সংখ্যা - ১-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

756.3
.012/8

কপিলের ডাইরির পৃষ্ঠা

সপ্তদশ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৬১ | প্রথম সংখ্যা

(কপিল)

[কপিল মুনি সাংখ্য সূত্র রচনা করা শেষ করেছেন ; তবুও মন তাঁর ভারাক্রান্ত। নিজ আশ্রমে তিনি একা আছেন ; আর ভাবছেন কি করে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হ'তে পারে। এমনি সময় একটি বালিকা তাঁর কুটির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হল। ঐ বালিকার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের কাহিনী এখানে তিনি নিজেই লিখেছেন। কিন্তু ক্রমাগত প্রথম পুরুষ এক রকমে লিখতে চান নি, তাই অপরের জবানীতে তিনি এটা লিখেছেন—তৃতীয় পুরুষে।—সঃ সম্পাদক]

কপিল মুনি নিজ আশ্রমে ঘুরছেন—অত্যন্ত চিন্তাকুল। নিজ মনে কি যেন বিড় বিড় করছেন।

দুঃখের নিবৃত্তি ত হল না ; সাংখ্য সূত্র ত শেষ হল—কিন্তু তবুও ত দেখছি ত্রিবিধ দুঃখ সমানেই মানুষকে দগ্ধ করছে। .....অথত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির-ত্যন্তপুরুষার্থঃ। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হ'লে অত্যন্ত পুরুষার্থ হয় ;..... কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি ত হচ্ছে না।

এমনি সময় একটি বালিকা তাঁর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। একাকী বাস করছেন ঋষি ; নারীসঙ্গ ত দূরের কথা, লোকসঙ্গ-ই তাঁর নিকট কতকটা অপ্রীতিকর। ভ্রূকুটি-কুটিল চোখে বুড়ো মুনি, ঐ বালিকার দিকে তাকালেন। "—"কি চাই তোমার ?" করলেন।

বালিকা বলল—"কি আবার চাই ? এলাম, তুমি একা আছ ; তোমার দুঃখ হচ্ছে ; দুঃখ দেখে এলাম—যদি তোমার দুঃখ কিছুটা লাঘব করতে পারি।"

কপিল হাসলেন, একটু বললেন—"দূর হ তোমার সাহস। আমি আজ কত বছর ধরে লোকের দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করছি ; আর তুমি এসে আমার দুঃখ লাঘব করতে। এই দেখছ—কত কাগজ-পত্র ; এতে সব হিসাব আছে—কার কি দুঃখ—আর আমি চেষ্টা করছি তা দূর করার জন্য। এত বছর চেষ্টা করেও পারছি না ; আর তুমি একটি ক্ষুদ্র বালিকা এলে আমার দুঃখ দূর করতে।"

বালিকা—"না, ঠাকুর ; আমি ত আসিনি। দুঃখ যে মানুষের বিশেষত্ব, (connotation

তাকে বাধা দিয়ে কপিল বললেন—"তুমি কি চাও—খুকী। দুঃখ সবার-ই আছে ; কম্ত অধীরও আছে।....."

বালিকা—"হাঁ, আছে; কিন্তু অন্য জন্তুর দুঃখ কেবল শরীরের; অন্য প্রকার দুঃখ তার প্রায় নেই। খুব সামান্য আছে। আমি বাবা-মার কাছ থেকে দূরে এসেছি। আমার মনে তাঁদের জন্য দুঃখ আছে, তাঁদের মনেও আমার জন্য দুঃখ আছে। পশু পক্ষীর মনে সে দুঃখ কতটুকু?—প্রায় নেই বললেও চলে। আসতে আসতে তোমার আশ্রমের একটা গাছ থেকে এই ফলটা পেড়ে এনেছি। অমনি মনে হ'ল চুরি করলাম—সমাজনীতি ভঙ্গ করলাম—কাজটা ভাল হল না। তাতেও মনে দুঃখ হ'ল। এই দুঃখ কি পশু-পক্ষীর আছে? নেই।·····তোমাকে এখানে একা দেখে, তোমার জন্য দুঃখ হ'ল। এই দুঃখ ত পশুপক্ষীর নেই।····· দুঃখ হল মানুষের জীবন; দুঃখ দূর করা যায় না; পারা যায় তাকে লাঘব করতে, তাকে সহনীয় করতে। এর বেশী সম্ভব নয়।·····"

কপিল মুনি চুপ করে রইলেন। ভাবতে লাগলেন —ত্রিবিধ দুঃখ,—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক।···এই বালিকা এ সব বড় বড় শব্দ জানে না; কিন্তু দেখছি—মোট তত্ত্বটা বেশ বুঝেছে। মনটা তাঁর একটু নরম হল।

একটু থেমে কপিল বললেন—"তুমি এত কথা শিখলে কোথায়?"

বালিকা জবাব দিল—"এ'ত শিখতে হয় না; তোমার মতো বেশী শিখলে হয়ত এ সবই গুলিয়ে যেত।·····এ সব কথা ত সবাই জানে।

কপিল—"তোমার নাম কি? কেন এসেছ এখানে?"

বালিকা—দুটো প্রশ্ন এক সঙ্গে করলে! আমার নাম তা অনেকগুলো আছে। বাবা-মা যখন আদর করে ডাকেন—তখন ডাকেন পুত্তলিকা। সেটা-ই এখন তোমার কাছে জানা থাক। আর এসেছি কেন? —আমার মন ভাল নয়। বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়া করেছি; তাই বাড়ী ছেড়ে এসেছি—যেখানে হয় থাকব। তার পর দেখলাম—তোমার এত বড় বাড়ী, একলা আছ—মন-ও তোমার দুঃখে ভরা। ভাবলাম তোমার এখানেই কিছু দিন থাকব।"

কপিল—"আমার এটা ত বাড়ী নয়; এটা ত আশ্রম। এখানে তুমি থাকবে কি করে—একা একা? তোমার খেলার সাথী নেই, কথা বলার সঙ্গী নেই।

বালিকা—"কেন! তুমি-ই ত আছ। তোমার সঙ্গে গল্প করব, তোমার সঙ্গে খেলব।"

কপিল একটু হাসলেন এবং পরে বললেন—আমি কে জানো? আমার সঙ্গে তুমি খেলা করতে চাও, গল্প করতে চাও!"

হাঁ, জানব না কেন! তুমি হ'লে কপিল মুনি। বিশ্বের দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে নিজের দুঃখ বাড়াচ্ছ ও নিজের মাথা খারাপ করছ।···আচ্ছা তোমার এত বড় অহঙ্কার কেন? এত লোকের দুঃখ তুমি দূর করবে!"

কপিল কিছু জবাব না দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। পুত্তলিকা কিছু সময় ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে-ও এক দিকে গেল। বালিকা এগাছ ওগাছ থেকে ফল কুড়াতে লাগল। সে-সব গুছিয়ে রেখে, সে বের হল—কি যেন খুঁজতে। কিছু সময় বাদে মুনিকে ধরে নিয়ে এল; তার কুড়ানো ফলগুলি দুজনে মিলে খেল। মুনির কাজের বিঘ্ন ঘটিয়ে, আশ্রমের নীরবতা ও শান্তিতে ব্যাঘাত জন্মিয়ে বালিকা আশ্রমেই রয়ে গেল। মুনি কাজ করেন;—বালিকা তাঁর সামনে বসে থাকে। কতক্ষণ পর হয়ত মুনির খেয়াল হয়—সামনে একটি চঞ্চলস্বভাব বালিকা চুপ ক'রে বসে আছে। তখন বলেন—"তুমি এমনি করে বসে আছ কেন? যাও, গিয়ে খেলা কর।"

বালিকা উত্তর দেয় "না, কার সঙ্গে খেলব। তুমি-ও চল। আর কত কাজ করবে?" ২।১ বার বলার পর-ও যখন বালিকা ওঠে না, তখন কপিলকে উঠতেই হয়। বালিকা খুব খুসী হয়ে ছুটতে থাকে; বৃদ্ধ মুনিকে-ও কিছুটা ছুটতে হয়। কাজে ব্যাঘাত হওয়াতে

মুনি একটু বিরক্ত-ও হন,—কিন্তু তার চেয়ে বেশী খুসী হন।—মনে হয় যেন, সাময়িক ভাবে একটা গুরুভার দুশ্চিন্তা কাঁধ থেকে নেমে যায়। এমনিভাবে দুটি অসম-বয়সী মানুষের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধন জমে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যার নিবিড় নীরবতায় একটি গাছের পাথার হেলান দিয়ে পুত্তলিকা গান করছিল—

"হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী"

কি পাই নি, কি পাই নি।···

কপিল মুনি একটু দূরে ছিলেন। বালিকার গান শুনে তিনি উৎকর্ণ হলেন। গান গাইতে গাইতে বালিকা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল। তিনিও বালিকার দিকে এগুচ্ছিলেন। আস্তে আস্তে পুত্তলিকা এগিয়ে এসে মুনির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ;—তখন-ও তার কণ্ঠে সঙ্গীত—

মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিনু তার
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার
সুর তবু জেগেছিল বারে বার।·····
মনে পড়ে তাই আজি
হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী
কি পাইনি—কি পাইনি—
তার হিসাব মিলাতে·····।"

কপিল স্তব্ধ হ'য়ে শুনছিলেন, গান থেমে যাওয়ার পর-ও তিনি কিছু সময় চুপ ক'রে ছিলেন। পুত্তলিকা তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করে নিজের বাহুদ্বয় এলিয়ে দিয়েছিল। একটু পর সে বলল—"ঠাকুর! তোমার মুখ এত গম্ভীর, অথচ তোমার চোখের কোণে হাসি। কি ভাবছ তুমি?"

তাঁর বক্ষোলগ্ন পুত্তলিকার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে—কপিল বললেন—"এ গান কোথায় পেয়েছিল, পাগলী!"

পুত্তলিকা—"বা, আমি পাগলী হব কেন?"

কপিল—"পাগল না হ'লেত দুঃখকে ভুলে থাকা যায় না। কি পাই নি—তার হিসাব না ভুলতে পারলে দুঃখ যায় না; আর পাগল না হ'তে পারলে—ও হিসাব তোলা যায় না—খুকী।"

পুত্ত—"বা, কি হয়েছে তোমার? আমি খুকী নই; আমি কত বড় হ'য়েছি।"

কপিল—"আচ্ছা—খুব বড় হয়েছ—তা হ'লে তোমায় মা বলে ডাকব।"

পুত্ত—না, বড় হয়েছি বলে কি বুড়ি হয়েছি যে তোমার মা হব? তোমার ত বয়সের গাছ পাথর নেই। তোমার মা হ'তে পারব না?"

কপিল—"তবে কি হ'বে! দিদিমণি হবে?"

পুত্ত—"তা বরং হ'তে রাজী আছি।"

একটু পর—কপিল বললেন, যেন আপন মনেই বলে চলছেন—"তা হয় না দিদিমণি,—মহৎ, অহঙ্কার ও মন—এই তিন মিলে এমন করবে—যে মানুষ হিসাবে না মিলিয়ে পারে না।" মহৎ—এর অপর নাম হ'ল বুদ্ধি। এসব মিলে তোমায় এমন মাতিয়ে তুলবে যে তখন তুমি ও তোমার বোধ—তোমার মনে জাগবে। তোমার ও তোমার নয় বুদ্ধি এলে তার হিসাব না মিলিয়ে পারবে না। তুমি ত এমনি বেশ বুদ্ধিমতী; তাহলে হিসাব না মিলিয়ে কি করে পারবে?—পুত্তলিকা বলল—"ও সব আমি বুঝি না। মহৎ ফহৎ—কি বলছ, জানি না। আমি মহৎ বলতে বুঝি যে নীচ নয়, ক্ষুদ্র নয়···!"

কপিল—"না, এ সব বোকা মেয়ে নিয়ে চলে না, সাধে কি নারীদের পক্ষে শাস্ত্র আলোচনা···"

পুত্ত—"ও, তুমি জাত ধরে গাল দিচ্ছ! জান আজ-কাল আমরা সবাই স্বাধিকার-সচেতন;—সবটাতে আমরা সমান অধিকার চাই—শাস্ত্রে-ও।—তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। বলেই পুত্তলিকা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল; কপিল তাকে ধরে ফেলে। জড়িয়ে ধরে বললেন—"অন্যায় হ'য়েছে, দিদিমণি! আর এমন কথা বলব না।···আচ্ছা, এসো—আবার আলোচনা করা যাক।"

পুত্তলিকা বলল—আচ্ছা, না হয়—মানলাম, তোমার মহৎ ও অহঙ্কার আছে। কিন্তু মন' তোমারি নেই।···

কপিল—মন নেই, তবে ··· ···?

পুত্ত—"তোমার বুদ্ধি আছে; অন্তঃকরণ আছে, চিত্ত

আছে, অহঙ্কার-ও আছে—কিন্তু নেই মন। কারোর কথা-ও তোমার মনে থাকে না, কারোর জন্ম তোমার দুঃখও নেই।...

কপিল—আরে—আমি যে দুঃখ নিয়ে মরছি—এই দুঃখের দর্শন-ই হল আমার জীবনের সাধনা।

পুত্ত—সে দুঃখ হল তোমার নিজের বুদ্ধির গড়া একটা বিলাস। কাজ নেই, কর্ম নেই—অফুরন্ত অবসর—কাজেই ঐ কল্পিত দুঃখ নিয়ে তুমি দিন কাটাচ্ছ এবং কাগজের পর কাগজ লিখে যাচ্ছ।

কপিল—তুই কি আমার লেখা পড়িস, দিদি?

পুত্ত—হাঁ মাঝে মাঝে পড়ি। কি সব ছাই লিখছ—ওর কি মাথা-মুণ্ড বুঝতে পারি!

কপিল—"কি বুঝতে পারিস নি! বল দেখি—।"

পুত্ত—"এত দুঃখ, দুঃখ বল কেন? দুঃখ কি—বলোত?"

কপিল ওর মাথায় হাত বুলতে বুলতে বললেন—"বোনটি, দুঃখ কি, এ কি বোঝাতে হয়। সমস্ত সৃষ্টিটাই হল বিপরীতের মিলনে; কাজেই দুঃখ থাকবে না কেন? প্রথম ধর—পুরুষ ও প্রকৃতি—পুরুষ হল শান্ত নিষ্কল, নির্বিকার; আর প্রকৃতি হল চঞ্চল, সবিকার। বিচার বুদ্ধি, রাগ-অনুরাগ সংরাগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সবই হল প্রকৃতির; আর পুরুষের নেই এর কিছুই। আর এই দুয়ের মিলনে হল সৃষ্টি। এমনি বিপরীতের মিলনে দুঃখ হবে না, ত কি হবে! আরো দেখো—প্রকৃতিতে আছে; সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি বিপরীত গুণ। এই তিনটি বিপরীতমুখী গুণের সামঞ্জস্য সাধনে হল প্রকৃতি। দেখছ ত বোন—দুঃখ কি সাধে আসে?

কপিল থামলেন; পুত্তলিকা-ও একটু চিন্তিত হল; আস্তে বুড়োর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে চাপ দিতে দিতে বলল—"তোমার মাথা খারাপ হবে দাদু। এত ছাই ভস্ম তাকার—যার কোনই দাম নেই, যা কেউ জানে না, বোঝে না।"

কপিল—না, বোন—মাথা আমার খারাপ হবে না—কিন্তু মাথা খারাপ হবে তোদের যারা বুঝছিস না—কি হারিয়েছিস?

পুত্ত—"ক্ষতি কি? যা হারিয়েছি তা যদি আমি টের না পেলাম—আমার দুঃখ কি? তা হারালে আমার লোকসান কি?

কপিল—কি হারিয়েছিস—তা জানিস না; কিন্তু দুঃখটা অনুভব করছিস। দুঃখ ছাড়া তোদের জীবনই চলে না।

উত্তরে কিছু সময় চুপ ক'রে থাকল। পরে আবার কপিল বললেন—"দেখ বোন—যা নেই তার উদ্ভব হতে পারে না; অসৎ হতে সতের জন্ম হতে পারে না। এই হ'ল কারণ ও কার্যের সম্পর্ক। কারণে যা নেই কার্যে তা হতে পারে না। মানুষের গঠনের মধ্যেই দুঃখ আছে; তা না হলে অ-দুঃখের বা দুঃখের অভাবের, অবস্থা থেকে দুঃখের উদ্ভব হতে পারে না।

পুত্ত—কারণের মধ্যেই কার্য আছে? তা কি করে হয়? কার্য না ঘটবার পূর্বে ত তাকে দেখতে পাই না।

কপিল—হাঁ, তা পাওনা; কিন্তু তবু-ও তা কারণের মধ্যেই আছে। কারণ থেকে কার্য হওয়ার নামই হল—পরিণামবাদ—অর্থাৎ অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের প্রকাশ বা পরিণাম। ওর মধ্যে এটা না থাকলে পরে এর সৃষ্টি হতে পারে না।"

পুত্ত—ঠিক বলেছ—দাদু, আমার একটা বোন আছে; সেটা খুব পড়ে; একটা ইংরাজী বই পড়ছিল। তাতে ঐ রকম কথা আছে। "... ex nihilo nihil fit—অর্থাৎ নাস্তি থেকে নাস্তিই হবে—অস্তি হবে না।"

কপিল—হাঁ—স্পিনোজা (Spinoza) নামে এক ছোকরা ঐ কথা বলেছে। ও ছোকরার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু ছিল। পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈততাব ওর মতেও আছে—মন ও জড়। তারপর দেখ স্পিনোজা-ও বলেছে—কারণ থেকে কার্য বের হবে অনিবার্যভাবে। আর এর বন্ধনে মানুষ বাঁধা পড়েছে। স্পিনোজাও বলেছে—সত্যিকার জ্ঞান লাভ করলেই মানুষ মুক্ত বা স্বাধীন হ'তে

পারে এবং কেবল স্বাধীন মানুষই ভাল করতে পারে।—অর্থাৎ স্বাধীন মানুষই কেবল সুখী হ'তে পারে।

পুত্ত—স্বাধীন মানুষ। কিসের থেকে স্বাধীন?

কপিল—বলেছি ত তোকে—পুরুষ বেচারা বাঁধা পড়েছে প্রকৃতির ফাঁদে. সেখানে তিনটা বিপরীত ধর্ম বা গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম ক্রমাগত সংঘর্ষ করছে। পুরুষের বুকের উপর চলছে এই তাণ্ডব। এর থেকে প্রথম এল—মহৎ বা বুদ্ধি;—পরিণাম এখানে সুরু হল। তারপর এল অহঙ্কার—অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি। প্রকৃতির এই যে তাণ্ডব—এর মধ্যে একদিকে আছে পুরুষের আনন্দ এবং অপর দিকে আছে—তার বন্ধন-বোধ বা দুঃখ এবং ঐ দুঃখ থেকে মুক্তির প্রয়াস। দুঃখের অনুভূতি আছে বলেই এই মুক্তির প্রয়াস আছে।

পুত্ত—"কিসে এই মুক্তি হবে? সব গোলমেলে কথা বলছ—আনন্দ ও দুঃখ একটা থেকেই আসে!"

কপিল—"তা আসবে না কেন? প্রকৃতিই যে হ'ল সবটার কারণ—যার নিজের কোন কারণ নেই। সুখ-দুঃখ সবটারই কারণ হল প্রকৃতি।.....ঐ মুক্তি কিসে আসবে? মুক্তি আসবে প্রকৃত জ্ঞান থেকে—যখন পুরুষ তার সত্তা বুঝতে পারবে। আত্মা যে অন্-আত্মা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র এই জ্ঞান হওয়া দরকার।"

পুত্ত—খুব বুঝালে! একটু খুলে বল—যাতে আমার মতো বোকাও বুঝতে পারে।

কপিল—মুক্তি তখনই আসবে—যখন পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ ছাড়তে পারবে;—যখন এইসব আসক্তি ত্যাগ করতে পারবে—তখনই মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি;—তখনই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে। এর সাধনা করছি এত যুগ ধরে—কিন্তু.....।

পুত্ত—"তাহলে ঠাকুর—আমি যে বলেছিলাম
—হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী—
পুত্তলিকা গান সুরু করল—
আপত্তি করার গোড়ায় রয়েছে হিসাবের কথা ভুলে যাওয়া, যা পাওনি তার জন্য খেদ না করা

"কি পাই নি—কি পাই নি
হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী—
ভাল বেসেছিনু এই ধরণীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে
কত বসন্ত দক্ষিণ সমীরে
ভরেছে আমার সাজি
আজ ছবির ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি!
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে—সাধনা
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিনু তার;
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার
সুর তবু জেগেছিল বারে বার,
কি পাইনি—কি পাইনি
হিসাব মিলাতে মন মোর
নহে রাজী—"

গানের সুর বাতাসের গায়ে বাজতে লাগল।

একটু পর কপিল বললেন—"দিব্যিমণি—এই গাইলে—ভালবেসেছিনু এই ধরণীরে সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে।.....এর মধ্যেই ত দুঃখ। হিসাব মিলাতে তুমি চাও না—কিন্তু"—

পুত্ত—ঠিক কথা—আমি ত বলিনি যে স্মৃতিও মনে আসবে না;—কিন্তু এই স্মৃতি মনে এলেই—আমি গাইব—মন মোর নহে রাজী।"

একটু থেমে পুত্তলিকা আবৃত্তি করতে লাগল—

"এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল
সে আনি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান
ভরেছি ধরণী তল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক।
যতদিন থাকে, তত দিন থাক,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক ধূলার মাঝে।

বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ বিবিধ সাজে।
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চরণে আসি—
……দেবি, তুমি যদি লহ কর পাতি
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি।"

কপিল—এমনি ক'রে সব ছেড়ে দিতে পারিস—বহ্নিজী?

পুষ্প—কেন পারব না! কি আমি চাই—তা-ও ত জানি না। তুমি বলেছ না—কার্য সবই কারণের মধ্যে আছে। আমার বাসনা-ও ত আমার মধ্যেই আছে। কখন কোন্ বাসনা আসে—জানি না। কি যে চাই তা-ও জানি না। কাজেই ছাড়তে পারব না কেন?

কপিল—আমি-ও ত সব ছেড়েছি, তবুও ত মুক্তি পাই না; তুই ত বোন বলেছিস—আমার মন নেই, মায়া নেই।……

পুষ্প—তা বলি—এক হিসাবে তা সত্যও;—কিন্তু অপর দিকে তা সত্য নয়। কত কিছু তুমি ছেড়েছ; কিছুই ত তুমি আঁকড়ে ধরে রাখ নি—বা কিছুই তোমাকে আঁকড়ে রাখতে পারে নি। তবুও তোমার দুঃখের অন্ত নেই; তোমার চোখ দিয়েও জল পড়তে দেখেছি।…

কপিল—উঁহু—মিথ্যা কথা!

পুত্তলিকা হাত তালি দিয়ে হেসে উঠল—এবং বলল—"দাদু তুমি মিছে বলছ—আমি নয়। ঐ যে সেই লক্ষ্মীছাড়া পাখীটা তোমার হাত থেকে উড়ে গেল—আর এল না—কত দিন তুমি গাছের আগার দিকে বা আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলেছ।…"

কপিল হেসে উঠে বালিকাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"দুষ্টু মেয়েটা, তুই দেখেছিস! কপিল মুনি একটা ছোট্ট পাখীর জন্য ফেলেছে কেউ বিশ্বাস করবে! বাতাসে উড়ে কোন ধূলি-কণা চোখে পড়েছিল, তাই জল…

তাঁকে বাধা দিয়ে পুত্তলিকা বলল—"আবার মিছে কথা বলছো দাদু। এইত মজা,—মনের কথা যে তুমি নিজেও জানতে পার না। কোথায় যে মানুষ মায়ায় পড়বে কে জানে। তুমি সব ছেড়ে একটা পাখীর জন্য কাঁদলে;—আমি বাপ-মা ভাই-বোন—সব ছেড়ে তোমার মায়ায় পড়লাম। শুনবে—আর একটা গান!—কবি অনেক বড় তোমার মতো তত্ত্বজ্ঞানীর চেয়ে।

বালিকা আবার গান ধরল—

"যাহা চাই ভুল করে চাই, যাহা পাই
তাহা চাই না।
বক্ষ হ'তে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।

গান করতে করতে বালিকা ঘুরে সরে যেতে লাগল—

বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া
পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই
তাহা চাই না।

বালিকা আরও দূরে সরে গেল—ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল সুর ভেসে আসতে লাগল—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম!
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে কোথা দিশা
খুঁজে পাইনা।
যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই
তাহা চাই না।"

ক্রমে গানও বাতাসে মিশিয়ে গেল। কপিল ডাকলেন—"পুত্তলি—দিদি—বোন এদিকে আয়"

দূর থেকে জবাব এল—"নাঃ—আর না—
—যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই, তাহা চাই না।"

কপিল আবার ডাকলেন—বোন, আয়।

এলো কেবল গানের সুর—

"হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী
কি পাইনি, কি পাইনি……"

রবীন্দ্রনাথের 'সর্বানুভূতি'

অধ্যাপক শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

উপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হন না।

রবীন্দ্রনাথ এই বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—'আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে ক্ষুদ্র; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সে-ই হয় প্রকাশিত।'

রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক আবহাওয়ায় মানুষ: তাঁর মনের গভীরে, অন্তরের ঐকান্তিকতায় উপনিষদের শিক্ষা প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছিল। উপনিষদ তাঁর কাছে শুধু তত্ত্ববহ শাস্ত্রগ্রন্থ মাত্র ছিলনা, এই ছিল তাঁর জীবন-বেদ। সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টায়, জীবনের সাধনায়, চরম উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে জীবনের সত্য হিসাবে পেয়েছিলেন এবং তা পেয়েছিলেন বলেই নিত্যকালের ভারতবর্ষের বাণী তাঁর কাব্য-গাথায় সুন্দর ও মধুর হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবি বলেছেন—

মুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত করহে বন্ধ;
সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।

উপনিষদের যে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধ শুরু করেছি, তার সঙ্গে কবির এই আন্তরিক প্রার্থনার সুরের গভীর ঐক্য আমাদের অভিভূত করে। সংভূতে মিলন-মাধুর্যের আলোকে মুক্তির দ্বার খুলবে—এইত কবির বিশ্বাস। আমাদের মনে হয়—কবির এই বিশ্বাস শুধু কথার কথা নয় সমস্ত জীবনের সত্যোপলব্ধির একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মর্মবাণী। এই প্রার্থনার ভেতর সমস্ত কবি-জীবনের প্রাণের ক্রন্দন, আত্মার আকুতি, প্রকাশের বেদনা সহস্র শিখ আলোক-শিখার মত ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে জ্বলছে। এই আলো ছড়িয়ে আছে—কবির কাব্য-কর্মে, জাগতিক কর্মে ও জীবনের মর্মমূলে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী কবি-জীবনের এই গোপন গহন অথচ মূল ও স্থির বাণীটির নাম দিয়েছেন—"সর্বানুভূতি"। সকলের মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ ও বিস্তীর্ণ করে দিয়ে আত্ম-প্রাপ্তির চেষ্টা ভারতবর্ষের কালের প্রয়াস। মানবজাতির সহস্র বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভেতরে ঐক্যের সহজ সুরটী খুঁজে পাওয়া ভারতবর্ষের সাধনা, নিত্যকালের ভারতবর্ষের অন্তরের কবি রবীন্দ্রনাথেরও একমাত্র প্রয়াস ও সাধনা।

জীবন-শৈশবের "প্রভাত সঙ্গীতে" হৃদয়-অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দ কবিকে আত্মহারা করেছিল। সেইদিনই কবি বুঝেছিলেন—মিলনেই জীবন, বিচ্ছেদেই মৃত্যু। আত্মার নিঃসঙ্গ একাকিত্বে তাঁর মোহ ছিলনা—ছিলনা আসক্তি। তিনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে মহামানবের চরণতলে জেগে উঠে মুক্তির আলোতে স্নান করলেন। সেই মুক্তি-আলোক-স্নান অক্ষয় হ'য়ে রইল "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"।

তারপর কাব্য-পথে শুরু হ'ল মুক্ত আত্মার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বারবার নানাভাবে, নানা সুরে নানা রূপে প্রকাশিত হ'ল উপনিষদের বাণী—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

কবি বললেন—

"শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য; এইজন্য পিতামহেরা বলছেন:—শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব।"

যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সমস্ত জাতীয় মনুষ্যের ঐক্যবিধায়ক অদ্বৈত তাঁরই ধ্যান মন্ত্র হল কবি-জীবন-

সাধনার বীজ-মন্ত্র। বিজনে বা আপন মনে পাওনা যাবে না।

নয়কো বনে, নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার সঙ্গে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সঙ্গে আমারো।

সকলের সুখ-দুঃখে, বিধা-দ্বন্দ্বে, উত্থান-পতনে সেই চরম ও পরম যিনি তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেছেন,—তাঁকে সেই গভীর প্রকাশের মধ্যেই অন্তর দিয়ে পেতে হবে।

সেইজন্যই কবি বললেন—

বৈরাগ্যে সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

নিঃসঙ্গ আত্মার একাকিত্বের সাধনায়, সবপরিত্যাগের বৈরাগ্যে কবির মুক্তি নেই। সর্বমানবের গভীর ঐক্যের অসংখ্য বন্ধনেই তাঁর মুক্তি।

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে র'ব মুক্তি সমাধিতে?

এপ্রশ্ন কবি-জীবনের কোন বিশেষ সময়ের সাময়িক প্রশ্ন মাত্র নয়, এ তাঁর সমস্ত জীবনের সর্বকালের প্রশ্ন।

উপনিষদ বলেছেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্"

কবির মতে এইত একমাত্র সত্য। "সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। ... ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন, এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা; আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়।"

সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেই মুক্তি, ঈশ প্রাপ্তির পরম [illegible]; এ কথাই কবি বার বার করে বলেছেন।

মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুম সেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা রোজ রোজ যেমন করে মনকে সংযত করা যায়, বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করা যায় না!

রবীন্দ্রনাথ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখছেন—

"এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়: তাই উপনিষৎ বলছেন: অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা। বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তারপর বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে"

কবির নিজের বিশ্বাসের মাধুর্যের ঐকান্তিকতায় মধুর এই বাণী-ভাষ্য মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয়েছে বলে মনে হয়। কবি যখন বলেছিলেন—'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ—তখন এই ধ্রুব প্রতীতি তাঁর মনে কাজ করেছে কিনা কে জানে!

শুধু কবি কর্মেই নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবন-চর্যায়ও 'সর্বানুভূতির' সুর সহজ হ'য়ে ধরা দিয়েছে। বিশ্ব-ভারতী' প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে এইভাব কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্বভারতীতে কবি পূর্ব পশ্চিম দূর নিকট, আত্মীয় অনাত্মীয় সবাইকে আহ্বান করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল—এই প্রতিষ্ঠান হবে সেই স্থান যার সম্বন্ধে বলা যায়—"যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্!" যে বাণী কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হচ্ছে—"বসুধৈব কুটুম্বকম্।" সুতরাং এমন নীড় তিনি স্থাপন করে গেলেন—যেখানে বিশ্ব এসে মিলবে—পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নয়, আত্মস্বীকৃতি ও আত্মপ্রকাশের আনন্দ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমাদের দেশের বিশ্বনিকেতন পূর্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায়না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের দ্বারা

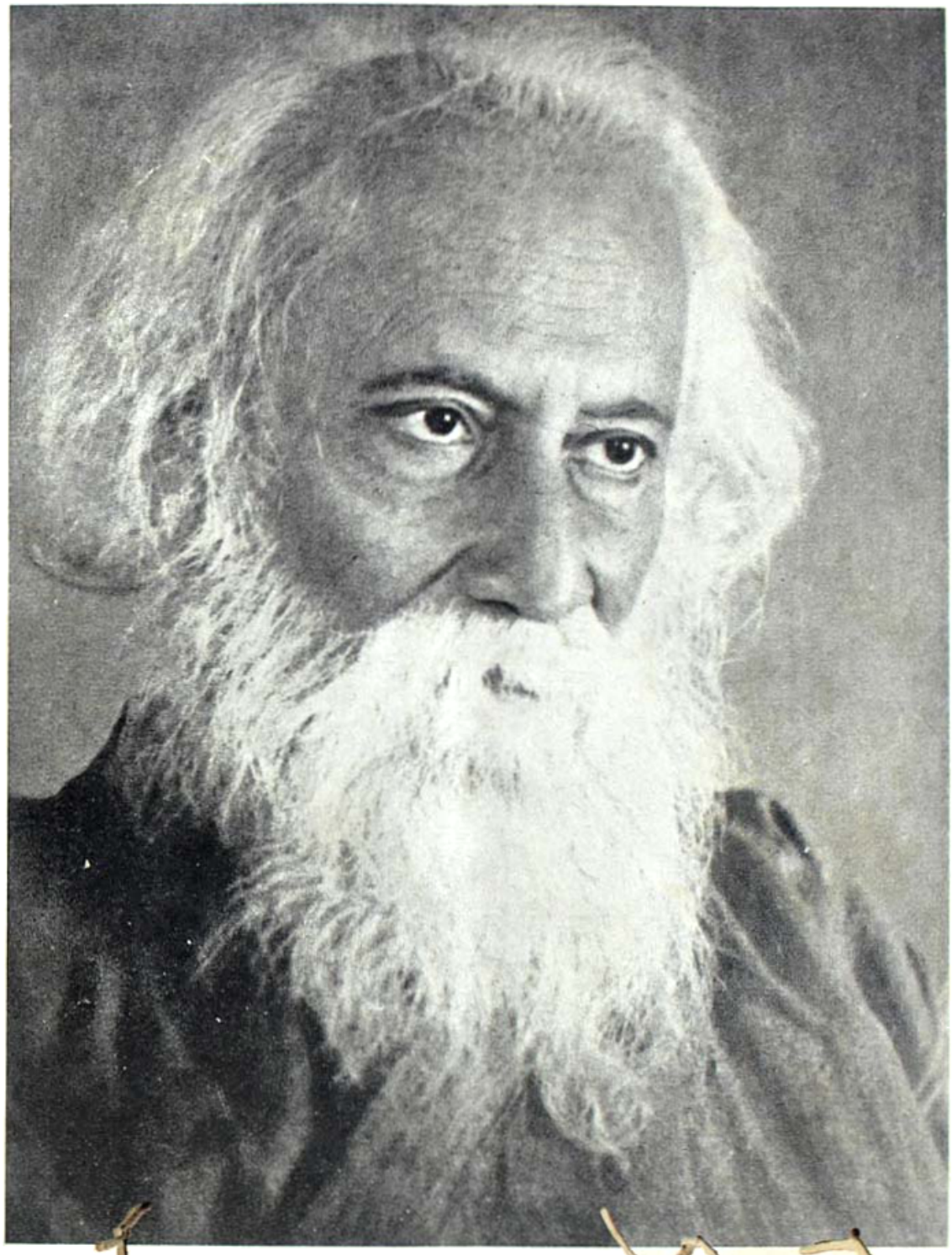

বিশ্বকবির চতুর্বতিতম জন্মদিনে
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি

নেই। যে গৃহস্থ কেবল মাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চল্‌বেনা, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রই তার প্রধান অতিথিশালা।"

কবি সেই অতিথিশালা স্থাপন করেছেন—তার নামই ত "বিশ্বভারতী"। 'এই মহামানবের সাগরতীরে' পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে লোক এসে মিলেছে। এই অতিথিশালা সবাইকে আতিথ্য দিয়েছে। কাউকে বিদেশী বলে অশ্রদ্ধা করেনি, হেয় বলে অবজ্ঞা করেনি। অশোভন বলে বিদ্রূপ করেনি। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সর্বানুভূতির এ এক বিশেষ প্রকাশ।

কবি জেনেছিলেন—সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে উপলব্ধি করাই আত্মপ্রকাশ ও মুক্তির উপায়। মানুষের এই প্রকাশতত্ত্বটি তিনি কাব্যে রূপ দিয়েছেন, শিক্ষার মধ্যে প্রচার করেছেন ও কর্মের মধ্যে জাগ্রত করেছেন। তাঁর সর্বানুভূতি সার্থকতা লাভ করেছে কথায় ও কাজে।

আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। মানুষের মনুষ্যত্বের পরাভব, জীবনের মূল্যবোধের অবমাননা, মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদের প্রকোপ আমাদের জীবন বিড়ম্বিত করেছে। আজ আমাদের বড় দুঃখ, ভেদবুদ্ধি আমাদের উগ্র হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনৎকার। গৃহে গৃহে যুদ্ধের প্রস্তুতি, কিন্তু বাইরে শান্তির বক্তৃতা। অন্তর বিসর্জন, মুখ মধুর কথায় ভরপুর। এই দুর্দিনে সর্বানুভূতির কবির বাণী আমাদের স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। আজ আমাদের অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে—

আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সে-ই হয় প্রকাশিত।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করতে হবে সেই 'এক'কে—

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু

'তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত করুন।"

তবেই আসবে শান্তি। যুদ্ধের ঘন কৃষ্ণ মেঘ যাবে কেটে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

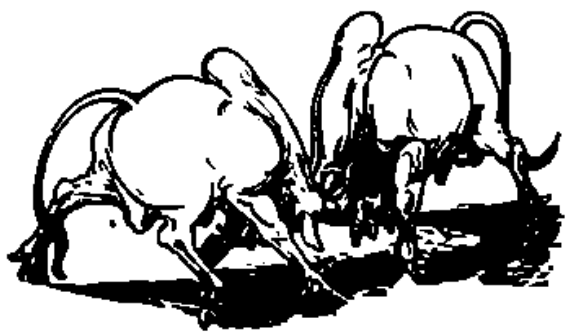

বাতিল

শ্রীসুনন্দা গুহ

একটু অসাবধানেই গাঢ় কাল রংয়ের কৌটাটা টপ্ করে ঝরে পড়লো ফিগারটার বাদামী কপালের ঢালে। মিলিয়ে নেবার কোন পথ নেই। একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নিরুপকালো দাগটার ওপর, তারপর একটা তির্যক্ রেখায় সমস্ত ছবিটা জুড়ে সেই কাল রংটা ছড়িয়ে দিল প্রদ্যুম্ন—ওর মনের অসন্তোষের মত কঠিন কালো প্রতিবাদ তুলে ছবিটা স্তব্ধ হয়ে রইল।

চুপ করে রইল মৈত্রেয়ীও। দরজা দিয়ে ঢুকে অবধি এই পাঁচ মিনিটই ও দাঁড়িয়ে দেখছিল, সাড়া দিতে পারেনি। ছবিটা নষ্ট করে ফেলবার পরও শব্দ করতে পারলো না, শুধু ওর মাথা ঘেঁষে ছোট্ট একটা চড়ুই পাখার ঝাপটা মেরে উড়ে গেল।

তুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এতক্ষণে পেছন ফিরে তাকালো প্রদ্যুম্ন—'তুমি'? —একটা কথাতেই অনেক কথা বলো—বল্লো ওর হাসিতে, ওর প্রসন্ন হ'য়ে আসা চোখে—'কতক্ষণ এসেছো?'

নম্র পায়ে এগিয়ে এলো মৈত্রেয়ী। কুণ্ঠানম্র স্বরে বল্লো 'এই পাঁচ মিনিট', তারপর বসলো ওর নির্দিষ্ট জায়গায়।

প্রদ্যুম্ন একটা চুরোট ধরালো—তারপর দীর্ঘ দৃঢ়চরণে পা ফেলে পায়চারী করতে লাগলো। ওর চোখের কোণে একটা অতৃপ্তির জ্বালা আস্তে আস্তে নিভে এলো। মৈত্রেয়ী একবার আড়চোখে মাষ্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ইজেলের দিকে তাকালো—বলিষ্ঠ ছেলেটীর মুখের ওপর ক্ষতচিহ্নের মত কালো দাগটা। এইমাত্র ছবিটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

'কেন এমন করলেন'—অনুযোগটা ঠোঁট পিছলে বেরিয়ে এলো মৈত্রেয়ীর। আন্তরিক ক্ষুব্ধতায় আবার বল্লো মৈত্রেয়ী—'এমন সুন্দর ছবিটা—কেন আপনি এমন করেন?'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল প্রদ্যুম্ন—না ফিরেই উত্তর করলো—'ওটা হয়নি কিছু।'

'এ আপনার অন্যায়, কেন নিজের এমন চমৎকার আঁকা ছবিগুলো আপনি নষ্ট করে দেন?'—নিদারুণ আক্ষেপে মাষ্টারমশায়ের ভয় ভুলে মৈত্রেয়ী বলে বসে—যেন ওর সত্যি এ অনুযোগ করার অধিকার আছে। যেন সমস্ত কলারসিকদের পক্ষ থেকে ও আবেদন জানাচ্ছে অসন্তুষ্ট শিল্পীকে।

পায়ের নীচে কতগুলো ছেঁড়া ছবির টুকরো পিষে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো প্রদ্যুম্ন—মনে হল মৈত্রেয়ীর দরদে-ভেজা কথাগুলো ওকে একটা আঘাত করলো। কিন্তু যখন মুখ খুল্লো, তখন সম্পূর্ণ অন্য সুরে বল্লো প্রদ্যুম্ন—'দেখি কি এঁকেছো।'

একের পর এক ড্রয়িং পেপারগুলো খুলে বিছিয়ে বিছিয়ে দেখে প্রদ্যুম্ন। দম বন্ধ করে ততক্ষণ বসে থাকে মৈত্রেয়ী। আস্তে আস্তে প্রদ্যুম্নর ভ্রূকুটীকুটিল মুখ স্নিগ্ধ হয়ে আসে—'ভাল হয়েছে।' তারপর কোথাও নতুন করে রংয়ের পরিকল্পনা করে। কোথাও বা ছবির এক প্রান্তে জাগিয়ে তোলে একটী ক্ষীণ পথের রক্তধারা, তাতেই যেন কথা কয়ে ওঠে ছবিগুলি।

আর কথা বলে মৈত্রেয়ীর ঘুসীভরা ভ্রূ। বঙ্কিম ভ্রূরেখা খুসীতে চঞ্চল করে তুলে মৈত্রেয়ী কৃতজ্ঞতা জানায়—'আপনার কাছে শিখি তাই। নইলে আমাকে দিয়ে কিছু হ'ত না।'

হঠাৎ ওর উচ্ছ্বাস থমকে যায়—মুখে চোখে একটা চাপা কাঠিন্য মেখে প্রদ্যুম্ন বাধা দেয়—'তুমি আমাকে অকারণে বাড়িয়ে বল। তোমার নিজের আত্মবিশ্বাস এত কম কেন?'

'বোধহয় অমল চিত্রা কত ভাল আঁকেন আমার চেয়ে—তাই।' মৈত্রেয়ী সভয়ে কৈফিয়ৎ দেয়।

প্রদ্যুম্নর চোখে অসন্তোষ ক্ষিপ্র বিলিক দেয়। প্রায়

অস্ফুটস্বরে দাঁতের ওপর দাঁত রেখে উচ্চারণ করে—'বোধারেন অমল চিত্রা!' সেটুকুই মৈত্রেয়ীকে হতবাক্ করে দিতে যথেষ্ট।

অশোককে কাঁদোকাঁদো গলায় বলতে গিয়েছিল মৈত্রেয়ী 'এমন মেজাজ প্রদ্যুম্নবাবুর'! হাতের বইটার থেকে চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলো অশোক, 'কি ব্যাপার?'

'এমন খামোখা চটে ওঠেন, মন রেখে কাজ করাই শক্ত।মারী। দোষের মধ্যে বলেছিলাম অন্য সকলের চেয়ে আমি খারাপ আঁকি—তাতেই রাগ করে এমন বকতে লাগলেন!' হাতের বইটা বন্ধ করে রেখে এবার একটু অদ্ভুত চোখে তাকায় অশোক মৈত্রেয়ীর দিকে—'ভালই তো। তোমাদের প্রদ্যুম্নবাবুর কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার অভিনবত্ব আছে। তা তোমার এতে এমন অভিমান করার কি?'

মৈত্রেয়ী থেমে যায়। 'তারপর', অশোক আবার জিজ্ঞেস করে 'তারপর আবার কি'? মৈত্রেয়ী নীরস গলায় উত্তর দেয় 'চলে এলাম'। অশোক একটু মুখ বাঁকায়, তারপর বইয়ে মন দেয় আবার? কিন্তু না বলেই বা বাঁচে কি করে মৈত্রেয়ী। তাই আবার আস্তে আস্তে মুখ খোলে। আপন মনে গল্প করে আর্ট কলেজের মেয়েদের ছবির। একসময় হঠাৎ ঝট্ ধমক দেয় অশোক 'থামো।' যত বাজে গল্প শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল আমার। মেয়েদের এসব বাঁরমুখী স্বভাবটাই দেখতে পারিনা আমি। কাকামণিকে তখনই নিষেধ করেছিলাম। তা তাঁর আর কি, তাকে তো আর মাইকেলাঞ্জেলোকে নিয়ে ঘর করতে হয়না—বা পিকাসোকে। আমারই যন্ত্রণা!'

'কাকামণি কি করলেন আবার'—বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ীর শ্যামল মুখ বেদনায় নীল হ'য়ে যায়। কিন্তু আরও বলতে যাওয়ার আগে কট্ করে আলোটা নিভিয়ে দেয় অশোক—'বাজে বোক না। তোমার নন্‌সেন্স শুনবার সখ আমার নেই। এসো, তারপর দুবাহুতে মৈত্রেয়ীকে এমনভাবে ছিঁচড়ে আনে, মনে হয় একটা জড়পদার্থকে নাড়াচাড়া করছে—আর রাত্রির গভীর কালো রংয়ে মৈত্রেয়ীর সমস্ত প্রতিবাদ বন্ধ্যত্বে হয়ে যায় প্রদ্যুম্নর আঁকা বাতিল ছবিটার মত।

মৈত্রেয়ী বিবাহিতা হল কেন? মডেলের রক্তিম সিঁথির দিকে চেয়ে এই নিয়ে তৃতীয়বার ভাবলো প্রদ্যুম্ন। তারপর দুহাতে সরিয়ে দিল এই বিসদৃশ চিন্তা, তুলির একটানে শেষ করলো পায়ের নখন আঁজ। রংয়ে ভেজালো তুলি।

'আর কত দেরী?' অধির হ'য়ে উঠেছে মৈত্রেয়ী—শুধু বসে থাকার অস্বস্তিতেই নয়, আরও কি একটা নিগূঢ় অস্বস্তিতে। প্রদ্যুম্নর দৃষ্টিটা আজ অসহ্য লাগছে—যেন বড় বেশী বলে ফেলছে ওর অতলান্তক চোখ।

'কিন্তু আর কত বাকি?' ছবিটাও বিচিত্র। এ ছবি আরম্ভ হয়নি ঊর্ধ্বদেশ থেকে। তুলি দিয়ে রংয়ের আঁচড়ে ফুটিয়েছে চরণসুষমা—এগিয়ে এসেছে চরণ হতে কটিতটে। যেন সমস্ত শরীরের লাবণ্যের অশান্ত ঢেউগুলিকে রেখার বাঁধনে বন্দী করে রাখবে শিল্পী—যেন তা শুধু শান্ত হবে মুখের সৌন্দর্যসমুদ্রে। 'চেনা যাবে?' যাবার সময় মুণ্ডহীন ছবির দিকে চেয়ে হাসলো মৈত্রেয়ী,—অদ্ভুত হচ্ছে কিন্তু। চেনা যাবে না? ভাবলো প্রদ্যুম্ন—হয়তো নয়—! যদি সন্ধ্যার নতুন তারা ফোটে ওর ছবিতে, যদি ভোরের পাখী গান গেয়ে ওঠে ওর রংয়ের বন্যায়, যদি প্রদ্যুম্নর সমস্ত মনের কথা স্বরলিপির মত লেখা হয় মৈত্রেয়ীর রূপসৃষ্টিতে—সে কি ব্যর্থ? কে জানে?

'আজ চলি'—মৈত্রেয়ী বিদায় সম্ভাষণ জানালো। তারপর হাত রাখলো দরজার হাতলে—আর সেই মুহূর্তে ওর এতক্ষণের অস্ফুট আশঙ্কাকে সত্য করে প্রদ্যুম্নর চওড়া হাত নেমে এলো ওর মুঠো করা হাতের ওপর। তারপর মৈত্রেয়ীর ত্রস্ত আতঙ্কিত চোখের ওপর নিজের আগ্নেয় নয়ন তুলে ডাকলো 'মৈত্রেয়ী'! একমুহূর্ত অবশ হয়ে রইল 'মৈত্রেয়ী'। তারপর জোর করে ছিনিয়ে

নিল নিজেকে—ছি, এসব কি?'

কিন্তু ছাড়িয়ে নিজেও সরতে পারলো না মৈত্রেয়ী। যেন আরও একটা অগ্ন্যুৎপাতের জন্য ও নিজেও অগ্নিগিরির মত জ্বলে উঠেছে। ওর জীবনে ও বুঝি এই প্রথম ভালবাসার ছোঁয়া পেল।

কিন্তু প্রদ্যুম্ন ছেড়ে দিল ওর হাত। ওর চোখ আবার অতল নির্বাক হ'ল। সবলে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো প্রদ্যুম্ন।

দরকারের বেশী আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মৈত্রেয়ী, যেন আরও কিছু ঘটবে। কিন্তু না। দরজার হাতল টেনে বিনা বাধায় বেরোতে পেলো মৈত্রেয়ী। ঠিক সে মুহূর্তে মুখ ফেরাল প্রদ্যুম্ন; মৈত্রেয়ীর উত্তেজনা-বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করলো

'তোমাকে আমি ভালবাসি মৈত্রেয়ী।'

দুহাতে কান ঢাকলো মৈত্রেয়ী, ওর হৃৎপিণ্ড যেন কাঁপতে কাঁপতে আর থামে না। রাস্তায় চলতে চলতে ওর মনে হ'ল আত্মধিক্কার আর অনুতাপ যেন ওর তীব্র হৃদয়কে ভেঙ্গে দেবে।

কিন্তু ধিক্কার শুধু কি মৈত্রেয়ীর? দীর্ঘ কমাস ধরে এ আত্মগ্লানি কি বিক্ষত করেনি প্রদ্যুম্নের মন? তার স্বপ্নে নারেনি নালিশ? উত্তেজিত পদচারণা করতে করতে ইজেলের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো—ক্যান-ভাসে মৈত্রেয়ীর গলার ভাঁজ অবধি আঁকা রয়েছে, কিন্তু তার ওপর কার ছোটার চিবুকের ডোল, উন্নত-স্পন্দিত মস্তক? মৈত্রেয়ী আর আসবে না! ছাতের কাছে রাখা তুলিটা টেনে নিল প্রদ্যুম্ন। সেদিনের স্পন্দিত যুবকের মত এই অপ্রগল্ভ যৌবনকেও একটা কুৎসিত কালির আঁচড়ে পঙ্গু করে দেবে প্রদ্যুম্ন। তার জীবনের ব্যর্থতার এই চরম প্রমাণটাকে মুছে ফেলবে সে। আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখলো প্রদ্যুম্ন। তারপর তুলির প্রথম টান দিতে শুরু করল।

কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জ ছুঁয়ে পুবে চললো, সিংহের পায়ের ধাবায় রক্তবর্ণ রেগুলাস জ্বলে জ্বলে ক্যাকাসে হ'য়ে এলো। এতক্ষণে দুচোখ ভরে ঘুম নেমে এলো প্রদ্যুম্নের—নামলো শান্তির নম্রতা।

ভেনাস? ছবিটা দেখতে দেখতে চোখে আর পলক পড়ে না মৈত্রেয়ীর। এ কার ছবি? এ কার মুখ? মৈত্রেয়ীর চোখে কি এত আগুন ছিল—মৈত্রেয়ীর শান্ত ঠোঁটে এত ভাষা? এবারকার শিল্পপ্রদর্শনীতে পুরস্কার পাওয়া ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছবিটা। চিত্রীর নাম দেখতে হয় না মৈত্রেয়ীর। তুলির বিশিষ্ট ছাঁদে শুধু একজনকেই মনে পড়ে। এ ধরণ তারই নিজস্ব।

'নিজের ছবি দেখে নিজেই মুগ্ধ?'

চমকে ফিরে তাকালো মৈত্রেয়ী। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মযূরকণ্ঠী শাড়ীর রংয়ে ওর চোখ ঝলসে গেল—সহ-কর্মিণী চিত্রা বোস।

'ভাল হয়নি মনে হ'চ্ছে আপনার?' বিস্মিত প্রতি-প্রশ্ন করে মৈত্রেয়ী।

'না, না, তাই বলেছি আমি?' ঠোঁটে গভীর স্নেহের কারুকার্য ফুটিয়ে উত্তর দেয় চিত্রা 'যার ছবি সবসময়ই মনে ভাসে, সে ছবি কখনও খারাপ হয়?' বলতে বলতে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে একটা আশ্চর্য শীতল হাসি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায়।

কথার বক্রতায় পিছিয়ে যায় মৈত্রেয়ী। একটা কঠিন উত্তর পিছলে আসে ওর ঠোঁটে, কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হয় এ চরমবাণী উচ্চারণের পর আর কোন ক্ষালনের প্রয়োজন নেই।

নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয় মৈত্রেয়ীর—বড় ফুরিয়ে যাওয়া। কালোছায়া-ঘনিয়েআসা ওর ফেরার রাস্তায় যেন আর ফিরতে পারে না মৈত্রেয়ী, যেন এই গতানু-গতিকতার রাস্তার ওপর চলার সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওর।

বাড়ীতে অশোক ফেরেনি এখনও। একলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এক চমকে ওর সারা জীবনের চেহারাটা একটুকরো ছবির মত জ্বলে ওঠে মৈত্রেয়ীর সামনে। বিয়েটা ওর হঠাৎ হ'য়েছিল। অশোকের কাকামণির

বন্ধুর মেয়ে মৈত্রেয়ী। তাঁর চেষ্টায় বিয়ে। মেয়ে দেখতে এসে পছন্দ হয়নি অশোকের। কালো মেয়ে। অশোকের কাকামণি না থাকলে হত না বিয়ে। দায়ে পড়ে এই না-পছন্দ-হওয়া বিয়ে দাক্ষিণ্যের পাণিগ্রহণ। প্রতিদিন তিলে তিলে এই দয়ার কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিয়েছে অশোক। মৈত্রেয়ী অশোকের প্রিয়া নয়, মৈত্রেয়ী অশোকের অনুগৃহীতা। মৈত্রেয়ী যদি নেশা না দিতে পারে মনের, মৈত্রেয়ী হোক্ শরীরের প্রয়োজন। যে ঘরের স্ত্রী হ'ল না, তার দাস্য ছাড়া আর কি পদ প্রযোজ্য!

ওকে আর্ট কলেজে শেখাবার ব্যাপারটা বাহ্যতা-মূলক। অশোকের কাকামণির আদেশ। কিন্তু শুধু এটুকুই। এ ছাড়া যতটুকু জীবন মৈত্রেয়ীর, সব অশোকের—কখন শোবে কখন সাজবে—সব-সব।

'কিন্তু আমি কি পেলাম?' দীর্ঘ পাঁচবছরের দাম্পত্যের অভ্যাসে মসৃণ জীবনের শেষে আজ এই চঞ্চল সন্ধ্যায় প্রথম নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দাবী করলো মৈত্রেয়ী 'আমি কি পেলাম বল?' ওষ্ঠ-যুগ এক আশ্চর্য বেদনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। এই তো আজ প্রথম চিন্তার কথায় নিজেকে আবিষ্কার করেছে মৈত্রেয়ী। সেই ছবি ছেটানো ঘরের একসন্ধ্যা শুধু একমাত্র রোমাঞ্চ ওর জীবনে। সে দুটী সাত্ত্বিক চোখে ওর একমাত্র উপাসনা শুধু একবার উচ্চারিত হ'য়েছিল; আর দ্বিতীয়-বার উচ্চারিত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে এসেছে মৈত্রেয়ী। দুহাতে মুখ ঢেকে ওর পীড়িত মনকে আবার প্রশ্ন করলো মৈত্রেয়ী 'আমি কি করলাম?'

দুহাতে অন্ধকারকে আলিঙ্গন করে ঠিক একই প্রশ্ন করলো প্রদ্যুম্ন 'আমি কি করলাম?' একান্ত এই নির্জনে কোন কোমল চোখের দিকে চাওয়ার ওর অধিকার নেই, নেই কোন প্রিয়মুখ। এমনি করে কেটেছে আটত্রিশটা অফলা বসন্ত। এরপর? এরপর শীত—অবিচ্ছিন্ন নিরবশেষ।

মৈত্রেয়ীকে বলতে চায়নি প্রদ্যুম্ন। শুধু নৈতিক বাধা নয়—আরও বড় বিধা ছিল ওর মনে। ওর জীবনে আরেকটী মেয়ের বাঁকা চোখের ছায়া আছে। প্রদ্যুম্নর জীবন নিষ্কলুষ পূজাবেদী নয়—। মৈত্রেয়ীকে ডাকবার স্পর্ধা কেন তবে প্রদ্যুম্নর? কিন্তু—ম্লান চোখে ভাবলো প্রদ্যুম্ন, সে তো অনেক দিন আগে। কাজলমেঘের মত সত্যাশাম্বরা মৈত্রেয়ী—যদি তোলায় সে অগ্নিস্পর্শের মত, স্বীকার করবে না প্রদ্যুম্ন? যার জীবন বিনা অপরাধে পতিত র'য়ে গেল আজ যদি তার অনাবাদী ক্ষেতে ফোটে একটি সদ্যুজ ধানের আশ্বাস, সে প্রতি-শ্রুতিকেও অভিনন্দন জানাবে না প্রদ্যুম্ন? কিন্তু হল না। মৈত্রেয়ী তো গোত্রহীনা উর্বশী নয়—নয় শিশুকের বুকে ভেসে আসা স্বপরিচয়ধন্যা ভেনাস। মৈত্রেয়ী ঘর ছাড়বে, এত কি প্রদ্যুম্নের শক্তি? যদি ওর ক্ষিপ্র কঠিন ভাল-বাসার গর্বে এত স্পর্ধা প্রদ্যুম্নর, তবে কেন রইলনা চিত্রা—সরে গেল অবলীলায়? এক নিমেষে জীবনের চরম ব্যর্থতাকে রাত্রির নিথর পটে প্রত্যক্ষ করলো প্রদ্যুম্ন।

সে মুহূর্তেই তীক্ষ্ণ পাখীর মত কূজন করে উঠে একটী কণ্ঠস্বর—'আমি এসেছি'। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রদ্যুম্ন। তারপর আলোর বন্যায় সমস্ত অন্ধকারকে ভাসিয়ে দিয়ে দুচোখ ভরে সেই নিরেদিতার দিকে তাকালো—

কিন্তু থাক্, তার আগে একটু পূর্বাভাস শুনে নিই। সেটা মৈত্রেয়ীর ঘরে। 'এই যে।' মৈত্রেয়ীর সমস্ত চিন্তাকে আলোতে আলিয়ে দিয়ে আলো জেলেছিল অশোক ও তারপর সকৌতুক অভিনন্দন জানিয়েছিল 'তোমার ছবি দেখে এলাম আর্ট কলেজে।' তারপর কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়লো অশোক—'অ্যাঁ তারপর, আমিও ভাগ্যবান হলাম তোমার কল্যাণে? অ্যাঁ, কেমন!' আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে তাকিয়ে থাকে মৈত্রেয়ী, 'কি দেখলে?'

'অনেক কিছু'—হাসতে হাসতে মৈত্রেয়ীর সামনে এসে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায় অশোক। ধীরে ধীরে ওর চৌকো চোয়ালে চোখে একটা অশুভ কালিমা গভীর

চাঁছে নাকে। 'কতদিন ধরে চলছিল এসব—বলি প্রদ্যুম্নের আদরের কবের থেকে পড়ছো?'

'কি বলছ তুমি?' কথাগুলো আর্তনাদের মতো ছিটকে বেরোয় মৈত্রেয়ীর রক্তহীন ঠোঁটের থেকে 'কার কাছ থেকে—কে বলো তোমায়?'

'তোমারই এক বান্ধবী—তুমি যে এরকম মেয়েমানুষ' ইতর কথায় স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে অশোক 'তা কি আমি জানতাম? তা এখন ঠেক না ধরে তার কাছে গিয়ে থাকলেই পারো।' একটা ভয়ঙ্কর রাগ অশোকের মুখে ছটফট করে, আর ছটফট্ করে ওর মুখের অশ্রাব্য কথার টুকরো। আচম্বিতে নিজের অসীম ক্ষমতা অনুভব করলো মৈত্রেয়ী—সমস্ত হীনতাকে পেরিয়ে যাবার শক্তি। মুগ্ধের মত উচ্চারণ করলো সে—যেন একটা কথা নয় একটা শপথ গ্রহণ করলো 'আমি তাকে ভালবাসি। তার কাছেই যাবো।' বলেই নেমে এলো রাস্তায়—যেন এতদিনের বন্ধ গলির থেকে ও সত্যি পৌঁছে গেল জীবনের আঙিনায়। শীতার্ত রাস্তায় ওর পা হোঁচট খেলো। চুঁচের মত শীতের বাতাস লাগলো ওর মুখে চোখে—। যখন ও প্রদ্যুম্নের দরজায় পৌঁছুল তখন ও থরথর করে কাঁপছে—তাকালো দরজায়।

সঙ্গে সঙ্গে ওর স্বপ্নজড়ানো চোখে লাগলো জড় মযূরকণ্ঠী শাড়ীর ঝলক। পড়ন্ত বেলায় যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখ দেখেছিল মৈত্রেয়ী আবার সে মুখ দেখলো। প্রদ্যুম্নর দুহাতে তুলে ধরা সে মুখ। অজস্র বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল চিত্রার মুখের ওপর গড়িয়েছে অশ্রুর ধারা। বিবেকের কঠিন কর্তব্যের পর ওর মুখ এখন আশ্চর্য করুণ অসহ্য সুন্দর—এত সুন্দর দেখেনি কখনও মৈত্রেয়ী; হয়তো তেমন আর দেখেনি পলকহারা প্রদ্যুম্নও। এতদিনের অসমাপ্ত ছবিটাকে আজ বুঝি শেষ ফিনিশ দিল শিল্পী—তৃপ্তিতে প্রদ্যুম্নর আধোর চোখ নিভে গেছে।

সাড়া দিল না মৈত্রেয়ী, ফিরেও গেল না। ওর রংয়ে রসে জীবন্ত করে তোলা ছবিটা শিল্পীর ক্রুর একটা তির্যক রেখার খেয়ালে চিরদিনের জন্য বাতিল হয়ে গেছে—তারই মত বোবা চোখ তুলে তাকিয়ে রইল মৈত্রেয়ী।

অরণ্য স্মৃতি

শ্রীহীরালাল দাসগুপ্ত

আমরা অরণ্যের যাত্রী। মটরে অধ্যাপক রায়। রায়গৃহিণী। সুধীন রায়। অরণ্য সঙ্গিনী সাবিত্রী। সোফার যোগেশবাবু আর পরিচর্যাকারী মনীন্দ্র। সেই পুরোনো রাজপথ ধরে চলেছি। পাটনা থেকে পূর্বে সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ। পাটনা ছেড়েই বাঁয়ে অড়হর ক্ষেত। তারি আড়াল থেকে চোখে পড়ে গঙ্গা। এদের সঙ্গে অন্তরের সখ্য যে নিবিড়। মনে হয় শুধু এই জীবনে নয়। ওদের চিনেছি জন্মে জন্মে। হয়ত আবার আসব জন্মান্তরে। এই পুলকভরা অঞ্জনতলে। তখন আজিকার মত ঐ বিস্তৃত সর্ষে ক্ষেতে খেলবে সোনার ঢেউ। গঙ্গা ছুটবে নূতন আনন্দে। আমারি আঙ্গিনায় বাতাবী লেবুর গাছে ফুল ফুটবে। নিশ্বাসে ছড়াবে পুণ্যগন্ধ। ওরা আমার। নিত্যকালের আমার। ঐ হরিৎ প্রকৃতি; ঐ পীতাভ মাঠের পাশে মলিন মানবশিশু; ঐ প্রস্তরবাহিনী ভাগিরথী ওরা আমার। ওদের ছাড়া আমি নই। চোখ চুলু চুলু করে। কিন্তু চোখ বুজতে পারি না। সইছেনা তন্দ্রার অবকাশে ওদের সঙ্গে ক্ষণিকের বিচ্ছেদ।

মটর ছুটছে। ওরও আজ আনন্দের অবধি নাই। বক্তিয়ারপুরের কৌলীন্যহীন বিপনী-শ্রেণীতে ভাজাভুজো চলছে। ওগুলো বিক্রী হবে সন্ধ্যায়। এখন দু'চারটী বিদেশী পথিক গাছের তলায় ছাতু মাখছে। মেইন লাইনটা পেরিয়ে গেলাম। উঁচু রাস্তার এক পাশে লাইট রেলওয়ে। রাস্তার দুইদিকে বহু নিম্নে সবুজ ক্ষেত। সবুজের প্রান্তে সাদা বকের সারি। মাঝে মাঝে জল। ক্ষীণ স্রোতরেখার পাশে নাচছে খঞ্জন আর কাঁদাখোচা। অপূর্ব ছবি। বলিহারি তাঁকে যাঁর তুলিতে এই চিত্র আর এই বর্ণ।

অদূরে হরিৎ রবি ফসলের ক্ষেতের মাঝে মাঝে শাদা কোঠা বাড়ী। ওখানে লিফ্‌ট ইরিগেশন চলছে। বিদ্যুৎশক্তিতে টেনে আনছে জল—শস্যক্ষেত্রে সেচের কাজে। ওখানে স্বাধীন ভারতের আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে অনাড়ম্বরে। চাষীদের বুক ভরেছে নূতন আশায়। সেই ক্ষীর খোয়ার পঙ্কশালা ওয়েনা। ভাইনে সো দরাই। ওখানে বুঝি ভেরা ফেলত ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীরা। ঐ বৌদ্ধ বিহারের তীর্থযাত্রীর দল। এর পরেইত অতীতের বৌদ্ধবিহার লক্ষিত বিহার শরিফ পাহাড়ের ঢালুতে পরে পরে নির্মিত গৃহস্থের কুটীর শ্রেণী কোন কুটীর ছুঁয়েছে উপরের কুটীরের পাদমূল। কেউ গলাগলি করেছে প্রতিবেশী কুটীরের সাথে। ওখানকার ছেলেমেয়েরা পাহাড়ের বুকে শুয়ে রেখে আকাশের চাঁদ পরের দিনে ছেলে-বুড়ো মিলে চলে যায় ঐ পাহাড়-শীর্ষের মন্দিরতলে। কে গড়েছে ঐ মন্দির! কে স্বপ্ন দেখেছিল মন্দিরের আওতায় গড়ে তুলবে দিব্য দিব্য সমাজ! ডাইনে নালন্দ আর রাজগীরের রাস্তা। সোজা রাস্তাটা চলেছে নওয়াদার দিকে। মাঝখানে গিরিয়াক নদীটা রাস্তাটা কেটে দিয়েছে। নদীর এপার ওপার এক করে দিয়ে নূতন পুল তৈরী হয়েছে। ঢাল-ফাসানের পুল। ত্রিভুজাকৃতি ইস্পাতের কাঠামোর উপরে কংক্রিটের পুল। মটরটা পেরিয়ে যেতে আগের মত কাঠের তক্তায় খটখট আওয়াজ তোলে গড়িয়ে যায় নিঃশব্দে। আগের রাস্তাও বদল হয়েছে। বহুদূর থেকে একটা বিরাট অজগরের মত রাস্তাটা বেঁকিয়ে এসে উপরে চড়েছে। আবার আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে নেমেছে সেই পুরোনো রাজপথে। মটর ছুটেছে। ডাইনে গিরি নদী গিরিয়াক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। পথপার্শ্বের গাছগুলি আপন আনন্দে বাহুরূপী শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের বুকে। ওদের হরিৎপত্রদলে আনন্দের হিল্লোল। দুলছে হাওয়ায়। বাঁয়ে জৈনমন্দির পাওয়াপুরী। ঐ জৈনগুরু মহাবীরের সাধনক্ষেত্র। অনেক সৌধ গড়ে উঠেছে ওকে ঘিরে।

পাটনা জিলার সীমা আগেই পেরিয়েছি। এবার গয়া জিলার মধ্যকুমা সহর নওয়াদা পেরিয়ে গেলাম। সহরে দেখা করেছি ডাক্তার হরিবের সাথে। ওর বাদশাহী মেজাজ, আতিথেয়তা আর হরণ ধারণটা বেশ লাগে। দেখা হলো ডাকবাংলোর খানসামা মংকুর সঙ্গে। ঐ কালো কুচকুচে লোকটীকে বড় ভালবাসি। ভালবাসি ঐ নওয়াদার রাস্তা পথকে। ভালবাসি অতীতকে। ভালবাসি ঐ পুলের নীচের ঘুরী নদীটিকে ও বয়ে এসেছে গয়ার কল্প থেকে। ওরই মত অস্বাভাবিলা।

ডাইনে গয়ার রাস্তা। সম্মুখে রাঁচীর। রাঁচীর মাঝে সুদীর্ঘ পার্বত্য অঞ্চল—রজৌলী। কোডার্মা। তারপর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড আরও দক্ষিণে হাজারীবাগ। পরে রাঁচী। আমরা রাঁচীর রাস্তায় চলেছি। দু' পাশে বহু দূরে নীলাঞ্জন পাহাড় শ্রেণী। ওরা দিক থেকে দিগন্তে রহস্যের ইন্দ্রজাল পেতেছে। ডাকছে বিনুকে পদিককে। ঐ পর্বতদেহের অরণ্যরাশি কি যেন লুকিয়ে রেখেছে ও রহস্যপুরী। ওখানে আছে শুধু বিস্ময় শুধু আনন্দ।

এবারে রাঁচী রোড ছেড়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরেছি। দুই সারি গাছের ছায়ার মাঝখানে রাস্তা। ওটা গেছে আকবরপুর। তারপর আরো দূরে—গোবিন্দপুর। ওদিকে সাত খাঁওয়া। পাহাড়, নদী, অরণ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। কিন্তু গোবিন্দপুর আমাদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য একতারা। ওখানে জনহীন অরণ্য প্রান্তর। আকবরপুরের প্রান্তে একটি নদী। ক্ষীণ স্রোতের চারিদিকে বালুকার স্তূপ। এখন নদীতে পুল হয়েছে। আগে বালুঠেলে আর্ত আওয়াজ তুলে গাড়ীটা পেরিয়ে যেত রাশি রাশি ধোঁয়ার নিশ্বাস ফেলে। আবার যখন বর্ষা হত, তখন নদীতে আসত উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস। একবার সেই জলস্রোতে আমার মটরটা বেঁচে গিয়েছিল দৈবাৎ। মটরটার নীচের দিকটা ডুবে গিয়ে গাড়ীর ভিতর জল উঠেছিল বিঘৎ পরিমাণ। আজ আর সে ভয় নাই। এখানেও কংক্রীটের পুল তৈরী হয়েছে। কখন পেরিয়ে মটরটা পেরিয়ে গেল।

সেই পুরোনো অভ্যস্ত রাস্তা। আশ্চর্য! ওরা আবার আমাকে ডেকে এনেছে। ধরণীর নাকি আকর্ষণ আছে, মাধ্যাকর্ষণ। নিখিলের প্রতি অণুপরমাণুর আকর্ষণ আছে। এটাকে বলা হয় জড়পদার্থের আকর্ষণ। কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে যে চৈতন্যসত্তা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—সাজিয়ে দিচ্ছে বর্ণে, গন্ধে। তাকে সমৃদ্ধ করছে পুষ্পে পল্লবে—সেই চৈতন্যের কি আকর্ষণ নাই? নিশ্চয়ই আছে।

সেই আকর্ষণ উপলব্ধি করি আমাদের অন্তরের আনন্দে। সেই অন্তরের সঙ্গে আছে ঐ প্রকৃতির চৈতন্যের পরিচয়। একবারে কাছে এসে দুই চিত্তের এই নিঃশব্দ সখ্য অনুভব করি। তাই ওকে দেখতে ইচ্ছা হয়। ওর তৃণশ্যামল প্রান্তরে গড়াগড়ি দিতে সাধ যায়। কোন্ সত্তা প্রকাশ করে অন্তরের এই ব্যাকুলতা! বসে বসে তাই ভাবছি। আরো ভাবছি কবে এই ধরণীর স্নেহনীড় থেকে খসে যাব। তখন অন্তরের এই ঐক্য কি ঘুচে যাবে! ভাবতে ব্যথা লাগে। এই অভ্যস্ত পথ, অভ্যস্ত মাঠ, অভ্যস্ত ফসলের ক্ষেত, অভ্যস্ত মন্দির, অভ্যস্ত পাহাড় ও অরণ্য—এদের জন্য ব্যাকুলতা। কোথায় আছে এই মর্মের বন্ধন?

খালধর বাজারে এসে পৌঁছলাম। বাজার ত নয়। রাস্তার দুপাশে ঘুলিমলিন দু'লাইন খাপরার ঘর। ওখানে ক্রেতা এসে জুটেছে দোকানীর দুয়োরে। মাত্র কয়েকটী নারীপুরুষ। দু'চারটী অর্ধনগ্ন ছেলে-মেয়ে। ওরা আমাদেরই নিরক্ষর ভাই-বোন। ওরাও টানছে আমাদের নিগূঢ় আকর্ষণে। পল্লীর দোকানে আছে—নুন, তেল, বিড়ি, দেশলাই, আটা, ছাতু আর লঙ্কা। এই অকিঞ্চনের সন্ধানে এসেছে কত দূর দূরান্তরের বস্তির নরনারী। ঐ অকিঞ্চন আমাদের পল্লীজননীর অবদান। তাঁর ছেঁড়া আঁচলের ক্ষুদকুঁড়ো। মাতৃহীন বুকের পীযূষ-বিন্দু।

বাজারের শেষপ্রান্তে একটা কাছারীতে আছেন—নবী আক্তার। নবী আক্তার নগণ্য নহেন। ও ঐ

পাহাড়ী অঞ্চলের সরকারী তহশীলদার। তুলোতেরা ছিটের—লম্বা হাতার মেরজাই পরে ইনি বসেছেন কাছারীর ভিতরের উঠোনে। দুর্ধর্ষ বাঘশিকারী এই বহেরা নবী আক্তার। আক্তার সদ্য রোগশয্যা ছেড়ে উঠেছেন। তবু শুষ্ক মুখে হাসিতে ভরিয়ে আমাদের ডাকছেন। বৈঠিয়ে—তশরীফ্ লাইয়ে। আমরা আসন গ্রহণ করলাম। ওঁকে দেখ্‌ছি। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওঁর সঙ্গে। গুলি খাওয়া বাঘ জঙ্গলে ঢুকে গেলে কার হিম্মত আছে তাকে খুঁজে বার করবার। সে আছে এই বিচিত্র মেরজাইপরা বহেরা শিকারীর। ওঁর কান নাই। আছে দুটী চোখ। আর আছে দু'টী সহচর। পুনোয়া আর মোদিয়া। ওরা যুদ্ধক্ষেত্রের সশস্ত্র সৈনিক নয়। ওরা বিষম সঙ্কটে রোষোন্মত্ত বাঘের সন্ধান করে বাঘেরই আবাসে। Daring the tiger in his own den (Lair). গুলিখাওয়া জিঘাংসু শার্দুল। ওর একটী থাবার পঞ্চত্বলাভ করে বড় বড় পালোয়ান।

নবী আক্তার কথা বললে। কথায় বিষাদের সুর। মোদিয়া আর নাই। সে চলে গেছে। বাঘের গ্রাসে নয়। যক্ষ্মার কবলে। বেচারা মোদিয়া। কাওয়াও নেই। তাছে শুধু পুনোয়া। আর একতারাতে আছে বুঁদিয়া। নবী আক্তার বলেই যাচ্ছেন—আর শিকারীই বা কোথায়? সাহেব সুবোরা বিদায় নিয়েছে। শিকারীও শেষ হয়েছে। ওদিকে বাঘের দৌরাত্ম্যে সব বস্তির গরু ভয়সাঁত খতম হ'য়ে গেল। শেকরাখে নারচুকা। আরও মারছে। রোজ হামলা করছে—রোজ। আপ আট রোজ ঠার যাইয়ে। একঠো জীপগাড়ী মাঙ্গাইয়ে। জরুর বাঘ মারিয়েগা। নবী আক্তারের কথায় আমরা বাঘের সান্নিধ্যে এসেছি। এই কল্পনায় উত্তেজনা বোধ করছি। কিন্তু মোদিয়ার খবর আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। কত সঙ্কটে—কত দুর্যোগের অন্ধকারের সাথী ঐ মোদিয়া। কালী পাহাড়ীর বাঘের আবাসের অলিগলি নালা পথে। মহাদেও স্থানের তমসাচ্ছন্ন অরণ্য কন্দরে। কোকলাত অন্ধরাতের অরণ্যপুরে ঐ মোদিয়া ছিল পথপ্রদর্শক, সহচর। রাইফেলের চেয়েও অধিকতর ভরসা।

নবী আক্তারকে সেলাম দিয়ে হাত মিলিয়ে উঠে পড়লাম। এখান থেকে দু'মাইল দূরে পাহাড়ের পাদপ্রান্তে নির্জন বাংলোটী আমাদের লক্ষ্য। এবারে শাদা বাংলোটী নজরে আসছে। রাস্তার দু'পাশের ক্ষেতের ধান কাটা শেষ হয়েছে। পীতাভ মাঠের পেছনে গাছপালার সবুজ প্রাচীর। অদূরে অপরাহ্নের সূর্যকিরণে ঝিলিমিলে অরণ্য, স্থানে পাহাড়শ্রেণী। অপূর্ব দৃশ্য কোন শিল্পী আপন অন্তরের রঙে চিত্রিত করেছেন এই বিচিত্র প্রকৃতি! যিনি রচনা করেছেন তিনি সুন্দর। তিনি বিরাট, তিনি মহান তিনি অনির্বচনীয়। তাতে সন্দেহ নাই।

বাংলোর গাড়ী পৌঁছুলো। আমার অনেকের অনুভূতির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিদেহী মোদিয়া। এই অরণ্য, এই তৃণাবৃত অঙ্গন। এই স্রোতঃশীলা নির্ঝরিণী ছিল তার খেলাঘর। একবার বাংলোর পেছনে ও সামনে পায়চারী করে এলাম। এগিয়ে গেলাম ঝোপ-ঝাড় খচিত বনসান্নিধ্যে। সুঠাম বাবু স্নানমগ্ন ঐ পাহাড়ের গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে।

অন্ধকারে বারান্দায় কে এসে বসেছে। অভ্যাস বশে বললাম 'মোদিয়া?' অমনি মেঝেতে এসে নীরবে আসন নিত মোদিয়া। আগন্তুক বললে—না হুজুর আমি বুঁদিয়া। বেচারা মোদিয়া ত মর গিয়া। হাঁ হাঁ, জানি। মোদিয়া মরে গেছে। এই বারান্দার ধূলির আসনে সে আর বসবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বুঁদিয়া। ও ছিল তার শিষ্য—তার সাথী। মোদিয়া ছিল বীর নির্ভীক নিঃশঙ্ক। কিন্তু তার শিক্ষা ছিল না। অর্থও না। এই বীরের কুঁড়েখানি ছিল নির্জন অরণ্য-প্রান্তে। কোনো বেদী, কোনো সমাধি উঠবেনা ওর চিতার উপরে। কোন নালিশ কোন অভিযোগ ও রেখে যায়নি। ও শুধু চলে গেছে। যেমন নিঃশব্দ ও প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিল, যেমন নিঃশব্দে ও বিচরণ করেছে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, তেমনি নিঃশব্দে ও চলে গেছে।

বুঁদিয়া বলছে—হুজুর এবারে বাঘ মেরে যান। ভারী লোকসান করছে বাঘ। গরু মোষ ত' উজাড় করে ফেলল। ঐত টাঁড়ের উপরে তিন দিন আগে মেরেছে একটা ভূয়োর। যেখানে একটা মারে সেখানে আর আসে না। একটা ভঁইসা কিনে জঙ্গলে বাঁধুন। সেটা থাক। তার পর ওটা ছেড়ে দিয়ে আর একটা বাঁধুন। এই দোসরা ভঁইসার উপরেই বাঘ বাহরেন। ভঁইসা বাঁধতে হবে মাদোপুরে। জিপ ছাড়া ত' সেখানে যেতে পারবেন না। একটা জিপগাড়ী আনিয়ে নিন। আমি অবশ্য কৌতূহলে বুঁদিয়ার কথা শুনছি। খুঁটিয়ে নাটিয়ে প্রশ্ন করছি। পুনোয়াও এসে পৌঁছেছে। জিপ ছাড়া কোন মতেই চলবে না। বললে পুনোয়া। প্রফেসর রায় সামান্য জলখাবার খেয়ে মটরে চললেন কোডার্মা। সেখানে গাড়ী থাকবে। উনি ট্রেনে চড়ে যাবেন কলকাতা। আবার ফিরে আসবেন একদিন পরে। শিকারের কোন সম্ভাবনা নাই। এই একদিন আমরা পায়ে হেঁটে জঙ্গলে বেড়াব। গায়ে মাখব বনের হাওয়া।

সকালে উঠে বুঁদিয়াকে নিয়ে বেরোলাম জঙ্গলে। দুর্গম অরণ্য নয়। গাছপালা আছে। আর আছে ঝোপঝাড় অধিকাংশই কেঁদ, পড়াশ, বনকরঞ্জা আর শেয়াকুলের ঝাড়। গাছগুলি মহুয়া, আম, বহেড়া, হরিতকী। মাঝে মাঝে আম গাছও আছে। এদিকে সেদিকে শিমুল। ঐ শিমুল গাছকে আমার বড় ভাল লাগে। সর্বাঙ্গে কণ্টক গেঁথে নিয়ে ও যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি। সম্বৎসরে একবার ওর ধ্যান ভঙ্গ হয়। তখন আনন্দে ওর শাখায় প্রশাখায় ফুল ফোটে। আগুনরাঙা রাশি রাশি ফুল। ওকে দেখলে আমার তপস্বী শঙ্করের কথা মনে পড়ে। আমি আনন্দে প্রণাম করি ঐ মহীরুহরূপী মহেশ্বরকে। জঙ্গলে বেরিয়ে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছি। কত রং ঐ অরণ্যের। সবুজেরও কত বৈচিত্র্য আছে। তরল শ্যামল ফিকে গাঢ় সবুজ। কোথাও ফুলছে শাদা শাদা অরণ্য ফুল। কাছে গিয়ে হাত দিয়ে দেখি ওরা ফুল নয়। গাছের পাতা ফুলের চেহারা নিয়েছে। বাগানের ভাহোলেট রং ব্যুগেনভিলার মত অরণ্যের শ্বেত শুভ্র ব্যুগেনভিলা। সামনে একটা ঝরণা। সামান্য জুতো ভিজিয়ে ওটাকে ডিঙিয়ে গেলাম। ঐ ঝরণা কোকলত থেকে এই প্রস্তর কঠিন জমিতে নেমে এসেছে। জল নামছে অনর্গলধারে। আসবেনা কেন? ওকে আসতেই হবে। ঐ জল না এলে যে ক্ষেতে ফসল ফলবে না। কোথাও ঝরণার জলে বস্তির চাষীরা বাঁধ দিয়েছে। সেখানে স্রোতধারা সঞ্চিত হয়ে ফুল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চাষের ক্ষেতে। জল আনে ফসল ফলাতে তৃষ্ণা মেটাতে। মানুষকে পশুপক্ষীকে। ঐ জলধারা কার নির্দেশ পেয়েছে এই বিশ্ব সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে! তাই দুর্গম পর্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে আসছে ভাগীরথী। আসছে যমুনা-নর্মদা-কৃষ্ণা আরও কত।

আমরা মাঠ নালা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছি। সঙ্গে সুধীন রায় পুনোয়া আর বুঁদিয়া। ওদের হাতে বন্দুক। কখন ওরা জঙ্গলে হারিয়ে গেল। সুধীনবাবু পাখী দেখছেন। হাতে ছোট্ট দূরবীণ। পরিচিত পাখী দেখে ওর আনন্দের সীমা নেই। কি নিবিড় আনন্দ এই অরণ্যের সাহচর্যে। আমাদের বাঁয়ে একতারার পাহাড়মালা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিগন্তে প্রসারিত। হঠাৎ আমাদের ঠিক সামনে একটা পাহাড় দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছি। ও যেন এইমাত্র অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে মাথা তুলেছে। একটা অতিকায় ভালুক যেন কোথায় লুকিয়েছিল। আমাদের আবির্ভাবে যেন সদর্পে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ও যেন রোষভরে আকাশকে ছিঁড়ে আনবে। ওর সর্বাঙ্গের অরণ্য ভালুকের রোমরাজীর মত উদগ্র হয়ে উঠেছে। আমরা বিস্ময়ে ওকে দাঁড়িয়ে দেখছি। হঠাৎ ঘুম্ করে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল জনের আড়াল থেকে। আমাদের চিন্তা ছিঁড়ে গেল।

আবার এগিয়ে চলেছি। আশ্চর্য ভল্লুকাকৃতি পাহাড়টা যে আমাদের পথ রোধ করেছিল সে যেন

এবারে পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে। সে আর সামনে নেই। এক পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। আমরা চলেছি। আশে পাশে কতগুলো গহ্বর আর নালা। বেশ গভীর। ওগুলো মানুষের তৈরী। আমরা শুনেছি এগুলো সুন্দরের ধরা ফাঁদ। বন্য বরাহের দল ফসলের ক্ষেতে চাষীদের অথবা বাঘের তাড়া খেয়ে ছুটে এসে হঠাৎ এই খাদের ভিতরে পড়ে যায়। পতনের বেগে পা ভেঙ্গে যায়। তখন বস্তিবাসীরা টাঙ্গী ও বল্লম নিয়ে ওদের শিকার করে। একটা মারা পড়লে সমস্ত বস্তিবাসীদের বহু দিনের খাদ্যের সংস্থান হয়। আমি একটা ফাঁকা জায়গায় বসেছি, চতুর্দিকে ঝোপ ঝাড়। সুধীন বাবু একটা নূতন পাখীর পিছু নিয়েছেন। আমি একটা ছোট গাছের ছায়ায় বসেছি। গাছটী যেন পরম স্নেহে আমার মাথায় ছাতা ধরে আছে। একটা অনুভূতির আবেশ এসেছে। ঝোপ ঝাড় আর অরণ্যে হাজার হাজার পাখী একসঙ্গে গান ধরেছে। দেশ কালের সীমা পেরিয়ে আমি যেন কোন্ স্বপ্নের সুরলোকে এসে আসন নিয়েছি। সুরলোক বটে। একটা অপূর্ব তানলয় সমন্বিত মিষ্টি সুরের সুরধুনী ব'য়ে আসছে চতুর্দিক থেকে। কোন্ কবি বলেছিলেন, সঙ্গীত থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছে এই রূপৈশ্বর্যময়ী পৃথিবী। এ সঙ্গীতময়ী প্রকৃতি তার সন্ধান দিচ্ছে, চুপ করে বসে আছি। মন কিন্তু ছুটছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। হঠাৎ তিড়িক ক'রে একটা লম্বকর্ণ শশক লাফাতে লাফাতে ছুটে এল জঙ্গলের ভিতর থেকে। ও পালাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। মনে হচ্ছে এক একটা লাফে খরগোষটা মাটী থেকে—দু'তিন ফুট উপরে উঠছে। কিন্তু এই সুরলোকে ওর পালাবার প্রয়োজন ছিল না। আজ যদি ও চুপ করে আমাদের গা ঘেঁষে এসে বসত। সেই হ'ত সত্য। ওকে দেখে কৌতূহল মেটাতাম। ও এই রহস্যময় বনের অধিবাসী। বন আমাদের অনধিগম্য। কিন্তু অরণ্য ওর আলয়। ওর খেলা ঘর। তবু ও মরবে। আজ না হোক কাল। মানুষের মত বিছানায় শুয়ে কাতরোক্তি করে নয়। ও মরবে হয় জানোয়ারের হাতে কিম্বা মানুষের হাতে। ওদের দুদিনের খেলা। কিন্তু ওকি মুছে যাবে? মুছে যাবেনা। ও প্রাণ দেবে কোন বৃহত্তর প্রাণের পুষ্টিসাধনে। এমনি নিমেষে নিমেষে প্রাণ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ—মহত্তর প্রয়োজনে। দুই শক্তির সংঘর্ষে গড়ে ওঠে এক প্রাণ। আবার এক প্রাণ বহু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বংশ-ধারায়। গাছের পাতা ঝরে যায়। মাটীতে জেগে ওঠে লক্ষ লক্ষ জীবাণু। গাছে—গজিয়ে ওঠে নূতন কিশলয়। এ পৃথিবীতে চতুরা নাই। আছে দেহান্তর রূপান্তর। বিস্ময়কর এই সৃষ্টিলীলা।

আকাশের বুকে লহর এঁকে একটী ছোট পাখী উড়ে আসছে বিচিত্র ভঙ্গীতে। ও বসেছে একটা বনকরঞ্জার শাখায়। কোমল শাখা দুলছে। ওর মনেও বুঝি দোলা লেগেছে। আনন্দের দোলা। হঠাৎ আবার দুম্ করে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। পুনোয়ারা শিকার করছে। বোধ হয় তিতির মেরেছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকতেই কয়েকটা তিতির জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। বাঘ মারা ত এত সহজ নয়। আর বাঘ মারার আয়োজনও আমাদের নেই। ওদের মতলব হুজুরদের জন্য বন্যকুক্কুট আর তিত্তিরের সন্ধান। এ জঙ্গলে তার অসদ্ভাব নেই।

প্রভাতের এই বিহগকূজিত সুরলোকের শুদ্ধ পরিবেশে বন্দুকের আওয়াজটা বেসুরো লাগে। কিন্তু এই বেসুরো ভাবটাকে নূতন সংস্কার বলে মনের গ্লানি দূর করবার চেষ্টা করছি। ধ্বংস কোথায় নেই! সমস্ত বিশ্বময় চলেছে ধ্বংসলীলা, এই ধ্বংস যদি নিছক নিরর্থক হ'ত তা হলে প্রশান্তের এই আকর্ষণ-মহাকর্ষণ নিয়ম ও শৃঙ্খলায় বিধৃত এই চির অম্লান সুন্দর ধরণীতে ওটা ঘটতেই পারত না। এ পৃথিবীতে কিছুই হারায়না। তথ্য যে, সে আত্মাহুতি দিয়ে গড়ে তুলছে তদ্ভবকে। এই তত্ত্ব শুনতে দুঃখ লাগে, কিন্তু এই যদি সত্য না হয় তবে নিত্য নিরন্তর জগৎময় ধ্বংসের মধ্যে এই সুন্দরী

প্রকৃতি আর ঘর ভেঙে যাবে না কেন? কেন সূর্য, চন্দ্র গ্রহতারা তেমনি অম্লান? কেন মানুষের শোক দুঃখ ক্ষণস্থায়ী মাত্র?

বন্যুকের আওয়াজ আর শোনা যায় না। প্রকৃতির এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রৌদ্রস্নানে কি মানিয়েছে এই নিখিল ধরণীকে। কি আনন্দ ঐ পাখীর প্রতি ভঙ্গীতে, ওর তুমিই কণ্ঠে। কেউ শিস্ দেয়, কেউ গান করে, কারো কণ্ঠে নূপুরের ধ্বনি। স্বর্ণ নূপুরের নিক্কণি। সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের আসর সাজিয়ে স্মিত নেত্রে রৌদ্রালোকে পা মেলে বসেছেন বনলক্ষ্মী। ঐ বনের সবুজে, পাখীর রৌদ্রালোকের আনন্দধারায় বলছেন—ওরে দুঃখ কোথাও নেই। নেই ধ্বংস, নেই বিনাশ, নেই বিচ্ছেদ। চেয়ে দেখ্ আমার দিকে। আমার তৃপ্তির বিরাম নেই। আনন্দের শেষ নেই। ঐ বাঘ আমার, হরিণ আমার, বিহঙ্গ আমার। ঐ বিটপী মল্লীকর আমার। হিংসা আছে। ক্ষত আছে। কাঠুরেরা গাছ কাটছে। তবু আমার সৌন্দর্য অম্লান, আনন্দ অক্ষুণ্ণ। ঐ আপাত দুঃখের অন্ধ যবনিকা বিদীর্ণ করে আমার চোখে পড়ছে অনন্ত জীবনের স্বর্গালোক।

পুনোয়া আর বুলিয়া ফিরে এসেছে। হাতে ঝুলিয়ে এনেছে তিনটি তিতির। এবারে বাংলোয় ফিরে যেতে হবে এবারে ঝোপ ঝাড় থেকে বেরিয়ে তরুবীথিতলা উপবনে বেরিয়ে এলাম। এই রাস্তাটা বেশ ছায়াময়। বহুরা কৌহ আর জাম পলাশ শিমুল আর জারুলের সারি। বহুয়াই বেশি। ফাল্গুনে এদের তলায় পুষ্পবৃষ্টি হবে। রূপে-গন্ধে মধুকরের গুঞ্জনে হবে বসন্তোৎসব। গাছগুলি তারই আয়োজন করছে। পাতাগুলো হচ্ছে পীতাভ। পুরোনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে ওরা রঙীন কিশলয়ের নূতন বাস পরবে। একটা অতি পরিচিত দুলহার গাছ খুঁজছিলাম। দেখতে পেলাম না। ওর সঙ্গে একদিনের সাক্ষ্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। প্রত্যূষের অরুণ আলোয় ঐ যজ্ঞ ডুমুরের গাছ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। লক্ষ লক্ষ ডুমুর সবুজ ফল ঝুলেছিল ওর সর্বাঙ্গে ওর অসংখ্য শাখা-প্রশাখায়। ঝুলেছিল গুবকে গুবকে। এক একটা গুচ্ছায় শত শত ফল। অধিকাংশ সবুজ। কিছু কিছু পেকেছে। সেদিন একটা ফটো নেওয়া হয়েছিল। অসাবধানে ফিল্মটা নষ্ট হয়েছে। গাছটার পরিচয় অঙ্কিত ছিল ভালুকের নখের চিহ্ন। এই দুলহার খেতে আসত বনের ভালুক। অপরাহ্ণের ছায়ায় এসেছিলাম বন্ধুজন সহ। পাটনার ডাঃ শরণ ছিলেন। ডাঃ ভাদ্রিণী ভর্মা ছিলেন আরও ছিল ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছেলে মৃত্যুঞ্জয়, কমল, অনিল। নিঃশব্দে বোকাই রাইফেল নিয়ে গাছে চড়ে বসেছিলাম ভালুকের প্রতীক্ষায়। ভালুক গাছে চ'ড়ে গেলে রাইফেলের গুলীতে তার পদস্খলন করানো সম্ভব হবে কিনা তার গবেষণা করেছিলাম। গাছের ডালে দু'চারটা ভালুক একসঙ্গে চড়ে গেলে এই বৃক্ষারোহণকুশলী জানুবান আর মানুষে কি যে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে তাও আমাদের ভাবনা এড়ায়নি। কিন্তু কিছুই হল না। ভালুক এল নীচে। সোঁ সোঁ করে গভীর নিশ্বাস ফেলতে লাগল। হয়ত অনভ্যস্ত গন্ধ শুকছে। আর নীচে স্খলিত পক্ক ডুমুর খুঁজছে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে একটা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। কিছুই দেখা যায় না। নীচে অন্ধকার। কিন্তু ডাঃ শরণের হাতের একটা লুক্কায়িত জলন্ত সিগারেট টুস ক'রে খসে পড়ল নীচে। স্খলিত সিগারেট তখনও ধুঁয়া ছাড়ছে। তারপর নীচের শুকনো পাতা ও ডাল পালায় বৃহৎ জানোয়ারদের পলায়নের শব্দ। আমরা একেবারে বোকা বনে গেছি।

ডুমুর গাছটা পেলাম না। অনভিজ্ঞের পক্ষে বনের রাস্তা চিনে রাখা অসম্ভব। অভিজ্ঞ স্থানীয় লোকও যে কেমন করে পথ হারিয়ে আমাদের বিপদ সঙ্কুল বিপথে চালিয়ে নিয়েছিল তার বর্ণনা করেছি 'মায়া হ্রদ' নামক প্রবন্ধে। তাই আর গাছটা খোঁজা হলনা। আমরা চলেছি এক জায়গায়। একটা "আহাড়"। পাহাড়সারিতে স্বাভাবিক খাদের অন্ত নাই। ওখানে জল জমে থাকে। এই 'আহাড়ে'র জল নীল। নির্মল, টল টল করছে।

কি স্নিগ্ধ ওর রূপ। সুধীনবাবুর ইচ্ছা হল আজ ওখানে স্নান করবেন। বাংলোয় ফিরে এসে মাথায় তেল দিয়ে উনি স্নান করতে বেরিয়ে গেলেন। স্নান সেরে ফিরে এলেন চাঞ্চল্য নিয়ে। আমাকে ডাকছেন—চলুন বেহানকে সঙ্গে নিন। বাঘের পাঞ্জা দেখবেন। "সুধীনবাবু জঙ্গলে নূতন আগন্তুক। বাঘের পাঞ্জা ত' কতই দেখেছি। আমি বললাম এই অরণ্যে আর ঝরণার কিনারে বাঘের পাঞ্জা দেখে বিস্ময়ের কি আছে? সুধীনবাবু নাছোড়বান্দা। ঐ পাহাড়টা বাংলো থেকে মাত্র ৫০০ গজ দূরে। সগৃহিণী চললাম দেখতে। সুধীনবাবুর সন্দেহ ভঞ্জন প্রয়োজন। আমাকে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞ। উনি বলছেন—স্নানের জন্য যখন উনি 'আহাড়ে' নামছেন তখন পাশের ক্ষেতে একটা লোক খুব খুব করছে আর আপন মনে কি গাল পাড়াছে। লোকটা বলছে "শাড়া হেনেসে হেনে গেলি শাড়া"—লোকটা মাটীতে নজর করে কি দেখছে। আমি বললাম, কেয়া হায় ভাইসাব! সে বললে, শাড়া শের-বাঘা। ছুটে গেলাম। দেখি একটা জানোয়ারের পায়ের ছাপ পড়েছে গোটা মাঠে। "আপনি দেখে বলুন বাঘের পাঞ্জা কিনা।'

আমরা সেখানে পৌঁছেই দেখলাম সুধীনবাবু যথার্থই বলেছেন। ঝরণার জলে সিক্ত জমির উপরে একদিক থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সদ্য পায়ের ছাপ। হয়ত কাল রাত্রে আমাদের উপেক্ষা জানিয়ে বাঘ এই পথে চলে গেছে। কেন বনের শুকনো পথ ছেড়ে ভিজে জমিতে নেমেছিল বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ শূয়োরের অনুসরণ করে এসেছিল। পাশের জমিতেই কিছু কাটা ধান গাদা করা ছিল। ওটা শূয়োরের খাদ্য। পাঞ্জা দেখতে দেখতে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সেই বর্ণনা। চিত্রাঙ্গদার একঘেয়ে সঙ্গ মনে শ্রান্তি এনেছে। এই অলস প্রণয়ার্ত জীবন আর ভাল লাগছেনা। অত্র-জীবনের আহ্বান এসেছে। কল্পনায় দেখছে অতীতের কোন অরণ্য পথে—

চিত্রব্যাঘ্র পদ পদচিহ্ন রেখা
রেখে গেছে পথ পঙ্কপরে।

আমাদের অরণ্যবাস মুহূর্তে সরস হ'য়ে উঠেছে। এতক্ষণ বাঘের গল্প শুনেছি। আজ তার অভ্যাগমনের অভ্রান্ত সাক্ষ্য মিলছে। কখন বাঘ ঘুর ঘুর করেছে আমাদের নাকের ডগার তলে জানি না। হয়ত পুনোয়াদের সঙ্গে যখন বাঘ শিকারের আলোচনা হয়েছে গত সন্ধ্যায় তখন সে দূর থেকে আমাদের নির্বাক তাকিয়ে দেখেছে। হয়ত বহুদিন পরে বাংলোর ল্যাম্পের আলোটা ও সন্দেহের চোখে দেখেছে।

বাংলোয় ফিরে এলাম। বনভ্রমণে প্রচুর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। টেবিলে সজ্জিত উষ্ণ অন্নব্যঞ্জনে এসেছে নূতন স্বাদ। খাওয়ার পরে বারান্দায় চেয়ারে বসেছি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। ও পাহাড়ে যাদু আছে। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। স্নিগ্ধ মধুর হাসি জেগে আছে ওর সর্বদেহে। সুধীনবাবু—বেরিয়ে গেলেন ঝরণার তীরে তীরে অরণ্যের দিকে। ওঁর অন্তর কি যেন সন্ধান করছে। ঐ ঝরণা বিধৌত নির্জন পর্বত সান্নিধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে আছে যাকে দূরে ফেলে রাখা চলে না। সে ডাকে। ব্যাকুল তার আহ্বান। সুধীনবাবু সেই ডাক শুনেছেন। আমি হায়। বেরোতে পারছি না। বারান্দা থেকে তাঁর গতিপথ অনুধাবন করছি।

সন্ধ্যায় পাহাড়ের শিখরপ্রান্তে সূর্য ডুবে সমস্ত বনপ্রান্তর, অরণ্য উপত্যকায় নেমে এল ধূসর আস্তরণ। তার পর ক্রমে ক্রমে কার অদৃশ্য হাত একটা ঈষৎ কৃষ্ণযবনিকা টানিয়ে দিলে। ওর আড়ালে এবার আসর বসবে আরণ্য জানোয়ারের। আমাদের দিন ফুরুলো। এবারে ওদের পালা। লক্ষণ দেখে দরজা বন্ধ করবার ইচ্ছা করছি। এমন সময়ে হঠাৎ মানুষের ছায়া পড়ল। ও বুঁদিয়া। সঙ্গে ওর কোন্ সাঙ্গোপাঙ্গ। একটা বন্দুক নিতে এসেছে। ওরা ধানের ক্ষেতে শূয়োরের পায়ের ছাপ দেখেছে। গাছের আড়ালে বসে শূয়োর মারবে। একটা বড় টর্চ আর বন্দুক নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। আমরা বারান্দায় বসে এই জনহীন

P30999

অরণ্যাঞ্চলের হৃদয়ের চুকে আছি। অদূরে আকাশচুম্বী শৈলমালা গহন বনের রহস্য বুকে নিয়ে আকাশের গায়ে উধাও হয়ে ওখানে ভাঃ ঘোষালের সঙ্গে কত নিশীথ রাতে শিকারে বেরিয়েছি। প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে শিকার সন্ধানে করেছি। সাহিত্য রাজনীতির বিতণ্ডা করেছি ওর সরস কাব্যসমৃদ্ধ বচনবিন্যাসে মুগ্ধ হয়েছি। আর লাভ করেছি ওর অজস্র প্রীতি। ওর শিকারে আকর্ষণ নেই। শিকারের ও দর্শক মাত্র। ওর আকর্ষণ এই রহস্যময়ী প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরের। ও খুঁজছে সৌন্দর্যের আস্বাদন। ও চাচ্ছে বিরাটের উপলব্ধি ওর অরণ্য সাহিত্যে সেই অতীন্দ্রিয়তাই ব্যক্ত হয়েছে বারান্দায় বসে বসে ঐ অতীতের কথাই রোমন্থন করছি। নীচে ধূলোর আসনে বসে আছে অশ্বত্থ মোদিয়া। অদূরে একতারা—তারপর নাধোপুর, ঢেঙর, ছানপাথরা, বিষলপুর, সাত পাঁওরা আরও দূরে কইয়াদোলের পাহাড়শ্রেণী। সম্মুখে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড়টা বেঁকিয়ে আবার সোজা দক্ষিণে চলেছে। ওখানি চলেছে তিন মাইল। ওখানে শিবীর বা দুর্বাসাপুর। ওটি দুর্বাসার নামে পর্বতশ্রেণী। অনেক রাতে পর্যন্ত বারান্দায় বসে থেকে ঘরের ভিতরে এলাম। মেঝেতে ঘাসের খড় বিছানো হয়েছে। ওর উপরে আমাদের বিছানা হয়েছে। খুঁদিয়া বলেছিল মধ্যরাতে ও ফিরে আসবে। কিন্তু ফিরে এল সে অনেক আগেই। ঘরে ঢুকেই বললে বাপরে, বাঘের হাঁকলায় আর বসে থাকা চলল না। সেই তমসাকৃতি পাহাড়ের পাশে 'আহাড়ে'র জলে দেহ ডুবিয়ে শুয়েছিল শম্বরের পাল। বাঘের গর্জনে তারা ছুটে পালালো। বাঘও ওদের ধাওয়া করল। খুঁদিয়া বলে হুজুরের মনে থাকবে যেখানে মুয়োর মেরেছিলেন—দুটো ভালুক ছুটে পালালো, সেখানকার বাঁধের রাস্তা পার হয়ে এসেছে বাঘ। রাতে একটা জানোয়ার যে মারবে তাতে সন্দেহ নাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কদিন আগে বাঘ শেষবার জানোয়ার ধরেছে!" খুঁদিয়া বলে "চারদিন আগে।" এই বাঘটার অদ্ভুত আচরণ। একটা জানোয়ার মেরে একদিন অর্ধেকটা খেয়ে চলে যায়। আর ফিরে আসে না। আমি বললাম তাহলে আজ রাত্রেই ও আবার জানোয়ার মারবে। কাল জঙ্গলে অনুসন্ধান করো।

বারোটার কাছাকাছি বিছানায় শুয়েছি। ঘুম আসছে না। আমার কল্পনায় চলছে বাইরে বাঘের সন্তর্পিত বিচরণ। এক একবার ভাবছি—রাইফেলটা বোকাই করে বারান্দায় বেরিয়ে লুকিয়ে থাকি। এ কল্পনা যে নিরর্থক তা জানি। কখন চোখ দুটোতে তন্দ্রা নেমে এসেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা গম্ভীর গর্জনে। বাঘ? বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছি। আবার সেই গর্জন। বাংলোর পেছনে। নালার ধারে। অদ্ভুত অনুভূতি। রাইফেলটা হাতের কাছে নেই। সুধীনবাবুকে ডাকলাম। শুনুন বেহাই মশাই—বাঘ ডাকছে। সুধীনবাবু নিদ্রাজড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। হাঁ আমিও শুনেছি। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কানে আসছে শুধু প্রান্তরের একটানা ঝিল্লির রব।

(আগামী বারে সমাপ্য)

জীবন-মরু

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[উপন্যাস——পূর্বানুবৃত্তি]

বিকাশ পুলিশে খবর দিয়েছে, কিন্তু দু'দিনের মধ্যে কোন কিছুই করে উঠতে পারা যায় নি। দুদিনের মধ্যে বিকাশের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখলে কষ্ট হয়।

মা সেই বিছানা নিয়েছেন আর ওঠেন নি। একমাত্র মেয়ে সুলতা, বিকাশ আর ভেবে উঠতে পারে না কি করবে সে।

সন্ধ্যার সময় বিকাশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল অনুপের—এমন সময় নিখিলেশ এল বিদ্যুৎকে নিয়ে। বিদ্যুৎকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে নিখিলেশ অনুপের কাছে এসে বসল। "কোন খবরই পাওয়া গেল না?" নিখিলেশ প্রশ্ন করে।

"না কিছুই পাওয়া গেল না।" বিকাশ জবাব দেয়।

নিখিলেশ চুপ করে বসে থাকে যেন ভয়ানক একটা আঘাত লেগেছে তার, খানিক পরে অনুপকে জিজ্ঞাসা করে—

"আচ্ছা এ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?"

"কিছুই বুঝতে পারছি না"। অনুপ জবাব দেয়।

"কোথায় যেতে পারে সে" নিখিলেশ আপন মনেই বলে। "অনুপ, বিকাশ চুপ করে থাকে।"

ওদিকে বিদ্যুৎকে দেখে সুলতার মা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন "আমি কি এমন পাপ করেছিলাম বল যে আমার সুলুর এই রকম হল"। লুটিয়ে পড়েন তিনি বিছানার ওপর।

বিদ্যুৎএর এবার সত্যি সত্যিই কষ্ট হয়। এতটা নিখিলেশ না করলেই পারতো। সেও এতে টাকার লোভে সাহায্য করছে। কি রকম একটা ভয় করে বিদ্যুৎএর। এটা বোধ হয় সামলান কঠিন হবে।

তখনকার মত সামলিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ সুলতার মাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, চুপ করে বসে থাকে।

সুলতার মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন "সুলুকে ফিরিয়ে এনে দাও তোমরা বৌমা, আমি আর পারি না।"

বিদ্যুৎ সুলতার মার গায়ে পিঠে হাত বুলাতে থাকে। চোখে তার জল এসে গেছে, কিন্তু কিছুতেই সুলতাকে তারা ফিরিয়ে দিতে পারে না। নিজেদের সর্বনাশ তারা করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরে নিখিলেশ চলে যায় বিদ্যুৎকে নিয়ে। গাড়ীতে যেতে যেতে বিদ্যুৎ বলে "সুলতার মার কান্না আর দেখা যায় না"।

নিখিলেশ বলে—"কাঁদবার কথাই, কিন্তু তোমারও কষ্ট হচ্ছে? ব্যঙ্গ করে নিখিলেশ, স্বামীর জন্য চোখের জল ফেল তাহলে আজও"।

বিদ্যুৎ আর কথা বলতে পারে না—চুপ করে যায়।

সুলতা উঠে দাঁড়ায়, দরজাটা খুলবার চেষ্টা করে—বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—ভিখু বাইরেই বসেছিল, দরজাটা নড়ে উঠতে সে গিয়ে শিকল খুলে দিয়ে ভিতরে এল।

"কি মাইজি, কুচ্ছু বলবেন"?

সুলতা দেখে একজন বুড়ো দারোয়ান তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে "ও মাইজি কোথায়, একবার ডাকনা"।

"বাহার চলি গ্যাছে বাবুকো সাথ"।

সুলতা দুহাত চেপে ধরে ভিখুকে বলে—"আমাকে তোমরা আটকে রেখেছ কেন বাবা"?

ভিখু বিব্রত হয়ে পড়ে—বহুদিন পর বাবা ডাক শুনল সে মনে পড়ে গেল তার ছোট মেয়ের কথা—একদিন সেও এমনি করে ডেকেছিল, আজ সে পরপারে। চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে ভিখুর, "হামি কি করব মাইজি,

বাবুর নিকট থেকেই, আমি তো চাকর আছি হামি, বাবু-লোকের চিনি বড় খারাপ আদমি আছে—দেখেন তুমাকে যদি ছাডিয়ে দিই তো হামাকে গুলি করে মারবে, কি করব বাইজি।"

চুপ করে থাকে সুলতা। কাজ করে দেবে ভিখু"?

"কি কাজ বাইজি"?

"একখানি খাম আনিয়ে দেবে চিঠি লিখে দেব তুমি ফেলে দেবে ডাকে, এটুকু উপকার তুমি কর ভিখু, আমি তোমার মেয়ের মতন। সুলতা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ভিখুর পা দু'টি জড়িয়ে ধরল।

ভিখুও সুলতাকে উঠিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে "আনিয়ে দেব বাইজি নিশ্চই আনিয়ে দেব।" দরজা বন্ধ করে ভিখু চলে যায় তখনকার মত।

অনেক রাত্রে বিদ্যুৎ ফিরে আসে। সুলতা তখন ক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে।

সুলতাকে এই ভাবে পড়ে থাকতে দেখে ডেকে তুলল বিদ্যুৎ।

খাট থাকতে মেঝের ওপর শুয়ে কেন বলুন তো? অসুখ করলে ভুগতে হবে আমাকেই। সুলতাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিদ্যুৎ।

অনুপ ভেবে কিছু কূল কিনারা পায় না, সুলতা কি চাইছে করে নিরুদ্দেশ হল—না অন্য কিছু, কি তার এত দুঃখ? মনে মনে অনেক কিছুই চিন্তা করে সে। নীলিমার ওখানে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে অনুপ। নীলিমাই এখন প্রায়ে অনুপের কাছে খোঁজ খবর নিতে। এক সপ্তাহ হয়ে গেল সুলতার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি—বিকাশের ওখানে আর যেতে ইচ্ছা হয়না অনুপের—বড় কষ্ট লাগে, সুলতার মার কান্না সহ্য হয়না। কিন্তু কিই বা করা যাবে।

বিকাশ হন্ত দন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে অনুপের—"অনুপবাবু সুলতার চিঠি এসেছে কিন্তু কিছু করবার উপায় নাই।" বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে—নিখিলেশ স্কাউণ্ড্রেল এত বড় শয়তান"।

"কি, ব্যাপার কি বিকাশবাবু? এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?"

"পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন" বলে চিঠিটা এগিয়ে দেয়—অনুপের দিকে।

অনুপ পড়তে থাকে—

'দাদা, নিখিলেশ বাবু আর তার স্ত্রী বিদ্যুৎ আমাকে অফিস থেকে ফিরবার সময় গাড়ীতে তুলে নেয়। পরে গাড়ীর মধ্যে জোর করে "ক্লোরফর্ম" করে একটা বাগান বাড়ীতে আটকে রেখেছে। কিন্তু এটা কোথায় ঠিক বুঝতে পারছিনা। দিন রাত্রি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে। এখানে একজন বুড়ো দারোয়ান আছে তাকে দিয়েই চিঠিটা কোন রকমে ফেলে দেবার বন্দোবস্ত করেছি, পারে কিনা জানিনা। জায়গাটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবার সময় পেলাম না। তবে মনে হয় বেলুড়ের কাছাকাছি জায়গা। আর বেশী দিন দেরী করলে বাঁচাতে পারবেনা আমাকে। দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে আর লিখতে পারলাম না।

"সুলতা"

"পুলিশে খবর দিয়েছেন?" অনুপ উত্তেজিত হয়ে বলে।

"এই মাত্র পেলাম, ছুটে এলাম আপনার কাছে"।

"এখুনি একবার পুলিশে খবর দেওয়া দরকার, চলুন"। ওরা বেরিয়ে যায়।

পুলিশ অফিসার চিঠিটা পড়ে বললেন—এখুনি একবার নিখিলেশবাবুর বাড়ী যাওয়ার দরকার—তাকে এ্যারেষ্ট করবার জন্য।"

অনুপ বললে "বেশ তাই চলুন।"

ওরা বেরিয়ে পড়ে নিখিলেশ বাবুর বাড়ী যাওয়ার জন্যে।

বাড়ী গিয়ে চাকরের কাছে শুনল—কাল থেকে তিনি বাড়ী ফেরেননি। কখন ফিরবেন বলতে পারেনা তারা। তখনকার মত বিদায় নিয়ে ফিরে এল ওরা। বাড়ীর

সামনে পাহারা দেবার মত একজন সাদা পোষাকে পুলিশ মোতায়েন থাকল। এলেই সঙ্গে সঙ্গে যেন ফোন করে জানিয়ে দেয় সে—এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন অফিসারটি।

ওখান থেকে যে যার বিদায় নিয়ে চলে গেল।

বিকাশ পথে যেতে যেতে অনুপকে জিজ্ঞাসা করে—"মাকে কি জানাব সুলতার কথা?"

"বোধ হয় ঠিক হবেনা—আরো উতলা হবেন, দেখাই যাকনা—খানিকটা আশার আলো তো দেখা দিয়েছে, ব্যবস্থা এবার হবেই একটা কিছু। আমি খানিকক্ষণ পরেই আপনার বাড়ী যাচ্ছি"। অনুপ বিকাশের কাছ থেকে তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সে বিকালের দিকে বিকাশের ওখানে গেলে, বিকাশ বললে—"চলুন একবার ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"তাই চলুন, যাওয়া যাক।"

বিকাশ আর অনুপ যখন থানায় গেল তখন ইন্‌স্পেক্টার নেই বেরিয়ে গেছেন, অনেকক্ষণ বসে থাকার পর তিনি ফিরলেন। "ও আপনারা এসেছেন, কিন্তু খবর পাওয়া যায়নি—ফিরলে নিশ্চয়ই ফোন করত। ঘাবড়ে গেছেন, না? কিন্তু কি করব বলুন। উপায় তো নেই, অপেক্ষা করতেই হবে। আপনারা বরং বাড়ী যান—খবর পেলে আপনাদের জানাব"।

অগত্যা ওদের উঠতে হল ওখান থেকে।

নিখিলেশের মোটর এসে থামল বাগান বাড়ীর সামনে, সে সোজা চলে গেলো বিদ্যুৎএর ঘরে। আজকে একটা হেস্তনেস্ত করবে সে। বিদ্যুৎকে বলল নিখিলেশ, "সুলতার ঘরের চাবিটা দাও, একবার দেখা করে কথাবার্তা বলে নিই"।

বিদ্যুৎ বুঝল আজ আর নিখিলেশকে আটকানো যাবেনা। চাবিটা ফেলে দিল নিখিলেশের সামনের টেবিলটার ওপর।

গট্ গট্ করে সুলতার ঘরে ঢুকল নিখিলেশ। সুলতা তখন চুপ করে শুয়েছিল—কদিন না খেয়ে সে প্রায় শয্যাশায়ী, নিখিলেশকে ভিতরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল।

নিখিলেশ বলল সুলতাকে, "শোন, তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হওয়ার দরকার। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি একে সর্তে"—খানিকটা চুপ করে থেকে নিখিলেশ বলে "আপাততঃ তুমি খাওয়া দাওয়া করবে, সন্ধ্যাবেলায় দিয়ে আসব তোমাকে তোমাদের বাড়ী, অবশ্য আমার সর্তে যদি তুমি রাজী থাক। কিন্তু এসে যেন দেখি তুমি খেয়েছ, তুমি ভাবছ ছেড়েই যদি দেব, দুদিন ধরে তবে আটকে রেখেছি কেন। আজই বুঝতে পারবে। ঠিক সন্ধ্যা বেলায় আসব"। গট্ গট্ করে বেরিয়ে এল নিখিলেশ, দরজা বন্ধ করে বিদ্যুৎকে ডেকে পাশের ঘরে গিয়ে বসল—"শোন, সুলতাকে আমি বিয়ে করব আজই সন্ধ্যা বেলায়। তুমি ওকে কিছু খেতে দেবার ব্যবস্থা কর, বড় দুর্বল হয়ে গেছে"।

"তুমি বিয়ে করবে"? বিদ্যুৎএর মুখে কথা জোগায়না।

"এতে অবাক হবার কি আছে"? নিখিলেশ বলে। "সুলতা রাজী হয়েছে?" প্রশ্ন করে বিদ্যুৎ। নিখিলেশ এবার হো হো করে হেসে উঠে বলে—"রাজী হয়নি, তবে রাজী তাকে হতে হবে। আচ্ছা আমি এখন চলি, সন্ধ্যাবেলায় তৈরি থেকো, এখান থেকে যেতে হবে"।

নিখিলেশ চলে গেছে। বিদ্যুৎ চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। কি সব পাগলের মত বলে গেল নিখিলেশ! সুলতাকে বিয়ে করবে সে! না না, এ কিছুতেই হতে পারেনা, দেখা যাক সুলতার সঙ্গে কথা বলে—কি কথা হয়েছে ওর সঙ্গে নিখিলেশের।

বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকে দেখল, সুলতা চুপ করে বসে আছে, মনটা যেন তার কোথায় হারিয়ে গেছে।

না না, একটা মেয়ের জীবনকে সে নষ্ট করতে পারবেনা। নিজেকে দিয়ে সুলতাকে বুঝতে চেষ্টা করে।

"কি ভাবছেন বলুন তো বসে বসে?" বিদ্যুৎ হেসে জিজ্ঞাসা করে।

"ভাববার আর কি আছে বলুন,—যে ক'দিন

বাঁচিয়ে রাখবেন সেই ক'দিনই বেঁচে থাকব। তবে আজ নিখিলেশ বাবু এসে বলে গেলেন আমাকে নাকি বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন যদি এক সর্তে রাজী থাকি"। সুলতাকে দেখে বিদ্যুৎএর কষ্ট হয় কেমন যেন দুর্বলতা এসে গিয়েছে সুলতার ওপর—"সর্তটা সম্বন্ধে কিছু জানিয়েছেন নাকি ?"

না"—সুলতা জবাব দেয়।

"আমি জানি সে সর্ত কি", বিদ্যুৎ বলে।

"কি বলুন তো" ? সুলতা জিজ্ঞাসা করে।

"নিখিলেশ বাবুকে বিয়ে করতে হবে আপনাকে"।

সুলতা স্তম্ভিত হয়ে যায় "আর আপনি" ?

বিদ্যুৎ এর মুখ নীচু হয়ে যায় "আমি তার স্ত্রী নই"।

"সেটা আগেই অনুমান করেছিলাম", এত দুঃখেও সুলতার হাসি পায়—"আমাকে যদি মেরে ফেলেন তবুও সেটা সম্ভব হবেনা"।

ভিখু সেই সময় ঘরে ঢুকল—নাইজি খাবার দিয়ে এসেছি"। ভিখু এসে সুলতার খাবারের থালাটা রেখে চলে গেল। সুলতাকে বিদ্যুৎ বলে—খেয়ে নিন, অনেক কথা আছে বলবার আপনাকে। বিদ্যুৎএর মধ্যে আজকের জন্য করুণাময়ী নারী যেন জেগে ওঠে। এ জীবন যে কত বেদনাময় তা সে বোঝে। বোঝে, নিখিলেশ কতখানি ভয়ানক। কিন্তু এখন সে নিরুপায়। নিখিলেশ ছাড়া তার আর উপায় নাই। তবু নিজের জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে সে। সুলতাকে সে বাঁচাবেই নিখিলেশের হাত থেকে।

সুলতা খেতে পারলনা। কিছু খাবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু বমি করে সব তুলে ফেলল।

বিদ্যুৎ বলল—"আপনি খেতে পারবেন না তা জানি। থাক, খেয়ে দরকার নেই। শুনুন আমার কথা।—

নিখিলেশ বাবু বোধ হয় জোর করে আপনাকে বিয়ে করতে চাইবেন ; কিন্তু আমি তা' হতে দেবনা। যা করে ফেলেছি তার আর চারা নেই, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। আপনি নিজেকে শক্ত করুন, ভেঙ্গে পড়বেন না। আপনি দয়া করে আমার কথা গুলিকে অভিনয় বলে ধরবেন না, সত্যিই আমি অনুতপ্ত।" বিদ্যুৎ তার নিজের জীবনের চিত্রখানি উদ্ঘাটিত করে দেয় সুলতার সামনে। বলে—"এজীবন থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই।"

বিদ্যুৎ উঠে গেল। আলমারি খুলে রিভলভারটা এনে দিল। সুলতাকে। "এটা নিন, আপনার কাছে রেখে দিন। দরকার হতে পারে।"

সুলতা সত্যিই বুঝতে পারেনা—সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। "আমি বুঝতে পারছিনা কিছু।" গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছেনা সুলতার। "আমি এখন চলাম। আমার সঙ্গে দেখা আপনার হবে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে, বিদ্যুৎ চলে গেল ঘর থেকে।

সুলতার সমস্ত শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, কি করবে সে কিছু ঠিক করতে পারেনা, তবু রিভলভারটা নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে দেয় সুলতা। জ্যেঠামণির রিভলভার সে Load করে দিত—আটঘাট জানে। দরকার হলে ছুঁড়তে তার অসুবিধা হবে না।

সন্ধ্যা না হতেই নিখিলেশ এল। বিদ্যুৎকে বললে "চট্ পট্ তৈরী হয়ে নাও"

সুলতাকে নিয়ে বিদ্যুৎ মোটরে এসে উঠল, সামনে ভিখুকে নিয়ে বসল নিখিলেশ।

বাগবাজারের কোন একটি অন্ধকার গলিতে এসে ওদের মোটর থামল। সুলতার মুখ রুমাল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে মোটরের ভেতর না দেখা যায়, সেই জন্য কাল পর্দা দিয়ে কাঁচগুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

ওরা এসে একটা বাড়ীতে ঢুকল—সুলতা বুঝতে পারলে জায়গাটা জনপল্লী নয়। ওদের একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে এল একটি মেয়ে। দেখতে বেশ ভালই বলতে হবে। সেই ঘরটি মূল্যবান আসবাব পত্রে সাজান আছে মেয়েটি তাদের বসতে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

নিখিলেশ ভিখুকে সঙ্গে করে বাইরে এল—মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল নিখিলেশ "এদিকের সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছো?" মেয়েটি বললে—"হ্যাঁ সবই ঠিক প্রায়। তবে পুরুত এসে এখন পৌছাননি। এখুনি এসে পড়বেন।"

"বেশ, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি তুমি এদিকে একটু নজর রেখো।" নিখিলেশ বাইরে চলে গেল।

বিদ্যুৎ সুলতার পাশে এসে বসল, বললে—"কি খুব ভয় লাগছে, না? শোন, আর দেরী করা চলবেনা আমি ভিখুকে পাঠাচ্ছি তোমার বাড়ী খবর দেবার জন্য—তুমি এই সময়টুকু একটু নিজেকে বাঁচিয়ে চলো। উপস্থিত বুদ্ধিতে, রিভলভারটা তোমার কাছেই আছে তো"? বিদ্যুৎ বিদ্যুতের মতই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিখিলেশ খানিকপরে ফিরে এল—সুলতার পাশে এসে বসল—"আজ তোমার বিয়ে আমার সঙ্গে"। ক্ষুর হাসি হাসে নিখিলেশ। "পাত্র হিসাবে আমি কি সত্যিই খারাপ সুলতা"? হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে সে। "একবার ঠকেছি সুলতা, বার বার ঠকতে চাইনা—ভালবাসার দাম তোমরা দিতে জাননা—তাই জোর করেই আদায় করছি"। নিখিলেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে জাঁকিয়ে বসে সুলতার পাশে।

সুলতা একটু অন্য ধারে যায়—"আমাকে না আপনি বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন?" সুলতা মরিয়া হয়ে গেছে।

"ফিরিয়ে নিয়ে যাব নিশ্চয়ই—তবে আমাদের বিয়ের পর—" নিখিলেশ নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয়—সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

"আপনি ভুল করেছেন নিখিলেশবাবু, আমি বেঁচে থাকতে সেটা কখনই সম্ভব হবেনা।" সুলতা জবাব দেয়।

"তাহলে তোমার মৃতদেহের সঙ্গেই বিয়ে হবে আমার। বাধা দেবার চেষ্টা করনা সুলতা—, তাতে ক্ষতি হবার সম্ভবনাই বেশী—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে—আমি তোমার ক্ষতি করতে চাইনা সুলতা, তা যদি চাইতাম এই ছদিনের মধ্যে তোমার সব থেকে বড় ক্ষতি করতে পারতাম—সেটা বুঝে দেখ"—নিখিলেশ যেন একটু বেশী গম্ভীর হয়ে যায়।

"আমি জানি, আমি তোমার চোখে একটা ভয়ানক চরিত্রের লোক ছাড়া আর কিছুই নই—জানি আমি মাতাল, চরিত্রহীন, কিন্তু তবু সুলতা আমি তোমাকে ভালবাসি—আমাকে নূতন করে নীড় বাঁধবার-নূতন জীবন আরম্ভ করবার সুযোগ দাও—আমি কখনই তোমাকে সোজা পথে পেতাম না—তাই এটুকু ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে"—নিখিলেশ যেন পাগল হয়ে গেছে।

সুলতা চুপ করে শুনে যায় নিখিলেশের কথা; কোন কথা যেন সে বলতে পারেনা। এমন সময় বিদ্যুৎ এসে ঘরে ঢোকে।

নিখিলেশকে বলে "একটু বাইরে যেতে হবে, সুলতাকে, সাজাব" বলে হেসে নিখিলেশকে চোখ টিপে বাইরে যেতে বলে। নিখিলেশ বাহিরে যায়—দরজাটা বন্ধ করে দেয় বিদ্যুৎ।

"তোমার বাড়ীতে চিঠি লিখে ভিখুকে পাঠিয়ে দিলাম—আমি পাশের ঘরেই থাকব—এঘরে থাকতে দেবেনা আমাকে নিখিলেশ বাবু। পুরুত নশাইকে ডাকতে পাঠান হয়েছে—আমি বেরিয়ে গেলেই দরজায় খিল এঁটে দিও। যতক্ষণ না তোমার বাড়ী থেকে লোকজন এসে পড়ে ততক্ষণ খুলোনা যেন"। বিদ্যুৎ বলে সুলতাকে।

সুলতা যেন কেমন হয়ে গেছে—উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিদ্যুৎএর দিকে। ভেতরে যে তার কত ঝড় বয়ে চলেছে—সেটা বাইরে থেকে কেউ বুঝবেনা। সমস্ত ঘটনা তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

বিকাশের আবার জ্বর হয়েছে—এই ক'দিনের অনিয়মে

তার দেহ যেন ভেঙ্গে পড়ছে। অনুপ বিকাশের পাশে চেয়ারে বসে আছে। কারও মুখেই কথা নাই, না কথোপকথন, বিছানা থেকে ওঠেননা—খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল—বিকাশ উঠতে যাচ্ছিল—"

"আপনি ব্যস্ত হবেননা আমিই যাচ্ছি"। অনুপ দরজাটা খুলে দেখল একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। অনুপ জিজ্ঞাসা করল—"কি চাই তোমার"?

"বিকাশবাবুকো একঠো চিট্ঠি হ্যায়" ভিখু বলে অনুপকে।

চিঠিটা খোলাই—অনুপ চিঠির শেষে দেখল নাম রয়েছে বিদ্যুৎ—এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে অনুপ তিন-চার লাইন মাত্র লেখা—"সুলতাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে। নিখিলেশবাবু এখুনি তাকে জোর করে বিয়ে করবে ব্যবস্থা করেছে। পত্রপাঠ মাত্র চলে আসুন"—'বিদ্যুৎ'। বাড়ীর ঠিকানা দিতেও বিদ্যুৎ ভুলে যায়নি।

চিঠিখানা পড়েই অনুপ সেখান থেকেই চিৎকার করে উঠ্‌লো "বিকাশবাবু, শুনে যান শিগ্‌গী। লোকটির হাত চেপে ধরে অনুপ বলে "চল তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে আমাকে"।

অনুপের চিৎকার শুনে বিকাশ প্রায় অসুস্থ শরীর নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে বাইরে বেরিয়ে এল—"কি ব্যাপার অনুপ বাবু"? উত্তেজনায় বোধ হয় বিকাশের এখুনি হার্ট ফেল করবে।

"আপনি চিঠিটা নিয়ে এখুনি ট্যাক্সি করে থানায় চলে যান—পুলিশ নিয়ে ওখানে যাবেন—আমি এর সঙ্গে চল্‌লাম। অনুপ ছুটে বেরিয়ে যায় লোকটির সঙ্গে। বিকাশ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে, প্রথমটা বুঝতে পারেনা—চিঠিটা পড়ে সেও ছুটে বেরিয়ে যায় থানার দিকে।

বিদ্যুৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সুলতা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খাটের ওপর চুপ করে এসে বসল—আসন্ন ঝড়ের প্রত্যাশায়।

নিখিলেশ এসে দরজায় ধাক্কা মেরে বলল—"সুলতা, দরজাটা খোল, দরকার আছে"।

সুলতা চুপ করে বসেই রইল পাথরের মত।

"শোন সুলতা, দরজা না খুললে ভেঙ্গে ঘরে ঢুকব"—বাইরে থেকে চিৎকার করে নিখিলেশ।

ভিতর থেকে সুলতার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। সশব্দে গোটাকতক লাথি মারল নিখিলেশ দরজার ওপর, কিন্তু ভাঙ্গলনা দরজাটা, নিখিলেশ রাগে একটা হিংস্র পশুর মত হয়ে গেছে। নিখিলেশ লাথির ওপর লাথি মেরে চলল দরজার ওপর। এবার দরজাটা সশব্দে ভেঙ্গে গেল, ঘরে ঢুকল নিখিলেশ।

সুলতা উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার সে কি করবে? বিদ্যুৎও দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আমি জানি তোমার মত মেয়েকে কি করে সায়েস্তা করতে হয়"—নিখিলেশ এগিয়ে যায় ওকে ধরবার জন্য।

সুলতাও পিছিয়ে যায় "এগোবেননা নিখিলেশবাবু, যদি বাঁচতে চান"। সুলতা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সুলতার কথা শুনে নিখিলেশ হো হো করে হেসে ওঠে পাগলের মত, সুলতাও আজ তাকে ভয় দেখায়—"মরতে আমার বড় আনন্দ সুলতা"—নিখিলেশের হাসি যেন থামতে চায়না।

ড্রেসিং আয়নার উপর ছোট আর একটা আয়না ছিল সুলতা সেইটে হাতে তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে।

নিখিলেশ একপা একপা করে এগিয়ে যায় সুলতার দিকে।

সুলতা আয়নাটা নিখিলেশকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়, মাথায় এসে লাগল নিখিলেশের, কর কর করে রক্ত পড়তে লাগল। খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে যায় নিখিলেশ, থমকে দাঁড়ায় সে। এতখানি সাহস সুলতা কোথা থেকে পেল?

তারপর হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলতার ওপর। সুলতা একদিকে ছুটে সরে যায়, তারপর রিভলভার বার করে দাঁড়িয়ে যায় নিখিলেশের সম্মুখে।

"এক পা'ও এগোবার চেষ্টা করবেননা নিখিলেশ বাবু। সুলতার হাতে রিভলভার দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় নিখিলেশ।

"এটা তুমি কার কাছ থেকে পেলে ?"

"সে খোঁজে আপনার কোন প্রয়োজন নেই।"

"ও বুঝেছি" পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বিদ্যুৎ দাঁড়িয়ে দরজার কাছে।

এক মুহূর্তের মধ্যে নিখিলেশ পকেট থেকে রিভলভার বের করে বিদ্যুৎকে গুলি করে। দরজার সামনে লুটিয়ে পড়ে বিদ্যুৎ সুলতা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

"এইবার তোমার পালা" নিখিলেশ এগোতে থাকে ধীরে ধীরে সুলতার দিকে।

সুলতাও প্রাণপণে রিভলভারের ট্রিগার টিপে। নিখিলেশ লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেজের উপর। হাত থেকে ছিটকে অনেক দূরে পড়ে থাকে তার নিজের রিভলভার।

সুলতা পাথরের মত রিভলভার হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে অনুপ—সমস্ত ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এক মুহূর্তে বুঝে নেয় অনুপ ব্যাপারটা। সুলতার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে—"এ তুমি কি করলে সুলতা ?" অনুপ কি করবে বুঝে উঠতে পারেনা, সুলতা অনুপের বুকের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

এক মুহূর্তে অনুপ ঠিক করে নেয় সে কি করবে। বিকাশবাবু এখনি পুলিশ নিয়ে পৌঁছবেন—তারপর ?

সুলতাকে সে কোনরকমে শুইয়ে দেয়, যার বাড়ীতে সুলতাকে নিয়ে আসা হয়েছে সে গুলির শব্দ শুনেই পালিয়েছে। বাইরে গুলির শব্দে লোকজন এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।

বিকাশ এসে পৌঁছাল থানার অফিসার আর পুলিশ নিয়ে। তারা এসে দেখল সুলতা খাটে শুয়ে আছে—জ্ঞান নেই। অনুপ বসে আছে তার পাশে, মেজের ওপর দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘরের মেজে।

থানা অফিসার ঘরে ঢুকেই বললেন "ইস্ এ কি কাণ্ড ?" দু'দুটো মার্ডার ? এ কি করে হোল ?

অনুপ কোন জবাব দিলনা—খানিক দূরে নিখিলেশের হাত থেকে ছিটকিয়ে যাওয়া রিভলভারটা মেজের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিল ইনস্পেকটার। "এই যে রিভলভারটা এখানে পড়ে আছে, তারপর সুলতার কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে বললেন—"অজ্ঞান হয়ে আছে দেখ্‌ছি, কি ব্যাপার বলুন তো" ?

অনুপের কথা বলার আগেই তিনু বলে—"হাম্ আঁকে দেখা মাইজি আউর বাবু খাড়া রহা"।

ইনস্পেকটার অনুপকে জিজ্ঞাসা করেন ঘটনা সম্বন্ধে—

"আমি এসে দেখি সুলতা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন আর নিখিলেশবাবু রিভলভার নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে কি তর্কাতর্কি করছেন, আমি ঢুকেই রিভলভারটা কেড়ে নিই পিছন থেকে, এমন সময় দরজার কাছে এই মহিলা আর একটা রিভলভার নিয়ে আমাকে গুলি করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন, আমি তখন মহিলাটিকে গুলি করি। নিখিলেশবাবু তখন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, ধস্তাধস্তিতে গুলি বেরিয়ে যায় ও তার গায়ে লাগে।"

ইনস্পেকটার বুঝতে পারেন কথা শুনে, সবই সত্যি নয়। "অনুপবাবু আপনি বুঝে বলুন, পরে কিন্তু আপনার statement আপনার বিপক্ষে যাবে। সত্যি যা ঘটল তাই বলুন।

"আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি আমার গুলিতে ওঁরা মারা গেছেন"।

"Strange gentleman" ইনস্পেকটার অবাক হয়ে যায়। তাহলে আপনাকে এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হলাম অনুপবাবু—আর এঁকে আপাততঃ নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। লাস্ দুটি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন

ইন্‌স্পেক্টর, পাঠিয়ে ছেলো ইসপাতালে।

বিকাশ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই না ভাবছিল; সমস্ত চেতনা সমস্ত সত্তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে তার। কোথা থেকে কি সব হয়ে গেল ভাবতে পারেনা বিকাশ।

বিকাশকে ইন্‌স্পেক্টর বললেন—আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে আপাততঃ থানায়, সেখানে এজাহার দিতে হবে, আর মৃতা দেবীর জ্ঞান হবার পুলিশ থেকে তার স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে।

বিকাশ যেন সমস্ত বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কোন কথাই যেন সে বলতে পারছে না। নীরবে সে সকলের সঙ্গে থানায় যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বিকাশ অনেক রাত্রে থানার কাজকর্ম সেরে বাড়ী ফিরল। মার সঙ্গে দেখা হয়নি তার সে রাত্রে, কোন রকমে বাড়ী ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, বিকাশ মৃণালের কথা ভেবে সারারাত্রি কেঁদে কাটালো। এক মিনিটও ঘুম চলো না তার। সেই দিন রাত্রেই অনুপের মাকে পুলিশ থেকে সব জানিয়ে দিয়েছিল—অনুপের মার প্রায় পাগলের মত অবস্থা, বারে বারে ফিট হচ্ছে সেই থেকে। সুব্রতকে খবর দিয়ে ডেকে আনিয়েছিলেন অনুপের মা।

সুব্রত সারারাত্রি অনুপের মার কাছে ছিল—সকালে উঠে নীলিমার বাবা মিঃ রায়ের কাছে গেল—তখন সকাল ৭টা।

মিঃ রায় তখন সকালে ড্রইং রুমে বসে চা খাচ্ছিলেন আর কাগজ পড়ছেন, নীলিমা পাশে বসে আছে আর বসে আছে হিরণ্ময়।

সুব্রতের মনের অবস্থা দেখে মিঃ রায় বুঝতে পারলেন কিছু একটা হয়েছে—সুব্রত বাবু, হঠাৎ কি ব্যাপার আপনাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে বলুন তো?"

সুব্রত নীরবে একটা চেয়ার টেনে বসল—তারপর বললে—"খবর বড় সাংঘাতিক মিঃ রায়, এত বড় দুঃসংবাদ যে আমি কি করে আপনাদের কাছে বলব, সেই কথাই ভাবছি। বিশেষ করে অনুপ আপনার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিল, আর ছিল আমারও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নীলিমা ধৈর্য রাখতে পারে না "কি ব্যাপার কি বলুন সুব্রতদা—অনুপ বাবু কি"—আর শেষ করতে পারে না নীলিমা—

"না, বেঁচে আছে, তবে বাঁচান বোধহয় যাবে না—সে মার্ডার কেসে কাল রাত্রে এ্যারেষ্ট হয়েছে।"

ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাৎ বাজ পড়ল।

হিরণ্ময় চোখ কপালে তুলে বলল—"My God! আমি আগেই জানতাম নীলিমা দেবী, লোকটি এই রকমই Dangerous"।

মিঃ রায় চীৎকার করে উঠলেন "Don't talk nonsense. সুব্রত বাবু, আসুন আমার ঘরে, সমস্ত কথা আমায় খুলে বলুন, না না, অনুপ এ কাজ করতেই পারে না, না না কখনই নয়।"

সুব্রতের কাছে সমস্ত কথা শুনলেন মিঃ রায়—তারপর বললেন—"আমি একবার যাব অনুপের সঙ্গে দেখা করতে—এখনি সে ব্যবস্থা আমি করছি—আপনি বাড়ী যান, আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না তাকে বাঁচানর—সে আমার নিজের ছেলের মত।"

হিরণ্ময়কে বিদায় করে নীলিমা এসে ঘরে ঢুকল "বাবা, কি হয়েছে আমায় বল" নীলিমা কান্নায় যেন এখুনি ভেঙে পড়বে।

মিঃ রায় সংক্ষেপে নীলিমাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন "তোমাকে বাঁচাতেই হবে বাবা অনুপ বাবুকে—না না এ কখনই হতে পারে না।"

"তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন নীলু, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব তুই এখন বেরুবার ব্যবস্থা করে দে আমার এখনি অনুপের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সুব্রত বলল—"আচ্ছা, আমি আসি মিঃ রায় আপনাকে আমার বেশী বলা ধৃষ্টতা" সুব্রত চলে গেল,—মিঃ রায় গুম হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ তারপর উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মণিপুর প্রসঙ্গ (৯)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

নরসিং (১৮৩৪—৫০)

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বৎসরের নাবালক পুত্র চন্দ্রকীর্তির অছি স্বরূপ, নরসিং রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইলেন। সেনাপতি রূপে নরসিংহের দক্ষতা এবং প্রভুভক্তির পরিচয় ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালেও প্রাক্তন রাজাদের বংশধরগণ বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সন হইতে পর পর এই বিদ্রোহের পালা আরম্ভ হয়। প্রথম রবিনোচন্দ্রের পুত্র তারিং কোম্বা কাছাড় হইতে তিনশত অনুচর লইয়া মণিপুরে প্রবেশ করেন। ইহার কএক বৎসর পর মারজিত সিংহের পুত্র যোগেন্দ্র সিং-ও কাছাড় হইতে মণিপুর আক্রমণের চেষ্টা করেন। ইহাদের দেখাদেখি চৌরজিৎ সিংহের তিন পুত্র ত্রিভুবন, রাম ও তিলাম্বো মণিপুরে থাকিয়া বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। অতঃপর ১৮৪৪ সনে নাবালক রাজা চন্দ্র কীর্তির মাতা মহারাণী কুমুদিনী দেবীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর নরসিং যখন নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন অপর একজন প্রাক্তন রাজা চরাইরংবার (গরীব-নিওয়াজের পিতা) বংশধর মেলাইরংবা (Melai Romba) কাছাড় হইতে মণিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। নরসিং এবং তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহের তৎপরতায় একে একে তাহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। মেলাইরংবা ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহী নেতাগণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। মেলাইরংবা ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ১৮৮১ সন পর্যন্ত রাজনৈতিক অপরাধের জন্য মণিপুরে আর কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই।

মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক

১৮৩০ সনে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাজা গম্ভীর সিং কাছাড় রাজ্য মণিপুরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কি কারণে কাছাড়ের বিস্তৃত সমতলভাগ তাঁহাকে না দিয়া নিজেদের এলাকাভুক্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৩ সনে হিন্দুস্থানের গভর্ণর জেনারেল এবং সুপ্রিম কাউন্সিল মণিপুরের মহারাজাকে এইরূপ জানাইলেন যে :—

"বরাক নদীর পূর্ব ও পশ্চিম বাঁকের মধ্যে, কালা নাগা এবং মুনডাই নামক দুইটি পর্বত শ্রেণী আছে : মান্যবর কোম্পানীর তাহাতে যে দাবি-দাওয়া আছে, তাহা আমরা ত্যাগ করিব এবং এই পর্বত দুইটি রাজাকে দখল করিতে দিব। অধিকন্তু ডিরি নদীর পূর্ব তীর এবং বরাক নদীর পশ্চিম বাঁক পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে, মণিপুর রাজাকেও সম্মত হইতে হইবে।

১। চন্দ্রপুর হইতে তাঁহার থানা স্থানান্তরিত করার কথা, ইতিপূর্বে তাঁহাকে যেরূপ জানান হইয়াছে, তদনুসারে তিনি তাহা অবিলম্বে ডিরি নদীর পূর্বধারে স্থাপিত করিবেন।

২। উভয় দেশের বাঙ্গালী ও মণিপুরী সওদাগরেরা যেরূপ পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে, তিনি তাহা কোনরূপ বন্ধ করিবেন না। তিনি এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন না এবং কোন পণ্য দ্রব্যই একচেটিয়া করিবেন না।

কালানাগা, মুনজাই পর্বতের অধিবাসী নাগারা, আসা, তুলা, মরিচ এবং তাহাদের দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য, যেরূপ পূর্বাপর কাছাড় প্রদেশে এবং বাণিজ্য উদ্দেশ্যে রাজ্যে বিক্রয় করিয়া থাকে, সে পক্ষে তিনি কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মাইবেন না।

৪। জিরি নদীর পূর্ব কিনারা হইতে আরম্ভ করিয়া, কালানাগা এবং কাউপুনের বলদিয়া, মণিপুর উপত্যকা পর্যন্ত যে পথ আছে, তাহা বাঙ্গান হইবার পর, রাজা সেটিকে এইরূপ মেরামত অবস্থায় রাখিবেন, যাহাতে তাহা দিয়া ভারবাহী বলদগণ শীত ও গ্রীষ্মকালে যাতায়াত করিতে পারে। অধিকন্তু রাস্তা তৈয়ারির সময় যদি তাহা তদারক করিতে ইংরেজ কর্মচারী পাঠান হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিবেন, রাজা তদনুসারে কার্য করিবেন।

৫। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধিকৃত দেশ ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে, যেরূপ ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা বৃদ্ধি পাইলে রাজা এবং তাঁহার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। অতএব যাহাতে এই সুফল শীঘ্র ফলিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চাহিলে, রাজা রাস্তা তৈয়ারির সাহায্য করিতে নাগা কুলি দিবেন।

ব্রহ্মের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে, দেশরক্ষা অথবা নিংথি নদী অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য, যদি মণিপুরে সৈন্য পাঠান হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চাহিলে, সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্র পাঠাইবার জন্য, রাজা, পাহাড়ী মুটে দিবেন।

৭। ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্বাংশে কোন দুর্ঘটনা হইলে, যদি বৃটিশ গভর্ণমেন্ট চাহে, তবে মণিপুর রাজ, তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশের দ্বারা সাহায্য করিবেন।

৮। তাঁহার কার্যের জন্য, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে সকল যুদ্ধ সামগ্রী দিবেন, রাজাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের গোচরার্থে যাহা খরচ হয় তাহার বিস্তারিত তালিকা মাসে মাসে মণিপুর সৈন্য সংশ্লিষ্ট বৃটিশ কর্মচারীকে তিনি দিবেন।"

মহারাজা গম্ভীর সিং সমস্ত সর্তই মানিয়া লইয়াছিলেন।

Treaty of 1833 :—

"The Governor General and Supreme Council of Hindusthan declare as follows :—

.....With regard to the two ranges of hills, the one called the Kala Naga Range and the other called Nungjai range, which are situated between the eastern and western bends of the Barak, we will give up the claim on the part of the Hon'ble company thereunto. and we will make these hills over in the possession of the Raja, and give him the line of the Jiri, and the western bend of the Barak as a boundary, provided that the Raja agrees to the whole of what is written in this paper which is as follows :—

1st—The Raja will, agreably to instructions received, without delay, remove his thana from Chandrapur, and establish it on the eastern bank of Jiri.

2nd—The Raja will, in no way obstruct the trade carried on between the two countries by Bengalee and Manipuri merchants. He will not exact heavy duties, and he will make a monopoly of no articles of merchandise whatever.

3rd—The Raja will in no way prevent the Nagas inhabiting the Kala Naga and Nungjai ranges of hills from selling or batterting ginger, cotton, pepper, and every other article, the produce of their country, in the

উপরোক্ত সর্তগুলিতে অর্থনৈতিক এবং সামরিক চুক্তি ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন কথা নাই। এবিষয়ে বারবার বিশদভাবে আলোচনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মণিপুরের সঙ্গে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করা। মণিপুরে তখন ইংরেজের প্রভাব বিস্তৃত হইলেও প্রভুত্ব তখনও কায়েম হয় নাই। গম্ভীর সিং এবং তাঁহার পরবর্তী নরসিং স্বাধীন নরপতি ছিলেন। কিন্তু এস্থলে ইংরেজ সরকারের অর্থে গঠিত এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত মণিপুর লেভির মণিপুর রাজ্যে অবস্থান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। কোন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী অন্য রাষ্ট্রের অর্থে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকা সেই রাষ্ট্রের পক্ষে কোনরূপেই মর্যাদাকর বলিয়া গণ্য হয় না। যে কারণে এবং যে অবস্থায় মণিপুর লেভি গঠিত হইয়াছিল, ইয়ান্দাবো চুক্তি, কাছাড় রাজ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিষ্পত্তি, এবং ১৮৩৩ সনে ইষ্ট-মণিপুর চুক্তির পর ইংরেজের পক্ষে মণিপুর লেভির প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। ১৮৩৪ সনের জানুয়ারি মাসে গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা হওয়ার আশঙ্কায় মণিপুর লেভি আরও এক বৎসর ইংরেজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সুদক্ষ সেনাপতি নরসিং নাবালক

---

plains of Kachar, at the Banskandi and Oodherban bazars as has been their custom.

4th—With regard to the road commencing from the eastern bank of the Giri, and continued via Kala Naga and Kowpum as far as the valley of Manipur, after this road has been finished, the Raja will keep it in repairs, so as to enable laden bullocks to passing during the cold and dry seasons. Further, at the making of the road, if British officers be sent to examine or superintend the same, the Raja will agree to every thing these officers may suggest.

5th—With ref. to the intercourse already existing between the territories of the British Govt. and those of the Raja, if the intercourse be further extended, it will be well in every respect, and it will be highly advantageous to both the Raja and his country. In order, therefore, that this may speedily take place, the Raja at the requisition of the British Govt will furnish a quota of Nagas to assist in the construction of the road.

6th—In the event of the war with the Burmese, if the troops be sent to Monipur either to protect the country or to advance beyond the Ningthi, the Raja, at the requisition of the British Govt. will provide hill porters to assist in transporting ammunitions and baggage of such troops.

7th—In the event of anything happening on the eastern frontier of the British territories the Raja will, when required, assist the British Govt. with a portion of his troops.

8th—The Raja will be answerable for all the ammunition he receives from the British Govt. (and will, for the information of the British Govt, give in every month a statement of expenditure to the British officer attached to the levy."

All the provisions of the above treaty with the exception of the last remained in force. The last one became inoperative when the Br. officer connected with the Manipur levy was withdrawn.

রাজ্যের অছি স্বরূপ রাজ্যের কর্ণধার হইয়া এক বৎসর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করার পর ১৮৩৫ সনে ইংরেজ সরকার মণিপুর লেভি'র ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণভাবে মণিপুর সরকারের হাতে তুলিয়া দেয়। সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গ্রান্ট (Major Grant) সমস্ত দায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়া মণিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন গর্ডন (Capt. Gordon) ১৮২৭ সন হইতে উক্ত বাহিনীর এড্‌জুটেন্টের (Adjutant) কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। সৈন্যদল হস্তান্তরিত হওয়ার পর তিনি ১৮৩৫ সনে মণিপুর রাজ্যে ইংরেজ সরকারের পলিটিক্যাল এজেন্ট (Political Agent) নিযুক্ত হন। গর্ডন সাহেব ব্যতীত মণিপুরে তখন দ্বিতীয় ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন ক্যাপ্টেন পেম্বারটন (Capt Pemberton)। পেম্বারটন সাহেব ১৮২৫ সনে গম্ভীর সিংহের সঙ্গে মণিপুরে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি মণিপুরের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণে রত ছিলেন। ১৮৩৫ সনে তাঁহাকে মণিপুরে যুগ্ম কমিশনারের (Joint Commissioner) পদে নিযুক্ত করা হয়। উপরোক্ত গর্ডন সাহেবই মণিপুর রাজ্যে নিযুক্ত সর্বপ্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট। এই পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং প্রয়োজনমত মণিপুরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। ব্রহ্ম-মণিপুর সীমান্তে গোলযোগের মীমাংসা করাও তাহার অন্যতম কর্তব্য ছিল। * ইহাতে দেখা যায় যে পলিটিক্যাল এজেন্টের কর্তব্য এবং ক্ষমতা অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজদূতের (Ambassador) চেয়ে বেশী ছিল না। গর্ডন সাহেব কৃতিত্বের সহিত তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া ১৮৪৪ সনের ডিসেম্বর মাসে মারা যান। মণিপুরীগণ তাহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের এই বন্ধুটিকে মনে রাখিয়াছিল। নরসিংহের শাসনকালে পর পর যে সমস্ত বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল তাহাতে অবস্থা কখনও কখনও সঙ্কটাপন্ন হইলেও ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট সব সময় নিরপেক্ষই ছিলেন। সেইজন্য কোন পক্ষই ইচ্ছাকৃতভাবে পলিটিক্যাল এজেন্টের কর্তব্যে বাধা সৃষ্টি করে নাই। গর্ডন সাহেবের মৃত্যুর পর কুলক (Mc Cullock) সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন।

কুমুদিনী মহারাণীর ষড়যন্ত্র :—

মহারাজ গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে মহারাণী কুমুদিনী দেবীর গর্ভে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্তি সিংহের জন্মের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহারাণীর মনে চন্দ্রকীর্তির প্রতি নরসিংহের অভিপ্রায় সম্পর্কে সব সময়ই একটা সন্দেহ ছিল। নরসিংহের চরিত্রে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এইরূপ সন্দেহের পিছনে মূলতঃ কোন কারণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। নরসিংহের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিং অনেকদিন যাবৎই তাঁহার অনিষ্টসাধনের উপায় খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোক, নরসিংহের সুশাসনে যেরূপ সন্তুষ্ট ও তাঁহার এবং নাবালক রাজা চন্দ্রকীর্তির প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে তাঁহার দুরভিসন্ধি কার্যে পরিণত করার কোন সুযোগ তিনি পান নাই। অবশেষে কতিপয় দুষ্ট লোকের সাহায্যে মহারাণীর মনে এমন একটি সন্দেহ দৃঢ়রূপে জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন যে, নরসিং অচিরে চন্দ্রকীর্তিকে দেশান্তরিত বা প্রাণে বিনষ্ট করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ গোপনে গোপনে করিতেছেন। সেইজন্য সময় থাকিতেই

* A political Agent first appointed in 1835 .....when the European officer deputed to supervise the Manipur Levy was withdrawn. He was posted in the valley "for the preservation of a friendly intercourse and as a medium of communication with the Manipur Govt. and as occasion may require, with the Burmese authorities on that frontier, and more especially to prevent border feuds, which might lead to hostilities between the Manipuris and the Burmese. (Political correspondence, No. 106).

মহারাণী নরসিংকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া থাঙ্গাল. পাওসাং (Paosang) মন্ত্রীনয়ন নবীন সিং প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লোকদিগকে স্বপক্ষে আনেন। দেবেন্দ্রের প্ররোচনায় তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু নয়ানয়ন নবীন সিং এই ব্যাপারে মহারাণীকে সমস্ত কৌশল বাৎলাইয়া দিয়া ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেন। আর দেবেন্দ্র রহিলেন ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থায়। তিনিই যে পশ্চাতে থাকিয়া দাবার চাল দিতে ছিলেন তাহা কেহ টের পাইল না। যদি নরসিং মারা যান তবে চন্দ্রকীর্তিকে শুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে বসিতে আর কতক্ষণ? আর এই কিস্তি বিফল হইলে চন্দ্রকীর্তিসহ তাঁহার দলের নির্বাসন অনিবার্য। সুতরাং এক্ষেত্রেও নরসিংহের মৃত্যুর পর তাহাকে সিংহাসনে বসিতে বাধা দেয় এমন সাধ্য কার আছে।

১৮৪৪ সনে একদিন নরসিং যখন শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে উপাসনায় রত ছিলেন তখন মহারাণীর ইচ্ছা-ক্রমে নবীন সিং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টায় নিজেই প্রহরীদের দ্বারা নিহত হন। নরসিং আহত হইলেও দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া যান। ১৮৩৩ সনের চুক্তি অনুযায়ী মণিপুর সরকারের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন গুথ্রী (Capt Guthrie) তত্ত্বাবধানে ১৮৩৭ সনে ডিব্রিঘাট হইতে বিষেণপুর পর্যন্ত নূতন রাস্তা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৪৪ সন পর্যন্ত এই কাজ চলে। নবীন সিং কর্তৃক নরসিং আক্রান্ত হওয়ায় সময় পলিটক্যাল এজেন্ট গর্ডন সাহেব অথবা তাঁহার সহকারী কেহই রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা তখন উপরোক্ত রাস্তা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে মহারাণী তাঁহার পুত্রসহ থাঙ্গাল ও পাওসাং-এর সঙ্গে মণিপুর হইতে পলাইয়া কাছাড়ে ইংরেজের আশ্রয়ে চলিয়া যান। পলায়নের সময় তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই নূতন রাস্তা দিয়া না যাওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে পলিটক্যাল এজেন্ট অথবা তাঁহার সহকারীর দেখা হয় নাই। নরসিং এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিজেকে মণিপুরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মণিপুরের লোক নরসিংহের বীরত্বে এবং সুশাসনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল বলিয়া চন্দ্রকীর্তিসহ মহারাণীর পলায়নের পর তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি উঠে নাই। এই ব্যবস্থা ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ মনঃপূত না হইলেও তাঁহারা এসম্বন্ধে নিরপেক্ষই থাকেন।

মণিপুরে কুকীদের প্রবেশ :—

কুকীগণ নাগা অথবা মণিপুরি হইতে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়ের লোক। তাহাদের আদি নিবাস কোথায় বলা কঠিন। তবে দক্ষিণে মালয় হইতে আরম্ভ করিয়া কাছাড় ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত।

ইহাদের কোন কোন গোষ্ঠী বহুদিন পূর্ব হইতে মণিপুর রাজ্যে বসবাস করিতেছিল। কিন্তু ১৮৩০ হইতে '৪০ সনের মধ্যে দলে দলে নূতন কুকী গোষ্ঠী দক্ষিণ হইতে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া পাহাড় অঞ্চলের নাগাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের জায়গা দখল করিতে থাকে। ১৮৪৪ সনে অবস্থা চরমে পৌঁছায়। মহারাজা নরসিং তখন সবে সিংহাসনে বসিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা তখনও একেবারে দূর হয় নাই। এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে নব্যাগত কুকীদিগকে দমন করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেবের উপর বিষয়টি ছাড়িয়াদিলেন। কুলক সাহেব এই কুকী সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া মণিপুরি এবং ইংরেজ মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে কুকী সম্প্রদায় দক্ষিণ হইতে অপেক্ষাকৃত প্রবলতর মানব গোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হইয়া মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে তাহাদের লক্ষ্য চাষ এবং বাসের ভূমি। ইহা পাইলেই

তাহারা সন্তুষ্ট। কুলক সাহেব তাহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জমি বাড়ী দিয়া বসাইয়া দিলেন এই ব্যাপারে তিনি বহু দলপতিকে নিজের পকেট হইতেও ঋণ দিয়া সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। বহু লোককে সৈন্যদলে অথবা অন্যান্য বিভাগে কাজ দেওয়া হইল। যাহাদিগকে কোন কাজ দেওয়া গেল না তাহারা বেগার খাটিয়া সাহেবের ঋণ শোধ করিতে প্রতিশ্রুত রহিল। এইরূপে হাজার হাজার দুর্বৃত্ত কুকী কুলক সাহেবের ব্যবস্থায় মণিপুর রাজ্যে আশ্রয় পাইয়া আজিও শান্তিপ্রিয় প্রজা এবং সীমান্তের প্রহরীর দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা পর্যন্ত কুলক সাহেবের এই সাফল্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিল।

কাছাড় হইতে চন্দ্রকীর্তির জন্য সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা :—

মহারাণী তাঁহার পুত্রসহ মণিপুর হইতে পলাইয়া কাছাড় আসিয়া ইংরেজ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের নিরাপত্তার জন্য সরকার হইতে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, এবং তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য মণিপুর সরকারের প্রাপ্য কুকী উপদ্রবের জন্য ক্ষতি পূরণের টাকা হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। এইরূপ নির্বাসনে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর কাটে। এর মধ্যে মহারাণী তাঁহার পুত্রকে মণিপুরের সিংহাসন ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করার জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট বহুবার আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ নরসিংকে ঘাঁটাইয়া শান্তি নষ্ট করিতে সম্মত হয় নাই। অতঃপর তিনি আসামে যাইয়া সেখানকার কমিশনার ক্যাপ্টেন জেংকিনসের (Capt. Jenkins) নিকট তাঁহার আবেদন পেশ করেন। অনেক লেখালেখির পর মহারাণীকে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিতে বলা হয়। প্রায় এক বৎসর আসামে থাকার পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া মহারাণী কাছাড়ে চলিয়া আসেন। ১৮৫০ সনে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কোন সুযোগ মিলিল না।

নরসিংহের মৃত্যু :—

১৮৫০ সন। মণিপুরে ব্যাপক কলেরা মহামারীর প্রকোপে বহুলোক মারা যায়। মহারাজ নরসিংও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলিটিক্যাল এজেন্টের চিঠিপত্রে দেখা যায় নরসিং তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। মণিপুরী মহলে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন নরসিং তাঁহার পুত্রগণের নিকট কাছাড় হইতে চন্দ্রকীর্তিকে আনাইয়া সিংহাসনে বসানোর জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নরসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিং কাহাকেও কোন সুযোগ না দিয়া নিজেই সিংহাসনে বসিলেন। নরসিংহের তিনপুত্র তখন কাছাড়ে পলাইয়া গিয়া চন্দ্রকীর্তির দলে যোগ দিলেন।

মহারাজা গম্ভীর সিংহের সময় ব্রজমমুম ও আনৌরাম এবং মহারাজা নরসিংহের সময় কুলীনমমুম ও গোসাঁইমমুন প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পরিবার সমূহের পূর্ব পুরুষগণ মণিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ব্রজমমুন আসিয়াছিলেন শান্তিপুর হইতে, তিনি গোপালজীর পূজা করিতেন বলিয়া মণিপুরে তাহার উপাধি হইল ব্রজমমুম। আনৌরাম আসিয়াছিলেন আগরতলা হইতে; আনৌবা শব্দের অর্থ নূতন —সেইজন্য এই নবাগতকে বলা হইল আনৌরাম। কুলীনমমুম আসিয়াছিলেন বরানগরের কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার হইতে সেইজন্য তিনি হইলেন কুলীন মমুম। কুলীন মমুম কালী সাধক ছিলেন। তিনিই বোধহয় মণিপুরে সর্বপ্রথম কালীপূজা প্রচলন করেন, কিন্তু মণিপুরিগণ তাহাদের হৃদয়ের যে আসনে সুদর্শনে কালোকে বসাইয়াছে সেই স্থানে ভৈরবী কালীকে

ছাড়িয়া দিতে তাহাদের মন সাড়া দিল না। সেইজন্য মণিপুরে কালীপূজা এখনও ততটা জনপ্রিয় হয় নাই। গোসাঁইমহুম আসিয়াছিলেন শান্তিপুর হইতে; তাঁহার পূর্ব উপাধি ছিল গোস্বামী—সেইজন্য তিনি হইলেন গোসাঁইমহুম। আসামের খারাদহ হইতে আচার্য উপাধিধারী একজন কথক ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন, মণিপুরী ভাষায় কথককে বলা হয় ওয়ারিলিবান, সেইজন্য তাহার উপাধি হইল 'ওয়ারিলিবান।'

মহারাজা নরসিং কীর্তন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময় 'নীপা-পালা' নামক কীর্তনের বিশেষ উন্নতি হয়। 'নীপা-পালার' গায়কগণ সকলেই পুরুষ, তাহারা পাগড়ি, মালা, বহু তাঁজকরা দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসরে কীর্তনের প্রাচীন এবং নূতন বিভিন্ন গান গাহিয়া থাকে। ঝুলন এবং দুর্গা পূজার সময় যে "ধোপ-পালা" গাওয়া হয় তাহারও গম্ভীর সিং এবং নরসিংহের সময় জন্ম হয়। গোস্বামী কৃষ্ণদাস ঠাকুরের নিকট হইতে ভাব এবং অনুপ্রেরণা লইয়া তাঁহারা এই নূতন পালা কীর্তনের রূপ দেন। রাজ পরিবারের মেয়েরাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া জল-কেলি এবং 'রাসেশ্বরী-পালা' অভিনয় করিতেন। সাধারণতঃ নরসিংহের পরিবারের মেয়েরা সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার অঙ্গে জল ছিটাইয়া 'জল-কেলি' করিতেন। আর কর্তা অর্থাৎ মহারাজা নরসিংহের বংশের মেয়েরা রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসের অভিনয় করিয়া 'রাসেশ্বরী পালা' গাহিতেন।

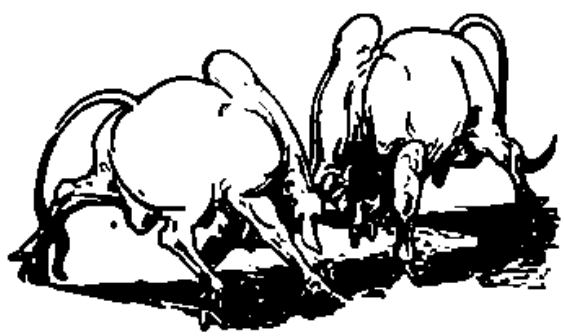

বিজ্ঞান জগৎ

হাইড্রোজেন বোমা

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্র আজ এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। খবরে দেখা যায়, গত মার্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা প্রথমতঃ দুইবার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। ১লা মার্চ যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল তাহার শক্তি নাকি ছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টন টি. এন. টি বোমার শক্তির সমান। ১লা মার্চ ভোর চারটায় সবল বিস্ফোরণ ঘটিবার ৩৭ মিনিট পরে ৭০ মাইল দূরবর্তী এক জাপানী জাহাজের লোকজন বোমার গর্জন শুনিতে পায় এবং প্রায় দুই ঘন্টা ধরিয়া ঐ অঞ্চলে শ্বেতবর্ণের প্রপাতের মত তুষারবর্ষণ হইতে থাকে। ইহাছাড়া লোকজনের শরীরেও নানাপ্রকার গুরুতর প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। নোটের উপর বিভিন্ন সূত্রে যেসব খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয়, হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসশক্তি অভাবনীয়ই বটে। শোনা যায়, এক কিলোগ্রাম হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হইবার সময় যে শক্তি নির্গত হয় তাহা ১৬,০০০ টনের টি. এন. টি বোমা বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন শক্তির সমান হইবে। এই রকমের একটি হাইড্রোজেন বোমা প্রায় তিন হইতে চারশত বর্গমাইল স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু কথা হইতেছে, হাইড্রোজেন বোমার এই প্রচণ্ড শক্তি আসে কোথা হইতে?

আজ পর্যন্ত মানুষ তাপ, বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উৎপন্ন শক্তির সাহায্যেই বহুবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। কারণ তাহারা প্রয়োজনানুযায়ী এই সকল শক্তি উৎপাদন করিতে পারে এবং ইচ্ছানুযায়ী তাহা নিয়ন্ত্রণও করিতে পারে। কিন্তু অনেকদিন পূর্বেই বৈজ্ঞানিকরা আর একটি প্রচণ্ডতর শক্তির উৎসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। শক্তির এই উৎস হইতেছে—পদার্থের পরমাণু, অর্থাৎ অ্যাটম। পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুতে বিপুল শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু এই শক্তিকে বাহির করিয়া আনিবার উপায় জানা ছিল না। পরমাণু হইতে এই শক্তি বাহির করিবার উপায় এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার কৌশল জানা গেলে মানুষ যে অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কি কৌশলে এই শক্তি আহরণ করা যায় এবং কেমন করিয়া তাহা ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন হইতেই গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কেহ কোন সন্তোষজনক উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে এক অভিনব আবিষ্কারের খবর শুনিয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য এবং উদ্দীপনার সাড়া পড়িয়া যায়। আবিষ্কারের বিষয়টি হইল এই যে, জার্মান

বৈজ্ঞানিক অটো হ্যান ও ষ্ট্রাসম্যান ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই কেন্দ্রীয় বস্তু বিভাজনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। তখন হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির বৈজ্ঞানিকেরাই সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত অ্যাটম বোমাই তাহার প্রমাণ। ইহার নির্মাণ কৌশল একমাত্র এ. ই. সি ছাড়া তাহা আর কাহারও জানিবার উপায় নাই। সামরিক কারণেই এই বিষয়ে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও এই সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে তার ও শক্তি সম্পর্কিত মৌলিক তত্ত্বের দিক হইতে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে মাত্র।

পদার্থের পরমাণু সম্বন্ধে যাহারা অন্ততঃ কিছুটা ওয়াকিবহাল তাহারাই জানেন—পূর্বে পরমাণুকে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণিকা মনে করা হইত, এখন সেই ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। এই কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি পরমাণু বিভিন্ন মৌলিক কণিকার সমবায়ে গঠিত। নিউট্রন নামক এইরকমের এক প্রকার নিস্তড়িৎ কণিকাকে ঢিলের মত ব্যবহার করিয়া পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় পদার্থের বহির্দেশে অবস্থিত ইলেকট্রনগুলিকে স্থানচ্যুত করা কঠিন ব্যাপার নহে। ইহার ফলে যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থকেও আংশিকভাবে ভাঙা যাইতে পারে। কিন্তু একফোঁটা জলকে অসমানভাবে দ্বিধাবিভক্ত করিলে যেমন ছোট, বড় দুই ফোঁটা জলে পরিণত হয়, সেরূপভাবে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে খণ্ডিত করাই ছিল সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। পূর্বেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আগে হইতেই জানিতেন যে, কোন এক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙিয়া অপর কোন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিণত করা যাইতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া ঘটিবার সময় প্রচুর শক্তি নির্গত হইবার কথা। পূর্বোক্ত জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু বিভক্ত করিবার কৌশলটিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এরূপ ভাঙনকে বলা হয় 'ফিসন'। অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিসম্পন্ন নিউট্রনের সাহায্যে ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ফিসন ঘটাইবার ফলে অ্যাটম বোমার প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভূত হয়।

এখন কথা হইতেছে—নিউক্লিয়াস দ্বিধাবিভক্ত হইলে এরূপ প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভূত হইবার কারণ কি? বস্তু ও শক্তির একত্ব পরিকল্পনায় আইনষ্টাইন দেখাইয়াছেন—পদার্থ লোপ পাইলে তাহা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম ভাঙিয়া যে দুইটি পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাদের উভয়ের ওজন যোগ করিলে মূল পদার্থের ওজনের সমান হওয়া উচিত। প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু ওজন কিছু কম হইতেই দেখা যায়। কাজেই বুঝা যায় ভাঙিবার সময় কিছু পদার্থ লোপ পাইয়াছে। এই লুপ্ত অংশটুকুই প্রচণ্ড শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অ্যাটম বোমার মধ্যে ইউরেনিয়াম বোমা এবং প্লুটোনিয়াম বোমা—এই দুই রকমের বোমাকেই ফিসন বোমা বলা হয়।

ফিসন বোমা সম্বন্ধে মানুষ ওয়াকিবহাল হইতে হইতেই খবর পাওয়া গেল—ফিসন বোমার শক্তি অপেক্ষা প্রচণ্ডতর শক্তি উৎপাদন করিতে পারে, পরীক্ষামূলকভাবে এরূপ কৌশল মানুষের আয়ত্তে আসিয়াছে। ফিসন বোমার যেমন পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া শক্তি নির্গত হয়, এই অভিনব কৌশলে কিন্তু তাহার বিপরীত প্রক্রিয়ার প্রচণ্ডতর শক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে। এরূপ প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদনকারী মারণাস্ত্রকেই হাইড্রোজেন বোমা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অ্যাটম বোমার তুলনায় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে

১০০ গুণ অধিক শক্তি নিহিত হয়। তবে প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রলয়ঙ্কর মারণাস্ত্রকে হাইড্রোজেন বোমা বলা যায় কিনা—সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। কারণ ইহাতে যে বিস্ফোরক পদার্থ থাকে, খুবসম্ভব তাহা হাইড্রোজেন এবং অন্য কোন পদার্থ হইবে। ইহা থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকসনের ব্যাপার। এই থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকসনের ফলেই আমাদের সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলী অনবরত আলো বিকিরণ করিতেছে। এই প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি অত্যাবশ্যক তাপের মধ্যে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু যতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু একীভূত হইয়া হিলিয়াম উৎপন্ন করে তাহাদের ওজন উৎপাদিত হিলিয়ামের ওজনের সমান হওয়া উচিত। প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু সেরূপ হয় না—ওজন কিছু কমিয়া যায়। এই কমতি কেন হয়? নিশ্চয়ই কিছু বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। এই নষ্ট বস্তুটুকুই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সেই শক্তিই সূর্যের আলোকরূপে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় ফিউসনজনিত শক্তি উৎপাদন।

এইরূপ থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকসনের প্রক্রিয়া চালু করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, পৃথিবীতে সেরূপ অত্যাবশ্যক তাপ উৎপাদন করা যে সম্ভব হইতে পারে, অ্যাটম বোমা উদ্ভাবিত হইবার পূর্বে একথা কেহ ধারণাই করিতে পারে নাই। অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের সময় যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তাহা সূর্যের অভ্যন্তরের তাপমাত্রাকেও ছাড়াইয়া যায়। কাজেই হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের প্রাক্কালে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হইয়া থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকসন ঘটাইবার উপযোগী তাপ সৃষ্টি করে। এই প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির কেন্দ্রীয় বস্তু একীভূত হইয়া হিলিয়ামের কেন্দ্রীয় বস্তুতে পরিণত হয়। ইহাই ফিউসনের ফলে পদার্থের রূপান্তর প্রাপ্তি। এই রূপান্তরের সময় যে পরিমাণ বস্তুর বিলোপ ঘটে তাহাই প্রচণ্ড শক্তিরূপে হাইড্রোজেন বোমা হইতে নির্গত হয়।

কিন্তু সাধারণ হাইড্রোজেন খুবই অলস প্রকৃতির। সূর্যের মধ্যে এই জন্যই অতি মন্থর গতিতে এই প্রক্রিয়া চলে। এই কারণেই সূর্যকে মন্থর হাইড্রোজেন বোমা বলা যায়। এই জন্যই সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিকেরা ট্রাইটিয়াম নামে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপকেই হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বিস্ফোরিত অ্যাটম বোমার মধ্যে থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকসনে ট্রাইটিয়ামেরই যথেষ্ট পরমাণু-কেন্দ্রিক 'দাহ' শক্তি রহিয়াছে। কিন্তু ট্রাইটিয়াম এমনই একটা দুর্লভ বস্তু, পৃথিবীতে যাহার অস্তিত্ব একরকম নাই বলিলেও চলে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার স্যাভানা নদীর ধারে ট্রাইটিয়াম উৎপাদনের জন্য যে বিরাট কারখানা নির্মিত হইয়াছে তাহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এক পাউণ্ড ট্রাইটিয়াম উৎপাদন করিতে দশ লক্ষ ডলারের কম খরচ হইবে না। অথচ ১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর এনিওয়েটকে যে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান হয় তাহাতে একটি দ্বীপ জলের নীচে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়। বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যে সব রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়—এই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা ৫০ লক্ষ টন টি. এন. টি-র বিস্ফোরণের মত হইয়াছিল। এই ব্যাপার হইতে সহজেই হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, সেই প্রলয়ঙ্কর বোমার মধ্যে ট্রাইটিয়াম ছাড়া অন্য কোন পদার্থই ছিল। এই বিষয়ে প্রকৃত রহস্য অজানা হইলেও কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খুব সম্ভব এই বোমার মধ্যে প্রথমতঃ অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই বিস্ফোরণে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপে ট্রাইটিয়াম ও ডয়টেরিয়াম মিশ্রণের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ফলে প্রচণ্ডতর তাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহাই শেষ নহে; দ্বিতীয়বারে উৎপন্ন অত্যাবশ্যক তাপে তৃতীয় দফায় আর একটা থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকসন ঘটিয়া থাকে—যাহার ফলে হাইড্রোজেন বোমার এই অত্যাবশ্যক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। মোটের উপর এই তিন দফায় বিস্ফোরণ ঘটিবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এতই সামান্য যে, আমরা তাহা ধারণাও করিতে পারি না। যাহা হউক—এই তৃতীয় দফার বিস্ফোরণ ঘটে কোন্ পদার্থের মধ্যে? এই পদার্থটা হয়তো লিথিয়াম হইতে পারে। লিথিয়াম কঠিন পদার্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা, রূপার মত সাদা একরকম ধাতব পদার্থ। হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের পরেই ইহার স্থান। কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা হাইড্রোজেন বোমা, না লিথিয়াম বোমা, তাহা বলা শক্ত। তবে এ. ই. সি-র সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে যাহা বুঝা যায় তাহাতে ইহাকে থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা বলাই ঠিক। অ্যাটম বোমাকে যেমন ফিসন বোমা বলা হয়, হাইড্রোজেন বা থার্মোনিউক্লিয়ার বোমাকেও সেরূপ ফিউসন বোমা বলা যাইতে পারে।

রূপের অভিশাপ

গী দ্য মোঁপাসা

অনুবাদক—শ্রীসুভাষ সমাজদার

আমার মনে হয় বেঁচে থেকে মানুষের সব চাইতে মর্মান্তিক পরিণতি মস্তিষ্কবিকৃতি। তাদের কথা মনে হলেই আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে হেকাটা ফুলের মত সুন্দর একটা মুখচ্ছবি। শ্বেত পাথরের মত তার গায়ের রঙ। কিন্তু যেন কী এক দুঃসহ চিন্তা কালো চিহ্ন রচনা করেছিল তার বড় বড় দুটো নীল চোখের নীচে। তবুও, হঠাৎ সেই ভদ্রমহিলাকে মনে হতো যেন একটা বিষাদের শিলা-স্তূপ। হতাশাচ্ছন্ন দুঃখে থম থম করতো তার মুখখানা।

বেশ কিছুদিন আগে উন্মাদ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে বলেছিল, তোমরা লেখক মানুষ—মানুষের জীবন মরণের উপর তোমরা তো খুব পোষ্টমর্টেম চালাও। কিন্তু তুমি যদি আমার হাসপাতালে আসো তাহলে তোমাকে এমন অদ্ভুত এক রোগিণী দেখাবো যে তুমি একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।—বলা বাহুল্য এমন আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলাম না। আমাকে দেখেই চিকিৎসক বন্ধু উল্লসিত গলায় বললেন—কী, এসেছো? চল ঘাই তোমাকে আগে দেখিয়ে নিয়ে আসি। পরে আলাপে সালাপ করা যাবে—ডাক্তার দোতালার করিডোর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের তালা খুললেন। আমি দেখলাম—আর্মচেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। বছর চল্লিশেক বয়স হয়তো হয়েছে তাঁর। কিন্তু এখনও যৌবনের রূপ ছাইচাপা আগুনের মত ঝিকি ঝিকি করছে তাঁর ঠুঠাম দেহে। হাতে একটা ছোট্ট আয়না নিয়ে তন্ময় হয়ে নিজের মুখ দেখছেন। কিন্তু আমাদের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর সারামুখে আতঙ্কের কতকগুলো কালো কালো ছায়া ভেসে উঠল। ছুটে ঘরের কোণে গিয়ে একটা বিছানার চাদরে মুখখানা ঢেকে বসে রইলেন স্থাণুর মত। ডাক্তার বললেন—কি, কেমন আছেন আজ সকালে?—মোটেই ভাল নয় ডাক্তারবাবু—বুক ভাঙা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে ভদ্রমহিলা বললেন—মুখের দাগগুলো ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে—না, তা হতেই পারে না—দৃঢ়গলায় ডাক্তার বললেন—কিচ্ছু হয়নি আপনার—তিনি ডাক্তারের খুব কাছে সরে এলেন। জড়িত গলায় ফিস ফিস করে বললেন—আরও দশটা নতুন দাগ দেখা যাচ্ছে ডাক্তারবাবু। ডান গালে তিনটি, চারটি বাঁ গালে আর তিনটি কপালে। ইস কী গভীর ক্ষতচিহ্ন ডাক্তারবাবু! কী ভয়ানক, কী কুৎসিত সেই দাগ! এখন এই মুখ আমি কাউকে দেখাতে পারবো না, কাউকে না, এমনকি আমার ছেলেকেও আমি এই মুখ দেখাতেপারবো না। এর চেয়ে আমার যে মরে যাওয়াও ভাল ছিল ডাক্তারবাবু! সারা জীবন এই বিশ্রী দাগগুলো আমার মুখে থাকবে? কাঁপতে কাঁপতে সে চেয়ারে বসে পড়ল। তার পরই আহত পশুর মত চিৎকার করে সে কী করুণ মর্মান্তিক কান্না! ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে বসে খুব শান্ত গলায় বললেন—শুনুন, আপনি মুখটা একটু খুলুন। আমি বলছি কিচ্ছু হয়নি আপনার। যদি দাগ উঠেই থাকে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে আমি সমস্ত দাগ অদৃশ্য করে দেবো। মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে ফেলুন—কিন্তু তিনি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়ে আপত্তি জানালেন। ডাক্তার তাঁর মুখের কাপড়টা জোর করে খোলার চেষ্টা করতেই তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরলেন কাপড়টা। ডাক্তার ভরসা দিয়ে আবার বললেন, শুনুন, আপনি তো জানেন এর আগেও কতবার আমি আপনার মুখের দাগগুলো

তুলে দিয়েছি। বলছি—এবারও ভাল করে দেখো। আপনি যদি আমাকে মুখ না দেখান, তাহলে কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না—আপনাকে মুখ দেখাতে তো আপত্তি ছিল না। দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গের ঐ ভদ্রলোকের সামনে কি করে আমি মুখের কাপড় সরাবো? এক মুখ হেসে ডাক্তার বললেন—উনিও ডাক্তার। আমার চেয়েও উনি আপনাকে বেশী যত্ন করবেন—

তিনি মুখের আবরণ সরিয়ে ফেললেন। ভয়ে দুঃখে অনুশোচনায়, অন্য লোকের দৃষ্টিপথে আসার লজ্জায় তাঁর মুখখানা একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে মাথাটা অনবরত ডাইনে বাঁয়ে নাড়াতে লাগলেন শুধু তাঁর মুখের দিকে আমাদের স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই বিড় বিড় করে বললেন—ইস্ কী ভয়ানক দেখাচ্ছে, না ডাক্তারবাবু? এ মুখ আপনাদের দেখাতে লজ্জায় দুঃখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে—তীব্র কৌতূহল নিয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম—তাঁর কপাল বেয়ে নীচে মুখখানার একটা ভাগ তো দূরের কথা, চল্লিশ বছর বয়স সেখানে একটা রেখা পর্যন্ত আঁকতে পারেনি। কোন ক্ষতচিহ্ন, কী একটা আঁচিল, কী একটা তিল পর্যন্ত নেই মুখের কোথাও। তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন—জানেন, ছেলের নার্সিং করতে গিয়েই এই ভয়ানক অসুখটা আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। আমি আমার হতভাগ্য ছেলেকে দিয়েছিলাম আমার সৌন্দর্য আর তার বদলে চিরকালের জন্য কুরূপা হয়ে গেলাম আমি। মায়ের কর্তব্য করেছি বলে শাস্তিই আমার পাওয়া উচিত, কিন্তু কেন যে প্রত্যেক দিনের প্রতিটি মুহূর্তে এত কষ্ট পাচ্ছি তা ভগবান জানেন—ডাক্তার তাঁর পকেট থেকে একটা ছবি আঁকার ব্রাশ বের করে বললেন—দেখি মুখখানা সমস্ত দাগ আমি নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি—তিনি ডাক্তারের দিকে প্রথম ডান গালটা বাড়িয়ে দিলেন। ডাক্তার ধীরে ধীরে তুলি বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেন তাঁর ঐ গালের পটভূমিতে কোন ছবি আঁকছেন তিনি। বাঁ গালে, কপালে অবিকল ঐ ভাবে নিপুণ শিল্পীর মত অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তুলি বুলিয়ে ডাক্তার কৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—দেখুন দেখুন—আর একটা দাগও নেই! একটা যদি বের করতে পারেন তবে আমার নাম বদলে দেবেন—তিনি সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটা নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজের মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। কুঁচকে উঠল তাঁর কপালের মাঝখানটা। ঠিকরে পড়া ছুটো চোখে আশঙ্কা ভরা দৃষ্টি নিয়ে তিনি অনেকক্ষণ মুখ দেখে একটা ভারী নিশ্বাস ফেলে বললেন,- না, একেবারে তো যায়নি। এখনও দু'একটা দেখা যাচ্ছে। তবে যা করেছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু ডাক্তার চেয়ার থেকে উঠলেন। তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমাকে নিয়ে বাইরে এসে দরজাটা আবার ভালো লাগিয়ে দিলেন। তাঁর চেম্বারে আসার পর ডাক্তার ভারী গলায় বললেন—এই বদ্ধ উন্মাদ ভদ্রমহিলার ইতিহাস জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, না? ডাক্তার বলতে সুরু করলেন—এঁর নাম ম্যাডাম হারমেট। ইনি এককালে প্যারিসের একজন সেরা সোসাইটি গার্ল ছিলেন। তাঁর মত সুন্দরী সচরাচর বড় দেখা যেত না। হারমেটের পুরুষ বন্ধুরা তাঁর রূপ যৌবনের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো। উচ্ছল প্রাণের আনন্দে মশগুল্ হয়ে তিনি পার্টি, ড্যান্স ডিনার নিয়ে দিন কাটাতেন। জানো, ম্যাডাম হারমেট ছিলেন সেই রকম রূপসী মেয়ে, যে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে যায়। স্নান ঘরের চৌবাচ্চার জলে নিজের ছায়া দেখে স্নান করতে ভুলে যায়। রূপ যৌবন এঁদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। জানো, সেই রূপই তাঁদের শেষ পর্যন্ত সাংঘাতিক সর্বনাশ করে। ম্যাডাম হারমেটের দিনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত প্রসাধন পরিচর্যায়।

মুখের কমনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ক্লান্তিহীন ছিল তাঁর প্রচেষ্টা। তাঁর নিটোল হাত দুটো, আঙুল, দাঁত —মোট কথা শরীরের যে অনাবৃত অংশগুলো তিনি তাঁর মুগ্ধ ভক্তদের সামনে মেলে ধরবেন, সেগুলোর যত্ন করতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিছুদিন পর তিনি বিধবা হলেন। একটিমাত্র পুত্র সন্তান ছিল তাঁর। আমাদের সমাজের অভিজাত বহুপ্রশংসিত মহিলাদের সন্তান যেমন করে লালিত পালিত হয়, ম্যাডাম হারমেটের ছেলেও তেমনি করে বড় হতে লাগল। আর যাই হোক, তিনি তাঁর ছেলেকে ভালবাসতেন। ছেলেটির সর্বাঙ্গে কৈশোরের দীপ্তি ঝকমক করতে লাগল; ওদিকে হারমেটের তন্বী-দেহে আসন্ন প্রৌঢ়ত্ব তার নিশানা দিয়ে দু'একটি রেখা আঁকল।

আমি জানি না, হয়তো হারমেটের জীবনে সেদিনই এসেছিল ভয়াবহ মুহূর্ত, যেদিন তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর যৌবন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। তারপর থেকে প্রত্যেকদিন সকালে উঠে তিনি আয়না নিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের মুখ দেখতেন। হয়তো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন, চোখের নীচে মুখের মসৃণ ঝক ঝকে চামড়ার উপর সরীসৃপের মত কালো লিকলিকে কোন রেখা পড়েছে কিনা, যে রেখাগুলো দিনে দিনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বার্ধক্য তার করাল ছায়া আঁকবে সর্বাঙ্গে—পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে রোধ করতে পারবে না। এই আতঙ্ক এই অসহ্য উদ্বেগের পীড়নে জ্বলে যেত তাঁর মাথার ভেতরটা। ছোট্ট ঐ রূপোর ফ্রেমে বাঁধা আয়নাটা তাঁকে শোনাতো ভাবী দুর্দিনের কাহিনী—যেদিন ফুলের পাঁপড়ির মত ঝরে যাবে তাঁর রূপ যৌবন, যেদিন ঝুলে পড়বে তাঁর গায়ের চামড়া, যেদিন কোটা ফুলের মত মুখখানায় বয়স তার কালো দংশন চিহ্ন এঁকে দেবে। সেই ভয়াবহ দিনের পদধ্বনি সর্বক্ষণ তাঁর কানে বাজতো। মাঝে মাঝে হয়তো তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ভগবানের বিরুদ্ধে নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠতেন—যৌবন যদি চলেই যাবে তবে মাত্র কয়েক বছরের জন্য কেন তিনি সারা শরীর চাপিয়ে যৌবনের ঢল নামান? কেন সমস্ত দেহে আভা আর সৌন্দর্য প্রখর করে জাগিয়ে রেন? আকুল কান্নায় দুচোখ ভাসিয়ে তিনি প্রার্থনা করতেন—ভগবান! আমার যৌবনটা তুমি চিরকাল রাখতে পারো না?—এমন একটা অসম্ভব প্রার্থনা হয়তো তিনি করতেন, যা ভগবান কাউকে কোনদিন মঞ্জুর করেন নি। হতাশ হয়ে অঝোরে কাঁদতেন তিনি। ম্যাডাম হারমেটের রুদ্ধঘরে প্রায়ই একটা বুকফাটা গুমরে গুমরে কান্নার শব্দ বাড়ীর লোকে শুনতে পেতো। তারপরেই এই ঘটনাটা হয়তো স্বাভাবিকভাবেই ঘটে গেল।

একদিন (তখন হারমেটের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর) তাঁর সেই পনেরো বছরের ছেলের জ্বর এল। ডাক্তার তার জ্বরের কোন লক্ষণ বুঝতে পারল না। সারাদিন মাষ্টার হারমেট জ্বরের যন্ত্রণায় ছটফট করতো। তাঁর গৃহশিক্ষক এ্যাবি প্রায় সব সময় তার বিছানার পাশে বসে থাকতো; পরম স্নেহে মাষ্টার হারমেটকে সেবা শুশ্রূষা করতো। আর তার সকালে একবার সন্ধ্যায় একবার এসে এ্যাবির কাছ থেকে ছেলের অসুখের খবর নিয়ে চলে যেতেন। সকালে লাল ঝলমলে সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে রোগীর ঘরে ওডিকোলন আর নানা ওষুধের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাসে দামী সেন্টের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে ম্যাডাম আসতেন ছেলেকে দেখতে। বিছানা থেকে সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—কি জর্জ, আজ কেমন আছ? দীর্ঘ বলিষ্ঠ সেই কিশোরের মুখখানা তখন জ্বরের তাপে লাল হয়ে উঠেছে। তবুও ক্লান্ত অবসন্ন গলায় সে বলত—আজ একটু ভাল আছি মা। ব্যস্ত চঞ্চল পায়ে তিনি ঘরের এদিকে সেদিকে ঘুরতেন হয়তো বা ওষুধভরা শিশিগুলো ঝাঁকিয়ে দেখতেন হারমেট। অকারণে বিরক্তির ভ্রূকুটি চিহ্ন ফুটে উঠত তাঁর মুখে। তারপর হঠাৎ বলতেন—এ্যাবি, ওঃ সংক্রামক একটা

চুল হয়ে গিয়েছে, নীচে একটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছি, বুঝলে, আমি যাই—বলেই ত্বরিত পায়ে ছুটে বেরিয়ে যেতেন ঘর থেকে। রাত্রে ম্যাডাম ছেলেকে দেখতে আসতেন সান্ধ্যপোষাক প'রে; ঘরের চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—এ্যাবি, ডাক্তার আজ কি বলেছে?

—তিনি এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেন না ম্যাডাম। এ্যাবির উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই তিনি সর্বাঙ্গে লাবণ্যের হিল্লোল তুলে চলে যেতেন ওপরে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় ছেলের খবর জানবার জন্য তিনি আসতেই রুদ্ধগলায় এ্যাবি বলল—ম্যাডাম, ডাক্তার বলেছেন আপনার ছেলের শুটি বসন্ত হয়েছে।

শুটি বসন্ত? তবে আতঙ্কে সারা বাড়ী কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠলেন ম্যাডাম। কাঁপতে কাঁপতে তার ঘরে গিয়ে সড়াম করে খিল বন্ধ করে দিলেন।

সকালে পরিচারিকা ম্যাডাম হারমেটের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল। রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন প্রকট হয়ে রয়েছে হারমেটের মুখে। চোখদুটোর শ্বেত জবাফুলের মত লাল টকটকে। বিছানায় বসে স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। পরিচারিকা জানালা খুলতে যেতেই ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন—জর্জ কেমন আছে তুমি জানো?

—আজও মোটেই ভাল নয় ম্যাডাম—

বাইরে বেলা বেড়ে উঠল। তবুও হারমেট বিছানা থেকে নামলেন না। এক কাপ চা'র সঙ্গে দুটো ডিম সেদ্ধ খেয়ে তিনি সেদিন 'লাঞ্চ' শেষ করলেন। যেন তাঁর নিজেরই কোন সংঘাতিক অসুখ করেছে। তারপর তিনি গেলেন সহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ওষুধের দোকানে। ডাক্তারের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ করে তিনি ছোঁয়াচে রোগের জীবাণুনাশক যাবতীয় ওষুধ কিনে নিয়ে রাত্রে ডিনারের সময়ের কিছু আগে বাড়ী ফিরলেন। শোবার ঘরে খিল এঁটে দিয়ে ডিস্-ইন্-ফেকট্যাণ্ট ওষুধে তাঁর সমস্ত পোষাক ভিজিয়ে নিলেন। ওদিকে খাওয়ার ঘরে এ্যাবি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। খাওয়ার ঘরে এ্যাবিকে দেখামাত্র ম্যাডাম অবরুদ্ধগলায় চীৎকার করে উঠল—কি, জর্জ কেমন আছে?

—ভাল নয় ম্যাডাম, ডাক্তারও খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। হারমেট কাঁদতে লাগলেন।

পরের দিন খুব ভোরে তিনি জর্জের খবর জানতে পাঠালেন। খবর এল—ভাল নয়। ম্যাডাম সারাদিন আর ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন না। অলভ 'ফারনেসে'র ধোঁয়ায় আর আগুনের তাপে শ্বাসরোধী হাওয়ায় ভরা ঘরে বসে সব সময় তিনি গুমরে গুমরে কাঁদতেন। (পরে তাঁর পরিচারিকা আমাদের কাছে এসব রিপোর্ট করেছিল) একটা সপ্তাহ ঠিক এইভাবে কেটে গেল।

এগারো দিনের দিন সকালে এ্যাবি তাঁর ঘরে এসে দাঁড়াল। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়েছে তার মুখে। ধরধরে গলায় সে বলল—ম্যাডাম, জর্জের অসুখ খুব বেশী হয়েছে, সে একবার আপনাকে দেখতে চায়। ম্যাডাম এক মুহূর্ত ফাঁকা চোখে এ্যাবির মুখের দিকে তাকিয়েই কান্না নাখা গলায় চীৎকার করে উঠলেন —না, না, আমি পারবো না। ওঘরে যাওয়ার সাহস আমার নেই—হা ভগবান, কি পাপ করেছিলাম আমি! এ্যাবি তুমি যাপ করো, আমি যেতে পারবো না। আবার অনুনয় করে এ্যাবি বলল—ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন ম্যাডাম। জর্জ আর বাঁচবে না, আপনার একবার যাওয়া উচিত,—বলেই এ্যাবি চলে গেল।

দু'ঘণ্টা পর। জর্জের শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। তার চোখের সামনে মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়েছিল বলেই হয়তো মাকে একটিবার অন্তত দেখার জন্য সে অধীর হয়ে উঠল। এ্যাবি আবার ছুটে গেল ম্যাডামের ঘরে। তখনও হারমেট ঘরের মেঝের হাঁটু ভেঙে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ধরে হু হু করে কাঁদছেন আর

অদ্ভুত অমানুষিক একটা গোঙানির মত শব্দ করে বলছেন—না না আমি পারবো না—জর্জের ঐ বীভৎস মুখ আমি দেখতে পারবো না……আমার বড্ড ভয় করছে……নিশ্চয়ই আমারও হবে ঐ কাল রোগ……এ্যাবি তাঁকে বুঝিয়ে বলল এবং শেষ পর্যন্ত জোর করে তাঁকে জর্জের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতেই ম্যাডাম দাঁতে দাঁত চেপে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সন্ধ্যার পরে ডাক্তার এলেন। তীব্র ভর্ৎসনা করে হারমেটকে বললেন, অত ভয় কিসের আপনার? জর্জ আপনার পেটের ছেলে—এসময় মৃত্যুভয়ও তুচ্ছ করে মুমূর্ষু ছেলের কাছে আপনার যাওয়া উচিত। চলুন আমার সঙ্গে। আমি নিজেও তো যাচ্ছি—বলেই তার হাত ধরে ডাক্তার সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন।

কিন্তু ম্যাডাম বাঁ'হাত দিয়ে দরজার একটা পাল্লা এমন করে চেপে ধরলেন যে, ডাক্তার তাঁকে কিছুতেই বাইরে নিয়ে আসতে পারলেন না। ডাক্তারের পায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে হারমেট বললেন—না না ডাক্তারবাবু, এই অনুরোধ আপনি করবেন না। আপনি যেয়ে জর্জকে বলুন—আমি তাকে ভালবাসি, খুব স্নেহ করি—কিন্তু ওঘরে যেতে ভয়ানক ভয় করছে ডাক্তারবাবু—আমাকে ক্ষমা করুন……

ওদিকে জর্জের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ঘরের জ্বালো আলোও মলিন হয়ে আসছে। সে তখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে পৃথিবীতে তার মেয়াদ মাত্র কয়েক ঘণ্টা। মৃত্যুপথযাত্রীর স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিতেই হয়তো জর্জ অনুমান করল—তার একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও কেন তার মা তাকে দেখতে আসছেন না। সে জড়িত গলায় বলল—মা বোধহয় আমার ঘরে আসতে ভয় পাচ্ছেন, না? তাঁকে আপনারা আবার অনুরোধ করে বলুন, তিনি যেন অন্ততঃ একেবার আমার জানালার সামনে এসে দাঁড়ান। দূর থেকে আমি তাঁর মুখখানা একবার দেখে যেতে চাই—চুমু তো খেতে পারবো না। ……ডাক্তার আর এ্যাবি ছুটে গিয়ে ম্যাডামকে জর্জের এই শেষ অনুরোধ জানালেন। ডাক্তার কর্কশ গলায় বললেন—চলুন, রোগের ছোঁয়াচ লাগার কোন ভয় নেই আপনার। আপনি ঘরের বাইরে বালকনিতে দাঁড়াবেন। জর্জ আর আপনার মাঝখানে জানালার পুরু কাঁচ থাকবে—ম্যাডাম যেতে রাজী হলেন। হাতে তিন তিনটে স্মেলিং সল্টের শিশি নিয়ে টিপে টিপে পা ফেলে তিনি বালকনির দিকে হাঁটতে লাগলেন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারে বারে তাকাচ্ছেন চারিদিকে, যেন এক্ষুণি শুটি বসন্তের অসংখ্য জীবাণু অসংখ্য মৃত্যুর অনুচর তাঁর ফুলের মত মুখখানায় ভর বসিয়ে দেবে। কিন্তু জর্জের জানালার আর একটু দূরে থাকতেই হঠাৎ চমকাতে মুখ ঢেকে চুকরে কেঁদে উঠলেন ম্যাডাম—জর্জের ঐ মুখ আমি দেখতে পারবো না ডাক্তারবাবু,—ভয়ে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—না আমি যেতে পারবো না ডাক্তারবাবু……কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন। ডাক্তার আর এ্যাবি তাঁকে ধরে কোনরকম করে জানালার সামনে দাঁড় করিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেও পারল না। তিক্ত-বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

ওদিকে মুমূর্ষু জর্জ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তার বড় বড় চোখদুটো জানালার বাইরে ছড়িয়ে অনেকক্ষণ সে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। কী আশ্চর্য, মৃত্যু এসে শুরু করে দিচ্ছে না তার জৎপিণ্ডের স্পন্দন। হয়তো তার রাজরাণীর মত রূপসী মায়ের সুন্দর মুখখানা শেষবারের মত দু'চোখ ভরে দেখার জন্যই মৃত্যুও অপেক্ষা করেছিল কিন্তু—

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করল জর্জ। প্রহরে প্রহরে রাত্রি গভীর হয়ে এল। হতাশ হয়ে মাথাটা বালিশে এলিয়ে দিল জর্জ। ভবিষ্যতে কোনদিন অনুরোধ করে তার সুন্দরী মাকে আতঙ্কগ্রস্ত করার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না।

শেষ হয়ে এল রাত্রি। সেদিন সকাল থেকেই ম্যাডাম হারমেট বদ্ধ উন্মাদ।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পুনরাবৃত্তি]

শিবশঙ্কর পিতৃব্যের কাছ থেকে সেই যে উঠে এসেছিল কালিন আর তাকে দেখা যায়নি। খুড়োর পরামর্শ সে যতই ঢাক না কেন ভেতরে ভেতরে কিন্তু নিজের কাজের তার বিরাম ছিল না। হাতের লোক-গুলোকে সে একবার খাটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে—সত্যিকারের এর মধ্যে কারা বা ক'জন আছে। দেশীর একার কি ক্ষমতা? তার কথায় যারা নাচ্‌ছে তাদের খাওয়া-পরার চিন্তাটা কি ঐ মেটাবে? বড় বাড় বেড়েছে মেটার। একদিন যার উঁচু থেকে খুঁচ ছিল

ন'কড়া, ছ'কড়া যে সব বাস্তু প্রজা আছে, যাদের কাছ থেকে কস্মিনকালে খাজনা আদায়ের কথা ঘোষ বংশের কেউ চিন্তা করেনি তাদের নামে বাকি খাজনার নালিশ দিতে শিবশঙ্কর কাগজপত্র তৈরী করলে। এক নম্বর সন্ন্যাসী বেরা, দিতা ৺তুলসী বেরা, দু'নম্বর অধর ছালদার দিতা ৺শঙ্কর ছালদার। গত বার বছর একটি পয়সাও ফেলেনি। অমন কত বার বছর যে উপুড় হস্ত করেনি তার ঠিক নেই। বছরে দু'চারবার বেপার খেটে ভাবে শুতেই উঙ্গল, গায়ে গায়ে শোধ। গ্রামের সেরা বাস্তুতে বেটারা বাস করছে—একজনের পাঁচ কাঠা সাত ছটাক, আর একজনের সাত কাঠা পাঁচ ছটাক—ডোবা আছে, ফলের গাছ আছে, বসবাস করুক! ও দুটোই আবার পালের সেরা! বধিয়ে দেখিয়ে 'জিন্দাবাদ' করে 'ইনকিলাপ' মারে—গাবটা কুড়ি মেরে সব নিয়ে নেবে। অধর আবার নালিশ করেছে—জমি কার যে খাজনা দেব, ছিল তো ঠাঁ! আমার বাপ-ঠাকুর্দা গন্তর খাটিয়ে না বাস্তু তৈরী করেছে—বাবুদের অমনি বললেই হ'লো! দিক আমার পূর্বপুরুষের মেহনতের!

গা জ্বালা করে না শুধু, রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে কথা শুনলে। জুতিয়ে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দিতে হয়।

শশধর লোকটা কোনদিন অমন কথা বলেনি, কত উপকৃত, বাধিত বোধ করতো মরবার আগে পর্যন্ত। কোনদিন হাতে করে ক'আনা পয়সার খাজনা জমিদার ঘরে পৌঁছে না দিলেও গায়ে গন্তরে, ফাই-ফরমাজে অমন অনেক ক'আনা পয়সা সে উশুল দিয়েছে, কোনদিন মনে হয়নি লোকটা ফাঁকি দিচ্ছে বা ফাঁকি দেবার মতলব আছে! সে মানুষগুলোই ছিল আলাদা, তাদের ব্যবহারও ছিল একরকম। আম গাছে আমড়া ফলেছে! শালাদের দেখে নিতে হবে।

বলে মাথা খোঁজবার জায়গা নেই নাচন-কুঁদন! এক তাড়া মারলে থাকবে কোথা তার নেই ঠিক।

অর্জুন মারিককে শুনিয়ে শুনিয়ে শিবশঙ্কর বললে, দেখলে তো কাগজপত্তর, বলো এবার কোন্ বাবা তাদের রক্ষে করে দেখা যাবে! এক এক করে' সব ক'টার টুঁটি চেপে ধরবো! সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, বুঝলে?

মারিক দাসানুদাস কণ্ঠে বললে, মরণ-বাড় বেড়েছে হতভাগারা! নালিশ করুন তবে শিক্ষা হবেন। অনেক বলেছি শোনেনি—সাপের পাঁচ পা দেখেছে সব।

শিবশঙ্কর ঔদার্য দেখিয়ে বললে, এখনো সময় আছে, এসে বলুক, যা হয়েছে হয়েছে আর কখনো হ'বে না, কাগজ পত্তর আমি নষ্ট করে ফেলবো—তাহাড়ি

করে দেব বাকি থাকবে না! তা নয়—

মারিক মনরাখা কথা বললে, পেয়েছিল আপনাদের তাই এখনো টিকে আছে, পড়তো একবার ঘোড়াঘাটার স্যানেদের পাল্লায়, মজা টের পেত! চাল কেটে করে বাস তুলে দিতো! ভালমানষের কাল নয়! জানি তো আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ। এখানে তো আমরা স্বস্থগে বাস করচি!

তাহ'লে বোঝ! সুখে থাকতে ভূতে কিলচ্ছে! আমাদের কহু, তোরাই মরবি শেষ পর্যন্ত! এখনি তো কিচ্ছু নেই, তোদের অত লাফানি-ঝাঁপানি কেন! জমি এমনি পেলে তাই তোরা চাষ করতে পারবি? লম্বা লম্বা কথা আছে! বেশীর কথা না ছয় বুঝলুম, কিন্তু তোরা? তোদের কি স্বত্ব? জমি চাই! বলে মুন কেনবার ক্ষমতা নেই পান্তা খাব···পুড়িয়ে খাবার তেল নেই···গলা টিপবো আর মারবো!

সায় দিয়ে মারিক মাথা নাড়লে, এখনি মারা উচিত! জাত ভাইদের সে আদৌ সমর্থন করে না। অন্যায় আব্দার সে দেখতে পারে না। বাবুদের চেয়ে তার বেশী গা জ্বালা করছে হতভাগাদের কাণ্ডকারখানা দেখে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করলে, কবে নালিশ দিবেন? আর দেরী নয়, দিয়ে দিন এইবেলা! রস গড়িয়ে আসবে।

জানা কথা। শিবশঙ্কর হাসলে। দিইনি কেবল একটা কথা ভেবে—

কথাটা কি? অর্জুন স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে পারে না। এমন কি গুরুতর কথা যার জন্যে পায়ের জুতো এখনো খিঠে পড়ছে না হতভাগাদের?

শিবশঙ্কর কাশিক চুপ করে থেকে বললে, দেখিনা কত বাড় বাড়তে পারে! কাগজপত্তর সব আমার তৈরী!

মারিক বললে, বলতে খালাদের আমি কসুর করিচি। গেরাজ্জিই করে না। বলে, কোটনা, বাবুদের পা-চাটা! একদিন তো মারামারি হ'তে হ'তে রয়ে গেল। ডাক্তারবাবু ছাড়িয়ে দিলেন নইলে ঐ শালা সন্নীসিটাকে একবার দেখে নিতুম! সেটার মাগ ছেলের ঠিক নেই, ফুটানী মারে—দস্তুরমত মারাচ্ছে!

শিবশঙ্কর বললে, বৌটা বুঝি এখনো ফেরেনি? ছেলেটা কার কাছে আছে? গ্রামে আরম্ভ হ'য়েচে বেশ।

আক্ষেপের সুরে মারিক বললে, আপনাদের শাসন নেই। কত লচ্ছার কাণ্ড হ'চ্ছে দেখতে পান না। শুধু কি বৌ-পালান, আর কত কি হচ্ছে!

শিবশঙ্কর বললে, সব জানি, দেখা যাক কত বাড়তে পারে সব!

মারিক ফোড়ন দেয়, বেটার একটুও কি তাই লজ্জা আছে—বেশীখুড়োই ওর মাথাটা খেয়েছেন। রতনে রতন চিনেছে! যেমন উনি তেমনি ও। মাগ বশে রাখতে পারে না শালা, আবার মানুষ!

শিবশঙ্কর বললে, বেটার চলে কি করে? রান্নাবাড়া করে কে?

কে আবার! খুড়োর ওখানে জুটেচে, এই তো মওকা। সুবাসি আছে, বাড়া ভাত পাচ্ছে বিনা পরিশ্রমে!

ছেলেটাকে কোথায় রেখেচে? ছোটলোকের কথা ছোট করে, শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

তাকে বোনের বাড়ী তুলে দিয়ে এসেছে হাঁড়ায়। এখনে তো নয়! বাউণ্ডুলেগিরি করবে না তো কি! ম্যাট্ হ'য়েচেন সন্নিসীবাবু হাঁক-ডাক ঐ করে।

আরো ছোট করে শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করে, ওর বউ-এর নাম যেন কি, বকুল? রাধানাথের সেই ছেলেটার সঙ্গেই তো—

অর্জুন সায় দিয়ে মাথা নাড়ে, মদনা! দুজনে একসময় গলায় গলায়—মদন মানে সন্নিসী, সন্নিসী মানে মদন! যা রোজগার করতুক ঐ সন্নিসীর হাঁড়িতে তুলে দিতুক—ইদিকে বাপ-মা ছেঁড়া-টেনারি এর জোর তার জোর করে বেড়াত! তখনি জানি এ পিরিতের রকমটা কি! জল গড়াতে আর দেরী নেই। শালা

নিজের মতলবে।

নচ্ছার কাঁহাকার!

শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস ক'রলে, মদন এখন কোথায়?

কোথায় আবার চুলোয়! শুনচি বদরতলাতে শালা বাইশমনি কাজ করে। মাগীটাও চটকলে রোজগার করে।

শিবশঙ্কর বল্লে, তাহ'লে ভালই আছে বল? দু'জনের রোজগার, সুখের সময়।

অর্জুন বল্লে, সাধে আর কলি বলেচেন, এই তারে—যে যত বেইমান, যে যত নষ্ট তার তত সুখ। আর দেখুন না আমাদের দুঃখে-দুঃখে জীবন সারা—কি না সংপথে থাকি! ভাল বই মন্দ চিন্তা করি না কারো। এ শালার কালের দোষ!

শিবশঙ্কর চুপ ক'রে রইলো খানিক। লোকগুলের বিচার চট্‌ করে সে করতে পারে না—অত আর সহজও নয় বোধ হয়। মুখের ওপর কিছু বলাটা কেমন যেন! সব উল্টেপাল্টে যাচ্ছে!

অর্জুন বল্লে, বড়বাবুকে বলেছিলুম একটা বিচার করুন, শিক্ষা দিন, শালার নচ্ছারগিরি ছাড়িয়ে দিন—ধরে একজনের নাক আর একজনের কান কেটে দিন, সারেস্তা হোক! তা শুনলেন না। এমন দেখুন চোরপুটিখানা!

শুনে শিবশঙ্কর মনে মনে হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। আর তাদের গ্রাম শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একদিন ছিল, আজ নেই—হঠাৎ কখন সে ক্ষমতা তাদের হাত পিছলে গেছে নিজেরা টেরও পায়নি। ঘুন ভেঙে অকারণে শরীর অসুস্থ বোধ করার মত।

এই তো সেদিনের কথা—মনে হয়, সবে গত কাল ঘটে গেছে—ঐ মদনের ঠাকুরদাকে নিয়ে ব্যাপারটা। ঐ বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে যেখানে শিবশঙ্করদের বার বাড়ি ছিল—লোকে বলতো কাঁড়ি ঘর, কাছারী বাড়ি—গ্রামের ছুরি-চামারী, কলহ-মারামারি, বিবাদ-বিসম্বাদ সব কিছুর বিচার হতো! বাবুরা যা বিচার করতেন তাই, একটুও নড়চড় হবার উপায় ছিল না, মুখ বুজে মেনে নিতে হতো! লঘু গুরু পরের কথা।

কোথাও কিছু নেই, একদিন সকালে মদনের ঠাকুরদা লক্ষ্মণ দাসকে বাবুদের পাইক গিয়ে ধরে নিয়ে এলো। কাঁড়ি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই মেজবাবু দুর্গাশঙ্কর পায়ের চটি খুলে লক্ষ্মণের পিঠে দু'ঘা কষিয়ে দিলেন—প্রহার করে মেজবাবু এতই উত্তেজনা বোধ করেছিলেন যে, তাঁর পরণের কাপড় বেসামাল হবার উপক্রম হ'য়ে পড়েছিল। লক্ষ্মণ দাসের নগ্ন ঘর্মাক্ত পিঠে জুতোর দাগ তখন স্পষ্ট।

ক্রমে লক্ষ্মণের অপরাধের বিবরণ জানা গেল।

তখন সবে শিবশঙ্করের বিয়ে হ'য়েছে। খিড়কির ঘাটে নববধূ বোধহয় একটি সর্বাধুনিক ফ্যাসানের গাত্রাবাস ফেলে এসেছিল। লক্ষ্মণ দাসের পুত্রবধূ মদনের মা সেটাকে কোন সময় তুলে এনে লোভ পরবশ বাঁশের খাঁচার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। অবশ্য শিবশঙ্করের নববধূ নিজে থেকে সে গাত্রাবাসের সন্ধান করেননি। তাঁর অনেক ছিল, তার মধ্যে একটি হারিয়ে গেলে বা খোয়া গেলে আঁতিপাঁতি সন্ধান করবার মত, অবস্থা তখন তাঁর না পিতৃকুলের না, শ্বশুর কুলের। গেছে গেছে, কে খোঁজ করছে! কিন্তু না, হারান গাত্রাবাসের সন্ধান একদিন আপনা থেকে নববধূর কানে এসে পৌঁছেছিল। তিনি বললেন, যা-জনদের তাঁরা বললেন বাড়ির কর্তাদের। বর্ষাসময়ে লক্ষ্মণ দাসের বাড়ি খানা তল্লাসী করা হ'লো। গাত্রাবাসটির তখন অনেকখানি উঁই-এ নষ্ট করে ফেলেছে—মদনের মা সিক্ত গাত্রাবাসটিই তাড়াতাড়িতে বাঁশের খাঁচায় তুলে রেখেছিল! লক্ষ্মণ দাস চোর সাব্যস্ত হ'লো।

সুতরাং—বিচারে লক্ষ্মণ দাসের দু'ঘা জুতো এবং একটি কালো পাঁঠা জরিমানা হ'লো। আর চোরের যে সন্ধান দিয়েছিল তার বকশিশ্ এক টাকা, লক্ষ্মণ দাসের কাছ থেকে আদায় করে দেওয়া হ'লো!

তারপর সে রাত্রে জরিমানার পাঁঠাটা নিজে হাতে কেটে ছাড়িয়ে বাবুদের কাঁড়ি-ঘরে 'ফিরির' উদ্যোগ আয়োজন

করছিল লক্ষণ দাস নিজেই, পাঁচ বছরের মদনও সঙ্গে এসেছিল দাদুর সঙ্গে বাবুদের প্রসাদ পেয়ে মাতৃ-দোষ স্খালন করতে। আর সেই রাত্রে মদনের মা কিনা কারণে ঢেঁকি শালে গলায় দড়ি দেয়। আশ্চর্য, সামান্য একটা গাত্রদাহ নিয়ে যতটা হৈ-চৈ সেদিন গ্রামে হ'য়েছিল তার সিকিও বোধহয় হয়নি বৌটা গলায় দড়ি দিতে। সেদিন কেউ বলতে সাহস করেনি যে, বাবুদের বিচারে স্বামী-শ্বশুরের অপমানে লজ্জায় ধিক্কারে মদনের মা আত্মঘাতী হয়েছে। লক্ষণ দাসও কোন ক্ষোভ রাখেনি পিঠে অকারণে জুতোর দাগে! তারপর ডাকলে হাঁকলে কতবার অম্লান বদনে অকাতরে সে, তার ছেলে বাবুদের বাড়ি ফাই-ফরমাস খেটে গেছে। ভগবানের মারের ওপর যেমন মানুষের আক্ষেপ নেই, ক্ষোভও নেই, ক্রোধ নেই, অভিযোগ নেই, এও যেন তাই—বাবুরা যা করেন, যতই গালমন্দ শাস্তি-সাজা দেন,তার জন্যে কোন দুঃখ নেই, কোন প্রতিবাদ নেই—মনিব, প্রভু, ভূস্বামী, দেবতা!

সে ভগবানের দিন বোধহয় চলে গেছে। সে মানুষ-জন আর নেই, বড়র ছোটোর ভেদ ঘুচেছে। মুখ-বোজা কাল শেষ হ'য়েছে। মদনকে ধরে এনে বাবুরা আজ কি করতে পারেন? মার-ধোর? শাস্তি-সাজা? কিচ্ছু না। চারগুণ ঝামেলা তাদের পোহাতে হ'বে, মারের বদলে এখনো মার উদ্যত না হ'লেও মারের বাড়া করে এরা হয়তো ছাড়বে। সাধে কাকা চুপ করে ছিলেন! যা পারে ওরা করুক—তাঁদের খাজনার সঙ্গে সম্পর্ক!

তাছাড়া ঘরের শত্রু বিভীষণ রয়েছে! চাষাভুষোকে মান-মর্যাদা, অধিকার-ফবিকার শিখিয়েছেন! মুখর হয়েছে! এখন যে কাণ্ড বাধিয়েছে তার রক্ষা হ'লে হয়!

শিবশঙ্কর বললে, বকুলটাকে তুই কোন রকমে এই সময় গ্রামে আনতে পারিস চেষ্টাচরিত্তির করে' তো বুঝি।

অর্জুন বাবুর মুখের দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে চোখ নামিয়ে মাথা চুলকে বললে, সে মাগী আরো চালাক! নষ্ট মেয়েমানুষ কম বুদ্ধি ধরে ভেবেছেন? মদনকে সে সাতবার চরিয়ে আনতে পারে! কিন্তু কেন বলুন তো?

শিবশঙ্কর বললে, পারবি না যখন, তোর শুনে কাজ নেই! সন্ন্যেসী তাহ'লে এখন বেশ্যার দিকে পিঠ দিয়েছে! পিঠ দেওয়াবো বেটাকে, ঐ মদনকে মুকোবালা বিবাদী করে বাকি খাজনার মালিশ দেব। বুঝবে তখন!

অর্জুন বললে, খুড়ো যেমন, ওদের নিয়ে নাচছে! ঘরে সোমত্ত মেয়ে রেখেচে খেয়াল নেই! কোন্‌দিন ফস্ করে' কি হ'য়ে যাবে বুঝবেন তখন! কি বুদ্ধি, যত সত ভূত নিয়ে কারবার!

শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, কেন, বেশ্যার মেয়ে শ্বশুর ঘর করে না?

অর্জুন বললে, সে দিকে কাঁটা দেওয়া, রাখাল পাড়ুই বৌ তুলে নিয়ে গেছে অনেককাল! বড় ঘরে বড় কথা শুনতে পাই।

কি! শিবশঙ্কর নিজে থেকে যেমন যেন অপ্রস্তুতবোধ করে ছোটলোকের কথায় কৌতূহল প্রকাশ করে'।

তবু অর্জুন বলে, শুনি সবাই বলে মেয়েটার স্বভাবচরিত্তির নাকি ভাল নয়। অমন বিদ্বান স্বামী তাই নাকি মনে ধরে না মেয়ের। তাছাড়া খুড়োরও তো নামে গোলমাল আছে···এদিক-ওদিক ওরা শুনেছে। মেয়ে নেবে কেন! ঘরের বউ যা তা কথা! চণ্ডীমেউল-এর পাড়ুইরা যে-সে লোক!

কৌতূহল অদমনীয়, শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, খুড়োর নামে কি আছে? রাখাল পাড়ুই কি শুনেছে?

কেন, যশোদাকে নিয়ে খুড়ো ঘর করেনি! একটা গর্ভও নষ্ট হয়নি! কর্তাবাবু চেপে দেননি ব্যাপারটা? বোধহয় চার পাঁচ সন আগে হ'বে, কার পয়সায় গাঁয়ে সেদিন মোচ্ছব হ'য়েছিল? দু'রাত্তির যাত্রা দিলে কে? এই যেগী খুড়ো! এখন 'নিডারী' মারাচ্ছেন! সবার পোঁদে ও! বললে কিছু থাকে না।

শিবশঙ্কর আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। অমন কথা

খাবার ঘরে ঘরে, কিছু লাভ নেই, কোন লাভ হ'বে না ওতে। বেশী নিজের ঘরে যা খুসী করুক আজ কিছু বলবার নেই তাদের—বললেও মুখ থাকবে না। এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দেওয়া। কেচ্ছা করবার পাঁচ কান, পাঁচ মাথা আজ তাদের বাইরে তাঁবের চলে গেছে। নিজের বৈঠকখানায় আর ক কান আছে!

অর্জুন কি ভাবলে কে জানে, খানিক এদিক ওদিক চেয়ে বললে, পাণ্ডুই মহাশয়কে একবার সেরাবে আনতে পারেন এই সময়, হাতে হাড়ি ভেঙে দিই! ভোঁতা মুখ ভোঁতা!

হঠাৎ কথাটা মনে লাগে যেন, সরল, অজ্ঞ হ'লেও কথাটা নেহাৎ খারাপ বলেনি অর্জুন!

এ সময় ঐ নিয়ে একটা হট্টচট্টো বাধিয়ে দিলে মন্দ হ'বে না। আরে দেখ্ দেখ্ কার কথায় তোরা নাচিস্! কে তোদের লীডার! আরে রান, ছ্যা ছ্যা!

যশদা আজ নেই, থাকলে হাতে হাতে প্রমাণ দেওয়া যেত। সবার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বেণী মণ্ডলের নীতি-কলাপ প্রকাশ করা যেত। সঙ্গে সুবাসিনীর কথাটাও পাণ্ডুইকে দিয়ে চাক পিটিয়ে দেওয়া যেত!

গম্ভীর স্বরে শিবশঙ্কর বললে, পারবি তুই সকলকে বলে' বেড়াতে তোদের ঐ মাতব্বর বেণী-যশদার সঙ্গে নষ্টটি করেছিল আর সুবাসিনী ডুবে ডুবে জল খায় এখনো! কি রে পারবি!

অর্জুন শিউরে ওঠে, যেন সত্যি কাজটা ক'রে ফেলে সে ভয়ানক একটা প্রতিফলের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার কানে গরম সীসে গলিয়ে কে যেন ঢেলে দিয়েছে—ভোঁ ভোঁ করছে সব!

অর্জুন আবোল তাবোল আঁ-আঁ করতে শিবশঙ্কর ধমকে উঠলো, যাক, তোকে আর পারতে হ'বে না! বেটাছেলে পিরীত করতে এসেছেন, যা যা তোকে শুদ্ধ ডোলাব—খাজনা দিয়ে কথা বলবি! সব বেটাকে বুঝি, ভিজে বেড়াল সেজে আছে!

বশংবদ অর্জুন মাথা হেঁট করে ঘাড় চুলকোয়। মুখে অস্ফুট বলে, এঁজ্ঞে, এঁ এঁ মানে—

শিবশঙ্কর জোরে চেঁচিয়ে উঠলো আর এক ধমক দিয়ে, ফের আজ্ঞে, হারামজাদা, ছুঁচো! খাজনা দিয়ে তবে কথা বলবি!—জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব পাজী কোথাকার! ফেল্ খাজনা—

আশ্চর্য, বাবুর এত তম্বিতে আজ একটুও ভয় করছে না অর্জুন মাঝিক! যেমন ছিল তেমনি বসে মাথা-পিঠ চুলকতে লাগল। কে জানে আর পাঁচ-জনের মত সে বুঝেছে বিনা বাবুদের গর্জনই সার! মার অত সহজ নয় বিনা কারণে!

খানিকক্ষণ পরে অর্জুন বললে, আমি একা বলবো কি করে? আপনারা পেছনে না থাকলে ওরা মেরে আমার পিঠের ছাল গুড়িয়ে দেবে! নিদেন পাণ্ডুই মশাই যদি থাকেন, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তবে রে শালা! তক্তাপোষের ওপর থেকে একরকম গড়িয়ে এসে শিবশঙ্কর ধাঁ করে অর্জুনের পিঠের চালায় এক ঘা লাথি মারলে, বত বড় মুখ না, তত বড় কথা!... ওর কোটনামিতে আমরা থাকবো! ছোটলোকের ছোট কথায় সাক্ষী দেব। বেটার স্পর্ধা দেখ!

অর্জুন এতটুকু শব্দ করলে না—এতটুকু কাতরোক্তি না। পিঠটা কুঁজো করেই উঠে দাঁড়লে, নত মস্তকটা উন্নত করে অদ্ভুত দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আপনার কথা ওদের বলবো! দয়া করে আমাকে রেহাই দিবেন এ সনটা··· নাড়িটা বড্ড নেগেচে:

যাবার সময় করজোড়ে বুঝি একটা নমস্কারও করেছিল অর্জুন মাঝিক।

অনেকক্ষণ চুপ করে' বসেছিল শিবশঙ্কর। অর্জুনের কথার মর্ম বোধসম্য হ'তে বুঝি তার দেরী হয়েছিল। পড়ে' মার খেল আবার কেমন কথা বলে গেল বজ্জাৎ! কে বলবে বেটা অজ্ঞ চাষা, দল-ছাড়া আক্-

কাটা মুখ্যু! নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না!

বেটা মিনমিনে, সবার চেয়ে পাজী, সবার চেয়ে শয়তান!

আলোটা উস্‌কে দিয়ে খোকার কাগজগুলো ধরে ধরে সাজাতে লাগল শিবশঙ্কর। বাতাস পেলে যেতে যেন উড়ন্ত কাগজ সংগ্রহ করছে। পাট্টা দেখে লাগ নম্বর, উত্তর সীমানা মিলিয়ে দেখ্‌ছে: মৌজা রসুলপুর, জে: এল নং ৪৫, খতিয়ান নং ৩৩৪ দাগ নং ২৮, জমির রকম: বাস্তু। পরস্পর অংশ: ।০/।৶০, ।২।/০, /২॥০ খাজনা: /১ পাই, ৫১৯, ৫৩০, অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার: রায়তি, দৌলত খাঁ, আওলাৎ খাঁ, সিং নাজীর খাঁ—আতুলী বিবি জওজে নাজীর খাঁ, সাং রসুলপুর!

না, কাউকে ছাড়ান-ছিড়েন না, সব বেটার নালিশ ঠুকে দিতে হবে, যাক এক কড়া আদায় করতে পাঁচ কড়া বেরিয়ে! তবু বেটারা কোর্টঘর করুক, ছুটোছুটি করে' মরুক—বুঝুক বাবুদের সঙ্গে বিবাদ ক'রলে লাভটা কি হয়! ওকালৎনামা দিয়ে জবাব লিখ্‌তে ঘটি বাটি বাঁধা দিক, ঠেলা সাম্‌লাক!

অনেকক্ষণ থেকে একটা পোকা ডিগবাজী খেয়ে খেয়ে আলোটার ওপর পড়ছে, আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্যে যেন প্রতিজ্ঞা করে' এসেছে পতঙ্গটা!

কি খেয়াল হ'লো শিবশঙ্করের চট্ করে' হাতের চেটোয় পোকাটাকে চেপে ধরে মুটো করে' আলোর চিমনী তুলে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁক্ পোড়া দুর্গন্ধ একটা গন্ধ বেরল, চিড়িক করে' একটা শব্দও হ'লো।

শিবশঙ্কর চেয়ে দেখ্‌লে আলোর চিমনীটা ফেটে গেছে। ইস্‌স্ শুধু শুধু কীট পতঙ্গটার জন্যে অমন দামী চিম্‌নীটাই ভেঙে গেল, ক্ষতি হ'লো! কি গ্রহ!

আলোটা আবার দপ্ দপ্ করছে, নিভবে নাকি! শিবশঙ্কর হাত বাড়িয়ে আরো খানিকটা পলতে উস্‌কে দিলে। ফাটা চিমনীতে খানিকটা ঝুলো পড়ে গেল। আবছা অন্ধকার ছম্ ছম্ করছে ঘরময়!

শিবশঙ্কর চোখ বুজিয়ে বসে রইল, কেন জানি না তার অকারণে ভয় করতে লাগল। মানসচক্ষে সে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারে অনুরণন নদুয়া প্রবাহ অবারিত গতিতে লাঠি-সোঁটা হাতে তাদের ঐ বিস্তীর্ণ খামারের ওপর এসে জড় হ'য়ে হুঙ্কারে জয়োল্লাসে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিচ্ছে—পাশাপাশি ক্ষীণ করুণ আর্তনাদ একটা গুমরে গুমরে কোথা যেন ভেসে আসছে। সে কি ঘোষবাবুদের অন্দর মহল থেকে? অসহায় অন্তঃপুরিকারা ভর্তাজনদের ওপর সমস্ত আস্থা, নির্ভয়তা হারিয়েছে?

চোখ খুলতে শিবশঙ্কর দেখলে আলোটা লাউ লাউ করে' জ্বলছে, চিমনীটা শতধা বিদীর্ণ!

শিবশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল, রামধারি! রামধারি!

কেউ সাড়া দিলে না। ঠিক সেই সময় একটা ইতর পেঁচা খচ্ খচ্ করে' উঠলো ইঁদুর ধরার উল্লাসে। ত্রয়োদশীর বাঁকা চাঁদ মরা মুখে হাসির মত কাগেতি-হাসিক তেঁতুল গাছটার ডালে আটকা পড়েছে।

রাত অনেক হ'য়েছে, এতক্ষণে সব বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, আশপাশে সাড়া শব্দ নেই। আদায়কারী পাইক ধারে কাছে নেই, ছাপরা জিলার কোনো গাঁয়ে পৌঁছেচে বোধ হয়। গোলবাড়ির শেষ কটা গোলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

কাগজপত্তর বেঁধে-ছেঁদে শিবশঙ্কর উঠে পড়ল, আর দেরী নয় একটা হেস্তনস্ত এর মধ্যে করে ফেলতে হ'বে। রসুলপুরে বেইমান আর রাখবে না। তার পূর্বপুরুষের কীর্তি বজায় রাখবে—মাটির মালিকানা স্বত্ব তারা কিছুতে ছাড়বে না। মাটি ধরে একদিন উঠে আজ যারা মাটিকে খোলাম কুচির দরে কিনতে চাইছে ঐ মাটিতে তাদের মুখ রগড়ে ধরতে হ'বে! পৃথিবীর সমস্ত মাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ ক'রতে হ'বে! সাত পুরুষের মাটি তাদের আরো সত্তর পুরুষ তারা দখলিকার! প্রজাদের এ বিদ্রোহ যেমন করে পারে তাদের ঠেকাতেই

হ'বে! কালাচাঁদ, গোরাচাঁদ, হরচাঁদ জগমোহন, ভুবন মোহন, শম্ভু চরণ, নবীন চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ আরো কত নাম মনে আসছে না শিবশঙ্করের! কি মনে করবেন তাঁদের স্বর্গত আত্মা! ভীরু কাপুরুষ কালচাঁদের বংশধরেরা!

দক্ষিণের দেওয়ালের কাছে সরে এসে ঘাড় কাৎ করে' ফ্রেমে বাঁধান কুল পঞ্জীটা নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল শিবশঙ্কর। তাদের পর্যন্ত নাম আছে ছাপান, আর নেই! লিখবো লিখবো করে' আর লেখা হয়নি—সবাইকে এক সঙ্গে মনে পড়ে না, কার কি নাম গুলিয়ে গেছে বার বার! একালের নাম আবার সব মনে থাকে না! ধনভাণ্ডার যত শূন্য হয়ে পড়ছে দিনে দিনে নামের ঘটাও তত বাড়ছে! কানা ছেলের নাম আজ কাল পদ্মলোচন রাখা হ'চ্ছে!

বোধ হয় হাসতে চেয়েছিল শিবশঙ্কর কুল পঞ্জীটা থেকে চোখ সরিয়ে বড় ভাইএর পাঁচ ছেলের নাম মনে করে: মৃণাল, কুনাল, অসিত, প্রদীপ, প্রভৃতি না কি প্রভৃতি।

হাসি মিলতে শিবশঙ্কর দেখলে দোর গোড়ায় চুনীলাল দাঁড়িয়ে, কি বলবার জন্যে ইতস্তত করছে।

কি খবর চুনী, এত রাত্রে কি মনে করে? তক্তাপোষ থেকে নেমে শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করলে।

অস্ফুটে চুনী বললে; কর্তাবাবু আপনাকে একবার এক্ষুণি ডাকচেন।

কাকা এখনো শুতে যাননি? ফিরলেন কখন? বুড়ো লোকটার জন্যে হঠাৎ এতটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল না শিবশঙ্করের, তবু কেমন যেন বেরিয়ে পড়ে।

চুনী উত্তর দিলে না। বাইরে দোরের আড়ালে অন্ধকারে সরে গেল।

আজ কাকা এখনো ঘুমোননি তার মত? শিবশঙ্কর ভাবলে।

[ক্রমশঃ]

বৈশাখী

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়

না নেয়ে আমায় ডেকোনা, এখন ডেকোনা, তোমার
কণ্ঠে লজ্জা ভীরু বাধীর;
দ্বিধা-থরোথরো পলাশের ছবি এঁকোনা! তোমার
বাসন্তিকার স্বপ্নের হার এই রাত্রির
সেতারের তারে যে-সুর শোনায়, যে-গানে উতল
মনের স্বর্গা—প্রাণের বন্যা ছায়া-টলোমল,
সে-ছায়া আমার সে-গান আমার সে-সুর নূপুর
চৈত্র শেষের নিরন্ন মেঘে সূর্যের সুর,—
মুক্ত হাওয়ার মুক্তো ছড়ানো ঝিনুকের সুখ!

কাল বৈশাখী ঝড়ের আলাপে এই উৎসুক
হৃদয়ের সব দুয়ার খুলেছি কবে-যে, কখন
প্রদীপের শিখা! দৃপ্ত সে-সুর আমাকে শোনাক
নতুন শপথ: না নেয়ে আমাকে ডেকোনা! তোমার
সেই ভীরু গানে এখানে আবার
ডেকোনা ডেকোনা—
পলাশের করা স্বপ্নের সাথ এ হৃদয়ে তুমি এঁকোনা এঁকোনা!
বাসনা আমার বসন্তে ম্লান, বাসন্তী, তাই
হৃদয়ের সুরে যে-গান আলাই
সে-যে বৈশাখ!!

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

[দিক্‌দর্শক]

সেই গল্পটা মনে পড়ছে : রজ্জু সর্পে রূপান্তরিত হ'লো, সর্প রূপে, রূপ ব্যাঘ্রে, ব্যাঘ্র আর যেন সব কিসে। এক এক করে অনেকগুলি জীব আর প্রাণী সংহার করলেন সেই রজ্জুরূপী নিয়তি। তারপর বিমূঢ় ব্রাহ্মণ জানতে চাইলে, তার প্রাণ সংশয় হ'বে কিরূপে! অনেক অনুনয়, বিনয়, কাকুতী মিনতির পর নিয়তি বললেন, কুম্ভীরের করাল দ্রংষ্ট্রায়! অতঃপর বহু চেষ্টায় বেচারা ব্রাহ্মণ কুমীরের দ্রংষ্ট্রাঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। নিয়তি : কেন বাধ্যতে! 'দুর্বলতার স্বর্গটুকু' বোধহয় এই।

অমন একখানা বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এ হেন দৈব কাহিনীটুকু জুড়ে দেওয়ার কি মানে হয় বুঝতে পারি না, তবে আজকের দিনে বিধুভূষণ, শশীভূষণদের মনোভাবের সঙ্গে ঐ কাহিনীর আশ্চর্য মিল আছে। শুধু বিশ্বাস নয় দৈবের উপর এমন একান্ত নির্ভরতা বোধকরি আমাদের চরিত্রে আর কখনো দেখা যায়নি।

সপ্তাহের প্রথম প্রত্যুষে ঘুম ভাঙলেই সর্বাগ্রে যে কথাটি মনে পড়ে তা কোন কর্তব্য কাজ নয়, আপন জন্মরাশির সাপ্তাহিক ফল, জাতক পক্ষে ভবিষ্যৎবাণী! জন্মে যাদের রাশি লগ্ন জানা নেই, তারা অবিলম্বে জ্যোতিষীকে দিয়ে রাশি-চক্র তৈরী করে নেন। ভাবটা, আর ভাবনা নেই।

কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের কারো ভাগ্য কোন ইতর বিশেষ হ'য়েছে বলে আমার জানা নেই। বরং ভাগ্যকে আমরা দিন দিন অবনতির প্রত্যন্ত পথে ঠেলে দিচ্ছি। খোবুরে কাগজের ভবিষ্যদ্বক্তাদের লিপি পটে আপন ভাগ্যকে যতই বিড়ম্বিত দেখছি ততই নিজেদের নৈতিক সামাজিক চরিত্রকে খর্ব করছি। আমাদের চরিত্রে আজ নানা দোষ কর্কট রোগের মত সংক্রামিত হচ্ছে। বিশ্বাসের স্থৈর্য হারিয়েছি, হারিয়েছি নিজ কর্মের প্রতি অনুরাগ। পরছিদ্রান্বেষী, চটুলতায় আর কৃপমণ্ডূকতায় সাক্ষাই গাইছি নিজ নিজ অপদার্থতার।

ধরুন, আপনার যে রাশিতে জন্ম তাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ সপ্তাহে আপনার প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু সপ্তাহ শেষে দেখলেন, ফল ফলেছে উল্টো : সারা সপ্তা ধার দেনা করে আপনাকে প্রচুর ঋণ গ্রস্ত হ'তে হয়েছে। তখন আপনার করনীয় কি? খবরের কাগজখানা উনুনে ধরবেন, না, সম্পাদককে গালি গালাজ করে' চিঠি লিখবেন? আমি বলতে পারি, আপনি ওসবের কিছুই করবেন না। পক্ষান্তরে বলবেন, দোষ দৈবজ্ঞের নয়, দোষ গা তা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর; কেননা, আপনি ব্যবসায়ী হ'লে বলবেন, অমুকের জন্য কাজটা হ'লো না—বেটা কোটেশন দিয়েছে সস্তা ছাড়া! তা না হ'লে যদি চাকুরে হন, বলবেন, ঘুষের সব টাকাটাই এবার ভাগাভাগির আগেই মুরারী মেরে দিয়েছে। আর তা নয় তো যদি চাকরির উমেদার হ'ন বলবেন, যিনি আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, ওঁর নিজের লোক আছে। সব আই-ওয়াশ'!...

এ নিয়ে তর্ক উঠবে, সাধারণ মানুষের সান্ত্বনা যদি ঐটুকুতে থাকে তাতে আপত্তির কি আছে? ভবিষ্যতের কি উজ্জ্বল চিত্র আজ আমরা তাদের সামনে তুলে ধরছি যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর অত আক্রোশ! শাসনে, শোষণে, নারণঅস্ত্রের সর্বনাশক ধ্বংসের হুমকীতে যে ভাবে সাধারণ মানুষ পিছ-মোড়া তাতে শান্তির পথে সে যদি এটুকুতে ভুলে থাকে তাতে লাভ বই লোকসান কি? মাঠে-ঘাটে ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া নিয়ে যদি গবেষণা অবাধে চলতে পারে তা'হলে গচ্ছলিকা-প্রবাহ-এই-মনুষ্য সম্বন্ধে কেন ভবিষ্যদ্বাণীর

বলবার কিছু নেই, এ এক নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। কিছু একটা হ'তে পারি, কিছু একটা করতে পারি, এ বিশ্বাস নেই বলে রাশিচক্রের সাপ্তাহিক ঘূর্ণাবর্তে চোখ রেখে পুরুষকারকে ঝাঁকি ঠেরে বলি, হে ভবিতব্য, তুমি আমাকে তোমার শ্রেষ্ঠ বর দাও। অর্থ, পদ, মান, যশের অধিকারী কর

'এ সপ্তাহে কেমন যাবে' দ্রষ্টব্য, যে কোন বাংলা সংবাদপত্রে পঠিতব্য • • •

যদি বলা যায় অশ্লীল বই আমাদের রুচিকে বিকৃত করে বলেই তা অপাঠ্য, তা হ'লে একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় সপ্তাহে বা মাসে বা বছরে সমষ্টি মানুষের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বক্তাদের সকল ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্তিবর্গের তথা পুরুষত্বের অপমান, সবৈব অশ্রাব্য। আইনের সাহায্যে অশ্লীল পুস্তকের প্রচার যেমন বন্ধ করা হ'য়েছে তেমনি এই জাতীয় ভবিষ্যদ্বক্তাদের অচিরে কণ্ঠরোধ করা উচিত। পাঠক চায় বলেই সপ্তাহ-মাসের লাক্ষিক বৈশিক ফল চকে দিয়ে খবরের কাগজের সংবাদ বাড়ানর কারসাজি কোন মতেই উচিত নয়। যদি এমনি চলতে থাকে তা'হলে জাতটা যে অচিরে ক্লীব, 'মনস্তবিষ্য' হ'য়ে পড়বে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র নেই। জ্ঞানের নামে একি অজ্ঞান, অন্ধকার আমরা আজ সাধারণ্যে বিতরণ করছি!

ভগবান তুমি আমাদের রক্ষা কর!

বুদ্ধের জন্ম

—শ্রীঅরুণ

[মিউজিয়মের ১২ নং চিত্র]

বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ,
বিশ্বের আলোর অঙ্গনা খুলে দিয়েছে—
—গগন থেকে গহন বনে-ও
তা ছড়িয়ে পড়েছে ॥
শাক্যরাণী মায়া—
প্রকৃতির এই উৎসবের রাতে
পিতৃ গৃহে চলেছেন।
চাঁদের আলোর সাথে সাথে
দেব, কিন্নর, অপ্সরাদের
অভিনন্দন তার ঘিরে ধরছে ॥
মানুষ তখনও জানেনা—
আজ কিসের উৎসব ;
মোহ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ;—
কিন্তু জেনেছে—
বনের পশু পক্ষী
বনের বৃক্ষ লতাতী
আরও জেনেছে'
আকাশের তারা
চাঁদের জোছনা ॥
অবোধ মানব—
রাণীর সঙ্গে চলেছে
তাঁর পিতৃগৃহে—
কেউ বা আগে,
কেউ বা পিছনে,
কেউ বা যান বাহক হ'য়ে ॥
লুম্বিনী উদ্যানে, সবাই ক্লান্ত।
বিশ্রাম ক'রে আবার যাত্রা সুরু হবে ॥
কিন্তু আর,
এগিয়ে যাওয়া হ'ল না—
শাক্যরাণী মায়া দেবী
কুক্ষি দেশে বেদনা বোধ করছেন ॥
রাণী বেদনায় কাতর—
তার মধ্যে-ও
এক সুখস্বপ্নের কথা মনে জাগল।
দশ মাস পূর্বে,
স্বপ্ন দেখেছিলেন—
তার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ ক'রে,
শ্বেত হস্তীরূপী বুদ্ধদেব
—তাঁর পুত্ররূপে প্রবেশ করে
তখন অন্তরীক্ষে দেবগণ
উৎসব করছিলেন ॥
আজও সেই উৎসবের ধ্বনি
আবার কানে বাজছে।
চোখের সামনে—
আবার উৎসবের মেলা বসেছে,
প্রসব-বেদনা-কাতর রাণী—
সব শুনছেন—
সব দেখছেন—
দেববালাদের আনন্দ—
বজ্রপাণির উল্লাস
ব্রহ্মার স্নিগ্ধ আশিস্।
শাল তরু শাখা ধরে—
রাণী দাঁড়ালেন ;
ভগ্নী মহাপ্রজাপতি ও পরিচারিকাগণ
সবাই পরিচর্যায় ব্যস্ত ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজছে,
আর বাজছে বীণা, মন্দিরা, মৃদঙ্গ,
অন্তরীক্ষে একদিকে দেবরাজ

অপর দিকে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।
মহা প্রজাপতি ও পরিচারিকাগণ
দুপাশে উৎকণ্ঠিত দাঁড়িয়ে আছেন।
আর স্বয়ং দেবরাজ—
শুভ্র বজ্রদণ্ড ধরে আছেন।
—নবজাতককে ধারণ করার জন্য।
মাতৃ কুক্ষি ভেদ করে
দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা নিয়ে
প্রবুদ্ধ অবতীর্ণ হলেন॥
প্রভুর পদস্পর্শে
পৃথিবীর সমস্ত কঠোরতা—
বিদূরিত হ'ল
—তার গায় গায়,
প্রতি পদ চিহ্নে
ফুটে উঠল কমলদল।
ঠিক সেই মুহূর্তে
ঋষি অসিত জেনেছিলেন
এক বুদ্ধ অবতীর্ণ হলেন।
আর,—ঠিক সেই মুহূর্তে
গৌতম-ভৃত্য ছন্দক
ও অশ্বরাজ কণ্ঠক
পৃথিবীর কোলে এল—
বুদ্ধ জীবনের
চির সহচর রূপে॥

স্বপ্নকন্যা

অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়

ঘুমের তরল পথ পার হয়ে স্বপ্নের দেশ।
একটি কোমল মেয়ে, পিঠ বেয়ে সোনা-রঙা চুল
অনেক পাখীর গান, নামহীন অসংখ্য ফুল
মেয়ে গো তোমারো দুই ঠোঁট জুড়ে কী গানের রেশ!
তোমার কোমল হাতে দেখ দেখ মোর ভীরু প্রাণ
একটি ফুলের শ্বেত পাপড়িতে ভরে দিই, নাও
(তোমার নিষ্ঠুর মন আজ রাতে না হয় বিলাও,
মনের কোরাসে কোথা এতটুকু নয় দাও স্থান!)
আমার প্রাণের ফুল নিতে গিয়ে তোমার দুহাত
একটু কাঁপেনি দেখি। সোনালী ঠোঁটের মৃদু গান
ক্রমশঃ আমার ভীরু হৃদয়ের দিকে ধাবমান,
কী পরিপূর্ণ দেখ সোনালী মেয়ে গো এই রাত!
তারারা ক্রমশঃ ম্লান; ম্লান হল স্বপ্নের দেশ
তোমারো দুচোখে গাঢ় বেদনার কুয়াশা ঘনায়
(ভুলেছ বাসা নাবে আমারো যে প্রতিটি কণায়
আজকে এমনি কেন নয় মোর জীবনের শেষ!)

চিত্রলেখা

শ্রীকরুণাময় বসু

স্বপনের আশ্চর্য সাগরে মণিময় প্রবালের দ্বীপ.
যেন কোন পরীর মেয়েরা ঢেউএর ফণায় জ্বালে
মায়ার প্রদীপ ;
নারিকেল চিকণ পাতায় ঝিরি ঝিরি হাওয়ার কাঁপন,
রূপালি মাছের খেলা জ্যোৎস্না রাতে সাগরের ঢেউয়ে,
কাঁপে মোর মন।

শৈলচূড়ে নেমে আসে ঘুসর কুয়াসা,
ছায়ার আল্পনা দেয়, দেয় ভালোবাসা
এই সব পরীর মেয়েরা, রামধনু রঙ কিছু রেখে যায়
নয়নের পাতে
ঝিঁঝি ডাকা ঝিম ঝিম জোনাকির পাখায় পাখায়
হীরে জ্বলা রাতে।

গন্ধের বেদনা যেন উড়ে আসে নারাঙ্গের পত্র কুঁড়ি হ'তে.
এখানে পরীরা নামে ফুলে ফুলে জ্যোৎস্নারাতে বসন্ত. শরতে
দুপুরের শুষ্ক মাঠ, বেত ঝোপ, নীল খড়ি বন
কোজাগরী জ্যোৎস্নারাতে রূপ ধরে চিত্রলেখা পরীর মতন।

চিত্রিতা মোমের মুখ, রাঙা ঠোঁট, এলোমেলো চুল,
কখনো করবী বাঁধে, গুঁজে রাখে চাঁপা বেল ফুল।

অর্ধেক মানুষী রূপ, অর্ধেক নাগিনী,
মাধবী পূর্ণিমা রাতে পদ্ম ঢাকা কালো জলে চেয়ে দেখো.
মনে হ'বে যেন চিনিচিনি।

মনে হ'বে এইখানে পাশাবতী মেয়ে কোন পেতে
রাখে ফাঁদ,
ধরেছে রাজার ছেলে, তারা দুল, বনলতা চাঁদ ;
পেতে রাখে হীরার ডালিম.
ছায়া-হাঁস, মেঘতরী, নাগাবন নিশি পাওয়া রাত ঝিমঝিম।

হঠাৎ এসোনা কেউ একা একা আপনার ভুলে.
এ বড়ো মায়ার দেশ, মণিমালা চমকায় পরীদের কালো
এলোচুলে
কখনো বা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে ভোজবাজী তাস.
মালঞ্চ লতার ফুলে ঢেউ দেয় বনের বাতাস।

ঝিকিমিকি জ্যোৎস্নারাতে কালো জলে জাল পেতে রাখে.
জড়াবে সমস্ত দেহ যদি পায় বেদের বিপাকে।

স্বপ্নে যেন মনে হ'বে এই সব পরী মেয়ে হাতে বাঁধে
ফুলের কঙ্কণ.
ভুরুতে কাজল রেখা, রাঙা দেহে মায়াময় ছায়া আলিম্পন ;
নারাঙ্গী ফুলের স্বপ্নে নেশা ;
ফাল্গুন চঞ্চল বনে বকুলের গন্ধ আনে, মনে লাগে নেশা !

এখানে এসোনা কেউ জ্যোৎস্না রাতে আপনার ভুলে :
এ বড়ো মায়ার দেশ. মণিমালা চমকায় পরীদের কালো
এলোচুলে।

প্রভাতী

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আকাশ থেকে সোনার নিঝর
ঝরছে তখন সবে
বসুন্ধরার আঁধার তনু 'পরে—
তন্দ্রা-অলস মানব-হিয়ার
রক্ত-প্রসূনগুলি
ফুটবে কিনা, খুলবে কিনা আঁখি,
দুলবে কিনা স্বপ্ন-সুখের মায়া,
দুলবে কিনা উদ্ভাসিত
প্রভাত-মলয়-কোলে.—
এমনি শত দ্বন্দ্বভরা প্রভঞ্জনের মাঝে
ক্ষণে ক্ষণে
উঠছিল যে কেঁপে'
আর্তকণ্ঠে, দুঃস্বপনের ঘোরে
কোন্ সে ভীরু, নিত্য পাতালবাসী
দুরন্তরে অরুণরথের অগ্রগতির আশা
মলিন ক'রে উঠছিল চিৎকারি'।
ধূসর আকাশ ম্লান হ'য়ে যায় ক্রমে,
প্রাচীর বেয়ে জ্বলতে থাকে
স্বর্ণস্খলিত আলো,
আঁধার গেল কেটে :
আলোর পরশ-উজল হাসির মালা
কে পরাল কণ্ঠে ধরিত্রীর ?

অজ্ঞানতার গর্ব হঠাৎ উঠল থরথরি'
অসুন্দরের তাসের প্রাসাদগুলি
পারিজাতের সুবাস-মাখা
সমীরণের স্রোতে
ধূলার বুকে গুঁড়িয়ে
মিশে গেল !···

নিশকালো সব মেঘের চূড়া যত
রক্ত শিখার প্রলয় ভরা
দেলিহানের মাঝে
উঠল সন্ন্যাসি' !

রাত্রি যত জেগেছিল ঘন্ধারিত-প্রাণে ;
শান্ত তা'রা হোল ;
মর্ত্যবাসী দৃষ্টি মেলি'
দেখলো সবিস্ময়ে
ভূলোক হ'তে উড়ে গেল,
শিউলি-ভরা পাখার আশীষ ঢেলে,
সুনীল নভের
সীমা অতিক্রমি'
অ-সান্ত কোন্ ঊর্ধ্বলোকের পানে
পুলকিত স্বর্ণ-তনু
অচিন্ত্য এক পাখী।

জীবাণুর কথা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীতে বিশেষতঃ মহিলা মহলে প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা যায় দুধটা অসাবধানতার জন্যে কেটে দই হয়ে গেলো। অভিযোগটা উঠে খুবই সত্য কিন্তু অসাবধানতার জন্য বড় বিশেষ একটা কেটে নষ্ট হয়ে যায় না। গ্রীষ্মকালে দুধকে কেটে দইয়ে পরিণত করার জন্য দায়ী অন্য এক অদৃশ্য হস্ত। কাহার অদৃশ্য হস্ত দুধকে নষ্ট করে অম্ল দই'য়ে রূপান্তরিত করছে তাহাই হবে বর্তমান আলোচ্য বিষয়। এই অদৃশ্য হস্তের কার্যাবলী এখন আর কাহারও কাছে অজ্ঞাত নয়। অনেক দিন আগেই বৈজ্ঞানিকবৃন্দের তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে অদৃশ্য হস্তের এই অদৃশ্য কার্যকলাপ। অদৃশ্য হস্ত আর কাহার নয়; এক জাতীয় জীবাণুর (Bacteria)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বাতাসে বহু প্রকার অদৃশ্য জীবাণু ভেসে বেড়ায়। এদেরই মধ্যে এক জাতীয় জীবাণু সুবিধা অনুযায়ী দুধের মধ্যে প্রবেশ করে দুধকে টক দই'য়ে পরিণত করে। একথা হয়ত প্রথমতঃ বিশ্বাসই হয় না যে এক অদৃশ্য জীবাণু দুধকে টক দই করে দিল—কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এদের যতটা তুচ্ছ ভাবি এরা মোটেই ততটা তুচ্ছ নয়। এরা যদিও আমাদের চোখে অতি ক্ষুদ্র, অদৃশ্য, তাহলেও তাদের অদৃশ্য কার্যাবলী মোটেই ক্ষুদ্র নয়। অতি অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় এরা দেয়। সময় সময় এইসব অদৃশ্য অজ্ঞাত জীবাণু আমাদের পরম বন্ধুর মত উপকার করে, কিন্তু এরাই আবার সময় সময় চরম শত্রুতা করতেও ছাড়ে না। এইসব জীবাণু জলে, স্থলে, বাতাসে, পৃথিবীর গহনতম প্রদেশে, ভাসমান বরফের অন্তরালে, গাছের পাতায়, মাটীর তলায়, এমনকি আমাদের শরীরেও অবস্থান করে অদৃশ্য শত্রু ও মিত্র রূপে।

ব্যাকটিরোলজি বা জীবাণুতত্ত্ব আজকাল বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে এবং বিজ্ঞানের এক করোজনীয় ও গবেষণীয় শাখারূপে পরিগণিত হ'য়েছে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক ওলন্দাজ নিসর্গবিদ এ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহিক এই অদৃশ্য জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তিনি বলেছেন, মানুষের উদরাময় রোগ, মানুষ মরবার পর যে পচে গলে যায় তা এই জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়। তারপর বহুদিন জীবাণুতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মহলে অবহেলিত অবস্থায় ছিল। পরে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এফ্ মুলার, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এরেনবার্গ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বাইতেন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকবৃন্দ জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন—তাহলেও যতদিন না পর্যন্ত লুইপাস্তুর (১৮৬৩ খৃঃ) Fermentation বা স্বতঃস্ফোটন লইয়া গবেষণা করলেন ততদিন পর্যন্ত জীবাণুতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটী গবেষণীয় শাখারূপে পরিগণিত হতে পারেনি। পরে পাস্তুর, স্বচ্, লিষ্টার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের অক্লান্ত গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারি এই জীবাণুই অনেক রোগের কারণ এবং অনেক জিনিষের পচনের মূল। এখন এই জীবাণু কি, তাহাই হবে আলোচনার বস্তু। অনেকের ধারণা জীবাণু একপ্রকার সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রতম প্রাণী বিশেষ। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইহারা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রাণময় জীব হলেও ইহাদের উৎপত্তি উদ্ভিদ জগত হতে। ইহারা ক্লোরোফিল হীন, ছত্রাক জাতীয় (Fungus) এককোষবিশিষ্ট (Unicellular) আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ। এরা বিভাজন প্রণালীতে (Fission) বংশবিস্তার করে, বংশ রক্ষা করে। এদের মাইক্রোব, ব্যাকটিরিয়া, সিজোমাইসেটিস্ বা জীবাণু বলা হয়। এই জীবাণু অতি সূক্ষ্ম। মাইক্রোস্কোপ ভিন্ন দেখা যায় না। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিলিমিটারের ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ। আকৃতি অনুসারে মোটা-

বৃষ্টি এদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র গোলাকার বা কড়াই (cocci), দণ্ডাকার বা ব্যাসিলাই (Bacilli) ও কুণ্ডলিকার বা স্পাইরিলা (Spirilla) এইসব জীবাণু এক মাইক্রন হতে ৫।৭ মাইক্রন পর্যন্ত হ'তে পারে। এক মাইক্রন সমান এক ইঞ্চির ২৫ হাজার ভাগের এক ভাগ। অনেক সময় এই জীবাণুর একটী, দুইটী ও বহু যুক্ত হ'য়া থাকে। জীবাণু এক কোষী। এই সব কোষের কোষ-প্রাচীর (Cell-wall) আছে, কিন্তু সেলুলোজ, দিয়ে তৈরী নয়। এদের মধ্যে কেন্দ্রিক বা (Nucleus) নেই, কিন্তু ক্রোমেটিন গুটীকা থাকে, যার ফলে তারা কেন্দ্রিকের কাজ করে। এই হ'ল জীবাণুর দেহাবয়ব। এদের প্রাণ আছে। এরা শবভোজী আবার অনেকে পরভোজী। মৃত, জৈব পদার্থ এদের খাদ্য। জীবাণু জটিল জৈব পদার্থকে ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত করে। এইরূপ করার ফলে একটা তেজ নির্গত হতে থাকে। সেই তেজই জীবাণুদের পুষ্টিসাধন করে। অনেক জীবাণু বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। যেমন টিটেনাস জীবাণু, ব্যাসিলাস সাবটিলাস্। আবার অনেকে বদ্ধ অবস্থায় থাকে যেমন ব্যাসিলাস বুটাইরিকাস্। Fermentation বা স্বতঃস্ফোটনের সময় জীবাণুরা জৈব পদার্থ হতে অম্লজান গ্রহণ করে। জীবাণুরা একা থাকতে ভালবাসে না। দলবদ্ধ ভাবে উপনিবেশ (Colony) তৈরী করে বাস করে। বিভাজন প্রক্রিয়ায় তারা সাধারণত বংশবিস্তার করে। এই প্রক্রিয়াতে তাদের দেহ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং ঐ বিভক্ত অংশ আরও অসংখ্য অংশে বিভক্ত হয় যা জানলে বিস্মান্বিত হ'তে হয়। জীবাণুর জীবনে আমরা দু'টী অংশ দেখতে পাই। একটী সচল আর একটী অচল অবস্থা। সচল অবস্থায় জীবাণুরা গরমে মারা যায়। কিন্তু অচল অবস্থায় জীবাণুরা কয়েকঘণ্টা গরমে কাটিয়ে দেয়। সেইজন্য চিকিৎসকেরা অস্ত্রশস্ত্রকে বেশ কিছুক্ষণ গরম জলে দিয়ে জীবাণু মুক্ত করে নেন। জীবাণু সর্বত্রই আছে। জনমানব পূর্ণ ঘরের প্রতি ঘন গজে ১০,০০০ জীবাণু ঘুরে বেড়ায় তাহা পরীক্ষায় জানা গেছে। মাটীর তলায় অসংখ্য জীবাণু বাস করে। বৃষ্টি হবার পর মাটী হ'তে যে সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায় তা এই জীবাণুরই দেহজাত গন্ধ। কলা গাছের পাতায়, গোয়ালঘরে, আবর্জনায়, আঁস্তাকুড়ে, তামাক পাতায় যে গন্ধ পাওয়া যায় তাও এই জীবাণুরই। জীবাণুর কার্যকারিতা জানলে সত্যিই অবাক হতে হয়। অনেক জীবাণু মুক্ত আবহাওয়ায় বিচরণ করে। তারা মানব ও উদ্ভিদ সমাজের পরম কল্যাণ করে। আবার অনেক জীবাণু বদ্ধ বাতাসে জীবন যাপন করে। তারা মানব ও উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে মানব ও উদ্ভিদের চরম ক্ষতি সাধন করে। যত রোগ এই পৃথিবীতে সংঘটিত হচ্ছে তার অধিকাংশ এই সব জীবাণুর দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। জ্বররোগ, কলেরা, বসন্ত টাইফয়েড, হাম, সর্দি-জ্বর, উদরাময়, আমাশা, ডিপথিরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সংঘটিত হয় এই সব জীবাণুর দ্বারা। এই সব জীবাণু অনেকে বদ্ধ বাতাসের সাহায্যে, কেহ বা জলের সাহায্যে শরীরে প্রবেশ করে আমাদের অশেষ ক্ষতিসাধন করে। আবার এই জীবাণুরা মানব ও উদ্ভিদের পরম কল্যাণসাধন করতে কার্পণ্য করে না। কৃষিকার্যে জীবাণুর দান সত্যই অতুলনীয়। বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের বা উদ্ভিদের নাই। যদিও কিছু আমরা প্রশ্বাসের সংগে নিই, তা কিন্তু শরীরের বিশেষ কোন উপকারে আসে না—সবই চলে যায়। কিন্তু এক প্রকার জীবাণু আছে (Azotobactor) যারা বাতাসের এই নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করতে পারে। তারা মাটীতে বাস করে। জীবাণু এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটীর অভ্যন্তরস্থিত আরও কয়েকটী উপাদানের সহিত এই নাইট্রোজেনকে মিশিয়ে এমন একটী খাদ্য উপাদান তৈরী করে যেটী একজাতীয় উদ্ভিদের প্রিয় খাদ্য। জীবাণুরা সেই জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে আশ্রয় নিয়ে এই খাদ্যউপাদান উদ্ভিদকে দেয় আর জীবাণুরা উদ্ভিদের

দেহ হ'তে শর্করা জাতীয় উপাদান গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। তাদের পরস্পর এইরূপ খাদ্য আদান প্রদান করে বেঁচে থাকার পদ্ধতিকে বলা হয় Symbiosis. উদ্ভিদ-তত্ত্বের Leguenineal নামক জাতীয় গাছের শিকড়ে এই সব জীবাণুরা আশ্রয় নেয়। আবার ঐ জাতীয় গাছের উৎপন্ন ফসল হতে আমরা নাইট্রোজেন শরীরে গ্রহণ করি। এই নাইট্রোজেন আমাদের দেহগঠনে সহায়তা করে। জীবাণুরা গাছের পাতা, শাখা ইত্যাদি পচাইয়া মাটীতে রসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাতা ও শাখার প্রোটোপ্লাস্মকে রূপান্তরিত করে এবং প্রোটিনকে এ্যমোনিয়ার পরিণত ক'রে মাটীকে উর্বর করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Ammonification। আবার অনেক জীবাণু আছে যারা মাটীতে বাস ক'রে এই এ্যমোনিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Nitrification। দুগ্ধজাত খাদ্য উপাদান প্রস্তুতিকরণে জীবাণুর দান প্রসংশনীয়। Dairy Industry গব্যাদি প্রস্তুতিকরনে জীবাণু একটী বৃহৎ অংশ গ্রহণ করেছে। মাখন, ঘৃত, দধি, ননী, ইত্যাদি আমরা যা পাই তা এই জীবাণুর দ্বারায়। Bactarial Fermentation বা জীবাণু সংঘটিত পচনকোটনে আমরা ঐ সব উপাদান পেয়ে থাকি। দুধ হ'তে যে দই হয় তা দধলের সাহায্যেই হয়। দধলই হচ্ছে জীবাণুর সমষ্টি। এই জীবাণুরা দুধের শর্করা উপাদানকে ল্যাকটিক এসিডে (Lactic Acid) পরিণত করে। দুধ সেইজন্য কেটে টক হ'য়ে যায় এবং ছানা তৈরী করে। বাজারে যে মদ বিক্রয় হয় তাও এই জীবাণু দ্বারা তৈরী হয়। আমাদের অনেকেরই ঘরে যে আচার, জ্যাম, জেলি, মোরব্বা হয় তা ভিনিগার দিয়ে তৈরী হয়। ভিনিগার প্রস্তুতের মূলে আছে জীবাণু। পাট, শণ ইত্যাদি জলে পচিয়ে আমরা পাট ও শনের আঁশ বাহির করি। এই পচনের মূলে আছে জীবাণু। মল-মূত্র, দূষিত আবর্জনা, মৃত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে জীবাণু পচিয়ে ধ্বংস করে উদ্ভিদ জগতের মূল্যবান খাদ্য তৈরী করে দেয়। আমরা যে চামড়ার জুতা, সুটকেশ, ব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করি, সেই চামড়া প্রস্তুত করণে জীবাণুর উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। চামড়া ট্যান করবার সময় আমরা প্রথমতঃ চামড়াকে রোদে বাতাসে ফেলে রাখি। তখন এক জাতীয় জীবাণু সেই চামড়ার আশ্রয় নেয়, এবং তারা চামড়ার উপরিভাগকে ক্ষয় করে চামড়াকে নরম ও নির্লোম করে। যদি চামড়াকে জীবাণু আশ্রয় করত তা'হলে চামড়া শুকিয়ে কাট হ'য়ে যেত এবং চামড়ার দ্রব্যাদি কিছুই প্রস্তুত হ'তে পারত না। কোমল ও লোমহীন করে দেওয়ায় চামড়াকে আমরা নানাকাজে লাগাতে পেরেছি জীবাণুর কল্যাণে। পৃথিবীতে রাশী রাশী দূষিত আবর্জনা নিত্যই সঞ্চিত হচ্ছে তা যদি পরিষ্কৃত না হ'ত তাহ'লে মানুষ পৃথিবীতে বসতি স্থাপন করতে পারত না। মানুষের পক্ষে বাঁচা কষ্টকর হ'য়ে উঠত। জীবাণুরা এই সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপকে পচিয়ে ধ্বংস করে এবং তারই থেকে কত নতুন উপাদান তৈরী ক'রে পৃথিবীকে ক'রে তুলেছে সুন্দর-স্বচ্ছ নির্মল। যদিও তারা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, অজ্ঞাত, অদৃশ্য কিন্তু তথাপি তাদের অমিত শক্তিকে অবজ্ঞা করা চলে না। তাদের অসাধারণ শক্তি নিয়ে সভ্যতার বেদীমূলে কতখানি যে সুদৃঢ় হয়েছে তা আমরা ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই।

জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ

শ্রীঅচল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋণ করিয়া ঘি খাওয়া সকল ক্ষেত্রেই অসমর্থনীয়। কিন্তু কেহ যদি ঋণ করা ধনকে ঘি উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করেন তবে সে কাজটি সকল ক্ষেত্রেই অসমর্থনীয় নয়। ঋণ-করা অর্থ নিছক ভোগের জন্য ব্যয়িত না হইয়া, দেশের সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইলে, ঋণ গ্রহণকে আমরা সমর্থন করিতে পারি।

ভারত সরকার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য যে ঋণপত্র চালু করিয়াছেন তাহাও এই একই কারণে সমর্থনযোগ্য।

সরকার যখন জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন অথচ সেই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করার মত আর্থিক সামর্থ্য তাহাদের তখন তাহারা যে কয়টি উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ করেন ঋণ গ্রহণ তাহাদের একটি। গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য অর্থাভাব দেখা দিলে সরকার করভার বৃদ্ধি দ্বারা অথবা বাজার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই ঘাটতি পূরণ করিতে পারেন। উপরিউক্ত দুইটি উপায়ের মধ্যে করভার বৃদ্ধি অপেক্ষা ঋণ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইলে তাহার ফল ভোগ করিবে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আর ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা পরিশোধের দায়িত্বও পড়িবে তাহাদেরই।

উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য বর্তমানের করদাতাগণকে করভারে প্রপীড়িত করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। যদি ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে ঘাটতি দেখা দেয় তাহা হইলে অবশ্য করভার বৃদ্ধি দ্বারাই তাহা পূরণ করা সমীচীন।

ঋণ গ্রহণ ব্যতীত ঘাটতি পূরণের আর একটি পথ আছে। সে পথটি হইল ঘাঁকতি ব্যয়ের পথ অর্থাৎ অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টির দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা। উপযুক্ত সতর্কতা ব্যতিরেকে ঘাঁকতি ব্যয়নীতির দ্বারা সৃষ্ট অর্থ যে কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি করে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ভারতের আর্থিক দুর্গতিই তাহার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারকেও অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। বাজারে প্রচুর পরিমাণে নোট ছড়াইলেও সরকার-অবলম্বিত ব্যবস্থায় বৃটেনে সংসার খরচ সামান্যই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে সে সময় সরকার-অবলম্বিত ব্যবস্থায় মজুতদারী মুনাফাবাজী প্রভৃতির সবিশেষ বৃদ্ধি ঘটে এবং জনসাধারণ তাহাদের বর্ধিত আয় ও অতীত সঞ্চয়ের সমস্তটুকু ব্যয় করিয়াও বর্ধিত জীবন-ধারণ-ব্যয়ের সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করিবার মত অর্থ-সম্পদ এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত মুদ্রাসৃষ্টির প্রশ্ন উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপরিষদের বাজেট বিতর্কে প্রকাশ, আগামী দুই বৎসরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ৫০০ কোটি হইতে ৬০০ কোটি টাকা পর্যন্ত নোট ছাড়িবার প্রয়োজন দেখা দিবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনেক বেশী ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন দেখা দিবে বলিয়া অর্থসচিব মন্তব্য করিয়াছেন। অপর পক্ষে সে সময় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও হ্রাস পাইতে পারে। বৃটেনে লগ্নি তহবিলও ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। ফলে দেখা যাইতেছে যে, সে সময় আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অনেকে এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছেন যে, তখন হয়ত আরও অধিক পরিমাণে বাজারে নোট ছাড়িতে হইবে। অবশ্য আর্থিক উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতিতে শঙ্কিত হইবার কিছু নাই।

ইহা সম্ভব কারণ হয় তখনই যখন সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সমর্থ হন। যুদ্ধের সময় ভারতে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল।

অর্থাভাবে পরিকল্পনার কাজে বিলম্ব করা উচিত কিনা এসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। হিসাব মত দেখা গিয়াছে যে, আমাদের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ মাত্র মূলধন গঠনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই তুলনায় পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে যথা—হাঙ্গেরীতে মোট জাতীয় আয়ের ১৮%, পোল্যাণ্ডে ২০-২৫%, নরওয়েতে ১৫% এবং ফিনল্যাণ্ডে ১৮% মূলধন গঠন কার্যে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে উদাহরণ স্বরূপ না ধরিলেও অনুন্নত ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে সমুন্নত করিতে হইলে আমাদের মোট জাতীয় আয়ের অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগকে মূলধন গঠনের কাজে নিয়োগ করা উচিত। অর্থাৎ—

$$\frac{\text{মূলধন গঠনের জন্য প্রাপ্ত সম্পদ}}{\text{মোট জাতীয় আয়}}$$

এই হিসাবে না পৌঁছানো পর্যন্ত দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের তথা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটিবে না। সুতরাং পরিকল্পনার কাজ পিছাইয়া দেওয়ার অর্থ হইল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের তথা আমাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের তারিখটি-ই পিছাইয়া দেওয়া। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে সফল করিতেই হইবে সে সম্পর্কে দ্বিমত হইবার অবকাশ নাই। প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত সতর্কতার সহিত ঘাটতি ব্যয়নীতি গ্রহণও সমর্থনযোগ্য, তবে বাজার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থাভাব মিটান সম্ভব হইলে ঘাটতি ব্যয়ের বিপজ্জনক পথ গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়।

সরকারও প্রথমেই ঘাটতি ব্যয়ের বিপজ্জনক পথটি গ্রহণ না করিয়া, বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহের জন্য বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা হারে সুদের ঋণপত্র চালু করিতেছেন। ১৯৬৪ সালের ১৯শে এপ্রিল এই ঋণের টাকা পরিশোধ করা হইবে। আগামী ১৯শে এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি একশত টাকার ঋণপত্র ৯৮৷০তে বিলি করা হইবে। তাহার পর প্রতি সপ্তাহে শতকরা ১ পাই হিসাবে বর্ধিতমূল্যে উহা বিক্রয় করা হইবে। সামান্যতম সঞ্চয়কারীকেও ঋণপত্র ক্রয়ের ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী আহ্বান জানাইয়াছেন। এক্ষণে আমাদের বিচার্য বিষয় হইল সরকারের এই প্রচেষ্টা কতদূর সফলমণ্ডিত হইবে।

জাতীয় আয় নির্ধারণ কমিটি সম্প্রতি যে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৯,৫৩০ কোটি টাকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান মূল্য অনুসারে মাথা পিছু আয় ২৬৯/০ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ও তাহার পূর্ববর্তী বৎসরে ভারতে জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ১,০১০ কোটি টাকা ও ৮,৬৫০ কোটি টাকা, ঐ দুই বৎসরের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ২৫৩/০ ও ২৪৬/০ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। বিবরণীতে দেখা যাইতেছে যে মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান। সুতরাং সরকারী ঋণপত্র সকলেই কিছু কিছু কিনিতে পারিবে এমন সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তথাপি ইহার পিছনে একটি "কিন্তু" আছে।

বর্ধিত জাতীয় আয়ের সুযোগ সকল শ্রেণী সমান ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আজও বিশেষ নৈরাশ্যজনক (ইহারা মোট জনসমষ্টির ৪৭% অংশ) অপরপক্ষে শ্রমিক শ্রেণী ও শিল্পপতিদিগের আয় ক্রমবর্ধমান। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণী (পৃথিবীর সর্বত্র যাহারা সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া স্বীকৃত) ইচ্ছা সত্ত্বেও ঋণপত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে কিনা সন্দেহ রহিয়াছে বাকী থাকে শ্রমিক শ্রেণী ও শিল্পপতিগণ। বর্তমান অবস্থায় ভারত সরকার দুই উপায়ে তাঁহাদের ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন—প্রথম, শিল্প-পতিদের প্রস্তাবান্বিত করিয়া (পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উপায়ে তাহাদের ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করেন। দ্বিতীয়, গ্রামাঞ্চলের স্বল্প সঞ্চয়কারীদিগকে (ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী) ঋণপত্র ক্রয়ে উৎসাহিত করিয়া (মাদ্রাজের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজাজী যে উপায়ে রাজ্য-সরকারের ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন)। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ইহা বলা চলে যে ভারত সরকার তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় শিল্পে সংস্কার-সাধন

বহুদিন যাবৎ ভারতীয় শিল্পে সংস্কার-সাধনের প্রশ্ন লইয়া, শিল্পপতি, শ্রমিক, সরকার ও অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুমুল বিতর্কের ঝড় চলিতেছিল। শিল্প-সংস্কারের সপক্ষে বা বিপক্ষে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বহু যুক্তির অবতারণা হইয়াছে এবং অবশেষে গত ১৪ই এপ্রিল ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণমাচারী এ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি, লোকসভায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, শিল্প-সংস্কার যেন অশ্রুবর্ষণের কারণ না হয়। শিল্পে সংস্কার সাধন করিতে হইলে শ্রম-অপনোদনমূলক যন্ত্রের প্রবর্তন অপরিহার্য এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কিছুসংখ্যক শ্রমিক হইবে উদ্বৃত্ত। ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা বাস্তবিকই অত্যাধিক এবং এই সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধানের ইঙ্গিত করিতে না পারায় সরকার প্রতিনিয়ত দেশের জনসাধারণের নিকট তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় শিল্প-সংস্কারের ফলে যদি তথা হইতে উদ্বৃত্ত শ্রমিকগণ কর্মচ্যুত হইয়া দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সমস্যাকে আরও প্রবল করিয়া তুলে, তবে সরকার দূরের কথা, কোন চিন্তাশীল লোকই তাহা পছন্দ করিবেন না। অথচ অবিলম্বে শিল্পের সংস্কার-সাধন না করিলে দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। দ্রব্যমূল্য হ্রাস না পাইলে দেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না এবং বিদেশের বাজারে তো কোনক্রমেই ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। ইহার অব্যবহিত ফল—শিল্পের তো বটেই জাতীয় প্রগতির পথকে বিপদাপন্ন করা।

এইরূপ সঙ্কট-মুহূর্তে, শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন যে শিল্প-সংস্কারের অভিযান আমাদের এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। সরকার বর্তমানে "শিল্পোন্নয়ন সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান আছেন। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। সুতরাং শিল্প-সংস্কারের ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদিগকে এই সকল নূতন শিল্পে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তিনি এরূপ আশ্বাসও দিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে বাড়তি শ্রমিকগণ যাহাতে বেকার হইয়া না পড়ে তাহার জন্য তিনি সরকারের নিকট একটি তহবিল সৃষ্টি করিয়া তথা হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ দিবার জন্য সুপারিশ করিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, অতি অল্প-সংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিবার মত অর্থের সঙ্গতি কতত সম্ভব হইবে। ইহার ফল হইবে এই যে, যে সকল প্রতিষ্ঠান অর্থের সঙ্গতি করিয়া উঠিতে পারিবে না, তাহাদের পক্ষে টিঁকিয়া থাকা, অসম্ভব হইবে। পরিকল্পনা কমিশন সমস্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করিতেছেন এবং আশা করা যায় যে তাহারা এমন একটি পন্থা নির্দেশ করিবেন যাহার দ্বারা সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সংস্কার সম্ভব হইবে।

ভারতের জাতীয় পরিকল্পনায় নূতন ঋণ-সংগ্রহ

জাতীয় পরিকল্পনায় ১৯৫৩ সালে প্রথম ঋণ গ্রহণের পর, গত ১৯শে এপ্রিল হইতে ভারত সরকার দ্বিতীয় দফার ঋণ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী দুর্গাবাঈ সর্বপ্রথম এই ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সরকারের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন করেন। বৎসরের এই সময়ে সরকারের এই প্রচেষ্টা স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জাতির নিকট এক আবেদনে বলিয়াছেন যে, এই উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া আমরা প্রমাণ করিব যে বাহিরের কোন চাপে বিনষ্ট না হইয়া আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে সক্ষম। বর্তমানে ভারতের প্রতি আমেরিকার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বলা যায় যে, এই ঋণ-সংগ্রহের আর্থিক কারণ হইতেও রাজনৈতিক কারণ বৃহত্তর এবং ইহা দ্বারা জাতীয় প্রয়োজনে একটি প্রচণ্ড "চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক দিক হইতেও বিচার করিলে এই প্রচেষ্টাকে সুবিবেচনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হইবে। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের ঝুঁকি বাতিরেকেই অর্থের অতি লাভজনক ন্যাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারী ৩০ টাকার কাগজে, উল্লিখিত টাকা হইতে অধিক আয় হইবে। কারণ ২৮০ টাকার ক্রীত ঋণ পত্র হইতে ৩০ টাকা সুদ পাওয়া যাইবে। উপরন্তু ১৯৬৪ সালের ১৯শে এপ্রিল এই ২৮৷৷০ টাকার ক্রীত ঋণ পত্র ১০০৲ টাকায় পরিশোধ্য হইবে।

আশা করা যায় যে সরকারের বর্তমান বৎসরের ঘাটতি ২৪০ কোটি টাকারও অধিক এই ঋণ পত্র বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। বস্তুতঃ ২৪০ কোটী টাকার উর্ধ্বে যদি কোন অর্থ সংগৃহীত হয়, তবে উহা ভারতের বহু বিতর্কিত "ডেফিসিট ফিন্যান্সিং"এর পরিমাণ হ্রাস করাইতে সাহায্য করিবে।

Kirit Advertising Agency
Representative of:
FAMOUS NEWS PAPER & MAGAZINE
72,HINDUSTHAN PARK
BALLYGUNJ, CALCUTTA.

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন
কলিকাতা—১

কালের

পঁচিশে বৈশাখ—

বছরের প্রত্যেকটি দিন আপন নিয়মে আসে যায়। ওরই মধ্যে বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব-তিরোভাবের স্মৃতিতে হয় চিহ্নিত। পঁচিশে বৈশাখ আজ সমগ্র জাতির স্মরণীয় দিন—কারণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

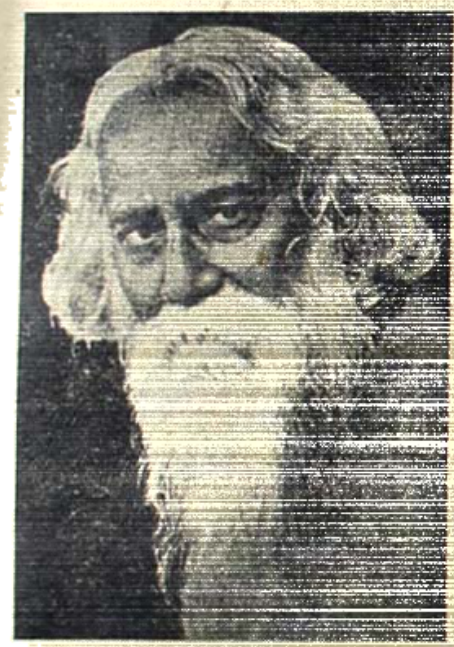

রবীন্দ্রনাথ

অক্লান্ত সাধনায় তিনি নিজের জীবনকে [illegible]। সে সাধনা যে কত একান্তিক, কত অকৃত্রিম ব্যাপক, তা যেন আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা [illegible]। খ্যাতির প্রলোভন নয়, স্বদেশানুরাগ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন [illegible] সাহিত্যানুরাগ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন [illegible]

সাধনা, ক্রমে অগ্রসর হয়েছি
পথে।

সকল সংকীর্ণতা থেকে
বিশ্বজীবনের সঙ্গে আপন
অবস্থায় আনন্দ-চেতনায় উ
দিয়ে গেছেন তিনি। স
প্রবর্তিত নানা অনুষ্ঠানের
কেমন করে নিখিল প্রকৃতি
আমরা যুক্ত করতে পারি
শিক্ষা সার্থক হোক্ আমা
পালন করতে গিয়ে আমর
আড়ম্বরকে, উদ্ধত ঐশ্বর্য-বি
ঘৃণা করতেন সকল ছল
বিদ্যালয়, কুটীরে আশ্রয়, ঋ
ঘটে শুভদিন-সংকেত।
আজ যে রুচিবিকার আমাদে
মনে হয়, মহাপুরুষদের শ্র
দেবপূজার বা মহাপুরুষ-স্মর
এবং ইতর ভোগস্পৃহা
আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের
কিন্তু তার পিছনে যেন আ
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির জীবনাদর্শ
আমাদের জীবনে।

অস্বাভাবিক, তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও তেমনি অসম্ভব ও অবাঞ্ছিত। পুরাতন অভিজ্ঞতা নিয়ে যেন এগিয়ে চলতে পারি নতুন পথে।

ইদানীং বাংলা নতুন বছরে নানাস্থানে নানারকম উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শারীরিক ক্রীড়াকৌশল, কুচকাওয়াজ, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা উপচারে দেশবাসী পয়লা বৈশাখকে সংবর্ধনা জানায়। এ প্রথা ভালো। তবে আমরা যেন উৎসবের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারি। মহৎ আদর্শ নিয়ে কর্মের পথে, সাধনার পথে অগ্রসর হবার সংকল্প হোক্ আমাদের নববর্ষ-উৎসবের প্রধান মন্ত্র।

আমাদের পত্রিকার গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের জানাই অভিবাদন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতির যোগ দৃঢ়তর হোক্।

ভারতবর্ষে ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল

বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে এসে ব্যবসা'র নারফতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। সব প্রথম আসে পর্তুগীজ ভাস্কো ডি গামা। যে সব ইউরোপীয় জাতি আসে তন্মধ্যে পর্তুগীজগণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানে অতি নীচ এবং এখানে যে আচরণ তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে তা অতিশয় বর্বরোচিত। প্রথম থেকেই এরা চেষ্টা করেছে স্থানীয় লোকের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-যাত্রা নষ্ট করে দিতে। তার জোর করে স্থানীয় অধিবাসীদের খৃষ্টান করার চেষ্টা করেছে। খৃষ্টান না হলে সাধারণ নাগরিক অধিকার লাভ করা অতি কঠিন হত। ভারতবর্ষে তাদের অধিকৃত স্থান হ'ল তিনটি—গোয়া, দামন ও দিউ। এই তিনটি স্থানের লোকসংখ্যা ৬ লক্ষের কিছু উপরে, মোটামুটি বলা যায় যে এ তিনটী স্থানকে পর্তুগীজগণ তাদের উপনিবেশ বলে দেখে।

এ ব্যতীত ফরাসীদের অধিকারে কয়েকটী স্থান আছে—তন্মধ্যে প্রধান হ'ল পণ্ডিচেরী; এবং মাহী, কারিকেল ও ইয়ানান নামক তিনটি স্থানও আছে। চন্দননগরও ফরাসী অধিকারে ছিল, কিন্তু কয়েকবছর পূর্বে সেখানকার ফরাসী শাসন লোপ পেয়েছে এবং চন্দননগর বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্রের অংশ। আগামী ২রা অক্টোবর থেকে এই সহরটি পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত হবে। পণ্ডিচেরী সহরটী ৮।১০টি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত এবং এগুলি সব পরস্পর সংলগ্নও নয়। পণ্ডিচেরীর অনেক এলাকা আছে যার চারিদিকেই ভারতীয় রাষ্ট্রের অঞ্চল। মাহী, কারিকেল, ইয়ানান সমুদ্রতীরবর্তী এক একটা ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামের মত। পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে গোয়া একটু বিস্তৃত অঞ্চল—শুধু একটা সহর নয়; কিন্তু ফরাসী অধিকৃত সব কয়টী স্থানই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পণ্ডিচেরীকে মোটামুটী বড় সহর বলা চলে আর তিনটি—সহরের নামে বাস্তবিক এক একটি গ্রাম।

ভারতবর্ষে ইংরেজের বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। গত বিশ্ব যুদ্ধের পর তারা নিজেরাই অনুভব করল যে বর্তমান যুগে এরূপ সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়; তাই কেবল ভারতবর্ষ নয়, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল থেকেও তারা রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে নিল। ইংরেজ জাতির কৃতিত্ব হল এখানে, যুগের ও অবস্থার সংগে তাল মিলিয়ে তারা চলতে পারে। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের তুলনায় পর্তুগীজ বা ফরাসী অধিকার প্রায় নগণ্য, তবুও এই সামান্য স্থানটুকুও ছাড়তে তারা রাজী নয়। পর্তুগালের কাছ থেকে অবশ্য কোন সদ্বিবেচনা, আদর্শবাদ বা উদার মনোভাব আমরা আশা করি না। কিন্তু ফ্রান্সের কাছে আমরা এ সব আশা করতে পারি এবং ফ্রান্সকে পর্তুগালের চেয়ে অনেক উচ্চে আসন দিয়ে থাকি। তা সত্ত্বেও এই অধিকারটুকু নিয়ে ফ্রান্স যে ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও কার্পণ্যের পরিচয় দিচ্ছে তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ফ্রান্সের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংগে এর সংগতি হয় না।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন সময়ে শ্রীজওহরলাল নেহেরু খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এই সব বিদেশী অধিকার আমরা বরদাস্ত করব না। ফ্রান্স এক সময়ে রাজীও হয়েছিল, কিন্তু পরে আবার সে মতের পরিবর্তন হয়েছে। গত ৩।৪ বছর যাবৎ ফ্রান্সের সংগে

এ নিয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে। তখন কথা ছিল যে গণভোট (Referendum) দ্বারা এসব অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। ফ্রান্সের আশা ছিল যে গণ-ভোটে তাদের দিকে রায় হবে, কিন্তু চন্দননগরের গণ-ভোটের অবস্থা দেখে তাদের সে আশা লোপ পেয়েছে। তখন পণ্ডিচেরীতে গণভোটের উপলক্ষে গুণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেওয়া হতে লাগল। সেই অবস্থায় গণভোট নিলে সমগ্র পণ্ডিচেরীতে ব্যাপক দাঙ্গার আশঙ্কা ছিল, তাই তখন গণভোট নেওয়া বন্ধ হয়েছিল। এবং সেই থেকেই ক্রমাগতই একটা গুণ্ডামীর আবহাওয়া পণ্ডিচেরীতে চলে আসছে।

বর্তমানে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল সমূহে একটী নিরস্ত্র গণ-বিপ্লব চলছে। স্থানীয় জনতা সমবেতভাবে ফরাসী অধিকার অস্বীকার করে ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছে। পর্তুগীজ অঞ্চলেও গোলমাল চলেছে। নিরস্ত্র জনতার উপর ফরাসী অঞ্চলেও পালটা আক্রমণ ও মারধর চলেছে। কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকও তাতে মারা গিয়াছে। এসব সত্ত্বেও ফরাসী শাসন কার্যতঃ ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলেই আজ আর নেই, আজ সেখানে জনতার অধিকার বা অরাজকতা চলেছে। পর্তুগীজ অঞ্চলেও অবস্থা ক্রমাগত সঙ্গীন হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই সামান্য একটু ভূখণ্ডের জন্য ভারতবর্ষেরই বা এত জেদ কেন? ফ্রান্স ও পর্তুগালের দিক থেকে বলা হয় যে ভারতবর্ষের বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে যদি সামান্য একটু অঞ্চলে অন্য রাষ্ট্র থাকে তাতে এমন কি আসে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান হয় যে ফ্রান্সের মধ্যে ম্যাকাও নামে একটী ছোট রাষ্ট্র আছে, ইটালীর মধ্যে সেণ্ট মেরিনো নামে একটী রাষ্ট্র আছে, বেলজিয়াম ও জার্মাণীর মাঝখানে লুক্সেমবার্গ নামে একটী রাষ্ট্র আছে, ফ্রান্স ও স্পেনের মাঝখানে এ্যানডোরা নামে একটী রাষ্ট্র আছে; তেমনি ভারতবর্ষের বিরাট ভূখণ্ডে পণ্ডিচেরী বা গোয়াও আলাদা থাকতে পারে। এ তুলনা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ওই সব অঞ্চলগুলি দূরবর্তী বিদেশী শাসকের অধিকারে নয়।

স্পেনের মধ্যে সামান্য একটু স্থান—জিব্রালটার ইংরেজের অধিকারে আছে। স্পেন তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। ভারতের বিদেশী-অধিকৃত এসব স্থান জিব্রালটারের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। আমরা মনে করি এটা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর। কারণ পর্তুগাল ও ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের কোন রকমই সান্নিধ্য বা যোগাযোগ নেই যা ইংলণ্ড ও স্পেনের ভিতর কতকটা আছে। নিজের দেশের মধ্যে দুটী বিদেশী শাসন বজায় থাকবে এবং তারা যথেচ্ছামত বিদেশী সৈন্য আনতে পারবে এমত অবস্থা কোন স্বাধীনরাষ্ট্র বা দেশ বরদাস্ত করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে পুরানো ইতিহাসের কথাও মনে করা উচিত। এ দুটী বিদেশী জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষ অধিকারের চেষ্টা করেছিল এবং এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক অধিকার বজায় রেখেছে। কাজেই এই দুইটি জাতির ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের দিক থেকেও এদের সম্বন্ধে সন্দিহান থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ইউরোপ-আমেরিকার যে কোন জাতির সম্পর্কে এশিয়ার প্রত্যেক জাতির মনে সন্দেহের কারণ আছে। অল্প কিছু দিন পূর্বেও আমেরিকার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেছেন যে এশিয়ার উপর আমেরিকার কর্তৃত্ব কিছু দিন বেশ চালু থাকা দরকার। শ্বেতকায় জাতির তরফ থেকে কর্তৃত্ব ও মোড়লি করেছে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি, আজ তা করতে চাইছে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এবং—অন্য ধরণের—চাইছে রুশিয়া।

আমেরিকার এই মনোভাব নিয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে আমেরিকার একটু মন কষাকষি চলছে। ইউরোপের প্রত্যেক জাতি কার্যতঃ আজ আমেরিকার তাঁবেদার। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ কোন কাজ গোয়া ও পণ্ডিচেরীতে বসে আমেরিকা যদি করতে সুরু করে, তা বাধা দেওয়া বর্তমানে আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

ভবিষ্যতে কোন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতবর্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করবে তার আবর্ত থেকে বাইরে থাকতে। তখন যদি আমেরিকা এই সব বিদেশী-অধিকৃত অঞ্চলে যুদ্ধ-আয়োজন শুরু করে তা ভারতের নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল হবে। এই কারণেও ভারতীয় গণতন্ত্র এই বিদেশী অধিকার বরদাস্ত করতে পারে না।

উপরোক্ত দুটী গুরুতর কারণ ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যাপারেও বিদেশী-অধিকৃত অঞ্চলগুলি অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তন্মধ্যে একটী বিষয়ের কথাই আমরা উল্লেখ করব.—চোরা কারবার (Smuggling)। ফরাসী ও পর্তুগীজ অঞ্চল থেকে বহু জিনিষের চোরা আমদানি রপ্তানী চলছে। ভারতবর্ষে যত জিনিষের চোরা আমদানী রপ্তানী হয় তার একটি মোটা অংশ ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত-অঞ্চলের মারফতে হচ্ছে। এতে যে আমাদের কেবল শুল্ক বা করের হানি হচ্ছে তা নয়, ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও বিরাট বিভ্রাট ঘটায়। সোনা আমদানী ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ অথচ এই দুটী অঞ্চল থেকে সোনার চোরাই আমদানী ইচ্ছে প্রচুর। গোয়া ও পণ্ডিচেরীর পার্শ্ববর্তী বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে মদ নিবারণ আইন চালু আছে অথচ এই দুটী অঞ্চল থেকে মদের ক্রমাগত চোরাই আমদানী হচ্ছে। চোরাই আমদানী রপ্তানী বন্ধ করার জন্য গোয়া ও পণ্ডিচেরী সরকারের কোন আগ্রহই দেখা যায় না। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এই চোরাই কারবারের পিছনে ওখানকার শাসনকর্তাদের গোপন সহানুভূতি আছে। ভারত সরকার ইদানীং চোরাই কারবার বন্ধ করার জন্য বেশ কিছু কড়াকড়ি করছে। আজ পণ্ডিচেরীতে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জনতার যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তার জন্য এই কড়াকড়ি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া অনেকখানি দায়ী।

পণ্ডিচেরীর ১৬টি মহল্লার মধ্যে ১৪টির অধিবাসীরা ফরাসী শাসন অস্বীকার করেছে এবং কার্যত সেই ১৪টি মহল্লায় ফরাসী শাসন এখন নেই। মাহি, কারিকেল ও ইয়ানানেরও অনেক মহল্লা থেকে ফরাসী শাসন লোপ পেয়েছে। এই সব স্থানের লোকদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যও ভারতের উপর নির্ভর করতে হয়। ডাক রেল এভৃতি সবই ভারতীয়। কয়লা, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র—প্রভৃতি জিনিষও ভারত থেকে ওখানে আমদানী না হ'লে, তাদের জীবন চলে না। এত দিন ভারত সরকার সংবিষয়েই খুব ভদ্র ও মৃদু নীতি অবলম্বন করে চলেছে। এখনও যদি ফরাসী কর্তৃপক্ষের সুমতি না হয়—তাহ'লে ভারতকে ক্রমে কড়াকড়ি করতে হবে; আশা করি সে পর্যন্ত যেতে হবে না, তার পূর্বে-ই ফরাসী কর্তৃপক্ষ ভারতের ও স্থানীয় জনতার দাবী মেনে নেবে।

পর্তুগীজগণ অবশ্য অনেকটা বেশী বেয়াড়াপনা করছে। পর্তুগালের কাছ থেকে সুবিচার বা উদার মনোভাব আশা করা বৃথা। আজ পর্তুগাল তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৬৪২ ও ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে ইংল্যাণ্ডের সহিত স্বাক্ষরিত সন্ধি সর্তের কথা উল্লেখ করছে। ঐ সন্ধিতে ইংল্যাণ্ড স্বীকার করেছিল যে পর্তুগালের কোন রাজ্যাংশ বা উপনিবেশ কেউ আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ড পর্তুগালকে যুদ্ধে সাহায্য করবে। ইংল্যাণ্ড নিজে ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে;—আর পর্তুগাল ঐ বছরের পুরানো সন্ধির বলে ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সামরিক সাহায্য আশা করছে। পর্তুগালের মত মধ্যযুগীয় দেশের পক্ষেই এইরূপ আশা করা সম্ভব। দিন কয়েক পূর্বে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী সালাজার (Salazar) হুমকি দিয়েছেন যে যদি গোয়ার অধিবাসীরা ও ভারত বেশি গোলমাল করে—তাহ'লে গোয়াতে কেবল উষর জমি রেখে তারা চলে যাবে। অর্থ হ'ল—গত মহাযুদ্ধের পোড়ামাটি নীতি অনুসারে সেখানে বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ—কিছুই থাকবেনা। এমন হুমকিও পর্তুগালের মতো বর্বর ভাবাপন্ন জাতির পক্ষেই সম্ভব। ইঞ্চি খানেক পরিমাণ স্থান মানচিত্রে যার পরিচয়—সেই পর্তুগালও আশা

করে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সে ঔপনিবেশিক শাসন চালাচ্ছে। আফ্রিকাতে সে বিরাট ভূখণ্ড দখল ক'রে আছে। এই সাম্রাজ্যের দিন চলে গিয়েছে—এই বুদ্ধি পর্তুগালের মাথায় সহজে ঢুকবে বলে আশা করি না। তবে পর্তুগাল যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত থেকে বিতাড়িত হ'বে—তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

তিব্বত সম্বন্ধে চীনের সঙ্গে নূতন সন্ধি

তিব্বত সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে এক নূতন সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার ভারতবর্ষ এই সন্ধিতে স্বীকার করে নিয়েছে। তিব্বতে চীনের শাসন-অধিকার কত দিনের এবং কোন্ অধিকারে সেই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিচার করা উচিত। তিব্বতের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ বহু প্রাচীন। বলা চলে যে চীনের সঙ্গে তিব্বতের সংযোগ স্থাপনের বহু পূর্বে ভারতবর্ষের সংগে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। চীন যখন মোগল শাসনের অধীনে আসে তখন দুজন মোগল সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ ও কবলুই খাঁ চীনের সাম্রাজ্যকে বহু বিস্তৃত করে। পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে হিমালয়, পশ্চিমে কাস্পিয়ান ও আমুর এবং উত্তরে আমুর নদীর (Amur) উপত্যকা এবং সাইবেরিয়ার অনেকটা অংশ এই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ক্রমে রুশিয়া মধ্যএশিয়া ও সাইবেরিয়ার কতক অংশ জয় করে নেয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত সাইবেরিয়ার কতক অংশ এবং মধ্য এশিয়ার অঞ্চলগুলি চীনের অধিকার থেকে রুশিয়া কেড়ে নিয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং বর্তমান ফরাসী ইন্দোচীন অঞ্চলও এক সময়ে চীনের করদ রাজ্য বলে পরিগণিত হত। ইংরেজগণ যখন ব্রহ্মদেশ জয় করে তখন চীনের সংগে সর্ত করেছিল যে ব্রহ্মরাজ্যের দেয় কর তারা চীনকে দেবে। এক বৎসর কর দেওয়ার পরে ইংরেজ সে কর আর দেয় নি। তিব্বতের উপর চীনের অধিকার সুরু হয় মঙ্গোল (Mongol) সম্রাট চেঙ্গিস্ খানের তিব্বত বিজয় (১২০৬ খৃঃ) থেকে। ১২৭০-এ চেঙ্গিস্ খাঁয়ের পৌত্র কবলুই খাঁ পুনরায় তিব্বত অভিযান করেন এবং তিব্বতীদের লামা-বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। এখনও লামা ধর্ম একমাত্র তিব্বতে এবং চীনের উত্তরে মোঙ্গলদের মধ্যে আছে। ঠিক তেমনি নেপাল, ভূটান, সিকিমের উপরও চীনের শাসন অধিকার অনেকদিন থেকে চলে আসছে। বস্তুত চীন কোনদিনই এসব দেশ শাসন করে নি, নামমাত্র একটী বার্ষিক কর গ্রহণ করেই তুষ্ট থাকত। তেমনি কর তিব্বত নেপালকেও দিয়েছে, ঠিক গত ১০০ বছর যাবৎ। বর্তমান জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের অংশ লাডাক ও লে (Ladak & Leh) এক সময়ে তিব্বতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৪১ খৃঃ জম্মুর রাজা গোলাপ সিং ওই দুটী অঞ্চল তিব্বত থেকে দখল করেন।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে তিব্বতের উপর চীনের সত্যিকার অধিকার কোন দিনই ছিল না। তেমনি অধিকার ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, নেপাল, সিকিম, সাইবেরিয়ার কতক অঞ্চল এবং বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার অঞ্চলের উপরেও তার ছিল।

তিব্বতী ও চীনাদের মধ্যে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত মিল প্রায় কিছুই নেই। চীনারা হোল মোঙ্গল বংশউদ্ভূত; তিব্বতীরা হোল তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) বংশোদ্ভব। চীনাদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। লিখনপদ্ধতি বর্ণমালা-বিবর্জিত (non-alphabetical)। তিব্বতীদের ভাষার লিখনপদ্ধতি বর্ণমালামূলক এবং ভারতীয় বর্ণমালায় তা লিখিত হয়। ধর্মের দিক দিয়ে তিব্বত এবং চীন দুই-ই বৌদ্ধধর্মানুরাগী হ'লেও তিব্বতের লামা ধর্ম চীনের মহাযান বৌদ্ধধর্মের চেয়ে পৃথক। তিব্বতের উপর চীনের যে শাসন অধিকার তা অস্ত্রবলের জোরের অধিকারে এবং তা নিতান্তই পরদেশী শাসন। প্রায় অনুরূপ একটি অধিকার ভারতও তিব্বতের উপর দাবী করতে পারে। চীনের দাবী আসছে তার বিদেশী

সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ ও কবলুই খাঁর বিজয় অভিযান থেকে; ঠিক তেমনি ভারতবর্ষও ইংরেজের জয় অধিকার থেকে তিব্বতের উপর একটা দাবি করতে পারে।

১৯০৪ খৃঃ ভারতীয় ইংরেজ সরকার ও তিব্বতী সরকারের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাতে তিব্বতের উপর ভারতীয় সরকারের একটা দাবী স্বীকৃত হয়। ১৯০৬ খৃঃ চীন সরকার বৃটেনের সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ক'রে ১৯০৪ খৃঃ ভারত-তিব্বতী সন্ধিকে মেনে নিতে রাজী হয়।

১৯৫০ খৃঃ চীন সরকার যখন তিব্বত অধিকারের জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করে তখন ভারত সরকার যে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেছিল তা ১৯০৪-১৯০৬ খৃঃ স্বাক্ষরিত ওই সন্ধি চুক্তির দাবীতে। আজ এই নূতন সন্ধিপত্রের ফলে ১৯৫০ সালের প্রতিবাদলিপিকে কার্যতঃ প্রত্যাহার করা হল; তাছাড়া তিব্বতে ভারতের যে সব অধিকার ও সুযোগ ছিল এই সন্ধি অনুসারে তাও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সন্ধিতে বার বার তিব্বতকে চীনের অংশ বা অঞ্চল (Tibet aregion of China) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ও গত শতাব্দীর শেষ দিকে ওই সব অঞ্চলে অনুপ্রবেশ বা অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেছিল তার প্রধান কারণ ছিল রাশিয়ার রাজ্যবিস্তার লিপ্সার (বিজিগীষার) প্রতি সন্দেহ। তখনকার দিনে হিমালয়ের মত দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে বা হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত মরুভূমি পার হয়ে ভারতে সামরিক অভিযান প্রেরণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বর্তমান যুগে হাওয়াই জাহাজ ও অন্যান্য সামরিক উপকরণের ফলে কোন প্রদেশই দুর্গম বা অনতিক্রম্য নয়। তাছাড়া রুশিয়া ও চীন আজ প্রায় এক রাষ্ট্র বা একই পদ্ধতিতে চালিত রাষ্ট্র। সামরিক অভিযান ছাড়াও বিদেশী রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল করা অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গোলমাল সৃষ্টি করার যে কায়দা কানুন এই দুটি রাষ্ট্রের আছে সে সম্বন্ধেও ভারতের সতর্ক হওয়া উচিত। তিব্বতের উপর চীনা শাসন মূলতঃ বিদেশী শাসন ও এই শাসন মেনে নেওয়া ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনযোগ্য নয় বলেই আমরা মনে করি। যদি সামরিক জয়ের অধিকারে প্রাচীন দাবীকেই স্বীকার করতে হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বিশ্বরাজনীতির দিক থেকে তিব্বতকে চীনের আধিপত্যের বাইরে স্বাধীন রাখাই আমাদের অনুকূল। চীন যে সব মানচিত্র প্রচার করছে তাতে চেঙ্গিস খাঁ ও কবলুই খাঁর দাবিতে ভূটান, সিকিম, আসামের কতক অংশকেও চীনের অংশ বলে দেখাচ্ছে। এই সন্ধি সর্তে চীনের পরোক্ষ দাবী সম্পর্কে কোন উল্লেখই নেই।

তিব্বতের উপর তার দাবি স্বীকার করে নিলে, এবং ইংরেজের জয় থেকে প্রাপ্ত তিব্বতের উপর দাবি প্রত্যাহার করে নিলে ভূটান, সিকিম ও আসামের একটি বিরাট অংশের উপর আমাদের কোন নৈতিক দাবি থাকতে পারেনা। সে হিসাবে আমরা মনে করি এই সন্ধি ভারতের পক্ষে নতি স্বীকারের পরিচায়ক।

ভারত ও তিব্বতের মাঝে একটা বিস্তৃত অংশ আছে যার উপর কোন রাষ্ট্রের অধিকার সুনির্দিষ্ট নয়। ওই অঞ্চলে ভারতের কিছু সৈন্যও ছিল। এই সন্ধিতে তিব্বত ও ভারতের সীমা নির্দেশের কোন উল্লেখ নেই। জানিনা চীন সরকার তার অধিকারকে কতদূর বিস্তৃত করবে এবং ওই উত্তর প্রান্ত চির তুষারাবৃত অথচ ভারতের সীমান্ত রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় স্থানটীর ব্যবস্থা কি হবে?

তিব্বতে ভারতের তিনটি ব্যবসায়ঘাটি ছিল; তার সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক অধিকারও ভারত সরকারের ছিল। সে সব অধিকারই এই সন্ধি অনুসারে ছেড়ে দিতে হল। তিনটি ব্যবসায় ঘাঁটির বদলা হিসাবে কালিম্পং, কলিকাতা ও দিল্লীতে চীনের তিনটি ব্যবসায়

ঘাঁটি খুলবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। ভারত সরকারের যে সব সম্পত্তি তিব্বতে ছিল—তা চীন উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নেবে। তিব্বতের ডাক বিভাগ—পোষ্ট, তার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন—কার্যত ভারত সরকারের হাতে ছিল: তা এখন চীন সরকারের হাতে নিতে হচ্ছে।

এসব ব্যবস্থা ও অধিকার পূর্বে ভারত সরকার পেয়েছিল তিব্বত সরকারের কাছ থেকে। তিব্বত বরাবরই কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই আচরণ করত। ভৌগোলিক সংস্থান, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য—সব দিক থেকেই তিব্বত স্বাধীন দেশের অধিকার পাবার যোগ্য। তিব্বতের সেই অধিকার অস্বীকার করেই এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'ল। ইতিমধ্যেই তিব্বতের পূর্বাঞ্চল খাম (Khain) প্রদেশকে চীন তিব্বত থেকে প্রায় আলাদা করে নিয়ে নিজের বাস অধিকারে রেখেছে। ছয়ত তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলের কতক অংশ সম্বন্ধে চীনের তেমনি অভিপ্রায় আছে। মোটের উপর এই সন্ধি ভারতের স্বার্থেরও বিশেষ অনুকূল নয় এবং তিব্বতের জাতীয় দাবীও এতে বিসর্জন করা হ'য়েছে। তাই আমরা এই সন্ধিতে বিশেষ খুসী হতে পারছি না।

পূর্ব বাংলার নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া

গত সংখ্যায় এই নির্বাচনের ফলাফল আলোচনার সময়ে বলেছিলাম—"আমরা কখন আশা করি না যে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দেবে বা নিজেকে স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করবে।" এবারেও আমরা এই কথার পুনরুক্তি করছি। তবুও এই নির্বাচন বহু লোকের অনেক মোহ ও ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ করেছে। আমরা বরাবরই মনে করেছি পাকিস্তানের সৃষ্টি ওখানকার জনসাধারণের সুখ সুবিধা বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য নয়, এর সৃষ্টি হয়েছিল তদিন্যঃ সামরিক বিধিব্যবস্থার (Strategy) জন্য। তাই ইংরেজ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কাগজ ও কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বর্তমান যুগে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র যে অচল কেবল তত্ত্বের দিক দিয়ে নয় বাস্তবের দিক থেকেও সে দিকের সম্বন্ধে এরা চোখ বুজে থাকতেই চেষ্টা করেছে। একই মুসলমান ধর্ম—এতগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্য প্রাচ্যে রয়েছে, যা থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে সে সব রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে তৈরী হয়নি, তন্মধ্যে আবার আরব ভাষাভাষী অন্তত ১০।১২টী রাষ্ট্র এশিয়া ও আফ্রিকাতে রয়েছে।

ধর্ম, ভাষা ও রক্তের সম্পর্ক আরব দেশীয় সব রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করতে পারেনি। তারপর একটা রাষ্ট্র দুটি অংশে বিচ্ছিন্ন, মাঝখানে প্রতিকূল পরিবেশে গঠিত একটী রাষ্ট্র ১৫।১৬শ মাইল জুড়ে বসে আছে। এও যে আজকালকার দিনে সম্ভবপর নয়—তাও বৃটেনের ও আমেরিকার রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণ বুঝতে চেষ্টা করেনি।

এই নির্বাচনের ফলে পাকিস্তানের এমনি সব অনেক বন্ধুর চোখ খুলতে সুরু করেছে। লণ্ডনে ইকনমিষ্ট (Economist) নামে একটি বিশেষ বিখ্যাত কাগজ আছে। এই নির্বাচনের পর এই কাগজে পাকিস্তান সম্পর্কে যা লিখেছে এইখানে তার কিছু উল্লেখ করছি। "করাচী ও ঢাকার মধ্যে পার্থক্য কেবল বিদেশী (ভারতের) হাজার মাইল জমি ও আহার, পোষাক, ভাষা ও শারীরিক গড়নের নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য আরও গুরুতর। পূর্ব পাকিস্তান অনিবার্য ভাবেই দক্ষিণ এশিয়ার অংশ, যতই পশ্চিম পাকিস্তান নিজেকে মধ্য প্রাচ্যের দুর্গ বলে মনে করুক না কেন। পাকিস্তানের আর্থিক বনিয়াদ নির্ভর করছে পূর্ব বাংলার রপ্তানি লব্ধ বিদেশী মুদ্রার উপর। আজ যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়ী দল দাবি করছে পূর্ব পাকিস্তানের এই সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারেই থাকবে। ভূগোলের কঠিন বাস্তবতা এটা সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে—করাচী ঢাকাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।"

লণ্ডনের ডেলী মেইল নামক রক্ষণশীল কাগজ কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। (১) পূর্ব বাংলা

নির্বাচনের ফলে পাকিস্তানের উপর আমেরিকার আস্থা হ্রাস হবে কি না. (২) আমেরিকা বা বিদেশী মূলধন পতিগণ (Capitalist) পাকিস্থানে নূতন ইনডাষ্ট্রী স্থাপনের অর্থ জোগাতে রাজী হবে কি না? ৩) আরব রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষপাতী, এর পর পাকিস্তানের প্রতি এ সব আরব রাষ্ট্রের মনোভাব কি হবে? বিলাতের বিখ্যাত দৈনিক কাগজ টাইমসের এখানকার প্রতিনিধি লিখেছেন. পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্ধত মনোভাবে অনেকদিন যাবৎ ক্ষুব্ধ ছিল। স্বৈর শাসন ও শাসনে অসততাই এই মুস্লিম লীগের পরাজয়ের কারণ নয়। অবজারভার (Observer) নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজে (রক্ষণশীলদের) লিখেছে করাচীর রাজনৈতিক চাঞ্চল্য হয়ত শীঘ্রই একটা বিপ্লবাত্মক পরিণাম আনবে। পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের ফলে পাকিস্তানের আমেরিকান দূতের চেয়ে আর কেউ বেশি চিন্তিত হয়নি, কারণ তিনি জানেন প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলীর পতন হলে আমেরিকার কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নেওয়া সম্বন্ধে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হবে।

অষ্ট্রেলিয়ার একটী সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি লিখেছেন, পূর্ব বাংলার নির্বাচনে মুস্লিম লীগ প্রায় মুছে গিয়েছে, হয়তঃ এই নির্বাচন পাকিস্তানের অবসান সূচনা করছে "This may be the beginning of the end of Pakistan" ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান বরাবরই পাকিস্তানের পক্ষ টেনে লিখেছে, সে কাগজও নির্বাচনের পর অনেকটা সংযত হয়েছে।

আরব দেশ সমূহের বিভিন্ন কাগজ এই পরাজয় থেকে দূরপ্রসারী পরিণাম আশঙ্কা করেছে। একখানা কাগজে লিখেছে (Akhbar Sadul—Akhbar Baghdad) লিখেছে এই নির্বাচন ফল করাচী সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে বিশেষভাবে সন্দেহাচ্ছন্ন করবে। এই নির্বাচন থেকে তুরস্ক-পাকিস্তান সামরিক চুক্তির উপর ঘা পড়লে আমরা কেউ বিস্মিত হব না। আর একখানা কাগজে লিখেছে যে এই নির্বাচনে সর্বপ্রকার সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং নেহরুর নিরপেক্ষতার নীতিকে সমর্থন করা হয়েছে। আর এক কাগজ এই নির্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনা করে প্রশ্ন করেছে পাকিস্তান সরকার সত্যই জনসাধারণের প্রতিনিধি কিনা এবং দাবি করেছে সংবিধান সভা (Constituent Assembly) ভেঙ্গে দিয়ে নূতন সংবিধান সভা তৈরী করা উচিত।

মিশর, ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন কাগজে এ নির্বাচন ফল নিয়ে এমনি ভাবে বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

এ নির্বাচনে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানের মূলনীতি—অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক জাতি ও রা পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা অস্বীকার করেছে। বাংল হিন্দুদের ভিতর যে ব্যাপক গণজাগরণ ১৯০৫ সা বঙ্গ বিভাগের ফলে এবং ১৯২০—২১ সালে অসহযো আন্দোলনের সময়ে দেখা দিয়েছিল—বাংলার মুসলম জনসাধারণের মনে সেই ভাব ১৯৪৭ সালে দেখা দিয়ে বলে আমরা অনুমান করি। অনেকে আশঙ্কা প্রক করছেন জনাব ফজলুল হক বা সুরাবর্দি এই গণ দা মর্যাদা রক্ষা করবেন কি না। তাঁদের পক্ষ থেকে যে কথা জোর করে আমরা বলতে চাই না। তাঁ ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীও আমরা কর চাই না। কিন্তু যারা ঐ প্রশ্ন করছেন তাঁদের শুধু স্ম করিয়ে দিতে চাই, সুরেন্দ্রনাথ বাংলায় গণ-আন্দোলন থামিয়ে রাখতে পারেন নি। তিনি যখন সে আন্দোল মর্যাদা রাখতে পারলেন না তখন আন্দোলন তাঁ অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলায় আন্দোলনও কোন নেতার অপেক্ষায় বসে থা বলে আমরা মনে করি না।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয়-৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

১। জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

২। রূপকথা ২৲

বাঙ্গালীর উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটী সরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুধীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী"—বসুমতী।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২৷৷০

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসহ। সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির প্রাঞ্জল ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। যদিও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে। বিষয়বস্তুতে, ভাষার সরসতায়, ছবিতে ও প্রচ্ছদপটের পারিপাট্যে পুস্তকখানি অপূর্ব ও মনোজ্ঞ। বাংলা ভাষায় ইহার সমতুল্য কোন পুস্তক নাই মূল্য—২৷৷০

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুষ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বহুদিন বাদে ফুরিয়ে যাওয়া একখানা দুষ্প্রাপ্য বই আবার পাওয়া যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২৲

—নরেন রায়—

বাঙলার ভুলে যাওয়া যুগের এক অভিনব কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত আনন্দমঠের সন্তান সৈন্যদের সত্যকার ইতিহাস।

সরস্বতী লাইব্রেরী ৪ ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিনামূল্যে সুন্দর একখানি পুস্তক তালিকার জন্য আজই লিখুন।

পরিচয়

সপ্তদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৬১ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব'

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাহিরের প্রভাবে ও সংঘাতে বাঙালীর সুপ্ত চিত্ত সহসা জাগ্রত হইল। সংস্কারের অন্ধকার করিয়া শত সহস্র প্রশ্ন মাথা তুলিতে লাগিল। নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া বাঙালী নূতনভাবে জগৎকে দেখিল।

জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিকালে কেহ অতীতকে আঁকড়াইয়া রহিলেন কেহ বা পাশ্চাত্যভাবের স্রোতে জাতীয়তা বিসর্জন আর কেহবা স্বদেশের আদর্শের সহিত পাশ্চাত্যভাবের সমন্বয় সাধন হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে স্বদেশের রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি, ভাব ও আদর্শকে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আপন জাতি-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। যুক্তিপ্রমাণে স্বদেশের যাহা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহার নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু যাহা সমর্থনযোগ্য এবং আমাদের সমুন্নতিবিকাশের অনুকূল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার প্রশংসায় ও প্রচারে যত্নবান হইয়াছেন। অধীন জাতিসুলভ দাস মনোভাব বা লাঘবন্যূনাদি তাঁহার মননশক্তিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নাই এই স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাবিলাসেই তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যের নহে, জাতির পথপ্রদর্শক হইতে পারিয়াছেন। বাঙালী তাঁহার অনুকম্পান্বিত জীবনচিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছে, আবার তাঁহার রচনায় জাতীয় জীবনের পথের সন্ধান যুগনায়করূপেও বরণ করিয়া

প্রকৃত-অপ্রকৃত-নির্বিশেষে যে-কোনও প্রবাদপ্রবচনকে শাস্ত্ররূপে মানিয়া অধীন চিত্তবৃত্তি বহুদিন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলিতেছিল বৈজ্ঞানিক-শক্তিসমৃদ্ধ যুক্তিপূর্ণ পাশ্চাত্যভাবের ঝঞ্ঝা করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে পড়িল তাহার এতদিন লোকে বলিত কেবল বিশ্বাসের বস্তু, বিচারের বস্তু নহে শিক্ষার বিকাশ, পাশ্চাত্যপ্রভাবে বাঙালী চারিদিক হইতে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে বিচারকে যুক্তির মহলে সাড়া পড়িয়া

ও সমাজের কতক বর্জন, কতক গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকে হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। প্রতিমাপূজার অনুরাগী হিন্দুগণ প্রতিমা পূজারও সমর্থন করিলেন। এক ভগবানে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহার বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্ররূপে আরাধনা করা যাইতে পারে এবং তাহাই সাধারণের ধারণা এবং কল্পনার অনুকূল,—ইহাই তাঁহারা প্রতিপাদন করিতে চাহিলেন। যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, বেদ-বেদান্ত-পুরাণমিশ্রিত নব্য হিন্দুত্বের, জ্ঞানোজ্জ্বল কল্পনামণ্ডিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্মের প্রথম বন্ধনকারী বঙ্কিম, এবং বঙ্গসাহিত্য তাঁহার অনুসরণকারী চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি ইহারা হিন্দুধর্মের পুরাপারণ যুক্তিসঙ্গত প্রথাপদ্ধতি এবং পৌরাণিক কল্পনার মাধুর্য রক্ষা করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাই বলিয়া যে কোনও লোকাচার বা প্রবাদ বাক্যকেই ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহেন।

৩

জীবন-সমস্যার সমুখীন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে প্রশ্ন সর্বাগ্রে ধ্বনিত হইল তাহা এই—'ধর্ম কি?'

খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ তাঁহাদের ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। স্বধর্মের অর্থহীন আচার বিচারে অবিশ্বাসী বিভ্রান্ত হিন্দু যুবক খ্রীস্টধর্মের বক্তৃতা শুনিয়া তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিল, রামমোহন একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের স্রোতকে অনেকটা বাধা দেন। তিনি শাস্ত্রালোচনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ব্রহ্মবাদী হইয়াও শৈব ও শাক্ত-ধর্মের ভালো দিকটাকে উপেক্ষা করেন নাই, এজন্য অনেক শাস্ত্রজ্ঞের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বধর্মের আলোচনা করিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্মকে মিথ্যা সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিয়া আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার প্রচারিত এই ধর্ম শতাব্দীত সনাতন হিন্দুর বিচারহীন আচারময় ধর্ম নহে। জীবনসমস্যাকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে-ধর্মের সন্ধান পাইয়াছেন, ইহা সেই ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে ইহা সার্বজনীন ধর্ম। ইহাতে দেশীয় এবং বিদেশীয় চিন্তাবীরগণের চিন্তার স্পর্শ আছে, তৎসঙ্গে স্বদেশীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাও আছে।

'ধর্ম বলিতে তিনি সম্প্রদায়বিশেষের কতকগুলি বিশ্বাস বা ধারণা বোঝেন নাই। যে-ধর্ম জীবনের সর্বাবস্থায় জীবনের সর্ববিধ বিকাশের অনুকূল নহে, তাহা তাঁহার মতে প্রকৃত ধর্ম নহে। তাঁহার ধর্মের প্রধান অঙ্গ অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ অনুশীলন। অনেকে এই মতবাদে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ছায়া দেখিতে পাইবেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন তাঁহার চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আলোকে তিনি হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন; পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই মতবাদের সহিত হিন্দুর ধর্মতত্ত্বের মূলতঃ ঐক্য রহিয়াছে।

"শিষ্য। এ যে বিলাতী 'doctrine of culture'

গুরু। 'Culture' বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দু ধর্মের সারাংশ।"

—ধর্মতত্ত্ব। প্রথম অধ্যায়।

সুতরাং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কোনও মতবাদের সহিত সাদৃশ্য মাত্র দেখিয়া তাহাকে 'অহিন্দু' মনে করা সমীচীন নহে। বস্তুতঃ বিভিন্ন দেশের মনীষিবর্গের চিন্তাধারায় প্রায়ই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই 'doctrine of culture' কে বঙ্কিম পুরাপুরি মানিয়াও লন নাই। পাশ্চাত্ত্য এই 'doctrine' বা মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা অগস্ত্ কোঁত্। তাঁহার 'পজিটিভিজম্' বা 'প্রত্যক্ষ ধর্মের' প্রধান কথা মানবের সকল শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ; 'মানবিকতা' বা মনুষ্যত্ব উহার মূলমন্ত্র।* কোনও অপ্রত্যক্ষ, অপার্থিব, অলৌকিক শক্তিতে উহার বিশ্বাস নাই। এইখানে বঙ্কিম উহার বিরোধী।

* বিখ্যাত ঐতিহাসিক সীলি এই মতের সমর্থক। তিনি বলিয়াছেন "The substance of religion is Culture" অর্থাৎ ধর্মের সারবস্তু হইতেছে অনুশীলন বা আত্মোৎকর্ষ।

"গুরু। বিলাতী অনুশীলন তত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ।...(হিন্দুদিগের) অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্মেই সমর্পিত।" —ধর্মতত্ত্ব। প্রথম অধ্যায়।

বৃত্তি নিচয়ের বিকাশের সহিত তিনি ভগবদ্ ভক্তির সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি মনে করেন, ভগবদ্ভক্তি ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়না। তাই গুরুর মুখে বলাইয়াছেন :

"যাহাকে হার্বার্ট স্পেন্সার 'inscrutable power in Nature' বলিয়া ঈশ্বর স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয়না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খৃষ্টিয়ানের ধর্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপসনাই ধর্মের মূল; কেননা তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন।" —ধর্মতত্ত্ব। চতুর্থ অধ্যায়।

অনুসন্ধিৎসু চিত্তে তিনি ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে চাহিয়াছেন। তাই পাশ্চাত্য দর্শনের তত্ত্বসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তিনি কোথাও অন্ধভাবে তাহার অনুবর্তন করেন নাই। 'অনুশীলন' ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ—এ কথায় যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্য মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পান তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য বঙ্কিম গুরুশিষ্য সংবাদে বলাইয়াছেন :

"শিষ্য। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন হিন্দুধর্মের অংশের সহিত যদি কোম্‌ত্-মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শ-দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?... বেদান্তের সঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সারের বা মিল্‌নোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিলে বলিব, বেদান্তটা হিন্দুয়ানীর বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি?"

—ধর্মতত্ত্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সকল বৃত্তির ও সকল ভাবের সমন্বয়মূলক ধর্ম বস্তুতঃ অনেকেরই মতে—তাহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। রবীন্দ্রনাথও ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ইহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম মাত্র নহে; ইহাতে সকল প্রকৃতির ও সকল শ্রেণীর উপযোগী সাধনার নির্দেশ আছে, সংসার ও ধর্ম, ভোগ ও বৈরাগ্য ইহাতে সুন্দর সামঞ্জস্যে বাঁধা পড়িয়াছে।

"যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্মকর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম।"

—ধর্মতত্ত্ব। পঞ্চম অধ্যায়।

এইজন্য শারীরিক বা মানসিক কোনও বৃত্তির ধ্বংস সাধন নহে, সকলের সামঞ্জস্য স্থাপন তাঁহার আদর্শ। তিনি বলেন, উৎকৃষ্টবৃত্তি সমূহের সমুচিত স্ফূর্তি ও নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির সংযম আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়-সমূহও সংযত হইলে ধর্মপথের অন্তরায় হয়না। জীবন ধারণে তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। ঐগুলির উৎসাদন বা সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে গেলে মানব-সংসার লুপ্ত হইবে।

৪

জ্ঞান প্রীতি বা ভক্তি এবং কর্ম, এই তিনের সমঞ্জস বিকাশে পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাদের কোনটিকে একান্ত করিয়া লওয়া বঙ্কিমের নিকট প্রকৃষ্ট আদর্শ নহে। 'জ্ঞান' বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পরাজ্ঞান নহে, সর্ববিধ জ্ঞানই বুঝিয়াছেন। জাগতিক জ্ঞানের সাধনাও কর্তব্য, কারণ তাহা আমাদের জীবন-বিকাশের অনুকূল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মপর ভেদ অর্থহীন। সকলের নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। অধুনা জাগতিক জ্ঞানে পাশ্চাত্য দেশ উন্নত। এই জ্ঞানের জন্য আমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যার সাহায্য লইতে হইবে।

"গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব রসায়ন। এই জ্ঞানের গুরু আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিতে হয়। তারপর আপনাকে জানিবে কোন শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে ও অন্তর্বিজ্ঞানে

গুরু। অর্থাৎ "Biology, ও Sociology.—এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিতে।"

—ধর্মতত্ত্ব। পঞ্চদশ অধ্যায়।

অতঃপর ঈশ্বরকে জানিবার জন্য গুরু হিন্দুশাস্ত্র পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন। বিদ্যালাভই প্রকৃত জ্ঞান নহে। "জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই শ্রীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছিবে।"—ধর্মতত্ত্ব। পঞ্চদশ অধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসমূলক ধর্মের অনুরাগী, কাজেই আলো কর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহার অনুমত নহে। তবে কর্মান্তে সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই। হিন্দুর চতুরাশ্রম-ব্যবস্থায় এইরূপ বিধি আছে। জ্ঞান যোগীর পক্ষে কর্মত্যাগ সাধনার সহায় হইতে পারে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "ভগবান্ বলেন যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ।"

হিন্দুর সন্ন্যাস বিলাতী ascecticism নহে। সন্ন্যাস সম্পূর্ণ কর্মত্যাগ নহে।

"কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।"—ধর্মতত্ত্ব। ষোড়শ অধ্যায়।

এই নিষ্কাম কর্মরূপ সন্ন্যাসের আদর্শই বঙ্কিম 'জ্ঞানস্থমঠ,' 'দেবীচৌধুরাণী,' 'সীতারাম' এবং 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন।

৫

'ধর্মতত্ত্ব' ব্যাখ্যায় বঙ্কিমের স্বাজাত্য ও স্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় আছে, কিন্তু অহৈতুক গোঁড়ামি নাই। পরন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে তিনি ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা আমাদের অনুধাবনযোগ্য এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া অনেকাংশে আমাদের অনুসরণীয়। ইহা কেবল অনুরাগ-বা সংস্কার-মূলক ধর্ম নহে, মুখ্যতঃ rational' বা যুক্তিমূলক ধর্ম। অভিজ্ঞতা হইতে যে ধর্মের উপলব্ধি আসে, তাহা জীবনসমস্যাকে এড়াইয়া চলেনা এবং সেই কারণেই সাধারণ মানুষের নিকট তাহা অবাস্তব স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়না।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সুপণ্ডিত বঙ্কিম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত ধর্মজ্ঞানকে মিলাইতে চাহিয়াছেন। বিজ্ঞান জাগতিক নীতির আবিষ্কারক, 'জীবন নীতির' বা ধর্মের সহিত তাহার বিরোধের কারণ নাই।

বঙ্কিম-প্রচারিত ধর্ম মূলতঃ জীবন-নীতি। মানুষের 'অনুশীলন'-ই মনুষ্যধর্ম। তাই আত্মপ্রীতিও আত্যন্তিক হইলে ধর্মবিরোধী নহিলে, তাঁহার মতে, ধর্মের প্রতিকূল নহে। এই কথার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হারবার্ট স্পেন্সারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন: A creature must live before it can act."—'কিছু করিতে হইলে আগে জীবের আত্মরক্ষা আবশ্যক।

"জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আত্মরক্ষাকেও নিষ্কামকর্মে পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য। তুমি যাহা কিছু আহার্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও তবে তোমার দানধর্মের শেষ হইবে। কেননা তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। —ধর্মতত্ত্ব। ষাবিংশ অধ্যায়।

অবশ্য কখনও কখনও পরার্থে আত্মত্যাগও কর্তব্য, তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন। তবে যদি সকলে সর্ব ব্যাপারে আত্মরক্ষায় বিমুখ হয় তবে সংসার চলিতে পারে না। নিজের ভোগ বিলাসের জন্য নহে, জীবনধারণের জন্য যাহা আবশ্যক তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তদতিরিক্ত যাহা তাহা পরার্থে উৎসর্গ হউক। কর্তব্য নির্ধারণকালে কিসে বেশী লোকের বেশী হিত হয়, দেখিতে হইবে। ইহাই বিলাতী 'হিতবাদ' বা 'ইউটিলিটেরিয়ানিজমে'র মূলকথা।

"হিন্দুধর্ম মতটা চাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু হিন্দুধর্মীদিগের ভ্রম এই যে তাঁহারা বিবেচনা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশমাত্র।"—ধর্মতত্ত্ব। দ্বাবিংশ অধ্যায়

আত্মপ্রীতির ন্যায় স্বজনপ্রীতি ও স্বদেশ প্রীতিও জগৎ-রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সুতরাং আমাদের কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে, আত্ম-স্বজন বা স্বদেশ-প্রীতি যেন ইহা ছাড়াইয়া সমগ্র জগতের কল্যাণের পরিপন্থী না হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতি যেন জগৎপ্রীতির অভিমুখে অগ্রসর হয়। নিজের মত সকলকে ভালোবাসিতে হইবে, ইহার নিজেকে বাদ দিয়া সকলকে, অথবা সকলকে বাদ দিয়া নিজেকে ভালোবাসিতে হইবে—এমন নয়। পরস্পরের পরিপূরক, পরিপন্থী নহে।

জ্ঞানার্জনী ও কার্যকারিণী বৃত্তির ন্যায় চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিরও বিকাশসাধন জীবনের পূর্ণতার পক্ষে আবশ্যক। চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত—ভারতবর্ষে উপাসনার সহায়করূপে গণ্য। প্রতিমাপূজা সৌন্দর্যের পূজা, মহানন্দাবের রূপময় প্রকাশ। ইহা পৌত্তলিকতা বা অন্ধ বিশ্বাসের নহে।

"The homage we owe to the Ideal of the Human realized in art is admiration. The homage we owe to the Ideal of the Divine realized in idolatry is worship.

—Bankim Chandra Chatterjee, 'Bangadarshan', September 28, 1882 (?)

"মানবদেহের আমাদের শ্রদ্ধার নাম ভক্তি আর প্রতিমা পূজার মর্মাদিয়া আমরা দেবত্বের আদর্শের প্রতিযে শ্রদ্ধা জানাইতে চাহি, তাহার নাম পূজা।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৮৮২ (?)

আধুনিক বিজ্ঞানতত্ত্বে সহিত হিন্দুর ধর্মতত্ত্বকে মিলাইয়া তাহাকে আমাদের মনোগ্রাহ্য ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী করিয়া দেখানো—বঙ্কিমের প্রধান চিন্তা ও কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ। তাঁহার প্রতিভা দীপ্তিতে হিন্দুত্বের সর্ববাদো যোগী শিক্ষা আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে তাহাদিগকে অবহা তত্ত্বরূপে হইয়া আমাদের দেহ জীবন-ব্যাখ্যারূপে উপস্থিত হইয়াছে। আপন হৃদয়ই তাঁহাকে ধর্মজিজ্ঞাসার অভিমুখী করিয়াছিল জীবনে সহস্র দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি নিত্যধর্মকে খুঁজিয়াছিলেন, এবং সেই সন্ধানের ফল আমাদের উপর যে আলোকে তাহার চলার পথ উদ্ভাসিত হইয়া ছিল আলোক তিনি আমাদের সম্মুখেও ধরিয়াছেন, তাহার কিয়া শুধু উপলব্ধিমূলী নহে, সংসারপ্রবাহ ও তাহাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বা ভাব-সাধনের উপলব্ধিতে পাঠকেরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু বিচারশীল সাধারণের নিকট যে-সব সমস্যা সমাধান—বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সুনিশ্চিতরূপে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশান্ত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

গ্রামের মুসলমানদের ওপর ঠিক কতখানি নির্ভর করেছিলেন বোঝা যায়নি। আর মুসলমানেরাও
ব্যাপারে তাদের কর্তব্য কি স্থির করেছে
এ পর্যন্ত তারা কোথাও মাথা
যেমন চুনীলাল মারফৎ বড়বাবুর তাতে
বেশি-বৈকুণ্ঠর সরাসরি সাড়া
তাদের দিক থেকে স্পষ্টই একটা নিরপেক্ষতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। মাঠে-ঘাটে, হাজারো খবর ভেসে বেড়ালেও ওরা সাড়া দেয়নি। চাষাবাদী, বেচাকেনার কথা নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেমন এক ধরণের নিষ্ক্রিয়তা—কাজে কি চাঞ্চল্যের নিয়ে। লাভের, অনেক দিকে ছাঁয়েছে!

সভাতারী করার জন্য জগবন্ধু ওদের সভা-সমিতিতে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু যাকে নেবে সে যদি আসে তোমার যাওয়াটাই বৃথা। উদয়পুরের মুসলমানরা এ পর্যন্ত একটা সভাতে, একটা মিছিলে কি একটা বৈঠকে যোগ দেয়নি, যদিও সব তাতেই তাদের নাম লিখে নেওয়া হ'য়েছিল। নারাণ-সেখ বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছিল কেবল নামের জন্যে! আন্দোলনের সর্বজনীনতা রক্ষার্থে সম্প্রদায় নির্বিশেষে রূপটা রূপের সামনে তুলে ধরতে হয়, জগবন্ধুর তা জানা আছে। উদয়পুরের কৃষক-ধর্মঘটের সংবাদ প্রকাশে তাই কোনোদিন বেণী মণ্ডলের পাশে নারাণ-সেখ বা লৌলত খাঁর নামটা বাদ পড়েনি। যথাকালে সে সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। সংবাদে বলা হয়, উদয়পুরের সর্বচারী হিন্দু-মুসলমান আজ সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ! ভূমির লড়াইয়ে একতাবদ্ধ! শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর! কিন্তু খবরের কাগজ দেশ নয়, ঘোষবাবুদের ভাগ্য ভাল! প্রকাশিত সংবাদ আজও সত্য নয়।

তাছাড়া ক'ঘরই বা মুসলমান, মরে-হেজে দশ-বিশ ঘর টিঁকে আছে; সে জানে এরা রসুল আলির কেউ ছিল কি না! কেন না এদের কারো মুখে ও নামটা শোনাই যায়নি কখনো। কাজাচাঁদের বংশধররা আলিসাহেবের নামের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এরা তার সিকির সিকিও পরিচয়ের ধার ধারে না। শুনতে পাই বাবুরা বলেন, ব্যস্ ঐ পর্যন্ত! পীরোত্তর জায়গাজমিগুলো বাবুরাই ভোগ-দখল করছেন, ঐ নিয়ে কে দরবার করছে!

কথা একবার উঠেছিল—সে অনেকদিন আগে। কোম্পানি আমল তখন সবে সুরু। কোথা থেকে এক মোল্লা এসে কি সব কাগজ-পত্তর মাতব্বরদের দেখিয়ে দেখিয়ে কদিন খুব পরামর্শ করলে, নামাজপড়ার নাম করে ঐ যে দিলভার বিবির ভিটেটা, যেখানে কবরের মাটি উঁচু হ'য়ে আছে—ওখানে সবাই কদিন সন্ধ্যে-সকাল জড় হ'লো! তার ক'দিন পরে একদিন বাবুদের খামারে গিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলে—মোল্লা নিঃশব্দে দর্গা তলার তালগাছটার তলায় ওঠ-বস করতে লাগল।

কি ব্যাপার? মুখপাত্র মোল্লা বললে, খামারের তালগাছের তলায় দু' কাঠা তিন ছটাক, আপনাদের গোলাবাড়ির ন' কাঠা দেড় ছটাক আর ঐ পাশ বাগানের সবটা পীরের স্থান, সুতরাং আমাদের প্রাপ্য প্রমাণ, চোতা একখানা কাগজ বার করে' মোল্লা

সন্তর্পণে খুলতে লাগল—কোন্ ভাঁজ থেকে কখন আবার খসে যায়।

গোরাচাঁদ চেয়ে দেখলেন, বড় জোর বিশটা কোয়ান হবে। মনে মনে কি ভাবলেন, মুহূর্তে ভ্রূযুগল তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো অধরোষ্ঠ অল্প অল্প নড়ল।

মোল্লাকে বললেন, দেখি কাগজখানা! এযে দেখছি নবাবী আমলের পাট্টা, চৌহদ্দি সীমানা বলা আছে।

মোল্লা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল, সাজোপাঙ্গ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে এ ওর মুখের দিকে চাইলে: মোল্লার এই দাবিটার পিছনে তাদের খুব জোর সমর্থন ছিল না—পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মত এ এক লাভ! দেখাই যাক না মোল্লার দৌড় কদ্দুর পর্যন্ত। কাছে পিঠে মসজিদ সেই গোপালপুরে, পাকা সাত পো পথ। সমাদর করে গোরাচাঁদ মোল্লাকে ডেকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। নিজেদের কাগজপত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে তো! নবাবী আমল আর কোম্পানী আমলে অনেক অদল-বদল হ'য়ে গেছে। সীমানার গণ্ডগোল হতেই পারে। সেই কবে আকবর বাদশা জরিপ করিয়েছিল।

বাইরে এরা অনেকক্ষণ বসে রইল। দর্গাতলায় তালগাছের ছায়া ক্রমে ছোট হ'য়ে এল, মোল্লা আর ফেরে না, সীমানা-নির্দেশে বুড়ো হ'য়ে গেল নাকি, কিংবা ভেস্তা নেই!

তারপর যখন জানা গেল তখন নামাজ পড়বার সময় হ'য়ে গেছে—পাখী বাগানের ওপর স্বর্গ নেমে গেছে।

মোল্লাকে গোরাচাঁদ গুম করে দিয়েছেন, লোক দিয়ে বাইরে প্রতীক্ষমাণ দাবীদারদের বলে পাঠিয়েছেন, যদি ভাল চায় তো সরে পড়ুক, নইলে তাদের সবাইকে জ্যান্ত গোর দিয়ে আরো খানিকটা জমি লিখে পড়ে দেবেন—ফালতু লাভ হ'বে।

মুখে আর কারো কোন কথা সরে না। হঠাৎ কলজের ছোরা খাওয়ার মত আঁক করে উঠেই তারা উঠতে উঠতে খামার পেরিয়ে যে-যার ডেরায় ফিরে গেল।

কোম্পানীর আমল, বাবুরাই এখন হর্তাকর্তা বিধাতা। শালার মোল্লাকে তখনই বারণ করা হ'য়েছিল! নেড়ের খোঁ। উদয়পুরের বাবুদের চেনে না, দিনকে রাত করতে পারে, রাতকে দিন!

সেই থেকে নাকি এরা আর মাথা তোলেনি। যেমন ছিল তেমনিই আছে, প্রাণের একধারে একটেরে, দীন-হীন, অল্প-স্বল্প। গাড়োয়ানি, চাষ-বাস, জন-মজুরী কি পেটাদারিগিরি জীবিকা! উদয়পুরে এখন এদের জমি জমার পরিমাণ কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পৌনে পাঁচ বিঘে। সেটেলমেন্টের পর্চায় কারো কারো নাম উঠেছে দখলিকারে স্বত্বে!

এখন নারাণ সেখই এদের মাতব্বর! অবস্থাটা মন্দের ভাল। নিজ লাঙ্গলে বিঘে বারেক চাষাবাদ করে। পায় তো আগাম নেয় বাবুদের কাছ থেকে। ধান-গাগুও আছে কিছু।

উদয়পুরে গ্রামের ঠিক মুখে (মহড়া আগলে) এই ক'ঘর মুসলমানদের দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ গাঁয়ের ভূস্বামীরাই একদা তাঁদের প্রয়োজনে অর্থাৎ ধনমান রক্ষার্থে, এদের এনে বসিয়েছিলেন। আজ সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে এদের বাস তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আজ তো তাকাই যায় না।

বাকি খাজনার ডিক্রী পেলেও চালকেটে বাস তোলার কি সব্য সব্য ভিটের সরষে ঘুনে দেবার, কি পোড়া মাটি করার হুকুম নেই—দিন-কাল বদলে গেছে, দিশি রাজাদের মত এখন মনোতুষ্টি, মশাই মশাই! মুসলমান এখন পীর ঠাকুর।

বেইমানী কথাটা চুনীলালের বানান। নারাণ সেখ এমনিই যেতে রাজী হয়নি—কি দরকার গণ্ডগোলের মধ্যে গিয়ে—এই তো অবস্থা। বেশ আছে তারা একধারে! তাছাড়া বাবুদের জমি করবার সামর্থ্য কই—তাদের গাড়ি ছেঁকে গরু বিক্রী করে ক'পয়সায়

বা জাতভাইরা
তেমন চলে
খালাস ক'রতে পেতমায়
পহরা থাকলে না কথা।

তা ছাড়াও মানীলোকের মানের কথাটা নারাণ ভেবেছিল। এককালে তার বংশের লাঠিই যে সে মান রক্ষা করেছিল তাও মনে হয়েছিল। বেশী দিনের কথা নয়, এক পুরুষ আগে, নারাণের ঠাকুর্দা আজকের লাট্টি বাড়িতে এতরাতে বাসের সর্দার করেছিল—

করা লেঠেল ছিল। পথল বেপথল, চাল্লাম চল্লাতে বাবুদের ডান হাত! পুরস্কার স্বরূপ বাবুরা তাকে এপার কাটা তিন ছটাক ধান জমি দান করেছিলেন। সেই জমি আবার তহসিলের বাকি খাজনার ডিক্রীতে বাবুরাই ডেকে নিয়েছেন। এখন সেখানে ধান ফলে না, রেবারেষিতে নোনা ফুটে থাকে বারমাস। বাবুরা কয়েকবার চাষ করবার চেষ্টা করেছিলেন প্রজাবন্ধ প্রমাণ করবার জন্যে, কিন্তু ঘুঘাই হাঁস, মুরগী আর চোর ছেঁচড়ের জ্বালায় একবারও শস্যও খামারে ওঠেনি। আর কে নেবে ও জমি এই মুসলমানপাড়ার মধ্যে এসে?

চুপচাপ বসেছিল নারাণ দাবার ওপর জলচৌকি পেতে সামনে জেলা বোর্ডের কাঁচা প্রশস্ত রাস্তাটার দিকে চেয়ে। জ্যৈষ্ঠের রোদে খড়ি ফোটা মাটি তেতে বায়ুবেগে ধূলোমুটির মত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। সামনে রাস্তার ধারে পুকুরের মাঝখানে পোতা বাঁশের ডগায়, যে মাছরাঙাটা এতক্ষণ আশায় আশায় বসেছিল সেটা কখন উড়ে গেছে। ঘোলা জল স্থির, একটিও সরকী বাখা উঁচু করেনি গভীর জলের শীতল আশ্রয় থেকে—উপরের জল এরি মধ্যে তেতে গেছে! পুকুরের লাগোয়া হাটুভাঙা, হাঁ-করা বাগানটার একটা গাছে একটা কাক হা-ক্লান্ত হয়ে বসে চোখের তারা উল্টোবার চেষ্টা করছে। নিদাঘে যদি ঘুম আসে।

হঠাৎ এক ঝলক ধূলো রাস্তার ওপর থেকে ছুটে এসে নারাণের দাবার ওপর উঠে পড়ল। নারাণ চোখ বুজলে।

হাতে মুখ ঝেড়ে উঠে পড়ে নারাণ বললে, এবারে শালার গরমটা আসাঢ়ের মত। শালার মেঘে এক ফোঁটা পানি নেই! কি হলো, দিন-কাল সব উল্টে গেল নাকি!

তারপর তামাক খাবার জন্যে আগুন-মালসাটা খোঁচাতে লাগল নারাণ—কি করবে, কাজ নেই বসে' বসে, তামাক খাই! বুড়োও হয়েছে, শুধু শুধু আর ওঠা-হাঁটা করতে ভাল লাগে না! কাজকর্ম ছেলেটাই করে।

হুঁকাটি মনে মুখে তুলেছে সামনে চেয়ে, নারাণ সসম্ভ্রমে বললে, সালাম ছোটবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক!

কালীপ্রসাদ এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে। দাবার নীচে এসে বললে, কি হ'চ্ছে খাঁ সাহেব একা একা বসে? নাস্তা হ'য়ে গেছে!

জল-চৌকিটা দুদ্দি দিয়ে মুছতে মুছতে নারাণ বললে, বসতে আজ্ঞা হোক! গরিবের বাড়ি আইছেন!

এসেছি কি আর সাধে! কালীপ্রসাদ মুখে বললে, না, মানে যাচ্ছিলুম এধার দিয়ে, দেখলুম বসে আছ, ভাবলুম একবার—

নারাণ খুব খুসী হ'য়েছে মনে হয়। আব আব ওপ্পরে বললে, বহুৎ মেহেরবাণী। খবর ভাল বাবু সাহেব?

আবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে কালীপ্রসাদ বললে, না, বসবো না—যাই। থাক্ কই আর ভাল!

বসবেন না! চলবেন! দাবার নীচে নারাণ নেমে এল।

পা পা এগোতে আরম্ভ করেছে কালীপ্রসাদ। উদ্দেশ্য যেন পথ চলতে লোকটার সঙ্গে দেখা, উপযাচক সাক্ষাৎ করতে আসেনি তা বলে।

(শেষাংশ ১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

শরৎ-সাহিত্যে যাঁরা সশ্রদ্ধ ও সচেতন, তাঁদের কাছে "শ্রীকান্তের" চতুর্থ পর্বের প্রয়োজন আছে কিনা—সরাসরিভাবে প্রশ্ন করাটা অশোভন ও অসম্মানজনকই মনে হবে। সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্প হচ্ছে শ্রীকান্ত; শরৎচন্দ্র নিজে যদি চতুর্থ পর্ব লিখে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন ছিল ধরে নিতে হবে। তবু-ও অনেক উন্নাসিক সমালোচক নিজেদের কেতাবী বুদ্ধির খাপে ফেলে শ্রীকান্তকে বিচার ক'রে থাকেন; তাঁদের খাপের চেয়ে ছোট হ'লে তাকে তাঁরা টেনে লম্বা করবেন, আর বড়ো হ'লে কেটে বাদ দিয়ে নেবেন। 'Procrustian Bed' যদি কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে এই ধরণের সমালোচনা।

তবু-ও আমরা একবার বিচার ক'রে দেখবো শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের। অপরিণত ও অগভীর দৃষ্টিতে দেখলে প্রথমতঃ মনে হয়—সত্যিই-তো, শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বটা বড়ো টেনে-আনা, অপ্রয়োজনীয় ঘটনা-সন্নিবেশের ফলে প্রথম তিনটি পর্বের অতুলনীয় শিল্প-নৈপুণ্য চতুর্থ পর্বে দেখা যায় না,—এবং অনেকের ধারণা, মাসিক পত্রের চাহিদা মেটানোর অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এটা। এ-জাতীয় সমালোচকদের যুক্তি হ'ল যে, শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের মধ্যে আছে তিনটে আখ্যায়িকা—একটা হচ্ছে গহর-সম্পর্কিত, আরেকটা কমললতা ও বৈরাগ্য আখড়ার বিষয়ে, এবং বাকীটুকু হ'ল শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর ব্যাপার—এবং সেইসঙ্গে পুঁটু ও ঠাকুর্দার কথা। শ্রীকান্তের সঙ্গে গহরের ষ্টেশনে দেখা হওয়া নিয়ে যে-কাহিনীর আরম্ভ ও গহরের মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে যার শেষ, সে-কাহিনীটা আপনার মধ্যে আপনিই সম্পূর্ণ—শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীঘটিত মূল কাহিনীর সঙ্গে যার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। কমললতা ও বৈষ্ণবদের নিয়ে যে-কাহিনী আছে, তার-ও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়-সম্বন্ধে কোনো আলোক-পাত করবার প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। কাজেই—শরৎচন্দ্র অনায়াসে গহর আর কমললতার কাহিনী বাদ দিতে পারতেন; এবং এই দুটি কাহিনী বাদ দিলে চতুর্থ পর্বের যা বাকী থাকে তাকে তৃতীয় পর্বেই যুক্ত করে দেওয়া যেত। এই সমালোচকেরা আরও বলতে পারেন—যদি গহর ও কমললতার কাহিনীর জন্যই চতুর্থ পর্বের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তবে বর্মায় ফেলে-আসা অভয়ার কথা, এবং রাজলক্ষ্মীর পিয়ারী-জীবনের আরো কিছু কথা দিয়ে আরেকটা পঞ্চম পর্বই বা লেখা হ'ল না কেন? অথবা কেউ কেউ বলতে পারেন, শরৎচন্দ্র যদি তৃতীয় পর্বের শেষেই শ্রীকান্ত-কাহিনীর যবনিকা টেনে দিতেন, তবে-ও তো তা একটা উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি হ'তে পারতো—পাঠকেরা জানতো, অতীত দিনের অবাঞ্ছিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রকৃষ্টতম পন্থা রাজলক্ষ্মী খুঁজে পেল কঠোর তপশ্চরণের মধ্যে।

এই আলোচনা থেকে তিনটে বিষয় স্পষ্ট হ'ল। প্রথমতঃ, কারো কারো মতে, শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বটাই অপ্রয়োজনীয়, কারণ এর মধ্যে অসংলগ্ন ও অনাবশ্যক কাহিনী রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, কারো কারো মতে, তৃতীয় পর্বের অন্ত-ই শ্রীকান্তের যবনিকা টেনে দিলে রসসৃষ্টি ব্যাহত হত না। তৃতীয়তঃ যাঁরা দ্বিতীয় মত মেনে নিতে রাজী ন'ন,—অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন যে, তৃতীয় পর্বেই শ্রীকান্ত-কাহিনী শেষ করা চলে না, তাঁদের কাছে হয়তো একটা চতুর্থ পর্বের প্রয়োজন, কিন্তু তা'তে ও গহর ও কমললতার কাহিনী অনাবশ্যক, বরং অন্য কোনো আগেকার ঘটনার কথারই সমাপ্তি থাকবে। এখন বিচার করে দেখা যাক, এই তিনটে মত কতদূর মেনে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই দেখা যাক, গহরের কাহিনীটা অপ্রয়োজনীয় কি না। এখানে-ও, "প্রয়োজন" কথাটার প্রকৃত ইংগিত কী তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু আমরা শুধু দেখব গহরের কাহিনীটা শ্রীকান্তের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সংগতি গহরের কাহিনীটা শ্রীকান্তের ঘটনা কাহিনীটা বাদ

• স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত প্রবন্ধ: "সংস্কৃতি"—শরৎ-জয়ন্তী ১৩৬০; প্রায় অপরিবর্তিত।

কিনা। এর আলোচনা করতে চ'লে কাশী থেকে ফিরে আসবার পথে শ্রীকান্তের মনের একবার খোঁজ নিতে হবে। রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্ত যে-ব্যবহার পেয়েছে, তা তার কল্পনাতীত। এতকাল যাকে প্রদক্ষিণ ক'রে শ্রীকান্তের জীবন আবর্তিত হয়েছে, সেই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে আর পূর্বের মতো তার ভাগ্যাকাশে থাকতে দিতে রাজী নয়। শ্রীকান্তের জীবন আজ তাই নিজের কাছে অর্থহীন, দিশেহারা। এতটা পথ যে সে চলেছিল রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণে, সবটাই তার কাছে আজ ব্যর্থ ব'লে মনে হ'ল। সে তাই চাইল নিজেকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলতে—যাতে ক'রে সে ভুলতে পারে যে তার আগে একটা জীবন ছিল। এমনি যখন মনের অবস্থা, সে তখন দই ও পাঁড়ার পরিবর্তে অনায়াসে ঠাকুরদার ফাঁদে পা জড়াতে পারল। চ'লে এলো সে তার বহুদিনের অবজ্ঞাত দেশে। তারপর সে ঠাকুরদার ফাঁদ থেকে অব্যাহতি পেল কিনা তা জানবার প্রয়োজন আপাততঃ নেই। দেশে যখন সে এসেছে, কোন সংগত ও গ্রহণযোগ্য কারণ পেলেই কয়েকটা দিন অনাহারে সে থাকতে পারে। স্টেশনে গাড়ি ফেল করা, এবং পরবর্তী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করবার সময়ে গহরের সংগে শ্রীকান্তের সাক্ষাৎ মোটেই আকস্মিক নয়—বরং এরকম ঘটনাই আমরা আশা করছিলাম। গহর যদি শ্রীকান্তকে দেখতে না পেত, তবে হয়তো শ্রীকান্ত-ই কলকাতার পথে পাড়ি না জমিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ত পুরোনো বন্ধুদের সন্ধানে। কাজেই—গহরের কাহিনী না হয়ে হয়ত অন্য কোনো লোকের কাহিনী হয়ে যেত। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে গহরের কাহিনী একটু-ও অপ্রয়োজনীয় নয়। এ-কাহিনী না হ'লে-ও অনুরূপ অন্য কোনো কাহিনী শরৎচন্দ্রকে সাজাতে হ'ত-ই। নইলে কী ক'রে শ্রীকান্ত দুঃসহ বেদনার দিনগুলো ভুলে থাকতে পারবে?

আরেক দিক দিয়েও গহর সম্পর্কিত কাহিনীকে অনাবশ্যক বলা যায় না সেই অর্থে, যে-অর্থে ইন্দ্রনাথের সংগে মাছ চুরি করতে যাওয়া, বা অন্নদাদিদির বাড়িতে খাওয়ার ঘটনাকে অনাবশ্যক বলা চলে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রীকান্ত উপন্যাসটা শুধু রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত-কেন্দ্রিক প্রণয়কাহিনী নয়; এক কথায়, শ্রীকান্তের দীর্ঘদিনের দিনপঞ্জীর সঙ্কলন হচ্ছে এই উপন্যাসটি। এর মধ্যে অনেক ঘটনা আছে যা শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয়-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নয়—কিন্তু যা শ্রীকান্তের চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। গহর ও কমললতার কাহিনী যে শ্রীকান্ত-চরিত্রের নতুন পরিচয় দিতে পারে নি এ-কথা কেউই বলতে পারবে না।

কমললতার কাহিনী-ও এক-ই কারণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু গহরের কাহিনীর চেয়ে কমললতার কাহিনীর গভীরতা অনেক বেশি। কমললতার সস্নেহ যত্নে শ্রীকান্ত কয়েকদিনের জন্য নিজের পূর্বসত্তা বিস্মৃত হতে পেরেছিল; কিন্তু এখানেই কমললতা প্রসংগের প্রয়োজন ফুরোল না। কমললতা তার নতুন গোঁসাইয়ের কাছে ব্যক্ত করেছিল তার অতীতদিনের কলংক-মাখা ইতিহাস। পরে রাজলক্ষ্মীও যে শ্রীকান্তের কাছে তার বিগত-জীবনের আবছা ইতিহাস ব্যক্ত করল তার দেরণা পেয়েছিল কমললতার কাহিনীর মধ্যে। আর, কমললতার প্রেমকে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের পাশাপাশি রেখে শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্যকে অনেক স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। শেষের দিকে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে এবং শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে যে অমন নিবিড় ক'রে পেল, সেই পাওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কমললতার দান কম নয়। কমললতা ও বৈষ্ণবদের আখড়ার কাহিনী এক হিসাবে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী—উভয়ের চরিত্রের ওপর-ই অনেকটা আলো বিস্তার করেছে। কাজেই চতুর্থ পর্বে কমললতার ও বৈষ্ণবদের কাহিনী যে অপ্রয়োজনীয়—এ-কথা প্রমাণ করবার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ শক্তিমান কথাশিল্পী এমন সুমিত নৈপুণ্যে বিভিন্ন কাহিনীর সন্নিবেশ করেছেন যে আপাত-অসংলগ্ন বিষয়ও গভীরতর দৃষ্টিতে যথাযথ হ'য়ে ওঠে,

এবং বিভিন্ন বিষয়ের মূলগত ঐক্যটানটি লক্ষ্য ক'রে আমরা মুগ্ধ হই। শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্ত-আখ্যানের যে সুন্দর সমাপ্তি আছে, তার সৌন্দর্যের অনেক খানি-ই ব্যাহত হ'ত, যদি গহর ও কমললতার কথা এর মধ্যে না থাকত।

পুঁটুর কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে না, কারণ তৃতীয় পর্বের শেষ দিকে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধ যেমন অস্বাভাবিক ভাবে ভেঙে গিয়েছিল, পুঁটুর কাহিনী-ই তার একমাত্র জোড়া লাগানো কালাই হল। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, শ্রীকান্ত যখন ধীরে ধীরে ঠাকুর্দার বেড়াজালে ধরা দিল, তা থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় সে দেখল রাজলক্ষ্মীর কাছে। রাজলক্ষ্মী যদি তার ভাগ্যাকাশ থেকে শ্রীকান্তকে চির বিদায় দিয়ে থাকে, তবে সে স্বীকৃতি দিক পুঁটুর সংগে শ্রীকান্তের বিবাহের ; আর যদি তার কাছে শ্রীকান্তের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন-ও থেকে থাকে তবে স্পষ্ট ভাষায় রাজলক্ষ্মী জানাক যে এ বিবাহ হ'তে পারে না। রাজলক্ষ্মীর সংগে হিসেব-নিকেশ পরিষ্কার করবার জন্যেই শ্রীকান্ত তার কাছে চিঠি লিখেছিল। এবং তার যথাযথ উত্তর-ও সে পেল, তার সমস্ত আশংকা, সন্দেহ ও অশান্তির অবসান হ'ল। সুনন্দার মন্ত্রে ও গুরুর মন্ত্রণায় যে রাজলক্ষ্মী তার নিজের হাতে গড়া স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, সে এবার বুঝতে পারল নিজের ত্রুটি ও ভ্রান্তি, এবং ঘনায়মান কুয়াশা দূর করবার ভার সে নিজের হাতেই নিল।

কাজেই পুঁটুর কাহিনীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না ! আবার অন্য দিক দিয়ে, গহর ও কমললতার কাহিনীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র রক্ষা করেছে পুঁটুর ব্যাপার। অপরাজেয় কথাশিল্পী এমনি ক'রেই "শ্রীকান্তের" আগাগোড়া ঘনসন্নিবদ্ধ করে গড়েছেন। তাঁকে পরাজিত করা যায় না সমালোচনায়।

যাঁরা বলেন যে শ্রীকান্তের কাহিনী তৃতীয়-পর্বেই শেষ করলে রসসৃষ্টি ব্যাহত হত না, তাঁদের হয় রস-সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান অল্প, অথবা তাঁদের দুঃসাহস একটু বেশী। এখানে মনে রাখা উচিত যে যে-জাতের "সাহিত্যিক" মাসিকপত্রের সম্পাদকের নির্দেশে অথবা অর্থ-উপার্জনের জন্য সাহিত্য" রচনা ক'রে থাকেন, তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে গণ্য করবার দুঃসাহস আমাদের যেন না হয়। তৃতীয় পর্বেই শেষ করলে শ্রীকান্ত-কাহিনীর রসসৃষ্টি ব্যাহত হয় কি না হয় তা সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে চতুর্থ পর্বের ফলে সে রসের সৃষ্টি হয়েছে তার সংগে তুলনা ক'রে দেখলে।

শ্রীকান্তের বিচিত্র জীবন যেদিকে মোড় ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তার স্বাভাবিকতা খুবই ব্যাহত হ'ত, যদি তৃতীয় পর্বেই শ্রীকান্তের উপাখ্যান সমাপ্ত হ'ত। শ্রীকান্তের এতদিনের জীবন-কাহিনীর সব কিছুই ব্যর্থতায় শেষ হ'ত তা হ'লে। এই মনোভাব শ্রীকান্ত ব্যক্ত করেছে এমনিভাবে : "এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আবার জীবনে আজ হইত, বিসর্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ও-দিকটা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতোখানি শেষ, তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন ?

"কিন্তু এই ত সেদিন। কুমার সাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—সৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই,—তথাপি হারানোটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার বিশ্ব জুড়িয়া রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্মায় পৌঁছিব। কিন্তু এ যেন সর্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ীর ঘরে ফেরা।" [৪র্থ পর্ব (১৩৪৯ সং) পৃঃ ৬]

রাজলক্ষ্মী একদিন বৈচির মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে যে শ্রীকান্তকে বর ব'লে জেনেছিল, এবং তার

বিশ্বাসের আবার যাকে সে অযাচিতভাবে পেয়েছিল, তাকে এমনি ক'রে উপেক্ষার মধ্যে বিদায় দিতে সে পারবে না—তাহ'লে যে রাজলক্ষ্মীর অকৃত্রিম হৃদয়কে অস্বীকার করা হয়। যেদিন কাশী থেকে উপেক্ষাহত চিত্তে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছিল, সেদিন থেকে ভ্রান্ত-তপস্বিনী রাজলক্ষ্মীর অন্তরেও তীব্র দহন জ্বলেছিল, এবং সেই দহনজ্বালা ভস্মসাৎ ক'রে দিল তার কৃত্রিম-শান্তিপরায়ণ সাধনভজন কৃচ্ছ্রসাধনকে। আবার যদি শ্রীকান্তকে সে ফিরে না পেত তা হ'লে তার জীবন যে কোথায় ভেসে যেত তা আমরা কল্পনা করতে পারি। তৃতীয় পর্বেই যদি শ্রীকান্ত কাহিনী শেষ করা হ'ত তবে এইরকম একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি তৈরী হ'ত হয়তো। কিন্তু—কথা হচ্ছে—সুনিপুণ আর্টের খাতিরে শরৎচন্দ্র তা করতে পারেন নি, কারণ, শ্রীকান্তকে আবার ফিরিয়ে না এনে, কেবল রাজলক্ষ্মীর মর্মপীড়া ও শ্রীকান্তের হতাশা ব্যক্ত করলে একদিকে যেমন তৃতীয় পর্বের [illegible] বিকর্ষ ব্যাহত হ'ত, অন্যদিকে উচ্চিষ্ট ট্র্যাজেডির সৌন্দর্য-ও সবটা অব্যাহত থাকতে পারতো।

তৃতীয় পর্বে ঘটনা প্রকাশের এমন একটা ঢঙ্‌সবুজনি রয়েছে যার মধ্যে এমনি ট্র্যাজেডির উপকরণ জোগানো অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। যদি জোর ক'রে তৃতীয় পর্বেই শরৎচন্দ্র দেখাতেন রাজলক্ষ্মীর অনুশোচনা ও অন্তর্দাহ এবং শ্রীকান্তের চিরবিদায়, তাহ'লে তৃতীয় পর্বের মূল ছন্দের সঙ্গে তার মিল হ'ত না কিছুতেই। তৃতীয় পর্বে খুব স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ক্রমশঃ একটু দূরে রাখতে চায়, এবং তার চরম অবস্থা হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধনরতা রাজলক্ষ্মীর নিদারুণ উপেক্ষা। এই অস্বাভাবিক উপেক্ষা দিয়েই যদি ট্র্যাজেডি গড়তে হয় তার প্রয়োজন ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর মর্মানুশোচনার পরিচয় দেওয়া; এবং তার পরিচয় দিতে হ'লে আরো কিছু ঘটনাবিন্যাসের দরকার—অর্থাৎ আরেকটি পর্ব অতি প্রয়োজনীয়। কাজেই, যাঁরা বলেন যে তৃতীয় পর্বেই সমাপ্ত হ'লে শ্রীকান্ত-উপন্যাস আরো ভালো হ'ত তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয় না।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকান্তের আগাগোড়ায় শিল্পী শরৎচন্দ্র যেমন আন্তরিকতার সংগে প্রত্যেকটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন—বিশেষ করে রাজলক্ষ্মীর প্রণয় কাহিনী—তা'তে শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী যে শ্রীকান্তকে ঠেলে ফেলে দেবে এ-কথা কল্পনা করা-ও যায় না। তাই তৃতীয় পর্বের শেষে সর্বস্ব খুইয়ে শ্রীকান্তকে ফিরতে দেখে সহানুভূতিশীল পাঠকের মন বিশ্বাস করতে চায় না যে এটাই সত্যি। চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর দীর্ঘ পত্রোত্তর পাঠ ক'রে অবশেষে সে স্বস্তি লাভ করে। তৃতীয় পর্বেই যদি শ্রীকান্ত-কাহিনীর যবনিকা টেনে দেওয়া হ'ত, তবে অতৃপ্ত পাঠকের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ও দাবী জাগত, সে ভাবত, রাজলক্ষ্মীর চরম-উপেক্ষাই যদি শ্রীকান্তের অনন্ত প্রণয়ের পুরস্কার হয়, তবে কী প্রয়োজন ছিল রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তের এত বড়ো অন্তরঙ্গজন ক'রে আঁকবার? সে প্রশ্ন করত—এই দীর্ঘদিনের পথচারণের পর এই চরম হতাশা ও বঞ্চনার পাথেয় নিয়ে শ্রীকান্ত কী ক'রে জীবনের পথে এগোবে? সহৃদয় পাঠক তাই চাইত শ্রীকান্তের সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে।

আরেক প্রকার অভিযোগ হচ্ছে যে, শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বেরই যদি প্রয়োজন থাকে, তবে তা থেকে গহর ও কমললতার অপ্রাসংগিক উপাখ্যান বাদ দিলে ভালো হ'ত, বরং অন্যান্য কাহিনী, যেমন রাজলক্ষ্মীর পিয়ারী-জীবনের কোনো ঘটনার প্রকাশ, শ্রীকান্তের আবার বর্মায় যাওয়া এবং অভয়ার কথা—ইত্যাদি যোগ করা উচিত হ'ত।—অর্থাৎ শ্রীকান্তের একটা চতুর্থ পর্বের দরকার থাকলেও বর্তমান চতুর্থ পর্বটা অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানেও মূলতঃ অভিযোগ হচ্ছে গহর ও কমললতার কাহিনীর বিরুদ্ধে। এ-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যা তা আগেই

পরিস্ফুট করেছি। অভিযোগের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে আমাদের বলবার বেশি কিছু নেই—কারণ এ-জাতীয় অভিযোগ যে অগভীর তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রাজলক্ষ্মীর পিয়ারী-জীবনের যেটুকু ইতিহাস আমরা চতুর্থ পর্বে পেয়েছি, ও-ই যথেষ্ট মনে করা উচিত। তার চেয়ে একবিন্দুও বেশি জানতে চাওয়া অনাবশ্যক। একটা বৃহৎ উপন্যাসে, বা উপন্যাস-জাতীয় রচনায় নানারকমের অপ্রধান ঘটনা থাকবেই; তাদের প্রত্যেকটিকেই যে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আভাসে ইংগিতে সংকেতময় ক'রে যে বর্ণনা দেওয়া হ'য়ে থাকে, তা-ই পাঠকের কৌতূহল উজ্জীবিত রাখে হয়তো তা চরিতার্থ করে না। না-ই বা করল। শ্রেষ্ঠ শিল্পের ধর্ম-ই হচ্ছে ইংগিতময়তা। সে-কারণেই, যাঁরা মনে করেন, অন্নদার সম্বন্ধে সব বলা হয় নি, রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে-ও অনেক চেপে রাখা হয়েছে, শ্রীকান্তকে বর্মায় নিয়ে যাওয়া হয় নি, ইত্যাদি—তাঁদের শিল্পবোধের অপ্রাচুর্য ঘটেছে বলেই সংগত ধারণা জন্মে।

একজাতীয় কাহিনী আছে (যেমন গোয়েন্দাকাহিনী) যাদের শেষ অধ্যায়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান ও সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'য়ে থাকে। 'শ্রীকান্ত' সে-জাতীয় উপন্যাস নয়। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থে-ও যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, 'শ্রীকান্তে'ও তার অভাব নেই। আমরা জানি, শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ সমস্যার দিকে তীব্র ইংগিত ক'রে তাদের স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন; সমস্যার সমাধানের দিকে তিনি যেতে চান নি। কারণ, সমস্যার স্বরূপ প্রকাশ করাকেই ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য ব'লে ধরে নিয়েছেন শরৎচন্দ্র, সমাধানের ভার ছেড়ে দিয়েছেন অন্যের হাতে। শ্রীকান্তের আগাগোড়া এমনি সমস্যাসঙ্কুল ঘটনায় ভরা; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র প্রাথমিক সংগে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে তাই পূর্বেকার সমস্যাগুলোর প্রত্যেকটারই সমাধানের আশা করা যায় না। সেইজন্যই হয়তো অনেকে অনেক প্রশ্নের জবাব না পেয়ে চতুর্থ পর্বের ওপরে চ'টে যান। কিন্তু শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত-প্রণয়ের এক সুন্দর সমাপ্তি আছে এবং এই বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্য এখানেই ব্যক্ত করেছেন পূর্ণভাবে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে তার অন্তরতম রাজ্যের সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিল।—ছেলেবেলার ছেলেখেলার সে শ্রীকান্তকে বরমাল্য দান করেছিল যে অলিখিত মুহূর্তে, তার নিজের উত্তর জীবনে অনেক পংকিলতা এসে জমা হওয়া সত্ত্বে-ও সে সেই মুহূর্তের কথা বিস্মৃত হয়নি। পিয়ারীর জীবন যাপন করতে সে বাধ্য হয়েছিল দৈবিক প্রয়োজনে কিন্তু মনের শুচিতা তার অটুট ছিল। সে তার অবচেতন বা সচেতন মনের এক অজ্ঞাত বিশ্বাসের বলে সর্বদাই এক দুরাশায় বুক বাঁধত—শ্রীকান্ত আবার ফিরে আসবে, যে-দেবতা একদিন একরকম তাকে ফাঁকি দিয়েই শ্রীকান্তকে চোখের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল, সে-দেবতাই একদিন আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এবং সত্যিই শ্রীকান্ত একদিন এল। তারপর থেকে আমরা দেখি রাজলক্ষ্মীর মনপ্রাণ শ্রীকান্তের প্রতি অভিনিবিষ্ট—প্রতিটি মুহূর্তের সমস্ত স্নেহে সে তার প্রেমের অনবদ্য অর্ঘ্য পূজা করতে লাগল তার প্রেমের দেবতার। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর একটু দুর্বলতা ছিল;—একদিন যে পিয়ারীর জীবনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল সেই রাজলক্ষ্মী আজ কোন্ অধিকারে দাবি করতে পারে পূত-নির্মল শ্রীকান্তকে? অহরহ রাজলক্ষ্মীর মনে এই দুর্বলতার ব্যথা গভীর হ'য়ে উঠত, এবং যদি-ও শ্রীকান্ত কোনোদিন বিন্দুমাত্র-ও সন্দেহ বা অবহেলা প্রকাশ করেনি, তবু-ও রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছে হ'ত বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে ধর্মজীবনের মধ্য দিয়ে নিজের কলংকী অতীতকে বিস্মৃত হ'তে, এবং ইহজন্মে কঠোরতম প্রায়শ্চিত্তের বিনিময়ে জন্মের পূর্ব অগ্নিশুদ্ধি লাভ করতে। এই প্রয়াসের চরম পরিণতি দেখি তৃতীয় পর্বের শেষে,—যখন রাজলক্ষ্মী

ভক্ত এবং "গুরুদেব নয়।" ছাড়া আর কিছুই জানতো না, এবং অসহনীয় উপেক্ষার মধ্যে যেদিন সে ইন্দ্রনাথকে বিদায় দিল। পরে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে উৎস-ই যদি শুকিয়ে যায় তবে কর্দমাক্ত জলকে নির্মল করবার সাধনায় ব্রতী হওয়া না-হওয়া সমান। কিন্তু তখন সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সে যে কী করল সে নিজেই বুঝতে পারল না। তার প্রায়শ্চিত্তের বেছে-নেওয়া পথ যে ভ্রান্ত, জানতে পারল না সে তখন! হৃদয়ের স্বাভাবিক দাবীকে অস্বীকার ক'রে সে যখন নিবৃত্তি-মার্গের অস্বাভাবিক তপশ্চরণ আরম্ভ করল উপেক্ষিত প্রেমের দেহতার অশ্রু-স্নাত-দীর্ঘশ্বাসের একটুখানি উষ্ণতার বাষ্প এসেই তার ধ্যানধারণা তপশ্চরণের ঔপচারিক অনুষ্ঠানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত ক'রে দিল। পরে রাজলক্ষ্মীকে তাই আমরা বলতে শুনেছি—"এত পাপ ক'রেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মতো কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো।

কোথা থেকে এসে জুটলো ধর্ম্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলুম? পল্লীগ্রাম থেকে চ'লে এসেও চৈতন্য হলো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম!.....বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরলো। খেতে পারি নে, শুতে পারি নে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে এলোমেলো কত-কি ভয় ভয় তার মাথামুণ্ডু নেই—গুরুদেব তখনো বাড়ীতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবচ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশহাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু পারলুম কই? মনের মধ্যে সহ করে, পুজোর বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়লো।" (৪র্থ পর্ব, ১৩৪৯, পৃঃ ১৪৪)

এর পরে অবশ্য রোগ সারতে বিলম্ব হ'ল না, এবং সারাজীবনের মতো রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সম্পর্ক সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির ঊর্ধ্বে রইল। এমনি একটি সমাধানের জন্যই পাঠক উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করছিল।

আর এই তো হ'ল শ্রীকান্ত উপাখ্যানের শেষ কথা। রাজলক্ষ্মী ছোটোবেলায় শ্রীকান্তকে হারিয়েছিল নিজের দোষে নয়; কিন্তু কুমারসাহেবের আসরে তাকে পেয়ে শেষে আবার কাশীতে তার বিসর্জন দিয়েছিল নিজের ইচ্ছেতেই। ঔপন্যাসিকের কর্তব্য ফুরোয় রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের পুনর্মিলনকে শাশ্বত সমুজ্জ্বল ক'রে দেখালেই। চতুর্থপর্বে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতোই পেল এবার। কাজেই শ্রীকান্তের কথা এবার ফুরোলো। আর কোনো পঞ্চম পর্বের প্রয়োজন নেই। রাজলক্ষ্মী এখন গঙ্গামাটিতে আনন্দের সংসার ফুল-ই তৈরী করুক বা না করুক, শ্রীকান্ত জানে, তার আর আগের মতো কোনো ফুলঝুরি ঝুমঝুমি আত্মবিস্মৃত হবার দুর্মতি হবে না। শ্রীকান্ত এখন আবার কমললতার আখড়ায় যাক বা না যাক, রাজলক্ষ্মীর উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। প্রথমে কমললতার প্রেমের কথা শুনে হয়তো রাজলক্ষ্মী একটু চিন্তান্বিত হয়েছিল, কিন্তু পরে কমললতাকে প্রত্যক্ষ ক'রে, এবং তার সবকথা শ্রীকান্তের মুখ থেকে শুনে রাজলক্ষ্মী কমললতাকে তার দিদির আসনে বসিয়েছে, এবং শ্রীকান্তকে ভালোবাসবার যেটুকু অপূর্ণতা তার মধ্যে ছিল, কমললতাদিদির কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে সে সেটুকু-ও পরিপূর্ণ করতে পেরেছে। আজ তাই আমরা শুনতে পাই শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর ছন্দোময় আলাপ:

"এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদের বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেবো। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকবো, তারপর তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোনো সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জেলে কখনো বা তার ভুল হবে—সে

সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনদিন বা দেবে সে এক-মুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে; কোনদিন বা কুন্দ। আর পরিচিত কেউ যদি কখনো আসে পথভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুন গোঁসাই। ঐ যে উঁচু—ঐযেখানটায় শুকনো মল্লিকা কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে করা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন ? বলিলাম, সে আমি জানি নে। হয়ত অনেক টাকা খরচ ক'রে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না হলো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না, গাছের ডালে ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করবার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতাদিদি, আমাদের এক ক'রে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা দিও মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।"

(পৃঃ ২০-৬-৭)

—এই হ'ল শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব। এর প্রয়োজন নেই বলব কেমন ক'রে ? চতুর্থ পর্ব না থাকলে আমরা শ্রীকান্তের মূল রস হ'তেই বঞ্চিত হতাম। চতুর্থ পর্ব আছে, কারণ এর থাকবার প্রয়োজন ছিল। এর আগা-গোড়া সমান ঔৎসুক্যের সংগেই আমাদের পড়তে হয়, বিরক্তিকর বা একঘেয়ে মনে হয় না কোনো অধ্যায়ই। আর তা-ই বা বলবার প্রয়োজন কী। প্রকৃত লেখক বা সাহিত্যিকের কোন্ অংশটা প্রয়োজনীয় তা নির্বাচন করবার ভার তাঁর হাতেই ন্যস্ত থাক; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোথায় তাঁকে থামতে হবে। বাইরের লোক—যারা মরম না জেনেই ধরম ব্যাখ্যা করতে যায়—জোর ক'রে তাঁকে থামাতে গেলে অনধিকারচর্চাই হবে। পাঠকদের রুচি বিভিন্ন, কাজেই সার্থক লেখকের প্রয়োজনের আরম্ভ কোথায় আর পাঠকদের প্রয়োজনের শেষ-ই বা কোথায়—তার সীমারেখা টানব কী ক'রে ? মহাকবি কালিদাস যখন কুমার সম্ভব লেখেন, তখন তিনি অষ্টম সর্গ পর্যন্ত লেখারই প্রয়োজন বোধ করেছিলেন (কারো কারো মতে নবম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের রচনা); কিন্তু পরবর্তী পাঠকদের প্রয়োজন সেখানেই শেষ হয় নি, তাই কোনো পাঠক-কবি হয়তো বাকী সর্গগুলো সংযোজিত করেছিলেন। তাই প্রচলিত কুমার সম্ভব গ্রন্থখানার প্রথমার্ধ অতি সুন্দর বোধ হলেও বাকী অংশ অনাবশ্যক ব'লে মনে হয়। যেখানে হরপার্বতীর মিলন হ'ল সেখানেই তো কুমার জন্মের সম্ভাবনা, এবং সেখানেই তো 'কুমার-সম্ভবে'র শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু কালিদাসের অনুকারী কবি ব্যক্তিটি ঐ কাহিনীকে যতোদূর সম্ভব টেনে বিস্তৃত ক'রে বর্ণনা করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের সীমারেখা টানতে হবে কোথায়—কুমার-সম্ভব'ই তার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কালিদাস নিজে মনে করেন নি যে দশম, একাদশ প্রভৃতি সর্গ লিখতে হবে; তাই ওই সব সর্গ লেখেন নি। শরৎচন্দ্র নিজে মনে করেছিলেন যে শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব লিখতে হবে; তাই তিনি তা লিখেছিলেন। তাই, কুমার-সম্ভবের শেষের সর্গগুলোর প্রয়োজন ছিল কিনা সন্দেহ জাগে; কিন্তু শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়।

মণিপুর প্রসঙ্গ (৯)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

চন্দ্রকীর্তির সিংহাসন উদ্ধার (পূর্বানুবৃত্তি)

মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু সময়ে চন্দ্রকীর্তির বয়স হয় প্রায় আঠার। তিনি মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াইয়া মন্ত্রবলে ডিব নদী পার হইয়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখান হইতেই তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টকে তাঁহার সংবাদ জানাইয়া দিলেন দেবেন্দ্র সিংহের প্রতি মণিপুরের কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না। চন্দ্রকীর্তি যতই অগ্রসর হইতেছিলেন ততই তাঁহার দল বাড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রের চেষ্টা সত্ত্বেও মণিপুরীগণ গম্ভীর সিংহের পুত্র চন্দ্রকীর্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সম্মত হইল না। দেবেন্দ্র সিংহের বিশ্বস্ত সৈন্যগণও চন্দ্রকীর্তির বশে আসিয়া গেল। নিরুপায় দেবেন্দ্র সিং মাত্র তিন মাস রাজত্ব করার পর কাছাড়ে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু উদ্ধারের সঙ্কল্প তখন ও মনে মনে রহিয়া গেল।

দেবেন্দ্র সিং সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁহাকে মণিপুরের রাজা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট সুপারিশ পত্র দিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার হইতে এই অনুমোদন দেবেন্দ্র সিংহের পলায়নের দিন পর পলিটিক্যাল এজেন্টের হাতে আসে। তখন ইহার কোন মূল্য রহিল না। এদিকে চন্দ্রকীর্তি সিং সিংহাসনে উপবেশনের পর নরসিংহের পুত্র ভুবন সিংকে যুবরাজপদে এবং ২য় পুত্র সেতু সিংকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। নরসিংহের পুত্রদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত যে বেশী দিন টিকিবে না তাহা পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব ভাল করিয়াই জানিতেন। এ দিকে দুই মাস যাইতে না যাইতেই দেবেন্দ্র সিং সিংহাসন উদ্ধারের বাসনায় কাছাড় হইতে মণিপুর আক্রমণ করিলেন। মণিপুরের সৈন্য তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ করে: কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চন্দ্রকীর্তি দেবেন্দ্র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবেন এই বিশ্বাসে সুবিধাবাদিগণ প্রজাদিগকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে। লোকে চন্দ্রকীর্তির প্রতি বিরূপ হইয়া সিংহাসনে পুনরায় দেবেন্দ্রকে কামনা করিতে থাকে। তাঁহার উপদেষ্টাগণও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দেবেন্দ্রসিংহ এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তিনি পুনরায় দলবল লইয়া মণিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কাছাড়ের কর্মচারীগণ তাঁহার মতলব টের পাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীহট্টে চালান দেয়। তাঁহার ভাগ্য এই ভাবে বিড়ম্বিত না হইলে এ যাত্রায় তাঁহার চেষ্টা সম্ভবত বিফল হইত না। শ্রীহট্ট হইতে পরে তাঁহাকে ঢাকায় চালান দেওয়া হয়। ১৮৭১ সনে নভেম্বর মাসে তিনি মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে কুবো উপত্যকা বাবদ মণিপুরের প্রাপ্য অর্থ হইতে মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইত।

এ দিকে ইংরেজ সরকার হইতে ইতিপূর্বেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে যতদিন পর্যন্ত মণিপুরের রাজা সিংহাসনে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম না হইবেন ততদিন পর্যন্ত কুবো উপত্যকার জন্য মণিপুরের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকিবে। এই অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকায় চন্দ্রকীর্তি পলিটিক্যাল এজেন্টের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এমনও কথা হইল—যদি বৃটিশ সরকার অবিলম্বে এই অর্থ না দেয় তবে কুবো উপত্যকা জোর করিয়া দখল করা হইবে। নির্বাসন কালে চন্দ্রকীর্তি সিংহাসন উদ্ধারের জন্য ইংরেজের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায় বোধ হয় তাঁহার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। তাহার

উপর কুবো উপত্যকার টাকা বন্ধ করা এবং তাঁহাকে তখনও সরকারীভাবে মণিপুরের রাজা বলিয়া গ্রহণ না করা তাঁহার ইংরেজবিদ্বেষের মূলে আরও ইন্ধন যোগাইয়াছিল।

তাঁহার এইরূপ বাড়াবাড়িতেও পলিটিক্যাল এজেন্টের মনে বিশ্বাস ছিল – চন্দ্রকীর্তি শীঘ্রই তাঁহার নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আশঙ্কা হইয়াছিল তৎকালীন অরাজকতার সুযোগে ব্রহ্ম সরকার আভার রাজ দরবারে আশ্রিত রাজকুমার নিবিড়জিতের পক্ষে মণিপুর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা না করে। ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে অবস্থা আরও চরমে পৌঁছে। তখন মণিপুর রাজ্যের উত্তরে এক নাগা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজের শত্রুতা চলিতেছিল। পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া মণিপুর সরকার এই বিদ্রোহী নাগাদিগকে সাহায্য করে। এই ঘটনা যথাকালে বৃটিশ সরকারের গোচরে আনা হইলে মণিপুরের রাজার নিকট এক কড়া চিঠি আসে।* অবশ্য ইহার পরই মণিপুর সরকার সাবধান হইয়া যায় এবং ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কেরও উন্নতি হয়। চন্দ্রকীর্তি স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব তখন চন্দ্রকীর্তিসিংহকে সরকারীভাবে মণিপুরের রাজা বলিয়া গ্রহণ করার জন্য ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ পত্র দেন। ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের মারফৎ নিম্নোক্ত সঙ্কল্প কুলক সাহেবের মণিপুর সরকারকে জানান হয়।

(মণিপুরের রাজা) চন্দ্র কীর্তি সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা, বারম্বার হইতে লাগিল; তাহাতে দেশের শান্তি নষ্ট ও ব্রিটিশ প্রভুত্ব হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হইল। এজন্য গভর্ণমেণ্ট, চন্দ্রকীর্তি সিংহকে মণিপুরের সিংহাসনে স্থায়ী রাখিতে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিমাত্রকেই শাস্তি দিতে, বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন।

এই ঘোষণার অল্প দিনের মধ্যেই দেবেন্দ্রসিংহের এবং নরসিংহের পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া চন্দ্রকীর্তির হস্তে পরাজিত হন। তাহাদের দেখাদেখি মদুচন্দ্রের দুই পুত্র এবং মারজিত সিংহের পুত্র কানাই সিং ও সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র কানাই সিং মণিপুর হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই সব বিদ্রোহের পর ১৮৫২ সনের মে মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স (Court of Directors) পলিটিক্যাল এজেন্টকে মণিপুরের রাজার উপদেষ্টা এবং পরিচালক হিসাবে কাজ করার নির্দেশ দেয়। প্রজাগণ কোন সময়ে

* "In reply Govt. administered a rebuke to the Manipur Raja, and reminded him that his state existed only by the sufference and countenance of the British Govt. At this the state of affairs improved considerably; the Raja evidently being recalled to a proper sense of this position, and ruling with a greater regard to the rights and feelings of his subjects."

† Mc Culloch.....received authority to "make a public avowal of the determination of the British Govt. to uphold the present Rajah and to resist and punish any parties attempting hereafter to dispossess him." Treaties by Achison. Page 248.

উৎপাটিত হইলে তাহা নিবারণের অনুমতিও তাহাকে দেওয়া হয় *

এই তারে মণিপুরে ঘন ঘন রাজদ্রোহ এবং রাজা বদল হওয়ার ফলে ভারত সরকার মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাইয়া বসিতে পারে (dejure) না হইলেও কার্যত (defacto) মণিপুর রাষ্ট্রের অভিভাবকস্থানীয় (sovereign) হইয়া দাঁড়াইল। তখনকার দিনে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবর্তমানে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে প্রবলতর প্রতিবেশীর সর্বদা মুখাপেক্ষী থাকিয়া নিজের পুরাপুরি স্বাধীনতা বজায় রাখা এরূপ অসম্ভব ছিল। মণিপুরের অপর প্রতিবেশী ব্রহ্মরাষ্ট্রও যদি ব্রিটিশের মত হইত তবে মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইরূপ হস্তক্ষেপ করার ঘোষণায় তাঁর প্রতিবাদ হইত। মহারাজা চন্দ্রকীর্তি যখন দেখিলেন কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সের ঘোষণায় মণিপুরের সিংহাসনে তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরদের দখল পাকাপাকি হইল তখন তিনি উহার পরিণামের কথা না ভাবিয়া প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরংচ খুশিই হইলেন। ইহার পর ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ৩৪ বৎসর তিনি নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিয়া গেলেন।

কিন্তু মণিপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রহণের সময় ইংরেজ সরকারের যেরূপ আগ্রহ এবং সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল, শাসনব্যবস্থার উন্নতি করা সম্বন্ধে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থা অপরিবর্তিতই রহিল। পূর্বে বিদ্রোহের ভয়ে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য শাসন ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবর্তন ও সংশোধন করা হইত, সিংহাসনের পশ্চাতে ইংরেজ শক্তির সমর্থন পাওয়ার পর রাজা এ বিষয়ে আর কোন রদ বদলের চেষ্টা করিলেন না। ইংরেজ সরকারও নিজেদের ষোল আনা সুবিধা আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট, মণিপুর রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে তাহাদের তেমন কোন গরজ ছিল না।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মণিপুর :—

১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার তাপ মণিপুরের গায়েও আসিয়া লাগে। চট্টগ্রামের সৈন্যাবাস হইতে সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিয়া কাছাড় অভিমুখে আসিতেছিল ; কিন্তু শ্রীহট্ট জেলার সীমান্তে লাতু (Latu) নামক স্থানে সরকারের বিশ্বস্ত সৈন্যের (44th Native Infantry) নিকট বাধা পাইয়া তাহারা মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেই সময় কাছাড়ে অবস্থিত চৌরজিত সিংহের অগ্রজ পুত্র নরেন্দ্রজিৎ সিং (অপর নাম চহি অহম*) মণিপুরের সিংহাসন দখলের আশায়—ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। মণিপুরের তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব চট্টগ্রামের সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই, তাহারা যাহাতে মণিপুরে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য মহারাজা চন্দ্রকীর্তিকে পশ্চিম সীমান্তে একদল সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করেন। এই স্থানে ইহা উল্লেখ করা সঙ্গত যে সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের সম্মুখে ইংরেজ বিতাড়ন ছাড়া স্বাধীন ভারতের

* The Court of Directors of the East India in a de-patch dated May 5th, 1852, confirmed the order of the Govt. of India and commented thus : "The position you have assumed of pledged protection of the Rajah imposes on you as a necessary consequence the obligation of attempting to guide him, by your advice, but, if needful, of protecting his subjects against oppression on his part ; otherwise our guarantee of his rule may be the cause of inflicting on them a continuance of reckless tyranny.

*, চহি অর্থ বৎসর, অহম অর্থ তিন। শুনা যায় নরেন্দ্রজিৎ সিং মাতৃগর্ভে তিন বৎসর ছিলেন—সেইজন্যই তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল চহি অহম।

কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। পক্ষান্তরে মহারাজার শাসন প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দ্বারা যে অচল মোগল হুকুমতকে চালু করার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে প্রাক্তন মোগল এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলের লোকদের উল্লাসের কোন কারণ ছিল না। বিদ্রোহীদের নেতাগণও মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের সমর্থন পাওয়ার কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সব কারণে মণিপুরের জনসাধারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিরপেক্ষই ছিল। মহারাজা চন্দ্রকীর্তি তখন একে ইংরেজের প্রতি আস্থাবান ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ নরেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে বিপদটা তাঁহার ঘাড়েও আসিয়া পড়িল। তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টের কথামত অবিলম্বে দুই জন মেজরের অধীন ৪ শত সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে বিদ্রোহী সিপাহীগণ মণিপুরে প্রবেশের সময় তাহাদের হস্তে পরাজিত হইয়া অধিকাংশই নানাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নরেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট অর্পণ করা হয়। বাকী জীবন তাহার নির্বাসনেই কাটে। সিপাহী বিদ্রোহ শান্ত হওয়ার পর ১৮৫৯ সনে বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ—ইংরেজ সরকার হইতে মহারাজা চন্দ্রকীর্তিকে পোশাক ও তরবারি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং মণিপুরের ৮ জন কর্মচারীকে নানা পুরস্কার ও পদক দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাজ পুত্রদের সিংহাসন দখলের চেষ্টা

সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল হইতে রক্ষা পাইলেও মণিপুরের ভাগ্যচক্রে দুষ্ট গ্রহের কোপ প্রশমিত হইল না। বিভিন্ন রাজপুত্রদের রাজ্যলোভ সময়ে সময়ে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া গভীর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু মণিপুর সরকারের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গরীবনিওয়াজের অন্যতম বংশধর মাইপাক (Mypak) প্রথম ১৮৫৯ সনে এবং পরে ১৮৬২ সনে এই দুইবার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৮৬৪ সনে মারজিতের পুত্র কানাই সিং পুনরায় কাছাড় হইতে মণিপুর আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য তাঁহাকে ডিরি নদী পার হইতে দেয় নাই। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৮৬৬ সনে দেবেন্দ্র সিংহের অন্যতম পুত্র গোকুল সিং একশত অনুচর লইয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু মহারাজের সৈন্যের হস্তে তাহারা পরাজিত হয়। গোকুল সিং অবশেষে ১৮৬৮ সনে কুচবিহার রাজ্যে ধরা পড়িয়া ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কানাই সিং দুই বৎসর পূর্বেই ধরা পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে হাজারিবাগ জেলে রাখা হয়। মণিপুর সরকার হইতে তাঁহাদের প্রত্যেককে মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইত। ১৮৬৬ সনে গোকুল সিংহের আক্রমণের পর ইংরেজ এলাকায় মণিপুরের উপর হামলা করিতে সক্ষম হইলেন আর কোন রাজকুমার রহিলেন না। দেবেন্দ্র সিং ইতিপূর্বেই মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র নিরজিৎ সিং এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শৈকর সিংকেও (Shaiker Singh) ঢাকায় রাজবন্দী হিসাবে রাখা হইল। কানাই সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্জয় সিং (Durjai Singh) আগরতলায় ছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে মণিপুর সরকারের কোন অভিযোগ ছিল না।

কোহিমায় বিপন্ন ইংরেজ ঘাঁটি রক্ষায় মহারাজার সাহায্য :—

মণিপুর রাজ্য এবং নাগা পাহাড়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমা রেখা নাই। ১৮৪২ সনে ইংরেজ সরকারের পক্ষে লেফ্‌টেন্যান্ট বীগস্ (Lt. Briggs) এবং মণিপুর রাজ দরবারের পক্ষে পলিটিকাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন গর্ডন মণিপুর এবং নাগা পাহাড়ের মধ্যে আনুমানিক একটি সীমা রেখা টানিয়া দেন। কিন্তু স্থানীয় নাগা সম্প্রদায় এই বীগস্-গর্ডন রেখার কোন তোয়াক্কা না রাখায়—ইহার অস্তিত্ব কাগজে পত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল। ইংরেজ সরকার ও এ অঞ্চলে তাহাদের হুকুমৎ বজায় রাখিতে তেমন মনোযোগী ছিল না। ফলে অনবরত নাগাদের স্বেচ্ছাচরিতায় বিরক্ত হইয়া ১৮৪১ সনে বীগস্

পর্বত শ্রেণীর অপর পারে ইংরেজ এলাকাধীন নাগা গ্রাম গুলির শাসন ভার সাময়িক ভাবে মণিপুর সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেয়। তাহা হইলেও এই বীগস্-গর্জন-রেখা সম্বন্ধে মণিপুরের গোড়া হইতেই আপত্তি ছিল। মণিপুরের রাজারা প্রাচীন কাল হইতেই নাগা পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে—খাজনা আদায় করিতেন। সুতরাং এক্ষণে ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপর তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। অবশেষে পলিটিক্যাল এজেন্ট জনষ্টনের আমলে মণিপুরকে নাগা পাহাড়ের আরও কতক অংশ দিয়া খুশী করা হইল।

পাহাড়ে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য সামাগুড়িতে (Samaguding) একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট থাকিতেন কিন্তু তাহার শাসিত অঞ্চল প্রকৃত পক্ষে সামাগুড়িং এবং উহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অশাসিত অঞ্চলের নাগাদের সঙ্গে ছোট খাট ঘটনা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। ১৮৭৭ সনে মজুমা (Mozzuma) গ্রামের সঙ্গে যখন ঝগড়া বাধে তখন পলিটিক্যাল এজেন্ট জনষ্টন সাহেব মন্ত্রী বলরাম সিং সহ মণিপুর হইতে সৈন্য লইয়া—নাগা পাহাড়ের উক্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের সাহায্যের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। অর্ধেক রাস্তা যাইতে না যাইতেই মহারাজের নিকট হইতে খবর আসিল ব্রহ্মের সমস্ত সুন জোক রাজা (Sumjuok Rajah) দূরে উপত্যকার সংলগ্ন মণিপুর রাজ্যের সীমান্ত রক্ষী কোঙ্গল থানা (Kongal Tannah) আক্রমণ করিয়া ৮ জন লোককে হত্যা করিয়াছে। এই ব্যাপারে সমস্ত মণিপুরে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মণিপুরের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্টের অন্যতম প্রধান কর্তব্য; সুতরাং জনষ্টন সাহেবের পক্ষে আর নাগা পাহাড়ের দিকে যাওয়া সম্ভব হইলনা। তিনি একাকী মণিপুরে ফিরিয়া আসিয়া থাঙ্গাল নেজরকে সঙ্গে লইয়া কোঙ্গাল (Kongal) ঘটনার তদন্তের জন্য যাত্রা করিলেন। তদন্তের পর ভারত সরকারকে তিনি জানাইলেন যে মণিপুরের উপর এইরূপ অবাঞ্ছিত আক্রমণের জন্য ব্রহ্ম সরকারই দায়ী। ইহার কোন প্রতিকার না করিলে মণিপুর সরকার ভারত সরকারের অগোচরে তাহাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থের চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তখন ইহার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আশ্রিত মণিপুর রাজ্যের রাজ দরবার ভারত সরকারের এইরূপ উদাসীনতাকে দুর্বলতা বলিয়া মনে করিয়াছিল*। ব্রহ্ম এবং মণিপুরের এই সীমানা সম্পর্কিত বাদ বিতণ্ডা ১৮৮১ সন পর্যন্ত চলিয়াছিল; অবশেষে ভারত সরকার এ সম্বন্ধে পাকাপাকি মীমাংসা করার জন্য জনষ্টন সাহেবকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া ঐ এলাকায় পাঠায়। ব্রহ্ম সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও জনষ্টন সাহেব ১৮৮১ সনে সাফল্যের সহিত মণিপুর রাজ্যের পূর্ব সীমানা সুনির্দিষ্ট করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্ম সরকারও পরে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়।

এদিকে জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত সৈন্য নাগা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিয়াছিল তাহারা তাহার ফিরিয়া আসার পরও কতকাল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মণিপুর সীমান্তে ছিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী নাগাগণ ইংরেজের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া একবার মহারাজ চন্দ্রকীর্তির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিল। তখন পর্যন্তও তাহাদের ধারণা ছিল ব্রিটিশ এবং মণিপুর রাষ্ট্রের মধ্যে মণিপুরই অধিকতর বলশালী। মহারাজা তাহাদের এই আবেদন মূলের উপর প্রত্যাখ্যান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে যদি অবিলম্বে তাহারা ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ না করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধে মণিপুর হইতে আরও

*...Failure to do jnstice would eventually lead to underhand reprisals on the part of Manipur, as the Durbar could not understand our Govt. tolerating an attack of this kind on a *protected state* and naturally ascribed our forbearance to weakness."

সৈন্য পাঠান হইবে। ফলে সেবারের মত নাগা বিদ্রোহ এইখানেই শেষ হইল।

১৮৭৮ সনে নাগা পাহাড়ের শাসনকর্তা দমন্ত সাহেব (Mr. Damant) সাময়িকভাবে হইতে শাসন কেন্দ্র কোহিমাতে স্থানান্তরিত করেন। তাহার পর হইতেই সেখানকার আঙ্গামি নাগাদের (Angami Naga) সঙ্গে বিরোধ চলিতে থাকে। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে আঙ্গামিদের দ্বারা কোহিমার ইংরেজ শাসন কেন্দ্র আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মণিপুরে খবর আসে। সেখানে তখন যথেষ্ট ইংরেজ সৈন্য ছিলনা, এবং রসদেরও অভাব ছিল; এসব জনষ্টন সাহেব আগেই জানিতেন। সুতরাং উপরোক্ত সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া মহারাজের নিকট সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিলেন। ইতিমধ্যেই নাগা পাহাড়ের সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট কাওলে সাহেবের (Mr Cowley) চিঠি আসিয়া পৌছে। তাহাতে জানা যায় দমন্ত সাহেব হত হইয়াছেন, এবং বাকী সকলের অবস্থাও অবরুদ্ধ হওয়ায়—অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন; কখন কি হয় বলা যায় না; অবিলম্বে উদ্ধার না করা হইলে স্ত্রী পুরুষ সমেত তাহাদের একটি প্রাণীও বাঁচিবে না। মহারাজা বিনা দ্বিধায় তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া বিপন্ন ইংরেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। পাঁচবার বন্দুকের আওয়াজের সঙ্কেত ধ্বনির সাহায্যে রসদ্দ যুবকদিগকে জড় করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনী জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে দেওয়া হইল। মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সুরচন্দ্র তৃতীয় পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ (অপর নাম কেরেং) এবং থাঙ্গাল মেজর মণিপুরী সৈন্য পরিচালনার জন্য সাহেবের সঙ্গে গেলেন। এজেন্সির (Agency) প্রয়োজনে মণিপুরে তখন কাছাড়ের ৫০ জন পুলিস এবং ৩৪ নং ব্রিটিশ আর্মির (34th B. I.) ৩৪ জন সিপাহী উপস্থিত ছিল। তাহাদিগকেও সঙ্গে লওয়া হইল। জনষ্টন সাহেবের বিবরণে দেখা যায় অভিযোগের গোড়ার দিকে টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজরের পক্ষ হইতে আশানুরূপ সহযোগিতা তিনি পান নাই। যুবরাজ সুরচন্দ্র কিন্তু অচিরেই তাঁহার কর্তব্য বুঝিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে সুরচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহার আবেদনে উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজর কর্তৃক উপরোক্ত আচরণের বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহারা সকলে নীদি ফুম (Mythe phum) আসিয়া টের পাইলেন,—ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নাগাদের এই গণউত্থানের ফলে মণিপুরের নাগাদের মধ্যেও ইংরেজ বিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়াছে; এই অবস্থায় রাজধানী হইতে আরও সৈন্য আসিয়া না পৌছা পর্যন্ত তাঁহারা জনষ্টন সাহেবের কথা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে ইতস্তত করিয়াছিলেন। এদিকে অবিলম্বে কোহিমায় পৌছিতে না পারিলে যে উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়া তাহা সমস্ত বিফল হইবে। নাগাদের হস্তে সদ্য সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ পলাইয়া আসিয়া অবরুদ্ধ ইংরেজ ঘাটির সঙ্কটজনক অবস্থার কথা জানাতে জনষ্টন সাহেব টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজরের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সুরচন্দ্র সহ যথা সময়ে কোহিমায় পৌছিয়া অবরুদ্ধ ইংরেজ ঘাটির সৈন্য এবং কর্মচারীদিগকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মেজর অবশেষে মত পরিবর্তন করিয়া জনষ্টন সাহেবের পৌছার পর সেইদিনই কোহিমাতে আসিয়া পৌছিলেন তাঁহাদের আগমনের ফলে নাগারা একেবারে দমিয়া গেল। সুতরাং মতানৈক্যবশত উপরোক্ত সামান্য অপ্রিয় ঘটনাটি বাদ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় এই যুদ্ধে মণিপুরী সৈন্যের সাহায্য না পাইলে শুধু যে অবরুদ্ধ ইংরেজ স্ত্রী পুরুষের জীবন নষ্ট হইত তাহা নহে আসামের সমস্ত উপজাতীয় অঞ্চল হইতেই বৃটিশের তল্পিতল্পা গুটাইতে হইত মহারাজ চন্দ্রকীর্তির কৃপায় এতদঞ্চলে সেই ঘোরতর দুর্দিনে ইংরেজের ধন মান প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল।

গিরিজনদের উপর মণিপুর সরকারের প্রভাব বিস্তার

মণিপুরের সৈন্য বিভাগে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের পূর্বে

গিরিজনদের উপর মণিপুর সরকারের প্রভাব নাম মাত্রই ছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন উপজাতি নিজেদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি করিত। উপত্যকা অঞ্চলেও যে সময় সময় তাহাদের দৌরাত্ম্য চলিত না এমন নয়, তবে সেখানে অশ্বারোহী মণিপুরী সৈন্যদের নিকট তাহারা বেশীদিন দাঁড়াইতে পারিত না। তাহা ছাড়া অন্যান্য পার্বত্য জাতিদের মত তাহারা ও নিজ নিজ এলাকা হইতে বেশী দূরে যাইতে সাহস করিত না। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে তাহারা একরূপ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই সব

রাস্তাঘাট অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল থাকায় বাহিরের সঙ্গে মণিপুরের যোগাযোগ খুব সহজ ছিল না। এমন কি মণিপুর হইতে কাছাড়ে যাইতে হইলে ও বেশ বড় একটি সশস্ত্র বাহিনী সঙ্গে না থাকিলে নিরাপদে পৌঁছার সম্ভাবনা কম ছিল। ব্রহ্মদেশের সৈন্য মণিপুর দখল করার সময়-ও তাহারা গিরিজনদিগকে অপ্রয়োজনে ঘাঁটাইতে যায় নাই। উহাদের স্বভাব তাহাদের আগেই জানা ছিল। নাগারাও অবশ্য তাহাদের ভয়ে ভূয়ে ভূয়েই থাকিত। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে তাহাদের এই ভয় কাটিয়া গেল। সুযোগ পেয়া তাহারা পশ্চাদপসরণরত ব্রহ্মের সৈন্যদিগকে নাস্তানাবুদ করিতে ছাড়ে নাই। ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অব্যবহিত পরই মহারাজাগম্ভীর সিং আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই কাবুই তাঙ্খুল, আজামি প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিদিগকে কতকটা সংযত করিতে সমর্থ হইলেন। পরবর্তী মহারাজা নরসিং এবং চন্দ্রকীর্তির আমলে রাজ্যের গিরিজনদের মধ্যে মণিপুর সরকারের প্রভাব আরও দৃঢ় হয়।

চাবাদ কুকীদের বিদ্রোহ

১৮৭৯ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজধানীতে খবর আসিল রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তবর্তী চাবাদ গ্রামের দুর্ধর্ষ কুকীদের নেতা তোংখু (Tonghoo) সুমজোকরাজার (Sumjak raja) প্ররোচনায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পার্শ্ববর্তী তাংখুল গ্রাম চীংসও (Chingsow)এর উপর হামলা করিয়া জিনিষপত্রসহ ৪৫ জন লোকের মাথা কাটিয়া লইয়া যায়। মণিপুরের মহারাজা সমস্ত প্রজাদের জান-প্রাণের রক্ষক। সুতরাং চাবাদ গ্রামের এইরূপ স্বেচ্ছাচার বন্ধ করিয়া রাজ্যে শান্তি রক্ষা করিতে মণিপুর সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মহারাজের অনুরোধে জনষ্টন সাহেব একদল মণিপুরী সৈন্য সহ উপদ্রুত অঞ্চলে যাইয়া শান্তি স্থাপন করিয়া চাবাদ গ্রামের কুকীদিগকে বশে আনেন। তাংখু মণিপুরের শাসন মানিয়া লয়। ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত ইহারা মণিপুরের অন্যতম শান্তিপ্রিয় এবং অনুগত প্রজা হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ১৮৯১ সনের রাষ্ট্র বিপ্লবের পর ইংরেজ সরকারের চর মহারাজ কুলচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার জন্য সমস্ত মণিপুর পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল তখন পরিণামের কথা না ভাবিয়া এই চাবাদ গ্রামের কুকীরাই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া মণিপুরের মহারাজের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল।

১৮৭৯ সনের চাবাদ কুকীদের এই বিদ্রোহ আজ হইতে প্রায় ৭৩ বৎসর আগের ঘটনা। এর মধ্যে মণিপুর রাজ্যে কত অদল বদল হইয়াছে; গৃহাং, চাবাদ হুন্দুং (Hoondoong) গমনং সাংশাকের উপর দিয়া—জাপান, আজাদ হিন্দ এবং ইংরেজ আমেরিকার ফৌজ বহুবার যাতায়াত করিয়াছে, দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়া মটর রাস্তা তৈরী হইয়াছে, যুদ্ধের সময় কত ট্যাঙ্ক চলিয়াছে, আকাশে কত বোমারু বিমান উড়িয়াছে, চাবাদে সীমান্তরক্ষী সৈন্যের ক্যাম্প বসিয়াছে—কিন্তু জনষ্টন সাহেব বর্ণিত হুন্দুংএর সেই তাংখুল গ্রাম, সেই মনোহর 'ফার' বনের মধ্য দিয়া চাবাদের আঁকা বাঁকা পথ, কোথাও, কোথাও দুই পাশে দীর্ঘ ওক গাছের সারি; মাঝে মাঝে ঘুম চাষের জন্য অর্ধ দগ্ধ অরণ্য,—এখনও সেই বর্বর যুগের বীরত্বের কাহিনী, প্রতিদিনকার নানা সুখ দুঃখের ঘটনা বহুল মানুষের ইতিহাস আধুনিক যুগের সভ্যতাভিমানী লোকের কুৎসিত লোভ এবং জিঘাংসার নীরব সাক্ষ্য বহন করিতেছে। চাবাদে সেই কুকী গ্রামটি এখনও আছে, তবে আগের

মত তেমন জনবহুল নয়,—অনেকে খৃষ্টান হইয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছে, যুদ্ধের সময় যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে ফিরে নাই। বিদ্রোহী নেতা তংখুল নাগা প্রত্যেক গ্রামের পুরুষানুক্রমে কুলাদপতি (গ্রামের নেতা বা রাজা) পদ অধিকার করিয়া আসিতেছে, কিন্তু কুকীদের সেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতি আর নাই; তাহারা এখন শান্ত এবং নিরীহ; মাথা কাটার কথা মনে করাইয়া দিলে লজ্জিত হয়।

গত ভারতীয় পার্লামেন্টের এবং মণিপুর ইলেক্টোরাল কলেজের (electoral college) নির্বাচন উপলক্ষে সেখানে যখন যাই, তখন অতিথির প্রতি তাহাদের কত আদর আপ্যায়ন; অথচ তথাকথিত সভ্য মানুষের সঙ্গে তাহাদের কতটুকুই বা যোগাযোগ, আর কি-ই-বা পাইয়াছে তাহাদের কাছ হইতে। ইম্ফল, পাহে হাঁটা পথে ৪।৫ দিনের রাস্তা, কালে ভদ্রে যে এক আধখানা জীপ-গাড়ী আগে পাশে আসে—তাহাও তাহাদের জন্য নয়। বাহিরের লোকের মধ্যে সেখানে আছে মাত্র আসাম-রাইফেলের ৪০।৫০ জন নেপালী সৈন্য। ইহাদের আচরণ ত সকলেরই জানা। তথাপি অপর সকলের মত চাষাদের লোকেরাও হানাহানির চেয়ে নির্বাচনের উপযোগিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে। মৃত ছাড়া আর সমস্ত স্ত্রী পুরুষ ভোটারই নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে আসিয়া ভোট দিয়া গেল, কোন গণ্ডগোল চীৎকার বা জোর জুয়াচুরি কিছুই দেখা গেল না। অথচ কংগ্রেসী, সমাজতন্ত্রবাদী সাম্যবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী কোন্ মত বা দলের প্রার্থীর বাক্স সেই কেন্দ্রে না ছিল? নির্বাচনের পর দেখা গেল সমাজতন্ত্রবাদী প্রার্থীরা বেশীর ভাগ ভোট পাইয়াছেন। মণিপুরে এমন কি ভারতের অন্যত্র এরূপ নির্বাচক মণ্ডলী আর কয়টি আছে বলা কঠিন। তাহাদের এই গুণ আমরা উপস্থিত কয়জন ছাড়া আর কাহার চোখেই বা পড়িয়াছে বা পড়িবে, এবং কেই-বা ইহার মর্যাদা দিবে? নির্বাচন শেষ হইয়াছে ত লেঠা চুকিয়াছে। খবরের কাগজ, পুরস্কার, মেডেল, বাহবা এ সবই ত তথাকথিত বাবু ভাইয়াদের জন্য। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ না থাকিলে নিছক গুণের আদর করার সময় কয়জনের আছে? চাষাদ কুকীদের সারল্যে এবং আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার লেখা পাঠের ধৈর্য এবং সময় খুব কম লোকেরই হইবে জানি—এবং আমার কলমের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাদের ঋণ শোধ করার চেষ্টাও বৃথা। সভ্য জগৎ আজ আতিথেয়তা ভুলিয়া গেলেও ইহাদের কাছে তাহা নিতান্ত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি শুধু আমার মুষ্টিমেয় পাঠকদের কাছে এই কথাটি জানাইতে চাই।

মহারাজাকে কে-সি-এস-আই উপাধি প্রদান:—

১৮৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে জনষ্টন সাহেব নাগা পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া ইম্ফলে চলিয়া আসেন। সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় সেখানে ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু সুদাই সীমান্তে ইংরেজ এলাকায় হাঙ্গামা বাধায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল। মেরমা (Merma) নামক উপজাতির লোকেরা কাছাড়ে বলোবস্ত চা ফেক্টরী আক্রমণ করিয়া একজন সাহেব কর্মচারী এবং কতিপয় কুলিকে নিহত করায় অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। জনষ্টন সাহেব মণিপুরের রাজ দরবারের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে ২০০ মণিপুরী সৈন্য কাছাড়ে জিলা সরকারের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৮০ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী আসামের চীফ কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলি (Sir Stuart Bayley) ইংরেজ সরকারের সহিত মহারাজা চন্দ্রকীর্তির বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া পদক দেওয়ার জন্য মণিপুরে আসেন। নাগা পাহাড়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্কট জনক মুহূর্তে মণিপুরের মহারাজের সাহায্যের কথা প্রত্যক্ষদর্শী জনষ্টন সাহেব

কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন *। ইঁহার কমিশনারের সম্মানার্থ যথাবিধি দেখা সাক্ষাৎ নানা অনুষ্ঠানের পর নির্দিষ্ট দিনে রাজ দরবারে সেটলি সাহেব মহারাজা চন্দ্রকীর্তিকে তারকা এবং কে. সি. এস আই উপাধি (Star and badge of a K. C. S. I.) প্রদান করেন। পলো খেলা নৃত্য গীত ইত্যাদি দেখিয়া ও নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া ৪ দিন পর সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি আসামে ফিরিয়া যান। মণিপুরের জনসাধারণ যে ইহাতে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিল সমসাময়িক মণিপুরী গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"……it is difficult to over-estimate our obligation to the Maharajah, for his loyal conduct during the insurrection and subsequent troubles. According to his own belief, we had deprived him of territory belonging to him, and which he had been allowed to claim as his own. The Nagas asked him to help them, and promised to become his feudatories, if only he would not act them. The temptation must have been strong, to at least serve us as we deserved, by leaving us in the lurch to get out of the mess as best as we could. Instead of this, Chandra Kirtee Singh loyally and cheerfully placed his resources at our disposal, and certainly by enabling me to march to its relief, prevented the fall of Kohima, and the disastrous results which would have inevitably followed." James Johnstone.

জীবন-মরু

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি]

ডাক্তারদের অনেক চেষ্টার পর করেক ঘণ্টার মধ্যেই সুলতার জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু কোন কথা সে বলেনি, পুলিশ থেকে তার স্বীকারোক্তি নেবার জন্য বসে আছে, অনেক প্রশ্ন করেছে তারা সুলতাকে ; কিন্তু সুলতার সে প্রশ্ন যেন কানেই যায়নি, তার দৃষ্টি সব সময় কি যেন খুঁজছে।

একজন ডাক্তার তাকে প্রশ্ন করল "আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন, আমরা তাঁকে খবর দেবার ব্যবস্থা করছি।"

সে প্রশ্নের উত্তরে করেক ফোঁটা জল বেরিয়ে এল তার চোখ দিয়ে। তারপর হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল সুলতা।

ডাক্তার বুঝতে পারলেন লেগেছে ব্রেণ'এ, মাথার গোলমাল হয়েছে রোগীর, পাগলও হয়ে যেতে পারে। "মরফিয়া" দিয়ে তখনকার মত তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তাঁরা চলে গেলেন।

বিকাশ অনেক চেষ্টা করবার পর সুলতার কাছে দু'তিনবার আসতে পেরেছে, করেক মিনিটের বেশীক্ষণ তাকে থাকতে দেওয়া হয়নি সুলতার কাছে, সুলতা বিকাশকে চিনতে পারেনি, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েছিল, আর দুচোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে।

মিঃ রায় অনুপের সঙ্গে দেখা করেছিলেন হাজতে, জামিনে খালাস করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জামিন মঞ্জুর হয়নি। মিঃ রায় অনেক করে বুঝিয়েছেন অনুপকে, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

অনুপ শুধু বলেছিল "আমায় আমার কর্তব্য ক'রতে দিন মিঃ রায়, আমি এর জন্যে দায়ী, খুন আমিই করেছি।"

মিঃ রায় অনুপের হয়ে আদলতে দাঁড়াবেন ঠিক করেছেন। সুলতার কাছ থেকে কোন কথা পাওয়া দুরাশা। সুলতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর পাওয়া যায়না। তিন দিনের মধ্যে একটি কথাও সুলতা বলেনি কারও সঙ্গে, খায়ওনি।

ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছে। তারা বলেছে সুলতা পাগল হয়ে গেছে। মিঃ রায় তাকে দেখতে গিয়েছিলেন, সুলতা তাঁকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল—"আমাকে আটকে রেখেছো। কেন তোমরা—না না, বিয়ে আমি তোমাকে করতে পারবনা, মেরে ফেলেও না। উঃ—রক্তে ঘর ভেসে গেল। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সুলতা কাঁদতে থাকে। মিঃ রায় বুঝলেন আর কোন উপায় নাই, পাগলই হয়ে গেছে সুলতা। যতদিন না কেস শেষ হয় সুলতাকে এখানেই থাকতে হবে"।

নির্দিষ্ট দিনে মোকর্দমা উঠল আদালতে। মিঃ রায় অনুপের হয়ে দাঁড়িয়েছেন—নীলিমা, বিকাশ, আর সবাই এসেছে কোর্টে।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেই কেস্ চালান হচ্ছে। কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অনুপ, স্থির, অবিচলিত, পাথরে খোদিত মূর্তির মত।

গভর্ণমেণ্টের উকিল তাঁর জেরা আরম্ভ করবার আগে বিচারককে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

"ধর্মাবতার, এই শিক্ষিত যুবক আজ শিক্ষিত সমাজের উপর যে কলঙ্ককালিমা লেপন করল তার বিচার শুধু তার প্রাণদণ্ডেই শেষ নয়। তার বিচার হবে সকলের উপর যিনি বিরাজ করছেন—সকলের মধ্যে যিনি ন্যায় অন্যায় বোধ দিয়েছেন তাঁর কাছে। সামান্য একটি নারীর মোহে যে শিক্ষিত যুবক—শিক্ষিত কথাটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়—আমি তাকে মোহান্ধই

বলব,—যে নরহত্যায় নিজের হাত রক্তে রঞ্জিত করতে পারে, যে যুবক একটি নারীর সুখস্বপ্নের জন্য নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করে অপরের প্রাণ নিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনা—তার কি শাস্তি হওয়া উচিত তা বিচারক ও জুরিগণই বিচার করবেন। আমার এই যুবকটির জন্য সত্যিই খুব দুঃখ হয়—দুঃখ হয় তার মনুষ্যত্বের হীনতা দেখে। তবে এক দিক দিয়ে যেমন দুঃখ হয়েছে আমার আনন্দও হয়েছে এই দেখে যে যুবকটি তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। সে স্বীকার করেছে খুন সেই করেছে। এখন আমি—বিচারকের অনুমতি নিয়ে আসামী শ্রী অনুপ চৌধুরীকে দু'একটি প্রশ্ন করব"।

উকিল অনুপের কাছে এগিয়ে গেলেন, দেখলেন অনুপ হাসছে। উকিল প্রশ্ন করলেন অনুপকে—"আচ্ছা অনুপবাবু, সত্যি করে বলুন তো—আপনি কি সত্যিই সুলতা দেবীকে ভাল বাসতেন?"

অনুপ বলে—"সে কথার জবাব আমি দেব না।"

"আচ্ছা—আপনাকে কি সুলতা দেবী ভালবাসতেন? উকিল প্রশ্ন করে।

"জানি না" অনুপ গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়।

"আপনি যখন দেখলেন যে আপনার প্রেমিকা চাতচাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন আপনার মধ্যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে আর খুনটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় না?

অনুপ হেসে বলে—"হয়ত তাই—কিন্তু আপনি দ্বিধা জেরা করছেন—আমি তো স্বীকারই করেছি—খুন আমিই করেছি।" বিচারক একে একে অনুপের সব কথা নোট করে নিলেন;

সকলের জেরা হয়ে যাবার পর ভিখুকে দাঁড় করানো হলো কাঠগড়ায়, উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি নিখিলেশ বাবুর বাড়ীতে কতদিন কাজ করছ?"

"চার পাঁচ বছর, ভিখু জবাব দেয়।

"তা হঠাৎ তুমি অনুপ বাবুকে খবর দিতে গেলে কেন?"

"সুলতা দেবীর কষ্ট দেখে আমার বড় কষ্ট হল, আর বিদ্যুৎ দেবী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

"বিদ্যুৎ দেবীর সঙ্গে নিখিলেশ বাবুর কতদিনের পরিচয়?"

"সে আমি বলতে পারে না।"

"তুমি ঘরে ঢুকে কি দেখলে?"

"সুলতা দেবী আর অনুপবাবু খাড়া রতা আর আউর ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ দেবী আর নিখিলেশ বাবুকা লাস গিরাথা।

বিচারককে এই কথা নোট করার কথা বলে ভিখুকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো।

তার চারদিন পর আবার মোকর্দমা উঠলো। এইবার নিয়ে আসা হলো যার বাড়ীতে নিখিলেশ সুলতাকে উঠিয়েছিল সেই মেয়েটিকে। সে বললে "আমার কাছে বাবু মাঝে মাঝে আসতেন একদিন আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন "আমার বিয়ে তোমার বাড়ীতে হবে, তুমি সব ব্যবস্থা কর।"

তারপর সুলতা দেবী ও বিদ্যুৎ দেবীকে আমার বাড়ীতে আনলেন তিনি, সেই দিনই এই ঘটনা—আমি গুলির শব্দ শুনে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বড় ভয় করেছিল আমার—আমি কিছু দেখিনি তারপর দিন খোঁজ নিয়ে জানলাম এইসব ঘটনা ঘটেছে। আমার বাড়ীতে খুন হয়েছে।" কথা কয়টি বলে মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দিনের পর দিন ধরে নীলিমা বিকাশের সামনে অনুপের বিচারের প্রহসন হয়ে একদিন তার যবনিকা পাত হলো—অনুপ স্বীকার করেছে যে সেই খুন করেছে, বিচারে আইনের চোখে নিখিলেশ ও বিদ্যুৎ দোষী হলেও খুনের দোষে অনুপের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

মিঃ রায় অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না

অনুপকে এই কঠিন শাস্তি হতে। তিনি বুঝতে পারলেন না নির্দোষী হয়েও অনুপ কেন ইচ্ছা করে খুনী সাজলে। হয়তো অনুপের এটা অভিমান সুলতার ওপর,—সুলতাকে পাগল অবস্থায় একবার কাঠগড়াতে আনা হয়েছিল, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু অনর্গল হেসে গেছে। কোন প্রশ্নেরই উত্তর তার কাছে পাওয়া যায়নি, সুলতাকে এ অবস্থায় দেখেছে অনুপ—পাথরের মূর্তির মত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে সুলতাকে দেখেছে।

জজের রায় বেরিয়ে যাবার পর বিকাশ কাঁদতে কাঁদতে সুলতাকে বলেছিল "অনুপের দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে, সুলতা শুনেছিল সে কথা?" কিন্তু কাকে কি বলছে বিকাশ? অনুপের কথা শুনে মনে হল না যে সে তাকে চিনতে পেরেছে শুধু বলল—"আমায় কিন্তু আজ বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, মাকে যে কতদিন দেখিনি নিখিলেশ বাবু।" তারপর সেই যে হাসি সুলতার আরম্ভ হলো মনে হল জীবনে বোধ হয় সে হাসি সুলতার আর থামবে না।

বিকাশ সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল। সুলতা সেখানে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল—তার কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।

দশ বছর পরের কথা। অনুপ জেল থেকে খালাস পেয়েই কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না. একমাত্র মা ছিলেন তিনি অনুপের রায় বেরুবার পর সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না—দিন পনের পরেই মারা গেলেন।

সুব্রতের খোঁজ নিয়ে শুনলো সেখানে তারা নাই। বিকাশের কথা মনে হল—ভাবলে সেইখানেই যাওয়া যাক—আপাততঃ, সুলতা—কেমন আছে কে জানে?

বিকাশের বাড়ী এসে অনুপ কড়া নাড়ল, উঃ কতদিন পর সব দেখা হবে। রাস্তা ঠিক তেমনিই আছে—পানের দোকানটাও আছে দেখ্‌ছি।

"কে"? ভিতর থেকে—গুরু গম্ভীর গলার আওয়াজ এলো—দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি আর যেই হোন বিকাশ নন্।

"তুমি আবার কে"? ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন অনুপকে দেখে।

তুমি সম্বোধনে চমকে উঠল অনুপ, দোষ কি ভদ্রলোকের—যা পোষাক তার, যা চেহারা হয়েছে। "বিকাশ বাবু আছেন"?

"কে বিকাশ বাবু? এ বাড়ীতে বিকাশ বাবু বলে কেউ থাকেনা, চালাকি করবার জায়গা পাওনি—কিছু নিয়ে সটকে পড়বার তালে আছ—যাও যাও সরে পড়।"

অনুপ আর কথা বাড়ায়না আস্তে আস্তে সরে যায় সেখান থেকে—কাউকে জিজ্ঞাসা করলে হয়না? পানের দোকানে এসে দেখে একজন বুড়ো লোক বসে আছে। "আচ্ছা এখানে বিকাশ বাবু বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথায় বলতে পারেন"?

"কার কথা বলছেন যার বোনকে নিয়ে খুব মর্ডার হয়েছিল—তার কথা"?

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ"।

"তারা তো কতদিন হলো—এখান থেকে উঠে গেছে"।

অনুপ নিশ্চিন্ত হ'লো। রাত্রে থাকবার দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেল অনুপ—পার্ক কিংবা কারোও বারান্দায় কাটিয়ে দেবে রাত্রিটুকু। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল সে, হঠাৎ নীলিমাদের কথা মনে হল অনুপের। নানা সেখানে সে যাবে না—তার থেকে রাস্তায় কাটানো অনেক ভাল।

অনুপ রাতটা একজন ভদ্রলোকের বারান্দায় শুয়ে কাটালো। ভোর হয়ে আসতেই উঠে পড়লো—অনুপ বেশ ছিল জেলে, কোনও ভাবনা ছিলনা। এখন সে কি করবে?

তখন দুপুর পেরিয়ে বিকাল হয়েছে, সারাদিন পেটে

কিছু পড়েনি। রাস্তার কল থেকে এক আঁজলা জল খেয়ে বসে পড়লো সে ফুটপাতের উপর। চলতে আর সে পারছে না। চিনতে পারছে অনুপ? ম্লান হাসি খেলে গেল অনুপের মুখে।

ঐ যে মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোকটি আর একজন ভদ্রমহিলা, পয়সা চেয়ে নেব ওদের কাছ থেকে? এত দুঃখেও হাসি পায় অনুপের, তবু এগিয়ে যায় সে ওদের দিকে। কাছে গিয়ে ফিরে আসে, চাইতে পারেনা অনুপ না, না, সে খুনী আসামী সাজতে পারে, কিন্তু ভিক্ষুক? না না করে গেলেও না। আবার ফিরে এসে রাস্তার ওপর বসে পড়ে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে চলে পথে—কিন্তু বেশী দূর যেতে পারেনা, একটা বাড়ীর সামনে এসে বসে পড়ে, এই দীর্ঘকাল কারাবাসের পর তার শরীর ভেঙ্গে গেছে।

বাড়ী থেকে বাড়ীর ঝি এসে সামনে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারি ফেলে দিয়ে

কেউ তো নেই—চারিদিকে দেখে নেয় অনুপ না, ধারে কাছে কেউ নেই—চোখ কান বুজে বসে পড়ে সেই উচ্ছিষ্টের পাশে। এক মুঠা তুলে নেয় মুখে দেওয়ার জন্য, এমন সময় কোথা থেকে এক পাগলী এসে বসে পড়ে সেই উচ্ছিষ্টের পাশে—গোগ্রাসে খেতে আরম্ভ করে সেই উচ্ছিষ্ট। অনুপের মুঠা থেকে তুলে নেওয়া ভাত পড়ে যায়, সুলতা? একি? স্বপ্ন—দেখছে সে—"সুলতা" চিৎকার করে ওঠে অনুপ,—সুলতার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, তখন সে গোগ্রাসে গিলছে, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে অনুপ—এই সেই সুলতা? পাগলীকে ধরে সে ঝাঁকানি দেয়—"সুলতা আমি অনুপ—চিনে পারছনা? সুলতা, দেখ আমি, আমি", অনুপের চিৎকারে আশেপাশের বাড়ী থেকে লোক এসে জড় হয়ে গেছে। এতক্ষণ পরে তার যেন চেতনা ফিরে এসেছে, সেই ভীড়ের মধ্যে এক পাশে বিকাশও দাঁড়িয়ে আছে।

সুলতা কেমন করে বিকাশের নজর এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। মা অনেকদিন মারা গেছেন। একা মানুষ বিকাশ, সব সময়ে সুলতাকে চোখে চোখে রাখতে পারা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

সুলতাকে বাইরে খুঁজতে এসে দেখে পাড়ার লোকেরা ভীড় করে আছে তার বোনের চারিধারে। আরো একজনকে দেখে বিকাশ। সমস্ত শরীরটা তার যেন উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে—এ কে? অনুপ?

অনুপকে দেখে সে যেন কেমন হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে বিকাশের, কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছেনা তার, এ কেমন করে সম্ভব? অনুপ?

অনুপ শুনলে ভীড়ের মধ্য থেকে একটি ছোকরা বিকাশকে বলছে—"এই লোকটা আপনার পাগলী বোনকে ধরে খুব ঝাঁকানি দিচ্ছে দেখলাম, দিয়ে দেবো ঘা কতক"?

কাঁদতে কাঁদতে বিকাশ বলে—"না থাক—এতবড় উপকারটা আপনি নাই বা করলেন", অনুপের দিকে এগিয়ে যায় বিকাশ, ছুটে গিয়ে অনুপকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

সুলতা হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে আসে, বিকাশ দু'জনকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে—পাশের গলির মধ্যে ঢুকে যায়—সেখান থেকে তার একতালা ঘরের খোলা জানালাটা স্পষ্ট নজরে পড়ে।

—সমাপ্ত—

বিড়ম্বনা

[শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দত্ত]

—না, না। মানুষের শরীর ত ?

—তাতো জানি, কিন্তু লেখাটা যে কালকে শেষ না করলেই নয়, রাণু।

—এ রকম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, অনিদ্রা মাথায় ক'রে সবল সুস্থ আদর্শের কথা ভাবা তোমার সাজেনা। বৃথা চেষ্টা।

—তবু সেরা ছোট গল্পের পুরস্কারের জন্য একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না।

—আকাশকুসুম। জীবনের পাথেয় এরকম করে হয়না। তা ছাড়া মাসিক পত্রিকার ব্যাপার ত' তোমার জানা আছে।

—তার জন্য দুঃখ করিনা। কারণ, তখন আমার দেখার একটা নেশা ছিল। 'দেশ বড় হবে' এই আদর্শ নিয়েই মেতেছিলাম। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে সদর অন্দর ছেয়ে যাবে। আমার লেখা ওদের নিজেদের নামে ছাপিয়েছে ব'লে আমার সেদিন আক্ষেপ করবার কিছু ছিলনা। যে ভাবেই হোক দেশের প্রয়োজনে লেগেছিল, সেই আমার পুরস্কার।

—সর্বনেশে নেশা ছাড়।

বাপীর উঠ্‌তে দেরী নেই ; দুধের চেষ্টা দেখ, নইলে ওর কান্না থামান আমার সাধ্যি নয়।

—মাপ কর ; তুমি যা হয় কর।

—কাঠ, কয়লা, কেরোসিন কিছুইত ঘরে নেই। মেয়েছেলে হয়ে আমি এসব কেমন ক'রে জোগাড় ক'রব ?

—তাইত রাণু, প্রতি মাস অথচ এ সব করতে পারনা ? দেখ্‌ছি উপোস ছাড়াত' উপায় নেই।

—সে কথা বল্‌বেই ত। কিন্তু তাতে বাপীর চল্‌বেনা।

—হে ! টাকা মাহিনার কেরাণী। ঘর ভাড়া দিয়ে, ছেলে বৌ নিয়ে সংসার করা চলে ? নামেই জীয়ন্ত সরকার।

—তা ব'লে চাঁদের আলো, নীল আকাশ, তারার ঝিকিমিকির সঙ্গে চামচিকের অট্টহাস্যের কি কোনও মূল্য আছে ?

—বাপীর তিন বছর বয়েস হ'ল, ওর মানুষ হওয়ারও ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সব কর ত', অনর্থ বাধাব। ক'মাস বাদেইত আবার ছেলে হবে, সে সব কথা ভাব্‌বার বুঝি তোমার সময় নেই ?

—না থাকাই স্বাভাবিক। এতদিন একান্ন পরিবারের মধ্যে মানুষ। কর্তারা ছোটদের এ সব বিষয় থেকে চিরদিনই রেহাই দিয়ে এসেছেন। আজ হঠাৎ এত শীগগির মাথা ঘামে কি করে ? তখনকার দিনে তাঁদের কাছে মুখোমুখী জবাব দেওয়া নেওয়াকে বিশেষ স্পর্ধার কথা বলেই তাঁরা মনে করতেন।

—"সেই বাড়ীর একমাত্র বৌ, ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছি এই কথাটাই কি তুমি আমায় সব সময় বোঝাতে চাও ?

—তোমার কথা বল্‌ছিনা, রাণু। বাংলাদেশের আবহাওয়ার কথাই বল্‌ছি। বৌ ঝিয়েরা শ্বশুর ঘর, স্বামীর ভিটের ইজ্জতকে প্রথম জীবনে নিজেদের একান্ত ব'লে মানতে চায় না। আলাদা সত্তা বোধ করে। সংসারের সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে নিজেদের অপমানিতা, লাঞ্ছিতা মনে করে। অশান্তি বেড়েই যায়।

—থাম, থাম।

—হ্যাঁ ; ভেঙ্গে হওয়ার দায়িত্ব আমাদের, উভয়ের ধৈর্য আর সামঞ্জস্য বোধের অভাব। অন্যায়, ভুলের বিরুদ্ধে গলাবাজি করে লোক ওড় করা যায়। মুখে চুণ কালিও মাখা যায়। শোধরান যায় না। ক্ষমার আনন্দ আনতই।

আমার পুজোর সময় বয়ে যাচ্ছে।

—নিয়মিত ঠাকুরঘরে মন্ত্র পাঠ আর তুলসীতলায় মাথা ঠুকে অনাত্মীয়কেই ভোলান যায়। সত্যকে পাওয়া যায় না গৃহদেবতা তুষ্ট গৃহধর্মে, সেবায়।

—দর্শন আলোচনা, মাষ্টারী অনেক হ'য়েছে, এখন দুধের ব্যবস্থা কর।

—জ্বালালে। সকাল ১০টা থেকে রাত্তির ১০টা অবধি অফিস করাই কেরাণীর ভাল জীবন।

• •

—এই নাও রেশন থলি আর সম্বল দুটো টাকা।

বাজার এনে কানু কর্ম দিলে :

জ্বালানি কাঠ—।০	মসলা—/০
কয়লা—	আলু—৵১০
দুধ—	শাক—/০
চা—	মাছ—।০
চিনি—	
গুড়—	
নুন—	অফিস যাতায়াত—৵০
সং তৈল— ৷০	
	———
	মোট ২৲

—৮টা বেজে গেল। উনুন ধরান, বাপীর দুধ খাওয়া, অফিসের ভাত এসব হবে কখন? বাজারের ত' এই ছিরি!

—কেন? ইংরাজ তাড়াবার সময় কর্তাদের মনে ছিলনা—দেশের লোকের পুরো ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে? তখন শুনেছিলুম কালো বাজারীদের স্যাঙ্গ পোষ্টে ঝুলিয়ে সদর রাস্তায় ফাঁসি কাঠে লটকে দেওয়া হবে।

—ফাঁকা আওয়াজে পেট ভরে না। অফিসের দেরী হ'য়ে গেল যে?

—তাতে কি হ'য়েছে? যাব না। রোজ রোজ খাটতে পারিনা।

—চাকরী গেলে?

—কাজ করে মাইনে নিই। দেশের মুখ চেয়েই নির্দিষ্ট কাজের চেয়ে বেশী কাজ করতে রাজী হই। বড়বাবুর মুখ চেয়ে নয়। দেশের স্বাধীনতা ত' গোলামী করবার জন্য নয়।

—কথায় কথা বাড়ে। আপের নষ্ট কোরনা, অফিস যাও।

—তাহ'লে গল্প লেখা সুরু হবে কখন?

—অনিশ্চিতকে দূর থেকে সেলাম জানান ভাল।

—দেশ, জাতির উত্থান পতনের ক্রমবিকাশ নিয়ে ছেলে খেলা চলে না। সব কিছু সত্যরূপ সৃষ্টির দাবী জগতে একমাত্র সাহিত্যই করতে পারে।

—নরনারীপ্রেমের বিকারপ্রচারও না কি সাহিত্যের ধর্ম?

—সে অনেক কথা। বাপী কি করছে, দেখ।

—অবোধ শিশু। মুখে হাসি লেগেই আছে, এই দেখলেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে। দোহাই শিগগির অফিস যাও। নিজের পায়ে আর কুড়ুল মেরো না।

—যা বলেছ। খাওয়াটা না হয় ও বেলাই হবে, আজকের মত বড়বাবুর গোলামী করে চাকরীটা বাঁচিয়ে আসি।

• • •

—রোজ রোজ দেরী করলে অফিসের কাজ চলে কি ক'রে কানুবাবু?

—আজ্ঞে,…

—বুঝেছি। এতদিন কাজ করে কিছুই শিখলেন না। ঘর বাড়ী পড়া ও পিয়নদের বছরে দুবার লেগেই আছে ওদের এত ছুটীর সুপারিশ করলে চলে কি করে? ছুটী হবে না।

—আজ্ঞে, Field Inspectorএর caseটা!

—ও, সেই অফিসের কাজ দেখতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে চোট লাগে ব'লে রিপোর্ট করেছিল। ছুটী নেয়া

ঘরে ব'সে কাজ করেছিল। তারপর মারছেনা ব'লে ১৫ দিনের ছুটী নিয়ে এখানে এসেছিল। X ray করাবে ব'লে।

—আজ্ঞে হাঁ। চার মাস হ'য়ে গেল, কোনও claim দেয়নি। case genuine কিনা hospital report call হবে করা কি? এর আগে তিনদিন অরের জন্ত ৪৮৲ টাকার বিল দিয়েছিল।

—না, না। কিছুই বোঝেন না। কেবল বোকার মত কথা বলেন। Inspectorকে এখানে জরুরী কাজ আছে ব'লে আসতে লিখে দিন আর আগাম T. A.টাও পাঠিয়ে দিন। On duty, অফিস compensation দিতে বাধ্য। Hospital এর সঙ্গে ব্যবস্থা করলেই হবে।

—আজ্ঞে—

—লিখে দিন, দেরী নয়।

• • •

—এত দেরী? পথে বুঝি গল্প লেখাটা শেষ করে এলে?

—গল্প লেখা মাথায় উঠেছে। খাটুনি আর খিঁচুনির জ্বালায় দুদণ্ড স্থির হ'তে পারা যায় না বলে।

—আমারও আর এত ধকল সইছেনা। কেমন খিট্‌খিটে স্বভাব হ'য়ে গেছে। এর ওপোর তোমার শরীর ভাঙ্গলে আমি আর বাঁচব না।

—সময়ও মাত্র একদিন আছে। এর মধ্যে তোমায় খেয়ে আমার গল্পের প্লট তৈরী হবে না।

—অনেক হয়েছে। এমন খাওয়া দাওয়া করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। রাগ পরে কোরো। বরাহনগর থেকে ভাসুর বোধ হয় চিঠি দিয়েছেন। কাল অফিসে গিয়ে প'ড়ে জবাব দিয়ে দিও।

—তোমার মত রাগ আমার চ্যাঁকে চ্যাঁকে ঘোরে না। আমার কাছে নিতান্ত অর্থহীন। চিঠিটা দাও না দেখি?

—তাড়া কিসের? দুবছরের ওপর তোমাদের ভিটে ছেড়ে চলে এসেছি। আমাদের কথা ছেড়ে দাও, এরমধ্যে একবার বাপীর খবরটাও ত করতে পারতেন?

—নিশ্চয় জরুরী কিছু আছে, না হ'লে নয়।

—সে যাই হোক, আমি এখন দিতে পারবনা।

• • •

—রেশনের পাঁচমিশেলী গুমো চাল বাচ্ছাটার একেবারেই সহ্য হচ্ছেনা। পেটটা ওর ভাল নেই।

—ভাঁড়ে মা ভবানী। রান্নার পাঠ ত আজ আর নেই। বালি আনবার পয়সাও বোধ হয় নেই।

—লক্ষ্মীর কৌটায় ৮/১০ পয়সা ছিল। /০ আনার বালি আনলেই হবে। কাল একবেলা রান্নার জন্তে আজকের একটা বেলাও কোনও রকম চ'লে যাবে।

—অত রাত্তিরে খেয়ে আমার শরীরটাও ভাল নেই। আজ সকাল সকাল অফিস বেরিয়ে পড়ি। যাবার আগে বালিটা কিনে দিয়ে যাচ্ছি।

—সাবধানে থেক। ভাসুরের চিঠিটা নিয়ে যাও, জবাব দিতে ভুল না।

শরীর মন কোনটাই আর চলতে চাইল না। অফিসের কাজে মন বসে না। অন্তমনস্কভাবে কানু তার দাদার চিঠিটা খুলে পড়তে আরম্ভ করলে:

কানু,

অনেক কাল পরে তোমায় চিঠি দিচ্ছি; একান্ত প্রয়োজন বলেই। তোমরা পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে আছ, নিজেদের শান্তির জন্ত। ভাল কথা, তবে পরস্পরের খবর নেওয়া নেওয়ার পাঠ সেই থেকে একেবারে উঠে গেছে। তা নিয়ে আমাদের কারও অভিযোগ করবার কিছু নেই।

আমার অনিদ্রা আর blood pressure বেড়েই চলেছে। কদিনই বা বাঁচব? তাই আজ অনেক পুরাণ কথা মনে পড়ছে, না বলেও থাকতে পারছিনা।

আমাদের দু'শ বছরের এই পুরাণ বাড়ীর মায়া আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের সব ছোট রেখে মা বাবা অনেকদিনই বিদায় নিলেন। তাঁদের কাছে শোনা সেই অতীতের কথা আজ কাহিনী বলেই মনে হয়।

দেশে সমাজ-রাষ্ট্র-বিপ্লব-আন্দোলন সুরু হয় পিতৃ-পুরুষদের নিঃস্বার্থ কর্ম-প্রেরণা ও আত্ম-বলিদানে। সৌজন্য আর দরদভরা বিশ্বাস ছিল তাঁদের সত্য পরিচয়।

আমরা পাঁচ ভাই যেন পঞ্চ পাণ্ডব। একটী ছোট বোন সেও কত আদরের ছিল। তোমাদের মানুষ করার দায়িত্ব আমাকে পেয়ে বসল। নিজের ভবিষ্যতের কথা একবারও ভাবলুম না। তোমার মেজদা মেতে গেল সমবায় সমিতির আদর্শ প্রচারে; "প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে এবং সকলে প্রত্যেকের তরে"। মেজদা ভারতের সঙ্গীত বিশারদ হ'য়ে বিশ্বজনীন সুরের সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘোরে। এদিকে তোমার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তুমি সংস্কৃতি, সাহিত্য এই সব নিয়ে মেতে উঠলে। তুমি ছাড়া আমাদের মধ্যে কেহই বিয়ে করেনি। সেও অনেক পরে।

দেশের ছেলেদের মানুষ করতে হ'লে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খেলাধূলা, ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিকাশের ব্যবস্থা প্রয়োজন। শিশুমনকে ভারাক্রান্ত বা ভীতু না ক'রে আনন্দ আগ্রহে ভ'রে দিতে হবে। এই আদর্শ নিয়ে বহু শ্রম ও অর্থব্যয় ক'রে "শিশু নিকেতন", স্থাপন করি। দেনার মাত্রা আমাদের বাড়তেই লাগল। পাড়া প্রতিবেশীরা আমাদের এইসব পছন্দ করতনা। অথচ আমাদের এই আদর্শবাদীর আহম্মকির সুযোগ নিয়ে বিনা খরচায় নিজেদের ছেলেদের মানুষ করে নিতে কোনও দিনই দ্বিধা বোধ করেনি।

যাই হোক বোনের বিয়ে ভালই হয়েছিল। কপালে সইলনা। সে কথা ভাবলে এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে। একদিন সন্ধ্যার সময় বোনের ছেলেকে নিয়ে তারা স্বামী স্ত্রীতে মোটরে ক'রে বেড়িয়ে ফিরেছে। গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীতে ঢুকতে যাবে এমন সময় খুব দমকা হাওয়া উঠল। পাশের একটা ঘরের টিনের চালা উড়ে এসে তাদের গলা কেটে দিয়ে চ'লে গেল। কেউই তারা বাঁচল না।

এর অনেক পরে তুমি বিয়ে করতে রাজী হ'লে। বংশ রক্ষা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ হবে এই ভেবে সে কী আনন্দ।

বৌমা বিয়ের পনে, বাড়ীতে এসেই শুনলে—এমন মেস বাড়ীতেও মেয়ের বিয়ে দেয়? মেয়ের বাপ মায়ের গলায় দড়ি জোটেনা তাই এতগুলো বুনো ষাঁড়দের নিয়ে ঘর করতে পাঠিয়েছে।

কেউ বললে—ওমা, এই বউ, এ যে একবারে নহিষ-মর্দ্দিনী। বৌমার ধারণাও বদ্ধমূল হ'ল—আমরা ঘাম-খেয়ালী, ঘরজ্বালানী। সেইজন্য আমাদের কাজে কথা-বার্তায় কিছুতেই সায় দিতে পারত না। দৃষ্টিকটু কিছু চোখে পড়লে শোধরাবার কথা সহ্য করতে পারতনা। নিজের মত ও পথকে সব সময়ই প্রাধান্য দিতে চাইত। সেজন্য মুখোমুখী জবাব দিতেও তার কোনও দিন বাধতনা।

তারপর সংসারে এল আমাদের সকলকার আদরের একমাত্র রণু। আমাদের মনের কথা, আনন্দের কথা একবারও ভাবলে না, বরং বৌমার ভয় খুব বেড়ে গেল, পাছে যদি কোনও স্বার্থহানি হয়। জোর ক'রেই তোমাকে চাকরী করাতে বাধ্য করলে।

আমাদের দেনা ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগল। বৌমা এসব বরদাস্ত করলনা। কারণ অকারণে রাগারাগির চূড়ান্ত ক'রে রণুকে নিয়ে তোমরা চলে গেলে। ভিটের গৌরব, আভিজাত্যের অভিমান অর্থহীন সমস্যাই হ'য়ে রইল। সাধের স্কুল এতদিনে বন্ধ হ'ল। দশজনের ছেলে মানুষ হল। ঘরের ছেলের মানুষ হওয়ার প্রশ্ন রয়েই গেল।

এর মধ্যে তোমার মেজদা তার সমবায় সমিতির ব্যাপারে অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ল। সহকর্মীদের স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্ত ও অসাধুতার জ্বালায় নিজের জীবনের সাধনা ত্যাগ করে গৃহত্যাগী হোল।

মেজদা সার্বজনীন সুরের সন্ধান করে দেশে ফিরে দেখলে—Direct action-এর ঠেলায় হিন্দু মুসলমান

দাদার চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তা। শান্তিপুর তৈরী করতে গিয়ে নিজেই শহীদ হ'য়ে চলে গেল। এর আগে তোমার ন'দা আগেই বিপ্লবের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইংরেজের শেষ গোলার সামনে নিজের বুকটা বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। এমনি করেই আমি নিতান্ত একা হয়ে পড়লুম। এসব পুরাণ দুঃখের কাহিনী বলার কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা জানিনা। কিন্তু না ব'লেও এই নিরান্ধব পুরীতে থাকতে পারছিনা। দিন আমার ঘনিয়ে এসেছে, তোমায় আজ একটী কথা বলে যেতে চাই :

এই ক'বছর তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বান্ধব জীবনের শেষ সন্ধ্যায় বসে আমার এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হ'য়েছে। রণুর না যদি ইচ্ছে করে ত আমাদের দাতপুকুরের ভিটের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করতে পারে। রণু বড় হবে, এত বড় সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবে এ চিন্তার প্রেরণাকে উপেক্ষা করতে পারবেনা বোধ হয়। তবে যদি মনে কর এই বিষয় রক্ষা করতে গিয়ে সহজ সৌজন্য আর মানুষের প্রতি দরদকে উপেক্ষা করবে, বংশের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে ভিটে রক্ষার দরকার নেই। তা যদি হয় ত, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে আমাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

রণুর মায়ের কাছে অপরাধী হ'য়েই গেলুম। ভুল বোঝার দায়িত্ব কেবল আমারই নয়, তারও আছে। উপলব্ধির পরেও যে মনের পরিবর্তন হয়না, তার চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে! মানুষের এর চেয়ে মরণ আর কিছু নেই।

তোমার কথা, ভাইদের কথাও ভাবিনা। কোনও-দিনই তারা আমার অপরাধের কৈফিয়ৎ দাবী করেনি; দুঃখ বেদনা বোধই করেছে। এ শিক্ষার মূল্য আজ কয় ক'জন দিতে পারে?

রণুদের নিয়ে আসতে ভুল না।

চিঠি পড়া শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরাহনগর থেকে টেলিফোন আসে "দাদার বাঁচবার আর কোনও আশা নেই।"

কানু অস্থির হ'য়ে পড়ে। নিরুপায়। মাস শেষ হতে এখনও চারদিন। হাতে একটী পয়সা নেই। অফিসে টাকা ধার যারা দিতে পারে খোয়া যাবার ভয়ে এমন বিপদেও তারা দিতে চাইলনা। রাস্তায় বেরিয়ে দেখে কাবুলী দাঁড়িয়ে। নরিয়া হ'য়েই তার কাছে দশ টাকা ধার ক'রে বাড়ী ফেরে।

* * *

—ইস্ তোমার কি দশা হ'য়েছে? এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে, শরীর খুব খারাপ হ'য়েছে বুঝি?

—না, না। আমাদের এখনি বেরোতে হবে; বাইরে ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘর দুটো চাবি দিয়ে রণুকে নিয়ে চল।

—আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনা এত পয়সা পেলে কোথায়? কাল হাঁড়ি চড়বে কি করে তার ঠিক নেই অথচ খামখেয়ালীরও শেষ নেই। টাকাকে টাকা বলেই জ্ঞান করনা।

—সে বোঝা পড়া পরে হবে। বরাহনগর যেতে হবে, দাদার খুব বাড়াবাড়ি।

—না যেতে হবেনা। তোমার না হ'ল খাওয়া, না হ'ল গল্পের আরম্ভ না হল শেষ। আজকের দিন চলে গেলে ভগবান কি আর মুখ তুলে চাইবে?

—মা ভো-ও-ও। বা আ-বু জো—ঠা কাছে।

—রণু চুপ কর, আকাশে ঘটা করে মেঘ উঠেছে। এখনি 'বুরো' ধরে নিয়ে যাবে।

—ওকে ভয় দেখাবার কি আছে? বরাতে থাকে ভগবান মিলিয়ে দেবেন।

এই নাও দাদার চিঠি। জবাব দেবার সময় পাইনি। দেখারত দিতে তাই ঘটা করে সপরিবারে ভবানীপুর থেকে বরাহনগর যাচ্ছি। এই ট্যাক্সী জলদি।

আপন খেয়ালে ট্যাক্সী চলে। কানুর চোখ চলে চৌরঙ্গীর টানা রাস্তার ধারে অগণিত জনসমুদ্রের ইতস্তত: গতির পানে। আর ময়দানের সবুজ ঘাসের সঙ্গে মেঘের বুকচেরা অস্তমিত রবিরশ্মির খেলা রাণুকে করে আনমনা।

দু'জনেরই চোখ থেকে থেকে সজল হয়ে ফুলে ওঠে। মাঝে মাঝে রণু হেসে বলে—মা; বুঝো; বা আ বু জো—ঠা!

গাড়ী চলে টিক্ টিক্ বাই বাই।

অরণ্য স্মৃতি

শ্রীহীরালাল দাসগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

বাংলোয় পৌঁছোবার আগে নবী আক্কার বলেছিল রেঞ্জার সাহেবের কাহিনী। বাঘে অনেক গরু মোষ খেলো গত বছর। পুলিশ সুপার রেঞ্জার হুকুম দিলেন "ভঁইসা বাঁধো।" বাঘ এসে ভঁইসা মেরে গেল কিন্তু সাহেব আসেন না। তিনি অসুস্থ ব্যক্তি। ওঁর হুকুম এল আবার ভঁইসা বাঁধতে। এ দ্বিতীয় ভঁইসাও বাঘে নিয়ে গেল। তবুনো সাহেবের শিকারে আসার কুরসৎ হয়নি। আবার ওঁরই নির্দেশে তৃতীয় মোষ বাঁধা হল। এবারে সাহেব এসে পৌঁছেছেন কিন্তু আশ্চর্য বাঘ আর সে কিলের গাছে আসেনা! চতুর্থ বার ভঁইসা বেঁধে নিকটে গাছে মাচা করে সাহেব বসলেন। বারংবার নিক্ষাটে মোষ মেরে বাঘের সন্দেহ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। সেদিন বাঘ এসে সামনের দুই পায়ে ভঁইসের গলা সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে খাওটা কামড়ে ধরেছে। মোষটা এলিয়ে পড়েছে। সেই মুহূর্তে অন্ধকার চিরে বজ্রনাদ হল। সাহেব রাইফেলে গুলি ছুঁড়েছেন। ভঁইসের সঙ্গে সঙ্গে বাঘও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেই মুহূর্তে আবার রাইফেল গর্জন করেছে। বাঘ আর মাথা তুলতে পারলেনা। প্রায় দশ ফুট লম্বা ছিল বাঘটা। অনেক গরু খেয়ে দেহ হয়েছিল পুষ্ট আর লাবণ্যযুক্ত। রেঞ্জার সাহেবের সাফল্যের কথা ভাবছি। আর ভাবছি এই বাঘের কথা। একটা বলিষ্ঠ জানোয়ার অরণ্যের আবাস থেকে বিদায় নিলে। ওর দেহের অণু পরমাণু বন্যিবাসীদের কাড়াকাড়ির পরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটা মিলে যাবে পঞ্চভূতে? কিন্তু ওর প্রাণ? সে কোথায় যাবে? হয়ত পঞ্চভূত আবার গড়বে নূতন দেহ। অহরহঃ গড়ছে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। কিন্তু ঐ প্রাণ প্রদীপ? ওর কি মৃত্যু আছে? ওকি মিশেছে বিশ্বের অদৃশ্য প্রাণ সাগরে? সেখানে কি লুকিয়ে থাকবে ওর ব্যাঘ্র মন? সেই ক্ষুধা, সেই হিংসা? কিন্তু হিংসা কাকে বলব? বাঘ হিংস্র। তার দেহ রক্ষার জন্যই হিংসার প্রয়োজন। মানুষ কেন হিংসা করে! কেন বাঘ মারে? 'দুর্বলেরে রক্ষা কর দুর্জনেরে হানো।' তাই?

তাই যদি হয়, দুর্বল গোরু মোষকে বাঁচাতে দুর্জন বাঘকে মেরে ফেলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাঘ ত' নিজের একান্ত প্রয়োজনেই দুর্জনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার চেহারা হয়েছে ভয়ঙ্কর, দন্ত হয়েছে ধারালো আর মজবুত। দৃষ্টি হয়েছে ত্রাসোৎপাদক! ওর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই যে এই ভয়াল দেহের প্রয়োজন। মানুষ সে যুক্তি মানে না। সে ওকে বধ করে। চাষীদের ফসলের শত্রু হরিণকে মারে। হরিণেরইবা কি অপরাধ? বৈষ্ণব গান্ধীজীকে বলা হয়েছিল—বানরে ফসল নষ্ট করেছে। মহাত্মাজী জবাব দিলেন—'বানর মেরে ফেলো।' তাই যদি সত্য হয়—জীব হত্যায় যদি জীব-প্রেম ক্ষুণ্ন না হয় তা হলে এই হিংসা আর প্রেমের ঊর্ধ্বে আর একটা সত্য আছে। সেখানে হিংসা আর প্রেমের সমন্বয় আছে—এক মহত্তর সৃষ্টি চক্রে। তাই ত মনে হয়—মানুষ, পশু, পক্ষী জানোয়ারের ভিতরে সংস্কার, বুদ্ধি, ক্ষুধা, ক্রোধ, হিংসা ও শক্তির এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। একই অখণ্ড মহতী ইচ্ছা ছড়িয়ে আছে বিশ্ব নিখিলে। কোথাও সে সংস্কার, কোথাও সে যুক্তি, কোথাও সে ক্ষুধা।

তাই বুঝি অদৃশ্য শক্তিকে উদ্দেশ করে ঋষি গেয়েছেন—

"যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।"

তা হলে এই বুদ্ধিও আমার নয়। শক্তিও আমার নয়।

আমি এক মহতী শক্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র। সেই ইচ্ছাই আমাকেও টেনে এনেছে বাংলার কোন্ অখ্যাত প্রান্ত থেকে বিহারের অলক্ষিত অরণ্যাঞ্চলে? সাক্ষী আছেন এক দিকে বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রায়। পণ্ডিত সুধীন রায়। অন্যদিকে পুনোয়া আর বুঁদিয়া। বাংলোর ভিতরে আছেন সেবানিরতা রায় গৃহিনী আর সাবিত্রী। আজ আমার মানস লোকে এরা নূতন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ওরা কোন্ প্রেরণা বশে আমাদের পথযাত্রাকে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছেন! আর আমাদের ঘিরে আছেন এই প্রীতিশালিনী মধুরহাসিনী ভাষা প্রকৃতি। অদ্ভুত! অপূর্ব! আমার নিজের কর্তৃত্বের লেশটুকু নাই কোনখানে।

ঘড়ি সাথে নেই। খড় শয্যায় আবার যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম তখন রাত যে তৃতীয় যাম অতিক্রম করেছে তাতে সন্দেহ নাই। দূরে শেয়ালের হল্লা শোনা যাচ্ছে। সপ্রশ্ন কলরব—"ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়া।" কি হয়েছে—কি হচ্ছে? বাইরে অরণ্য তখন কোন্ নাটকের অভিনয় সুরু করেছে কে জানে? কিন্তু দরজা খুলে বাইরে যেতে হল দৈহিক প্রয়োজনে। তখন চাঁদ ডুবে গেছে। আকাশের নক্ষত্রগুলি বৃহত্তর আকার ধারণ করে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তাদের আলোকে ধরণীর অন্ধকার হালকা হয়েছে।

দূরে ও নিকটে তরুশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে নিথর নিস্পন্দ। তাদের লক্ষ লক্ষ পাতায় যেন লক্ষ লক্ষ আঁখি উৎসুক হয়ে আছে। অদূরে পাহাড়ের বুকে জল-প্রপাতের শব্দ বুঝি শোনা যাচ্ছে। ওরা সবাই টানাটানি করে। তবু এই রহস্যভরা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। মনে পড়ছে—ওই কোকলতের পাশে নিবিড় অরণ্য বেষ্টিত গুহায় আশ্রয় নিয়ে ছিলেন কোন্ সাধু। বাঘ ভালুকের ভয় তাকে বিচলিত করে নি। অনর্গল জলঝরা নিঃসঙ্গ গহন ওকে আতঙ্কিত করে নি। কিন্তু আতঙ্কিত হয়েছিল ওই করণা পথের যাত্রীদল। একদিন দিনের আলোতে দেখা গেল লোটা কম্বল। দেখা গেল না সাধুকে! গুহা শূন্য। কেউ বলেছে সাধুকে বাঘে খেয়েছে—কেউ বলেছে সে দেহ রেখেছে। প্রকৃত রহস্য কেউ জানে না।

রাত্রির প্রথম প্রহরে বাঘ এদিকে হামলা করেছিল। বুঁদিয়া পুনোয়ের লোভ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। আমার পা দু'খানিও ভক্ত বারান্দা পেরিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। তারপর দরজায় খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরের পাহাড়ী ঠাণ্ডায় শীতে হি হি করে কাঁপছি। এবারে মুদিত চোখে ভেসে এসেছে কোকলতের নৃত্যশীল জলস্রোত। গভীর প্রশান্তিতে কখন সে জলস্রোত মুছে গেল।

তখনো বিছানা ছেড়ে উঠিনি। ঈষতরল অন্ধকারে গরম চা এসে পৌঁছেছে শয্যাপ্রান্তে। সুধীন বাবু লোটা হাতে পূর্বদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। ওখানে এক ঝাঁক ছোট ছোট খেঁজুর গাছে রসের হাঁড়ি ঝুলছে। সুধীন বাবু ঐ হাঁড়ি থেকে রস ঢেলে আনবেন। মনীন্দ্রও আর একটি লোটা হাতে নিয়েছে। আমি চায়ে চুমুক দিয়েছি। একটা মোটরের শব্দ শোনা গেল। গাড়ী থেকে হাসিমুখে নেমে এলেন প্রফেসর রায়। কলিকাতা থেকে ফিরেছেন কোডার্মাতে। সেখান থেকে এসেছেন মটরে। আশ্চর্য! ওর মুখে শ্রান্তির চিহ্নটুকু নাই। চা খেয়েই বেরোলেন বনভ্রমণে। এই বিজ্ঞানী কর্মবীরের সাধনার পেছনে আছে শিল্পীমন। সে মন রসপিয়াসী। অরণ্য আড়ালে বিনীতমান বিজ্ঞানী হঠাৎ আমার চিত্তে আনন্দের লহর তুলেছে। উনি বন থেকে যখন ফিরে এলেন—হাতে একগুচ্ছ দুগ্ধধবল বন পল্লব। চাষ কলায় ওর মত এমন অনুরাগ কম দেখেছি। এমন শ্রান্তিহীন কর্মী কম দেখেছি। ক্ষয় ও ক্ষতিতে এমন নির্বিকার মানুষও বেশী দেখি নাই।

বুঁদিয়া আর পুনোয়া গেছে জঙ্গলে তিঁতিরের সন্ধানে কিন্তু আসল উদ্দেশ্য বোধ হয় বাঘের পদাঙ্ক অনুসরণ। আমরা খাওয়াদাওয়া শেষ করে যাব হাজারীবাগ জিলায় তিলাইয়ার বাঁধ দেখতে। সুরেন বাবুর হুকুম 'বারোটা

নয়ো শেষের হও আয়োজনের সাড়া পড়ে গেছে। আর ও সহেন বাবু বোতে দাঁড়িয়ে কুয়োর পাশে স্নান করছেন। উনি আমার নতুন অনারেবল্ব ব দসাহী নন। স্নানান্তে ধুতি পাঞ্জাবী নিয়ে ধুয়ে রোদে শুকুতে দিলেন। আমি কৌতূহলপূর্ণ চোখে চেয়ে দেখছিলাম। কৃত্যের প্রতি অতি ভিক্টোরিয়ানরা আমাদের দেশে এসেছে কোন যুগে? বাঙালী ইংরেজের আমলে? ইংরেজরা ত তাদের প্রগতিশীল। এ দেশে এসে বয়, খানসামা, বেয়ারার বহর তৈরী করেছিলেন। আমরা সিভিলাইজড্ হওয়ার সাধনায় ঐগুলি অনুকরণ করে নিজেদের সবল বাহুকে পঙ্গু করেছিলাম?

বাকি দিনটা রইল খানসামার জিম্মায়। আমাদের গাড়ী ছুটবে আকবরপুরের রাস্তা ধরে রাঁচী রোডে। তারপর গাড়ী ছুটবে তিলাইয়া অভিমুখে। ক্যাম্প ছেড়ে আবার সেই পথযাত্রা। পথ চলার এক অদ্ভুত আনন্দ আছে চোকে সে মোটার। চলার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে শুধু মন কত ঘর করবার চিত্র চোখে পড়ে। কত স্মৃতি তারা জাগিয়ে তোলে। দোকানে বাস্ত জন্তুর পিঞ্জর। লোকজনের আনাগোনা। কত পল্লী, পাহাড়। সবুজ মাঠের ক্ষেত কলাই মুসুরী আর ছোলার ক্ষেত। ওরা নূতন জীবনের আনন্দে মুখর। তার পাশেই সবুজ ক্রেমে আঁটা পৌষের পীতাভ মাঠ। কি আনন্দ ছড়িয়ে ওই মাঠে। ডানদিকে রজৌলী পাহাড়। ওর নাথায় ছিল শৃঙ্গী মুনির আশ্রম। বাঁধের রাস্তাটা তৈরী হয়েছে পাহাড় কেটে। ওটা একটা অষ্টাদশ মাইল দীর্ঘ গিরিসঙ্কট বা ঘাট। দু'পাশে পাহাড়। পাহাড়কে সবুজ করেছে অরণ্য। পাহাড়ের গুহায় গুহায় ছিল ঋষিদের আশ্রম। পাঁচটি ঋষি ছিলেন এই পাহাড়পুরে। দুর্বাসা ও শৃঙ্গী তাঁদের অন্যতম। পাহাড়কে দ্বিধাবিভক্ত করে বালুশয্যায় শয়ান একটী পার্বত্য নদী। নাম ওর দনাজী। আজ আর নদী তীরে পিঙ্গল জটাধারী ঋষি বালকেরা নাই। আছে ক্বচিৎ দরিদ্র কাঠুরে। খানিকটা এগিয়ে আছে একটা শিলাসন। দরিদ্র রাখাল বালক দরিকা বনের পশুকে জয় করে রাজ্য গড়েছিলেন। তার বীরত্ব গাথা আজও গীত হয় পাহাড় পল্লীতে। রাস্তা ক্রমশ উর্ধ্বে উঠেছে পাহাড় চূড়ায়, আবার নেমেছে—পাহাড়ের পাদমূলে। তারপর বিসর্পিত ভঙ্গীতে চলেছে। পথে পথে সাইন পোষ্টে লেখা আছে 'সাবধান—জোরে গাড়ী চালিও না।'

গিরি সঙ্কট পেরিয়ে কোডার্মায় পৌঁছেছি। মাঠে—প্রান্তরে অভ্র ছড়ানো। সূর্য কিরণে ঝিক্ মিক্ করছে। আঁশের ধনি রয়েছে পাহাড়ের আড়ালে। কোডার্মা রেল ষ্টেশন পেরিয়ে যে জায়গায় পৌঁছুলাম তাঁর নাম ঝুমুর তিলাইয়া। নামটী কৌতূহলোদ্দীপক। এরই কয়েক মাইল পূর্বে বরাকরে বাঁধ তৈরী হয়েছে। ওখানে খবর ছিল আমরা পৌঁছুব দর্শনার্থী হয়ে। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দাস আর দিলুবাবু আমাদের নিয়ে গেলেন গেষ্ট হাউসে। ব্যবস্থা চমৎকার। ওখানে চা বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করে ডাম দেখতে চললাম। বরাকর নদী। বছরের অধিকাংশ সময় থাকত জলহীন। বর্ষায় ওতে ছুটে আসত জলোচ্ছ্বাস। তখন ও উন্মাদিনী! পল্লী গ্রাম ভেসে যেত। ভেসে যেত মাঠ ঘাট গরু বাছুর। এবারে বর্ষায় এই উন্মাদিনীকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। বরাকরে বারশত ফুট দীর্ঘ একশত বিশ ফুট উঁচু কংক্রীটের বাঁধ তৈরী হয়েছে। এক দিকে এই বাঁধ অন্য তিন দিকে সুউচ্চ পাহাড়। এই বেষ্টনীর ভিতরে বানের জল সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। ছাব্বিশ বর্গ মাইল পরিমাণ জমিতে বন্দী হয়েছে আটানব্বই ফুট গভীর জলরাশি। বাঁধের উপর দিকের খানিক অংশে ইস্পাতের গেট। প্রয়োজন মত চাষ বাসের ক্ষেতে জল দিতে এই গেট খুলে দিলেই পাহাড়প্রমাণ উঁচু বাঁধের উপর থেকে জল ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর শুকনো খাতে। ওই পণ্যসম্ভারবাহী তরণীর চলাচল সুরু করবে দেশকে—সমাজকে।

অপরাহ্নের ম্লান আলোকে প্রশস্ত রাজপথসম বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে জলরাশির দিকে তাকিয়ে দেখছি। একটী

লক্ষ বাঁধা আছে। ইচ্ছে হলে এই লক্ষে চড়ে বেড়াতে পারতাম। কিন্তু আমাদের সামনে আছে প্রায় আশি মাইল পথ যাত্রা। আমাদের বিস্ময় বোধ হল ওই সাগর সমান পাহাড়গুলিকে দেখে। কতগুলো পাহাড়ের দ্বীপ। ওতে জঙ্গল আছে। জানোয়ার আছে। নাই শুধু আদল ভূখণ্ডের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ।

জলবিদ্যুত তৈরীর কলকব্জাগুলো দেখলাম—বাঁধের নীচের তলায়। আরো নীচে আছে গ্যালারী। জল তলের সুড়ঙ্গ পথে যে দুটী পাহাড় যুক্ত করে বাঁধ তৈরী হয়েছে—সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এক পাহাড় থেকে ওপারের পাহাড়ে যাওয়া চলে। বাঁধের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরী হয়েছে এই জলবর্ত্ত বা গ্যালারী। বহু কক্ষ সমন্বিত এই ত্রিতল বাঁধটী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প চাতুর্য ও সৌন্দর্যের অনুপম নিদর্শন। নূতন ভারতের সাধনা মূর্ত হয়ে উঠেছে ও উঠছে এই দামোদর বাঁধ নির্মাণে। এখান থেকে বিজুলী আলো যাচ্ছে কোডার্মাতে, হাজারীবাগে। এই বিদ্যুৎ শক্তির সহায্যে গড়ে উঠবে কত শিল্প, কত কারখানা—সেই স্বপ্ন দেখছি।

এবারে মোটার ফিরে চলল একতারা অভিমুখে—সেই নির্জন অরণ্য বাসে। রাতে একতারা পৌঁছেছি। রান্নার আয়োজন হচ্ছে। আমরা তিন বন্ধু লেগে গেলাম শয্যা রচনার কাজে। আরও খড় আনা হয়েছে। রেনবাবু খড় বিছিয়ে তার উপরে বিছানা করেছেন। সুধীনবাবু নিপুণ লোক। ইদানীং পথে প্রবাসে চলা খুব এস্তামাল হয়েছেন। সুধীনবাবুর মুখে তৃপ্তির সীমা নাই। সুরেনবাবু প্রসন্ন। গোলটেবিলে ভোজ্য বস্তু আনা হয়েছে। আহার শেষে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলাম। রুদ্ধ দরজার বাহিরে চন্দ্রালোকিত পাহাড়, প্রান্তর আমাদের অনর্থক ডাকাডাকি করতে লাগল।

ভোরে চা খেয়ে কোকলত জলপ্রপাত দেখতে যাব। খানিকটা বনপথ পেরিয়ে আমাদের গাড়ী রেখে আমরা স্রোতের ধারা অনুসরণ করে পাহাড়ে চ'ড়ে যাব। বাংলো ছেড়েই সামনে একটা খাতে জল। ওটা পার হয়ে উপরে উপত্যকা ভূমিতে পৌঁছেছি। দু'পাশে আম্রকুঞ্জ। কিছু দিন আগে এখানে পাহাড়ীদের মেলা বসেছিল। মাটীর তৈরী মুক্ত ভিটে দেখা যাচ্ছে। এই ভাঙ্গাহাড়ি, ভাঙ্গাবেলোয়ারী চুড়ি বিছানো জনহীন শূন্য মেলার জায়গাটী দেখে আমার ভাল লাগছে। আমাদের দেশের আচার, রীতি, নীতি সামাজিক অনুষ্ঠানের কতই পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে পল্লী প্রান্তে বটের ছায়ায়, নদীকূলে, পাহাড় তলীতে আজও টিকে আছে এই সাম্বাৎসরিক মেলা! ও এক মহা প্রাচীন উৎসব ক্ষেত্র। সমস্ত বছর যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়না, এই মেলা উপলক্ষ করে ঘটে তাদের যোগাযোগ। খালি চোখের দেখা নয় অন্তরের মিলন। প্রাণের বিনিময়। সামাজিক প্রীতিসম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এই মেলার অবদান অপূর্ব। একদিকে মরণা বয়ে যাচ্ছে। আবার একদিকে মরণার জল বয়ে চলেছে যাদের দেশে তারপর দুদিকে বন। মাঝে সরু রাস্তা ধরে মোটার চলেছে। ক্রমে জঙ্গল গভীরতর হয়ে আসছে। এই রাস্তার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। মনে পড়ে ডানদিকের এই নালার ধারে উঁচু ঢিবির উপরে একটা বাঘের উপরে গুলি চালিয়ে ছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু বাঘ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরও খানিকটা দূরে গুলিবিদ্ধ বাঘকে অনুসরণ করেছিল নবী আক্তার—সঙ্গে ছিল মোদিয়া।

নবী আক্তারের গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ঝাঁপ দিয়েছিল শিকারীকে লক্ষ্য করে। নবী আক্তার বেঁচে গিয়েছিল দৈবাৎ। আরও খানিকটা এগিয়েছি। হঠাৎ বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে ছুটে এল একটা শম্বর শিশু। ও ভয় ডর এখনো শেখেনি। সামনের রাস্তাটী পার হয়ে মোটারের সামনে দিয়ে ডানদিকের জঙ্গলে চলে গেল। এই শম্বর শিশুর আবির্ভাবে বনের—রহস্যের একটুখানি আভাস পেলাম। ভাবছিলাম ও একলা মা'র সঙ্গ ছাড়া

কি করে এল ? ওর মাকে কি বাঘে খেয়েছে ? এইত বাঘ চরাচরের রাজা। গত রাত্রেও বাঘের হানাতে খুঁড়িয়া পলিয়ে এসেছিল। মাতৃহারা এই হরিণ শিশু হয়ত আজ রাত্রেই বাঘের পেটে যাবে। আমাদের মধ্যে এমনি আলাপ আলোচনা চলছে। এমন সময় আমাদের মোটার ছেড়ে পায়ে হেঁটে উপরে ওঠার জায়গায় পৌঁছেছি।

ডাইনে—সম্মুখে এবং উর্দ্ধে জলের ছল্ ছল্ কল্ কল্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে আসছে উঁচু পাহাড় থেকে বহু নিম্নে জলস্রোতের আছড়ে পড়ার শব্দ। ডাইনে ধারে অরণ্য। মাথার উপরে অরণ্য ছায়ায় বিক্ষিপ্ত প্রস্তর রাশির উপরে সন্তর্পণে স্রোতের তারতম্য রক্ষা করে উপরে উঠে যাচ্ছি। কোথাও স্রোতধারার মধ্যে দিয়ে পাথর খণ্ডে পা রেখে ডিঙিয়ে যাচ্ছি ওপারে। হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমাদের আনন্দের অবধি নাই

স্রোতধারা ও ছায়া ঘন বনের সম্পর্কে একটা স্নিগ্ধ শীতল আবহাওয়া বনদেবীর গাম্ভীর্য্যকে রহস্যময় করে তুলেছে। গম্ভীর এবং অপূর্ব এই পরিবেশ। এই পরিবেশ আপিয়ে তোলে অন্তরের ধ্যান স্তিমিত চৈতন্যকে। তাইত যারা গম্ভীরের ধ্যান করেছিলেন তাঁরা আসন নিয়েছিলেন হিমাদ্রি গুহায়: তাঁদের আশে পাশে করেছে গঙ্গাধারা—সরস্বতীর পুণ্য ধারা। কোন্ ঋষি বলেছিলেন "রসো বৈ সঃ।" যিনি বলেছিলেন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগগচ্ছতি
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথে তদনু শিষ্যাৎ

তাঁকে চোখ দেখতে পায়না। বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। সেখানে এই মনও গমন করতে পারে না। সেই ব্রহ্মকে কি করে অপরের জ্ঞান গোচর করব।

তথাপি উপলব্ধি তাঁরা করেছেন
তদেব ভাসন্ত মনু ভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদম বিভাতি

এই ঋষিরা বুঝেছিলেন নিখিল রহস্যের মূল সত্যকে। সেই সত্যই প্রকাশিত করেছে অরণ্য ও নির্ঝরের এই শ্রী শোভা সৌন্দর্য্যকে। তাঁরাই আভাস এই তত্ত্ব পল্লবের শ্যামলিমায়। সে রস-আনন্দ-চৈতন্য কেবল উপলব্ধিগত। বর্ণনায় তাকে প্রকাশ করা যায় না।

পাথর রাশির উপরে পা রেখে পারে চলার পথে এগোচ্ছি। সুমুখে ঊর্দ্ধগামী ইট সুরকীর তৈরী সিঁড়ি উঠেছে। ডান দিকে একটা প্রাচীর। উপরে উঠতে শ্রান্তি নিশ্চয়ই আছে কিন্তু শ্রান্তির অনুভূতি নাই। আছে আনন্দ। একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ আসছে উপর থেকে। ডাইনে গভীর পার্বত্য পথে উচ্ছ্বসিতা নৃত্যশীলা জলধারা। জলস্রোত ছুটে নামছে পাথরের প্রতিবন্ধকের সঙ্গে যুদ্ধ করে। স্রোতের বিরাম নাই। শব্দেরও বিরাম নাই। কোন অদৃশ্য মহাসমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে পাহাড় ফুঁড়ে। মিসেস রায়ের উঠতে বড় কষ্ট হচ্ছে। তবুও অনেকটা উঠে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা উপরে গেলাম। এখানে পাহাড়ের কটিদেশে অবিরাম জল পতনে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম পাড়টা ছাপিয়ে স্রোতধারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে নিম্নভূমিতে। যেন হ্রদের উপরের উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ছে জলরাশি। অদ্ভুত দৃশ্য! নির্মল, স্নিগ্ধ জলোচ্ছ্বাস পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে পড়ছে। নির্জন অরণ্য বেষ্টিত পাহাড় বুকে নিরবচ্ছিন্ন জলের খেলা। খেলা দেখছি। দেখছি না খেলুড়েকে! এখানে আলো আছে—রৌদ্র নাই। এই রৌদ্রহীন উৎস থেকে দিকে দিকে স্রোতধারা ছুটেছে রৌদ্র জ্বলা ধরণীর বুকে! সুরেনবাবু স্তব্ধ। সুধীনবাবু নির্বাক। উনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কখনো অজানা তরুর তৈরী সোপান পথে—কখনো উপরের মন্দির সোপানে। ধর্মশালার অলিন্দে। অরণ্যের দক্ষিণের গুহাটা প্রায় দৃষ্টির অগোচর হয়েছে।

নীচে নেমে আসছি। অন্তরে ভরে এনেছি—একটা সুস্নিগ্ধ অনুভূতি। একটা অনির্দ্দেশ্য আনন্দ। বড় বড় গাছের ডাল পালা মাথার উপরে চন্দ্রাতপ তৈরী করেছে।

রাস্তা—বন্ধুর। উপলসঙ্কীর্ণ স্রোতোমুখে বনেরেটা প্রভৃতোন্মুখ আলগাচ। একটা গাছে গাছে অসংখ্য গাব ফলে আছে। শৈশবে আস্বাদিত ঐ রসালো ফলটা আমাদের আকৃষ্ট করেছে। সুরেন বাবুর নির্দেশে মনীন্দ্র গাছে চড়ে ছোট শাখা পল্লবসহ অনেকগুলি গাব নিয়ে এলো। রাস্তার কিনারায় চামরের মত দুলছে ফুল কাশের গাছ। সুদীনবাবু কতগুলো ভেঙে নিলেন। ওঁর ঠাকুর ঘরের সেবায় লাগবে। আবার সেই বনপথ। মোটর যাত্রা। দু পাশের বনজুল দোলানো বন্য বিটপী। শম্বর শিশু কোথায় আশ্রয় নিয়েছে দেখা যায়না।

বাংলোয় ফিরে সুরেনবাবু আদেশ করলেন পাটনা ফেরার পথে রাজগীর দেখতে হবে। সেই প্রাচীন গিরি ব্রজ! আবার সেই একঘণ্টার নোটিশ। সেই দাঁড়িয়ে কুয়ো তলায় স্নান। এক জাহাজ কিনিস পত্তর একটী মোটারে সাজিয়ে দিচ্ছেন সুরেনবাবু। হাঁই হুঁই করছি।

বাংলো ছেড়ে গাড়ী চলল। বুদিয়া পুনোয়া দাঁড়িয়ে রইল। সন্দরীরে দাঁড়ালনা মোদিয়া! আমার মনটা বিষাদে ভরে উঠেছে। এক তারার সঙ্গে এই কি শেষ সাক্ষাৎ? আবার কেমন করে আসব এই আমার লুব্ধ চিত্তের বাসর ঘরে! একবার একতারার দিকে তাকালাম। ও ব্যাকুল চোখে আমাদের দেখছে। অন্তর আর্দ্র হয়েছে ওর অদৃশ্য অশ্রুনীরে। মহাদেও স্থানকে প্রণতি জানালাম। মোদিয়াকে স্মরণ করলাম। মনে মনে বললাম—

হে একতারা হে অলক্ষিত অঞ্চলের অরণ্যলক্ষ্মী—তুমি এ পথিকের চিত্ত মূলে আসন গ্রহণ কর তার বহুদূর প্রবাসের নিদ্রাহীন নেত্রে তোমার ঐ সুন্দর মূর্তি প্রকাশিত করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

আশ্বাস

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

ছাতাটার সামান্য মেরামতি দরকার। বর্ষা এখনও নামেনি বিশেষ, নামার আগে অবলম্বনটাকে প্রস্তুত করে রাখা দরকার। সবে একবছর হল কিনেছি ছাতাটা। স্বভাবতঃই নতুন। কিন্তু কিছু করেছে এরই মধ্যে মাঝখানের দরকার হল বলে

কয়েকবছর আগে ছাতির ব্যাপারটা সম্মানিত ছিল অনেক ক্ষেত্রে উঠেছিল, ভালো ছাতি কিনতে পারাটা সম্মানের একটা ব্যাপার ছিল; কিন্তু বর্তমানে ছাতি অনেক হলেও, ভালো ছাতির দরদাতা করবে যে মানুষ, সে পথে ঘাটে খুব সহজে দেখা পাওয়া যায় না। অথচ অনেক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে ছাতা মাথায় দেবার আশ্বাস ক্রমশঃ ছাড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার বুক থেকে। এক ধরণ বাঁশের হাতের বোতা আর কালো রঙের পুটলী হাতে কুলিরা লোকগুলোকে বর্ষার আগে পথে ঘাটে প্রায় দেখতেই পেতাম। তারা সংখ্যায় আজ বেশ কমে গেছে। বেশ তাগা হয়েছে, এখানের মানুষ ওখানে, ওখানের মানুষ এসেছে এখানে, আর সেই যাওয়া আসার ইতিহাসে ওদের হারিয়ে গেছে কিনা তা বলতে পারি নই। বর্ষাটা নেমে পড়বার আগে চঞ্চল হই শুধু, কিন্তু ঘড়িটার কাঁটা আমার অফিসে বেরোবার কাছে এগিয়ে আসে। পর্যন্ত ছাতা সারাইয়ের বেখা পাই না বাড়ীর সামনের খোলা ওঠা রাস্তায়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি এখন পথে পথে সেই মিষ্টি সুরের বিচিত্র ডাক যেন ক্রমশঃ কমে আসছে। কিনি কিনির ভয়ে আজ আর ওরা পথে ঘোরেনা, কিনি-কিনির ভয়ে পথে বসে। দুপুর বেলার সেই চিলডাকা নিস্তব্ধতায় নাকে বাদামওলার বাসনের ঠুন ঠুন শব্দে, সারা সেদিন গ্লাউজ-এর ডাক এমনি কত বিচিত্র শব্দ নিয়ে ছবি আঁকবার সুযোগ আজকের দুপুরের নেই। হয়ত এটাই স্বাভাবিক; তা না হলে কোনরকম ক্ষোভ না করে কেন আমরা প্রয়োজনের দিনারা খুঁজি ফুটপাতের সওদার, রেলিঙে বাসা বাঁধা অস্থায়ী সস্তার দোকানে।

অফিস যাবার আগে যা সম্ভব হয়না; সে কাজটুকুই তাই পথের বুকে সারতে হয় দশটা পাঁচটার আসা যাওয়ার মধ্যে।

ফুটপাতের ধারে শিবমন্দির। মন্দিরের ভিতর সামনেই একটা বিরাট ঘন্টা ঝুলছে। মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির গায়ে লাগান দুপাশে দুটো রক। রকের এক দিকে একটা বড় জালা হয়ত বুড়ো শিবের কাজে লাগে আর একটা দিকে অধিকার করেছে বুড়ো লোকটা, হয়ত বুড়ো বলেই।

ছেঁড়া কতকগুলো ছাতা দেওয়ালের গায়ে উল্টেপাল্টে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান। কতকগুলো কাপড় বিবর্জিত ভাঙ্গা শিকও হাতের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গলা ভড়াভড়ি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা ভাঙ্গা বাক্স, বাক্সটার ভালো একটা আছে এটাই সৌভাগ্য বলতে হবে। টাকা পয়সার নিশ্চয় বোঝাই নয় ছাতা সারানোর ছোট ছোট মাল-পত্রে বোঝাই।—হাত ঘড়িটার দিকে চাইলাম। হাতে এখনও কুড়িটা মিনিটের বেশী সময় আছে। সারাতেই সারাতে হবে। এতখানি সময়ে নিশ্চয় হয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

শিব মন্দিরের সামনে দরজার গোড়ায় অফিস মুখো মানুষেরা দাঁড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ছুটছে, কারোর বা ভক্তি নিবেদন করে যেতে দেরী হচ্ছে। দরজার চৌকাঠে বসে মোটা লোকটা, বোধ হয় পূজারীর সহকারীদের কেউ হবে, দুর্বোধ্য হিন্দীতে কি যে মন্ত্র পাঠ করে যাচ্ছে তা বোঝবার উপায় নেই। ওর বলার ধরনটায় ভক্তিরস কোথায় উছলে উঠবে না হাসি পাচ্ছে আমার। লোকটা একটা বিরাট

কমণ্ডলু থেকে জল ঢেলে যাচ্ছে অবিশ্রাম উৎসুক ভক্তের হাতে। মাঝে মাঝে মার্বেলের মেজের ওপর রাখা রুপোর থালাটার ধাতব প্রতিধ্বনি উঠছে।

স্বাভাবিক দৃশ্য এগুলো, রোজই যাবার সময় দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু একেবারে কাছে এসে একটু খুঁটিয়ে না দেখে পারলাম না। নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি, যে বুড়োকে দিয়ে কাজ করাব, তার মন পাওয়া অত সহজ নয়।

আমি একা নই ওর খদ্দের। আমার ওপর নজর দেওয়াটা ওর পক্ষে যত সহজ হবে ভেবেছিলাম ততটা সহজ মোটেই হয় না। বিশেষ করে আমার ছাতার অবস্থা এমন কিছু গুরুতর নয়, যে বুড়োর আমার ছাতার ওপর পক্ষপাত দেখালে কিছু বিশেষ লাভ হতে পারে। অগত্যা অপেক্ষাই করতে লাগলাম। বুড়ো একবার ওর ভাঁটি-বিহীন চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে এক পলক দেখে নিল, তার পর অন্য একজনের ছাতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, এক টাকা লাগবে।'

ভদ্রলোক আঁতকে ওঠেন, এক টাকা কি গো, এই ত' সামান্য সারাবে!

বুড়ো বিরক্তিতে মুখ ভার করে, 'কি বলছেন, এই আপনার সামান্য হল? ঘোড়া পালটাতে হবে, শিকগুলো ঠিক করতে হবে। কাপড়ে তালি লাগাতে হবে! ফাঁকি দিয়ে আমি কাজ করি না, বুঝেছেন? অন্যায্য দাম নেই আমার কাছে। সারাতে চান সারান, না সারান ত নিয়ে যান, আমার সময় নেই।'

অপ্রসন্ন মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'নাও ভাই; তবে ভাল করে সারিয়ো বাপু।'.....রীতিমত পাকা বন্দোবস্ত বুড়োর। নম্বর দেওয়া চাক্তি পেলেন ভদ্রলোক। নম্বর ঝুলল ভদ্রলোকের জীর্ণ ছাতাটায়, দামের অঙ্ক খড়ির আঁচড়ে লেখা হল ছাতির ভেতরের কাপড়ে ভদ্রলোকের সামনে। কাজে কোন ত্রুটি নেই বুড়োর।

ভদ্রলোক বললেন এবার, 'কখন পাব'?

—'সেই পাঁচটা। ফেরবার পথে নিয়ে যাবেন। একটা ত' কাজ নয় আমার।' বুড়ো হাসে এবার। ভদ্রলোক চলে যেতেই আমার ছাতাটা বাড়িয়ে দিই; 'আমার কিন্তু পাঁচটার পর দিলে হবে না। তলাটা আলগা হয়ে গেছে, টুপীটাও পালটে দিতে হবে। কত দাম টুপীর?'

বুড়ো ছাতাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, চার আনা, পালটাতে বলেন পালটে দেব, আমার আর কি, ঠিকই ত' আছে! সবশুদ্ধ আট আনা লাগবে।'

আট আনাটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে বলতে যাব, একটা ছেলে একটা জরাজীর্ণ ছাতা ঝপাং করে ওর হাতের কাছে নামিয়ে রেখে বলে উঠল, 'বুড়ো, জলদি ছাতাটা সারিয়ে দাও, জলদি!

—'এখন হবেনা; হবেনা, নিয়ে যাও তোমার ছাতা' বিরক্তিতে ঝাঁকিয়ে উঠল বুড়ো।

—আলবৎ হবে। এখনই বেরোতে হবে আমাকে, ছেলেটা আরও ঠেলে দেয় ছাতাটা বুড়োর দিকে। বুড়ো রাগে আগুন হয়ে ওঠে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে 'ওরে বাবা, কে আমার নবাব এলেন রে, এখুনি ছাতা করে দাও; যেন আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!'

—'অন্য কাজ পরে করো'খন। এঁরা ত অফিস ফেরত ছাতা নেবেন, তবে?' ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

বুড়ো রাগে গজ গজ করতে করতে আমার ছাতাটায় হাত দেয়। ছেলেটা হাসতে হাসতে বলে ওঠে, 'আমি, দোকান খুলে আসছি, এসে যদি দেখি আমার ছাতা ধরনি ত' দেখবে মজা।'

বুড়ো রাগের মাথায় ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওর হাতে 'না ধরবনা, নিয়ে যাও তোমার ছাতা।' ছেলেটা তখনও হাসছে। বললাম, 'কেন খেপাচ্ছেন, রেখে যান ঠিক করে দেবে'খন। বুড়ো চটে যায় আমার ওপর, 'আপনাকে ওর হয়ে বলতে হবে না। আমার যখন খুশী তখন ধরব, কারোর পরোয়া করি না আমি। যাও, ছাতা নিয়ে যাও তোমার।

ঘড়িটার দিকে চাইলাম। বুড়োর মেজাজ এখন যে রকম খারাপ হচ্ছে আর ছেলেটা সেই যে ভিজে ঘরে বসে আছে, তাতে আমার ছাতা সারানো ত' দূরের কথা চলন্তরটাই চাপা পড়ে যায়।

মিশিরজী মন্ত্র পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ফোকলা দাঁতে হাসছে মিটিমিটি। ছেলেটা এবার হাসতে হাসতে বলে উঠল, দেখ বুড়ো বাপিও না, বেশী বাড়াবাড়ি করবে ত সব জিনিষপত্র তোমাকে ট্রাম লাইনের পাশে ফেলে দেব তখন বুঝবে মজা! ছাতা রেখে গেলাম। আসছি এখনই।' ছেলেটা ছাতা রেখে চলে গেল।

বুড়ো মিশিরজীর দিকে চায়, তারপর মন্ত্রজপরত মিশিরজীকে বিরক্ত করা সুবিধার নয় ভেবে আমাকেই সাক্ষী মেনে বলল 'দেখুন, কাণ্ড দেখুন, আজকালকার ছেলেরা আমাকে বলে কিনা ঘাড়ে ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে। আরে তুই ত' সেদিন পর্যন্ত ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতিস ইস, একটা বিস্কুটের দোকানে খুলে ভেবেছিস, কি যেন হয়ে গেছিস। সেই যে কথায় বলে না 'ব্যাঙের লাথি' আমার ওর লাথির ভয় করতে হবে! মিশিরজী তুলসে ওর চোখে রাঙানিতে! আমাকে জানে না। কত বছর ধরে এখানে বসে আছি আমি! আপনাকে বলছি, কিছুতেই সারাব না ওর ছাতা, আমার চোখ রাঙায়, দেখা যাক্ না ওর মুরোদ!' বুড়ো রাগে ফোঁস ফোঁস করে। মিশিরজী মন্ত্র পড়া থামায় এতক্ষণে, তারপর সরস ভঙ্গীতে বলে ওঠে, 'এ মিস্ত্রীজি, লেকিন বিস্কুটবাবু ত' গুণ্ডা আছে, সব চিজ লিখে রাস্তাবে ফিকে দিবে, তুমকো কেয়া হোগা, আঁ্যা?

—'ফেলে দেবে, ছাতা আজব না ওর পিঠে'···বুড়ো রোষকষা দৃষ্টি হানে মিশিরজীর দিকে।

ব্যাপারটা যতই উপভোগ্য হোক্, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখা হল না ঘড়ির কাঁটাটার দিকে চেয়ে। লেট আজ হলই। ছাতাটা না সারিয়েই চলে আসি। বুড়োর খেয়ালই হলনা ওর একজন খদ্দের বিফলমনোরথ হয়ে চলে গেল।

বাড়ী ফেরবার পথে বুড়োর কাছেই এসে দাঁড়ালাম। রোয়াকটার পাশেই ছোট বিস্কুটের দোকান। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত কে জানে।

বুড়োর কাছে এসে দাঁড়াতেই বলে উঠল, 'সকালে ত' আপনি চলে গেলেন। ছেলেটা যে এত পাজী জানতাম না। ছিঃ ছিঃ ছাতা সারিয়ে দিইনি বলে, মিশিরজীকে বললে কিনা বুড়োকে উঠিয়ে দাও। টানাটানি জিনিষপত্র নিয়ে সে এক কাণ্ড! আরে তুই বা কি করবি, তোর মিশির লালজীই বা কি করবে? বলে, মন্দিরের মালিক বনশী লালজীই আমাকে ওঠাতে পারবে না। যেমন আমার পেছনে লাগা, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ওর ছাতা। দেবে ত' কচু, মাসের মধ্যে বিশ দিন ঠিক করে দাও ছাতা।' বুড়ো চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই কথা বলে হয়ত ছেলেটাকে শোনাবার জন্যে। ছেলেটার মুখের অবস্থা এখান থেকে বুঝতে পারিনা, তবে সকালের মত ওর মুখে হাসি নেই। ছাতি সারিয়ে চলে যাই।

বর্ষা নেমেছে জোরে। ছাতির আড়াল দিয়ে মন্দিরের পাশ দিয়ে অনেকবারই গেছি। বুড়ো তার কাজে ব্যস্ত। এখনও র'কের ওপর ওর দোকান জমজমাট। বর্ষার প্রকোপ যত বাড়ে, ভেঙে পড়ে পুরোন ছাতা, ভিড় তত বাড়ে। খুশি হয় বুড়ো। সেদিনের সেই সামান্য ছাতি সারানো উপলক্ষ্য করে যে ঘটনা ঘটেছিল তার পরিণতিটুকু জানা আমার হয়নি। আমার ভূমিকা এখানেই শেষ। কিন্তু আমি অনুপস্থিত হলেও গল্প কখনও থেমে যেতে পারে না।

বিস্কুটবাবু বুড়োর ওপরে সত্যিই সেদিন খুশী হতে পারেনি। সামান্য কৌতুক থেকে যে জিনিষটা দাঁড়াল গিয়ে, তার দুঃখজনক পরিণতিটুকু নিজের সম্মানের জন্যেই মেনে নিতে হল ওকে। মিশিরজীকে দিয়ে বুড়োকে রক থেকে তুলে দেওয়া মধ্যে যে ছেলেমানুষীই থাক্, সেই ছেলেমানুষীটাই মস্ত অপরাধের মতো সঙ্কোচের বেড়া সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই বুড়োর সঙ্গে কথা কওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বুড়োও ভাঁটি-বিহীন চশমার

ফাঁক দিয়ে ওর দোকানটাকে দেখেছে কখনও সখনও, তারপর নিজের কাজে মন দিয়েছে।

বর্ষা একদিন বিদায় নিয়েছে। শরতের সকালের মত উজ্জ্বল আলো নিয়ে নীল আকাশ আত্মপ্রকাশ করেছে। একমাত্র বুড়ো লোকেরা ছাড়া কড়া রোদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ছাতা আর কেউ ব্যবহার করে না। একবছরের জন্যে নিশ্চিন্ত জীবন ছাতাগুলোর, এখন ধুলোয় গাদায় ওদের কালো কাপড়ের বুকে ধুলো জমার পালা।

ভাঙা বাক্স আর ভাঙা শিকের বোঝা নিয়ে বুড়ো ফিরে গেছে গ্রামে। রকটা এখন খালি পড়ে থাকে। আবার আর এক বর্ষার অপেক্ষা। কলকাতার মুখ দেখবে বুড়ো আবার সাত আট মাস পরে। ততদিন কোনরকমে টিকে থাকবে প্রাণান্তকর চেষ্টায় স্ত্রী আর রোগা জিরজিরে দুটো ছেলেকে নিয়ে। একরকমে চেষ্টাটা সহজ ছিল, গতর খাটালে এ ক'টা মাস কলকাতার চেয়ে খুব খারাপ কাটত না কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই অভাবটা যেন আরও জাঁকিয়ে বসছে। তবুও বুড়োর গাঁয়ে মাথা গোঁজবার মত একটা আস্তানা আছে। কলকাতার যারা নিজেদের দেশ ঘর ছেড়ে বাঁচবার জন্যে পথে মাথা খুঁড়ে মরছে, তাদের কথা ভাবতেই ভয় পায় বুড়ো।

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়, 'এই কটা মাস অপেক্ষা করে থাক, বর্ষার আগে কলকাতায় গেলে তখন সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।' বুড়ো খাটে, ওর বউ খাটে, রোগা জিরজিরে ছেলে দুটোও খাটে, কিন্তু এত খেটেও কলকাতার দিনগুলোকে তোলা যায় না। মাস গেলে ত' তবু কিছু রোজগার হয়। ছাতি না সারিয়ে লোকের চলেনা বলেই ত!

...আবার আর এক বর্ষণের সুরু। বুড়ো এবারে গাঁ থেকে তাড়াতাড়িই চলে এসেছে, যত তাড়াতাড়ি দুঃখটা ঘোচান যায়!

কালীঘাটের পরিচিত বাসাটায় উঠল বুড়ো। শুধু হাতেই এল একদিন নিজের পুরোন জায়গাটা দেখবার জন্যে। জায়গাটা খালি পড়ে আছে কিনা কে জানে, অফিস অঞ্চলে সবচেয়ে ভাল জায়গা। মন্দিরের কাছে এসেই বুড়োর বুকটা ধক্ করে উঠল। ওর শূন্য স্থান অধিকার করেছে আর একটা জালা। প্রণাম করল বুড়ো বাবা শিবকে। মিশিরজী কুশল জিজ্ঞাসা করে। কথায় কথায় মিশিরজীর কাছে যে খবরটা শুনল তাতে আরও ওর মন খারাপ হয়ে গেল। বনমালীলালজী কাশী চলে গেছেন। নতুন পূজারী কেমন লোক কে জানে?

হঠাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে বাজখাঁই গলার আওয়াজে চমকে উঠল বুড়ো। মিশিরজী ত্রস্তে ছুটল ভেতরে। উঁকি মেরে বেশল বুড়ো ব্যাপারটা কি। মোটা মত একটা লোক। বিরাট থোঁচ, তর্জন গর্জন করছে, আর মিশিরজী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিশিরজীকে সকাতে বুড়োরই বুকে কাঁপুনি লাগে। ওই লোকটার কাছে কি করে বলবে এখানে বসার কথা।

বিস্কুটের দোকানটা বন্ধ। ছেলেটা শুধু শুধু ঝগড়া করলে। ঝগড়া না হলে, ওকেই বুড়ো পাঠাত মোটা লোকটার কাছে। বুড়ো একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

কিছুক্ষণ পরে আবার ও ঘুরে আসে। বিষণ্ণ মুখে ও মন্দিরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে। কি যে করবে কিছুই ভেবে পায়না ও। চমকে যায় বিস্কুটবাবুই ওকে ডাকছে ওর দোকান থেকে, 'ও বুড়ো, কবে এলে গো এসো এসো।' বুড়ো ওর ডাকে চকচকিয়ে যায় তারপর এগিয়ে যায় ওর দোকানের দিকে।

দোকানের ছেলেটা ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গী দোকানের বসবার জায়গায় বসায়।

—'এবারে যে সকাল সকাল এলে। তা ভাল করেছ। দেশের খবর ভাল ত'।

বুড়ো মনের অবস্থা চাপতে পারে না, 'আর বাপ খবর ভাল। যা অভাব লেগেছে। তোমার দোকা কেমন চলছে? একমুহূর্তে ছেলেটার হাসি হাসি মু

একটু মলিন হয়ে উঠল, উদাসীন ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'কোথাকার কথা আর বলো না, বিস্কুট কিনবে কে বল? থাকগে ও কথা, কবে আসছ?'

মুখটা কালো করে বুড়ো বলে ফেলে, 'আর আসা হল না বাবা, দেখছ না দুপাশে ছুটো জালা। বনশী লাগতাও বলতে দেবে কি আমায়? দেখি অন্য জায়গা পাই কি না কোথাও?' বুড়ো নিঃশ্বাসটা চাপতে পারে

হেসে উঠল ছেলেটা, এই তোমার জোর! আমাকে না বলেছিলে কে তোমে দেখি আমার, কত বছর ধরে বসে আসছি আমি! বুড়োর অন্তরতরা মুখটায় লজ্জার হাসি খেলে যায়।

—'তাই বুঝি তখন থেকে ঘুরঘুর করছিলে। কিছু ভেবো না, ও আমি জালা তুলে দেওয়াব। তোমাকে তুলতে না পারি, বসাতে পারি। এখন বল কবে আসছ?'

বুড়ো চাইল ছেলেটার দিকে। কৌতুকের ছিটে-ফোঁটাও নেই ওর অনুজ্জ্বল মুখের উজ্জ্বল ছুটো চোখে। একটা পরম আশ্বাসে বুড়োর মন অকারণে ভরে ওঠে। ও বলে ওঠে হাসি মুখেই, 'বল না; বিকালেই এসে পড়ি।'

হে ভারত

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

হাতাশে অধীর ক্লান্তি; আকণ্ঠ পিপাসায় প্রাণ
কুহিত জীবনজ্বালা, ভোগলিপ্সু, উন্মত্ত যৌবন
এতাকীর্ণ দাও দাও, দাও তাকে অনন্তজীবন
অকুণ্ঠ বাসনা, ভোগ; অন্তহীন লোলুপ আহ্বান
সম্ভোগের। সভ্যতার নগ্ন নির্লজ্জতায়
নিরলস পাশবিক আত্মরতি ভারত প্রাণের,
আত্মতৃপ্তি শুধু তার হিংসায় দিগ্‌বিজয়ের,
সে তৃপ্তিতে ধ্বংস আর মৃত্যু, লয়..... চিরশূন্যতায়।
দাও তারে যযাতির অনন্ত যৌবন শেষ জ্ঞান,
ভোগ নয়, জীবনের অর্থ এক নিগূঢ় বেদনা,
প্রাণের পূর্ণতা শুধু প্রসারণে; ত্যাগের সাধনা
আনো মনে; সভ্যতার মোহ হতে দাও পরিত্রাণ।
পরিশ্রান্ত শতাব্দীর চিত্ত আজ মৃত্যু পিপাসিত,
তুমি তারে মুক্ত করো, জীবনকে করো উজ্জীবিত॥

কঙ্

জন এ'কলার

অনুবাদক—শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

গরমের দিন ফিরে এলো। "স্নানাগার"টি খোলা হলো।

প্রথম দিবসই সবাই নতুন দারোগাটির নাম দিল "কঙ্"। নামটি তার উপযুক্ত হয়েছিল নিশ্চয়। সেই দিন থেকে কেউ তাকে অন্য নামে ডাকেনা। তার সঙ্গে আলাপ করবার সময়ও তারা বলে "কঙ্"। তাতে অসন্তুষ্ট হয়না সে। এবং খুশী হয়েই যেন মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানায়।.....

জনতা তার ওপর থেকে চোখ ফিরাতেই পারছিল না। সে যেন চুম্বকের মতো দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল তাদের।

টিনের সবুজ প্রবেশপথটির কাছে সে দাঁড়িয়েছিল পাথরের মূর্তির মতো। তার পরণে এক জোড়া কালো পাজামা, সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, কাঁধ দুটি ঘোড়ার পিছনের দিকটার মতো উঁচু, অসমান; গায়ে কালো কেশ। পায়ের দিকের কেশগুলো এত ঘন ও এত কালো যে গায়ের চামড়াটা একেবারে দেখাই যায়না। বাঁদরের মতো তার মুখখানি, কান দু'টো ছোট, কুঁচকানো, চুলগুলো ভড়িয়ে গেছে; পয়সা নেবার সময় হাসতেই তার লম্বা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসছিল। তার চোখ দুটো ছিল শিশুর চোখের মতো সুন্দর, শান্ত, নমনীয়; দৃষ্টি সরল সাদাসিধে, অসাধারণের মধ্যে এটাই সবচেয়ে দেখাচ্ছিল।

পা দুটো ছড়িয়ে সে দাঁড়িয়েছিল—শিকারের প্রতীক্ষায় একাগ্রভাবে দণ্ডায়মান আদিম শিকারীর মতো।

পুরানো দারোগাটি গত বছরের শেষে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। তাই এ'বছর স্নানাগার খোলবার আগে তিন-জনপ্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা ছিল—বড় পুকুরটির অর্ধেক সাঁতার কেটে গিয়ে আবার ফিরে আসা নিয়ে। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কঙ্ই জয়ী হয়। দর্শকদের হাততালির মধ্যে সে যখন জল থেকে উঠে এলো, তখন তাকে দেখাচ্ছিল অদ্ভুত—যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলাভূমি থেকে বেরিয়ে আসা একটি আদিম জীব। তার লোমশ বুক ও পা থেকে ঝর ঝর করে জল ঝরছিল।

সেদিন অপরাহ্নে সে প্রবেশপথের কোণ থেকে একপাও নড়েনি। তার মধ্যে যেন ছিল—পাশবদ্ধ পশুর স্বাভাবিক বিষণ্ণতা। সে তরুণ তরুণীদের দিকে সকরুণভাবে তাকাচ্ছিল বার বার। প্রথমতঃ সে তার চারদিকে যা হচ্ছে তা থেকে আনন্দরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করলো। তরুণীদের চাঞ্চল্যকৌতুকে হাসলো অর্থহীন হাসি, তাকে ঘিরে থাকা ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আরো কৌতুক করলো। তার ব্যক্তিত্ব যেন সেই আনন্দময় জীবনের সুরে সুর মিলাবার জন্য ব্যাকুল। সে অনবরত ঘাড় দোলাচ্ছিল, নীরবে। মাঝে মাঝে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছিল জলের দিকে, ভাবছিল—সেখানে সে কেমন করে এলো, কখন এলো, এলোই বা কেন?

সন্ধ্যার একটু আগে কয়েকজন প্রবীণ লোক মোটরে চড়ে বেড়াতে এলেন—সেখানকার অবস্থাটা একবার দেখে যাবারই আগ্রহে। অধিনায়ক কঙ্ যখন দরজা খুলে দিল আর পাহাড়ের মতো নিশ্চলভাবে প্রবেশপথে দাঁড়ালো তখন হাসিতে তাদের দম আটকে যাচ্ছিল। তাঁদের একজন বললেন, একখানা কাপড় এনে পর,—ছি ছি ছি! তারপর থেকে কঙ্ পুরনো পাজামার উপর একটি ইজার পরতে আরম্ভ করলো। তাই এই নতুন বেশে সে যখন প্রবেশ পথে এসে দাঁড়াল তখন আপত্তি জানালো অনেকে তার এই পরিবর্তনে।

অসহ্য গরম পড়েছে। স্নানাগারে লোকের ভিড়।

প্রতিদিন তাকে সেখানে দেখা যায়—সে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম সপ্তাহে সে সেই কোণ থেকে একটিবারও নড়েনি। কিন্তু ধীরে ধীরে সে একটু পায়চারি করে ছোট ছেলে-মেয়েদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সাবধান করে দেয়।

মেয়েদের সঙ্গে সে বেশী কথা বলত না। কিন্তু ছেলে-দের সঙ্গে আলাপ করতো গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মেয়েরা তার সঙ্গে আলাপ করতে এলেই সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তো। তার এই দুর্বলতা তারা যেন টের পেয়ে গেল। কোন-না কোন অছিলায় তারা তার সঙ্গে আলাপ করতে আসতো, নানা প্রশ্নে তাকে বিব্রত করতো। সে যখন বিরক্ত হয়ে উঠতো তখন তারা হাততালি দিয়ে হাসতো। এসব অত্যাচারীদের এক ঘুসিতে শিমুল তুলোর মতো গুঁড়ো করবার শক্তি এখনো তার মধ্যে রয়েছে। তবু, তাকে এমন অসহায় দেখে সত্যিই হাসি পেতো।

রবিবারের অপরাহ্ণ। একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। অপরাপর রবিবারের অপরাহ্ণের মতো সেই দিনের অপরাহ্ণটিও ছিল জনাকীর্ণ। গরম ছিল ভয়ানক। বাতাস পরম মখমলের মতো গায়ে এসে লাগছিল। পুকুরটির ওই পাড় থেকে কালো, সাঁতারের পোশাক পরা একটি মেয়ে সাইকেল চড়ে আসছিল। ভিড়ের জন্য সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রায় অর্ধডজন যুবক তার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিল। পুকুরের পুলে প্রতিধ্বনি তুলছিল তাদের উপস্থিতিতে।

চোখের পলকে মেয়েটি তার সাইকেলটি নিয়ে জলে পড়ে গেল। তার আর্তনাদ হাওয়ায় ভেসে এলো।

উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কণ্ড ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হল। মেয়েটি যেন অতি কষ্টে জল থেকে উঠে ঘাসের উপর বসে হাঁপাচ্ছিল। তার ডান পায়ে চোট লেগেছে, খানিকটা কেটে গেছে। সে পা-টি দুহাতে চেপে ধরেছিল। অনেক সুন্দর স্বাস্থ্যবান তরুণ—সে নিশ্চয় মেয়েটির বন্ধু—পাশে বসেছিল মেয়েটির। তার নিজের ঠোঁটের উপর হাতখানি রেখে সে মেয়েটিকে কি যেন ভিরস্কার করছিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল কণ্ড। একটু পরেই মেয়েটি কণ্ডকে জিজ্ঞেস করলো—সে তার সাইকেলটি জলের ভিতর থেকে তুলে দিতে পারবে কিনা। তার মুখ থেকে উত্তর বেরোবার আগেই যুবকটি বলে উঠলো আমি তুলে দিচ্ছি, সেজন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না।

সেই যায়গাটিতে জল ছিল প্রায় দশ-হাত। দু'তিনজন যুবক ইতোমধ্যেই সাইকেলটি তুলবার বৃথা চেষ্টা করছিল। এই যুবকটি যখন জলে ডুব দিল তখন সবাই ধীরে ধীরে সরে পড়লো। কণ্ড উদাসভাবে চেয়ে রইলো সেদিকে।

প্রায় এক মিনিট পরে যুবকটি জলের উপর মাথা তুললো। ক'জন তরুণী তাকে ডেকে জিগ্যেস করলো—সাইকেলটি পাওয়া গেল কিনা। যুবক ভ্রূকুঞ্চিত করে তাদের পানে তাকালো একবার। কালো চুলগুলো তার কপালের অর্ধেকটা ঢেকে ফেলেছে। আরও দু'তিনবার ডুব দিল সে। অনেকক্ষণ ধরে সে জলের নীচে রইলো। তরুণীরা তা' দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। অনেকক্ষণ পরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলো। তার চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে গেছে, কথা বলতে পারছিল না সে।

একটু দম নিয়ে সে বলল, সাইকেলটা পেয়েছি,—একেবারে জলের তলায় উল্টে পড়ে আছে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লো সবাই।

কালো পোষাকপরা মেয়েটি বলল, সত্যি! ওটা কোথায় আছে ভেবেছিলে তুমি? আচ্ছা, ঐ লোকটাকে সাইকেলটি তুলতে দিলেনা কেন? তোমার দ্বারা ওকাজ হবেনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে কণ্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন কথা না বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর ডুব দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সাইকেলটি জলের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে

জলের উপর গা ভাসিয়ে দিল। সবাই হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করলো।

মেয়েটিও তাকে ধন্যবাদ দিল। আনন্দে ও শ্রদ্ধায় দীপ্ত হয়ে উঠছিল তার চোখ দু'টি। যুবকটির দিকে চেয়ে সে বলল, আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি ওটা তুলতে পারবেনা।

যুবকটি তার ঠোঁট দুটো কামড়াতে লাগলো। কণ্ড মেয়েটির পায়ের ক্ষত সম্বন্ধে অস্পষ্ট ভাষায় কী যেন বলল। মেয়েটি মৃদু হেসে তার পরামর্শ গ্রহণ করলো। সে প্রবেশ-পথ পর্যন্ত কণ্ডের সঙ্গে গেল। কণ্ড সাইকেলটি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, তার চার পাশে ছিল জনতা।

কণ্ড মেয়েটির ক্ষতটা মুছে দিয়ে কী একটা প্রলেপ লাগিয়ে দিল। তারপর রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। মেয়েটি কণ্ডের সঙ্গে কথা বলছিল, বার বার তাকে জানাচ্ছিল সে সাহায্য না করলে সাইকেলটি পাওয়া যেতোনা। কণ্ড বেশি কথা বলছিল না। সে তার সকল লজ্জা জয় করে মেয়েটির ক্ষতটার দিকে চেয়ে ছিল এক দৃষ্টিতে। সে যেন ভাবছিল—কেমন করে এ ক্ষত সারানো যায়? সে যখন তার নীল চোখ দু'টি তুললো, তখন মনে হলো ওরা যেন বিস্ময়োল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সেই যুবক—তার নাম পিটার—মেয়েটির দিকে চেয়ে ছিল।.....

সারাটি দিন জনতা কণ্ডের দিকে এমনি করে তাকাচ্ছিল যেন সাইকেলটি তুলে সে মস্ত একটা বীরত্বের কাজ করেছে, সে যদি ডজনখানেক জলমগ্ন লোককে উদ্ধার করতো, তা'হলেও হয়ত এত বাহবা পেতোনা।

সে সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। তাই হয়তো এই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। নইলে এমন উত্তেজনা দেখা যেতোনা নিশ্চয়। দলে দলে লোক ভিড় করে দাঁড়ালো তার চার পাশে। পুরুষদের মধ্যে কেউ তাকে সিগারেট দিল, মেয়েরাও এসে দাঁড়ালো তাকে ঘিরে—তাকে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে নয়, তার মুখের দু'একটি কথা শুনবার আগ্রহে। শিশুর দল নীরব-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলো।

কণ্ড সকলের সঙ্গে আলাপ করলো, হাসলো, তার আঙুলের আইওডিনের দাগগুলির দিকে তাকালো। মাঝে মাঝে হাতখানি ঠোঁটের উপর রেখে আইওডিনের গন্ধ শুঁকলো।

সেইদিন থেকে কণ্ডের পরিবর্তন সুরু হ'লো।

প্রথমদিনের কণ্ডের সঙ্গে এই নতুন কণ্ডের কোন সাদৃশ্যই কল্পনা করা যায় না। নতুন ও পুরানো কণ্ড যেন দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা জীব।

কণ্ডের মধ্যে জেগেছে অপূর্ব পুলকশিহরণ।.....

সেদিন সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি মেয়ে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। যাবার সময় সে কণ্ডের গায়ে এক ধাক্কা দিয়ে গেল। তারপর ছুটলো চিৎকার করতে করতে। কণ্ড ছুটলো মেয়েটির পেছনে। একটু দূরে গিয়ে তাকে ধরে ফেললো। তারপর তাকে ছুঁড়ে ফেললো জলের ভিতর। জনতা আনন্দে কলরব করে উঠলো।.....

তরুণীদের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলো সে। মাঝে মাঝে ডুব-প্রতিযোগিতা হয়। জলের ভিতর ছুঁড়ে ফেলা নানান্ জিনিস যে তুলে আনতে পারবে, তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। প্রতিবারেই কণ্ড কৃতকার্য হয়ে পুরস্কার লাভ করে। সে এখন স্বাভাবিকভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে।

সাইকেলওয়ালা মেয়েটির সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে। স্নানাগারে এলেই মেয়েটি কণ্ডের সঙ্গে আলাপ না করে যায়না। পিটার সঙ্গে থাকলে সে পিছিয়ে পড়ে আলাপ করে কণ্ডের সঙ্গে। অধৈর্য পিটার অদূরে দাঁড়িয়ে রাগে গামছা দিয়ে পা দু'টোতে আঘাত করে। কিন্তু মেয়েটি প্রায়ই ইচ্ছা করেই যেন দেরী করে। পিটারের এই

অকারণ রোষে মেয়েটি যেন আমোদ পায়। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে করতে একটা তীব্র চঞ্চলতায় মাটির উপর থেকে উঠে দাঁড়ায় কও। মেয়েটি অন্যমনস্কভাবেই কথা বলে। তার বাদামী রঙের সুগঠিত দেহটিও একেবারে স্থির হয়ে থাকেনা। ঘরগোসের মতো দ্রুত চঞ্চলতা তার মধ্যেও থেকে যায়। তার সুন্দর চোখ দুটি, দাঁতের ঝৌলুস, দু'টি নরম লালচে ঠোঁট—সংজ্ঞাহীন করে ফেলে কওকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় সে। মনে হয় ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে তার কণ্ঠস্বর, সে সরে গেছে দূরে—অনেক দূরে। স্মিত স্নিগ্ধ মতো কওের দু'টি চোখ ব্যাকুলভাবে তাকে করে অনুসরণ। কোনদিন যদি সে জানে

কওের মনে হয়—সেই ধূসর আলোছায়ায় তার নেই আজ।.....

অপরাহ্ণ। পিটারের সঙ্গে মেয়েটি এলো।

একটি কমলালেবুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। মেয়েটি সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে বাঁধা ব্যাগ থেকে একটি কমলালেবু নিয়ে কওকে দিল। কও আনন্দে হয়ে উঠলো। পিটার তাড়াতাড়ি সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে সাইকেলে হেলান দিয়ে কমলালেবুটির খোসা ছাড়ানো শেষ করছিল। তার রাগের মাত্রা চললো যখন, তখন সে কমলালেবুর খোসা টুকরো টুকরো করে জলে ছুঁড়তে লাগলো।

তা লক্ষ্য করলো। সে স্তব্ধ হ'য়ে গেল হঠাৎ। মেয়েটিও এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো—কি হচ্ছে। সে পিটারকে ডেকে বলল, পিটার জলে খোসা ফেলোনা। তারপর মুচকি হেসে কওকে বলল, তুমি আমাদের এখান থেকে বের করে দেবেনা তো?

পিটার চারিদিকে তাকালো একবার। তার মনে হ'লো সবাই তার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে। ঘৃণা ও লজ্জায় তার সর্বশরীর জ্বালা করছিল। হাতের শেষ টুকরোটা জলে ফেলে দিয়ে সে সরোষে একবার চারিদিকে তাকালো। তাকে কাছে করে দেখে নিল কও-এর চেহারাটি। একবার ভাবলো, খোসা ছাড়াবে। কমলাটিও সে জলে ফেলে দেবে কিনা। কমলাটি নিচে ফেলে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়েটি বলল, পিটারকে নিয়ে আমি কী করবো ভেবে পাইনে। সেদিন থেকে সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে—দিনের পর দিন। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই সে রেগে যায়।

মেয়েটি চললো। কও তার ছোট ঘরখানির ভিতরে ঢুকে পড়লো। মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে সে তার হাতের কমলাটির দিকে একবার তাকালে। তারপর তার খোসা ছাড়াবার কোন চেষ্টা না করেই দেয়ালে টাঙানো কোটটির পকেটে ফেলে রাখলো।

অপরাহ্ণ হয়ে এলো।.....

স্বচ্ছ আকাশের কোলে সূর্য জ্বলছে, সিমেন্টের রাস্তাটি অসম্ভব গরম হয়েছে। রাস্তার উপর দিয়ে চলা যায়না। কও তার কুঁড়ে ঘরখানির পাশে দাঁড়িয়ে শুধু সেই কমলাটির কথা ভাবছিল। এক একবার তার ইচ্ছা হচ্ছিল কমলাটি বের করে নেয়। হঠাৎ সে দেখলো মেয়েটি জল থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কও তার মাথার টুপিটা খুলে নিয়েছে, তার খোলা চুলগুলো কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কোথায় গরম বেশি, —জলে, না জলের উপরে, এখানে? উঃ যদি একটা কমলা পেতাম এখন! সত্যিই একটা কমলা পেলে খুবই ভালো হতো।

কও বলল, আমার কমলাটি তো রয়েছে। ওটা নিন না। আমি এবার সেটা খেতে যাচ্ছিলাম।

মেয়েটি ফিক্ করে হেসে বলল, না-না, আমি তোমার কমলাটি খেতে চাইনা।

কও আবার বলল, নিন্ না—অন্ততঃ অর্ধেকটা নিন। একটু দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি।

ঘরে ঢুকে কমলাটি বের করে নিয়ে এলো। তারপর খোসা ছাড়িয়ে তাকে দুভাগ করে সবটাই মেয়েটির পকেটে পুরে দিল।

মেয়েটি মন্তব্য করলো, আমি এর চেয়ে ভালো খোসা ছাড়াতে পারতাম। মেয়েটি অর্ধেক কমলা হাতে নিল। একটু রস মুখে দিয়ে বলল, সত্যি কী আরাম! বাকী অর্ধেক দিল কণ্ডের হাতে।

দু'টি মেয়ে সেদিক দিয়ে গেল। তাদের একজন মন্তব্য করল, এমন দিনে কমলা খেতে খুবই আরাম।

কণ্ড মেয়ে দু'টির দিকে চাইলো। দেখলো—গজ দশ গজ দূরে পিটার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে রোষের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। সে একবার রাগতভাবে কণ্ডের পানে চাইলো। তারপর আবার ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো মেয়েটির দিকে। স্মিতমুখে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে। তার ঠোঁটে মায়াবিনীর ক্রূর হাসি।

কণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাসছিল। বুঝতেই পারছিল না—কী সে করবে। কমলার টুকরাটি তখনও তার হাতে ছিল। মেয়েটি কমলার একটি বীচি ছুঁড়ে দিল। কণ্ডের বুকের উপর এসে পড়লো বীচিটি, সে হেসে সেটি ঝেড়ে ফেললো। মেয়েটি মেতে উঠল ঐ খেলায়। অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। কিন্তু এক অনুভূতপূর্ব আনন্দে সে হয়ে উঠলো দীপ্ত। মেয়েটির খোসা ফেলা যখন শেষ হলো তখন কণ্ড প্রতিশোধ সুরু করল—কমলা-লেবুর দানা খুলে খুলে মেয়েটির দিকে ছুঁড়তে লাগলো। সে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল একেবারে।

মেয়েটি হাঁপিয়ে উঠলো হাসতে হাসতে। অনুনয়ের সুরে বললো, আহা! মেরোনা —না—না। কী অসভ্য তুমি!

বীচিগুলো তার বাহুতে আঘাত করলো। তার কালো চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়লো।

হঠাৎ একটা গোলমাল সুরু হলো। পিটার জনতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এলো। রাগে তার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সে কণ্ডের চুল ধরে জোরে এক ধাক্কা মারলো। গর্জে উঠলো, ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি·····

লোক জড় হয়ে গেল চারদিকে।

কণ্ড তার দু'টি বাহু ছাড়িয়ে নীরবে পিটারের দিকে তাকালো। মেয়েটি ভয় পেয়ে পিটারের কাঁধ চেপে ধরলো। বলল, কী করছ—করছ কী?

পিটার তার হাত দুখানি দূরে ছুঁড়ে দিল। সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কণ্ডের দিকে এগিয়ে এলো। এসেই কণ্ডের সর্বাঙ্গে ঘুষি লাগাতে আরম্ভ করলো।

আক্রমণের আগে হতভম্ব হয়ে কণ্ড তার বাহু দু'টো একবার উপরের দিকে তুললো। তার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ পেলো।

পিটার নির্মমভাবে ঘুষির পর ঘুষি মারলো। কণ্ড-এর মুখের এক কোণে এক ঝলক রক্ত দেখা দিল। কণ্ড ঘাড় নাড়লো একবার। সে যেন রক্তের আস্বাদ পেলো। মাথা ঘুরে গেল তার। মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে সে যেন ভাবলো—কী করবে। শুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো সে। পিটার তখনও দু'বার আঘাত করলো তার মুখে। ব্যথায় অচেতন কণ্ডের মুখখানি বিবর্ণ হ'লো। সে জেগে উঠলো এবার।

মুহূর্তের মধ্যেই গলা টিপে ধরে কণ্ড পিটারকে জলে ছুঁড়ে ফেললো। কে যেন কাতরকণ্ঠে ডেকে উঠলো—ওকে ধর—ধর—ও ভালো সাঁতার জানেনা!

দু'জন লোক ডুব দিল জলে।

কণ্ড নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।·····

পিটারকে জল থেকে তুলে ঘাসের উপর বসানো হ'লো। কণ্ডের শক্ত আঙুলগুলোর দাগ পড়ে গেছে পিটারের নরম গলায়। সে একবার তার দুর্বল হাতখানি নাড়বার চেষ্টা করলো।

মেয়েটি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ডাকল, পিটার!

তার দুচোখ বেয়ে ঝরঝর্ করে অশ্রু ঝরতে লাগলো। কণ্ড তার দিকে তাকিয়ে ছিল। কণ্ডের সঙ্গে হঠাৎ দৃষ্টি

বিনিময় হতেই তার চোখের জলের ধারা নেমে গেল। মাথাটি নীচু করে সে বলল, তুমি জা-নো-য়া-র !.....

.....ঘটনাটি সম্বন্ধে তদন্ত হয়েছিল।

স্নানাগার দুদিনের জন্য বন্ধ ছিল।

কণ্ড-এর এই ব্যবহার সমর্থন করে সাক্ষ্য দিল অনেকে। তারা বলেছিল—বার বার আঘাত খেয়ে কণ্ড আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল।

দুদিন পরে যথারীতি স্নানাগারটি খোলা হলো। কণ্ড তার কাজে বহাল রইল।

কণ্ড তার ঘরের মধ্যেই রইলো। কিন্তু সবাই সেখানে গিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। তার বন্ধুরা তার করমর্দন করলো, কাঁধ চাপড়ালো বাহবা দিল। কিন্তু কণ্ড-এর বিকৃত মনখানি সাড়া দিতে পারছিলনা কিছুতেই।.....

দিন যেতে লাগলো। কী এক অদ্ভুত দুর্ভেদ্য আবরণ যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে।.....

প্রায়ই, দিনের বেলায় সে সযত্ন প্রবেশপথের পাশে তার কুঁড়ে ঘরটির মধ্যে বসে থাকে একা। কখনও বা উদাসভাবে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। তার মনখানি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, জনতার কলরব সম্বন্ধে সে যেন অর্ধসচেতন, সূর্যের আলো ও প্রখরতা সে অনুভব করেনা, তার বুকে বিচিত্র শিহরণ। সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমন অপূর্ব জড়তা, মৃদু বেদনায় সে যেন ক্লিষ্ট হয়নি এর আগে কোনদিন। প্রবল দৃষ্টিধারা থেকে আত্মরক্ষার ব্যাকুল অসহায় পালকের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই বৃষ্টি বুঝি আর থামবেনা, বিস্ময়ে হতাশায় ও বেদনায় সে সেখানেই রইবে নিশ্চল।.....

•

সিটার ও সেই মেয়েটি আর কখনও সেই স্নানাগারে আসেনি।

দিন-কাল

(৮২ পৃষ্ঠার পর)

পিছু পিছু এগিয়ে এল নারাণ। খানিক চুপ করে থেকে কালীপ্রসাদ বললে, তোমরাও কি ওদের দলে! মাগনা পেলেও আমাদের জমি করবে না? আর সব যেন বলচো তোমরা!

কই কিছু তো বলিনি বাবু! কি দরকার আমা-একধারে যেমনি পড়ে আছি তেমনি যেন কি শুনেচেন কার কাছে!

কালীপ্রসাদ বললে, সে যাক, সত্যি বল দিকি তোমাদের মতলবটা কি? এ বছর চাষ করবে না?

নারাণ বোধ হয় মনে মনে হাসলে। বললে, চাষ না করলে খাব কি? যা আছে ঐ নেড়ে-চেড়ে দদ্দিন চলে!

যদি আরো বেশি পাও, তাতে অমত কি? কালী প্রসাদ বাড়িয়ে নিতে বললে।

অমত আর কি? কিন্তু পাচ্ছি কোথায়! বেশি পেতে গেলে তো বেশি দরকার! এই তো অবস্থা! পাকা দাড়িতে কথাগুলো যেন পাক খায়।

ধান ভাগে জমি করবে? ক' বিঘে চাই বল না? সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' ঘনকে দাঁড়িয়ে বললে কালী প্রসাদ।

নারাণ হঠাৎ জবাব দিতে পারে না। ক' বিঘে চাইবে, না ক' বিঘে তার চাওয়া উচিত এই সুযোগে!

শেষে চোক গিলে ছোট করে বললে, অত টাকা কই বাবু? সেলামী না হোক, চাষ ক'রতে তো খরচ আছে!

কালীপ্রসাদ বোধ হয় চটে যায় মনে মনে। বললে, তা তো আছেই। ওদের মত বিনা খরচে গোলা পূর্তি করতে চাও নাকি!

নিজেকে এককালে যেন নারাণ, শালা নেড়ের আবার ধানের গোলা! বলে খেতে কুলোয় না আবার জমা রাখবে!

রাগ দেখাবার সময় না এটা। কালীপ্রসাদ বললে, এই তোমরা জমি পাওনা বলে' কত আক্ষেপ ক'রতে! এখন পাচ্ছ, কর না।

নারাণ খানিক চুপ করে রইল, কি যেন ভাবলে মনে মনে—তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, পাওয়া আজ যত সহজ, নেওয়াটা তত সহজ নয় ছোটবাবু!

হঠাৎ যেন চমকে উঠলো কালীপ্রসাদ—ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, তার মানে?

মানে কথা ওদের মুখের গ্রাস আমরা কাড়ি কি করে? এক গেরামে বাস করি, এক পথে হাঁটি, এক আলো বাতাসে বাঁচি—

থাক্ আর কপচাতে হবে না। বাচলে সোনা রাঙ হয়! খুব পিরীত দেখছি! কালীপ্রসাদ খিঁচিয়ে ওঠে।

নারাণ চুপ করে থাকে। কথাগুলোর মধ্যে সত্যি কি কোন আন্তরিকতা নেই! খালি কপচান!

কালীপ্রসাদ বললে, সেদিনের কথা ভুলে গেচ বুঝি—দাঙ্গার সময় ভন্নি-তল্পা নিয়ে সবাই যখন বাবুদের ফটকের মধ্যে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছিলে—ঐ একপথে হাঁটা লোকগুলো যখন তোমাদের পেছনে কুকুরতাড়া করেছিল! ধর্ম্ম জ্ঞান খুব!

কিছু বলতে পারে না নারাণ, সে একটা সময় গেছে বটে দুঃস্বপ্নের মত, নেশার ঝোঁকের মত। হাত বাড়িয়ে বিধর্মীকে মারতে পারলেই জীবন সার্থক হ'য়ে যেত। সেই দেশ-জোড়া খুনের অনুশোচনা আজও শেষ হয়নি। কেবল মনে হয়, কেন এমন হয়—শুধু শুধু মার বললেই মেতে ওঠে কেন!

কালীপ্রসাদ উস্কে দেয়: সেদিন ঐ ছোটলোকেরাই তোমাদের শেষ করে দিত, নেহাৎ আমরা ছিলুম! সত্যিকারের যদি ধর্মজ্ঞান থাকতো তা হ'লে কথাই ছিল না! সুবিধেবাদী সব, আমাদের বেশ চেনা আছে!

আশ্চর্য নারাণ রাগ করলে না। মুখটা কাঁচু-মাচু করে' হাত-জোড় করে বললে, না বাবু পারবো না, মাপ করবেন! আবার একটা অশান্তির কারণ হই কেন! বেশ আছি একধারে পড়ে!

কালীপ্রসাদ গুম হ'য়ে গেল। ঠিক এমনটা সে ধারণা করেনি, ভাবেনি চিরকেলে দুঃখী সামান্য একটা চাষীর কোনদিন এমন ধর্মজ্ঞান হ'বে! না, কোথায় একটা ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে, নিজেদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা! নেড়ের জাত বিশ্বাস কি, মুখে বলছে এক, ভেতরে-ভেতরে করে রেখেছে আর এক! এখন জিজে বেড়ালটি সেজে ধর্ম কথা শোনাচ্ছে।

কালীপ্রসাদ অন্য পথ ধরলে। যেন সে মানুষই নয়—সুর বদলে বললে, কাকা বলছিল পশ্চিম মোপের ঐ এগার কাঠাটা তোমায় দলিল করে দেবে। ও তোমাদেরই জমি!

নারাণ হাঁ-ও বললে না, না-ও বললে না। এখন জমি পাওয়া না-পাওয়া তার কাছে যেন সমান। ইচ্ছে করলে এখন সে অনেক কিছুই পেতে পারে। বাপ ঠাকুর্দার লাঠিতে সুযোগমত তেল মাখাতে পারলে এখন তার মণ্ডা নেয় কে?

আজ এস না কাকার ওখানে কথাবার্তা হ'বে। কালীপ্রসাদ হঠাৎ সমস্ত আভিজাত্য ত্যাগ করে নারাণের কাঁধে হাত দিয়ে বললে।

ক্রমশঃ]

গহিন রাতের গান

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

শত স্বপ্নের হীরকের কণা
তোমাকে পারে না কিনতে,
তুমি থাকো শুধু একাকী-সুদূর
আকাশের নীল বৃত্তে।

নিশির ঝরছে টুপটাপ।
সময় ক্লান্ত, চুপচাপ।
অস্ফুট স্বরে আকাশ মাটির কথা
জানায় কেবল রাত্রির নীরবতা।

রাত্রির গহিন গাঙে কে তুমি এখনো পারাপার
করো, তোমার কী হারাবার
ভয় নেই ? সীমাহীন ধূ ধূ অন্ধকারের প্রহরে
আমার যে একা একা বড়ো ভয় করে।

হাওয়া

উন্মন হৃদয়,
উত্তর দক্ষিণ থেকে ছুটে আসে হাওয়া—
তারা কাঁপে, ফুল ঝরে আগেকার মত ;
কই সে প্রহরগুলি ? তাদের যাবেনা ফিরে পাওয়া ?

সঞ্চয়

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

তোমারে নেহারি করে জেগেছিল প্রথম বিস্ময়
প্রথম কবিতারূপে, অনুরাধা, মর্মে দোলা দিলে।

সর্ব অঙ্গে শিহরণ, অন্তরে কী দুরন্ত আবেগ,
আকুল আহ্বানে আহা, সহসা অস্থির করেছিলে।
কণ্ঠে তব উৎসারিত যুগান্তের বরাভয় বাণী,
অতলান্ত সমুদ্রের নীলটুকু নয়নে তোমার।
মৃন্ময় প্রদীপ হস্তে প্রভাতের কল্যাণী মূরতি
মনের পরতে আজো করে নব স্বপ্নের সঞ্চার।

তোমারে নিরখি শুধু বেড়ে চলে বিস্ময়ের ঘোর,
ভুলে যাই নিষ্করুণ পৃথিবীকে মুহূর্তের তরে।
তারার অক্ষরে পড়ি প্রেয়সীর প্রেমের লিপিকা,
তোমার প্রীতির স্পর্শে ঘাসে ঘাসে শিশিরেরা ঝরে।
প্রথম কবিতা রূপে জাগালে যে পরম বিস্ময়,
সমস্ত জীবনে মোর সেইটুকু সুবর্ণ-সঞ্চয়।

মন-পবন

[শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য]

স্বপ্ন ছিলো : কেশবতী রাজকন্যা আর
রাজপুরী হীরে-মুক্তার।
অনেক নিশুতি রাতে ঘুমের গভীরে
সে-পথ চিনেছি আমি জ্যোৎস্নার আলোকে
আর জোনাকির ভিড়ে।
মানচিত্রে সীমা-টানা পৃথিবী তখন গেছে ঘুচে,
আকাশের যবনিকা খসে গিয়ে ক্ষয়ে গিয়ে
সকল রহস্য নিলো মুছে।

সব তর্ক শেষ : তাই শান্ত হ'য়ে থেমেছে সময়,
সব কথা শেষ : তবু আকন্দ গাছের ডালে
ব্যাংগমা-ব্যাংগমী কথা কয়।
সে-কথার মানে
সমস্ত হৃদয় দিয়ে বুঝেছি সেদিন জানো
রাতজাগা তারার কল্যাণে।
সে-কথায় আছে যেন নেশা
মনের অনন্ত তীর্থে পথ খুঁজে বেড়ানোর নেশা।
সে-কথার সূত্র ধ'রে কতোবার
নেমে গেছি কমল-সায়রে,
পথ কেটে চলেছি আবার।

সাগর যেখানে শেষ, সেইখানে জেগেছে শহর,
প্রহর আপনি বাজে প্রবালের তোরণের 'পর ;
ভিড় ঠেলে চ'লে গেছি স্ফটিকের রাজপথ ধ'রে
শহরের কেন্দ্রে : তার একেবারে মর্মের ভিতরে,
সেইখানে গজমোতি-বিনার চূড়ায়
বিস্ময়-চকিত চোখে কেশবতী রাজকন্যা
দেখেছে আমায়।
মনে হ'ল তার দুটি কালো চোখ ছেয়ে
কী যেন আশ্বাস এলো : এ মুহূর্তে যেন
সব খোঁজা পেয়ে।

সব চাওয়া শেষ : তাই শ্রান্ত হ'য়ে সময় ঝিমায়,
সব পাওয়া শেষ : তবু পিঞ্জরের এক প্রান্তে
হীরামন সুর বুনে যায়।
সে-গানের মানে
সমস্ত আবেগ দিয়ে বুঝেছি সেদিন জানো
রাতজাগা তারার কল্যাণে।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি

আমদানী ও রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদ দুইটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য সচিব-দ্বয় সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং বৈদেশিক

অন্যান্য বৎসর পূর্বের তুলনায় ভারতের অনুকূল হইয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে মোট রপ্তানী ৫২২ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ১১ কোটি টাকা কম হইলেও এই বৎসর আমদানী ৯৫ কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যে নিট্ ঘাটতি পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৪৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসর পাটজাত দ্রব্যাদি শতকরা ১১ ভাগ, চা শতকরা ৭ ভাগ ও সূতীবস্ত্র শতকরা ২৪ ভাগ বেশী রপ্তানী হয় কিন্তু তৈল, তৈলবীজ ও অয়েলকের রপ্তানী শতকরা ৭৪ ভাগ হ্রাস পাওয়ায় মোট রপ্তানী হ্রাস পায়। আমদানীর পরিমাণ অপ্রত্যাশিত ভাবে হ্রাস পাইবার প্রধান কারণ খাদ্যশস্য জনিত আমদানী ৩৫ কোটি টাকার উপরে হ্রাস।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সরকার ইতিমধ্যেই উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর হইতে রপ্তানী শুল্ক লোপ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া কতকগুলি দ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, অবাধ সাধারণ লাইসেন্সের ক্ষেত্র প্রসার, বিদেশে প্রচার কার্য, প্রধান বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। আমদানী প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন যে, সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এমন কি ঘাটতি-বাজেটে সরকারের যে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় দেখা দিবে তাহা সঙ্কুলান করিবার জন্য আমদানী বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। সেজন্য সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছু শিথিল করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে ভারতীয় বাণিজ্য সমিতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ করিবার জন্য ৮০০ দ্রব্যের এক তালিকাযুক্ত স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশের চালু শিল্পের স্বার্থরক্ষা করা ও নূতন শিল্প স্থাপনের পরিবেশ গড়িয়া তোলা যেমন সরকারের কর্তব্য অপর দিকে আমদানীর নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশের জনসাধারণ যাহাতে অত্যধিক মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া নিষ্পিষ্ট না হয় সে দিকে সরকারের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৫৩ সালে শিল্পোৎপাদন

১৯৫১ সাল হইতেই শিল্পোৎপাদনের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়া ১৯৫৩ সালে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বাধিক হইয়াছে। (১৯৪৬ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ ধরিলে, ১৯৫১ ১১৭'৪, ১৯৫২—১২৮'৯, ১৯৫৩—১৩৫'১)। সূতী বস্ত্রাদির পরিমাণ পরিকল্পনা কমিশনের স্থিরীকৃত লক্ষ্য হইতেও বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯০ কোটি ৫০ লক্ষ গজ এবং সূতার পরিমাণ ১৫১ কোটি পাউণ্ডে উন্নীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া লবণ, সিমেন্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পেও উৎপাদন লক্ষণীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে শ্রমিক গোলযোগ, চাহিদা হ্রাস, কাঁচা মালের অভাব বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব প্রভৃতির জন্য কিছু সংখ্যক শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে

এই যে কয়েকটি শিল্পজাত দ্রব্য ব্যতীত বহু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দ্রব্য মজুত রহিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই নয় যে দেশের প্রয়োজন মিটিয়া গিয়া উহা উদ্বৃত্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ দেশের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার হ্রাসই ইহার মূল কারণ। প্রতি টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয়ের দরুণ গত বৎসর হইতে এই বৎসর ৯ পাই অতিরিক্ত দিতে হইতেছে। পণ্য মূল্য শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারণকে এই অতিরিক্ত বোঝা বহিতে হইতেছে। (১৯৩৯ সালের ক্রয় ক্ষমতা ১০০ ধরিলে, তদনুপাতে ১৯৫২ সালে—৩৮.০৬, ১৯৫৩ সালে—৩৯৭.৫)।

চিনির উৎপাদন হ্রাস

এই বৎসরে চিনির উৎপাদন ১০ লক্ষ টনের অধিক হইবে না বলিয়া অনুমান। ইহা গত বৎসরের উৎপাদন অপেক্ষা ৩,৫০,০০০ টন কম। চিনির মূল্য অপরিবর্তিত রাখিয়া দেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি আমদানী, সরকারের নিকট মজুতলাভ ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত চিনি হইতে দেশের সর্বত্র চিনি সরবরাহ প্রভৃতি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে, ভারত সরকার ইতিমধ্যে ৬ লক্ষ টন চিনি ক্রয়ে সমর্থ হইয়াছেন এবং উহার ৭০ হাজার টন মে মাসের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবে। ন্যায্যমূল্যে চিনির উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিনির কলকব্জা আধুনিক করণের প্রশ্ন আজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে শিল্পপতিদের দাবী সম্বন্ধে সরকারের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

খাদ্যের সরবরাহ

বর্তমান বৎসরে ভারতে খাদ্যের সরবরাহে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। গত বৎসর মোট খাদ্যের আমদানী হইয়াছে ৭৫ কোটি টাকারও কম (পূর্ববর্তী বৎসরে হইয়াছিল ১৫০ কোটি টাকা)। উদ্বৃত্ত রাজ্যের মধ্যে আসাম অন্যতম; আসাম সরকার তাহাদের উদ্বৃত্ত চাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১৫,০০০ টন ও ভারত সরকারকে ৪০,০০০টন দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। দেশের স্বাভাবিক ঘাটতি ১০ লক্ষ টন খাদ্য মজুত রাখিবার জন্য ভারত-সরকার রেঙ্গুন হইতে ৯ লক্ষ টন চাল ২৯ কোটি টাকায় ক্রয় করিয়াছেন; রেঙ্গুনের চাল নিকৃষ্ট শ্রেণীর; কিন্তু মূল্য দিতে হইয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আশ্বস্ত হইবার কারণ এই যে, এখানে ঐ চাল দেওয়া হইবে না। কৌতূহলের বিষয় এই যে সর্বত্রভাবে খাদ্যের দিক হইতে উদ্বৃত্ত হইতে না হইতেই ভারত সরকার আসামের উদ্বৃত্ত চাল হইতে ৪০,০০০ টন চাল সাধারণতন্ত্রী চীনে প্রেরণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, খাদ্যাবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য যে গত ১০ই মে হইতে আসাম সরকার রেশন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং আগামী ৩০শে মে হইতে বোম্বাই প্রদেশের ১১টি শহরে ও ৭ই জুন হইতে পশ্চিমবঙ্গের ৫টি শহর হইতে রেশন ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারদ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন।

কোশী পরিকল্পনা

গত ২৪শে এপ্রিল কাঠমাণ্ডুতে কোশী পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত ও নেপালের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে ভারত সরকার নেপালের অন্তর্গত হনুমান নগরের তিন মাইল উত্তরে কোশী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জলাধার নির্মাণ, খাল খনন ও বন্যা প্রতিরোধক অন্যান্য নির্মাণকার্য এবং বৈদ্যুতিক উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপিত করিতে পারিবেন। এই পরিকল্পনার ফলে উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চল লাভবান হইবে এবং ইহাতে ব্যয় হইবে ৩৮ কোটি টাকা।

নদী পরিকল্পনায় বারে বারে নক্সা পরিবর্তন ও পরি-চালন ব্যবস্থায় গলদের ফলে একদিকে যেমন কাজের গতি মন্থর এবং অপরদিকে সরকারী অর্থের অপচয় হইতেছে তাহাতে এই কোশী পরিকল্পনায় যাহাতে পূর্ব

হইতেছে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার কাজ শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় যে-সমস্ত লক্ষ্য উহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালনা করা হইবে বলিয়া কমিশন স্থির করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নিকট যে নির্দেশনামা পাঠান হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকটি পল্লী বা সমষ্টি ইত্যাদির জন্য তাহাদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করিবার দ্রব্যের উৎপাদন পূর্ণ অকালে কর্মের সংস্থানই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। উন্নত ধরনের বীজের উৎপাদন ও সারের ব্যবস্থা, ভূমির পুনরুদ্ধার, পল্লীর সেবা-ভূমির উদ্ধার, উন্নত ধরনের গবাদি পশুর প্রবেশ বৃদ্ধিসমূহ উন্নয়ন ও পল্লী শিল্পের উন্নয়ন, পল্লীর যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং ইহা ছাড়া সেচ পরিকল্পনা, সড়কের ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কার্যগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনেক গোলমালের করিতে হইয়াছিল এবং উহার অধিকাংশ পরিকল্পনাই পূর্ববর্তী বৃটিশ সরকার কর্তৃক আলোচিত ও কতকাংশে প্রণায়িত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যাহাতে সুচিন্তিত ও সুরচিত হয় তৎপ্রতি পূর্ব হইতেই সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সকল দ্রব্যেরই উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইবে, তাহা ছাড়া দামোদর, হীরাকুঁদ, ময়রা-নাগার্জুন প্রভৃতি পরিকল্পনা যদিও সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে উপনীত হইবে, কোশী, চম্বল, রিহান্দ এবং কৃষ্ণা পরিকল্পনার সমাপ্তির পথে এক সোপানের অধিক অগ্রসর হইবে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহে ৯টি রাজ্যসরকার ব্যর্থ হইয়াছেন এবং সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়ের ব্যাপারেও দেশবাসীর নিকট হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা ঋণ গ্রহণের দ্বারা সংগ্রহ করা যে সম্ভব হইবে না তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সরকারের হাতে 'ডেফিসিট্ ফিন্যান্সিং' নামে এক বড় হাতিয়ার আছে। কিন্তু উত্তরোত্তর 'ডেফিসিট্ ফিনান্সিং' চালাইয়া গেলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার যে কোন উপায় থাকিবে না সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে এই পরিকল্পনায় স্থানীয় উদ্যোগ, উদ্যম ও সম্পদের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে ইহা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

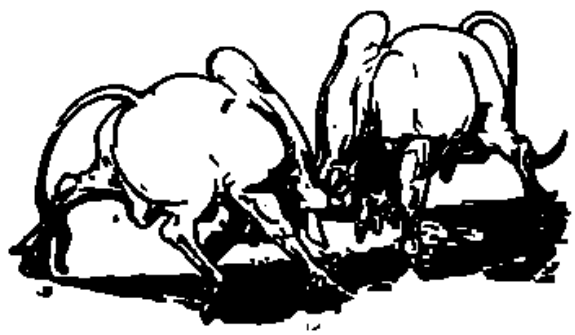

সংবিধান সংশোধন—

ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়ে আজ ও বছর যাবৎ তা চালু হয়েছে। এর মধ্যে এর আংশিক সংশোধন করা হয়েছে। এখন আবার কথা উঠেছে—এই সংবিধানের আরও কিছু সংশোধন করা দরকার। প্রথমবার এর সংশোধনের কথা ওঠে—প্রধানত, সম্পত্তি বিষয়ক মৌলিক অধিকারের ধারা নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তখন জমিদারী প্রথা রহিতের আইন প্রণয়নে মন দিয়েছে। সংবিধানের ৩১ ধারায় বিষয়-সম্পত্তির উপর যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে—তা জমিদারী স্বত্ব লোপ করার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল। তাই ১৯৫১ সালে তার সংশোধন করে, বলা হল যে সম্পত্তি বিষয়ক মৌলিক অধিকার ভূ-সম্পত্তির উপর সেভাবে প্রযোজ্য হ'বে না—যাতে জমিদারী দখল করায় অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। তখন-ও ঐ ধারায় অন্যান্য সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা রইল। অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে এখন গোলমাল শুরু হয়েছে। ১৯৫০ সালে একটা আইন ক'রে শোলাপুর কাপড়ের কল সরকারী অধিকারে নেওয়া হয়। ঐ কলের কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে কল চালাতে পারছিল না; ১৯৬৯ সালে তারা মিল বন্ধ করে দেয়। অথচ তখন দেশে বস্ত্রের অভাব খুব বেশী। শোলাপুর কলটি খুবই বড়; বস্ত্রের ঐ দারুণ অভাবের সময় এত বড় একটি কল বন্ধ হয়ে থাকবে—এটা দেশের ও জাতির পক্ষে মোটেই শুভ নয়। তাই পার্লিয়ামেন্ট এক আইন পাশ ক'রে ঐ মিল পরিচালনার ভার সরকারকে দেয়।

অংশীদার ও পরিচালকদের (Managing Agents) স্বত্ব সরকার জবর-দখল বা বাতিল করে নি। কিন্তু সাময়িক ভাবে তাদের স্বত্ব বন্ধ করে রাখা হ'ল। সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) এ নিয়ে মৌলিক অধিকারের মামলা হয়; তাতে শোলাপুর কল সম্বন্ধীয় আইন সংবিধান বিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এতে দাঁড়াল বিষয় সম্পত্তির উপর কারোর কোন অধিকার সাময়িক-ভাবেও বাতিল করা চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে ভারত সরকারের ও অনেক প্রাদেশিক সরকারের বহু ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত বান-চাল হয়ে যাচ্ছে। এখন হ'ল প্রধানত নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার যুগ এবং এখনকার সরকার হ'ল জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র (Welfare State)। জাতির সর্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয় ও হবে। সেই অনুসারে সরকারের বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। Industries (Development & Regulation) Act অনুসারে কোন কোন অবস্থায় কোন কারখানা বা ইণ্ডাষ্ট্রি সরকারের কর্তৃত্বে ও আয়ত্বে আনা যায়। এর ১৯(ক) ধারায় এই অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছে। যদি কোন ইণ্ডাষ্ট্রী ও কারখানার পরিচালনা জনস্বার্থের প্রতিকূল হয় তাহলে এই ধারা অনুসারে সরকার তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারে। শোলাপুর কল সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের ঐ রায় অনুসারে—এই ১৯ (ক) ধারাও বাতিল হয়ে যায়। ঐ আইনের বলে উত্তর প্রদেশের দুটি চিনির কারখানার পরিচালনার ভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। এখন সে দুটী কারখানা সম্বন্ধে যে কি করা যাবে, তা অনিশ্চিত।

ইনসিডেন্টেল আইনের ৪২ (ক) ধারা অনুসারে ১০টী ইন্সিডেন্টেল কোম্পানীর পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করেছে। ১৯৪১ সালের রেলওয়ে কোম্পানী সম্বন্ধীয় জরুরী আইনের বলে বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ের পরিচালনার ভার পরোক্ষভাবে সরকার গ্রহণ করেছে। এমনি আরও বহু আইন আছে যার বলে কোন বিশেষ অবস্থায়—কোন কারখানার বা ইণ্ডাষ্ট্রির পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করতে পারে। প্রাদেশিক বহু আইনও সুপ্রীম কোর্টের এই রায় অনুসারে বা সংবিধানের ৩১ ধারার বলিতে—কোন হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সংবিধান বিরোধী বা বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার ভূমি উন্নয়ন ও পরিকল্পনা আইন (West Bengal Land development and Planning Act) সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করেছে; এর ফলে উদ্বাস্তুদের জন্য বা অন্য কোন সরকারী কাজের জন্য পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষে কোন জমি দখল করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি পাশ করা পশ্চিম বাংলার জমিদারী বিলোপ সাধনকারী আইনে জোতদার, লাটদার ও অন্যান্য নধাবর্তী স্বত্বাধিকারীদের স্বত্ব লোপ করার যে ক্ষমতা পশ্চিম বাংলা সরকার গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধেও আজ সন্দেহ জাগছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংবিধানের ৩১ ধারা সরকারের বহু পরিকল্পনাকে বাধা দিচ্ছে। অথচ বর্তমান আর্থিক ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় এই সব পরিকল্পনার বড় প্রয়োজনীয়তা আছে। সংবিধান যদি তাতে বাধা দেয় তবে তার সংশোধন করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সম্পত্তির উপর মানুষের মৌলিক অধিকার অতি পুরাতন যুগের কথা। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার দাবি দিয়ে নূতন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করা চলে না। সংবিধানের আরও কতকগুলি ধারা আছে যাতে এমন সব মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে যা বর্তমানে রাষ্ট্রের পরিকল্পনার বা রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

সংবিধানের ১৪ ধারায় আইনের চক্ষে সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৫।১৬ ধারাতেও বিভিন্ন অবস্থায় এই সাম্যের কথাই বলা হয়েছে। বাক্য, চলা ফেরা, সংঘ গঠন করা, সম্পত্তি অধিকার করা, ব্যবসা ও পেশা প্রভৃতি বিষয়ে সব নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথা ১৯ ধারায় বলা হয়েছে। ২০, ২১, ২২শে গ্রেপ্তার বিচার ও আটক রাখা বিষয়ে রাষ্ট্রের অধিকার সঙ্কুচিত করে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই সব ধারায় প্রদত্ত অধিকারের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমনি ভাবে সংকুচিত হয়েছে যে রাষ্ট্রের বহুবিধ কল্যাণকর কাজে বাধা পড়েছে। নাগরিকের অধিকারের সাম্যের অজুহাতে সম্প্রতি আয়কর অনুসন্ধান কমিশনের (Income-tax Investigation Commission) একটী ধারা সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। তার ফলে ঐ কমিশনের হাতে বিচারের জন্য যত মামলা আছে তার প্রায় ½ অংশ ঐ কমিশনের বিচারের অধিকারের বাইরে চলে যাবে। কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা সংবিধানের এই সব ধারা অনুসারে অত্যন্ত কঠিন বা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অনেক আইন সংবিধানের এই সব ধারা অনুসারে বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। কোন অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বা সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত লোকেদের জন্য কোন বিষয়ে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে রাখা বা তাদের কোন বিশেষ অধিকার দেওয়া সাম্যমূলক এই সব ধারার ফলে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পাঞ্জাবের ভূমি আইন অনুসারে কেউ যদি দীর্ঘকাল ভূমি থেকে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেই ভূমির উপর তার অধিকার চলে যায়। কিন্তু সৈন্য বিভাগের নিযুক্ত লোকদের পক্ষে গৃহে উপস্থিত থেকে জমি চাষ করা সম্ভব নয়। তাই কথা হয়েছিল এই আইনের আওতা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে যাতে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু সংবিধানের এই সব ধারার জন্য এ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি।

১৯ ধারাতে বাক্যের, মতামত প্রকাশের এবং সম্মেলনের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারের অপপ্রয়োগ বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা বিদ্বেষ জাগাবার উদ্দেশ্যে বা সৈন্য ও পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ হলেও, তা বাধা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কোন লোকের অত্যন্ত গর্হিত এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নিন্দা করেও এই মৌলিক অধিকারের বলে লোক অব্যাহতি পেতে পারে। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার জারী করেছিল যে সরকারের অননুমোদিত কোন সংস্থায় বা সংগঠনে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যোগ দিতে পারবে না। মাদ্রাজ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে এই ইস্তাহার অবাধ সম্মেলনের ব্যক্তি-অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯ ধারার একটি উপধারায় ব্যবসায় বা জীবিকার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যের বহু ক্ষেত্রে সরকারী লাইসেন্স ও পারমিটের বহু প্রয়োজন হয়। অনেকের মনেই এখন সন্দেহ জাগছে যে সরকারের এমন কোন অধিকার আছে কিনা। ১০০ জন হয়ত কোন একটি বিশেষ ব্যবসায়ের লাইসেন্সের আবেদন করল, তার মধ্যে হয়ত ৫০ জনকে লাইসেন্স দেওয়া হল। এতে প্রশ্ন উঠছে—প্রত্যাখ্যাত ৫০ জনের ব্যবসায়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হল; অতএব এই লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়া সংবিধান বিরোধী। উত্তর প্রদেশের এমনি একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট এক রায় দিয়েছে। করলার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেখানে লাইসেন্স প্রথা প্রচলিত আছে। সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে লাইসেন্স প্রথা প্রচলিত করার অধিকার উত্তর প্রদেশের সরকারের নেই।

সংবিধানের আরও বহু ধারা আছে যার ফলে শাসন কার্যে নানাবিধ অসুবিধা হচ্ছে। প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার নিয়েও সংবিধানের নির্দেশ অনেকটা গোলমেলে। ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় বিষয়;—কাজেই কোন প্রাদেশিক সরকার ব্যাঙ্ক পরিচালনা করতে পারে কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তেমনি প্রাদেশিক সরকারের অন্তর্গত লিষ্টের কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যবসায় বা ইণ্ডাষ্ট্রী চালাতে পারবে কি না তা নিয়েও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। খনি, কৃষি গ্যাস, হোটেল, যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের লিষ্টের অন্তর্গত। এই সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার বা এমনি কোন ব্যবসায় বা ইণ্ডাষ্ট্রী চালানো আজ সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে। সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধেও সংবিধানে এমন সব সর্ত আছে যার ফলে, তাদের বিরুদ্ধে কোন দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। তারও সংশোধন নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই সংবিধানের একটা ব্যাপক সংশোধনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

পাকিস্থান—

পাকিস্থানের অবস্থা এমন দ্রুত তালে পরিবর্তিত হচ্ছে যে তা নিয়ে কোন মাসিক কাগজে লেখা মুস্কিল; এমন কি দৈনিক কাগজেও এর তাল রাখা সম্ভব নয়। তবুও আমরা কিছু আলোচনা না করে পারি না। সর্বপ্রথমে আমরা ইয়াংকী-পাকিস্থানী সামরিক চুক্তির কথা বলব।

মে মাসের ১৮।১৯ তারিখ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাকিস্থানের তরফ থেকে বার বার জোর গলায় বলা হয়েছে যে এ সামরিক চুক্তির মধ্যে পাকিস্থানের কোন বাধ্য বাধকতা নেই। কিন্তু চুক্তির ভাষার অন্তরালে বাধ্যবাধকতা মূলক অনেক সর্ত রয়ে গিয়েছে। ১ম ধারার দ্বিতীয় উপধারায় বলা হয়েছে যে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য অথবা সংযুক্ত জাতীয় সংঘের (United Nations) সামবায়িক শান্তিরক্ষার বিধি ব্যবস্থার জন্য আমেরিকার প্রদত্ত এই সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে। এই থেকে অনুমান বা আশঙ্কা করা চলে যে ইয়াংকী যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতির জঞ্জালের মধ্যে পাকিস্থান জড়িত হতে বাধ্য হবে। কোরিয়ার অভিযানে সংযুক্ত জাতি সংঘের প্রস্তাব সত্ত্বেও ভারত বা পাকিস্থান সৈন্য পাঠায় নি। কিন্তু এর পর এমনি কোন অবস্থায় পাকিস্থান সৈন্য না পাঠিয়ে পারবে—এমন আশা করা যায় না।

৩য় ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছে যে পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক খরচ (administrative and operating expediture) বাবদ ইয়াংকি যুক্ত রাষ্ট্রের ভল্ল টাকা পাকিস্তান সরকার জোগানের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়াও আমেরিকার লোকজন যারা এই সামরিক চুক্তির জন্ম পাকিস্তানে বাস করবে—তাদের জন্ম যে সব জিনিষ পত্র আমদানী রপ্তানী হবে তার বাবদ কোন শুল্ক আদায় করা হবে না (grant duty free treatment on importation and exportation)। এতদ্ব্যতীত আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার কর থেকেও তারা অব্যাহতি পাবে (exemption from internal taxation upon products, property, materials etc.)। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এশিয়ার অনেক দেশে ইউরোপীয় জাতি সমূহ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা উপভোগ করত যাকে বলা হত extra territorial rights। চুক্তির এই ধারাটি অনেকটা তারই পুনরাবৃত্তি। এই ধারার দ্বিতীয় উপধারায় যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এ চুক্তির ৪র্থ ধারায় বলা হয়েছে যে এই চুক্তি সম্পর্কে যে সব ইয়াংকী সামরিক লোকজন পাকিস্তানে বাস করবে তারা সবাই রাষ্ট্রদূতের পদমর্যাদা ও অধিকার (diplomatic status) ভোগ করবে। এই সব লোকজন পাকিস্তানের ভূমিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে এবং কার্যতঃ তারা পাকিস্তানে সমস্ত সামরিক বিধি ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করবে (will be accorded facilities and *authority* to observe the progress of assistance furnished persuant of this agreement)। পাকিস্তানের সমস্ত সামরিক ব্যবস্থা এই চুক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নির্ধারিত হবে; কাজেই উপরোক্ত ইংরাজী বাক্যের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে পাকিস্তানের সমস্ত সামরিক ব্যবস্থা এই সব মার্কিণী সামরিক কর্মচারীদের আয়ত্তাধীন হবে।

এই চুক্তির ৫ম ধারায় ইংরাজী যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে কতকগুলি কাজ করতে পাকিস্তান বাধ্য থাকবে। তার মধ্যে কয়েকটি আমরা উল্লেখ করছি—(১) আন্তর্জাতিক 'সমঝাওতা' ও সম্প্রীতি (understanding and goodwill) এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যোগ দেওয়া। (২) আন্তর্জাতিক মন কষাকষি (tension) দূর করতে সহযোগিতা করা. (৩) যথাসাধ্য নিজের ও "স্বাধীন" জাতি সমূহের (অর্থাৎ রুশিয়া বিরোধী এবং আমেরিকার সহযোগী জাতি সমূহের) সামরিক শক্তি বাড়াবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করা. (৪) পাকিস্তানের কাঁচা ও অর্ধ কাঁচা মাল দরকার মতো আমেরিকাকে যোগান দেওয়া; (৫) এছাড়া পাকিস্তানের বৈদেশিক ব্যবসার নীতির উপরও আমেরিকার অনেকখানি অধিকার থাকবে।

এমনি সব সর্ত যে চুক্তিতে রয়েছে তা নিয়ে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ জাগা খুবই স্বাভাবিক। পূর্ব বাংলায় আজ যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্ম এ চুক্তি অনেকখানি দায়ী। পূর্ব-বাংলার নির্বাচনের সময় এই চুক্তি নিয়ে বহু কথা হয়েছে। যদিও দুইজন বয়স্ক নেতা—হক সাহেব ও সুরাবর্দী সাহেব—এই চুক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। মৌলানা ভাসানী, যুবক ও ছাত্রগণ এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে আন্দোলন করেছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই চুক্তি তাদের মনে শঙ্কা ও সন্দেহ উদ্রেক করেছে। এই সাত বছর পূর্ববাংলা অনেকটা ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বাস করেছে; এই চুক্তিতে তাদের মনে আশঙ্কা জাগল যে আমেরিকার সামরিক সাহায্য নিয়ে এই ঔপনিবেশিক শাসনই আবার কায়েমী ও মজবুত করা হবে। বর্তমানে যে ভাবে কজলুল হক সরকারকে বরখাস্ত ক'রে গভর্ণরী বা কার্যত সামরিক শাসন চালানো হচ্ছে তাতে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মনে অনিবার্য ভাবে ধারণা হবে যে—আমেরিকার সামরিক সাহায্য না পেলে পাকিস্তান সরকারের এ সাহস হতো না।

পূর্ব বাংলায় আজ যে শাসন চলছে, তার পূর্ণ স্বরূপ বাঙালী পাঠকদের কাছে অবিদিত নয়। ইংরাজ শাসনে এই ব্যবস্থা বাংলার উপর বহুবার হয়েছে। এই সম্বন্ধে

বৈদেশিক কাগজে যা মন্তব্য করেছে তা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে মোটেই প্রীতিমধুর হবে না। যে সব বিলাতী ও আমেরিকার কাগজ সাধারণত পাকিস্তানের সমর্থক, তারাও পাকিস্তান সরকারের এই কাজকে ভাল চোখে দেখতে পারে নি। আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস' মূলত আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদন করে এবং সেই হিসাবে এই কাগজ পাকিস্তানের সমর্থক। এই কাগজ লিখেছে যে পূর্ব বাংলার এই সমস্ত গোলমাল প্রধানত পাকিস্তানের ভৌগলিক অনাচারের অনিবার্য ফল (are in part the inevitable product of the geographical monstrocity)। ঐ প্রবন্ধেই লিখেছে এই ভাবে নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা স্বভাবতই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। এ কাগজ আরও লিখেছে যে পূর্ব বাংলার কতকগুলি যুক্তি-সঙ্গত অভিযোগ (legitimate grievances) আছে।

পাকিস্তানের অর্থ সম্পদ পূর্ববাংলা যতটা জোগান দেয় তদনুরূপ প্রতিদান পাকিস্তান সরকার থেকে সে পায় না।

বিলাতের 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' কাগজ বরাবর পাকিস্তানের সমর্থক। সে কাগজ লিখেছে যে নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে গভর্ণরী শাসন প্রবর্তন করা পাকিস্তান বা ভারতবর্ষে এ প্রথম নয়, কিন্তু পূর্ববাংলায় এবার যা করা হলো, তার কোন তুলনা নেই। এটা নিকৃষ্টতম শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট (worst constitutinal crisis)। যে প্রদেশে অর্ধেকের চেয়ে বেশি লোক বাস করে, তাকে জোর করে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পাকিস্তানের মতামতের কোনই মূল্য নেই।

লণ্ডনের বিখ্যাত 'ইকনমিস্ট' কাগজ "Pakistan One or Two" নামক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছে, পূর্ববাংলার ঘটনায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পাকিস্তান একটা কি দুটা? পাকিস্তানের অদ্ভুত ভৌগলিক অবস্থানের (bizarre layout) কথা উল্লেখ করে সে কাগজ লিখেছে, পাকিস্তান যদি একটা রাষ্ট্র থাকতে চায় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানকে একটা বিশেষ রকমের স্বাতন্ত্র্য দিতেই হবে। (greater measure of special autonomy),—সিন্ধু বা পাঞ্জাবের মতন একটা সাধারণ প্রদেশ হিসাবে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলাকে দেখতে পারবে না।

ইরাক, মিশর, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের কাগজেও পাকিস্তান সরকারের এই কার্যের নিন্দা করা হয়েছে। কোন কোন কাগজে লিখেছে যে পূর্ব বাংলাকে ঔপনিবেশিক পর্যায়ে নেওয়ার জন্যই এরূপ শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। ব্রহ্মদেশের একটি নামকরা কাগজ।—'নিউ টাইমস অব বারমা' লিখেছে যে, পাকিস্তান সরকারের এই অবিবেচনা-মূলক কাজ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধিতাকে আরও তীব্র ক'রে তুলবে। এই কাজের ফলে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা মোটেই বাড়বে না। জাপানের একখানা কাগজে লিখেছে যে পাকিস্তানকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে ঢাকার অনেকগুলি দাবি মেনে নিতেই হবে—যাতে পূর্ববাংলার লোকরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতায় বাস করাকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল মনে করতে পারে। ইরাকের নানা কাগজে এ সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে। একখানা কাগজে লিখেছে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ভাবে নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে পারে, তা হলে নির্বাচনের মূল্য কি? আর এক-খানা কাগজে লিখেছে, মন্ত্রীসভাকে এই ভাবে বরখাস্ত করার ফল যে কি হবে তা অনুমান করা কঠিন; তবে করাচীর আদেশে পূর্ববাংলার লোক সহজে দমিত হবে এ আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

এ সম্বন্ধে বৈদেশিক মতামত আর বেশী উল্লেখ করতে চাই না। আমরা এটা স্বীকার করি পাকিস্তান আজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, তার আভ্যন্তরীণ কাজ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়। কিন্তু এমন অনেক আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঘটতে পারে যার প্রতিক্রিয়া আমাদের রাষ্ট্রেও অনুভব করতে হয়। পূর্ববাংলায় আজ যা ঘটছে

তার অনেকটা সেই শ্রেণীর। ইতিমধ্যেই পূর্ববাংলা থেকে বহু লোক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আসতে আরম্ভ করেছে। অন্যান্যবার কেবল হিন্দু উদ্বাস্তু আসত, এবারে মুসলমান উদ্বাস্তুও আসবে—এমন অবস্থার সৃষ্টি পূর্ববাংলায় হয়েছে। তাছাড়াও পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে একটি রক্তের সম্পর্ক আছে তা ভুলে যাওয়া দুই অঞ্চলের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ববাংলার সম্পর্কে আমরা একেবারে নির্বিকার থাকতে পারব—এমনটি আমরা করি না। পশ্চিম বাংলার লোক এবং হয়তো বা ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলের লোক শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় পূর্ববাংলার ঘটনা সমূহ নিরীক্ষণ করছে। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক স্থায়ী রাষ্ট্র স্থাপিত হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা শান্তিতে ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে এই আমরা চাই। এর প্রতিকূল অবস্থা স্বভাবতই আমাদের শঙ্কিত করে তোলে।

পাট অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট

কিছুদিন আগে ভারতীয় পার্লামেন্টে কাঁচা পাট-চাষীদের নিয়ে—অনেক বিতর্ক ও আলোচনা চলছিল। গত ক'বছর যাবৎ পাট-চাষীরা প্রায়ই পাটের জন্য উপযুক্ত দাম পেত না। অথচ কাঁচাপাটের অভাবে যখন ভারতবর্ষ পাকিস্তানের কৃপার উপর নির্ভর করছিল, তখন পাটচাষীরা এই অভাব মোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে জাতির সেবা করেছে। ভারত বিভাগের বা বঙ্গ বিভাগের ফলে কাঁচা পাটের যোগান ভারতবর্ষে অত্যন্ত কমে গেল। মাত্র ১৩ লক্ষ গাঁট পাট ভারতবর্ষে উৎপন্ন হত। ১৯৪২-৪৩ সালে পাট-চাষীদের চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে ৪৭ লক্ষ গাঁট ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়েছিল। অথচ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যে দরে পাট বিক্রি করতে হয়েছে, তাতে পাট উৎপন্ন করবার খরচও অনেক সময় পোষায় নি। ১৯৪১ সালে শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ প্রথমে পার্লামেন্টে এ বিষয় উত্থাপন করেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন সভ্য এই ব্যাপার নিয়ে বার বার পার্লামেন্টে আলোচনার চেষ্টা করেন। তখন সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে—এই জন্য একটী অনুসন্ধান কমিটি তারা নিযুক্ত করবে। গত বছর আগষ্ট মাসে এই অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়।

এই অনুসন্ধান কমিটির গঠন সম্বন্ধে বাংলাদেশ বা উড়িষ্যা আসাম, বিহার অর্থাৎ যে কয়টী প্রদেশে পাট উৎপন্ন হয় তারা কেউ খুসী হতে পারে নি। এইসব প্রদেশের কোন লোক বা পাটচাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন লোক এই কমিটিতে ছিল না; এবং কমিটির গঠন ও আলোচ্য বিষয়ের তালিকা দেখে এমন সন্দেহ লোকের মনে জেগেছিল যে এই কমিটি পাট চাষীদের স্বার্থের চেয়ে হয়ত বা পাটকল-ওয়ালাদের স্বার্থই বেশী দেখবে। পাটের ইণ্ডাষ্ট্রী ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য পাট-উৎপন্ন দ্রব্যই এতদিন প্রধান পণ্য ছিল। তা ছাড়া কাঁচা পাটের বাজার ও দর নির্ভর করে পাট-উৎপন্ন তৈরি মালের চাহিদার উপর। সেদিক থেকে পাট ইণ্ডাষ্ট্রীজ বা পাটকলের স্বার্থ দেখা খুব অনুচিত বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু তবুও দর ইণ্ডাষ্ট্রীর গোড়া হল কাঁচা পাট ও তার উৎপাদক পাটচাষীগণ;—তা ভুলে যাওয়া অনুচিত। আমরা এখানে কাঁচা পাট ও পাটচাষীদের বিষয়েই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখব।

অনুসন্ধান কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত পাটচাষীরা উপযুক্ত মূল্য অর্থাৎ খরচ পোষাবার মত মূল্যও অনেক সময় পায় নি। এই কমিটির মতে ভাল এক মণ পাটের মূল্য বাবদ চাষীদের অন্ততঃ ২০৲ টাকা পাওয়া উচিত। কলিকাতার কলে এক মণ পাট আনার খরচ ৫৲ টাকা এবং দালালদের মুনাফা মণ প্রতি ২৲ টাকা করে ধরলে সর্বোৎকৃষ্ট পাটের দর কলকাতার বাজারে বা মিলের দরজায় ২৭৲ টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময়েই মিলওয়ালা-গণ এর চেয়ে কম দরে পাট কিনেছে। দালালদের লাভ এবং পাট আনবার রেলের ভাড়া তাতে ক্ষুণ্ণ

হয়নি ; ক্ষুণ্ণ হয়েছে কেবলমাত্র চাষীদের প্রাপ্য টাকা।

কমিটি আরও স্বীকার করেছে যে পাট চাষীগণ অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত এবং অত্যন্ত উচ্চহারের সুদে এদের ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কমিটি সুপারিশ করেছে যে প্রাদেশিক সরকারের উচিত সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করে আইন পাশ করা। কমিটি বলেছে যে চাষীদের পক্ষে কাঁচা পাট বিক্রির অবস্থা ও পদ্ধতি প্রাচীনকালের মতোই রয়েছে : পাটের বাজারে পাট ওজনের তৌলের কোন স্থির মান নেই ; অনেক সময়ে তাদের ওজন কিছুটা বেশী থাকে। তাতে প্রতি মণে এরা কিছু বেশী পাট নেয়। কৃষকগণ পাট ধরে রাখতে পারে না ; তাই দালালদের খুসীমতোই পাট বিক্রি করতে হয়। দাদন ও বুন্তি বাবদ অনেক টাকা দালালরা কেটে নেয়। চাষকগণ কলকাতা গিয়ে মিলের কাছে পাট বিক্রি করতে পারে না। কলকাতার মিল মালিকরা যে দরে পাট কেনে তার থেকে অনেক কম দর এরা গ্রামে বসে পায়। এর মধ্যে দালালদের লাভ এবং পাট আনার জন্য যানবাহনের ভাড়া ধরা হয়। এই কমিটি মনে করে যে রেলের বা ষ্টীমারের ভাড়া অত্যন্ত বেশি, এবং যানবাহনের অন্য প্রকার অসুবিধাও আছে।

কৃষকদের অসুবিধার দিক থেকে এ সব কথা স্বীকার করেও, তা দূর করবার জন্য কমিটি খুব বিশেষ কিছু সুপারিশ করেছে বলে আমরা মনে করতে পারি না। কাঁচা পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করার দাবী বহুবার পার্লামেন্টে উঠেছে, কিন্তু এই কমিটি কাঁচা পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করা সমর্থন করে নি। আমরা স্বীকার করি যে কাঁচা পাটের মূল্য অনেকটা নির্ধারিত হয় পাট উৎপন্ন দ্রব্যের বিদেশী চাহিদার উপর এবং এখন পূর্বের মতো কাঁচা পাট ও পাট উৎপন্ন দ্রব্যে আমাদের একচেটিয়া অধিকার নেই। কাজেই সরকারী হুকুম দিয়ে তার মূল্য নির্ধারণ খুব সহজ নয়। তবুও মিল মালিক ও দালালদের যোগাযোগে কাঁচা পাটের মূল্য অনেক সময়ে অন্যায় ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তা রোধ করবার জন্য এ কমিটী বিশেষ কোন সুপারিশ করে নি। যে কারণে এরা অতিরিক্ত সুদের হারে ঋণ করতে বাধ্য হয়, ঠিক সেই কারণেই এরা যে কোন মূল্যে কাঁচা পাট বিক্রি করতে বাধ্য হয় ; অর্থাৎ কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মিল মালিকগণ ও দালালগণ তাদের প্রাপ্য মূল্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে। তার জন্য পাট ক্রয় বিক্রয়ের এবং উপযুক্ত হারে কৃষকদের ঋণ দেবার সুব্যবস্থা করা উচিত। এ সম্বন্ধে কমিটি সুপারিশ করেছে যে প্রধান প্রধান পাট উৎপাদন কেন্দ্রে পাটের নিয়ন্ত্রিত বাজার (regulated market) স্থাপন করা উচিত এবং এমনি প্রত্যেক বাজারে পাটের গুদামও রাখতে হবে। কমিটি আরও সুপারিশ করেছে যে চাষীদের সুবিধার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করা উচিত। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও উদ্যোগ ব্যতীত—এ সব কতখানি কার্যকরী হবে এসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কমিটি সুপারিশ করেছে পাট হলো কাঁচা মাল সুতরাং এর উপর ক্রয় কর বা অন্য রকম শুল্ক বসানো উচিত হবে না।

আমরা বর্তমানে আমাদের আলোচনা কাঁচা পাট ও কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলাম ; তাও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলাম না। আমরা আশা করি এই কমিটি কাঁচা পাট ও চাষীদের জন্য যে সুপারিশ করেছে তা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারেরা কাজে পরিণত করবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মঞ্জিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

১। জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষার, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

২। রূপকথা ২৲

বাবিলোনীয় উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটী সরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুধীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী—বসুমতী।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২৷৷০

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসহ। সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির প্রাঞ্জল ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। যদিও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে। বিষয়বস্তুতে, ভাষার সরসতায়, চিত্রে ও প্রচ্ছদপটের পারিপাট্যে পুস্তকখানি অপূর্ব ও মনোজ্ঞ। বাংলা ভাষায় ইহার সমতুল্য কোন পুস্তক নাই। মূল্য—২৷৷০

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —যুগান্ত

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুশ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বহুদিন বাদে ফুরিয়ে যাওয়া একখানা দুষ্প্রাপ্য বই আবার পাওয়া যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২৲

—মরেন রায়—

বাঙলার ভুলে যাওয়া যুগের এক অগ্নিময় কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সৈন্যদের সত্যকার ইতিহাস।

সরস্বতী লাইব্রেরী ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিনামূল্যে সুন্দর একখানি পুস্তক তালিকার জন্য আজই লিখুন।

সপ্তদশ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৬১ | তৃতীয় সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'ধর্মতত্ত্বে' যাহা তত্ত্বাকারে বিবৃত, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহারই মূর্ত প্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। "তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।"

শ্রীকৃষ্ণ এই অনুশীলন-ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যাঁহাদের জীবনে এই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা নাই, তাঁহারা মহৎ হইলেও সর্বসাধারণের অনুসরণযোগ্য নহেন। জনক, নারদ, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম—ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত পুরুষ।

"যীশু ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণ-বিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতে সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে।...কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর চিরন্তন আর এক আদর্শ আছে...তাঁহার তুল্য মহাচরিত্রসম্পন্ন চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় (ধর্মতত্ত্ব) এই আদর্শ মানবই শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁহারই চরিত্রব্যাখ্যান।

কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে অনেক গুরুতর এবং ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বঙ্কিম এই সমস্ত মলীক কাহিনীজাল ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণের প্রকৃত রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে পাশ্চাত্য ইতিহাস-রচনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে; অর্থাৎ কেবলমাত্র ভাবাত্মক আলোচনা না করিয়া তথ্য প্রমাণ সংবলিত বৈজ্ঞানিক রীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ফলে, যাঁহারা শাস্ত্রনামে যাহা-কিছু প্রচলিত তাহাই নির্বিচারে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অনেকে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্কিম তাহাতে বিচলিত হন নাই। তিনি নির্ভয়ে যুক্তিদ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্রের সূচনায় তিনি বলিয়াছেন, "কৃষ্ণসম্বন্ধে যে-সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাসকার-কৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহা অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র, অতিশয় মহৎ।"

যুক্তিদ্বারাই তিনি ঐ সব গল্পকে অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, শুধু ভাবপ্রবণতা বশে ঐরূপ উক্তি করেন নাই।

(২)

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার উপাদান হিসাবে বঙ্কিম মহাভারত, হরিবংশ এবং আঠারোখানি পুরাণ অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে মহাভারত সর্বপ্রাচীন। সুতরাং তাহারই উপর বঙ্কিমের প্রধান নির্ভর। কিন্তু এই গ্রন্থের অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত। সেজন্য কোন্ অংশ মৌলিক রচনা, কোন্ অংশ প্রক্ষেপ, তাহা স্থির করিয়া তাঁহাকে বিচারের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

পাণ্ডবগণ এবং কৃষ্ণকে তিনি কাল্পনিক মানব বলিয়া মনে করেন না। গ্রন্থারম্ভেই তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মত আলোচনা করিয়া উঁহাদের ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বিচারকালে তিনি সর্বত্র "প্রক্ষিপ্ত, অতিপ্রকৃত এবং বিশ্বাসের অযোগ্য" অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতও তিনি এই প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন এবং গ্রহণযোগ্য অংশ গ্রহণ ও যুক্তিবিরুদ্ধ অংশ বর্জন করিয়াছেন।

কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের অনেক অলৌকিক লীলা তিনি মহাভারতের পরবর্তী যুগে কল্পিত এবং কোন কোন স্থানে রূপক বলিয়া মনে করিয়াছেন। যমলার্জুনভঙ্গ, বৎসাসুর বধ, বকাসুরবধ, অঘাসুরবধ, কালীয়দমন, এ-সবের রূপক তাৎপর্য তিনি স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গোপীদিগের সহিত ক্রীড়ার কথা মহাভারতে নাই, ভাগবতে আছে। ভাগবতের বর্ণনাও কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ক্রীড়া ও নৃত্য করিয়াছেন, এই উল্লেখই সেখানে পাই। ইহা নির্দোষ আনন্দ মাত্র—"ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই।" 'রতি' শব্দের ব্যবহার ভাগবতে আছে বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে উহার মূল অর্থ 'খেলা' এবং সেই অর্থে উহার প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রচুর। এরূপ খেলাধূলা ও নাচ বোধ হয় কৃষ্ণের সময়ে দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। এরূপ ক্রীড়া ও নৃত্য এখনও বহু দেশে প্রচলিত। তদ্ব্যতিরিক্ত ভক্ত ও ভগবানের আনন্দ-লীলা অর্থেও এ কাহিনীকে গ্রহণ করা চলে। 'হরিবংশে' রাসলীলার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘুভাবাপন্ন। উহা কবির স্বাধীন কল্পনা-বিলাস। গোপীগণের বস্ত্রহরণ কাহিনীও, বঙ্কিমের মতে, "পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র।" পুরাণকার উপন্যাস আকারে ঈশ্বরপ্রাপ্তির ও মুক্তজীবনের আনন্দকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, অল্পবুদ্ধি লোকেরা বুঝিতে না পারিয়া তাহার আপাত অর্থকেই গ্রহণ করে।

শ্রীরাধার উল্লেখ ভাগবতে নাই, তাঁহার নাম প্রথমে পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। সেখানে তিনি আদর্শ-রূপিনী গোপী, কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্রে তিনি মূল প্রকৃতি স্বরূপা, তিনি মানবী নহেন, তিনি প্রতীক।

(৩)

কর্মকাণ্ডে আসিয়া আমরা ঐতিহাসিক কৃষ্ণের বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় পাই। ধর্মার্থ তিনি কংসবধ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার স্বার্থ ছিলনা। তিনি বলবান্, কর্মনিপুণ, পরহিতব্রত, তাই কংসরাজ্য আপনি ভোগ না করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

জীবোন্নতির তথা ধর্মের মূল উপায় শিক্ষা। বেদ-বেদান্তে, শাস্ত্রে ও শস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহার উল্লেখ মহাভারতে ও পুরাণকাহিনীতে আছে। তাঁহার রাজনীতিজ্ঞান এবং বৃথা মনুষ্যহত্যার বিরাগ মহাভারতের অরাসন্ধবধ পর্বাধ্যায়ে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বহুবিবাহকাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র অমূলক বলিয়া মনে করেন। স্যমন্তক মণি পাইয়া অমনি কেহ কন্যাদান করিল অথবা একা নরক রাজার ষোল হাজার মেয়ে, এসব নিতান্তই গল্প। চরিত্রালোচনায় এ সকল উল্লেখেরই যোগ্য নহে।

খাণ্ডবদাহ এবং রাজসভা নির্মাণ ধর্মরাজ্য স্থাপনের ভূমিকা। জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণকে দমন করিয়া কৃষ্ণ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও ইহারই উদ্দেশ্য। বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের নিয়ন্তা। তাঁহারই উদ্দেশ্য এবং কৌশল সর্বত্র জয়ী হইয়াছে।

জগতের আদর্শ মানব যুদ্ধে নামিয়া চাতুর্য অবলম্বন করিয়াছেন, লোকক্ষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন, দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহার মহিমার সন্নিধান হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার গৌরব হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বঙ্কিম মনে করেন নাই। সত্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণাপূর্বক কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।...সত্য বাক্য প্রয়োগ ক'রাই কর্তব্য। কিন্তু যেখানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ দোষাবহ নহে।"..."ধর্ম প্রাণীদিগকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম।"

এইদিক্ দিয়া দেখিলে প্রাণিগণের রক্ষার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বিত উপায় আবশ্যক হইয়াছিল, বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞা পাশ্চাত্য হিতবাদিগণের সংজ্ঞার বিরোধী নহে। বঙ্কিম তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ। কথাটায় এখনকার হর্বর্ট স্পেন্সর, বেন্থাম, মিল্ ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোনপ্রকার অমত করিবেন না জানি।"

কৃষ্ণ-কথিত সত্য-তত্ত্বের বঙ্কিম এইরূপ করিয়াছেন :

"১। যাহা ধর্মানুমোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য, যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।"

অহিংসা পরম ধর্ম, এরূপ উক্তি গীতায় আছে। অথচ, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে উৎসাহদাতারূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই। ইহার অর্থ কি? বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণবাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম।" নচেৎ হিংসাকারী নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে। বরং পরম ধর্ম।" কৃষ্ণোক্ত বলাকের কাহিনীদ্বারাও এই মত হয়। সনন্দিত বলাক-নামক ব্যাধ হিংসাকারীর হিংসা করিয়াই পুণ্য অর্জন করিয়াছিল।

৪

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলেন। অতঃপর যদুবংশধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ। এইরূপে সমগ্র কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করিয়া বঙ্কিম উপসংহারে বলিতেছেন, "সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ (১) প্রাচীন কুসংস্কারের নিরসন (২) সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান।...যে যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আমার যতদূর সাধ্য ততদূর আমি গড়িলাম।"

বঙ্কিম-বর্ণিত কৃষ্ণ দৈহিক বলে বলবান্; তাঁহার জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকল চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত কার্যকারিণী বৃত্তিরও পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। অর্থাৎ মানবীয় সকল সদ্‌গুণে তাঁহার জীবন বিভূষিত। অতএব তিনি সর্বমানবের অনুসরণীয় মহামানব।

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল মত সর্বজন গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি যে নিপুণ পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অনুধাবনশক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দুর্লভ; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মোহিতলালের পত্র (৩)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

৩৮, নীলক্ষেত রোড
রমনা, ঢাকা
১লা কার্ত্তিক ১৩৩৬।

শ্রীতিভাজনেষু—

আপনার পত্র ও কবিতা 'মহাকাল' পাইলাম। কবিতাটিতে ভাষা ও ছন্দের সংযম শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য ফুটিয়াছে। প্রথম Stanza'র শেষ ছত্রটি ভালো হইয়াছে। 'নৌনতা' ব্যাকরণবিরুদ্ধ, 'উৎকর্ষতা'র মত। আশা হয়, কাব্যসাধনায় ব্রতী হইলে আপনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। আপনার কল্পনার ambition আছে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আপনার হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ ও সচেতন হইবে, ততই আপনার কবিতায় সৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে।...

'সাহিত্য ও জীবন' সম্বন্ধে আপনি যেকথা বলিতে চান তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তবে কথাটা খুব গম্ভীর—এ সমস্যা সম্যকরূপে সমাধান করিতে হইলে নিখিল কাব্যকলা এবং যুগেযুগে তাহার বিচিত্র বিকাশের সন্ধান করিতে হইবে—Nature ও Art, Life ও Poetry, Particular ও Universal, Abstract ও Concrete—এইরূপ যত দ্বন্দ্ব মানুষের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে উভয়ের সমন্বয়-মূলক একটা তত্ত্ব বুঝিয়া বুঝাইতে হইবে। Subjective ও Objective—Real ও Ideal এর দ্বন্দ্ব কেমন করিয়া রসসৃষ্টিতে মিলাইয়া যায়—Fact ও Truth—Perception ও Imagination—এ দুইয়ের কোন্‌টা বড় এবং কেন? সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ কি? কাব্য সৃষ্টিতে যে সত্যের উপলব্ধি হয় রসচেতনায়—সে সত্যের মূল্য কি? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব জীবন ও জগৎকে যেভাবে উপস্থিত করে—কাব্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র—ইহা কাব্যের গৌরব না অগৌরব? জীবন ও জগৎরহস্যের চরমতম উপলব্ধি কাব্যেই সম্ভব। অতএব উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ কি? কাব্য জীবনেরই নিগূঢ় ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, জীবনের সঙ্গে কাব্যের এই সম্বন্ধ কোন্‌খানে? কাব্যকে জীবনধর্ম বলে—কবিকল্পনা এই জীবনধর্মের অনুসরণ করে কোন্ অর্থে ও কিভাবে? সৌন্দর্য ও সত্য—এই দুই তত্ত্বের সমন্বয় হয় কাব্যে। Imagination নামক যে দৈবীশক্তি, তাহার authenticity কোথায়? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের দ্বারা সাহিত্য ও জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থির করা দরকার। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বহু চিন্তা ও মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বড় বড় কবি ও সমালোচক এই দুরূহ সমস্যার নানারূপ মীমাংসা করিয়াছেন, আধুনিক য়ুরোপে এবিষয়ে অতি অপূর্ব আলোচনা চলিয়াছে।

আপনি শনিবারের চিঠি'তে (গত বৎসরের সকল সংখ্যা—ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) এবিষয়ে আমার বহু আলোচনা দেখিতে পাইবেন। বিশেষ করিয়া 'কাব্য ও জীবন' নামে দুই সংখ্যায় সমাপ্ত যে দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল সেইটি আপনাকে পড়িয়া দেখিতে বলি। এ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে কিঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্কও আছে।

আশা করি, কুশলে আছেন! আমার বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন লইবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

প্রশান্ত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পুনরাবৃত্তি]

নারাণ খাঁ কালী প্রসাদের হাতটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে দিলে না। কেমন অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগল—কাঁধে হাত দেবার মত লোক সে নয়! ইয়ার বন্ধু কি পেয়ার সে নয়ও বাবুদের। হঠাৎ এ আন্তরিকতা শোভা তো পায়ই না, উপরন্তু সন্দেহ জনক। মাঝে এতটা ঘাটো সে ভাবতে পারে না বাবুদের।

হাতের চাপটা কালী প্রসাদ শক্ত করে দেয়। খানিক চুপ করে থেকে বলে, কি রাজী তো?

আশ্চর্য, এই কাঁধে হাত দেওয়া ব্যাপারটা নিয়ে যতটা আশ্চর্য নারাণ হয় তার সিকি বুঝি কালীপ্রসাদ হয় না। এমন কি ঘটনা যার জন্যে অবাক হতে হ'বে! কেবল কি সমানে সমানেই কাঁধে হাত দেয়, গলাগলি করে, আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়—অসমান মৈত্রী বন্ধন কি কখনো হয় না?

চুপ করে' থেকে নারাণ বললে, কি বলি বলুন সিকি আমাদের তো এই অবস্থা—জানেন তো সব! সামলাতে পারবো না।

কালীপ্রসাদ পিছন ফিরে চাইলে। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে নারাণকে। হঠাৎ চোখদুটো তার আটকে গেল নারাণের মাথার ওপর। মুসলমান পাড়ার সব গৃহস্থের এক অবস্থা—চালে খড় নেই কারো।

নারাণেরও তাই। বিলিয়ে দিলেও এরা রাখতে পারবে না। বিপদে কোন উপকারই হ'বে না এদের দিয়ে। ডুবন্ত লোকের কুটী ভরসা!

কালীপ্রসাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে' নারাণ বললে, কি দেখচেন? আমাদের ওপর আশা করবেন না বাবু, আমরা একেবারে হীন হ'য়ে গেইচি!

কথাটার মধ্যে শ্লেষ ছিল কিনা কে জানে। কালীপ্রসাদ চুপ করে থাকে, বড় ছোট মনে হয় নিজেকে। হীন! হীন!

সোজা কথা আজ কেউ বলে না। ইচ্ছে করে—

ইচ্ছের সে রূপটা আজ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা যায় না—অবাধ্য প্রজাকে জব্দ করা, বশে আনা তখন মাত্র মুখের কথা ছিল—বাঁশগাড়ি, পিছ-মোড়া, উঠোন-চসা উঠতে বসতে। বনের বাঘ জব্দ হয় আর প্রজা জব্দ হয় না! আর ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতো ঐ নারাণের পিতামহ নাজির খাঁ। তার উঁচুলে বিছে রঙ-এর তেলপাকান সাড়ে সাতহাত লাঠিটার হাঁক-ডাক, দাপট ছিল খুব। কেবল হুকুমের অপেক্ষা! বাবুদের জন্যে জান কবুল করেছিল নাজির।

তারই বংশধর আজ কেমন ধারা কথা কইছে—এক পুরুষের তফাতে কত দূর হ'য়ে গেছে। হুকুমের বদলে আজ খোসামোদ করলেও গলে না, যেন মজা ক'রছে সব!

প্রকৃত ইচ্ছে দমন করে' কালীপ্রসাদ বললে, হীন তা কি! তোমরা যদি রাজি হও তার ব্যবস্থা করবো। যে ক'বেটা লাফাচ্ছে সব কটার ঠ্যাং ভেঙে দিই—যেমনকে তেমন! আগাম বিলি নাই হ'লো এবছরটা চাও তো সব মেহেরবানী করলুতী করে দোব! ও বেটাদের চোরপুট্টি ভাঙবো।

আবার বোধ হয় হাত ধরতে গেল কালীপ্রসাদ। নারাণ থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ বলে বসল, কি দরকার বাবু বিবাদ করে! মিটিয়ে ফেলান না!

কালীপ্রসাদের প্রসারিত হাতটা সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। বেটার স্পর্দ্ধা কি! মিটিয়ে ফেলতে বলে! যেন ওর দ্বারস্থ হ'য়েছি বিপদে পড়ে। সব শালা বেড়ে উঠেছে!

আগের হ'লে অমৌক্তিক কথা কেউ আর শেষ না—পায়ের জুতো হাতে, চোরের মুখ-পিটে, মেয়েমিটি মীমাংসা তারও পরে।

খুব বেশি দিনের কথা নয়—কালীপ্রসাদ তখনো লুকিয়ে চুরিয়ে গোলাবাড়িতে বসে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে তামাক খায়। বৈঠকখানায় বসবার সময় হয়নি।

ঠিক এমনি সময়, বাক-ক্লান্ত দুপুর, হঠাৎ একটা শব্দ উঠলো বৈঠকখানা বাড়িতে। কালী এসে দেখলে, কোটাল ডাক্তার বিনোদ হালদারের পিছন পিছন ন'সেও কাকা জুতো তুলে হামার পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। বোধ হয় আগে খা করতে হ'য়ে গেছে।

কি ব্যাপার? বিনোদ নাকি কার হয়ে খাজনা মকুব করাবার কথা বলতে এসেছিল—হারামজাদা শয়তান এখন হাতে পানি পায়নি তাই বিনোদকে ধরেছে। কাকার রাগ সেই কারণে!

কাকা তখনও চেঁচাচ্ছিলেন, সে-শালা কোথায়? তুই তার হয়ে মুচ্ছুদ্দি সেজেচিস্! বালোলী নারায়ার জায়গা পাওনি, জুতিয়ে খাল খেঁচে দোব!

আর অপরাধ কি ছিল বিনোদের জানা যায়নি, শোনা যায়নি। ভূস্বামীর সামনে কাকুর হয়ে কথা বলাটা অপরাধের ছিল—বিশেষ করে যেখানে রেশারেশি 'কেইস-এর' ব্যাপার, ছোটর বড়র লড়ালড়ি!

কালীপ্রসাদ বললে, কেন তোমাকে ধরেছে নাকি? নারাণ বললে, না। আমাদের সঙ্গে ওনাদের সম্পর্কটা কি! বলচি এক গেরামের মধ্যে থাকি যখন, গণ্ডগোলটা করে লাভটা কি হ'বেক। সেই যখন বাবুদের না হ'লে তোদের চলবে না, আবার তোদের না হ'লে বাবুদের চলবে না!

গম্ভীর কণ্ঠে কালীপ্রসাদ বললে, শুনেচো ওদের বায়নাক্কা?

নারাণ চুপ করে থাকে। কিছু কিছু তার কানে এসেছে। জমার হার নিয়ে আড়াআড়ি।

তা বলে' বলতে চাও ওদের পায়ে ধরবো! যশাই যশাই করে' আধাকড়িতে বিলি করবো? কিনা গ্রাহক নেই! কেন? যেন মিটমাটের আলোচনাটা এখনি আরম্ভ হয়ে গেছে, কালীপ্রসাদ এই মারে কি সেই মারে!

নারাণ বললে, না, মিলিলে না হ'লে রাজী হ'বেন কেন! তা ব'লে মানী লোকের মান রাখবে না···সে কি কথা!

কথাগুলো কালীপ্রসাদের খুব ভাল লাগে না। কেমন যেন হীনমন্যতা আসে। কার কাছে আজ কি শুনতে হ'চ্ছে! পায়ে মাথায় সমান!

কালীপ্রসাদ হঠাৎ আত্মসচেতন হ'য়ে বললে, সে থাক্। তোমার কথাটা কি শুনি? ভাগচাষে জমি নেবে কি না বল! ও শালারা যা পারে করুক!

বুঝি কাঁপরে পড়ে নারাণ। এত সুবিধে তবু কত বাধা—কি বলবে ভেবে পায় না সে!

কালীপ্রসাদ বললে, কি! ভয় হ'চ্ছে? হেঁদুর ভয়!

নারাণ হঠাৎ কুব্জ দেহটা সোজা করে ডিমিড চোখটা পিট্ পিট্ করে' বললে ভয়? তা বলতি পারেন। নিজের কথা হ'লে বলতুম আপনাকে। কিন্তু বোঝেন তো আজকালকার ছেলেছোকরাদের—

কালীপ্রসাদ জিজ্ঞেস ক'রলে, তুমি ক' বিঘে করতে পার? মানে ভয়-ডর না করে'—

খোঁচাটা নারাণ বুঝতে পারে। বললে, ভয় তো আমাদের এখন সবখানে!···কারে কেলে কারে রাখি বুঝতে পারি না। আপনাদের দিকে হ'লে ওনারা রাগ ক'রবে আবার ওনাদের দিকে গেলে আপনাদের পোঁসা হ'বেন! সামলানই দায়! তাই বলি যেমন আছি তেমনি থাকি, কাজ কি ইসবের মধ্যি গিয়ে!

কালীপ্রসাদ বললে, তাই থাক! জাত ধর্ম তোমাদের যাবে কোথায়! বেইমান কাঁহাকার!

খাড়া হ'য়ে দাঁড়ায় নারাণ। তীর ছোড়ার মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, খবরদার বাবু! বেইমান আমরা?

ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কালীপ্রসাদ বললে, মারবে নাকি? বেইমান না তো কি!

বাবু! ভাল হ'বে না বলছি—নারায়ণের জ্বলতে থাকে!

আলবৎ বেইমান! নেমকহারামের বংশ সব! সাধু সাজবেন! চুপ্ পিছিয়ে যাও কালীপ্রসাদ।

হয়তো একটা বিপরীত কাণ্ডই ঘটে যেত তখন-তখন নারাণকে পিছন থেকে না ধরে ফেললে। মুসলমান পাড়ায় আরো ক'জন ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলে চেঁচামেচিতে! নারাণ নিজেকে সামলে নেয়।

কিন্তু কালীপ্রসাদের গর্জন থামে না, আহত মার্জারের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করতে থাকে। নারাণকে যে ধরেছিল, সে বোঝাতে চাইলে হাত জোড় করে বাবুর মাপ্ত রেখে—ছোটবাবু, ছাড়ান দিন। দেখছেন চাচা আমাদের বুড়ো হ'য়েছেন—

সত্যিই বুড়ো হয়েছে নারাণ সেখ। কালীপ্রসাদের বাবার বয়স হ'লেও হ'তে পারে। রক্তের তেজ কমেছে তাই। না হ'লে এতক্ষণে ফাটাফাটি রক্তারক্তি কাণ্ড যেত একটা—তা বাবুই জানে কে, পীরই বা জানে কে

ঠকুনের গোলামী ছেড়েছে তারা অনেককাল। মনিবের নুনেই পেটে করে। কথার মত হ'বে কেন! এককালে লাঠি ওদের জন্যে ধরেছিল বলে সেই লাঠি যে কালচক্রে ওদেরই মাথায় বাজবে না তার ঠিক কি! বাবু আছেন, বাবুর মত থাকুন! তাদের ঘাটান কেন!

উত্তেজনা বুঝি তখনো কাটেনি নারাণের। লাঠি টানতে টানতে বললে, যান বাবু যান! বেশী বকবেন না। আপনাদের চেনতে আমার বাকী নেই। পারেন আপনারা করেন—

কালীপ্রসাদ যেতে যেতে বললে, দেখতে কাল—ছোটলোকের বাড় ভাঙবো! বেইমানী ছাড়াবো সব বেটার।

নারাণ গলা ফাটিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, কইবেন ফের আপনারে বলছি—ভাল হবেন না! নারাণ খাঁ আজো লাঠি ধরতে পারে—

মারমুখো হ'য়ে কালীপ্রসাদ ছুটে আসবার আগেই আর সবাই তাকে একরকম পাঁজা কোলে ক'রে পাড়াটা পার ক'রে দিলে! (ক্রমশঃ)

যাযাবরী তুমি

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

যাযাবরী, তুমি উচ্ছল গান গাও
ফাল্গুন-বনে বসন্ত-ছলনা-ও
বুঝেছি, তবুও বুকের বীণা যে কাঁদে ;
হেসেছো, যেমন কণা হেসেছে চাঁদে ;
মনে পড়ে কত এসেছো যে বৈশাখে
শুনেছি সেদিন পাখিদেরো হাহাকার,
আর্ত্তির স্বরে চাপা দিয়ে ওই ফাঁকে
ডেকেছো জ্যোৎস্না, রুদ্ধ করেছো দ্বার।
চৈতালি দিনে দুচোখের অঞ্জন
মুছে দিলে এনে আকাশ-ঢাকানো ধূলি,
আশ্বিন মাঠে ফের মানভঞ্জন
করেছো, ধরেছো শস্যের শীষে তুলি।
শ্রাবণের মেঘা বাদলের ঝরো ঝর :
হে অভিসারিকা, উপান্ত-নীল চোখে
টেনেছো আগল, নীল কেতু নশ্বর
দেহ নিয়ে দীপ মেলেছে গভীর শোকে।
অঘ্রাণে তুলি হলুদী ফসল মাঠে
কথা কইবার কোথা ছিলো অবসর !
দক্ষিণায়নে সূর্য ডুবেছে,—ঘাটে
তখনো তোমার শুনেছি স্নিগ্ধ স্বর
আবারো ভ্রমরী, সেই নীতে গুঞ্জন
তুলেছো, কঠোর শ্রমের এসেছে রাত।
মধু মালতী গো স্বপ্নের ভুজঙ্গ
ভুলে গিয়ে তুলি উত্তাপহীন হাত।
হে বন হংসী, মেলবে কোথায় ডানা,
কুয়াশার স্বরে ক্লান্ত অমরাবতী !
তবু ও তোমাকে কবুবো না জেনো, মানা ;
ছন্দবিহীনা, টেনো না অজানা যতি।
চোখ রোশনাই জেলেও দেখাবো পথ
ঘনির তিমিরে, কি ক্ষতি তোমার বলো ?
আরো কিছুদিন আমার ভবিষ্যৎ
জেনে নিতে দাও, মাতাবিনী, আগে চলো।

নব জাতক

বাসুদেব দত্তরায়

সংকল্পের বাঁকা তলোয়ার আঁকা আমার অন্তরে
আমার অন্তরে অনুভব করি
চেতনার বিস্মিত বেদনা
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে শুনি
নব সূর্যের কামনা।
আমার নব সূর্যের জন্ম মুক্তি সাগরে
আমার নবসূর্য বাঁচবে মুক্ত বাতাসে
জরা মৃত্যুর দিক্ চক্রবাল রেখা পার হয়ে
অব্যক্ত আনন্দ ঝংকারে।
হে চেতনা বিহীন আকাশের নীলসূর্য
তোমার আয়তন কত ক্ষুদ্র আমার নবজাতকের কাছে
মানব কল্যাণে প্রদীপ্ত আমার সূর্য
যেন আফ্রিকার ঘুমন্ত খনিতে
জীবন্ত হীরক খণ্ড।

ামমোহন-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বর্তমান ভারতীয় ও বাঙ্গালী
ভাবান্বিত করিয়াছে। তাঁহাদের
ধ্যে উক্ত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃঃ নিজের মাতৃভূমিতে
রাজ্যে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে
ন ঐ বৎসরের জুলাই-আগষ্ট
নামক ইংরেজী গুজরাটি দ্বৈ-মাসিক
বন্ধ লিখেন। এক পর্যায়ের উপাধি
for old", পুরাতন প্রদীপের
র ৭টি প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু ছিল—
"Renaissance in
ম্পাদক ছিলেন অরবিন্দের
র সতীর্থ দেশপাণ্ডে।
বেদন-নিবেদনের ব্যর্থতা
। এই সত্য স্বীকার
n Fein সিন্ ফেইন
তার বহু পূর্ব হইতে
বেদনের থালা বহিয়া
মানসিক গ্লানির কথা

ভারতবর্ষের নব-জাগরণ
ন্ধাবলী আরও অধিক
ছ ছিল। তিনি এই
নেতা পার্নেলের সমর্থক
সেই নীতি আইনানুগ
র্ম-পদ্ধতির সংমিশ্রণ।
অরবিন্দ জীবনীতে এই
ংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।
ণ প্রবন্ধে অরবিন্দ
দিলেন আমাদের এক

নূতন ধর্ম, বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র—মধুসূদন দিলে
নূতন গদ্য ও পদ্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বা
ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র রামমোহন প্রবর্তিত নব-জাগরণে
পরিপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার, রামচ
বিদ্যাবাগীশ "তত্ত্ব-বোধিনী" পত্রিকার সাহায্যে এই ন
জাগরণের ভারত-ব্যাপী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন
শ্রীযোগানন্দ দাস ও শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ে
পুস্তকাবলীতে পাঠ করিয়াছি যে এই পত্রিকা ৪।৫-
ভাষায়—বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তেলেগু, তামিল ভাষায়
ছাপা হইত।

স্বামী বিবেকানন্দ

। একটী কথা বলিতে চাই। একটা ধারণা
যে অরবিন্দ বাংলা ভাষা জানিতেন না.
রার মহাশয় যতদিন তাঁকে সেই ভাষা-
; অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অরবিন্দ না
। ভাষা. না জানিতেন মাতৃভাষার কথা:

পূর্বদিনের বৈকালে
দায়িত্ব স্বীকার করেন। এবং
তাঁর প্রথম প্রবন্ধের উপাধি ছি
Three Phases"—জন মর্লি (ভ
তিনি) তাঁর ত্রি-মূর্তি বা তাঁ
ত্রি-ধারা।

আর একটি প্রবন্ধ কলিকা
বিশেষভাবে বিচলিত করে। প্র
"New Manchester on the H
তাঁরে বিলাতী কলকারখানার
চলিতেছে, তার ফলে আমাদের গ
শিল্প ছাড়া অর্থনীতির শিক
লেখক ছিলেন—চিত্তরঞ্জ
অন্তর হইলেও এসব স্মৃতি
বলিয়াছি যে রামমোহন
আলক। সুভাষচন্দ্র তাঁ
তাঁর নিজের জীবনে প্রতি
পৌর প্রতিষ্ঠানের
উৎসব উপলক্ষে ব
বিদ্রোহের নে

—অরবিন্দ

। কিন্তু, বাংলা দেশের [illegible]
ধারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে [illegible]
যে অরবিন্দ [illegible]

খৃষ্টে ব্রিটিশের দুর্গত মুলুক, গোলা বারুদে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক রার হাত ধরা হইয়া আছে আজ ৪০ বৎসর।

সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা, সুতরাং কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলিত করে নাই ; করিয়াছিল ৃত পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিয়া মার্কিনের সৈন্য-সামন্ত, তার বোমারু বিমান জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিল ৩ বৎসর। সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজও এই ক্রমণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে অনেক কু-অভ্যাসে ও সু-অভ্যাসে আমাদের জাতীয় জীবনে

সুভাষ চন্দ্র বসু

একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট লাভের পর আমরা পোষাক-পরিচ্ছ অনুকরণ করিতেছি, তৎ-পূর্বে আমরা যেন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডি যুগে ফিরিয়া গিয়াছি। দ্বিজেন্দ্র লা ধরণে কাশি, ফরাসী ধরণে হাসি" এই অবস্থা।

রামমোহন বিবেকানন্দ সুভাষচ একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁদের বিদ্রোহের ভাব বিদ্যমান। রাম জাতির দোষ-গুণের বি করেন যে হিন্দুগণ অত্য civilised) এবং ছুঁৎম গিয়া নিজের সমাজ করিয়াছে। ফলে, পদানত হইয়াছে। বিদ্রোহের অগ্নিমূর্তি। সেই ভাব প্রকাশ ক "নাচুক তাহাতে শ্যাম চঞ্চল করে। কয়েকটি প

বাজে ভেরী, বাজে ক
বীর দাপে কাঁপে
ঘোষে তোপ বব
বন্দুকের কড়ক
ধুম-ধুমে ভীম রণস্থ
অনল বমে শত জা
ফাটে গোলা, ল
কোথা আসোয়ার

"প্রবুদ্ধ ভারত" নাম কয় পংক্তি বিবেকানন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিলেও কখনই গান্ধিজীপ্রদর্শিত অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাস করেন নাই। এই সব ঘটনায় ব্রিটিশ সরকার দেশবন্ধুর সমগ্র সক্রিয় বাহিনীকে নানাস্থানে বন্দী করিলেন। তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্তা—সুভাষ-চন্দ্রকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এইরূপ নানা অভিজ্ঞতার ফলে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বিপ্লবীগণ কোনক্রমেই গান্ধিজীর আপোষ নীতি প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসহযোগ আন্দোলন হইতে আইন-অমান্য আন্দোলন; তারপর ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, এই সব নানা পরীক্ষার পর ১৯৪২ খৃঃ "ভারত ছাড়" "Quit India" আন্দোলনে ভারতবাসীর অন্তরের বাণী উচ্চারিত হয়।

অনামী

শ্রীকুমারকান্তি ঘোষ

বিকেলের রোদটুকু এসে পৌঁছয় না। সূর্য ডোবার অনেক আগেই আবছা অন্ধকারে ভ'রে যায় খালের পথ। বিল্ থেকে ফিরছে শেখর মাছ-ধরা সাংগ ক'রে। ছিপ্‌গুলো পাটাতনের ওপর ছড়ানো, গলুই-এর ওপরে ব'সে দু'হাতে লগি ঠেলে নৌকা চালাচ্ছে শেখর। সংগে আর কেউ নেই।

দু'ধার থেকে বাঁশের মাথা জলের ওপর হুইয়ে পড়ে। রোদের পথ আটকাতে বাঁশপাতাই যথেষ্ট, তার ওপরে আবার আছে হিজল আর জাওড়া গাছ, শিমুল আর ভারুল গাছ। অস্পষ্টতায় ভরা সব কিছু। হঠাৎ উলটো দিক থেকে হয়তো কোনো নৌকো আসে, বোঝা যায় যে নৌকো আসছে—কিন্তু দেখা যায় না—তখন ওই নৌকোর মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে—"যার যার হাতের বাঁয়ে!"

কলেজ সেরে এসে বিকেলে প্রত্যেকদিন ছিপ নিয়ে বেরোনো এখন অভ্যাসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে শেখরের। মাছ ধরাটা গৌণ—বাঁশ-ঘেরা জলরাশির বুকের ওপরে ভাসতে ওর কোনদিনই একঘেয়ে মনে হয় না। খাল দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই দেখা যায় বিরাট বিল—সূর্যের শেষ আভা অপরূপ শোভায় সাজিয়ে দেয় দিগন্তকে, ওধারের ছোটো-ছোটো সবুজ গাছপালার আবছা আবছা সারির মধ্যে মধ্যে দু'টো একটা তালগাছ দেখা যায়, মেঘের স্তর যেখানে এসে নানান রঙের দৃশ্যপট আঁকতে থাকে। স্বচ্ছ জলের প্রস্রবণ উৎস, মাঝে মাঝে প্রচুর শাঁপলা ফুটে আছে, সাদা ও লাল। নানারকমের পাখি এখানে ওখানে উড়ে বসে, চ'লে যায়, শব্দ ক'রে।—এই সুন্দর পরিবেশ শেখরের প্রাণের মধ্যে মিশে এক হয়ে গেছে! বিকেল হ'লেই বেরোতে হবে। জলের নিচে সূর্যের শেষ ছায়াটাও যখন তলিয়ে যায়, শেখর তখন বাড়ি ফেরে।

আজ একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির ক'রে বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যার দিকে ওর কয়েকজন বন্ধুর আসবার কথা তাই। খাল দিয়ে এগোতে সামনে পড়ে একটা জলা, তার ধার দিয়েই হ'ল শেখরের রাস্তা, বাঁদিকে জংলা জায়গা, কাছ দিয়েই পায়ে হাঁটার পথ। এইটাকে বলে উত্তর পাড়া। শেখরদের বাড়ি চল, দক্ষিণ পাড়ায়। দু'পাড়ার মাঝখানে শুধু একটা সরু খাল।

সামনে একটা কদমগাছ, কদমফুলে জায়গাটা আলো হ'য়ে আছে। আপন মনে শেখর নৌকো বেয়ে এগোচ্ছিল। একটু এগোতেই হঠাৎ শোনা গেল বুনো শুয়োরের ডাক, আর সেই সংগে এক নারীকণ্ঠের আর্তনাদ! এখানে আবার কোন মেয়েমানুষ আসতে পারে?—শেখর নৌকোর গতি তাড়াতাড়ি রোধ করল, একধারে মুখ ফিরিয়ে লাগালো ডাঙায়। ডাঙায় আর নামতে হ'ল না তাকে—দেখলো, একটা মেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়োচ্ছে। পরণে রঙীন শাড়ি, কাঁধের ওপাশে চুলের বেণীটুকো ছড়ানো। শেখরকে দেখতে পেয়েই মেয়েটা এদিকে দৌড়ে এলো, এসেই (নৌকোরই ওপরে) এক হাতে শাড়ির আঁচলটা ধরে লাফিয়ে উঠে পড়লো। অবাক হ'য়ে শেখর তাকিয়ে দেখছিল তাকে। ওপরে কদমফুল অজস্র ফুটে রয়েছে—এ মেয়েটাও যেন তার-ই একটি। মেয়েটা কিন্তু ভীত চোখে তীরের জংগলের দিকে একবার, শেখরের দিকে একবার তাকাচ্ছিল। শেখর জিজ্ঞেস করল,—"কী ব্যাপার?"

মেয়েটা কম্পিতকণ্ঠে বললো,—"শিগ্‌গির নৌকো ছাড়ুন আপনার—জংগলের মধ্যে বিরাট এক বুনো শুয়োর—আর একটু হ'লেই আমাকে ধরেছিল আর কী!" আর বলতে পারে না—গলা শুকিয়ে কাঠ

হ'য়ে গেছে। ত্রস্ত হাতে শেখর নৌকো ছেড়ে ডাঙার মাঝখানে নিয়ে গেল।

স্রোতহীন জলের ওপর নৌকো রইল গতিহীন। মাঝখানের পাটাতনের ওপর অতি সাবধানে মেয়েটা বসেছে। পায়ের সুন্দর স্যাণ্ডেলটা কাদায় মাখা হ'য়ে হ'য়ে গেছে। শাড়ির একধারটায়ও লেগেছে কাদা। সাদা ধবধবে কপালের দুপাশে কোঁটা কোঁটা ঘাম জমেছে। ডান হাতে আর বাঁ হাতে একগাছা ক'রে সোনার চুড়ি। গায়ে সাদা রঙের ব্লাউজ। সব মিলিয়ে যেন স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখর জিজ্ঞেস করল,—"আপনি এখানে এসেছিলেন কেন? কোন্ বাসায় থাকেন?"

এবার মেয়েটা শান্ত হ'য়েছে কিছুটা। বললো—"আর বলছেন কেন—আজ সকালে আমরা এসেছি কোলকাতা থেকে—ছুটির দিনকতক মামার বাড়িতে কাটিয়ে যাবার জন্যে। উত্তরপাড়ার বীরেশ বসু হ'লেন আমার মামা। সারাটা দিন ভালো লাগলো না—তাই একটু বেড়ানোর জন্য বেরিয়েছিলাম এই রাস্তায়। কিছুদূর এগোতেই দেখি ঠিক মাঝ রাস্তার ওপরে একটা শুয়োর শুয়ে আছে ওর বাচ্চা-টাচ্চা নিয়ে। কলকাতায় তো অনেক শুয়োরই দেখি—যেগুলো ড্রেন আর ডাষ্টবিন ছাড়া আর কিছু জানে না। তাই সাহস ক'রে যেই একটু এগিয়েছি—অমনি বাপরে কী লাফ আর চীৎকার! বাচ্চাগুলো চেঁচামেচি করতে লাগলো! আর এই অবসরে আমি দিলুম দৌড়—শেষে আপনার নৌকো পেলুম। নইলে যে কী হ'ত কে জানে!"

শেখর বললে, "যাক, অন্ততঃ একদিনের জন্য আমার নৌকাটা একটা পরোপকারের কাজ করতে পারলো। যাক্, আমি ধরে নিচ্ছি যে সম্প্রতি আপনি আর ও রাস্তা দিয়ে সান্ধ্যভ্রমণ করতে রাজি হবেন না—কাজেই আপনার আপত্তি না থাকলে আপনাকে আপনাদের বাড়ির ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসি!"

পূর্ণিমা চাঁদের মাধুরী-মাখা চোখে তাকিয়ে সে জবাব দিলো,—"আপনি কী আমাকে ওই জংগলে শুয়োরের হাতে প্রাণ খোয়াতে পরামর্শ দেন? পরোপকারের এ সুযোগটার যদি সদ্ব্যবহার করবার ইচ্ছে হয় তবে একটু কষ্ট ক'রেই দিয়ে আসুন আমায়!"

শেখর সহাস্যমুখে নৌকো ফেরালো। বীরেশ বসুদের বাড়ি বেশিদূরে নয়।

মেয়েটা নৌকোর সরঞ্জামগুলো সাগ্রহে দেখতে লাগলো। একধারে জল ফেলবার সেঁউতি, নৌকোর স্বল্প জলের মধ্যে পাঁচ ছটা লাল রঙের সাপলা ফুল, ছিপের গোড়া এসে পড়েছে একটা ফুলের পাপড়ির ওপর। নৌকোটার শুধু মাঝখানে পাটাতন দেওয়া, বাকি জায়গা খালি। মুখ তুলে বলল মেয়েটা, "আপনি যে এক বিরাট মৎস্য-শিকারী তার প্রমাণ রয়েছে অনেকে। ছিপগুলোর মধ্যে! আর মাছ না পেয়ে বুঝি ফুল নিয়ে এলেন?—এগুলো কী ফুল? কোথা থেকে এনেছেন?" প্রশ্নের জবাবের ভরসা না রেখেই সে নিচু হ'য়ে ফুলের পাপড়ির ওপর থেকে ছিপের গোড়টা সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু নৌকোর কাঁকিতে তাল রাখতে না পেরে নৌকোর জলের মধ্যে পড়ে গেল, দু'হাত দিয়ে কোনো রকমে টাল সামলে নিল।

শেখর ব্যগ্রভাবে বললো—"লাগলো বুঝি?"

মেয়েটা নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে স্মিতমুখে জবাব দিলো, "ব্যথা লাগে নি, তবে কিছুটা জল লেগেছে! যাঃ—ফুলটা একদম নষ্ট হ'য়ে গেল পায়ের চাপে—এই দেখুন"—ব'লে সাবধানে তুলে ধরল একটা সাপলা ফুল—স্যাণ্ডেলের চাপে দুমড়ে গেছে। শেখর বললো—"ওতে অবশ্য কিছু হয় নি—কারণ ওর দাম কিছুই নয়। আপনার দেখছি ফুলগুলোকে খুব ভালো লাগছে—কারণ আপনার পরিষ্কার শাড়িটার দুরবস্থা-ও ভুলে যাচ্ছেন!"

একটা ফুল হাতে তুলে মেয়েটা বললো—"আচ্ছা—এগুলোর নাম কী?"

শেখর জবাব দিলো,—"সাদা কথায়—লাল সাপলা। এগুলোর অভাব নেই এদিকে—একদিন যদি বিলে বেড়াতে যান—দেখবেন কতো ফুটে আছে!"

—"আপনি কি বিলে বেড়াতে গিয়েছিলেন একলা একলা?"

—"হ্যাঁ, শুধু বেড়াতে নয়, মাছ ধরতে-ও, তবে মাছ ধরাটা হয়নি, বেড়ানোটা হ'য়েছে। প্রত্যেক দিনই তো বেড়াতে যাই ওখানে—না গেলে মোটেই ভালো লাগে না!"

—"কোন্ রাস্তা দিয়ে যেতে হয়? এখান থেকে কতটা দূর—বেশি নয় বোধ হয়?"

—"এই খাল ছাড়া তো আর রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন না—কাজেই এখান দিয়েই যেতে হয়। মিনিট পনের-র পথ। আপনাদের বাড়ির সামনা দিয়েই তো রোজ যাই!—ওই দেখুন—কথা বলতে বলতে আপনাদের ঘাটে এসে গেছি।"

বাইরে লোকজন বিশেষ কেউ ছিলো না। মেয়েটা সাবধানে উঠে দাঁড়ালো এবং পা টিপে টিপে গলুই-এর মাথায় পা দিয়ে নিচে নামলো। শেখর বললো—"ফুলগুলো যখন আপনার ভালো লেগেছে—তখন নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হ'ত কিন্তু!"

মেয়েটা হাসিমুখে হাত বাড়ালো, বললো, "দিন তা হ'লে! আপনার জিনিস কি না—তাই নিজের হাতে নিই নি।"

শেখর সবগুলো সাপলা তুলে সেই শুভ্র-সুন্দর কোমল হাতের উপর রাখলো। একটু ছোঁয়া লাগলো বুঝি! হাসিমুখে শেখর বললো,—"আচ্ছা—আজকের মতো আসি।"

"আচ্ছা! দেখা হবে নিশ্চয়ই, কেমন?"

দেয়, তাকিয়ে থেকে।

শেখর নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

(২)

পরের দিন শেখর আরো একটু আগে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নৌকোটার ওপরে আরো দু'সারি গাটাতন বসিয়ে নিল।

দূর থেকেই বুঝতে পারলো, সে ব'সে আছে ওদের বাড়ির সামনে। নৌকো কাছে আসতেই সে বললো শেখরকে উদ্দেশ ক'রে, "অনেকক্ষণ ধরে ব'সে আছি আপনার জন্যে। এসে পড়েছেন ভালোই হ'ল। আরেকটু পরে এলে আর দেখা হ'ত না!" শেখর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো—কালকের সেই ফুলের হাসি আর তার মুখে লেগে নেই—শুদ্ধ, বিষণ্ণ। শেখর বলল,—"কলেজ ছুটির পর বাড়ি এসেই রওনা হয়েছি—এর আগে আর আসবার উপায় ছিল কিন্তু—ব্যাপার কী? আপনারা চ'লে যাচ্ছেন নাকি?

সদা-প্রফুল্ল মুখে আজ গাম্ভীর্য,—মেয়েটা জিজ্ঞেস করে আগ্রহভরে,—"আপনি কোন্ ইয়ারে পড়ছেন?"

—"এখান থেকে এক মাইল দূরে আছে একটা মাঝারি কলেজ, সেখানে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। আপনার সংবাদ বলুন এবার।"

—"প্রেসিডেন্সিতে সেকেণ্ড ইয়ার চলছে।—যাক্ আর সময় বেশি নেই আপনার সংগে জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি নে!" চোখের কোণ ছলছল ক'রে উঠল, কণ্ঠস্বরটা একটু ভিজে হ'য়ে এলো। সেটাকে ঢাকবার জন্যেই বোধ হয়, হাসি ফুটিয়ে সে বলতে লাগলো, "ভেবেছিলাম, আপনার সংগে ক'টা দিন বেশ জলের ওপর বেড়ানো যাবে, বিল দেখা যাবে, লাল সাপলার অজস্রতা দেখা যাবে! কিন্তু ভাগ্যক্রমে আর আধঘণ্টার মধ্যে আমরা রওনা হচ্ছি!"

শেখরের বাক্‌শক্তি লুপ্ত হ'য়ে গেছে। মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে শুদ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। একটু পরে, মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে—"আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাচ্ছেন—আবার আসছেন তো?"

—"আবার কবে আসা হবে তা অনিশ্চিত দুপুরে আজ একটা তার এসে হাজির—বাবাকে

ছেড়ে হবে বেওয়ারিশ। দেখুন কী অন্যায়ে—একটিমের জন্যে এতোদূর এসে কি কথাটা!"

—"এর পরের ছুটিতে আসছেন তো?"

—"তার মানে আগামী বছর এমন দিনে হয়ত আসা হবে। কিন্তু—কিন্তু অতো দিন পরে আমাদের কথা ভুলে যাবেন না তো?"

শেখর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—কারণ চোখে জল এসে গিয়েছিল। বলল কোনো রকমে,—"আপনি কী মনে রাখবেন এই মৎস্য-শিকারীর কথা?"

একটা বছর দশেকের মেয়ে দৌড়ে এসে জানিয়ে দিয়ে গেল তাকে যে সবাই খুঁজছে, এখনি রওনা হবে সবাই। উঠে দাঁড়ালো সে, দাঁড়িয়ে বুকের কাছ থেকে কালকের একটা লাল সাপলা ফুল বার ক'রে নিজের নাকের সামনে ধরে বলল, "আপনার দেওয়া ফুলের গন্ধ হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে—কিন্তু আপনার কথা মনে থাকবে চিরকাল!" আস্তে আস্তে সে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

কিন্তু পরের বছরের এমন দিনের বাঞ্ছিত অবকাশ আর ফিরে আসতে পারলো না। দেশময় হুলুস্থুল—বুকের কাগজে, সভায়, সমিতিতে ঘোষিত হ'ল—ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'য়েছে—কিন্তু সেই সঙ্গে পাকিস্তানের-ও জন্ম হ'য়েছে—কলকাতা আর মনমনসিংহ আলাদা হ'য়ে গেছে, একটা হিন্দুস্থানে আর একটা পাকিস্তানে!···

আর সকলের মতো শেখর-রা-ও অভিশপ্ত মুহূর্তে লটবহর নিয়ে রওনা হ'ল নতুন চরের সন্ধানে! পেছনে ফেলে রেখে গেল সেই বহু-বিকেলের প্রাণের সংগী নৌকাটাকে আর তার সংগে জড়িত স্বপ্নমাখা স্মৃতি-রাশিকে। সামনে রেলস্টেশন। কর্কশ ট্রেনের শব্দ, লাল ইটের বাড়ি, রৌদ্রের তপ্ততা—সব কিছু মিলিয়ে এ কোন্ মরুভূমি! শেখরের মন সে-সব ছাড়িয়ে চলে গেছে বহুদূরে—!···প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় বছরে! এতোদিনে হয়তো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে··· হয়তো বা বৃত্তি পেয়েছে, আবার ভর্তি হয়েছে। নাকি—না:, সে-কথা ভাবা-ও যায় না। নিশ্চয়ই সে আছে বাড়িতেই! কী করছে সে এখন? পড়ছে? কিন্তু যখন কোনো বিকেলে বৃষ্টি নামে ঝমঝমে, আকাশের মেঘগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়, জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু ঝাপটায় জল এসে ঢোকে—তখন, তখন কি সে দাঁড়িয়ে থাকে না গরাদ ধরে—অনির্দিষ্ট দৃষ্টি ফেলে সে কি দূরের পানে তাকিয়ে থাকে না, তার মনে কি পড়ে না কোনো ফেলে-আসা বিস্মৃত প্রদোষের অলস স্মৃতি? একদিনের পরিচয়—তা-ও নাম জানা হয়নি তার! কী করে, কোন পথ ধরে খুঁজবে তাকে এই পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জনতায়?

তারা বাসা নিয়েছে কিনু গোয়ালার গলির মতোই কোনো এক গলিতে, কিন্তু একমাত্র কপাল গুণেই শেখর ভর্তি হতে পেরেছে প্রেসিডেন্সিতে। তার আগেকার রেকর্ড অবশ্য খুবই ভালো ছিল—কিন্তু দূর থেকে শুনেছিল—ও কলেজ হচ্ছে বড়লোকের ছেলেদের জন্যে! স্টাইপেণ্ড একটা যোগাড় করে নিল সে।

কিন্তু কোথায় সে? সেকেণ্ড ইয়ারের ক্লাশ ভাবতেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করে—ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তার সেই মুখটি দেখা যায় কি না। থার্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে নিজের ক্লাশ নষ্ট করেও। না:—কোথাও নেই। একদিন না পেলে মনে করে আজ বোধ হয় সে অ্যাবসেণ্ট। কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ দিন ধ'রে তো আর সে কলেজ কামাই করবে না! কার কাছেই বা শেখর জিজ্ঞেস করবে—তার না জানে সে নাম, না ধামে পরিচয়— কিন্তু তাকে সে যেমন ক'রে জানে আর কে জানে তেমন করে?

হৃৎপিণ্ডের ওপরে একটা ব্যাথার বোঝা তাই চেপে থাকে। দিন যায়, মাস যায়—কোথাও কোনো হদিশ নেই তার বাঞ্ছিতের।

পড়াশুনোয় তাই সে মন দেয়। এক বছর নষ্ট হয়েছে, তাই আবার সেকেণ্ড ইয়ারেই ভর্তি হয়েছে। অনার্স আছে ইকনমিক্স্-এ।

দু'টো পরীক্ষা হয়ে গেল। শেখরের ফল খুবই ভালো হ'ল—অবশ্য প্রথম হ'তে না পারলেও সমস্ত বই সে কিনতে পারে না—ধার ক'রে নিয়ে পড়ে, লাইব্রেরীতে ব'সে পড়ে। হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেন্ট ওকে খুব ভালোবাসেন, অনেক বই টই দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর নাম ডক্টর মনতোষ দত্ত।

শেখরের কেন যেন ওঁকে খুব ভালো লাগে। পিতার মতো স্নেহ, কিন্তু বন্ধুর মতো ব্যবহার। চরিত্রবলে দেবতুল্য। কলেজে অবসর সময়েই শেখর যায় তাঁর কাছে, আলোচনা করে, উপদেশ নেয় দুদণ্ড শুধুরে নেয়।···

টেস্টে প্রথম হ'ল শেখর কিন্তু ডাঃ দত্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ব'লে খাতা দেখেন নি। কলেজ-ম্যাগাজিনে তার একটা গল্প বেরোলো, প্রশংসা পেলো অজস্র। বাইরের দুয়েকজন বড়ো বড়ো সাহিত্যিক তাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিলেন।

পরীক্ষার জন্য প্রাণপাত ক'রে শেখর পরিশ্রম করতে লাগলো। অধ্যাপকদের অকৃপণ আশীর্বাদ ছিলো তার মাথার ওপর। ছেলেদের সংগেও তার কোনোদিন অসদ্ভাব ঘটেনি। সবাই আন্তরিকভাবে চাইতো যে শেখরই প্রথম শ্রেণীর প্রথম হোক্।

ডাঃ দত্তের সংগে শেখরের নৈকট্য যতোই থাক সে ওঁর বাড়িতে বেশি যায় নি, আর যখনি গিয়েছে, বেশি-ক্ষণের জন্যে থাকে নি। হয়তো বই নিয়ে এসেছে, গিয়ে আবার ফেরৎ দিয়ে এসেছে। এই পর্যন্তই।

শেখর তার কথা ভুলে না গেলেও মনের মধ্যে সে উত্তপ্ত চিন্তা চেপে রেখে দিয়েছে। নিশীথে রাত্রি-শিখা প্রদীপের আলোতে যখন অর্থনীতির নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তঃস্থলে প্রবেশের চেষ্টা করতে করতে ক্লান্তি নেমে এসেছে দু'চোখে, জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে যখন দেখতে পেতো বাইরের উদ্মুক্ত আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদের রূপলহরী গাছগুলোর মাথায় মাথায় খেলে বেড়াচ্ছে—হয়তো তখন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে সেই অতীতের অপরাহ্ণ বেলার ক্ষণিক স্মৃতি, প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে বই বন্ধ ক'রে তখন শুয়ে পড়েছে, স্বপ্নের মধ্যে সেই স্মৃতিকে সুধাই ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশে!···

পরীক্ষার আর দু'সপ্তাহ বাকী। যথাযথভাবে শেখরের প্রস্তুতি-পর্ব সমাধার পথে। অপ্রস্তুতির উদ্বেগ কেটে গেছে।

কিছুক্ষণ লেখালেখির পর সে ডাঃ দত্তের বাড়ি থেকে অনেক গেঁটে ঘুটে যে-বইগুলো নিয়ে এসেছিল আজকে, সেইগুলো নামিয়ে নিয়ে এলো শেল্‌ফ থেকে। প্রদীপের সল্‌তেটাকে একটু উসকে নিয়ে স্থির হয়ে বসল চেয়ারে। একের পর আরেকটা বই নামাতে লাগলো। প্রথমেরটা হিক্‌স্-এর "ট্রেড সাইকেল", দ্বিতীয়টা নতুন সংস্করণের "থিওরি অব্ প্রাইস্", তৃতীয়টা—যাঃ একটা বই ভুল ক'রে নিয়ে এসেছে! চ'লে এসেছে কাপড়ে-বাঁধাই করা 'চার অধ্যায়'টা।

এই বইটেই আগে টেনে আনলো সামনে। প্রথম পাতায় দেখলো লেখা, সুন্দর, গোটা গোটা, বা বার প্রচলিত উপমা হচ্ছে মুক্তোর মতন, 'তেমনি' অক্ষরে; শ্রী সর্বাণী দত্ত। বোধহয় ডাঃ দত্তের মেয়েটেয়ে হবে। স্ত্রীর নাম যে এ নয় তা সে আগেই জানতো। বইটার মাঝখানে বোধ হয় কিছু ছিল—সেইজন্যেই মাঝখানটা উঁচু হ'য়ে আছে। পাতাগুলো ওল্টাতেই বের হ'ল একটা খাম, ডাকটিকিট নেই, কোথায় যাবে তা-ও লেখা নেই, তবে প্রেরকের জায়গায় দ্বিতীয় বন্ধনীতে লেখা আছে—"শ্রী সর্বাণী দত্ত, ১৭, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা"। তাড়াতাড়ি চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে খুলে ফেলল খাম-টা। খোলা দরজা দিয়ে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শেখরের বুক পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। এক ফালি মেঘে চাঁদের আলো ঢাকা প'ড়ে গেল হঠাৎ। বেয়ালে টিকটিকি টিক টিক্ ক'রে উঠলো!

একখানা কাগজে একটা কবিতা, ওপরে বাঁকিয়ের লেখা, ওগো কণিকের বন্ধু!" তারপরে আরম্ভ হ'ল কবিতা, সেই একই হাতের সুন্দর অক্ষরে একনিশ্বাসে পড়তে লাগলো শেখর :

"অপরাহ্ণ বহ্নি ঢালে, পূর্ণিমার চন্দ্রমা গরল,
প্রত্যূষের হর্ষ-আলা বহে অংগ, ঝলকে নয়ন,
জ্বলন্ত চিতে যায়, তপ্তশ্বাস ছাড়ে তীক্ষ্ণ শর,
দীপ্তিহীন চক্ষু মোর, তন্দ্রাহীন নিশীথ শয়ন!
বিদায় চাইতি, বন্ধু, বন্ধুর পথের প্রান্তে এসে,
ক্ষান্ত হ'ল জনমের বাধাহত ব্যর্থ এ অধ্যায়,—
অপেক্ষার হ'ল শেষ, উপেক্ষিত হ'ল প্রেম মোর
প্রিয়ের সাথে, অতীতের স্মরণী সন্ধ্যায়।
অপরাহ্ণে আমি আজ, নিরুপাধি প্রেমের খেলায়;—
তবাইনি নাম তব, শুধাওনি তুমি মোর নাম;
হয় যাপনার কূলে আছে আঁকা স্মৃতি-মাখা প্রেম—
বিদায়, বিদায় বন্ধু; রেখে যাই অনামী প্রণাম।"

অনেকক্ষণ পরে শেখর চেতনা ফিরে টেবিলের ওপরে মাথাটা ছেড়ে দিয়েছে অঘোরে জ্বলছে প্রদীপ; দু'টো একটা পোকা উড়ে পড়ছে তার কাগজটা রয়েছে তার হাতের নিচে!

উঠে যখন দাঁড়ালো, ওর মনে হ'ল ওর অন্তরের বুঝি শূন্য হ'য়ে গেছে। দরজা খুলে রাস্তায় বেরোলো সে। গভীর রাত্রি। নৈঃশব্দ্যেভরা আকাশ-বাতাসে—যেন তা আর কোনো কালে ভাঙবে না। আকাশের তারাগুলো ঢলে পড়েছে একদিকে, আলোর দীপ্তি ম্লান হ'য়ে গেছে।

পরের দিন ডাঃ দত্তকে 'চার-অধ্যায়'টা ফেরৎ দিতে গেল, ওহ্‌লিনের বদলে এইটে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সে-কথা ব'লে, জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, এ বইটার ওপরে নাম লেখা রয়েছে সর্বাণী দত্ত। আপনার কে ইনি?"

দত্ত বইটে হাতে নিতে নিতে বললেন,—
—"ও, এ বইটে চ'লে গিয়েছিল? তোমার তাহ'লে কাল রাত্রে ওহ্‌লিনের বই পড়া হ'ল না! ওঃ, সর্বাণী হ'ল আমার বড়ো মেয়ে, এই মাস ছয়েক আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে, ওর বর হ'ল বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট —ভারী সুন্দর ছেলেটা। সর্বাণী মা আমার তো কিছুতেই এতো শিগ্‌গির বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়বে না ব'লে গোঁ ধ'রে থাকতো, সব সময় মন খারাপ করে থাকতো, আমার সংগে ঝগড়া করত। কিন্তু ছেলের খুব পছন্দ—আমিও বুড়ো মানুষ, বলে কী হয় কে জানে!—যাক্ গে, ওই যে টেবিলের ওপরে ওহ্‌লিনের বইটে আছে নিয়ে যাও, কাল পড়তে পারো নি খুব অসুবিধে হয়েছে নিশ্চয়ই?"

—"আজকে আর ওহ্‌লিনের দরকার নেই, পরে নিয়ে যাবো। আসি তা হ'লে।" ব'লে শেখর বেরিয়ে আসে।

মণিপুর প্রসঙ্গ (৯)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

দৈব দুর্বিপাকে

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮৮০ সনের জুন মাস হইতে পর পর দৈব-দুর্বিপাকে মণিপুর রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। ৩০শে জুন প্রবল ভূমিকম্পের দ্বারা ইহার প্রথম পর্ব আরম্ভ হয়। মণিপুরের অধিকাংশ বাড়ীঘর তখন বাঁশ এবং খড়ের তৈরী হইলেও ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম হয় নাই। লাংথাবালে গম্ভীর সিংহের রাজ প্রাসাদ এবং পলিটিক্যাল এজেন্টদের পুরাতন রেসিডেন্সী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ভূমিকম্পের পর দেখা দেয় ব্যাপক কলেরা। ইহাতে রাজ্যের বহুলোক এমনকি রাজপরিবারেরও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সদস্যদের অনুপস্থিতিতে রাজ-দরবারের অধিবেশন অনেকদিন বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার পর আর বাজার বসিত না। ধারে সারি সারি চিতা—দিবারাত্রে জ্বলিতে থাকিত সমস্ত উপত্যকাভূমি মহামারীর কবলে পতিত হইল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মণিপুরীগণ এই ঘোর দুঃসময়ে ধৈর্য সহকারে যে কর্তব্যবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহা সচরাচর অনুরূপ অবস্থায় অন্যান্য সমাজে দেখা যায় না। মহামারীর সময় স্বভাবতই লোকে রুগ্ন দিগকে ফেলিয়া পলাইয়া যায়; মৃতের সৎকার দূরে থাক মুমূর্ষুর আর্তনাদ করিলেও শয্যাগত রোগীর মুখে একবিন্দু জল দেওয়ার জন্য কেহ আগাইয়া আসে না। কিন্তু এই দুরারোগ্য সংক্রামক রোগের স্পর্শে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও প্রতিবেশীরা কেহ ভয়ে পলাইয়া গেল না। সেবা এবং সৎকারের জন্য কোন সমস্যা দেখা দিল না।

মহমারীর প্রকোপ কমিতে না কমিতেই মহারাজা স্বয়ং কর্ণমূলে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া দাঁড়াইল। মণিপুরে মহারাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এক্ষেত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম হইল না। এক পক্ষে মহারাজের জ্যেষ্ঠ চার পুত্র, অপর পক্ষে নরসিংহের বংশধরগণ প্রকাশ্যেই তৈরী হইতে লাগিলেন। মহারাজের মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই অস্ত্রের ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইবে। রাজ্যে পুনরায় রক্তের স্রোত বহিবে। রুগ্ন চন্দ্রকীর্তির নিকট এই আশঙ্কা রোগ যন্ত্রণার চেয়েও বেশী পীড়া দিতে লাগিল। জনষ্টন সাহেব আসন্ন রক্তপাত ঠেকাইবার জন্য খাঙ্গাল নেজরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কিছুদিনের জন্য সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র তাহার রেসিডেন্সীতে আনাইয়া রাখার সঙ্কল্প করিলেন, এবং যুবরাজ সুরচন্দ্রকে মহারাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই রেসিডেন্সীতে চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন এই সব ব্যবস্থা চলিতে থাকাকালে মহারাজের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। তিনি তখন যুবরাজকে ইংরেজ সরকার কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সম্মত করাইতে জনষ্টন সাহেবকে অনুরোধ করেন।—*

জনষ্টন সাহেবের ইচ্ছা ছিল বরাবরের জন্য মণিপুরের সিংহাসনে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। মণিপুরের রাজশাসন অনুযায়ী ক্রমানুসারে সমস্ত রাজপুত্রেরই—অর্থাৎ প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র, দ্বিতীয়ের মৃত্যুর পর তৃতীয়, এইরূপে সকলেরই সিংহাসনে বসিবার অধিকার ছিল। কিন্তু চন্দ্রকীর্তি প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে যাইতে সম্মত হইলেন না। ইংরেজ সরকারও তখন চন্দ্রকীর্তির ইচ্ছাতেই সায় দেয়।

---

* "He begged me to write to the Govt. of India and request that the Jubraj should be acknowledged by them as his successor."

James Johnstone

১৮৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মহারাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পুনরায় রাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। মণিপুরের আকাশ হইতে কালবৈশাখীর ঘন কালোমেঘ কাটিয়া গেল। মণিপুরীদের শান্তির নীড় হইতে দুশ্চিন্তা দূর হইল। এই সময় জনষ্টন সাহেব একদিন সম্রাজ্ঞী সইকরা মহারাজা চন্দ্রকীর্তিসিংকে নাইট-কমাণ্ডার অব-দি ষ্টার-অব-ইণ্ডিয়া' (Knight Commander of the Star of India) পদে নিয়োগপত্র হাতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। মহারাজ সানন্দে এবং সসম্ভ্রমে উহা গ্রহণ করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহার অকৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।

ইম্ফল-মাও পথ

মণিপুর উপত্যকা হইতে রাজ্যের উত্তর সীমান্তবর্তী মাওকেন্দ্র মাও পর্যন্ত তখন কোন ভাল রাস্তা ছিল না। জনষ্টন সাহেব যখন কোহিমা উদ্ধারে যান তখন তাহাকে পায়ে হাঁটা দুর্গম পথে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি ইম্ফল হইতে মাও পর্যন্ত গরুর চলাচল করিতে পারে এমন একটি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মহারাজকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী করিয়া তুলেন। প্রথমে ইহার উপযোগিতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছিল; অবশেষে জনষ্টন সাহেবের দৃঢ় সঙ্কল্পই জয়ী হইল। লেফ্টেনেণ্ট রবান সাহেবের (Reban R. E.) তত্ত্বাবধানে এবং মণিপুরীদের সাহচর্যে ১৮৮১ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ এবং ১৮৯১ সনে মণিপুরে রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। আগে মণিপুরের ব্যবসা বাণিজ্য, সামরিক এবং রাজনৈতিক কাজ কর্ম, তীর্থ পর্যটন সমস্তই চলিত কাছাড়ের পথে। কিন্তু নূতন রাস্তাটি অধিকতর সুগম হওয়ায় লোকে ক্রমশ ঐ পথ ধরিল: বর্তমান সময়ে কাছাড়ের পথ একেবারে পরিত্যক্ত; ইম্ফল-মাও পথ ক্রমশ উন্নত এবং প্রসারিত হইয়া ভারতের অন্যতম প্রধান ইম্ফল-ডিমাপুর রাজপথে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত আদান-প্রদান চলা-ফেরা, ভাব ও সংস্কৃতির বিনিময় বহুদিন যাবৎ একমাত্র এই পথেই চলিয়া আসিতেছে। কোন গৃহের উত্তর দরজা খুলার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আলো হাওয়া একমাত্র উত্তরের খোলা দরজা দিয়াই প্রবেশ করে। সুতরাং নূতন দিকে নূতন পথ খুলায় অলক্ষিতে মণিপুরীদের চিন্তা এবং কর্মেও যে তাহার কিছুটা প্রভাব দেখা দিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

খাজাঞ্চি মেজরের প্রাধান্য :—

১৮৮১ সনে জনষ্টন সাহেবের অবর্তমানে এরিংথা (Erengha) নামক জনৈক অখ্যাত রাজকুমার সিংহাসন দখলের এক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া মহারাজের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মেলাইরংবার পর রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বহুদিন পর পুনরায় মণিপুরে এই চরম দণ্ডের প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৮৮২ সনের জানুয়ারী মাসে জনষ্টন সাহেব দীর্ঘ দিনের ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। তাঁহার অবর্তমানে এবং মহারাজের অসুস্থতার সুযোগে রাজসরকারের খাজাঞ্চি মেজরের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে তিনিই হইলেন রাজ্যে সর্বেসর্বা। জনষ্টন সাহেব ব্যতীত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। ১৮৮৯

† "……I visited him, that I might congratulate him on his recovery, and present him with Her Majesty's warrant, appointing him a Knight Commander of the Star of India. The papers bearing the Queen's signature were received with a salute of thirty one guns, and the 'Maharajah rose to take it from my hand, and a tonce placed it on his forehead, making an obeisance."

James Johnstone

সনের অক্টোবর মাসে তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া থাঙ্গাল মেজরের বিরুদ্ধে বহুলোকের বহু অভিযোগ শুনিতে পাইলেন। নিজেও তাঁহার ঔদ্ধত্যের নানা পরিচয় পাইলেন। মন্ত্রী বলরামসিং এবং যুবরাজ শুরচন্দ্র থাঙ্গাল মেজরের প্রতিপক্ষ ছিলেন।

ইহাতে জনষ্টন সাহেবের অনেক সুবিধা হইল। সেনাপতি রাজা কর্তৃক কোজল থানা আক্রমণের কোন সুবিচার না হওয়ায় থাঙ্গাল মেজর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল মণিপুরের কিছু লোক ব্রহ্মের এলাকায় হানা দিয়াছে। থাঙ্গাল মেজর তখন 'আয়া পুই এল' অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ সম্পর্কীয় মন্ত্রী (Aya Poiel Minister for Burmese affairs) ছিলেন। সুতরাং ইহা যে থাঙ্গাল মেজরের কীর্তি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। জনষ্টন সাহেব নই বলরাম সিংকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং ঘটনার তদন্ত করিয়া মহারাজের নিকট তাহার বিরুদ্ধে থাঙ্গাল মেজরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে 'আয়া-পুইএলে'র পদ হইতে অপসারিত করিতে অনুরোধ করেন। গোড়ার দিকে নানা হুমকি দেখাইলেও অবশেষে বেগতিক দেখিয়া থাঙ্গাল মেজর মহারাজের নির্দেশ মত পদত্যাগ করিয়া জনষ্টন সাহেবের নিকট নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন। তাঁহার এইরূপ পতনে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হইয়াছিলেন যুবরাজ শুরচন্দ্র এবং বলরাম সিং। তাঁহারা তাঁহার প্রতাপে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিরক্তিকর ঘটনার এইখানেই শেষ হয়।

২য় ব্রহ্মযুদ্ধ :—

১৮৮৫ সনের ২৫শে নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য উত্তর ব্রহ্ম আক্রমণ করিলে চীন্দুইন অববাহিকার বোম্বে-বার্মা কর্পোরেশনের (Bombay Burma-Corporation) কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য জনষ্টন সাহেব প্রায় দুই হাজার মণিপুরী সৈন্য লইয়া কেণ্ডেট (Kendat) প্রদেশ দখল করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ২০ দিনের দিন রেঙ্গুন হইতে ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক সম্রাট থীব (Thibaw) সহ রাজধানী মান্দালয় সহর হস্তগত হয়। সুতরাং যুদ্ধ অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। তথাপি জনষ্টন সাহেব পরিচালিত মণিপুরী সৈন্যের এই প্রয়াস কতিপয় বিপন্ন ইংরেজ কর্মচারী প্রাণ রক্ষা করিতে এবং কেণ্ডেট এলাকায় অরাজকতা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—যাহা অন্য উপায়ে সম্ভব ছিল না। তদানীন্তন ভাইসরয় (Viceroy) লর্ড ডাফরিণ (Lord Dufferin) তাহাদের এই সহযোগিতা এবং বীরত্বের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

জনষ্টন সাহেবের শেষ বিদায় :

১৮৮৬ সনের মার্চ মাসে জনষ্টন সাহেব মণিপুর হইতে শেষ বিদায় লইয়া যান। তাহার পরও একবার তাঁহাকে মণিপুরে পাঠানের কথা হইয়াছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁহার আসা সম্ভব হয় নাই। জনষ্টন সাহেব তাঁহার কার্যতৎপরতায় এবং ব্যবহারে মণিপুরে সকল শ্রেণীরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ছুটির পর পুনরাগমনের সময় অন্তত প্রত্যেক বারই তিনি বহু লোকের দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেন। রাজ্যের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ এবং সাহচর্য ছিল অপরিহার্য। সমস্ত বাধা বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মণিপুরের সেবা ও উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজের সঙ্গে মণিপুরের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার সময়ও তিনি মণিপুরের স্বার্থ সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ ছিলেন, এমনকি তাহার জন্য ইংরেজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া হইলেও অপরাপর রাষ্ট্রের লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পর্যন্ত পশ্চাদপদ হন নাই। নাগাপাহাড়ে প্রথমবার যখন ইংরেজের সঙ্গে নাগাদের গোলমাল বাধে তখন তিনি সেখানে না যাইয়া মণিপুরের থানা আক্রমণকারী সুজোক রাজার বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কতিপয় মণিপুরী কাণপুরে যাইয়া কার্পেট বয়ন শিখিয়া আসে। তিনি স্বয়ং ইম্ফলে একটি উন্নত ধরণের মৃৎশিল্প স্থাপন করেন এবং মণিপুরী রৌপ্যকারদিগকেও উন্নত

সবদের জিনিস তৈরী করিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। নানা প্রকার সদ্য অপরাধে গুরুদণ্ড দানের প্রথা তিনি রহিত করেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা তখন সফল হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থে অননুকরণীয় সহজ সুন্দর ভাষায় মণিপুর সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম মূল্যবান দলিল হিসাবে চিরকালে গণ্য হইবে। বস্তুত সমসাময়িক মণিপুরকে জনষ্টন সাহেব হইতে পৃথক ভাবে ভাবা যায়না। মণিপুরে

এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই যাহার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন না। ভারতের অন্যান্য ইংরেজ শাসকদের চেয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি লোকের যেটুকু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে এই জনষ্টন সাহেবের মত কতিপয় মহানুভব কর্মচারীর দান। তিনি উপস্থিত থাকিলে মণিপুরে ১৮৯১ সনের শোচনীয় দুর্ঘটনা, হয়ত ঘটিবার সুযোগই পাইত না।*

মহারাজা ভগ্নকীর্তির মত সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান রাজা মণিপুরে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঁচ ফুট ইঞ্চি, দীর্ঘ বাহু, শক্ত গড়ন, অবয়বের ইন্দোচৈনিক রেখা, শান্ত মুখমণ্ডল সব কিছু মিলাইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত। স্কুল কলেজের সাধারণ শিক্ষা না পাইলেও তাঁহার রুচি অতিশয় মার্জিত ছিল নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তিনি সর্বদাই নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। যন্ত্র-বিজ্ঞানে তাঁহার একটা সাধারণ ঝোঁক ছিল। একটি গবেষণাগার নির্মাণ করিয়া তিনি তাহাতে নানা বিষয়ের পরীক্ষা করিতেন, এমনকি শারীরস্থান (anatomy)-ও বাদ যাইত না। তিনি তাঁহার নিজস্ব কারখানায় কাঁচ তৈরী করিতেন; এবং একবার তাঁহার নির্দেশমত একটি নিখুঁত পেট্রলল্যাম্প তৈরী করাইয়া জনষ্টন সাহেবকে দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকিলেও রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। জনষ্টন সাহেব একবার মহারাজের নিকট নিজের ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু চা গাছ রোপণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ মহারাজের মনে চুকিয়া চুকিয়া গেল। ইংরেজগণ যে চা-চাষের জন্য ১৮৪০ সনে মুত্তুক (Muttuk Country) দখল করিয়াছিল একথা তিনি জানতেন। ভাল চা উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া ভবিষ্যতে তাহারা মণিপুর রাজ্যও যে খাসে আনিতে চাহিবেনা একথা কে বলিতে পারে। মহারাজ জনষ্টন সাহেবকে তাহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে বিনামূল্যে ভাল চা পাঠানর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রাজ্যে বিদ্রোহ এবং অশান্তি দমনে তিনি যেমন দৃঢ় ছিলেন তেমনি প্রজাদের অসুবিধা দূর করিতেও সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান প্রজাদিগকেও পূর্বে হিন্দুদের মত মহারাজের সম্মুখে আত্মনিবেদন হইয়া সম্মান দেখাইতে হইত, কিন্তু ইহা তাহাদের ধর্ম-বিরুদ্ধ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে এই প্রথা হইতে মুক্তি দিয়া শুধু 'সেলাম' করিতে বলিলেন। মুসলমান সমাজের নেতাকে রাজ-সরকার হইতে 'নবাব' উপাধি দেওয়া হইল। অথচ তাহাদের সংখ্যা তখন ৪০ হাজারের বেশী ছিলনা। মহারাজা জনষ্টন সাহেবের অনুরোধে গো-হত্যা, পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের নিয়ম তুলিয়া দেন এবং চক্ষু উৎপাটন, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা (Principle of retaliation) ইত্যাদি নৃশংস উপায়ে শাস্তি দেওয়ার প্রথাও রহিত করেন। পূর্বে কাছাড় হইতে ৮ দিন অন্তর মণিপুরে ডাক আসিত, ক্রমশ এই

* "Oh! for a moment of colonel Johnstones' presence at such a crisis" wrote a British official from Manipur, to the Pioneer, in 1891. "One strong word with the ominous raising of the forefinger would have paralyzed the treacherous rebel koireng (Senaputtee) from perpetrating this outrage" E. D.

ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া ২ দিন অন্তর চিঠি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মহারাজা শ্রীহট্টে এবং শিলচরে রাজভবন তৈরী করাইয়াছিলেন। মহারাজ জননী কুমুদিনী দেবী চন্দ্রকীর্তির সঙ্গেই মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেবের (R. Brown) বিবরণে দেখা যায় তিনি ১৮৭৩ সন পর্যন্তও জীবিত ছিলেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্তি ১৮৮৬ সনের গ্রীষ্মকালে ৩৪ বৎসর রাজত্ব ভোগের পর ৭৮ বা ৭৯ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

চন্দ্রকীর্তির মত সর্বগুণসম্পন্ন শাসক এ অঞ্চলের ইতিহাসে খুই কমই দেখা যায়। কিন্তু তথাপি ইংরেজের সঙ্গে তাঁহার যে সমস্ত চুক্তি হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের উপর যতটা নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোন স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা বজায় থাকে না। ইংরেজের নিকট হইতে পদবী গ্রহণ, পররাষ্ট্রীয় এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলা প্রতি ব্যাপারে পলিটিক্যাল এজেন্টের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা, এমনকি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট পূর্বাহ্নেই অনুমোদন লাভের প্রার্থনা করা ইত্যাদি কোন স্বাধীন রাজ্যের পক্ষেই মর্যাদা দূরস্থান স্বাধীনতারই পরিচায়ক নহে।

তৎকালীন মণিপুর রাষ্ট্রে নিযুক্ত ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টদের অভ্যর্থনার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইত এবং রাজদরবারে তাহাদের প্রভাব এত বেশী ছিল তাহাতে তাহাদিগকে মণিপুর সরকারের ইংরেজ উপদেষ্টা (Advisor) এবং পরিচালক, মনে করিলে কোন ভুল হইবে না। পলিটিক্যাল এজেন্টগণ যখন মণিপুরে আসিতেন তখন রাজ্যের একজন মন্ত্রী জিরিঘাট হইতে তাহাকে পথ প্রদর্শনের জন্য সঙ্গে থাকিতেন। রাজধানীর প্রবেশ মুখে মহারাজা তাঁহার পুত্রগণসহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন। আনুষঙ্গিক আরও অনেক অনুষ্ঠানও সেই সঙ্গে পালিত হইত।*

পাশাপাশি ব্রহ্মরাষ্ট্রে তখন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে নগ্ন পদে রাজ দরবারে প্রবেশ করিয়া নতজানু হইয়া রাজাকে সম্মান দেখাইতে হইত।†

এককালে প্রাচ্যদেশে সর্বত্রই এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত নানা দিক হইতে বিচার করিয়া মহারাজা চন্দ্রকীর্তির আমলের মণিপুরকে স্বাধীন রাজ্যের পর্যায়ে ভুক্ত করা চলে না। ব্রিটিশ ভারত বহুল নিয়ন্ত্রিত দেশীয় রাজ্যের সঙ্গেই ইহার একমাত্র তুলনা চলে। (ক্রমশঃ

---

* "……at the entrance of the capital, I was met by the Maharajah himself, surrounded by all his sons. A carpet was spread with chairs for him and myself, we both of us having descended from our elephants, advanced and met in the centre of the carpet, and having made our salutations (a salute of eleven guns was fired in my honour), we sat and talked for two minutes. We then mounted the Maharajah's elephant being driven by his 3rd son; and we rode together through the great bazar, till our roads diverged at the entrance to the fortified enclosure to the place, when we took leave of each other……

After a day's rest I paid a visit to the Maharajah, having first stipulated as to my proper reception. I was received by the Jubraj (heir apparent) at the entrance to the private part of the palace, and by the Maharajah a few paces from the entrance to the Durbar room (hall of reception), and conducted by him to a sit opposite to his own, with a table between us, his sons and officials being seated on either side. I read the Viceroy's letter, informing the Maharajah of my appointment ……I took my leave and was escorted back to the place where I was met on my arrival."

Johnstone.

† "According to the Burmese custom the British Resident, when attending court had to remove his shoes and kneel before the King' …Page 838.

Advanced History of India.

ফাটল

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ দিন পরে এলাহাবাদ থেকে সুমিতা এল নিজের সংসার ফেলে কলিকাতায়। কৈশোরের সাথী জীর্ণ বাড়ীটা এখনও সেই রকম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার মানুষগুলোই খালি পালটেছে কিন্তু সুমিতার পরিচিত সমস্ত কিছু স্মৃতি বাড়ীটায় এখনও অমলিন হয়ে গেছে। সেই খোলা উঠোনের চারধারে চকমিলানো বারান্দাটুকু আজও অতীত স্মৃতির রোমাঞ্চ বয়ে আনে সুমিতার কাছে। বারান্দার সিমেন্টটায় ফাট ধরেছে শুধু। সারা বাড়ী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সুমিতা। মা মারা যাবার সময় কিছুদিনের জন্যে এসেছিল সুমিতা, কিন্তু তখন মানুষের ভিড়ে বাড়ীটার দিকে মন দেবার সময় হয়নি সুমিতার।

বড়বৌদি মারা যাবার খবরটুকু শুনেছে, মা নরা মেয়েটার দুঃখে কেঁদেছে সুমিতা, কিন্তু আসতে পারেনি সংসার ছেড়ে। মন্টুই যা নতুন, এ বাড়ীতে যাকে আগে দেখেনি সুমিতা।

বড়দা মন্টুকে ডাকলেন নিজের কাছে। ডাগর দুটী বিস্মিত চোখে মেয়েটা এগিয়ে এল বাবার কাছে।

'মারি, পিসিমাকে প্রণাম কর। ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে মন্টু সুমিতাকে প্রণাম করতে যায়, সুমিতা জড়িয়ে ধরে মেয়েটাকে।

কৈশোরের সাথী জীর্ণ বাড়ীটাকে নতুন করে ভালবেসেছে সুমিতা আর ভালবেসেছে মন্টুকে। মাঝে মাঝে ভাবে সুমিতা; সময় হলে যখন ফিরতে হবে এলাহাবাদে; তখন মন্টুকে ছেড়ে যাবে কি করে সুমিতা।

চকমিলান বারান্দাটুকু বড় প্রিয় সুমিতার, শীতের দুপুরে রোদ এসে পড়ে খোলা বারান্দাটুকুতে। একটা বই হাতে নিয়ে সুমিতা এসে বসে বারান্দায়। ছোট বৌদি গল্প করে কিছুক্ষণ পান চিবোতে চিবোতে, তারপর শুতে চলে যায়। সুমিতা এবার দিব্যি ছায়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে রোদে। অদ্ভুত খুশীতে মন ভরে ওঠে ওর, যেন ফেলে আসা কৈশোরেই ফিরে এসেছে আবার।

মন্টুর দুপুর বেলার খেলার আসর সুমিতার জন্যেই অন্য বাড়ীথেকে উঠে এসেছে এ বাড়ীতে। পিসিমাকে একলা ছেড়ে দিতে মন্টু একবারে নারাজ। অপরিচিত লোকের সামনে খেলতে লজ্জা পায় অন্য মেয়েরা। কিন্তু মন্টুই ভরসা দেয় ওদের, পিসিমা খুব লক্ষী। কাউকে কিছু বলবেন না দেখো।

ধীরে ধীরে সঙ্কোচ কেটে যায়। অস্পষ্ট ফিস্-ফিসানি থেকে রীতিমত হৈ চৈ সুরু হয়ে যায়। সুমিতার কানে ওদের টুকরো টুকরো সব কথাই ভেসে আসে। মাঝে মাঝে ওদের কথায় কৌতুকে হেসে ফেলে সুমিতা। ওরা সব হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়।

আজও খেলার আসর বসেছে কিন্তু ওরা আজ এত চুপিচুপি কথা বলছে কেন? সুমিতার সন্দেহ হয়। ব্যাপার কি; কোন পরিকল্পনা গজাল নাকি দুই, মন্টুর মাথায়, কোন নতুন দুষ্টুমীর? বই থেকে মুখ তুলে সুমিতা ওদের জিজ্ঞাসা করে; 'কিগো তোমরা এত চুপচাপ কেন, কি হল আজ?'

মন্টু মাথায় একটা গামছা দিয়ে ঘোমটা করে সামনের বাড়ীর গুলির ছোট ভাইটাকে একটা ছেঁড়া পাখা দিয়ে বাতাস করছে। অসীম কৌতুহলে বারান্দা ছেড়ে নেমে এল সুমিতা। ব্যাপার কি, ওর আবার কি হল?

—'কি হল মন্টু?' মন্টু পিসিমার কথার উত্তর দেয় না। ছেলেটা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রয়েছে

সুমিতার দিকে। চোখ দুটো পিটপিট্ করছে। ভুলে গেছে ওরা সুমিতা ওদের খেলার সাথী নয়; তাই একজন গম্ভীর হয়ে বলে ওঠে, 'খোকার ভয়ানক জ্বর যে!' ব্যাপারটা বোঝা সুমিতার উচিত ছিল, ছেলেটার চাউনি দেখে। হেসে ফেলে সুমিতা। তারপর ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলে ওঠে 'তাই বুঝি বৌমা তোমার পাখার বাতাস করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে! ডাক্তার দেখিয়েছ?'

—'ডাকি আর দেখাই নি, বলে বাঁচে কিনা সন্দেহ!'

হাসি আর চাপতে পারে না সুমিতা, খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে বারান্দায় এসে বসে পড়ে। ছেলেটার আর ধৈর্য সয় না; লাফিয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে,—'ছাৎ আমার অসুখ না ছাই; আমি খেলব না যাও'। রাগে গুমরাতে করতে চলে যায় ছেলেটা।

খেলাটা ভেঙে গেল বলে সুমিতার অনুশোচনা হয়। ছেলেটাকে ডেকে আনে সুমিতা নিজে, মিট-মাট হয়ে যায়। আবার খেলা সুরু হয়।

চমকে উঠল সুমিতা মঞ্জুর ডাকে; 'পিসিমা!' বইয়ের পাতায় মুখ দিয়েই সুমিতা বলল, 'কি বল?'

—'কি করে সংসার চালাই বলত; রোজগার পত্র করবে না; খালি ঘুরে বেড়াবে। ঘরে একটা পয়সা নেই!'

অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটায় উঠে বসে সুমিতা। মঞ্জুর করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে হাসি পায় সুমিতার, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'তার জন্যে তুই ভেবে মরে গেলি—পুরুষ মানুষ, এক দিন খেটে খাবেই। আমিই ওকে একটা চাকরী দেব'খন।'

—'তুমি বল না পিসিমা; বলে চাকরী করব না; ছ্যাৎ, চাকরী আমার ভাল লাগে না।'

—'কিছু ভাবিস নি, কাল দেখিস ঠিক হয়ে যাবে' পিসিমার কথায় মেয়েটার মুখ অকারণ খুশীতে ভরে উঠে। ছেলেটাকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, 'কেমন জব্দ, চাকরী করবে না বললেই হল!' ছেলেটা নির্বিকার হয়ে উঠোনের তালা পাঁচিলটায় বসে পা দোলায়।

.....জীর্ণ বাড়ীটাকে আর শ্যামল রঙের ভাসা ভাসা চোখের এই মেয়েটাকে ছেড়ে ফিরে যেতে হল সুমিতাকে এলাহাবাদ। জীর্ণ বাসার স্মৃতির চেয়ে, ওর কথা ব্যাকুল করে তোলে সুমিতাকে সংসারের হাজারো তুচ্ছতার মাঝেও।

.....সেদিনের ছোট মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। শাশুড়ীর অসুখ বাড়াবাড়ি বলে যাওয়া হল না সুমিতার। রোগে ম্লান বাড়ীটায় সেদিন বার বার সুমিতার মনে পড়েছে মেয়েটার কথা।

অনেকদিন পরে আবার সুমিতা এসেছে কলকাতায়। বড়দা এ'কদিনে কতটা বুড়ো হয়ে গেছেন। বারান্দাটায় বেশ ফাট ধরেছে। সামনের উঠোনটা শ্যাওলা পড়ে পিচ্ছিল দেখতে হয়ে গেছে। হাঁফিয়ে উঠল সুমিতা বাড়ীটার অবস্থা দেখে। বাড়ীতে মঞ্জু নেই বলে নয়, এমনিতেই বাড়ীটার আবহাওয়ার প্রীতির সে নিষ্টি রেখা নেই। বড়দা ছোড়দায় একটা ব্যবধানের অস্তিত্ব বিব্রত করে তুলল সুমিতাকে। সেই এল সুমিতা, কিন্তু কিসের জন্যেই বা এল ও!

বড়দা রাত্রিতে ডেকে পাঠালেন, বললেন 'কতদিন পরে এলি, থাকবি ত?' কিছুদিন থাকবে এই ইচ্ছাই ছিল সুমিতার; কিন্তু এখানের ব্যাপার দেখে মোটেই আর সে ইচ্ছা নেই তার। ও বলে, 'বেশী দিন থাকতে পারব না দাদা, শাশুড়ীর নিত্য অসুখ; দেরী হলে রাগ করবেন। মঞ্জু কেমন আছে দাদা?'

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন বড়দা, 'ভালই আছে, তাই ত দেখে। দেখতে ত' বেশী আর যেতে পারি না। শরীরটা বাবু করে ফেলেছে, ট্রেণের ধকল সহ্য করে অতদূর যাবার শক্তি নেই। সুকুমারও দেখা করেনি অনেক দিন।'

—'মেমারীতে বিয়ে হয়েছে না?'

—'হাঁ'

মঞ্জুকে একবার দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে সুমিতা। ও বলে, 'আমি কাল একবার ওর কাছে যাব ভাবছি।'

বড়দা ঘাড় নাড়েন, 'কাল, কাল ত ছুটী পাব নারে।'

—'আমি চকুকে নিয়ে যাব, সন্ধ্যের ট্রেণেই চলে আসব। তোমার আর কষ্ট করতে হবে না।' সুমিতার কথার প্রতিবাদ করেন না বড়দা।

শোবার ঘরে চলে এল সুমিতা। ঘরে মঞ্জুর আর সুকুমারের একটা ছবি টাঙ্গান রয়েছে। সুন্দর দেখতে হয়েছে মঞ্জুকে। কতদিন ও মঞ্জুকে দেখেনি।

ট্রেণ থামতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুমিতা। রাস্তাটা যেন ফুরোবার নয়। এখনও নাকি ছ'মাইল হাঁটতে হবে মঞ্জুর শ্বশুর বাড়ী যেতে হলে।

ক্লান্ত সুমিতা থামল চকুর কথায়। সাধারণ একটা দোতালা বাড়ী। বেলা এগারোটা। আশ পাশ নিস্তব্ধ। সামনেই একটা মজা পুকুর। একজন ঘাটে বাসন মাজছে। সুমিতা গিয়ে কড়া নাড়ে। দরজাটা খুলে যায়।

মঞ্জুর চিনতে ভুল হয় না পিসিমাকে। অর্ধস্ফুট একটা বিস্ময় মেশানো আনন্দের ধ্বনি ভেসে বেরিয়ে আসে ছুটী ঠোঁট থেকে। দরজার গোড়ায় মঞ্জু প্রণাম করে সুমিতাকে। মঞ্জুর দিকে চেয়ে বিস্মিত সুমিতা; কাল রাতের ছবিটার সঙ্গে এ মেয়েটীর একি তফাৎ। ছেঁড়া কাপড় পরনে, চোখ দুটোয় রাজ্যের বিষণ্ণতা—রোগা হয়ে গেছে।

'—আসুন ভেতরে'—ক্লান্ত পায়ে ব্যথাভরা মনে সুমিতা অনুসরণ করল মঞ্জুকে।

—'কে বৌমা'? রান্নাঘর থেকে প্রশ্ন এল। ভীরু গলায় উত্তর দেয় মঞ্জু, 'আমার পিসিমা।' কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসেন সুকুমারের মা হেমাঙ্গিনী।

হেমাঙ্গিনী সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, কাজ সেরে আসছি বলে আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন।

সুমিতা এসে বসল মঞ্জুর ঘরে। ঘরটার দিকে ভাল-ভাবে চাইল সুমিতা। সারা ঘরটায় দৈন্যদশার ছাপ। মঞ্জুর ঘর এত বিশৃঙ্খল, এত শ্রীহীন হতে পারে তা ভাবতে পারে না সুমিতা। মঞ্জুর বেশবাস, ওর বিষণ্ণ কালো চোখের সঙ্গে মিল রেখে, এ ঘরটাকে যেন এমনি করেই রাখা হয়েছে।

—'আয় কাছে আয়,' মঞ্জু পিসিমার কাছে এসে বসে।

—'বড় রোগা হয়ে গেছিস।' পিসিমার কথায় মঞ্জু ম্লান হাসে।

সুমিতার কাছে সে ম্লান হাসির একটা অর্থই থাকতে পারে,—মঞ্জু কি তার সংসারে খুশী হতে পারে নি? বড়দা যে বলল ভাল আছে, এ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না সুমিতার বিষণ্ণ এই মেয়েটাকে দেখলে।

—'মঞ্জু'

—'উঁ'

—'একটা কথা বলবি?'

—'কি কথা পিসিমা।'

—'তুই কি সুখী হোস্‌নি এ বাড়ীতে বিয়ে হয়ে। সুকুমার কি···'আর বলতে পারে না সুমিতা।

—হঠাৎ থরথর করে কেঁপে ওঠে মঞ্জু, পিসিমার কোলে মুখ লুকোয়, 'ওর চাকরী গেছে পিসিমা ছ'মাস। কি করব?'

বুকটা ধ্বক করে উঠল। সুমিতা আর্তনাদ করে উঠল, 'বাবাকে বলিস্ নি কেন?'

—'বলতাম। ও-ই বারণ করেছে। এদিকে এরা ওকে পাগল করে তুলেছে। কি করব আমি পিসিমা'—ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে মঞ্জু।

মনে পড়ে জীর্ণ বাসার সেই চকমিলানো বারান্দার সামনের উঠোনটায় খেলাঘরের সংসারের বধূ ভাগর ভাগর চোখের মেয়েটাকে, এমনি এক প্রশ্ন, সেদিন সেও করেছিল। কিন্তু আজ এই মেয়েটাকে কি বলেই বা সান্ত্বনা দেবে সুমিতা। খেলাঘরের মত সুমিতার সান্ত্বনাটা সত্যি হয়ে যাবে না, একথা যে নিষ্ঠুর ভাবে সত্য

সুমিতার চোখের কোণে জল জমে, কিছু বলতে পারে না এই ক্রন্দনরতা মেয়েটাকে, আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোন স্বপ্নে ওর বিষণ্ণ দুটী চোখের তারায় আলো ফিরিয়ে আনবার সাধ্য নেই সুমিতার। তাই নীরবে শুধু ওর পিঠে হাত বুলোয় সুমিতা।

বদ্রীধাম দর্শন

শ্রীইন্দুমতী

প্রকৃতির আহ্বান যদি কারও অন্তরে তীব্রভাবে জাগে তবে পারিপার্শ্বিকতার বাধা খুবই ছোট হয়ে যায় একথা আমি অনুভব করলাম, যখন ভগবান বদ্রীবিশালের চরণ দর্শনের সুযোগ আমার ঘটলো। স্বভাবতঃ সকল বস্তুর মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব মেনে নিলেও আমার ভক্তির আতিশয্য এত নেই যে নিছক ভগবদ্ভক্তিই আমাকে এই তীর্থযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। জনৈক লেখক পাহাড়কে বলেছেন—"প্রটেক্টর অব উইলডারনেস্" বিজন-প্রান্তর-প্রহরী। এই শব্দ প্রয়োগ আমার মনের মধ্যে এমন গভীর ছায়াপাত করেছিল যে একদিন আমার এই স্বদেশের প্রহরীর মধ্যে "বিজন প্রান্তর প্রহরী'কে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। আমি শুনেছিলাম বদ্রীধামের যাত্রাপথে অনেক উঁচু পাহাড়ের দর্শন মেলে।

যাত্রার জন্য দু'বছর ধরে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বন্ধুরা, তেমনি আত্মীয় পরিজনরা বললেন—"মেয়েমানুষ একলা কি করে যাবে! পথ দুর্গম; তেমনি ওখানে যারা যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে" এমনি আরও। কিন্তু আমার মনের মধ্যে বদ্রীবিশালের আহ্বান এমনি প্রবল হয়ে উঠলো যে একদিন প্রয়োজনের বেশ কিছু বেশী জিনিষপত্র আর আমার ছোট্ট চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওকে তখনও বলিনি আমরা কোথায় যাব। রওনা হবার আগে মানচিত্র দেখে পি. ডব্লু. ডি কর্তৃপক্ষকে তারিখ মত তাদের বাংলোতে আমার জন্য জায়গা রিজার্ভ রাখতে অনুরোধ করি। পৌড়ীর পি. ডব্লু. ডি. কর্তৃপক্ষকে এ অনুরোধও করেছিলাম যে আমার রিজার্ভেসনের খবর যেন তাঁরা তারযোগে শ্রীনগরে জানিয়ে দেন। কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করেই রওনা হই। তখনও আমি সেনাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাই ভরসা ছিল, আগে থেকে রিজার্ভেসন না থাকলেও সেনা-বিভাগের লোক হিসাবে খুব তাড়াতাড়িই জায়গা করিয়ে নেওয়া যাবে।

যাত্রা আমার সুরু হলো। তখন ল্যাণ্ড লাইনসের বাস বীরাট থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত চলত। ওরা জুন (১৯৪৭) বেলা দু'টার সময় আমি ও আমার ভৃত্য শালিগ্রাম রওনা হয়ে সন্ধ্যায় হরিদ্বারে পৌঁছাই। এই তীর্থভূমি আমার কখনও ভাল লাগেনি। এই সময় দেশ বিভাগের সম্ভাবনা থাকায় পাঞ্জাব থেকে বহুলোক এখানে এসে ভীড় জমিয়েছিল। এখানে আমার মন বেশ একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আমি যে হোটেলে গিয়ে উঠলাম সেখানে অনেক লোক ছিল। হোটেলওয়ালা একা একটি মেয়েমানুষকে হোটেলে স্থান দিতে নারাজ। শেষটায় কোনমতে রাতের জন্য একটু স্থান মিললো। পরদিন সকালেই আমার লটর পটর নিয়ে আমি হৃষীকেশ অভিমুখে রওনা হই। ভেবেছিলাম ওখান থেকে কীর্তি-নগরের বাস্ পাওয়া যাবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম হৃষীকেশ থেকে মাইল খানেক দূরে "মুনিকী রেতী" নামক স্থান থেকে বাস চলে। শালিগ্রাম আমার খাবার তৈরী করছিল তাই আমি নিজেই খোঁজ নিতে বেরিয়ে-ছিলাম। রাস্তায় নানা প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে হতে হোলো—আপনি কি একা? কতদূর যাবেন? আরও···। আমার মনকে ক্ষুব্ধ করবার পক্ষে এসবই ছিল যথেষ্ট। যাই হোক আমার দৃঢ় সংকল্পই শেষ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করেছে।

পরের দিন সকালে বাস ছিল। গঙ্গার গা বেয়ে সরু রাস্তা। বাস্ চলতে পারে কিন্তু ড্রাইভার একটু অসতর্ক হলেই সকল যাত্রীকেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কোলে আশ্রয় নিতে হবে। ভারতবাসীর অন্তরে গঙ্গা মায়ের আসন দখল করে রয়েছেন। কিন্তু এখানে ভাগীরথীকে দেখে একটি মুগ্ধাবস্থা বলে মনে হয়েছে। যেন একটি চটুল মেয়ে চল চপল ভঙ্গীতে গিরিরাজের সঙ্গে লুকোচুরী খেলে চলেছে আর তার

হর্ষোৎফুল্ল অন্তর এক একবার খিল খিল করে হেসে উঠছে।

রাস্তায় ভাগীরথী আর অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে "দেব প্রয়াগ" প্রথম বড় সহর। এখানে পাহাড়ের উপর শ্রীরামচন্দ্রের এক মন্দির আছে। কিংবদন্তী আছে যে, রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র হাজার বছর ধরে এখানে তপস্যা করেছিলেন। ভাগীরথীর ঘোলাজল আর অলকনন্দার স্বচ্ছধারা এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যরক্ষার লড়াই করে করে চলেছে। এখানে কলা এত বেশী জন্মায় যে, আসামের কদলীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ঋষীকেশ থেকে ৬৩ মাইল দূরে কীর্তিনগর। টেহরী রাজ্যের মোটর সার্ভিস এখানেই শেষ। আমাদের মোটর দেবপ্রয়াগ থেকে অলকনন্দার গা বেয়ে চলছিল! সন্ধ্যায় কীর্তিনগরে নেমে তাড়াতাড়ি কুলি নিয়ে তিন-মাইল দূরে শ্রীনগরে পৌঁছলাম। এখান থেকেই আগে যাবার বাস ধরতে হয়। পুরুষ কুলির সংখ্যা এখানে খুবই কম। আর মেয়ে কুলিরা বেশী মাল বইতে পারে না: তাই আমাকে তিনজন মেয়ে কুলি নিতে হোলো। অলকনন্দার এই তিনমাইল সুরম্য তটের মাঝে মাঝে এক একটি গ্রাম। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকাচ্ছিলাম। এই সেই উত্তরাখণ্ড যার মহিমা ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি। হায়; আমার কেন এখানে জন্ম হয়নি!

শ্রীনগরে ডাক বাঙলো খুব উঁচু জায়গায় অবস্থিত। পথে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। আমি আমার বর্ষাতি পরে নিলাম, আর শালিগ্রাম পরল তার ক্যানভাসের কোট। ওর খুব ভয় হচ্ছিল পাছে ওর পাহাড়ের ঠাণ্ডা লেগে যায়। ডাক বাঙলোতে পৌঁছে দেখলাম ওখানে পি, ডব্লিউ, ডির দু'জন অফিসার রয়েছেন। আর আমার রিজার্ভেসনের খবর ওদের হাতে পৌঁছায় নাই। চৌকিদার ছিল অতি চমৎকার লোক। সে আমায় ওভারসিয়রের কোয়ার্টার খুলে দিল, আর তার নিজের বাড়ী থেকে আমার জন্য দুধ লাকড়ি সব এনে দিল। শুধু কি তাই? আমাকে বারবার অনুরোধ করলো তাড়াতাড়ি ভিজা জামাকাপড় ছেড়ে নিতে, পাহাড়ের প্রথম বর্ষার জল, অসুখ হতে পারে। আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই কাপড় জামা ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। শালিগ্রামও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে ওর খুব ক্ষুধা পেয়ে যাওয়ায় কোনমতে খাবার তৈরী করে অনেক রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে রুটি আর আমের চাটনী খাওয়াল। ভোরে উঠে চোখের সামনে পড়লো এক মনোরম দৃশ্য। মাথার উপর স্বচ্ছ নীল আকাশ, সামনে অলকনন্দা! দুয়ে মিলে কি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টিই না করেছে! কেবলই মনে হচ্ছিল, আমি যদি চিত্রকর হতাম! যদি এ দৃশ্যকে আমার তুলিতে ধরে রাখতে পারতাম! এক একবার পাহাড়ের চূড়া ঘিরে যাচ্ছিল এক এক রঙে—দশ দিকে অভিভূত করে পাহাড়কে পরিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল নব নব বেশ!

শ্রীনগর থেকে কর্ণপ্রয়াগের জন্য বাস ধরতে হয়। মোটর ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে জানলাম সেদিন ত' নয়ই পরের দিন কোনমতে দু'একটা সিটের ব্যবস্থা করা গেলেও যেতে পারে। একথাও শুনলাম বাস কোটদ্বার থেকে আসে তাই প্রথমে ওখানকার যাত্রীদের যায়গা দিয়ে পরে যদি অন্য যাত্রীর স্থান থাকে তবেই আমাদের স্থান পাবার প্রশ্ন উঠে। হাঁ, তবে যদি কিছু বেশী পয়সা খরচ করতে রাজী থাকি তবে···

আমি ত' একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। এই তীর্থযাত্রা! আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমি অলকনন্দার তীরে কমলেশ্বর মহাদেব দর্শনে চলে গেলাম। এককালে টেহরী রাজ্যের রাজা এই মহাদেবের পূজা করতেন পদ্মফুল দিয়ে আর এখন পূজা হয় দারুচম্পক দিয়ে। মন্দিরটি বেশ বড়। প্রবেশপথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে দারুচম্পকশোভিত তরুরাজী যার ফুল হাওয়ায় দুলে দুলে পথচারীর মাথা স্পর্শ করে পুষ্পবৃষ্টি করে যায়!

পরদিন সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে চৌকিদারের

কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সে আমাকে আন্তরিকতা আর সহানুভূতি দিয়ে পথের সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিল। আমি সাদরে তার উপদেশ গ্রহণ করে কর্ণপ্রয়াগ অভিমুখে রওনা হলাম।

দু'খানা বাস চলে গেল। এখন কি করি? আমার যাবার উৎসাহের উপর যেন তুষারপাত হয়ে গেল। পরের বাসটি এসেছিল পৌড়ী থেকে। সৌভাগ্যক্রমে তাতে ড্রাইভারের পাশের একটা সিট্ খালি ছিল। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল—"সামনের সিটে বসলে ভয় লাগবে না তো?" মনে মনে বললাম, ভয় পাবার হলে কি এই দেবভূমিতে আসতাম? যাই হোক আমার জন্যে সামনে বায়গা হয়ে গেল, আর শালিগ্রামকে পেছনে ঢুকিয়ে দিয়ে বাস চলতে সুরু করল।

এই রাস্তায় যেতে হ'লে অলকনন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে যেতে হয়। এখান থেকেই একটি পথ চলেছে কেদারনাথ অভিমুখে। বদ্রীকেদারের পাণ্ডারা এখানেই থাকে। কোথাকার এক রাজা বদ্রীধাম দর্শনের জন্য এসেছিলেন। রাজকুমার আর রাজা-সাহেব পাণ্ডার সঙ্গে সবিনয়ে আলাপ করেছিলেন। অন্য লোক কিন্তু পাণ্ডাকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছিল না। রুদ্র-প্রয়াগে রাজাসাহেব পাণ্ডাকে গাড়ীতে রেখে স্নানাদি সারতে গেলেন। পাণ্ডাজী আমার সঙ্গে পরিচয় করতে আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। আমার নাম ধাম যাত্রার উদ্দেশ্য সব জেনে নিয়ে বললে—বদ্রীনাথে কোন পাণ্ডার ওখানে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে না আমি আপনার জন্য ব্যবস্থা করব? বললাম আমার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে।

তবুও ভগবৎ দর্শনের জন্য ত' পাণ্ডার দরকার হবে। আমার নাম—

না, আমার পাণ্ডার মারফতে ভগবৎ দর্শনের ইচ্ছা আমার নেই।

—যদি ব্রাহ্মণকে কিছু দান না করেন তবে ত যাত্রার পুণ্য হবে না।

ভাবছিলাম এই ধরণের কথাবার্তা বলতে ত লেখা পড়া জানতে হয় অথচ ভাবতেও দুঃখ হয় লোকগুলো শতবর্ষ পেছনে পড়ে আছে।

কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছতেই খুব জোর বৃষ্টি সুরু হয়ে গিয়েছিল। পথে শুনেছিলাম এই গাড়ী নন্দপ্রয়াগে পৌঁছে দেয়, কিন্তু বর্ষার দরুণ আর আগে যেতে পারল না। বাসের ফিনারের অভদ্র আচরণ, শালিগ্রামের অনভিজ্ঞতা আর অক্ষমতা, তেমনি বর্ষার ঝড় তুফান সব মিলে আমার একাকিত্বকে দুঃসহ করে তুলেছিল! উঁচাপাঁচা আর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে পাহাড়ের উপর ডাক্ বাঙলোতে গিয়ে পৌঁছলাম। চৌকিদার অনুমতি পত্র না দেখে দাঁড়াতেই দেবে না। অনেক বলা কওয়া, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর এক কামরা খুলে দিল। তখনও আফিস বন্ধ হয়নি, এই ডাক্ বাঙলোতে থাকবার অনুমতি পাবার ব্যবস্থা করবার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। ফেরবার সময় পর্যন্ত কর্ণপ্রয়াগ অবধি পথের ডাকবাঙলো গুলোতে থাকবার অনুমতি পাওয়া গেল।

সন্ধ্যায় পি, ডব্লু, ডির হেডক্লার্ক এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন আমার কোন কিছুর দরকার হবে কিনা। বলে গেলেন সকালে যদি কোন বাস নন্দপ্রয়াগে যায় তবে তাতে তিনি আমার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন। সারা রাত খুব বৃষ্টি হলো। পিওরার পুল ভেসে গেল। বাস যাবার সম্ভাবনা খুব অল্পই ছিল। মোটর ট্যাক্সে মালপত্র আনার পর ভাবলাম, নন্দপ্রয়াগ অবধি যাবার যদি কুলি মিলে যায় তবে হেঁটেই রওনা হয়ে পড়ব। এখান থেকে নন্দপ্রয়াগ বার মাইল। আমার পায়ে চলা এখান থেকেই সুরু। আমি যখন পিওরার তটে দাঁড়িয়ে আছি তখন মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকার পথরক্ষী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা হোলো। তিনি বদ্রীনাথ থেকে ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল আমেরিকান যাত্রীদের একটি ছোট দল। এই যাত্রীদলের একজন মোটর সাইকেলে বদ্রীনাথ পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। এই অফিসার ভদ্রলোক আমাকে নন্দ-

রকারী আফিস, আদালত ইত্যাদি আছে। স্থানটি
ন্দর। পাহাড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শালিগ্রামের গা বমি
রছে। তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তারটি
তি সজ্জন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে
বার জন্যে খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সময় অল্প,
ই ফেরবার পথে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব এই
ল আমি চলে এলাম।

আমার পরবর্তী বিশ্রামকেন্দ্র "পীপল কোটি"।
খ সিরাসৈন নামে একটি স্থান আছে। মনে হয়,
তাদেবী কখনও এখানে শয়ন ও বিশ্রাম করেছিলেন।

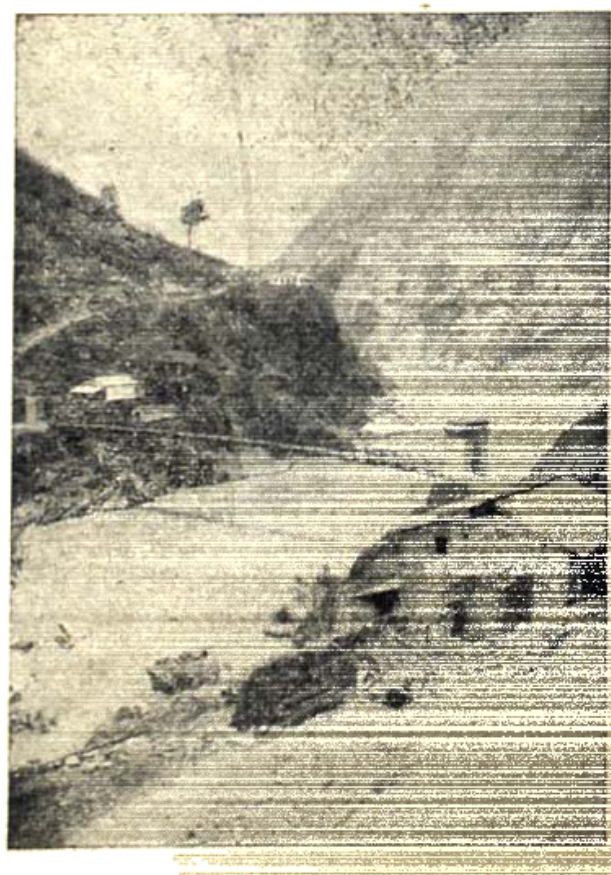

বিরহী গঙ্গার একটি দৃশ্য

একটি সরু নদী আছে—যাকে বলে বিরহী গঙ্গা।
রাস্তায় পগডণ্ডী থেকে মহিলা স্নান করিতেছেন
গোহনাতাল নামে একটি

কুলি নিয়ে যাওয়া উচিত
ার বাস থেমে গেল। বাসে
ছিলেন যিনি গারোয়াল দেশ-
র। তাঁর সাহায্যে আমার
বং পথেও বেশ সুবিধা হয়।
লায় ওর জন্য অপেক্ষা করে
জন্য দেরী করে সন্ধ্যা হয়ে
ষ্টি হচ্ছিল। ডাকবাঙলো
পাওয়া গেল। খাবার জল
রের একটি ঝরণা থেকে।
র বাজার থেকে চা তৈরী
নবণ গরম জলে পা ধুয়ে
শুয়ে পড়লাম। পরদিন
নাথ অভিমুখে পায়ে চলা

বার ৩৮৩
। বছরের ছয়মাস
ই উচ্চ শিক্ষিত।
ইল দূরে চমোলী। এখান
যাবার রাস্তা চলেছে।
পোষ্ট-আফিস, তেমনি

ুব সুন্দর। দেখতে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু হয়ে
ই। একা মেয়েমানুষ যাচ্ছি, তাই কোন কুলি
র সঙ্গে যেতে রাজী হোলো না। মাঝখানের বিশ্রাম
া না খেমে ঐদিন একেবারে গোলাপকোটি পৌঁছে
ম। রাস্তার দু'ধারে গোলাপফুল দেখে দেখে চোখ
য়ে যায়। মন আনন্দে নেচে উঠে। চড়াই উৎরাই
য়ে যেতে হয় সত্যি, কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য নয়।
দের বহু দল চলছিল বদ্রীনাথ অভিমুখে। রাস্তা
পাঁচ ফুট চওড়া। পি, ডব্লু, ডির বিশেষ ব্যবস্থ
ে। গরুড় গঙ্গা পৌঁছবার আগেই খবর পাওয়া গেল
াস্তার প্রায় একমাইল বিস্তৃত এলাকার পাহাড় ধ্বসে
পড়েছে। যাত্রীরা অবশ্য এও বলে যে রাতে বৃষ্টি হয়নি,
তাই চলা যাবে। দেড় ফুট চওড়া পায়ে চলার পথ, উপর
থেকে পড়ছে কালো কালো কয়লার মত ছোট বড় পাথর

বদ্রীধামের পথে একটি মনোরম দৃশ্য।
—পাশ দিয়ে চলেছে খরস্রোতা "গরুড় গঙ্গা"...

শস্যভূমি।

পরদিন যোশীমঠ অভি
যতদূর যায়, আকাশকে আড়া
চূড়ার পর চূড়া! গোলাপকো
এগিয়ে যাবার পর চোখে পড়
শিখর। মনে প্রশ্ন জাগলো এই
প্রহরী" যাকে খুঁজতে আমি এ
উপশিরার মতোই ছোট ছোট
ভেদ করে, হেলায় পাহাড়কে
গতিতে চলেছে সুন্দরী অলকন
প্রহরীর" সন্ধানও চলেছে
হাজার ফুটের কিছু বেশী
উঁচুতে। বেশ বড় ওায়গা।
এখানেই
পাশি
সরকারী
অফি
ডাক
আর
মেডে
হাস
হয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুপ্রয়াগের
পাওয়া আছে যার উপর দিয়ে

জন প্রান্তর প্রহরীর সত্যরূপ আমার চোখে পড়ল !

বদ্রীধামের একটি দৃশ্য

দু'ভাগ করে দাঁড়িয়ে আছে
তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে
ারা। সেই শিলাখণ্ডের মাঝ
লা পাথর, যার উপর শোভা
স্থিত এক অপরূপ নারীমূর্তি
ঠিক যেন অজন্তার গুহাচিত্র।
াকে অভিভূত করে ফেলল।
রে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য
ঘুরে ঘুরে নীচে নেমে পাশে
াম। একটু নাম্‌বার পরই
ক করে দিল, "মাইজী আগে
বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু
গেল না। শেষটায়

পরদিন বদ্রীধাম পৌঁছান স্থির ছিল। আঁকা বাঁকা চড়াই উৎরাই, তারপর ঘন জঙ্গল, খোলা হাই, [illegible] অলকনন্দা তেমনি উঁচু উঁচু পর্বতমালা পার হয়ে হনুমান চট্টি থেকে যে চড়াই সুরু হয়েছে তাই [illegible] হয়েছে। দীর্ঘপথ, ক্লান্ত দেহ, চলতে চলতে [illegible] শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যায় এমন এক পুরীতে [illegible] হলাম ভাষায় যার সৌন্দর্য বর্ণনা অসাধ্য। [illegible] মাঝে মন্দির। এপ্রিল থেকে [illegible] দর্শনার্থী যাত্রীর ভিড় লেগেই আছে। [illegible] জায়গা থেকে যাত্রীর সমাগম হয়। [illegible] বাঙলো বিরাট ময়দানের মাঝে খুব [illegible] অবস্থিত। শুনেছি [illegible] স্থান বলে গণ্য করা হয়েছে। [illegible] শিলা আছে যাকে [illegible]

নে নদীর ওপারে ভগবান বদ্রীবিশালের মন্দির
রের নীচে তপ্তকুণ্ড, যার উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করে
ারা ক্লান্তি দূর করে। ওখানেই শিলা দিয়ে ঘেরা
রদকুণ্ড"। কিংবদন্তী আছে যে বদ্রীনাথের স্থাপিত
হ. এখান থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর একটু
ই 'ব্রহ্মকপাল' সেখানে পিতৃপুরুষের আত্মার সদ্গতির
লোকে পিণ্ডদান করে। মন্দির কর্তৃপক্ষ, তেমনি ধনী
ং ব্যবসায়ীদের আনুকূল্যে এখানে অনেকগুলো ধর্ম
া তৈরী হয়েছে। পাণ্ডাদের দলও এখানে যাত্রী
জ খুঁজে বেড়ায়।

রাতে ভীষণ শীত পড়লো। শালিগ্রাম জ্বরে বেহুঁ
। পড়ে রইল। ওকে ওষুধ খাইয়ে এবং শোবার
স্থা করে দিয়ে বিশ্রাম করতে বলে আমি বাইরে
ারান্দায় গিয়ে বসলাম। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিতা রজনী—

বদ্রীবিশালের মন্দির

সামনে রজত শুভ্র তুষারমুকুটপরিহিত উন্নতশীর্ষ

সেই রজতশু
নিয়ে গেল তেমনি আমার
মূর্তিতে আমার কাছে প্রতিবিম্বি

পরদিন মন্দিরব্যবস্থাপকে
বসুধারা যাত্রার জন্য, ঘোড়া চা
দর্শনের জন্যই এই সাক্ষাৎ।
সাহেবের কন্যা সন্ধ্যারতির
দিয়েছিলেন। আরতির আ
বাণী শুনবার জন্য বসে
বদ্রীনাথের যাত্রার মাহাত্ম্য বর্ণ
এই পুণ্য তীর্থে তিনরাত কি
আর পুণ্য তাঁদেরই হয় যাঁরা প
কিন্তু এসব না জেনেও পু
বসুধারা যাবার পথে একটি গ্রা
এইটিই আমাদের ভারত ভূখণ্ডে
এখানে ভোটদের বাস। এই
ভূটান থেকে প্রবাহিত সরস্বত
এসে মিশেছে। বসুধারা চা
নীচে পড়বার সময় হাওয়ায়
এসে পড়ে, যাতে মনে হয়
চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা হচ্ছে।
তখন খুবই কাছে। অলকন
ফুট উঁচুতে অবস্থিত "সতো
হ্রদ" পর্যন্ত আসতেই প
পথে অনুসন্ধিনয় করতে হ
অক্সিজেনের শেষ হয়ে গিয়েছি

'সপ্তাপন্থ' দেখবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে ছিল। বস্তুধারা পৌঁছবার একটু আগে একটা ঢালানের (Slope) ঘোড়াটা আমাকে ফেলে দিল। পড়ে গিয়ে মনে হলো কি দরকার ছিল এতটুকুর জন্য ঘোড়া নেবার।

পথে বিভিন্নবর্ণের ফুল দেখে চক্ষুদ্বয় যেন এখানেই থেকে যাই। অথচ আর "মোক্ষপালে" বিভিন্ন রঙের নানা সব সময় ওদের জায়গা ফুলে ছেয়ে ছবে সেই পুষ্পরাজ্য যা মোক্ষধামে বিশ্রামলাভ করছে।

পুরাণবর্ণিত শ্যামবর্ণ ঘোড়া, আর ফিরে এলাম। চারদিন দেখতে দেখতে চলে গেল। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিছুদিনের জন্য থেকে যাই, আর কৈলাস পর্যন্ত ঘুরে একদম্ "মানস সরোবর" দেখে

ফিরবার পথে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত একই পথে ফিরলাম। ওখান থেকে বাস পেতে হলে পাঁচদিন অপেক্ষা করতে রাণীক্ষেত পর্যন্ত ৬৮ মাইল পথ হেঁটে আসবার সিদ্ধান্ত কোরলাম। আগের কুলী রাজী হলো না তাই নূতন কুলী নিয়ে ৬দিনে রাণীক্ষেতে পৌঁছাই। রাণীক্ষেত তো আমাদের এদেশেরই অংশ। রাস্তা খুব সুন্দর ও সুবিধাপূর্ণ। দশ বার মাইল দূরে দূরেই ডাকবাঙলো। এই রাস্তার উপর "আদিবদ্রী" আর লোভার মাঝখানে সদ্য ধ্বসে পরা এক পাহাড় ডিঙাতে হয়েছিল। পাথর পড়ছে, তার উপর পা রাখছি আবার একটা পাথর পড়লো—আবার পা দিলাম; কী দুর্গম, কী বিপদসংকুল যাত্রা! পা ফসকালো তো কয়েক শ' ফুট নীচে পড়ে একেবারে মুক্তি!

এইসব দেখে আবার একদিন ফিরে এলাম। অসুস্থ হয়েও ফিরিনি বা পথে কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি। বরং যা দেখে এলাম, যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম তা' জীবনে ভুলবার মতো নয়। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, প্রত্যক্ষ করে এলাম তা অবর্ণনীয়।

কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতাম। সম্ভবতঃ তাই আমায় রক্ষা করেছিল। কেনা খাবার কোথায়ও খাইনি বাইরে কোনদিন জল খাইনি। আমার সাথে থাকতো টিওনিক, আর খুব হাল্কা খাবার। চলতে শুরু করবার আগে কিছু খেয়ে নিতাম। দশ বারো মাইলের বেশী চলতাম না। সকালের দিকে রওনা হয়ে দুপুরের আগেই যতটুকু যাবার গিয়ে থেমে যেতাম। বিকালের দিকটায় বিশ্রাম নিতাম। এতে স্নান, খাওয়া দাওয়া সমস্ত নত করা যেত। বিকালের বর্ষার ঝড় ঝাপটার হাত থেকেও বাঁচা যেত। সাধারণ বিশ্রামগৃহে কোথাও থাকতে হয়নি তাই অসংখ্য মক্ষিকার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কিছু ওষুধপত্র ছিল, কিন্তু শালিগ্রামকে বদ্রীধামে দু'দিন ব্রাণ্ডি দেওয়া ছাড়া আর আমাদের দুজনের কোন ওষুধ দরকার হয়নি।

বিজ্ঞান জগৎ

জৈব ও অজৈবের সাড়া

গ. চ. ভ.

জীবদেহে বাহিরের আঘাত, উত্তেজনায় জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞাপক কতকগুলি লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই লক্ষণ পরিস্ফুট নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা এতই অপরিস্ফুট যে, বিশেষ জটিল পরীক্ষার সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনের অস্তিত্বই বুঝিতে পারা যায় না। সেরূপ ক্ষেত্রে জৈব-তড়িৎশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আঘাত, উত্তেজনায় জীব-শরীরে একপ্রকার তড়িৎশক্তির উন্মেষ ঘটে। ইহারই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী হইতে কোন কিছুর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জ্ঞাপক চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'জৈব ও অজৈবের সাড়া' বিষয়ক যুগান্তকারী গবেষণার ফলে যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে শারীরতত্ত্ববিদ ও জীবতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকদের প্রচলিত ধারণা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। জীবের মধ্যেই জীবন থাকিতে পারে—অন্য কোথাও তাহা সম্ভব নহে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রভৃতি যাবতীয় জীবন্ত পদার্থ) উপরেই জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞাপক এই জৈবতাড়িতিক পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখিতেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র কতকগুলি অদ্ভুত পরীক্ষার প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন—জীবনের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় জীবের ন্যায় জড়-পদার্থও একই ভাবে সাড়া দিয়া থাকে। কাজেই ইহাকে জীব ও জড়ের পার্থক্য জ্ঞাপক চূড়ান্ত পরীক্ষা বলা যায় না। জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী মনীষীদের যেখানে অনুমান বা কল্পনার আশ্রয়ে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল তথায় জগদীশ-চন্দ্রের এই গবেষণালব্ধ ফল তাঁহাদের অগ্রগতিকে যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

জৈব পদার্থের উৎপত্তির ধারা বিবেচনা করিলে জৈব ও অজৈবের মধ্যে একটা গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নহে। এই পর্যন্ত যত প্রকার জৈব পদার্থের বিষয় জানা গিয়াছে তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী জৈব পদার্থ হইতেই উদ্ভূত; অর্থাৎ পূর্ববর্তী জীবন হইতেই পরবর্তী জীবনের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু সবুজ কণিকার সাহায্যে উদ্ভিদ অজৈব পদার্থ হইতেই জৈব পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং প্রাণীরা তাহাই দেহসাৎ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে—জড় ও জীবের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দেশ করা সুকঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল অবস্থা-সাদৃশ্যে বা ঘটনাসাম্যে বৈজ্ঞানিক নির্ধারিত হয় না। শারীরতত্ত্বের পরীক্ষামূলক গবেষণায় এই সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? জগদীশচন্দ্রের পূর্বে এরূপ অদ্ভুত অসমসাহসিক কল্পনা কাহারও মনে উদিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ অবশ্য ঘটনাচক্রে এই সমস্যা তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহারই ফলে তিনি জড় ও

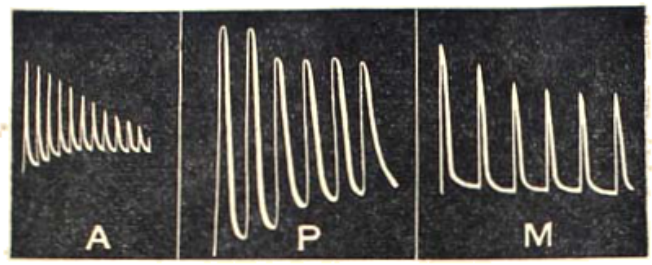

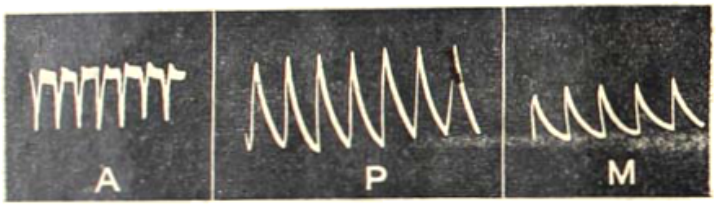

৩৬৮ স্নায়ুতন্ত্রে
উপায় অবলম্বন

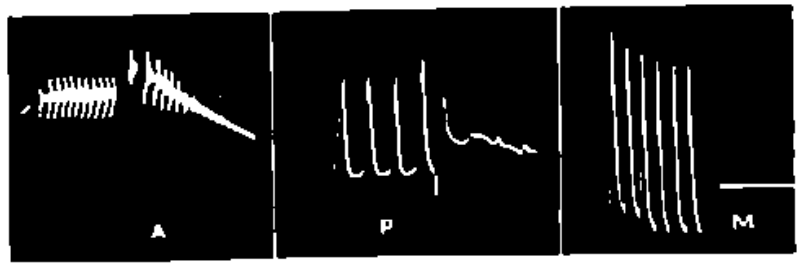

বৈদ্যুতিক উপায়ে গ্যালভ্যানোমিটারের
সুস্পষ্ট করা যাইতে পারে। এই

জৈবতাড়িতিক পরীক্ষাই শারীরতত্ত্বজ্ঞদের জীবনের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব-জ্ঞাপক প্রধান পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার সাহায্যেই শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত অভিনব তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

অজৈব পদার্থও স্নায়ু-সূত্রের অনুরূপ তাড়িতিক সাড়া দিতে সক্ষম কিনা তাহা বিবেচনা করিবার পূর্বে পরিস্ফুট জীবনীশক্তিসম্পন্ন উদ্ভিদজগতের কথা স্বতঃই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন—তাহারাও আঘাত, উত্তেজনা বা বিষ, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতিতে প্রাণিদেহের

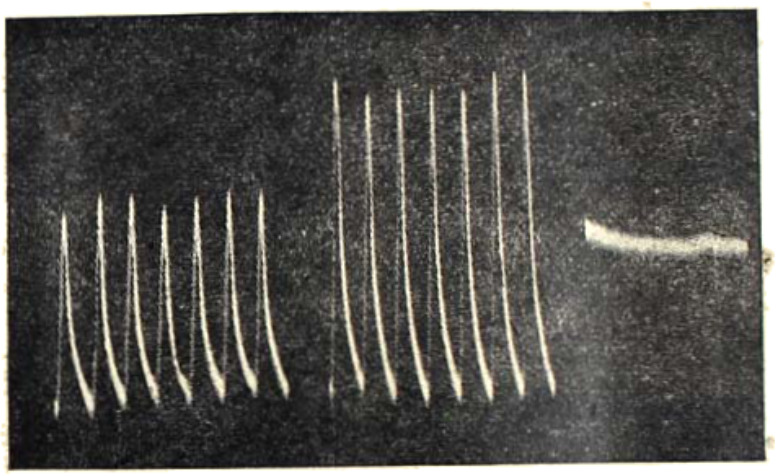

একটুকরা টিনের উপর পটাস প্রয়োগে সাড়া-লিপি। বাঁ-দিকে স্বাভাবিক অবস্থায় টিনের টুকরার স্খলিখিত সাড়া-লিপি। মধ্যে—পটাস প্রয়োগে উত্তেজিত অবস্থার ডানদিকে—অত্যধিক পটাস প্রয়োগে অসাড়তার লক্ষণ।

মতই সাড়া দিয়া থাকে। শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে না পাইয়া জগদীশচন্দ্র অসম সাহসে অজৈব পদার্থের রহস্য উদ্ঘাটনে অগ্রসর হইলেন। অসম সাহস বলিতেছি এই জন্য, তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকেরা পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলী হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জীবিত বস্তুকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলে তাহার যেমন সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়, অজৈব পদার্থও সেরূপ মৃত বস্তুর ন্যায় সাড়া দিতে অক্ষম। তখনকার দিনে প্রচলিত এই বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধ মত পোষণ করা ভারতীয় এক নবীন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যে কিরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অবশেষে তাঁহার সাধনাই জয়যুক্ত হইল। বহু পরীক্ষায় তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, অজৈব ধাতুখণ্ডও প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রাণী বা উদ্ভিদদেহের ন্যায় একই রকমের সাড়া দিয়া থাকে। যে যন্ত্র সাহায্যে উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের মাংসপেশীর সাড়া লিপি-বদ্ধ হইয়াছিল, সেই যন্ত্র সাহায্যেই একটুকরা ধাতব তারের মধ্যে তিনি এক অচিন্ত্যপূর্ব অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ক্লোরোফর্ম, বিষ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ এবং উত্তাপ, আলোক, আঘাত বা উত্তেজনা প্রয়োগে ধাতব তার যন্ত্রকৌশলে তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্খলিখিত বিবরণ প্রদান করিতে লাগিল।

পরীক্ষার জন্য টিন বা অন্য ধাতুনির্মিত এক প্রস্থ তার 'অ্যানিল' করিয়া তাহার 'টেম্পার' সর্বত্র সমান করিয়া লইতে হয়, তারপর খাড়াভাবে টাঙিয়া রাখিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে উপর হইতে নীচে বার বার ঘষিয়া লইলে, সামান্য কিছু 'টার' অবশিষ্ট থাকিলেও তাহা বিদূরিত হইবে। ইহার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া কলের জলে ডুবাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলেই তারের সাড়া দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এই উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও তারটা যেন সময়ে সময়ে একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পড়ে। আলোর সংস্পর্শের বিপর্যয়ই যদি সাড়া দিবার কারণ হইয়া থাকে তবে এই অবস্থায় পুনরায় 'অ্যানিল' করিয়া লইলেই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া যাইতে পারে।

পরীক্ষানুযায়ী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত
প্রান্ত গ্যালভ্যানোমিটারের সঙ্গে যোগ

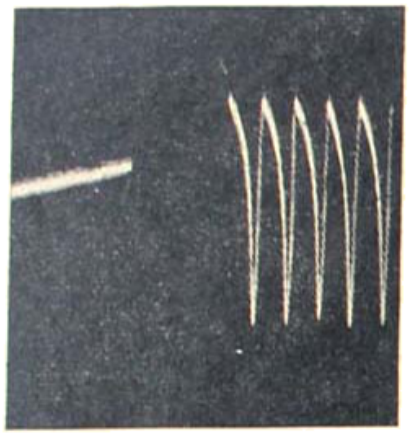

রে উপর অম্লানিক অ্যাসিড প্রয়োগের আগে
ও পরের সাড়া-লিপি

দিলে তারের দুইটি প্রান্তই সমতাড়িতিক
র বলিয়া যন্ত্রে কোনোই পরিবর্তন লক্ষিত হইবে
ন তারের উভয় প্রান্ত তড়িৎ-পরিচালক হিসাবে
হয় তবে সামান্য তড়িৎপ্রোত গ্যালভ্যানো-

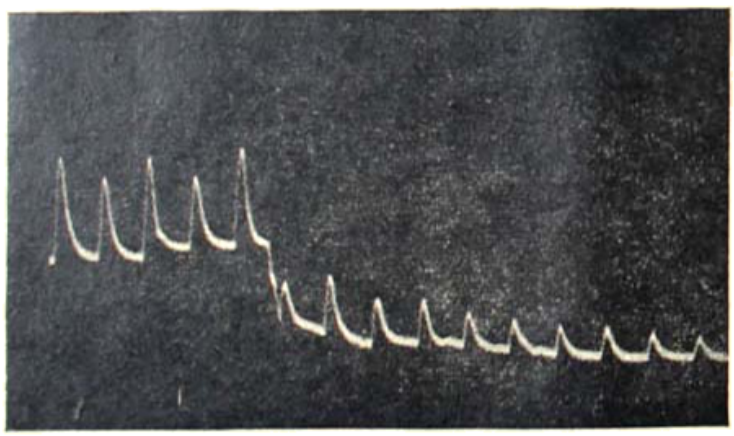

ফুলকপির পাতার বিষ-প্রয়োগের পূর্বে ও পরে গৃহীত সাড়া-লিপি।

মিটারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে, তখন তারের এক প্রান্তে মৃদু ঘা দিয়া বা সামান্য মোচড় দিয়া আঘাত করিলে দেখা যাইবে—অনাহত প্রান্ত হইতে আহত প্রান্তের দিকে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ব্যাপারটি ঠিক স্নায়ু-সূত্রের সাড়ার মতই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তারের দুই প্রান্ত যদি একই সময়ে মোচড়াইয়া দেওয়া যায় তবে পরস্পর বিপরীত অভিমুখী তড়িৎ-প্রবাহের ফলে গ্যালভ্যানোমিটারের রশ্মি-প্রতিফলকটি একই স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে। কাজেই যে কোন এক প্রান্তে উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসাহায্যে তাহার সাড়া-লিপি গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই উপায়ে বিভিন্ন উত্তেজক বা অবসাদক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে মাংসপেশী বা স্নায়ুসূত্রের সাড়ার মত জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন ধাতুখণ্ডে একই রকম সাড়ালিপি পাইতে সমর্থ হইয়াছেন। পেশীর উপর বিভিন্ন বিষের যেমন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়, বিভিন্ন ধাতুখণ্ডেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ প্রয়োগে মৃত্যু ঘটিলে স্নায়ু বা পেশীসমূহের যেমন সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়, ধাতুখণ্ডেরও সেরূপ ঠিক একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ক্রমাগত সাড়া দিবার ফলে জীবন্ত পেশীর মত ধাতুখণ্ডও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার বিশ্রাম দিলে তাহাদের ক্লান্তি দূর হয়। বিষ প্রয়োগে জীবন্ত পেশীর মৃত্যু ঘটাইলে যেমন তাহার আর সাড়া দিবার সম্ভাবনা থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজৈব পদার্থের মধ্যে তিনি অনুরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মোটের উপর তাঁহার এই জাতীয় বহুবিধ পরীক্ষা হইতে দেখা যায়—জৈব পদার্থের জীবিত ও মৃত অবস্থা-ভেদের মত অজৈব পদার্থেরও একই রকমের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিশেষজ্ঞের যাহাকে জীবনীশক্তিজাত সাড়া বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহা পদার্থের আণবিক সংস্থানের পরিবর্তনজনিত ফল মাত্র। এই আণবিক সংস্থানের পরিবর্তন, অবস্থাবিশেষে জৈব ও অজৈব উভয়বিধ পদার্থে একই নিয়মে ঘটিয়া থাকে।

মাংসপেশীতে ঢিমটি কাটিলে বা মোচড় দিলে অত্যন্তরস্থ আণবিক শৃঙ্খলা সহজেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। জোরে মোচড়াইয়া দিলে সেই ধকল আর কাটাইয়া উঠিতে পারে না, তখন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে, শারীরতাত্ত্বিকেরা জৈব পদার্থের সাড়ার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া ইহাকে জীবনীশক্তি নামক এক

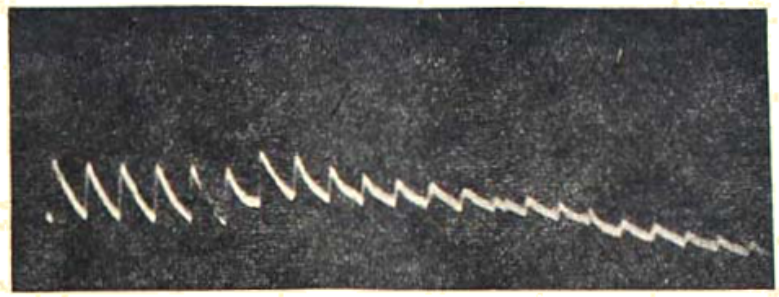

মূলার উপর বিষ প্রয়োগের পূর্বে ও পরের অবস্থার সাড়া-লিপি।

অজ্ঞাত শক্তির ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—কারণ জীবদেহের অনেক বৈচিত্র্য, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন শাস্ত্রের সাধারণ নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জৈব ও অজৈব উভয় জাতীয় পদার্থের আণবিক সংস্থানের পরিবর্তন হেতুই এই সাড়ার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ইহা পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রাসায়নিক নিয়মই মানিয়া চলে। বাহিরের আঘাত, উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতার মূলে জৈব ও অজৈব পদার্থে যে একই শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাঁহার গবেষণালব্ধ এই অভিনব তত্ত্ব হইতে জীবন-রহস্য সমাধানের প্রশস্ততর পথের সন্ধান মিলিতে পারে।

বোমা ও শান্তি

দিবাকর

সকালে চায়ে চুমুকের সঙ্গে অন্তত একখানা কাগজে চোখ বুলোন চাই। ব্যতিক্রম হ'লে চা বিস্বাদ লাগে, চোখে অন্ধকার দেখি, বেঁচে থাকার মানেটা হারিয়ে ফেলি। ভাবতে পারিনা চা আর খবরের কাগজ না থাকলে মানুষ বাঁচে কি করে, রসনা এবং মনের তৃপ্তি হয় কি দিয়ে!

ও দুটি আমার চাই-ই চাই। যতদিন বাঁচি (অবশ্য অক্ষত হয়ে) হে ভগবান, ও দু'টি থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না! আর আমার মৃত্যুর পরেও যেন ও দু'টির চাষ মানব সমাজে অবাধে চলে। (আমার প্রার্থনা উত্তর মানব-সমাজের জন্যেও)।

চা এবং খবরের কাগজের সঙ্গে আমাদের মত সভ্যতা-অভিমানী ব্যক্তিদের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। চা-এ খিদে মরে খবরের কাগজে নলেজ বাড়ে। আমি হিসাব করে দেখেছি, দৈহিক মানসিক সুখ বিধানের নিমিত্ত আর যে কোন ব্যয়ভার অপেক্ষা ও দু'টির ব্যয়ভার শতাংশের একাংশ। এতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, ও দু'টির সম্যক চর্চা করলে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে অতিরিক্ত,

অসভ্যতার কেরামতি খাই খাই করে চেঁচামেচি করতে হবেনা এবং অনেক দুর্ভাবনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজে চোখ বিলে পৃথিবীর রঙ বদলে যায়। আর অভ্যাসে এমন হয়ে যায় যে, মুখস্থিত চায়ের পেয়ালার সঙ্গে চোখের সামনে যে কাগজখানা ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে থাকে তাকে যথেষ্ট প্রসারিত না-করেই বলা যায়, আজকে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ সংবাদ কি?—সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টা এবং আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষায় জাপানের আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে তেজস্ক্রিয়া!

যাঁরা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রিলি-ব্যবস্থা এবং অবস্থা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, কোন একটা যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি প্রচেষ্টা (সিংএর মত) কাঁধে কাঁধে চলতে চেষ্টা করে। আর একটা যুদ্ধ না বাধা পর্যন্ত প্রতিনিবৃত্ত হয় না। মনুষ্যোচিত কাযের মনুষ্যোচিত সমালোচনা হ'য়ে মনুষ্যোচিত ভাবেই শেষ হয়। অর্থাৎ আবার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধেই যদি যুদ্ধের শেষ হ'তো তাহলে পৃথিবীতে একটির বেশি দুটি যুদ্ধ হ'তো না। শান্তি-কর্মীরা এ পর্যন্ত যা কিছু স্বস্তি বচন আউড়েছেন তা যুদ্ধেরই পুনরায়োজন। তারস্বরে সভা করে বা সই-সাবুদ যোগাড় করে' যাই করা হোক নিঃসন্দেহে তাতে শান্তি নেই। দল ভাগাভাগিতে দলাদলিই বাড়ছে কেবল, পৃথিবীতে অশান্তি ঘনিয়ে উঠছে! কি নিউইয়র্ক, কি মস্কো, কি জেনিভা কোথাও শান্তি নেই।

নেই শান্তি কামনায় কোন আন্তরিকতা। এমন তো কেউ দেখিনা, শান্তির নামে প্রভু যুদ্ধের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, সর্বত্যাগী হ'য়েছেন। পক্ষান্তরে শান্তি পুরস্কার মনকে আঁখি ঠারছে! আজকে পৃথিবীতে পক্ষ-মুখে রামনাম গাওয়া হ'চ্ছে না, বদলে মরা-মরা বা মার-মার বলা হচ্ছে। নিজের ঘর শাসন করতে গিয়ে পাঁচ দালালের মধ্যস্থতায় যেটুকু শান্তি অবশিষ্ট ছিল তাও শেষ হ'চ্ছে। শান্তির দালালরা ক্রমেই অশান্তি বাড়িয়ে তুলছে।

আপনি মোড়লদের পাঁয়ে মানতে সুরু করেছে—ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিদ্বেষ ধূমায়িত হ'চ্ছে, পরস্পর সন্দেহ বাড়ছে! সর্বাত্মক ধ্বংসের উদ্ভাবনীতে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন—প্রাণ ধারণের উপাদান প্রাণ নাশনের আয়ুধে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট সমর নায়ক বলেছিলেন, হাইড্রোজেন বোমা থেকে নিরাপত্তার একমাত্র উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান —যেখানে ঐ মারাত্মক বোমা পড়বার কোন সম্ভাবনাই নেই, কেননা যেই ফেলুকনা কেন, ধ্বংস উভয় পক্ষেই সমান—সলতের বাতি দিতে আর কেউ থাকবেনা!...

শান্তির সমস্যা আজ মানুষের নিছক স্বার্থদ্বন্দ্ব নয়। পরস্পর বিরোধী মতবাদ। স্বার্থদ্বন্দ্বের রূপ আছে, প্রকৃত ঘটনায় তার নিরসন সম্ভব, কিন্তু এই মতবাদ—প্রত্যক্ষ কোন রূপ নেই, তাই ন্যায় মূলে মূলে কিছুতেই সোজা করা যায় না, উষ্কানিতে রক্তবীজের মত বেড়েই চলে, শাখা-প্রশাখায় দুর্বলকে আক্রান্ত করে, ঘর-জ্বালানি পর-তোলানি।...

পরস্পরের মৃত্যুবাণ আমরা পেয়ে গেছি। পরশুরামের কুঠার প্রস্তুত। পৃথিবীকে বার বার মানবশূন্য করে, যদি শান্তি আনতে হয় তার জন্যে অবশ্যই শান্তিকামীরা চেষ্টার ত্রুটি করবে না। সুতরাং হাইড্রোজেন বোমার নামে যারা আজ ভয় পাচ্ছে তারা পৃথিবীতে শান্তিই চায় না!

(আপনি যদি নিয়মিত খবরের কাগজের একনিষ্ঠ পাঠক হন তা হ'লে নিশ্চয়ই যুক্তিটা ধরতে পেরেছেন!)

সুর্য-স্বপ্ন

শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

আমি তো চলেছি নিত্য আপনার পথ চিনে চিনে—
কখনো পশ্চিমে-পুবে, কখনো বা উত্তরে দক্ষিণে,
কখনো একেলা
আবার কখনো কারো হাত ধরে কেটে গেছে বেলা।
কতো অমাবস্যা রাত ফেলে গেছি আমার পশ্চাতে
প্রদীপটি নিতে গেছে বারে বারে কী ঝোড়ো হাওয়াতে,
বর্ষা-সিক্ত দিনে
পা টিপে পা টিপে হেঁটে সাবধানে গেছি পথ চিনে।

এত পথ পার হয়ে কেন আজ দেখি অবশেষে
আমার আশার পাখি কোথায় হারিয়ে গেছে ভেসে,
তবে কি গো, তবে
এতদূর হেঁটে আসা সমস্ত নিষ্ফলশ্রম হবে?

ক্লান্তিকে করেছি ঘৃণা, মুছিনিকো কপালের ঘাম—
তার বিনিময়ে আজ অবশেষে আমি কী পেলাম!
রাত্রে যেই স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন মিথ্যা হয় প্রাতে,
প্রভাতী প্রত্যাশা যত ব্যর্থ তাহা বিষণ্ণ সন্ধ্যাতে—
এসময়ে যদি শেষবার
সূর্য-স্বপ্ন চোখে এঁকে তুমি এসে সুমুখে দাঁড়াতে!

বর্ষামঙ্গল

শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ধূ ধূ গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে
আবার শ্যামল ছায়ার শিশির। আকাশের নীল,
মেঘের বলাকা, যদিও উধাও। সারাদিন ধ'রে
ক্লান্ত করুণ একটানা সুর। বৃষ্টি-নূপুর
বেজে চলে আহা শুধু অবিরাম! কেবল অঝোর
জল আর জল। কী অবসন্ন শ্রান্ত দুপুর
ঘনায় মনের দিগন্ত জুড়ে। রঙ্-ঝিলমিল
আকাশে আলোর আলপনা মোছে মেঘের সায়র!

বৃষ্টির ছাঁট খোলা জানালায়। পাতার ফরাসে,
ধানের ক্ষেতের আলে, খাল-বিলে, মাঠে আর ঘাসে
অবিশ্রান্ত জলের শেফালি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে!
মেঘ-মেয়েদের কান্নার সুর বাতাসের স্বরে!

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর জুড়ে শ্যামল আশার
ভিজে-ভিজে সুর: আবার আষাঢ়, সজল আষাঢ়!!

চেনা পথ

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

চেনা পথ চলে গেছে করশিয়া পার হ'য়ে পণ্ডীর দিকে।
নদীর গতির মত আঁকাবাঁকা, বেঁধে রাখে এ'
পাহাড়টাকে।

হয়নি আমার সাথে এর দেখা এখানের প্রথম তারিখে,
তারো আগে, আরো আগে এ'পথ সাজানো ছিল
ভাবনার থাকে।

এ'পথ দেখেছি আমি বহুদিন
দুপুরের চিন্তায় নির্জন,
অলস মনের মহা-শিরে
রোজ হয় এ'পথের চিত্রণ।

ঢেউ যেন চঞ্চল,
ছাড়া পেলে এক্ষুণি মাতবে;
প্রবীণ পাহাড় শুধু গম্ভীর,
চোখের শাসনে তারে বাঁধবে।

শ্রাবণের ছাই-রঙা স্বপ্নে
পাহাড় যখন থাকে মগ্ন,
এ'পথ তখন লাল লজ্জায়,—
হীন পৃথিবীর রূপ নগ্ন।

কখন মেঘের মন টলবে,
চাইবে মাটির রূপ ফিরাতে,
চিকণ জলের ধারা বইবে,
এ'পথের শিরা-উপশিরাতে।

শীতের বাতাস মরে হুঙ্কার,
সবুজের সাথে এর বিরোধ।
তবু তারে ভালবাসে পল্লব;
স্নেহ ঢালে, হয়ে যায় নিঃশেষ।

কখনো এখানে নাচে কাঞ্চন,
নয় ক্লান্ত মরণের অন্তে।
এমনি করেই এর দিন যায়
বর্ষায়, গ্রীষ্মে, বসন্তে।

চেনা পথ চলে গেছে করশিয়া পার হ'য়ে পণ্ডীর দিকে,
চেনা গ্রাম থেকে চেনা গ্রামের নিরীখে।
একে চিনি বহুদিন, বহুদিন আগে।

এ'পথ সাজানো ছিল চিন্তার উষ্ণ সোহাগে।
তবু দেখা প্রতিদিন, যাই আসি বাঁধা এক পথ;
চেনে থাকি একদিন, আরো চেনা হয় চেনা পথ।

মল্লিকার ঝড়

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী

বসন্ত হাওয়ার স্পর্শে কি ছিলোল মল্লিকার ঝাড়ে,
ফুলগুলি টলমল নেশা জাগা অশান্ত মাতাল,
এপাড়ের ফুলগুলি ওপাড়ের গায়ে ঢলে' পড়ে,
প্রেমিকের প্রেমস্পর্শে রাঙা হয়, আভা তাই লাল।
আশা তবু মেটেনাকো ভাষা জাগে স্পর্শাতুর দেহে,
আবার কামনা করে বসন্ত হাওয়ার দোলা দেওয়া ;
প্রেমের নেশায় মত্ত দেহে কোথা' ক্লান্তি লেশ নেই,
আবার দোলায় তা'রে বসন্তের মৃদু মন্দ হাওয়া।

একদিন আসে ক্রমে হাহাকার মল্লিকার ঝাড়ে—
জেগে ওঠে। লতা হতে ঝরে পড়ে শুকনো ফুলেরা !
উদাস দৃষ্টিতে চায় শ্যামল পাতারা পরে পরে,
বসন্তের হাওয়া শুধু হাসে শুধু স্বপ্নের কিনারা।
নীচে ঝরা ফুলগুলি অতীতের স্বপ্নেতে বিভোর,
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস নিদাঘের শুষ্কতায় মেশে।
একদিন তা'ও থামে ঝরা ফুলে আভা অস্তিমের
মল্লিকা লতার গানে হাহাকার সুর ভেসে আসে।

লাল-নীল

শ্রীঅনিমেষ সেন

নীলফুল, লালফুল
কত ফোটে বনে,
নীল-লাল লাল-নীল
আষাঢ়ে শ্রাবণে।

নীল মেঘ নীল শাড়ী
নীল নীল পাখী,
লাল টিপ্ লাল গাল
অপরূপ নাকি !
লালে মেয়ে নীল মেয়ে
হাঁটে চুপি চুপি,

টুপ্‌টাপ স্মৃতি ঝরে,
স্মৃতি বহুরূপী।
শুধু লাল, শুধু নীল
জানালার কাঁচে,
লালরোদে নীল পাখী
আলিসায় নাচে।

সব নীল সব লাল
দুরন্ত জোয়ার
লালে মিশে নীলে মিশে
সব একাকার।

জেটি

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

শত সাইক্লোন তাড়িয়ে আমি এবার
জেটিতে কি ঠাঁই পাব না একটিবার
তোমার ভরসে হে রাজকন্যে আর
দুঃসমুদ্র পার হব কতবার ?

আশা নিরাশার ছায়ায় রাঙা শিখা
দুচোখে লোভের জ্বেলেছে মরীচিকা —
সেদিকে তাকাই তোমার অনামিকা
ইসারায় টান টানে কি দুনিবার।

হতাশ সায়েও ভেঙেছি কত তুফান
দুস্তর দেশে কতবার অভিযান
করেছি ক্লান্ত হৃদয়ে, তবুও প্রাণ
কত অশান্ত সাগরে ছুটবে আর ?

তাতার তিমির দিল যে দুর্গতি
মোহের মশালে জ্বেলেছি তার যতি
এখনও অনড় আমার দুর্মতি
পোরবন্দর কোথায়—চাই আমার।

কুয়াশার যবনিকার এই আড়াল
ছিঁড়বে এ আশা এখনও ছাড়ে নি হাল
দুচোখে উষার রঙীন রঙমশাল
আশা নিরাশার ছাই করে কাঁটাতার।

তাই এ নিশে একা এ বালাপাহাড়
ভাঙা হাল ছেঁড়া পাল নিয়ে বারবার
ছুটবে, জেটিতে ভিড়বেই একবার
হে রাজকন্যে তোমার জন্যে মন
দুঃসমুদ্র পার হবে শতবার।

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য

ভ্রুক কমিটির রিপোর্ট।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বে-সরকারী শিল্পের যে ভূমিকা নির্দেশ করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়া না ওঠায় গত বৎসর অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া শ্রী এ. ডি. ভ্রুককে সভাপতি করিয়া "বে-সরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ" সংক্রান্ত কমিটি নিয়োগ করেন। কর তদন্ত কমিশনের বিবেচনাধীন উপায় সমূহ ছাড়া আর কোন্ কোন্ উপায়ে বে-সরকারী শিল্প-ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ বর্ধিত করা যাইতে পারে, বিশেষতঃ সংহত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, তাহাই ভ্রুক কমিটির তদন্তের বিষয় ছিল। আনন্দের বিষয়, এই কমিটি প্রশ্নটিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং মাত্র ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া যথেষ্ট কর্ম-তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। গত ২৩শে এপ্রিল কমিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে বে-সরকারী শিল্পক্ষেত্রে নূতন মূলধন নিয়োগ ১৯৫১-৫৩ সাল পর্যন্ত সময়ে লগ্নীর পরিমাণের দ্বিগুণিত করিতে হইবে। বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর মূলধনের সমস্যা ততটা তীব্র হইয়া উঠে নাই, কিন্তু নগদ তহবিলের অভাবে মাঝারী ও ছোট শিল্পগুলির বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। বে-সরকারী লগ্নীর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত "অর্থনৈতিক আবহাওয়া" সৃষ্টির উপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সরকারের জাতীয়করণের নীতি সম্বন্ধে উদারভাব অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। শ্রমিক আইন ও শিল্প ট্রাইব্যুনালের রায় সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও কমিটি বলিয়াছেন। কমিটি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, বণিক সঙ্ঘ, উৎপাদক সঙ্ঘ প্রভৃতি সংস্থাগুলির কর্তব্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিয়া ব্যবসায় পরিচালনের মান ও নীতি উন্নীত করা।

আর্থিক নীতি সম্পর্কে কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কতিপয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদেশ হইতে মুদ্রাস্ফীতির চাপে সহায়তা, কর্ম-সংস্থানে অবনতি লক্ষণীয়; সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টার লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উন্নয়নের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আর্থিক ক্ষেত্রে কতকগুলি সমন্বয় বিধান আবশ্যক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলমার্কেট স্কীম, সমবায় ব্যাংকে ঋণদান ব্যবস্থার প্রসার "রি-ডিস্কাউণ্ট" ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আরও উপযুক্ত সমন্বয় বিধান করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন প্রভৃতির মাধ্যমে মূলধন সরবরাহ বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে কমিটির বহুশ্রমে ও বহুতথ্যে সমৃদ্ধ সুপারিশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পের ক্ষেত্রে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্যও কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। ব্রুকগণ ও দেশীয় ঋণদাতৃগণ যাহাতে অর্থলগ্নীর সুব্যবস্থিত বাজারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সহযোগিতা করিতে পারেন, তাহার জন্যও কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ছোটখাট শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কমিটি এই শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন এবং যে সকল ব্যবস্থা বর্তমানে বলবৎ আছে তাহা ছাড়াও এই শিল্পগুলির প্রতি আনুকূল্য করিবার জন্য অবিলম্বে ৫ কোটি টাকা মূলধন ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৫ বৎসরের মেয়াদে ১০ কোটি টাকা (সুদহীন) ঋণ লইয়া একটি "বিশেষ উন্নয়ন সংস্থা" গঠন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শিল্প-সমূহকে কারিগরি ও পরিচালনা সংক্রান্ত দিক হইতেও সাহায্য করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের জন্যও কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

"বিশেষ উন্নয়ন সংস্থা" প্রভৃতি কতিপয় সুপারিশের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলেও মোটের উপর সুপারিশগুলি যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং উহাদের রচনাকালে যে প্রগতিমূলক মনোভাবেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণেতাদের রিপোর্ট

ভারতসরকারের আমন্ত্রণক্রমে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাবিদ্‌গণ এদেশের ছোটখাট শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। বহুতথ্য সমৃদ্ধ এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ছোটখাট শিল্পের পরিচালনা ও উৎপাদন পদ্ধতির ত্রুটি আধুনিক যুগের শিল্পক্ষেত্রের নৈপুণ্য রক্ষা ও ব্যয় হ্রাস করিয়া শিল্পোৎকর্ষ সাধনের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোন্নয়নের জন্য কমিটি সাতটি সুপারিশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি, যথা—চারিটি আঞ্চলিক কারিগরি সংস্থা গঠনের, একটি বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের সহযোগিতায় একটি "সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংসদ" স্থাপনের সুপারিশগুলি ইতিমধ্যেই সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সমবায় পরিচালনা পদ্ধতি শিক্ষাদানের ও সর্বোচ্চ স্তরে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হাতে রাখিয়া সমবায় সমিতির পরিচালনা বে-সরকারী মহলে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে ভারতের গ্রামে গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে ব্যাপক আকারে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাঁহাদের অভিমত অনুসারে, ভারতীয় বাজার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ এবং শহর ও গ্রাম সমূহে যদি এই বাজারের পরিপূর্ণ উন্নতি সাধন করা যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ পৃথিবীতে বৃহত্তম শিল্প বিপ্লব আনা যাইতে পারে।

রিপোর্ট উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। সরকারী ব্যবস্থায় সুপারিশগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে পরিণত হয়, তৎপ্রতি জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিবে।

শিল্পোন্নয়ন সংস্থা।—(ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন)

ভারতসরকার কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মাচারীর পরামর্শক্রমে এই সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সংস্থা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এই হিসাবে যে, ইহা কেবলমাত্র নূতন শিল্প স্থাপনের প্রশ্নই বিবেচনা করিবে। এই সংস্থাকে মোটামুটিভাবে গড়িয়া তুলিতে আরও কয়েকমাস সময় লাগিবে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় গঠিত এক ষ্টিয়ারিং কমিটি ইহার সংবিধান রচনা করিয়া ভারত-সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। এক-কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত হইবে বলিয়া পরিকল্পিত এই সংস্থা অবিলম্বেই যে সমস্ত শিল্পে বে-সরকারী মূলধন ও প্রচেষ্টার অভাব দেখা যায় তাহার উন্নয়নে মনোনিবেশ করিবে। সংস্থা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকারের জামিনে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে। কয়েক বৎসর পরে এই সংস্থার পরিচালনা ভার বে-সরকারী মহলে ন্যস্ত করিবার কথা আছে।

ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণ যেরূপ ঘৃণাভাব আছে এবং তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-

সরকারগুলির আর্থিক কার্যক্রম যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই সংস্থার পরিচালনাভার বে-সরকারী মহলে ন্যস্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

রাস্তাঘাটের উন্নয়ন

প্রধানতঃ পাঁচটি উপায়ে পরিবহন কার্য হইয়া থাকে—আকাশ পথ, জল পথ, ভূগর্ভস্থ পথ, রেলপথ ও রাজপথ বা সড়ক। আমাদের দেশে রেলপথ ও রাজপথ ব্যতীত অন্য প্রকার সংযোগ ব্যবস্থা নিতান্তই নগণ্য। রেল পথও যাহা আছে তাহা এত বড় একটি দেশের পক্ষে নিতান্তই অ-পর্যাপ্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে মাত্র ৩৪০০০ হাজার মাইল রেলপথ আছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রতিশত বর্গমাইলে ভারতে ২০১ মাইল রাস্তা আছে, আর সেই তুলনায় যুক্তরাজ্যে ২,০১৭ মাইল ও জাপানে ৩,৯৮৮ মাইল রাস্তা আছে। যান-বাহনের অবস্থাও তদনুরূপ—প্রতি হাজার বর্গমাইলে ভারতে ২৫০টি, যুক্তরাষ্ট্রে ১২০০০ এবং যুক্তরাজ্যে ৩০,০০০ খানা স্বয়ংক্রিয় শকট আছে। জাতীয় প্রগতির যে কোন পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একথা স্বীকার করিলেও নূতন সড়ক নির্মাণের জন্য পরিকল্পনায় মাত্র ১২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ২৭ কোটি টাকা জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য। শেষোক্ত খাতে পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ৩০০ মাইল লুপ্ত সড়ক পুনর্নির্মাণ, ২০টি বড় সেতু তৈয়ারী ও ২১ শত মাইল রাস্তার সংস্কার করা হইয়াছে এবং উহাতে খরচ হইয়াছে ১২ কোটি টাকা। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় যান-বাহন ও রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী ও, ভি, অলগেশন ঘোষণা করিয়াছেন যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে আরও দশ কোটী টাকা সাহায্য দিবেন। ইহা ছাড়া ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে তিন বৎসরে পল্লীর রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্য এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে এবং ভারত সরকার ঐ ব্যয়ের ১/৪ অংশ বহন করিবেন।

এই সকল ব্যয় একত্রিত হইলেও দেশের প্রয়োজনে উহাকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে। সম্প্রতি ভারতীয় সড়ক পরিবহন সংস্থার বম্বেতে যে বৈঠক হয় তাহাতে জনসাধারণের উপর অত্যধিক করভার আরোপ, ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইনের গলদ ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা জাতীয় করণের নীতিকেই দেশের রাস্তাঘাট উন্নয়নের পথে বাধা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি না হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি ব্যাহত হইবে। অর্থের অসঙ্গতি একটি গুরুতর প্রশ্ন হইলেও জাতীর নব-জাগরণের সময় ইহাকে একটি অনিবার্য বাধা বলিয়া স্বীকার করা উচিত হইবে না।

ভারতে তুলার উৎপাদন ও কাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি—

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতে তুলার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৫৩-৫৪) তুলার চাষ ও উৎপাদন যে বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

তুলা চাষের অন্তর্গত জমির পরিমাণ—	তুলার উৎপাদন প্রতি গাইট ৩৯২ পাউণ্ড
১৯৫২-৫৩—১৫,০১৩,০০০ একর	২,৯০৫,০০০ গাঁইট
১৯৫৩-৫৪—১৬,২৬৬,০০০ „	৩,৬৫৮,০০০
বর্তমান বৎসরে বৃদ্ধি—	
১,২৫৩,০০০	
(বা ৮·৩%)	(বা ২৫·৯%)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এবৎসর তুলা বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ১,২৮০,০০০ টন হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১,০১৮,০০০ টন। তুলা

* কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুসারে।

উৎপাদনকারী প্রায় সমস্ত প্রদেশ হইতেই উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার ফলে প্রাথমিক জমিতে চাষের প্রসার সর্বদা বাঞ্ছনীয় নহে। উচ্চ শ্রেণীর তুলার জন্য আজও ভারত পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং দেশে উচ্চ শ্রেণীর তুলা উৎপাদনের প্রতি অবিলম্বে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাটতিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত জানুয়ারী পর্যন্ত ৫ মাসে ভারতীয় মিলগুলি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের ১৯২ লক্ষ গাঁইট তুলা ব্যবহার করে। গত বৎসরে অনুরূপ সময়ে মিলে তুলার কাটতি হইয়াছিল ১৮৭ লক্ষ গাঁইট। কেবলমাত্র ভারতেই নহে, সমগ্র পৃথিবীতেই তুলার কাটতি বৃদ্ধি পাইতেছে। ওয়াশিংটনস্থিত আন্তর্জাতিক তুলা উপদেষ্টা সমিতির গণনা হিসাবে তুলার কাটতি ১৯৫১-৫২ সালে ছিল—৩২৩ লক্ষ গাঁইট (প্রতিটি ৪৭৮ পাউণ্ড) ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৩৪ লক্ষ গাঁইট এবং বর্তমান বৎসরে উহা দাঁড়াইবে ৩৪৪ লক্ষ গাঁইটে। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, একদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যখন তুলার কাটতি হ্রাস পাইতেছে, তখন বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, পাকিস্তান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে কাটতিবৃদ্ধি পাইতেছে।

তুলার কাটতি (প্রতি গাঁইট—৪৭৮ পাউণ্ড)

	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪
যুক্তরাষ্ট্র—	৯৪,৬১,০০০ গাঁইট	৮৭,৫০,০০০ গাঁইট
ভারতবর্ষ—	৩৮,৭৫,০০০	৩৯,০০,০০০
জাপান—	২০,৬৫,০০০	২৫,০০,০০০
পাকিস্তান—	২,৩০,০০০ „	৪,০০,০০০ „

এই সমস্ত দেশগুলিতে জন সংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যই তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ রহিয়াছে।

স্বরলিপি

রাগমালা।

জয়জয়ন্তী, ভূপালী, ইমন্-কল্যাণ।

কথা—অবিনাশচন্দ্র কর, শাস্ত্রী, এম্-এ, বি-এল্।

সুর ও স্বরলিপি—মহিমচন্দ্র সরকার।

শ্রীশ্রীমহামায়া বিজয়তে।

দৃপ্তৈর্বিবাদশতসংশমনৈর্মলিন্দি-
র্বাদৈরজস্রমুরজধ্বনিগীরনাদৈঃ।
যস্যাধুনাপ্যসুরণস্তিতরামিবামী
ধর্মাধিকারনিলয়া বরিশালপূর্ধাম্॥ ১॥

তত্রৈব হর্ম্যে স্বমিতেঽমিতাত্মাহ-
বসন্বিশালে ব্যবহারবাজঃ।
আসীপ্রশস্যঃ প্রমিতাংশোঃ
স্বরূপচন্দ্রঃ স গুহাস্বয়ার্কঃ॥ ২॥

স্বামী স্বকালার্চিতসর্ববাচা-
মধীশ্বরোঽদভ্রভুবঃ সমস্তাৎ।
রোচাপি ধর্মার্থধুরাঃ সহস্রং
চক্রুর্যুরীশো দিবসৈকনাথঃ॥ ৩॥

অথ মণিধৃতদুর্গানামতন্ত্রর্পণস্যা
বিয়দম্বুবসুসোমোন্মীলিতে শাকবর্ষে।
জগদবিবসতীয়াং যামহো বিশ্বধাত্রীং
বসতিরিহ হি তস্যৈ দিৎসতে মুগ্ধরেষা॥ ৪॥

অর্পিতং মহামায়ায়া এতন্মন্দিরকং শুভম্।
দুর্গায়ৈ দুর্গসৈনেন শ্রীয়তাং পরমেশ্বরী॥ ৫।

ব্যবহারিক শব্দ।

বিবাদ (১) :—কলহ, বিরোধ; মকদ্দমা, মামলা; বিচারালয়ের অভিযোগের পরিচালনা—যেমন, "বিবাদ-রত্নাকর" (চণ্ডেশ্বর ঠাকুর কৃত), "বিবাদ-চিন্তামণি" (বাচস্পতি মিশ্র কৃত। কলিকাতা, ১৮৩৭)। আরবী—মুকদ্দমা। আরবী—মুআমলা। ফার্সী—দাদফরীয়াদ—"বাগদিনী বেশে যত দুঃখ দিল উহা। তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা।"

বিবাহন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কৃত। ১৭৪০ খ্রীঃ। হার—বিচার প্রার্থনা। ইংরাজী—suit, Fr.,—Low Latin *secta*, a suit—Latin *sequi*, to follow.

সংশমন :—বিবেকবৃত্তি, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ইংরাজী (১)—decision. French (*de-*), from Latin *decisionem* (decide,—ion).

বার :—বিবাদ (বদ্-ভাবে-ঘঞ্)—"মনুষ্য কি বাদে (১) কভু পারে তার সনে"—শ্রীচৈতন্য ভাগবত। ইংরাজী—law-suit; French, from Latin *causa*.

ধর্মাধিকারনিলয়া—বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ—Manu (১) VIII, 1; See Colebrooke "On Hindu Courts of Justice," Essays (London, 1873). ইংরাজী—place for Courts of Justice. From Old French *cort* from Latin *c* (*oh*) *ortem* (nom. —*ors*), yard, Cohort; the senses of assembly, judicial court, by confus. in French with Latin *curia*.

ব্যবহারবাজ :—"নানাবিবাদবিষয়ঃ সংশয়োঽস্যিতেঽনেন (২) ইতি ব্যবহারঃ।" নানা—অব সন্দেহ—ছ হরণ করা + অ (ঘঞ্)—ণ। ব্যবহারশাস্ত্রতত্ত্বাভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রী—"কোন এক সময়ে ব্যবহারবিদের (jurists) মূলমন্ত্র ছিল যে পৃথিবী ধ্বংস হউক কিন্তু ন্যায়-পরায়ণতা যেন না ক্ষুণ্ণ হয়"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাশিয়ার চিঠি। ইংরাজী—prince in legal profession, advocate, vakeel, pleader, Advocate

—Old French *avocat*—Latin—*advocatus*—*advocare*, - *atum*—*ad*, to, to call : to call (another to help, as in a law- or sickness). আরবী—'ওকালৎ' ('বকালৎ'?) শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থ—সমর্পণ। 'মুক্কদ্দমা' (আ) কার্য্য যাহার উপরে সমর্পণ করা হয়, সেই উকীল। আরবী ভাষায় ঈশ্বরও উকীল, কারণ তাঁহার উপর জীবের আত্ম সমর্পণ করা হয়। Arabic—*wakil da 'wa*. Persian—*vakil—i murafa 'a*.

চৌধুরীঃ—উপাধি বিশেষ। "Chaudhuri an honorific title conferred on persons of position, specially of the land-lord class. In some cases, combined titles like 'Roy Chaudhuri' are also found." চৌধুরী—(চৌ + ধুরী from ধুর)। A chief of four (as a title of honour)—Haughton, A Dictionary, Bengali and Sanskrit, explained in English. London, 1833, p. 1122; চৌধুরী—(চৌ—চারি ধুর—নৌ. হস্তী, অশ্ব ও পদাতির ভার + ইন্ (স্বা), lit. the bearer of a discus, i. e. one in authority—the headman of a village or district, community or craft—*Glossary Indore State Gazetteer*, 1908; "If a landholder owns a pargana, or an aliquot portion thereof, he is called a Zamindar, and also generally receives by courtesy the title of *Chaudhuri*; but if his estate bears no relation to a pargana or its divisions, he is merely a taluqdar."—Beveridge, The District of Bakarganj. London, 1876, p. 56.

ধর্ম্মপত্নী—বিবাহিত স্ত্রী। ইংরাজী—lawful

(৪) Anglo-Saxon—*wif*; Icelandic—*vif*, German—*weib*; Dutch—wijf, all neuter nouns, etym. &c. dubious.

সাঙ্গীতিকী।

মুরজঃ—দুদ্দল, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ—"মৃত্তিকানির্ম্মিতশ্চৈব মৃদঙ্গঃ

(১) পরিকীর্ত্তিতঃ।" মৃদ্—অঙ্গচ্—কর্ম্মবাচ্যে। মুর—ক্বন—ড—কর্ত্তৃবাচ্যে। Cf. "ততঃ বীণাদিকং বাদ্যমানন্তরং মুরজাদিকম্। বংশাদিকন্তু সুষিরং কাংসতালাদিকং ঘনম্॥" "দুদ্দল বাজায় নন্দী ভাল সেই তাল।" "মৃদঙ্গ তরঙ্গ মর্দ্দল পুষ্কর পণবাবদ্ধ ডমরু, খঞ্জরী ঢোল ঢোলক বিতত

• প্রাচীন ভারতের মনু সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা, আপস্তম্ব সংহিতা, বৌধায়ন সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, গৌতম সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, নারদ সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, দেবল সংহিতা, পরাশর সংহিতা, মারীচী সংহিতা, ব্যবহার-মাতৃক (জীমূতবাহন), ব্যবহারতত্ত্ব (রঘুনন্দন), মিতাক্ষরা, ব্যবহারাধ্যায় (বিজ্ঞানেশ্বর), মহাভারত, মৃচ্ছকটিক (শূদ্রক), অভিজ্ঞান-শকুন্তলা (কালিদাস), মুদ্রারাক্ষস (বিশাখদত্ত), শিশুপাল-বধ (মাঘ), কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবি), শুক্রনীতিসার (শুক্রাচার্য্য), অর্থশাস্ত্র (বৃহস্পতি), অর্থশাস্ত্র (কৌটিল্য), নীতিসার (কামন্দক), প্রভৃতি, গ্রন্থসমূহে ব্যবহারিক শব্দের (legal terms) এবং আইনসম্বন্ধীয় তথ্য (legal intelligence) পাওয়া যায়।

জান"—তানসেন। নারদবিরচিতে সঙ্গীত-মকরন্দে সঙ্গীতাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ।। অথ মৃদঙ্গ-লক্ষণম্। ১-৪ শ্লোকাঃ। G. O. S., No. XVI, Baroda, 1920, pp. 21-22. ইংরাজী—drum; Teutonic root found in Dutch—*trom*, German—*trommel*, a drum; Middle High German—*trumme* orig. trumpet.

নাদ ;—ধ্বনি, শব্দ, গর্জ্জন—"চকার নাদং ঘননাদসন্নিভম্।"
(১) শব্দ মাত্রকেই নাদ বলা যায়—"প্রাণ আকুল তৈল বাঁশীর নাদে"—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। নদ শব্দ করা + অ (ঘঞ্)—ভাববাচ্যে। নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে "সঙ্গীত-দর্পণে" ১।৩—৬, ৭—১৬, ১৮—২৭, ২৮—৩১, ৩২, ৩৪—৩৯; "সঙ্গীত-সংহিতা" ১।৩৬—৩৯; "সঙ্গীত-মহোদধি" ১।৪; "নারদ-সংহিতা" ১।১০, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। Cf.

"ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা গ্রামস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥"
—নারদ-সঙ্গীতে।

"গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্তা প্রশস্যতে"—
সঙ্গীত-দর্পণে।

"প্রথম নাদ সরস্বতী গণপতি বুধদাতা"—
তানসেন।

ইংরাজী—sound; Middle English—*souun*, Old French *soner*, Latin—*sonare*, to sound, *sonus*, a sound.

স্থাননির্ণয়।

বরিশালপুর্য্যাম্—নগর। কার্শী - শহর্। ইংরাজী—
(১) town, Anglo—Saxon—*tun*, an enclosure, town; Icelandic—*tun*, an enclosure, Dutch—*tuin*, Old Norse—*tun*, German—*zaun*, a hedge. পূর্ব্ববঙ্গের বাকরগঞ্জ জিলার প্রধান শহর্ "বরিশাল"। "১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ উইল্কিন্স্ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের আমলে বাকরগঞ্জ জিলার সদর আফিসাদি "বরিশাল" স্থানান্তরিত হয় এবং বর্ত্তমান্ সময় পর্য্যন্ত এই স্থানেই সংস্থাপিত আছে। দেওয়ানী হাকিমও ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করেন"—"কায়স্থ-সমাজ" (নাসিক), আশ্বিন, ১৩৪৩, *s.v.* "রামচন্দ্রপুরের গুহচৌধুরী", পৃঃ ২৫৩। "Bakar is an Arabic word, and the correct transliteration of it is Baqir; hence some write Baquirganj."—Beveridge.

সময়নিরূপণ।

বিয়দম্বুবস্বম্বসোমোদ্ধীলিতে শাকবর্ষে—বিয়ৎ = ০, অম্বু = ৪,
(৪) বসু = ৮, সোম = ১।
"অঙ্কস্য বামাগতিঃ"
এই নিয়মানুসারে
১৮৪০ শকাব্দ, ১৩২৪
সং বৎ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ,
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বরিশালস্থ কাশীপুর-কাঠগড় পল্লীতে ৺মহামায়াদেবীর ইষ্টক নির্ম্মিত নবমন্দির হয়। সময়নিরূপণের প্রথা এরূপ ভাবের বহুদিন হইতেই সুপ্রচলিত আছে—যেমন,

উড়িষ্যার অন্তর্গত-ভুবনেশ্বরের মন্দির (শিবের মন্দির)—"গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ" অর্থাৎ গজ = ৮; অষ্ট = ৮; ইন্দু = ১, "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" নিয়মানুসারে ১৮৮ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৺পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দির—

"শকাব্দে রন্ধ্রতুল্যাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে" অর্থাৎ রন্ধ্র = ৯;

শুভ্রাংশু = চন্দ্র = ১ ; রূপ = ১ ; নক্ষত্র—নায়ক = চন্দ্র = ১, ঐ নিয়মানুসারে ১১১৯ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল ("পঞ্চরাত্রচরিতম্" বাসুদেব রথ প্রণীত নাটক—সংস্কৃত পুঁথি দ্রষ্টব্য। ইহা সম্ভবতঃ উড়িয়া অক্ষরে লিখিত বলিয়া মনে হয়)।

৺পুরীধামের প্রায় ১৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত কোণারক (সংস্কৃত—কোণার্কঃ) মন্দির (সূর্য্যদেবের মন্দির) ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় ("মাদ্‌লা—পঞ্জিকা"য় ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিত আছে)।

কলিকাতায় বাগবাজারে (বাগবাজার ষ্ট্রীট্ ও চিৎপুর রোডের সংযোগ-স্থলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে) অন্নপূর্ণার গৃহ ও পাঁচটি শিব-মন্দির দেখা যায়। উহার দ্বিতীয় শিব-মন্দিরের উপরিভাগে লিখিত আছে—"শাকে বিলেশয়-বিদর্ভবিধৌ" অর্থাৎ বিলেশয় = সর্প = ৮ ; বিল = গর্ত্ত = রন্ধ্র = ০ ; ঋতু = ৬ ; বিধু = চন্দ্র = ১, "অঙ্কস্য বামাগতি :" নিয়মানুসারে ১৬৯৮ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংরাজ শাসনাধীনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বড়লাট তখন ছিলেন।

শ্রীরামপুরের দক্ষিণ এবং বালী-উত্তরপাড়ার উত্তর-দিকে গঙ্গাতীরে "কোণ-নগর" (কোন্নগর) গ্রাম অবস্থিত। এখানে দ্বাদশ শিব-মন্দির, চাঁদনী ও বাঁধাঘাট আছে। ইহা সব "শাকেঽক্ষিবেদধরভূগণিতে তপস্যে" অর্থাৎ অক্ষি = চক্ষুঃ = ২ ; বেদ = ৪ ; ধর = পর্ব্বত ৭ ; ভূ = পৃথিবী = ১ ; তপস্য = ফাল্গুন মাসে—"অঙ্কস্য বামাগতিঃ" নিয়মানুসারে ১৭৪২ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নবদ্বীপের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে "গঙ্গাবাস" গ্রামে হরিহর-মন্দির "বিধিস্রুত্যমুগতসুকৃতকৌণিপালে শকে" অর্থাৎ বিধিস্রুতি = ব্রহ্মার কর্ণ = ২ ; সুকৃত = পুণ্য = ৯ ; কৌণিপাল = রাজা = ১৬, ঐ নিয়মানুসারে ১৬২৯ শকাব্দে নির্ম্মিত হয়।

ছন্দোবোধ।

গাথা—১। বসন্ততিলক (চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তিঃ)।

গাথা—২। উপেন্দ্রবজ্রা } উপজাতি (একাদশাক্ষরা
গাথা—৩। ইন্দ্রবজ্রা } বৃত্তিঃ)।

গাথা—৪। মালিনী (পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তিঃ)।

গাথা—৫। অনুষ্টুপ্ (অষ্টাক্ষরা বৃত্তিঃ)।

*রাগমালা—জয়জয়ন্তী।

পীনোন্নতা সুন্দরী সা মৃগাক্ষী
স্বর্ণপ্রভা কোকিলনাদতুল্যা।
বীণাবিনোদী সুরপুষ্পগন্ধী

সা জয়জয়ন্তী সুরমেঘস্য ভার্য্যা॥ ইতি ধ্যানম্ †

সৌরাষ্ট্র, গৌড়সংযুক্তা, বেলাবলী মিশ্রিতায় জয়জয়ন্তী উৎপন্না হন। ইনি অষ্টতম আদি মেঘরাগের অষ্টতমা স্ত্রী (সঙ্গীত-চন্দ্রিকা ২।৩৮)। সম্পূর্ণ জাতি, বাদী ঋ, সংবাদী ম, আরোহণে গ নাই। নিশীথে গেয় অথবা রা ৬—১০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। তৃতীয়প্রহরাৎপর। ষড়জাংশগ্রহন্যাস কোথাও ধৈবত কথিত।

"জয় জয় বাতেঁ করত হো মো
দোঁ। জয়জয়ন্তী এহ নার কহাবত।
মুখকী মোদোঁ শিরকী বাসোঁ
বাহে কোঁ চিন্তা ছিপাবত॥"
—সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে তৃতীয়খণ্ডে পৃঃ৮৫

*রাগমালা—বর্ণিত বিষয় কতকগুলো রাগে বেঁধে তালযোগে পর্য্যায়ক্রমে গান। See রাগমালা—জীবরাজ দীক্ষিত; ঐ—পুণ্ডরীকবিঠ্ঠল Rajendralal Mitra's Notices of Sanskrit Mss.; পরিশিষ্টম্ ২, p. 55. Sangita—Makaranda, Gaekwad's Oriental Series, No. XVI, Baroda, 1920.

†ধ্যান—ধ্যৈ + ভাবে – অনট্——রূপচিন্তন, "করণান্ত-রহিতস্য স্থাণুরিশ্চলাত্মকঃ। আত্মানং হৃদয়ে ধ্যায়েন্নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ॥" তৎপর মধ্যে মূর্ত্তি (দেবতাদির রূপ যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত) চিন্তা——"দিবানিশি থাকি আমি তোমার ধেয়ানে"——রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু); "ধেয়াননগনা অপর্ণা গিরি' যে কুঞ্জ বাটি……"—প্রভাত-কামিনী গুহজায়া।

আস্থায়ী—

+
গ প ম প ধ ধ ধ ধ সা ম ম মপ ধ গধ সা ০
দৃ ষ্টে বি বা দ শ ত সং শ য় নৈ র্ঘ ০ ল ০ দ্ ভি ০
ধ ম ম প প প ধ নিঁ ধ প ম প মগ ধ গধ সা ০
র্বা দৈ র জ স্র মু র জ ০ ধ্র নি ধী র ০ না ০ ০ দৈ:

অন্তরা—

ধ ম প প ম প প প ম প নি নি সাঁ ০ সাঁ ০
ব ন্তা ন্ না প্য হু র ণন্ ভি ত রা মি বা ০ মী ০
সাঁ ধ সাঁ নিঁ ধ প প ম প ধ প ম গ ধ সা
ধ শা ধি কা র নি ল য়া ব রি শা ল পু র্ ষা ম্

সঞ্চারী—

সা ধ ০ ধ ম ০ ম০ মপ প০ প০ প০ মপ ০প নি০ নি০
সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ ০
ত ত্র ই ব হ ০ র্ষে ০ ষমি তেহ মিতাত্মাহং। বস ০ন্বি
শা০ লে০ বাব হা র রা০

০
সা
জ: ০

আভোগ—

সাঁ ধ ০ সা নিঁ ০ নিঁ ০ ধধ ধ০ প০ প০
আ দী ০ প ম ০ স্বী০ পনি মংহি মাং শো:
নি সা ০ সা ধ০ প০ ধপ মগ ধ ধ ধ ০
০
স ম ০ প চন্ দ্র০ সগু হা ম ধা ম্ বু ক:০

ভূপালী।

গৌরদ্যুতিঃ কুসুমরক্তদেহা
তুলতনী চন্দ্রমুখী মনোজ্ঞা।
ভর্তুঃ স্মরন্তী বিরহেন দুনা
ভূপালিকেয়ং রলশান্বিযুক্তা॥ ইতি ধ্যানম্।

ভূপালী রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন।

ঋ, নি, বিবাদী। ঔড়ব জাতি। গান্ধার বাদী, বৈবত সংবাদী স্বর। মধুর রাগ। শুদ্ধ কল্যাণ, জেত কল্যাণ এবং দেশকার রাগ হইতে অভিন্ন। স্বতন্ত্র নিয়ম হইতে ভিন্ন। অন্যতম আদি হিন্দোলরাগের অন্যতমা স্ত্রী (সঙ্গীত-মহোদধি ২।১৫) ভূপালী। রা ৬—১০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। নিশা—প্রথমযামকে।

আস্থায়ী—

গগ ০গ প০ প০ পপ পপ প০ প০
স্বামী ০স কা০ লার্ চ্ছিত সর্ব বা০ চা০
পধ ০প সাঁ০ সাঁ০ ধধ ধধ সাঁ০ সাঁ০
মধী ০স রো০ ন০ ভ্রূ বংস নন্ তাং

অন্তরা—

সাঁসাঁ ০সাঁ সাঁ০ ধ০ ধধ ধধ ধ০
বোঢা ০পি ধর্ স্মা র ধনু রাংস হ০ স্রং০
পগ ০গ গ০ প০ ধপ গধ সা০ সা০
চতু র্ ঘু রী০ লো০ দ্বি তৈক না০ য়ং০

সঞ্চারী—

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
প প প ধ ধ প সা সা সা সা সা ধ সা ০ সা ০ সা ০
অ থ ম নি যু ত দু র্গা মা ম ত ল্ল র্ স্ব প ৎ স্থা ০
০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
সা সা সা ধ ধ ধ সা ধ গ গ ধ সা ধ ধ সা ধ প ০
বি ল দ ম্ব র ম্ব সো মোন্ মি লি তে শা ০ ক ব র বে ০

আভোগ—

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
প ধ প সা ধ ধ সা সা ধ ধ সা সা ধ ধ প ০
জ গ দ ধী ব স তী মাং যা ম হো বি ধ ধা ত্রী
০ ০ ০ ০
সা সা সা সা ধ ধ প প সা সা সা ধ গ প ধ
ব স তি রি হ হি ত স্তৈ দিং ঙ্ তে মুগ্ ধ বৈ ধা ০

ইমন্-কল্যাণ।

সম্পূর্ণ জাতি, দুই র। রাত্রি—৬:১০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। মিশ্র। সঙ্গীতে ষোল হাজার বিভিন্ন রাগ-রাগিণী কথিত আছে—"ষোড়শসহস্রভিন্নভিন্ন রাগ-রাগিণী চরিতঃ"—সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে তৃতীয়খণ্ডে রাগাধ্যায়ে পৃঃ ১৩; কলিকাতা, সংবৎ ১৯৭৩। গানের ভেদ অনেক, এর শেষ নেই, যেন সমুদ্রের মতই সীমাহীন "—গানভেদোপ্যনেকস্ত নাস্ত্যন্তো গানবারিধেঃ।"

আস্থায়ী—

	গ	ম̣	প
পি	তং	ম	হা
নি	ধ	ণ̣	সা̣
তন্	মন্	দি	র

অন্তরা—

ম	ম	ম	ম	ম	গম̣	প	প
দু	র্গা	দৈ	দুর্	গ	দৈ•	নে	ন
ম	ম	ম	গ	ণ	ণ	সা	০
শ্রী	দু	তাং	প	র	মে	শ্ব	রী

•"শ্রীশ্রীমহামায়া বিজয়তে"—গাথাটি সম্ভবতঃ "কায়স্থ-সমাজ" (মাসিক), কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৪৪ সনে বের হোয়ে থাকবে। সংকৃত গাথার স্বরলিপির প্রচলন কম দেখা যায়! এই গাথাটি তখন নানাদিক্ ঘিরে গানের আসরে সমাদর পেয়েছিল বোলে স্বরলিপি বার করা হোল! বিভিন্ন ছন্দেতে এটি লেখা! তাই, স্বরলিপিও 'রাগমালা'র পরিপন্থ! শব্দের পারিপাট্য, লেখন-ভঙ্গিমায় এবং বিষয়-গৌরবে রচনাটি অপূর্ব! সত্যিই শ্রীদিলীপকুমার রায় বোলেছেন, "বড় কবি যাঁরা হন তাঁরা ভাব অনুসারে ছন্দ নির্বাচন করেন—কেননা তাঁরা জানেন কোন্ ভাব কোন্ ছন্দে সব চেয়ে সহজে রসোত্তীর্ণ হ'য়ে ফুটে উঠবে"—সুরবিহার, প্রথম খণ্ড, ১৩৪৬, ভূমিকা, পৃঃ ।৶৹।

শ্রীরিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী।

পুস্তক পরিচয়

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫)—শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। শিক্ষাতীর্থ কার্যালয় ৪০।১, বিডন রো (ইষ্ট), কলিকাতা। মূল্য—বারো আনা।

স্বদেশী যুগের স্মৃতিকথা অনেকে লিখেছেন। ঐতিহাসিক বিবরণ এখনও খুব বেশী লেখা হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের পূর্বে দু'খানি উল্লেখযোগ্য পুস্তকে আমরা এবিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা পেয়েছি—

এক:—শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', দুই:—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'। শুধু বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বোধ হয় পূর্বে কেউ লেখেন নি। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকবর্গের বিভিন্ন সময়ের উদ্যোগ এবং ১৯০৫-এ কার্জনী ঘোষণার প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা গ্রন্থকার-যুগল সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে তাঁরা সযত্নে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এমন চিত্তাকর্ষক বইখানিতে কয়েকটি ছাপার ও ভাষার ভুল দেখে দুঃখিত হ'লাম। কয়েকবার 'ভৌগোলিক' স্থলে 'ভৌগলিক' ছাপা হয়েছে। 'অবিসংবাদিত' দেখা দিয়েছে 'বিদিত'-রূপে (পৃ: ১৪); মতুকে 'ক্যাকরী' ব'লে স্ত্রীলিঙ্গরূপে গণ্য করা অযৌক্তিক (পৃ: ৮)। ইংরেজী উদ্ধৃতিতেও দু'একটি ভুল রয়ে গেছে। আশা করি, আগামী সংস্করণে এ ত্রুটিটুকু সংশোধিত হবে।

রৌদ্রজ্যোৎস্না:—শ্রীসুনীলকুমার গুপ্ত। রাইটার্স কর্ণার, ১০৪।১৪, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্য এক টাকা।

কবিতাগুলি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এখন পুস্তকাকারে সংকলিত হ'ল। আজকাল তার ভাষা ছন্দ নিয়ে যে বিচিত্র পরীক্ষার হুজুক চলেছে, তাতে পাঠককে প্রায়ই দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়; না পারে সে বুঝতে, না পারে মুখ ফুটে কিছু বলতে।
পারে হুজুকওয়ালাদের কাছ থেকে বিদ্রূপ, অথচ প্রশংসাবাণী তার হৃদয় থেকে আসেনা। এ অবস্থায় একখানা সহজ সাবলীল সরস কবিতার বই পেয়ে বইখানা পাঠক বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করেছে; বিনা দ্বিধায় সে বলতে পারবে—ভালো। যেমন

'ইতিহাস নারী':

'জীবনের
গড়া সেই ইতিহাস নারী।'

তারই আকর্ষণে
ধ'রে আমরা এগিয়ে চলেছি।

মানবের অনুচ্চারিত অভিযান তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ। তিনি সমাজ-সচেতন। তা বলে প্রকৃতির মায়া মাধুরীকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি; তার প্রমাণ কলকাতার আশ্বিন, দোলপূর্ণিমা।

দৃষ্টিধারা:—শ্রীআনন্দ ইষ্টারপ্রকাশনার পরিবেশনা কনসার্নস্, ৬৭, বাগবাজার রোড। মূল্য দুই টাকা।

ছোট উপন্যাস। প্রকাশকেরা ভূমিকায় বলেছেন, সমানা টাকায় বাংলা উপন্যাসের কপিরাইট বিক্রী হয় শুনে 'বজ্রাহত' হয়ে তাঁরা আগাম টাকা দিয়ে লেখকের কাছ থেকে এ বইখানির পাণ্ডুলিপি চেয়ে নেন এবং নূতন আদর্শ নিয়ে প্রকাশকর্মে ব্রতী হন। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নামে মনে হয় তাঁদের কল্পনা বহুদূর প্রসারী—আন্তর্ভারতিক ভাববিনিময় বোধ হয় তার অন্তর্গত। এ উপন্যাসখানি অবশ্য 'আদর্শ' নয়। এতে অতিআধুনিক শৌখীন সমাজের ছবি কিছুটা ফুটেছে; তবে ঘটনার চেয়ে কথার আতিশয্য বিশেষতঃ '(বাংলাদেশে বহু বড় বড় সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও)—বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছেনা' এই অংশটুকু বইয়ের অনেকটা জুড়ে আছে। গল্পের বন্ধন শিথিল, চরিত্রগুলি অস্পষ্ট।

দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র :—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৪৪।১বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য আট আনা।

দীনেশ গুপ্ত-প্রমুখ বিপ্লবীর উদ্দেশে কবিতার গ্রন্থকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'শেষপত্র'খানিও দীনেশ গুপ্তের লিখিত পত্র নয়। মায়ের কাছে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা'রই ভাবছায়ায় রচিত কবিতা। মোট ছয়টি কবিতা আছে।

বাংলার উচ্চশিক্ষা :—শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জো ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নবযুগের উদয় হয়েছিল, যোগেশবাবু সযত্নে তার ইতিহাস রচনা করছেন। রাজনীতিতে, সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন যুগের প্রাণচাঞ্চল্য ও সাধনা কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার বিস্তৃত নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন গ্রন্থে পাচ্ছি। আলোচ্য পুস্তিকার ভূমিকা বাদে আটটি পরিচ্ছেদ :—উচ্চশিক্ষার আয়োজন, গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নির্ধারণ, সরকারী শিক্ষানীতির মৌলিক পরিবর্তন, উচ্চশিক্ষা—খৃষ্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার, উচ্চশিক্ষার নূতনপর্ব, উচ্চশিক্ষার ফলাফল। লেখকের নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা এবং ঐতিহাসিক বোধ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মত এখানিতেও পরিস্ফুট। শিক্ষাপ্রসঙ্গে গত শতাব্দীর বাঙালী চিন্তাবীর ও কর্মবীর অনেকের কথাই কিছু কিছু এসে পড়েছে; তাঁদের কীর্তি ও প্রয়াস আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং তার অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য। ললাটে সেকালের হিন্দুকলেজের একখানি সুন্দর ছবি আছে।

মধুপর্ক : কবিতা সংকলন, বসন্ত ১৩৫০। সম্পাদক —শ্রীসুবোধ কুমার গুপ্ত। ২০এ, বিহারী ডাক্তার রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য দশ পয়সা।

পূর্বসংখ্যার চেয়ে এটি সুদৃশ্যতর এবং সমৃদ্ধতর। লব্ধ প্রতিষ্ঠদের মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন আর কৃপালকাস্তি, এবং উদীয়মানদের মধ্যে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহাকর, প্রণব কুমার প্রভৃতি অনেকের লেখা এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। অধিকাংশের লেখাতেই কোমল স্বপ্নাবেশ। বটকৃষ্ণ দাসের 'দেববানী'-তে ভাষার গম্ভীর রূপ বেশ ফুটেছে।

দেশবন্ধু—

ষোলই জুন। এমনি এক বর্ষাদিনে বাংলাদেশ গাঢ় শোকচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, দেশবন্ধু দেশবাসীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন।

মনুষ্যত্ব যে কি পরম রহস্যময়, এঁদের মত মহা-মানবদের দেখে তা আমরা সবিস্ময়ে অনুভব করি। কত বিচিত্র তার প্রকাশ! বিশেষ ক'রে দেশবন্ধুর জীবনে আমরা দেখেছি—কবি, আইনজ্ঞ, রাজনীতিক, ভোগী ও ত্যাগীর অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর প্রতিভা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

দেশবাসীর কাছে তাঁর প্রধান পরিচয়—তিনি 'দেশবন্ধু'। দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য তিনি তাঁর অর্থ, সম্পদ, জীবন—অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। 'দেশ' তাঁর কাছে কথার কথামাত্র ছিলনা। তাকে তিনি চিনেছিলেন তার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য ও সাধনার মধ্য দিয়ে; তাঁর হিন্দু-মুসলমান সর্বসাধারণের প্রতি গভীর প্রীতির মধ্য দিয়ে।

তাঁর উদার চিত্তের স্পর্শ লাগুক আমাদের চিত্তে, উদ্বুদ্ধ করুক আমাদের মানবত্বকে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—

আর একজন দেশানুরাগী মনীষীকেও এমনি দিনে আমরা হারিয়েছিলাম, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

বিজ্ঞান-সাধনায় পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি তিনি অর্জন ক'রেছিলেন, কিন্তু দেশের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থেকে পুঁথিশালায় বা গবেষণাগারে তিনি জীবন কাটাননি। যেখানে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হ'য়েছে, সেখানেই ছাত্রদল নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন,—বিত্ত সাধনায় দেশের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা ক'রেছেন, মহাত্মাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা ক'রেছেন।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমরা এই মহাপুরুষকে স্মরণ

উন্নয়ন পরিকল্পনা—

কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে তার মধ্যে বড় বড় কয়েকটি পরিকল্পনার কথাই আমরা সাধারণত জানি। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, চিত্তরঞ্জন রেলকারখানা, হীরাকুঁদ, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতির নাম আমরা অনেকেই জানি। এই সব বড় বড় ব্যাপার নিয়ে সংবাদপত্রেও বহু আলোচনা আলোচনা হ'য়ে থাকে। এই সব বিরাট পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় নেই। দেশের কৃষির ও ইণ্ডাষ্ট্রির (Industrial) উন্নতির পক্ষে এই সব পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এসব বড় বড় পরিকল্পনা ছাড়াও দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য অনেক ছোটখাট পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। আমাদের মনে হয় জনসাধারণের মনে সেই সব পরিকল্পনা সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারণা নেই। তার ফলে সরকারী এই সব পরিকল্পনার পূর্ণ সুযোগ দেশবাসী পাচ্ছে না।

এই সব ছোট ছোট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'ল গ্রাম্য জীবনকে সহজ ও সুগম করা। এই সব পরিকল্পনার সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যম ও উৎসাহের উপর। এই শ্রেণীর একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে "এর মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল জনসাধারণের মনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সম্বন্ধে উহা জানান যাতে তারা কায়িক পরিশ্রম, কাঁচা মালের যোগান বা টাকা দিয়ে স্থানীয় ছোট ছোট পরিকল্পনায় সাহায্য প্রদান করে এবং নিজেদের প্রত্যক্ষ উপকার লাভের ব্যবস্থা করে।" (The basic idea is to stimulate the enthusiasm of the people for the Five Year Plan through local schemes which would be of direct assistance to them and in the execution of which they would contribute either in cash or through supplies in kind or through voluntary labour)। বড় বড় পরিকল্পনার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ খুব সামান্য; কিন্তু এই ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলি প্রধানত নির্ভর করবে জনসাধারণের কর্মপ্রচেষ্টার উপর এবং এদের উদ্দেশ্য অতি অল্প সময়ের ভিতর গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাকে কতকটা উন্নত ও সহজ করা।

এমনি সব পরিকল্পনার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য সমষ্টির উন্নয়ন ব্যবস্থা (Community development project)। সাধারণত একশতটি গ্রাম নিয়ে এক একটা অঞ্চল বেছে নেওয়া হ'য়েছে। এই একশত গ্রামকে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ'ড়ে তোলা। এমনি এক একটি অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে এক একটি উপদেষ্টা মজলিশ (Advisory Board) গঠিত হ'য়েছে। এই মজলিশের স্থানীয় প্রতিনিধি সভ্যদের উচিত উন্নয়ন কার্যের সাথে একটা স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা করা। গ্রামসেবক নামে পরিচিত যে-সব কর্মচারী এই উন্নয়ন ব্যবস্থার কার্যভার নিয়ে গ্রামাঞ্চলে কাজ করে তাদের সঙ্গে উপদেষ্টা কমিটির সভ্যদের যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি উন্নয়ন প্রস্তাব জনসাধারণের অনুমোদনে উদ্ভূত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় উপদেষ্টা কমিটির সভ্যগণ বছরে বার কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়া ব্যতীত উন্নয়ন কার্যের ব্যাপারে খুব বেশী যোগাযোগ রাখেন না। হয়ত তার ফলে এই সমষ্টিগত উন্নয়নের মূল নীতি বিসর্জন করা হয়। গ্রামের উন্নয়নকার্য গ্রামের লোকদের প্রয়োজনবোধ অনুসারে এবং যথাসম্ভব তাদের পরিকল্পনায় সাধিত হবে ইহাই এই উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কথা।

আর একটি উন্নয়নপ্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের আছে তাকে বলা হয় স্থানীয় উন্নয়নকার্য। গ্রাম্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রাম্য স্কুলগৃহ বা হাসপাতালগৃহের সংস্কার বা নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে ছোটখাট রাস্তা তৈরী প্রভৃতি কার্য এর অন্তর্গত। সাধারণত এর অন্তর্গত এক একটি উন্নয়ন কাজের মোট খরচ বিশহাজার টাকার মধ্যে হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এর প্রত্যেকটি কাজের জন্য শতকরা পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী থাকে আর বাকী পঞ্চাশ টাকা স্থানীয় লোকদের দিতে হবে। স্থানীয় লোকদের দেয় অংশ যে টাকাতেই দিতে হবে এমন কোন কথা নাই; গায়ে খেটে বা কায়িক পরিশ্রমে অথবা ঐ স্থানে সহজপ্রাপ্য কাঁচামালের সরবরাহ ক'রেও দিতে পারে। এই বাবদ এত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, কিন্তু তার অর্ধেক টাকাও বোধ হয় খরচ হয়নি। এর প্রধান কারণ গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট উন্নয়ন কাজের জন্য গ্রামের লোকেরা এগিয়ে আসেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের আর একটি ব্যবস্থা আছে তারও পূর্ণ সুযোগ অনেক অঞ্চল নিতে পারেনি। ভারতের প্রায় সর্বত্র কৃষকগণ মরশুমী ঋণ (Seasonal debts) অল্প কয়েক মাসের জন্য অত্যন্ত অতিরিক্ত সুদের হারে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কৃষকদের এই দুরবস্থার থেকে মুক্ত করার জন্য রিজার্ভব্যাঙ্ক মাত্র শতকরা ১½ টাকা সুদে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে (Appex Co-operative Bank) ঋণ দেয়। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে এই টাকা যায় জেলার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে এবং পরে সেখান থেকে গ্রামের প্রাথমিক ব্যাঙ্কে। এই ঋণের টাকা সম্বন্ধে রিজার্ভব্যাঙ্ক কোন পরিমাণ বা টাকার অঙ্ক নির্দেশ ক'রে

রাখেনি, যে সব প্রদেশে সমবায় সংস্থা সুগঠিত হ'য়েছে সে সব প্রদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা পায়। বম্বে এবং মাদ্রাজ এই ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগ গ্রহণ ক'রতে পারে; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ যে পারেনা তার কারণ সেখানকার সমবায় সংস্থার অনুন্নত বা বিশৃঙ্খল অবস্থা।

পাটচাষীরা এখনও অনেক স্থলে ছ'মাসের জন্য ১০০৲ টাকার ১০০৲ টাকা সুদ দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে। সেই সব অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা ও আসামে যদি সমবায় ব্যাঙ্ক সুগঠিত হ'ত তাহ'লে এই সব পাটচাষীরা ছ'মাসের জন্য হয়ত ১০০৲ টাকার ৩।৪ টাকা সুদ দিয়ে ঋণ পেতে পারত। এটা যে কেবল কৃষকদের উপকারের জন্য প্রয়োজন তা নয় কাঁচাপাটের উৎপাদন খরচ এবং মূল্য কমিয়ে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য ও পাটের রপ্তানি অনেকটা সহজ এতে করা যেত।

প্রায় তেমনি অবস্থা তাঁত সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বিষয়েও। কৃষিকার্যের পরই সবচেয়ে বেশীসংখ্যক লোক তাঁতে নিয়োজিত। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁতীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা বহুভাবে আলোচিত হ'য়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁতের পরিপোষণের জন্য অনেকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। মিলে উৎপন্ন কাপড়ের উপর একটা বিশেষ কর আদায় করা হয়। তাঁতকে উৎসাহ দেবার জন্য এই ট্যাক্সের টাকা ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তাঁতের সমবায় সংস্থা সমিতি হ'লে প্রত্যেক সমিতির অন্তর্গত তাঁতের সংখ্যার উপর হিসেব করে ঐ সমিতিকে টাকা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে যে পরিমাণ তাঁত আছে তা নিয়ে যদি সমবায় সমিতি গঠন করা যায় তাহ'লে বাংলাদেশ অনেক টাকা এই বরাদ্দে পেতে পারে। আসাম সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। কিন্তু এ দুইটি প্রদেশ এবং হয়ত অন্যান্য আরও অনেক প্রদেশ এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে নি। এরও কারণ জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব। গৃহশিল্প ও অন্যান্য প্রকারের কুটির-উৎপাদন ও হাতের কাজের জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে। তারও যে বিশেষ সুযোগ সব প্রদেশ, বিশেষ করে বাংলা ও আসাম, নিতে পেরেছে মনে হয়না, মাদ্রাজ এবং বম্বে এই বিষয়েও অনেক বেশী অগ্রসর। অন্যান্য প্রদেশের উচিত এই দুই প্রদেশের অনুকরণ করা।

সমাজসেবামূলক কাজকে সাহায্য করার জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু ব্যবস্থা আছে। কোন বে-সরকারীসমাজসেবক সমিতি বা সংস্থা সমাজসেবা-মূলক কাজের জন্য সরকারী সাহায্য পেতে পারে। এজন্য মোট ৪ কোটী টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করে রেখেছেন। বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক প্রতিষ্ঠান এবং আরও অনেক গ্রামাঞ্চলের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এই তহবিল থেকে সাহায্য পেয়েছে। আমাদের মনে হয় আরও বহু জনসেবামূলক কাজ এই ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হ'তে পারে।

এইসব ছোটখাট উন্নয়নপরিকল্পনার মৌলিক ফল জনসাধারণের চেতনা বা কর্মপ্রেরণা জাগান। এতে যে কেবল জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতি হবে তা নয়; জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক নাগরিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষিত ও সচেতন করাও এইসব ব্যবস্থার মারফতে হ'তে পারবে। জনসাধারণের শিক্ষার দিকটা বৈষয়িক উন্নতির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাই আমরা এখানে এইসব পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলাম। গ্রাম্য জনতা অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের চেষ্টায় যদি নিজেদের জীবনযাত্রাকে অনেকটা সহজ ও সুগম করতে পারে তাহলে স্বায়ত্ত-অধিকারসম্পন্ন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ (Autonomous Village Panchayet) গঠনের আস্থা ও বিশ্বাস তাদের মনে আসবে। ভারতীয় সংবিধানে এমনি পঞ্চায়েৎ গঠনের সঙ্কল্প করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ঋণ

পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ২২৪৪ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হ'তে আভ্যন্তরীণ ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে যে টাকা পাঁচ বছরে পাওয়া যাবে ব'লে ধরা হয়েছে তারপরেও ৩৯৪ কোটী টাকা ঘাটতি থাকে। এই টাকা পূরণের জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমাবার জন্য সম্প্রতি একটি আভ্যন্তরীণ ঋণপত্র খোলা হয়েছে। গত কল্যাণী কংগ্রেস অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যে উন্নয়ন কার্যে জনসাধারণের সহযোগিতা বোধ জাগাবার জন্য তাদের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করা হোক। সাধারণত সরকারী ঋণ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ও একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা হয়। কিন্তু এই ঋণপত্রে তেমনি কোন সীমানির্দেশ নেই। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ধনী-আর্থিক-সংস্থার (Finance Institutions) উপর নির্ভর না ক'রে জনসাধারণের সহযোগিতার উপরেই এই ঋণ বিশেষভাবে নির্ভর করে।

টাকা পাওয়াটাই এই ঋণপত্রের মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উন্নয়ন-কাজের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতা স্থাপন এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু এ সম্বন্ধে যে সব ইস্তাহার পাঠিয়েছেন তাতে বলেছেন যে আমরা চাই "যাতে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে এই অনুভূতি জাগে যে নূতন ভারতবর্ষ গড়বার প্রচেষ্টায় সে একজন অংশীদার।" প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটির ও পরিষদের ও পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যের এই ঋণের বিষয়ে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হওয়া উচিত।

এই ঋণপত্রের সঙ্গে Plan Certificates নামে জাতীয় অর্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থার (National Savings Scheme) অন্তর্গত একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণপত্রের সর্বনিম্ন অঙ্ক হ'ল ১০০ টাকা; এমন বহুলোক আছে যাদের পক্ষে ১০০ টাকার ঋণপত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাদের জন্যই শেষোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে—এতে ২৫ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। গ্রামাঞ্চলের উপযোগী করেই এটা করা হয়েছে। কংগ্রেস কমিটি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবৃন্দের উচিত এই দুইপ্রকার ঋণপত্রের সাফল্যের সহায়তা করা।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'নুহিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

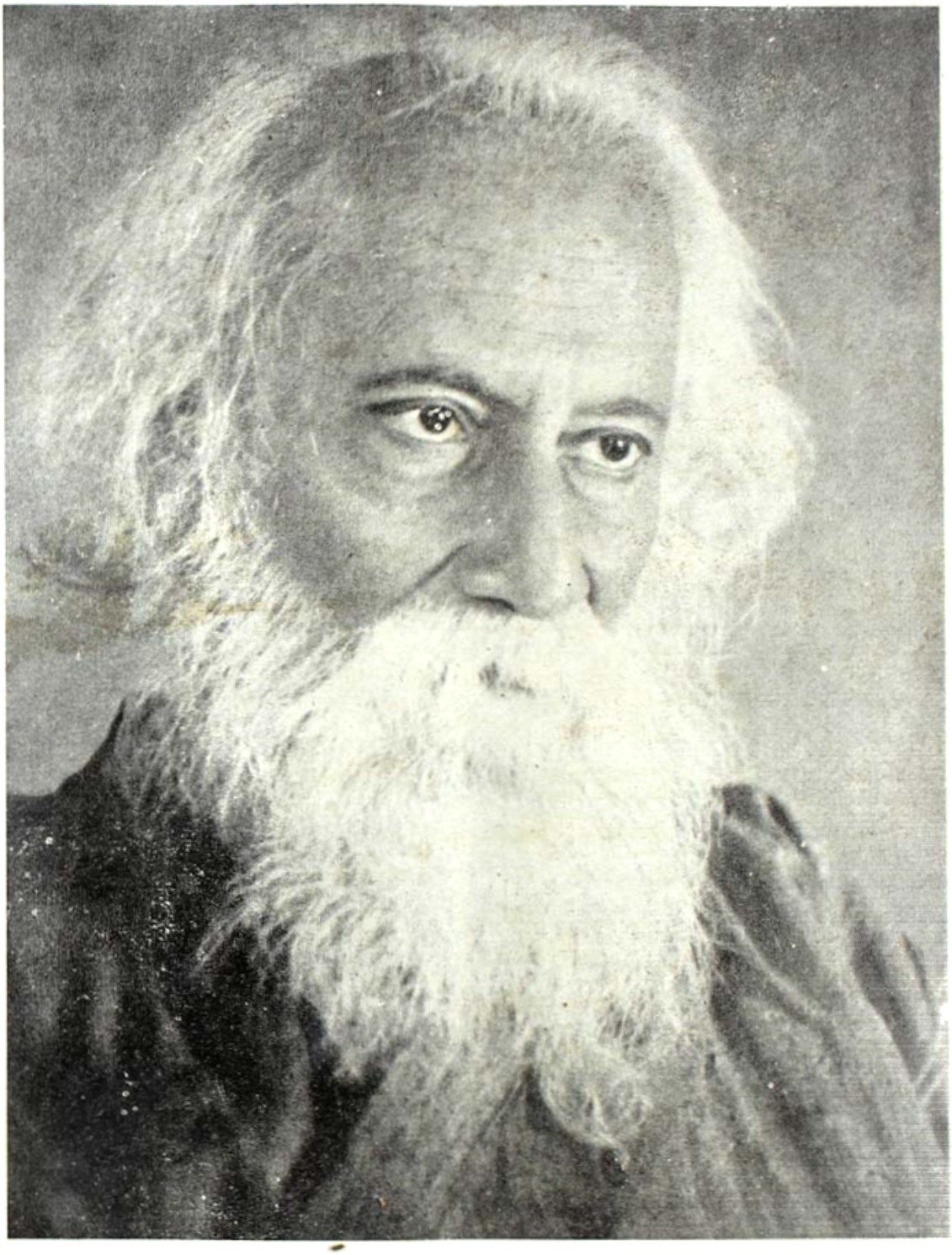

রবীন্দ্রনাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্যহীন ধূসর আকাশে
অস্পষ্ট রুপালি রেখা বৈশাখের নাম নিয়ে আসে।
মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ স্পন্দনে শুধু কালবৈশাখীর
ধূলিক্ষেপ দেখা দেয়, বর্ষণবিহীনা পৃথিবীর
অন্তর চাহিয়া থাকে অসুর্বর, প্রত্যাশায় ম্লান;
আকাশে অনন্ত শূন্য···নির্বিকার কালের শ্মশান।

ধূলি ভরে ওঠে শুধু জীবনের অক্লান্ত চরণে
তরুণের ললাটে কুঞ্চনরেখা, শান্ত দিগঙ্গনে
সায়াহ্নের ছায়া নামে। স্বর্ণ প্রত্যাশায় আর
জ্বালা নেই মেঘে মেঘে। প্রত্যাশার শান্ত অন্ধকার
ভরিয়াছে আকাশ প্রান্তর বন, ভরেছে ভুবন,
নিস্পন্দ করেছে এই শতাব্দীর হৃদয়স্পন্দন;
তুলেছি আকাশে সেই একটি আশ্চর্য উজ্জ্বলতা
অনন্ত মহত যার অবিরাম নিত্য মুখরতা।

আমাদের অনন্ত বিস্মৃতি কবি, অগণ্য বিরোধ
ধূলিলিপ্ত মাংসপেশে বেদনার ঋণ করি শোধ,
কঠিন আঘাতে দেখি পৃথিবীর নির্মম অক্ষমা,
আমাদের ক্ষমা কোরোনাকে।

তোমার দুঃসহ ঘৃণা
বজ্রের আঘাতে দিক্ দুনিবার প্রচণ্ড বেদনা;
নির্ভুল বিচারে তব ছিন্ন হোক প্রলীক কুয়াশা,
দাও অগ্নিজ্বালা বুকে, মরুসার তীক্ষ্ণতম ভাষা

চূর্ণ করো মহত্ত্বাকে এ'জাতির স্পন্দিত যৌবনে
হানো রুদ্রকশা তব; তবু থাক উন্মত্ত ভুবনে।
তারপর আকাশের রাত্রিশেষ জ্যোতির আহ্বানে;
জীবনের অনন্ত সৃষ্টির বাঁশী দিয়ো গানে গানে।

LIBRARY, UNIVERSITY

—শরৎচন্দ্র

সপ্তদশ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬১ | চতুর্থ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য'

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য সার্বজনীন উন্নতি আবশ্যক। সমাজের একশ্রেণী যে-পর্যন্ত অপর শ্রেণীদ্বারা শোষিত হইবে, সে-পর্যন্ত সমগ্র দেশ উন্নত হইতে পারিবেনা। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য বঙ্কিম সাম্য-মন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। 'সাম্য' তাঁহার পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি, প্রগাঢ় চিন্তার ফল।

শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের উন্নতির উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চ ভাব ও আদর্শের ঘোষণা তিনি আপন কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কর্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ব্যক্তিগত জ্ঞান ও চরিত্র সমুন্নত না হইলে দেশের উন্নতি সম্ভবেনা। তাই "দেবী চৌধুরাণী" "আনন্দমঠ", "সীতারাম" প্রভৃতি উপন্যাসে এবং "ধর্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তিনি জীবন গঠনের পন্থা নির্দেশ করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থে তিনি বলিতে চাহিলেন, প্রকৃত ধর্ম আপনার সুখ সমৃদ্ধিবর্ধনে নয়, সর্বজনের মঙ্গল সাধনে। এই সার্বজনীন কল্যাণ আজ নানারূপ সামাজিক বৈষম্যে বাধা পাইতেছে। সুবিধাভোগীরা দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিদের জোর করিয়া পদানত করিয়া রাখিয়াছে। দুর্বলেরা জ্ঞান ও সাহসের অভাববশতঃ ইহার প্রতীকারে অসমর্থ। নিজেদের অবস্থা বুঝিবার শক্তিও তাহাদের নাই। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা এবং তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতে হইবে, আপন অধিকার অর্জনে তাহাদের প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। তাই "সাম্য" গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন: "স্বদেশীয় সাধারণ জনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে পঠিতব্য কিছু না পান, আমি দুঃখিত হইবনা। অশিক্ষিত পাঠকদিগের জন্যে এই নীতি অনুচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।"

বড়লোক ছোটলোকের প্রভেদ আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিম দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশে এই প্রভেদ দুইরূপে বর্তমান: (১) অর্থগত (২) জাতিগত। কেহ বা বড় চাকুরে বলিয়া তাঁহার সম্মান, কেহবা উচ্চবর্ণ বলিয়া সম্মানিত। সম্মানের যোগ্যতা কাহার বস্তুতঃ আছে তাহা দেখিয়া সম্মান করিতে চাইলে ইহাদের অনেকেই বাদ পড়িয়া যাইবেন। অথচ এই কৃত্রিম বৈষম্য বর্তমানে এবং আমরা সকলে তাহা মানিয়া লইতেছি। যে বৈষম্য প্রাকৃতিক তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই এবং থাকিতে

পারেনা। কিন্তু এইসব কৃত্রিম অযৌক্তিক বৈষম্য সমাজের নিত্য অমঙ্গলের হেতু।

সামাজিক সাম্যবিধানের উপরে দেশের শ্রীবৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। রোমে যখন পেট্রিসিয় ও প্লীবিয়দিগের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য অপনোদিত হইল, তখনই রোমের অভ্যুত্থান। আর যখন ভোগে বিলাসে রোম পূর্ণ হইল, মুষ্টিমেয় লোকের স্বেচ্ছাচারের উপর অসংখ্যের জীবন মরণ নির্ভর করিতে লাগিল, তখনই রোমের পতন। ফরাসী দেশেও সামাজিক বৈষম্যের পীড়ন যেদিন অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছিল সেদিন তাহার ঘোর দুর্দিন। অগণিত মানবের শোণিতধারায় মহা-বিপ্লবের পথে দেশ তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। ভারতবর্ষও বর্ণ-বৈষম্যের বিচারে শূদ্রের জ্ঞান রোধ করিয়া তাহার অবনতি আনয়ন করিয়াছিল; বুদ্ধদেবের ধর্ম-বিপ্লবে সাম্যের প্রতিষ্ঠায় তাহার পুনরুত্থান ঘটে।

পৃথিবীতে—বঙ্কিমের মতে—তিনজন মহাপুরুষ সাম্য-মন্ত্রের প্রধান প্রচারক। এক—বুদ্ধদেব। ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাচারে ভূমীভূত করিয়া হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে তাঁহার অভ্যুদয়। দুই—যীশুখ্রীষ্ট। রোমক সাম্রাজ্যের উদ্দাম ভোগবিলাস ও অত্যাচারের দিনে দরিদ্রের বন্ধুরূপে, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মন্ত্র প্রচার করিতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। আর তৃতীয়—রুসো। ভূমি ভোগদখলের একচ্ছত্র অধিকার কাহারও নাই, বসুন্ধরা সর্বমানবের; সমাজ ও সভ্যতা বলবান কর্তৃক দুর্বলের পরাজয়ের উপরে সৃষ্ট; ফরাসী সাম্রাজ্যে সম্রাটের ঘোর স্বেচ্ছাচারের দিনে Le Contrat Social গ্রন্থে তিনি এই বাণী ঘোষণা করিলেন।

রুসোর এই নব সাম্যবাদ দিকে দিকে নূতন আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। কুদরীরিজম্, জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের উত্তরাধিকার-নীতি, সেণ্ট সাইমনিজম্ রুসোর মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, সাম্যনীতির অন্তর্গত; কম্যুনিজম্ রুসোর বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছে। মিল রুসোর সহিত পূর্ণ একমত নহেন। ধনসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী না থাকিলে কিংবা পিতা পুত্রকে সকল সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে উহাতে সমগ্র সমাজের অধিকার, তাঁহার এই মত। নরনারীর সমান অধিকারের তিনি বিশেষ পরিপোষক। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাঁদের সাম্যতত্ত্বের অনুরাগী। কিন্তু ইহাঁদের কাহারও মতামত তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। রুসো সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, সমাজ ও সভ্যতা বিষয়ে তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত; কিন্তু তাঁহার এই ভ্রান্ত বাক্যই ফরাসীদেশে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। "রুসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপিতা হইল। কেননা, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক। সেই ভ্রান্তির দ্বারা অর্ধেক সত্যে নিমিত।"

৪

সাম্যবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিদ্যমান তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, পরাণ মণ্ডল নামক জনৈক কল্পিত কৃষকের অবতারণা করিয়া তাহার দুঃখময় জীবন, জমিদারের নিষ্পেষণ এবং অন্যান্য সমস্যার পর্যালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার একান্ত ভক্ত হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সামাজিক দোষ ত্রুটিগুলি পরিষ্কারভাবেই দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনা যুক্তিপন্থী। অলস ভাববিহ্বলতায় তাঁহার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণের চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়া যেখানে যাহা গ্রহণযোগ্য সেখানে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশের গৌরবে গৌরববোধের ক্ষমতা হারান নাই। স্বাদেশিকতার সহিত এই স্বাধীন চিন্তা তাঁহার রচনাবলীকে এযুগের আদর্শস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতীয় তথা বঙ্গীয় কৃষকের জীবন আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: "অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা আজিকালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতরলোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক।

যতদিন হইতে ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকের দুর্দশার সূত্রপাত।"

দুর্দশার কারণ কি? "কৃষক বলেন যে, জ্ঞানের ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।—জ্ঞান আপনি জন্মেনা, অতিশয় দুর্লভতা। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্বে উদর পোষণ চাই।—যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না।" সুতরাং আবশ্যক এই, একদল ধন উৎপাদন করিবে এবং অন্যদল তাহার উপভোক্তা হইয়া জ্ঞানচর্চা করিবে। উৎপাদকেরা আপনাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন উৎপাদন করিতে পারিলেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের দেশের উৎপন্ন ধনের পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে বাড়িতেছে না। দ্রুত লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ভ্রমজীবিদিগের আর্থিক সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। ধনী দরিদ্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রে, উন্নতে অনুন্নতে অপরিমিত বৈষম্যও প্রজাসাধারণের দুরবস্থার অন্যতম কারণ। ভারতীয় প্রজার দুর্দশার কারণ আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকস্থলে বক্তৃতার মত উল্লেখ ও সমর্থন করিয়াছেন, দুইএকস্থলে স্বীয় মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন।

নারী সমস্যা সম্বন্ধে অনেকের ধারণা বঙ্কিম সম্পূর্ণ রক্ষণশীল এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমানাধিকারের বিরোধী। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বিজাতীয় অতি-গতির নিন্দা তিনি অনেকস্থলে করিয়াছেন বটে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কথার কখনই বিরোধিতা করেন নাই। এদেশের স্ত্রীজাতির দুর্দশায় তিনি যথেষ্ট দুঃখবোধ করিয়াছেন। "আমাদের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতীকারজন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যত্ন অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই।"

নারীর দুর্দশামোচনেরও উপায় তিনি করিয়াছেন—শিক্ষা। স্ত্রীগণের অবরোধমুক্তি এবং অর্থোপার্জন চেষ্টারও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। "লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে এবং ঐ দেশীয় স্ত্রীপুরুষ সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্ তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।"

বিশেষ করিয়া অনাথা স্ত্রীলোকগণের পক্ষে নানা-প্রকার দুর্ব্যবহার ও গঞ্জনা সহ্য করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অপেক্ষা অফিস-আদালতে কাজ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন শ্রেয়ঃ একথা তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন।

এইসকল মতামত অংশতঃ পাশ্চাত্য চিন্তাদ্বারা প্রভাবিত হইলেও আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন বিচার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সতেজ সবল চিন্তার পরিচায়ক বলিয়াই এই সকল রচনা দেশের সর্বপ্রকার আদরের বস্তু এবং সর্বজনের অনুধাবনযোগ্য।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পুণর্মুদ্রণ]

শিবশঙ্কর ঘরে ঢুকে দেখলে—ঘর ভর্তি।

রমাপতি মাঝখানে, আর সবাই আশে-পাশে। যত না আলো তার চেয়ে বেশী ছায়া ঘরময়। বড় কাডলণ্ঠনটা জ্বালা হ'য়েছে, কিন্তু সে দিনের মত আলো নেই, কেমন মিট্‌মিট্‌ করছে যেন। ওর চেয়ে আজকাল হ্যারিকেনের জোর বেশি পরিষ্কার, অনেক বেশি উজ্জ্বল!

চোখ তুলে রমাপতি বললেন, এস, বস।

তক্তাপোষের একধার চেপে বসে শিবশঙ্কর সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হ'লো, ইতিপূর্বে গভীর আলোচনা হ'য়ে গেছে নিজেদের মধ্যে।

একটু অস্বস্তি বোধ করে শিবশঙ্কর—তার অবর্তমানেই যখন আলোচনা হ'য়ে গেছে তখন আবার তাকে ডাকা কেন? তার আসবার দরকার কি! তাকে বাদ দিয়েই চলুক না—

রমাপতি বললেন—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি সব—

এতক্ষণে শিবশঙ্কর গা দুলিয়ে ভাল ভাবে উঠে বসল তক্তাপোষে সবার গা ঘেঁসে। স্পষ্ট করে চেয়ে দেখল—বোধ বংশের সকলেই এসেছে, পুব-বাড়ি, পশ্চিম-বাড়ি, নতুন বাড়ি। কাকাকে বাদ দিয়ে সাতজন, তাকে নিয়ে আটজন। কালীপ্রসাদ, কৃষ্ণধন, অমূল্যরতন, রাজীবলোচন, পঞ্চানন, বিধুভূষণ, রাজচন্দ্র!

এমন মিল আর কোনদিন হয় নি বিশ বছরের মধ্যে। কর্তাদের আমলে, বুঝি এর চেয়ে বেশি মিল ছিল, বোঝা যেত না কে কার ভাই, কে কার কি! বৈঠকখানা আলো ক'রে থাকতেন তাঁরা। "পার্টিশান স্যুটে" সব এক-এক পার্টি হয়ে গেছে—এক বাড়িকে সাতভাগ, এক সদরকে পাঁচ সদর, ভেঙে খোলামকুচি।

আজ দেখতে কেমন লাগছে! আবার সব এক হওয়া যায় না? তাতা মন জোড়া লাগে না সাধারণ স্বার্থে?

রমাপতি বললেন, শুনেছো বোধ হয় কালীকে নারাণ খাঁ অপমান করেছে—

শিবশঙ্কর মাথা নাড়লে। নারাণ বড় বেড়েছে তা সে জানে।

রমাপতি বললেন, ঐ নারাণের বাবা ছিল তোমাদের পাইক, নফর সব!

অপরাধটা যেন শিবশঙ্করের, ঊর্ধ্বশ্বাসে শিবশঙ্কর অপেক্ষা করে।

রমাপতি বলতে থাকেন,—প্রথম যেদিন তোমাদের বাড়ির ভেতর নেড়ে ঢুকলো সেইদিনই আমি আপত্তি করেছিলুম—কাজটা ভাল হ'লোনা, ফল খুব খারাপ চাষ-বাসের কাজ করুক, তা নয় হাট-বাজার ওদের দিয়ে!

মনে না পড়লেও শিবশঙ্কর মেনে নেয় অপরাধ—মুসলমানের প্রতি তাদের পরিবারের পক্ষপাতিত্ব!

হঠাৎ রমাপতি বললেন, কি ইচ্ছে করচে তার বেটাকে এখুনি ধরিয়ে আনিয়ে ঐ পথের ঘরে জ্যান্ত কবর দিই!

কি জানি কারো সেই বেয়াদপ মোল্লার কথা মনে পড়ে কিনা। তবে সবার মুখে-চোখে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার একটা উজ্জ্বল ছায়া দেখা যায়। নাকি কাড-লণ্ঠনের আলো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে? পুরোন আলোর কল বিগড়ে গেল?

রমাপতি বললেন, আগে ঐ শালা নেড়েদের জব্দ করতে হ'বে, তারপর অন্য কথা!

সবাই চুপ।

গাঁয়ের মুসলমানরা আর এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নিরপেক্ষতার ভান করে, তারাও আজ বাবুদের বিরুদ্ধে। স্বজাতের অপমান তবু সহ্য হয়, কিন্তু বেজাত, বিধর্মীর অপমান সহ্য করা কোন মতেই উচিত নয়। ওতে নিধন ঘনিয়ে ওঠে, ধ্বংস এগিয়ে আসে।

খানিক চুপ করে, থেকে রমাপতি বললেন, যার যেটুকু জমি ওদের দেওয়া আছে খাস দখল করে ফেল। যে জন্যে ওদের জমি দেওয়া—বাসের জন্যে—তার কোন দরকারই নেই আর—গ্রাম থেকে ওদের বাস উঠিয়ে দাও—শালার জাতকে বিশ্বাস নেই, হারামীর বাচ্চা সব!

এতক্ষণ কালীপ্রসাদ চুপ করেছিল। সেই কখন যেন এসে একবার কাকার কানে নারাণ খাঁর ব্যাপারটা তুলেছিল, তারপর সবাইকে ডাকাডাকি বলাবলি। বাপী পক্ষে সাক্ষী সংগ্রহ!

কালীপ্রসাদ বললে, মশা মারতে আর কতক্ষণ! আপনি একাই পারেন। বেটা বলে কিনা সব বাবুদের আমার জানা আছে! মনে করে কটা চাবা লাফাচ্ছে বলে বাবুদের হয়ে গেচে!

আট মুখ একটি মুখের দিকে ফেরে।

কিন্তু রমাপতি নীরব। অতঃপর নারাণকে কি ভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায় তিনি যেন ভাবেন গম্ভীর ভাবে।

বোঝা যায়, আজ আর কোন উপায় নেই এক কাগজে-কলমে কিছু করা ছাড়া। নারাণকে শায়েস্তা করা দরকার ডাক ফরিদকে, ফরিদকে জব্দ করতে ডাক মোরাদকে—তখন একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লাগিয়ে দেওয়া কত সহজ ছিল! লোকেও যেন মুখিয়ে থাকতো কোন-মতে বাবুদের একটা কাজে আসতে পারলে, সে বেগারই হোক আর মূল্য ধরেই হোক! বাবুরা বলছেন যখন তখন 'না' করবার কিছু নেই। বলা যায় কি বাবুদের কৃপায় কার কখন বরাত খুলে যায়! ওঁরা হলেন প্রভু, সাক্ষাৎ রাজা-বাদশা!

এখন আর তেমন হয়না। খেতে না পেলেও ফরিদ বা মোরাদকে কিছুতে নারাণের বিরুদ্ধে লাগান যাবে না। চালে খড়, ভাঁড়ে তেল রইল কি না, তার তোয়াক্কা করে না। জাত-ভাই সে যেমন হোক!

রমাপতি বললেন, তাহলে ঐ কথা রইল, সবাই মিলে বাকি খাজনার নালিশ দোব। শিবু তুমি তো কাগজ তৈরী করছো ঐসঙ্গে মুসলমান পাড়ার ক'বেটার নাম জুড়ে দাও।

শিবশঙ্কর ইতস্তত করলে। ওদের জব্দ করার মত কাগজপত্র তেমন নেই কিছু—বে-বেয়াদী কবুলতী ছিল যেন কখানা। তাছাড়া খাজনার বন্দোবস্ত কিছু নেই। কবুলতীগুলোর কোন মেয়াদ নেই—পার্টিশনের মামলার সময় খোওয়া গেছে। পত্তনের নাম অনেক জমা বদল হয়েছে! সিভিল স্যুট-এ বড় সুবিধে হবে না ডিক্রী হলেই বা কি!

তার চেয়ে, শিবশঙ্কর বললে, কোন রকমে একটা ফৌজদারী করতে পারলে—

হঠাৎ একটা নিঃশব্দ চাঞ্চল্য বোধ করা যায় সবার মধ্যে। যুক্তিটা অগ্রাহ্যের না হ'লেও কোথায় যেন বাধে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখে। রমাপতি কোন কথা বলেন না। সামান্য একটা চাষার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে হাতজোড় করে, নালিশ জানাবেন কি-

উদয়পুরের জমিদারবাবুরা! তার চেয়ে গ্রাম ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত। শক্তিহীনের আত্মহত্যাই সমীচীন

রাজচন্দ্র বললে, সে হবেনা। ফৌজদারী করলে নিজেরাই ছোট হয়ে যাব। লোকে বলবে, বাবুরা ওরে পেড়ে মারপিটের মামলা রুজু করেছেন! তার চেয়ে বরঞ্চ হাজনার নালিশ অনেক বেশি সম্মানের।

হাজনার ব্যবস্থাই নেই তার নালিশ!

কি নালিশ করবে শুনি? শিবশঙ্কর ক্ষেপে করে।

কিছু না থাকে মিথ্যে করে' আজি লেখান চরে—ছুটির কোর্ট হাঁটাহাঁটি করুক তো বেটারা! রাজচন্দ্র বললে, তা বলে চুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল শিবশঙ্কর। রমাপতি বাধা দিয়ে বললেন, না ফৌজদারী করা চলবে না। অপরাধের একটা সীমা আছে। বংশ আমাদের পড়ে গেছে, তাদেরও আরো, তা বলে এতটা! এ তুমি কি করে ভাবলে শিবু, মার খেয়ে বাবী সাজবো আমরাই—কোর্টে গিয়ে বলবো, নারাণ খাঁ আমাদের মেরেছে, তার ভয়ে আমরা বাস করতে পারছিনা গাঁয়ে! বলতে পারবে?

শিবশঙ্কর উত্তর দিলে না। আর সকলে অস্বীকৃতির গুঞ্জন তুললে—না না, তা কখনো হয় না।

মহলেও মর্যাদা হারাতে নেই। রমাপতি বললেন, কেবল নিজের ঘরে নয়, বাইরেও ও জিনিষটা বজায় রাখতে হয়! বংশের সব গেলেও ঐটে থাকবে শেষ পর্যন্ত। ওটা গেলে জানবে সব গেল, কিছু আর বাকি রইল না।

চুপ করে শুনলে সবাই।

ঠিকই বলছেন কাকা, তা বলে মান-মর্যাদা খোয়ান যায় না! শিবু পাগলের মত যা-তা বলছে!

কিন্তু কিল খেয়ে কিল চুরি করতে কেমন অস্বস্তি লাগে কালীপ্রসাদের। এতক্ষণ কারো কোন পরামর্শই তার মনের মত বোধ হচ্ছিল না। দেওয়ানী, ফৌজদারীতে আর কতটুকু অপমানের শোধ নেওয়া যায়—উত্তম-মধ্যম যদি না দেওয়া যায় সবাই মিলে। উল্টে এমন মার শালাকে লাগতে হবে যে, আজীবন মনে থাকবে, বংশপরম্পরা মনে রাখবে—হাঁ, মার দিয়েছিল বটে উদয়পুরের বাবুরা—সে একটা মার খাকে বলে। মারের নাম জবর খাঁ।

মকদ্দমা করে' জব্দ আর মানুষকে কতটুকু করা যায়! ওসব দুর্বলের সম্বল আজকাল। সবল কখনো কোর্টে ছোটে না।

কালীপ্রসাদ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, তার চেয়ে গিয়ে বেটাকে উত্তম-মধ্যম লাগান উচিত। মারই হ'লো ওদের ওষুধ।

কেউ সাড়া করে না।

কারণও আছে, ওষুধ দেবে কে—মারবে কে? মুখের কথা নয় আজকাল মারটা। মারের বদলে মার, বাপ বলতে শালা—খুব সার্থক প্রতিশোধ, খুব পুরোন দাওয়াই, খুব কাজের; কিন্তু আজকাল তার প্রয়োগ অনেক বিধিনিষেধের অপেক্ষা রাখে। মার দিয়ে মারের শোধ হয় না।

গম্ভীর হ'য়ে রমাপতি বললেন, বেশ, তাই হ'বে। কাল চল সবাই মিলে যাই—বেটাকে জুতো পেটা করে' আসি—জুতিয়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দিই—পিঠের ছাল-চামড়া গুটিয়ে দিই!

কালীপ্রসাদ চেয়ে দেখে, আর, সবাই মাথা নীচু করে' আঙুল দিয়ে ফরাশ খুঁটছে, যেন কাকার কথাটা ওদের উদ্দেশ্যেই নয়।

রুষ্টকণ্ঠে কালীপ্রসাদ বললে, কি, তোমরা রাজি তো? কাকা যা বললেন—

কেউ কথা বলে না। শিবশঙ্কর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, তার প্রস্তাব যখন খাটলো না তখন অন্যের প্রস্তাব সে স্বীকার করবে কেন? কি বয়ে গেছে তার—

রমাপতিও চুপ করে থাকেন। কি ভাবেন কে জানে—নিজ বংশের হীনমীর্যতার কথা নয় তো? এত ভয় পায় সব!

কালীপ্রসাদ নিজেকে সামলাতে পারে না—ক্ষুব্ধ অভিমানে বলে, এই তোমাদের মুরোদ, এই তোমাদের স্বজনপ্রীতি! বুঝেচি আমাকে অপমান করেচে তোমাদের লাগবে কেন, আমার মুখে থুতু দিয়েচে তোমাদের মুখ নষ্ট হবে কেন! বেশ। আমিও বলচি, আজ থেকে তোমাদের কোন ব্যাপারেই আমি নেই। যদি থাকি আমার মুখে দু'ঘা জুতো মেরো!

বলে' উত্তরের অপেক্ষা না করেই কালীপ্রসাদ উঠে যাচ্ছিল, রমাপতি ভাবলেন, আঃ কি করচো কালি! বস। আমায় তোমার ব্যাপার কি বলচো! ভাবতে দাও, বুঝতে দাও ব্যাপারটা! ছেলেমানষী করো না—

এতক্ষণ যা হয়নি, কালীপ্রসাদের গলা কান্নাভাঙা হয়ে যায়—যেন জ্ঞাতিরাই তাকে ডেকে এনে অপমান করেছে দুর্বল পেয়ে—বোঝবার কিছু নেই, ভাববারও কিছু নেই—আমাকে অপমান করেচে তা আপনাদের কি! তবে বলে দিচ্ছি এ তোলা থাকবে—কাউকে ওরা বাদ দেবে না, তখন মনে থাকে যেন!

রমাপতি একটু থমকালেন, সেই তুমি চুপ করবে না! বলচি, সবাইকে ডাকা হ'য়েচে যখন তখন একটা ব্যবস্থা হবেই—আমার তোমার কথা নয়! এর মধ্যে অতো উতলা হ'লে চলবে কেন! আজ আমাদের শত্রু চতুর্দিকে, ঘরে বাইরে—অনেক বিবেচনা করে' কাজ করতে হবে! তুমি মার চাইলেই কি সবাই 'মার-মার' করে' ছুটবে ভেবেচো! এটা তুমি কি করে' ভাবলে, তোমার অপমান কারো গায়ে লাগেনি?

কালীপ্রসাদ স্বর পরিষ্কার করে বলল, না কারো লাগেনি, কেন লাগবে? বুঝতে পারি না কার কি মনোভাব! নেড়ের সঙ্গে পিরীত আমাদের কারো ছিল না, এখন সেই নেড়ে দিয়ে অপমান কারা করাচ্ছে বুঝতে পারি না ভেবেচেন, এতই নির্বোধ পেয়েছেন!

নির্বোধ তুমি হতে যাবে কেন, তুমি খুব চালাক! শিবশঙ্কর টিপ্পনী কাটলে, বেশি বুদ্ধিমান বলে তো এই অবস্থা!

তার মানে? কালীপ্রসাদ ক্ষেপে ওঠে একেবারে।

মানে খুব স্পষ্ট। শিবশঙ্কর ছোট্ট করে বলে।

কি, কি! শুনচেন তো, এই সব জ্ঞাতির জন্যে নিজের মান খোয়াতে গেছি আমি! আপনি বলচেন ভাববার আছে! কি ভাববেন! কালীপ্রসাদ তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ে।

রমাপতি আর ডাকেন না। বললেন, তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করবে তা হলে আমাকে বার দাও, যা হচ্ছে হোক—

রাজচন্দ্র কালীপ্রসাদকে থামালে, কি, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! কি মুস্কিল এর মধ্যেই—

কালীপ্রসাদ থামলে। সত্যি, তার ব্যবহারে অযৌক্তিকতা কোথায় সে ধরতে পারে না। নারাণ খাঁ সেদিন তাকে যতটা অপমান করতে পারে নি, তার হাজারগুণ অপমান এরা তাকে করেছে। তাকে থামিয়ে দিয়ে, ফোঁড়ন কেটে তার ক্রোধটা প্রকাশ করতে না দিয়ে, তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে' তাকে অগ্রাহ্যই করছে। ঐ শিবশঙ্করকে সে চেনে, ঐ রাজচন্দ্রকেও তার জানা আছে ভাল করে।

আজ দেখতে এক হলে কি হবে, সেদিন পর্যন্ত মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল! পারলে বুঝি হাতে মাথা কাটতে কুণ্ঠিত হতো না। জানা আছে সবাইকে!

এ ভাবনার কালীপ্রসাদের কারণ আছে, তার পিতামহের নাম বিকৃত করে বলা হয়, বিঘত ভাগাভাগির ব্যাপারটা তিনিই নাকি ধ্বংসের শেষ সীমায় টেনে এনেছিলেন। মুনসেফ কোর্টের নিষ্পত্তিতে তিনি ক্ষান্ত হননি—একের পাঁচ অংশকে একের পক্ষা করে' হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়েছিলেন। বলাই বাহুল্য এতে তাঁর লাভের অঙ্কটা বেশি হবার সম্ভাবনাই ছিল

[illegible] ভাল হবে, তার মোটা বখরাদার তিনি তাঁর পুত্র-পৌত্র ভবিষ্যৎ সুখে থাকবে। যার [illegible] তিনি [illegible] করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, [illegible] তাঁরই পিতার খোপাজিত। এতগুলি ছিল সমানভাবে ছ'দশ বিঘা হবে কি হবে না। পূর্বপুরুষ কালাচাঁদ একা আর কত রোজগার করেছেন সবাই মিলে তার ভাগীদার! কে না জানে, খড়ের চরবার তাঁর ছ' দুবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বেনার দায়ে, তাঁকে লাইল ধরতে হয়েছিল! কেনারামের সম্পত্তি কার বুদ্ধিতে ঘোষেদের হয়েছিল? সে ঐ কালীপ্রসাদের পিতামহের পিতা জগন্নাপ্রসাদের ফন্দি-ফিকিরে প্রমাণ না হোক, বুকে হাত দিলে সবাই বুঝতে পারবে—রক্তটা তো এক, মুখে বললে হবে কেন।

উত্তপ্তকণ্ঠে কালীপ্রসাদ বললে, মাথা হামাদের ভাল ভাই, তোমাদের মাথা নিয়ে তোমরা জাতি কখনও ভাল হয় না, জাতি কখনো হয় পেছনে হাত-তালি জাতি ছাড়া আর সেই জন্যে অনেক আগেই আমাকে ডাকিয়েছিল তুমি ওদের মধ্যে যেও না! জাতিকে বিশ্বাস নেই।

নেই নেই! বড় আমার জাত-ভক্ত বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি এসেছেন। জজনে হঠাৎ বলে ফেললে।

তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসাদ একটা কটু বাক্য চীৎকার করে উচ্চারণ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উপস্থিত কজনের মধ্যে সকৌতুক চোখে চাওয়া-চাওয়ি হলো।

রমাপতি লক্ষ্য করলেও করে থাকবেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না। বাইরে অন্ধকারে চোখ রেখে তিনি খানিক চুপ করে' রইলেন। তাঁর এমনি মনে হলো, এ বিপদে কাউকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না, নিজেও তিনি রেহাই পাবেন না। গৃহ-বিবাদ বড় সংঘাতিক! অনেক বিবাদ তাঁরা করেছেন কিন্তু কখনো নিজেদের মধ্যে এমন ভাবে ছোটলোকমি করেন নি—কত মামলা মকর্দ্দমা হয়েছে কিন্তু এমনি ভাবে তাঁদের মন পরস্পরের প্রতি কাদার-ছিটের মলিন হয়নি। লক্ষ্মী তাঁদের অনেকদিন চলে গেছে সত্যি, কিন্তু আজ তাঁর মনে হচ্ছে, প্রকৃত লক্ষ্মীছাড়া এখনি হয়েছেন। বাইরের বিদ্রোহ ঠেকালেও ভেতরের এই অসন্তোষকে কিছুতেই বুঝি ঠেকাতে পারবেন না—পচন ধরেছে।

পূর্ব পুরুষের কীর্তি, বিস্তৃত এই খামারের পুঞ্জীভূত অন্ধকার যদি কথা কয়, চির-নবীন তামসী রাত্রি যদি হঠাৎ ভাষাবতী হয়ে ওঠে তাহলে অতীতের অনেক দূর থেকে অনেক কথা শোনা যায়—এ আর কিছু নয়, পাপের ফল! পাপ জমে ছিল তার প্রায়শ্চিত্তি হচ্ছে। রসুল আলী সদাশয় ছিল, তার অভিশাপ যাবে কোথায়? ঠকিয়ে বিষয় আর কতদিন ভোগ করবে?

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের নাটক

নারায়ণ চৌধুরী

থর নাট্যসাহিত্যকে মূলতঃ
াতে পারে।—নাট্যকাব্য, রূপক
রসাত্মক নাটক। প্রথম পর্যায়ের
প্রতিভা, 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির
য়ার খেলা' 'মালিনী', 'রাজা
চিত্রাঙ্গদা' প্রমুখ কাব্যাশ্রিত
হল 'রাজা'

প্রতীক হিসাবে নাটকেও উপস্থাপিত রয়েছেন।

কিংবা, 'রাজা ও রাণী' বা তার পরিবর্তিত রূপ পতী' নাটক। কবি রাজা ও রাণী প্রকাশের লের (১২৯৬) প্রায় চল্লিশ বৎসর পর (১৩৩৬) টকের আখ্যানভাগের সংস্কার করে গুছাশায়ী পতী' নাটকটিকে দাঁড় করান। রাজা ও রাণী ং তপতী দুটিই কাহিনীধর্মী নাটক। আবার এর

'বৈকুণ্ঠের

হল তার মধ্যেই যে রবীন্দ্র-
পঞ্জী নিঃশেষিত হয়ে গেল তা
ক আছে এবং তা উল্লিখিত
অন্তর্গত। আবার, একাধিক
ত্র একই রচনায় প্রকাশ পেয়েছে
যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' বা তার
'। প্রায়শ্চিত্তের আখ্যান-
থেকে গৃহীত।
হাসিক

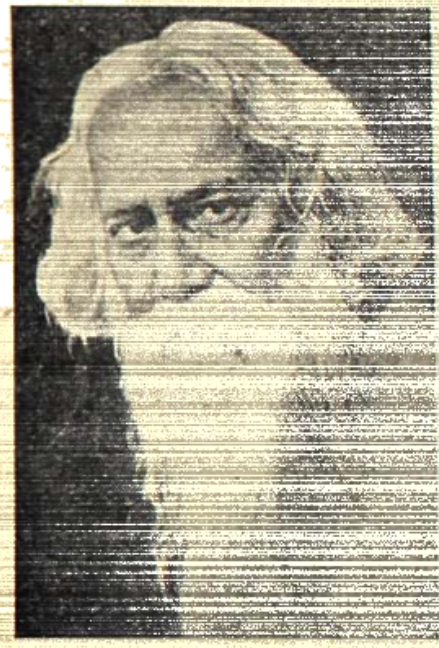

মূল ... ছন্দ ... বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী আবেগের সংঘাতে নাটক জমে উঠেছে। তত্ত্ব থাকা না থাকার ... এ নাটকের চরিত্র বিশ্ব সাধনা নিরপেক্ষ নয়।

'নটীর পূজা' নাটকটিকেও এই পর্যায়ের অন্তর্বর্তী করা যেতে পারে। কিন্তু 'গৃহপ্রবেশ' সব দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট একটি রচনা। এর ভিতর ... ট্র্যাজিডির বেদনা প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

... নিছক বালক বালিকাদের চিত্তবিনোদন ও অভিনয়ের জন্য রচিত নাটক বা নাটিকা, যথা, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'শারদোৎসব', ও 'মুকুট', এবং বিশেষভাবেই বালক বালিকাদের জন্য রচিত 'হাস্য-কৌতুক' পুস্তকের অন্তর্গত কতিপয় হেঁয়ালি-নাট্য। এর সঙ্গে যদি 'শাপমোচন', 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' 'শ্যামা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যগুলিকে যোগ করা যায় তা হলে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের পরিমাণ প্রকৃতই বিপুল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এক জীবনে যতগুলি নাটক লিখেছেন তা-ই একজন সাহিত্যকর্মীর শ্রমের সুবিপুলতা এবং কল্পনার বহুবৈচিত্র্য প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। যে কোন লেখক শুধুমাত্র এই অবদানের গৌরবেই চিরন্তন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারতেন।

আমরা তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছি। এই পর্যায়-গুলিকেও আবার কালানুক্রম অনুসারে তিনটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। কবির সাহিত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়ে নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্যের প্রাধান্য, দ্বিতীয় বা মধ্য অধ্যায়ে রূপকনাট্যের সংখ্যাধিক্য, আর জীবনের শেষ দিকে নৃত্যনাট্যের উপর কবির সুস্পষ্ট পক্ষপাত। এর মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে তিনি হাস্যরসোজ্জ্বল নাটকগুলি লিখেছেন, তবে অন্যান্য পর্যায়ের নাটকের তুলনায় এদের সংখ্যা বেশী নয়।

এই কালানুক্রমিক বিভাগের বিশেষ একটি অর্থ আছে। মানুষের মানসিক বিকাশের ছন্দটুকু বয়োবৃদ্ধির ক্রম অনুসরণ করে চলে। যে বয়সের যে ধর্ম সে বয়সের সেই বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সৃষ্টকর্মের মধ্যে বিশেষভাবেই প্রতিফলিত হয়। যৌবনের ধর্ম হল ভাবালুতা, আবেগপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস—রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে এ তিনেরই কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্ত সমাবেশ দেখা যায়। এই সব নাটকের মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য নেই এমন নয়—বস্তুতঃ, নাটকীয় উপাদানের তুলনায় এদের ভিতর কাব্যভাবেরই সমধিক প্রাধান্য—কিন্তু এই কাব্য ভাবালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন ও খণ্ডিত। 'প্রকৃতির পরিশোধ', 'মায়ার খেলা', 'মালিনী' প্রভৃতি রচনায় নাটকোচিত বিষয়কে কাব্যের আশ্রয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে নাটকের যা প্রাণবস্তু সেই ঘটনার সংঘাতের আদর্শ থেকে কবি বহু দূরে সরে এসেছেন এবং সে পরিমাণে রচনা ঘটনাবিচ্যুত হয়েছে-সে পরিমাণে তা কাব্য-গদগদ হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, এ কাব্য পরিণত বয়সের কাব্য নয়, সুতরাং পরিণত মনের ছাপও তাতে অনুপস্থিত। যৌবনের উচ্ছ্বাস এবং আবেগচাঞ্চল্যের দ্বারা এ কাব্য বিশেষ ভাবেই আবিষ্ট। ফলে নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য, গীতনাট্য যে নামেই তাদের অভিহিত করি না কেন, তাদের ভিতর কাব্যাংশের প্রাধান্য সত্ত্বে রচনা দুর্বল থেকে গেছে—কি কাব্যের দিক থেকে, কি নাটকের দিক থেকে। আজকাল অবশ্য ইংরাজী সাহিত্য অতিমাত্র বাস্তবধর্মী গদ্যনাটকের প্রতিক্রিয়ায় কাব্যনাট্যের সবিশেষ প্রচলন হয়েছে—ক্রিষ্টোফার ঈশারউডকে এই ধরণের আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা বলা যেতে পারে—কিন্তু এই আধুনিক কাব্যনাট্যের সার্থকতা ও উৎকর্ষ পরিণত মননের উপর বিশেষ ভাবেই নির্ভরশীল। ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য পরিণতির পথে অগ্রসর হতে গিয়ে বিবর্তনের অনেকগুলি সুচিহ্নিত স্তর অতিক্রম করার পর তবে এই নাট্য-কাব্যের অধ্যায়ে এসে পৌঁচেছে। ইংরাজী আধুনিক

নাট্যকারের নাটকীয়তা গুণে সমৃদ্ধ, পরন্তু কাব্যরসে ভরপুর। পরিণত বোধ এবং বুদ্ধি এই উভয়েরই ছাপ তার উপর স্পষ্ট।

কবির প্রথম বয়সের নাট্যকাব্যগুলি সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। বয়সোচিত ধর্মে এগুলি বিশেষ ভাবেই বয়সোচিত মানসিকতা প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ-এর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কবি 'জীবন স্মৃতির' পাতায় লিখেছেন—"আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতানর অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম।" এ কথার নির্গলিতার্থ এই যে কবির জীবনে আবেগাকুলতার আধিক্য ঘটেছিল এবং তারই প্রণোদনায় তিনি অন্তরের একাকোণে স্বহস্তে অন্ধকার বিবর নির্মাণ করে তার ভিতর গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, ফলে তাঁর বাইরের দৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছিল। যে ঘটনা বা এ্যাকশন প্রতিটি সফল নাট্যবস্তুর প্রাণ তা মূলতঃ বহির্দৃষ্টি নির্ভর। এই বহির্দৃষ্টি না থাকলে চতুর্দিকে পরিদৃশ্যমান জড়জগতের কোন বস্তুকেই ঠিক মতো দেখা হয় না। বহির্মুখিনতার প্রভাবে নাটকের মধ্যে আসে সজীবতা, আসে সংঘাত। পক্ষান্তরে বহির্জগৎ থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করে যে কবি তাকে বিনিঃশেষে মনোনিবদ্ধ করে, অনুভূতির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বে তিনি অকেন্দ্রিকতার অভিযোগ বুঝি সম্পূর্ণ খণ্ডন করতে পারেন না। আবার রাজা ও রাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—এর "নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি।" অর্থাৎ নাট্যকার স্বমুখেই স্বীকার করেছেন যে, কাব্যের আতিশয্যে এ নাটকের নাটকীয়তা ব্যাহত হয়েছে। ঐ যে কুমার সেন এবং ইলার একটি স্বতন্ত্র আখ্যান এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে নাটকটির অনিবার্য কোন যোগ নেই, ওটি যৌবনসুলভ ভাবালু কাব্যিকতার ফল। কবি নিজেই বলেছেন যে, সেটা অত্যন্ত শোচনীয় রূপে অসঙ্গত হয়েছে।

কিন্তু তপতী নাটক সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। একই আখ্যানবস্তু ভাবালুতা তথা কাব্যকুয়াসাবর্জিত হলে কতখানি জোরালো হতে পারে কাব্যনাট্য রাজা ও রাণী এবং গদ্যনাট্য তপতীর পার্থক্য বিশ্লেষণ করলেই সেটা ধরা পড়ে। তা ছাড়া এই ক্ষেত্রে প্রবীণ বয়সোচিত পরিণত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটিও বস্তু বিচার্য বিষয়, কেন পূর্বেই বলা হয়েছে যে রাজা ও রাণী এবং তপতীর রচনাকালের ভিতর প্রায় চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান।

রাজা ও রাণীর মধ্যে যে অনতিব্যক্ত তত্ত্ব অন্তর্লীন রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আসক্তি সত্যিকার প্রেমের উপলব্ধির পথে একটি প্রধান অন্তরায়। বিক্রমের প্রতি সুমিত্রার অন্তরে যে নিবিড় প্রেমের প্রগাঢ়তা ছিল, বিক্রম তাকে আসক্তির পীড়নে বার বার পীড়িত ও খণ্ডিত করেছে। ভোগের পথে বিক্রম যতো বেশি সুমিত্রাকে একান্ত করে পেতে চেয়েছে ততো বেশি সুমিত্রা বিক্রমের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। প্রেমের সংযম, পবিত্রতা এবং মর্যাদাকে সুমিত্রা ভোগাসক্তির বলি হতে দেয় নি বলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিয়ত চলেছে কঠিন মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত। সুমিত্রার মৃত্যুতে এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

গভীর কোন তত্ত্বকথা নয় তবে তত্ত্বটি চিরন্তন একটি সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব কাব্যসৃষ্টি সেই সঙ্গে এটি নাটকীয়তাগুণেও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এর নাট্যাংশ হচ্ছে বিষয়বস্তুর অভিনব বৈশিষ্ট্যে এবং কাব্যসৌন্দর্য বর্ণনার অপরূপ মাধুরীতে। কাব্য এবং নাট্যসম্পদ উভয়তঃ সমৃদ্ধ এজাতীয় নাটকের আদর্শ। আজকাল পাশ্চাত্য সাহিত্যে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রভাবটি অকারণ নয়।

বসন্তের অনুগ্রহে অনবদ্য রূপলাবণ্যের প্রসাদ লা

করে মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা এক বৎসরের জন্য অপ্রতিরোধ্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়েছিলেন, অর্জুন এই সৌন্দর্যের আকর্ষণে বাঁধা পড়েন। কিন্তু শুধু রূপের মোহে পুরুষকে আকর্ষণ করে নারীর তৃপ্তি নেই, রূপ এবং রূপহীনতা এই দুই অবস্থাতেই যখন প্রেম সমান অবিচল তখনই প্রেমের মহিমা পূর্ণ প্রকটিত। বরং খতিয়ে দেখতে গেলে, বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য যথার্থ প্রেমের পরিস্ফুরণের পথে একটি বাধা। দৈহিক রূপ সৌন্দর্যের মোহ মুছে গিয়ে যখন অন্তরে প্রকৃত চরিত্রশক্তির উদ্বোধন হয়, ভোগলিপ্সার আবিলতা দূর হয়ে যখন দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন অবিনশ্বর, অম্লান প্রেমের অনির্বচনীয় প্রসাদে মন কানায় কানায় ভরে ওঠে, আর তখনই প্রেমের পূর্ণতা।

'চিত্রাঙ্গদা' গ্রন্থের সূচনায় কবিমনে এই অপূর্ব-সুন্দর কাব্যনাট্যটির উন্মেষের ইতিহাসের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—"সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভোগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা দৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র শক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনে ভরযাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়; এর পরিধানে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানসিক, এ নয় প্রাকৃতিক।" কতকটা এই ভাবেরই আভাস যেন আমরা পাই অক্রূরতন নাটকে সুরঙ্গমার গানের কথায়—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব।"

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের এটি হচ্ছে তত্ত্বগত দিক, এ ছাড়া নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার বার্তাও অত্যন্ত ব্যর্থহীন, বলিষ্ঠ ভাষায় এ কাব্যে উদ্গীত হয়েছে—

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

আমাদের চিরপরিচিত অবলা নারীর মুখনিঃসৃত দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল ভাবণের সঙ্গে এর সুর ঠিক মেলে না, পরন্তু আত্মপ্রত্যয়দৃপ্তা আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলা বলিষ্ঠচিত্ত কোন নারীর অকুণ্ঠিত অঙ্গীকারের সুরটাই যেন এর ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবীতে অগ্রবর্তিনী নারীর স্বাধিকারের বাণী এর চাইতে বলিষ্ঠ, এর চাইতে সুসংহত ভাষায় বোধ করি উচ্চারিত হতে পারত না।

নাট্যকাব্যের পরে রূপকনাট্য। আমরা পূর্বেই বলেছি, এগুলি কবির মধ্য-বয়সের রচনা। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হলে মানুষের আবেগ সংহত হয়ে পক্ষান্তরে চিন্তাশীলতার দ্বারা উন্মুক্ত হয়। দার্শনিক প্রজ্ঞার স্ফুরণ এই সময় থেকেই। প্রবীণ মনের একটা প্রধান লক্ষণই হচ্ছে ভাবগাম্ভীর্য এবং বিচার বুদ্ধির স্থৈর্য ও অভ্রান্ততা। রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য গুলিতে এসকল গুণের সুসমঞ্জস ঐক্য ঘটেছে

প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্র রূপক নাট্যগুলি সৃষ্টিশীল প্রতিভার এক উজ্জ্বল দান। এতে যেমন আছে গাঢ় কাব্যের আস্বাদন আছে তেমনি আছে একাধিক চিরন্তন সত্যের প্রতি দ্বিধাহীন অঙ্গুলী নির্দেশ। রসরসিকতা ও মননশীলতায় মিলে রূপকনাট্যগুলি আমাদের সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হ'য়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক প্রমুখ প্রতীকবাদী লেখকদের রচনায় সমধর্মী নাট্যসাহিত্যের সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু মনে হয় সত্য ও সৌন্দর্যের এমন নিখুঁত সমন্বয় আর কোন নাটকে সংসাধিত হয় নি যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যগুলিতে। এই রচনাগুলিতে যাঁরা কাব্য চান তাঁরা কাব্য পাবেন, যাঁরা দর্শন চান, তাঁরা দর্শন পাবেন, অধিকন্তু সাধারণ পাঠক বা দর্শক উপভোগ করতে পারে এমন বিচিত্র সামগ্রীও এই রচনাগুলিতে হু হাতে ছড়ানো আছে। একাধিক রূপকনাট্যে কাব্য এবং তত্ত্বের তলায় তলায় অনাবিল হাস্যরসের স্রোত স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে অন্তর্লীন ফল্গুস্রোতের মতো। শুধু সেই হাস্যস্রোতকে অবারিত করবার কৌশল জানা চাই। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির মনে শান্তি আনন্দ ও মৈত্রীতে গড়া যে একটি উদার প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরশায়ী সার কথাগুলি শুধু যে কাব্যের আশ্রয়ে কায়া পরিগ্রহ করেছে তা নয় অনেক সময় আপাতচটুল নির্দোষ পরিহাস রসিকতার মধ্য দিয়েও অভিব্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই রূপকনাট্যগুলির বর্ণিত জনতার কথা মনে পড়ে। প্রতি নাটকেই একটা না একটা জনতার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। সেখানে গোটা জনতাই যেন একটা চরিত্র। তাদের মুখের কথা এবং কিম্ভূত আচরণের আপাত-হাস্যকরতার অন্তরালে মানব চরিত্র সম্পর্কে অতি নিগূঢ় কতকগুলি সত্যের সঙ্কেত দেওয়া আছে। জনতার সংলাপ দৃশ্যতঃ কৌতুকরসান্বিত, মূলত দার্শনিক জনোচিত প্রজ্ঞার দ্যোতক। তাদের অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যেও মানব চরিত্রের সহজাত দোদুল্যমানতা ও অস্থিরচিত্ততার লীলা পরিস্ফুট। বিশেষ করে 'মুক্তধারা' এবং 'অরূপরতন' নাটকের বর্ণিত জনতার মধ্যে আমরা মানব চরিত্রের এই দোলাচলচিত্ততার অভ্রান্ত প্রমাণ পাই। রবীন্দ্রনাথের রূপনাট্যের অন্তর্গত সাধারণ চরিত্রগুলির মধ্যে জনতার চরিত্রের শিল্পরসোত্তীর্ণ অতি নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে। এই দিক দিয়ে মানব চরিত্রের কবি শেক্সপীয়র এবং রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সমপর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য।

রবীন্দ্র রূপকনাট্যগুলিকে কেউ কেউ এই যুক্তিতে খাটো করতে চান যে, ওদের মধ্যে যে পরিমাণ পাঠযোগ্যতা আছে সে পরিমাণ অভিনয়যোগ্যতা নেই। মুক্তধারা কিম্বা অচলায়তন পাঠ্য নাটক হিসাবে চমৎকার, দৃশ্য নাটক হিসাবে তেমন নয়। নাটকের প্রধান সার্থকতা তার অভিনয় যোগ্যতায়, সংস্কৃত সাহিত্যে নাটককে যে 'দৃশ্যকাব্য' বলা হয়েছে সেটি এই কারণেই বলা হয়েছে, সেইদিক থেকে রবীন্দ্রনাট্যের আংশিক অপূর্ণতা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এ কথাকে উড়িয়ে না দিয়েও বলা যায়, কে কোন্ নাটককে কতখানি দৃশ্য বা অভিনয়যোগ্য মনে করবেন সেটা তাঁর রুচির ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। রবীন্দ্র রূপকনাট্যগুলি প্রচলিত সংস্কারের নাটকীয় মানদণ্ডে হয়তো যথোচিত পরিমাণে এ্যাকশন-প্রধান নয়, তাদের ভিতর ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্পষ্টতঃই কম, তা বলে তাদের কোনপ্রকার অভিনয় যোগ্যতা নেই এ কথা বললে রবীন্দ্র রূপকনাট্যের স্বরূপ সম্পর্কে অনুচিত ধারণার পরিচয় দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাট্যোক্ত সংলাপের অন্তর্নিহিত রসরসিকতা, মননশীলতা এবং কাব্য সম্পদের স্বাদ একবার যিনি ভালো করে পেয়েছেন তাঁর পক্ষে পেশাদার নাট্যমঞ্চের তথাকথিত সফল নাটকগুলির সম্পর্কে উৎসাহ জীইয়ে রাখা কথঞ্চিৎ শক্ত ব্যাপার।

আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও

যে, রবীন্দ্রনাট্যগুলির যথোপযুক্ত অভিনয়যোগ্যতা নেই তাতেই বা কী। পাঠ্য-সাহিত্য হিসাবে এইগুলি কি অনবদ্য রচনা নয়? রবীন্দ্র নাটক বার বার পড়লেও কি তাতে ক্লান্তি আসে? রবীন্দ্র নাটকের, বিশেষ করে রবীন্দ্র রূপকনাট্যের, অভিনয়-যোগ্যতার যদি-বা কিছু অপূর্ণতা থেকে থাকে, তাদের পাঠযোগ্যতার দ্বারা সে বিচ্যুতির বহুলাংশে শোধন হয়েছে বলে আমরা করি। নাটক শুধু অভিনয়ার্থেই রচিতব্য—এই গতানুগতিক সংস্কার কিঞ্চিৎ খণ্ডিত হওয়া ভালো।

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের বিরুদ্ধে আর একটি চলতি অভিযোগ এই যে, সে গুলি বাস্তব বোধ দ্বারা যথোপযুক্ত পরিমাণে উদ্বুদ্ধ নয়। এ অভিযোগেরও কোন ভিত্তি নাই। সাংসারিক বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার কিঞ্চিৎ তফাত আছে। রবীন্দ্র রূপকনাট্যগুলিতেও বাস্তবতার আবহাওয়া আছে তবে তা সার্বভৌম ও সর্বকালীন বাস্তবতা, সঙ্কীর্ণ স্থান কালের দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করে দেখা চলে না।

শিল্পসৌন্দর্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যগুলির মধ্যে এই কটিকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যেতে পারে—'ডাকঘর', 'রাজা' বা তার পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'ফাল্গুনী', 'রক্তকরবী' ও 'তাসের দেশ'। এদের মধ্যে আবার প্রধানের মর্যাদা দিতে হয় অরূপরতন, অচলায়তন, মুক্তধারা ও রক্তকরবীকে। তাসের দেশ রূপকনাট্য হলেও তার স্বাদগন্ধ কিঞ্চিৎ আলাদা। ওটির মধ্যে রূপকের পাশে পাশে Phantasy-কেও একটি বড়ো জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাণ্টাসির ভিতরের কথা হল কাব্যকল্পনার উদ্ভটত্ব ও বৈচিত্র্য। তাসের দেশ নাটকে কল্পনার উদ্ভটত্বের ছড়াছড়ি, আর এই উদ্ভটত্বের আশ্রয়ে আমাদের চিরাভ্যস্ত কতকগুলি কুসংস্কারকে বিদ্রূপের কষায় নির্মমভাবে জর্জরিত করা হয়েছে এই নাটকে। সনাতন আচার-আচরণের প্রতি মূঢ় আসক্তি যুক্তিহীন অতীতপ্রবণতা সহজ জীবন-যাত্রার আনন্দ ও স্বতস্ফূর্তির অবদমনকারী কৃত্রিম বিধি নিষেধপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য উল্লিখিত কুসংস্কারসমূহের অন্যতম।

রাজা এবং অরূপরতন নাটকের ভিতরের কথাটা হল দুর্লভ ধনকে কখনও বুদ্ধির অভিমান দিয়ে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হলে কঠিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দীর্ঘকারী দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে যখন মনের সব পুঞ্জীভূত অভিমান গ্লানি ও মিথ্যা বিনিঃশেষে দূর হয়ে যায় মাত্র তখন—এবং একমাত্র তখুনি—দুর্লভ ধ্যানের ধন তার সত্যমূর্তিতে প্রকাশমান হওয়া সম্ভব। দুঃখের মধ্য দিয়ে পাওয়াই প্রকৃত পাওয়া, মূল্য না দিলে কোন বস্তুই আত্মগত হয়ে ওঠে না।

"ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে
আরাম যত করে কোথায় দূর।"

কিম্বা

"আমার অভিমানের বদলে আজ
নেব তোমার মালা।
+ + +
সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামী
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণ-ডালা।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, রাজা বা অরূপরতন নাটকের রাজা আগাগোড়া নেপথ্যবিহারী, সাদা চোখে তাকে দেখা যায় না। প্রধান চরিত্রের এই নেপথ্য সঞ্চরণের সংস্কার রবীন্দ্রনাথের আরও কতকগুলি নাটকে অনুসৃত হয়েছে দেখতে পাই। যেমন 'ডাকঘর'

যেমন 'রক্তকরবী' যেমন 'পাপমোচন'। রক্তকরবীর নেপথ্যবিহারী রাজার প্রকৃতি অবশ্য কিঞ্চিৎ আলাদা তবে নাটকের প্রধান পুরুষকে এভাবে দৃষ্টিসীমার বাইরে যবনিকার অন্তরালবর্তী করার মানে সম্ভবতঃ এই যে, প্রকৃতিতে ও আচরণে এই নেপথ্যবিহারী পুরুষ ভগবানের স্বগোত্র। ভগবানকে চিরবাঞ্ছিত দয়িতরূপে যদি কল্পনা করা যায় এবং তার সঙ্গে একাত্ম হবার ব্যাকুলতাকে যদি মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি মনে করা যায়, সে ক্ষেত্রে এই নেপথ্যবিহারী রাজার তত্ত্ব বুঝতে কষ্ট হয় না। আসলে ডাকঘরের অমল এবং রাজা নাটকের সুদর্শনা জীবাত্মার প্রতীক, এই বিশ্ব-চরাচরের অন্তরালে যে চৈতন্যময় পরমসত্তার অধিষ্ঠান এবং যা সব-কিছুকে ধারণ করে আছে তার সঙ্গে মিলিত হবার একান্ত কামনায় জীবাত্মার অনিশ্চিত পথ-পরিক্রমা, অন্ধকারে কেবলই পথ হাতড়ে ফেরা। অমলের বেলায় জীবদেহের পার্থিব বিনাশ হল সেই মিলনের পরম লগ্ন, আর সুদর্শনার বেলায় অহং-এর পরিপূর্ণ অবলুপ্তি। অর্থাৎ দৈহিক কিম্বা মানসিক গ্লানির বিনিঃশেষ অবলুপ্তি ঘটলে তবেই শুধু 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে' বেজে ওঠা সম্ভব।

অচলায়তন নাটকে দুইটি বিপরীত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। মহাপঞ্চক সনাতন শাস্ত্রধর্ম পালনের নামে সর্বপ্রকার স্থাণুত্ব ও জড়ত্বের পরিপোষক; পক্ষান্তরে পঞ্চক গতির প্রতীক। যুক্তি ও অনুভূতির নিকটে সে সব-কিছুকে যাচাই করে দেখতে চায়, নিছক শাস্ত্রবাক্যের উপর তার কোন আস্থা নাই। নাটকটির পরিণামে প্রাচীন এবং নবীনের সমন্বয়ে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—পুরাতনের আদর্শকে বিনিঃশেষে বর্জন করা হয় নাই। জড়বাদী বিজ্ঞানের যুক্তি অনুযায়ী যেমন দুই বিপরীত শক্তির যৌগিক সমবায়ে তৃতীয় এক শক্তির উদ্ভব তেমনি অচলায়তনের মধ্যে ঐতিহ্যপ্রীতি ও প্রগতিশীলতাকে একত্র যুক্ত করে অভিনব এক জীবনদর্শনের সূচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই জীবন-দর্শন রবীন্দ্রনাথেরই জীবনদর্শন। সনাতনের প্রেমী সাধক রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র এই যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই জোর দিয়েছেন।

মুক্তধারা নাটকের রূপকটি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। আধুনিক সভ্যতার যন্ত্র এবং অতিরিক্ত যান্ত্রিকতার নিগড়ে বন্দী মানুষের প্রাণ কেবলই ছটফট করে মরছে। অভিজিৎ হ'ল সেই নিপীড়িত যন্ত্রবন্দী মানুষ। শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে সে সেই যন্ত্রের নিগড় ভাঙল। মুক্তধারার অর্থ তার নামেই স্বপ্রকাশ। মুক্ত ধারা কি না প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ। এই প্রবাহ যদি কোন কারণে অবরুদ্ধ হয়ে যায় তা হলেই জীবনের বুকে নেমে আসে যান্ত্রিকতার কঠিন অভিশাপ। সে ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার কঠিন লৌহবেষ্টনীর চাপ প্রাণকে কেবলই পিষ্ট করতে থাকে। ধনঞ্জয় বৈরাগী চেয়েছিল অহিংসা দিয়ে যন্ত্রের হিংসাকে জয় করতে এবং তাতে সে বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে। কিন্তু অহিংসা যতো বড় ধর্মই হোক, তার চাইতেও বড়ো ধর্ম পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্জন। আত্মোৎসর্জনের তুল্য ত্যাগ আর নেই। এই সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগধর্মেরই প্রতীক হল মুক্তধারার ঝরণাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া রাজপুত্র অভিজিৎ। অভিজিতের কপালে চিহ্নিত রাজ চক্রবর্তিত্বের লক্ষণ আসলে ত্যাগের জয় টিকা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারার ভিতরের কথাটিকে প্রকাশ করেছেন এই ভাবে—"পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে মার লাগিয়ে জয়ী হব। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি নিতে হবে, মুক্তি দিতে হবে। যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।"

পূর্বেই বলা হয়েছে মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী আর মুক্তধারার রচনাকালের প্রায় চোদ্দ-পনেরো বৎসর

(১৩১৬) পূর্বে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্র পরিকল্পনার দিক থেকে একই বাক্তি। প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তরিত সংস্করণ পরিত্রাণেও এই চরিত্রটি আছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী অহিংস নীতির মূর্ত প্রতীক। গান্ধীজীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির সঙ্গে ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রচারিত মতবাদের গভীর সৌসাদৃশ্য আছে। এর থেকে সুপরিচিত রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধনঞ্জয় বৈরাগী আসলে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবক্তা গান্ধীজীর আবির্ভাবের অগ্রদূত। অসহযোগ নীতি কার্যতঃ প্রযুক্ত হওয়ার অন্ততঃ বারো বৎসর আগেই রবীন্দ্রনাথ এই নীতির সারবত্তা প্রচার করেছিলেন।

এ সিদ্ধান্ত বোধ করি পুরোপুরি ঠিক নয়। মহাত্মাজী ভারতীয় রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন ১৯২০-২১ সালে, কিন্তু তার বহু তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নীতির কার্যকারিতা বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে আসছিলেন তাতে আংশিক সফলতাও লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সাফল্যের কাহিনীই কবির অজ্ঞাতসারে কবির ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রপরিকল্পনাটিকে প্রভাবিত করে থাকবে।

'ফাল্গুনী' নাটক তারুণ্যের জয়গানে মুখর।

'রক্তকরবী'র মর্মকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিক রচনায় অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে তার দু'একটি অংশ উদ্ধার করি—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

রক্তকরবীর নন্দিনী স্নিগ্ধ নারীশক্তির প্রতীক, তার অলকধৃত রক্তকরবীর গুচ্ছ হল নারী হৃদয়ের বিকশিত ভালোবাসা, রঞ্জন আনন্দের প্রতিচ্ছবি, আর যক্ষপুরীর অদৃশ্য রাজা অপরিমিত লোভের কারাগারে স্বেচ্ছাবন্দী ভয়ঙ্কর অথচ নিষ্প্রাণ শক্তির প্রতীক। এই শক্তির মূল কথা হল গায়ের জোর, তার ভিতর ভালবাসার কণাও নেই। বাইরে থেকে পশুশক্তির প্রকার যতই উদ্ভট আর চোখধাঁধানো হোক, আসলে তা শূন্যগর্ভ। এই শূন্যতার পেষণে যক্ষপুরীর রাজা সদাক্লিষ্ট। পুরুষের কর্মোদ্যমনা প্রেম এবং আনন্দবিবর্জিত হলে নিছক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়—এই তত্ত্ব যক্ষপুরীর রাজার চাইতে আর কেউ মর্মান্তিক ভাবে জানে না। তাই তো নন্দিনীকে পাবার জন্য তার, নিরন্তর আকুলি-বিকুলি, কিন্তু সেখানেও স্বতো-বিরোধের দ্বারা তার আকাঙ্ক্ষা প্রতি পদে খণ্ডিত এবং পরিণামে ব্যর্থ। এই দিক থেকে বিচার করলে রক্তকরবীকে ট্রাজিডির কোঠায় ফেলতে হয় কিন্তু ঐ ট্রাজিডির মধ্য দিয়েই নন্দিনী আর রঞ্জনের আদর্শের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।*

* নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

মণিপুর প্রসঙ্গ (১০)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

পলিটিক্যাল এজেন্সি

১৯৩৪ সনে মণিপুরে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্সী স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ও কর্তব্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৪১ এবং ১৮৪২ সনে ভারত সরকারের ঘোষণা দ্বারা এবং গর্ডন, কুলক ও জনষ্টন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কর্মচারীদের কার্যের ফলে পলিটিক্যাল এজেন্টের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ইহাদের আমলে মণিপুরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই যাহার সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন যোগাযোগ ছিলনা। ১৮৪৪ সনে গর্ডন সাহেবের মৃত্যুর পর সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব (Mr. Cullock) সেই পদে উন্নীত হন। পূর্ব অধ্যায়ে গর্ডন সাহেব এবং কুলক সাহেবের প্রথমবার কার্য সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে। কুলক সাহেব ১৮৬১ সন পর্যন্ত কৃতিত্বের সহিত কর্তব্য পালন করিয়া প্রথমবারের মত অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ভারত সরকারের সিভিল ফাইনান্স কমিশনের (Civil Finance Commission) সভাপতি স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্সী লোপ করার উপদেশ দেন। এই কথা চাপা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রজাগণ ভল্লিতল্পা গুটাইতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যে সমস্ত নাগা এবং কুকি পলিটিক্যাল এজেন্টদের আশ্বাসে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া উপত্যকাতে বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়াছিল তাহাদিগকে ধরিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হইল। ফলে ভারত সরকার টেম্পল সাহেবের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া ডাক্তার ডীলনকে (Dr. Dillon) ১৮৬২ সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠায়। কিন্তু এই পদে ডীলন সাহেব সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। অল্পদিনের

(পূর্বানুবৃত্তি)

মধ্যেই মণিপুর সরকারের সঙ্গে তাঁহার খিটিমিটি লাগিয়া গেল। পর বৎসর মহারাজা তাঁহার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নিকট কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। তদানীন্তন সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল ডীলন সাহেবের অযোগ্যতার খবর রাখিতেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন তদন্ত না করিয়াই ১৮৬৩ সনে তিন দিনের নোটিশে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর কিছুদিনের জন্য উক্ত পদ খালি থাকা অবস্থায় ১৮৬৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মণিপুরের মহারাজা ভারত সরকারের নিকট মণিপুরে পুনরায় একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের জন্য দরখাস্ত করেন। মণিপুর রাজ্যে প্রজাদের শান্তি এবং রাজার সিংহাসন নিরাপদ রাখার জন্য পলিটিক্যাল এজেন্টের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। * এবং যে কেহ দ্বারা সেই কাজ চলিবে না;—ইত্যাদি নানা দিক ভাবিয়া ভারত সরকার অবশেষে কুলক সাহেবকে পুনরায় উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। কুলক সাহেবের পুনরাগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তিনি শীঘ্রই পলিটিক্যাল এজেন্সীর মর্যাদা ফিরাইয়া আনেন। ১৮৬৭ সনে মণিপুর হইতে তাঁহার শেষ বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত

* "The past history of the country shows that.....peace, order and comparative prosperity reigned while the British Agent was present. Lastly but not least both the chief himself and his people desire to have a British Agent amongst them, they have told Capt. Stewart that the presence of one is equal to a brigade as regards the security of the country.

Political Agent, April 1864 letter No. 108

এজেন্সীর কাজকর্ম নির্বিবাদেই চলে। কুলক সাহেবের অবসর গ্রহণের পর হইতে ১৮৭১ সনে জনষ্টন সাহেবের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই ১ বৎসরের মধ্যে মণিপুরে যে সমস্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট আসিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত যোগ্যতার অভাবে মণিপুর সরকারের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৭২ সনে মণিপুর সরকার পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্ণেল টমসনের (Col, Thomson) বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ আনেন। কিন্তু তদন্তকারীদের নিকট উহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। পুনরায় ১৮৭৬ সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট ডাঃ ব্রাউনের বিরুদ্ধে আসামের চীফ কমিশনার কর্ণেল কীটিংসের নিকট অভিযোগ করা হয়। অনেক চিঠি লেখালেখির পর জেলার ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল সীয়ারকে (Col, Shere) তদন্তের জন্য পাঠান হয়। তদন্ত চলিতে থাকা কালেই ডাঃ ব্রাউনের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতে তদন্তের পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নাই। কারণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবারেও মণিপুর সরকার তাঁহাদের অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারায় ভারত সরকার পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রতি এইরূপ প্রতিকূল আচরণের যথেষ্ট নিন্দা করে। (*) পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন দুরাণ্ডের (Capt. Durand) বিবরণে দেখা যায় মণিপুর সরকার ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। মণিপুরের মত জায়গায় মহারাজার সঙ্গে মতদ্বৈধ হইলে পলিটিক্যাল এজেন্টের জীবন দুর্বিসহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মহারাজের এক ইঙ্গিতে তাঁহার রসদ এমনকি দোপা নাপিত পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যেমন পলিটিক্যাল এজেন্টের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল তেমনি মহারাজার স্বার্থের জন্য তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন ছিল। মহারাজা চেষ্টা করিতেন পলিটিক্যাল এজেন্টের সাহায্যে ভারত সরকারের নিকট হইতে নানা স্বার্থ আদায় করিতে। পলিটিক্যাল এজেন্ট তাহাতে সম্মত না হইলে তাঁহার উপর নানা ভাবে চাপ দিতে চেষ্টা করিতেন। (†)

১৮৭২।৭৩ সনে মণিপুর রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত নির্ধারণের সময় মহারাজের এই মনোভাব অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করে। কিন্তু অবশেষে ইংরেজ সরকারের দৃঢ়তায় মহারাজকে সংযত হইতে হয়। (‡)

(*) "A severe reproof was in consequence transmitted from the Govt of India to the Raja"

History of Political Agency
—B. C. Allen C. S.

†"The Political Agent is dependent on the will and pleasure of the Maharaja for everything. His very word and movement are known to the Maharaja. He is in fact a British Officer under Manipur surveillance. If the Maharaja is not pleased with the Political Agent he cannot get anything, he is ostracised, from bad coarse black atta which the Maharaja sells him as a favour, the dhobi who washes his clothes, and the Nagas who work in his garden; he cannot purchase anything at any price. The court is almost openly hostile, though they have pliancy enough to pretend to a great regard for the Political Agent and the Sirkar" (Precis of correspondence regarding Manipur affairs, by J. Clark, P, 23)

(‡) "In 1872-73, the Raja again adopted a most unseemley attitude, when steps were being taken for the demarcation of the boundary between Manipur and the Naga Hills. Every obstruction possible was offered, and the Raja even had the effrontery to expressly 'forbid' the Political Agent to enter the eastern portion of his territories. The Maharaja was sternly called to account by the Supreme Govt. and was required to submit an ample apology for his improper conduct."

History of Political Agency—B. C. Allen C. S.

কুলক সাহেবের অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকারের নিকট মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্সী একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই আদিম জাতি পরিবেষ্টিত দুর্গম রাজ্যে কোন উপযুক্ত লোক এই পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যাইতে সম্মত হন না। ইহাতে ৯ বৎসর পর্যন্ত ভারত সরকারকে নানা ঝামেলা পোহাইতে হয়। অবশেষে ১৮৭৬ সনের শেষভাগে জনষ্টন সাহেব এই পদ গ্রহণ করিতে রাজী হওয়ায় ভারত সরকারের দুশ্চিন্তা দূর হয়।* শাসন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও আদিম এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা দ্বারাই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কেওঞ্জরে (Keonjhur) থাকাকালে তিনি প্রায় দুই হাজার আদিম জাতীয় নগ্ন লোককে কাপড় পরার অভ্যাস করাইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারই স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা নয় শতের কোঠায় আসিয়া দাঁড়ায়। সেখানকার রাজার সঙ্গে প্রজাদের যে বিরোধ চলিতেছিল —তাঁহার চেষ্টায় অচিরেই তাহা নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি ফিরিয়া আসে। বস্তুতঃ ভারতের আদিম জাতি-সমূহের ইতিহাসে কোন কালে লেখা হইলে জনষ্টন সাহেবের নামও তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। ভারতে দেশীয়রাজ্যে ইংরেজ প্রতিনিধির পদেই তিনি বেশী সময় নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালীন আমলাতন্ত্রের নানা দোষত্রুটী তাঁহার চোখে পড়ে। প্রাচ্য দেশের শাসন ব্যবস্থা কোনকালেই ইউরোপীয় আমলাতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইত না। এখানে ব্যক্তির সৎ অথবা অসৎ ইচ্ছার উপর প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিত। ইহাতে সদিচ্ছাপ্রণোদিত শাসকের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু আমলাতন্ত্রের নিয়মানুসারে স্থানীয় কর্মচারীর কোন স্বাধীনতা থাকে না। তাহাকে কেন্দ্রে অবস্থিত উপর-ওয়ালার হুকুম তামিল করিতে হয়। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না থাকায় তাহাদের নির্দেশ সবসময় জনস্বার্থের উপযোগী নাও হইতে পারে। অপরপক্ষে ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে আমলাতন্ত্র বিশেষ উপযোগী হইলেও তাহাদের বিজিত সাম্রাজ্যের প্রজাগণ ইহার শুফলের চেয়ে কুফলের ভাগী হয় বেশী। বিদেশী শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় শান্তিতে সাম্রাজ্য ভোগ করা। সেইজন্য তাহারা জনমতের ভয়ে কোন প্রকার কুপ্রথা লোপের চেষ্টা অথবা সমাজসংস্কার হইতে বিরত থাকে। সতীদাহের মত নৃশংস কুপ্রথা নিবারণ করিতেও আমলাতান্ত্রিক সরকারের অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। অথচ গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে রাতারাতি হুকুম জারি করিয়া একদিনে এই সমস্ত কুপ্রথা বন্ধ করিতে পারিতেন; তখনকার দিনে তাহার আদেশ অমান্য করিতে কেহ সাহসী হইত না। (†)

জনষ্টন সাহেবের নিয়োগের পূর্বে দীর্ঘ ৯ বৎসর পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে মহারাজের কিরূপ

*"Manipur, to which Colonel Johnstone was appointed in 1877, was called by one of the Indian Secretaries the Cinderella among political agencies. 'They'll never' he said, 'get a good man to take it'. 'Well' was the reply, 'a good man has taken it now'

Introduction by the Editor of Johnstone's My experiences in Manipur and the Naga Hills.

(†) "Take, for instance the case o Suttee, or widow-burning. It was argued for years that we could not put it down without causing a rebellion. What are the facts? A Governor-General, blessed with moral courage in a great degree, determined to abolish the barbarous custom, and his edict was obeyed without a murmur,

Johnston

সম্পর্ক ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি আসিয়া নূতন পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য মণিপুর সরকারের গুপ্তচর রহিয়াছে। সব সময় এইরূপ সন্দেহভাজন হইয়া থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকর হইলেও তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। নিজের পদমর্যাদা পুরাপুরি বজায় রাখিয়া তিনি কাজকর্ম চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সরকারী বে-সরকারী যে কোন লোক তাহার সঙ্গে অবাধে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার পাইত। কোন কাজ করার পূর্বেই সর্বদা যুক্তিতর্কের দ্বারা মহারাজকে বুঝাইয়া সমতে আনয়ন করার চেষ্টা করিতেন, কখনও নিজের ইচ্ছাকে জোরে চাপাইতে যান নাই। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার সহৃদয়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া পলিটিক্যাল এজেন্ট সম্বন্ধে মণিপুর সরকারের সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়া যায়।

জনষ্টন সাহেব অত্যন্ত সহৃদয় এবং অমায়িক হইলেও নিজের পদমর্যাদা অথবা কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তৎকালীন ভারতীয় চরিত্রের দোষত্রুটী তাহার অগোচর ছিল না। তিনি ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন যে পদস্থ লোক যদি আচারে ব্যবহারে অপর সকল হইতে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে না পারেন তবে দেশী-লোক ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করে না। এই অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিতেও নানা অসুবিধা হয়। সেইজন্য তিনি নিজে কোন খেলায় যোগ দিতেন না। মহারাজা একসময় থাঙ্গাল মেজর, বলরাম সিং এবং রানা সিং মেজরকে জেনারেলের পদে উন্নীত করেন। কিন্তু জনষ্টন সাহেবের পদমর্যাদা তখন লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের (Lieutenant Colonel) উপর ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত মণিপুরী কর্মচারীদের উদ্দেশ্য যে তাঁহাকে তাহাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা ইহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্য দৃঢ়তার সহিত নিজের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য তাহাদের এই পদোন্নয়ন উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সঙ্গে আগের মতই ব্যবহার চালাইয়া গেলেন। অপর পক্ষে জনষ্টন সাহেবের স্বীকৃতি লাভ না করায় তাহাদের এই নূতন পদবী বিশেষ জনপ্রিয় হইল না। গাঁয়ে না মানিলে যেমন আপনি মোড়ল সাজিয়া বেশীদিন থাকা চলে না, তেমনি একবার মোড়ল সাজিলে মোড়লি ছাড়িতেও আত্মসম্মানে বাধে, জেনারেলগণ তখন অগত্যা সুর নরম করিয়া জনষ্টন সাহেবকেই ধরিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামের চীফ কমিশনারের নিকটও লেখালেখি আরম্ভ করিলেন। মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট প্রত্যক্ষভাবে আসামের চীফ কমিশনারের অধীনে না হইলেও এতদঞ্চলে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সমস্ত নির্দেশ চীফ কমিশনারের মারফতই যাইত। সেইজন্য মণিপুরের ব্যাপারে তাহার অনেক হাত ছিল। পলিটিক্যাল এজেন্টগণও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতেন। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে জনষ্টন সাহেব চীফ কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলিকে (Sir Steuart Bayley) নিজের অভিমত জানানোর ফলে তিনি এ সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। জনষ্টন সাহেব অবশ্য একটি সর্তে তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে যদি তাহারা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া দেখাইতে পারেন তখন তিনিই অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে জেনারেল হিসাবে সম্বোধন করিয়া সম্মানিত করিবেন। এদিকে জনষ্টন সাহেব মণিপুরে আসিয়াও ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এদেশের লোকের মনোভাব সর্বজনবিদিত। নানারকম প্রতিবন্ধকতায় গোড়ার দিকে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়া এরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তবু তিনি হাল ছাড়িলেন না। অবশেষে উপরোক্ত

বিষয় সম্পর্কে থাঙ্গাল, বলরাম সিং এবং রমা সিং যখন তাহার নিকট হাঁটাহাটি করিতেছিলেন তখন তিনি পুনরায় রাজ দরবারে ইংরেজী বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাবটি উথাপন করেন। বলাবাহুল্য অন্যান্য বারের মত এবারেও ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উঠিল। তিনিও ছাড়িবার পাত্র নন। থাঙ্গাল, বলরাম সিং, রমা সিং সকলেই তখন মন্ত্রী ছিলেন. তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, যদি তাঁহারা ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে মহারাজের সম্মতি আদায় করিতে পারেন তবে তিনি তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহাদিগকে জেনারেল বলিয়া সম্বোধন করিবেন। দুই এক দিনের মধ্যেই মহারাজের সম্মতি পাওয়া গেল। এইরূপে জনষ্টন সাহেবের চেষ্টায় ১৮৮৫ সনে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় (Middle English School) স্থাপনের ফলে মণিপুরে আধুনিক শিক্ষার বীজ রোপিত হইল।

মানব সমাজে যে সমস্ত পরিবর্তন আগে হইতে ভাবা যায় না. কেবলমাত্র রাজশাসনের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না. অথবা শাসনযন্ত্র যাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না—সেই অসম্ভব যুগান্তকারী শক্তি নিহিত থাকে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটী সত্ত্বেও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি রাজনৈতিক জীবনে আমাদিগকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিকতার পথে পরিচালিত করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্বন্ধেও সচেতন হইতেছি। ইউরোপীয় সমাজচেতনা আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনকেও প্রভাবিত করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের অন্তরের বদ্ধমূল কুসংস্কার-গুলির গোড়ায় আঘাত করিয়া আমাদিগকে মুক্তিবাদী করিয়া তুলিতেছে। কূপমণ্ডূকতা দূর হইয়া মনের মধ্যে মুক্তির দরজা খুলিয়া যাইতেছে। পুরুষকারের আঘাতে অদৃষ্টবাদের কারাপ্রাচীরে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরায় আমাদের সুপ্ত কর্মশক্তি জাগ্রত হইয়া পুনরায় নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত আন্দোলন ও পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কোনটাই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবমুক্ত নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর মণিপুর বাংলা ভাষার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বাঙ্গালীমনীষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা স্থাপনের পর স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। অবশ্য তখন এ সমস্ত পরিবর্তনের কথা কেহ ভাবে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মণিপুরের রাজতন্ত্র আজ অচল। স্বায়ত্বশাসন লাভের দাবী ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। খোঁড়া বৈষ্ণবের ছেলে পরম উৎসাহে জীবনেতে অস্ত্র সঞ্চার করিয়া প্রাণি-বিদ্যার চর্চা করিতেছে।

জনষ্টন সাহেবের আমলে মণিপুরে ব্রিটিশ-প্রজাদের বিচারের অধিকার সম্পর্কে একটি মূলনীতিগত প্রশ্ন ওঠে। মহারাজা স্বয়ং সেই অধিকার দাবী করেন। জনষ্টন সাহেবের ইহাতে আপত্তি ছিল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের নজির দেখাইয়া ব্রিটিশ প্রজাদের বিচারের অধিকার নিজেই গ্রহণ করেন। জনষ্টন সাহেবের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিপত্তি অপরিহার্য হইলেও মণিপুরের মন্ত্রী এবং উচ্চতম রাজপুরুষগণ ইহাতে সুস্থি বোধ করিতেন না। প্রায় সময়ই তাঁহারা পরোক্ষে পলিটিক্যাল এজেন্টের সম্বন্ধে নানা অবজ্ঞাসূচক উক্তির সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির

•"Judging by the decision of the High Court of Calcutta that all the descendants of European British subjects were European British subject. I insisted on all descendants of British subjects being considered as such, and subject to my jurisdiction" Johnstone

করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করিতেন। জনষ্টন সাহেব ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া চলিতেন।

জনষ্টন সাহেবের বিদায়ের পর পলিটিক্যাল এজেন্ট পদের জন্য পুনরায় সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগ মণিপুর সরকারের প্রকৃতি এবং মণিপুরের সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক তথ্য অবগত থাকিলেও পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উক্ত পদে নিয়োগের জন্য কর্মচারীদের নিকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুযোগ্য কর্মচারীগণ ও মণিপুরে আসিতে নারাজ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পদটি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তাঁহাদিগকে বেশী দিন সেখানে রাখা হইত না। জনষ্টন সাহেবের পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর ট্রটার (Major Trotter) সুযোগ্য ব্যক্তি হইলেও ৮ সপ্তাহের মধ্যেই এক দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৮ সনে শ্রীহট্টের একজন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ নূতন কর্মচারী (Junior Officer) মিষ্টার গ্রীমউডকে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত করিয়া মণিপুরে পাঠান হয়। অল্পদিন হয় তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন; সুতরাং মণিপুরের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা থাকার কথা নয়। কিন্তু এইরূপ আশাতিরিক্ত পদোন্নতির লোভে তিনি সানন্দে এই পদ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মণিপুরে আসিয়া

মাস থাকার পর যখন মণিপুরী সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার মোটামুটি ধারণা হইল তখনই তাঁহাকে শিলংএ বদলি করা হয়। তখন অনেক প্রবীণ (Senior) কর্মচারী ছুটির শেষে ফিরিয়া আসিয়া নিয়োগের অপেক্ষায় ছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত স্থলাভাবে তাঁহাদিগকে কাজ দেওয়া দুষ্কর হয়। মিষ্টার হীথ (Mr. Heath) মিষ্টার গ্রীমউডের (Mr. Grimwood) চেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন—সুতরাং গ্রীমউডকে বদলি করিয়া মিষ্টার হীথকে পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ দেওয়া হয়। মিষ্টার হীথ তখন অসুস্থ ছিলেন এবং মণিপুরে আসাও তাঁহার মনঃপুত ছিল না;—কিন্তু অন্যত্র তাহার উপযুক্ত কোন পদ খালি না থাকায় অগত্যা তাহাকে মণিপুরেই আসিতে হইল। ভারত সরকার যে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্টের নিয়োগ এবং বদলি সম্বন্ধে মণিপুরের দিকে দৃষ্টি না দিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অধিকতর সচেষ্ট ছিল তাহা উপরোক্ত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মণিপুরের রেসিডেন্সীতে (Residency) নিঃসঙ্গ অবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই মিষ্টার হীথের মৃত্যু হয়। তখন মিষ্টার গ্রীমউড ১৮৮৯ সনের অক্টোবর মাসে পুনরায় পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ গ্রহণ করিয়া মণিপুরে আসেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের এইরূপ অবিবেচকতার ফল ফলিতে বেশী দেরী হইল না। অনুপযুক্ত লোকের উপর দায়িত্ব অর্পণ এবং ঘন ঘন নিয়োগ বদলীর ফলে মণিপুরের রাজপরিবারে পুনরায় গৃহবিবাদ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে মুকুলিত ও পল্লবিত হওয়ার অবকাশ পায়। ১৮৯১ সনের 'মণিপুর যুদ্ধ' (Manipur War) ইহারই শোচনীয় পরিণতি। পররাষ্ট্র বিভাগ গোড়া হইতেই সাবধান হইলে এইরূপ ঘটনা ঘটিবার কোন সুযোগই হইত না।

রেসিডেন্সী (Residency):

জনষ্টন সাহেবের আগমনের সময় পর্যন্ত পলিটিক্যাল এজেন্টগণ রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী একটি ভাড়া করা কাঁচা বাড়ীতে বাস করিতেন। বাড়ীটি নানা দিক দিয়া পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। ইহার প্রাঙ্গণে আম্রকানন এবং অন্যান্য বৃক্ষ থাকিলেও চারিদিকে ডোবা এবং নোংরা বস্তি মিলিয়া একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। জনষ্টন সাহেবের পূর্ববর্তী একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট রাজপ্রাসাদ হইতে দেড় মাইল দূর চীংমাইরংএর (Chingmairoong) নিকট

ভারত সরকারের নিজস্ব রেসিডেন্সী
কল্পনা করিয়া সরকার হইতে অর্থ
বাহের অনুমোদন লাভ করেন। কিন্তু মণিপুরের
মহারাজা পলিটিক্যাল এজেন্টের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল
থাকায় • রাজপ্রাসাদ হইতে এত দূরে 'রেসিডেন্সী'
নির্মাণের প্রস্তাবে রাজপরিবারে আপত্তি উঠিল। জনষ্টন
সাহেব আসামরণ পুনরায় তিনি উক্ত প্রস্তাব
করেন। কিন্তু মহারাজা এবারেও এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ
করিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন।

রেসিডেন্সী প্রয়োজনমত
করিতে নিকটস্থ বস্তীগুলি
সরাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় জনষ্টন সাহেব পুরাতন
স্থানেই নূতন পাকা রেসিডেন্সী নির্মাণের কাজ আরম্ভ
করেন। পলিটিক্যাল এজেন্সীর হেডক্লার্ক বাবু রমণীলাল
কুণ্ডুর (ভ্রাতা রসিকলাল কুণ্ডু) তত্ত্বাবধানে আধুনিক
ধরণের এক বৃহৎ রেসিডেন্সী তৈরী করা হয়। নূতন
ভবনের সম্মুখস্থ পুরাতন জলাশয়টি সংস্কার করাইয়া
তাহার মধ্যস্থ দ্বীপে, এবং উদ্যানে ও রাস্তার দুই পার্শ্বে
ঝাউ, দেবদারু এবং অন্যান্য নানা জাতীয় বিদেশী গাছ
রোপণ করা হয়। রসিকলাল কুণ্ডু তৎকালে পলিটিক্যাল
এজেন্সীর একজন সুযোগ্য বাঙালী কর্মচারী ছিলেন।
তাঁহার মণিপুরী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বাসভবনে বর্তমানে
সন্ধিশালী মণিপুরী
রেসিডেন্সী গৃহ নির্মাণ একটি অতি সামান্য ঘটনা হইলেও
এই উপলক্ষে মহারাজের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া
যায় তাহাতে উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব একেবারে
অস্বীকার করা যায় না।

• "……in Manipur, representative of the Government of India regarded by the Maharaja as a powerful prop and support in case of his throne being attacked, as constantly the case in former years". Johnstone

"He said 'where you are now, I can call to you, but if you go to a distance, I shall be cut off entirely". Johnstone.

তাপমান

প্রশান্ত কুমার রায়

শেষ অতিথিকে ট্রামে রাস্তায় তুলে দিয়ে এসে তপতীকে খোঁজ করলুম; এ-ঘরে ও-ঘরে সে-ঘরে—কোথাও তাকে পেলুম না। দোতলায় বাবার ঘরে লোক পাঠালুম, সেখানে নেই, রান্নাঘরে খোঁজা হ'ল, সেখানে নেই; ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ। কোথায় যেতে পারে? আজ সবকিছু যখন বড় উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে তখন এই একটা উৎসবের মধ্যেও নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে তপতী। সমস্ত দিনে একবারও আজ তার দেখা পেলুম না—না সকালে, না দুপুরে, না এই রাত্রির প্রথম প্রহরে। অবশেষে পাশের বাড়ীর ওরা এসে বললে, তপতী ঘুমিয়ে আছে ও-বাসায়, ওরাই পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি বললুম, 'কাজ-কর্মের বাড়ীতে তুমি নির্জন বাস করছ, এটা ভাল দেখায় না, তপতী, কি হয়েছে তোমার বলতো?'

তপতী বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললে, 'কিছু জিজ্ঞেস করোনা, আজ আমাকে চুপ করে থাকতে দাও।'

'কিন্তু সবাই কি ভাববে জান?'

'যা খুশী ভাবুক। তুমি তো জানো, এই উৎসব, এই কোলাহল আজ আমার বাজ বলেই মনে হয়।'

আমি আর কিছু বললাম না। সমস্তদিন ঘুড়ির মত কেবল পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে বেড়িয়েছি। এখন বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। দোতলায় বাবার ঘরে মিঠুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দের কোয়ারা উপচে পড়ছে যেন। সেখানে হৈ-হল্লা চলছে, হাসির গমকে গমকে রাত্রির নৈস্তব্ধ্য খান খান হয়ে যাচ্ছে। উপহারের কত উপকরণ। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, চেনা-জানা দলে দলে কত এসেছে, উৎসবে মেতেছে, উপঢৌকনের স্তূপে আমার ঘর ভরে উঠল। আজ মিঠুর অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। অতিথিদের কত টাঙ্গী, সেলির সাইকেল, ঘুড়ি লাটাই, ঘুতোর মশ, মশ, আওয়াজ বাইরের বাঁধানো চত্বর ভরে রেখেছিল। এখন সব স্তব্ধ হয়ে এসেছে। দারোয়ান ঝনাৎ করে লোহার গেট বন্ধ করে দিয়ে এইমাত্র পকেটে ছিপি গানের কলি ভাজতে ভাজতে তালা বন্ধ করে হয়ত শুতে গেল।

ঘুনন্ত মিঠুকে নিয়ে মা আমার ঘরে এসে বিছানায় ওকে শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বৌমা, অনেক রাত হল। যাও ছুটো মুখে দিয়ে এস।'

'না মা, কিছু খাবনা। শরীরটা ভাল নেই।'

'পাগলামি কোরোনা, বৌ; আজ উপোস থাকতে নেই, ছেলের অমঙ্গল হয়। যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে এসো। বন্টু বরং ছেলের কাছে থাকুক।' বলে মা বেরিয়ে গেলেন।

তপতীকে একরকম ঠেলে খেতে পাঠালুম। তারপর একমনে বসে বসে মুহূর্ত গুণছি। ভাবছি কতশত মুহূর্তেরা মিলে একটি পুরো উজ্জ্বল দিনের সৃষ্টি করতে পারে। আর ব্যর্থ দিনের স্মৃতি সেকি উজ্জ্বল দিনেও বেঁচে থাকে? যদি থাকে তবে এ উজ্জ্বল দিনও বুঝি ব্যর্থ। তবে কি জীবনে উজ্জ্বলতার কোন মানে নেই? হয়ত আছে। কিন্তু তপতীর জীবনে অতীতের স্মৃতিই সব, কোন দিবসের উজ্জ্বলতায় তা বিস্মৃতিতে লীন হতে পারেনা। মিঠুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বড় সুন্দর করে ওকে আজ সাজানো হয়েছে। চন্দনের গন্ধ আর ফুলের সুবাস ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা পরিচ্ছন্ন কোমলতায় ওকে বড় মধুর করে তুলেছে। দু'হাতে কোলে তুলে নিতেই চমকে উঠলুম। বুকি ওর গায়ের তাপ স্বাভাবিক নয়। বছর খানেক আগেকার কেনা থার্মোমিটারটা খুঁজে খুঁজে পেলাম না কোথাও। হয়ত সেটা তপতীর সুটকেসে আছে কিন্তু সে বাক্সে কাউকে হাত দিতে দেয়না তপতী। কেন যে তা আমিও জানি এবং জানি বলেই পারতপক্ষে তাতে হাত দিইনা।

কখনো কখনো দেখেছি ঐ বাক্সটা খুলে তার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে তপতী ; কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

'কি খুঁজছ ?' তপতী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল।

'একটা থার্মোমিটার ছিলনা ? এই যে হাঁ, পেয়ে গেছি, বলে কেসটি খুলে থার্মোমিটারটি হাতে নিতেই চমকে উঠলুম। একি ! প্রায় ৬'ডিগ্রীর কাছাকাছি পারা উঠে আছে ! জিজ্ঞেস করলুম, 'কে ব্যবহার করেছিল এর আগে ?'

'কেউনা' বলে তপতী কাছে সরে এল। বলল, 'রেখে দাও ওটা, রেখে দাও। আজ ওটা কেন বার করতে গেলে ?'

মুহূর্ত বিলম্ব না করে শয্যার প্রান্তে এসে মিঠুর গায়ে হাত রাখল তপতী। সুটকেস বন্ধ করে বিছানায় উঠে এলুম। কয়েকটা মিনিট চুপচাপ। তারপর ঘরটা অন্ধকার করে নরম বাতিটা জেলে দিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে ঢেলে দিলুম। ঘরে বাইরে একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা নেমে আসে। দূর থেকে মাঝে মাঝে ট্রাম লাইনের রাস্তা মেরামতের টুংটাং শব্দ কানে ভেসে আসছে। কত কথাই মনে জাগে ! কি ছিলাম, কি হয়েছিলাম, কি হয়েছি আর কি হতে চলেছি, হতে পারি—এই সব ভেবে ভেবে কেবলি মনের পাড় চিন্তার তরঙ্গবিক্ষেপে ভেঙে ভেঙে চলেছি। হঠাৎ তপতীর দীর্ঘনিশ্বাস কানে বাজল। তবে তপতীও ঘুমোয়নি ! সে কি ভাবছে এতক্ষণ ? কে কার ভাবনা রোধ করতে পারে ? ভাবনার রাজ্যে মানুষ বলগাবিহীন।...মিঠুর সত্যি জ্বর হয়নি তো ? তপতীর গায়ের উপর দিয়ে মিঠুর শরীর স্পর্শ করলুম। না, তেমনি আছে, বাড়েনি। তপতী নড়ে উঠল। বললে, 'তুমিও ঘুমোওনি ?'

'কি করে ঘুমোই বল'—

তপতী কথা বলল না। বললুম, 'মিঠুকে আমার বুকের উপর তুলে দাও। একবার থার্মোমিটার দিয়ে ওর তাপটা দেখলে হতোনা ?'

'না না, মিঠুর কিছু হয়নি। ওটা ব্যবহার কোরোনা।'

'কিন্তু বললে না তো, কে এর আগে থার্মোমিটার ব্যবহার করেছিল'—

'দীপু'—

'দীপু'!

'দীপুর ঐ শেষ তাপ' বলে একবার ডুকরে কেঁদে উঠল তপতী। তারপরে আমার বুক থেকে মিঠুকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বুকের তলায় যন্ত্রের ধনের মত চেপে রইল ; দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে পক্ষীশাবককে যেন সযত্নে দিয়ে আগলে রইল পক্ষী-মাতা।

বিয়ের আগে তপতীকে পিসিমার বাড়ী ভবানীপুরে প্রথম যেদিন দেখেছিলুম, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু স্মৃতি একে একে সব মনে জাগল।

•

আমার বয়সী পিসিমার বড় ছেলে অসীম প্রথম যখন তপতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তখন থেকেই তপতীর মধ্যে ডুবে রইলুম কিন্তু আজও তার হৃদয়ের গভীরতা পরিমাপ করতে পারিনি। একথা স্বীকার করতে আজ বাধা নেই, প্রথম প্রণয়ের উদ্দামতায় একদিন পথভ্রান্ত হতে চলেছিলুম, তপতী সেই নরকের পথ থেকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে মঙ্গলের পথে। স্বাভাবিক পথে। হয়ত তাকেও আমি আমার কামনার কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত করতুম কিন্তু চেয়ে দেখি সে পঙ্কজ হয়ে সুস্থ হৃদয়ের শতদল মেলেছে আগেই।

আমি তখন সবে বি-এ পাশ করে যৌবন-তেজে জ্বলছি। বাবা চেয়েছিলেন, তাঁর বংশের ঐতিহ্য আমি যেন বজায় রাখি। অর্থাৎ ওকালতি পাশ করে তাঁর জমিদারী দেখাশুনা করব, মানী পিতার মানী পুত্র হব এইরকম একটা ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছেন। বাবা বলেন, তাঁর জমিদারীর মামলা মোকর্দ্দমায় যে পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর উকিল মোক্তারদের দিতে হয় তাতে তিন থেকে চারটে পরিবার গায়ে ফুঁ দিয়ে অনায়াসে বড়লোকী করতে পারে ; অতএব আমাকে রাশভারী পিতার আদেশ মান্য করে ওকালতী পড়তে হবে। বাবার ঐ এক কথা।

একটু ভড়ভড় হবার জো নেই। আমারও এক ভাবনা—তপতীকে সঙ্গে চলনা করা যায় না। জানি গোরহীন তপতীকে হয়ে সাংঘাতিক এবং সে আমাও সহজভাবে অসম্ভব সে যদি না আসে, আমার স্থান হবেনা। অতএব চাকরী বিনে গত্যন্তর ছিলনা। চেষ্টা করে একটা চাকরী যোগাড় করে নিলুম। তারপর একদিন তপতীকে ভরসা দিয়ে রাতে মাকে এসে সোজাসুজি বললুম, 'তপতীকে তো তুমি জান, মা?'

'সে তো বেশ মেয়ে। কেন, তার কি হয়েছে?'

'আমি ভাবছি'—

বাধা দিলেন: হ্যাঁ আমি জানি। অসীম প্রস্তাব প্রথমেই। কিন্তু ওর সঙ্গে তো তোর বিয়ে

কেন চলতে পারেনা, না?'

'চলতে পারেনা, এইটুকুই জেনে রাখ। আর, ও বাড়ীতে যাতায়াত না থাকাই ভাল।'

'এখন আর সেকথা হতে পারেনা মা। ওদের কথা দিয়ে এসেছি; তাছাড়া বিয়ে না করে উপায় নেই।' বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলুম। মনে হল এই-মাত্র আমার জীবনের এক পরম অধ্যায়ের সূচনা হল। বাবার চোখ মনে পড়ল। হ্যাঁ তাঁর ইচ্ছাও পূরণ করবার চেষ্টা করব—ওকালতী পড়ব। কিন্তু যে ব্যক্তি পড়বে তারও তো মন বলে একটা পদার্থ আছে; সেও তো মনেরি অধীন। যে সংকল্প আজ আমি গ্রহণ করেছি তাতে যদি বিন্দুমাত্র অন্যায়ের কিছু স্পর্শ থাকতো মনে কি ভয়ে একটা ঝড় উঠতোনা! কিন্তু মনটা এই মুহূর্তে এত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কালো ঘন মেঘের কোন ছায়া মনে উঁকি মারছেনা তো। নির্মেঘ আকাশের মত মনটা কোন মায়ামন্ত্রবলে যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

তারপর বাড়ীতে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড! না কোথা থেকে এক পাত্রী জোগাড় করে এনে আমার প্রবৃত্তির মুখে ছাই চাপা দিতে চাইছেন। হায়রে, তপতীকে কি 'শুধু প্রবৃত্তির আগুনে জ্বালাতে চেয়েছি! কিন্তু বাবার সেই এক কথা! বাড়ীতে যখন এমনি ঝড় বইছে, তখনও আমার মন হাল্কা অনুভব করছি। আর আমার বিশ্বাস, বাবা-মার এ-ভাব দুদিনেই স্থির হয়ে আসবে—মত পাল্টাবেই অন্ততঃ যখন দেখবেন ওকালতীর সিঁড়িগুলি অতিক্রম করতে তপতী বাধা হয়ে নেই বরং সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশেষে একদিন লোকালয়ের বাইরে তপতীর গলায় পরিয়ে দিলুম চিরমিলনের মালা। সেদিন কোন বাজনা বাজেনি, কোন মঙ্গলশঙ্খধ্বনিও হয়নি, কোন আশীর্বাদের উপঢৌকন স্তূপীকৃত হয়ে ওঠেনি; কেবল দুইটি হৃদয়ে মিলনের গান গুঞ্জরিত হয়ে উঠল, কেবল অনন্ত প্রেমের আশীর্বাদ দেহ মনকে রাঙিয়ে দিল। অসীমের স্নেহস্পর্শ দুইখানি হাতকে বড় মধুর করে জড়িয়ে দিয়ে দুটি প্রাণকে মিলিয়ে দিল।

তপতীর সাধ ছিল, আমার সঙ্গে আমার মা-বাবাকেও পাবে। ও ছিল পিতৃ-মাতৃহীন আত্মীয়ের গৃহে পালিতা অন্ন-দুঃখী। কিন্তু বাড়ীর ঝড় তখন দুর্বার হয়ে উঠেছে। সংসার আমাদের গ্রহণ করলনা। তপতীকে নিয়ে উঠে এলুম এক বস্তী-প্রায় এলাকায়। সে পথ অসীম ছাড়া আর কারুর জানা ছিলনা। তপতী নীড় তৈরীর কাজে লেগে গেল। একদিন বললে, 'তোমাকে একটা কথা বলি, যে শিশু আসছে দেখো সে যেন দুঃখ না পায়' বলে একটু থেমে গিয়ে ফের বললে, 'তোমার বাবার সংসারে আমার কোনদিন স্থান হবেনা সে জানতুম। আমার জন্যে কষ্ট নেই; তোমাকে পেয়েছি এ আমার স্বর্গ-সুখের চাইতেও বড়, কিন্তু তুমি আর ও-সংসারে ফিরে যেতে পারবে না আমারই জন্যে, সে দুঃখ ভুলতে পারছিনা। তোমার বাবা-মাকে আমি কষ্ট দিলুম।'

'ওসব কথা ভুলে যাও, তপতী। যা হয়ে গেছে তা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতোনা। তুমি না থাকলে অনেক আগেই সংসার ছাড়তে হতো।'

'তা হোক, তবু আমি একটা শান্তির সংসার নষ্ট করলুম'—

'আরেকটা সংসার গড়েছ, সেও শান্তির।'

'তবু আমার একটা কথা রাখো—তুমি আইন কলেজে রাত্রে ভর্তি হয়ে যাও।'

'আবার আইন কেন?'

'তোমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল'—

অতএব দিনে সওদাগরী আপিসে চাকরী করে যে সামান্য বেতন পেতুম প্রতিমাসে তার একাংশ জমা দিতে হল আইন কলেজের ক্যাশে। দিনের পর দিন—অফিস কলেজ, তপতী। 'আসবে আসবে করে যে এতদিন আসেনি একদিন সে এল তপতীর কোল জুড়ে। দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি ও টানাটানির মধ্যেও দেবতার এই আশীর্বাদ দেহে মনে শান্তির বাতাস বয়ে আনে। মাসের পর মাস যায়। প্রতিদিন রাত্রে বাসায় ফেরার পরে তপতী এসে ঘুমন্ত ছেলেকে আমার কোলে তুলে দিয়ে পাশে বসে পাখার বাতাস করে। দিন যতই যায়, বাবা-মার কথা বেশী করে মনে পড়ে। তাঁরা কি আমার কথা ভাবেন? আমার দৈন্যের কথা, আমার তপতীর কথা, আমার সন্তানের কথা, কিছু কি জানেন তাঁরা? জানতে চান কি? ছেলের মুখ দেখে আমার হৃদয় যেমন জুড়ায় আমাকে যখন প্রথম তাঁরা পেয়েছিলেন এমনি করে কি তখন তাঁদেরও ভাল লাগত? নিশ্চয়ই লাগত। তবে, তবে বড় হলে কি মায়া ঘুচে যায়? না-না, স্নেহের কমতি নেই। কেন তবে ও-বাড়ীতে আমার স্থান হলনা? তপতীর জন্যে? না-না তপতী আমাকে বাঁচিয়েছে, আমার সন্তান সৃষ্টি করেছে; তপতী না থাকলে আমার ভবিষ্যৎ—না থাক, সেকথা ভেবে কি লাভ। তপতী এক সময় বললে, 'দেখো দীপু কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, না?'

'ছোট বেলায় অমনি হয়—একবার শুকোয় আবার ভাল হয়। ও জন্যে ভেবোনা।' বললুম বটে কিন্তু আমি তো জানি শিশুর পক্ষে যে সব খাদ্যপ্রাণের দরকার তার কিছুই আমি দিতে পারছিনা। অথচ দীপু যে বংশের সন্তান—থাক, সেকথা তুলে লাভ কি! কত কি চিন্তা মনে আসে. কিন্তু তপতী ভরসা দেয়, আশার বাণী শোনায়। বলে, আমরা জগতের কাছে কোন অন্যায়ই করিনি। আমাদের এ দিন থাকবেনা। সুদিন আসবেই তখন তোমার মনের মত দীপুকে সাজাবে। এত অভাব অনটনের কথা কেবল ভাবছ কেন, বলতো? একবার আশপাশের চারিদিকে তাকিয়ে দেখনা, লোক কত কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে। তাদের চেয়ে আমরা অনেক ভাল আছি। দেখ, দীপু কেমন বসতে শিখেছে।' বলে দীপুর দিকে আমার মনকে ঠেলে দেয়।

সাত আট মাস দীপুর বয়স হতে চলল। তপতী বলে, 'শুভ-দিন দেখে ওর মুখে ভাত দিতে হবে।'

বললুম, 'তাতে খরচ আছে।'

'তা থাক। তুমি ভেবোনা; আমার কাছে কিছু আছে।'

তপতী সঞ্চয়ী। এক দুই করে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছে সে দীপুর অন্নপ্রাশনের জন্যে। একদিন বৈ তো নয়। অন্নপ্রাশনের আয়োজন করছিলুম। এক সময় তপতী কাছে এসে বললে, 'আমার ভারী ইচ্ছে, তোমার বাবা-মাকে একবার আসতে লেখো।'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কি বলছ, তপতী!'

'না-না আপত্তি করোনা। অসীমদাকে দিয়ে তাঁদের কাছে একবার চিঠি লেখো। হয়তো তাঁরা আসবেন না, তবু এই শুভ দিনে অন্ততঃ তাঁদের আশীর্বাদ দরকার। দীপু তো তাঁদের কাছে কোন অপরাধ করেনি।'

হাসি পেল তপতীর কথা শুনে। ও জানেনা, দীপু যে তাঁদের কাছে জন্ম-অপরাধী। ওযে—থাক. কি হবে স্মৃতি মন্থন করে! অসীমকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম। দুদিন বাদে বাবাকে লুকিয়ে মা দীপুকে আশীর্বাদচিহ্নস্বরূপ তাঁর গলার হার পাঠিয়ে দিয়েছেন অসীমের সঙ্গে। অসীমকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মা চিঠি দিয়েছেন কি?' ও বললে, না। দীপুর কথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ চোখের জল ফেললেন। চলে আসবার সময় চুপি চুপি বললেন, 'আমাকে একদিন

নাতির চাঁদমুখ দেখিয়ে এনো, অসীম। বন্ধুর বাবা যেন শুনতে না পান।'

তপতী সোৎসাহে বললে, 'দীপুকে না দেখতে চেয়েছেন! আমার এত ভাগ্য! অসীমদা তুমি মাকে নিশ্চয়ই একদিন নিয়ে এসো। কবে, কবে আনবে, অসীমদা?'

'আনবো সময় করে' বলে অসীম দীপুকে কোলে নিয়ে চুমো

অন্নপ্রাশনের দিনটা সাধারণ ভাবে কেটে গেল। নাটির প্রদীপ সারারাত আলো জ্বলল। বস্তীবাসীদের ভোজ উৎসব করতে এসেছিল বিশেষ করে মেয়েদের দু'চারজন। আয়োজন দেখে তারা বোধ হয় অবাক হল। বাঙালীর ঘরে প্রথম সন্তানের এমন ঢালা অন্নপ্রাশন! সন্ধ্যা রাতে সেদিন খুব বৃষ্টি হল। আকাশখানা ভেঙে পড়ল আমাদের ঘরের চালে। বাঁশের বেড়া আর খড়ের সস্তা ছাউনি আকাশের অফুরন্ত জল-ঢালাকে বাগ মানাতে পারল না। বেড়ার গায় বাতাসের দৌ-দৌ শন্-শন্ আওয়াজ বেজেই চলল। উঠে দেখি আমাদের বিছানা-পত্তর জলে একদম ভিজে গেছে। দীপুকে তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে বসল তপতী। সারারাত বসে বসে ভোরের ধ্যান করতে লাগলুম। ভোর হল। এদিকে ভিজে ভিজে দীপুর জ্বর এল। এমন জ্বর আর দেখিনি। একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। জ্বর যখন কিছুতেই ছাড়েনা তখন তপতী ডাক্তার ডাকতে বলল। কিন্তু ডাক্তারের খরচ যোগাবার সম্বলটুকু অন্নপ্রাশনে পুরোপুরি খরচ হয়ে গেছে। বললুম, এ আর এমন কি, ও ছেড়ে যাবে।' থার্মোমিটার লাগালুম; তিন ডিগ্রীর বাধায়। এক একবার হাত তুলে তুলে শব্দ করবার চেষ্টা করছে দীপু, পরক্ষণেই একেবারে চুপ হয়ে যায়। সেই হাসি হাসি দুষ্টুমিভরা চোখ একদিনেই বড় করুণ হয়ে গেছে। কান্নাও নেই। এমনি করে দুটো দিন কেটে গেল। অসীম টাকার ব্যবস্থা করে ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার ভরসা দিয়ে গেলেন। পরদিন অফিসে যান, এমন সময় তপতী চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে দেখি তপতীর হাতে খোলা থার্মোমিটার। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'ডাক্তার ডাকো, এতো জ্বর!'

দেখলুম জ্বর ছয় ডিগ্রী অবধি উঠেছে। অসীম কদিন থেকেই আমাদের কাছে কাছে আছে। ওকে ডেকে বললুম, 'ব্যবস্থা কর।'

অসীম ডাক্তার নিয়ে এল। যথারীতি ইন্‌জেকসান দেবার পরে ডাক্তারকে রাস্তায় এগিয়ে দিতে গিয়ে ফিরে আসতে বড় বিলম্ব করছে অসীম। দীপুর শিয়রের কাছে বসে রইলুম। ঘন্টাখানেক বাদেই ঘর্-ঘর্ করে এক সময় দীপুর বুকে শব্দ উঠল। একটু নড়ে উঠল, আবার শব্দ—বুক থেকে গলায়। তপতী ও আমি দু'জনেই ঝুঁকে পড়লুম দীপুর মুখের উপর। একবার মাত্র চোখ খুলে আবার চোখ বন্ধ করল দীপু। সেই শেষ! আর চোখ খুলল না।

আমার এখন ধৈর্য হারালে চলবেনা। উঠে দরজার কাছে এসে দেখি অসীম মাকে নিয়ে হাজির! আমার মা! সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ নিমেষে ছিন্ন হয়ে গেল। আর উঠে বসতে পারলুম না।

সব শেষ হয়ে গেলে বিকেল বেলায় একরকম জোর করেই অসীমকে দিয়ে মাকে বাসায় পাঠিয়ে দিলুম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই স্বয়ং বাবার একখানি চিঠি পেলুম। তার মর্ম হচ্ছে এই যে আমি ইচ্ছে করলে তাঁর বাসায় গিয়ে থাকতে পারি। মা প্রায় শয্যাশায়ী। তপতীকে চিঠি দেখালুম। ও কোন কথা বললে না। শুধু কাঁদলে খানিকক্ষণ ধরে। ভাবলুম, আমার ঘরের দীপ তো নিভে গেছে, কি দরকার আর বিজয়া উৎসবের। দীপুকে ঘিরে কত স্মৃতিই না আজ মনকে ভরাক্রান্ত করে তুলেছে। সেই কচি মুখের চিকন হাসি, মুঠো হাতের স্বচ্ছন্দ গতি আর ওকে কেন্দ্র করে তপতীর সঙ্গে মান-অভিমান, সব এক এক

করে মনের দরজায় এসে ভিড় জমায়। দীপুতো দৈন্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তি দিয়ে গেল কিন্তু তপতীকে এখন বাঁচানো দায়। ওকে একা রেখে বাইরে বেরুনো মুস্কিল। অসীমকেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধরে রাখা যায় না। আপিস থেকে ছুটী নিয়েছি পনেরো দিন, কিন্তু তারপর? পনেরো দিন পরেও যদি সে সুস্থ হয়ে না ওঠে, তখন? সেই ভাবনাও সব নয়। জানি ভেবে লাভ নেই, তবু ভাবতে হয়, ভেবে দিশেহারা হতে হয়। কিছুদিন বাদে আবার আরেক চিঠি পেলুম। লিখেছেন, অসীমের মুখে তপতীর অসুখের সংবাদ শুনে মা বিশেষ বিচলিত। তপতীকে নিয়ে চলে আসবে।

তখনও মন স্থির করতে পারলুম না। আরও কয়েক মাস বাদে বাবার তৃতীয় পত্র পেলুম। লিখেছেন, বৌমার অসুখ নিয়ে তালবাহানা আমার বরদাস্ত হয় না। কোন দ্বিধা না করে তাকে অন্ততঃ তোমার মা'র কাছে পাঠাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর পর আর তপতীকে ধরে রাখা সম্ভব নয়—সে যাবেই যাবে। বললুম, 'যেখানে তোমার পদে পদে কথার খোঁচা সইতে হবে সেখানে কি না গেলেই নয়? তুমি তো ছেলে মানুষ নও, তপতী।'

'না-না-না, কিছু বলোনা। আমি যাবোই। দীপুর স্মৃতিই আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে। ও যেখানে বড় হতে পারত, প্রাণ পেতে পারত সেখান থেকে জন্মের আগেই নির্বাসিত হবার ব্যথা ও সইতে পারেনি। তাই অভিমানে চলে গেছে।

'কিন্তু'—

'তোমার পায়ে পড়ি। দীপু তোমার বাবা-মার চোখ খুলে দিল—'

স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলুম তপতীর দিকে। মনে মনে ভাবলুম, বাবার যখন মত ফিরেছে তখন এই দূষিত আবহাওয়ায় আবার কোনো নবজাতকের বলি যেন না ঘটে!

অসীমকে নিয়ে পরদিনই গাড়ী করে বাসায় ফিরলুম। গেটের সামনে বাবার প্রকাণ্ড ট্যাক্সিটায় মাল বোঝাই হ'চ্ছে দেখতে পেলুম। শুনলুম, বাবা হাওয়া বদল করতে পশ্চিমে কোথাও চলে যাচ্ছেন আজই। ঘরে ঢুকে শশব্যস্তে মাকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, 'উনি চলে যাচ্ছেন। আর বোধহয় ফিরবেন না।'

মার আশঙ্কা ফলেনি। দীর্ঘ এক বৎসর পরে হাওয়া বদল করে বাবা বাড়ী ফিরলেন। হাওয়া বদল হলনা শুধু তপতীর। স্মৃতির ঘূর্ণি হাওয়ার আবর্তে কেবলি সে পাক খেয়ে খেয়ে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে।

* * * *

আজ রাত্রির এই শুভ্রভাষ নবম ঘটনাটাকে একটা অতীত কাহিনীর বইয়ে পড়া গল্প বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ তপতী আমার গায়ে একখানা হাত রাখল। বললে, 'এখনও ঘুমোওনি? উঠে একবার আমার সুট-কেসটা আনো।'

'কেন কি হবে?'

'দীপুর একটা ফটো ছিল; সেইটে—'

'কি হবে তা নিয়ে?'

'তাকাও দেখো দীপুই যেন মিঠু হয়ে এসেছে, না?'

বললুম, 'অনেকটা তার মতই'—

'উঁহু, সে-ই এসেছে। এ মিঠু নয়, দীপু, দীপু, দীপু' বলে মিঠুর মুখে, চোখে, গালে—সর্বাঙ্গে অজস্র চুমো দিতে সুরু করল তপতী।

সুটকেসটা নিয়ে এলুম। তপতী খুলে দীপুর জামা, ফ্রক, পিতলের চুড়ি, হার ইত্যাদি বার করল। খুলে ফেলল মিঠুর সমস্ত সাজ সজ্জা। তারপর একে একে দীপুর সেই সব পুরোনো পোষাকগুলি পরিয়ে দিল মিঠুকে।

'কই থার্মোমিটারটা দাও তো'—বললে তপতী।

বার করলুম সেটা। দেখলুম চ'ড়িগ্রী ছোঁয়া পারা। ইতিমধ্যে কখন যেন তপতীর চোখের জল ধারার মত সজল হয়ে কাঁপছে। আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে মেঝের উপর ঠুকে ভেঙ্গে ফেলল তপতী। বললে, 'এটা দিয়ে কি হবে আর। দীপুর জ্বর তো সেরে গেছে।'

ভোরের আলোর প্রত্যাশায় বেহালা ঘড়ির দিকে চোখ তুলে চাইলুম। ভোর হ'তে তখনো একটু দেরী আছে। তপতীর দিকে তাকালুম, ধ্যানের ভঙ্গিতে সে দীপুর ফটো হাতে করে একবার ফটোর দিকে আরবার মিঠুর দিকে দৃষ্টিপাত করছে। মেজেতে চোখ নামালুম। দেখলুম, ঘরময় ছড়িয়ে পড়া চূর্ণ পারদ অজস্র অশ্রুবিন্দুর মত টল্-টল্ করছে।

মানভূমে বারমাসে তের পার্বণ

শ্রীঅশোক চৌধুরী

পাথর-বর্জিত দেশ বলিয়া মানভূমের যত অখ্যাতিই থাকুক, মানভূম যে রস, রুচি ও সৃষ্টি-বর্জিত স্থান এ অপবাদ কেহই দিতে পারিবেন না। বাংলার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইলেও মানভূমের ভূ-প্রকৃতিকে বাংলার মত সুজলা সুফলা বলা চলে না। পরিত্রাণ্ডিত এই অঞ্চলের উষর-ভূমি-জাত বৎসরের একবারের ফসল লোকের অভাব ও দুঃখ দূর করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া রসের নির্ঝরিণীকেও নিঃশেষ করিতে পারে না। এই স্থানের রুক্ষ প্রকৃতি রুক্ষ ও কর্কশ হইলেও বসুন্ধরা যেমন রত্নগর্ভা, মানভূমের অধিবাসীদের বাহ্যতঃ নীরস বোধ হইলেও তাহাদের অন্তর তেমনি সরস ও প্রেমময়। বাংলার কবি গাহিয়াছেন—"গোলায় গোলায় ধান থাকিলে গলায় গলায়

স্বাভাবিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মানভূমের ভাগ্যে মাতা অন্নপূর্ণা সদা বিরাজমানা থাকিলেও উৎসবের রঙ্গে কোনও দিনই ভাঁটা পড়ে না। বাংলার মতই বৈশাখ হইতে সুরু করিয়া চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে তেরো পার্বণ মানভূমে আজও লাগিয়াই আছে।

মানভূমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রসারের বহু সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান। পাকবিড়রা, বড়াম, দেউল টাঁড়, পরেশপুর, বেলুড়া, প্রভৃতি স্থানের নগ্ন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি, বৌদ্ধমূর্তি এবং বহু দেউলগুলি সেই অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। মানভূমের কাঁসাই, দামোদর ও সুবর্ণরেখার নদীর তীরে তীরে বহু বৌদ্ধ মন্দির ছিল—নদীর বালুকা সরাইয়া এখন ঐ সব বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইতেছে। জৈন মন্দির ও হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরেরও ধ্বংসাবশেষ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়।

মানভূমের বাগাড়ো, ভূমিজ, খেড়িয়া, প্রভৃতি সম্প্রদায়ও বহু পূর্বে হয়ত বৌদ্ধ বা জৈন ছিল। কিন্তু এখন তাহারা পুরুষানুক্রমে, আচারে ব্যবহারে ও পূজার পার্বণে একেবারে বাঙ্গালী হিন্দুদের মতই। একদাকালে যে তান্ত্রিকতার বন্যা সমগ্র বাংলাদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার ঢেউ মানভূমের বুকেও কম আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। পালবংশের পতনের পর বাংলায় যখন সেনবংশীয়েরা নিজেদের আধিপত্য গড়িয়া তুলিলেন তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হইল এবং বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন সুরু হইল। সেই সময় বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের আচার অনুষ্ঠান আত্মগোপন করিয়া হিন্দু দেবদেবীর নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। ধর্ম পূজা, মনসা পূজা, প্রভৃতি পূজাপার্বণ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার হিন্দু রূপান্তর। একই কারণে, মানভূমের বহু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইল। ফলে, এখনও বহুস্থানে বৌদ্ধ মূর্তি শিবমূর্তিরূপে পূজিত হইতেছে, যেমন কংসাবতী নদী তীরস্থ বুধপুর ও বড়ামে। বহু নারী মূর্তি কালী মূর্তিরূপে আজও পূজা পাইয়া আসিতেছে। এখন ঐ সকল শিব, কালী ও ধর্মপূজার স্থানে ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

বৈশাখ মাস সারুল পরব ও ধর্মপূজার সময়। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন সারুল পরব উদ্‌যাপিত হয়। 'লায়া' বা গ্রামা পুরোহিত "গ্রাম্য থানে" ফুল উৎসর্গ করে এবং মোরগ, ছাগল প্রভৃতি বলি দেয়। সাঁওতাল ও ভূমিজেরা হাঁড়িয়া পান করিয়া সারা রাত্রি নাচ গান ও উৎসব আনন্দ করে। কুর্মী প্রভৃতি শ্রেণীরা মদ্যপান বা নৃত্যাদি করে না—তবে গৃহ গোজপাদি সুসজ্জিত করে এবং পর্ব উপলক্ষ্যে ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ রাখে।

আবার বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মানভূমে ধর্মপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপূজা শূন্য মূর্তির পূজা এবং ইহার পুরোহিত হইল ডোম। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম-ঠাকুর, ধর্মরাজ-ঠাকুর তথা ধর্ম

দেবতার পূজা আজও বিশেষ প্রচলিত। কোথাও কোথাও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজেও ধর্ম-পূজার প্রচলন দেখা যায়। এই ধর্ম-ঠাকুর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ। অমরকোষে বুদ্ধদেবকে স্থানবিশেষে ধর্মরাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। রায় বাহাদুর শরৎকুমার রায়ের মতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম বলিতে সূর্যদেবকে বুঝায় সুতরাং ধর্ম-পূজা সূর্য উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ধর্ম-ঠাকুরের কোনও মূর্তি নাই। একটি সাধারণ প্রস্তর খণ্ড ধর্ম-ঠাকুর রূপে পূজিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈশাখী অর্থাৎ বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন ধর্মরাজের পূজা অনুষ্ঠিত হইলেও স্থান বিশেষে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা অথবা আষাঢ় পূর্ণিমাতেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মানভূম জেলার ঘুটিতোড়া গ্রামে, বাঁকুড়া জেলার বেলিয়া-তোড়ে অথবা বীরভূম জেলার কেন্দুলি গ্রামে জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় পূর্ণিমার দিন ধর্মপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলেও ধর্মপূজার প্রচলন থাকিলেও মানভূমের ধর্ম-পূজার অনুষ্ঠান বাংলারই অনুরূপ।

সাঁওতাল ও ভূমিজদিগের বিশেষ উৎসব—"অযোধ্যা শিকার" এই বৈশাখ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। বাঘমুণ্ডীর অযোধ্যা পাহাড়ে সাঁওতালগণের এই বাৎসরিক শিকার-পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহাকে অযোধ্যা শিকার বলে। বহুদূর দূর অঞ্চলের এমন কি বিভিন্ন জেলার সাঁওতালগণ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই অযোধ্যা পাহাড়ে সমবেত হয়। সাঁওতাল যুবকগণ তীর, ধনুক ও বর্শা লইয়া পালিত কুকুরের সাহায্যে বন্য শূকর, খরগোশ প্রভৃতি শিকার করে। ইহা ব্যতীত সাঁওতাল যুবকগণের তীর ধনুক সহযোগে নানান্ শিকার কৌশলও প্রদর্শিত হয়। পূর্ণিমার দিন সারারাত্রিব্যাপী তাহাদের উৎসব: আনন্দ ও নাচ গান চলে এবং তাহাদের এই উল্লাসমুখর উৎসবের রেশ বহুদূর সুদূরান্ত পর্যন্ত শ্রুতিগোচর হয়। এক সপ্তাহ কাল পরে সাঁওতালগণের এই উৎসব স্থায়ী হয়।

উৎসবের পরের দিন সাঁওতালগণের বিচারসভা বসে। সারা বৎসর যে যাহা কিছু অন্যায় করিয়াছে তাহার বিচার এই নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্দারের বিচার সকলেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। হাজারীবাগ ও মানভূম সীমান্তের পরেশনাথ পাহাড়েও সাঁওতালগণের অনুরূপ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মানভূমের লোকসৃষ্টি মূলতঃ পর্বকেন্দ্রিক হওয়ায়, মানভূমের লোক সংগীত, লোকনৃত্য প্রভৃতি লোকসৃষ্টির ধারা এই একটি পর্বকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ লাভ করে। যেমন টুসু, ভাদু বা করম পর্বকে উপলক্ষ্য করিয়া টুসুর গান, ভাদু সংগীত বা করম গীত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মানভূমের লোকনৃত্যের রাজা যেমন হইল ছৌনৃত্য; তেমনি লোকসংগীতের রানী হইল ঝুমুর এবং ছৌনৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হইল ঝুমুর। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনের সময় হইতে ছৌনৃত্যের বিশেষ উৎসব সুরু হয়। ক্ষেতের ধান চাষীদের খামারে ওঠার পর, যখন সারা বৎসরের সঞ্চয় তাহাদের গৃহে মজুত হয়—তখনই চাষীদের অবকাশের আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত সময় আসে। এই সময়ে গ্রামের আখড়ায় আখড়ায় সুরু হয় ছৌনাচের মহড়া—আর চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় তাহা আত্মপ্রকাশ করে এক নব্য সমারোহে। সমগ্র বৈশাখ মাস ধরিয়া তাহার পর গ্রামে গ্রামে ছৌনাচের আসর চলিতে থাকে এবং মানভূমের গ্রামাঞ্চল উৎসবও আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ কোনও পৌরাণিক ঘটনাকে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া ছৌনৃত্যে রূপদান করা হইয়া থাকে। 'ছৌ' বিশেষ বীরত্বব্যঞ্জক নৃত্য এবং যুদ্ধাত্মক কাহিনী বা ঘটনাই সাধারণতঃ নৃত্যের ছন্দে পরিবেশিত হইয়া থাকে। সুতরাং দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হইল এই নৃত্যের ছন্দ বৈশিষ্ট্য। সরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলেও ছৌনৃত্য বিশেষ প্রচলিত—কিন্তু মানভূমে

ছৌনৃত্য ঐ সকল অঞ্চলের ছৌনৃত্য হইতে বেশ কিছু স্বতন্ত্র। ছৌনৃত্যের জন্য যে সকল মুখোশ ব্যবহৃত হয়—তাহারও বিশেষ নির্মাণকৌশল আছে এবং এই মুখোশ নির্মাণ একটি বিশেষ নিপুণ গৃহশিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে চাষীদের আবার চাষের কাজে লেগে যাবার সময় আসে। সুতরাং এই সময়ের পূর্ব পার্বণ সমস্তই কৃষিকার্যকে কেন্দ্র বা উপলক্ষ্য করিয়া উদ্‌যাপিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ই তারিখে "রোহিণী পরব" অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে কৃষিকার্যের উদ্বোধন বলা চলে। এই পর্ব উপলক্ষ্যে গোময় তুষিকা দ্বারা চাষীর গৃহের চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং বালক ও যুবকেরা কাদামাটি মাখিয়া ও পরস্পরের প্রতি ধুলি কর্দম নিক্ষেপ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করে এবং নাচ গান করিয়া গ্রামটি প্রদক্ষিণ করে। ধুলা কাদা মাখিয়া চাষীকে যে চাষের কাজ সুরু করিতে হইবে—ইহা যেন তাহারই মহড়া। গৃহ-প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এবং গৃহ বা প্রাঙ্গণস্থিত কোটর গহ্বরাদি খুঁজাইয়া সর্পভীতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য পূর্বাহ্নেই সাবধানতা অবলম্বন করে। চাষীদের বিশ্বাসমতে রোহিণীর দিন বৃষ্টি হইতেই হইবে। এই দিন বৃষ্টি না হইলে চাষীরা ইহা বিশেষ দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করে এবং আশঙ্কা করে যে সেই বৎসর ফসল ভাল হইবে না এবং সাপের বিষও অতিমাত্রায় বাড়িবে।

আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন "ধাতাল পরব" বা আষাঢ়ী গ্রাম্য পূজা। সুবৃষ্টি লাভের আশায় চাষীরা এই পূজা করে। "গ্রাম্য থানে" নবোদ্গত শস্যশীর্ষ উৎসর্গ করা হয় এবং পর্ব উপলক্ষ্যে ছাগ বলি দেওয়া হয় ও ভোগ হিসাবে ছাগ বিতরণ করা হয়। মানভূমের সর্বত্রই মনসা পূজা অতি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম্য শিল্পীদের দ্বারা সর্পবিভূষিতা মনসা দেবীর সুন্দর মূর্তি গড়িয়া পূজা করা হয়। শ্রাবণের বর্ষণমুখর প্রতিটি সন্ধ্যা কৃষক পল্লীগুলি মনসা দেবীর গানে এবং ডমরুর ত্রিমি ত্রিমি রবে মুখরিত হইয়া উঠে। মঙ্গলকাব্যযুগের প্রাচীন মনসামঙ্গলের গানগুলি কৃষাণ রমণীদের কণ্ঠে বাঙ্ময় হইয়া শ্রাবণের অবিরাম ধারাকে আরও রসময় ও মধুর করিয়া তোলে। শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মনসা পূজা উপলক্ষ্যে হাঁস, পায়রা, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

মনসা পূজা উপলক্ষ্যে বহু স্থানে "ঝাপান" বা সাপ লইয়া খেলানো হয়। সাপুড়েরা "বশীকরণ মন্ত্রের" দ্বারা বিষধর সর্পকেও হীনতেজ করিয়া সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আবার দুই সর্পবিশারদের মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উত্তেজনাপূর্ণ কলহ এবং পরস্পরের মধ্যে "বাণ মারামারি"র দ্বন্দ্ব অনেকক্ষেত্রে বিশেষ সাঙ্ঘাতিক রূপ ধারণ করে।

মনসা পূজা হইয়া যাইবার পর জাতের আসর বসে। মনসার সহিত চাঁদ সদাগরের কলহ, লক্ষীন্দরের জন্ম, বেহুলার সহিত বিবাহ ও বাসর গৃহে লক্ষীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু, মৃতপতি কোলে বেহুলার স্বর্গযাত্রা, লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন লাভ ও মনসার পূজার প্রচলন প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি সুর করিয়া পড়িয়া শোনানো হয় এবং ইহাকেই 'জাতগান' বলে।

ভাদ্রমাসে মানভূমের বিশেষ পর্ব হইল 'ভাদু পরব"। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই পর্ব সর্বাধিক প্রচলিত। এই পর্ব সম্পর্কে কিম্বদন্তী এই যে পঞ্চকোটাধিপতির ভাদু বা ভদ্রেশ্বরী নামে এক অশেষগুণসম্পন্না কন্যা ছিল। সেই কন্যা প্রজার কল্যাণ সাধনের জন্য কুমারী অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন করে এবং তাহারই স্মৃতিরক্ষার জন্য "ভাদু" পূজার প্রবর্তন হয়। ভাদু মূর্তি গড়িয়া ভাদুর ছড়া গাহিয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয় ও ভোগ নিবেদন করা হয়। ভাদু গানের দু একটি ছড়া এই প্রকারের :—

১। ভাদরে আদর পেয়ে
ভাদু সে যে রাজার মেয়ে
ভাজে জুনার সো।—
ওলো, আয়লো ভাদু
খেতে দিব ভালভালা
ফুলের মধু।

ভাদু সঙ্গীতের নিজস্ব স্বতন্ত্র সুরে এই গানগুলি গাওয়া হয়। এইগুলি হইল ভাদুর আবাহনী সংগীত। তাহার পর ভাদুর মানভংগের জন্য গাওয়া হয়:

আন্ গো কাগজ যত লাগে দাম
সাজাই ভাদুর যান গো;
সাজাই ভাদুর যান।
ভাদু করে মান,
মানে গেল সারা নিশি,
সোণার ঝারি করবো দান।

এই ধরণের গান সারারাত্রি গাহিয়া ভাদুর মান ভঞ্জন করা হয়। ইহাকে ভাদু জাগরণ কহে। ইহার পরের দিন অর্থাৎ ৩০শে ভাদ্র ভাদু বিসর্জন। ভাদুর অনুরাগিণীরা কুমারী ভদ্রেশ্বরীর শ্বশুর বাড়ী জলে কল্পনা করিয়া ভাদু বিসর্জনের গান গায়—

জলে ছেল, জলে খেল,
জলে তুমার কে আছে?
আপন মনে ভাবে দেখ
জলে শ্বশুর ঘর আছে।

ভাদু সংগীতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুরুচির অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ভাদু পরবে আমোদ আহ্লাদের মাত্রা ছাড়াইয়া "নাচ্নী নাচ" প্রভৃতির অনুষ্ঠানও কোথাও কোথাও হয়। এই নাচে শিল্প-কুশলতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও শ্লীলতাবর্জিত হওয়ায় ইহা সভ্য সমাজে স্থান পায় নাই। রুচি ও শ্লীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিলে ললিতকলা হিসাবে এই নাচের উৎকর্ষ সাধনও সম্ভব এবং সমাদরও বৃদ্ধি পাইবে।

ভাদ্র মাসের অন্যতম পর্ব হইল করম একাদশী ও ইন্দ্র পূজা। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীর রাত্রে নির্বাচিত কৃষক কুমার ও কুমারী শুদ্ধ অবস্থায় নিকটস্থ বনের কোনও করম বৃক্ষের ডাল আনিয়া গ্রামের আখড়ায় পুঁতিয়া দেয়। তাহার পর ঐ ডালটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সারারাত্রিব্যাপী নাচ গান ও আনন্দ করে। এইরূপে তিন দিন ধরিয়া নৃত্য গীত চলে এবং করম একাদশীতে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই পর্বটিকে "করম পরব" বলে এবং অন্যান্য পর্বের ন্যায় ইহারও আনুষঙ্গিক গানগুলিকে "করম গীত" বলে। করম একাদশীর দিন ভাইএর মঙ্গলার্থে কৃষক কুমারীরা নানা মঙ্গলাচরণ করে। মঙ্গলাচরণের সময় কুমারীরা এইরূপ মঙ্গল গীতি গাহে।

করম গীত

.....পাওব ভাইরে করম গোসাঞীরে
দেহ দেহ করম গোসাঞী দেহ আশীষরে.
দেলি ওগো করমইতে দেলিও আশীষরে
তোর ভইয়া জীওত লাখ বরিষরে···।

সাধারণ করম গীত এই প্রকারের:

আজরে করম রাজা ঘরের ভিতরে
কালরে করম রাজা ঘরের বাহিরে।
ঝুমু ঝুমু বাঁকে পরা কানে করম ফুল পরা
লাচে লাচে কুল থুচাস্ না।

অথবা

সীতাকে হরিল লঙ্কাপতি রাবণ
হনুমান করিল সন্ধান,
বহু কষ্টে রাম, বহু কষ্টে রাম
সীতাকে সীতাকে করিল উদ্ধার।

করম পূজার পরের দিন ইন্দ্র পূজা বা ইন্দ্ পরব। কৃষিকার্যের অবসানে ভাল ফসলের জন্য সুবৃষ্টি লাভের আশায় চাষীরা ইন্দ্রের পূজা করে। ৩১শে ভাদ্র অর্থাৎ ইন্দ্ পরবের পরের দিন ছাতা পরব। গ্রামের জমিদার ও মোড়ল শ্রেণীর লোকেরাই এই পর্বের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নির্দিষ্টস্থানে শাল কাঠের একটি মোটা খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে বাঁশ দ্বারা নির্মিত এবং কাপড় ও রঙীন কাগজ দ্বারা বিচিত্রভাবে সজ্জিত একটি বিরাট ছাতা ঐ খুঁটির উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামের জমিদার বা মোড়ল অনুচর পরিবৃত হইয়া ঘোড়ায় বা পাল্কিতে চড়িয়া উৎসব স্থলে আসিলে হর্ষধ্বনি সহকারে ছাতাটি

হোলা হয় এবং ঐ লাল কাঠের খুঁটিটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।

ইহা বা ছাতা উভয় পর্বই মানভূম জেলার জমিদারী প্রথার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বহুকাল পূর্বে স্থানীয় দু'একটি রাজা এই পর্ব উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই অনুকরণে মানভূমের জমিদার বা ভাতখণ্ডিদার শ্রেণীর লোকেরা এই পর্বের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই পর্ব বহালী ধান্য রোপণের ও পেঁড়াধান্য কাটিবার সময় সঙ্কেত করে। ইহার পর আশ্বিন মাসের অন্যতম বিশেষ পর্ব হইল "জিতা পরব"। দেবীপক্ষের আগে কৃষ্ণাষ্টমীর দিন সন্তান সন্ততির শুভকামনার্থে মায়েরা সারাদিন ও রাত্রি উপবাস করিয়া জীমূত বাহনের পূজা করেন। কৃষ্ণাষ্টমীর দিন পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ইক্ষুদণ্ড, ডুমুরের ডাল ও কয়েকটি ধানের চারা পোতা হয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভগবতীর উদ্দেশ্যে এই পূজা নিবেদিত হয়। পর্বের দিন সাঁওতালেরা দিবারাত্র নৃত্যগীত করিয়া আনন্দ করে। এই পর্ব সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত সমভাবেই পালিত হয় এবং বিশেষ সমারোহ হয়।

কার্তিক মাসের বিশেষ পর্ব হইল বাঁদনা বা গাইবাঁধা পরব। কালীপূজার দিন নির্দিষ্ট উৎসবের সহিত সারা-রাত্রি ঢাক, ঢোল ও মাদল বাজাইয়া "গাই জাগানো" পরব উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন গরুর শিংএ তেল ও সিন্দুর মাখাইয়া এবং পিঠে কলিকার ছাপ দিয়া গোয়ালে আনিয়া পূজা করা হয়। শুক্লা প্রতিপদ ও দ্বিতীয়ার দিন বাঁদনা পরব পালিত হয়। এই পর্বকে অনেক স্থানে পরয়া পূজাও বলে।

বাঁদনা পর্বের পরের দিন "কাড়াখুঁটা" পরব। এই পর্বটি একটি বিশেষ ধরণের আমোদ প্রমোদ মাত্র। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এই পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়। একটি শক্ত মোটা খুঁটিতে কাড়া বা বলদকে বাঁধিয়া লাল কাপড় দেখাইয়া এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া ক্ষেপানো হয়। কাড়া বা বলদটি ক্ষিপ্ত হইয়া খুঁটির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে এবং যতক্ষণ না দড়ি ছিঁড়িয়া পলায় ততক্ষণ তাহাকে ঐভাবে ক্ষেপানো হয় এবং দর্শকেরা আনন্দ উপভোগ করে।

অঘ্রাণ সংক্রান্তি হইতে পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত টুসু পরব উদ্‌যাপিত হয়। এই পরবের জের বসন্ত পঞ্চমী পর্যন্ত চলে। মানভূমে এই বৎসরের টুসু পরবের অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে স্থানলাভ করিয়াছে এবং সর্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেই কারণে এই পর্বের বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিশদ ভাবেই আলোচিত হইল।

মানভূমের যেসকল পাল-পার্বণ বাংলার সাংস্কৃতিক ধারার সহিত ঘনিষ্ঠ এবং অচ্ছেদ্য যোগাযোগের পরিচয় দেয় "টুসু পরব" তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বাংলার তুঁষ তুঁষলি বা তোষলা ব্রতই মানভূমে টুসু বা তুষু পরব নাম ধারণ করিয়াছে। এই টুসু পরব মানভূম, ধলভূম ঘুমু, তামাড়, রাহে, বারান্দা, সিল্লী প্রভৃতি রাঁচী জেলার পাঁচপরগণিয়া অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। এই পর্ব উপলক্ষে মানভূম, ধলভূম ও পাঁচপরগণিয়ার নানাস্থানে খুব বড় বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কুমারী মেয়েরা রূপবান স্বামী এবং ঐশ্বর্য লাভের আশায় এই ব্রত উদ্‌যাপন করে। মাটির একটি নূতন পাত্র পিঠুলির দ্বারা নানাপ্রকার আল্পনা দিয়া চিত্রিত করে। তাহার পর ছোট ছোট গোবরের গুলি পাকাইয়া ঐ পাত্রে রাখে। পরে ঐ পাত্রটির উপর নতুন ধানের দুব ছড়াইয়া দেয় এবং সরিষা ও মূলা ফুল দিয়া টুসুদেবীর পূজা করে। অঘ্রাণ সংক্রান্তি হইতে সারা পৌষ মাস তাহারা এইভাবে টুসুদেবীর পূজা করিয়া টুসু গীত গায়। টুসুর আবাহন গীত এই প্রকার :—

এসো টুসু ধন ডাকি ঘন ঘন
পূজিব তোমার ও রাঙা চরণ।

এই ভাবে প্রতি সন্ধ্যা হইতে কিছু রাত্রি পর্যন্ত টুসুর গান হয়। কোথাও কোথাও মেয়েরা সমবেত ভাবে একত্রিত হয়ে টুসু পূজা করে। টুসুর পূজা সারিয়া

অধিক রাত্রে বাড়ী যাইবার পূর্বে তাহারা টুসুকে ঘুম পাড়াইয়া যায়। ইহাকে "টুসু চুলানো" বলে। টুসু চুলানোর গান এই প্রকার :—

টুসু চুল চুল চুলগো তালতুলসীর মূলেগো
আজ যায় না হাতী ঘোড়া পিছু যায় না আরি
আরির চলনে মোরা চলিতে না পারি গো।

পরের দিন আসিয়া আবার "টুসু জাগানো" হয়। সারা পৌষ মাস ধরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় এই ভাবে "টুসু চুলানো" ও "টুসু জাগানো" হয়। কিন্তু টুসুর গান বাঁধা ধরা কোনও নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। চলমান জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিত্য নূতন সঙ্গীত রসের পরিবেশন করিয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুখ দুঃখ, অভাব অনুযোগের কাহিনী টুসুর গানের ভিতর দিয়া নিপুণ ভাবে প্রকাশিত হয়। কাহার ভাগ্যে স্বামী-রূপ দেবতাটি কি রকম জুটে তাহা লইয়া হাস্য পরিহাস করিয়া গায় :—

কার কপালে কি আছে—
বুড়া বরে মোছে পাক দিছে।

আবার হয়ত কোনও নব বধূ দীর্ঘকাল শ্বশুরালয়ে কাল কাটাইতেছে। তাহার পিতামাতাও কন্যাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন না—দীর্ঘকাল পরে হয়ত বধূ পিত্রালয়ে আসিল তখন সেই বধূর অভিমানভরা মনের আক্ষেপ গানের মাধ্যমে নিজের বেদনা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া গায় :—

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি না শ্বশুর ঘরে
পরের মা কি বেদন বুঝে, অন্তরে ঝেরে মারে
এমন মন বলে
উড়ে যায়ে বইসবোলো মায়ের কোলে

তাহার পর কোনো মেয়ের হয়ত বহুদূরে শ্বশুরালয়, যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা—পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসার পথে অনেক বাধা। তখন মেয়েটি দুঃখ করিয়া গায় :—

দূরে বিহা দিলি মাই কেনে
কাঁদ দিব নদীর বালে।

গাঁয়ের দোকানী, পাঠশালার পণ্ডিত কেহই তাহাদের লক্ষ্য এড়ায় না; যে কোনও পরিস্থিতিকে ইহারা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে—গ্রামের পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া গান বাঁধে :—

কি কাপড় পইরবে মাষ্টার কি কাপড়ে সাধ আছে
মনের কথা খুলে বল সিঁদরা গাঁয়ে হাট আছে।

গাঁয়ের দোকানীর কোনও-কিছু ত্রুটিকে তৎসনা করিয়া গায় :—

ও তুই নাকিয়ে বড় দোকানী—
কই দিলি এলাচ লং দারচিনি।

এই ভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোটা কন্ট্রোলের ফলে সাধারণ লোকের কি পরিমাণ দুঃখ দুর্দশা হইয়াছিল তাহাও টুসুর গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে। টুসুর মাধ্যমেই দেশের অবস্থা সহজভাবে পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে।

পৌষ সংক্রান্তির দিনে সমগ্র মানভূম এক অপূর্ব রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক গ্রামের কুমারী মেয়েরা দল বাঁধিয়া ছোট বড় নানা আকারের কাগজের টুসু হাতে লইয়া বিসর্জনের জন্য নদী অভিমুখে গমন করে। পৌষের দ্বিপ্রহর ভোর কুমারী কণ্ঠের গানে গানে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং নদীতটে যেন টুসুগানের মেলা বসিয়া যায়। পূর্ব আকাশে সূর্যের কিরণ প্রকাশ হওয়া মাত্রই টুসু বিসর্জনের ধুম পড়িয়া যায়। কাগজের তৈরী টুসুকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিবার সময় কুমারীরা তাহাদের ঈপ্সিত স্বামীলাভের আশায় টুসুকে তাহাদের শেষ প্রার্থনা জানাইয়া দেয়। টুসু বিসর্জনের সময় বিদায়ের করুণ রাগিণীতে প্রাণের বেদনা জানাইয়া কুমারীরা গায় —

তিরিশটি দিন ছিলে মাগো
তিরিশটি ফুল নিয়ে গো।
আর রাখিতে নারি মাকে
মঙ্কর হইল বাদী গো।
এতদিন যে ছিলে টুসু
মা বলে আর ডাকলে না।

যাবার বেলা বাগড় হৈল
মাকে ছাড়া যাবো না।
আর তোরা কে যাবি আয়
আমার টুসু জলকে যায়।

পৌষের শীর্ণস্রোতা নদী অলস মন্থর গতিতে টুসুর স্রোত বুকে বহন করিয়া অনির্দেশ যাত্রা করে, তখন কুমারী কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইয়া ওঠে—

টুসু সিনাছেন, গা ধোলাছেন,
হাতে তেলের বাটি,
নয়ে নয়ে চুল বাড়ছেন
গলায় সোনার কাঁটি।
কার ঘরে না বৌ ঝি আছে
কেবা খায় পানি?
খাঁড়ুরী মনের ঘরে করে অপমান।

মকর সংক্রান্তিতে নদীর জলে টুসু বিসর্জন করিয়া মেয়েরা তাহাদের ব্রত সাঙ্গ করে। কিন্তু বহুস্থানে এই পরবের জের বসন্ত পঞ্চমী পর্যন্ত চলে এবং এই পর্ব উপলক্ষ করিয়া বড় বড় মেলা মানভূম, ধলভূম ও রাঁচী জেলার পঞ্চ পরগণা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চলা মাঘ তারিখে পঞ্চ পরগণার সতীঘাটা মেলা টুসু পর্ব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম মেলাগুলির অন্যতম এবং এই মেলায় লক্ষাধিক জনসমাগম হইয়া থাকে।

মকর সংক্রান্তির দিন মকর স্নান ও পিঠা পরব মানভূমের লোক-উৎসবগুলির অন্যতম। মানভূমের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই উৎসব পালন করে এবং সকর বা প্রাচীকালের নদীতীর বা বৃহৎ জলাশয়গুলির নিকটস্থ স্থানে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মেলা বসিয়া যায়। মকরস্নান সমাপনে গৃহে আসিয়া সকলে নানা রকম পিঠা ভক্ষণ করে।

চৈত্র মাসে শিবের গাজন বা চড়ক পূজা বৎসরের সর্বশেষ এবং সাজনপ্রিয় পর্ব। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই পর্ব উদ্‌যাপিত হয় এবং ইহাকে ভোক্তা পরবও বলে। ভোক্তা অর্থাৎ শিবের উপাসকেরা গাজনের আগের দিন উপবাস করে এবং উপর কুলের মালা পরিয়া নাচিতে নাচিতে স্নান করিতে যায় এবং স্নান করিয়া নাচিতে নাচিতে ফিরে। সন্ধ্যার পর ভোক্তারা শিবের পূজা করে এবং শিবকে আগুনের ফুল উপহার দেয়। পরের দিন ভোক্তারা নিজ নিজ মানসিক শোধ করিবার জন্য দণ্ডী খাটে। কেহ বা পিঠের চামড়া ফুঁড়িয়া, কেহ জিভ ফুঁড়িয়া ও অন্যান্য নানান ভাবে শরীরকে নির্যাতন করিয়া মানসিক শোধ করে এবং উৎকট ক্রীড়া দেখাইয়া জনমণ্ডলীকে আনন্দ দানের চেষ্টা করে। সন্ধ্যার পর শিবের পূজা দিয়া ব্রত ভঙ্গ করে এবং সারারাত্রি ধরিয়া ছৌনৃত্য চলে। গাজনের দিন হইতে মানভূমের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে আনাড়া, বুধপুর ও ছড়রার মেলাগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। শিবের গাজন হইতে সুরু করিয়া সমগ্র বৈশাখ মাস ধরিয়া গ্রামে গ্রামে ছৌনাচের আসর চলিতে থাকে।

এই সকল পাল-পার্বণের সঙ্গে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, রথযাত্রা, নামসংকীর্তন প্রভৃতি পূজা-পার্বণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি বাংলা দেশের মতই সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা কালীপূজা প্রভৃতিতে মানভূমে শাক্ত প্রভাবও বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবার শিবায়নের গান, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলনও দেখা যায়। বর্ধমান জেলার সন্নিহিত মানভূমের কোনও কোনও অঞ্চলে বৈষ্ণবী দুর্গা পূজার প্রচলনও দেখা যায়। বৈষ্ণব প্রভাবের পরিচয়ও ইহা হইতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসীদের মাঘাংবুরু, বেজা বিঁধা বা বিঁধা পরব প্রভৃতি নানান্ পর্ব পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র মাঘ ও ফাল্গুন মাসে চাষীরা ফসল কাটিতে এবং সম্বৎসরের সকর গৃহজাত করিতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকায় এই সময় ঘটা করিয়া পর্ব অনুষ্ঠানের কোনও অবকাশই পায় না। সুতরাং এই দুইটি মাসে মানভূমের প্রধান পাল-পার্বণগুলি অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সমগ্র ভাবে বিচার করিলে মানভূমকে সত্যসত্যই বারমাসে তের পার্বণের দেশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

চাল

মানবেন্দ্র পাল

সন্ধ্যের সময় যে ট্রেন কাটোয়া থেকে হাওড়ার দিকে যায় তাতে ভিড়টা থাকে কম। আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে অলস দেহটাকে আলস্যের হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে চিকিয়ে চিকিয়ে এগোনো যায়।

বোধহয় এই ভেবেই তরুণ ব্যবসাদার শ্রীমান অতুলকুমার ইণ্টার ক্লাসের বদলে থার্ড ক্লাসেরই একটা টিকিট কেটে বসল। তাছাড়া শ্রীমানের আভিজাত্য এখনো শ্রেণী-চেতন হয়ে ওঠেনি। মিহি ধুতির সঙ্গে সার্জ মানাবে কি না অথবা ইণ্টারের গদি ছাড়া তার দামী স্যুটের অবমাননা ঘটবে কি না এ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর এখনো পায় নি।

দামী জিনিসটা ব্যবহার করে, কারণ তার বয়েসটা এখন মূল্যবান—দামী জিনিসের মতোই লোভনীয় —দুর্লভ। তা ছাড়া নিজে উপায় করছে কাঁচা পয়সা বছর খানেক ধরে। সে উপার্জিত অর্থের সঞ্চয়ের পথ আছে কিন্তু ব্যয়ের পথ সীমাবদ্ধ।

একলা মানুষ—কাছে পিঠে কোনো পোষ্য নেই—নেই স্ত্রী-সূত্রের পরগাছা। মাথার ওপর আকাশচুম্বী গম্বুজের মতো বিরাট প্রতিপত্তিশালী বাপ অথচ নাপ শহরের নাম করা ব্যবসাদার।

কাজেই দু'বার আই, এ, ফেল করে যখন বাপের উপদেশ মতো সরস্বতীকে বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করলে তখন তার চিন্তা আভিজাত্যকে ভুলে আর্থিক উন্নতির পথ-বাৎলানো আইডিয়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিন্তু বয়েসটা তার তখনো পঁচিশ পার হয় নি।

সিগারেট ধরিয়ে অতুল সামনের একটা ফাঁকা থার্ডক্লাসে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি জানালার ধারের কোণটা বেছে নিয়ে রুমাল দিয়ে জায়গাটা ঝেড়ে মুছে কাঠে ঠেসান দিয়ে বসল।

একবার দেখে নিল গাড়িটা। পরিবেশ ভালোই। বেশ নিরিবিলি হিসেব করা চলবে লাভ-লোকসানের—হাওড়া পৌঁছনো পর্যন্ত।

যা দু'চারজন প্যাসেঞ্জার আছে তারা কেউ এরই মধ্যে ঝিমোচ্ছে, কেউ গভীর মনোযোগে পড়ছে ওবেলার বাসী খবরের কাগজখানা।

কেবল সামনের জানলার ধারের বেঞ্চিটাতে দুটি মেয়েছেলে বসে। তারাই কেবল নিচুগলায় গল্প করছে আর মাঝে মাঝে জোরে হেসে উঠছে।

বিরক্ত হয়েই অতুল একবার তাদের দিকে তাকালো। একজনের বয়েস চল্লিশ পার হয়ে গেছে। কালো পাতলা চেহারা, মাথায় কাপড়। স্বামী আছে কিনা সে চিহ্ন চোখে পড়ল না। পরণে নোংরা একটা শাড়ি। খালি গা। কথায় কথায় আঁচল থেকে একটা কৌটা বের করে লোকটা খাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য নির্লজ্জ আর একজন। তার বয়েস কুড়ির নীচে। রংটা ফর্সা। স্বাস্থ্য লোভনীয়। গায়ে এক শাড়ি ছাড়া অন্য কোনো আবরণ নেই। আর আভরণের মধ্যে তার দুই নিটোল হাতে দু' গাছা লাল চুড়ি। এর পরণেও ময়লা শাড়ি,—এও হাসে, তবে এর হাসি একটু বেশি পরিমাণে। সশব্দে কংকার তুলে ও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বয়স্কা মেয়েমানুষটি তখন হাসি লুকিয়ে চিমটি কেটে ওকে সংযত করে দেয়। অল্পক্ষণের জন্যে মেয়েটি সামলে নেয় বটে কিন্তু একটু পরেই যখন টিনের বাক্সে পান চুণ, খয়ের সাজিয়ে 'পান চাই' বলে পানওলা এসে দাঁড়ায় তখন আবার মেয়েটির চপলতা ওঠে চমকে। নিজেই উঠে ছেলেটির টিন থেকে পান কেড়ে নিতে যায় বয়স্কা আবার ওর হাত ধরে বসিয়ে চোখের ইশারায় ধমক দেয়। তারপর চারটে পয়সা দিয়ে দুটো পান কেনে,

তারপর আঁচল থেকে বের করে দোক্তা।

পানওলার তাতেও নিষ্কৃতি নেই। সে হয়তো চলে যাচ্ছে—মেয়েটি ওমনি গলা তুলে ডাকলে—এই পটলা, আর দুটো সুপুরি দে।

পটলা ভয়ে ভয়ে সুপুরি দিল। মেয়েটি নিজে আরও দুটো সুপুরি বাক্স থেকে তুলে নিয়ে নিচু গলায় বললে—হ্যাঁরে, ব্যোমকেশকে আজ ধরেছিল কেনে?

—কী জানি ভাই, ও খাবার বেচে, আমি বেচি পান। আমার ব্যাপারি আমাদের জাহাজের খবর রাখতে নেই।

—তুই কদ্দুর যাবি?

—দোমড়ায় নেবে পড়ব ভাবছি। তুমি কদ্দুর

মেয়েটি এবার বরস্কার পানে তাকিয়ে দুষ্টু হাসল। বললে—ব্যাণ্ডেল তো পার হই।

পটলা চলে গেল।

অতুলকুমার এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল সব।—না সত্যিই মেয়েটি বড়ো বেহায়া—কিন্তু—

কিন্তু সুন্দরও। ওর ওই সাদাসিধে আটসাঁট দেহ-লতার মধ্যে একটা জীবন্ত যৌবন উঁকি দিচ্ছে। ওর চোখে মুখে সেই যৌবনেরই একটা অহমিকা,—ওর বেপরোয়া ভাবটা যেন, তার ঐশ্বর্যের নিঃসংকোচ প্রচার!

মেয়েটির নির্লজ্জ চাউনি প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাধ্য হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে হল অতুলকে। কে জানে, হয় তো এখুনি পানওয়ালার মতো তার কাছে এগিয়ে এসে বলে ফেলবে—

বলে ফেলবে কিছু একটা আবোল-তাবোল। তারচেয়ে সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো।

পা তুলে কাঠের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘুরে বসল অতুল। হু হু করে হাওয়া আসছে। ট্রেন চলেছে। দুপাশে ধূ ধূ মাঠ।

অতুলের চোখে ঘুম নেমে এল। কাল সারা রাত্তির গেছে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় পথে পথে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অতুলের চোখের সামনে থেকে চলন্ত ট্রেনের ভাৎ দূরে মিলিয়ে গেল। আর চোখের সামনে ভেসে উঠল গতরাত্রের বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলো—ড্রাইভার কালীপদ, পেট্রোল-গার্ড, লরী, চাল···

···লরী নিয়ে চলেছে অতুল। পাশে আর এক বন্ধু-সহকর্মী! পেছনে গাদা করা চালের বস্তা। একটা ত্রিপল ঢাকা দেওয়া হয়েছে। বস্তার আড়ালে মাথা লুকিয়ে বসে আছে জন তিনেক কুলি। সঙ্গে তাদের আত্মরক্ষার জন্যে একগাছা করে মোটা লাঠি।

নিস্তব্ধ জনশূন্য কালনা-বর্ধমান রোড। পিচ উঠে গেছে কোথাও! কোথাও খোয়া বেরিয়ে খাদ হয়ে গেছে। বিশাল লরীটা সেই রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। পথের ওপর এক-চোখ-কানা হেড্-লাইটের ঘোলাটে আলো। একঘেয়ে একটা আর্তস্বর তুলে লরী এগিয়ে চলেছে।

ভেতরে তিনটি প্রাণী। ষ্টিয়ারিং-এর ওপর ড্রাইভারের হাত কাঁপছে থর্ থর্ করে, কিন্তু অবিচলিত দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত।

অতুলকুমার ঘন ঘন সিগারেট টানছে আর সভয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছে। যেন—

অতুলের গলার চাপা স্বর ফুটে উঠল—পেছনে যেন গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?

সহকর্মী একটু নার্ভাস প্রকৃতির। অতুলের হাতখানা চেপে ধরে বললে—সর্বনাশ! নিশ্চয়ই পুলিশ পেট্রোলে বেরিয়েছে।

—কালীদা জোরে চালান। অতুল উত্তেজিত হয়ে উঠল।—পেছনে পেট্রোল গার্ড ফলো করছে।

কিন্তু মান্ধাতার আমলের পুরনো লরী অতুলের আকুতি কানে নিল না। বেশি স্পীড তুলতে গিয়ে হঠাৎ একটা আওয়াজ করে গাড়িটা থেমে গেল একেবারে।

দারুণ উত্তেজনায় অতুল ঘেমে উঠল।

—সর্বনাশ! আর উপায় নেই। লরী ভর্তি মাল—পেছনে যেন গাড়ির শব্দটা স্পষ্টতর হচ্ছে।

কিন্তু অদ্ভুত কর্মকুশল কালীপদ ড্রাইভার। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে একটা টর্চ নিয়ে খুলে ফেলল ইঞ্জিনের ঢাকনা। মিনিট পাঁচেক কি ঠোকাঠুকি করলে। তারপরেই ভেতরে ঢুকে অতুলকে নির্দেশ দিলে জোরে হ্যাণ্ডেল মারতে।

পকেট থেকে দামি রুমালটা নিয়ে লোহার হ্যাণ্ডেল অতুল ষ্টার্ট দিলে। সাদা ধবধবে রুমাল লোহার মরচেতে মলিন হয়ে গেল।

তা হোক্ তবু রক্ষে, লরী ষ্টার্ট নিয়েছে। মুখের ঘাম মুছে নিল অতুল সেই রুমালেই। লরী আবার ছুটতে লাগল।

মিনিট দশেক যাবার পরই পল্লীরক্ষা সমিতির প্রহরা।

এখানে কোনো ভয়ের কারণ নেই। আসবার সময় ব্যাচ-ইন-চার্জের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছে বিনা বাক্য ব্যয়ে লাইন ক্লীয়ার দেবার জন্যে। এসব আট ঘাঁট বেঁধে রাখার বিষয়ে অতুল সিদ্ধহস্ত।

কথা ছিল ব্যাচ-ইন-চার্জ যথারীতি হাত তুলে লরীকে দাঁড়াবার নির্দেশ দেবে। কিন্তু লরী যেন না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ কারও চোখে পড়লে ব্যাচ-ইন-চার্জ কৈফিয়ত দিতে পারবে।—লরীকে সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দাঁড়ালোনা তো কী করা যাবে?

তাছাড়া ব্যাচ-ইন-চার্জ যাকে ছেড়ে দেবে তার উপর সন্দেহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নিরাপদে লরী এগিয়ে চলল আরও কিছু দূর। এবার আর এক বিপদ।

লরীর হেডলাইটে ধরা পড়ল অদূরে রাস্তার ওপর সার সার গরুর গাড়ী ফেলা। পথ বন্ধ।

মুশকিল!

এইবার কালীবাবুও ঘাবড়ে গেলেন। আর রক্ষে নেই। অতুলের ভুরু কুঁচকে উঠল।

বললে—কালীদা, গাড়ি এইখানেই রাখুন। আমি একা গিয়ে দেখি কী ব্যাপার!

কিন্তু অতুলকে বেশি দূর যেতে হল না। কেমন করে কয়েকজনে জানতে পেরেছিল এই পথ দিয়ে লরী বোঝাই চাল আসবে শেষ রাত্তিরে।

সংখ্যায় এরা জন পাঁচেক। হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। হৈ হৈ করে তারা ছুটে এল।

অতুল প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমা মোছবার ছল করতে লাগল নিঃসংকোচ চিত্তে।

অতুলের এই নির্বিকার ভাব দেখে প্রথমে ওরা ঘাবড়ে গেল। পরস্পর একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। কিন্তু একটু পরেই ওদের একজন এগিয়ে এসে বললে—কী দাদু, খুব পালাবেন মনে করেছিলেন, এঁ্যা?

অতুল ক্যাপ্‌স্টেনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে আগুন ধরালো। বললে—কী চাও তোমরা সোজাসুজি বলো।

একজন বললে—চালগুলি এখানে রেখে যেতে হবে।

অতুল বললে—এটা কথার মতো কথা হলনা: এতে আমার ওপর জুলুম করা হবে।

—তবে টাকা দাও। আর তা নাহলে বলো, এখুনি থানের লোককে খবর দিই। তারপর দেখবে কেমন কুত্তা-ঠেঙানি হয়।

অতুল একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

বললে—দেখো, ঢোলে হাতুড়ি দিয়ে পিটলেই জোরে বাজনা বাজেনা। বরঞ্চ ঢোলই ভাঙে। ভাঙে যে বাজাতে যায় তারই ক্ষতি বেশি। তার চেয়ে বরং সাধে বাজাও, শব্দও মিষ্টি লাগবে, ঢোলও বাঁচবে। দরকার মতো পরেও আবার পিটতে পারবে।

কথা শেষ করেই পাঁচ টাকার নোট একখানা করে পাঁচজনের হাতে দিয়েই গাড়িতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পথও পরিষ্কার। লরী আবার চলতে শুরু করল।

লরী চলেছে। রাত এখন তিনটে। সমস্ত রাত ঘুম নেই। আর পাঁচমাইল পার হলেই পারমিট-এরিয়া। কিন্তু এ পাঁচমাইল বোধহয় আর পার হওয়া যায় না।

পেছনে আসছে পেট্রোল গার্ড। তাদের ট্রাকের

শব্দ দূর থেকেও বুকের মধ্যে কাঁপুনি জাগাচ্ছে।

অতুলের মনে হল, তার সর্বাঙ্গ যেন কেমন থেমে উঠছে—মাথা কিম ঝিম করছে, মনে হল জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে।

অথচ এই সময় জ্ঞান হারালে……

অস্ফুট কণ্ঠে অতুল বলে উঠল—কালীদা—

কে যেন এসে তার হাতখানা চেপে ধরল একটা মুখ—কী বীভৎস—কী কঠোর! হেসে উঠল নিঃশব্দে মুখ বিকৃত করে। লোহার হাতকাপ ঝনঝনিয়ে উঠল চোখের সামনে।

…ঘুম ভেঙে গেল। সত্যিই হাতে তার কে যেন স্পর্শ করেছিল। কিন্তু—

পেট্রোল-গার্ড নয়—এ সেই মেয়েটি।

চোখ মেলতেই মেয়েটি কিরকম করুণ সুরে বললে, —বাবু, আপনার হাতে পায়ে ধরছি—

বলে সত্যি সত্যিই মেয়েটি পা ছোঁয় আর কি!

—আরে আরে করকি! অতুল চমকে উঠে সামলে নিল নিজেকে।

মেয়েটি বললে—দয়া করে আমায় বাঁচান।

—কী হয়েছে?

তখনো যেন ঘুমের ঘোর কাটেনি। কিছুতেই বুঝতে পারছেনা অতুল, হঠাৎ এই অল্প সময়ের মধ্যে কী এমন বিপদ এসে আক্রমণ করল ঐ চটুল মেয়েটিকে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বললে—আমার কাছে এই কটা চাল আছে। আপনি যদি দয়া করে আপনার পেছনে লুকিয়ে রাখেন।

চমকে উঠল অতুল—কিসের চাল!

এত দুঃখেও মেয়েটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বললে—সে আপনি বুঝবেন না।

তারপর একটু থেমে বললে—আমরা অন্নসীর চাল নিয়ে যাই। কিন্তু বাঁশবুকোদের তাও সয়না। এখুনি বাগেল এসে পড়বে আর চাল সুদ্ধু আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবে।

কিন্তু আপনার পেছনে থাকলে আপনাকে সন্দ করবে না। আর যদি করে, আপনি বলে দেবেন কার না কার চাল আপনি জানেন না।

এক নিশ্বাসে কথাটা শেষ করেই মেয়েটি অতুলের পা জড়িয়ে ধরলে।

—আরে ওঠ্ ওঠ্, এই দেখো গাড়ির মধ্যে কী কেলেঙ্কারী!

—আমায় বাঁচান বাবু। আমি বড়ো গরিব। এই ক'সের চাল নিয়ে গিয়ে বেচব। তবে দুটো পয়সা পাব। শুধু ব্যাণ্ডেলটুকু পার করে দিন।

এতক্ষণ বয়স্কা জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে ছিল। এবার সেও উঠে এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—লক্ষ্মী বাবা আমার, বাঁচাও আমাদের। বড়ো গরিব। পেটের দায়ে এই সব কাজ করতে হয় বাবা। তোমরা লেখা-পড়া-জানা ভদ্দরলোক আমাদের ক্ষমাঘেন্না করে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দাও।

বয়স্কা এসে অতুলের পা জড়িয়ে ধরতে যায়। এক বৃদ্ধ প্যাসেঞ্জার বললেন—নিন মশাই, এত করে বলছে। পেছনে ফেলে রেখে দিন না! আপনার আর কি?

একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন—বেচারারা এই ক'সের চাল নিয়ে যাচ্ছে, তাতেই এত জুলুম, ওদিকে হাজার হাজার বস্তা কত যে পার হয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। কী আর বলব!

বৃদ্ধ ক্ষোভের হাসি হাসলেন।

অগত্যা অতুলকে রাজী হতে হল। তখন সেই বয়স্কা আর তরুণীতে মিলে বেঞ্চির নীচ থেকে, বাথ্‌রুমের কোণ থেকে ছোটো ছোটো তাকিয়ার মতো প্যাক করা কয়েকটা বস্তা এনে বেশ করে অতুলের পেছনে সাজিয়ে দিলে।

মেয়েটির দুঃসাহস—সে আবার অতুলের হাত ধরে বললে—এই এমনি করে ঘুরে বসুন। আর গায়ের কাপড়টা—

কথা শেষ না করেই নিজে হাতে মেয়েটি আলোয়ান-খানা অতুলের সর্বাঙ্গ বেড়ে এমন ভাবে জড়িয়ে দিলে যে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না—মানুষটার পেছনে কোনো গুপ্ত ধন লুকানো আছে।

আশ্চর্য! অতুলকুমার কোনো কথা বলতে পারলনা। সে বোবার মতো মেয়েটির হাতে যেন আত্ম-সমর্পণ করে বসে আছে।

ব্যাণ্ডেল পার হয়ে গেল। খাকি প্যাণ্ট পরা চাপ-চেকাররা উঠলেন। টর্চের আলো ফেলে এদিক ওদিক দেখলেন। মেয়েলোক দুটিকে যথেষ্ট সন্দেহও করলে কিন্তু কিছু পেলে না। চলে গেল।

মেয়েটি এতক্ষণ বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমুবার ভান করছিল ট্রেন চলতে সুরু করলে এক লাফে উঠে এগিয়ে এল অতুলের কাছে।

মুখে হাসি আর ধরেনা।

আমাকে।

এই বলে সে একে একে বস্তাগুলো সরিয়ে নিলে এতক্ষণে অতুলের মুখে কথা সরল।

বললে—এসব কাজ কর, ভয় করেনা

ধরি ধরা পড়তে?

মেয়েটি একটু হাসলে

বললে—ভয়তো করেই। ভয় করে বলে চুপ করে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারিনে।

চালাবে কে?

কেমন একটা কৌতুক হাসি ফুটে উঠল চোখে মুখে।

অতুল বিস্ময়ের মতো বললে—তা হলেও তোমরা মেয়েছেলে। এসব ব্যাপারে বিপদ আছে—

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

বললে—সে ভদ্রলোক বুঝবেন

তারপর হঠাৎ গলার স্বরটা নিচু করে বললে—বিপদ যেমন আছে, তার উপায়ও আছে। একালের বিয়েতে-ঠাকুর খুব সজ্জন। তাঁর জানাশুনা আছে। তিনিই সব ঠিক করে রেখেছেন।

কথা শেষ করেই একছুটে গিয়ে আঁচল ধরে টানতে লাগল।

বয়স্কা নিজেই কোঁকার

এগিয়ে গিল।

[উপন্যাস]

শুধু একটি মাত্র ভুলের জন্য আমার গোটা জীবনের ইতিহাসটাই পাল্টে গেল। ভালোবেসেছিলাম অনিমাকে, বিয়ে ক'রলাম তনুশ্রীকে। অনিমাকে ভালোবেসে ভুল করিনি, ভুল হ'লো তনুশ্রীকে বিয়ে ক'রে। ভুল ক'রলাম, সে একটা ইতিহাস।

ছিল কলেজে আমার সহপাঠিনী। শুধু সহপাঠিনী বললে ভুল হবে, কলেজ-ম্যাগাজিনের আমরা ছিলাম যুগ্ম-সম্পাদক। সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন অবশ্য অধ্যাপক সিদ্ধান্ত, ক্লাশে আমাদের সাইকোলজি পড়াতেন। অধ্যয়নে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও ম্যাগাজিন-সম্পাদনায় আমরা ছিলাম একজন। অনিমাই দেখে-শুনে সব ক'রতো, আমি শুধু মাঝে মাঝে ঈষৎ পুরুষালি চঙ্গুক্ষেপ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তাম। অনিমা তাতে বরং খুশী চ'তো। নির্বিরোধ দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মেয়েরা খুশীই হয়। কিন্তু নিশ্চিন্ততা মাঝে মাঝে ব্যাহত হ'তো - যখন তার আকস্মিক আবির্ভাবে সচকিত হ'য়ে উঠতো আমার নির্জন অধ্যয়নকক্ষটি। এসেই সাই-কোলজির চ্যাপ্টার খুলে ব'সতো, নজির টানতো আধুনিক বাংলা উপন্যাস থেকে। কারণ, আমি হয়ত তখন সিলেবাসের পৃষ্ঠা বুজিয়ে রেখে কিছু-একটা ঔপন্যাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে খানিকটা স্বপ্নাতুর হ'য়ে উঠেছি। মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধ'রে নিজের অলক্ষ্যেই কখনও হয়ত শরৎচন্দ্রের দেবদাসকে অনুসন্ধান ক'রেছি নিজের মধ্যে, অকস্মাৎ পার্বতীর আবির্ভাবে সচকিত হ'য়ে উঠতে হ'য়েছে। এ পার্বতী শরৎচন্দ্রের 'পারু' নয়, আমার সহপাঠিনী অনিমা। সাইকোলজির পৃষ্ঠা থেকে লাইন টেনে নিয়ে ব'লেছে : 'শরৎবাবুর বইতে নেই, কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর ছবিতে দেখিয়েছেন—গরুর গাড়ীতে দেবদাস যখন শেষ নিশ্বাস ফেললো, সাংসারিক পরিবেশে পার্বতির শিথিল হাত থেকে নানা খাবারে সুসজ্জিত থালাখানি অকস্মাৎ মেঝের প'ড়ে গিয়ে সবকিছু তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেল। কি সাইকোলজির ওয়ার্ক হ'লো এখানে, বলতো ?'

প্রথম প্রথম অনিমা আমাকে 'আপনি' ক'রেই ব'লতো, ক্রমে ম্যাগাজিনের সূত্রে কিছুদিন খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে কাটবার পর সম্প্রতি নিরঙ্কুশ 'তুমি'তে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি থেকে তুমিটাই বরং শ্রুতিমধুর শোনালো ওর কণ্ঠে।

উত্তরে হেসে ব'লেছিলাম, 'একেবারেই হাসালে তুমি এবারে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ যেখানে নিবিড়, মনের অবচেতন মুহূর্তেও সেখানে একটি হৃদয়কে আর একটি হৃদয় প্রভাবিত ক'রতে পারে।'

আর কিছু, একটাও পাল্টা জিজ্ঞেস ক'রলো না বটে অনিমা কিন্তু জবাব শুনে আশ্বস্ত হ'লো ব'লেও মনে হ'লোনা। আসলে সাইকোলজির ও চ্যাপ্টারটা তখনও আমার অধিগম্য হ'য়ে ওঠেনি ; উঠলে অধ্যাপক সিদ্ধান্তে আর আমাতে পার্থক্য থাকতো কি ! মনে মনে বোধ করি সেটুকু বুঝলো অনিমা, অত্যন্ত ইন্টেলেকচুয়াল ছাত্রী, ইন্টারমিডিয়েটে সিক্সথ্‌ হ'য়েছিল, বি, এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পাবে—স্বতঃসিদ্ধ। তর্ক ক'রতে পারে অসম্ভব, কিন্তু

সে-তর্কে লজিকের ভুল নেই। বিষয়টা নিয়ে ক্লাশেই অকস্মাৎ একদিন তর্কের অবতারণা ক'রে ব'সলো সে অধ্যাপকের সঙ্গে। ঘণ্টার কুলোলোনা ব'লে বাধা হ'য়ে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক সিদ্ধান্ত তাকে ছুটির পর দেখা ক'রতে ব'ললেন কমনরুমে।

কমনরুম অর্থে অধ্যাপকদের বিশ্রাম-কক্ষ। ছুটির পর বড়-একটা কেউ থাকেন না। বোকাবুঝির পক্ষে পরিবেশটা অনুকূল। আমাকেও বাধ্য হ'য়ে অনুগমন ক'রতে হ'লো অণিমার। মনে দ্বিধা ছিল—পাছে ওর সঙ্গে এত বেশী মাখামাখির সুযোগ নিয়ে পরোক্ষে কিছু ইঙ্গিৎ ক'রে বসে ছাত্রবন্ধুরা। কিন্তু অণিমা কিছুতেই ছাড়লোনা। ভরসা ছিল অধ্যাপক সিদ্ধান্তের দিক থেকে, আমাদের সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি তিনি, প্রয়োজন-বোধে অনেক সময়ই সহযোগিনী সহযোগে যেতে-আসতে হয় বৈকি তাঁর কাছে!—গিয়ে ব'সতেই আলোচনায় গদগদ হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি। উদাহরণ টানলেন রোমিও-জুলিয়েট থেকে, সোরাব-রুস্তম থেকে, শকুন্তলা থেকে। অপাঙ্গে একবার আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হ'লো—কেমন একটা সোনালী আভায় সারা দিগন্ত ছেয়ে গেছে। ভাব্‌লাম কথাগুলো নোট ক'রে নিলে পরীক্ষার হলে কাজে লাগ্‌বে। অণিমা ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনের কথাটাকে টেনে নিয়ে অধ্যাপককে অনুরোধ ক'রে ব'স্‌লো, 'এর ওপরে আপনি একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখুন স্যার। আমাদের আগামী সংখ্যা ম্যাগাজিনের ওটা একটা এ্যাসেট্ হবে।'

সমর্থন জানিয়ে ব'ললাম, 'শুধুই কি ম্যাগাজিনের, আমাদের এ্যান্সার পেপারেরও।'

কেমন একটা মুগ্ধ হাসিতে সহসা অধ্যাপক সিদ্ধান্তের গুম্ফভারাক্রান্ত মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।—'বটে!'

শব্দটা এমন সুরে তিনি উচ্চারণ ক'রলেন যে, অতঃপর কোনো একদিন এসে মনে করিয়ে দিলেই রচনার হাত দিতে পারেন তিনি।

পথে এসে ধন্যবাদ জানালাম অণিমাকে, ব'ললাম, 'খাঁটিজাতের সম্পাদকের মতই রচনা সম্বন্ধে সাজেস্‌শন দিয়ে এলে তুমি।'

মুচ্‌কি হেসে অণিমা ব'ল্‌লো, 'কেন, এখনও কি বেখাঁটি মনে ক'রো নাকি? তোমাদের যে ঘোড়ার-ডিমের মাসিকপত্র সব বেরোয় বাজারে, সেগুলো কি একটাও পড়বার মতো! সুযোগ পেলে ওর চাইতে আমি ভালো কাগজই বের ক'রতে পারি।'

ঠাট্টা ক'রে ব'ললাম, 'বেশতো, এবারে কোনো একজন ফাইনাল্‌সিয়ার দেখে সেই চেষ্টাই দেখ না!'

—'তবেই হ'য়েছে। ফাইনালে গিয়ে তবে ব্ল্যাক্ খাতা গার্ডের হাতে তুলে দিয়ে সলজ্জে হল থেকে বেরিয়ে আস্‌তে হবে।'—চোখের কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ক'রে ঠোঁট চেপে হাস্‌লো অণিমা।

ব'ল্‌লাম, 'কেন, যে রাঁধে, সে কি আর চুল বাঁধেনা? পাঁচ ছেলের মা হ'য়েও তো সংসারটাকে সুন্দর ক'রে গুছিয়ে রাখে মেয়েরা! আর—এ তো সামান্য একখানি কাগজ, তার জন্যে তোমার পড়াশুনোর এমন কিই বা ক্ষতি হবে, বলো?'

—'যথেষ্ট।' থেমে অণিমা ব'ল্‌লো, ফাইনালটা হ'য়ে যাক্, তারপর সে-চেষ্টা দেখ্‌বো।'

দেখ্‌লাম—কথাটাকে ঠাট্টা হিসেবে না ধ'রে সিরিয়াস্‌লিই গ্রহণ ক'রেছে অণিমা। এই নিয়ে তাই আর দ্বিতীয়বার কথা তুল্‌তে গেলাম না।

নির্জন পথ দিয়ে আমাদের চারখানি পা শুধু লঘুভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে। অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কাছ থেকে বেরোতেই, আমাদের দেরী হ'য়ে গ'ড়েছিল। তারপর মুহূর্তকালের এই পথ-যাত্রা। একটু বাদেই ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যেতে হবে দু'জনকে। অণিমা গিয়ে ব'স্‌বে তার অনার্স কোর্স নিয়ে নিজের টেব্‌লে, আমি গিয়ে খানিকক্ষণ হুড়োহুড়ি ক'রবো দিদির নতুন খোকাকে নিয়ে। দু'দিন হ'লো চক্রধরপুর থেকে জামাইবাবুকে নিয়ে দিদি এসেছে বেড়িয়ে যেতে।, কাল বাদে পরশুই আবার চ'লে যাবে। কোলের ছেলে মন্টু, বছর তিনেক

বয়েস হ'লো, দেখলেই 'মামাবাবু' ব'লে বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সৃষ্টিও হ'য়েছে তেমনি, হুড়োহুড়ি না ক'রলে মুখে হাসি ফোটেনা। বই ছেড়ে এ দু'দিন তাই নন্টুকে নিয়েই কাটছে। অনিমার বোধ করি এ ঝামেলা নেই, বোন আছে একটি, অপেক্ষাকৃত ছোট হ'লেও নিতান্তই কোলে-কাঁখে ক'রে ব'য়ে বেড়াবার মতো নয়। ঝামেলা পোহাবার তাই কারণও নেই কোনো। অনার্স নিয়ে তাই এমন ক'রে ভাবতে পারছে। যাচ্ছি ভাবনা বস্তু সিদ্ধিউদ্বৃত্তি তাদৃশি। ফাইনালে গিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস অনিমার অবধারিত।

এই কথা ভাবতে গিয়ে কখন্ যে নানা কথায় মনটা সহসা জড়িয়ে গেল, বুঝতে পারিনি। বিকেল গড়িয়ে গোধূলির ম্লান ছায়া একটু একটু ক'রে গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তাকিয়ে দেখলাম—চোখের সামনে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে আকাশে। চতুর্দশীর চাঁদ। চতুর্দশীর চাঁদ বলতে হবে, নইলে পাঁজির পৃষ্ঠা ছেড়ে এমন অকস্মাৎ চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে কেন! দেখলাম—অনাক্রান্ত কখন্ চাঁদ তার উৎসারিত জ্যোৎস্নায় অনিমার সুন্দর মুখখানিকে মেখে দিয়ে গেছে। তারার ঝিকিমিকি খেলছে তার চোখে। বোধ করি অনেকক্ষণ থেকেই কিছু-একটা ব'লবে-ব'লবে ক'রছিল। এবারে নিজেই স্বতোৎসারিত কণ্ঠে ব'লে উঠলাম: 'কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে

ভাগ্যিস্ অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে নিয়ে তুমি পড়েছিলে, নইলে এমন একটা ত্রি-যোগ কি আজ সম্ভব ছিল আজ!'

—'ত্রি-যোগই বটে।' অনিমা ব'লে উঠলো, 'এর পিছনেও বোধ করি কিছু সাইকোলজি থেকে থাকবে!'

—ব'লে উঠলাম, 'আশ্চর্য হবার কি আছে? মানুষ নিজেই জানেনা—তার মনোবিজ্ঞান কোথায় গিয়ে কোন্ আকাশে হঠাৎ কখন্ এমন একটা সুন্দর চাঁদকে ফুটিয়ে তোলে। প্রকৃতিকে অস্বীকার ক'রে আমরা তাই নিজের দিকে ঝুঁকে পড়ি। আসলে প্রকৃতির সঙ্গে যে আমাদের চিরকালের সংযোগ। মনোবিজ্ঞান তো এই প্রকৃতিকে নিয়েই।'

মুহূর্তকালের জন্য একবার মুখ তুলে তাকালো অনিমা আমার মুখের দিকে, তারপর ব'লে উঠলো, 'হাতের কাছে এমন সুন্দর এক্সপ্রেসন থাকতে মিথ্যেই তো এতটা সময় বাজে খরচায় কাটিয়ে এলাম অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কাছ থেকে! বড্ড হিপোক্রিট্ তুমি।'

কথা শুনে না হেসে পারলুম না, ব'লে উঠলাম, চাঁদের দোষ. চাঁদ নিজেই হিপোক্রিট্।'

শুনে অনিমাও হাসলো। বেশ লাগলো ওর টোল-খাওয়া হাসিমুখখানি। ব'লে উঠলো, 'চন্দ্রদ্বীপ তবে তোমার আধিগম্য, বলো?'

—'চন্দ্রদ্বীপ নয়, চন্দ্রানন।' হেসে ব'লে উঠলাম, 'এসনা দু'দণ্ড মাঠে কোথাও বসি! বেশ লাগছে সন্ধ্যাটাকে, বহুকাল এমন সন্ধ্যার সন্ধান পাইনি।'

—'অদ্ভুত মানুষ তুমি সুমন্ত।' ব'লে বিচিত্র একটা গ্রীবাভঙ্গি ক'রলো অনিমা। আমার প্রস্তাবে যে ওর আপত্তি নেই, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। খুশী হ'লাম; আরও বেশী খুশী হ'লাম—ওর মুখে আজ এই প্রথম আমার নামের উচ্চারণ লক্ষ্য ক'রে। বেশ লাগলো শুনতে, সেতারে ধ্বনি তুললে যেমন লাগে শুনতে, ঠিক তেমনি।

এমন সন্ধ্যা সত্যিই রোজ আসেনা। নির্মেঘ নীলাকাশে নববধূর ললাটে সিন্দুরের টিপের মতো উজ্জ্বল চাঁদ, তাকে ঘেরে ক'রে ছোট ছোট জোনাকীর মতো অসংখ্য তারা। বাতাসের মৃদু মৃদু হিল্লোলে প্রকৃতি প্রশান্ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো ছন্দিত একটা মুহূর্ত। সেই ছন্দে এসে ভাষা খুঁজে পেয়েছি আমরা, অধ্যাপক সিদ্ধান্তের সাইকোলজি-ক্লাসের একটি ছাত্র আর একটি ছাত্রী।

কাছাকাছিই মাঠের একটা ঘন তৃণাচ্ছাদিত যায়গা বেছে নিয়ে এসে ব'সলাম দু'জনে। সামনেই একটা অনাদৃত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় ফুল ধ'রেছে। তার আড়াল থেকে চাঁদটাকে আরও মনোরম লাগলো।

হঠাৎ অনিমা ব'লে বসলো, 'কিছু একটা আবৃত্তি করো না, শুনি!'

একটু বাদে অনুরোধটা আমিই অণিমাকে ক'রতাম, এবারে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'লুলাম, 'রাজি আছি—যদি তুমি গান শোনাও!'

—'আমি শোনাবো গান!' খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো অণিমা, বল্‌লো, 'এক্ষুণি তবে মাঠের কোথাও থেকে শেয়াল দৌড়ে আস্‌বে। গান আমি কবে শিখলাম যে শোনাবো? তার চাইতে তুমি আবৃত্তি করো, আমি শুনি।'

যে সুরে কথাটা ব'লুলো অণিমা, তা থেকে অন্ততঃ এটুকু বুঝ্‌লাম যে, গান জানলে অণিমা নিশ্চয়ই গাইত; কিন্তু জীবনে সে সুযোগ কোনোদিন আসেনি।

পাছে নিজের অক্ষমতায় মনটা ওর বড়-বেশী বিমর্ষ হ'য়ে ওঠে, দ্বিধা না করে নিজেই তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে ছোট্ট একটা আবৃত্তি ক'রে ব'লুলাম

—'দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে,—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক্ মহীয়সী—
তুমি আছ আমি আছি।'...

মৃদু হেসে অণিমা ব'ললো, 'সত্যি?'

বুঝলাম অণিমা কি ব'লতে চায়, তাই তার পাল্টা জবাবে বললাম, 'মিথ্যে কি!'

গলার স্বরকে আরও খানিকটা পরিষ্কার ক'রে আন্‌লো এবারে অণিমা: 'কথাটা তবে আবৃত্তিতেই পর্যবসিত হবে না, বলো? আমাদের এই আজিকে চিরন্তন রূপ দিয়ে জীবনকে সার্থক ক'রে তুল্‌বে তুমি,—বলো, এই চাঁদকে সাক্ষী ক'রে বলো তুমি!'

দেখ্‌লাম—এতটুকুও আর সঙ্কোচ নেই অণিমার মধ্যে। এম্‌নি একটা মুহূর্তের জন্যই যেন এতকাল অণিমাও অপেক্ষা ক'রে ছিল। শুনেছিলাম—মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, কিন্তু সে বুঝি অতীত যুগের ব্যর্থ একটা প্রবাদ মাত্র। অনুকূল পরিবেশ পেলে মেয়েরা যে কতখানি মুখর হ'তে পারে, অণিমা তার প্রমাণ। এমন প্রামাণ্য সূত্র নিয়ে আমি যে কোনোদিন থিসিস্ লিখ্‌লো না, একথা অণিমাও জানে। ব'লুলাম, 'আমাদের ভালবাসা আজ্‌কের সন্ধ্যায় এসে তার পরিণতি খুঁজে পেলো। কিন্তু ভালবাসার গোড়ায় কি সত্যিই কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল? চাঁদকে মিথ্যেই তাই সাক্ষী টান্‌ছো। আসলে হৃদয়ে যদি আমরা এক হ'য়ে থাকি, তবে জীবনেই বা এক হ'তে বাধা কি!'

—'বাধা?'—দেখ্‌লাম প্রশ্নসূচক কণ্ঠে শব্দটা উচ্চারণ ক'রে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিল অণিমা।

ব'লুলাম, 'চলো, উঠি। এরপর আরও বেশী রাত হ'লে বাড়ীতে গিয়ে আর জবাবদিহি করতে পারবে না।'

কথাটায় বোধ করি দুঃখই পেলো অণিমা, ব'লুলো, 'শেষ পর্যন্ত বাড়ীতে গিয়ে জবাবদিহির প্রশ্নটাই বড়ো হ'লো? জানোনা, মেয়েরা ছেলেদের মতো কাপুরুষ নয়, জবাবদিহি ক'রতে তারা জানে।'

হেসে ব'লুলাম, 'সত্যি ক'রে নিশ্চয়ই নয় তাতে যে অন্ততঃ বিপদ আছে, সেটুকু তো স্বীকার ক'রবেই।'

অণিমার কণ্ঠে এবারে খানিকটা দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো, বল্‌লো, 'কেন, বিপদটা কি, শুনি?'

ব'লুলাম, 'এতক্ষণ পর সেটা কি আমার মুখ থেকে না শুন্‌লেই নয়?'

এবারে কেন যেন আর কথা কাটতে পারলো না অণিমা। চাঁদটা ততক্ষণে কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপরে উঠে এসেছে। সেদিকে কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে মুহূর্তের জন্য কি যেন একবার ভাব্‌লো

পিছে তার হাতখানিকে সে একবার বাড়িয়ে দিল আমার দিকে নিজের হাতের মুঠোয় সেই সুন্দর নরম হাতখানিকে টেনে নিয়ে আমি নিজেও উঠে

কিন্তু সত্যিই কি উঠ্‌বার জন্ম মনটা প্রস্তুত ছিল? আমার হাতের মুঠোয় তখনও অণিমার কোমল আঙুলগুলো যেন কেবলই কথা ব'লে

আঙুলেরও যে ভাষা আছে, সে ভাষা যে মানুষের মুখের ভাষাকেও হার মানায়, এতদিন তা কেবল ক'বেই প'ড়েছিলাম, জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি আজ এই প্রথম। ভাব্‌লাম রবীন্দ্রনাথের যেমন ক'রে অনিত্য বে ব'লেছে লাবণ্যকে: যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ, সেওয়া তা ভেবে শেষ ক'রতে পারিনে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা ক'য়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইসারা। ভালবাসার যত কিছু আ যত কিছু সেবা, হৃদয়ের যত নব যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে!—কিন্তু ব'লতে পারলুম না মনে হ'লো—ধার করা কথা দিয়ে অণিমার হাতখানিকে পরোক্ষে অপমানই করা হবে। অণিমাও কিছু-একটা সূত্র পেয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত শেলের কবিতার সাইকোলজিকাল এ্যাপ্রোচ্ বা মনোবিজ্ঞানের আবেদন নিয়ে হঠাৎ-কিছু তর্কের অবতারণা ক'রে ব'স্‌বে! অন্ততঃ এই মুহূর্তের জন্ম সেটা অসহ্য। এখানে তর্ক নয়, বিজ্ঞান নয়, হৃদয় দিয়ে শুধু হৃদয়ের উপলব্ধি। জ্যোৎস্নাধবল সন্ধ্যার এমন চাঁদের আবির্ভাব জীবনে ক'দিন ঘটে!

বাড়ীর পথ ধ'রতে গিয়ে সারা রাস্তায় একটা কথাও আর নতুন ক'রে অণিমাকে ব'লতে পারলুম না। চাঁদের উৎসারিত জ্যোৎস্নাধারা যেন একমুহূর্তে আমাদের সমস্ত কথা কেড়ে নিয়েছে। ভাব্‌লাম—অণিমা হয়ত কিছু বল্‌বে, কিন্তু মিথ্যা। আজ্‌কের দিনের জন্ম সমস্ত কথা হয়ত আমরা শেষ করেই উঠেছিলাম—পথে আস্‌তে গিয়ে কথার পুঁজি তাই ফুরিয়ে গেছে। বিদায় নেবার সময় মুহূর্তের জন্ম একবার মুখোমুখি দাঁড়ালাম দু'জনে।—'তা হ'লে অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে তাগিদ দিয়ে সময় মতো লেখাটা আদায় ক'রে নিও।'

—'নেবো।' ব'লে অণিমা তাদের বাড়ীর পথে পা বাড়ালো।

কিন্তু পা দু'খানি আমার যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই চ'লছিল না। অণিমা চ'লে যাবার পর কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো—ঠিক ও কথাটা না ব'লে অন্য কিছু ব'লেও হয়ত বিদায় দিতে পারতাম অণিমাকে।···

(ক্রমশঃ)

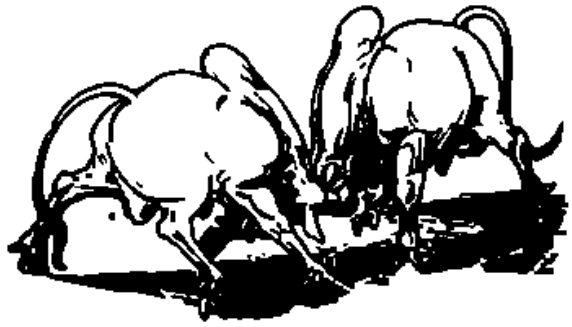

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র-কু-সে]

সমাজবন্ধনের একটি বড় অনুশাসন হ'চ্ছে মানুষের মানোন্নয়ন। মানুষ কোথাও নিঃসঙ্গভাবে জীবন যাপন ক'রতে অভ্যস্ত নয়। তার একটি সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন—যে পরিবেশের মধ্যে তার চারিত্রিক ও আর্থিক মান উন্নত হ'তে পারে। এই পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার সূত্রেই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ বিজ্ঞানের গোড়ার কথাই হ'চ্ছে এই। মানুষের মননের ক্ষেত্র যেখানে সম্প্রসারিত হ'লো না, চারিত্রিক বিকাশের দ্বারা মানুষ যেখানে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও প্রাণবান হ'য়ে তার পারিপার্শ্বিককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারলো না, সেখানে বুঝতে হবে—নীতির দিক থেকে সমাজ-কর্ম বলে কিছু নেই। এমন সমাজ অরণ্যেই সম্ভব, লোকালয়ে নয়। আজকের সমাজের সঙ্গে বর্বর যুগকে তুলনা ক'রলে ভীতির উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ ধাপে ধাপে উন্নত হয়েছে, ধাপে ধাপে সে পশু-স্বভাব থেকে মনুষ্যত্বভাবযুক্ত হ'য়ে বিজ্ঞান রচনা ক'রেছে, আর্ট সৃষ্টি ক'রেছে, সুন্দরকে বহৎ শিল্পাশ্রয়ী ক'রে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ক'রেছে। এইভাবেই ক্রমে সভ্যতার সৃষ্টি হ'য়েছে, সংস্কৃতির প্রসার ঘ'টেছে। জনসংখ্যা যত বেড়েছে, সমাজ তত বিস্তৃত হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনও উন্নত হ'য়েছে। কিন্তু এ উন্নতির কোনো মাপকাঠি নেই। নেই ব'লেই একযুগের সভ্যতা আর একযুগে মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। ট্রয় সাম্রাজ্য ভেঙেছে, গ্রীক সভ্যতা বিলুপ্ত হ'য়েছে, খৃষ্টানধর্মের মধ্য দিয়ে সভ্যতার আলো আবার নতুন ভাবে ছড়িয়ে প'ড়েছে। এইভাবে চ'লতে চ'লতে আমাদের বর্তমান সমাজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাও উন্নতির শেষ সীমা নয়, কিন্তু শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শনের পূর্ণ বিকাশের যুগ, সন্দেহ নেই।

মানুষের মননধর্মের প্রথম স্ফুরণ ঘ'টেছিল ভারতবর্ষে। ভারতের একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র। পৃথিবীর সর্বত্র যখন ভোগবাদে ছেয়ে গেছে, ভারতবর্ষ তখন ত্যাগের মহনীয়তা প্রচার ক'রে দেখিয়েছে—ভোগে শান্তি নেই, ভোগের মধ্যেই দুর্ভোগ এবং মানুষের দুর্ভাগ্য। ভোগবাদী পৃথিবীর মধ্যে সেই দুর্ভোগই দেখা দিল। চারদিকে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, হাঙ্গামা, ক্ষমতার লড়াই, গুণ্ডাবৃত্তি, নারীর লাঞ্ছনা, শিশুহত্যা, ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্য অভিযান। অনেকে ভারতের ত্যাগধর্মকে নিষ্ক্রিয় ধর্ম ব'লে অভিসম্পাত ক'রলো; কিন্তু এক-চোখো মানুষের সে-অভিসম্পাতের মূল্য স্বীকৃত হ'লো না। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের উর্দ্ধে যে একটি মহাজীবন আছে, তাকে ভারতবর্ষ স্বীকার ক'রে নিয়েই মানসিক উর্বরতা দ্বারা তার সমাজ ও জাতীয় জীবনকে চিরকাল উন্নত ক'রতে চেয়েছে। সেখানে সংস্কারের ঘোলা জল কখনও সংস্কৃতির বেগবতী ধারাকে রুদ্ধ ক'রতে পারেনি। ভারতবর্ষ যদি যোদ্ধা জাতি হ'তো, তবে অনায়াসে সে তার এই প্রাণ-ধর্মকে সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষ নিজেকে যেমন চিরকাল সকলের সঙ্গে মিলিয়েছে, তেমনি সকলকে নিজের ঘরে এনে আসন দিয়েছে। তার এই সমন্বয়-ধর্মী মানসিকতার জন্যই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষকে দোহন ক'রবার সুযোগ নিয়েছে। তুর্কি, হার্মাদ, পর্তুগীজ, মারাঠা, পাঠান, মোগল ও সর্বশেষে ইংরেজ এসেছে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন ক'রতে।

কিন্তু লুণ্ঠনই যদি লুণ্ঠনের শেষ হ'তো ক্ষতি ছিল না, তার উর্বরা ভারতভূমির অশেষ সম্পদ তাতে নিঃশেষ হ'তো না। কিন্তু ইংরেজ চতুর জাতি, সে শুধু ভারতবর্ষকে বহির্মুখী লুণ্ঠনের দ্বারাই ক্ষান্ত হ'লো না ভারতবর্ষের স্বভাবসুন্দর আত্মাকে হত্যা ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইল। প্রগতিযানার দিক থেকে, শিক্ষার দিক থেকে এদেশকে সে যতটুকু দিল, তা একান্তাংশ। ফলে ভারতবর্ষের নিজস্ব সামাজিক রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হ'তে সুরু ক'রে এলো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হ'লো, বিকল্প রূপের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ তার নিজের রূপ হারিয়ে ফেললো। সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনও পর্যুদস্ত, হতমান ও বিকলাঙ্গ হ'তে সুরু হ'লো। ভারতবর্ষে দু'শো বছরের এই বলবদ্ধি ইংরেজিয়ানার পর ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে যেতে হ'লো সন্দেহ নেই, কিন্তু দুষ্টব্যাধির যে বিষাক্ত বীজ তারা এদেশে রোপণ করে গেল, তা থেকে গত সাত বছরের স্বাধীনতার পরেও এদেশীয় সমাজ রক্ষা পেলো না। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আজ উন্নতির নব অরুণোদয় দেখা দিলেও সমাজের নিচুতলায় যে পাপ ও প্রাণান্তকর কলুষতা অবিরাম গতিতে ব'য়ে চ'লেছে, তা যদি বর্ষার স্রোতের জল হ'তো, তবে ভয় ছিল না, জোয়ারের মুখে ভেসে যেতো, কিন্তু তা বন্ধভূমির পঙ্ক ব'লেই আজ এদেশের সমাজ তথা জাতীয় জীবনে সমস্যা দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রতিক কালের গুণ্ডাবৃত্তির সম্প্রসার তার মধ্যে একটি। গুণ্ডাবৃত্তি সব দেশেই কিছু-না-কিছু আছে সন্দেহ নেই। কেউ একে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, কেউ বা নিজেদের রাষ্ট্রীয় দলের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সামাজিক আইনে দু'টোই অপরাধ। দুটোর জন্যই বিভিন্ন দেশের সরকার দমন-নীতি অবলম্বন ক'রে থাকেন। এদেশেও সম্প্রতি সরকারী পক্ষ থেকে সেই গুণ্ডা-দমননীতি অবলম্বিত হ'তে সুরু হ'য়েছে। গত কিছুকালের মধ্যে সংবাদ-পত্রে এই নিয়ে তীব্র আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হ'য়েছে। এদেশে গুণ্ডাশ্রেণী যে সাম্প্রতিক কালের কোনো সংগঠিত শক্তি, এমন নয়। বিশেষভাবে ক'লকাতার মতো নাগরিক পরিবেশে এই গুণ্ডাবৃত্তি দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে। একসময় তদানীন্তন-কালীন সরকারী অধিকারিক টেগার্ট সাহেব গুণ্ডাদমনে সক্রিয় শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাতে যে ফল হয়নি, এমন নয়; দীর্ঘকাল এদেশের পল্লী ও নাগরিক জীবন গুণ্ডার অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারী অযোগ্যতার ফলেই হোক্ বা যে-কারণেই হোক্, গুণ্ডাশ্রেণীর সংসার আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ফলে অবস্থাটা এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই গুণ্ডাশ্রেণী দিন-দুপুরে বড় বড় লুট-তরাজ ও মানুষের প্রাণহানি ক'রতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ ক'রলো না। সমাজ-জীবন ভীতত্রস্ত হ'য়ে প'ড়লো। এমনও দেখা গেল—পুলিশের সঙ্গে আর্থিক সংযোগ রক্ষা ক'রে এই গুণ্ডাশ্রেণী আরও দুর্বিনীত হ'য়ে উঠ্‌লো। পুলিশ তার পাওনা নিয়েই নিশ্চিন্ত, এদিক সমাজ-জীবন কোন্ অতলে তলিয়ে যেতে ব'সলো সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই।

এদেশে বৃটিশ আমল থেকে এই অবস্থাই প্রায় চলে আসছে। তার কারণ হ'লো এই যে, এদেশকে যতখানি সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ক'রে গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, তা না ক'রে তাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ এদেশের মানুষকে নানা দিকে নানা অবস্থার মধ্যে পিষে রেখেছিল। ফলে সমাজের একটি বৃহত্তর শ্রেণী, অনেকক্ষেত্রে যাদের জন্ম নানা রহস্যে আবৃত, অসংস্কৃত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগত অর্থনৈতিক বনিয়াদকে পাকা ক'রে তুলবার জন্য গ্রহণ ক'রলো এই বৃত্তি। এক একটি দলে এক একটি গুণ্ডাদের অধীনে অসংখ্য গুণ্ডা গড়ে উঠলো। এ ছাড়াও বহু একক গুণ্ডা আছে। এরা বিভিন্ন বাড়ীর রোয়াকে বসে, কালভার্টে

ক'রে নিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে মানুষের জীবনকে বিপন্ন ক'রে তোলে। মানুষের জীবন বিপন্ন সামাজিক বিপন্নতা। এদেশে এই বিপন্ন সমাজ-চিত্রের অভাব নেই। বিগত কিছুকালের মধ্যে এক কলকাতা সহরেই গুণ্ডামির যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হ'য়েছে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। নগরের শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও এই ভয়াবহ বিপদ থেকে মানুষ উদ্ধার পায়নি। অভাবের জন্যই যে এই বৃত্তির প্রসার ঘটেছে, তা নয়; এটা গুণ্ডাশ্রেণীর পেশা। বিষয়টিকে সম্প্রতি সরকারের উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষ এবং পৌর-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলী যৌথভাবে গ্রহণ ক'রে গুণ্ডা দমন কাজে শক্তি নিয়োগ ক'রেছেন। এর ফলে হয়ত সাময়িকভাবে গুণ্ডার উপদ্রব অবদমিত হতে পারে—যেমন হ'য়েছিল টেগার্ট সাহেবের আমলে, কিন্তু যতক্ষণ না এই গুণ্ডাশ্রেণীর পুরোপুরি উচ্ছেদ হ'চ্ছে ততক্ষণ সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতে আমাদের জাতীয় জীবনের শান্ত শোভন রূপ ফিরে আসছে না। এই পেশাধারী গুণ্ডা ছাড়াও ন-সাধুবেশী গুণ্ডার অভাব নেই। এ সম্পর্কে সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কটকে এক সাধু-সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুলিশের স ঘর্ষ খানাতল্লাস ক'রে দেখা যায়—সাধুদের ছদ্মবেশের অন্তরালে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও নারী রয়েছে। এই সাধু-সম্প্রদায় বেশ যে নিতান্তই মুখোস মাত্র, জনসাধারণের কাছে তা পরিষ্কার প্রকাশ হ'য়ে পড়তে দেরী হ'লোনা। ভারতীয় সাধুর অভাব নেই আমাদের সমাজে। এ ছাড়াও ছোট ছোট দলবদ্ধ গুণ্ডা রয়েছে, যাদের হাতে নগণ্য ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অতর্কিত মুহূর্তে মানুষের জীবন বিপন্ন হ'য়ে ওঠে।

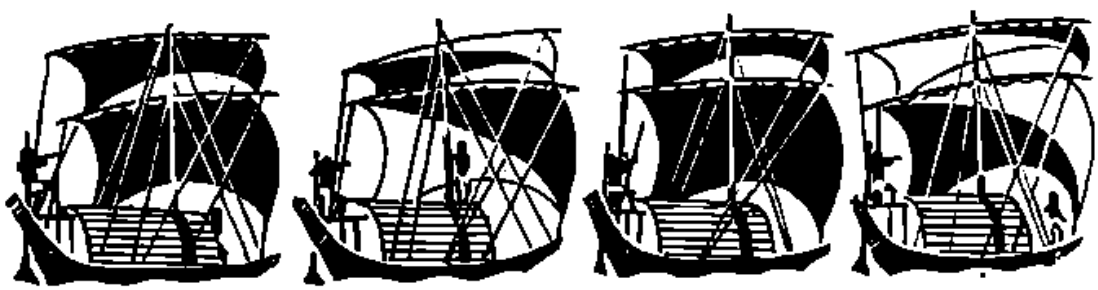

নৈতিক উন্নয়ন

'কে. জি.

স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু শিকড় যেখানে শিথিল—ভিত্তি যেখানে দুর্বল—উদ্ভিদ সেখানে তার সঞ্জীবনী শক্তিকে আহরণ করতে পারে না—আর তারই ফলে অকালে শুকিয়ে যায়। তাই আজ ভারতের রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক—সাংস্কৃতিক যে কোন উন্নয়ন-পরিকল্পনাকেই আমরা রূপ দিতে যাবো তা অর্থহীন—পঙ্গু হ'য়ে দাঁড়াবে যদি জাতির নৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার না দেওয়া হয়।

আজ দেশের যে দিকেই তাকান যায়—সর্বত্রই একটা নৈতিক অবনতির লক্ষণ দেখা যায়। রাজনীতি—ব্যবসায়—চিকিৎসা,—এমন কি শিক্ষাক্ষেত্রেও দুর্নীতির একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার করাল ছায়া জাতির উন্নতির পথকে অন্ধকার করে তুলেছে। অক্টোপাসের কবল থেকে জাতিকে যদি না বাঁচান যায় তবে স্বাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা—সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন পরিকল্পনা—সব কিছুর ভেতরেই ঘুণ ধ'রে যাবে।

স্বাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা—তার ছাত্র-সমাজ। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার ভারতের যুব-সম্প্রদায়, সে সমাজেরও নৈতিক মান আজ এমন এক নীচু স্তরে নেমে এসেছে—যেখান থেকে তাকে কঠিন হস্তে প্রতিরোধ না করলে—জাতি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যুব সমাজের ভেতরে আজ তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এর প্রতিরোধ করতে কঠোর শাসনের প্রয়োজন কিন্তু শুধু শাসন-দণ্ডের আঘাতেই তাকে আজ নিযুক্ত করা যাবেনা। তার জন্যে প্রয়োজন আজ মানসিক চেতনার। সমাজের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে আজ এমন ক'রে তুলতে হ'বে যে,—দেশের প্রত্যেকটি যুবক তার নৈতিক কর্তব্যকে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে। তার সামাজিক আবহাওয়া এমন হওয়া প্রয়োজন যে নৈতিক চেতনা যেন প্রত্যেকটি যুব-শক্তির ভেতর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

তার জন্যে প্রয়োজন পারিপার্শ্বিকতার। সংঘবদ্ধ-ভাবে এই দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করবার জন্যে প্রত্যেক পল্লীতে "দুর্নীতি-নিবারণী সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সে সমিতির গঠন-প্রণালীকে—তার উদ্দেশ্যকে—তার কর্মধারাকে স্থান দিতে হ'বে রাজনৈতিক সংঘাতের ঊর্ধ্বে। জাতি বর্ণ-পদ-নির্বিশেষে আজ এগিয়ে আসতে হবে দেশকে এই বিরাট ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। অতি সন্তর্পণে—সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা নিয়ে দৃঢ়পদে অগ্রসর হ'তে হবে এ পথে—মনে রাখতে হ'বে যেন রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে এর মুখ্য উদ্দেশ্য তলিয়ে না যায়। সে সমিতির সভ্য থাকবেন পল্লীর গণ্যমান্য—বিচক্ষণ সৎপ্রকৃতির আদর্শ স্থানীয় অভিভাবক—থাকবেন শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—থাকবেন স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের (কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ইত্যাদির) প্রতিনিধি—এবং সম্ভব হ'লে পুলিস কর্তৃপক্ষ। তাঁরা একযোগে—কঠোর হস্তে সমাজের এ উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উৎকর্ষের দৃষ্টান্তকে উপযুক্ত মর্যাদাও দেবেন, তাঁরা সমিতির পাক্ষিক—সম্ভব হলে সাপ্তাহিক অধিবেশনে মিলিত হয়ে কার্যক্রম নির্ধারণ করবেন। তাঁদের কার্যসূচী এবং কর্মধারার সংক্ষিপ্তসার—প্রয়োজন হলে সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ করবেন।

বর্তমানে খাদ্য বিভাগের কাজ অনেক লঘু হয়েছে। খাদ্য-দপ্তরের সঙ্গে একটি দুর্নীতি-নিবারণ—দপ্তরের সৃষ্টি করে—দুর্নীতি-নিবারণী সমিতিগুলির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ভার দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য লক্ষ্য

রাখ্‌তে হবে যেন সরষের ভেতরে ভূত লুকিয়ে না থাকে।

শুধু পল্লী-সমিতি বা মন্ত্রীসভাই নয়। প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেও আজ এগিয়ে আস্‌তে হবে এই দুর্নীতি-দমনে—এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে শিক্ষা-পর্ষৎকে—বিশ্ববিদ্যালয়কে। প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্দেশ থাকবে 'নীতি-শাস্ত্র'কে একটি আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় রূপে গণ্য করবার—এবং সপ্তাহে অন্তত একটি ঘণ্টা 'নীতি-শাস্ত্রের' জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখ্‌বার। স্কুল কলেজের ম্যাগাজিনগুলিতে থাকবে নৈতিক উন্নয়নমূলক প্রবন্ধ এবং দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনা। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে উত্তম এবং তার ব্যয়ভার বহন করবেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এই দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে দেখ্‌বেন, যে বেকার-সমস্যাই এই উচ্ছৃঙ্খলতার এক গৌণ কারণ কি-না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়—শুধু বেকার সমস্যাকে দোষ দিলে ভুল হবে। ঠিক সেইরূপ শুধু "অশিক্ষা"কেও এর জন্যে দায়ী করা ঠিক হবেনা। কারণ প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদের ভেতরেও এই সর্বনাশা সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সুরু হয়েছে। এর প্রারম্ভিক বীজ বপন করা হ'য়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ধকারময় দিনগুলিতে। একদিকে দেশের নেতৃবৃন্দ কারাগারে—অন্যদিকে সরকার যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। মাঝখানে জনতার একাংশ মুদ্রা-স্ফীতির প্রবল উন্মাদনায় দিশেহারা—অন্য অংশ পঞ্চাশের মন্বন্তরে মুহ্যমান। এরই অনিবার্য পরিণতি সামাজিক দুর্নীতি। সেই দুর্নীতিরই এক পঙ্কিল ধারা তৎকালীন যুবসমাজে বিচার-বুদ্ধিহীন সংগ্রাম লিপ্সার এক প্রবল মত্ততা এনে দিয়েছে।

১৯৪৬-এর দাঙ্গা সেই মত্ততারই বীভৎস রূপ। আর আজ যুব-সমাজের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা তার বহিঃ-প্রকাশের পথ না পেয়ে নিজেদেরই সমাজ-জীবনের শিরায় শিরায় সংক্রামিত হয়ে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু ক'রে তুলেছে। তাই এ মহামারীর হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন 'গতিহীন'—নিরুদ্ধ মনকে 'গতিশীল' করে তোলবার। ছাত্রসমাজের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহাকে জাগ্রত ক'রে—তার পুঞ্জীভূত—অপরিশ্রুত ধারাকে পথ দেখিয়ে দেবার।

কিন্তু পথ কে দেখাবে? একনায়কত্বের দিন প্রায়তো ফুরিয়ে এসেছে। তাই এর ভার গ্রহণ করতে হবে সংবাদপত্রকে—গ্রহণ করতে হবে চলচ্চিত্রকেও। প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের ব্রত হবে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন। প্রত্যেকটি দৈনিকে—সাপ্তাহিকে—মাসিকে তার জন্যে একটি পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। তাতে প্রকাশিত হবে নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ, প্রকাশিত হবে পাঠকদের মতামত। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে নৈতিক অবনতির তিরস্কার এবং নৈতিক উন্নতির বাস্তব পুরস্কারের দৃষ্টান্ত। সে দৃষ্টান্ত প্রকাশ করতে গিয়ে সংবাদপত্রকে হ'তে হবে সাহসী—হতে হবে পক্ষপাতশূন্য—থাকতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে। সে বিচারের কাঠগড়ায় যদি দেশের কোন নেতৃস্থানীয় লোকও এসে দাঁড়ান, তবে তাঁকেও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবেনা।

চলচ্চিত্রের দায়িত্বও সংবাদপত্রের চাইতে কম নয়। আমাদের চলচ্চিত্র-সমাজ আজ সৃষ্টি করে চলেছে—"পাশের বাড়ী" "লেডিস সীট" হিন্দী "সংগ্রাম" "নাও"—যার ন্যাকামি, জোর-জোচ্চোরি এবং নগ্নতা যুব-সমাজের চোখের সামনে এমন এক-একটি মেরুদণ্ডহীন নায়কের চিত্র তুলে ধরেছে, এমন একটি যৌন-আবেদনের অবতারণা করেছে—যা' আমাদের ছাত্রসমাজ তথা সমগ্র যুব-সমাজের রুচি এবং নীতির ভেতরে এক পঙ্কিল ভাবধারার সৃষ্টি করে চলেছে, যার পরিণাম

সমাজের ভিত্তিকে শিথিল করে দেবে। তাই দুর্নীতি নিবারণ সমিতির মাধ্যমে পল্লীতে পল্লীতে জনকল্যাণকর সংস্থা (লাইব্রেরী, সেবা-সমিতি, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি) স্থাপন করতে হবে। সম্ভব ছাদে জমীদের প্রয়োজনীয় অংশকে বেতনভুক্ত ক'রে নিতে হবে—এবং যে গুপের প্রদর্শক হিসেবে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সর্বপ্রথমে।

চিত্র আজ সরকারী
কলকাতায় ছাপাইয়ের দুইজন
পরিবার একসঙ্গে বি
জন-সংখ্যের কোনো
ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক
এর ক্রমবর্ধমান
দুর্নীতি

কিন্তু শুধু সরকারী সাহায্যের ভরসায় বসে থাকলেই চলবে না। সরকার পথ দেখাবেন আর জনগণ সেই পথে সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে এই "ভণ্ডা-শাহী" সমাজকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করবেন। তবেই ফিরে আসবে শান্তি—তবেই সার্থক হবে উঠবে পঞ্চ-বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা।

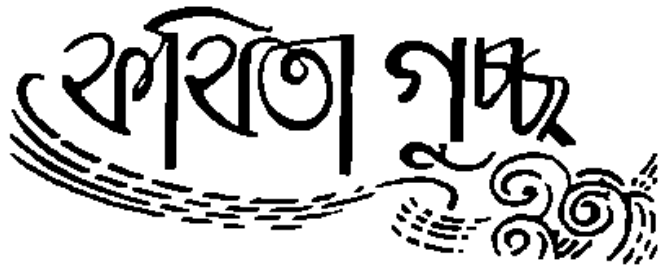

ঝড়ের পর

শ্রীশম্ভু নাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী অনেক বড়ো, তবু তা'তে খুঁটে খুটে গড়
ঘর বেঁধে,—ছোটে বুকে আশা নিয়ে বিস্তর বিস্তর—
ক্লান্ত দু'ডানাকে আমি দিয়েছি তো অনেক বিশ্রাম
তোমার বাহুর মাঝে বহু ব্যর্থ আকাংক্ষা পেলাম

সেদিন প্রলয়ালাপে। ঝড় এলো কবে একদিন,
পাখার পালকে দূর গতি দিলো উদ্দেশ্য-বিহীন,—
আলিংগন ছিন্ন হোল—ছিটকে গেলাম বহুদূর;
তুমিও হারালে কোথা, ফেটে গেল বিশ্রম্ভের সুর

অনেক নগর ঘুরে সেই থেকে খুঁজেছি তোমায়।
দেখেছি, নোতুন চর মাথা তোলে নদী-মোহনায়;
শুনেছি, কান্নার সুরে বনানীতে বেজেছে মর্মর
—"তুমি কোথা, তুমি কোথা।" নিরালোয় নিশুতি প্রহর
কেটে গেছে কতো তার রাখিনি হিসাব। কথা কয়
দেখি শুধু রাত শেষে প্রতীক্ষায় মৌন কিশলয়॥

আলোলেখা

শ্রীমহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তখনি রৌদ্রের উষ্ণ আবাহন: সূর্যকরোজ্জ্বল
আশ্চর্য বৈশাখী দ্যুতি পরিব্যাপ্ত তখনি, তখনো—
যখন বৃষ্টির তারে কী কম্পন, সর্বাঙ্গ শীতল
ধরো ধরো: আদিনার আঁতোয়াসে প্রহরী লণ্ঠনো
নিবে আসে, শঙ্কিত বিশ্রান্ত চষ্ট অন্ধকারে, শীতে
হৃদয় বিবর্ণ হয়, অবশেষে যখন আকাশে
মেঘের কপাট ভাঙে, বিদ্যুতের আলো নেমে আসে—
তখনি রাত্রির কণ্ঠ ভ'রে ওঠে রৌদ্রের সঙ্গীতে।

বৃষ্টি-বিন্দু গুনেগুনে হয়তো স্বপ্ন
ক্রমশ গলেই যাবে ভিজে
ক্ষমা হবে, একদিন স্মৃতিতেও
তাও হ'ক! বিদ্যুতের মতো জ্বালে জ্বালে রৌদ্রনাচ
এনে দেবে, জানি আমি, একেকটি বাইশে শ্রাবণ
নিয়ে যাবে যেইখানে বৈশাখের পঁচিশের মন!

জীবন-সন্ধান

শ্রীমিথিল ঘোষ

প্রাত্যহিক এ জীবনে লক্ষ্য করি :—
আমার জানলার আকাশ
বড় হয় নাকো। সেই পথে আসে নাকো
নূতন বাতাস।...
এক টুকরো মরুভূমিসম
ব্যথাহত আমার হৃদয়;
তাতে—স্বপ্ন ক্যারাভ্যান পার হয়ে যায়
কষ্টে, অনায়াসে নয়।
তিন তার শুষ্টায় অঙ্গন,
গোধূলির শেষ বেলা তাই
কেরাণীর কর্মক্লান্ত মনের মতন—
নেশা নাই, নাই রঙ নাই।
মজা নদী পানাঢাকা
মন্থরেগ স্রোতসম
এ জীবন বয়ে চলে। তবু
আশা জাগে কত!
পূর্ণিমার চাঁদ যদি ভাবে,
ক্ষয় নাই মম,
পৃথিবী কি মেনে নেবে
জ্ঞানহীনসম?
প্রভাতে আলোর মাঝে
হারায় নক্ষত্রদল
রাত্রি শেষে। শান্তি শেষে
অন্তরের আশা হয় হারা।
তার পর শুরু হয়
জীবনের মানে খোঁজ করা:
কস্তুরী মৃগের মত
অনর্থক ছুটে ছুটে মরা।

মূল্যবোধ

শ্রীবিবেককুমার রায়

এ তো টাকা কড়ি নয়। দুপুরের
গিন্নির মতোই স্বর্ণরোদ
ছড়িয়ে প'ড়েছে। পেয়েছো কি
জীবনের কিছু মূল্যবোধ।
ফেলিংএ ফোটে অবহেলায়
বেগুনী ফুলের ছোট লতা;
চাঁপাশাখা দুলে হায় গাঁথে
গান গায় বলে কত কথা।
তোমার গলার নেকলেসের
মতো কচি কচি পাতাগুলো
ঝিকিমিকি করে। বাঁশী বাজে।
ফুল ফোটে আর ওড়ে ধুলো।
বাইরে রোদ গিন্নির মতন—
পেলে কিছু তার মূল্যবোধ?
টাকাকড়ি নয়। গৃহকোণে
ব'সে ব'সে খোঁজো কি প্রবোধ।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

জুলাই—ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানী নীতি

কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ১৯৫৪ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের আমদানী নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই নীতি প্রণয়নের সময় আমদানী-উপদেষ্টা পরিষদের ও শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন শাখার সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে লৌহ ও ইস্পাত, তালভ্, তামা, সিসা, এস্‌বেসটস্ প্রভৃতি এখানে উৎপাদিত ৩৪টি দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে এবং কতিপয় ঔষধপত্র, বস্ত্রপাতি, সুতা, বুট ও জুতা প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয় না এইরূপ ৬০টি দ্রব্যের আমদানীর ব্যবস্থা সহজসাধ্য করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লাইসেন্স মঞ্জুরের পদ্ধতি সহজসাধ্য করা হইয়াছে এবং কতকগুলি পণ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত লাইসেন্স মঞ্জুরের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আমদানী নীতিতে স্বয় আমদানীকারীদিগকে পূর্বেকার তুলনায় কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

এই আমদানী নীতির ফলে একদিকে দেশীয় উৎপাদকদিগকে যেরূপ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আমদানী দ্বারা বাণিজ্যিক সূত্র উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লাইসেন্স ব্যবস্থার সংশোধনের ফলে অধিকসংখ্যক লোক আমদানী বাণিজ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে। এই বৎসরের প্রথম চারি মাসে গড়ে ৩৮কোটি টাকার পণ্য আমদানী হয় এবং চলতি বর্ষার্ধে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আরও সরকারের 'রপ্তানী বৃদ্ধি পরিকল্পনার' সহিত নূতন আমদানী নীতিবিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম খাল—ভাক্রা-নাঙ্গাল

গত ৮ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু ভাক্রা-নাঙ্গাল খালের উদ্বোধন করেন। বহুপূর্বে বৃটিশ আমলে এই পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হইলেও, কার্যতঃ স্বাধীনতা অর্জনের পর ইহাতে মনোযোগ দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় দুইটি বাঁধ ও দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। প্রথম বাঁধ ও সেখান হইতে ৪০ মাইল দীর্ঘ নাঙ্গাল খালটি বর্তমানে সম্পূর্ণ হইয়াছে। দুর্ভেদ্য অরণ্য ও বন্ধুর পর্বতের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এই খাল কাটিয়া ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারগণ বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই নাঙ্গাল খাল শতদ্রু নদীর জলধারাকে দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া রূপারের নিকট ভাক্রার মুখ্য খালটিতে লইয়া যাইবে। ১০৮ মাইল দীর্ঘ মূল ভাক্রা খাল, ৯০ মাইল দীর্ঘ ইহার মূল শাখাটিও নাঙ্গাল হাইডেল প্রণালী মিলিত-ভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম সর্বার্থসাধক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় মোট ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার উপকারিতা ব্যাপ্ত হইবে পাঞ্জাব, পেপসু ও রাজস্থানের মোট ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার

এবং তমলুকে এবং সিন্ধিতে এমোনিয়া হইতে ১৩২ কোটি টাকা মূল্যের পটাশ উৎপন্ন হইবে। তন্মধ্যে প্রতি বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ১১৩ লক্ষ টন, ইক্ষু ৫ লক্ষ তুলা ৮ লক্ষ গাঁইট, তৈলবীজ ১ লক্ষ টন ও পশুখাদ্য ১৫ লক্ষ টন। এই পরিকল্পনায় ৭ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং উহাদ্বারা ১২৮টি সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। নয়াদিল্লী উপনগরে ২৫ লক্ষ লোকের পুনর্বাসন হইবে। তাছাড়া

পরিকল্পনার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। ১৯৫৮ সালে এই পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইবে। এই পরিকল্পনার ফলে উষর মরুভূমি অঞ্চল শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়া ভারতীয় জীবনে যে অভাবনীয় সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

চর্করা শিল্পের সম্প্রসারণ

দেশে নূতন কল স্থাপন করিয়া ও পুরাতন কল-গুলির সম্প্রসারণ করিয়া চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রশ্ন ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ একটি কারিগরী সংস্থা বিবেচনা করিতেছেন।

পর্যন্ত প্রায় ৪০খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে এবং আরও দরখাস্ত আসিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার বোম্বাই রাজ্যকে চিনির কল খুলিবার জন্য ১২০ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে একটি চিনির গবেষণাগার স্থাপনের প্রশ্নও সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ভারতবর্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও, এদেশে চিনির উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ইংলণ্ডে বাধা পিছু ১১২ পাউণ্ড চিনি খরচ হইয়া থাকে, নিউজিল্যাণ্ডে ১১৫ পাউণ্ড এবং ডেনমার্কে হয় ১২৮ পাউণ্ড, আর ভারতবর্ষে মাত্র ৩০ পাউণ্ড—ইহার মধ্যে গুড়ই ২৪ পাউণ্ড। আমাদের দেশে উৎপন্ন ইক্ষুতে চিনির ভাগ খুব কম, তাছা ছাড়া চিনির উৎপাদন এখনও পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইহার ফলে চিনির উৎপাদন খরচ ও মূল্য খুব বেশী পড়িয়া যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য চাষীকে সার প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা অধিক চিনির অংশযুক্ত ইক্ষু উৎপাদনে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এবং সে যাহাতে তাহার শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় তাহাও লক্ষ্য করা উচিত।—এ সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াই সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন যে, "এতদিন পর্যন্ত ইক্ষুর মূল্য অনুযায়ী চিনির মূল্য নির্ধারিত হইত, কিন্তু এখন হইতে চিনির মূল্যানুযায়ী ইক্ষুর মূল্য নিরূপিত হইবে। চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে, ইক্ষুর মূল্যও তদনুসারে বাড়িয়া যাইবে।" এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, চিনির মূল্যের সহিত ইক্ষুর আনুপাতিক মূল্য বাঁধিয়া দিবার জন্য শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হইবে। ইহা হইলে কৃষকগণ ভাল ইক্ষু উৎপাদন করিবার দিকে মনোনিবেশ করিবে কিন্তু অসুবিধা থাকিয়া যাইবে এই যে চিনির মূল্য হ্রাস পাইলে ইক্ষুর মূল্যও তদনুসারে কমিয়া যাইবে। সমস্যার অপর দিকের গুরুত্বও আদৌ কম নহে। আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া শিল্পের পুনর্বিন্যাস করিতে না পারিলে চিনির মূল্য সম্পূর্ণরূপে জন-সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। নূতন কলগুলি স্থাপনের সময় এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু চাষীকে প্রকারান্তরে লভ্যাংশ দিতে হইলে কারখানার মালিকগণ শিল্পের পুনর্বিন্যাস করিতে যত্নবান হইবেন কি?

ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন হ্রাস—

বিদেশের বাজারে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাওয়ায় ভারতের মাঙ্গানিজ ব্যবসায় এক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। গত বৎসর ১৬ লক্ষ টনের অধিক ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানি হয় কিন্তু বর্তমান বর্ষারম্ভে মাত্র কয়েক হাজার টন রপ্তানী হইয়াছে। ইহার ফলে হাজার হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এপর্যন্ত ৫০টির অধিক খনির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদনে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান (রাশিয়া প্রথম) অধিকার করিলেও বিদেশের বাজারে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের চাহিদাই অধিক ছিল। রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশের বাজারে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। বিদেশের বাজারে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য শিল্পপতি, শ্রমিক ও সরকারের একযোগে অবিলম্বে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য।

আমেরিকায় চায়ের কাটতি বৃদ্ধি

১৯৫৩ সালে আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক চায়ের কাটতি হয়। এই বৎসর ১০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা আমেরিকায় আমদানী হয় (পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ১১% বেশী) এবং বিক্রয় হয় ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া মিলিতভাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের চা সমিতির পূর্ণ-অংশীদাররূপে চা বিক্রয়ের কার্যে লিপ্ত আছে। চায়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্রেতা হইলেও আমেরিকায় ইংলণ্ড অপেক্ষা ১।১৫ অংশ হইতেও কম চা মাথা পিছু কাটতি হইয়া থাকে। উপযুক্তভাবে প্রচার কার্যাদি চালাইয়া গেলে আমেরিকায় চায়ের বাজার যে আরও অনেক সম্প্রসারিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

নেপালে ভারতের সাহায্য

ভারত সরকার কিছুদিন পূর্বে নেপালকে বিনাসর্তে ৭ কোটি টাকা সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নেপালের সহিত তেরাইন অঞ্চলের সংযোগ রক্ষার্থ রাজপথ নির্মাণ, নেপালের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, গৌচর বিমানঘাটি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচকার্য ও অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের জন্য অ্যামোনিয়ম সালফেট বিতরণের জন্য প্রধানতঃ এই সাহায্য দেওয়া হইবে।

এই সাহায্যের ফলে ভারত-নেপাল সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হইবে। তা ছাড়া ভারতের সহিত নেপালের যেরূপ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে নেপালের বৈষয়িক উন্নতিতে ভারতের অবশ্যই আনন্দের কারণ আছে।

হাওড়া—বর্ধমান রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণ

বোম্বাই ও মাদ্রাজের অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা কিছুকাল যাবৎ সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে কিছুদিন পূর্বে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে 'কলিকাতা বৈদ্যুতিকীকরণ' নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার চতুর্দিকস্থ সাবার্বান রেলপথ বৈদ্যুতিকীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও বর্তমানে এই সংস্থা ৬৬ মাইল দীর্ঘ হাওড়া বর্ধমান রেলপথ ও ২২ মাইল দীর্ঘ শেওড়াফুলী-তারকেশ্বর রেলপথটি বৈদ্যুতিকীকরণের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে। এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে ১১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং কাজ সমাপ্ত হইতে ৩ বৎসর সময় লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে রেলপথে যাতায়াত যে কত অনিশ্চিত ও দুর্ভোগের কারণ তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নয়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে একদিকে যাত্রীদিগের যেরূপ গমনাগমনের পক্ষে সুবিধা হইবে অপরদিকে জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের এক শ্রেণীর লোক সহরতলীতে বাস করিতে উৎসাহিত হইবেন।

পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু

[illegible] বাজেটের বাজেই অধিবেশনে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন [illegible] প্রসঙ্গে তৈরন বাজেট ভাষণে বলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্গঠন কার্য [illegible] সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন কেবল পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দিকে সরকারের মনোযোগ [illegible] কারণেই পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালিত হয়নি। প্রথম দিকে পশ্চিমবাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মনে একটি ভ্রান্ত সৃষ্টি করে রেখে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এদিকে মনোযোগ দেয়নি। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যতদিন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ততদিন এ সমস্যাকে তিনি নিজেও স্বীকার করেননি এবং তাঁর এই মনোভাবের ফলে কেন্দ্রীয় [illegible] এই সমস্যাকে প্রথম দিকে স্বীকার করেননি। এ সম্পর্কে ডাঃ ঘোষের সম্প্রতি প্রকাশিত যে বিবৃতি আমরা দেখেছি তাতে আমাদের এই ধারণা দূর হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই সমস্যাকে স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও এইজন্য অর্থব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের মন্ত্রীমণ্ডলীর ভিতর উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব বর্তমান ছিল—পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলায় স্থান দেওয়া হবে না এমনি একটি মনোভাব তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠির মধ্যে প্রবল ছিল। তাই কিছুদিন পরে হয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের তাগিদে ডাঃ রায়কে নিজে এই পুনর্বাসন দপ্তরের ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারপর থেকেই পুনর্বাসনের কাজ কিছুটা এগিয়েছে, কিন্তু পুনর্বাসনের কাজে অন্য প্রকার বাধাও ছিল—যে টাকা সরকার খরচ করেছে তার যে সবটা সদ্ব্যবহার হয়নি তা আজ প্রায় সর্ববাদি-সম্মত। কেন্দ্রীয় সরকার এক কমিটি নিয়োগ করেছিল পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসনের তথ্যানুসন্ধানের জন্য, তাতে—পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন বিভাগের একজন উচ্চতর কর্মচারীও ছিলেন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একশ্রেণীর নেতা গজিয়েছিল যারা টাকার এই অপপ্রয়োগের জন্য প্রধানত দায়ী। পুনর্বাসন বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী প্রায়ই উদ্বাস্তু। তাদের অনেকের অসততার ফলে ও সহায়তায় পূর্বোক্ত নেতা বা দালালরা নিজেদের কাজ গুছাবার সুযোগ পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিও মানুষের দুঃখ কষ্টের সুযোগ নিয়ে অনেক সময় রাজনীতির খেলা খেলেছে। কংগ্রেস সরকারকে এদের কাছে অপ্রিয় বা অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আধিপত্য পেয়েছে তার ফলে উদ্বাস্তুদের সত্যিকার স্বার্থ বা পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা অনেক সময়ে এরা অবহেলা করেছে। তার উপর একদল ভূম্যধিকারী উদ্বাস্তুর বন্ধু হিসাবে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হল। ঐ সব দালালগণ পুনর্বাসন বিভাগের কর্মচারীদের যোগাযোগে ২০৲। বা ৩০৲ টাকা দামের জমি ২৫০৲।৩০০৲ টাকায় সরকারের মারফতে উদ্বাস্তুদের কাছে বিক্রী করা হয়েছে।

১৯৫২ সালে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ পার্লামেন্টে টাকার এই অপব্যবহার বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন তোলেন। নীলদর্পণ, রামচন্দ্রপুর, তাহেরপুর প্রভৃতি কলোনী ও উপনিবেশের জমির যা স্বাভাবিক মূল্য তার প্রায় ৮।১০ গুণ বেশী মূল্য উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে আদায় করা

হয়েছে ;—অবশ্য টাকাটা সরকারই দিয়েছে। এই সব প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন একবার পার্লামেণ্টে স্বীকার করেছিলেন যে এর কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি হয়েছে, এবং সরকার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান (Enquiry) করবে। এর কিছুদিন পরে অরুণবাবুর এক চিঠির জবাবে শ্রীজৈন জানান যে তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হচ্ছে। এক হিসাবে বলা চলে যে এই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের ফলেই পশ্চিম বাংলায় সমস্ত পুনর্বাসন ব্যবস্থা নূতন করে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ঐ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের উপর মন্ত্রী কমিটি যে সব সুপারিশ করেছে সেই অনুসারেই পুনর্বাসনের নূতন ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্ত্রী কমিটির সুপারিশ ৮।৯ মাস পূর্বে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছিল ; ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাও প্রায় শেষ হয়ে গেল। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের সমস্ত দৃষ্টি এদিকে পড়ার সুযোগ ঘটল।

শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন পশ্চিম বাংলায় এসে প্রায় ১০দিন ছিলেন। প্রাদেশিক সরকার, উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগে তিনি আলাপ আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে তার ধৈর্যের সুখ্যাতি করতে হয়। তিনি অনেকগুলি কলোনীতে গিয়েছেন, অনেক ক্যাম্পেও গিয়েছেন। বহু কলোনীতে তিনি অধিবাসীদের অপরিসীম দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনেছেন। সবচেয়ে বড় বড় কলোনী হল ২৪ পরগণা ও নদীয়ার মধ্যে। দুটি বড় উদ্বাস্তু ক্যাম্প নদীয়া জেলায় মধ্যে, এবং কিছু ছোট ছোট ক্যাম্প ২৪ পরগণার মধ্যে আছে। ৩।৪ বছর অনেকে এই সব ক্যাম্পে বেকার বসে আছে এবং সরকারী মুষ্টি ভিক্ষার (dole) উপর নির্ভর করে দিন চালাচ্ছে এমনি উদ্বাস্তুর সংখ্যা হবে ৯,০০০ পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ৪৫,০০০ লোক এতদিন অলস জীবন যাপনের পরে এদের কর্মশক্তি আজ কতটুকু আছে তা আজ বিবেচনার বিষয়। এদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণের সময়ে এ কথাটা খেয়াল করা বিশেষ প্রয়োজন হবে। উদ্বাস্তুদের মানসিক (Psychological aspect) অবস্থা বিবেচনা না করে পাইকারী ধরণে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার অনেক দোষত্রুটি ঘটেছে।

কলোনী বা উপনিবেশগুলিতে বিশেষ দরকার হয়েছে উদ্বাস্তুদের জীবিকার ব্যবস্থা করা। তাহেরপুর, গয়েশপুর, মেদিয়া, নীলদর্পণ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি উপনিবেশে ঘর তৈরী হয়েছে, কিন্তু ৩।৪ কাঠার জমির উপর কেবল বাসস্থান তৈরী হলে পুনর্বাসন হয় না। তাদের নিত্যকার খাবার ব্যবস্থাও করতে হবে। শুনছি গয়েশপুরে ও তাহেরপুরে সুতার কল হবে ; কিন্তু সে কবে ? ঐ সব উপনিবেশের লোকদের যে একবেলার খাবারও ঘরে নেই। সুতার কলের আশায় তারা কি এক বা দেড়বছর অপেক্ষা করতে পারবে ? যাই হোক এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সমস্যার গুরুত্বও তার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে তাই আশাকরি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সরকার দেরী করবেন। তাহেরপুর, গয়েশপুর এবং অন্যান্য উপনিবেশেও যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এদের চিকিৎসার কথাও সরকার চিন্তা করছে জেনে সুখী হলাম। শুনছি ভ্রাম্যমান যক্ষ্মাহাসপাতাল (Mobile Hospital) দিয়ে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে এবং বিশেষ অনুস্থদের জন্য আলাদা পর্যবেক্ষণশালা (Segregation hospital) স্থাপন করা হবে।

কলকাতার আশে পাশে ও উপকণ্ঠে বহু জবর দখল উপনিবেশ (Squatters' Colony) হয়েছে। দখলকারীরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা হামেশাই এই সব উপনিবেশে আনাগোনা করেন, তাই এই কলোনীগুলির সুব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কলকাতার উপকণ্ঠে একটি গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া পুনর্বাসনের দিক থেকেও এগুলির সুব্যবস্থা করাও বিশেষ জরুরী। এই সব উপনিবেশগুলিকে প্রায় কলকাতার অন্তর্ভুক্ত বলা চলে, অথচ নাগরিক সুখ-সুবিধা এরা কিছুই পায় না ; গ্রামের সহজ অনাড়ম্বর জীবনও এদের পক্ষে সম্ভব নয় তাই ঐ সব উদ্বাস্তুদের জীবন সত্যিই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া

কলকাতা নগরীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও ঐসব উপনিবেশগুলিকে এই ভাবে চলতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রীঅজিতপ্রসাদ এই সব জবর-দখল উপনিবেশগুলি সম্বন্ধেও ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে শ্রীঅজিত প্রসাদ আশ্বাস দিয়েছেন যে, বাংলার বাহিরে তাদের পাঠান হবেনা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বাংলার বাহিরে এদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা সফল হয়নি, তার জন্য পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের দর-মুখ টানাকে দায়ী করলে চলবে না। পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহের কর্তৃপক্ষ এই উদ্বাস্তুদের প্রতি যে বিশেষ অনুকূল মনোভাব দেখিয়েছেন তা বলা চলেনা। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করেও কোন কোন প্রাদেশিক সরকারের মনোভাব বদলাতে পারেনি। আজ সহায়হীন নগ্ন উদ্বাস্তুদের উপর রোষ চাপিয়ে সে নিজের পরাজয়কে ঢেকে নিল। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু আন্দামানে যেতে প্রস্তুত এবং যাচ্ছেও; এমনকি উত্তর প্রদেশের দুর্গম তিরাই (Tarai) অঞ্চলেও এরা গিয়ে বাস করেছে। অথচ বাঙালীর পাশে বিহার-উড়িষ্যায় এরা যেতে চায়না—কেবল ঘর-মুখপনার জন্য, এটা কোন বিচারশীল ব্যক্তি মানবেনা। যাই হোক যদি এই ৩০ লক্ষ পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু কেবল পশ্চিম বাংলায় থেকে যায় তাহলে পশ্চিম বাংলাকে কেবল কৃষির উপর নির্ভর করলে চলবেনা। ছোট বড় নানা প্রকার ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন করে জীবিকার নূতন ব্যবস্থা করতে হবে।

পশ্চিম বাংলা থেকে কোন উদ্বাস্তুকে বাংলার বাইরে পাঠান হবেনা—এই নীতি স্বীকার করলেও আসামে প্রায় সাতলক্ষ এবং ত্রিপুরায় প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তু থেকে যায়। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে হলে এই প্রায় ১০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে বিবেচনার বাইরে রাখলে চলে না। বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের চেয়ে আসাম সরকারের মনোভাব যে এদের প্রতি বিশেষ অনুকূল তা মনে করার কোন কারণ বোধহয় নেই। আসামের পুনর্বাসন সম্বন্ধে বহু অভিযোগ আমাদের কানে আসে। কেন্দ্রীয় সরকার কাছাড়ের পুনর্বাসন ব্যবস্থা প্রায় ৩ বছর নিজের হাতে রেখেছিলেন, তাতে কত টাকা খরচ হয়েছে বা নষ্ট হয়েছে তার কোন সঠিক খবর আমাদের জানা নাই, কিন্তু আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ১ কোটির বেশ কিছু উপরে। কাছাড়ের সে পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হল এবং প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতার অভাব এই ব্যর্থতার মূলে অনেকখানি দায়ী কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে। যাই হোক, অতীতের কথা আমরা বেশি টানতে চাই না। আমরা শুনেছি এবং আশা-করি তা সত্য যে ইদানীং আসামে পুনর্বাসন কার্য অনেকটা ভাল ভাবে চালিত হচ্ছে; তবুও আমরা মনে করি পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে যেমন তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়েছে, আসাম ও কাছাড়ের সম্পর্কেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অতীতের দোষত্রুটি বুঝতে না পারলে তা শোধরাবার ব্যবস্থাও হয় না। অন্ততঃ অবিলম্বে শ্রীঅজিত প্রসাদের আসামে গিয়ে সরজমিনে সব দেখে ব্যবস্থা করা উচিত।

ভাত কাপড়ের অবস্থা

মানুষের স্মৃতিশক্তি অনেক ব্যাপারে নিতান্ত ক্ষীণ। ৬।৭ বৎসর পূর্বে মানুষের জীবনযাত্রা কি রকম কঠিন ছিল তা আমরা অনেক সময় আজ স্মরণ করতে রাজী হই না। বাঙালী আমরা খাদ্য বলতে প্রধানত বুঝি ভাত এবং বাংলার বাইরে উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অধিকাংশ স্থানেই গমের প্রচলন বেশী; দক্ষিণ ভারতে অবশ্য চালেরই প্রচলন বেশী।

১৩৪৩ সাল থেকে অর্থাৎ ১৯৪০-এর মন্বন্তরের পূর্ব হতেই দেশের খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বাংলার দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়।—তারপর খাদ্যের নিয়ন্ত্রিত বণ্টন শুরু হয় মাথা প্রতি সপ্তাহে সোয়া সের বা দেড় সের চাল

আমরা পেতাম এবং সে চালের দাম বা দোষ গুণ বিচার করার অধিকার কারুর ছিল না। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চল থেকে যে কোন মূল্যের চাল বা গম পেলেই আমরা ক্রয় করেছি।

আজ চাল ও গমের নিয়ন্ত্রিত বণ্টন বা Rationing উঠে গিয়েছে। চাল সম্বন্ধে বাঙালীর একটা বাছবিচার বরাবরই ছিল। গত ১০ বছর সে বাছবিচারের অধিকার আমরা হারিয়েছিলাম। বিধবাকেও অনেক সময় আতপের পরিবর্তে সিদ্ধ চাল খেতে হয়েছে। সরু মোটার কথা ত' কেউ ভাবতেও পারে নি। আজ এ নিয়ন্ত্রণ প্রথা উঠে যাওয়ার পর বাঙালী আবার তার পছন্দ মতন চাল বেছে নেবার সুযোগ পেয়েছে। এই পরিবর্তন আমাদের জীবনযাত্রাকে যে কতখানি স্বাভাবিক করেছে তা আমরা গতানুগতিক জীবনযাত্রার মুখে প্রায়ই ভু'লে যাই।

ভাতের পরেই আসে কাপড়ের কথা। একখানা শাড়ীর জন্য ভদ্রঘরের মেয়েদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনেক সময় দিনের পর দিন 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে থাকতে হত—হয়তো কোন বয়স্কা নারী একখানা শাড়ী নিয়ে আসত যা দিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করা চলত না। কোন সধবা নারী হয়ত' পাড়হীন একটা ধুতী হাতে নিয়ে আসত—হয়ত কোন বিধবা নারী টকটকে লালপেড়ে শাড়ী বগলে নিয়ে ফিরে আসত। বালক বালিকাদের পক্ষে ধুতী বা শাড়ী পরা লোপ পেয়েছিল—হাফ্‌প্যাণ্ট বা ফ্রক পরেই তাদের তুষ্ট থাকতে হত। আজ কাপড়ের সে অভাব নেই। যথেচ্ছ পরিমাণ কাপড় এবং পূর্বের চেয়ে অনেক কম মূল্যে এবং নিজের পছন্দমত লোকে কিনতে পারে।

সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই যে দুটি দ্রব্য—তা পাওয়া এত সুগম হল কি করে এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। জাতীয় সরকার যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছেন আমরা বরাবর সে সম্বন্ধে কেবল সন্দেহ প্রকাশ এবং প্রতিকূল সমালোচনাই করেছি। অথচ এইসব উন্নয়ন পরিকল্পনার কোন মূল্য না থাকলে তাতে কাপড়ের এ-অভাব হঠাৎ ঘুচতে পারত না। আমরা এখানে দেখাব স্বাধীনতা লাভের পর এই দুটি জিনিষের উৎপাদন আমাদের দেশে কি রকম বেড়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে আমাদের ধান উৎপাদন হয়েছিল ২,১২,০০,০০০ টন আর এ বছর ১৯৫৩-৫৪ সালে আমাদের ধান হয়েছে ২,৭১,০০,০০০ টন / এবং ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫৫-৫৬ সালে ধান উৎপাদনের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাও প্রায় এই-ই। এই কয়বছরে গমের উৎপাদন বেড়েছে ৫৬ লক্ষ টন থেকে ৭২ লক্ষ টন। অন্যান্য খাদ্যশস্য (বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি ১,৬৯,০০,০০০ টন থেকে ২,১২,০০,০০০ টনে দাঁড়িয়েছে। সর্বপ্রকার খাদ্যশস্য এবছর অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সালে আমাদের দেশে জন্মেছে—৫,৫৫,০০,০০০ টন: ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের যা উদ্দেশ্য ছিল তার থেকে আমরা প্রায় ৩০ লক্ষ টন বেশী উৎপাদন করেছি। অর্থাৎ খাদ্যশস্য উৎপাদন বিষয়ে ১ম পঞ্চবার্ষিকী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা লক্ষ্য (Target) আমরা তিনবছরেই ছাড়িয়ে গিয়েছি। রাশিয়াতে এরকম একটা ব্যাপার হলে অনেকে একটা হরোড় লাগিয়ে দিত।

কোটি একর বাড়তি জমি চাষের মধ্যে আনা।

১৯৫৩-৫৪ সালেই আমরা চাষ করেছি খাদ্যশস্য বাবদ ২৫.৯৩ কোটি একর, এবং পাট তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক শস্য (cash crop) বাবদ ৪.৯৪ কোটি একর মোট ৩০.৮৭ কোটি একর জমি। বাণিজ্যিক শস্য (cash crop) বাবদ এর পূর্বের বছর ৫.১১ কোটি একর জমি চাষ হয়েছিল; কিন্তু তুলা ও বিশেষ করে পাটের দর অত্যন্ত নেমে যায়, তার ফলে কৃষকরা ঐসব চাষ কমিয়ে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়িয়েছে। মোটের উপর ৫ বছরে চাষের মধ্যে আনার বরাদ্দ ছিল—২৯.৭৫ কোটি একর, তার স্থলে ৩ বছরেই আমরা চাষ করেছি—৩০.৮৭ কোটি একর—অর্থাৎ এক কোটির চেয়েও বেশী জমি। এখন ত তাহারা খাল খোলা হল, বাঁধের

উপত্যকার ও সেচের জল ২।১ বছরের মধ্যেই পাওয়া

অন্যান্য বহু নদী উপত্যকার পরিকল্পনাও এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই শীঘ্রই চাষের জমির পরিমাণ আরও বাড়বে এবং জমির ফলনও বাড়বে। এক কথায় আমাদের খাদ্যের অভাব ঘুচে গিয়েছে—বা যাচ্ছে—এই দাবী আমরা করতে পারি।

সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার পক্ষে ভাতের পরই আসে কাপড়ের কথা। কাপড়ের বিষয়েও এই কয় বছরে আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। পূর্বের সেই অভাব আর আজ নেই। এবার কাপড়ের ও খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে কি করে—এই প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। "অধিক খাদ্য ফলাও" (Grow More Food Campaign) প্রচেষ্টা কয় বছর যাবৎই চলছিল। অনেকেই এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে হাসি-ঠাট্টা করেছে; ওটা কেবল অর্থ নষ্ট করার ফন্দী এমন কথাও হয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা থেকে যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেচের বৃহৎ পরিকল্পনা বহু গ্রহণ করা হয়েছে; তাছাড়া সেচের ছোট ছোট স্থানীয় ব্যবস্থাও অনেক হয়েছে।

নলকূপ এবং এমনি কুঁয়ো, ছোট ছোট নদীর উপর বাঁধ দিয়ে সেচের খাল—প্রভৃতির সাহায্যে জমিতে জলের যোগান বাড়ান হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টন সার জমিতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে জমির উর্বরা শক্তি বেড়েছে। ধানের সারি-বপন প্রথা—যা জাপানী বপনপ্রথা নামে চলছে—তাতেও জমির ফলন বেড়েছে। এ ছাড়া বহু নূতন জমি চাষের মধ্যে আনা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চাষের জমি বাড়াবার যে লক্ষ্য (target) ছিল—তা তিন বছরেই আমরা অতিক্রম করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল—১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশস্যের জন্য ২৪৬ কোটি একার (acre) এবং পাট তুলা প্রভৃতি··· বাণিজ্যিক শস্য (cash crop) বাবদ ৪.১৫ কোটি একর—মোট ২৯.৭৫ উৎপাদনের হিসাব দেখছি। ১৯৫০ সালে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ৩৬৬'৫ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয়েছিল; ১৯৫১ সালে হয়েছে—৪০৭.৬ কোটি গজ; ১৯৫২ সালে ৪৫৯.৯ কোটি গজ এবং ১৯৫৩ সালে ৪৯০.৫ কোটি গজ। ইহা ব্যতীত তাঁতের উৎপাদনের পরিমাণও কিভাবে বেড়েছে তাও দেখা দরকার।

১৯৫০	৬৩৬
১৯৫১	১০০
১৯৫২	১১০
১৯৫৩	১২০

কাজেই এই চার বছরে কাপড়ের উৎপাদন ৪৩০ কোটি গজ থেকে ৬১০ কোটি গজে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ প্রায় দেড় গুণ।

কাপড়ের উৎপাদন বেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের রপ্তানীও আমাদের বাড়ছে। সে রপ্তানীর পরিমাণ বাদ দিয়ে দেশের জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে যে কাপড় পাওয়া গিয়াছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

১৯৫০	৩১৮.৪	কোঃ গজ
১৯৫১	৪৩০.৯	
১৯৫২	৪১০.৭	
১৯৫৩	৪৪৫.৩	

তাতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হিসাব করেও মাথা প্রতি এ কয় বছরে ৪.৯ গজ, ১১.৭ গজ, ১৩.৯ গজ, এবং ১৪.৭ গজ কাপড় পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল মাথা পিছু ১৫ গজ করে কাপড় দেওয়া। অর্থাৎ সেই লক্ষ্য আমরা ৫ বছরের স্থানে প্রায় ৩ বছরেই জয় করেছি।

জাতীয় সরকারের ও জাতীয় অগ্রগতির এই যে গৌরবময় অধ্যায় আমরা এখানে ব্যাখ্যা করলাম এর তাৎপর্য যেন জাতীয় প্রত্যেক নাগরিক অনুধাবন করে। দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস একদিকে তাদের সরকারের উপর এবং অন্যদিকে নিজেদের কর্মশক্তির উপর থাকা প্রয়োজন। এ কয় বছরে জাতীয় সরকার কোন ভুল ত্রুটি করেননি—সেকথা কেউ বলবেনা, কিন্তু সে ভুলত্রুটি সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার পথ আজ কতটা সুগম হয়েছে সেকথা আমাদের ভুললে চলবেনা।

ভাখরা নানগাল উদ্বোধন

কিছুদিন পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভাখরা-নানগাল জল-প্রণালী মুক্ত করেছেন। পৃথিবীর মধ্যে এই খাল বৃহত্তম বলে দাবী করা চলে। শতদ্রু নদী হতে এ খাল কাটা হয়েছে। স্বাধীন ভারত যে কয়টি বড় বড় নদী উপত্যকার পরিকল্পনা নিয়েছে ভাখরা-নানগাল তার মধ্যে অন্যতম। ভারত ও পাঞ্জাব বিভাগের পূর্বে পাঞ্জাবে চাষের জন্য সেচের যে ব্যবস্থা ছিল তা প্রায় সবই পড়েছে

পশ্চিম পাঞ্জাবে। পূর্ব-পাঞ্জাবে সেচের খাল (irrigation canal) প্রায় নেইই ছিল না। এই খাল দিয়ে যে জল প্রবাহিত হবে তাতে পূর্ব-পাঞ্জাব এবং রাজস্থান চাষের জন্য জল পাবে। অনেকেই জানেন যে রাজস্থান প্রায় মরুভূমি; বৃষ্টি সেখানে অত্যন্ত কম হয়, নদী সেখানে মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলেছে; পূর্ব-পাঞ্জাবেও জলের প্রাচুর্য নেই, নদী সেখানে আছে অনেকগুলি, কিন্তু কৃষির উপকারে সে জল খুব কমই লাগে বরং অনেক সময়ে ঐ সব নদীতে প্লাবন এসে কৃষির ক্ষতিই করে।

এই তাবরা খালের জল পেয়ে পূর্ব-পাঞ্জাবের চেহারা ফিরে যাবে; এবং রাজস্থানেরও কতকটা অংশ বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এই ক'বছরে কৃষির উন্নতির দিকে ভারতবর্ষ যে কতটা অগ্রসর হয়েছে তা অন্যত্র আমরা বলেছি। দামোদর উপত্যকার ও তাবরার জল পেলে আমাদের খাদ্য সমস্যা যে আরও অনেকটা সহজ হবে তাতে নিঃসন্দেহ। এমনও আশা করা যায় যে অদূরভবিষ্যতে আমরা বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানী করতে পারব। ভারত বিভাগের সময়ে পাকিস্থান খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ছিল পর্যাপ্ত আর ভারতবর্ষ ছিল ঘাটতি; কিন্তু আজ আমরা প্রায় স্বপর্যাপ্ত এবং পাকিস্থান আজ খাদ্য বিষয়ে ঘাটতি অঞ্চল। এই খালকাটা হলে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে আমরা যে আরও অনেকটা স্বাবলম্বী হব সেটা হয়ত অনেকের নিকট প্রীতিপ্রদ হবে না। পাকিস্থান প্রথম হতে এই খাল কাটা নিয়ে প্রতিকূল আচরণ করে আসছে। সে বলতে চায় যে শতদ্রু নদী হতে যে জল এই খালে প্রবাহিত হবে তাতে পাকিস্থানের সেচ-প্রবাহ খাল-গুলিতে জল-প্রবাহ কমে যাবে। এখানে পাঞ্জাবের নদীগুলি এবং পুরান সেচ-প্রবাহ খালগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন হবে। সিন্ধু ও তার শাখাসমূহ নিয়ে ৬টী নদী অবিভক্ত পাঞ্জাবে প্রবাহিত :—সিন্ধু (Indus) বিতস্তা (Jhelum) চন্দ্রভাগা (Chenub) ইরাবতী (Ravi) বিপাশা (Beas) শতদ্রু (Sutlej)-এর মধ্যে সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা কাশ্মীর থেকে বেরিয়ে পাকিস্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং এই ৬টী নদী দিয়ে যে জল প্রবাহিত হয় তার প্রায় বারো আনা এই তিনটী নদী দিয়েই প্রবাহিত হয়। ইরাবতী ও শতদ্রু ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এবং বিপাশা কেবল ভারতের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়।

পাকিস্থানের আশঙ্কা যদি আমাদের মেনে নিতে হয় তাহলে ক্ষুদ্র বিপাশা নদীর জল ব্যতীত আর কোন জল আমরা পেতে পারি না। ভারত বিভাগের কিছু পরে ১৯৪৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিলে নদীর জল সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেন। সেই চুক্তির পরে উভয় সরকার মেনে নিয়েছিল সাময়িক চুক্তি হিসাবে। এই চুক্তির মেয়াদ ছিল ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্থান সরকার এই সম্পর্কে আলাপআলোচনায় আসেনি। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা মে এক নূতন চুক্তি হয়, তাতে পাকিস্থান সরকার স্বীকার করে যে পূর্ব-পাঞ্জাবে জলের অভাব ঘুচিয়ে এই বিরাট অঞ্চলকে চাষের উপযোগী করার আগ্রহ ভারতবর্ষের থাকা স্বাভাবিক ও সঙ্গত; তবুও ভারতবর্ষ পাকিস্থানের জলের যোগান হঠাৎ বন্ধ না করতে রাজী হয় এবং বলে, ধীরে ধীরে জলের যোগান কমান হবে। ইতিমধ্যে পাকিস্থান তার জলের অন্য ব্যবস্থা করে নিবে। কিছুদিন পরেই পাকিস্থান এই চুক্তির বার থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে এবং নানাভাবে এই চুক্তির সর্ত অগ্রাহ্য করতে সুরু করে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে সেচের জল সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ—মিঃ লিলিয়েন থাল (Mr. Lilien Thal) ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। তিনি এই নদী এবং সেচের খালগুলি পরিদর্শন করেন, দেশে ফিরে গিয়ে একটী কাগজে তিনি লেখেন, "খালের সমস্যা কূট বা রাজনীতি সংক্রান্ত নয়, এটা ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপার, যে পরিমাণ জল এইসব নদী দিয়ে—বিশেষ করে এর পশ্চিম দিকের কয়টী নদী দিয়ে—বম্বাই সমুদ্রে প্রবাহিত হয় তাতে উভয় দেশের প্রয়োজন মিটবার মত পর্যাপ্ত জল পেতে কোন কষ্ট হবে না। পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটিয়ে ভারতের অনুন্নত অঞ্চলের সেচের জন্য জল দরকার—কারণ, ভারতবর্ষ যদি আরও জল না পায় তবে তাকে উপোষ করতে হবে—" (India too must have more water or starve) তিনি প্রস্তাব করেন যে বিশ্বব্যাঙ্ক এই বিপদের সীমাংসা করে দিতে পারে। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের (World Bank) সভাপতি মিঃ ব্ল্যাক এর মীমাংসার দায়িত্ব নেন।

দুবছর ধরে বিশ্বব্যাঙ্ক এ সমস্যার আলোচনা করে কিছুদিন পূর্বে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের, এই শালিসী অনুসারে প্রায় ৬০ কোটি টাকা পাকিস্থানকে দেওয়ার নির্দেশ ভারতবর্ষের

উপর হয়েছে এবং জলের হিস্সা বিশ্ব ব্যাঙ্কের সালিসীতে ভারতবর্ষের খুব খুসী হওয়ার কোন কারণ হয়নি। জলের পরিমাণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আপত্তি করার কারণ ত আছেই তা ছাড়াও এই সালিসী অনুসারে পাকিস্থানকে ৬০ কোটি টাকা দেওয়ার দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপর পড়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ এই রায় মেনে নিয়েছে। কিন্তু পাকিস্থান এই রায় গ্রহণ করার সম্মতি এখন পর্যন্ত জানায়নি। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ বিশ্ব ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দেয় যে এই আলাপ-আলোচনার বিশেষ কোন ফলের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। এদিকে ভাখরা-খাল সম্পূর্ণ হওয়ার আমাদের আর দেরী করা সম্ভব না। অপর দিকে পাকিস্থান এক নূতন খাল খনন করে চন্দ্রভাগা থেকে শতদ্রুতে অতিরিক্ত জল আনার ব্যবস্থা করেছে এই বছরের এপ্রিল মাস থেকে। ভাখরা খাল থেকে যে জল পূর্ব-পাঞ্জাবে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশী জল ঐ পাকিস্থানের নূতন কাটা খাল থেকে শতদ্রুতে আসবে। সুতরাং পাকিস্থানে জলের পরিমাণ কমবার কোন আশঙ্কা

অথচ ভারতবর্ষের একটি বিরাট অঞ্চল সেচের জলের অভাবে চাষের অযোগ্য হয়ে আছে।

তাই বিশ্বব্যাঙ্ককে পূর্বাহ্নে জানিয়ে ভাখরা খাল দিয়ে জল মুক্ত করা হয়েছে। ভারতবর্ষ বিশ্ব ব্যাঙ্ককে ইহাও জানিয়েছে যে ব্যাঙ্কের শালিসী প্রস্তাবের ভিত্তিতে যদি এর পরে আর কোন আলাপ-আলোচনা ব্যাঙ্ক চালাতে চায়—তাহলে ভারতবর্ষ তা বিবেচনা করতে রাজী থাকবে। পাকিস্থান ইচ্ছা করে যেন গড়িমসি করছিল, কারণ তাতে পাকিস্থানের কোন অসুবিধা ছিলনা, অথচ যত দেরী হচ্ছিল তাতে ভারতবর্ষেরই ক্ষতি হচ্ছিল। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে এই বিষয়ে শালিসী করার দায়িত্ব নেয়, তখন চুক্তি করা হয় যে ব্যাঙ্কের আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের জলের যোগান কমাতে পারে এমন কোন উন্নয়ন কাজ হাতে নিতে পারবে না। এই চুক্তি ভারতবর্ষ পুরাপুরী মেনে নিয়েছে। যদিও এই চুক্তির ফলে কার্যত দাঁড়ায় যে পাকিস্থান নূতন কোন সেচের ব্যবস্থা করতে পারবে—অথচ ভারতবর্ষে তেমন কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবেনা।

আমরা পূর্বে বলেছি—ক্ষুদ্র বিপাশা নদী ভিন্ন এই ৬-টি নদীর আর কোনটি ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই সেচের জন্য কোন বড় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পথ ভারতবর্ষের পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। পাকিস্থান হয়ত এতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এমনি অবস্থা ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল মেনে নিতে পারে না। পাকিস্থান আজ যতই চেঁচা[illegible] করুক ভাখরা খাল খোলার ফলে তার জলের যোগান কমবার কোন আশঙ্কা অন্ততঃ বর্তমানে নেই। বিশ্ব ব্যাঙ্কও একথা স্বীকার করে নিয়েছে। ভাখরা খাল ভারতবর্ষের পক্ষে কতকটা জীবন-মরণের সমস্যা, কাজেই পাকিস্থান এ নিয়ে যে-খেলাই খেলুকনা কেন ভারতবর্ষ তাতে সায় দিতে পারেনা। এই ৬-টি নদী দিয়ে যে জল প্রবাহিত হয় তাতে প্রয়োজন মিটবার পক্ষে পর্যাপ্ত জল পাকিস্থানের হাতে থাকবে। বর্তমানে এই খাল দিয়ে শতদ্রু হতে মাত্র বর্ষার ৫ মাস (May—September) জল প্রবাহিত হবে। এবং তখন শতদ্রুতে জলের প্রবাহ উত্তর দেশের চাহিদা মিটাবার পক্ষে অতিরিক্ত। ভাখরা বাঁধ তৈরী হতে আরও প্রায় ৫ বছর সময় লাগবে, তার পূর্বে বছরের অন্ত সাত মাসে ঐ খাল থেকে জল প্রবাহিত হবেনা। বিশ্ব ব্যাঙ্কের শালিসী প্রস্তাব অনুসারে এই ৫ বছরের মধ্যে উত্তর দেশের মধ্যে জলের ভাগ-বাঁটরা নিয়ে বোঝা-পড়া হতে পারবে এটাই আশা করা সঙ্গত আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তর দেশের চাহিদা মিটাবার পরেও এই ৬টি নদীতে অতিরিক্ত জল থাকবে। এখন সবটাই নির্ভর করছে পাকিস্থান বিশ্বব্যাঙ্কের এই শালিসী মেনে নিবে কিনা তার উপর।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

—ভারতবর্ষ

সপ্তদশ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৬১ | পঞ্চম সংখ্যা

সাহিত্যে দেশ প্রেম

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের আগে দেশপ্রেম ভাবপ্রেরণার প্রধান উৎস-রূপে বাংলাসাহিত্যে দেখা দেয়নি। শতাব্দীতেই এই নূতন উৎসের আবির্ভাব ও উৎসা কেবলমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় নয়, সমাজ চেতনায়, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি ঐতিহাসিক গৌরব উপলব্ধিতে, দেশের প্রকৃতি ও জীবন-ধারার সহিত ঐক্য-অনুভবে বিচিত্রধারায় নব-নব রূপে এর প্রকাশ।

গুপ্তকবি একদিন শোনালেন: "মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম, তার চেয়ে রত্ন নাহি আবেদন-নিবেদন-পন্থীদের প্রতি কটাক্ষ করে লিখলেন ছদ্ম ভিক্টোরিয়া-স্তুতি: "তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু, শিখিনি শিং বাঁকানো, কেবল খাবো বিচিলি ঘাস।"

রাজপুত-কাহিনীর আবরণে রঙ্গলাল গাইলেন মুক্তির গান: "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" বাঙ্গালের বীরত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বল্‌লেন, একতার অভাবই ভারতের পরাধীনতার কারণ।

মধুসূদনের কাব্যেও রাবণের মুখে "জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? সে মূঢ়, শতধিক্ তারে।"

হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীতে' বিদেশী অধীনতার জ্বালা আরও তীব্র:

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি
মের জাতি নিদ্রিতে

সঞ্জীব থাকিলে একনি উত্থিত,
বীরপদ ভরে মেদিনী দুলিত
ভারতের নিশি প্রভাত হইত
ছাড়িত সেদিন ঘুচিয়া গেছে

এ কবিতায় মাদরাচাপের উল্লেখ নিতান্তই এড়াবার উদ্দেশ্যে; পরোক্ষভাবে কবির মুখেই শোনা যায় ধিক্কারোক্তি:

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে—উথলি আবার
উত্থিত ভারতে বাধিত প্রাণ।"

'যুগসঞ্চারে' স্বপ্নচ্যুত দেবগণের চিত্রেও ভাগ্যবিড়ম্বিত ভারতবাসীরই বেদনার কালো ছায়া।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' মুখ্যতঃ বঙ্গের স্বাধীনতা-বিলোপের শোকগাথা। একালের দুর্ভাগ্যের চিত্রই শুধু তিনি আঁকেননি। গিরিব্রজপুর বা রাজগৃহে গিয়ে তিনি দীর্ঘকালের ইতিহাস স্মরণ করেছেন। "মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর ভস্মলেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার শেখরমালার অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে।" [উৎসর্গ—'রৈবতক'।] কবি লিখলেন রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস। মহাভারত তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'লো ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত-রূপে। জাতীয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে এই আন্তরিক যোগ-অনুভবে দেশ-প্রেমের এক বিশিষ্ট প্রকাশ। অন্তর্বিরোধই ভারতের দুর্গতির কারণ, জাতিভেদ ক্ষয় করছে তার সামাজিক শক্তিকে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল বিরোধের অঙ্কুর উন্মূলিত ক'রে আর্য-অনার্যকে মিলিয়ে অখণ্ড ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা—নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্যত্রয়ের সার কথা এই। আরও লক্ষণীয়, তাঁর দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেম-বিরোধী নয়। সর্বমানবের মৌলিক ঐক্যের বাণী বারে বারে ঘোষিত হয়েছে তাঁর কাব্যে।

বিহারীলাল ঐতিহাসিক কাব্য লেখেননি। একালে ফোন পেয়েছেন আপন মনে, তবু দেশাত্মবোধের সুর তাঁর কবিতাতেও মাঝে মাঝে বেজেছে :

"যাহার প্রতাপে সদা মেদিনী কম্পিত,
ম্লেচ্ছ-পদাঘাতে আজি সে হয় মর্দিত
"যখন জননভূমি ছিলেন স্বাধীন
কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন
এখন হয়েছে তায় সে বুধ মলিন
মনোদুঃখে পরেছেন তিমির-বসন"
"এদেশের রঘুবীর বেঁচে নেই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে অন্তর্হিত।
কপটে অন্যায়ে এসে রাক্ষস দুর্বার
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা।"

'বন্দেমাতরম্'-এর মন্ত্র-উদ্গাতা বঙ্কিম। দেশসেবার নানা পথের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। একদিকে পুরাতন ভারতের আদর্শ, অন্যদিকে যুগ কর্তব্য। উভয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করিয়ে তিনি জাগাতে চেয়েছেন নূতন সমাজ-চেতনা ও ধর্মবোধ। এ ধর্ম জীবন-বিচ্ছিন্ন মনোবিলাস নয়, বরং বলতে পারি জীবন-ধর্ম। একদিকে 'কৃষ্ণচরিত্র' অন্যদিকে 'পরাণমণ্ডল'—তাঁর ধর্মপতাকার দুই প্রান্ত ধারণ ক'রে আছে। "সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইওনা"—এ উক্তিও ধর্মতত্ত্বে স্থান পেয়েছে।

চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ। নানা প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তাঁরা জাতিকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। জাতীয় ইতিহাসচর্চা আত্মশক্তি উদ্বোধনে অনেক সময়ে সহায়তা করে। রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ, অক্ষয়মৈত্রেয়, রজনীগুপ্ত, রাখালদাস প্রভৃতি ঐ দিকে লক্ষ্য রেখেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নাটকের ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও ইতিহাসের আভাস আছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' একালের বৃত্তান্ত; নীল বিদ্রোহের সত্য চিত্ররূপে এ গ্রন্থ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা-স্পৃহাই দেশপ্রেমের মাপকাঠি নয়। দেশের সঙ্গে যাঁরা নানাভাবে একাত্মতা অনুভব করেছেন, তার সমস্যায় বিচলিত এবং গৌরবে উৎফুল্ল হয়েছেন, তাঁরা সকলেই দেশপ্রেমিক। রামমোহন, ভূদেব, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, শিবনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ—এঁদের জীবন এবং সাহিত্যও দেশপ্রেমের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা অল্প। তবু তার মধ্যে 'ভারত আত্মার বাণী' ধ্বনিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র আর অবনীন্দ্রনাথ পল্লীকুটীর ও পর্বতগুহা থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছেন জাতির উপেক্ষিত সাহিত্য এবং শিল্প সম্পদকে।

এককালে হিন্দুমেলা জাতীয়তা উদ্বোধনে ব্রতী

হ'য়েছিল। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সেকালের অনেক জ্ঞানী লোক তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানেই পঠিত হয়েছিল বালক রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলার উপহার'। তারপর গানে গল্পে কাব্যে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কত রকমে যে জাতির মনকে গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু 'দেশ দেশ নন্দিত করি' কিংবা 'জনগণ মন' অথবা 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীত নয়। তিনি দিয়েছেন মুক্তিসাধকের পায়ে পায়ে এগিয়ে চলার গান! "আমি ভয় করবোনা, ভয় কর'বোনা। দুবেলা মরার আগে মরবোনা।" "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে।" "যদি তোর ভয় থাকে তো ফিরে যানা। তবে তোর করি মানা।" "বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।" এমন অসংখ্য গান মনে পড়বে আমাদের। দেশপ্রেমকে সঙ্কীর্ণতা থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। 'গোরা'য়, 'ঘরে বাইরে'-তে আমরা তার দৃষ্টান্ত পেয়েছি। কাজের বদলে কথা দিয়ে যারা দেশোদ্ধার করতে চায় তাদের উদ্দেশে কবির বাণী "তোরা নেই বা কথা বল্‌লি। দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগোলি পল্লী।" কেবল ভাব-বাষ্পনয়, তিনি চেয়েছেন কর্মের তপস্যা। রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি উপেক্ষা করেননি, কিন্তু তা যেন ছলমাত্র কিংবা মহত্তর মানব-আদর্শের বিরোধী না হয়, সে বিষয়ে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। নৈতিক শক্তি ছাড়া কোনও শক্তির সাহায্যেই আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবোনা। মহাত্মাজীর আবির্ভাব যেন পূর্বে-থেকে উদ্ভাসিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে।

ভারতের জাতীয়-আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে বহু কবির কবিতা, গীতিকারের গান, কথাশিল্পীর আখ্যান, প্রবন্ধকারের রচনা। গোবিন্দ রায়ের 'শতকাল পরে' গোবিন্দ দাসের 'স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে', কামিনী কুমার ভট্টাচার্যের 'অবনত ভারত', দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধন-ধান্য পুষ্পভরা', অতুল প্রসাদের 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী,' রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,' সরলা দেবীর 'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী,' মুকুন্দদাসের যাত্রা, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের গীতিমালা অনেকেরই মনে আসবে। মনে পড়বে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সখারাম গণেশ দেউস্কর ব্রহ্মবান্ধব, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর বহু রচনা। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস দেশানুরাগের নিশ্চিত নিদর্শন। চলতি অর্থে না হলেও বিভূতিভূষণ [illegible] কি দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ নয়? জীবিত [illegible] তাদেরও অনেকের গ্রন্থেই [illegible] প্রীতির প[illegible]

[illegible] শেষ।
[illegible] এ যারে মাঠে তে
[illegible] পলো।
[illegible]

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

রমাপতির গাম্ভীর্যে বাকি সাতজন শঙ্কিত হয়ে উঠলো। কাজটা তাদের উচিত হয়নি। কালীপ্রসাদকে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। অন্ততঃ এসময়ে কার মনে কি আছে বলা যায়! বিষ না থাক্ কুলোপানা চক্কোর তো আছে। কাউকে না পাক নিজেকেই কামড়াবে।

রমাপতি বল্‌লেন, বলবার কিছু নেই, এরকম যে হ'বে আমি জানতুম! আর দরকার কি? ওদের ডেকে একটা মিটমাট করে ফেল এবার—সেই যখন শেষ পর্যন্ত করতেই হ'বে, ধ্যাষ্টামো করে' লাভ নেই! আজ কালী কাল শিবু, পরশু রাছু, তারপর আমি তুমি, সবাই এক এক করে সরে দাঁড়াব—এ আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। মতের মিল আমাদের কোনদিন হ'বে না, কারো কথা কারো সহ্য হ'বে না—

হতভম্বের মত মাথা হেঁট। সত্যি বোধের বড়। বুঝিয়ে বল্‌লে, নিজের মনে ক'রলে, কালীর কথা অমন মনেই হতো না কারো! বরং মায়ের বদলে মতের যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য মনে হ'তো। চাষা-ভুষোদের অমন তর কথা কাপুরুষতা। আভিজাত্য বংশ মর্যাদা, এসব তা হলে কি? সামান্য একটা প্রজা তা বলে মুখের ওপর দাঁড়িয়ে অপমান করবে! বললেই হ'লো—

মুখ নীচু করে' রাজচন্দ্র ক্ষেন ভরে ভরে বললে, আপনি যা করতে বলবেন—বলবার কিছু নেই। ক্ষেন ছাই উঠলো রমাপতির। বাইরে তেঁতুল গাছটার মাথায় একটা পেঁচাও ডেকে উঠলো সেই সময়।

তোমাদের যা খুসী কর। কি হ'বে আর পাঁচ মাথা এক করে—কালের ঢেউ হাত পেতে আটকান যাবে না। বরং মানে মানে—

আবার পেঁচাটা ডাকল, মনে হ'লো অন্তর্যামী যেন। রমাপতি হয়তো মনে ক'রতে পারেন, পেঁচার এমনি অস্বাভাবিক ডাক শৈশবে একবার যেন শুনেছিলেন। ঘুম ভেঙে ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল—ভেতর বাড়ির সে লিচু গাছটা এখন নেই, চোখ চেয়েই মনে হ'য়েছিল, ঝাঁকড়া চুলো এক অজগর দৈত্য তাঁদের বাড়িটাকে সমূলে উপড়ে ফেলবার জন্য হাতদুটোকে মাটির মধ্যে সাঁধ করিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভূমিকম্পের মত সব কাঁপছে।

তারপর হৈ-চৈ শব্দ শুনে রমাপতি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে রমাপতির, ডাকাতের মত কারা দল বেঁধে সেবারে তাদের বাড়ি লুট করতে এসেছিল।

ডাকাত নয়, একদল বিদ্রোহী প্রজা—বৈরাগী মহলের অঘোর নিঘোর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ! বাকি খাজনার দায়ে সর্বস্বান্ত হ'য়ে শেষ লাঠি-সোঁটার ওপর বেপরোয়া বিশ্বাস করেছিল! কিন্তু তাদের সে বিশ্বাস সেদিন ঠেকেনি। মায়ের চোটে প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়েছিল—অঘোর নিঘোর!

মনে আছে রমাপতির, কর্তারা সবাই সেদিন এক হ'য়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, মায়ের হুকুম দিয়েছিলেন—বর্শা-বল্লম নিয়ে রণাঙ্গনের সম্মুখেই ছিলেন অকুতোভয়ে। সে রণরঙ্গ মূর্তি আজো চোখের সামনে ভাসছে।

সাধে কি আর লোকে বলে, ঘোষবাবুরা ডাকাত ছিলেন—ওঁদের পূর্ব পুরুষ ডাকাতি করে পয়সা

করেছে! কলকাতাগঞ্জের খড়িবেড়ের ঐ জঙ্গল-কাশী ওঁদেরই প্রতিষ্ঠিত! ঘোষবাবুরা সব করতে পারেন। দিনকে রাত!

ওদিকে কখন বাড় লণ্ঠনের জোর কমে ভক্তাপোষের ওপর মানুষের ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়ে গেছে—চাদরে কালি পড়ার মত।

রমাপতি নড়ে চড়ে বসলেন। হঠাৎ কি ভেবে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যাও—ব্যবস্থা আমি করবো। ও-নেড়ের কত বাড় দেখে নেব। শিবু, তুমি তোমার কাজ ক'রো—কাগজ-পত্তরগুলো ঠিক রেখো!

আলো উস্কে দেওয়ার মত আশার সঞ্চার হয়। সাহস পেয়ে বিধুভূষণ বললে, আজকে বলে নয়, নেড়েগুলো চিরকাল অমনি, নেমকহারামি ওদের পেশা। বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াতে চায় এখন—দেখলেন না দাঙ্গার সময় ভিজে বেড়ালটি! তারপর একটু সুবিধে হ'তে ঐ বেটা চাষাদের চ্যাটাং চ্যাটাং কিরকম কথা! তখনি বেটাদের মেরে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। নেড়ের নেই ইষ্টি, তেঁতুলের নেই মিষ্টি। কোন লাভ নেই ওদের পুষে।

কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষকে আজ পোষণ করার মালিক কে? উদয়পুরের ঘোষবাবুরা না, আর কেউ? বর্ণ বৈষম্য, জাতিভেদ করবে কে? ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পৃথক করে দেখবার দিন চলে গেছে। মুসলমান বলে যেমন অনাদর নেই, তেমনি আবার হিন্দু বলে খাতির নেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাছে।

রমাপতি বললেন, আমাদের গাঁয়ের লোকগুলোই হ'য়েছে পাজি, ওরা যদি ঠিক থাকতো একবার দেখে নিতুম ঐ নারাণকে! ঘরই বিগড়ে গেছে। সাধির ঢেঁকি আজ মাথায় উঠতে চাইছে। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে তারও দাম চোদ্দসিকে! বলবার কিছু নেই দেখে যাও, খুব সাবধান সব!

রমাপতি চুপ করলেন। চোখের ওপর বিগত কালের ছবিটা ভেসে ওঠে—সে একদিন ছিল, সে একদিন গেছে, জুতোর আগায় সব টিট্ থাকতো, টুঁ শব্দটা পর্য্যন্ত কেউ করতে পারতো না—বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো ঘোষেদের নাম শুনলে! কোথায় ছিল তখন ঐ বেণী, ঐ বৈকুণ্ঠ—ঘুণাক্ষরে ভাবা যায়নি ওদের কথা! কোন অবকাশ না দিয়েই যেন পরিবর্তনটা ঘটালো—মানুষ সব বদলে গেল!

রাজচন্দ্র বললে, পীতাম্বর ছেন মনিষ্যি সেও নাকাচ্ছে! তার কথা যদি শুনতেন—

রমাপতি বললেন, কে পীতাম্বর?

অদ্বৈত বসুদের বেটা। বড় লায়েক হয়েচে আজকাল – শিড়িং শিড়িং আরম্ভ করেচে—

অদ্বৈত! রমাপতি নামটা উচ্চারণ করে হঠাৎ থেমে যান।

রাজচন্দ্র পরিচয় সম্পূর্ণ করলে, উদ্ধবের ছোট ভাই, ওরা ভাই-এ ভাই-এ বিবাদ করে উচ্ছন্নে গেল।

ও। রমাপতি কি যেন ভাবতে লাগলেন। মনে পড়ছে বোধ হয় তাঁর আগাগোড়া ব্যাপারটা। উদ্ধব-অদ্বৈতের বিবাদে তাঁরাই লোকটির কাজ করেছিলেন। ফল হয়েছে এখন, সব চেয়ে পুরোন বংশ সব চেয়ে হীন হ'য়ে আছে—তিন কাঠা, তিন ছটাক, দু'কড়া দু' কাক এক তিল বাস্তু ছাড়া আর কিছু নেই নিজের বলতে। উদ্ধবের ছেলেরা বহুকাল গ্রাম ছেড়েছে, অদ্বৈতের বংশ ঐ পীতাম্বর এখনো আছে—দিন মজুরী করে।

রমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কি বলে? বলে জুটেছে বুঝি!

সবার চেয়ে তার রোকটাই বেশি। ঘরে বসে বসে কি সব করে নাকি! বিধু বললে। আর সবাই হাসলে।

আড়ালে রাজার মাকে ডান বলে? রমাপতি হাসিতে যোগ দেন না। বলুক—আপনিই খেমে যাবে!

তা হ'লে তো হ'তো—বলে বেড়াচ্ছে বাবুরা ওদের বিষয় কাঁকি দিয়ে নিয়েচে—এত বিষয় তেতো বিষয়! রাজচন্দ্র বললে।

হঠাৎ রমাপতি রেগে ওঠেন: শুনে তোমরা চুপ করে' থাক? বেটার মুখে দু'ঘা জুতো মারতে পার না! বাবুদের বড় অভাব, ওদের বিষয় না মারলে চলবে কেন—হারামজাদার ভারী স্পর্ধা হ'য়েচে তো! এ্যাং, ব্যাঙ, খোলসে-পুটি তারও কত!

কিন্তু কাকায় সত্যিকারের রাগের কারণ কি? প্রথমে তো তাদের অনেক ভাবে গালাগাল দিচ্ছে, আড়ালে কিছু তো আর বলতে বাকি রাখছে না!

বেশীই ওকে আস্কারা দিচ্ছে। রমাপতি বলতে

লাগে. অত কথা না হ'লে আর বিশ্বাস কার কাছে! তুমি বেণীর ওখানে আর দাস পড়ে থাকে রাতদিন।

বসে আছে যে। বলেই অমূল্য মাথা হেঁট করে। সামান্য চাষী দিন-মজুরের সম্বন্ধে এধরণের মন্তব্য অসাক্ষাতে হ'লেও শোভা পায় না।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। রসটা কি?

কিছু হয়তো না, কি শুনেছে কার কাছে—বেণীর ঘরে রসের ঘর বাবুরাই বা জানবেন কি করে! তা ছাড়া জাত—প্রতিবেশী ওরা! রসে-রসে দরকার কি!

সে ছিল অদ্বৈত, রসে টগ-মগ্ করতো রাত-দিন। শেষ বয়সে বড় রসের কথা বলতো, গান বাঁধতো রসের—কাজ করতো, কাচের চুড়ি ফিরি! মামলায় সর্বস্বান্ত হ'য়ে লোকটা গান-পাগলা হ'য়ে গিয়েছিল—হাসার জন্তে এতটুকুও ক্ষোভ ছিলনা মনে।

বাপের মত হ'য়েছে ছেলেটা। রমাপতি বললেন, চুড়ি ফিরির নামে যত নজ্জারগিরি ক'রে বেড়াত অদ্বৈত শেষ বয়সে। বেটারছেলে এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের এখানে খেয়ে-পরে মানুষ হ'য়েছে। আজ বড় লায়েক হ'য়েছে, দেখনি! কি বলে শুনি?—

ওদের সব বিষয় নাকি আমরা মেরে খেয়েচি! তাদের ঠকিয়ে জুয়াচুরি দিয়ে আমরা ভাগ ক'রে নিয়েচি সেগুলো থাকলে আজ দেখে নিতো আমাদের সবাইকে।

হাসির কথা, হাসি, ওঠে। সত্যি-মিথ্যে কে জানে। জমিদার কাগজপত্র মুখস্থ শিবশঙ্করের, বললে, ক ছটাক বিষয় ছিল পীতাম্বরের শুনি? ঐ বাস্তুটা না-হয় বাস জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত, আর কি ছিল প্রথমে নিজ নামে ওদের! জমিদারের ঘরে দাখিলে ঘর করতে পারে ওতখানা তো বুঝি।

রাজেন্দ্র বললে, এ রসুন তো বলা ভাল নয়! বলতে বলতে শেষটা কোথায় পৌঁছাবে বুঝতে পারছেন?

এও এক চাল ঐ লীডারটার—পুরোণ বংশ ধরে উস্কে দিচ্ছে, মুখে মুখে দাবি তো করু, তারপর দেখা যাবে। চালাকি বড় নয়।

সেদিন শুনলুম, জগমোহিনীর নামে জমাটা ঐ অদ্বৈত-উদ্ধবের বিধবা পিসির নামে। জমিদারের ঘরের হাত-চিঠি আছে, দাখিলা কাটা হয়নি। রমাপতি চুপ ক'রে শোনেন। সত্যি-মিথ্যে তিনি জানেন হয়তো। মোহিনী বলে অসামান্য সুন্দরী একজন মেয়েছেলে ছিল বটে ঐ মোড়ল পাড়ায়—উদ্ধবদের বাড়ি থেকে প্রায়ই আসতো বাবুদের খামার পেরিয়ে কনে-ঠাকুমার ঘরে। ঝি-এর কাজ করতো বুঝি বাবুদের বাড়ি!

না, বয়েস হলে রমাপতি জানতে পারে ব্যাপারটা। মোহিনী চাষার মেয়ে, তার বালবিধবা—জ্ঞাতি গোত্রের আলায়, শ্বশুর ঘর ত্যাগ ক'রে ভায়েদের কাছে আশ্রয়ের জন্তে উদয়পুরে ফিরে এসেছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু বিষয় আশয়, পেয়েছিল স্বামীর। কিন্তু ভায়েরা তখন নাবালক, গার্জেন ছিলেবে মেধকর্তা জগদিন্দ্রনাথকে ধ'রে পড়েছিল—জ্ঞাতিরা যাতে ভয় পায় বাবুদের নাম শুনে। কনে-ঠাকুমাকে ধরম মা বলেছিল।

মোহিনীর জ্ঞাতিদের কাছ থেকে জগদিন্দ্র তার বিষয়ের পাই-পয়সা বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু জমি-জমা অদল-বদল ক'রে নিয়েছিল এই গ্রামে। মোহিনী কি বোঝে, কনে-ঠাকুমার কাছে দুবেলা আসতে পেলেই সে বর্তে যেত।

তারপরের কথায় লোকে নানা কদর্থ করে। জগ-মোহিনী নাম নাকি ঐ দু'জনের নাম জুড়ে সৃষ্টি হ'য়েছে—মোহিনীর সর্বস্ব বাবুই লাভ করেছিলেন!

যদিও ঘোষবংশের কুলজীতে জগমোহিনী নামে এক-জন নিঃসন্তান মহিলার নাম পাওয়া যায়! স্বামীর মৃত্যুতে অংশমত বিষয়ের অধিকারিণী ছিলেন তিনি বহুদিন, ভাসুর দেবরকে তিনি বড় একটা আমলই দিতেন না—এক সময় 'পপার' সুটও করেছিলেন নিজের দাবী আদায় করতে। তীর্থপর্যটনে নিখোঁজ না হ'লে পার্টিশান সুটে আরো একটা অংশ বেড়ে যেত—এককালে তাঁর নেওয়া দত্তক-পুত্রের বংশধররা আজো পাশের গ্রাম শ্যামসুন্দরপুরে অতি হীন অবস্থায় বাস করছে।

রমাপতি বললেন, পীতাম্বরকে এবার দাখিলা কাটিয়ে আসতে বলো। হাত-চিঠে যখন আছে আর ভাবনা কি। ঘা কতক জুতো মারতে পারো শালাকে—

জুতো ও আপনিই খাবে। ঐ বেণীই মারবে। অমূল্য রতন আর থাকতে পারলে না।

রমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কি হ'লো আবার ওদের মধ্যে?

সাধে বলি রস। যা শুনলুম……দেখুন না ক'দিন টেঁকে—বেণীর বাড়ি আড্ডা মামে কি? ও বেটার শেষ হ'লো। [ক্রমশঃ

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু সে.]

মৌর্য-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়—চীন-পরিব্রাজক ভারত-ভ্রমণে এসে দেখ্‌লেন—এদেশে চুরি ডাকাতি কাকে বলে, কেউ জানে না। দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি। আজকের বিংশ-শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ব'সে আমরাও তেম্‌নি আশ্চর্য হ'য়ে যাই--কি ভাবে সেই ভারত তার সেই স্বভাব-সুন্দর সমাজ-জীবন থেকে স্খলিত হ'তে হ'তে আজ পাপের পঙ্ককুণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে! চুরি-ডাকাতি আজ যেমন যথেচ্ছ হচ্ছে, তেম্‌নি প্রশ্রয়ও পাচ্ছে। সরকারী দপ্তর, পৌর প্রতিষ্ঠান আর বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সুরু ক'রে নিভৃততম মুদীর দোকান পর্যন্ত সর্বত্র আজ চুরি-ডাকাতির সংবাদে কণ্টকিত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে, সন্তার সৃষ্টি হ'য়েছে, অথচ সেই অনুপাতে অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হ'য়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে বহু জাতির সংমিশ্রণে ও বহু ভাবধারার সংঘাতে এদেশের মানুষ তার নিজের গতি লঙ্ঘন ক'রেছে। তার ফলে সে জাগতিক ক্ষেত্রে উদার হ'য়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু মনুষ্যত্ববোধের জাতীয়বৃত্তি ক্রমে ক্ষয়িত হ'য়েছে। এই ক্ষয় যখন ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়ালো, তখনই ঘট্‌লো বিপর্যয়। সেই বিপর্যয়ের মুখ বন্ধ করবার জন্য যে পরিমাণ কৃচ্ছ্রতা ও জীবন-সাধনা এবং সেইসঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন, তার পুরোপুরি অভাব ঘট্‌লো। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা ঐতিহাসিক দর্শন হ'য়েই পণ্ডিতদের মাথায় ভর ক'রে রইল, জন-সাধারণ তা নিয়ে জানতেও গেলনা কিছু। এম্‌নি করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাস তার ঊর্ধ্বতন জীবনবোধ থেকে অধস্তন কৃষিকবৃত্তির পথে নেমে এলো। সমাজের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষ চাইলেন তাঁদের জ্ঞানাঞ্জনী স্পর্শে দেশের চিত্তকে শোধন ক'রতে, কিন্তু স্বার্থান্বেষী বৃহত্তর সমাজ-জীবন তা গ্রহণ ক'রলো না। ফলে সমাজে দুর্যোধনদের পাপ বেড়ে চ'ল্‌লো, ন্যায়াচরণের ক্ষেত্রে অর্জুনদের গাণ্ডীব সপ্তরথীর চক্রব্যূহের দ্বার থেকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে এলো। আজকের বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজ-জীবন এই সাক্ষ্যই বহন ক'রে চলেছে।

এই মনোবৃত্তির জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই যাঁরা একমাত্র দায়ী ক'রে থাকেন, তাঁরা কাল দর্শক। অভাবের তাড়না থেকে চৌর্যবৃত্তি দাঁড়ায় সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজে এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছে—যাদের চৌর্যবৃত্তি একটা অভ্যাস। ডাকাতির ব্যাপারটাও অনুরূপ। এমন বহু ডাকাতের দল আছে, যারা একমাত্র দলের স্বার্থেই বৃত্তি হিসেবে এটাকে গ্রহণ ক'রেছে। যারা খুদে গুণ্ডা, তারা এদের চেলা।

তেম্‌নি বর্তমান সামাজিক অপকৃষ্টতার আর একটি বড় দিক হ'চ্ছে 'ভেজাল'। যারা এই ভেজাল ব্যবসায়ী, তারাও একশ্রেণীর বড় ডাকাত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই ডাকাতি যত বেড়েছে, সংখ্যানুপাতের দিক থেকে পূর্বে এতটা প্রসার লাভ করেনি। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নানা দেশের মানুষ এসে ভিড় ক'রলো এদেশে। বাড়্‌তির পথে এগিয়ে গেল লোক-সংখ্যা। এদেশের উৎপাদনে টান প'ড়লো। দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘ'ট্‌লো, কিন্তু উৎপাদন-স্ফীতি ঘ'ট্‌লো না। ফলে একসেরকে ভেজাল মিশিয়ে দেড় সের ক'রতে চ'লো, দেড়সেরকে দু'সের। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেজালে ভরে গেল বাজার। দুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল, অষুধে ভেজাল : চালে কাঁকরের ভেজাল। মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য গ'ড়ে উঠ্‌বার যে যে মুখ্য উপাদান—সেইখানেই ভেজাল এসে বাসা বাঁধ্‌লো। ফলে রোগগুলো সংক্রামক হ'য়ে উঠ্‌লো, মৃত্যুহার বেড়ে গেল। পশ্যজগতের যারা ব্যবসায়ী, তাদের ব্যবসা কিন্তু তাতে বন্ধ হ'লো না, বরং লাভের অঙ্কে চতুর্গুণ দশগুণ হ'য়ে দাঁড়ালো। দেশের মানুষ চেষ্টা ক'রে-পাক্‌লোনা এই ভেজাল বন্ধ ক'রতে, বরং তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে বিষুপ্তি হ'য়ে ম'রলো। সরকারী দপ্তর নিঃস্পৃহ এবং নিষ্ক্রিয়। ফলে ব্যবসাদারদের গদি আরও বেশী মোটা ও মজবুৎ হ'লো। একসময় যুদ্ধের দামামা থেমে গেল বটে, কিন্তু ভেজাল বন্ধ হ'লোনা। ক্রমে অবস্থাটা এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, কেউ এসে খাঁটি মাল নিয়ে বাজারে ব'স্‌লেও তাকে ভেজাল ব'লে সন্দেহ ক'রলো মানুষ। সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য নিয়মেই মানুষের মন এমন সন্দেহগ্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তেম্‌নি ব্যবসাদারীরাও ভেজাল-ব্যবসায়ে এত বেশী মোহগ্রস্ত হ'য়ে পড়লো যে, এর বাইরে খাঁটি জিনিষ সম্পর্কে আর মাথা দেবার অবকাশ পেলো না। কাঞ্চনের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ, এক একটি ব্যবসায়ী সেই কাঞ্চনসিদ্ধ পুরুষ হ'য়ে নিজেদের দেহের মেদ বাড়ালো,

কিন্তু দেশের ম ।ষ যে তাতে টিঁকলো না, তা নিয়ে তাদের ভাবনা নেই। চোরাকারবারের কালো গলি তাদের কাঞ্চনের শুশ্রূষায় ভ'রে উঠ্‌লো, অথচ সেই মাটির নিচেই জাতির কঙ্কাল প্রোথিত হতে লাগ্‌লো।

এক কলকাতা সহরের বাজারগুলিতে দুধের ব্যবসা চলে, সেদিকে লক্ষ্য করলেই ভেজালের উৎকট প্রমাণ মিল্‌বে। বাজারের অধিকাংশ দুধই বাইরে থেকে আমদানী এবং সব দুধেই দশ আনা থেকে বারো আনা ভেজাল। এক টাকা ক'রে যে খাঁটি দুধ, তার অর্ধেক খাঁটি, অর্ধেক জল। এই দুধ পরীক্ষা ক'রে তবে বাজারে ছাড়বার কোনোরকম সরকারী বা পৌর-ব্যবস্থা নেই। পৌর-প্রতিষ্ঠান থেকে স্যানিটারি ইন্‌স্‌পেক্টরদের সাহায্যে এরকম পরীক্ষাকার্য চল্‌বার রীতি আছে, কিন্তু সেই রীতি অহরহ কোথাও সক্রিয় নিয়মের দ্বারা ব্যবস্থিত নয়। দেশের শিশুরা এই ভেজাল দুধ খেয়ে অকালে জরাগ্রস্ত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'চ্ছে। ব্যবসায়ী ডাকাতেরা ছুরি দিয়ে গলা না কেটে অলক্ষ্যে থেকে তিলে তিলে শুষে নিচ্ছে শিশুদের প্রাণশক্তি। দেশের অক্ষম বাপ-মায়েরা পারছে না এই ডাকাতদের মুখোস খুলে দিয়ে জাতিকে বাঁচাতে। অথচ ঠিক একই সময়ে বিলেতের একটি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমরা চমৎকৃত হই।

সেখানকার হাসপাতালগুলিতে ডাক্তারেরা পরীক্ষাকার্য চ'লিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সেখানকার সাম্প্রতিক ক্যানসাররোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাম্রকূট সেবনের ফলে ঘটেছে। এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিলেতের যত তাম্রকূট ব্যবসায়ী, একত্রে টাকা তুলে হাসপাতালের ডাক্তারদের চাতে দিয়ে ব'লেছে—পরীক্ষা-কার্য আরও ভালোমতো হোক্‌। যদি তাম্রকূট সেবনই ক্যান্‌সারের একটি অন্যতম কারণ ব'লে স্থিরীকৃত হয়, তবে সদলে তারা এ ব্যবসা ত্যাগ ক'রে স্বতন্ত্র ব্যবসা গ্রহণ করবে।

বিষয়টি বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। এমন ঘটনা আমাদের দেশে ঘট্‌লে হয়ত তাম্রকূট ব্যবসায়ীরা ডাক্তারদের গোপনে অপরিমিত উৎকোচ দিয়ে মন্তব্য লিখিয়ে নিতো যে, ক্যান্‌সার রোগের পক্ষে তাম্রকূট আদৌ কোনো মারাত্মক কারণ নয়। একথা বলার অর্থ হ'চ্ছে এই যে, এদেশে ভেজাল আজ শুধু পণ্যেই নয়, পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে এসেও ঠাঁই নিয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা বা সংস্কারের সঙ্গে যখন কোনো জিনিষ মিশে যায়, তখন তা বড় মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ সেই মারাত্মক ক্রিয়া সংক্রামিত হ'য়ে চ'লেছে। এথেকে আপাতত উদ্ধার পাবার প্রধানতঃ তিনটি সক্রিয় কার্য গ্রহণীয়। যথা—

(১) সরকারী তৎপরতা। আক্সাবান পুলিশ ও পুলিশ অফিসারদের দিয়ে সর্বত্র অনুসন্ধান ক'রে ভেজাল ব্যবসায়ীকে তার যথোপযোগী শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(২) পৌর-প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে স্যানিটারী ইন্‌স-পেক্টর নিযুক্ত ক'রে যে বাজারে যত ভেজাল আছে, তা নষ্ট করে দেওয়া। এবং

(৩) জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভেজাল বস্তুকে পুরোপুরি বয়কট করা।

এই তিনটি পদ্ধতিতে কার্যক্রম সুরু হ'লে অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাবে—বাজার থেকে ভেজাল উধাও হ'য়েছে। এজন্য সরকারী দপ্তর ও পৌর-প্রতিষ্ঠানকে যতখানি কঠোর হ'তে হবে, তার চাইতে আরও বেশী কঠোর হবার প্রয়োজন জনসাধারণের। জনসাধারণের হাতে গিয়ে যদি বাজারের জাল না উঠলো, তবে ব্যবসা চল্‌বে কাকে নিয়ে? অতএব এক্ষেত্রে কর্মধারার প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ থেকে তৃতীয় অনুচ্ছেদটি অধিক কার্যকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এদেশের জনসাধারণ ট্রামভাড়া আন্দোলন নিয়ে সংগ্রাম করলেও জীবনীশক্তির মূল আন্দোলনের ক্ষেত্রে একেবারেই নিঃস্পৃহ। তাদের এই নিঃস্পৃহতা সমাজকে আরও বেশী পঙ্গু ক'রে তুলছে। যারা এই ভেজাল-ব্যবসায়ী, তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু জ্ঞানপাপী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মেধা যেখানে এই অশিক্ষিত ব্যক্তিদের দুশ্চরিত্রতার রজ্জুতে আবদ্ধ, সেখানেই সমাজের সব চাইতে বড় মৃত্যু। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরই আজ সমাজ-পাঠ গ্রহণ করবার প্রয়োজন। যে নিবীর্য নিঃস্পৃহতার অন্ধকারে এদেশের সরকারী শাসন এতকাল আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, আমরা মনে করবো—বিগত সাত বছরের স্বাধীন ভারত-সরকার তার প্রায়শ্চিত্ত করে জাতীয়-জীবনের এই মহাপাপ অপনোদনে অবিলম্বে যত্নবান হবেন। এদেশের জাতীয় চরিত্রকে যদি তার অতীত ঐতিহ্যমুখী করে আগামীকালের মধ্যে মিশিয়ে দিতে না পারা যায়, তবে আজকের জাতীয় চরিত্রের এই আভ্যন্তরীণ দিকের উন্নতির কোনো আশার আলোই লক্ষ্যে পড়বার মতো নয়। এ সম্পর্কে সরকার, পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সেবক সম্প্রদায় ও জনসাধারণ একসঙ্গে যত্নবান ও হুঁশিয়ার হোন, দেশকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলুন।

মণিপুর প্রসঙ্গ (১০)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

মহারাজ সুরচন্দ্র (১৮৮৬-১৮৯০)

মহারাজ চন্দ্রকীর্তি আট স্ত্রী এবং ১০ পুত্র রাখিয়া ১৮৮৬ সনের শ্রীষ্মকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। যে স্ত্রীর গর্ভে যে যে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহাদিগকে যে সমস্ত পদে নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রথমা রাণীর গর্ভে—১। সুরচন্দ্র (মহারাজ)।
২। তৈরজিৎ বা পাঙ্কাম্বা (শ্যোল হঞ্জুবা পদ—অশ্বাধ্যক্ষ)।
কেশর জিৎ (শামুহ হঞ্জুবা পদ—অর্থাৎ গজাধ্যক্ষ ; মহারাজের সৈন্য বিভাগে তখন ৬০টি গজ ছিল)।
পদ্মলোচন বা গোপালদা (দোলাইরোই হঞ্জুবা পদ—অর্থাৎ শিবিকাধ্যক্ষ)।

দ্বিতীয়া রাণীর গর্ভে—কুলচন্দ্র (যুবরাজ পদ) ; গাম্ভীর সিং।

তৃতীয়া রাণীর গর্ভে—টিকেন্দ্র জিৎ বা কৈরেং সিং (সেনাপতি পদ)

চতুর্থী রাণীর গর্ভে—বালকীর্তি সিং। প্রধান সেনাপতি পদ।

পঞ্চমী রাণীর গর্ভে—অহৌবা (তুমুলখোঙ্গী অফিসার পদ—মণিপুর-ব্রহ্ম পথের অধ্যক্ষ)

ষষ্ঠী রাণীর গর্ভে—জিল্লাউবা (নাবালক থাকায়—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকেও কোন উচ্চপদ দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল)

সপ্তমী এবং অষ্টমী রাণী—নিঃসন্তান ছিলেন।

(পূর্বানুবৃত্তি)

চন্দ্রকীর্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র বড়া চাওবা ও কনিষ্ঠপুত্র মেকজিন সিং সদলবলে রাজধানী আক্রমণ করেন। পিতৃশোকে কাতর টিকেন্দ্র জিৎ শত্রুঘ্ন এবাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। নরসিংহের পুত্রদ্বয় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সুরচন্দ্রের যথাবিধি রাজ্যাভিষেকের পর ৪ মাস শান্তিতেই কাটে। ইতিমধ্যে বালকীর্তির মৃত্যু হওয়ায় টিকেন্দ্রজিৎকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। নরসিংহের পুত্রদের অর্থবল, জনবল এবং প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। তাহারা দুই হাজার সৈন্য ও তদনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনরায় রাজধানীর উপর সতর্কিতভাবে হামলা করে। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হন। তুমুল সংগ্রামের ফলে সরকারী সৈন্যের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। মহারাজা পলিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্টার গ্রিম-রোডের নিকট সামরিক সাহায্যের আবেদন করেন। অনেক বিবেচনার পর মাত্র একশত সিপাহী টিকেন্দ্রজিতের সাহায্যার্থ পাঠান হইল। আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় মহারাজের পক্ষের লোকজনের মনে অত্যন্ত নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সৈন্য-দলের মধ্যে সাহস ও উদ্যম ফিরাইয়া আনিয়া অমিত-বিক্রমে বিপক্ষের উপর আক্রমণ চালান। অবশেষে বড়াচাওবা ও মেকজিন উভয়ে পরাজিত এবং বন্দী হইয়া ইংরেজের হস্তে অর্পিত হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে মাসিক ৬০৲ টাকা এবং কনিষ্ঠকে মাসিক ২০৲ টাকা হারে ভাতা দিয়া হাজারিবাগে নজর-বন্দী অবস্থায় রাখা হয়।

বড়াচাওবার আক্রমণের এক বৎসরের মধ্যেই

১৮৫৩ সনে অনন্তের পরলোকগত মন্ত্রী তুবন সিংহের পুত্র ওয়াং থৈরাকপা সহসা একদিন সদলবলে রাজধানী আক্রমণ করে। টিকেন্দ্রজিৎ দোলাইরোই হঞ্জুবাকে সঙ্গে লইয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু ইংরেজের নিকট হইতে তখন কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। টিকেন্দ্রজিৎ কৌশলে বিপক্ষের বাহিনীকে বেষ্টনমধ্যে ফেলিয়া পরাজিত করেন। ওয়াং থৈরাকপা পুরোপুরি যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপ সাফল্যের জন্য মহারাজা এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট টিকেন্দ্রজিৎকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

ইংরেজের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় মণিপুর সরকার, পলিটিক্যাল এজেন্ট ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। ছোটখাট ঘটনার মধ্যে এই বিরক্তির আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে। এক সময় পলিটিক্যাল এজেন্সীর কতিপয় প্রহরী কোন কিছুমাত্র ব্যতীত মণিপুরীদের দ্বারা প্রহৃত হয়, আর এক সময় কতিপয় লোক সরকারী ডাকপিয়নের নিকট হইতে ডাকের থলি ছিনাইয়া লয়। এই সব ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় পলিটিক্যাল এজেন্সীর প্রভাব তখন একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে যোগ্য লোক এবং তাহার সমর্থনে ছোট একটি বাহিনী থাকিলে এজেন্সীর প্রভাব এই ভাবে ক্ষুণ্ণ হইত না।

১৮৮৭ সনে মণিপুর সরকার আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়। রাজ্যের সীমান্তবাসী,—কুকিদের দলপতি তমহর সহিত একজন রাজকর্মচারীর মতান্তর ঘটে। কর্মচারীটি কিছু অসঙ্গত পার্বণী চাওয়াতেই ইহার সূত্রপাত হয়। তমহ সেই কর্মচারীকে তাহার এলাকায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। তাহা সত্ত্বেও সে পূর্বের মত সেখানে যাতায়াত করিতে থাকে। তমহ তখন তাহার বিরুদ্ধে মহারাজের নিকট নালিশ জানায়। কিন্তু সঠিকভাবে নির্দশন এবং সাক্ষী দ্বারা অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারায় উক্ত কর্মচারীকে কোন শাস্তি দেওয়া গেল না। তমহ ক্ষুব্ধ চিত্তে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চায়েতের দ্বারা মহারাজকে স্পষ্টভাবে এই কথা জানাইয়া দিল যে, যে পর্যন্ত উক্ত কর্মচারীকে স্থানান্তরিত করা না হয় সেই পর্যন্ত কুকিগণ রাজকর অথবা কোন বেগার দিবে না। মহারাজা নানাভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তখন সৈন্য পাঠাইলেন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে চতুর্দিকে কুকিদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এই বাহিনী পরাজিত হয়। রাজসৈন্যের এইরূপ পরাজয়ে তমহর স্পর্ধা আরও বাড়িয়া যায়। তাহাকে সহজে দমন করা যাইবে না দেখিয়া মহারাজ সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ বহু সৈন্য লইয়া সমগ্র বিদ্রোহী অঞ্চল ঘেরিয়া ফেলিলেন। কুকিগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। তমহকে বন্দী অবস্থায় রাজধানীতে আনা হইল। এই ব্যাপারে টিকেন্দ্রজিতের খ্যাতি আরও বাড়িয়া গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ তমহ কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার না করায় তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইল। সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত কুকি নেতার নিকট কারাগারের বন্দী জীবন অল্পদিনের মধ্যেই দুর্বিষহ বোধ হইতে লাগিল; সে তখন মহারাজের নিকট কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাহিয়া মুক্তির প্রার্থনা জানাইল। মহারাজা ইতিপূর্বেই অভিযুক্ত কর্মচারীটিকে অপসারিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তমহর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন।

কুকিযুদ্ধের প্রায় এক বৎসর পর ১৮৮৮ সনে যোগীন্দ্র সিং নামক এক ব্যক্তি কাছাড় প্রবাসী পাঁচশত মণিপুরী সংগ্রহ করিয়া মণিপুরের সিংহাসন অধিকার করার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বাধা দেয়। যুদ্ধে যোগীন্দ্র নিহত হয়।

মহারাজের সহোদর ভ্রাতা পাকাম্বার সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের বাল্যকাল হইতেই কোন সদ্ভাব ছিল না। টিকেন্দ্রজিৎ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর পাকাম্বাকে তাঁহার অধীনে কাজ করিতে হয়। ইহা তাঁহার পক্ষে আরও মনোবেদনার কারণ হয়। বড়া চাওবা, ওয়াং খৈরাকপা এবং অবশেষে দুর্দান্ত কুকি-দিগকে কৃতিত্বের সহিত পরাজিত করিয়া বারবার মণিপুরের সিংহাসন বিপন্মুক্ত করিতে সমর্থ হওয়ায় রাজ-দরবারে এবং প্রজাদের মধ্যে তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। ইহাতে পাকাম্বার অন্তরে ঈর্ষার অনল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি হইতেছেন মহারাজের সহোদর ভ্রাতা, সেইজন্য তিনি অপরাপর বৈমাত্রেয়দের চেয়ে অধিকতর সম্মান এবং খাতির পাইতে আশা করিতেন। পদমর্যাদায় যুবরাজ কুলচন্দ্রের স্থান ছিল মহারাজের নীচেই। সেই জন্য তাঁহার প্রতিও তিনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন কিন্তু লেখাপড়ায় এবং বৈষয়িক বুদ্ধিতে তিনি অপরাপর ভ্রাতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট অহঙ্কার ছিল। কথায় বার্তায় চাল-চলনে তাঁহার এই বিকৃত মনোভাব সর্বদাই লোককে পীড়া দিত। টিকেন্দ্র জিতের সঙ্গে পাকাম্বার মন কষাকষির আরও একটি কারণ ছিল। তাঁহারা উভয়ে মাইপাকবী নামক এক ধনাঢ্য স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর সুন্দরী কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রণয় লাভের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মাইপাকবী তখন ষোড়শী যুবতী। লম্বা এবং নিখুঁত গড়ন; সোনার বরণ তনু, ঘন এবং দীর্ঘ ভ্রমর কালো কেশ, সব কিছু মিলিয়া মণিপুরের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। নানারকম স্বর্ণালঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র পরিয়া থাকায় তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত। মাইপাকবী নৃত্য-কলায়ও পারদর্শী ছিল। তাহার পিতা রাজদরবারে একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন।

পাকাম্বা কোন রকমেই টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া নিজের সহোদর ভাইদিগকে তাঁহার দলে আনিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশরজিৎ ও গোপাল-কাকে পক্ষে আনিতে বেশী দেরী হইল না। মহারাজা চূড়াচন্দ্র ধার্মিক এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এই সব পারিবারিক কলহের ঊর্ধ্বে থাকায় পাকাম্বা তাঁহার নিকট নিজের অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেন না। পাকাম্বার 'তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া টিকেন্দ্রজিৎও বসিয়াছিলেন না। কুলচন্দ্র এবং টিকেন্দ্রজিৎ বৈমাত্রেয় হইলেও দুই সহোদরা ভগ্নীর গর্ভজ সন্তান। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। অপরাপর বৈমাত্রেয় ভাইগণও পাকাম্বার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত থাকায় টিকেন্দ্রজিতের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের দুঃখকষ্ট এবং মনোবেদনা লাঘবের জন্য তিনি সর্বদাই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ফলে দলাদলিতেও টিকেন্দ্রজিৎ পাকাম্বার উপর দিয়া গেলেন। সুতরাং এই উপায়ে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা কম দেখায়—পাকাম্বা তখন অন্য পথ ধরিলেন; তিনি মহারাজের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য রাজকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। লেখাপড়া জানা থাকায় এই কাজে অতি সহজেই তিনি মহারাজের আস্থা-ভাজন হইয়া উঠিলেন। লোকেও তখন তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতে লাগিল। মহারাজা রাজকার্যে পাকাম্বার বুদ্ধি এবং নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। এতদিন পর যুবরাজ এবং সেনাপতিকে জব্দ করার সুযোগ আসিল। বিচার বিভাগের উপর কর্তৃত্বভার ছিল যুবরাজের হাতে। পাকাম্বা তাঁহার কার্যের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ধরাইয়া দিয়া এই বিষয়ে তাঁহার অযোগ্যতা সম্বন্ধে মহারাজার মনে ধারণা জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। এই ব্যাপারে পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রীমউড সাহেবও পাকাম্বাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজা তখন স্বতন্ত্র বিচার সচিবের পদ সৃষ্টি করিয়া পাকাম্বাকে বিচার বিভাগের ভার দেন। এইভাবে পদচ্যুত হওয়ায় যুবরাজ কুলচন্দ্র যথেষ্ট

মর্মাহত হইয়াছিলেন। যুবরাজকে এইভাবে কাবু করার পর পাঙ্কাম্বা টিকেন্দ্রজিতের প্রতি মনোযোগ দিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নানা কাহিনী মহারাজের কানে লাগাইয়া তাঁহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমাগত এইরূপ বিষ ঢালার ফলে মহারাজার মনও বিষাক্ত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ মহারাজের পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়ায় টিকেন্দ্রজিৎকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সমস্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে সংহতি আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন অনিষ্ট হইলে টিকেন্দ্রজিৎ তাহা নিজেরই ক্ষতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সর্বকনিষ্ঠ রাজভ্রাতা ভিক্রাওম্বা টিকেন্দ্রজিতের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সেইজন্য পাঙ্কাম্বা তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেন। আদালতে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার বিবৃতিতে বলেন —"আমাদের পিতার মৃত্যুর সময় সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমার ভিক্রাওম্বার বয়স ৯।১০ বৎসর মাত্র ছিল। রাজকীয় কোন পদ বা সম্মান তাহাকে প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার বয়স বাড়িতেছে আনুষঙ্গিক খরচপত্র বাড়িয়াছে কিন্তু মহারাজ শূরচন্দ্র তাঁহার মাসহারা বাড়াইয়া দেন নাই। নানা সময়ে তাঁহাকে নানারূপে অত্যাচরিত ও অপমানিত করা হইয়াছে। মণিপুর রাজবংশধরগণ বাড়ীর বাহির হইলে বা কোথাও গেলে, শিঙ্গা বাজাইবার রীতি আছে। ভিক্রাওম্বা একদিন বাহিরে যাইবার সময় শিঙ্গা বাজিতেছিল। 'এইরূপ শিঙ্গা বাজান অপরাধ হইতেছে —মহারাজের অপমান করা হইতেছে' ইত্যাদি রূপ বলিয়া পাঙ্কাম্বা তাহা বন্ধ করিলেন। মহারাজও তাহা একেবারে রহিত করিবার আদেশ দিলেন। এই প্রচলিত সম্মান ও সম্ভ্রমের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায় ভিক্রাওম্বার মনে দারুণ কষ্ট হইল, কিন্তু তিনি এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেছিলেন।" (বঙ্গানুবাদ)। টিকেন্দ্রজিতের সহিত ভাব থাকার অপরাধে পাঙ্কাম্বা অঙৌম্বার উপরও নানারূপ ছল-চাতুরী প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। টিকেন্দ্রজিতের বিবৃতিতে দেখা যায়—"পাঙ্কাম্বা মহারাজ শূরচন্দ্রকে হঠাৎ মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে অঙৌম্বা গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করিতেছে। মহারাজও সে বিষয়ের সত্যাসত্যের কোন তদন্ত না করিয়াই একেবারে হুকুম দিলেন যে, ২৩শে সেপ্‌টেম্বর প্রত্যূষে অঙৌম্বা ও ভিক্রাওম্বাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরস্ত্র করা হইবে। কার্যোদ্ধার করিবার জন্য পাঙ্কাম্বা গুপ্তভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারা মর্মাহত হইলেন এবং এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃসিংহাসনসম্মুখে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইলে যে লোক দেখান বিচার হইত, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি চিরনির্বাসন বা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, ইহা নিশ্চয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা উভয়ে একত্রে ২২শে সেপ্‌টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে রাজবাটি আক্রমণ করিলেন এবং বন্দুকাদি চালাইতে লাগিলেন।"...আমি রাজপ্রাসাদে পৌঁছিবার পূর্বেই প্রজাবর্গের সম্মিলিত হইবার চিরপ্রচলিত সঙ্কেত ৫টি তোপ দাগা হইয়াছিল। মহারাজার পলায়নের কথা সকলেই বলিতেছিল।.....কিন্তু সেই দুইজন রাজকুমার বা আমি কেহই রাজা হইতে চাহি নাই, যুবরাজ কুলচন্দ্রকে রাজপদাধিকারী করিবার যুক্তি যার্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে রাত্রে যুবরাজকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না এবং মহারাজা ও তাঁহার সহোদর তিন ভ্রাতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

২৩শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে জানা গেল যে যুবরাজ কুলচন্দ্র কয়েকজন অনুচরসহ, বিষ্ণুপুরের দিকে গিয়াছেন এবং মহারাজা তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত রেসিডেন্সীতে আশ্রয় লইয়াছেন। এই সকল বিবরণের উল্লেখ করিয়া আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট তারে সংবাদ পাঠান হইল। পরদিন পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট উত্তর আসিল। তদনুসারে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সাহেব যুবরাজকে রাজ-অহি (Regent), আমাকে যুবরাজ,

অভৌরাকে সেনাপতি, জিরাংথাকে শানুহক্না বলিয়া স্বীকার করিলেন।" (বঙ্গানুবাদ)।

টিকেন্দ্রজিতের পরামর্শে ও সহযোগিতায়ই যে সুরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত (coup) হইয়াছিলেন একথা সহজেই অনুমান করা যায়। টিকেন্দ্রজিৎ কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিবরণের সঙ্গে এইটুকু যোগ করিয়া লইলে নিষ্টার গ্রীমউড ও তাহার পত্নীর বিবরণের সঙ্গে উহার বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। মহারাজা এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ভয়ে বিচলিত হইয়া তাঁহার সহোদরগণের সঙ্গে রেসিডেন্সীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে আসিয়াও তাঁহারা লোক সংগ্রহ করিয়া সেনাপতিকে আক্রমণের চেষ্টায় ছিলেন (Ref. ২৩।৯।৯০ তারিখ পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট হইতে আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট তার সংবাদে প্রকাশ)। কিন্তু রেসিডেন্সীর প্রাঙ্গণের মধ্যে তাঁহাকে অস্ত্রধারী লোকজন একত্র করিতে দেওয়া হয় নাই (পলিটিক্যাল এজেন্টের তার সংবাদে প্রকাশ)। পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ গ্রীমউড ২৪শে সেপ্টেম্বর আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট এক চিঠিতে উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ জানাইয়াছিলেন :—

"কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা মহারাজা করেন নাই। কিন্তু সোনাইরাইজুবা এবং জিরাসিং বলেন যে, তাঁহাদিগকে দেশান্তরিত করা বা অন্যরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। মৈ সংযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক জিরাসিং, মহারাজের খাসমহল হঠাৎ আক্রমণ করেন। অবিরত বন্দুক ও গুলী চলিতে থাকে। তাহাতে কেহ আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও প্রাণভয়ে মহারাজা সত্বর পলায়ন করেন; তৎপরে সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, সকল দ্রব্য অধিকার করিলেন এবং আক্রমণ নিবারণের সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন।"

"দিবালোক প্রকাশ হইবামাত্রই, আমি জানিতে পারিলাম যে সেনাপতি, সোনাইরোই হানজাবা ও জিরাসিং রাজবাড়ীতে আছেন এবং চারিটী পাহাড়ী কামান ও বারুদাগার দখল করিয়াছেন। যুবরাজ কুলচন্দ্র কাছাড়ের রাস্তার দিকে চলিয়া গিয়াছেন, দরবারের মন্ত্রীদের মধ্যে কেবল আয়াপারেল সেনাপতির সহিত আছেন। থাঙ্গাল জেনারেল, তাঁহার পুত্রগণের সহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলে রেসিডেন্সীতে আসিয়াছিলেন।" (পত্র নং ২৮৮)। মহারাজা আশা করিয়াছিলেন গ্রীমউড সাহেব তাঁহার সৈন্য লইয়া সেনাপতির বিরুদ্ধে লড়িবেন। কিন্তু"……রাজবাটীর দক্ষিণদিকে বারুদখানাটি (ম্যাগেজিন) আক্রমণ নিবারণোপযোগী উৎকৃষ্ট আড্ডা। যদি সেইটিকে সহসা হস্তগত করিয়া আয়ত্তাধীনে রাখা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমার অধীনস্থ লোকেরা বিশেষ কষ্ট ব্যতীতও প্রাতঃকালে রাজবাটী পুনরধিকার করিতে পারিত। কিন্তু যখন সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতারা যাবতীয় কামান ও যুদ্ধ সামগ্রী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদ আক্রমণের জন্য ৮০ জন ঔর্যসৈন্য পাঠাইলে নিতান্তই বাতুলতার কার্য হইত।" (পত্র নং ৩৭১ সি, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯০ সাল)।

মহারাজা রেসিডেন্সীতে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করিতেছিলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টকে বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। "পরদিন অর্থাৎ রবিবার প্রাতঃকালে মহারাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিতে এবং সেইখানেই বসবাস করিতে, দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে এবং তাঁহাকে যেন হাজারিবাগ পাঠান না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে, বহু মিনতির সহিত বলিলেন। আমার বোধ হয়, বড় চৌবার বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি হাজারিবাগের কথা তুলিয়াছিলেন।" (পত্র নং ২৮৮ ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সাল।) মহারাজা গ্রীমউড সাহেবের সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের বিশেষ বন্ধুত্বের কথা অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে

মহারাজের সঙ্কল্প ছিল। পরবর্ত্তী চিঠিপত্রে এবং ষ্টীভেন্স সাহেবের আচরণে মনে হয় টিকেন্দ্রজিতের সাহায্য [illegible] তিনি সম্ভবতঃ সম্মতই হইয়াছিলেন, এবং যুবরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাবে তাহার ঘোরতর আপত্তি [illegible] "আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যদি তিনি সত্যই বৃন্দাবন যাইবার মত স্থির করিয়া থাকেন, তবে আমি [illegible] সকল সুব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু তিনি একবার গেলে, এ জীবনে আর কখনও মণিপুর রাজ্যে [illegible] আসিতে পারিবেন না, একথা বিশেষরূপে বুঝাইলাম। আমি ইহাও বলিলাম যে, পাক্কাম্বাকেও অবশ্যই যাইতে হইবে; অপর সকলে ইচ্ছা করিলে উঁহার সহিত যাইতে বা মণিপুরে থাকিতে পারেন।

আমি যখন রাজবাটীতে গেলাম, তখন মহারাজার ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইল। সেনাপতি, মহারাজ এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের কাছাড় পর্য্যন্ত যাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং যাহারা মণিপুরে থাকিবে, তাহাদের [illegible] করা হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। যুবরাজ তখন কাছাড়ের পথে ৮ মাইল দূরে ছিলেন। সেনাপতি তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং একথাও বলিলেন। যুবরাজ ইহার দুই তিন [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।" (পলিটিক্যাল এজেন্টের পত্র নং ২৮৮, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সাল।) যুবরাজ কুলচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট এক চিঠিতে তাঁহার সিংহাসন [illegible] রোহণের সংবাদ জানাইলেন।

"I have most respectfully to inform your Excellency that, owing to certain reason, there was constant displeasure and quarrels between our brothers, for which my eldest brother, the Maharaja Surachandra Singh, making voluntary abdication of the throne to me (the heir of the throne) left for Brindaban. Accordingly I ascended the throne of my father and grand-father on the 8th Ashin last."

Correspondence relating to Manipur 1891.—p. 9.

মহারাজা সুরচন্দ্র বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া রেসিডেন্সী হইতে টিকেন্দ্রজিৎকে নিম্নোক্ত চিঠি লিখিয়াছিলেন:—(বঙ্গানুবাদ)

"আমি এতদ্দ্বারা আমার কনিষ্ঠভ্রাতা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, একবার বৃন্দাবন যাইতে আমি নিতান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া হাঁটিয়া এদেশ পার হইতে এবং সেখানে যাইতে আমি অক্ষম। অতএব ভাই! তুমি আমার বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক করিয়া দাও। পাক্কাম্বা তোমার সহিত বিস্তর কুব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মহারাজা আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের নাম স্মরণ করিয়া তুমি তাহাকে মার্জ্জনা করিবে। তুমি যে ইহা করিবে, একথা শুনিতে আমি নিতান্ত উৎসুক রহিলাম। শকাব্দা ১৮১২, ভাদ্র, শুক্ল ৯ই, মঙ্গলবার, ইংরেজী ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সন।"

তাহার উত্তরে টিকেন্দ্রজিৎ লিখিয়াছিলেন—"..... শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ আজ্ঞা অনুসারে, শ্রীধাম ব্রজ নিবিরে পৌঁছিবার চেষ্টিত হইব। অধীনের। শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে যাহা অপরাধ করি, তাহা মার্জ্জনা করিবেন।"

এইস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ সুরচন্দ্র স্পষ্টভাবে কোন ঘোষণা দ্বারা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন উপরোক্ত চিঠিপত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। "মহারাজের দেশত্যাগের কথা রাষ্ট্র হইবামাত্রই, বহু সংখ্যক মণিপুরী তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেসিডেন্সীতে আসিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে কম বা বেশী

নজর না দিল। সকলে যেরূপ কান্দিতে লাগিল, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, মহারাজা লোক প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার বিদায়ে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭৷৷০ টার সময়, মহারাজা এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ এখান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। তাহাদের সহিত কাছাড় পর্যন্ত যাইবার জন্য, আমি ৪৪নং গুর্খা পদাতিক দলের ৩০জন বন্দুকধারী দিয়াছি। মহারাজের ব্যবস্থা এখান হইতে বিদায় হওয়া, খুব ভালই হইয়াছে।...(এস্থান অপবিত্র বলিয়া) তিনি এখানে কিছুই খাইতেন না।...তাঁহার এখানে থাকাতে আমার আনুষঙ্গিক সমস্ত লোকের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। অধিকন্তু তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, ততক্ষণ দুর্ঘটনা এবং লোকের মন বিচলিত হইবার আশঙ্কা, সর্বদাই ছিল। তজ্জন্য আমি অনুমতির অপেক্ষায় কালক্ষেপ না করিয়া, নিজ দায়িত্বে, মহারাজকে বিদায় দিয়াছি। (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সালে পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্তৃক লিখিত ২৮৮নং পত্রের বঙ্গানুবাদ)। ২৪শে সেপ্টেম্বর আসামের চিফ কমিশনার তাহার নিকট তার এবং পত্রের উত্তরে পলিটিক্যাল এজেন্টকে নিম্নোক্ত তার করিয়াছিলেন—".....গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী না পাওয়া পর্যন্ত যুবরাজকে রাজ অছি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তান্ত লিখিবেন এবং মহারাজা ও পাক্কাম্বা রওয়ানা হইলেন কিনা সংবাদ দিবেন।" (বঙ্গানুবাদ)। উক্ত তারের সংবাদে ইহা প্রমাণিত হয় যে চিফ কমিশনার সাময়িকভাবে কুলচন্দ্রের শাসনভার গ্রহণের অধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য এ সমস্তই হইয়াছে গ্রীমউড সাহেবের প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া। এই তারে পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্তৃক চূরচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ দিয়া কুলচন্দ্রের জন্য সুপারিশ করা এবং ভারত সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া চূরচন্দ্রকে অবিলম্বে নিজ দায়িত্বে কাছাড়ে পাঠাইয়া দেওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর আচরণ। ভারত সরকারও এইজন্য নিম্নোক্ত পত্রে চিফ কমিশনারকে অনুযোগ দিয়াছিলেন।

"আপনি যখন কহিমা হইতে সৈন্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত দলের নেতৃত্ব করিতে মিষ্টার গ্রীমউডকে তারযোগে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন রাজবাটীতে সেনাপতির নিকট গিয়া, বিদ্রোহের কারণ জানিয়া, আপনাকে সংবাদ দেওয়া তাহার উচিত ছিল। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রকাশ হইতে যে, মহারাজা সম্পূর্ণরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছেন। এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট মহারাজার পলায়নে সম্মতি দিয়াও সেনাপতির (টিকেন্দ্রজিতের) বিদ্রোহের সফলতা স্বীকার করিয়া যে গুরুতর কার্য করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকে সেরূপ করিতে হইত না। সে ক্ষেত্রে সেনাপতিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার সহিত অন্যের প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে পারিতাম।" (গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৪শে জানুয়ারি ১৮৯১ সনে, আসামের চিফ কমিশনারকে লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)। ১৮৯১ সনে 'মণিপুর যুদ্ধ' এবং আসামের চিফ কমিশনার মিষ্টার কুইন্টন, পলিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্টার গ্রীমউড প্রভৃতি সাহেবদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলে রহিয়াছে চূরচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি। সেইজন্য এই ঘটনার সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট দলিল ও চিঠিপত্রাদি হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া এসম্পর্কে যথাসম্ভব সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হইল।

উপরোক্ত অবস্থায় ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজা চূরচন্দ্রের রাজত্বের অবসান হয়। চূরচন্দ্র দেখিতে খর্বাকৃতি হইলেও তাঁহার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফরসা। মুখের গড়ন ছিল চীনা ও ব্রহ্মবাসীদের মাঝামাঝি এক ধরণের, কিন্তু বসন্তের দাগ থাকায় তেমন সুশ্রী দেখাইত না। তাঁহার পোষাক ছিল সাদাসিধা। পরণে পাতলা সাদা ধুতি, গায়ে সোনার বোতামওয়ালা সাদা কোট, মাথায় একপ্রকার হলুদ

করিত। পাঞ্জাবার কবলে না পড়িলে এবং রাজোচিত সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে সৌহৃদ্য বজায় রাখিয়া আজীবন নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুনে মণিপুরকে দগ্ধ হইতে হইত না।

[ক্রমশঃ]

[এই প্রবন্ধে উল্লিখিত চিঠিপত্র এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বিবৃতির বঙ্গানুবাদ উপরোক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভারত সরকারের মহাফেজ-খানায় রক্ষিত প্রাচীন দলিল পত্র পাঠের সুযোগ লাভ করা এখনও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। লেখক শ্রীযুক্তকুলাদ চৌধুরী তাঁহার গ্রন্থের শেষভাগে মণিপুর সম্পর্কে সেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য দলিল পত্রাদির হুবহু বঙ্গানুবাদ যুক্ত করিয়া দিয়া সত্যানুসন্ধানী ইতিহাস পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার সুযোগ দিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডুমরবণের
সাহায্যার্থে বড় বড় বৃটিশ
সেনাপতিগণ পূর্বোক্ত
সময়সময়ই ইংরেজ
সৈন্যদিগকে সাহায্য করিতে সচেষ্ট ছিলেন।
ইহাদের জন্য প্রজাগণ তাঁহাকে কর

Assam District Gazetteers Vol. IX —1905 by— B. C Allen, C S.

My Experiences in Manipur and the Naga Hills by—Major-General Sir James Johnstone K. C. S. I. —1896

My Three years in Manipur by—Ethel St. Clair Grimwood— —1891

বিজয় পাঞ্জাবি (in Manipuri)
by—মুদুয়া কুলন সিং।

মণিপুর ইতিহাস—(in Manipuri)—1947
by—রাজকুমার শ্রীশ্যামশাল সিং।

মণিপুরের ইতিহাস (in Bengali)—1891
by—শ্রীযুক্তকুলাদ চৌধুরী

Senapati Tikendrajit—(in Hindi)
—Pandit Kartikeya Charan Mukhopadhyaya

৭] [পূর্বানুবৃত্তি]

এরপর মাঝখানে কয়েকটা দিনই একরকম গেছে।

নিয়মিত কলেজে যাই আসি। এ্যাটেণ্ডেন্স্ নিয়ে ভাব্‌তে হয় না। মাঝে মাঝে প্রস্থির কাঙটাও এসে ওকে নিয়ে চ'লে যায়। কিন্তু অণিমাকে দেখ্‌লাম—দিন দুয়েক আর কলেজে এলোনা। অনার্সের ছাত্রী, কলেজে উপস্থিতি সম্পর্কে এমন অনিয়ম কিন্তু তার বিশেষ একটা হয় না। নন্-কলেজিয়েট্ হওয়া সম্পর্কে আগাগোড়াই সে কিছুটা স্তীক্ষ্ণ চরিত্রের মেয়ে। ভাবলাম—বাড়ীতে একবার খোঁজ নেবো কিনা! অসুখ-বিসুখও তো হ'তে পারে! কিন্তু লজ্জা এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। কলেজের সম্পর্কে এপর্যন্ত শুধু অণিমার সঙ্গেই আলাপ, তার বেশী নয়। মাঝে মাঝে ওদের পরিবার সম্পর্কে জান্‌তে ইচ্ছে হ'য়েছে, কিন্তু সেধে কিছু জিজ্ঞেস্ ক'রতে উল্টে বরং লজ্জাই পেয়েছি। তাই ব'লে আমাদের বাড়ীতে অণিমার আনাগোনার কোনোদিন বাধা থাকেনি। আমার অধ্যয়ন-কক্ষের দরজায় এসে কখনও তাকে কড়া নাড়তে হ'য়েছে বলে মনে পড়ে না, আগাগোড়াই সে-দরজা তার জন্যে খোলা র'য়েছে। সুতরাং গৃহ-পরিবেশের আমি আর কলেজ-পরিবেশের আমি—দু'টোই ওর কাছে স্পষ্ট; অথচ গৃহ-পরিবেশের অণিমা কিন্তু আমার কাছে একেবারেই প্রচ্ছন্ন। এ প্রচ্ছন্নতার আবরণ উন্মোচিত হয়নি ব'লেই অণিমার খোঁজটুকু নিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ ক'রলাম।

অথচ তার এই অনুপস্থিতির পিছনে যে তার শারীরিক কোনো অসুস্থতা নয়, নিতান্তই এটা ইচ্ছাকৃত—তা বুঝ্‌তে পারলুম পরে, অণিমার সঙ্গে দেখা হ'লে। আসলে সেদিন সন্ধ্যায় যে ঘটনা ঘ'টে গেল, তারই আবেশে লজ্জাবিষ্ট হ'য়ে দু'দিন সে আমার চোখের আড়ালে থেকে গেল। ক্লাসে এসে চোখে চোখ প'ড়লে আর বুঝি সে মাথা তুলতে পারতো।

এম্‌নি একটা-কিছু ভাবছিল অণিমা। অদ্ভুত কাণ্ড মেয়েদের। মুখর আলোচনার ক্ষেত্রে নিজেকে নিঃশেষে প্রকাশ ক'রতেও বিলম্ব নেই, আবার প্রকাশ করেও লজ্জার শেষ নেই। বেদা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—নারী চরিত্র হচ্ছে এম্‌নি। কিন্তু প্রহেলিকা আছে ব'লেই না প্রাণময়ীর প্রতি এত আকর্ষণ!

কথাটা ব'লতে গিয়ে বাধা পেলাম অণিমার কাছ থেকে। থেমে এবার সে নিজে থেকেই আমন্ত্রণ জানালো তাদের বাড়ীতে।—'আগামী কাল ছোট বোন শীলার জন্মদিন। দশ পেরিয়ে এবারে এগারোয় প'ড়লো শীলা। আগামীকাল সন্ধ্যায় তোমাকে নিশ্চয়ই আস্‌তে হবে আমাদের ওখানে। না এলে ভারী দুঃখ পাবো।'

ব'ল্‌লাম, 'তোমাকে দুঃখ দেওয়াই তো আমার উদ্দেশ্য নয়! যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। শীলা শুধু তোমারই বোন, আমারই বা নয় কেন?'

উত্তরে কিছু-একটাও আর না ব'লে মুখে ঈষৎ

হাসি টেনে উঠে গেল অণিমা। বাধা দিলাম না, ভাব্‌লাম—কাল সন্ধ্যায় তো আবার দেখা হ'চ্ছেই! কাল মানে রবিবার, সন্ধ্যার যোগটা এভাবে না ঘ'টলে দিনটা অপেক্ষাতেই কাটতো। অলক্ষ্যে থেকে বরং শীলাই তা নিষ্পত্তি ক'রে দিল।

কিন্তু খালি-হাতে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা কেমন-দেখায় না কি? শীলা তার ছোট্ট বুচি মুখখানিতে হাসির জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যখন এসে কাছে দাঁড়াবে, তখন কি সত্যিই তাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলে হাতে কিছু উপহার না দিয়ে? অণিমার বন্ধু হিসেবে এ যে আমার পক্ষেই অপমানের বিষয়!

বইয়ের দোকানে গিয়ে বেছে-বেছে তাই ভালো দু'খানা ছবি ও ছড়ার বই কিনে নিয়ে যথাসময়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম অণিমাদের বাড়ী। অণিমাকে দেখে অন্ততঃ মনে মনে আগে ধারণা ছিল—বাড়ীটা তাদের বিশেষ ধরণেরই হবে, কিন্তু এসে দেখ্‌লাম বাড়ীর নামে পায়রার বাসা। রান্নাঘর নিলিয়ে ছোট ছোট খান তিনেক ঘর, ইলেক্‌ট্রিকের বালাই নেই। তার মধ্যেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে চারটি প্রাণী: বাবা, মা, অণিমা আর শীলা। শীলাই সব থেকে ছোট, বড়দের কাছে ছোটর আদরটা তাই দেখ্‌বার মতো।

উপহার নিয়ে তার হাতে তুলে দিতে শুধু শীলাই খুসী হ'লো না, তার দিদিও। কোলের কাছে টেনে নিয়ে তবু একবার জিজ্ঞেস্ ক'রলাম শীলাকে, 'ছবি আর ছড়া তুমি নিশ্চয়ই ভালোবাসো? কেমন হ'য়েছে' বই দু'খানি, বলো তো?'

মনে মনে ভাবলাম—ভারী তো দাম বই দু'খানির, তাই নিয়ে আবার কেমন হবার প্রশ্ন!

অণিমা ব'ল্‌লো, 'কেমন আবার হবে, ভালো জিনিষকে কি ভালো ব'লে বোধ আছে কিছু শীলার? কাল সকালেই ঘুম থেকে উঠে দেখ্‌বো—একখানারও মলাট নেই।'

কথাটা বোধ করি শীলার আত্মসম্মানে গিয়ে বিঁধলো! দিদি ব'লে ছাড়া পাবার উপায় নেই; ব'ল্‌লো, 'আখো, এম্‌নি ক'রে বানিয়ে বানিয়ে তুমি যা তা বোলো না দিদি। কবে কোন্ বইখানার মলাট ছিঁড়েছি, বলো তো? তুমিই তো বরং সেবার তোমাদের কলেজ-লাইব্রেরীর কি একখানা বই এনে মলাট ছিঁড়ে আঁঠা লাগিয়ে আবার ফেরৎ দিয়ে এলে। যত দোষ নন্দ ঘোষ, আমায় পেয়েছ তেম্‌নি, তাই না?'

দেখ্‌লাম—অণিমার মুখখানি এবারে অস্বাভাবিক লাল হ'য়ে উঠেছে। লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠেছে গাল দু'টি। ব'ল্‌লো, 'নে, তা নিয়ে তোকে আর সর্দারী করতে হবে না। পারিস তো মাকে গিয়ে একবার খবর দে।'

বাধা দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'মাকে খবর দেবার জন্যে এত ব্যস্ততাই বা কেন? ভয় নেই, যখন এসেছি, মার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাচ্ছি না।'

—'তোমাকে দিয়ে বিচিত্র নেই কিছু।' ব'লে মুখ টিপে একবার হাসলো অণিমা।

শীলা কিন্তু সত্যিই আর অপেক্ষা ক'রলো না। বুঝ্‌লাম—দিদিকে তার বড় ভয়, অন্ততঃ বই ছেঁড়ার ব্যাপারটা ব'লে সে ভালো করে নি। কিন্তু এই বা কেমন? এলাম শীলার জন্মদিনে, অথচ শীলার সঙ্গে যোগ থাকবে না, বিশ্রীই বৈ কি ব্যাপারটা! কিন্তু অণিমা সেটুকু বুঝ্‌তে চাইল না, পরোক্ষে সে শীলাকে বরং সরিয়েই দিল।

ব'ল্‌লাম, 'এ তোমার ভারী অন্যায়।'

মুখ উঁচিয়ে অণিমা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি অন্যায় ক'রলাম, বলো?'

—'অন্যায় ভিন্ন কি!' কণ্ঠস্বরের উপর খানিকটা জোর দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'রামহীন রামায়ণ কি কখনও জমে? শীলাকে তুমি ডাকো।'

—'ডাকতে হবে না, ও এক্ষুণি আবার এলো ব'লে।' থেমে অণিমা ব'ল্‌লো, 'নতুন লোক দেখ্‌লে ওর আর কথা নেই, গায়ে প'ড়ে সেধে সেধে আলাপ ক'রে তবে ছাড়বে।'

মুখে মৃদু হাসি টেনে ব'ল্লাম, 'তাব জন্মাতে তার দিদিই বা কম যায় কি? দিদিরই তো বোন!'

—'তা বটে।' ব'লে ঠোঁটের ফাঁকে একটা উদ্যত হাসি গোপন ক'রে নিল অণিমা।

ব'ল্লাম, 'এ বাড়ীতে জন্মদিন কি শুধু শীলারই পালিত হয়, তার দিদির হয় না?'

দেখ্লাম—মুখের রং হঠাৎ যেন কেমন ব'দ্লে গেল অণিমার! ব'ল্লো, 'আমার আবার জন্মদিন!'—কথাটার মধ্যে খানিকটা ব্যর্থতার সুরই ফুটে উঠ্লো।

সাগ্রহে এবারে আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে ব'স্লাম অণিমার।—'কেন, তোমারই বা নয় কেন?'

মুহূর্তের জন্ম আমার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি তুলে ধ'রে খানিকক্ষণ চুপ করে ব'সে রইল অণিমা, তারপর একসময় ব'ল্লো, 'পৃথিবীতে সুলক্ষণা হ'য়ে তো জন্মাই নি, আমার উপর দেবতার অভিশাপ চিরকালের। জানো তো, এ সংসারে প্রথম আবির্ভাব আমার! তাছাড়া বাবার এমন সঙ্গতি নেই যে একা সংসার চালাতে পারেন। আমার কলেজের মাইনে গুণ্তেই বাবাকে হিম্সিম খেতে হ'চ্ছে। ক'পয়সাই বা রোজগার, লোয়ার কোর্টের মোক্তারের। পায়ই বা ক'পয়সা! উচিৎ ছিল আমাকে ছেলে হ'য়ে এতদিনে রোজগার ক'রে বাবাকে সাহায্য করা, কিন্তু বিধির ইচ্ছে অন্তরকম।'

থেমে একবার দম নিল অণিমা, তারপর পুনরায় ব'ল্লো, 'এই জন্তেই তো বিশেষ করে অনার্স্ নিয়েছি। জানো সুমন্ত, অনার্স্ আমাকে পেতেই হবে, নইলে সামান্ত একটা স্কুল-মাষ্টারীও জোটাতে পারবো না। এখানে জন্মদিন পালনের অবকাশ কোথায় বলো?'

কেন যেন উত্তর দিতে গিয়ে এবারে কণ্ঠে ভাষা খুঁজে পেলাম না। শুধু তাই নয়, এতক্ষণ চোখের যে অসামান্ত চাঞ্চল্য নিয়ে বার বার তাকাচ্ছিলাম অণিমার সুন্দর মুখখানির দিকে, চোখের সে চাঞ্চল্য হঠাৎ যেন কেমন নিস্তেজ হ'য়ে এলো। কতক্ষণ যে এইভাবে নীরবে পাথুর মতো ব'সে রইলুম, ব'লতে পারি না।

একসময় অণিমাই আবার সুরু ক'রলো: 'জানি, আমাদের সংসারের এই অবস্থা জান্বার পর আমাকে নিশ্চয়ই তোমার আর ভালো লাগ্বে না, কিন্তু মনটাকে কি সত্যিই অবস্থার সঙ্গে কোথাও মানিয়ে নিতে পেরেছি? আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের এখানেই সব চাইতে বড় ট্রাজেডি, বড় বিদ্রোহ। এর পিছনেও সাইকোলজি আছে বৈ কি?'

—'তা আছে।' কথাটাকে সমর্থন করেই ব'ল্লাম, 'কিন্তু এসব কি ব'ল্তো তুমি অণিমা? ভালোবাসা—তাও কি কখনও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল? তাছাড়া, তোমার নিজেরই বা এত দুশ্চিন্তা কেন, অবকাশ পেলে আমিই কি কখনও তোমার বাবার সাহায্যে আস্তে পারিনা?'

অণিমা এতটুকুও আর দ্বিধা ক'রলো না, ব'ল্লো, 'সেই অবকাশের দিনের জন্তেই আমার জন্মতিথির বিশেষ মুহূর্তটিকে তুলে রেখেছি। আজকের প্রয়োজন মেটানোর দিনে শীলার মধ্য দিয়েই আমাদের যতকিছু আনন্দ।'

উত্তরে কি একটা ব'ল্তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। পাশের দরজা দিয়ে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক এক প্লেট জলখাবার হাতে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। অণিমার মা অরুণাংশু দেবী। ব'ল্লেন, 'অণিমার কাছে তোমার পরিচয় আগেই পেয়েছি বাবা। নাও, ধরো, একটু মিষ্টিমুখ করো।'—সাগ্রহে তিনি প্লেটখানিকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

সেটাকে নির্বিবাদে নিজের হাতে টেনে নেবার আগে অরুণাংশু দেবীকে একটা প্রণাম করা কর্তব্য ব'লে মনে ক'রলাম। না ক'রলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অণিমার বন্ধুত্বের দিক থেকে পাছে কিছু ত্রুটি

থেকে যায়, শুধু এই কথাটা ভেবেই গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রলাম অরুণাংশু দেবীকে।

স্নেহকণ্ঠে তিনি বললেন, দীর্ঘজীবী হও, সতী হ'য়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করো।'

আশীর্বাদের অবকাশে এ পর্যন্ত অনেকেই দীর্ঘ-জীবনের ছেদ টেনেছেন, কিন্তু অরুণাংশু দেবী তার সঙ্গে একটা নতুন কথা যোগ ক'রে দিলেন। বেশ লাগলো শুনে। এ বাড়ীর আবাসিক পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্য পাবলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে যে বিশেষ একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, অরুণাংশু দেবীর কথা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

জবাবে কিছু-একটা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নীরবে এবারে তাঁর হাত থেকে প্লেটখানিকে টেনে নিলাম। প্লেটের সামগ্রীও একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। সিঙ্গাড়া, খাস্তা কচুরি, বালুসাই আর মিহিদানা, পাশে প্রসাধনের সামান্য মিষ্টান্ন। পেট ভ'রবার পক্ষে যথেষ্ট। ব'ল্লাম, 'এই নাকি জলখাবার, এ তো দেখ্‌ছি রীতিমত লাঞ্চের ব্যবস্থা।'

'লাঞ্চ' শব্দটার সঙ্গে বোধ করি অরুণাংশু দেবীর পরিচয় নেই, উত্তরে তাই অনিমাই তার মাকে বাঁচিয়ে দিল।—'ভারী তো সামান্য একটু মিষ্টি, একে ব'ল্‌ছো লাঞ্চ্‌?'

এবারে বোধ ক'রি আভাসে কিছু বুঝে নিলেন অরুণাংশু দেবী—সামান্য যখন নয়, তখন যে অসামান্য কিছু, এটা তিনি অনিমার কথা থেকেই ধরে নিয়ে ব'ল্‌লেন, 'নিজের হাতে কিছুই তো ক'রতে পারিনি, অন্য দিন তবু গোয়ালা এসে রোজের দুধ দিয়ে যায়, আজ সে পর্যন্ত আসেনি। নইলে অন্যান্য বছর শীলার জন্মদিন ঠিক এভাবে যায় না। সামান্য জিনিষ, নাও, মুখে দাও, ওটুকু খেকে একটু কিছুও তুমি রাখ্‌তে পারবে না। যাই, আমি শীলাকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এতটুকুও আর দাঁড়ালেন না তিনি, দ্রুত পায়ে অন্দর মহলে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

প্লেটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে অনিমাকে ব'ল্‌লাম, কিছু ভাগ নাও।'

কিন্তু অনিমা কিছুতেই রাজি হ'লনা। ব'ল্‌লো, 'দুষ্টুমি কোরোনা, খেয়ে নাও।'

ব'ল্‌লাম, 'খেতে যে পারবো না, তা নয়; ভাগ নিলে তোমার হাতের স্পর্শটুকুও তো অন্ততঃ পাই!'

—'স্পর্শের সঙ্গে ভাগ নেবার ব্যাপারটাকে নাই বা জড়ালে!' হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে প্লেট থেকে খানিকটা মিহিদানা তুলে নিয়ে অনিমা বল্‌লো, 'নাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো হা করো দিকি!'

এবারে আর এমন সাধ্য রইল না যে, মুখ বুজে থাকি। মেরুদণ্ডের দিকে ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে বাধ্য হ'য়েই হা ক'রলাম। নির্বিবাদে মিহিদানাটুকু আমার মুখের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে স্মিত হাস্যে অনিমা ব'ল্‌লো, 'স্পর্শের বালাই এবার চুকলো তো?'

ব'ল্‌তে পারলুমনা যে চুকলো। অনিমার আঙুলের স্পর্শ এসে লেগেছিল আমার ঠোঁটে। শুভ্র পেলব-কোমল সেই আঙুল—যাকে কেন্দ্র ক'রে একদিন কাব্য ক'রে বল্‌তে চেয়েছিলাম অনিমাকে হৃদয়ের দু'টি অব্যক্ত কথা। সেদিন যাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম, আজ পেলাম তাকে অধরের অনুভূতিতে। ইচ্ছে ক'রলে দুষ্টুমি ক'রে মৃদু একটা কামড় বসিয়ে দিতে পারতুম তার কোনো একটা আঙুলে। বড় জোর আধোভাবে অনিমা শুধু একবার ব'ল্‌তো, 'কি অসভ্য তুমি!' কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম—সেটা হয়ত আবহাওয়ার পক্ষে আদৌ উপযোগী হবে না। মিহিদানাকে তাই মিহি করে চিবিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লাম, 'এমন মিষ্টিমুখের পরে নোন্‌তা জিনিষ-গুলো আর ঠিক জমবে না। অতএব মিষ্টি দিয়ে যখন সুরু, তখন মিষ্টিতেই শেষ হোক্।'

কথা কেটে অনিমা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু শেষের মধ্যেও অশেষ আছে, জান তো? নোন্‌তাটা মধ্যপদলোপি, এর পর সিঙ্গাড়া আর কচুরী দিয়ে চা খাবে।'

বাধা দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'এর পর আর কিছুতেই চা

চ'লবে না। অতএব ওগুলো একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। পাতের না ক'রে বরং তুমি তুলে রাখো।'

জবাবে এবারে আর অণিমাকে কিছু-একটা ব'লতে হ'লো না। জলের গ্লাস নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো নীলা।

কাছে টেনে নিয়ে ব'ললাম, 'বাকুসাইটা তোমার, এটা তুমি তুলে না নিলে প্লেটের কিছুটি আমি আর ছোঁব না।'

স্বভাবজাত লজ্জায় ভেঙে পড়ে তবু একবার আপত্তির সুর তুললো নীলা: 'আমিই যদি খাবো, তবে আর আপনার জন্যে কি থাকবে? তা ছাড়া আমার জন্মদিনে আমার মঙ্গল কামনা ক'রে ওটুকু তো আপনি ইচ্ছে ক'রলেই খেয়ে নিতে পারেন!'

অপাঙ্গে একবার অণিমার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম—মুখে আঁচলের কোন্ টেনে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। পরোক্ষে সে তারিফই ক'রলো নীলাকে।

কিন্তু নীলার মুখের কথা শুনে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। দশ পেরিয়ে সবে এগারোয় প'ড়লো, কিন্তু ওর অনুভূতি ও কথা বলার ভঙ্গী বয়সের অপেক্ষা রাখেনি। সেদিক থেকে নীলা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে ব'ললাম, 'বেশ, এই তবে খাচ্ছি।'

বাধ্য হ'য়েই এবারে প্লেটখানিকে খালি করে দিতে হ'লো।

নীলা এগিয়ে এসে এবারে সত্যিই গায়ে প'ড়ে আলাপ সুরু ক'রলো।

—'আচ্ছা, আপনি আর দিদি মিলে তো ম্যাগাজিন ছাপান, কই, আমাদের প'ড়বার মতো তো কিছুই থাকেনা তাতে! কেন, আমরা কি পড়তে জানিনা? গোড়ার দিকে তো দেখি একগুচ্ছের ইংরেজি, আর পেছন দিকে কঠিন কঠিন বাংলায় ছাইভস্ম দু'একটা কি লেখা!'

ছাইভস্মই বটে! কথা শুনে এবারে হাসি সম্বরণ করা কঠিন হ'লো। ব'ললাম, 'যারা কলেজে পড়ে, শুধু তাদের জন্যেই ঐ ম্যাগাজিন। তুমি যখন বড় হ'য়ে তোমার দিদির মতো কলেজে প'ড়বে, তখন দেখবে—এগুলো তোমার কাছে কিছু একটা প্রশ্নই নয়।'

পাণ্ডিত্যের সুরে নীলা ব'ললো, 'তখন এভাবে আমরা ম্যাগাজিন ছাপতে দেবোই কিনা! ইংরেজি ফিংরেজি তখন আর চলবেনা; ইংরেজরা তাড়া খেয়ে বিলেত পালালো, তবু আবার আমাদের দেশে ইংরেজি কি!'

মিথ্যে নয় কথাটা। এগারো বছর বয়সের উক্তি হ'লেও এ বড় সাঙ্ঘাতিক প্রশ্ন। অণিমার দিকে চোখ তুলে ব'ললাম, 'বুঝতে পেরেছ? উক্তিটা নীলার হ'লেও প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার মতো নয়। পারো তো কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে একবার আলোচনা ক'রে দেখো।'

মুচ্‌কি হেসে অণিমা ব'ললো, 'তুমি দেখো। নীলাকে খুসী ক'রতে হ'লে তোমাকেই গিয়ে আলোচনা ক'রবার দরকার।'

ব'ললাম, 'শুধু নীলার খুসীর প্রশ্নটাই তো বড় নয়, আমরাই বা ওর চাইতে বেশী গেলাম কিসে? নীলার মুখ দিয়ে সমস্ত বাঙালীর প্রাণের কথাই কি শুনতে পাচ্ছো না?'

—পাচ্ছি নাকি?' অণিমা ব'ললো, 'তুমি দেখছি ছবি ও ছড়া থেকে একেবারে হাই ব্যারোমিটারে উঠে গেলে! নীলারও দেখছি যত আজেবাজে কথা।'

এরপর হয়ত অতিভাবকসুলভ কণ্ঠে নীলাকে কিছু কটূক্তি ক'রে বসতো অণিমা। সে সুযোগ না দিয়ে ব'ললাম, 'বাইরে যাকে বাজে বলছো, ভিতরে তা-ই সুর হ'য়ে বাজছে না কি? আসলে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি নীলার অনুভূতি দেখে।'

এতক্ষণ চোখ দু'টোকে বড় ক'রে আমার আর অণিমার মুখের দিকে অনবরত তাকাচ্ছিল নীলা, এবারে ও-প্রসঙ্গ ত্যাগ করে ব'ললো, 'আপনি বুঝি কাছেই কোথাও থাকেন সুমন্তদা?'

'কাছে না হ'লেও একেবারে দূরেও নয়।' যেতোনা একদিন দিদির সঙ্গে?'

—'দিদি বুঝি চেনে আপনাদের বাড়ী?'

—'চেনে আবার না!' ব'লে একবার তীব্রক দৃষ্টিতে তাকালাম অণিমার দিকে। দেখলাম—নীরবে স্থান ত্যাগ ক'রে ইতিমধ্যেই সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। বুঝতে কষ্ট হ'লোনা যে, শীলার এই দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতিটা তার পক্ষে ঠিক সুখকর ব'লে বোধ হ'চ্ছেনা। আসলে শীলার জন্মদিনকে উপলক্ষ ক'রে আমাকে ওদের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে কিছু সময়ের জন্যে ধ'রে খুশী হ'তে চেয়েছিল অণিমা, সে খুশীতে তার ঘা প'ড়েছে। কিন্তু শীলার ব্যাপারে এসে শীলাকেই বা কি বর্জন করা চলে?

ব'ললাম, 'দিদির সঙ্গে একদিন গিয়ে তুমি বরং বাড়ীটা চিনে এসো, পরে একাই কখনো যেতে পারবে।'

এতটুকুও সঙ্কোচ নেই শীলার মধ্যে, দশ বছরের ছেলেদের আবার সঙ্কোচ ব'লেও কিছু থাকে নাকি? কণ্ঠে আব্দারের সুর তুলে ব'ললো, 'এম্‌নি ক'রে তবে আরও অনেক ছবি ও ছড়ার বই দেবেন তো?'

—ব'ললাম, 'দেবো।'

খুশী হ'য়ে এবারে সে আপন খেয়ালে কোথায় একদিকে চলে গেল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলো এতক্ষণে অণিমা। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই আবার এসে সে সাম্‌নে দাঁড়ালো। পাশে হেরিকেনটা এতক্ষণ উঁচুশিখায় জ্বল্‌ছিল, সেটাকে ঈষৎ কমিয়ে দিয়ে অণিমা ব'ললো 'আচ্ছা তুমি কি বলতো?'

ব'ললাম, 'অদ্ভুত একটি মানুষ, দেখ্‌তে পাচ্ছো না? কিন্তু এতক্ষণ ঠায় বসে থাকতে থাকতে কোমর ধ'রে এসেছে। এবারে আমাকে উঠতে দাও। রাতও বোধ করি কম হ'লোনা!'

—'রাত্রির আর দোষ কি! সে তো আর কেবল এই ছোট্ট ঘরখানির মধ্যেই আবদ্ধ নয়!' ব'লে মুখ গম্ভীর ক'রলো অণিমা।

এবারে বোধ করি ঝড় উঠবার সম্ভাবনা, কিন্তু সামান্য বিদ্যুতেই মেঘ কেটে গেল।

ব'ললাম, 'নিজেকে বেড়া দিয়ে যেখানে ঘিরে রেখেছ, সেখানে অন্যকে অভিযোগ দেবারই বা এমন কি আছে! গোড়াতে তো তুমিই ব'লেছিলে—আজ শীলার মধ্য দিয়েই আমাদের যতকিছু আনন্দ! সে-আনন্দে ফাঁক রেখে উঠে যাবো, এমন নরাধমই বা নিজেকে ভাবি কি ক'রে! কাল বরং খোলা মাঠে বেশী কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে ফিরবো আমরা। আজ উঠি।'

ভেবেছিলাম প্রতিবাদ ক'রে বাধা দেবে অণিমা, কিন্তু একটি কথাও আর সে ব'ল্‌লো না, এমনকি আর একটু-কালের জন্য বসতে পর্যন্ত অনুরোধ করলো না। বরং হেরিকেনের শিখাটাকে আবার কিছুটা চড়িয়ে দিয়ে সামনের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে দাঁড়ালো অণিমা।

নিঃশব্দেই তাদের চৌকাঠ পেরিয়ে সদর রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। ঘাড় ফিরিয়ে একবার লক্ষ্য ক'রলাম—তখনও সিঁড়ির গোড়ায় তেম্‌নি ভাবেই হেরিকেনের শিখাটি উজ্জ্বল হ'য়ে র'য়েছে। সাম্‌নের পথ যেখানে অন্ধকার, ভাব্‌লাম—সেখানে এম্‌নি ক'রেই কি চিরকাল অণিমার হাতের এই অনির্বাণ শিখাটি উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে?

(ক্রমশঃ)

ভারতাত্মার বাণীমূর্তি রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

বিগত একশত বৎসর কালে বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মজীবনে যে দুইজন মহাপুরুষ যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের দুইজনের সাধনপন্থার বৈষম্য থাকিলেও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। উভয়েরই সাধনা সমন্বয়ের সাধনা—অর্থাৎ সকল প্রকার ভাবাদর্শগত বিরোধের অবসান করিয়া একটি ঐক্যের সৃষ্টি করা। সকলেই অবগত আছেন যে বাঙালীর নবজাগৃতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রামমোহন হইতে ইহার সূচনা এবং শ্রীঅরবিন্দে ইহার সমাপ্তি। মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি ভাস্বর জ্যোতিষ্কের উদয় জাতির জীবনে এক পরম শুভ লগ্ন। বস্তুতঃ যে যুগকে আমরা নবযুগের জাগরণ বা রেনেসাঁ নামে অভিহিত করি তাহা এই সকল মনীষীদের দানে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু যে দুইজনের প্রভাব আর সকলকে অতিক্রম করিয়া সুদূর প্রসারিত হইয়াছে, যাঁহাদের জীবন সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, যাঁহাদের কৃপায় জগৎসভায় তাহার আসন স্থায়িভাবে লাভ করিয়াছে এবং আজিকার চরম সঙ্কট মুহূর্তেও 'মহতী বিনষ্টিঃ' হইতে রক্ষা করিতেছে সেই দুইজন শ্রেষ্ঠপুরুষের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরতরে গাঁথিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ যখন আমাদের জাতীয় জীবনকে আলোড়িত আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, শতাব্দীর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন ও পরাধীনতার দীনতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাণে জীবন উপভোগের আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য সৃষ্টি করিয়াছিল, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া আলেয়ার আলোকের মত আমাদের ভড়ংয়ের নেশায় উন্মত্ত করিয়া দিয়া অন্ধবের পশ্চাতে দৌড়াইতে বাধ্য করিয়াছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন তাহাকে সার্থকভাবে প্রতিহত করেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির কর্ণে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার মনের সকল সংশয় নিরাকৃত করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন হিন্দুসাধনার তিনটি ধারাকে—(বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র)—আপনার সাধনা ও অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা সমন্বিত করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে যোগাসনে বসিয়া তিনি যেদিন তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্যকে প্রচারিত করিলেন, সেদিন অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন ও অবিশ্বাস জাগিয়াছিল। বহু বিদগ্ধ মনীষী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বুদ্ধির উদ্দামতায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে গর্বিত হইয়া সেই মহাপুরুষকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে আপনাদের তর্কজাল বিস্তার করিলেন ও যুক্তির ফাঁদ পাতিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। কোন অলৌকিক শক্তি এবং মায়াজালে যেন এই দীনবেশী প্রায়উপেক্ষিত পূজারী তাঁহাদের সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিলেন।

যে পাশ্চাত্য মানবিকতাকে (Humanism) তৎকালীন যুগের সকল কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ একমাত্র নিঃশ্রেয়স বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহা যে আদৌ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সাধনার বহির্ভূত নয় তাহাও শ্রীরামকৃষ্ণে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদতত্ত্বই রামকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব। শঙ্কর-রামানুজ-বুদ্ধ প্রভৃতি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদিগণ জীবন ও জগতের মূলে স্থিত দুঃখকে 'অসৎ' বলিয়া করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ 'গীতা' আত্মাকে সুখদুঃখ বন্ধু ও শত্রুরূপে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মোহমুক্ত আত্মার ভয় বলিয়া কিছু নাই। এই প্রসঙ্গে একজন চিন্তাশীল সমালোচকের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"দ্বৈত ও অদ্বৈত দুই তত্ত্বই এক। যেখানে বিরোধ আছে সেখানে আত্মারই আত্মজ্ঞানের অভাব। তাহাই মোহ—তাহাই অবিদ্যা। অতএব জগৎকে অস্বীকার করিবার যে জ্ঞান বিকৃতির মনোভাব তাহাও অজ্ঞান আত্মার আত্মসঙ্কোচ। অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে —অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতে, আত্মার এই পদচারণা আত্মারই 'যোগমৈশ্বরম্'। ইহা যদি দুঃখময় হয়, তবে দুঃখও এই চিদাবেশ সত্য যে তাহা আত্মার সেই অনন্ত শক্তিকে প্রেমরূপে আস্বাদন করিবার একটি সম্ভার।" [বাংলার নবযুগ—নোহিতলাল মজুমদার]

আত্মার এই প্রেমময় শক্তি—যাহা 'গীতার' প্রধান উপজীব্য—তাহা ভারতের অতি প্রাচীন তত্ত্বেরই অন্তর্গত। বলা বাহুল্য যে ইহাই রামকৃষ্ণের দিব্য সাধনায় নবতনরূপে রূপায়িত হইয়া দেশকালাতীত সমগ্র মানবজাতির বরণীয় ধর্ম হিসাবে প্রচারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণের ব্রহ্মসূত্রের এই অভিনব ভাষ্য পাশ্চাত্য Humanismকে কেবলমাত্র পরিশুদ্ধ করে নাই, তাহাকে অধ্যাত্মরসে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই ফলে পরবর্তী কালে এই আত্মোপনিষদ—জ্ঞান ও প্রেমের এই অদ্বৈত সিদ্ধি—শান্তং শিবং রূপে রামকৃষ্ণের উত্তর সাধক, মানস সন্তান ও শিষ্য-শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের সাধনার ধারাকে অব্যাহত গতিতে প্রচারিত করিয়াছে। কিন্তু একথা থাক। এই প্রসঙ্গে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতের চিরাগত সাধনা কিরূপ বিশাল লাভ করিয়াছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা জানি অতিশয় বাল্যকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক শিক্ষার আলোকে লালিতবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহচর্যগুণে তাঁহার মননশীলতা অল্প বয়স হইতেই উপনিষদের উদারমুক্ত বাণীকে বন্দনা করিয়া উহার প্রশান্ত ছায়া-শীতল আশ্রয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। যোগী ও মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তের মত তিনি আপনাকে ঋষিবাক্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ শিষ্যের মত উহার সূক্ত ও মন্ত্রগুলিকে আপনার অন্তরে গ্রহণ করিয়া তিনি কঠিন নিয়মবন্ধন তপশ্চর্যা সহকারে উহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রবুদ্ধ চিন্তা এবং গভীর রসানুভূতির সাহায্যে তিনি ঐগুলিকে কাব্য সঙ্গীত, প্রবন্ধ ইত্যাদির আকারে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বিশ্লেষণ করিলে বা তাঁহার স্রষ্টাপুরুষের সহিত পরিচিত হইলে যাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা উপনিষদ্-বর্ণিত জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সাধনার বা আত্মোপলব্ধি ও ব্রহ্মসম্বন্ধের সাধনারই আর একরূপ। জীবনের নশ্বরতা যুগে যুগে মানুষকে ভাবিত করিয়াছে। যে মানুষ তাহার ধ্যান ও তপস্যার অন্তর্দৃষ্টিতে জগৎকে 'ভূমা'রূপে দেখিতে শিখিয়াছে, আত্মাকে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎস্বরূপ হিসাবে কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছে এবং উহার অনশ্বরতা সম্বন্ধে একপ্রকার নিঃসংশয় হইয়াছে—সেই মানুষই আপনার দেহের বিকার ও বিনাশকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে গিয়া যেন সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তখন ইহ জগতের সকল কর্মে ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর ন্যায় তাহারও মনে এই করুণ প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—'যে নাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' যাহার দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না তাহা লইয়া আমি কি করিব? প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর মধ্যে অমৃত, সীমার

মধ্যে অসীম, সান্তের মধ্যে অনন্ত, ধরার মধ্যে অধরাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই উপনিষদের প্রধান বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায়—তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে এবং দার্শনিক অনুভূতিতে উপনিষদের অন্তর্নিহিত এই উপলব্ধিই স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। তিনি আমাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছেন যে আমাদের এই মরজীবনে একমাত্র উপনিষদ হইতেই আমরা অমরত্বের রস আস্বাদন করিতে পারি। উপনিষদ্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

"উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে।

মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শ পাইবার রহস্যও রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন :

"মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? সেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে। মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারে বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদেরই অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসে ঠেলে দিয়ে বলতে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"

[শান্তিনিকেতন—প্রার্থনা]

ঊনবিংশ শতকে বাঙলার জীবনে যে আধ্যাত্মিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহা একদিকে যেমন রামকৃষ্ণের দিব্য সাধনায় জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, তেমনি অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের দানে দেহের অক্ষিমজ্জায় নূতন শক্তি ও শোণিত সঞ্চারিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ প্রাচীন হিন্দুরই তপঃসাধনার অন্তর্গত। অর্থাৎ তাহাতেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম প্রকটিত হইয়াছে। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালীর জীবনে প্রেমের যে মন্দাকিনী বহিয়া গিয়াছিল, বৈষ্ণবযুগের সেই গৌরবমহিমার একটি তরঙ্গপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া বা একটি স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া যেন এইকালে মহামানববাদ ও বিশ্বপ্রেমের আকারে সনাতন ভারতীয় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভা যুগের প্রবৃত্তিকে এমন এক ঊর্ধ্বায়ন মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে যাহার ফলে সকল জটিল সমস্যার একটি সহজ সমাধান মিলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তিনি জাতীয়তার সহিত আধ্যাত্মিকতার, স্বদেশিকতার সহিত বিশ্বপ্রেমের নব সার্থক মেলবন্ধন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আত্মিকজীবন পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ইষ্ট দেবীর নিকট এই প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—'আমায় রসে বশে রাখিস মা'। কবি রবীন্দ্রনাথও রসসাধক।

"আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্ না হারা।"

আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ রস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা পরম ব্রহ্মেরই অংশ বিশেষ নিয়ম এবং সৌন্দর্য—বিশ্বনিয়ন্তার এই দুই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন অপরটি প্রত্যক্ষ একদিকে কঠোরতা ও সংযম এবং অপরদিকে আনন্দ ও মাধুর্য—এই দুই আপাতবিরুদ্ধ বস্তুর সমাবেশে রসের ধর্ম ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ রস শুভঙ্করী। প্রবৃত্তি নিরোধক এবং সত্যকার প্রেমোদ্দীপক। সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন :

"মানুষ যখনি সত্যভাবে, গভীরভাবে মিলে তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলে

ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের
ৎটি সুষ্ঠু হইবে :
র্শের দ্বারা জীবনে শান্ত স্বরূপকে লাভ
করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি
করা সম্ভবপর হয়। নতুবা গার্হস্থ্য অমঙ্গলের
হয়ে ওঠে।...যখন তা বুঝি তখনই তিনি
সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্বপ্রকার
বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভব হয়। আজিও সংসার
সংচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয় পরিণাম আনন্দরূপ
য়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেম।
শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, শিবেতেই শেষ।
প্রকৃতিতে শেষ নয়, মানুষ প্রকৃতিতেও শেষ নয়
মানুষেই শেষ। এই প্রেম আমাদের আত্মাকে
শান্তিনিকেতন ৭ খণ্ড

ন লক্ষণ হচ্ছে এই যে,
কার করে নেয়। কেননা
রাই তার পূর্ণ সার্থকতা।

তর হইতে একটি নিহিত
নিজেকে দেখান। ঈশ্বরের
এবং আমাদের আত্মায়
প্রকৃতির নিয়মই তাহার
ার অর্থই অশান্তি। এই
নি যে জীবজগৎকে ধারণ
া ধ্রুব—তাহা মঙ্গলকর।
ক্ত সেখানে তিনি অদ্বৈত
ানন্দময় এবং প্রেমময়।

গণ এই উপদেশটি মন্ত্রের ন্যায় পালন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই উপদেশ বাণীটিকে পরিবর্তিত করিয়া যাহা তাহার স্বকীয়তিরিক্ত করিয়াছেন, আজিও তাহার বিরুদ্ধে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ লক্ষিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'জীবে দয়া নয়; জীবে সেবা, জীবে প্রেম।' যে জীব, সেই শিব।' সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার স্বকীয় চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এই বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার মানবপ্রেম (Humanism কেবলমাত্র দেশের পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি তাহাকে দেশাতীত অবস্থায় উন্নীত করিয়া সমগ্র মানবসমাজের বা বিশ্বমানবের কল্যাণে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই তাঁহার ধর্ম বাঙালীর ধর্ম নয়, ভারতবাসীর ধর্ম নয়—তাঁহার ধর্ম, মানুষের ধর্ম। এই মানুষের ধর্ম প্রচার করিয়াই তিনি বিশ্বসভায় অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়াছেন। জাতি হিসাবে বাঙালী তথা ভারতবাসী অন্যান্য দেশের তুলনায় কতখানি অগ্রসর, তাহার ঔদার্য কতখানি কৃত্রিমতাশূন্য তাহাও প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন:

"মানুষ আপনার অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একান্ত। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।' ...মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

(মানুষের ধর্ম)

সভ্যতার আদিযুগ হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস অনুধাবন করিলে যে-সত্যটি উপলব্ধি করা যায় তাহা এই যে মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস সমন্বয়েরই ইতিহাস। তাহার ধর্ম-কর্ম, ভাবকল্পনা সমস্তই অমিলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য খুঁজিয়া লইতে চাহিয়াছে। কেবলমাত্র আপনার মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের মানুষ তপস্যা করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে সে সমগ্র বিশ্বমানবের মুক্তির বা নিখিল মানবের বন্ধনহীনতার কথা চিন্তা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সেই বাণী শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি।...ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্দুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়।"

(বৃহত্তর ভারত—কালান্তর)

ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম সব কিছুই কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও যে কিরূপ উন্নতির পরিচয় দিয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইহার কারণ ভারতবর্ষের আর্য ঋষিগণ ধর্মকে সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য ব্যবহার করেন নাই। সমগ্র সংসারকে তাঁহারা ধর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য শিক্ষার কালকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—ব্রহ্ম লাভের দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিব:

"ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির অবলম্বন নহে—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বেশী করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশী করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।"

(ততঃ-কিম্—ধর্ম)

ভারতবর্ষের ধর্ম সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা একাধারে শক্তি এবং প্রেম অর্থাৎ গতি ও স্থিতির সাধনা। শক্তি আমাদের কর্মের মধ্যে লইয়া যায়—প্রেম আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের উদ্রেক করে। এই ধর্ম আবার সরল আদর্শ ও স্থির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণ স্বরূপ আমরা উপনিষদের আশ্রয় লইতে পারি। উপনিষদ যে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ স্বরূপকে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যেমন পরিপূর্ণ তেমনি সকল প্রকার জটিলতা এবং চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত। এই সরলতার কথা বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

"The East worships simplicity and
erein his one of the main reasons why
ulgarity is impossible to any Eastern people.
eligion is neither word nor doctrine. It is
be and become, not to hear and acce
is the whole soul changed into that which
elieves"

করে, যাহা উপকরণের
চেষ্টাকে

ভারতাত্মার সাধক রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবির ছাদে আমাদের ধর্মের মর্মবাণীটিকে তাঁহার অনুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

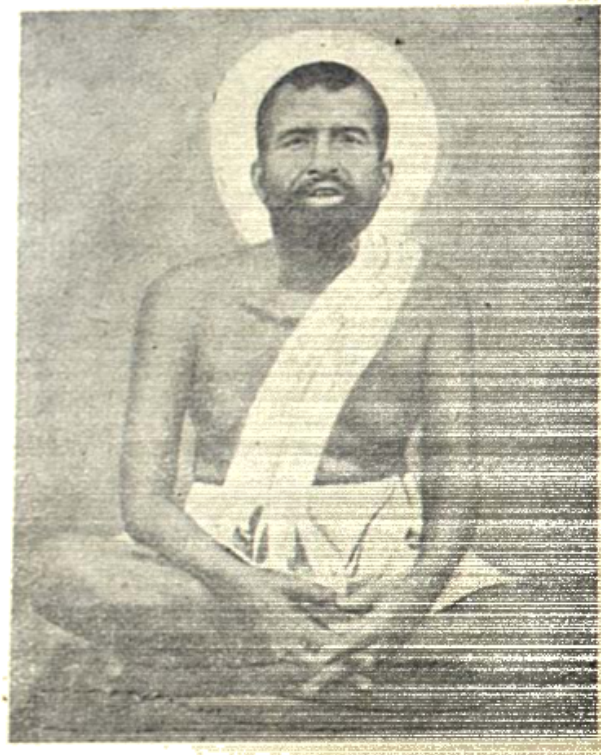

রামকৃষ্ণ পরমহংস

"যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইয়া
হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না। চক্ষুকর্ণ
থকতা একথা ভারতবর্ষের
বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অসত্য
হা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই
দেয়—কারণ তাহাই সত্য, তাহাই
স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের
আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া
আকর্ষণে আমাদের

শেরিফের ছেলেমেয়ে

চার্লস্ ডব্লিউ চেসনুট

অনুবাদক—শ্রীদেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

যুদ্ধের দশবছর পর একদিন গ্রীষ্মের এক প্রভাতে ট্রেরেতে ছড়িয়ে পড়ল ক্যাপ্‌টেন ওয়াকারের হত্যার সংবাদ। সেদিন শুক্রবার। সহরের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেনসনে খুনখারাপির ব্যাপার সচরাচর ঘটত না। তাই যখন সবাই জানতে পারল যে রাত্রিতে ওয়াকার নিহত হয়েছেন তখন চারদিকে এক অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। দলে দলে গ্রামবাসীরা জমা হয়ে জটলা করতে থাকে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের বিষয়ে। কয়োনারের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে শুক্রবার সকালে সহরের দিকে যেতে যেতে একজন চাষী একটি শ্বেত-কাফ্রীকে ট্রয় থেকে চলে যেতে দেখতে পেয়েছে। শেরিফ ব্যাপারটির তদন্তের জন্য বিকালের দিকে লোকটিকে তলাশী করবার বন্দোবস্ত করলেন। ট্রয়ের অধিকাংশ অধিবাসী যখন রাত্রির খাবার খাচ্ছিল তখন এই সন্দেহভাজন মানুষটিকে পল্লীর কারাগারে আনা হল।

পরের দিন সকাল বেলা। প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত খবর রটে গেল যে আসামী ধরা পড়েছে। শনিবার দিন সাধারণত সহরে যত লোক আসত তার চাইতে অনেক বেশি লোক সেদিন এসে হাজির হল। নানান বেশভূষার নরনারীর এক জনতা। সবাই এই খুনের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিল। নিহত ক্যাপ্‌টেনের অনেক অতীত স্মৃতি স্মরণ করে কেউ কেউ চোখের জল ফেলছে। আহা! নিরীহ সদাশিব ক্যাপ্‌টেন। ক্রমে ক্রমে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ ঐ জনতার মধ্যে জেগে উঠে। তাদের বন্ধুর হত্যাকারীর কঠোরতম শাস্তি চাই। সাধারণ বিচার অত্যন্ত কম হবে এই খুনীর পক্ষে।

দুপুরের দিকে সহরের লোক ডান এ্যাসমের দোকানে জমায়েত হয়। দুর্জয় ক্রোধে তারা স্থির করে যে নিজেরাই ঐ শ্বেত-কাফ্রীর প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা করবে। তবেই তার অপরাধের যথার্থ শাস্তি হবে। খুনের প্রতিশোধ। এছাড়া আর কোন পথ নেই। আইনের সমস্ত কথা তারা ভুলে যায়। বারংবার মনে জেগে উঠে—এ্যাঁ, নিগ্রোর হাতে শ্বেতাঙ্গের হত্যা!

'ক্যাপ্‌টেন একজন সৈনিক ছিলেন। কোর্টমার্শাল হলেছে শুনলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।'—নিহত ক্যাপ্‌টেনের একজন বন্ধু ধীর গম্ভীর স্বরে একথা বললেন।

পরামর্শ করে তারা সবাই বিকাল পাঁচটায় টাই-সনের দোকানে জড় হয়ে জেলের দিকে একসাথে এগিয়ে যায়। শ্বেত-কাফ্রীটার প্রাণদণ্ডের পাকাপাকি ব্যবস্থা করবার জন্য কমিটিও ঠিক হয়ে গেল।

তারপর কেউ কেউ ডিনার খেতে চলে যায়। আরো লোক জোগাড় করবার চেষ্টায় থাকে।

পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট মাত্র বাকী। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ ছুটে একজন নিগ্রো শেরিফের বাড়ীর দুয়ারে এসে পৌঁছে। জেলের একটু দূরেই শেরিফের বাড়ী। দুয়ারে টোকা দিতেই একজন কালো রঙের মহিলা এগিয়ে আসে।

'বোন নান্স, কেমন আছ?'—

'ভাই সাম, কেমন আছ?'—

'শেরিফ বাড়ী আছেন ?'—নিগ্রো জিজ্ঞাসা করে।

'হাঁ, সাম, তিনি ডিনার খাচ্ছেন।'—মহিলা উত্তর করে।

'খোন নাম্স, তাঁকে একটু জিজ্ঞাসা করবে এক মিনিটের জন্ত তিনি যদি একটু দেখা করেন ?'

মহিলাটি খাবার ঘরে চলে যায়। শেরিফ দুয়ারে এলেন। লম্বা, দৃঢ় মাংসপেশীবহুল লাল টকটকে তাঁর চেহারা। ঘন লোমশ ভ্রূযুগের নীচে এক জোড়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন চোখ।

'কি চাই তোমার সাম ?'—শেরিফ নিগ্রোকে জিজ্ঞাসা করলেন।

নিগ্রোটি টুপি হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। শার্টের হাতা দিয়ে সে ঘাম মুছছে।

'শেরিফ, জেলের কয়েদীকে ফাঁসি দেওয়ার জন্ত ওরা আসছে। দোকানে ময়দার বস্তার পিছনে আমি শুয়েছিলাম। ডক' কেইন এন কুয়েল রাইটকে এ সব কথা বলতে শুনলাম। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যত শীগ্‌গীর সম্ভব ছুটে এসেছি। শুনলাম আপনি বলেছেন আপনার মরা শরীরের উপর দাঁড়িয়ে না গিয়ে আপনার কাছ থেকে কেউ কয়েদীকে নিতে পারবে না। তাই ভাবলাম আপনাকে জানাই যে ওরা আসছে। তাহলে আপনি তাকে রক্ষা করতে পারবেন।

ধীরভাবে শেরিফ সব শুনলেন। তাঁর মুখে একটা দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠে। একটা অনড় সংকল্প তাঁর ধূসর রঙের চোখ দুটি উজ্জ্বল করে তোলে। তাঁর অবচেতন মনে জেগে উঠে: তিনি যেন একজন সৈনিক আর শত্রুর সাথে মুখোমুখী সাক্ষাতের প্রত্যাশা করছেন।

তিনি বললেন—'বাধিত হয়েছি সাম। আমি কয়েদীকে রক্ষা করব। কারা আসছে ?'

নিগ্রো উত্তরে বলল—'কারা আমি জানি না। সিটা ন্যাক্ সোয়েইন, এন ডক কেইন কুয়েল রাইট—আরো অনেকে। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে তাদের আছেকের কথা ভুলে গিয়েছি। মনে হচ্ছে এতক্ষণে তারা এসে গেছে। কাজেই চলি। কারণ এর মধ্যে আমি আছি এ-কথা কেউ ভাবে এ-আমি চাই না।'

সহরের দিকে যে-রাস্তাটা গিয়েছে তার দিকে সে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে।

'একটু ডিনার খাবে না ?'—শেরিফ জিজ্ঞাসা করেন।

খোলা দরজার ভিতর দিয়ে নিগ্রো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়, আর শূকরের সিদ্ধ মাংসের স্বাদ গন্ধের ঘ্রাণ নেয়।

'দেরী করবার সময় নেই আমার, শেরিফ'—সে বললো—'কিন্তু বোন নাম্স আমাকে দিলে হাতে করে নিয়ে রাস্তায় খেতে পারি।'

কিছুপরে স্যান্ডি স্যাণ্ডউইচ এবং অন্যান্য খাবার এনে তাকে দেয়। চট্ করে টুপি মাথায় দিয়ে কিছুটা পকেটে এবং কিছু হাতে নিয়ে নিগ্রো দ্রুত রাস্তা দিয়ে বনের শেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঘরের ভিতরে এসে শেরিফ কোট এবং টুপি পরে নিলেন। দোনালা বন্দুকটা গুলি ভর্তি করলেন। রিভলবারের কুঠরীগুলির ভিতরে নূতন গুলি বোঝাই করে কোটের পকেটে রেখে দিলেন।

ধীর প্রশান্ত এক তরুণী উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে শেরিফের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

'কোথা যাচ্ছ বাবা ?'—সে জিজ্ঞাসা করে। নিগ্রোর সাথে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছে তা সে শোনেনি।

'জেল-বাড়ী যাচ্ছি।' শেরিফ উত্তর করলেন—'একদল উন্মত্ত লোক এদিকে আসছে নিগ্রো বন্দীকে হত্যা করতে।' বেশ জোর দিয়ে তিনি বললেন—'কিন্তু তারা এ করতে পারবে না।'

তাঁর বাহু-সংলগ্ন হয়ে সে বলল—'তুমি যেয়ো না বাবা, ওকে ছেড়ে না দিলে ওরা তোমায় গুলি করবে।'

আস্তে তার হাত সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—'আমার জন্ত কিছু ভেবো না, পলি। আমি এবং

কয়েদী—এ-দুজনের জন্যই আমি সতর্ক থাকব। ব্রেনসনে এমন একটি মানুষও নেই যে আমাকে গুলি করতে পারে। তাছাড়া কর্তব্যের খাতিরে তো প্রায়ই গুলির সামনে দাঁড়িয়েছি। তুমি বাড়ীতে থাকো।'

তিনি বলতে লাগলেন—'যদি তোমায় কেউ বিরক্ত করে প্রথম দেরাজে যে ঘোড়া পিস্তল রয়েছে তার ব্যবহার করবে। একটু সেকেলে হলেও কয়েক বছর আগে ঐটে যথেষ্ট কাজ দিয়েছে।

এ-কথায় তরুণী ভয়ে কেঁপে উঠে। কিন্তু বাবার চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে আর কোন সে আপত্তি জানাল না।

সাধারণ অর্থ, শিক্ষা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষের সমাজের অনেক উঁচুতে এই ব্রেনসনের শেরিফের স্থান। যুদ্ধের আগে যে অল্প কয়েকটি পরিবার বিশাল সম্পত্তি এবং অসংখ্য ক্রীতদাসের মালিক ছিল—তাঁর পরিবার তাদেরই একজন। বি. এ পাশ করবার পর সাময়িক সাহিত্য এবং প্রগতিমূলক চিন্তাধারার সাথে তিনি পরিচয় রেখেছিলেন।

শেরিফের কর্তব্যপরায়ণতা অপরিসীম। তিনি কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র হতে বোধ হয় শেরিফের পদের কর্তব্য-কর্মগুলি ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিলেন। সেজন্যই অস্ত্র ঠিক করে তিনি জেলে চলে গিয়েছেন। পলির নিরাপত্তার জন্য তাঁর কোন ভয় নেই।

জেলের সামনের বিরাট দরজাটা সবেমাত্র শেরিফ তালা বন্ধ করেছেন এমন সময় প্রায় ছ'জন ঘোড়-সওয়ার আর তার পিছনে পিছনে পদাতিক জনতা রাস্তার মোড়ে মিলিত হয়ে জেলের দিকে এগোতে থাকে। দালানের চারদিকে বেড়ার ধারে তারা থামে। প্রস্তুতি কমিটির কেউ কেউ শেরিফের বাড়ীর দিকে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় ঘোড়ার চাবুক দিয়ে ঘা দেয়।

'শেরিফ বাড়ী আছেন?'—সে জিজ্ঞাসা করে।

'না, তিনি বাইরে গেছেন।'—পলি উত্তর দেয়।

'আমরা জেলের চাবি চাই'—সে বলতে থাকে।

'চাবি এখানে নেই; শেরিফের কাছে রয়েছে।—কৃত্রিম ঔদাসীন্যের সঙ্গে পলি বললো—'তিনি এখন জেল-বাড়ীতে।'

মানুষটি চলে যায়। পলি সামনের দিকের ঘরে গিয়ে উদ্বেগের সাথে জানালার সবুজ পর্দার ভিতর দিয়ে জেলের দিকে উঁকি দিতে থাকে। ইতিমধ্যে সেই মানুষটি তার দলের মানুষদের গিয়ে তার আবিষ্কারের খবর দেয়। মনে হলো, শেরিফ যেন তাদের মতলব টের পেয়েছেন এবং প্রতিরোধের জন্য তৈয়ারী হচ্ছেন।

তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে দরজায় ঘা' দেয়।

'একি হচ্ছে?'—ভিতর থেকে শেরিফ বললেন।

'আমরা আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'—তাদের মুখপাত্র বললো।

দরজার ছোট্ট পকেটটি খুলে শেরিফ তার মধ্য দিয়ে উত্তর করলেন—'ঠিক আছে, বলুন। আপনারা সবাই আমার কাছে অপরিচিত। আর আপনাদের কি কাজ তা আমি জানি না।' এমন অবস্থায় শেরিফ কাউকে বিশেষ করে চিনে নেওয়া প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করলেন না।

'আমরা নাগরিকদের একটি কমিটি, এবং আমরা জেলের ভিতর ঢুকতে চাই।'—তারা বলল।

'কি জন্য? ভিতরে ঢুকতে খুব কষ্ট করতে অধিকাংশ লোকই বাইরে থাকতে চায়।"

শেরিফের এই রসিকতা বুঝবার মত মনের সে ঐ জনতার ছিল না। কাজেই এই রসিকতা শ্রোতাদের নিকট ব্যর্থ হয়ে গেল।

'ক্যাপ্‌টেন ওয়াকারের হত্যাকারী ঐ নিগ্রোর সাথে আমরা কথা বলতে চাই।'—তারা বলে।

'বিচারের জন্য যখন তাকে নেওয়া হবে তখন কোর্টে তার সাথে কথা বলতে পারবেন। আসছে সপ্তাহে কোর্ট

বলবে। আমি জানি আপনারা কি চান। কিন্তু আপনারা আমার কয়েদীকে আজ পাবেননা। একজন পরীবের মুখ থেকে আপনারা রুটি নিতে চান? এই কয়েদীকে রাখবার জন্য আমি রোজ পঁচাত্তর সেন্ট পাই। এবং সেই একমাত্র জেলে রয়েছে; আপনাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি আমার পরিবারকে কষ্ট দিতে পারিনা।' —শেরিফ বললেন।

রোজ পঁচাত্তর সেন্টের অভাবে শেরিফ কাল্পনিকের কষ্টের কথায় ভীড়ের মধ্যে দু'একজন যুবক হেসে উঠে। তাদের নিকটেই যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের ভ্রূকুটিতে তারা চুপ করে যায়।

'যদি আমাদের ঢুকতে না দেন'—একটি কণ্ঠস্বর চীৎকার করে উঠে—'তবে আমরা ভেঙে দুয়ার খুলব।'

'তাহুন'—শেরিফ উঁচুতে কণ্ঠস্বর তুলে বললেন যাতে সবাই শুনতে পায়। 'কিন্তু আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। যে প্রথমে চেষ্টা করবে তাকে গুলি করা হবে। আমি এ-দেশের শেরিফ। আমি আমার কর্তব্য জানি এবং আমাকে তা করতে হবে।'

'বন্দুক ছুঁড়ে কি লাভ, শেরিফ?'—জনতার একজন নেতা যুক্তি দেখায়—'যেভাবেই হক নিগ্রোব্যাটার ফাঁসি নিশ্চয়ই হবে। তার হওয়াও যথার্থই উচিত। নিগ্রোদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অমোদের কিছু করতে হবে। নইলে শাদাচামড়ার মানুষেরা এদেশে বাস করতে পারবে না।'

'কথা বলে কোন লাভ নেই বাপুরা।' শেরিফ উত্তর করলেন—'বাইরে আমি সাদারঙের লোক। কিন্তু এই জেলের ভিতরে আমি শেরিফ। যদি এই অঞ্চলে এই নিগ্রোর ফাঁসি দেওয়া ঠিক হয় তবে আমিও তার ফাঁসির প্রস্তাবই করছি। কাজেই সামনে থেকে দিক দিয়ে টুয়ে চলে যেতে পার। তোমরা আমাকে জান। এর আগেও আমি গোলাগুলির সামনে দাঁড়িয়েছি। যতক্ষণ আমি গুলি চালাতে পারব ততক্ষণ এ জেল আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব না।'

নিজের সংকল্পের কথা ঘোষণা করে শেরিফ দরজাটি বন্ধ করে বেঁধে দিলেন; এবং যেখান থেকে দালানটি রক্ষা করা যায় সেরকমের সবচাইতে ভালো যায়গাটির জন্য চারধারে তাকালেন।

মানুষের দল একটু পিছনে চলে যায়। নেতারা নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলাবলি করে।

জেল-বাড়ীটি ছোট্ট, দোতালা দালান। বেশ শক্ত মজবুত। কারুকার্যের কোন বালাই নেই। দুয়ার খুলে শেরিফ কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করেন। এক কোণে কয়েদী জড়সড় হয়েছিল। ঘরের আধো-আলো অন্ধকার।

তার ভয়ে পাণ্ডুর মুখখানি আধা-ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। কপালে তার ঠাণ্ডা ঘাম জমেছে এবং ভয়ে হাত ঠকঠক করে কাঁপছে।

'ভগবানের নামে বলছি, শেরিফ'—ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বিড়বিড় করে বলে—'আমাকে ওদের খুন করতে দিওনা। আমি বুড়ো লোকটিকে খুন করিনি।'

এই ভীত প্রাণীটির প্রতি শেরিফ অবজ্ঞা এবং ঘৃণার চোখে তাকালেন।

'ওঠ্'—তিনি তীব্রভাবে বললেন—শীগ্‌গীরই হক আর দেরীতে হক বোধ হয় তোর ফাঁসি হবে। কিন্তু আজ হবেনা অবশ্য আমি যদি কোন উপায় করতে পারি। তোর শেকল খুলে দেব এবং যদি জেল রক্ষা করতে না পারি তবে তোকে যথাসাধ্য লড়তে হবে। আমি গুলি খেলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল।'

'জানালা থেকে সরে দাঁড়া। তোকে দেখলে তারা গুলি করতে পারে।'—শেরিফ বললেন।

জানালার কাছে একটি পাইন কাঠের বেঞ্চি টেনে নিয়ে গিয়ে শেরিফ তাঁর রিভলভারটি তার উপর রাখলেন। তারপর বন্দুকটি হাতে নিয়ে তিনি জানালার ধারে দাঁড়ালেন—যেখান থেকে নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে নীচের ঐ জনতার গতি লক্ষ্য করা যায়।

যারা নিজেরাই ক্ষমতা হাতে নিয়ে এই শ্বেত-কাফ্রীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করতে এসেছিল তারা ধারণাও করতে পারে নাই যে শেরিফ এত প্রবলভাবে বাধা দিবেন। শেরিফ দেখতে পেলেন যে তারা কি যেন বলাবলি করছে। দূরত্বের জন্য তাদের কথাবার্তা শোনা গেলনা। নেতার উপদেশে শেষ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতা চলে যায়। রাস্তার মোড়ে তাদের চলে যাওয়া পর্যন্ত শেরিফ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ না শেষ লোকটি চোখের আড়ালে চলে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি একটুও নড়চড় করলেন না। এই চলে যাওয়াটা তাদের একটা ধোঁকা হতে পারে। পরে আবার আক্রমণ করবে। কাজেই বাইরের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। শেরিফ টের পাননি যে কয়েদী সন্তর্পণে মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে এসে তাঁর পিছনে বেঞ্চির উপর থেকে রিভলবারটি হাতে করে নিয়ে ঘরের কোণে নিজের যায়গায় আবার হামাগুড়ি দিয়ে চলে গিয়েছে।

তারা চলে যাওয়ার পরই শেরিফ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার কয়েক ইঞ্চি দূরে একটি বুলেট এসে পড়লো। রাস্তার পারে ঐ বন থেকে এই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। যেদিক থেকে চাপ-চাপ ধোঁয়া আসছে সেদিক লক্ষ্য করে শেরিফ দুবার গুলি করলেন। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ্য করেন। তারপর জানালার বন্দুকটি রেখে অপর হাতিয়ারটির জন্য যন্ত্রচালিতের মত পিছনে ফিরেন। বেঞ্চির উপর ঐটি ছিল। এই ভেবে মুখ ফিরিয়ে তিনি রিভলবারের ডগার দিকে তাকালেন।

'যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন, শেরিফ'—কয়েদী বলল। তার চোখদুটি জলজল করছে। উত্তেজনায় লাল।

এই অসুবিধায় পড়বার জন্য নিজের অসতর্কতাকে শেরিফ মনে মনে অভিশাপ দিলেন। এ-ধরণের কিছু তিনি প্রত্যাশা করেননি। একজন নিরস্ত্র শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে নিগ্রোর যে কাপুরুষতা এবং অধীনতা বোধ স্বাভাবিক তারই উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন। শেরিফ সাহসী বীর ছিলেন। কিন্তু কয়েদী তাঁকে ভীষণ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। একমুহূর্ত মানুষ দুটি দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টি-যুদ্ধ চলল দুজনের ভিতর। কিন্তু তাতে কারুর কোন ক্ষতি হলনা।

'তুমি কি করবে ভাবছ?'—অবিকম্পিত স্বরে শেরিফ জিজ্ঞাসা করলো।

'অবশ্যই চলে যাব'—কয়েদী এমন স্বরে বলল যে তাতে তার দিকে শেরিফের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ এবং শংকিত হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন যে তাকে সব পরিষ্কার করে নিশ্চয়ই বলবেন এবং তার কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সাননের ঐ ধারালো দুটির বেপরোয়া লোকটি কয়েক মিনিট আগের প্রাণ-ভিক্ষু নীচ ইতর প্রাণী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন!

শেষে শেরিফ বললেন—'আমার নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমাকে রক্ষা করবার এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা? যদি আমি এভাবে না করতাম, তাহলে এখন তুমি নিকটের কোন গাছে ঝুলতে।'

কয়েদী বলল—'সত্যিই আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? আপনি যখন এলেন তখন বললেন আসছে সপ্তাহে কোর্ট বসবে। লোকগুলি চলে যাওয়ার সময় বলল, বেশিদিন আমি বাঁচবনা। দুইটি ঘড়ির মাঝে একটু বাছাই করা মাত্র।'

শেরিফ উত্তর করলেন—'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' যন্ত্রবৎ এই অতি প্রচলিত সাধারণ কথাটি তিনি বললেন। কিন্তু তাঁর মন এই অবস্থা হতে উদ্ধারের কথা ভাবতে ব্যস্ত ছিল। তিনি বললেন—

'যদি তুমি নির্দোষী হও তুমি তা প্রমাণ করতে পার।'

শ্বেত-কাফ্রী সন্তান তার দৃষ্টি শেরিফের উপর নিবদ্ধ করে রেখেছে। সে বলে—

'আমি বুড়োকে খুন করিনি। কিন্তু আমি কখনও পরিষ্কারভাবে তা' প্রমাণ করতে পারব না। খুনের সময় আমি তার বাড়ীতে ছিলাম। আমি যখন ধরা পড়ি

তখন আমার পিঠে যে কোটটি ছিল ঐটি আমি দেখান থেকে চুরী করেছি। সত্যিই যে খুনী তাকে বের করবার আগেই বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হব।'

শেরিফ এ-কথা অবশ্য ভালোভাবেই জানতেন। তিনি যখন ভাবছিলেন এর পর কি যুক্তি দেওয়া যায় তখন কয়েদী বলতে আরম্ভ করল—

'চাবি আমার ছুঁড়ে দিন—না—দুয়ারের তালা খুলে দিন।

অস্থিরচিত্ত হয়ে শেরিফ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন।

অন্তত দৃষ্টিতে শ্বেত-কাফ্রীর চোখ জ্বলছে।

ঘর পেরিয়ে গিয়ে শেরিফ দরজালানের দুয়ারের তালা খুলে দিলেন।

'এখন নীচে গিয়ে বাইরের দুয়ার খুলে দিন।'

শেরিফের বুক স্পন্দিত হতে লাগল। মুক্তির জন্য তিনি হয়ত একটা চেষ্টা করতে পারেন। সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে তিনি নীচে নেমে এলেন। কয়েদী তাঁর খুব কাছাকাছি পিছে পিছে রইল।

তালার ভিতরে শেরিফ বিরাট লোহার চাবিটি ঢুকিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে মরচে-পড়া কুলুপ খুলে যায়। দুয়ার খুলতে এখনো বাকী।

'খামুন'—শ্বেত-কাফ্রী হুঙ্কার দিয়ে উঠল।—'একটি আওয়াজ করলে আমি আপনার মাথা উড়িয়ে দেব।'

শেরিফ সে-কথা মেনে নিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এখনো তাঁর সুযোগ আসেনি।

'এখন গলিপথের ওদিকটায় থাকুন এবং উপরে চলে যান।'

রিভলভারের ডগার নীচে রেখে শ্বেত-কাফ্রী শেরিফকে উপরতলায় নিয়ে গেল। শেরিফ ভাবছিলেন যে কয়েদী তাঁকে কুঠুরীতে আটকে রেখে পালিয়ে যাবে। তিনি প্রায় এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর পক্ষে নীরবে আত্ম-সমর্পণ করা এবং তারপর সংকেত দিয়ে আবার তাকে আটক করবার সুযোগ নেওয়াই সব চাইতে ভালো কাজ। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছেন। কিছুক্ষণ আগেও সশস্ত্র একশত লোকের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই বেপরোয়া লোকটিকে তুচ্ছ ভেবে লাভ নেই। এত অসুবিধা এবং বাধার সামনে জীবন বিসর্জন দেওয়ার মত অবিবেচক তিনি ন'ন। পলি রয়েছে। তাকে তো দেখতে হবে। কর্তব্য-নিষ্ঠারও একটা সীমা আছে। তার বাইরে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিক, এমন কি বোকামি হবে।

কয়েদী বলল—'আমি চলে যেতে চাই, আবার ধরা পড়বার ইচ্ছাও আমার নেই। কারণ ধরা পড়লে সেখানেই আমার ফাঁসী হবে।' চিন্তা করতে করতে সে বলল—'নিজেকে বাঁচানোর জন্যই আপনাকে আমার হত্যা করতে হবে।'

অনিচ্ছাপ্রসূত এক ভীতি-বিহ্বলতায় শেরিফ বললেন—'ভালো ভালো। যার কাছে তুমি তোমার নিজের জীবনের জন্য ঋণী তাকে নিশ্চয় হত্যা করবেনা।'

শ্বেত-কাফ্রী বলল—'নিশ্চয়ই আমার জীবনের জন্য আমি আপনার কাছে ঋণী।'

চরম বিপদের মুহূর্তে শেরিফ চমকে উঠলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে?'

সে উত্তর করল—'টম সিসেলির ছেলে।' দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার ভিতরে যে ফাঁক ছিল তার মধ্য দিয়ে সে কথা বলছে।—'মনে করতে পারছেন না সিসেলিকে, যাকে সন্তান-সহ এলবেজিয়া যাত্রী দাস ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিয়েছিলেন?'

শেরিফের মনে পড়ে। অনেকবার তাঁর মন এ-ব্যাপারের জন্য দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বাপের সাথে অনেক ঝগড়াও তিনি করেছেন। টাকার অভাব, দেনা, বন্ধকী, শস্য ভালো হয়নি। সিসেলি এবং তার ছেলের জন্য যে দাম পাওয়া গেল তা আশাতীত। তাই শেষ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ অন্তরে টাকার অভাবের নিকট নতি স্বীকার করতে হল।

তিনি বললেন—'বেশ, তুমি তোমার বাবাকে খুন করবে না!'

'আমার বাবা?'—ঐ শ্বেত কাফ্রী উত্তর দেয়।—'ঐ সম্পর্কের দাবী করা আমার পক্ষে খুবই ভালো ছিল। কিন্তু আপনার পক্ষে এর জন্য কিছু চাওয়া শোভা পায়না। আমার প্রতি পিতার কি কর্তব্য আপনি করেছেন? অন্য শ্বেতাঙ্গ পিতারা তাদের সন্তানদের দিয়েছে স্বাধীনতা, টাকা পয়সা,—তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে মুক্তরাজ্যে। কিন্তু ধানের জলাভূমিতে আপনি আমাকে বেচে দিয়েছেন।'

'আমি অন্তত তোমাকে এই জীবন দিয়েছি—বিড়বিড় করে শেরিফ বললেন।

'জীবন?'—কয়েদী বলল। একটা বিদ্রূপের হাসি তার চোখে মুখে ফুটে উঠে। কোন্ জীবন? তোমার রক্ত, তোমার চেহারা আমায় দিয়েছ? দুবার ফিরে এক সাথে আমাদের দিকে ফিরে তাকানোর দরকার নেই। আমাকে দিয়েছ একজন কালোমেয়ের মা। অভাগী। চাবুকের নীচে তার জীবন শেষ হয়েছে, কারণ নিজের আত্মাকে নিজের বলে বলবার মত যথেষ্ট নারীত্ব তার ছিল। সাদা মানুষের তেজ দিয়ে আমাকে ক্রীতদাস করেছ। সে-তেজকে পিষে নষ্ট করে দিয়েছ।'

'কিন্তু তুমি এখন মুক্ত।'—শেরিফ বললেন। এই শ্বেত-কাফ্রীর কথা তিনি সন্দেহ করতে পারলেন না। তিনি জানেন ঐ রুক্ষ-কালো চামড়ার নীচে কার তেজ রয়েছে, তারই সামনের ঐ কালো চোখের মধ্যে কার আবেগ উজ্জ্বল হয়ে আছে। পিতার শাসন এবং জনমত তার চারদিকে রক্ষাকবচের মত না থাকলে তিনি কি করতেন তা তিনি এই শ্বেত-কাফ্রীর মধ্যে দিয়ে অনুভব করলেন।

'স্বাধীন! কি করতে?'—সে উত্তর দিল।—'শুধু নামে স্বাধীন। কিন্তু আমার মায়ের চাইতেও অনেক বেশি আমি যাদের জাতের তাদের দ্বারাই আমি ঘৃণিত অবহেলিত।'

'অনেক স্কুল রয়েছে, সেখানে তুমি পড়েছ।'—শেরিফ লক্ষ্য করলেন ব্রেনসন দেশের অধিকাংশের চেয়ে এই শ্বেত-কাফ্রী অনেক বেশি শুদ্ধ ভাষায় অনর্গল কথা বলছে।

'স্কুলে আমি গিয়েছি। যখন গিয়েছি তখন স্বপ্ন দেখতাম—এর প্রভাবে আমার অবস্থার আমূল পরিবর্তন হ'য়ে যাবে। কিন্তু কি আমি শিখেছি? আমি ভাবতে শিখেছি যে কোন শিক্ষা বা জ্ঞানই আমার চামড়ার রঙ্ পাল্টে দেবে না। আর চিরদিন আমাকে আমার দেশের এই কলঙ্ক-চিহ্ন বইতে হবে। যখন এ-কথা একমনে ভাবি তখন এ-জীবনের জন্য বিশেষভাবে আর প্রার্থ করি না। তোমার কাছে আমি কিছুর জন্যই ঋণী নই। সে বলতে লাগল—'তোমার কাছে আমি কিছু প্রত্যাশাও করি না। তোমাকে গুলি করতেও ঘৃণা হচ্ছে। আমি মানুষ খুন করি না। ক্যাপ্টেনকে আমি খুন করিনি। তোমাকে গুলি না করলে কাল সকাল পর্যন্ত আমাকে ধরবার জন্য কোন বিপদ সংকেত দেওয়ার চেষ্টা করবে না—এ-কথা শপথ করে বলতে পারো?'

মানুষ দুটি তাদের নিজেদের কথাবার্তা এবং বিপর্যস্ত চিন্তায় এমনি বিভোর হয়েছিল যে নীচে বন্যা যে কতার উপর বাড়ে উঠেছে, একটি মৃদু পদধ্বনি উপরে এগিয়ে এসেছে এবং একটি পাতলা চেহারা অন্ধকার গলিপথে ছায়াগুড়ি দিয়ে শ্বেত কাফ্রীর দিকে এগিয়ে আসছে—তা তারা কেউই টের পায়নি।

দ্বিধাগ্রস্ত শেরিফ। জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব। শেরিফের বিবেক মরে যায়নি। সমাজ সংসার শুধু তাকে আবৃত করে রেখেছিল।

'থামুন',—শ্বেত-কাফ্রী বলল—'আপনার শপথ করা হবে না। করলেও আপনাকে বিশ্বাস করা

আমার নিরাপত্তার পথ। আপনাকে মারতেই

গুলি করবার জন্য সে হাত তুলতে নিছনের গলি-পথ থেকে গুলির আওয়াজ হল। পিস্তলটি তার হাত থেকে পড়িয়ে পড়ল।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে শেরিফ দুয়ার খুলে নাটিতে পড়া অস্ত্রটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর কয়েদীকে কুঠুরীর মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা ও তালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বেরালের উপর অর্ধ-অচেতন পলির কাছে ফিরে এলেন। পলির হাত তার নিজের বুকের উপর জড়িয়ে ছিল।

আমি ঠিক সময়ে এসেছি।' পিতার বাহু-সংলগ্ন হয়ে মূর্ছারোগীর মত সে কেঁদে উঠল।

'তারা সবাই চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করছিলাম।

বন থেকে গুলির আওয়াজ শুনলাম। তোমাকে গুলি করতেও দেখলাম। তারপর যখন তুমি আসছনা তখন আমার ভয় হল হয়ত বা কিছু হয়েছে। হয়ত তুমি আহত হয়েছ। অস্ত্র পিস্তলটি বের করে আমি দৌড়ে এলাম। দরজা খোলা দেখে বুঝলাম কিছু বিপদ হয়েছে। গলার আওয়াজ শুনে হামাগুড়ি দিয়ে উপরে এলাম। ঠিক সময়ে উপরে পৌঁছলাম যখন সে তোমাকে হত্যা করবে বলে চলছে। ওঃ, 'অল্পের জন্য বাঁচা গেছে।'

সে একটু সুস্থ হলে তাকে সেখানে রেখে শেরিফ কুঠুরীর দিকে ফিরে গেলেন। কয়েদীর ক্ষত বাহু থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। নির্বিকার তার মুখের চেহারা—বিমর্ষতা বা ভয়ের কোন চিহ্নই নেই! পলিকে শেরিফ কাপড় আনতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সৈনিক জীবনে অর্জিত অপটুদক্ষতায় সাথে তিনি সে-ক্ষত বেঁধে দিলেন।

'সকালবেলা একজন ডাক্তার আনব।'—শেরিফ কয়েদীকে বললেন। 'তুমি সে-পর্যন্ত চুপ করে থাকলে তাতে করে খুব ভালো হবে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে বলতে পার যে বন থেকে ছোড়া বুলেটের আঘাতে ঘা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গুলি খেয়েছ—এ-কথা বলে কোন লাভ হবেনা।'

কয়েদী কোন কথাই বলল না—না ধন্যবাদ না ক্ষমা চাওয়া। শুধু বসে রইল। বিক্ষুব্ধ। নিশ্চুপ। ক্ষত বাহু ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে পলি এবং তার বাবা বাড়ী ফিরে যান।

সেদিন বিকালে শেরিফ অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ছিলেন! পলির কথার গোলমেলে উত্তর দিয়ে গেলেন। রাত্রে বিছানায় গিয়েও কয়েক ঘণ্টা বিনিদ্র হয়ে রইলেন।

রাত্রির শান্ত নীরব প্রহর। নিঃসঙ্গ শেরিফ। সঙ্গী শুধু ভগবান। অভাবিত চিন্তার তরঙ্গ মনে উঠতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা আগে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে যে মানুষ তার অনুভূতির মত তাঁর অনুভূতি হয়েছে—যার কাছে সমস্ত কামনা-বাসনা কুসংস্কার আর জীর্ণ আচারের তিমির আবরণ ভেদ করে বিবেক জেগে উঠে। সত্যের উজ্জ্বল আলোকে মানুষের সমস্ত কাজ পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। মনে হয় ভগবান অলক্ষ্যে যেন সব দেখতে পাচ্ছেন। উদ্ধার পাওয়ার পর তাঁর মনে অন্ত-রকমের অনুভূতি জেগে উঠেছিল। কিন্তু এই নিশীথ রাত্রির নীরবতায় তিনি দেখতে পেলেন—তাঁর এই ছেলের প্রতি তাঁর কর্তব্য রয়েছে। আইন-কানুন আচার-বিচার মানুষের মনের সহজাত কর্তব্যবুদ্ধি নষ্ট করতে পারেনা। ভগবানের চোখে পাপের এই ফল তিনি দূর করে ঠেলে দিতে পারেন না। কোনদিন পাপ না করলে বিলুপ্ত অতীত থেকে এই অবাধ্য চেতনা মনে জেগে উঠতনা। এ-সব চিন্তা মনে আসতে শ্বেত-কাফ্রীর উপর তাঁর সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল। বিপুল করুণার উদ্রেক হল। তিনি ভাবলেন যে দাসত্বের পঙ্কল থেকে তিনি এই অগ্নিগর্ভ শক্তি রক্ষা করতে পারেন।

নিজের যৌবন তাঁর স্মরণ-পথে জেগে উঠে: সম্মানিত বংশের নাম অকলঙ্কিত রাখতে হবে, ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। সুন্দরী তরুণী হাতছানি দিচ্ছে সুখের

অমরাবতীর দিকে। কিন্তু ঐ যে ছত্রভঙ্গ
প্রাচীরের মধ্যে বড়বিড়ালির
বাপ-মা নাম-ধাম কি আছে? কিছু
ভবিষ্যৎ। সামনে শুধু অস্পষ্ট ধূমেলী দিগন্ত।

কি করতে পারতেন আর এখনো কি করতে পারেন ভাবতে ভাবতে তাঁর জাগ্রত বিবেকে রোডস লাগে। তাঁর মনে হয় ক্লডেলীকে চলে যেতে বলতে পারা যায়। কিন্তু কর্তব্য। শেরিফের শপথ পথ আগলে দাঁড়ায়। তন্ন তন্ন করে খুঁজে প্রকৃত খুনীকে তিনি বের করতে পারেন। কারণ ক্লডেলী যে নির্দোষ—এ-বিষয়ে তাঁর মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একবার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারলে সমাজ এবং ভগবানের বিরুদ্ধে শেরিফ যে-পাপ করেছেন তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন।

সিদ্ধান্তে পৌঁছে শেরিফ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলো একেবারে সকাল বেলায়।

কোন ফাঁস-প্রশ্বাসে
ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে ক্লডেলী নিজেই তার মাথের ব্যাণ্ডেজ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর রক্ত ঝরতে ঝরতে রাত্রিতেই কখন মধ্যে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

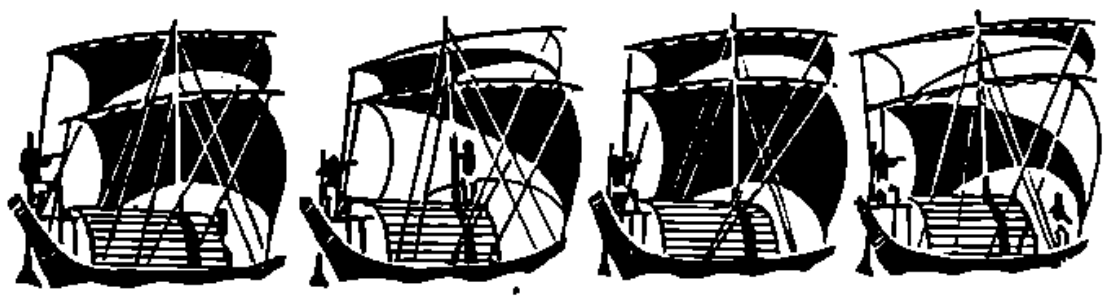

বিজ্ঞান জগৎ

জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করা কি সম্ভব ?

গ. চ. ভ.

মানুষ চায়—ইচ্ছামত যতদিন খুশী পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ; কিন্তু মহাভারতের ভীষ্মদেব ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কারও বোধ হয় যতদিন খুশী পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার কথা শোনা যায় নি। অথচ এই অবস্থাটা যে মানুষের পক্ষে কত দূর কাম্য, সেটা প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ আজ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, অতীত কল্পনাকেও সে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলেছে কিন্তু মৃত্যুকে বিলম্বিত করে জীবনকে ইচ্ছামত দীর্ঘস্থায়ী করবার কোন উপায়ই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। মৃত্যুকে বিলম্বিত করবার কোন উপায় আবিষ্কৃত না হলেও বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এসম্বন্ধে মোটেই নিশ্চেষ্ট

প্রাকৃতিক রহস্য সমাধানের উপায় প্রকৃতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত গ্রহণ করে থাকেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ, তথা জীবমাত্রেরই জীবন-কালের একটা মোটামুটি সময় নির্ধারিত দেখা যায়। কোন কোন প্রাণীর জীবনকাল কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কারো কয়েকদিন, কারো বা কয়েক বছর ; আবার কতকগুলি প্রাণী শতাধিক বছরও বেঁচে থাকে। উদ্ভিদ-জগতের পক্ষেও এ নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। ক্ষেত্রবিশেষে সময় সময় কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেলেও এই নিয়ম ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় না। জীবনের স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে এই যদি প্রকৃতির কঠোর নিয়ম হয়ে থাকে তবে তার পরিবর্তন অসম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে —জীব-জগতের সর্বত্রই কি এই নিয়মের সমান কঠোরতা পরিলক্ষিত হয় ? তাছাড়া, মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রমই বা ঘটে কেন ?

বিশেষভাবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই নিয়মের কঠোরতা লক্ষিত হয় না। উদ্ভিদ-বীজ অথবা অণ্ডজ প্রাণীদের কথাই ধরা যাক। বীজ অথবা ডিমের মধ্যে উদ্ভিদ অথবা জীবের ভ্রূণ সুপ্তাবস্থায় থাকে। অতি ক্ষুদ্র এবং অপরিণত অবস্থায় থাকলেও ভ্রূণ জীবন্ত পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটের উপর, উদ্ভিদ অথবা অণ্ডজ প্রাণীর জীবন-কালের পরিমাপ করতে হলে বীজ অথবা ডিমের উৎপত্তিকাল থেকেই হিসেব লওয়া প্রয়োজন। শুকনো বীজের অভ্যন্তরে থাকবার সময় উদ্ভিদ-ভ্রূণ সুপ্তাবস্থায় থাকে। কিন্তু জলের সংস্পর্শে এলেই জাগ্রত হয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুপ্তাবস্থায় তার আহারও থাকে না বা বৃদ্ধিও ঘটে না ; অথচ জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে। বীজ থেকে গাছ জন্মগ্রহণ করবার পর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত যতটা সময় অতিবাহিত হবে, আর একটা বীজকে দু-বছর পর রোপণ করে গাছ জন্মাবার পর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময় ঠিক ততটাই হবে কিনা—সেটাই বিচার্য বিষয়। আমরা সাধারণতঃ রোপণের পর অঙ্কুরোদ্গমের সময় থেকেই উদ্ভিদের বয়স নির্ধারণ করে থাকি। এই হিসেবে বিভিন্ন সময়ে রোপিত উদ্ভিদের বয়স সমান হতে পারে ; কিন্তু বীজ থেকে হিসেব ধরলে উভয়ের বয়সের গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হবে। বীজের মধ্যে ভ্রূণের সুপ্তাবস্থার মত কোন এক অবস্থা

যদি কোন উপায়ে জীবনের মধ্যভাগে এনে ফেলা যায়, তাহলেই এই হিসেবটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। এই হিসেবে ইচ্ছামত বীজ বপন করে যদি জীবন-কাল বৃদ্ধি করা যায় তবে মানুষের জীবনেও কোন উপায়ে উদ্ভিদ-ভ্রূণের মত সুপ্তাবস্থার সৃষ্টি করে তাকে দীর্ঘায়ু করা যাবে না কেন? কোন কোন উদ্ভিদ এবং নিম্নস্তরের কোন কোন প্রাণী নিয়ে পরীক্ষার ফলে দেখেছি—নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় বেশ কিছুকাল পর্যায়ক্রমে অনাহার এবং অনাহারে রাখবার পর পুনরায় পূর্ণাহারে তাদের জীবন-কাল অনেকটা দীর্ঘতর হয়েছে।

অবশ্য এরূপ কয়েকটামাত্র পরীক্ষা থেকে যদিও কোন সাধারণ নিয়মের কথা বলা চলে না, তবুও এতে যে জীবন-কাল বৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিকদের কাছে সেটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। প্রক্রিয়াবিশেষে অবস্থান্তর ঘটিয়ে জীবনকাল কিছুমাত্র বর্ধিত করা সম্ভব হলে তাকে অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী করা অসম্ভব হবে কেন? যাঁরা জীবন-তত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত, তাঁদের অনেকেরই চিন্তাধারা মোটামুটি এই রকমের। তাঁদের ধারণা—পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অনেক পুরুষ পর ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরেরা হয়তো শত বছরের পরিবর্তে হাজার বছর পর্যন্তও বেঁচে থাকবে। ধরা যাক, এটা ২১৪৫ সাল। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে আপনার এক অধস্তন বংশধর এই সালে ২৫ বছরে পদার্পণ করেছে। এই পঁচিশ বছর বয়স্ক যুবক এক বৈজ্ঞানিককে গিয়ে বললো—"আমি স্থির করেছি, কিছুকালের জন্যে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবো। আমাকে ষ্টোরেজ ভল্টের মধ্যে শুরু করে রাখুন এবং নির্দেশ দিয়ে দিন যেন একশো বছর পরে সুপ্তাবস্থা থেকে আমাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।" যুবকের ইচ্ছানুযায়ী যথাযোগ্য আদেশপত্র লিখে বৈজ্ঞানিক তাকে সেক্রেটারীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে প্রক্রিয়াবিশেষে তার জীবনক্রিয়া স্থগিত করে দেহটাকে শুষ্কাবস্থায় আনা হলো। তারপর শুষ্ক দেহটাকে একটা বিশেষ ধরণের বাক্সে রেখে লেবেল এঁটে দেওয়া হলো। বাক্সটাকে তখন এমন একটা সুরক্ষিত ঘরে রাখা হলো যেখানে আরও শত শত স্ত্রী-পুরুষের দেহ বাক্সবন্দী রয়েছে। বাক্সে রক্ষিত এই দেহগুলি জীবিতও নয়, আবার মৃতও নয়। সেগুলি বৃদ্ধিও পায় না বা পচেও নষ্ট হয় না। ২২৪৫ সালে সেই যুবকের শুষ্ক দেহ বাক্স থেকে বের করা হলো এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুষ্ক দেহটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলো। একশো বছর কেটে গেছে, অথচ সে যেমন ছিল তেমনিই আছে, যুবজনোচিত আকৃতি বা সক্রিয়তার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। এ অবস্থায় সে অপর দশজন যুবকের মতই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে রিপভ্যান উইঙ্কলের মত পুনরায় সুপ্তাবস্থায় উপনীত হয়ে আরও দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকবার জন্যে ব্যবস্থা করতে পারে।

উদ্দাম কল্পনা—সন্দেহ নেই; তবু কিন্তু বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার গণ্ডী-বহির্ভূত নয়; কারণ যিনি এই উক্তি করেছিলেন, তিনিও নিছক কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। এ বিষয়ে যাঁদের কথা প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়, তিনি ছিলেন সেইরূপই একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, রকফেলার ইনষ্টিটিউটের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণারত ডাঃ আলেক্সিস্ কারেল। জীবনতত্ত্ব সম্পর্কিত অদ্ভুত অদ্ভুত গবেষণার জন্যে ডাঃ কারেল বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত। আজকাল আমাদের দেশেও বিভিন্ন গবেষণাগারে টিস্যু-কালচার সম্পর্কিত নানাপ্রকার পরীক্ষা চলছে। কিন্তু ডাঃ কারেল বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রাণীদেহের বিভিন্ন তন্তু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখে বর্ধিত করবার জন্যে অনেক যুগান্তকারী পরীক্ষা করে গেছেন। মুরগীর ছানার হৃৎপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করে সেটাকে তিনি ২০ বছরেরও বেশী জীবিত রেখেছিলেন। কর্ণেল লিণ্ডবার্গের সহায়তায় তিনি "লিণ্ডবার্গ লাইফ চেম্বার" নামে একটি অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করে গেছেন। যন্ত্রটি কাচনির্মিত এক প্রকার যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে স্বাভাবিক

অবস্থায় জীবিত থাকে এবং দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যেমন করতো এখানেও ঠিক সেরূপই ক্রিয়া করে থাকে। এতে যে মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস রয়েছে সেই হৃৎপিণ্ডটি রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত রক্ত সঞ্চালিত করে এবং ফুসফুস তা পরিশুদ্ধ করে দেয়। আমাদের দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস যেমন অবস্থায় আছে এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্রটিও সেরূপ কাচের কুটুরীতে সজীব অবস্থায় রক্ষিত। এই অপূর্ব হৃদযন্ত্র ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকদের একটি সমস্যা সমাধানের পথ পূর্বাহ্নেই উন্মুক্ত করে রেখেছে। কাজেই দীর্ঘজীবন লাভ সম্বন্ধে যাঁর মতামতের গুরুত্ব সর্বাধিক তিনিই যখন এরূপ আশা পোষণ করেছেন, তখন সেটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ডাঃ কারেলের মতে, বিভিন্ন উপায়ে জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে —তরুণ বয়স্ক কোন প্রাণীর বিশেষ গ্রন্থি, অস্ত্রোপচারে বয়স্ক লোকের দেহে যথাযথভাবে বসিয়ে দিতে পারলে তার পক্ষে পুনর্যৌবন লাভ করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই গ্র্যাফ্ট-গ্রাফ্টিং-এর ব্যাপার কতকটা অগ্রসর হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী হলে মানুষ অনায়াসে আরও দীর্ঘকাল জীবনধারণ করতে সক্ষম হবে। অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো গ্রন্থি-সংযোজনের ব্যবস্থা এত সহজসাধ্য হয়ে উঠবে যখন দেখা যাবে যে, ৭০ বছর বয়স্ক একজন লোক দু-তিন দিন হাসপাতালে কাটিয়ে আসবার পর ক্রমশঃ যুবকের মতই চেহারা ও শক্তি-সামর্থ্য লাভ করছে। এই অবস্থায় তার জীবনকাল ত্রিশ বছরেরও বেশী পিছিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তিনি বলেছেন—মনুষ্যদেহের জড়তা ও সক্রিয়তা সম্পর্কিত প্রকৃত রহস্যগুলিকে যতই বেশী জানা যাবে ততই তাকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই অভাবনীয় দীর্ঘজীবন লাভের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন দেশে এখনও সুস্থ, নীরোগ শতায়ু লোকের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখবার প্রকৃত রহস্যসমূহ আমাদের দেহের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যা আজও আমরা বুঝে উঠতে পারি নি বা বোঝবার চেষ্টা করি নি। সুদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব রকম দীর্ঘজীবন লাভের সম্ভাবনার কথা বললেও ডাঃ কারেল কিন্তু মানুষের অমরত্ব লাভের কথা বলেন নি। মানুষের বয়স শত বছর থেকে হাজার বছর বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে সে এড়াতে পারে না। দুশো, পাঁচশো, এমন কি হাজার বছর পরে হলেও মরতে তাকে হবেই।

মানুষের দেহকে শুষ্কাবস্থায় এনে না-মৃত, না-জীবিত অবস্থায় ষ্টোরেজ ভণ্টে রাখবার পর প্রক্রিয়াবিশেষে ইচ্ছামত তাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্বন্ধে ডাঃ কারেল বলেছেন—নিম্নস্তরের কতকগুলি আণুবীক্ষণিক প্রাণীকে জল থেকে তুলে শুষ্কাবস্থায় অনেককাল রেখে দেখা গেছে, তাদের জীবনের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কিন্তু আপাতঃ মৃত এই শুষ্ক প্রাণীগুলিকে কয়েক ফোঁটা জলের মধ্যে কিছুকাল রেখে দেওয়ার পরেই ম্যাজিকের মত এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। শুষ্ক প্রাণীগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করে দেয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাণীগুলির মৃত্যু ঘটে নি, অবস্থা পরিবর্তনে সাময়িকভাবে জীবনক্রিয়া স্থগিত রেখেছিল মাত্র। কিন্তু এরূপ সুপ্তাবস্থার অর্থ কি? আজ পর্যন্ত কেউ এর সঠিক জবাব দিতে পারেন নি। বৈজ্ঞানিক কৌশলে মানুষকেও যে একদিন এরূপ অবস্থায় আনা সম্ভব হবে না—এমন কথা কে বলতে পারে? সাময়িকভাবে জীবনক্রিয়া স্থগিত রাখার ব্যাপারে আমাদের দেশের হঠযোগীদের সম্বন্ধেও অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। আমরা যাকে কুম্ভক বলি, ইংরাজীতে সেরূপ অবস্থাকে বলা হয়—Suspended animation। অবশ্য Suspended animation সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ মিললেও হঠযোগীদের কুম্ভক সম্বন্ধে প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব।

তাছাড়া সাময়িকভাবে কতকাংশে জীবনক্রিয়া স্থগিত রাখার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সাপ, ব্যাং, শামুক, কচ্ছপ, ডরমাউস, ভল্লুক এবং কোন কোন জাতের পোকামাকড়ের

hibernation) বা শীতঘুমের কথা কারো অজানা নেই। শীতের প্রারম্ভে এরা আহার-বিহার বন্ধ করে অনেক দিন পর্যন্ত মৃতের প্রায় পড়ে থাকে। কিছু কিছু অনুমান ছাড়া এ ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। আলেকজাণ্ডার লিপ্‌সুজ আংশিকভাবে শুরু—সাধারণ হিসেবে মৃত—প্রাণীদেহের অংশবিশেষ জীবন্ত গিনিপিগের শরীরে জোড় লাগিয়ে দেখেছেন, সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই জীবন-ক্রিয়া করতে থাকে। এসব ব্যাপার থেকে বৈজ্ঞানিকেরা যে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করবেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন কোন অস্ত্রচিকিৎসকের কাছে গিয়ে বলবে—আমার হৃৎযন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে—ওটাকে ফেলে দিয়ে নতুন একটা হৃদযন্ত্র বসিয়ে নিতে চাই। চিকিৎসক তখনই রোগাক্রান্ত পুরাতন হৃদযন্ত্রটাকে ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন যন্ত্র যথাস্থানে জুড়ে দেবেন। এতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা বা বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। এভাবে যে কোন ক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষকে সুস্থ, সবল, দীর্ঘ জীবনলাভে সহায়তা করবে আবার এ-ও দেখা গেছে যে, বিশেষ বিশেষ খাদ্য, জীবন-যাত্রা নির্বাহের বিশিষ্ট ধারা বা বংশানুক্রমিক মানুষকে শতাধিক বর্ষব্যাপী সুস্থ এবং নীরোগ থাকতে সহায়তা করে থাকে। এসব বিষয়ে যাবতীয় রহস্য অবগত হতে পারলে বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো অধিকতর সহজ পন্থায় মানুষকে দীর্ঘজীবী করবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছু কাল পূর্বে সংবাদপত্রে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, সোভিয়েট রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার বোগোমলেটস্ ঘোড়া থেকে পাওয়া আন্টিরেটিকিউলার সাইটোটার্কাল নামে একরকমের সিরাম আবিষ্কার করেছেন। এই সিরামের সাহায্যে নাকি ভবিষ্যতে নরনারীর গড়পড়তা পরমায়ু ১৫০ বছর করা যাবে বলে আবিষ্কারক আশা করেন। ১৯৩৯ সালে মঃ ষ্টালিন বলেছিলেন—দীর্ঘজীবন লাভের উপায় আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। তাঁর সে বিস্ময়কর সিরামের কথা

মোটের উপর ডাঃ কারেলের ভবিষ্যদ্বাণী আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সুদূর ভবিষ্যতেই একমাত্র এর সত্যাসত্যের প্রমাণ মিলতে পারে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে রোজার বেকন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সবাই তখন সে ভবিষ্যদ্বাণীকে স্বপ্ন-বিলাসীর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই করেন সুদূর ভবিষ্যতে ডাঃ কারেলের ভবিষ্যদ্বাণীও একদিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে না, এমন পারে?

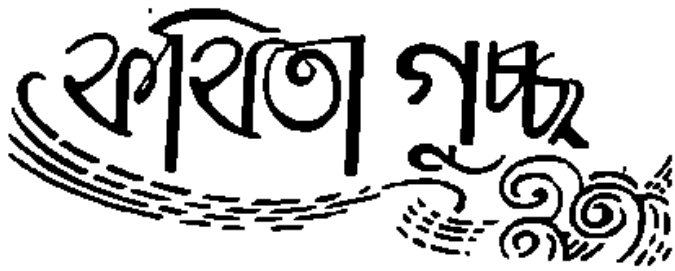

ক্লান্ত ইথার

শ্রীগোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়

হারা-সারা মেঘ নিয়ে আশ্বিনের সবুজের মাঠে
কেমন করে ভারী ভারী দিনগুলি কাটে!
একক প্রহরগুলি নিয়ে কেবলি ভেবেছি মনে মনে—
কটা দিন, আহা এই অগ্রহায়ণে।

তারপর, পৌষের নবান্ন হবে ঘরে ঘরে, প্রাণ-চেতনায়
গোলাপী রোদের রঙ, প্রজাপতি মন উড়ে পলকা ডানায়
বর্ণালী ভুলে মৌমাছিদের মত ভালো-বাসা এঁকে যাবে,
চড়াই চটুল হবে, উড়ে আসা শালিকেরা শস্য দানা পাবে।

তবুও যে কাঁপে বুক, সিঁদুরে মেঘের ভয় মনে সুখ নেই
অনেক অদৃশ্য শত্রু ওৎ পাতে আজো সমানেই—
কখন মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে বহুরূপী ছলায় কলায়!
মেটাবে চাতক-তৃষা, খুঁটে খাবো দেবে ঘুন। মনের তলায়
তাই, মুছে যায় স্বপ্ন, বেজে ওঠে বৈশাখের প্রতিজ্ঞা কঠোর,
আশার শিশির জমে শেষ রাতে তপ্ত বুকে ক্লান্ত ইথারের!

উজ্জ্বল রৌদ্রের ঝড়ে

শ্রীস্নেহাকর ভট্টাচার্য

দুরন্ত হাওয়ার মতো উজ্জ্বল রৌদ্রের ঝড়ে আকাশ ভাসাও!
শীতের শুকনো পাতা আরো দূর দূরান্তের দিগন্তে ছড়াও।
সারারাত ঝাঁকে ঝাঁকে নিরন্তর ঝরে গেছে স্ফটিক শিশির,
আবার দিয়েছে হানা তীক্ষ্ণধার স্মৃতি আর বিস্মৃতির তীর!
হৃদয় রক্তাক্ত হয়, বেদনামন্থর গতি বহেনা সময়—
উত্তর পশ্চিমে দীন মৃত্যু হিম কুয়াশার ধূসর বলয়।
এবার রৌদ্রের ঝড়ে যায় যদি, সেও ভালো, ভেঙে
যাক বুক;
তবু ত শীতের শেষে আশ্বাস আনবে, দীপ্ত অপূর্বের মুখ॥

একটি হেমন্তের কবিতা

শ্রীকৃষ্ণ দাস

হেমন্তে কুয়াসা ঘুছে ধরা দিলে তারার আকাশ
অকালে নেপুর বনে ফুল ফোটা গন্ধের কিছুটা
সহসা সহজ হয়ে অনিমেষ রাত্রিক্ষণ যাপে।
নেপথ্য আকাশ থেকে দৃষ্টির আকাশে আসে চাঁদ
পরিপাটি জ্যোৎস্নার মোলায়েম ছায়া ছায়া নামে॥
নিরুপম গান কার অম্লাণের তারার আকাশে
অনায়াস শোনা যায়? বলো কার অবারণ চলা
ঝিকিমিকি বেজে ওঠে রৌদ্র মোছা মাটিতে ও ঘাসে?
আমার সহরতলী আরো তার আশপাশ গ্রাম—
স্থির জ্যোৎস্নার নীচে পৃথিবীকে দেখেনি তো চেয়ে
কারো চোখ জানালার সাশি খুলে পায়নি বিস্ময়!
দূর বনে অন্ধকার দীপ হয়ে আছে; আরো ওটি কয়
দীপপুঞ্জ এখানে সেখানে। দেখেছি সে
অন্ধকারে জোনাকীরা সজাগ পাহারা দেয় জেগে।
এ রাতে একাকী নিজেকে অম্লান রেখে পৃথিবীকে
যেন খুব কাছাকাছি পাই; মনে হয় ঘুমের চাদর তুলে
হেমন্তের মাঠে জ্যোৎস্নার ছায়ার নীচে আনাগোনা করি।
জ্যোৎস্নায় নির্জন নির্জন গাছপালা নিরুপম। কী নির্জন
রম্য বিষণ্ণ একান্ত মুখর হয় হেমন্তের রাত্রির নগরে
দিনকার যা' কিছু শিথিল জ্যোৎস্নায় গান হয়॥

সেই আলো

শ্রীবিবেককুমার রায়

এ হৃদয় হ'তে কোনদিন
প্রতিস্বত রঙীন আলোক
অপূর্ব বিভায় ভ'রেছিলো
মাধুর্যে তোমার মুখ চোখ।
উষ্ণতাপে কেটেছে সেদিন
আঙুলের শীতল জড়তা,
বেঁধে-নেওয়া স্বর্ণতারগুলো
ঝঙ্কারে বলেছে কত কথা।
সাত রঙ হ'য়ে ভেঙে গেছে
সেই আলো আঁখির পাতায়,
টকটকে সোনালি আগুনে
জ্ব'লেছে তা' কনক চাঁপায়।
সে আলো কি লুপ্ত হ'য়ে গেছে?
কোন এক দক্ষিণে বাতাসে
করবী তলায় ব'সে দেখো
সে আলো ঝলসে সন্ধ্যাকাশে॥

মধ্যবিত্ত

নগেন দত্ত

গুটি দুই অনুরক্ত ভ্রাতা
একটি যুগল, বয়স্থা দুহিতা।
দুর্ভিক্ষ-পড়ে-পাওয়া শিশু,
তোলানাথ বিশু,
সবে মিলে একাকার।
বুদ্ধিজীবী,
নাকারি বিশ্বের সংসার।

প্রপিতামহের প্রথা
কোথায় ফাটল নেই,
ঐতিহ্যের বাঁধানো সড়ক।
অন্নদাতা শ্যামলাল,
পিসিমার একান্ত পালক।
বাল বিধবা পিসি
গোলক নগরে।
মাসের প্রথম হপ্তা,
হয়তো বা পরে।
একখানি চিঠি। সঙ্গে জোড়া ফর্দের বহর।
হরিনাম গুণগান—অষ্টপ্রহর।
চিঠির ভাষণ,
সামনে বৈশাখ মাস
পুণ্যে ভরা তিথি,
তুলসীর বৃন্দাবনে
জল দেবো নিতি।
কিছু টাকা আগাম পাঠাও।
পুণ্য আর প্রয়োজন—দুই স্রোতে
ভেসে যাই বুদ্‌বুদের নাও।

নিত্যকার মনে আনাগোনা,
অঙ্কের অক্ষর।
শততন্ত্রা জীবন স্বাক্ষর।
বান-ডাকা চাহিদার পণ্যের দাম ওঠে বেড়ে।
নিত্য ঘাটতি পূরণের আশা দেই ছেড়ে।
এসার পতন।

জুয়াড়ির হাতের তাস,
এ-জীবন রং ইস্কাপন।

পাতালে কপিল কাঁপে ক্রোধের প্রকোপে,
ভস্মীভূত সগর তনয়।
ভগীরথ ব্রহ্মার মানসে,
কেঁপে ওঠে মহেশের জটার বলয়।
রোষদীপ্ত জহ্নু মুনি,
প্রাণগঙ্গা গণ্ডুষে চুমুক।
নিত্য হারি, নিত্য মার খাই,
এবার ভূরুপ।
এ আকাশে আলো নেই
তারকারা মমীর কবরে।
সাহারায় বালুকার ভীড়,
রুদ্ধপথ, বেদুইন পথ খুঁজে মরে।

রাবণের দুষ্ট হাসি,
জটায়ুর ছিন্ন পক্ষ,
রক্ত করে সীতার কপোলে।
সেতু বন্ধ পালা হল শুরু,
খুঁজে মরি অচেনা উপলে।

ভারতে লৌহশিল্পের সম্প্রসারণ।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস স্থাপনকে ভারতে লৌহ উৎপাদনের সূত্রপাত বলে ধরা যেতে পারে। তারপর ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়ান আইরন্ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন, ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল এবং মাইসোর ষ্টীল এণ্ড আয়রণ ওয়ার্কস্ স্থাপিত হবার পর দেশের লোহার উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেশের চাহিদার তুলনায় ভারতীয় কারখানাজাত লোহার পরিমাণ আদৌ সন্তোষজনক নয়। এদেশে প্রায় ২৮ লক্ষ টন লোহার চাহিদা আছে কিন্তু এখানে তার অর্ধেকও উৎপাদিত হয় না! ফলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশ থেকে লোহা আমদানী করে দেশের চাহিদা কোন রকমে মেটানো হচ্ছে। ভারতবর্ষে শিল্পে এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে। দেশকে শিল্পোন্নত করতে হলে লৌহ-শিল্পের উন্নয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ যে কোন শিল্প গড়ে তুলতে লোহা অপরিহার্য। যুক্তরাজ্যে বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১০ কোটি টন লোহা উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশে লোহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারত সরকার দেশে লোহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উড়িষ্যার রাউড়কেলায় নূতন লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত অন্যতম।

এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে ৭২ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং তার কিছু অংশ যোগাবে প্রতিষ্ঠানের অপর অংশীদার—জার্মান ফার্ম ক্রুপ ও দেমাগ কোম্পানীদ্বয়। ১৯৫৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপন কার্য সমাপ্ত হবে এবং তখন এখান থেকে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টন লোহা উৎপাদিত হবে। তাছাড়া চালু লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দিয়ে লোহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে।

টাটার ষ্টীল ওয়ার্কস্ আধুনিকরণ এবং ষ্ট্রিপ ও টিউব মিল স্থাপনের জন্য ভারত সরকার টাটা কোম্পানীকে ১০ কোটি টাকা ঋণ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। টাটার এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হবে ৩৫ কোটি টাকা। কাজেই বাকী ২৫ কোটি টাকা টাটার সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হলে টাটার লোহার উৎপাদন আরও ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন বেড়ে যাবে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পো-রেশনেরও একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে। তাতে খরচ পড়বে আনুমানিক ৩১ কোটি টাকা এবং তার ফলে ষ্টীলের উৎপাদন বর্তমানের ৩ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লক্ষ টন হবে এবং বিক্রয়যোগ্য লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন থেকে বেড়ে গিয়ে ৪ লক্ষ টন হবে। সরকার পরিচালিত মাইসোর ষ্টীল এণ্ড আয়রণ ওয়ার্কসেও উৎপাদন ২৫ হাজার টন থেকে ১লক্ষ টন করবার জন্য ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই সমস্ত পরিকল্পনা ১৯৬৭ সালে সমাপ্ত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে এবং তখন মোট ১৪৩ কোটি টাকার বিনিময়ে বৎসরে অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টন লোহা উৎপাদিত হবে। বলা বাহুল্য, এই অতিরিক্ত উৎপাদন সত্ত্বেও এতবড় দেশের শিল্পোন্নয়নে ত যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে না। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে যাতে এই প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় তার জন্য এখন থেকেই সুচিন্তিত কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্লানটেশন শ্রমিক আইনের খসড়া

প্লানটেশন সংক্রান্ত ইণ্ডাষ্ট্রীয় কমিশনের ষষ্ঠ অধিবেশন গত ২০শে জুলাই উতকামণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের বিবিধ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং বৈঠকের সমাপ্তিতে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মধ্যে মতানৈক্যের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। শিল্পের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সকলেরই যে ঐকান্তিক আগ্রহ রয়েছে এই সম্মেলনে তা পরিস্ফুট হয়েছে বৈঠকে যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় তার কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাসপাতালে স্থাপন সম্পর্কে মালিকদের প্রতিনিধিগণ বাগানে হাসপাতালের ব্যবস্থা রাখতে সম্মত হলেও বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে হাসপাতাল সমূহ স্থাপনের দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের উপর চাপাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রমিকদের বাসস্থান সম্পর্কে পূর্ববর্তী বৈঠকে স্থির হয়েছিল যে উত্তর ভারতের শ্রমিকদের জন্য দ্বি কক্ষ ও দক্ষিণ ভারতের শ্রমিকদের জন্য একটি কক্ষ যুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু বর্তমান বৈঠকে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সর্বত্রই শ্রমিকদের জন্য এক কক্ষযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়। তবে বৃহৎ পরিবারের জন্য দ্বি-কক্ষযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা হবে। শ্রমিকদের জন্য ক্যান্টিন ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্পর্কে মালিকপক্ষ প্রস্তাব করেছেন যে চা সমিতিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলক ভাবে ক্যান্টিন খুলতে অনুরোধ করা যেতে পারে। প্লানটেশন অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শ্রমিকরা বাস করে। ফলে ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোন এক প্রান্তে অবস্থিত ক্যান্টিনের সুবিধা অধিক সংখ্যক শ্রমিক গ্রহণ করতে পারে না। বর্ষাতি সম্পর্কে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের রেইন্ কোর্টের পরিবর্তে ব্লাংকেট দেবার যুক্তি প্রদর্শন করেন। অপর পক্ষে শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ ব্লাংকেটের অনুপযুক্ততার কথা উল্লেখ করেন। শ্রমিক পক্ষ আরও দাবী করেছেন যে প্রসূতির জন্য অধিকতর সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্লানটেশনে ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ সম্পর্কে সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে। শ্রমিক ও মালিকের মধুর সম্পর্ক শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ। আমাদের দেশের শ্রমিকদের অবস্থা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অতি শোচনীয়। এদের জীবন-যাত্রার মান উন্নীত হলে পরোক্ষে শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করা হবে। ইণ্ডাষ্ট্রিয় কমিশনের সভাপতি মিঃ আবিদ আলী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে প্লানটেশন শ্রমিক আইনকে চূড়ান্তরূপ দেবার আগে সরকার বিভিন্ন পক্ষের দাবী বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করে দেখবেন।

ভারতে ভূমি ব্যবস্থা ও প্রকৃত সমস্যা।

ভারতে ভূমি ব্যবস্থায় জমিদারী প্রথা প্রচলিত থাকায় বহুদিন থেকে কৃষকদের প্রতি উপেক্ষা করে আসা হয়েছে। ফলে জমির উন্নতি সাধনে কৃষকগণ বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারে নি। জমির উর্বরা শক্তির হয়েছে অপচয় এবং সমাজে দেখা দেয় নিষ্ক্রিয় পরগাছা মধ্যস্বত্ব ভোগী রূপে। 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা ভারতের প্রত্যেক রাজ্যসরকার স্বীকার করেছেন এবং জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য অধিকাংশ রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই আইন পাশ করেছে। জমিদারী প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির মধ্যস্বত্বভোগীগণ ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাবে এবং কৃষকদের মধ্যে জমির বণ্টন করে দেওয়া হবে। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তাতেও হবেনা। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হলে ভূমির উন্নতি সাধন সম্ভব হবেনা। কৃষিই ভারতের প্রধান উপজীবিকা। শতকরা ৭২.৫ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। শতকরা ৫০ জনের অধিক লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দৃঢ়তার লক্ষণ নয়। অথচ ভারতে সংহত শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৩০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলবার প্রভূত চেষ্টা চলছে সন্দেহ নেই কিন্তু মোট জনসাধারণের শতকরা ৫০ জনের কতদিনে শিল্পে কর্ম সংস্থান হবে তা

বলা কঠিন। ভারতে প্রতিবৎসরে ৫০ লক্ষ লোক বাড়ছে। এদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নও আজ বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়েছে। জমিদারী প্রথা বিলোপে ক্ষতি-পূরণ বাবদ ৪৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। ভারতীয় কৃষকগণ সর্বদা ঋণভারে জর্জরিত থাকে। পরীক্ষামূলক গণণায় দেখা গিয়েছে যে ভারতীয় কৃষকগণের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এসব ছাড়া ভারতের কৃষির পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কৃষির উৎপাদন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে করতে হলে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এত টাকার সংস্থান যে পল্লীঅঞ্চল থেকে সম্ভব হবেনা, তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই এই সকল অর্থের যোগান দিয়ে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা না করলে, কেবলমাত্র ভূমির পুনর্বণ্টন থেকে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

বিল মার্কেট স্কীমের ক্ষেত্র প্রসারিত।

অর্থের বাজারে বিলমার্কেট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। খোলা বাজারে ট্রেজারী বিল, স্বল্পমেয়াদী গভর্ণমেণ্ট বণ্ড, প্রমিসরী নোট প্রভৃতি বিক্রী করে ব্যবসায়ে চলতি মূলধন সংগ্রহে বিলমার্কেট অতি প্রয়োজনীয়। নানা কারণে এদেশে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিলের যথেষ্ট প্রচলন না থাকায় বিল মার্কেট এখানে তেমন উন্নত হয় নি। সম্প্রতি প্রফ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক বিল মার্কেট স্কীমের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক পরীক্ষামূলক ভাবে বিল মার্কেট স্কীমের প্রবর্তন করে এবং বিগত আড়াই বৎসর কার্যকালে এই স্কীম যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান বর্ষার্ধে এই স্কীমে লাইসেন্স প্রাপ্ত শিড্যুল্ড ব্যাংক সমূহকে ১২২'২২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ সময়ে ১৯৫৩ সালে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ৬০'৮৪ কোটি টাকা এবং ১৯৫২ সালে তার পরিমাণ ছিল ৭৪'০২ কোটি টাকা। এতদিন পর্যন্ত ৫ কোটি কিংবা তদূর্ধ্ব টাকা আমানত যুক্ত প্রয়োজনীয় লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিড্যুল্ড ব্যাংক বিল মার্কেট স্কীমের সুবিধা গ্রহণ করতে পারত কিন্তু এখন থেকে আমানতী টাকার পরিমাণ নির্বিচারে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ২২ ধারা অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে কোন শিড্যুল্ড ব্যাংকই এই স্কীমের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া এই স্কীমে ঋণের নিম্নতম পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১০ লক্ষ টাকা করবার এবং প্রত্যেকটি পৃথক বিলের পরিমাণ ১লক্ষ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকায় কমাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

রিজার্ভ ব্যাংক বিলমার্কেটের ক্ষেত্র মুদ্রায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছোবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। এজন্য ব্যাংকিং এবং ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ সন্তোষ দেখা দিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের এই সিদ্ধান্ত যে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করবার পক্ষে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তা'তে সন্দেহ নেই।

এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে লেনদেনে সমস্যা:

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে সমস্ত অন্তরায় দেখা দেয়, তা'র মধ্যে বৈদেশিক লেনদেনে অসুবিধাই অন্যতম। বৈদেশিক লেনদেনে অসুবিধা সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা এবং পারস্পরিক দেশগুলির মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের সুযোগের অভাব থেকে। এই সকল অসুবিধা দূর করে বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রসার সাধন এবং তার অব্যবহিত ফল স্বরূপ পারস্পরিক দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বহুদিন থেকে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রয়াস পেয়ে আসছেন। তাঁদেরই প্রয়াসে আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর আগে 'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার' গঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে এই সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্যকে নানাদিক থেকে সাহায্য ক'রে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেনদেনের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না।

গত কয়েক বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকা থেকে বহুল পরিমাণে ডলার ও সোনা স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ষ্টার্লিং মুদ্রান্তরিত (Convertibility) করণের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হয়েছে বলে এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আরও মন্তব্য করেছেন যে কমিশনের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ইউরোপীয় লেনদেন সমিতির (European Payments Union) অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করলে অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বিষয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে।

মুদ্রান্তরিত করণে অনেক অসুবিধা আছে সন্দেহ নেই। তার মধ্যে মুদ্রামূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রার মূল্য নিরূপণে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস
১৭৩ পাবে, কারণ মুদ্রামূল্য নির্ধারিত হবে বাহিরের অর্থনৈতিক শক্তিগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা। অথচ বৃহত্তর পৃথিবীর সমষ্টির কথা চিন্তা করে দেখলে দেখা যে মুদ্রান্তরিত করণ একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হতে হবে।

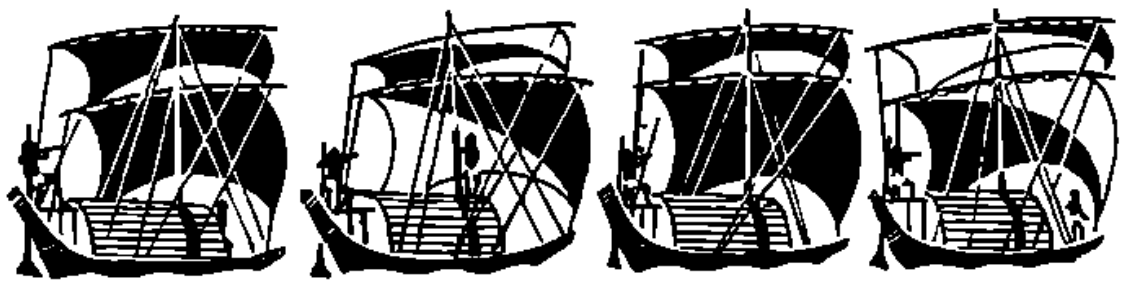

ভারতীয় সাবান শিল্প ও উহার সমস্যা

শ্রীকমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়

তৈল, চর্বি ও কষ্টিক সোডা এই তিনটি প্রধান কাঁচামালের উচ্চ মূল্যের দরুণ সাবান উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈল ও চর্বির মূল্যের উপর সাবান উৎপাদকদিগের কোন হাত নাই এবং কষ্টিক সোডা ক্রয়ের ব্যাপারে তাঁহাদের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা শতকরা ১০০রও অধিক মূল্য দিতে হইয়া থাকে। সরকারের সহযোগিতায় বৃহৎ সাবান উৎপাদকগণের এই সকল কাঁচামালের উচ্চমূল্যের সমস্যা সমাধানের বিশেষতঃ কলিকাতা ও বোম্বাই সহরের সন্নিকটে প্রতিদিনে ৬ টন দ্রব্য উৎপাদনক্ষম দুইটি কষ্টিক ক্লোরিন কারখানা স্থাপন করিয়া এ অঞ্চলদ্বয়ে শতকরা ৪৪।৫০ ভাগ দ্রবণযুক্ত কষ্টিক সোডা প্রতি টন অনূর্ধ্ব ৩৮০৲ টাকা মূল্যে সরবরাহ করিবার প্রশ্নটি বহুদিন পূর্বেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। অবশ্য ইহা সত্য যে আমাদের দেশে তরল ক্লোরিনের ব্যবহার প্রচলিত না থাকার দরুণ কষ্টিক কারখানায় উপজাত তরল ক্লোরিনের কাটতির জন্য গুরু রসায়নিক দ্রব্য উৎপাদকদিগকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। জল পরিশোধনের (Water Treatment) জন্যেও তরল ক্লোরিনের ব্যবহার এদেশে অতি সামান্যই হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে, কঠিন ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে তরল ক্লোরিণের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের অগ্রসর হইয়া আসা উচিত।

সেইরূপে কোল-হাইড্রোজেন ব্যবহার করিয়া প্রতি দিনে ৩০ টন দ্রব্য উৎপাদনক্ষম দুইটি হাইড্রোজেনেশন্ কারখানা স্থাপন করিয়া সাবান কলে কিয়ৎপরিমাণে হাইড্রোজেন মিশ্রিত তৈল সরবরাহ করিতে পারিলে তৈলের খরচও বহুলাংশে হ্রাস পাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ যদিও ভারতবর্ষে আমদানীকৃত চর্বির বিশেষ সমাদর নাই, তথাপি উহাদ্বারা কাপড় কাচিবার সাবান প্রস্তুত হইলে সাবানের পড়তা (Basch) খরচ হ্রাস পাইবে।

পরিশোধনজনিত অতিরিক্ত খরচ এড়াইবার জন্য "বনস্পতির" উপজাত উৎপাদকগণ চীনা বাদাম তৈলের 'ফুটস্' হইতে সাবান প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অপর 'ফুটসের' সহিত মিশ্রিত তৈল সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে না পারিলে মুখ্য উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন খরচের উপর হইতে অতিরিক্ত ভার অপসারিত হয় না। অধিকন্তু 'ফুটস্ ব্যাচ্', হইতে প্রস্তুত ব্যবহৃত ক্ষার মিশ্রিত জল হইতে গ্লিসারিন উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব। গ্লিসারিন উদ্ধার করিবার কল না থাকিলে আইনের দ্বারা সাবান কারখানা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ সাবান কলে উপজাত গ্লিসারিন তৈল ও চর্বির গড়মূল্য অপেক্ষা সর্বদা দ্বিগুণ দামে বিক্রয় হয় বলিয়া ইহা হইতে লাভের শতকরা ১০ ভাগ আয় হইয়া থাকে। গ্লিসারিন উদ্ধারের ফলে প্রাপ্তীয় কাগকে সহজেই আরও শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উপজাত সাবান উৎপাদকগণ কখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাবান উৎপাদনকারীদিগের সহিত সত্যকার প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম নহেন। তবে পরস্পরের ক্ষতিসাধন করিয়া তাহারা কিছুকাল টিকিয়া থাকিতে পারেন।

সাবান উৎপাদক সমিতির ঘোষণানুযায়ী ভারতে ২০,০০০ টন সাবান উদ্বৃত্ত আছে, অতএব দুঃখের বিষয় এই যে ভারতে চালু সাবান কলগুলি উহাদের

উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগেরও ব্যবহার করিতে পারিতেছে না এবং তাহা সত্ত্বেও যে মাল এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত হয় তাহা মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের মত সাবান শিল্পে অনুন্নত অঞ্চলেও কাটতি হয় না। ত্রিশ কোটি লোকের বাসভূমি ভারতবর্ষেই এই উদ্বৃত্ত মালের কাটতি হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষে সাবান উদ্বৃত্ত হওয়ার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ আধুনিক যন্ত্র-

প্রবর্তন না করার ফলে অধিকাংশ সাবান কলগুলির উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় নাই। তাহা ছাড়া উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে সাবানের কোন শ্রেণী বিভাগ বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে ভারতীয় সাবান উৎপাদকদিগের উৎপন্ন দ্রব্যের কাটতির জন্য উপযুক্ত বিক্রয়-সংস্কার অভাব। কেহ কেহ আজও ইহাকে অনাবশ্যক অতিরিক্ত খরচ বলিয়া মনে করেন এবং বিক্রয়ার্থ খরচের বন্দোবস্ত না করিয়াই কারখানা পর্যন্ত যে খরচ হয় তাহাতেই সাবানের মূল্য নিরূপণ করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া

এই নীতি অত্যন্ত অপরীণত দৃষ্টির পরিচায়ক

ইহা দ্বারা শিল্পকে কেবলমাত্র সঙ্কটময় করিয়া তোলা চলে। সাবান শিল্পে উৎপাদন মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কাজ আর অবশিষ্ট ৯৫ ভাগ কাজ হইতেছে বিক্রয় ব্যবস্থা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপযুক্ত বিক্রয় সংস্থা বর্তমান থাকিলে বিক্রয়ের দরুণ কখনও লোকসান হয় না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে লেভার ব্রাদার্স [ইণ্ডিয়া] লিঃ কোম্পানী ভারতবর্ষে উহার সাবান উৎপাদনক্ষম চালু কলগুলি থাকা সত্ত্বেও আবার ঘণ্টায় ৩ টন দ্রব্য উৎপাদনক্ষম একটি স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্র বিমুখ সাবান কল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সেইরূপ টাটা অয়েল মিলস লিঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিক্রয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং অবিক্রীত উদ্বৃত্ত মালের সমস্যা তথায় প্রকট নয়।

সাবান উৎপাদনকারিদিগের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে কেবলমাত্র ভাল সাবান উৎপাদন করিলেই তাহাদের শিল্পে টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে তাঁহারা গত ১৫ই মে তারিখে দিল্লীতে আমদানী উপদেষ্টা সমিতির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের প্রদত্ত বিবৃতি হইতে প্রকৃত অবস্থাটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি একথা পরিষ্কার করিয়াই জানাইতে চাই যে প্রায়শঃই অবিক্রীত ভারতীয় পণ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং শিল্পপতিগণ চালু শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদনের প্রাচুর্য পছন্দ করেন না। বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে অসুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সরকার উৎপাদনকারীদিগের জন্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না।"

ইহা হইতে পরিষ্কার এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে সরকারের সহানুভূতিপুষ্ট হইয়া শিল্পের প্রসারসাধন করিতে হইলে সরকার চাহেন যে উন্নত শিল্পগুলি উহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের কাটতির জন্য অবশ্যই নিজস্ব বিক্রয় সংস্কার ব্যবস্থা করিবে। যে সকল ক্ষুদ্র সাবান উৎপাদকগণ বিক্রয় সংস্কার খরচ বহনে অসমর্থ তাহাদের সকলের মিলিত হইয়া সাবান উৎপাদক সমিতির অধীনে একটি সংগঠন গঠন করা উচিত। এই সংগঠন তাহাদের সকলের পক্ষে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এইরূপ না করিলে অদূর-ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র সাবান উৎপাদকদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগ সাবানের উপর সম্প্রতি যে করধার্য করিয়াছেন তাহার ফলে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারিগণ অযথা বিড়ম্বিত হইবেন না। কারণ অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারীর ঘোষণা অনুযায়ী কাপড় কাচা সাবানের প্রথম ১২৫ টন ও প্রসাধন সাবানের প্রথম ২৫ টনের উপর হইতে কর রেহাই দেওয়া হইবে। ইহার ফলে ক্ষুদ্রও বৃহৎ সকল সাবান উৎপাদকগণ সমপর্যায়ে আনীত হইবেন। সুতরাং ক্ষুদ্র সাবান উৎপাদকদিগের অন্ততঃপক্ষে মাল বিক্রয়ের জন্য একত্রিত হইবার অতি উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

স্বরলিপি *

বিবাহে

রাগ বসন্ত—তাল তেওরা।

কে তুমি এসে, বঁধু, ল'য়ে বসন্তে,
এ বিজন যৌবন যমুনারি বক্ষে।
চল ছুড়ী মঞ্জীর জলতরঙ্গের † মীড়,
কাটে হিয়া : সিন্ধুরিয়া কাফি বসন্তে।
কনক কলসী তায় ছুঁও ছুঁও কলিজায়,
আর তো না সামালে সে অঙ্গে অঙ্গে।

কথা ও সুর—অবিনাশচন্দ্র গুহ, শাস্ত্রী, এম্-এ। স্বরলিপি—মহিমচন্দ্র সরকার। রাগ বসন্ত—আমের কুড়িতে সাজান রাগ, ঘোরান রক্তপদ্মের চোখ, হল্‌দ রংয়ের কাপড় পরা, সোনার রংয়ের দেহ—যুবতীদের প্রিয় বোলে বসন্ত রাগ কথিত। তারই বর্ণনা। পুং রাগ। প্রাতঃকালে গেয়। মতান্তরে দিবা দ্বিপ্রহরে গেয়। বসন্ত কালের। সম্পূর্ণ। দুই ম, ঋ কোমল পঞ্চম বিবাদী। মতান্তরে ঋ। খাড়ব (প-বর্জ্জিত)।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধিত হোয়েছিল। স্বরলিপির প্রণালী পর্য্যন্ত এই ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। কারুর কাছ থেকে ভারত তা নেয়নি—নিজস্ব। তার প্রমাণ সোমেশ্বরের "রাগবিবোধ" গ্রন্থে। সোমেশ্বর মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গোদাবরী জিলার একজন অধিবাসী ছিলেন। ঐ "রাগবিবোধ" গ্রন্থ ১৩০৯ খৃষ্টে রচিত হয়। সংস্কৃত "আর্য্যাছন্দে" আদ্যন্ত সুন্দর গাথায় লেখা। তাতে রাগ, শ্রুতির কথা, বিশেষ বীণাযন্ত্রের বিষয়ে বলা হোয়েছে (Ed. by Pandit S. Subramanya Sastri with an introduction by Prof. G. Kunhan Raja. Adyar Library Series No. 48, Madras; a gloss on it Ragavibodha-viveka in Bhandarkar's Deccan College Mss. XIX, i, 430)। ভারত থেকেই সুদূর গ্রীস দেশে তা নেওয়া হয়। সেখানে গ্রীস দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরাসের (সি. ৫৮২-৫০০ বি. সি.) চেষ্টায় সঙ্গীতের উন্নতি হোয়েছিল। পরে রোমে খ্রীষ্টীয় ৬০০ শত অব্দে পোপ গ্রেগরির দ্বারায় স্বরলিপি (Notation System) শিক্ষারও বিশেষ উন্নতি হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আর্যদের সঙ্গীত শিখেই খ্যাত হন। মির্জা খাঁ "তোফ্‌তুল্‌হেন্দ" (*Tuhfatul-Hind*) নামে নানা বিষয়ের এক বিরাট বই সঙ্কলন করেন। এর ভেতরে সুর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা, রাগ-রাগিণী, তাল, লয় প্রকরণাদি আছে। মুসলমান্ গায়কদের কাছে এই বই অত্যন্ত মান্যের, আদরের এবং প্রিয় বস্তুও বটে।

---

* সুর, তাল, লয়, মাত্রা, ইত্যাদি জ্ঞাপক পাঠের নাম স্বরলিপি। ইংরাজীতে বলে—Notation, Musical scale, A system of signs or symbols. লাতিন্ ভাষায়—From *notatio*, *noto*, *notatum*, to mark. সংস্কৃত ভাষায়—লক্ষচিহ্নঃ (See সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৮৭২ শকীয়, পৃঃ ৩১, *s. v.* "বিছুবো বুত্তম্"—(Modern Notation) † মীড়—সংস্কৃত (মিল)। ল=ড়। মি=মী। অতি ঘন সন্নিবেশ আশ। অর্থাৎ আরোহে কিংবা অবরোহে অন্তরবর্ত্তী স্বরগুলোকে মৃদু মধুর ছুঁইয়ে স্বর থেকে স্বরান্তরে যাওয়ার নাম মীড়—যেমন, সাঁ ধ নিঁপ, মাঁপ, ধঁ ন ইত্যাদি। ‡ সিন্ধুরা, সিন্ধুরিয়া—সম্পূরণ। গঁ গ নিঁ। মতান্তরে গঁ নিঁ। দিবা ১১ হইতে ১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। কাফি—আ০ = কাফী = পর্য্যাপ্ত : রাগিণী বিশেষ : আশাবরী, গুর্জ্জরী ও ভৈরবী যোগে উৎপন্না রাগিণী। সুহারাগের স্ত্রী। কাফির সহিত অন্য রাগিণী যোগে,—কাফি-কানাড়া, কাফি-টোড়ী, ইত্যাদি। সম্পূরণ। গ নিঁ। দিবা ১১ হইতে ১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। পূর্বরাগ। সা গ্ প। Indian Notation System & Its origin—The See Sunday Amrita Bazar Patrika (Town ed.), Magazine Section, Sunday, August 27, 1950, p. 10, col. 4; রবিবারের যুগান্তর, কলিকাতা সংস্করণ, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৮, যুগান্তর সাময়িকী, পৃঃ ১২, কলম ৭-৮, পৃঃ ৬, কলম ৭।

আস্থায়ী															
সা	সা			নি	সা		ম	গ				ম	গ		
কে	তু			লে			ধু	ল				ন্	তে		
				নি	নি			গ			ম		ঋ	সা	
	বি			যৌ				য			রি		ঙ্	কে	
অন্তরা															
গ	গ	ম	ধ	সা		সা	সা	নি	নি	ধ	ম	ম		নি	সা
১। চ	ল	চু	ড়ী	ম		ণী	র	জ	ল	ত	র	লে	র	মী	ঙ
২। ক	ন	ক	ক	ল	সী	তা	য়	ছুঁ	ও	ছুঁ	ও	ক	লি	জা	য়
সা	গ	ঋ	সা	নি	ধ		সা	সা	নি	ধ	ম	গ	ঋ	সা	
১। কা	টে	কি	য়া	সি	ন্ধু		য়া	কা	০	কি	ব	স	ন্	তে	
২। আ	র	তো	না	সা	০		লে	সে		অ	জে	অ	ঙ্	গে	

* সম্ভবতঃ "নব্যভারত", মাসিক পত্র ও সমালোচন, ফাল্গুন, ১৩০৪ সনে এই মূল গীতটী বের হোয়ে থাকবে। সেই সময়ের গানের আদরে সমাদর পায়! স্বরলিপির অভাব ছিল! তাই পূরণ করার চেষ্টা হলো! সঙ্গীত-শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরলে স্বরলিপি করা সার্থক হবে!

বাসি বিবাহে

*রাগ সিন্ধুভৈরবী—†তাল তেতালা।

বাসি বিয়ে কও, নারী, শুনে' হাসি পায়,
বিবাহ যে ভালবাসা সে কি বাসি হয়।
চাঁপা, চামেলী গুলে বসন্তেরে বেঁধে চুলে,
গলিয়া মলিয়া হেলে কর তারে ক্ষয়।
সে তো কালের শ্বাসে শুখিতে শুখিতে হাসে,
সে আতর-স্নেহ হারে সে কি কভু যায়।

কথা ও সুর—অবিনাশচন্দ্র গুহ, শাস্ত্রী, এম্-এ। স্বরলিপি—মহিমচন্দ্র সরকার।

আদি ছয় রাগের মধ্যে ভৈরব একটি। ঐ ছয়টি রাগের ছত্রিশটি রাগিণী স্ত্রী বোলে কল্পিত হোয়েছে—"ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে অনুরাগ যে সব রাগিণী"—অন্নদামঙ্গল। তার ভেতরে ভৈরবী, সৈন্ধবী অন্যতমা দুটি ভার্য্যা।

ভৈরবী রাগিণীর বর্ণনা—পুকুরের মধ্যে সূর্য্যকান্তমণির ভৈরেরি ঘরে পটলচেড়া চোখ, তাম্রবরণা ভৈরবী বিশুদ্ধ গানের সঙ্গে পদ্মের ধারায় ভৈরবের পুজো কোরছেন (নাদ-মহোদধি)।

সৈন্ধবী রাগিণীর রূপ—হাতে ত্রিশূল, রক্তরংয়ের কাপড় পরা, স্বামীভক্তা, বন্ধুজীবসন্নিভা, ভয়ানক উগ্রা, বীররসসহিতা সৈন্ধবী-ভৈরবী রাগিণী বলে কথিতা আছেন (সঙ্গীত-দর্পণে ২।৫১)।

দিবা—বেলা ১-৫ দণ্ড অথবা ৬-১০ দণ্ড কিংবা ১১-১৬ দণ্ড মধ্যে গেয়। গ্রীষ্মকালের। ঋ, গ, ধ, নি। সম্পূরণ।

*যে স্বর লোকের চিত্তরঞ্জন করে, তাই রাগ (সঙ্গীত-দর্পণে রাগবিবেকাধ্যায়ে ২।১-৪)।

†গানের সুরে যেখানে যেখানে প্রধান ঝোঁক পড়ে, তাকে তাল বলে। সুরের কাল পরিমাণ ঠিক রাখতে এবং ছন্দ সুস্পষ্ট কোরতে তালের দরকার। সুরের ছন্দ তাল্‌লে কিংবা কাল তাল্‌লেই গানের তাল তাজে—"তত্তম্ তত্তম্ ববম্ তাল ঘন বাজে শিঙা ডমরু গাল, ঝম্পতালে তাল দেয় বেতাল কালী নাচে অট্ট তালিয়া"

—অন্নদামঙ্গল।

আস্থায়ী

সাঁ	সা	ধ'	ধ'		১ গ'	প'		প	নি'	নি	নি'	ধ'	ধ'		পঁ
বা	সি	বি	রে		ক	ও		রী	শু	নে	হা	০	সি		পা
পঁ	নি'	ধ'	নি'		ধ'	নি'		নি'	ঔ'	গ'	মনি'	ধ'			পঁ
বি	বা	হ	যে		ভা	ল		সা	সে	কি	বা	০	সি		হ

অন্তরা

	পঁ		প	ধ'		নি'	সাঁ	সাঁ	ঔ'	সাঁ		নি'	নি'	ধ'	নি'		পঁ	ধ'	নি'	ধ'
১।	চাঁ		পা	চা		মে	লী	ও	লে			ব	স	ন্তে	রে		যে	যে	চু	লে
২।	সে		তো	কা		লে	র	খা	সে			শু	বি	ন্তে	শু		বি	ন্তে	হা	সে

	পঁ	নি'	ধ'	নি'		ধ'	নি		নি		ম	প	ধ'	নি'	ধঁ		পঁ
১।	দ	লি	রা	ম		লি	য়া		লে		ক	র	ভা	রে	০		ক
২।	সে	আ	ভ	র		স্নে	হ		রে		সে	কি	ক	ছু			যা

কুলশয্যায়

: রাগ ছায়ানট—ঠুমরী।

ঘের ভাগে যার হরিণ নয়নী
কুলশয়নে সুখ রয়নী রে।

ফুলে ফুলে ভুল, আঁখি না পাএ কুল,
ফুল সায়রে ফুল নায়রী রে।
চকোর চাঁদিনায় করিছে হায় হায়,
হালে বিধু বিধু-বয়নী রে।

কথা ও সুর—অবিনাশচন্দ্র গুহ, শান্তী, এম্-এ। স্বরলিপি—মহিমচন্দ্র সরকার। রাগ ছায়ানট—রাত্রি ১-৪ দণ্ড মধ্যে। সঙ্গীত-মকরন্দ মতে সূর্য্য অস্তের এবং উদয়ের ৩ ঘণ্টা পরে গেয়। দুই নি সম্পূর্ণ। পুং রাগ। রিষভ তীব্রর। পরে মধ্যম তীব্রর। পুনঃ মধ্যম কোমল। অন্ততম আদি রাগ নটনারায়ণের পুত্র। ঠুমরী—সম্পূরণ। রূপের আধার—বারোয়াঁ, বেহাগ। নিশি কিংবা দিবা-ভাগে গেয়। হিন্দী ভাষায়—ঠুমরী (*ek qism ka git*, a variety of song. সঙ্গীতের তাল: চারি মাত্রার তাল। প্রধানতঃ কাফী, খিম্বাটি, পিলু, ঝাঁড, ভৈরবী, খমাজ, প্রভৃতি রাগে এবং পাঞ্জাবী ত্রিতালে গাওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাগের মিশ্রণে গেয়। লক্ষ্ণৌ এবং বানারসের ঠুমরী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রিয়।

: রাগ—(রনুজ-ঘঞ্-অনিকরণবাচো); তাল—(তন-ভাবে-ঘঞ্নি)।

আস্থায়ী

সাঁ	নি	ধঁ	নি		ধঁ	প		পঁ	০		রেঁ	গ		ম	ধ	পঁ	মগ		রেঁ
হে	প্র	জা	০		গে	কা		র	০		হ	রি		শ	০	ন	য়০		নী

অন্তরা।

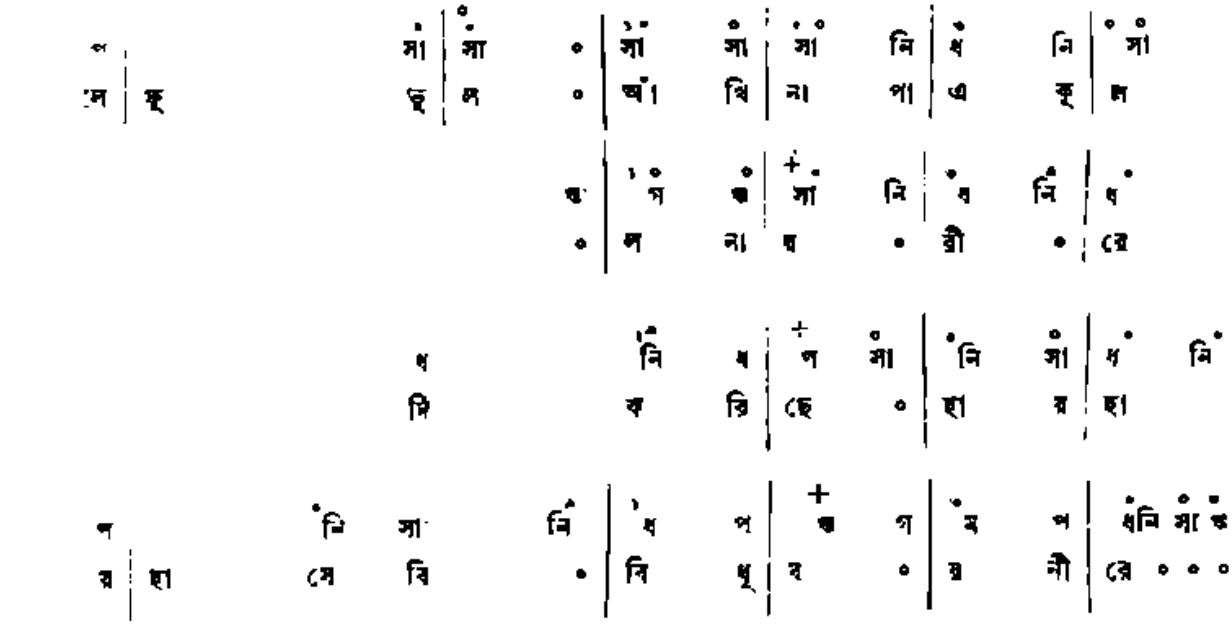

সা সানি
(হে হ০)

---

*সম্ভবতঃ "নব্যভারত", মাসিক পত্র ও সমালোচন, ফাল্গুন, ১৩০৪ সনে ঐ দুটি গান প্রকাশ হোয়ে থাকবে। তখনকার দিনের গানের মজলিসে ওদের কদর ছিল খুব! স্বরলিপি ছিল না বোলে বড় অভাব মনে হোত! তা দূর করার জন্যে এই প্রয়াস! সঙ্গীতামোদীদের দৃষ্টি পড়লে শ্রম সফল জ্ঞান হবে!

রাগ-রাগিণীর কালনিরূপণ।

গ্রীষ্মে—ভৈরব, বর্ষায়—মেঘ, শরতে—মালকোশ, হেমন্তে—দীপক, শিশিরে—শ্রী এবং বসন্তে—হিন্দোল।

ব্রহ্মার মতে—শ্রী (শীতে), বসন্ত (বসন্তে), পঞ্চম (গ্রীষ্মে), ভৈরব (শরতে), মেঘ (বর্ষায়) এবং নট নারায়ণ (হেমন্তে) গেয়।

রাগ-রাগিণীর সময়নির্ণয়।

দিবা বিভাগ।

বেলা ১ দণ্ড হইতে ৪ দণ্ড পর্য্যন্ত—ভৈরব, ভৈরবী বঙ্গালী, রামকেলী, দেশকার, বোগিঞা, খট্, আশাবরী গান্ধার, দেবগান্ধার, ভাটিয়ারী, গুণকেলী, আনন্দভৈরব ও কালাংড়া, ইত্যাদি।

৬ হইতে ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত—বিভাস, দেওগিরি, কুকুভ আলাহিয়া, বেলাবলী, পটমঞ্জরী, সঙ্করদা ও সুহা, ইত্যাদি

১১ হইতে ১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত—সিন্দূরা, বাগি, সিন্ধু, টোড়ি, গুর্জ্জরী, সুঘরাই, ইত্যাদি।

১৭ হইতে ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত—বৃন্দাবনীসারঙ্গ, মধুমাধ-সারঙ্গ, গৌর-সারঙ্গ, শুদ্ধসারঙ্গ, পটহংসিকা, দেওশাক ও বসন্ত-মাল্ল, ইত্যাদি।

২১ হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত—ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, ধানী, ধবশ্রী, মূলতান, পিলু, মালিগৌড়া, ইত্যাদি।

২৫ হইতে ২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত—পূরবী, বরাট, আহীরী, ধনশ্রী, মালশ্রী, দিনপুরিয়া, ধানশ্রী ও ঢোল, ইত্যাদি।

রাত্রি বিভাগ।

১—৫ দণ্ড পর্য্যন্ত—কানোড়, ছায়ানট, কেদারা, হাম্বীর, ইত্যাদি।

৬—১০ দণ্ড পর্য্যন্ত—ইমন্-কল্যাণ, ভূপালী, জন-জয়ন্তী ও রাতপুরিয়া, ইত্যাদি।

১১—১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত—শুদ্ধকানাড়া, খাম্বাজ, সাহানা, বাগেশ্রী, সিন্ধুড়া, লুম ও মালকোষ, ইত্যাদি।

১৬—২০ দণ্ড পর্য্যন্ত—বেহাগ, বেহাগড়া, সম্পূরণ, টঙ্ক, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, রতিবাহি, সুরট, ঝিঁঝিট, বারোয়াঁ, মালোয়া ও মেঘ, ইত্যাদি।

২১—২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত—নটনারায়ণ, কেদারা, কর্ণাট, ইত্যাদি।

২৫—২৯ দণ্ড পর্য্যন্ত—হিন্দোল, মোহিনী, বাসন্ত, ইত্যাদি।

৩০ দণ্ডের সময় ললিত।

সঙ্গীত-বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভোজদেবের একটি শ্লোক—

ত্রিবর্গফলদাঃ সর্বে দানাধ্যয়ন-তপাংসি।
একং সঙ্গীত-বিজ্ঞানং চতুর্বর্গ ফলপ্রদম্॥
হর্ষাদি-সুখদো ধর্ম্মো ধনকামো নৃপাদিতঃ।
নিদানং তদনুষ্ঠানং মোক্ষস্তস্মাত্তদভ্যসেৎ॥

অজানায় "বিদুষাং মুদে" বোলে সঙ্গীত-রত্নাকরেতে দেখা যায়—

শ্রুতি-স্মৃত্যাদি-সাহিত্য-নানাশাস্ত্রবিদোঽপি চ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাঃ পুচ্ছবর্জিতাঃ॥

---

† ঘটি (৬০) পলে ১ দণ্ড; ১ দণ্ড=২৪ মিনিট;
১ পল =২৪ সেকেণ্ড; ১ প্রহর =৩ ঘণ্টা।

* পিতৃদেব স্বনামধন্য ৺বিদ্যাসুন্দর শর্ম্মার সতীর্থ, সঙ্গী ও সমব্যবসায়ী কলিকাতার প্রবীণ ধর্ম্মাধিকরণের প্রবীণ ব্যবহারজীব শ্রীগুরুচরণ সেনগুপ্ত, বি-এল্ মহাশয়ের শুভবিবাহে ঐ তিনটী গান গেয়েছিল বোলে শোনা যায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মচৌধুরী

পুস্তক পরিচয়

ভাঙাগড়া : বৈশাখ ১৩৬১। সম্পাদক :—শ্রীসুকুমার রায়। চার আনা। ছোট্ট নতুন মাসিক পত্রিকা। এরকম বহু পত্রিকার জন্ম এবং অকালমৃত্যু। তা সত্ত্বেও নতুন লেখকদের মনে উৎসাহ-সঞ্চারের এগুলির কিছু সার্থকতা আছে। আলোচ্য কাগজের প্রথম সংখ্যা। এতে কণপ্রভা ভাদুড়ীর উপন্যাস 'কৃষ্ণকলি' শুরু হয়েছে। চীরেন্দ্রনাথ 'আধুনিক-কালোচিত্তকালের কবিতা'য় বলেছেন, তাঁর কবিতা প্রগতিশীল কবিতার চেয়ে বড়ো জিনিস। আমাদের কবিতা কালজের কবিতা হোক।"

মুকুল : প্রথম বর্ষ, গ্রীষ্ম ও বর্ষাসংখ্যা, ১৩৬১ সম্পাদক : শ্রীপ্রবোধ কুমার গুপ্ত। দাম ৮০ পয়সা।

"পূর্বেও এই সুলভ সুদৃশ্য কবিতা-পত্রিকাখানির কথা বলেছি। দেখে সুখী হয়েছি, পত্রিকাখানি উত্তরোত্তর সুপাঠ্য হয়ে উঠছে। বর্তমান সংখ্যা আরম্ভ হয়েছে শ্রীশৈলকান্তির 'বিচিত্র মুহূর্ত' দিয়ে; প্রায় কণপ্রভা তাঁদের মত ছোট ছোট পাঁচটি সুমধুর কবিতা। বল-কারখানাও কবি-মনে রহস্যবোধ জাগাতে পারে, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এঞ্জিন শেড্' তার দৃষ্টান্ত। দিলীপ বসু লি-পোর একটি চীনা কবিতার অনুবাদ করেছেন। সুশীল কুমার গুপ্ত আর কণিষ্কদেব আচার্যের কবিতা দু'টি বেশ ভালো লাগলো। স্নেহাঙ্কুর ভট্টাচার্যের 'মৃণাল-কান্তির-কবিতা' আলোচনা সু-চিন্তিত, সু-লিখিত। একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। কিছুদিন পূর্বে কক্ষ প্রচারধর্মী কবিতার দিকে অনেক কবি ঝুঁকেছিলেন; ইদানীং স্বপ্ন-মাধুরীর দিকেই অধিকাংশের আকর্ষণ।

কল্পিতকাহিনী :—শ্রীঅনিলেন্দু চৌধুরী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দু'টাকা।

ছোটগল্পের বই। প্রথম গল্পের নামে বইয়ের নাম। বিন্দুচিহ্ন ক'টি না থাকলে অবশ্য নামের অর্থ নিয়ে খট্‌কা লাগে। আধুনিক গল্পের রচনারীতি লেখক বেশ আয়ত্ত করেছেন। তাঁর ভাষা সরস ও সাবলীল। 'কেন্সিলি' প্রভৃতি গল্পে জীবন-রহস্য-বোধের পরিচয় আছে। আরও গভীরতা সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আসবে। শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যাল এ গ্রন্থে 'প্রতিশ্রুতি'র স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছেন, আমরাও পেলাম। বহিঃসজ্জা, বিশেষ ক'রে প্রচ্ছদপটটি চমৎকার। (বী)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'মন্দিরা'য় যে সব উপন্যাস এবং প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তা আগামী শারদীয়া আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে না। কার্তিক সংখ্যা থেকে তা যথারীতি প্রকাশিত হবে। মঃ সঃ

অরুণ বহ্নি

শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

.....তোমার "অরুণ-বহ্নি" পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। খুসী হবার কারণগুলির মধ্যে তোমার কলমে বাংলার মা-বোনদের কথা বেশ ভালভাবে প্রকাশ হওয়াও একটি। আমার এই একটা ঝোঁক ছিল। এক বন্ধুকে ধরে একবার কিছু লেখাই। ভূপেন দত্তের সম্পাদকত্বে তখন "স্বাধীনতা" সাপ্তাহিক রূপে বেরুচ্ছিল। কাগজখানি তোমাদের সম-সাময়িক। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল "বাংলার মা-বোন।" মাতৃজাতির অবদান বিপ্লবের পথে খুবই সমৃদ্ধ। জান কি, এ যুগের প্রথম গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে একজন মহিলা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত? যদিও জন্মতঃ তিনি ছিলেন বিদেশিনী, আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে এদেশী। তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৩ সালে সার্কুলার রোডে প্রথম যে আড্ডাটি খোলা হয় তার সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। তাঁর দেওয়া লাইব্রেরী বিপ্লবীদের বিপ্লবজীবনের আত্মিক ক্ষুধা মেটাত।

তোমার বইখানি আমার খুব ভাল লেগেছে। বিষয়-বস্তু রোমাঞ্চকর অথচ প্রকৃত—একদম বাস্তব। বলার ভঙ্গি পরিপাটি, অনতিযোগ্য। ভাষা চমৎকার। ঘটনা সন্নিপাতের কায়দা অতি সুন্দর। প্রকৃত ব্যাপার পড়ছি কি রূপকথা পড়ছি ভ্রম হয়ে যায়। কত কথা মনে পড়ে, কত চিন্তার উদয় হয়। শেষটা চিন্তা, ধ্যান ও অনুধাবন ছুটে চলে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। কি অদ্ভুত আমাদের এ দেশ! কতবার উঠেছে, পড়েছে। কিন্তু মরে নাই। সামধিকভাবে এর আত্মিক-শক্তি মাঝে মাঝে ম্লান হয়েছে। কিন্তু আবার জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠেছে। প্রকৃতিতে যার প্রয়োজন আছে তার জীবন থাকে অটুট।

জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশ যেন তোমাদের জীবনের ভিতর দিয়ে নতুন করে পেলাম। বিপ্লবী জীবনের আলেখ্য সত্যরূপ পেয়েছে তোমার লেখনী মুখে। চিরন্তন সত্য এমনই ভাবে বুঝি বিকাশ লাভ করে। মনে হল, যেন স্বতঃসিদ্ধ খাঁটি কথাটী এইভাবে বলতে চেয়েছ—রক্ত ঝরে ঝরে পড়বে আমাদের। নব জাতির নতুন জীবনের সৌধ গড়ে তোলার নক্সা অঙ্কিত হতে থাকবে তাই দিয়ে। আত্মোৎসর্গের রূপ-রেখায় আসবে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা। আমার কখনও মনে হল তোমার ভাষার অন্তরালের ভাবটি হচ্ছে—উৎপীড়ক, তোমার নারণাস্ত্রেই হবে তোমার অত্যাচার-উৎপীড়নের মরণ। আমার বন্দী-পায়ের বেড়ীর ঝন্ ঝন্ প্রতিনিয়ত তাই ধ্বনিত করে চলেছে। নয় কি?

আরও বেশী ভাল লাগল তোমার যুক্তিবাদী মনকে। ঈশ্বর আছেন কি নেই, অনুসন্ধিৎসা। এ তত্ত্বের পারের নাগাল কি পেয়েছ? দুরবগাহ। তবু অনুসন্ধান চলা ভাল।

হিংসা-অহিংসা। এগুলো যেন মুখোস। মুখোস দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়? মুখোস খসিয়ে ফেললে প্রকৃত মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। মানবিকতার কষ্টি-পাথরে তাকে মিলিয়ে নিতে হবে। তোমাদের ভিতরের সত্যকার মানুষকে যে আমি দেখেছি। শুধু দেখিনি, চিনেছি। সে নিত্যমানব স্বয়ং ভাস্কর, বেদ বিধির পর। দেদীপ্যমান।

তোমার ছেলে-জীবন পড়ে মনে হ'ল—বিপ্লবী তোমরা তেমন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে, শুখিয়ে মরার ব্যবস্থার মাঝে, পড়েছিলে—যে অবস্থায় "মনের ক্ষুধাই হয় মনের আহার।" কিন্তু তোমাদের অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্নমতি অসাধারণ।

তোমার বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। আপন-ভোলা, হিসাবে অনভ্যস্ত, ভাব-চেতনায় একান্ত লীন, সর্বত্যাগী, আদর্শের চরণে করে যাবার সাধন নিয়ে এসেছিল যে সব ফুল আজও তাদের সশ্রদ্ধ অন্তরে অভিবাদন জানাই।

তোমার ও তোমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সতত চাই। ইতি—

তোমাদের

যাদুদা।

---

*শ্রীযুক্ত শান্তি দাস, এম্, এল্, সিকে লিখিত।

নেতা রাজনীতিক

দিবাকর

নাক-কান মোলে নিয়ে গেলেছি, এ কাজ আর করবো না। জাহাজের খবর আর রাখবো না। কাঁসি না বাজাতে পারি, হরিনাম তো ক'রতে পারি! ইহকালের আর ক'দিন, সারা পরকালটা পড়ে আছে!

কিন্তু ভাপের ঢাকা চাতে করে' মনটা কেমন করে' বারান্দায় বসে সেই সবই দেখতে পাই। নাম ভুলে চেঁচাতে হয়: বেড়া ভেঙে গরু ঢুকলো! গেলো গেলো!

মানে পলিটিক্স্। আজ পর্যন্ত অনেক করেচি! সত্যি কথা বলতে কি, এতে মূলধন কিছু লাগেনি। হঠাৎ একদিন ঘুমের ঘোরে (স্বপ্নে) দেবাদিদেবের প্রত্যাদেশ পাই—ব্যাঙ কাজ করে' চেঁচায় কেন? চোখের ওপর কাজ পড়ে আছে দেখতে পাস্ না? মুখ দিয়েছি কিসের জন্যে? বড় রাস্তার মোড়ে, ফাঁকা মাঠে গিয়ে চেঁচা! আমাকে যে কথাগুলো বলিস্ সেইগুলোই গুছিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বল! কাজ হবে—তোর অন্ন মারে কে!

আদেশ মানলুম। কেবল তোতলামিই সারল না, অনেককে সারলুম। আমার পেছনে লোক জুটলো! শেষটা মই নিয়ে গাছে তোলার মত জনতা আমাকে কাঁধে করে' অনেক উঁচুতে তুলে দিলে; আমি নেতা হ'য়ে গেলুম। কেবল লক্ষ্য ছিল, পিছনের ঐ মই কাঁধে লোকগুলোকে তাল দেওয়া! আর এমন একটা ভাব দেখান যেন, আমাকে কাঁধ থেকে নামালেই তাদের সমূহ বিপদ।

এতে সুখও যেমন দুঃখও তেমনি। সব সময় ভয়, এই বুঝি জনতা (সমর্থন) ছুটে গেল, আর কেউ ভাড়িয়ে নিলে, স্রোতের গতি পরিবর্তন হ'লো! ইন্‌ক্যুবেটরের তাপের মত পলকে জনমতকে না-দেটা অবস্থায় তাতিয়ে রাখতে হয়। নাতিশীতোষ্ণ!

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর এ কাজে আমার অভিজ্ঞতা। নেমে' প্রথম কাজটার ওপর ভারি একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভাবতুম, এ কাজ না-ক'রলে মানব-জনমই বৃথা। কালে সে শ্রদ্ধা একেবারেই চলে যায়। বুঝলুম, কাজটা কিছু নয়, দল পাকাতে না-পারলে একাজ কাজই নয়। দলটাই আসল। ল্যাং মারামারির নামই পলিটিক্স্। চেঁচিয়ে কেবল ফিরিই হয়, কাউকে ফেরান যায় না। ট্যাকটিকস্ না জানলে দাঁতের মাজন কিরি কেবল!

এমন অনেক নেতা আছেন যাঁরা জীবনে একটি বারও মঞ্চে ওঠেননি, কিন্তু যাঁদের নাম করতে লোকে বিষম খায়! বড় বড় ছবি ছেপে দেশবরেণ্য, দেশ-গৌরব নানা আখ্যা দেওয়া হয়।

নেতা হ'তে গেলে আগে দরকার হ'তো বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা, সাহস। এখন ঠিক তার উল্টো, বিদ্যে-বুদ্ধির কোন বালাই-ই নেই—কেবল দল-পাকাও, আর দল-ভারি কর। অতি বড় মূর্খও অতি বড় বিদ্বানের ঘাড়ে চাপতে পারে, খালি পিছনে যদি তার দল (people's support!) থাকে!

কিন্তু দল মানে সংখ্যাধিক্য ভোট নয়। বিনা ভোটে দলপতিই হ'লো আসল: আমি নিজে কখনো ভোটযুদ্ধে নামিনি; কিন্তু বরাবর ঐ যুদ্ধের পিছনে পাকজঞ্জ বাজিয়েছি। দেখেছি, ফল ফলেছে। সামনা-সামনি লড়াই ইতর জনদের জন্যে। প্রায় সংসারের কর্তারা যেমন বলেন, হঠাৎ আমি রাগি না, কিন্তু রাগলে আর কারো রক্ষা রাখবো না—নেতাদেরও তেমনি কর্তৃত্বের হুমকি দেওয়া চাই। Blank Fire!

রাজনীতিক্ষেত্রে জনপ্রিয় কথাটা কথার কথা, বোকা লোকের আদিখ্যেতা! যাঁর কাজে যত সমালোচনা, নিন্দে তিনিই তত পপুলার। গুরু-ঠাকুর ধারণা নেই

।তিক

—

চ্ছতি। মুখে সব সময় বলতে চয়, তোমাদের জন্যে করচি, তাই করচি—জীবনপাত করচি!

এটা ঠিক, লোকে কোনদিন ভুলেও তোমার সব কাজের হিসেব নিতে আসবে না, জবাবদিহিও সে না তোপ চেয়েও দেখবে না, সত্যি তুমি বি লে না ক'রলে!

ভুলিয়ে নত বলা কেবল।

এখন কেউ যদি মনে করেন, বিশেষ অসুবিধায় চ্ছি বলেই এই সব আত্মবাক্যে আওড়াচ্ছি, তিনি ভাই ভুল ক'রবেন। বেকায়দায় পড়লেও সুযোগ ঠেলে ওঠবার ক্ষমতা আমার জানা আছে। কম র' পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা সহজ ব্বেন না আমাকে!

নোতানার বই

কমলা দাশগুপ্তের

রঙের এক্সপ্রে

দান্ তোল্ দান্ তোল্ ছেড়ি,
ঝাপো ভিজা ঘাপে মো
ওরে মরণে দিয়া দান্
গাঙ্গুর ওঙ্গুর ঘাটৈ;

ভিজলো বেন। ঘরিনী কিশোরী অরুণ এক পুরুষের ভাল ভালার কর্মিক ধরে পাইছে। বিদেশের ফেলানো তুচ্ছ আবর্জনার এরমি ভরিং মোকুলের নিষ্ঠুর চাহনী ঘরের ভাঙ নির্মম পরিহাস আমাদের-সব আশার প্রেম বিশ্বাসের মূলে-ছেরে তুল মারিয়েছে। আজ-বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপ বেদনার ছিন্ন পল্লব যেন হাতা কেবার কেবল তুলিয়ে পুরুষ করে বিদেশে বিদেশ-পত্নিন। ভাংগীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের অনেক অজানা ও সরল ও আকুল ভাষায় পাঁচালীর, বাংলার বাংলার বিদেশী

কন্যা কমলা দাশগুপ্ত ৷ পাঁচ টাকা ৷

নোতানা

৷ নোতানা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ

ঢাকেশ্বরীর কাপড়

কিনুন—টাকা বাঁচান

পছন্দসই কাপড় তৈরী করে ঢাকেশ্বরী গত ২৮ বছর যাবৎ জাতির সেবা করছে।

প্রায় নয় হাজার শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান—১ ও ২নং মিল নারায়ণগঞ্জে এবং ৩নং মিল আসানসোলে।

আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত এই সব মিলের তৈরী রকমারি বস্ত্রসম্ভার বাজারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ঢাকেশ্বরীর কাপড়

সুন্দর, মজবুত ও সস্তা বলে খ্যাত—

মনে রাখবেন

এই দেশীয় সম্পদের অংশীদার প্রায় ২৩,০০০ জনসাধারণ

ইতিমধ্যে শতকরা ২০০ ভাগের অধিক ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

১ ও ২নং মিল নারায়ণগঞ্জ (পূর্বপাকিস্তান)
৩নং মিল আসানসোল (পশ্চিম বঙ্গ)

শ্রীসূর্য্য কুমার বসু
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ও
ম্যানেজিং এজেন্টস।

রেজিঃ অফিস :
৪১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিঃ-১৬
ঢাকা অফিস :
৩৬নং হাটখোলা রোড, ঢাকা।

পূজার অভিনয়ে নূতনত্ব চাহিলে

মন্মথ রায়ের নাটক

কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া

সুবিখ্যাত নাটকত্রয় এক খণ্ডে প্রকাশিত :• মূল্য ৩৲

জীবনটাই নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত একাধারে পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক : ২৷৷০

মহাভারতী

১৯০৫ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুক্তি-আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেগ একটি চাষী-পরিবারের পঞ্চাঙ্ক জীবন-নাটক একটিমাত্র দৃশ্যপটে রূপায়িত। মূল্য ২৷৷০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স : ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ—৬

পর পর দুটি বন্ধু ও সহকর্মীর তিরোধান

পর পর দু দিন দু'জন পুরানো দেশসেবক কর্মী দেহ-ত্যাগ করেছেন। ২৬শে শ্রাবণ চলে গিয়েছেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় প্রত্যুষে ওঁর সময় পরদিন রাত ১২টার পর গিয়েছেন শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। সুরেশচন্দ্র খ্যাতনামা ব্যক্তি, তাঁর হঠাৎ মৃত্যু জাতীয় জীবনে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তাঁর জীবনকাহিনী বিভিন্ন কাগজে, বিশেষরূপে তাঁরই দুখানি দৈনিক কাগজে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হয়েছে। কাজেই এখানে আমরা তাঁর জীবনী নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করতে চাইনা। তিনি বহুদিনের কর্মী—একটা পুরানো বিস্মৃতপ্রায় যুগের অনেক কাহিনীর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। মন্দিরার পরিচালকদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বহুদিন ব্যাপী। তাই মন্দিরার তরফ থেকে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আজ এখানে আমরা আলোচনা করব শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় ও প্রেরণায় এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে কৃচ্ছ্রসাধনার আদর্শ নিয়ে যে সব যুবকদল গড়ে উঠেছিল উপেনদা তাঁদের অন্যতম। এমনি আদর্শবাদিতা ও নিষ্ঠা তাঁর চরিত্রে ছিল যাতে তিনি সমাজের সঙ্গে নিজেকে খুশিমত মিলিয়ে নিতে পারেননি। জীবনে সাফল্যের দিক থেকে বা কর্মকার্যতার দিক থেকে এটা তাঁর জীবনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মানুষকে যদি আমরা মানুষ হিসাবে বিচার করতে যাই, তাহলে কেবল সাফল্য বা কৃতকার্যতা দিয়ে তাঁকে দেখলে চলবে না। তার জীবন ধর্ম ও চরিত্র দিয়ে তাঁকে বিচার করতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে আদর্শকে খর্ব করতে হয়, নিষ্ঠাকে ক্ষুণ্ণ করতে হয় বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করে চলতে হয়। Compromise is a virtue এ নীতি আমরা জানি, কিন্তু যদি হাসিমুখে দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নেয়, ব্যবহারিক ও সাংসারিক জীবনে কৃতকার্যতাকে তুচ্ছ করে চলে, কারণ কোন অবস্থাতেই অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে সে রাজী নয়, সে মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তাকে দিতেই হবে।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই গোষ্ঠির লোক যা আজকের সমাজে অত্যন্ত দুর্লভ। আজ যেখানে পুরানো দেশ

গ্রহ দেখছি ব্যাংকে জমানো
হবিলের উপর চেক কেটে
ক জীবনের সাফল্যের ইমারত
থের এই নিষ্ঠা ও আদর্শবাদিতা
দেবে তা সহজেই অনুমান
ছলে বুড়ো সকলের কাছে
জনপ্রিয়, কিন্তু কংগ্রেসের
য় তিনি একজন নবাগতের
সে পরাজয় উপেন্দ্রনাথের
তিষ্ঠানের হয়েছিল তাহা

শরীরও খুব ভাল নয়। তার মধ্যেও প্রায় প্রত
নি পায়ে হেঁটে মন্দিরা অফিসে আসতেন। উদ্দেশ্য,
পাড়ার ছেলেদের মধ্যে প্রতিরোধশক্তি জাগান যায়
করে। তিনি নৈতিক কংগ্রেসকর্মী, স্বভাবে শ
ও দার্শনিক এবং অত্যন্ত দৃঢ়ব্রতী। কাউকে তি
ঘাত করবেন, এটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবু
া ও গুণ্ডামীর সামনে পাড়ার লোক নীতি স্বীকার
বে এটা উপেন্দ্রনাথের পক্ষে অসহ্য ছিল। মন্দি
কিসে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে
ভা করতেন এবং নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে
া করতেন যাতে পাড়ার যুবকদের মধ্যে প্রতিরোধ
ক জাগে। তাঁর সহকর্মীরা কতো তাঁকে তিরস্কার

অন্তিম শয্যায় উপেন্দ্রনাথ

একখানা ছোট কক্ষ
র কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল
ল তাঁর আত্মীয় স্বজন এবং
যাবৎ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল
বন্ধুবান্ধবরা অনেক সময়

একটা বিশেষ অধ্যায় আমরা
শ্রম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের
বাস করতেন তার আশেপাশে

রেছে, এমনি ভাবে বিপদকে [illegible]
ল। পাঁচ হাত দূরের জিনিষও তিনি ভাল করে
দেখতে পেতেন না। এ অবস্থায় একাকী মানুষের পক্ষে
ন্তর দিয়ে শিয়ালদহ কাছে যাতায়াত [illegible]

বিপজ্জনক তা স্থানীয় সবাই সহজেই বুঝতে পারবেন। বছর দেড়েক পূর্বে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখনও নারকেলডাঙ্গার সেই অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে কক্ষটি ছেড়ে অন্যত্র যেতে তিনি সহজে রাজী হন নি। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে গিরে রাঁচিতে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সুস্থ হয়েই তিনি আবার ফিরে এলেন তাঁর সেই দুঃখ বন্ধুদের সাহচর্যে। সেখানে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর জীবনের অবসান হয়।

যে যুগ আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হতে যাচ্ছে, উপেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই যুগের প্রতীক। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের তিনি ছিলেন কর্মী। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তিনি ছিলেন বেখাপ্পা। প্রাচীনপন্থী, প্রগতি বিরোধী, বদ্ধ মন এই ছিল আজকার দিনের লোকের নিকট তাঁর পরিচয়। কিন্তু এই লৌকিক পরিচয়ের অন্তরালে যে মানুষটি ছিল তা ছিল আদর্শবাদী কর্তব্যে নিষ্ঠাপরায়ণ, শৃঙ্খলায় দৃঢ়, স্বধর্মে অবিচলিত এবং সর্বোপরি জনসেবায় একনিষ্ঠ। লৌকিক প্রথায় মৃত্যুর পর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করা উচিত। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আত্মার মুক্তি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন আবার এই বাংলা দেশে মানুষ হয়ে জন্মে দেশ ও জনতার সেবা করার অধিকার। পরলোকের কথা আমরা জানিনা। হিন্দু হিসাবে কর্মফল ও জন্মান্তর-বাদের সংস্কার বা বিশ্বাস আমাদের মনে শিশুকাল থেকে আছে। যদি সে সংস্কার বা বিশ্বাসের পিছনে কিছু সত্য থাকে তাহলে উপেন্দ্রনাথ আবার বাংলার কোন গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন, কারণ এই ছিল তাঁর কামনা। তিনি ছিলেন কর্মযোগী ও ব্রতী। কর্তব্য-পালন করেছেন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে। কর্মযোগীর যে গতি প্রাপ্য তা তিনি পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

মন্দিরার পরিচালকগণ তাঁর মৃত্যুতে ব্যক্তিগত শোক অনুভব করছে। তিনি তাদের বহুদিনের সহকর্মী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর শোকে মুহ্যমান হয়েছে তাঁর নারিকেলডাঙ্গার যুবকগণ,—জাগৃতি সঙ্ঘের সভ্যগণ। তাদের প্রতি মন্দিরা তার সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

সাত বছরের হিসাব—

স্বাধীনতা লাভের পর ৭ বছর অতীত হল। এই ৭ বছরে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পক্ষে বা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের পক্ষে জাতীয় সরকার কি করেছে তা আমাদের একবার বিচার করা উচিত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেবল যে জাতীয় বিত্ত সম্পত্তি বাড়াবার প্রস্তাব করা হয়েছে তা নয়। জাতীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও পরিকল্পনা এতে আছে। গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি ভাত কাপড় ও কৃষির ব্যাপারে জাতীয় সরকার এই ক'বছরে কি করেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খতিয়ান না লিখেও এটা সর্ববাদিসম্মত যে আজ লোকের জীবনযাত্রা পূর্বের চেয়ে অনেক সহজ ও সুগম হয়েছে। সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বিশেষ বেশে নেই এবং দামও পূর্বের চেয়ে অনেক কম হয়েছে। একই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান। উভয় দেশের আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থার তুলনা করলে দুই দেশের উন্নয়নকার্যের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করা যাবে।

বৈষয়িক ব্যাপার ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও সামাজিক বিষয়ে জাতীয় সরকার কতখানি এগিয়েছে বা কি চেষ্টা করছে তার হিসাব নিলেও আমাদের খুব লজ্জিত হবার কারণ নেই। আমাদের সংবিধানে এ সম্বন্ধে কতগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৭ ধারাতে অস্পৃশ্যতা প্রথা রহিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধারাতে আরও বলা হয়েছে যে অস্পৃশ্যতা প্রথা আইন মতে দণ্ডনীয় হতে পারবে। তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি (Castes – Tribes) সমূহের উন্নতির জন্য প্রায় ৫½ কোটি টাকা বরাদ্দ এ ৫ বছরের জন্য ধরা হয়েছে। এদের অবস্থার অনুসন্ধানের জন্য অনুন্নত জাতির কমিশন (Backward Classes Commission) স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করা

হয়েছে তাতে অনুন্নত প্রথাকে আইন অনুসারে শিডিউল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে অনেক পার্বত্য উপজাতি সমূহ আছে। তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা হচ্ছে। এত বছরের পরাধীনতার ফলে জাতির একটা বিশেষ অংশ অনুন্নত অবস্থায় ছিল। তপশীলী জাতি, পার্বত্য উপজাতি ও অনুন্নত জাতি সমূহের মোট সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ জন হবে। তন্মধ্যে সাধারণ ভাবে অনুন্নত যাদের বলা হয়, অর্থাৎ তপশীলী ও পার্বত্য উপজাতিদের বাদ দিয়ে, তাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২০ জন হবে। সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যতীত কেবল এদের জন্য ৫ কোটি টাকা আলাদা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের সংবিধানে একটা আদর্শ নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ আর ৬ বছর পর, ৬ বছর হতে ১৪ বছরের প্রত্যেক বালকবালিকার জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে ৬ থেকে ১৪ বছরের বালকবালিকাদের মধ্যে শতকরা ৩০।৩২ জনের বেশী লেখাপড়া জানেনা বা স্কুলে যায়না। ১৯৬০ সালে এই লেখাপড়া জানা বালকবালিকার সংখ্যা শতকরা ১০০ জন করা খুবই কঠিন এবং একটা উচ্চ আদর্শের সূচক। এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার বরাদ্দের জন্য ১৪২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা এবং তাও বুনিয়াদি ধরণের প্রাথমিক শিক্ষার উপর। গ্রামে গ্রামে যে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কত বেড়েছে তা বিশেষ করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এবং এ বছরে এই বৃদ্ধির সংখ্যা আরও ক্ষিপ্র হবে। কেবল কেতাবী শিক্ষা নয় কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারেও এই পরিকল্পনাতে একটা আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাব খুব বেশী এবং শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠানেরও অভাব ততোধিক। চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রধান কাজ হবে নূতন নূতন চিকিৎসাবিদ্যালয় স্থাপন করা ও গ্রামে গ্রামে হাতিকাগার ও সাধারণ লোকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা। জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রধান কাজ হবে পানীয় জলের ব্যবস্থা—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, ম্যালেরিয়া নিবারণ, গ্রাম্য জনসাধারণের রোগ-প্রতিষেধমূলক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যিক ব্যবস্থা প্রভৃতি ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই দুই কাজের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সমাজসেবামূলক এমনি আরও অনেক ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিবিধ সামাজিক আইন এবং নারীদের সামাজিক ও আর্থিক অধিকার বাড়ানো ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন সাধন। পার্লামেন্টে বর্তমানে হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কতগুলি বিল আলোচিত হচ্ছে। তার ফলে হিন্দু সমাজে প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে এবং নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকার বিশেষ ভাবে বেড়ে যাবে। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রমিকদের আরামগৃহের উন্নতি সাধন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আরও উন্নতি সাধনের অনেক প্রয়োজন আছে। আশাকরি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজসেবাক্ষেত্রে আরও ক্ষিপ্র উন্নতি সাধিত হবে। পরিশেষে দেশবাসীর কাছে আমাদের নিবেদন, জাতীয় সরকারের এই যে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা, তাতে জনসাধারণের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। এটা তাদের নিজেদের কাজ, নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনা ঠিক করবে এবং সেই কাজে উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

মরতলোকে এলো কেশে ও কে এলো তোরা যা দেখে।
বিজুলিছটা বহ্নিফটা সিংহ'পরে পা রেখে॥

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY, UNIVERSITY

মন্দিরা

সপ্তদশ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৬১ | ষষ্ঠ সংখ্যা

পদাবলী-সাহিত্যে সম্ভোগাঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

লৌকিক সমাজ-নীতির বিচারে পদাবলীর মধুররসের বিচার করিতে গেলে রসাভাস হইবে। রাধা চন্দ্রাবলী ও ব্রজগোপীগণ পরোঢ়া বা পরকীয়া। তাহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় সামাজিক আদর্শের বিচারে দুষণীয়। রাখিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—রাধা তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি। মানব বৃন্দাবনে ভগবান প্রেমলীলা আস্বাদনের জন্য চিন্ময় মুরলীধর হইয়া অবতীর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন নিত্য। আর বিবাহ একটা সামাজিক সংস্কারমাত্র। ঐ নিত্যমিলন কোন সামাজিক সংস্কারের অধীন নয়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন—

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেহভাগাদে
একাত্ম সংপ্রথিতমেব তদুদ্বয়ং নৌ।
কস্তিংশ্চিদেকসরসীব চকাশদেক
নালোপমজ্যুগলং খলু নীলপীতম্॥

রাধাকৃষ্ণ এক মৃণাল হইতে সমুদ্ভূত একটি নীল একটি পীত পদ্মের মত নিত্যমিলিত। রাধাকৃষ্ণের মিলনের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ইহা একটি প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণ একাত্মলীলার মধ্য দিয়া অদ্বৈতের দ্বৈতভাববিলাস করা হইয়াছে। দ্বৈতভাবে দুই শরীরে রূপ ধারণ না করিলে লীলা হয় না।

কবি বলিয়াছেন—'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ।' অসীম অনন্ত ভগবান সীমার মধ্যে অর্থাৎ মানুষের জীবনকে আশ্রয় করিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন। অসীমকে যেমন সীমার ভাষায় ব্যক্ত করা হয়—নিত্যানন্দকেও তেমনি মানবিক ও দৈহিক আনন্দের ভাষায় পদাবলীতে ব্যঞ্জনা-গর্ভরূপ দান করা হইয়াছে। ইহা অনির্বচনীয়কে সঙ্কেত ও ধ্বনি ব্যঞ্জনার দ্বারা অধিগম্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস মাত্র। "সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা" অসীমের মধ্যে হারা হইবার জন্য সসীমের যে স্বতঃসিদ্ধ পিপাসা,

ও ব্যাকুলতা (yearning) তাহাই পূর্বরাগ, অভিসার ও বিরহের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধকের এই পিপাসা ও ব্যাকুলতা—এতই গাঢ়, গূঢ় ও তীব্র যে স্বকীয়া-প্রেমের ভাষায় ব্যক্ত হয় না বলিয়াই পরকীয়া প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমরা যাহাকে ভালবাসি, কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালবাসা। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা তাহার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না—সমস্ত হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ মানব-বাছুরটিকে বেষ্টন করিয়া লেহন করিতে পারে না—তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে—প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থবিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করে।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মধ্য দিয়া অনন্তের উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। পতি-পত্নী কথাটা ব্যবহার না করিয়া কবিগুরু প্রিয়তম—প্রিয়তমা কথা ব্যবহার করিয়াছেন কেন, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যে ভালবাসায় আনন্দের অবধি পাওয়া যায় না—যে ভালবাসার গভীরতায় থাই পাওয়া যায় না, যে ভালবাসায় আত্মদানের অন্ত নাই—সেই ভালবাসাতেই অশেষ, অথই, অনন্ত বা অসীমের উপলব্ধি মিলে। তাহাই যদি হয়, তবে ভালবাসার বিবিধ প্রবাহের মধ্যে নিবিড়তম, গভীরতম প্রবাহ—কোনটি, যাহাতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটে, থাই না পাইয়া নরনারী একেবারে অনন্তের মধ্যে তলাইয়া যায়? বৈষ্ণবকবিরা বলেন,—দুর্লভ প্রিয়তমের জন্য দুর্লভা প্রিয়তমার প্রেম—সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিয়া দেখিলে পরপুরুষের প্রতি কুলবতীর প্রেম। এই প্রেমই Symbolised হইয়াছে দেশকালাতীত অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের পরকীয়া-প্রেমে। বলা বাহুল্য, অনন্তের উপলব্ধির জন্য যেমন কোন মাতাকে আহ্বান করা হইতেছে না তাহার সন্তানকে ভালবাসিতে, তেমনি কোন কুল-নারীকে আহ্বান করা হইতেছে না বা উৎসাহিত করা হইতেছে না—পরপুরুষের প্রতি অনুরাগের জন্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ের মধ্য দিয়া অনন্তকেই উপলব্ধি করিবার জন্যই বৈষ্ণবকবিরা আহ্বান করিয়াছেন সকল পুরুষ ও নারীকে।

যাকে শুকমুনি।
ভাগবতে পরকীয়া বলিলা আপনি॥
ইহা ভাবি মঙ্গল ইচ্ছিবা যেইজন।
'ভক্তাচার করুন নতু কৃষ্ণের আচরণ॥

স্বকীয়া রতি.—আত্মত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, আত্ম-নিগ্রহ, বাধা বিঘ্ন, সংস্কারবিজয় ইত্যাদি হইতে বিমুক্ত হওয়ায় ভাগবত প্রেমের Symbol হইতে পারে না। একমাত্র ব্রজের এই পরকীয়া প্রীতিকে ভক্তিধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া ভক্তাচার করিতে হইবে—জীবনে অনুকরণ করিলে চলিবে না। যাহারা লীলাতত্ত্ব বুঝে না—তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত কাল্পনিক আচরণের অনুকরণ করে।

বৈষ্ণব সাধকগণ বলিতে চান—পরপুরুষে অনুরক্তা কুলবধূর আত্মহারা আকুলতাটুকু অধিগত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর—জীবনে তাহার আচরণের অনুসরণ করিও না।

রাজা পরীক্ষিৎ রাসলীলা-শ্রবণে সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইলে শুকদেব সন্দেহভঞ্জনকল্পে বলিলেন—"যে সকল ব্যক্তি অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র বা দেহাত্মবাদী, তাহাদের কদাপি মনের দ্বারাও ঐরূপ আচরণ কর্তব্য নয়। যেমন রুদ্র-ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাপ্রযুক্ত ঐরূপ ঈশ্বরের আচরিত কার্য্য আচরণ করিলে অচিরে বিনষ্ট হইবে—যদিও ভগবান

আপ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাদৃশ ক্রীড়া করিয়াছেন। (ভাগবত দশম স্কন্ধ)

রাসলীলা প্রসঙ্গে ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছে—রাসলীলা যোগেশ্বরের মায়ার দ্বারা পরিকল্পিত লীলা। অতএব ইহাতে ব্রজগোপীগণের স্বপতি ত্যাগ ইত্যাদি লৌকিক বিচার অনাবশ্যক।

ভাগবতের রাসলীলা বিশ্লেষণ করিলে আমরা যাহা পাই, তাহার সঙ্গে লৌকিক বিচার একেবারেই সমঞ্জস হয়না। শ্রীকৃষ্ণ এমন মুরলীধ্বনি করিলেন—যে তাহা শুনিয়া ব্রজগোপীগণ যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পাগল হইয়া বনের দিকে ছুটিল। পরপুরুষের দিকে যে নারী ধাবিত হয়—সে পতিসেবা করিতে করিতে ছুটিয়া তাহার দিকে যায় না, শিশুকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে তাহাকে রোরুদ্যমান অবস্থায় ফেলিয়া পাগলের মত ছুটে না, এক চোখে কাজল পরিয়া এক কানে কুণ্ডল পরিয়া, এক পায়ে আলতা পরিয়া, দুলিত বেশে, স্খলিত বেশে স্খলিত-নীবিবন্ধন হাতে করিয়া ধরিয়া ছুটেনা। একসঙ্গে কখনও পতিপুত্রবতী নারীরা দল বাঁধিয়াও কোন পরপুরুষের উদ্দেশে ছুটে না। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণের মুরলী যমুনাতীরের বাঁশবন হইতে তৈরী মুরলী নয়—এ মুরলী কোন বাস্তব পদার্থই নয়। আর ব্রজগোপীরা আমাদের লৌকিক জগতের নারীও নয়। আর শ্রীকৃষ্ণও পরপুরুষ নহেন, পরমপুরুষ। লক্ষ্য করিতে হইবে—কোন কুমারী বা বিধবা নারীর কথা ইহাতে নাই। সকলেই পতি-পুত্রবতী, গৃহিণী, গৃহাসক্তা, সংসারধর্মে নিবিড়ভাবে মগ্না।

ভাগবতের কবি পতিপুত্রে অনন্যরক্তা, চঞ্চলচিত্তা, লালসাবতী, পরপুরুষের জন্য প্রতীক্ষমাণা এমন কোন নারীর কথাই বলেন নাই। তিনি রাসলীলাপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন—একদিকে সংসার—অন্য দিকে পরম-পুরুষের আহ্বান। এই সংসারটির বন্ধনজাল বুঝাইবার জন্য পতিপুত্রবতী নারীগণকে নানা কর্মে ব্যাপৃতাকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। পরপুরুষ কখনও একদল স্ত্রীলোক লইয়া লীলা করে না—পরমপুরুষের পক্ষেই তাহা সম্ভব, যদি ঐ স্ত্রীলোকগণ রক্তমাংসে গঠিত না হয়। প্রেমগর্ব্বের জন্য পরপুরুষ কখনও গর্ব্বিত করে না—পরমপুরুষই ভক্তির মধ্যে অভিমান থাকিলে ভক্তকে দণ্ডদান করিতে পারেন।

এই সকল কথা চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে পরকীয়া বলিতে বৈষ্ণবেরা কি বুঝিয়াছেন এবং ভাগবত কি বলিতে চাহিয়াছে। পরকীয়া-রতি রূপক না হইলেও Symbol বলিয়া অবৈষ্ণব পাঠক ধরিয়া লইতে পারেন। Metaphor ও Symbolism ছাড়া আর একটা অলঙ্কার আছে তাহা Analogy (আনুরূপ্য)।

রাধা যমুনায় জল আনিতে যান, রন্ধনশালায় যান, অঙ্গন মার্জ্জনা করেন, আরও অনেক গৃহকর্ম করেন। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকে সব সময়ই শ্রীকৃষ্ণে। গৃহসংসারে রমণী সংসারধর্মরতা কুলবধূর পর-পুরুষের চিন্তা আর বিষয়কর্মরত ভক্তের পরমপুরুষের চিন্তা দুইএর মধ্যে আনুরূপ্য পরকীয়াবাদের একটা অতি সাধারণ ব্যাখ্যা। পরমহংসদেবও বিষয়াসক্ত ভক্তের কথা বুঝাইতে এই আনুরূপ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের শ্লোকটিকে মনে পড়ে—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনোভিরমতাং ত্বয়ি।

এই মনোভিরামতাকে আরো নিবিড় ও গভীর করিয়া দেখাইতে হইলেই পরকীয়া যুবতীর কথা ও পর-পুরুষের কথা বলিতে হয়।

খাঁটি বাংলা ভাষার পদগুলিতে সংস্কৃতকাব্যের প্রভাব অতি সামান্য। ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি সংস্কৃত কাব্য ধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। সংস্কৃত কাব্যে প্রেম ও কামের মধ্যে একটা সীমারেখা নাই—প্রেম ও কাম অঙ্গাঙ্গী ভাবে অনুস্যূত। এখন যেমন Platonic love, বিদেহ প্রেম, নিষ্কাম প্রেম, অতীন্দ্রিয় প্রেম, অবাস্তব

প্রেম ইত্যাদি লইয়া কাব্য রচিত হয়, সংস্কৃতে তাহা হইত না। দেহসম্পর্কযুক্ত নিরালম্ব প্রেম কাব্যের বিষয়ীভূতই ছিল না। যেখানেই প্রেমের কথা, সেখানেই তাহার উপযুক্ত দৈহিক আবেষ্টনী, আধার, উপচার, উপকরণ ও আনুষঙ্গিকতার কথা আছে। সীতাকে হারাইয়া দণ্ডকারণ্যে দারুণ বর্ষাগমে রামচন্দ্রের মনে বিরহব্যথার সঞ্চার হইয়াছে। মহাকবি তাহাতে কামকেলিও মিশ্রিত করিয়াছেন। কুমারসম্ভবে মহাযোগীর গৌরীপ্রেম দেহসম্পর্কবর্জিত নয়। সংস্কৃত কবির লেখনীতে হরগৌরীর প্রেমলীলা কামলীলাতেই পরিণত হইয়াছে।

ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি সংস্কৃত কাব্যধারার দ্বারা আবিষ্ট বলিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের মতই এইগুলিতে কামলীলারও স্থান হইয়াছে। হরগৌরী বা রামসীতার প্রসঙ্গেই মহাকবিরা সতর্কতার শোভন বোধ করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতে ইহা ত অপরিহার্য্য অঙ্গ হইবেই।

রবীন্দ্রনাথ 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটির 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ' এই পংক্তির স্থলে 'কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ' সংযোজন করিয়াছিলেন। ইহাই বর্তমান যুগের রসালস্কের পক্ষে সুসঙ্গত। বৈষ্ণব কবি কাম দারুণ যখন পরম সত্য, তখন তাহাই লিখিতে কোন অসঙ্গতি দেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্যের অনুস্মৃতি এবং কাব্যের চিরন্তন ঐতিহ্যের ধারার অনুবর্তনের ফলেই ব্রজবুলির পদাবলীতে কামলীলার বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

ব্রজলীলার পদে ঐশ্বর্যভাবমিশ্রিত থাকিলে তাহাতে রসাভাসের সঞ্চার হয়—ইহা একটি অনুশাসন। এই অনুশাসন পদকর্তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয় ঐশ্বর্যভাব হইতে চিত্তকে বহু দূরে লইয়া যাইবার জন্য কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল প্রাকৃত-প্রেমমুগ্ধ মানুষ করিয়া তোলেন নাই, কামুক লম্পট করিয়া তুলিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনের কবি কেবল দেবত্ব হরণ করেন নাই, মনুষ্যত্ব পর্যন্ত হরণ করিয়াছেন। মোট কথা, শ্রীকৃষ্ণকে রক্তমাংসের পুরা মানুষ বানাইবার জন্য কবিরাজরা মকরধ্বজের সহায়তা লইয়া একটু বাড়াবাড়িই করিয়াছেন।

পদকর্তারা প্রায় সকলেই পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধিকার সখীর অভিনয় করিয়াছেন। এই সখীভাবে সখ্য, দাস্য ও মধুর ভাব তিনই মিশ্রিত আছে। সখীদের প্রধান কাজ রাধাকৃষ্ণের পরিচর্যা। এই সেবাধর্মের সঙ্গে Anthropomorphic ভাব বিজড়িত আছে। আমাদের লৌকিক জীবনে যাহা যাহা প্রীতিকর, তাহা তাহা দিয়াই পরম প্রিয়ের সেবা বা উপাসনা করারই পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। বস্তুগত ভাবে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর উপচারের কথা নয়। জাতিগত, শ্রেণীগত বা গোষ্ঠিগত ভাবে যাহা মোদনীয় তাহাই হয় পরমপ্রিয়ের সেবার উপচার। মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর পূজা ও ভোগের উপচারের কথা—স্মরণ করিতে বলি।

দেবদাসীর নৃত্যগীত ও রাগানুকূল হাবভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য। আরাধ্য যেখানে প্রেমাকৃষ্ট কিশোর কিশোরী, সেখানে তাহাদের সেবা উপচারও তদুপযোগী। তরুণ রসবিদগ্ধ নাগরনাগরীর প্রেমলীলার উপচার যোগানোই সখীসজনীর কাজ। এইরূপ উপচার যোগাইতে গিয়া কবিদের রচনায় অজস্র কামকেলির উপকরণ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে কেহ মনে না করেন, কামকেলি বৈষ্ণবকবিদের পরম লভ্য বস্তু এবং তাহাই পরম প্রিয়কে উৎসর্গ করিয়াছে তাঁহারা। কামকেলি লভ্য বস্তু কবিদের সখীর ভূমিকায়—বাস্তবজীবনে নয়। জীবনে তাঁহারা কামকেলি হয়ত একেবারেই বর্জন করিয়াছিলেন—প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য হইবে বলিয়াই সখীর ভূমিকায় সম্ভোগের উপচার যোগাইয়াছেন। এদেশে প্রথা আছে যে বস্তু ইষ্টদেবতাকে (যেমন জগন্নাথকে) উৎসর্গ করা হয়—তাহা ভক্ত নিজে আর উপভোগ করেন না। সাধক কবিদের সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন প্রাকৃত জনকে লীলাধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদের রুচির অনুগত

কাম-লীলার বর্ণনা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে উপস্থস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনে রাধাবিরহই পরিপূর্ণ-ভাবে বিলসিত হইয়াছিল। এই রাধাবিরহই পদাবলীর সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। রাধাবিরহের পদাবলীর দ্বারা ভোগাসক্ত লোকদের লীলাধর্মে দীক্ষা দেওয়া যায় না। সম্ভোগলীলার সাহায্যে তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া শেষে বিরহরসের রসিক করিয়া তোলাই সম্ভোগের পদকর্তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

যাহারা মাংসভোজনলুব্ধ তাহাদিগকে প্রাচীন মনীষীরা বলিয়াছিলেন "মাংস খাইবে খাও, দেবতার কাছে বলি দিয়া কিংবা দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাও।"

অশুচি আমিষও তাহাতে শুচি হইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর কামকেলি বর্ণনা কি সেইভাবে পরিকল্পিত? কবির হয়ত বলিবেন—সাহিত্যের মারফতে শুধু কাম কেলির কথাইত তোমরা শুনিতে চাও? তাহাই যদি উপভোগ করিতে চাও, তবে রাধা কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া উপভোগ কর। পদকর্তারা তোমাদেরই ভোগ্যবস্তু রাধাকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিয়াছেন। রাধার উরোজযুগল কনক-শম্ভুত্ব লাভ করিয়া যেমন বিল্বপত্রবাসিত হইয়াছে, তাহার সম্ভোগ-লীলা তেমনি হরিচরণে নিবেদিত হইয়া তুলসীপত্র বাসিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'পদাবলীর ব্রজলীলা মদন-মহোৎসব।' মদনমোহনের মহোৎসব কেন যে মদন মহোৎসবে পরিণত হইয়াছিল তাহা সংস্কারমুক্ত মনে ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মনে রাখিতে হইবে যিনি এই রসের প্রধান স্রষ্টা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি সন্ন্যাসী, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বিষয়-বিরক্ত মহাপুরুষ। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস অসামান্য প্রেরণার অধিকারী। ইঁহারা কোন ষড়্‌যন্ত্র করিয়া লোকের রুচিকে পীড়া দিবেন এবং জন্মার্জিত সংস্কারের মূলচ্ছেদন করিবেন, এমনত মনে হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ সম্ভোগাংশের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই—কিন্তু ইহার জন্য পদাবলীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্মল নয় • • বৈষ্ণবকাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণরাধার প্রেমসৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে। তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে এসকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না—সমগ্রের প্রভাবে ইহার ঘৃণনীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণবকাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেকস্থলে স্খলিত হইয়াছে। তথাপি সমগ্র পদাবলীপাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর ও উন্নত ভাবের সৃষ্টি হয় না, সে হয় সমস্তটা ভাল করিয়া পড়ে নাই, নয়ত সে কাব্যরসের রসিকই নয়।"

কেবল ব্রজবুলি ভাষার দ্বারা নয়, প্রভূত আলঙ্কারিকতার দ্বারা কবিরা সম্ভোগাংশের রুচিবিগর্হিত ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন—এবং তদ্দ্বারা ঐ অংশের পদগুলিকে রসসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া কেবলমাত্র বিদগ্ধজনেরই উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন,—সাধারণের ঐ গুলিতে প্রবেশাধিকার নাই। কলাসরস্বতীর পাদমূলে রতিদেবী দাসীর আসনটুকু পাইয়াছেন। তাঁহার মরালের শ্বেত পক্ষবিস্তারে রাগোৎফুল্লকণ্ঠ কপোত-কপোতীর কলকেলি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

বৃন্দাবনের সম্ভোগলীলা চিরবিচ্ছেদের আগে আদি কবি বর্ণিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের প্রণয়কেলিরই মত। বিচ্ছেদকারুণ্যের গভীরতার আভাস দিবার জন্য মিলন-নিবিড়তার অবতারণা। ক্রৌঞ্চীর করুণ আর্তনাদে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে তাহার ক্ষণিক সম্ভোগের স্মৃতি।

স্বপ্ন-বিলাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সকাল বেলা। স্বর্গলোকে মস্ত বড় কটকওয়ালা বাড়িতে জনকয়েক নরনারী প্রবেশ করলো। ভুবন চৌধুরী, পিছনে অন্নদা, তার পিছনে নোটিশ এবং সব শেষে নরেন। বাড়িটা আশু গুপ্তের। ওরা একটা দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

সকলে। আশুবাবু! আশুবাবু আছেন?

আশু। (নেপথ্যে) কে?

সকলে। আমরা।

(নেপথ্যে) আমরা কে?

(অসহিষ্ণুভাবে) দেখুন না দরজা খুলে।

[আরও জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ]

আশু। (কণ্ঠস্বর আরও কাছে) আঃ। আঃ। ভেঙে ফেলবে না কি হে? জানোই তো পুরোনো বাড়ি! যাচ্ছি। (দরজা খোলার শব্দ) এসো! বোসো।

ভুবন। আমাদের চিনতে পারছেন আশুবাবু? খুব সরু দরের মধ্যে নিয়ে এসে তো বসালেন! চেনা মুখ মনে হচ্ছে?

আশু। ন্ না। মানে, আর একটু পরিষ্কার করে বলুন। মনে হচ্ছে যেন দেখেছি কোথাও। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না। আপনার কি?

ভুবন। আজ্ঞে না। আমার আমি জীবনে কখনও যাই নি। একবার গয়া গিয়েছিলাম বটে পিণ্ড দিতে। আমি হাতীপোতার জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবন চৌধুরী।

আশু। বাঃ! বাঃ! ভালো আছেন?

[তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল চিনতে পারেন নি

অন্নদা। তথাপি পরিচয়টা খুব স্পষ্ট হোল বলে মনে হচ্ছে না, না চৌধুরী মশাই?

আশু। (ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। কি জানেন, নাম আমার ভালো মনে থাকে না।

অন্নদা। দেবদাসের যে পার্বতী, তাঁর স্বামী উনি।

আশু। (সোল্লাসে) হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইবারে চিনতে পেরেছি, খুব চিনতে পেরেছি। নমস্কার, নমস্কার! আর আপনি?

অন্নদা। আমি অন্নদা।

আশু। (ব্যস্তভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গলে'র

ভুবন। (বাধা দিয়ে) আপনার শাস্ত্রজ্ঞান অপরিসীম গুপ্ত মশাই। কিন্তু ইনি দুর্ভাগ্যক্রমে সে অন্নদা নন, তাহ'লে এতক্ষণে আপনার খাট-পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল থেকে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত সোনা হয়ে যেত।

আশু। বেঁচে যেতাম! তাহ'লে ইনি কোন অন্নদা?

ভুবন। যিনি বিদ্যাসুন্দরকে মানুষ করেছিলেন। তাঁদের বাড়ির

অন্নদা। কি

আশু। না, না, কি বলেন কেন? ওঁরা তো আপনাকে খুবই মান্য করতেন। দ্বিজদাস তো মায়ের মতোই দেখতেন। আর এ দু'টি ছেলে মেয়ে?

অন্নদা। এ টি নরেন। চিনতে পারছেন না?

[নেপথ্যে :

এলোকেশী। আমার নরেন্দ্রনাথ কি কেবল পড়া-শুনাতেই ভালো, ও এমনি থিয়েটারের এ্যাক্টো করে যে, লোকে শুনে আর চোখের জল রাখতে পারে না। সেই সীতা সেজে কি রকমটি ক'রে বলেছিলি, একবার শুনিয়ে দাও তো বাবা!

নরেন। প্রাণেশ্বর! কি কুক্ষণে দাসী তব.....

বিন্দু। ওরে থাম, থাম, চুপ কর্। বউঠাকুর ওপরে আছেন।

নরেন। আচ্ছা, তবে থাক। আমি বাজাতেও পারি। ত্রেকেটে তাকে বাজনা বড় শক্ত মামী, আচ্ছা ওই পেতলের হাঁড়িটা একবার দাও তো দেখিয়ে দিই।]

আশু। (অট্টহাস্য ক'রে) হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! আর এই মেয়েটি?

অন্নদা। ওর নাম মোহিনী। বিরাজের ছোট জা। মনে নেই বিরাজের কথা:

[নেপথ্যে:

বিরাজ। আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোট বৌ, শুধু তোমাকেই এতদিন চিনতে পারিনি। কিন্তু তোমাকে তো মরণকালে কোনো জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েছেন। যাও—রাত হ'ল শোওগে বোন।]

আশু। (শান্ত, স্নিগ্ধকণ্ঠে) হাঁ। মনে পড়েছে। দেখি, তোমাকে দেখি, মাথার কাপড় সরাও তো মা। জানো অন্নদা, অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু আমার এই মা'টিকে দেখবার লোভ যে কত ছিল, সে আর বলবার নয়। ঠিক! যতবার তোমার কথা ভেবেছি, এমনি একটি যুঁই ফুলের মতো মিষ্টি মেয়েই আমার কল্পনায় ফুটে উঠেছে। (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন) তা, এতগুলি প্রাণী হঠাৎ এই সকালে এসে আমাকে আক্রমণ করলেন! ব্যাপারটা কি? চৌধুরী মশাই, আপনি সকলের বড়। আপনিই এই প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র হোন। বলুন, কি ব্যাপার?

ভুবন। আজ্ঞে না। সে যোগ্যতা আমার নেই। হাতীপোতার প্রকাণ্ড জমিদার আমি। লোকবল, অর্থ-বল কিছুরই অভাব ছিল না সত্যি। কিন্তু পার্বতীকে বিয়ে করার পর থেকে মুখ তুলে আর চলতে পারিনি। আজও মুখ নিচু করেই চলি, যদিও অপরাধ কোথায় তা আজও ঠিক করতে পারিনি। সুতরাং আমার নিজের কথাটাই বলব। ওঁদের কথা ওরা নিজেরাই বলতে পারবেন। সেই ভালো নয়?

আশু। বেশ। তাই বলুন।

ভুবন। (গলা ঝেড়ে নিয়ে) শরৎ-সাহিত্যে আমরা এই ক'জন নিতান্তই 'সি' টিমের খেলোয়াড়, নয় কি?

আশু। (বিব্রতভাবে) তা বলতে পারেন।

ভুবন। (ঈষৎ উত্তেজিতভাবে) কিন্তু কেন এমন হলো বলতে পারেন? আমরা কি 'এ' টিমে খেলতে পারতাম না? আমার নিজের কথাই বলি। পার্বতী নিজেই দেবদাসের কাছে স্বীকার করেছে:

[নেপথ্যে:

পার্বতী। হাঁ, সত্যিই বলছি। তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নেই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনিও ধনবান, বুদ্ধিমান, শান্ত এবং স্থির। তিনি ধার্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তোমার মতো একজন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দান্ত লোকের হাতে আমাকে তাঁরা কিছুতে দেবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

ভুবন। শুনলেন? হয়তো বলবেন এ তার রাগের কথা। সত্যিকার মনের কথা নয়। হবে হয়তো। "শুভ-দৃষ্টির সময় সে কটমট করে চেয়ে রইল,—ওষ্ঠের কোণে হাসির রেখা। আমি ছেলেমানুষের মতো দৃষ্টি অবনত করলাম।" (পাড়ার মেয়েরা খিল খিল করে হেসে উঠল।) সত্যি। কিন্তু তারপরে

[নেপথ্যে:

ভুবন। তা তুমিই হোলে বাড়ির গিন্নি, সব দেখে শুনে, বুঝে প'ড়ে নিজেই নিও—

পার্বতী। আচ্ছা।

ভুবন। আর দেখ, তা এই ছেলেমেয়েরা, হাঁ তা এরা তোমারই সব—। হাঁ আর এই দেখ

এই মহেন তোমার বড় ছেলে, সেদিন বি. এ. পাশ করেছে—এমন ভালো ছেলে, এমন শান্ত-শিষ্ট, কি জান, একটু যত্ন আত্মীয়তা—

পার্বতী। (হাসি চেপে) আমি জানি সে আমার বড় ছেলে।

ভুবন। আর আমার যশোমতী—

পার্বতী। তোমাকে ভাবতে হবেনা। যশোকে আনবার জন্ত আমি লোক পাঠাব—না হয় মহেন নিজেই যাবে।

যাবে? যাবে? তোমার ভালো হবে। আমি আশীর্বাদ করচি—তুমি সুখী হবে—ভগবান তোমাকে দীর্ঘায়ু করবেন।

এ তো আমার রাগের কথা নয়। কতদিন অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে:

[নেপথ্যে:

ভুবন। আহা, ভালো করিনি—

পার্বতী। কি ভালো করিনি গো?

ভুবন। ভাবচি—এখানে তোমাকে সাজে না।

পার্বতী! (হেসে উঠে) খুব সাজে। আমাদের আবার সাজাসাজি কি? তুমি বুড়ো হলে আমিও গিন্নীপনার বুড়ো হয়ে যাবো। মেয়েমানুষের বুড়ো হতে কি বেশী দেরী হয় গা?

ভুবন। (আনন্দ গদগদ কণ্ঠে) তুমি আমাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েছ। বেঁচে থাক, সুখে থাক।

পার্বতী। সে আবার কি?

ভুবন। কি, তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। নারায়ণ! কত লজ্জা, কত আত্মগ্লানি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিলে!

ভুবন। একেও কি মিথ্যে বললেন আশুবাবু?

আশু। না। কিন্তু শেষটায়:

ভুবন। হাঁ। শেষটায়

[নেপথ্যে:

পার্বতী। (দূরে) তুমি কি আমাকে সত্যি পাগল পেলে? পথ ছাড়।

ভুবন। যায় কে?

মহেন। ছোট মা।

ভুবন। সে কি? কোথায় যায়?

মহেন্দ্র। দেবদাসকে দেখতে।

ভুবন। (চিৎকার করে) তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি, ধর ধর—ধ'রে আনো ওকে। পাগল হয়েছে। ও মহেন, ও কপে বৌ!

ভুবন। আপনি কি মনে করেন,—আমি হাতী-পোতার জমিদার, বয়স চল্লিশ পার হয়েছে, কিছুই বুঝিনি আমি? সেই কথাই বলতে এসেছি। আমাদের দেশের, এবং অন্ত যে-কোনো দেশের সাহিত্যে আমি নায়ক হতে পারতাম। এ কি আপনি মনে করেন না আশুবাবু?

আশু। করি চৌধুরী মশাই।

ভুবন। অথচ শরৎ-সাহিত্যে আমি 'সি' টিমের খেলোয়াড়ের উপরে আর উঠলাম না। এই অন্নদা—

অন্নদা। আমার কথা নাই তুললেন চৌধুরী মশাই। আমার নিজের কাছেও সেই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

[নেপথ্যে:

"দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মতো, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্ধনা সংকোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অন্নদা। দিদি, আপনার জন্তেই দাঁড়িয়ে আছি। চলুন স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই।

আশু। (ব্যস্তভাবে) ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। ও তোমার বিনয় মাত্র। বন্ধনারও সে কথা বুঝতে দেরি হয় নি:

[নেপথ্যে:

গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বন্ধনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল:

বিজুবাবুর তুমি দিদি, তাঁকে মানুষ করেছ। এই

আংটিটি তোমার বৌমাকে দিও অন্নদিদি,—সে যেন পরে।

আশু। তুমি আশ্চর্য মেয়ে অন্নদা, তুমি চমৎকার!

ভুবন। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে ও কোথায় পড়ে রইল আশুবাবু! ও কি কারও চোখে পড়ে? অথচ কত বড় সম্ভাবনাই না ওর ছিল!

আশু। বলেন কি চৌধুরী মশাই, চোখে পড়ে না? যত বড় করেই চোখে পড়ে। মনে করুন তো শেষের দিকের সেই দৃশ্যটা। সতী-বিপ্রদাসের বিবাহের দিনের দৃশ্য: "সতীকে জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে বন্দনা তার পায়ে আলতা পরিয়ে দিচ্ছিল। এই মঙ্গলাচারটুকু অন্নদাই তাকে শিখিয়ে নিজে আত্মগোপন করেছে। তার চোখ রাঙা, অবিরত অশ্রুবর্ষণে চোখের পাতা ফুলেছে। বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বললে:

[নেপথ্যে:

অন্নদা। বৌকে মুখ দেখাতে আমি পারব না।

বন্দনা। তুমি পারবে না কেন অন্নদি, তোমার লজ্জা কিসের?

অন্নদা। আমার লজ্জা এই জন্যে যে, এর আগে মরিনি কেন? শুধু বিনুকেই তো মানুষ করিনি বন্দনাদি, বিপিনকেও মানুষ করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল, কা'র হাতে দিয়ে গিয়েছিল দু'মাসে ছেলেকে? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন দয়াময়ী? কোথায় ছিল তার মেয়ে-জামাই?

আশু। এ কি ভোলবার কথা? প্রথম যেদিন ওঁকে দেখলাম, অকারণ দীনতায় নম্র দাসী-মূর্তি, সংকোচ-কুণ্ঠিত। কিন্তু দেখতে দেখতে অন্নদা তাঁর নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তেমনি নম্র, তেমনি কুণ্ঠিত, তবু মহিমান্বিত।

ভুবন। ঠিক। কিন্তু তবু অন্নদা সামান্য একটা পার্শ্ব-চরিত্র মাত্র। ছোট তার ভূমিকা। আবার প্রশ্ন, এই অন্নদাই কি নায়িকা হবার যোগ্যতা রাখেন না?

আশু। রাখেন।

ভুবন। অথচ পার্শ্ব-চরিত্রেই রয়ে গেলেন। তারপর এই মোহিনী। শরৎবাবু একে নিয়ে এসে বসালেন বিরাজ-বৌএর একপর মধ্যাহ্ন-দীঘির পাশে। সূর্যের পাশে চাঁদের সমস্ত স্নিগ্ধতা ম্লান হয়ে গেল। কারও চোখে পড়লো, কারও বা পড়লো না।

আশু। গোড়ায় তাই বটে, কিন্তু শেষের দিকে? মনে করুন তো! পুঁটু নীলাম্বরকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাবে। মোহিনীর যাওয়ার কোনো আয়োজন নেই দেখে নীলাম্বর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে:

[নেপথ্যে:

নীলাম্বর। তুমি যাবে না মা?

মোহিনী। না।

নীলাম্বর। সে হবে না মা। তুমি একলাটি কেমন ক'রে থাকবে, আর গেকেই বা কি হবে মা? চল।

মোহিনী। না বাবা, আমি কোথাও যেতে পারব না।

নীলাম্বর। কেন কোথাও যেতে পারবে না মা?

মোহিনী। নিরুত্তর।

নীলাম্বর। না বললে তো আমার যাওয়া হবে না মা।

মোহিনী। আপনি যান, আমি থাকি।

নীলাম্বর। কেন?

মোহিনী। কখনও যদি দিদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা।

নীলাম্বর। বল কি?

মোহিনী। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি, আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোনো মতেই নিষ্ফল হতে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাকব—আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা।

পুঁটু। কখনও তোমাকে চিনতে পারিনি বৌদি, আমাকে মাপ কর।

আশু। শুধু বিরাজ-বৌই নয় চৌধুরী মশাই, পুঁটুও তাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু পরিচয় একদিন সবাই পেলে। ফুল ঢাকা থাকে, কিন্তু গন্ধ তো ঢাকা থাকে না।

ভুবন। কিন্তু ফুল ভালোবাসি শুধু গন্ধের জন্যেই তো নয় আশুবাবু, তার রূপও আছে যে! তাও চোখে পড়া চাই। নইলে মন মানবে কেন?

আশু। তা বটে!

ভুবন। গোড়ায় রাজি হইনি সত্যি আশুবাবু, কিন্তু দেখছি এই প্রতিনিধিদলের মুখপাত্রের কাজটা বেশ খানিক আমিই করলাম। অমলা কথা কম মোহিনীও তাই। শুধু নরেন, তা সে একটু বোধ হয় বেশিই কথা বলে। কেন যে এতক্ষণ চুপ করে রয়েছে ওই জানে।

আপনাদের কথা শুনছি।

ভুবন। তাই শোনো। কিন্তু শুধু শুধু চুপ করে কথা শোনবার ছেলে তো তুমি নও বাবা। তাই আবার চঞ্চলিলাম। তা সে যাই হোক, ওর কথাটাও ভাবুন। অমূল্য ওকে ঠেকে রাখলে। সে একে ভালো ছেলে, তার ওপর বিশু তাকে বাঘিনীর মতো আগলে রেখেছে, কখন নরেন ওকে খারাপ করে ফেলে।

আশু। কিছু কিছু নমুনা কি তার পাওয়াও যায়নি?

ভুবন। গেছে। ওর দশ আনা, চার আনা, দু' আনা চুল ছাঁটার সখ দেখা গেছে, পকেটে পোড়া সিগারেট পাওয়া গেছে। এ সব দেখা গেছে।

আশু। তবে?

ভুবন। কী তবে? দশ আনা দু' আনা চুল কি আর কোনো ছেলে কাটে না? না, বিড়ি-সিগারেট খায় না? দেবদাস-গতীশ কি খুব সচ্চরিত্র ছিল? তাতে কি তাদের নায়ক হতে বেধেছে?

আশু। তা বাধেনি অবশ্য।

ভুবন। তা ছাড়া, ওর অন্য দিক কি নেই? শুনুন বিশু আর নরেনের কথা:

[নেপথ্যে:

বিশু। হ্যাঁ নরেন, এই তো ইস্কুলে যাবার সোজা পথ। তবে অমূল্য এদিক দিয়ে আর যায় না কেন? নরেন নিরুত্তর।

বিশু। বেশ তো রে। আমি জানি তুই অমূল্যকে ভালবাসিস। তোরা দুটি ভাই গল্প করতে করতে যাবি আসবি, সেই তো ভালো।

নরেন। (চুপি চুপি) সে আর লজ্জায় যায় না মাসী, ওই ঘোষা দিয়ে ঘুরে যায়।

বিশু। তার আবার লজ্জা কিসের রে? না না তুই বলিস তাকে, সে যেন এই পথেই যায়।

নরেন। কক্ষণো যাবে না মামী! কেন যাবে না জান?

বিশু। কেন?

নরেন। তুমি রাগ করবে না?

বিশু। না।

নরেন। তাদের বাড়িতে বলে পাঠাবে না?

বিশু। না।

নরেন। আমার মাকেও বলে দেবে না?

বিশু। (অধীরভাবে) না রে না, বল্ আমি কাউকে কিছু বলবো না।

নরেন। (ফিস ফিস করে) থার্ড মাষ্টার অমূল্যর আচ্ছা করে কান মলে দিয়েছিল।

বিশু। (রুদ্ধকণ্ঠে) কেন দিলে? গায়ে হাত দিতে আমি মানা করে দিয়েছি না?

নরেন। তার দোষ কি মামী, সে নতুন লোক। আমাদের চাকর এই ছেবো শালাই বজ্জাত, সে এসে মাকে বলেচে। আমার মা'টিও কম বজ্জাত নয় মামী, সে মাষ্টারকে বলে দিতে থার্ড মাষ্টার অমনি বলেছে, আচ্ছাসে কান ম'লে দিয়েছে—কি রকম করে জান মাসী—এই রকম করে ধরে—

বিন্দু। হেরো কি বলে দিয়েছে ?

নরেন। কি জান মামী, হেরো টিফিনের সময় আমার খাবার নিয়ে যায় তো, অমূল্য ছুটে গিয়ে বলে, কি খাবার দেছি নরেনদা ? মা শুনে বলে, অমূল্য নজর দেয়।

বিন্দু। অমূল্যর খাবার কেউ নিয়ে যায় না ?

নরেন। কোথায় পাবে মামী, তারা গরীব মানুষ ; সে পকেটে করে দু'টি ছোলা-ভাজা নিয়ে যায় তাই টিফিনের সময় ওদিকের গাছতলায় লুকিয়ে বসে খায়।

ভুবন। এর মধ্যে আর এক নরেনকে পাওয়া যায় না ? রসের বিচারে তার মূল্য কি অমূল্যর চেয়ে কম ?

আশু। তারই জন্যে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বিন্দু বলেছিল :

[নেপথ্যে :

বিন্দু। আমার সমস্ত অমূল্যর। শুধু হাজার দুই টাকা নরেনকে দিও। আর তাকে পড়িয়ো। সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে।

ভুবন। (ব্যঙ্গভরে) বাঃ ! চমৎকার ! বিন্দু সকরুণা-ময়ী ! দু'হাজার টাকায় নরেনের মূল্য সে স্থির করে ফেললে। তার কাছে মানুষের মূল্য কে অমূল্যকে কত-খানি ভালোবাসে, তাই নিয়ে। মানুষের যেন আর কোনো সত্তা নেই !

আশু। [হো হো করে হেসে] ও পাগলী মায়ের কাছে তাই বটে। অমূল্যই ওর সমস্ত জগৎ,—ওর ইহকাল, ওর পরকাল। তাকে কে কতখানি ভালোবাসে, কে তার কতটা কল্যাণকামী, তাই দিয়েই ওর কাছে মানুষের বিচার। কিন্তু ওই মাপকাঠিতে আমরাও তো নরেনকে বিচার করেছি চৌধুরী মশাই। তার মধ্যে নারকের সম্ভাবনা যেটুকু দেখা যায়, সেও তো ওই ঘটনা থেকেই। তা ছাড়া আর কিছু আমাদের হাতে নেই ? আছে ?

ভুবন। তা অবশ্য নেই।

আশু। তবে ? (আবার তিনি উচ্চহাস্য করে উঠলেন।)

ভুবন। তবের কথা নয় আশুবাবু। যে অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসা সে হচ্ছে এই যে, আমাদের উপর শরৎবাবু অবিচার করেছেন। পার্বতী-দেবদাসের ভালবাসাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করতে গিয়ে তিনি আমার শান্ত, স্নিগ্ধ, অচঞ্চল প্রেমকে উপেক্ষা করেছেন।

আশু। কি করে, বুঝিয়ে দিন।

ভুবন। একটা সহজ প্রশ্ন করি : আমাদের বিবাহের ঠিক আগে যাঁদের দৃষ্টান্ত মনে করুন। দেবদাস কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। পার্বতীকে সে চায়। কিন্তু পার্বতী যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করলে তখন, "দেবদাসের বুকের ভিতরটা রাগে, অপমানে, অন্যুৎপাতের ন্যায় ভীষণ হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই সে ছিপের মোটা বাঁটটা সজোরে ঘুরিয়ে ধরে ভীষণকণ্ঠে বললে :

[নেপথ্যে :

দেবদাস। শোন পার্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়। (গলা একটু খাটো করে) দেখতে পাও না চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কালো তোমরা বসে থাকে ? এস, তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।

ভুবন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে সে পার্বতীর মাথায় আঘাত করলে এবং তার কপালের ওপর থেকে বাম ভ্রূর নিচে পর্যন্ত চিরে গেল। মনে পড়ে ?

আশু। পড়ে।

ভুবন। এইতেই এই। কল্পনা করুন, তার সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হয়েছে এবং তারই গৃহে বসে আমার জন্যে তার চোখে ঘুম নেই, কাজে মন নেই, মনে সুখ নেই। কি শাস্তি তার জন্যে পার্বতীকে তার হাতে পেতে হোত, অনুমান করতে পারেন ?

আশু। না, পারি না। মানুষ রাগে এটা বুঝি, কিন্তু রেগে হঠাৎ মারামারি করে কেন, এটা বরাবরই আমার কেমন গোলমাল লাগে। আমাকে মাপ করবেন চৌধুরী মশাই।

ভুবন। কিন্তু আমি জমিদার মানুষ, লাঠালাঠি আমার রক্তে রয়েছে। আমি অনুমান করতে পারি এবং অনুমান করতে গিয়ে পাছুর কথা ভেবে শিউরে উঠি। শরৎবাবু সেই দুর্ভাগ্য থেকে তাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আমি যে বাকি জীবনটা নিঃশব্দে শুধু সয়ে গেলাম, আমার উপর তিনি সুবিচার করেন নি।

আশু। কিন্তু আপনার সেই শান্ত সহিষ্ণু প্রেমকে তিনি তো উপেক্ষা করেননি চৌধুরী মশাই। কত জায়গায় তারও ছবি এঁকেছেন। কতবার বলেছেন,

এমনকি দেবদাসকে নিয়েও স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন। মনে পড়ে, "দেবদাস পার্বতীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলল :

[নেপথ্যে :

দেবদাস। তুমি ভালোই করেছ পার্বতী। আমার কাছে তুমি তো সুখ পেতে না, কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অকাল স্বর্গবাস ঘটতো।

ভুবন। (উত্তেজিত ভাবে) ও কিছু নয়, ও কিছু নয় আশুবাবু। ওইটেই শরৎবাবুর প্যাঁচ। সংসারের তিনি যাদুকর। কথার প্যাঁচে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তাঁর জুড়ি নেই।

[অন্নদা, মোহিনী এবং নরেন হো হো ক'রে হেসে উঠলো।]

তাহলে কি করা উচিত ছিল বা

এই অন্নদাকে বঙ্কনা ধন্বন্তরী সতীর চেয়ে করা।

অন্নদা। আর মোহিনীকে বিরাজের চেয়ে ছোট না করা।

মোহিনী। আর এই নরেনকে যাত্রাদলের চোকরার চেয়ে বড় করে আঁকা।

নরেন। আর চৌধুরী মশাইকে দেবদাসের চেয়ে ছোট না করা।

ভুবন। আসল কথা, আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে নামকের ভূমিকা দিয়ে পৃথক পৃথক আরও কতকগুলো বই লেখা। তাহ'লেই আমাদের উপর যথার্থ সুবিচার করা হোত।

আশু। ধীরে ধীরে) এই প্রশ্নের মীমাংসা করি এমন বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই চৌধুরী মশাই। এর জন্য যোগ্যতর লোক আছেন। তাঁদের কাছে যাওয়াই আপনাদের উচিত ছিল। আমি নিতান্তই অনধিকারী এবং অরসিক ব্যক্তি। তবু (একটু ভেবে) এটুকু আমার সহজ বুদ্ধিতেই মনে হয় যে, আপনাদের ওপর অথবা অন্য কোথাও অন্য কারো ওপর অবিচার তিনি করেন নি। কারও চেয়ে আপনাদের ছোটও তিনি করেন নি। প্রত্যেক চরিত্রের একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র আসন আছে। সেখানে আপনারা প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে

ভুবন। তবে ? থামলেন কেন, বলুন !

আশু। তবে নায়ক হিসাবে পৃথক বই লেখার কথা যা বললেন,

ভুবন। সেইটেই আসল কথা আশুবাবু। সেইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ। সেই জন্যেই, বলতে গেলে, আপনার কাছে আসা।

আশু। আমার কাছে আসা নিরর্থক চৌধুরী মশাই, আমি কি করতে পারি ? কিন্তু আপনাদের কথাগুলো ভাবছিলাম আপন মনে। যতই ভাবছি, ততই অবাক হচ্ছি।

ভুবন। অবাক হবারই কথা আশুবাবু। আমাদের ওপর যে অবিচার করা হয়েছে তা যে-কেউ ভেবে দেখবে সেই অবাক হবে।

ওরা তিনজন একসঙ্গে। সত্যি।

আশু। (হেসে) না, সেজন্য নয় যা সকল। অবাক হচ্ছি, শরৎবাবুর শক্তি দেখে।

মোহিনী। কিছু মনে করবেন না আশুবাবু। দিদির চেয়ে বড় হোতে আমি চাইনে। আমার কাছে দিদির চেয়ে বড় আর কেউ নেই। কিন্তু এই যে বললেন, শরৎ -বাবুর শক্তি দেখে, কিন্তু আমাদের উপেক্ষা করে যাওয়ার মধ্যে শক্তিটা কোথায় ?

আশু। আমার কথা শোনো না, উপেক্ষা তিনি তোমাদের করেন নি। সে কথা নয়। কিন্তু শক্তিটা কোথায় জানো, সাহিত্যের আকাশে নিতান্ত খেলাচ্ছলে তোমাদের মতো যে অনেকগুলি তারা তিনি ছিটিয়ে রেখে গেছেন, উজ্জ্বলতায় এগুলিও কারও চেয়ে সামান্য নয়। আমাদের যা তিনি দিয়ে গেছেন তার তুলনা নেই। তাঁর পরে যাঁরা আসছেন তাঁদের জন্যেও তিনি যে অস্ফুট, অর্ধস্ফুট তারাগুলি ফোটাবার জন্যে রেখে গেছেন তাও অসামান্য। বাংলার ভাবী-সাহিত্যে এর কতগুলি তাঁদের স্পর্শে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে, কে জানে ! তবে দেখবেন আমার কথা। সব শেষে আর একটি নিবেদন আছে।

সকলে। বলুন।

আশু। আজ দুপুরে আমার এখানে দুটি খেয়ে যেতে হবে। "মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস্, মেয়েদের জন্যে না হোক আমাদের পুরুষদের জন্যে দু'রকম খাওয়ার ব্যবস্থাই— অর্থাৎ কি না—প্রেজুডিস যদি না থাকে—বুঝলেন না ?

[আশুবাবুর অট্টহাস্য এবং ভুবন ও নরেনের সকলরব সমর্থন।

দেবীপক্ষ

রণজিৎ কুমার সেন

কৃষ্ণপক্ষ গিয়ে মহালয়ায় দেবীপক্ষ পড়লো। শরতের নির্মেঘ আকাশ সোণালী আভায় ভ'রে উঠলো। বাংলার ঘরে ঘরে পূজাচর্চা-কাল সমাগত।

শ্রীদুর্গা (উত্তর ভারত)

শ্রীদুর্গা (যবদ্বীপ)

ক নিয়ে পুজো, কাদের পুজো, কেন পুজো, টিবারও আমরা ভেবে দেখেছি ? দুর্গোৎসব র্গতদের দুর্গতিনাশের উৎসবারাধনা, না ত্তি-আয়োজনে ভূরিভোজীদের চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে দুর্গোৎসব সার্থক হবে, কাদের ার রাঙা চরণে মঙ্গীর বেজে উঠবে ? এ প্রশ্ন বোধ করি অনেকেই অবান্তর বলে মনে করবেন। পুজো তো হিন্দু মাত্রেরই। কিন্তু সেই বাঙালী হিন্দুর অবস্থা আজ কোন্ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে ? ব্যক্তিবিশেষের গৃহ-পুজো বা সম্প্রদায় বিশেষের বারোয়ারী পুজো ততক্ষণই সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারে না—যতক্ষণ দেশের কোটি কোটি নিরন্ন উপবাসী আত্মা পথে পথে অশ্রু বিসর্জন ক'রছে। বাঙালী হিন্দুর সেই অশ্রুর স্বাক্ষর আজ পথে পথে। পুজো তো সেই অসংখ্য মানব-আত্মাকে নিয়েই পুজো যে সেই নিরন্ন উপবাসী সন্তানদেরই, দুর্গতিনাশের

মন্ত্র দিয়েই যে দেবী-আরাধনার উদ্যোগ! অতএব কাকে দিয়ে পূজো, কাদের পূজো, কেন পূজো—একথা উপলব্ধি করা কঠিন নয়।

পূজানুষ্ঠানের অবশ্য আরও একটি তাৎপর্য আছে। মিলিত হবার এবং মেলাবার তাৎপর্য। প্রিয়-পরিজনকে এ সময়ে আমরা কাছে পাই, আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আনন্দ-বিনিময়ের একটা স্বাভাবিক সুযোগ ঘটে এ সময়ে: কতকটা তা ছুটির অবকাশে, কতকটা পূজোর নৈবেদ্যে। কিন্তু পূজোর মহৎ প্রয়াসের কাছে এ তাৎপর্য একেবারেই গৌণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালাই হৃদয়কে কোথাও মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়তে দেয় না। কে জ্বালাই আমাদের বাঙালী-জীবনে আজ সব চাইতে বড় জ্বালাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মিলনের আনন্দ তাই বিরহের পূরবী-রাগে মূর্ছিত।

অথচ ইতিমধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় লাল শালুতে ঘেরা কাপড়ের ছরফে বারোয়ারীর আক্ষেপিক ঘোমটা সমাপ্ত হয়েছে। চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে উপস্থিত হচ্ছেন পাড়ার প্রতিনিধিরা। পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী, কোথাও বা এক পাড়াতেই দুটো বারোয়ারী। সেখানে পূজোর চাইতে প্রতিযোগিতারই প্রাধান্য। মার মৃন্ময়ী স্বরূপকে নিয়ে মার সন্তানদের কতই না সমরসজ্জা। এর পিছনে কি ভক্তি নেই?

কিন্তু ভক্তির পরিণতি অনুষ্ঠান পর্যন্তই নয় কি? অনুষ্ঠানও তো বড় বড় মাইক বক্তৃতা, এ্যাম্প্লিফায়ারে সংযোজিত কয়েকখানি নির্দিষ্ট প্রণয়-সঙ্গীত তৎসহ একটি প্রদর্শনি, সেখানেও মাইকে ভলান্টিয়ারী তৎপরতা। বাঙালীর মা শঙ্করী ক্রমেই উদয়শঙ্করী (!) রূপ নিয়ে বাংলার রাজন-কাঠামোয় এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। তার জন্য কুমোরের চাইতে মোটা অর্থ দিতে বাধে না, ষষ্ঠী থেকে দশহারা পর্যন্ত মাইক খরচা মেটাতে কার্পণ্য নেই, অনুষ্ঠানের সর্বদিক রক্ষা ক'রে দেখা গেল—শেষপর্যন্ত সামান্য চাল-কলাটুকুও জুটলো না অনেকের। মায়ের ভোগ হয়ত যুগ্মানি ব্রাহ্মণের ঘরে কিছু গেল, তাছাড়া ভোগ নিয়ে শেষপর্যন্ত দুর্ভোগেরই সৃষ্টি।

এই দুর্ভোগই চারপাশে। পূজোতেও সেই দুর্ভোগ। পূজোর মহৎ উদ্যোক্তা যিনি, তিনিই কি অতঃপর মনে মনে উচ্চারণ করেন না—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' মা তো ছেড়েই আছেন, মাকে অদৃষ্টের সঙ্গে যুক্ত করতে পারছি কোথায়? সারা বছরের কান্না নিয়ে তাই তো অন্ততঃ কয়েকটা দিনও আনন্দের প্রত্যাশা। কিন্তু আনন্দকে ধরতে পারা যায় কোথায়? যাঁদের মাথার এ্যাম্প্লিফায়ার বাঁধতে বাঁধতেই যে বেলা ফুরিয়ে আসে, মাইকে ভলান্টিয়ারী করতে গিয়ে যে শেষপর্যন্ত মায়ের সেই এত ঘটার মৃন্ময়ী স্বরূপটাও চোখে আড়াল পড়ে যায়, প্রদর্শনীর মাচা বাঁধতে গিয়ে মাতৃ-দর্শন আর অদৃষ্টে ঘটেনা; ঘরে যদি মা বাড়াভাত নিয়েও ব'সে থাকেন, তা বিরক্তিকর ব'লেই মনে হয়। অর্থাৎ—অসুস্থতা এবং অস্থির-চিত্ততা। এই অস্থিরতা আনন্দকে পাবারই অস্থিরতা; মা যে আনন্দময়ী, তাঁর আসন রচনার তাই এত ঘটা, তাঁর আসর রচনা কি নৈঃশব্দের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'তে পারে? অথচ মন্ত্রে যে ফাঁক থেকে যায়, ধ্যানে যে চিত্ত জাগে না—সেদিকে লক্ষ্য নেই কারুর।

কিন্তু ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের সেদিকে লক্ষ্য ছিল। অনুষ্ঠানকে বর্জন ক'রে মাকে তাই সে দর্শন করতে পেরেছিল। কমলাকান্তের দিব্যচোখে ভেসে উঠেছিল—মা কি ছিলেন, মা কি হ'য়েছেন, মা কি হবেন! কাল-সমুদ্রে মাতৃ সন্ধানে নেমে বিকীর্ণ লোহিতোজ্জ্বল আলোকে কমলাকান্ত চিনতে পারলো—'এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে-নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজা—দশদিক—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে—নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না আজি দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপ

শ্রীদুর্গা (বাংলা-দেশ)

শ্রীদুর্গা (ভুবনেশ্বর)

শ্রীদুর্গা (নেপাল)

শ্রীদুর্গা (মহাবলিপুরম)

কার্তিকের, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।'

কিন্তু এ যুগের কমলাকান্তের মাতৃদর্শনের সে নিষ্ঠাও যেমন নেই, মাও তেমনি নানা ভাগে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছেন। বঙ্গপ্রতিমা বঙ্গজননী বাংলাদেশ আজ শতধা বিভক্ত। অন্নবস্ত্র মিলিয়ে নানাদিকে আজ সমস্যা ভারী হ'য়ে উঠেছে। বাংলার ছেলেমেয়ে বাংলার মাটিতেই আজ শরণার্থী। নিজ গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আজ যদি কেউ ঢাকের বাদ্যে কর্ণকুহর বিদীর্ণ করে, অথবা বারোয়ারীর আলোয়ারীতে যদি কোনো কোকিলকণ্ঠ কূজন করে, তবে তা কি পেচকের রবের মতই কর্কশ শোনাবে না? দুঃসহ দিনের কালস্রোত আর কাকে বলে? অনন্নরত্ন-ভূষিতা জননী জন্মভূমি আজ কালগর্ভে নিহিতা। যতকিছু আয়োজন অনুষ্ঠান, তা উৎসবের উৎসাহের মধ্যেই অবসিত, মাটি দিয়ে মাতৃরূপকে যতই খাঁটি ক'রতে চাই, ফাঁকি এসে আশ্রয় নিচ্ছে তার পুরোভাগে। দুর্গত দুঃখের জননী, তাঁর আবির্ভাব কি সত্যিই সার্থক হ'তে পারে প্রাচুর্যের মধ্যে? প্রদর্শনী আর এ্যাম্‌প্লিফায়ারের চিৎকারে কর্ণকর্কে মা নেপথ্যচারণা করেন। লজ্জায় তাই তিনি দন্তসংক্ষিতে জিহ্বা কামড়ে মহাকালীর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। শান্ত রূপের পরিবর্তে মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি রুদ্ররূপে। অন্যায়, অবিচার আর বাহুল্যে যেখানে দারা দেশ আচ্ছন্ন, বিভীষিকা রূপ সেখানে মার, লজ্জায় নিজের দাঁতে নিজের জিহ্বা কামড়াচ্ছেন মা। কোটি কোটি সন্তান তাঁর গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন; ক্ষণবৃত্তি উৎসবের আতিশয্য দেখে মা সেখানে লজ্জিতা হবেন ভিন্ন কি? মায়ের ভুবনমোহিনী রূপ দেখ্‌বার জন্য কি একবারও আমরা কমলাকান্তের মতো ব'লতে পেরেছি—'উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব, উঠ মা!'

কমলাকান্তের মতো এমন আকুলকণ্ঠে ডাকতে পারলে আজ কি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির এমন বিভক্ত বিভীষিকারূপ দেখ্‌তে হ'তো? আজও পূজামণ্ডপে কোথাও সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই, আজও উৎসবে সকলকে মেলাতে পারছিনা আমরা, আজও ভ্রাতৃ-বৎসল হ'য়ে দেশের আপামর ভাইবোনকে একত্র ক'রতে পারছিনা মায়ের অঙ্গনে। এখনও জনে জনে পার্থক্য, মনে মনে বিরোধ। পরের মঙ্গল সাধনের প্রবৃত্তি কবেই তো অন্তর্হিত হ'য়েছে আমাদের জাতীয় চরিত্র থেকে! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মোহে প'ড়ে আমরা বিবেকবুদ্ধিহীন হ'য়ে আজ খাঁটি ছেড়ে মেকীর আশ্রয় নিয়েছি। না পারছি তাই নিজেদের রক্ষা ক'রতে না পারছি মায়ের মুখ রাখ্‌তে।

পূজো অর্থে আজ অনুষ্ঠানই বিশেষতঃ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে অর্থ মাইক আর এ্যাম্‌প্লিফায়ারে নিঃশেষ হয়, সে অর্থ যদি দুর্গতদের সেবায় নিয়োজিত হ'তো, তবে কি অনুষ্ঠাতাদের সংবেদনশীল চিত্ত অন্ততঃ কিছুটাও আশ্বস্ত হ'তো না? এক কলকাতার বারোয়ারী অনুষ্ঠানগুলোকে মেলালেই লক্ষাধিক অর্থের হিসেব মিলবে। দেশের কোন্ দুর্গতের সেবায় তার একটি পয়সাও ব্যয় হয়? লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ হতভাগা অশ্রুসিক্ত ভাইবোনকে বঞ্চিত ক'রে কোনো পূজো কি সত্যিই আনন্দমুখর হ'য়ে উঠ্‌তে পারে? বঞ্চনা সেই-খানেই—যেখানে তাদের পেটে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই। ক্যাম্পে, স্কুটপাতে, প্লাটফর্মে, জীর্ণ কলোনীর ভাঙা বস্তিতে বস্তিতে, কুষিপল্লী আর শ্রমজীবীদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে র'য়েছে তারা। তারাও বাঙালী, বাঙালী হিন্দু, জন্মগত অধিকারে বাংলাদেশ তাদেরও দেশ। তাদের যদি একত্রে এনে পূজোর আনন্দে না মেলানো গেল, তবে জাতীয় কর্তব্য হিসেবে আমরা দেশের কতটুকু কি ক'রলাম?

'ডিভাইড্ এ্যাণ্ড রুলের' কড়া শাসনে এতকাল ইংরেজ এদেশকে পায়ের নিচে লাবিয়ে রেখেছিল।

আজ পরশাসনমুক্ত হ'য়ে দেশ স্বাধীন হ'য়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশের মানুষ এখনও দেশের স্বাধীন নাগরিক হ'তে পারেনি। 'স্বাধীনতা' একটা শব্দমাত্র নয়, এর দায়িত্ব অনেকখানি। পুজো-পার্বণের মধ্য দিয়েও সে দায়িত্ব পালনের অবকাশ কমখানি নেই। রবিন্দ্রনাথের কমলাকান্ত চক্রবর্তী একদিন জনসাধারণের সামনে এই মন্ত্রই তুলে ধ'রে ব'লেছিল: 'উঠ মা, এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব; উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব, উঠ মা।' কিন্তু সত্যিই কি মায়ের সুসন্তান হ'য়ে পরের মঙ্গল সাধনায় ভ্রাতৃবৎসল হ'য়ে আমরা আজও দাঁড়াতে পেরেছি? বড় জোর এক সন্ধ্যা কাঙালী-ভোজনের ব্যবস্থা ক'রে আমরা আত্মচরিতার্থতা বোধ ক'রে থাকি। তাতে না ভরে কাঙালের পেট, না ভরে আমাদের চিত্ত। এই চিত্তবিকৃতিই আজ আমাদের সম্পদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পুজো অর্থে অনুষ্ঠানের আধিক্য, সেবা অর্থে লোক দেখানো তাদের ছটা আর ধর্ম অর্থে বাহ্যাড়ম্বরের প্রাচুর্য আমাদের জাতীয় জীবনের চরিত্রকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

এ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃত সংবেদনশীল মানুষ হ'য়ে না দাঁড়াতে পারলে আমাদের কল্যাণ নেই। মন্বন্তরের তরঙ্গবিক্ষেপে বিশ্ব সংসার আজ সমাচ্ছন্ন। সেই প্রলয়-বারিধিতে মা নিমজ্জিতা। কাঠামোর খড় মাটি আর রং চড়িয়েই আমরা মাতৃনামে ভাবগদগদ হ'য়ে উঠি না কেন, দেশমাতৃকা সেখানে নেই। মা ছড়িয়ে র'য়েছেন নগ্নতায় আচ্ছাদিত সেই ক্যাম্পে, ফুটপাতে, প্লাটফর্মে, জীর্ণ কলোনীর ভাঙা বস্তিতে বস্তিতে, ফুদিপল্লী আর শ্রমজীবীদের ঘরে ঘরে। কবি-গুরু সেই বিশ্ববিধাত্রীর খাঁটি আসনকে উপলব্ধি ক'রেই ভক্তচিত্তে ব'লেছিলেন—

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে সবহারাদের মাঝে।...'

সেই সর্বহারাদের ডেকে একাসনে ব'সতে হবে মাতৃপূজায়, কমলাকান্তের মতো সকলকে আকুলকণ্ঠে ডেকে ব'লতে হবে: 'এস ভাইসকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই।...অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ওহে কি! না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি!'

যারা সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহী, তাদেরও যেমন এ পুজোয় জাতীয় কর্তব্য র'য়েছে, যারা বারোয়ারীর উদ্যোক্তা—তাদেরও সে কর্তব্যের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করতে হবে। তবেই পুজো সার্থক হবে, সুন্দর হবে, অনুষ্ঠান মধুর হবে; কারণ এ জাতির পুজো, জাতি হিসেবে কেউ কাউকে ছেড়ে নয়। মাতৃপূজোর উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যদি রিক্তা বিপর্যস্তা বঙ্গভূমিকে আবার স্বর্ণপ্রসূ ক'রে তুলবার প্রতিশ্রুতিই গ্রহণ না করা গেল, তবে ব্যর্থ সেই পূজানুষ্ঠান। সেই ব্যর্থতা নিয়েই কি আমরা আত্মবিসর্জন ক'রবো, না দেশের সকলের সঙ্গে একযোগে দুঃখ-সুখের সব অংশীদার হ'য়ে দেশকে আবার ফলে শস্যে সম্পদে জাগিয়ে তুলবো, মাটির প্রতিমাকে স্বর্ণপ্রতিমা ক'রে মাথায় তুলে নেব? পুজোর বাদ্য বেজে উঠেছে। মাতৃপূজোর এই প্রাক্-মুহূর্তে আমাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নটিই আজ সব চাইতে বড় প্রশ্ন।

পরাবর্ত

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কথাটা চাপা রইলো না। এক কান থেকে দশ কান। পাড়ার মেয়েদের আনন্দের সীমা নেই। এ তবু নতুন ধরণের কিছু। নয়তো সেই বাদর ঘরে বসে একঘেয়ে রসিকতা। যে মেয়ে গাইতে জানে, তাকে হাজার অনুরোধ। অনুনয় বিনয়ের পরে নাকি সুরে গান। তারপরে বরকে গান গাওয়ানো। প্রথমে হাতজোড়, মাথানাড়া, দারুণ অসম্মতি, তারপর একটু একটু করে লজ্জা ভাঙে। হারমোনিয়ম কোলে তুলে নিয়ে হালকা গান। অনেক সময় বরের গান শুনে মেয়েদের হাসি চেপে রাখা দায়। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বারান্দায় পালিয়ে আসে। যেমনি গলা, তেমনি তাল মান জ্ঞান। যেমন হ'য়েছিলো মানসীদির বিয়েতে।— অমন সুন্দর চেহারা জামাইয়ের, মিষ্টি মিষ্টি কথা, কিন্তু গানের গলা শুনে পিলে চমকাবার যোগাড়। হাতজোড় করে যেমন গান আরম্ভ করিয়েছিলো, তেমনি হাতযোড় করেই গান থামালো। অবশ্য দু একজন ভালোই গেয়েছে। বাঙ্গুযোদের শশীর বর, কিংবা মল্লিকদের মেজ জামাই। বেশ গলা। যেমন সুরেলা, তেমনি গলায় ছোট খাটো কাজ। কিন্তু এ একেবারে অন্য জিনিষ। ভাগ্য বলতে হয় রুচিদির।

পাত্র ম্যাজিশিয়ান। একেবারে বাজে নয়, বেশ নামডাক আছে। শহরের বাইরে থেকেও প্রায় ডাক আসে। রোজগারও মন্দ নয়। তার কিছু করারও দরকার হয়না। বাসর ঘরে সবাই মিলে ধরলো ম্যাজিক না দেখিয়ে যাবে কোথায়। নাকি সুরে গানের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

বিকাল থেকে মেয়েদের ভীড়! জামাই আসতে এখনও অনেক দেরী। ন'টা সতেরোয় লগ্ন। তা হোক কাছে পিঠেই তো থাকে সকলে। রুচিকে সাজাবার গোছাবারও তো লোকের দরকার। তা ছাড়া রাত পোয়ালেই তো বন্ধু হাওয়া। আবার কবে দেখা হবে ঠিক আছে! সেই ওদ্ধই সকাল করে আসা।

বর পৌঁছোতেই হৈ চৈ। মেয়ের দল হুমড়ি দিয়ে পড়লো। কালো, বেঁটে, চেউখেলানো চুল। একটু যেন চোয়াড়ে। বেশীর ভাগ মেয়েই নাক সিঁটকালো। বর বাপু তেমন ভালো হয় নি। এত টাকা খরচ ক'রে এই জিনিষ আনলেন রুচির বাপ।

কিন্তু বাসর ঘরে ঢুকেই মেয়েদের সিঁটকানো নাক ঠিক হয়ে এলো। ভারি আমুদে মানুষ। কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা।

ম্যাজিকের কথা উঠতেই একগাল হাসি।
যাজে কথা কোথা থেকে শুনলেন বলুন তো!
তো আপনারাই দেখাচ্ছেন।

মেয়ের পাল নাছোড়বান্দা। ওসব চালাকি এখানে চলবে না। সব খবর রেখেছে মেয়েরা। ছাওবিলে ছাপানো নামও দেখেছে।

বর মুচকি হাসলো। মাথা নেড়ে অস্বীকার।

রেবা এগিয়ে এলো। পালের গোদাই শুধু নয়, রুচির বিশেষ বন্ধু। প্রায় এক আত্মা। ভুরু কুঁচকে বললো, বুঝেছি, কানে মোচড় না পড়লে সত্যি কথা বেরোবে না।

রেবা কাছাকাছি আসতেই বর কথা বললো, মোচড় ছয় বেচেন, কিন্তু আপনি এসব কেন করতে গেলেন ?

—কি সব ?

—এই পেট পুরে খেলেন একবার, আবার ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ?

তার মানে ? রেবা ভুরু কোঁচকালো। এ-আবার কি রসিকতা !

রসিকতা মোটেই নয়। বর অন্য সকলের দিকে চেয়ে বললো, আপনারা কেউ একজন রেবাদি'র আঁচলটা খুলে দেখুন না।

দলের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। রেবা রেগে লাল।

—কাউকে খুলতে হবে না। আমিই দেখাচ্ছি খুলে। কথার সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে আঁচলটা কোলের ওপর ফেললো। ফেলেই অবাক। সত্যিই তো, আঁচলে শক্ত মতন কি একটা বাঁধা রয়েছে। গিঁঠ খুলেই অপ্রস্তুত। টাটকা ছুটো শিঙাড়া।

রেবা দাঁড়িয়ে উঠলো। সকলের দিকে চোখ পাকিয়ে বললো, এ তোমাদের কারুর কাজ ! আমার শাড়ীটার দফা শেষ।

—হাসরে হৈ চৈ। মেয়েরা চীৎকার সুরু করলো। বললো না, এমন রসিকতা কোনদিন তারা করবে না। কথা নেই, বার্তা নেই, অমনি শিঙাড়া বাঁধতে যাবে রেবাদির আঁচলে ?

—তবে এগুলো কি হাওয়ায় উড়ে এলো ? রেবার সন্দেহ গেলো না। কেউ নিশ্চয় ওকে অপদস্থ করার জন্য এ কাজ করেছে, ধরা পড়ে এখন মানতে চাইছে না।

বর হেসে খুন। আহা পেট ভরে নি, চেয়ে-চিন্তেই না হয় নিতেন, কিন্তু শাড়ীতে বেঁধে নিয়ে আসা।

রেবার মেজাজ তেরীয়া। সারা দেহের রক্ত মুখে। দুচোখে জলের আভাস।

ব্যাপারটা বুঝে বর কথা পাল্টালো, বেশ আপনার কিছে না থাকে আমাকেই না হয় দিয়ে দিন। আমিই খাচ্ছি। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে আর লাভ কি।

রেবা চোখ ফিরিয়ে শিঙাড়া তুলতে গিয়েই আবার বোকা বনলো। শিঙাড়া উধাও। ছুটোই।

এ কি অবাক কাণ্ড। আঁচল ঝেড়ে শিঙাড়া ছুটো খতরঞ্জের উপরই তো ফেলেছিলো। হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো নাকি ! এধার ওধার খুঁজে রেবা নাজেহাল।

বর আর একবার হেসে উঠতেই রুচির খেয়াল হলো। এতক্ষণ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সব দেখছিলো। স্থান কাল ভুলে ঘোমটার তলা থেকেই ব'লে উঠলো ম্যাজিক !

তখন সকলের খেয়াল হলো তাইতো, বর তো ম্যাজিক জানে। রেবাদির আঁচলে শিঙাড়া বাঁধা থেকে ফুলদানীর মধ্যে শিঙাড়া উড়িয়ে দেওয়া সবই বরের কারসাজি। সবাই বরকে ঘিরে ধরলো। তারপর সারাটা রাত চললো হাত সাফাইয়ের খেলা। লাল ফুল সাদা হ'য়ে গেলো, বিয়ের পদ্যের কাগজ ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে আবার জোড়া দেওয়া, হাতের আংটি ফুলদানীর মধ্যে রেখে উড়িয়ে দেওয়া। নানা রকমের। মেয়েরা অবাক। ভোরের দিকে সবাই যখন বাড়ী ফিরলো, তখন রুচির ভাগ্য সম্বন্ধে সকলেই একমত। এমন বরাত সচরাচর অনেকেরই হয় না। গাইয়ে বরের চেয়ে ম্যাজিশিয়ান অনেক কামা।

মনে মনে রুচিও কম খুশী হ'লো না। স্কুলে, পাড়ায় ছোটখাট ম্যাজিক অবশ্য দেখেছে, চোখ বেঁধে তীর ছোঁড়া, লাল বলকে নীল রংয়ে রূপান্তরিত করা এই সব। কিন্তু ঘরের মানুষ এ সব খেলা জানে, কথায় কথায় দেখাতে পারে, এ ভেবেই রুচির বুক গর্বে ভরে গেলো। পাঁচজনকে দেখাবার মতন, পড়শীদের বলবার মতন স্বামী।

বিয়ের দিনকতক বেচারীকে পদে পদে ঠকতে হ'লো। ঠোঙায় ভরা খাবার এনে শশীপদ রুচির হাতে তুলে দিয়েছে, ঠিক ক'রে রাখুক, স্নান সেরে এসে খাবে। ঠোঙাসুদ্ধ রুচি তাকের ওপর সরিয়ে রেখেছে। একটু পরে তাক থেকে নামিয়ে মানুষটাকে খাবার সাজিয়ে দিতে গিয়েই গালে হাত। সর্বনাশ, খাবারের চিহ্নও নেই, কেবল কাগজের কুচি। অরন্তুতের একশেষ।

শশীপদ হেসে খুন।

রুচি চটে উঠেছে, কি বাপু সব সময়ে ইয়ারকী করো, ভালো লাগে না।

—বারে, আমি করলাম ইয়ারকী। খাবারসুদ্ধ ঠোঙা এনে তোমার হাতে দিলাম, বেমালুম খাবার সরিয়ে, কাগজের কুচি সামনে এনে ধরলে?

রুচি আর কথা বাড়ালো না। তবু রক্ষে। শাশুড়ী, ননদের ঝামেলা নেই। উটকো লোক নেই বাড়ীতে। শুধু আপনি আর কোপনি। চেঁচামেচি হাসি ঠাট্টা কারো কানে যাবার কথা নয়। কিন্তু তবুও সব সময়ে কি ভালো লাগে এসব।

বিকেলে গা ধুয়ে রুচি এসে দাঁড়িয়েছে। শশীপদ খাটের উপর বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। মুখ তুলে বললো, কি ব্যাপার, অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো?

রুচি ঠোঁট ওল্টালো, কত কুসুমের ছড়াছড়ি। গাদা গাদা মালা এনে দিচ্ছো। খোঁপায় ফুল গুঁজবো!

এই কথা, চা শেষ করে শশীপদ কাপটা নামিয়ে রাখলো, কি ফুল চাই বলো? গোলাপ? মতিয়া বেল? তবল জুঁই?

আহা থাক, আর মস্করা করতে হবে না। রুচি আয়না পেড়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। চুলের কাঁটা, ফিতে চিরুণী চারদিকে ছড়িয়ে।

এই নাও, শশীপদ রুচির দিকে হাতটা বাড়িয়ে ধরলো।

রুচি ঘাড় ফিরিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলো না। লাল টকটকে গোলাপ। সবুজ দুটি পাতা সুদ্ধ।

—কোথা থেকে আনলে? কারুর বাগান থেকে চুরি নিশ্চয়।

—সেতো তোমার জানবার কথা নয়। চুরি করে হোক্ ডাকাতি করে হোক, জিনিষ পেলেই তো হ'লো। তাছাড়া চুরি ডাকাতির কথাটাই বুঝি আগে মনে পড়লো, কেন দোকান বাজার নেই?

অবজ্ঞায় রুচি মুখভঙ্গী করলো, এঁলো জায়গা মণিরামপুর, এখানকার বাজারে আবার গোলাপ বিক্রী হবে, তাও এই সাইজের। কুমড়ো ফুল মিললেও মিলতে পারে। হুতো আনাদের কুলকাতা, পয়সা দিলে বাবের দুধ মেলে।

রুচি এত কথা বললো বটে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে গোলাপটা ঠিক নিলো। দাঁত দিয়ে ফিতে চেপে ধ'রে তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধার মন দিলো। খোঁপা শেষ ক'রে ফুলটা সন্তর্পণে তুলে মাঝখানে আটকে দিলো। দু এক সেকেণ্ড। হাতে চটচটে কি একটা লাগতেই রুচি লাফিয়ে উঠলো। ওমা, এ কি! পাকা টসটসে টম্যাটো, হাতের চাপে ভেঙে রস আর বিচি দারাটা খোঁপায় মাখামাখি।

শশীপদর হাসি উদ্যান।

মাথায় রক্ত চড়ে গেলো রুচির। পুকুরের জলে স্নান করতে পারে না বলে সুবলের নাকে দিয়ে টেপাকল থেকে রোজ বালতি ক'রে জল নিয়ে আসে।

সারা ঘাড় পিঠ চটচট করছে। আবার গা ধোয়া ছাড়া উপায় আছে? শুধু গা ধুলেই হবে না, স্নানও সেরে ফেলতে হবে।

দুম দাম পা ফেলে রুচি স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অদ্ভুত লোক। সারা জীবনটাই যেন ম্যাজিকের বেড়াজালে ঘেরা। এ ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারে না। মনে আছে ফুলশয্যার রাত্রেও লোকটা অন্য কথা বলে নি। কাছ ঘেঁষে বসেছে বটে, কিন্তু

স্নেহের কাছে, মনের সান্নিধ্যে নয়। কোথায় কোথাকার জমিদার ওর ম্যাজিক দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে কি বলেছিলেন, কোন ম্যাজিস্ট্রেট গলা থেকে মালা খুলে পরিয়ে দিয়েছিলো গলায়, কোন্ শহরে জনতা পিছু ধাওয়া ক'রে ষ্টীমার ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন, কেবল এই সব কাহিনী। শুনে শুনে রুচির মাথা ধরে উঠলো। একেবারে ছেলেমানুষ নয়। সমবয়সী অনেকের বিয়ে হ'য়ে গেছে। তাদের আছে ফুলশয্যা-রাতের মনোজ্ঞ কাহিনী শুনতে রুচির বাকি ছিলো না। কিন্তু এই বুঝি তার নমুনা। সারাটা রাত ভোর করে দিলো নিজের কাহিনী ব'লে। নিজের জরতাক তবল কাটি দিয়ে একটানা বাজিয়ে। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে হাতের খেলা, পয়সাকে তবল পয়সা, রুমাল উধাও, এই সব রকমারী ব্যাপার।

আজকের ব্যাপার কিন্তু চরম। রসিকতার চূড়ান্ত। ফুল ব'লে পাকা টসটসে টোম্যাটো খোঁপায় চটকানো, এর আর তুলনা নেই। নিজের ঘরসংসার ইন্দ্রজাল দেখাবার মঞ্চ ব'লেই বোধ হয় মনে করে লোকটা। তাই দিন নেই, ক্ষণ নেই, ভেলকী দেখায়। মানুষের ভালো লাগুক, আর নাই লাগুক।

শুধু কি ওই মানুষটা। সার্কাসের চেলা যারা আসে সব ওই দলের। বাড়ী ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢিল। রুচির পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই। কি জানি, হাত সাফাইয়ের কায়দা যদি জেনে যায়। ঘরে ফেলে ম্যাজিকের মসল্লৎ। পাঁচ দশ মিনিট নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশেষ করে বাইরে খেলা দেখাবার তারিখ থাকলে তো কথাই নেই।

রুচি চুপচাপ এঘরের জানালার কাছে বসে থাকে। একটি লোক শুধু ওঘরে নয়, এঘরের দরজায় এসে টোকা দেয়। ইচ্ছা করলে অবশ্য ঢুকতে পারে ওদিকের ঘরে, কিন্তু লোকটি এদিকের ঘরই পছন্দ ক'রে। ছৈ হল্লোড়ের মধ্যে না ঢুকে তবু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বৌদির সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা বলতে পারবে রাজীবলোচন। ম্যাজিকের জাঁদরেল খেলার সময় পিছন থেকে বেহালা বাজায়। খুব যে চমৎকার হাত এমন নয়, ওই চলনসই গোছের। তাতেই কাজ চলে যায়।

টোকার উত্তরে রুচি গায়ে মাথায় কাপড় ঠিক ক'রে বলে, এসো ঠাকুর পো। তারপর রাজীবলোচন ঘরে ঢুকতে হাসে, কি ব্যাপার, তুমি দলছাড়া যে?

—প্রাণ যায় বৌদি। ওসব ভূতুড়ে ব্যাপার দেখে দেখে হাল্লাক হ'য়ে গেছি! বাপস্, দুনিয়ায় লাল বল নীল করা ছাড়া আর কি কাজ নেই।

—বলো তো ঠাকুরপো,—রুচির মনের মতন কথা বলেছে রাজীবলোচন, দিন নেই, রাত নেই, কেবল ম্যাজিক। তোমার দাদা তো আমাকে ষ্টেজের সামনের সারিতে বসা দর্শক ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না। ওর ইচ্ছা কেবল হাততালি দিই ওর খেলা দেখে। গুটোনো মাদুর টেনে রাজীবলোচন বসলো। দুনিয়ার কেউ কোথাও নেই লোকটার। একেবারে ঝাড়াহাত পা। বিয়ে থা করে নি। বাউণ্ডুলে। আশে পাশে যাত্রা হলে বেহালা বগলে গিয়ে হাজির হয়। দুটাকা পাঁচ টাকা যা আসে। কেবল শশীপদর দলের বাঁধা বেহালাদার। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। তিলকগঞ্জ থেকে লালমণির হাট। গোরাবাজার থেকে ঘনসাকাটি।

শশীপদ খেলা ভালোই দেখায়। রোজগারপাতিও নিন্দার নয়। তেঁতুলদিঘি থেকে ফিরে রুচিকে একছড়া সোনার হার গড়িয়ে দিলে।

হারটা হাতে নিয়ে রুচি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। প্যাটার্ণ মন্দ নয়। সোনার জেল্লাও আছে। কিন্তু গলায় দিতে ভয় করলো। কি জানি গলায় দিয়ে হয় তো দেখবে কাগজের মালা কিংবা লতাপাতা।

—কি গো, গলায় দেবো? তোমার কারসাজী নেই তো?

শশীপদ সশব্দে হাসলো, উঁহু, এখানে যা কিছু কারসাজী সেঁকরার, আমার কিছু নয়।

সত্যিই তাই, রুচি হার গলায় দিলো। গলাতেই ঠিক রইলো। দিনের পর দিন।

কিন্তু কেবল সোনাদানাতেই বুঝি মানুষের মন ভরে, বিশেষ ক'রে উঠতি বয়সের মেয়ের মন। কাছে আসা নয়, মিষ্ট কথা নয়, ইনিয়ে বিনিয়ে সোহাগের হাল্কা সুর নয়, কেবল ম্যাজিক আর ম্যাজিক।

সেদিন রাজীবলোচন আসতেই রুচি ধ'রে বসলো, ঠাকুরপো, এখানে কি এক নাকি চমৎকার নদী আছে। এতদিন বিয়ে হয়েছে, কেউ একবার নিয়েও গেলো না নদীর ধারে।

ভোর ভোর শশীপদ বেরিয়েছে। কোন্ এক স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস। চারদিন ধরে আমোদ প্রমোদ। শেষের দিন শশীপদর ম্যাজিক হবার কথা আছে। সেক্রেটারীর সঙ্গে সেই সব বিষয়েই কথা বলতে গেছে। বেনাপাওনা সম্বন্ধে শলাপরামর্শ। ফিরতে বেলা হবে।

রাজীবলোচন মাথা চুলকোলো, এ আবার একটা কথা বৌদি। বেশ মেঘলা দিন আছে। চলুন বেরিয়ে পড়ি।

দূর পথে অনেকখানি। সোজাসুজি পলাশডাঙার মাঠ ভেঙে, বাজারের পিছন দিয়ে, পিয়ালী নদীর ধার খুব দূর নয়। তাও পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে এলো। এপার ওপার দেখা যায় না। জলের রং নীলচে, লোকে বলে সাগরের সঙ্গে নাকি যোগ আছে। কেউ কেউ ব'লে পিয়ালী যমুনার বোন। দুই বোনের রঙের মিল আছে।

নদীর ধারে এসে রুচি উচ্ছ্বসিত। কি চমৎকার ছোট মেয়ের মতন চেঁচামেচি শুরু করলো। আজন্ম শহরে মানুষ। ইট, কাঠ, ওরকির দোসর। অবারিত মাঠ, দিগন্ত ছোঁয়া আকাশ, অনাবিল জলের ধারা, এসব দেখবার সুযোগই পায় নি।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রুচি বললো, আহা একটা বড়ো ভুল হয়ে গেলো ঠাকুরপো।

—কি বৌদি?

—তোমার বেহালাটা আনলে পারতে। এমন জায়গায় বড় সুন্দর লাগতো।

রাজীবলোচনকে পেয়ে রুচি যেন বেঁচে গেলো। শুধু নদীর ধারেই নয়, মাঠে হাটে, পুরোনো মন্দিরে, রেল-লাইনের তার ঘেঁসে ঘেঁসে সোজাসুজি হাঁটা। কখনও কখনও গাছতলায়, কিংবা পুকুরের ফাটলধরা চাতালের ওপর বসে রাজীবলোচন বেহালায় ছায়ানট ধরতো, কিংবা পূরবী। হাত খুব ভালো নয়, কিন্তু ওসব বোঝবার মতন কান রুচির ছিলো না। পরিপূর্ণ মনে কিছু ভুলে ভরা সুরও অপূর্ব লাগতো।

সেদিন মাঝরাতে আচমকা রুচির ঘুম ভেঙে গেলো। জানলার পেঁপেগাছের চিকনকাটা পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের ইসারা। বিছানার বেশ খানিকটা জুড়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না। ধারে কাছে কোথাও হেনা ফুটেছে, তারই মদির সুরভি।

রুচি হাত বাড়িয়ে পাশের মানুষটাকে ছুঁতে গিয়েই ধড়মড় করে উঠে পড়লো। বিছানা খালি, শশীপদ নেই। উঠে বসে রুচি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। মিনিট পনেরো। শশীপদর দেখা নেই। তারপর পা টিপে টিপে খাট থেকে নেমে এলো। বেশীদূর যাবার দরকার হলো না। পাশের ঘরের দরজা ভেজানো। সাবধানে দরজা ফাঁক করেই রুচি অবাক। এদিকের দেয়ালঘেঁষা-বর বিছানার চাদর টাঙানো হয়েছে। সামনে টিপয়ের ওপর মড়ার খুলি। শশীপদ হাতের লাঠির তালে তালে খুলিটা মুখ খুলছে। মাঝে মাঝে শশীপদ লাঠি নাচানো থামিয়ে, লাঠির সঙ্গে বাঁধা সরু সুতোর ওপর কি যেন মাখিয়ে নিচ্ছে।

আশ্চর্য, বাইরে এমন তারাভরা আকাশ। জ্যোৎস্নায় বান ডেকেছে। আর একটা মানুষ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মড়ার খুলি নিয়ে মাতামাতিতে ব্যস্ত। চোখ ফেটে জল এলো রুচির। যে সব সঙ্গিনীরা ওর সৌভাগ্যে ঈর্ষা করেছিলো, তারা এসে দেখে যাক একবার। রুচির সুখের বুঝি সীমা পরিসীমা নেই।

দরজার কবাটের সঙ্গে রুচির আঁচলে বাঁধা চাবির ঠোকাঠুকি। ঠক ক'রে শব্দ। শশীপদ চমকে মুখ ফেরালো। রুচিকে দেখেই বিরক্তিতে চোখ মুখ কোঁচ-কালো, কি মুস্কিল, কোথায় নির্জনে নিজের একটু কাজ করবো, তার পর্যন্ত যো নেই। ঠিক পিছু ধাওয়া করেছো? যাও, যাও, শোওগে। আচ্ছা জ্বালাতন। কথার সঙ্গে সঙ্গে শশীপদ ভিতর থেকে টেনে দরজা বন্ধ করে দিলো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে রুচি বিছানায় ফিরে গেলো। হাত দিয়ে জানালাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিলো। বাইরের চাঁদের আলো না হয় আটকালো, কিন্তু নিজের চোখের জল আটকাবে কি করে। সারারাত কাঁদলো বিছানা তিজিয়ে।

এবার একটা বড়ো রকমের কন্ট্রাক্ট। সামনে পূজা। সেই উপলক্ষ্যেই। চণ্ডীতলার ছোটতরফের নায়েব নিজে এসেছেন। কোন্ খেলায় শশীপদর ম্যাজিকের খেলা দেখেছিলেন। তিনিই সুপারিশ করেছেন কর্তার কাছে। নবমীর দিন কথকতা আর ম্যাজিক। আগাম টাকা বায়না দিয়ে একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

শশীপদর মরার সময় নেই। এক হাতে সব। কতকগুলো নতুন খেলা দেখাবার ইচ্ছা। দিন নেই, রাত নেই, তারই মহড়া চলেছে। সাকরেদদের মধ্যে তুলসী আর শিবু থাকবেই, তাছাড়া নতুন এক ছোকরা বিলাসকেও জোটানো হয়েছে। একটা খেলায় তিনজন লোক দরকার। বাড়তি লোক আনবার দরকার ছিলো। রাজীবলোচনকে দিয়েই চলতো। বেহালা বন্ধ ক'রে উঠে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু রাজীবলোচন ঘাড় নেড়েছে। হাতজোড় করে বলেছে, সারারাত পিছন থেকে বেহালা বাজাতে রাজী, কিন্তু একপাল লোকের সামনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ভাবতেই পা ঠকঠক করে, কপালে ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে।

মাঝরাতে রুচি একবার উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, শশীপদ মেঝেয় ব'সে প্রকাণ্ড সুটকেশে ম্যাজিকের জিনিসপত্র সব গোছাচ্ছে। রুচি একবার বলেছিলো গুছিয়ে দেবার কথা, শশীপদ রাজী হয় নি। এসব মেয়েছেলের কর্ম নয়, একটা জিনিস ভুলে গেলেই সর্বনাশ। হাসি টিটকারীর বন্যা, অপ্রস্তুতের একশেষ। ঠিক পরপর জিনিষ গুছিয়ে নিতে হবে, যেমন ভাবে খেলার পর খেলা দেখাবে, তেমনি।

ভোর ভোর যাত্রা করতে হবে। পাঁচটা ছত্রিশে ট্রেণ। দলবল সব ষ্টেশনে থাকবে। সকালে উঠে কড়া ক'রে এক কাপ চা। ব্যাস, শশীপদ, আর কিছু চায় না।

শশীপদর ঘুম ভাঙলো ঠিক চারটেয়। হাতে একঘণ্টা সময়। তার মধ্যে স্নান করা আর চা খাওয়া হ'য়ে যাবে। ষ্টেশন যেতে বড়ো জোর মিনিট বিশেক। সময় আছে।

স্নান করতে যাবার মুখে শশীপদ একটু দাঁড়ালো। চাদর মুড়ি দিয়ে রুচি অকাতরে ঘুমাচ্ছে। ডাকতে গিয়েও মায়া হ'লো। থাক আর একটু ঘুমাক। স্নান সেরে এসেই তুলে দেবে। হাঙ্গামা তো কিছু নেই। কাপড় জামিয়ে এক কাপ চা।

শশীপদ স্নান সেরে যখন ফিরলো তখনও রুচি এক ভাবে ঘুমাচ্ছে। এবার আর উপায় নেই। ডাকতেই হবে। পাঁচটা ছত্রিশের ট্রেণ ধরতে না পারলে একেবারে ন'টা সাতাশ। বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নরম গলায় ডাকলো, খুব সজাগ ঘুম রুচির। এক ডাকেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু বার তিনেক ডাকার পরেও কোন সাড়া শব্দ নেই। সর্বনাশ, শরীর খারাপ নয় তো। তা'হলেই বিপদ। দেখবার লোক তো কেউ রইলো না। রাজীবলোচনও সঙ্গে যাবে।

কোট চড়িয়ে শশীপদ বিছানার ধারে এগিয়ে গেলো। গলার আওয়াজ আরো জোর। কি ঘুম রে বাবা! ওঠবার নাম নেই।

ঠেলতেই কেমন সন্দেহ। কি রকম হ'লো? শশীপদ বিছানায় উঠে চাদর সরিয়ে ফেললো। বালিশের কারসাজি। রুচি উধাও। প্রথমে শশীপদ মনে করলো কাছে পিঠে কোথাও লুকিয়েই বা আছে। এ ঘর ও ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো। খাটের নীচে উঁকি দিতেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। চামড়ার সুটকেশও নেই। রুচির শাড়ীজামা গয়নাপত্তর সব সেখানে থাকতো।

শশীপদর মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। আচ্ছা ভেলকী দেখালো তো রুচি! হাত সাফাইয়ের কারদা শশীপদও কম জানে না। লাল বল বদলে নীল, ফুলের বদলে পাকা টম্যাটো, কিন্তু বউ বদলে বালিশ! কোন্ ওস্তাদের কাছে রুচি এ খেলার হদিশ পেলো?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো শশীপদ। মানুষের কাছে হাততালি-পাওয়া এত রকমের খেলা তার জানা, অথচ বালিশ বদলে বৌ করতে পারার খেলাটা শেখেনি। কিংবা বৌকে বৌ রাখবার!

স্বাধীনতার স্বরূপ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে বহুদিন আগে। যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন দেশকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলি মোটামুটি একই প্রকারের বলা যায়। ভারতের সমস্যা যুদ্ধোত্তর কালে যা ছিল—তা ছাড়াও অনেক নূতন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। সারা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ব্যাপারে আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সকল জাতির স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার। দ্রুতগতি যান-বাহনের প্রচলন হওয়াতে আজ পৃথিবীর পরিধি অনেক ছোট হয়ে এসেছে। অতীতকালের এক দেশ থেকে অন্য দেশের স্বতন্ত্রতা বা বিচ্ছিন্নতার কোনও মূল্য বা সার্থকতা আজ কেউ স্বীকার করে না। সকল জাতিকে আজ সকল জাতির জন্য কাজ করতে হবে।—অর্থাৎ একই পৃথিবীর জন্য সকলের চেষ্টাকে একই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এই আদর্শের সার্থকতা সম্পাদনে নবীন ভারত তার নৈতিক সমর্থন পুরা মাত্রায় দিতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।]

১৫ই আগষ্ট এই দিনটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। স্বাধীনতা লাভ করবার পরও আমি যে "সংগ্রাম" কথাটি ব্যবহার করেছি—সেটা ইচ্ছাকৃত কেন না আমি মনে করি যে আমরা মাত্র বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছি—সত্যকার মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের জন্য আরও অক্লান্ত শ্রমস্বীকার করতে হবে—দীর্ঘদিন ধরে'। একাজ আরম্ভ করতে হবে ভিতর থেকে—সে কাজের মধ্যে থাকবেনা জবরদস্তি বা তীব্র ভাবাবেগ বা উগ্র উত্তেজনা; অথবা বাহিরের প্রভাব বা শক্তির চাপ, যার ফলে ক্রমশঃ মানুষের সংগঠন শক্তি লোপ পায়—অথচ এই সংগঠন শক্তিই জাতির ভাগ্য গড়ে তোলার কাজে একান্তভাবে অপরিহার্য। এ কাজ আরম্ভ করা হয়েছে—ভাল ভাবেই, আশা করা যাক্—ভবিষ্যতে এর সমাপ্তিও ঘটবে ভাল ভাবেই। ভবিষ্যৎ তাদেরই করায়ত্ত যাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি আছে।

আজ থেকে সাত বৎসর আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।—অর্থাৎ পরশাসনমুক্ত হয়েছে। ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় কে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করেছিলেন তা নয়—তবে ১৯৪২ সালে বৈপ্লবিক আন্দোলন ও পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ বাহিনীর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে—অতি দ্রুতগতিতে পট পরিবর্তন হচ্ছে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, যে শক্তি পৃথিবীকে এতদিন শাসন করে আসছিল—তারও পরিবর্তন ঘটছে এবং এক নূতন সভ্যতার উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের কাছে তাকে বর্তমানে পরাভব স্বীকার করতে হচ্ছে। একথাও তাঁরা বুঝলেন যে তাঁদের সময় শেষ হয়ে এসেছে—ভারতের নূতন ইতিহাস যাঁরা রচনা করবেন তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।

সব দেশের সমান সমস্যা

সারা পৃথিবী জুড়ে সকল জাতির সম্মুখে আজ যেসকল সমস্যা—সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে সেগুলি প্রায়াদিক একই রকমের। যেমন পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে আজ জাতিগত অধিকারের জটিলতা মানুষকে বিব্রত করে রেখেছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির নিজেদের মধ্যেই বিরুদ্ধ দলের শক্তির লড়াই চলছে। সেইজন্য মানবজাতির সামগ্রিক সহযোগিতার আহ্বান এক বা অবিভাজ্য পৃথিবীর (One

World) দিকে উচ্চকিত হয়ে উঠছে। অন্তর ডেকে বলছে "পৃথিবীই আমার দেশ"—"The World is my Country." কিন্তু এই এক এবং অবিভাজ্য পৃথিবীর স্বপ্ন সফল হতে পারে যদি রাজনৈতিক সংযোগ বা বন্ধুত্বের মাধ্যমে মানবজাতির একাত্মবোধ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমেরিকার অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি নিকোলাস বাটলার মনে করেন, মানুষ ক্রমশঃ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। গত কালের বহু ব্যক্তিগত অধিকার সে আগামী কালের সকল মানুষের সংযুক্ত নিরাপত্তার জন্য ত্যাগ করতে শিখছে।

জানিনা আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ শাসকদের মনে এই ভাবের কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি না, কিন্তু একথা আমরা নিশ্চিত জানি যে অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাক, সে অন্য কথা। আমরা এখন যে ব্যাপারের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে এই যে রাজত্বের ক্ষেত্রে মানুষের মুক্তি বিশ্বমানবের যে একাত্মবোধের উপর নির্ভর করছে আমরা কি সেইদিকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি? আত্মসর্বস্ব জাতি, পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্র, এমন কি ধুরন্ধর যুদ্ধবাজ নায়কেরাও আজ এই দিকে চিন্তার মোড় ফিরিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছেন। এ চিন্তা সমগ্র পৃথিবীকে পেয়ে বসেছে—এদিকে আমাদের চিন্তা কি ভাবে এবং কতদূর অগ্রসর হয়েছে বা হতে যাচ্ছে—এটা আজ উপেক্ষার কথা নয়।

ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে এসেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু স্বদেশে ও বিদেশে পরস্পরনির্ভরতার প্রশ্ন ও প্রয়োজন ক্রমশঃ পূর্বাপেক্ষা আরও প্রকট হয়ে পড়ছে। এটা দুঃখের কথা নয়, সুখের কথা, কেন না একে মানবজাতির একাত্মবোধের দিকে নিশ্চিত অগ্রসরের লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে। একটি জাতির আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য আজ সকল দেশের অনুধাবনযোগ্য হয়েছে, এবং দেশে বিদেশে তার তাত্ত্বিকও শুনা যাচ্ছে। স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারতবর্ষও তাদের ছাড়া নয়। বিচ্ছিন্নতা (Isolation) বিষ্যা নিরাপত্তার মনগড়া স্বপ্ন মাত্র। শুধু তাই নয়—মানব প্রগতির পথে এমন মনোভাব বিশেষ অন্তরায়। এই কারণেই পণ্ডিত নেহেরু এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বর্জন করতে বারবার দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

আধুনিক গণতন্ত্রের চাপে প্রাচীন বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন করতেই হবে—এবং তাতে গণতন্ত্রের সীমানার ভিতরে ও বাহিরে সকল মানুষেরই কল্যাণ সাধিত হবে, আমাদের গণতন্ত্র যদি এই লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে মানব জাতির একাত্মবোধ কখনই অলীক স্বপ্ন হয়ে থাকবে না।

বহুপূর্বে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসে হারভার্ড ডিভিনিটি স্কুলে র‍্যাল্‌ফ্ ওয়াল্ডো ইমার্সন এই মানবজাতির একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন—

"Oneness of mankind is the highest law, since it encompassed the humanitarian doctrines of individual liberty and universal tolerance."

অর্থাৎ এই একাত্মতাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধি কেন না এর মধ্যে আছে ব্যক্তি স্বাধীনতার মানবীয় তত্ত্ব এবং সার্বজনীন পর মত সহিষ্ণুতা।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাস পোষণ করার প্রাচীন নীতির নিন্দা করে তিনি তার অবসান ঘোষণা করেন। মানব জাতির কল্যাণের জন্য স্বাধীন মানুষের সংযোগ, সহযোগিতা ও সাহচর্যের উপর যে নূতন পৃথিবীর ঐক্য নির্ভর করে এই মহান ব্যক্তি তারই স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার প্রত্যাসন্ন অভ্যুদয় ঘোষণা করে গিয়েছিলেন একশ ষোল বছর পূর্বে। আর আজ আমরা তারই জন্য পুনরায় সকল দেশে সচেষ্ট হয়েছি।

বহু যুগ পূর্বে ইমার্সন যে নূতন দর্শনের সন্ধান

দিয়েছিলেন আজও সে দর্শনের নূতনত্ব যায়নি কারণ আমরা এখনও অতীতের ভাবধারণা থেকে মুক্ত হতে পারি নি। আমাদের সর্বপ্রযত্ন সত্ত্বেও এ যাবৎকাল আমরা সে একাত্মবোধের কাছে পৌঁছাতে পারিনি এবং অতীতে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং তার আনুষঙ্গিক অত্যাচার ও অমানুষিক উৎপীড়ন মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিকতাই প্রমাণ করে গেল—রবার্ট বার্নস-এর কথায় যাকে বলা যায় Man's inhumanity to man"। নিষ্ঠুর নরহত্যা, পাশবিক অত্যাচার, পররাজ্যলুণ্ঠনের মূল প্রেরণা আসে 'জোর যার মুলুক তার' এই ধারণা থেকে।

মানব ও অতিমানবের যুদ্ধ এ নয়—এ যুদ্ধ রাজ্যের শক্তি সম্পদ বা সম্মান বৃদ্ধির যুদ্ধ—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ভেবেছিল যে একদিন এক অতিমানবের জাতি সমগ্র মানব জাতিকে জয় ক'রে তাদের কায়েমী সুখ শান্তির ব্যবস্থা করে দেবে। এই নৃশংস ধারণা জগতের যা কিছু সুন্দর ও শোভন, যা কিছু মানবকল্যাণের আদর্শ সেই সব কিছুরই সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। যুদ্ধবিগ্রহের অশান্তি ও দুঃখ এই ধারণার ফলেই বারবার মনুষ্য সমাজে দেখা দিয়েছে।

নিজে বাঁচ এবং পরকে বাঁচতে দাও

নৈতিক আচার শাস্ত্রের দিক থেকে ভারতবর্ষ অত্যাচার—উৎপীড়ন, স্বৈরাচার ও জাতি-বিদ্বেষের বিরোধী। কারণ তার শিক্ষা দীক্ষা লাভ হয়ে থাকে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থায় যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ হিসাবে সে ধরে নিয়েছে "নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও", আমরা বাঁচব এবং পরেও বেঁচে থাকুক—এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করুক বেঁচে থাকতে। কারণ পৃথিবীকে উচ্চতর মানবপ্রীতি, পারস্পরিক সাহচর্য ও যুক্তিপরায়ণ ও ব্যাপক সহযোগিতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে—যাতে করে মানবভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—যে ভ্রাতৃত্বের কথা—মানবীয় একাত্মবোধের সংস্কার ইমার্সন ১৮৩৮ সালে প্রকাশ করেছিলেন। হয়ত আমাদের বিলম্ব ঘটেছে এই পথে আসতে—কিন্তু একেবারে না আসার চাইতে বিলম্বে আসা শ্রেষ্ঠতর।—আজ বিশ্বের পরিবর্তিত মনোভাবের দিক থেকে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু কি ভাবে ভারতবর্ষ তার বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহ্বান দেশে দেশে লোকে লোকে পাঠাবে—তার চিন্তা করবেন দেশ-নায়কগণ।

ব্যক্তি বা জাতি অলস ভাবে দর্শকের মত বসে থাকতে পারে না—এই সান্ত্বনায় যে যার মত দেখে নিক—আপন আপন ঘর সামলাক। জাতির পক্ষে সেটা হবে চরম দুর্ভাগ্যের কথা। সারা বিশ্বে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে খবর রাখবে না—বুঝবেনা—এ হতে পারে না। আজকের দিনে চিন্তানায়কগণ বলেন—What happens anywhere is everybody's business, অর্থাৎ যেখানে যাই ঘটুক না কেন—তার জন্য আজ সকলেরই মাথা ব্যথা হওয়া উচিত। কারণ সামগ্রিক ভাবে পৃথিবী এক ও অবিচ্ছেদ্য। পৃথিবীর যে কোনও অংশে যাই ঘটুক না কেন—সকল অংশেই তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এক ভূখণ্ডে যে ধ্বনি ওঠে—পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এ থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই—এবং থাকলেও মানচিত্রেই কেবল তার অস্তিত্ব। বিভাগের চিহ্ন, দেশের সীমানা অথবা অন্যপ্রকার বাধা আর থাকতে পারে না এবং বর্তমান কালের যানবাহনের অবাধ ও দ্রুত গতির ফলে যে পারস্পরিক যোগাযোগের সৃষ্টি হবে তাতে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের অত্যন্ত কাছে এসে পড়বে। জাতিগত বিদ্বেষ নিঃশেষ হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায়। মানবতার স্থান হবে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে। মানুষের এই একাত্মবোধের মধ্যে দেখা দেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং টমাস পেনের (Thomas Paine) কথায় সাহসের সঙ্গে বলতে পারা যাবে—"The world is my country, to do good is my religion."—বিশ্বজগৎ আমার দেশ—কল্যাণসাধনই আমার ধর্ম।—রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে যা বলেছিলেন "বিশ্বজগৎ আমারে মিলিবে যে মোর আত্মপর" অথবা

"সেখানে যেন মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরু খুঁজিয়া" আজ সকল জাতির মধ্যে বিশ্বজগৎকে নিজের ঘর করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তার জন্য চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে।

সাধারণ লোকের পক্ষে একথা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয় যে সমগ্র মনুষ্যজাতি রহস্যজনকভাবে—ভাতৃত্বের সম্বন্ধনে জড়িয়ে আছে। আমাদের সকলের মধ্যে এই রহস্যের বীজ লুকিয়ে আছে এবং তাতেই আমরা এক সূত্রে বাঁধা হয়ে আছি। মনুষ্যজাতির এই যে একাত্মবোধের ধারণা বা উপলব্ধি এর মধ্যে আছে এক নিগূঢ় তত্ত্বের আকর্ষণ। আমরা সে আকর্ষণ অনুভব করি যখনই আমরা ভবিষ্যতের দিকে চোখ মেলে তাকাই। অতীতকাল প্রস্তাবনা মাত্র। এবং বর্তমান ভবিষ্যতেরই সূচনা। ভবিষ্যতের দিকে তাই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। আশা রাখতে হবে ভবিষ্যতের উপর। ইমার্সন (Emerson) বলেছেন "The eyes of man is set in his forehead, not in his hindhead." মানুষের চোখ বসান আছে মাথার সামনের দিকে—পিছনের দিকে নয়। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

অতীতের বিচ্ছিন্নতার সমাধি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, অপরাপর জাতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, ভবিষ্যতের মহারণ্যে প্রবেশ করতে হবে,—অনাবিষ্কৃত, অপরিচিত নূতন পথের সন্ধান আমরা পাবই। বেঁচে থেকে, অপরকে বাঁচতে দিয়ে —এবং যাতে বাঁচতে পারে তার জন্য সহায়তা করে আমরা নূতন পৃথিবী গড়ে তুলব এই হোক আমাদের সঙ্কল্প। ব্যক্তির কিছু মূল্য নেই জাতিরও কিছু মূল্য নেই, কিন্তু সভ্যতার সম্মুখ অভিযানে মানবতা শুধু যে মহামূল্যবান তাই নয়, আমাদের ধ্যান ধারণা ও ভাবুকতার দিকগুলে মানবতা ক্রমশঃ বৃহৎ হতে বৃহত্তর আকারে দেখা দিচ্ছে, যে আদর্শ বৈশিষ্ট্যের দাবী করে, এবং যে বৈশিষ্ট্য দিতে পারে একমাত্র পৃথিবীর জাতিপুঞ্জ; মানবতাই সেই বৈশিষ্ট্য; কুয়াসায় আবৃত থাকে প্রভাতের সূর্য, একমাত্র এই মানবতাই সেই সূর্যকে প্রকাশ করতে পারে।

আজ ভারতবর্ষ তার অতীতকালের বিলুপ্ত ধারণা ও উপলব্ধির ইতিহাসের দিকে এবং ব্যক্তি সত্তা সংরক্ষণের বস্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে পারে না। আজ তাকে তার কল্পনাকে প্রসারিত করে দিতে হবে কুয়াসামুক্ত দিগ্‌দিগন্তে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে দৃশ্যমান জগৎকে তার উপযুক্ত মূল্য ও পরিবেশে। এ যাত্রা তার একার নয়, যারা আজ অগ্রগতি ও সফলতার পথে তাদের পদচিহ্ন রেখে চলেছে সেই সকল দেশের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে তার সম-যাত্রা।

খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রতিদিনের আশু সমস্যার কথা, উল্লেখ করছি না বলে আমাকে অনেকে স্বাপ্নিক বলে মনে করতে পারেন। আমি সে সকল সমস্যার উল্লেখ করছি না বটে কিন্তু সেগুলি এড়িয়ে যেতেও চাইছি না। এসকল সমস্যা স্বয়ং-নির্ভরশীল নয়। আমি জানি না এমন যাদুদণ্ড আছে কিনা যেটা দক্ষিণে ও বামে দুলিয়ে দিয়ে আজিকার দিনের সকল সমস্যা এক মুহূর্তেই নিরসন করা যায়। কিন্তু আমি জানি মানবতার যাদুস্পর্শে, দুঃসময়েও অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। সেই জন্য আমি মানুষের একাত্মতার কথা বলি, মানবিকতার কথা বলি—একদিন তার কল্যাণে এক এবং অবিচ্ছিন্ন পৃথিবীর স্বপ্ন সফল হ'তে পারে এবং যে সমস্যাগুলির সমাধান বিষয়ে আমরা আজ আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি সেগুলিও ধীরে ধীরে নিঃসংশয়ে অন্তর্হিত হবে তাদেরই চোখের সামনে, যারা সব জিনিষই আজ সন্দেহের চোখে দেখছে।

আজিকার এই ধারণা উদ্ভট-কল্পনা বা স্বপ্নবিলাস বলে মনে হতে পারে কিন্তু আগামীকাল স্বাধীন জাতিপুঞ্জের সমবেত চেষ্টায় এই ধারণাই ক্রমশঃ নূতন সৃষ্টির শক্তিতে গড়ে উঠে পৃথিবীর সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিরোধে সমর্থ হতে পারে। ভারতবর্ষ তার অন্ত-

নিশ্চিত প্রবল শক্তিতে চারিত্রিক বলে মানবিকতার আদর্শে এক এবং অদ্বিতীয় পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে—হয়ত অন্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা অনেক বেশীই পারে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সমস্যা বর্তমানে অপরাপর জাতির বন্ধুত্বলাভের সমস্যার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে ভারতবর্ষ আজ কারেবী বন্ধুত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কি অংশ গ্রহণ করবে সে বিষয়ে চিন্তা করবে এবং সেই বন্ধুত্ব ও শান্তি রক্ষা করার যে আদর্শের জন্য সে এতদিন আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে—তার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করতে অগ্রসর হ'বে। যদি সে আদর্শ থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে তাহলে বুঝব ভারতের বীরযুদ্ধের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদান বৃথা হয়েছে; কারণ, সংগ্রামের পর যে সব ঘটনা ঘটছে—সেগুলি যা ঘটে গেছে তার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে একথা নির্ভয়ে বলতে পারি যে আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে বীরের মত নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করে গেছি আজ আমরা সে লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমরা এদেশে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছি যে ভবিষ্যৎ শান্তি ও সর্বক্ষেত্রে নিবিঘ্ন উন্নতি সাধনের জন্য চাই—রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আমরা সেজন্য এদিকে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নির্ভর করব রাষ্ট্রের উপর—যে রাষ্ট্র সর্বদাই প্রত্যাশা করবে জনসাধারণের অর্থাৎ আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা।

আমরা আজ অনুভব করছি অচিরেই আমাদের অর্থ-নৈতিক সংগ্রামের অবসান ঘটা দরকার, কেননা সমাজ বিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের মূলে রয়েছে এই অর্থ-নৈতিক দুর্দশা। এযাবৎকাল আমরা যে মনোভাব ও অন্যায় আচরণের নিন্দা করেছি, ঘৃণা করেছি, আজ তারই অবলম্বনকার হচ্ছে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। এই মনোভাবের যাঁরা সমর্থক, তাঁরা প্রচার করলেন যে তাঁদের পরিকল্পনায় ও কর্মপদ্ধতিতে দারিদ্র্য ও অভাব দূরে যাবে এবং যারা অবনমিত, বঞ্চিত ও নিম্নস্তরের মানুষ তারা চিরদিনের মত রক্ষা পেয়ে যাবে। এই স্তোকবাক্যে বহু লোক আকৃষ্ট হোল, সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল, এবং যে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য জাতীয় কংগ্রেস অশেষ ত্যাগস্বীকার করে—এতদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে—সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার সহজ ও আশু উপায় হিসাবে তারা রাষ্ট্র-বিরোধী ও সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়ে গেল। রাজ-নৈতিক ক্ষমতা লাভের যে লালসা, আত্মসর্বস্ব দেশকর্মের যে বঞ্চনা সেটার আপাতমধুর আসল রূপ আপাত উত্তেজক বাকচ্ছটায় ঢাকা পড়ে থাকল—আমরা মরিয়া হয়ে হাততালি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম—হুল্লোড় করার জন্য। এটাকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিপর্যয়ও বলা যায়।

অতএব আজ প্রয়োজন মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্ম-বোধকে জাগিয়ে তোলা—এবং তারই আগে দরকার মানুষের অন্তরে রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত করা। তাতে করে জনসাধারণের প্রীতি, অনুরাগ ও আনুগত্য আসবে রাষ্ট্রের প্রতি; জনসেবা ও সকলের জন্য ত্যাগস্বীকার তখন আমাদের পক্ষে সহজ হবে কারণ তখন রাষ্ট্রকে মনে করব আমাদের রাষ্ট্র, এই মহান দেশের মহান জাতির আমরাই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং আমাদের সম্মিলিত শক্তিতেই যে রাষ্ট্রের শক্তি এ উপলব্ধিও আসবে আমাদের সহজে—একমাত্র এইভাবে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে। স্বাধীনতা লাভ করেছি কিন্তু এই অপহরণের মধ্যে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মূর্তি আমাদের চোখের সামনে বা অন্তরের মধ্যে ফুটে ওঠে নি।

এ বিশ্বাস যেন আমাদের থাকে যে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ধীর ভাবে এগিয়ে যেতে পারব এবং জনকল্যাণ সাধনের ব্রতও আমাদের সফল হবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখতে পারব। এ বিশ্বাসও

আমাদের এই মন্ত্র
রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার প্রতিষ্ঠা করে কৌশলে তার পরিচয়
করতে পারি এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে রাখতে
পারি তাহলে যে আদর্শবাদী দলের আন্তরিকতা আছে,
অথচ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে আজ সরকারী ব্যবস্থার
মাধ্যমে স্বল্প আয়াসে, অল্পদিনের মধ্যেই নিরাপদ মোক্ষ
লাভের কাজ হাসিল করার জন্য চিৎকার করে গলা
ফাটাচ্ছেন তাঁদের সকলের অনুকূল্য লাভেও আমরা
সমর্থ হব

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আজ নৈষ্ঠিক আদর্শবাদীরাও
ভাতারভয়ে ও বিভ্রা সভাকার কল্যাণকেও তাঁরা আজ
অকল্যাণ বলে মনে করছেন—নিজেদের গোঁড়ামির জন্য
অপর পক্ষের সুতাকার শুভবুদ্ধিকেও অভিসন্ধি বলে ভুল
কিন্তু আমরা জানি যে আন্তরিকতার ক্ষেত্রে
তাঁদের স্থান গৌণ নহে; পদ্ধতি পৃথক হলেও উদ্দেশ্য এক
দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কামনা তাঁরাও করে
থাকেন হয়ত ক্ষমতা লাভের প্রলোভন কোথাও আছে,
হয়ত উচ্চপদমর্যাদার আকর্ষণে তাঁদের মনও কখনও কখনও
চঞ্চল হয়ে ওঠে—হয়ত অসূয়া আছে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ
পরমত অসহিষ্ণুতা আছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে
আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা অন্যায় নয়, অশোভন
স্বাস্থ্যকর, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা হবে একই
দলের খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা—একই বাহিনীর
সৈন্যদের প্রতিযোগিতা—যাদের সকলেরই লক্ষ্য এক, পথ
এক পদ্ধতি এক, শুধু প্রতিযোগিতা হবে নিজেকে উঁচু
করার নিজেকে আত্মজন ও চারিত্রিক বলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতি-
পন্ন করার প্রতিযোগিতা। লক্ষ্য এক, আদর্শ এক,
সাধনার পথও তাদের এক।

আজ ভয়ানক আদর্শবাদের মোহে, ভ্রান্তবুদ্ধিতে
যাঁরা অন্য দেশ থেকে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করার
দাবী জানাচ্ছেন—যাঁরা ভারতবর্ষকেও মনে
মনে বিভিন্ন করার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন আজ
তাঁদেরই বিরুদ্ধে আমাদের ধীর স্থির ভাবে যুঝতে
হবে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক আদর্শবাদীদের
পক্ষে অন্য মত হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ থাকতে
পারে না। আন্তর্জাতিকতা "ফ্যাসান নয়,"—দোপদুরস্ত
কেতার বাহাদুরী নেওয়া নয়,—গোঁড়ামিও নয়,—এক
এবং অবিচ্ছিন্ন পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সর্বতোভাবে
এর প্রয়োজন আছে—এবং আজকার দিনে এ
প্রয়োজন মূলতঃ আমাদের দেশ কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে
অপরিহার্য।

আজ আমাদের সমবেতভাবে চেষ্টা করা দরকার
যাতে আমরা ভারতবাসীকে জাতি হিসাবে এবং
ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক দেশ হিসাবে উচ্চ থেকে
উচ্চতর স্থানে উন্নীত করতে পারি। আমরা ইচ্ছায়,
সংকল্পে, উদ্দেশ্যে ও কার্যে যদি সমবেত হতে পারি
তাহলে আমাদের কর্মক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের হস্ত-
ক্ষেপের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। এইভাবে
আমরা আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বপ্নকে, আমাদের
নিরাপত্তা ও সার্বভৌমিক স্বাধীনতার আদর্শকে সফল
করে তুলব, ভ্রান্তবুদ্ধিতে কোনও সুযোগ সুবিধাকেই
বর্জন করে যাব না—যে "Freedom boundless,
brilliant, and immortal"—অর্থাৎ যে স্বাধীনতা
বন্ধনহীন, চিরদীপ্তিমান ও চিরন্তন আমরা সেই
স্বাধীনতা লাভের জন্য এক এবং অবিচ্ছিন্ন পৃথিবীর কামনা
করব।

চিঠি পাওয়া ও দেওয়া

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চিঠি দিয়ে ঠিক সময়ে তার উত্তর পাওয়া বাংলা দেশে একটা স্মরণীয় ঘটনা। সকলেই চিঠি পাওয়া পছন্দ করেন, না পেলে অনুযোগ করেন, কিন্তু জবাব দেবার সময় গড়িমসি না করে কাজের উপায় নেই। আজ-নয়-কাল করতে করতে অনেক সময়ই বিশেষ জরুরি চিঠির কথাও মন থেকে মুছে যায় এবং তার জবাবই দেওয়া হয় না। অন্যের কথা কি বলবো, আমি নিজেও এ বিষয়ে কম অপরাধী নই।

মনে আছে, একবার এক আত্মীয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন,—তিনি পরীক্ষা-সংক্রান্ত কয়েকটা আইন-কানুন জানাবার জন্যে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজ শেষে যখন তাঁকে উত্তর দিলাম, তখন পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে। একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আমার উত্তর না পেলে, এক বন্ধু একটি কাজের ভার অন্যকে দিয়ে দেবেন বলে জানান—সে তারিখের ঠিক দেড় মাস পরে তাঁকে উত্তর দিই। এরি অনেক ঘটনাই এ পর্যন্ত ঘটেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আত্মীয়টি পরীক্ষাও দিয়েছেন, বন্ধুটির কাজের ভারও শেষ পর্যন্ত আমার হাতেই এসেছে, অন্যত্র চলে যায় নি। এর থেকে এই কথাই বুঝতে হবে যে চিঠি দিয়ে তার উত্তর সম্বন্ধে তাঁরা নির্লিপ্ত ছিলেন না, বরং তার আশাই রাখেন নি—তাই অন্য রকমেও তাঁরা বিধিমতো তদ্বির চালিয়েছেন আমি নিজেও জরুরি বিষয়ে ঠিক তাই করি, বোধহয় অন্যেরাও করেন। অর্থাৎ বিনা চিঠিপত্রের আদান-প্রদানটা আমরা কেউই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। কিন্তু মজা এই যে যেটা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং সেই জন্যেই সেটা দোষেরও নয়, গুণেরও নয়, তাই নিয়ে আমাদের নালিশের অন্ত নেই। মফঃস্বল থেকে কোন আত্মীয় হয়ত লিখলেন, কলকাতায় শুনছি গরম জামা এবার খুব সস্তা, তা কি রকম দাম এবং একটা পাঠালে কত খরচ পড়বে লিখো ত। এই অতি জরুরি প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে না, বলা বাহুল্য ইচ্ছে করে নয়, নিতান্তই আলস্যের দায়ে। যথাকালে সেই আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা এবং এ নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনীয় বিক্ষোভ, এক-আধটু খোঁচাও এই বলে যে ইদানীং বড় লোক হয়ে গেছি, আত্মীয়-বন্ধুকে আর খুঁজি না, কিন্তু সেই আত্মীয়কে যদি মনে করিয়ে দিই যে আমিও একটা জমির ব্যাপারে চিঠি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর পাই নি, তাহলে নিশ্চয় তিনি অপ্রতিভ হয়ে পড়বেন, সেই জন্যেই তা আর করি না, কিন্তু তিনি সেটা বুঝতে পারেন না এবং সেই জন্যে চটেন, আমি বুঝতে পারি বলেই তা নিয়ে মনে-মনে একটা আমোদ পাই।

অবশ্য এটা ঠিকই যে আমার যা জরুরি, আপনার কাছে তার মূল্য কিছুই নয় কাজেই আমি যদি আশা করি যে আপনি আমার কখন কোনটা দরকার, তাই মনে করেই সর্বদা সম স্নেহা হোটেলের মতো তৈরী হয়ে আছেন, আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই মাথায় পাগ্‌ড়ি বেঁধে ছুটতে সুরু করে দেবেন, তাহলে আমাকে হতাশ হতেই হবে। আপনার নিজেরও জরুরি দরকার থাকতে পারে, আপদ-বিপদ পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে, আমার প্রয়োজনের সময় সে সব কথা আর ভাবাই হয় না—তাই লিখি, আশা করি পত্র পাঠ মাত্র এ বিষয়ে একটা বিহিত করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি, যা

পড়ে আপনার হয়ত গা জ্বলে ওঠে, নয়ত যা পড়ারই সময় হয় না, নয়ত যা পড়ে এবং যথেষ্ট সমিচ্ছা নিয়েও শেষ পর্যন্ত আপনি বেমালুম ভুলে যান। এর কোনটাই অস্বাভাবিক নয়, তাই এ নিয়ে আমি কখনো কিছু মনে করি না।

যখন আমি আপনাকে কোন কাজের ব্যাপারে চিঠি লিখি, তখন আমার সত্তাটা আমি আরোপ করি আপনার ওপর এবং ধরে নিই যে আমি নিজে হলে যা করতাম, আপনি আমার হয়ে ঠিক তাই করবেন—এটা অন্ধ আব্দারের ছাড়া আর কিছুই না। কারণ আমার নিজস্ব মূল্য আমার কাছে যাই হোক, আপনার কাছে—সে আমি যদি আপনার অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও হই—তা ততখানি হবে কেমন করে? আমার নিজের সুবিধা-অসুবিধার জন্যে আমার যে টান, তার মূলে রয়েছে আমার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, আপনার মধ্যে সেটাই আসবে কোথা থেকে! তাই নিজের সাথে আমি আপনার মনের সাথ সৃষ্টির জন্যে যখন উঠে-পড়ে লাগি, তখন আপনার মন হয়ত থাকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত এবং সেই কারণেই আমার আবেদন আপনার মনের ওপর পর্দা দিয়ে ভেসে চলে যায়, তাতে কোন স্পষ্ট আঁচড় কাটতে পারে না। এই জন্যেই আমরা 'পত্রপাঠ' কাজকে কিছু করে উঠতে পারি না—এ আমাদের মনোধর্ম।

আর এই সঙ্গে যে একটা সুদূরবিসর্পী আলস্যেরও যোগ আছে, তা বলাই বাহুল্য। ঠিক আলস্য নয় কেমন যেন সব জিনিষের ওপর দিয়ে আলগোছে পা ফেলে চলার ভাব—কাজকর্ম, আত্মীয় বন্ধু, চিঠিপত্র, অনেক কিছুর জনতার ভেতর দিয়ে চলেছি, অথচ ভেতরে-ভেতরে জাগিয়ে রেখেছি একটা আড়াল—বস্তু-সংসারের সঙ্গে সংযোগের ধারাটা হয়ে রয়েছে যথেষ্ট আলগা, এত আলগা যে কিছুতেই যেন আমার কিছু যায়-আসে না। এই সূক্ষ্মতম অতলস্পর্শ আলস্যেরও কিছু মূল্য আছে বৈকি!

কিন্তু তাই বলে আমি চিঠি দিতে ভালোবাসি না, বা দিই না ভাবলে ভুল হবে। বরং আমি বড্ড বেশীই চিঠি দিই। বাড়ীর সকলেরই, বিশেষত স্ত্রীর ঈর্ষামিশ্রিত অপ্রসন্নতা থেকে বুঝতে পারি, আমার এই চিঠি লেখার অভ্যাসটা অন্যান্য অনেক বদ-অভ্যাসের মতোই তাঁদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট সহনীয় নয়! তাঁদের একথা বোঝাতে পারলে সুখী হতাম যে চিঠি লেখা জিনিষটা আমার একটা বিলাসিতা—ওটা কাজের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতানো বা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন, বা এটি ধারা কোন কাজের কাজ নয়। ওতে আমার মন তার রেক আলগা করে আশপাশের দুনিয়ায় এলোমেলো পায়ে চলাফেরা করবার সুবিধা পায়—আত্মার প্রসারের জন্যই ওটা আমার চাই!

কিন্তু আমি কি ধরণের চিঠি লিখি? অত্যন্ত জরুরী বৈষয়িক ব্যাপারেও আমার টনক নড়ে না, আর তাতে পরের ত বটেই, নিজেরও প্রচুর কার্যহানি হয়, একথা আগেই বলেছি! আমি লিখি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, এমন কি বিষয়-নিরপেক্ষ চিঠি—যা কবিতাও হয়, বক্তৃতাও হয়, অনেক সময় ছোট গল্পও হয়ে উঠতে পারে। এক-এক সময় মনের মধ্যে এক-একটা ভাবের তরঙ্গ চলতে থাকে—তাকে কেন্দ্র করে অনেক কথাই কল্লোলিত হয়ে ওঠে, অথচ তাতে ঠিক সেই শ্রেণীর পারম্পর্য বা শৃঙ্খলা থাকে না, যাতে ভাবীকালকে বা বাইরের জনসাধারণকে ডেকে সেই সমস্ত উদ্ভব ভাবনা ও চলন্ত অনুভূতির বার্তা শোনানো যেতে পারে। সেই চলতে চলতে রং বদলানো, গড়তে গড়তে ভেঙে যাওয়া, কতক স্পষ্ট কতক আবছা এবং আগাগোড়া জড়িয়ে অসংলগ্ন চিন্তাপুঞ্জ কোন পরিচিত মানুষকে ডেকে শোনানোর জন্যেই লিখি চিঠি। কাজেই আমার চিঠিতে বিষয় এবং ব্যক্তি দুটোই উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে নিজের মন—তাকে নিয়ে খেলা করবার জন্যেই আমি চিঠি লিখি। সে চিঠি যার উদ্দেশে পাঠাই, তার সঙ্গে তার যোগ থাকে অতি সামান্যই, সে হয়ত তা পেতেও চায় না এবং যখন জবাব দেয়, তখন ষোল-আনা কাজের কথা দিয়েই পাতা ভরায়, তবু!

এই সমস্ত চিঠির 'কথা' হাতের কাছে কাউকে ডেকেও বলতে পারি হয়ত. কিন্তু তা কোনদিন বলি না। দাদা-দাদি যাকে পাই, তাকে সম্পূর্ণ করে পাই বলেই তার ও আমার মধ্যে কল্পনার কোন অবকাশ থাকে না। অনুমানের বিস্তৃত আকাশে তাকে বুহৎ করে মনের মতো করে গড়ে নিতে পারি না, সে মুঠোর ভেতর ধরা পড়ে যায়. তাই তাকে নিয়ে কাজ চলে. কিন্তু কল্পনা চলে না। যে আছে দূরে, দৃষ্টি-সীমার বাইরে, ধরা-ছোঁয়ার এলাকা পেরিয়ে, অথচ যে দুর্লভও নয়, দুর্গমেও নেই, এমন মানুষদের নিয়েই ত স্বপ্ন! সেই স্বপ্নই মনকে নাচায়, অনুভূতিকে দেয় ভাষা। আমি চিঠি লিখি এই স্বপ্নের আকর্ষণে—আমার চিঠি তাই কোনদিন উদ্দিষ্ট শ্রোতাকে সামনে নিয়ে গড়ে ওঠে না। কিন্তু স্বপ্ন আমারই মনের—শ্রোতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার বাইরে থাকে. তাই জবাবটাও আসে বাইরের। কিন্তু জবাবের বাগ্রতাতেই চিঠি লিখি না. কাজেই সেজন্যে আমার ঔৎসুক্যও থাকেনা কিছুই।

অবশ্য চিঠি পেতে কি আমি ভালোবাসিনা, অথবা তা পাবার জন্যে কি আমার কোনই ব্যাকুলতা নেই? অবশ্যই আছে, কিন্তু যার চিঠি আমি পেতে চাই. তাকে চিঠি দিয়ে আমি উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারি না—অপ্রত্যাশিত চমকের মতো কোন একদিন শীতের মিষ্টি সন্ধ্যায়, নয়তো গ্রীষ্মের ঝাঁঝালো দুপুরে একখানা চিঠি—দশ লাইন, বিশ লাইন. যাই হোক এবং যে কথাটা শুনতে চাই, সেই কথাটা ছাড়া আর সব কথাই—এ পাবার জন্যে আমার লোভ আছেই এবং দাদন দিয়ে এই মুনাফাটুকু আদায় করে একে কারবারে রূপান্তরিত করতেও আমি চাইনে। কিন্তু এ রকম চিঠি আসে কৈ? বাড়ী ফিরে রোজই লেটারবক্স হাতড়াই—কত রকম বিরক্তির বাণ্ডিলই পাই তাতে. লেখার জন্যে সম্পাদকের অনুরোধ. প্রতিশ্রুত সময়ে টাকা দেবার অপারগতা জানিয়ে প্রকাশকের নোট, প্রুফ-সিট, প্যামফ্লেট ক্যাটালগ—দু-চারখানা আত্মীয়ের চিঠি. তাতে কন্যার বিবাহে আর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা, একরোতল ম্যালেরিয়ার পাঁচন পাঠানোর নির্দেশ, পৌষ মাস উপলক্ষে কালীদর্শনের জন্য কালিকাক্ষেত্রে আসবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন, এমি অনেক কিছু।

কিন্তু যে চিঠি পেলে প্রাণ ভরে যায়. পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যা পত্রে-পুষ্পে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে. আপন ঐশ্বর্যে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে যা উদ্ভীত হয় অনির্বচনীয় সুরে. নিরন্তর প্রসন্নতায় যা চিত্তাকে করে ভাব-লোকে উধাও, তেমন চিঠি আসে কালে ভদ্রে. আর তা আসে বলেই তার মূল্য এত বেশী. তার কল্পনা এত উষ্ণ। সাংসারিক প্রয়োজনের পথ ধরে প্রত্যহই রাশি রাশি চিঠি আসে, সেগুলো হল বৃথা জঞ্জাল। প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবার পর ঘরের আনাচে কানাচে তারা মৃত দিনের কঙ্কালের মতো অনাবশ্যক জনতা সৃষ্টি করে—প্রবহমান জীবনের সঙ্গে খুঁজে পাইনা তাদের যোগ, তাই সেগুলোর গৃহিনী যখন সদ্গতি করেন, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি—মনে হয়, অনেক অপটুতা, অক্ষমতা ও অসাধুতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ পুড়ে শেষ হল। কিন্তু যে চিঠি সত্যই আমার প্রিয়, তা যদি খোয়া যায়, তার সঙ্গে ঘরে যায় এক একটা পাঁজরা।

উল্কা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

নৈহাটী ষ্টেশনে মেলট্রেন দাঁড়ালো মুহূর্তের জন্য, সেই মুহূর্তটুকুর মধ্যে আরম্ভ হল ছুটাছুটি. ট্রেনে ওঠা-নামা ধাক্কাধাক্কি—অর্থাৎ মুহূর্তে বিপ্লব। ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সব হয়ে যাবে নিস্তব্ধ, ষ্টেশন আবার ঝিমিয়ে পড়বে; কিন্তু এই যে একটুখানি সময়—এইটাই চলে আসছে বহুদিন ধরে—চলবেও বহুদিন ধরে এই সময়ের মূল্য নির্ধারণ।

ট্রেণের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন শোভন লাল, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, যাঁকে ছাত্রেরা বিশেষভাবে চেনে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

শুধু অধ্যাপক নামেই তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞান—সকল জড়িয়ে তাঁর পরিচয় তিনি বড় কোমল প্রকৃতির লোক, বড় সরল ,বড় অমায়িক এবং অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ।

সেকেণ্ডক্লাস কামরা—যাত্রী আছেন আরও দুইজন। নৈহাটি ষ্টেশন থেকে ট্রেনটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সোরগোল শুনে বাধ্য হয়েই শোভনলালকে মুখ ফিরাতে হল

ছোট্ট একটি মা—

হ্যাঁ, মা-ই বটে, কোলে তার তেমনিই ছোট্ট একটি ছেলে। ফুল করে মেয়েটি উঠে পড়েছে সেকেণ্ড ক্লাসে,—কয়েক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে কামরা নির্ণয় করতে সে পারে নি। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি—সেই ছোট্ট 'মা'টি। কোলের শিশুটির হয়তো ঘুম ভেঙে গেছে, সে কান্না সুরু করেছে—ওয়া ওয়া ওয়া—

কিন্তু তাকে থামানোর কথাও ভুলে গেছে তার ছোট্ট মা,—এই আলো পাখা ও গদীআঁটা কামরায় উঠে সে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, কি করবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

"ষ্টপ—ষ্টপ—"

ওপাশের বেঞ্চ হতে যে মেয়েটি এ উক্তি করলেন তাঁকে শোভনলাল চেনেন; মিস্ সেনকে অনেকেই চেনেন। জীবনের আট দশটা বৎসর তিনি কাটিয়েছেন আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষ করে শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি অধ্যয়ন আলোচনা করবার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন। বৎসর খানেক হল বাংলায় ফিরে এসে তিনি শিশু ও জননীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়বার ভার নিয়েছেন। এই সপ্তাহখানেক আগে কলকাতায় তিনি একটা বিরাট জনতার মাঝখানে এদেশের মা ও শিশুদের সম্বন্ধে এত সুন্দর লেকচার দিয়েছেন যাতে সবাই জেনেছে মেয়েদের প্রকৃত হিতৈষিণী একমাত্র তিনিই এবং দেশের বুকে সমস্ত ধনী ও দরিদ্র মেয়ের মাঝখানকার ব্যবধান ঘুচিয়ে সকলকে মানুষ করে গড়ে তুলবার জন্যই তিনি দাঁড়িয়েছেন।

ওদিকে সাহেবী পোষাকে সুসজ্জিত যে যুবকটি নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি ইংরাজী উপন্যাস পড়ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁর একাগ্র সাধনায় বাধা পড়েছে, হাতের সিগারটা টান মেরে ফেলে তিনি সগর্জনে চেঁচিয়ে ওঠেন—ইউ সোয়াইন, নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও কামরা সে।"

বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট মাও বুঝি ফেলে।

কতই বা বয়স হবে তার—বড় জোর তেরো ছাড়িয়ে চোদ্দ বৎসরে পা দিয়েছে; মুখ দেখে বয়স ঠিক করে নেন শোভনলাল। কপালের মাঝখানে বড় একটি সিন্দুরের টিপ, সিঁথায় চওড়া সিন্দুর রেখা। ঘন কোঁকড়া চুলগুলো অসম্বদ্ধ ভাবে মাথার কাপড়ের ফাঁক দিয়ে মুখ চোখের উপর এসে পড়ছে।

কচি মুখ, চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে, মনে হয় এখনিই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।

মিস্ সেন মিহি সুরে বললেন, দেখছেন—তবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—'

যুবকটি গর্জন করেন, "বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে ফেলে দেব, সঙ্গে ঐ মা-টাকেও ফেলব।"

এবার আর রক্ষা নাই—। ট্রেণের একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মেয়েটি তার শিশুকে বুকে চেপে ধরেই বসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরবে কেঁদে ওঠে।

সহ্য করতে পারেন না শোভনলাল—

"ভয় কি মা—আমি আছি, কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। এসো মা, আমার হাতখানা ধরে আমার পাশে এসে বসো—"

হাতখানা বাড়িয়ে দেন তিনি, ছোট মায়ের ঘর্মাক্ত ছোট হাতখানা ধরে তোলেন, সাবধানে তাকে নিজের পাশে বসান।

"আঃ—কি করছেন স্যার, আপনি ওর হাত ধরছেন, কত রোগের জার্ম রয়েছে ওর হাতে—"

মিস সেন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন—আমেরিকায় কিছুদিন তাঁকে শোভনলালের কাছে শিক্ষালাভ করতে হয়েছে।

রিসার্চরত মিঃ চ্যাটার্জি অধ্যাপক শোভনলালের ছাত্র, তিনিও এতখানি হাঁ করে ফেলেন।

কিন্তু শোভনলাল কোন কথায় কান দেননা—তাঁর দৃষ্টি ছোট্ট মায়ের উপর—

"আহা হা, বাচ্চাটা বড় কাঁদছে যে মা, ওকে আগে শান্ত কর, তারপর কথাবার্তা হবে'খন। আমি পেছন ফিরে বসছি লক্ষি, কিছু দেখব না! তুমি আগে বাচ্চাকে খাওয়াও দেখি।"

তিনি পিছন ফিরে বসলেন।

ও দিকে সিটে বসে চেয়ে আছেন মিস্ সেন, দুই চোখে তাঁর ঘৃণার আগুন।

সেদিকে তাকিয়ে ছোট্ট মা বড় শঙ্কিত হয়ে ওঠে, বাচ্চাকে খেতে দেওয়ার সাহস তার হয় না।

"ওরা ওরা ওরা—"

কাঁদতে কাঁদতে ক্ষুধার্ত শিশু আড়ষ্ট হয়ে যায়।

"কই খাওয়াচ্ছো না ছোট্ট মা—"

বাধ্য হয়েই, শোভনলালকে ফিরতে হয়। বালিকা কাঁদ কাঁদ মুখে মিস্ সেনকে দেখালে "ওই যে উনি, উনি কি করে চোখ পাকিয়ে—"

এর বেশী সে আর কিছু বলতে পারে না। বুঝেছেন শোভনলাল।

বললেন—"তুমি বরং নিচে বসে বাচ্চাকে খাওয়াও, কেউ তোমায় দেখতে পাবে না। ওঁরা মা হওয়ার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেন নি কিনা, সেই জন্যে কোনো মাকে সইবার ক্ষমতা ওদের নেই।"

ছোট্ট মাকে নিচে বসিয়ে দিয়ে তিনি মুখ তোলেন, আপন মনেই বলে যান, "কিন্তু মা যে কত বড় তা যদি কোন দিন চিন্তা করতে মনীষা, হয় তো তোমার জীবনে শান্তি আসতো—সুখময় একটি নীড় গড়ে তুলতে পারতে। ভুল করে চলেছো, উল্কার মতই, কিন্তু দিনও তো ফুরিয়ে এলো মনীষা, মিথ্যার বেসাতি আর কয়দিন চলবে বল—?"

শোভনলাল কি উন্মাদ হয়েছেন? প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন মিস্ সেন—"আপনি কি বলছেন স্যার, কাকে বলছেন?"

মিস সেনের মুখের দিকে তাকান শোভনলাল, বললেন, "না না, আপনাকে বলছিনে মিস্ সেন, আমি মাঝে মাঝে অমনি আবল তাবল বকি, ও এক রকম ডিলিরিয়াম বলতে পারেন—"

বলতে বলতে তিনি হেসে ওঠেন—

স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন ছোট্ট মায়ের উপর—যে কামরার মেঝেয় বসে একান্ত নিবিষ্টভাবে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। দৃষ্টি তার শিশুর মুখের উপর ন্যস্ত, সে ভুলে গেছে তার কাছে অন্য কেউ আছে।

চোখ ফিরান শোভনলাল—

তাঁর সে চোখ দুটি তখন শুষ্ক ছিলনা।

কতকাল,—সে কতকাল আগের কথা।

একটী ছিল ছোট্ট মেয়ে—আর ছিল একটি ছেলে—মেয়েটির চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়।

ছোট মেয়েটির মা একটি হতভাগিনী মেয়ে, মেয়েটি যখন গর্ভে তখন সে আশ্রয় পায় মা দয়াময়ীর স্নেহ নীড়ে। কাশী হতে ফিরবার সময় ষ্টেশনে হঠাৎ এই মেয়েটিকে দেখতে পান দয়াময়ী; তরুণী ও সুন্দরী এই বিধবা মেয়েটীকে ঘিরে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়েছিল, প্রশ্নে প্রশ্নে মেয়েটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

মেয়েটি একটি কথাও বলে নি, চোখের উপর পর্যন্ত মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়েছিল, তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরছে দেখা যাচ্ছিল।

মুহূর্তে সব বুঝতে পারেন দয়াময়ী, তাঁর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। শিশু শোভনকে দাসীর কাছে দিয়ে দৃঢ় পদে তিনি এগিয়ে যান মেয়েটির দিকে স্বামী আশ্চর্য হয়ে যান, বাধা দেন "তুমি যাচ্ছো কোথায় ওই সব ছোটলোকদের মধ্যে যেও না বলছি।"

দয়াময়ী কেবল হাতখানা তোলেন—"তুমি থামো, মেয়েটিকে আমার দরকার তাই আমি যাচ্ছি।"

স্বামী স্ত্রীর এ কণ্ঠস্বর চেনেন, একটু থতমত খেয়ে যান, মাথা চুলকিয়ে বলেন, "কিন্তু তোমার যাওয়ার কি দরকার আছে? দারোয়ান আছে, কি আছে, ওরাই ডেকে আনুক না কেন?"

ততক্ষণে দয়াময়ী এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়েছেন, ইতর লোকগুলো মজা দেখতে আরও কাছে সরে এসেছে।

দয়াময়ী মেয়েটির মুখের পানে চাইলেন, সে দৃষ্টিতে অভয় পায় মেয়েটি—সে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে, আর্তকণ্ঠে কেঁদে বলে, "আমায় রক্ষা করুন মা, এই লোকগুলোর হাত হতে আমায় বাঁচান—।"

দয়াময়ী তার হাত ধরে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র লোকগুলোর ইতরামী কথা কানে আসে, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, "রাম সিং, দোবে, মিশির, এই লোকগুলোকে এখান হতে হাঁকিয়ে দাও তো, আমার বার হয়ে যাওয়ার পথ করে দাও, এরা আমার পথ আটক ক'রেছে।"

ছুটে আসে দারোয়ানেরা, সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো ইতস্তত: সরে যায়, আর তাদের দেখা যায় না।

ট্রেনের গাড়ীতে বসে দয়াময়ী পরিচয় পান তার—

বিধবা, গ্রামের মেয়ে,—পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে সে তার দুর্ভাগ্যবশে। সব চেয়ে বেশী কষ্ট তার—সে মা হতে চলেছে। সন্তানকে সে নষ্ট করতে চায় নি, এবং সেই জন্যই সে কাশীতে লুকায়িত অবস্থাতে থেকেও কোন এক ফাঁকে পালিয়ে এসেছে। পথ সে চেনে না, চলতে চলতে এসে পড়েছে ষ্টেশনে এখানে এই লোকগুলো তাকে অনেক বিদ্রূপ করেছে, তাকে আশ্রয় দেওয়ার প্রলোভন দেখাচ্ছে।

আশ্রয় তার মিললো—অত্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় যে রকম আশ্রয় পাওয়ার কল্পনাও সে করেনি।

বর্ধমানের বাড়ীতে সবাই জানলে, মেয়েটি দয়াময়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী, সন্তান গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা হয়েছে, দয়াময়ী তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

প্রকৃত কথা জানলেন শুধু তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুই জন,—আর কেউ নয়।

দুর্ভাগিনী বিধবা রমা,—স্বামী সে হারিয়েছে, তখন ধনী শ্বশুর শাশুড়ী সবাই বর্তমান, ছিলেন। দরিদ্র পিতা কন্যাকে নিজের কাছে আনতে চান নি, কিন্তু বিধবা রমা শ্বশুরালয়ে স্থান পেলে না। দুর্ভাগ্য ও অকল্যাণের প্রতিমূর্তি বধূকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন পিত্রালয়ে, তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রইলো না।

শাশুড়ী তার পরই মারা যান, ভাসুর সংসারের কর্তা, শ্বশুর কাশী চলে গেছেন। শ্বশুরের সম্পত্তিতে বিধবার কোন অধিকারই রইলো না।

তরুণী বিধবার পদস্খলন কিছু বিচিত্র নয়—বিশেষ সে বিধবাকে যদি উদরান্নের চেষ্টায় পরের বাড়ী কাজ করতে যেতে হয়।

উত্তেজিত হয়ে ওঠেন দয়াময়ীর স্বামী সুরেন্দ্রনাথ—বলেন, "এ রকম ছোট মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত—। মাত্র বারো বছর বয়সে যে মেয়ে বিধবা হল সে সংসারের কতটুকু পরিচয় পেলে? এ সব মেয়েদের দুঃখ কষ্টের কথা আমাদের সমাজ কানে নেয় না, নিজের চারদিকে সে যে গণ্ডী টেনে রেখেছে সে গণ্ডীকে আগে ভাঙা দরকার। তুমি রমাকে বল দয়া, তার মত হলে আমি তার বিয়ে দেব, পাত্র আমি এখনই ঠিক করছি।"

কিন্তু রমা মাথা নাড়ে, দৃঢ় আপত্তি জানায়—না, বিবাহ সে করবে না। তার সন্তান আসছে, সেই সন্তানকে নিয়েই সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

কত আশাই না তার ছোট বুকের মধ্যে—।

ছেলে হলে নাম হবে পঙ্কজ, মেয়ের নাম রাখবে পঙ্কজিনী। সেই ছোট্ট শিশুর কল্পনা করে রমা—পনেরো বছরের তরুণী বিধবা—জীবনে এই একটা দিকেই আছে তার আলো, আর সব দিক অন্ধকার।

জন্মালো পঙ্কজিনী—

তার জন্মের পর তিনটি দিন মাত্র রমা পৃথিবীতে রইলো, তারপর দয়াময়ীর হাতে মেয়েকে দিয়ে সে শান্ত মনে চোখ মুদলো।

সরোষে চোখের জল মোছেন দয়াময়ী—তিনদিনের শিশু মেয়েকে তিনি কোলে তুলে নেন। দুই বৎসরের খোকা মন্টু স্নেহার্দ্র এই শিশুকে মায়ের কোল ছেড়ে দিলে।

দিনের পর দিন এই ছেলে মেয়ে দুটি মানুষ হয় দয়াময়ীর কোলে, সেই সময় তিনি স্বামীকে হারালেন।

কেউ জানলে না কারও পরিচয়, শুধু জানলে তাদের বিবাহ দেওয়া হবে, বিধবা দয়াময়ী পুত্র ও বধূ নিয়ে আবার সংসার সাজাবেন। এই তাঁর স্বামীর আদেশ।

তারপর—

তারপর কোথায় ছিটকে পড়লো সেই দুটি ছেলে মেয়ে। বাড়ীর দাসীর মুখে একদিন আত্মপরিচয় পেয়েছিল কল্যাণী—সে তখন কলেজে ভর্তি হয়েছে, ষোলো বছরের মেয়ে মাত্র।

আর শোভন পড়ছে এম এ, কলকাতায় থাকে। কদাচিৎ বাড়ীতে আসে, একদিন থেকে চলে যায়। না চান—সে এম. এ. পাস করে কাজ করবে, ততদিনে কল্যাণীও বড় হয়ে উঠবে। তাদের বিবাহ দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে মা যাবেন তীর্থে বাস করতে, বর্ধমানের বাড়ীতে থাকবে শোভনও কল্যাণী।

ভারত মেয়ে, এই পরিচয় কল্যাণী পায়।

কল্যাণীর চোখে জল আসে না, আগুন জ্বলে ওঠে,—নিজের পথ সে ঠিক করে ও ফেলে সবে সবে।

সেদিন সেই যে সে কলেজে গেল, আর ফিরলো না।

বৎসর খানেক পরে পত্র আসে—ঠিকানা তাতে ছিলনা—কল্যাণী লিখেছে—মা এই ভারত মেয়েকে নিজের ঘরের লক্ষ্মীরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কল্যাণী তাতে রাজি হতে পারলে না। শোভন তার পরিচয় জানে না—কিন্তু যেদিন জানবে সেদিন ঘৃণায় কি তার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠবে না? কল্যাণীকে যদি সে ক্ষমা করতে না পারে, যদি সে দূরে ঠেলে দেয়?—

সেই অপমান হতে বাঁচবার জন্যই সরে গেল কল্যাণী। সে জীবনে বরণ করে নিয়েছে সাথীরূপে তারই মত একটি হতভাগ্য ছেলেকে যার পিতা মাতার পরিচয় কেউ জানেনা—সে রিফিউজেতে প্রতিপালিত, সমাজ নিপীড়িতরা এই পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নিয়েছেন, তাকে নিজেদের ধর্মে দীক্ষা দিয়ে, ধর্ম প্রচারের ব্রত দিয়েছেন। কল্যাণী এই সমাজেই নিজের স্থান গড়ে নিয়েছে।

মর্মাহতা হন দয়াময়ী, ভুলবার চেষ্টা করলেন তাকে। কিন্তু শোভনলাল বিবাহ করেন নি, একা স্বচ্ছন্দ জীবন কাটিয়ে চলেছেন।

একদিন দেখা হয়েছিল—প্রায় বৎসর দুই পরে—বন্দুক রোডে ফিরতে একটী রাস্তার একখানা ঘরের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান শোভনলাল।

দেখতে পান একটি মাকে, বারোন্দায় বসে তার শিশুকে আদরই করছে বুঝি—

"মনি—মনীষা—"

অকস্মাৎ চমকে ওঠে শিশুর মা, মুখ তুলে তাকায়—

কোনদিনই শোভনলাল কল্যাণী বলে সম্বোধন করেন নি,—সে জীবনে মনীষা, নামে তাঁর কাছে পরিচিত ছিল কল্যাণী।

চকিতে ঘরের মধ্যে মিলিয়ে যায় সেই ছোট্ট মা—ফিরে আসেন শোভনলাল,—অনেকখানি সন্দেহ তাঁর মন জুড়ে থাকে।

তিন দিন বাদে আবার সেখানে যান—শুনতে পান—মেয়েটী তার শিশু কন্যা নিয়ে কোথায় চলে গেছে। প্রতিবেশীরা জানায়—সন্তানটি গর্ভে থাকতে তার স্বামী মারা গেছে,—বড় কষ্টে সে দিন চালাচ্ছে। হঠাৎ তার চলে যাওয়ার কারণ কেউ জানে না, কোথায় গেল তা সে কাউকে বলে নি।

হায় অভাগিনী মনীষা, মায়ের বড় আদরের কল্যাণী। পাছে নাকি তার জন্য—তাই সে পদ্মজিনী।

মা আছেন বৃন্দাবনে,—শোভনলাল মাকে কেবল জানালেন—কল্যাণীকে তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে আবার হারিয়ে গেছে।

বাচ্চা ঘুমিয়েছে—

মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত আরামে তুলতুলে দেহ মেলে দিয়ে বাচ্চা ঘুমোচ্ছে চোখ বুজে—।

"তুমি কোথায় যাচ্ছো মা,—।"

শোভনলাল জিজ্ঞাসা করেন।

মেয়েটি নিজের কথা বলে—।

সে গিয়েছিল তার মাকে দেখতে। মা আজ পাঁচদিন আগে খবর দিয়েছিল—সে আর বাঁচবে না—শেষবার সে মেয়েকে দেখতে চায়।

শাশুড়ী কিছুতেই পাঠাবেন না, স্বামীকে বলে, তাঁর অনুমতি নিয়ে একটা দিনের জন্যে মাত্র সে নৈহাটি এসেছিল: মা কাল মারা গেছেন,—তার মাকে সে দাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পাদ্রী সাহেবরা শ্রাদ্ধ করতে দেয় নি—কবর দিয়েছে মাটির তলায় —।

বলতে বলতে তার চোখে জল আসে—

সজাগ হয়ে ওঠেন শোভনলাল,—

"কেন, তোমার মা কি খৃষ্টান ছিল?" কিন্তু তুমি—

আর্দ্রকণ্ঠে মেয়েটি বলে, "আমার আমার মা হিন্দুর ঘরে বিয়ে দিয়েছিল। শ্বশুর শাশুড়ী যখন জানতে পারলেন, আমায় তাড়িয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু আপনার জামাই আমায় ত্যাগ করেন নি বাবা। আমার জন্যেই তিনি বাপ মায়ের কাছ হতে তফাতে গিয়ে বাসা করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে সেই ছেলে বউকে আবার নিতেই হয়েছে, মা বাপ কি ছেলে ফেলে থাকতে পারে—আপনিই বলুন বাবা—"

চমৎকার সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে ছোট্ট মেয়েটি, সরে তাঁর পায়ের কাছে কখন এসে বসেছে, গায়ের উপর হাত রেখেছে।

শোভনলাল বিকৃত হাসি হাসেন—

বললেন, "ঠিক কথা, মা বাপ সন্তানকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারেন না—যেমন তুমি তোমার খোকাকে একদণ্ড বুক ছাড়া করতে পারো না। হ্যাঁ, তারপর তোমার মা—তোমার মায়ের নামটা কি ছিল জানো মা?"

কমলা বললে, জানি বাবা, আমার মায়ের নাম ছিল মনীষা, আমার মা অনেক লেখাপড়া জানতো বাবা, তখন তার নাম ছিল নাকি কল্যাণী। ছোট্ট বেলায় মাকে দেখতাম কলে কাজ করতে যেতে, বড় কষ্টে আমাদের দিন কাটতো। তাই তো মা কলে কাজ করবার সময় তোমার জামাইকে দেখে পছন্দ করে তাড়াতাড়ি আমার বিয়েটা দিয়ে ফেললে—তখন আমার বয়েস মাত্র সাত বছর। সেই বয়েসেই মা আমায় শ্বশুরবাড়ী নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবু মাঝে মাঝে যেতাম, কিন্তু যখন শ্বশুর জানলেন, মা জাত লুকিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছেন তখনই না গোলমাল বাধলো—।"

বলতে বলতে মুখ তোলে কমলা।

শ্রোতা তখন জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, মন তাঁর কোথায়—কি চিন্তা করছে কমলা সে সন্ধান পায় না।

মনীষার মেয়ে—তাঁর সেই মনীষা—সে মরেছে, ঠাণ্ডা মাটির মধ্যে বিশ্রাম করছে সে।

"ওরা ওরা ওরা—"

বাচ্চা ঘুম ভেঙে কাঁদে, তুলতুলে ছোট ছোট হাত পা ছুড়ে দারুণ অসন্তোষ জানায়—

তার ছোট্ট মা তাকে শান্ত করতে হিম্‌সিম্ খায়—। তার মুখের দিকে তাকান শোভনলাল—

চোখের সামনে কল্যাণীর মুখখানাই জেগে উঠেছে তার ছাপ দেখা যাচ্ছে তার মেয়ে কমলার মুখে।

ও দিক্ হতে পরম বিস্ময়ে মিস সেন তাকিয়ে দেখেন—পরম পণ্ডিত শোভনলাল ছোট্ট মায়ের ছোট্ট শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ভুলাবার চেষ্টা করছেন, শিশু ছোট্ট মা-টি ভয়ে বিস্ময়ে, লজ্জায় সঙ্কোচে তাঁর পানে তাকিয়ে একান্ত নিরুপায় ভাবে হাত দুইখানা কচলাচ্ছে।

বৃদ্ধার মিস্ সেন শিউরে উঠলেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও বিবাহ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুবিবাহ এবং বিচ্ছেদ বিল সম্পর্কে প্রবল বাদানুবাদের ঝড় বইছে সমস্ত দেশের উপর দিয়ে। এই ব্যাপারে আধুনিক মনীষীরা কি ভেবেছেন তা জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের (Bertrand Russel) বইগুলো আবার পড়তে সুরু ক'রে দিয়েছি। Principles of Social Reconstruction-এর উপসংহারে তিনি লিখেছেন: দুটো মূলনীতিকে অনুসরণ করলে আমাদের রাস্তার ভুল হবে না। প্রথম নীতি হোলো—ব্যষ্টির উন্নতি, সমাজের উন্নতি। দ্বিতীয় নীতি হোলো: ব্যষ্টির অথবা সমাজের উন্নতি করতে গিয়ে আর একজনের অথবা আর এক সমাজের ক্ষতি করা চলবে না। দ্বিতীয় নীতির মূল কথা হোলো শ্রদ্ধা বা Principle of Reverence. অন্যদের সঙ্গে আচরণের বেলায় ব্যক্তিকে হ'তে হবে মানব। শ্রদ্ধা কথাটার তাৎপর্য হোলো: আমাদের নিজেদের জীবনের যে-পরিমাণ মূল্য অথবা গুরুত্ব আছে ব'লে মনে করি অন্যের জীবনেরও সেই পরিমাণ মূল্য অথবা গুরুত্ব আছে।

রাসেল বলছেন, অন্যের জীবনকে সম্মান দান করবার আদর্শ স্বয়ম্পূর্ণ আদর্শ না হ'লেও লক্ষ্য হিসাবে খুবই মূল্যবান। কেন? কারণ নিজেরা জোরের সঙ্গে বাঁচবো—এই ইচ্ছা অত্যুগ্র হয়ে উঠলে আমাদের বাঁচবার প্রবল উদ্যম অন্যের পক্ষে উদ্বেগেরই কারণ হয়ে ওঠে। ইউরোপের বিরাট প্রাণোদ্যম আফ্রিকাকে শোষণে শোষণে অন্তঃসারশূন্য ক'রে ফেলেছে। নিগ্রোরা সেখানে বহন করে শেয়াল-কুকুরের বিকৃত জীবন। পুরুষদের জীবনীশক্তির প্রাবল্য মেয়েদের আত্ম-প্রকাশের পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করেছে।

রাসেল বলছেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে মূল্য দেওয়া যেতে পারে কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে প্রত্যেকেরই আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে, যেখানে দাসত্ব নেই, প্রভুত্ব নেই, যেখানে প্রীতির বন্ধনই একমাত্র বন্ধন। রাসেলের মতে বিবাহিত জীবনে দম্পতির পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এত গভীর হওয়া উচিত যে একজন আর একজনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কথা চিন্তাতেও আনতে পারবে না। নারীর আর পুরুষের সাম্পত্যজীবনে এই স্বাধীনতার মূল্য আজ স্বীকৃত হয়েছে কতটুকু? মাতাল স্বামীর অত্যাচারের চিহ্ন সর্বাঙ্গে বহন ক'রে কত স্ত্রী ঘরে ঘরে ফেলছে দীর্ঘশ্বাস; কামান্ধ পতির পৈশাচিক প্রবৃত্তির অনলে পুড়ে যাচ্ছে কত নারীর স্বাস্থ্য এবং পরমায়ু!

নারীর মধুময় স্বপ্নের কী শোচনীয় সমাধি! শক্তিমান পুরুষের বাহুবন্ধনের মধ্যে আনন্দময় আত্ম-সমর্পণ! তার সেবায় জীবন, যৌবন, মন এবং প্রাণ—সমস্ত কিছুকে নিবেদন করে দেবার পরম পরিতৃপ্তি! কিন্তু এ আত্মোৎসর্গের পরিণতি কোথায়? পূজার পুষ্প প'ড়ে থাকে পাষাণ-দেবতার কঠিন পদতলে; পুরুষের মুখে কঠিন অহমিকার ছাপ! উপেক্ষিতা নারীর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা কান্না!

মুক্তির কামনায় পাগলিনী হ'য়ে উঠেছে কি কেবল মেয়েরাই? হাজার হাজার পুরুষ রয়েছে যারা করে নারীর এবং পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত স্বাধীনতা। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাবার সামর্থ্য নেই, শাঁখা-পরা দুটী হাতের পরিচর্যা নিয়ত গ্রহণ ক'রে চলেছি—এমন অবস্থা অনেক পুরুষের

দৃষ্টিতেই আজ লোভনীয় নয়। পুরুষ কি ডিভিয়ে থাকার যাঁর তাকে অন্নেরা শুধু কলসী আর বাদাম খাইয়ে যাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর? পতিদেবতা হ'য়ে শুধু পরিচর্যা গ্রহণ করাতেই কি আনন্দ? পরিচর্যা করার মধ্যেও কি আনন্দ নেই? সহকার তরু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষ অটল মহিমায় এবং নারী তাকে জড়িয়ে আছে পাকে পাকে মাধবীলতার মতো—নারী আর পুরুষের এমন একটা আশ্রয়-আশ্রিতের সম্পর্কই বা চিরকাল ধ'রে গৌরব পাবে কেন? কেউ কারও আশ্রয়ে থাকবার জন্যে তো তৈরী হয় নি, কেউ কারও তুলনায় তো একচুল কম নয়! নারীর শক্তি এক-একজন পুরুষের শক্তি আর একরকমের। পুরুষের করা সম্ভব নারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে নারী যা করতে পারে পুরুষ তা করতে পারে না। দু'জনকে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে দিতে হবে প্রচুর সুযোগ, প্রচুর স্বাতন্ত্র্য। একজন সহানুভূতি সহযোগিতা দিয়ে আর একজনের আত্মপ্রকাশে সাহায্য করবে। রাসেল বলছেন: ভালবাসা যেখানে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত সেখানেই শুধু প্রেমের বিকাশ সম্ভব। অমুককে ভালোবাসা আমার কর্তব্য—এই কর্তব্যবোধ তো প্রেমের সমাধি রচনা করে। প্রেমিক প্রেমাস্পদকে বিধিনিষেধের বন্দীশালায় বেঁধে রাখবে না। অসীম বিশ্বাসে এবং শ্রদ্ধায় সে তাকে চলতে দেবে নিজের পথে। পুলিশের কাজ তো শুধু বারণ করা। অমুক কাজ কোরো না, অমুক কাজ করো না-এ কথা বলবার জন্যে আছে পুলিশ। পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গিমা তো স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিমা হতে পারে না। একজন আর একজনকে সর্বদার জন্যে কড়া পাহারায় রেখেছে পাছে সে অপর কোন পুরুষের অথবা মেয়ের খুব নিকটে যায়—এরকমের দাম্পত্যসম্পর্ক নিশ্চয়ই গৌরবের হতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে ভালবাসা যখন উবে যায় কর্পূরের মতো, একজন আর একজনের পক্ষে যখন পুলিশের সামিল হয়ে দাঁড়ায়, জীবনের দিগন্ত থেকে যখন মিলিয়ে যায় আলোর শেষ রশ্মিটুকু তখন মানুষ খোঁজে বিবাহের চির নির্বাসন থেকে মুক্তির রাস্তা। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন দেখা দেয় পরিণয়ের নাগপাশ থেকে জীবনকে মুক্ত ক'রে তাকে সুষমায় করবার জন্যে।

রাসেল বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন; বিবাহ-বিচ্ছেদকে সহজ ক'রে দিলেই বিবাহিত জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনে। সুদীর্ঘকালের দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য এবং মহিমা আছে তার সঙ্গে নতুন প্রেমের ফেনিল উচ্ছ্বাসের কোন তুলনাই হতে পারে না। বছরের পর বছর বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে চলে আসা, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, কখনো আলোয়, কখনো ছায়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জীবনকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করা—এর অভিজ্ঞতা দুর্লভ। কালই শুধু নরনারীর প্রেমের সম্পর্ককে দান করতে পারে পরিপূর্ণতা। রাসেল বলছেন: A Companionship which has lasted for many years and through deeply felt events has a richness of content which cannot belong to the first days of love, however delightful these may be. আরও বলছেন: দীর্ঘকালের দাম্পত্য জীবনের প্রেমের গৌরবকে হেলায় বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রেমের পিছনে ছোটার মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় আছে অল্পই।

তবে বিবাহিত জীবন সুষময় হবারও কতকগুলি সর্ত আছে। প্রথমতঃ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই অনুভব করবে একে অপরের সমান; কেউ কারো তুলনায় কম নয়। দ্বিতীয়তঃ কোন পক্ষ কোন পক্ষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেনা; তৃতীয়তঃ শরীরের এবং মনের ঘনিষ্ঠতা কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হবে না; সর্বশেষে দুজনের রুচির এবং আদর্শের মধ্যে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য থাকা দরকার।

রাসেল বলছেন, এই রকমের অবস্থায় বিবাহের সম্পর্কের মতো এমন কল্যাণময় এবং মধুময় সম্পর্ক আর হতে পারেনা। নর নারীর দাম্পত্য-জীবনে যেখানে পরিপূর্ণতা আসেনি সেখানে বুঝতে হবে একজনের কাছে আর একজন পুলিশের সামিল হ'য়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে পুরুষ অথবা নারী যদি আপন আপন স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে পারে তবেই বিবাহ সার্থক হবার সম্ভাবনা আছে।

রাসেল বিবাহিত জীবনে যৌন সম্পর্কের প্রাধান্যকে স্বীকার করেন না। I regard marriage not primarily as a sexual partnership but above all an understanding to co-operate in the procreation and rearing of children. পুত্রকন্যার জন্ম এবং তাদের মানুষ করার ব্যাপারে নারীপুরুষের আনন্দিত সহযোগিতাই বিবাহের প্রধান কথা—এই হোলো রাসেলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হয়েছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা!

বিয়ে তো শুধু নর-নারীর একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বিয়ের একটা সামাজিক দিকও আছে। সংসারে যখন বাচ্চা আসে তখন থেকে দম্পতির সম্পর্ক, তাদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক আর থাকে না। শিশুর নিজের কল্যাণের প্রশ্ন আসে এবং সেই সঙ্গে জাতিরও। কারণ শিশু জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। শিশুর প্রশ্ন না এলে নারী এবং পুরুষ তাদের সম্পর্ককে খুসীমতো ভাঙতে পারে। কিন্তু শিশুর জীবনকে পিতামাতার খেয়ালের কাছে কিছুতেই বলি দেওয়া যেতে পারে না। বাপ অথবা মা ক্ষণাগত সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী বদলালে শিশুগুলো যায় কোথায়? শিশুর শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে মা-বাপের মতো এমন সহায় আর কোথায়? বিশেষতঃ ছেলেমেয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে মায়ের মতো এমন গভীর ক'রে আর কে জানতে পারে? আর শিক্ষার উদ্দেশ্য তো শিশুর ব্যক্তিত্বকে উন্মেষিত ক'রে তোলা। সেই মা যদি শিশুকে পরিত্যাগ ক'রে আর একজনকে বিয়ে করে শিশুর জীবনকে কতখানি পঙ্গু ক'রে দেওয়া হয় তা সহজেই অনুমেয়। শিশু যদি তার বাপের দুরুচ্ছায়ার স্নেহময় পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়—সে দুর্ভাগ্যও কম নয়। এই জন্যে বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যাকে লঘু ক'রে দেখলে উপেক্ষিত শিশুর তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ জাতির ভবিষ্যৎকেই অতলে ডুবিয়ে দেবে। তাই একদিকের নর-নারীর জীবনের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেবার যেমন দরকার আছে আর এক দিকে সেই স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হ'য়ে শিশুর জীবনকে যাতে পঙ্গু ক'রে না দেয় সেদিকেও দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে। সর্বশেষে রাসেল যে কথাটির উপর জোর দিয়েছেন তাহলো প্রথম প্রেমের কুজন গুঞ্জনের মধ্যে যতই উচ্ছ্বাস, যতই ঔজ্জ্বল্য থাক্—বহুদিনের সুখে-দুঃখে গাঁথা নর-নারীর দাম্পত্যজীবনে সে একটা অনির্বচনীয় মাধুর্য ছড়িয়ে থাকে তার কাছে আর কোন মাধুর্যই দাঁড়াতে পারে না। প্রথম শুভদৃষ্টি-পাতের সময়ে একজন আর একজনের কাছে স্বর্গের দূত অথবা স্বর্গের দেবী। প্রাত্যহিক জীবনের নৈকট্যে মোহ হয় অপগত। একজনের কাছে আর একজন তার চরিত্রের ভালোমন্দ নিয়ে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তার পর চলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের পালা। দুজনের জীবন টানা এবং পোড়েনের মতো একসঙ্গে যায় জড়িয়ে। একজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা আর একজন ভাবতেই পারে না। যে নয়নের সম্মুখে ছিল সে নয়নের মাঝখানে নেই ঠাঁই. এই সম্পর্ককেই হিন্দুবিবাহ দিয়েছে মর্যাদা। রাসেলও একেই মর্যাদা দিয়েছেন। চক্‌চক্ করলেই তাকে স্বর্ণের গৌরব দেওয়া কি ঠিক?

"মল্লার"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বরূপ মণ্ডল বললে—"হয় দা'ঠাকুর। নিজের চোখে দেখা জিনিস, হয় না বললেই তো মেনে নিতে পারিনে। পাশের চোটে আকাশ থেকে জলও নামানো যায়, তেমনি আবার পৃথিবী থেকে আগুনও টেনে তোলা যায়।"

আমি যাঁদের বাড়ীতে এসে উঠেছি তাঁদের একজন প্রতিবেশী এই সময়টা সা-রে-গা-মা সাধেন। ভাবলাম স্বরূপের ওখানেই গিয়ে তা'হ'লে নয় একটু বসি।

সা-রে-গা-মা সাধা থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথা উঠল। মসনেটা ছোটবড় জমিদারের জায়গা ছিল, এক সময় বড় বড় ওস্তাদরা এসেছে গেছে; স্বরূপেরও কয়েকটা দরবারী চীজ ছিল, তাই থেকে হয়তো শুনে শুনেই বড় বড় রাগ-রাগিণী গুলার নাম, সময়, কয়েকটার ঠাট-বাট দেখলাম জানা আছে। নাতির ছিপের জন্যে একটা বাতা চাঁচতে চাঁচতে খানিকটা আলোচনা ভাসা-ভাসা ভাবে চালিয়ে গেল। সঙ্গীতের অলৌকিক শক্তির কথাটা আমি নিজে থেকেই তুললাম, এ-বিষয়ে স্বরূপের যদি থাকে কিছু পুঁজি তো আপনিই বেরিয়ে আসবে। কৌশলটা জানা আছে, —নিজেই তুলে আবার নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করতে অভীষ্ট সিদ্ধি হোল।

মোড়াটায় একটু গুছিয়ে ব'সে বললাম—"বিশ্বাস অবশ্য হয়না এসব কথা, তবে তুমি যখন বলছ নিজের চোখে দেখেছ···"

"কি বিশ্বেস হয়, কি হয়না তার একটা পাকাপাকি হদিস পেতে হলে মসনেতে জন্মাতে হবে দা'ঠাকুর। এখনকার নয়, সেই সাবেক কালের মসনেতে, এখন আর মসনের আছে কি, শুধু নামটা আছে পড়ে।···গানের কথাই ধরা যাক না, নিতাইমল্লিক সরগম সাধবে—খোসা, এখনও শাঁষে পৌঁছায় নি, ভিষ্টুতে না পেরে চলে আসতে হোল আপনাকে; আর এও দেখেছি, পাল চৌধুরীদের নহবৎ খানায়—রাত্তিরে দরবারী কানাড়া ধরেছেন ওস্তাদ আলে খাঁ—মেটেবুরুজের নবাব দিয়েছেন পাঠিয়ে, চৌধুরীদের সঙ্গে খুব দহরম্ মহরম্ তো তখন—তা পাড়ায় বিপটা সিঁদ পড়ে গেল, কেউ একটু টেরও পেলে না এরকম একটা পাইকিরি চুরির কথা···সুরে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানগম্যি তো নেই ছেলেবুড়ো কারুরই।"

বিপদ না সম্পদ ঠিক বুঝতে না পারায় একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইতে হোল, স্বরূপ, একটু হেসে বললে—"আজ্ঞে না পরীক্ষে। আগেকার জমিদারদের ঐরকম তো খেয়াল হোল, লোক লাগিয়ে চুরি করানো। যার যা গেছল ঠিকই ফিরে পেলে, তার ওপর কিছু কিছু করে বকশিষও; ওস্তাদ আলে খাঁকে একজোড়া শাল আর একগুচ্ছ মোতির মালা দিয়ে বিদায় করা হোল।"

বললাম—"পাঁয়ে বেশ সাড়া পড়িয়ে গেলেন বলে ওস্তাদ আলে খাঁ!" "তা বেশ খানিকটে পড়ল বৈকি দা'ঠাকুর, ব্যাপারটা তো সোজা নয়। যদি বলেন বিজয়া দশমীর রাত ছেল, সিদ্ধির নেশা,—এরকম রটাবার লোকও যে না ছেল এমন নয়,—তা বেছে বেছে ঐ কটা বাড়ীর ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ সবাই সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে ছেল, একথাও তো মেনে নেওয়া যায় না দা'ঠাকুর ···ওরা বেড়াক না বলে, তবুও দিব্যি সাড়া পড়ে গেল পাঁয়ে—হ্যাঁ, নবাব দরবারের গাইয়ে, সে একখানা গেল শুনিয়ে গেল বটে। তবে সাড়টা আর বেশিদিন রইতে পারল কৈ?"

প্রশ্ন করলাম—"কেন, কি হোল?"

"হোল—ঐ যে বললুম আকাশ থেকে জল টেনে নামানোর কথা—তাই আর কি।"

নাতনীটি কলকে সেজে নিয়ে এল। কড়ি-বাঁধা হুঁকোয় বসিয়ে আমায় এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, স্বরূপ কাতা আর বাঁখারিটা পাশে রেখে দিয়ে বললে—"ইদিকে নে' আয় কলকেটা, এ দা-কাটা ধরিয়ে নেওয়া ওনার সাধ্যি নয়।" গোটাকতক লম্বা টানে আগুনটা জালিয়ে আবার কলকেটা বসিয়ে দিয়ে আরম্ভ করবে।—

"যাখনকার কথা বলচি দা'ঠাকুর, তাখন মসনেতে বাখা-ভাল্লুকের লড়াই চলচে; উদিকে পালচৌধুরীরা ইদিকে দক্ষিণপাড়ায় রায়চৌধুরীরা। পরে অবিশ্যি দুদিকেই ভাঙন ধরল, আস্তে আস্তে প্রেথক হতে লাগল তো সবাই; তাখন কিন্তু দুদিকেই কর্তারা খোদ বেঁচে—রায় চৌধুরীদের তরফ থেকে একটু কিছু যদি হোল তো পালচৌধুরীদের তার পাল্টা জবাব না দেওয়া পর্যন্ত আর নিস্তার নেই; দুগ্‌গো প্রতিমা কত বড় হবে তা থেকে ইস্তক আলে খাঁ মেটেবুরুজ থেকে এসে কি গেয়ে গেল সে পর্যন্ত। একটা না একটা কিছু লেগেই থাকত—বারো মাস তিরিশ দিন, জুড়ুতে তো পেত না। মসনের সে এক সময় গেছে দা'ঠাকুর, যখুনি দেখো, গমগম করচে, আর এখন দেখুন না, গাঁ যেন গুলি খেয়ে কিমুচ্ছে।"

কিরকম হঠাৎ একটা স্মৃতির ঘোর এসে গেছে, স্বরূপ একটু চুপ করে বাতা চাঁচতে লাগল, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। কিছু একটা বলা দরকার মনে করেই আমি বললাম—"যুগ তো বদলায় স্বরূপ, তখনকার কালে কর্তাদের এইসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর ছিল, ঘামাতেনও; আর আজকাল

স্বরূপ মুখ তুলে চাইলে, বললে—"তবেই হয়েচে! কর্তাদের মাথা কোথায় যে মাথা ঘামাবে দা'ঠাকুর? আসল কথা মসনের লোকেই তাখন এরকম নিঃঝুমের পালা বরদাস্ত করতে পারতনা—যেন শ্মশান জেগে বসে থাকা নয়? উসকুনি দেবার, কলকাটি নাড়বার লোক ছেল, তারাই আসরটা গরম রাখত, তারপর দেউড়ির বাইরে এসে আবার সব এক। তা হবেনা কেন বলুন, এই তো আমারই জ্যেঠা ছেল নরোন পাল চৌধুরীর ছিলিম-বরদার, হুঁকো থেকে নিয়ে বোতল পর্যন্ত যা কিছু সব তাঁর এলাকায়। আর ঠিক ঐ কাজেই রায়চৌধুরী মশায়ের ওখানে ছেল আমার কাকা; দুই ভাইই-তো। এদের শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হোত, এরা তালের মাথায় একটা কথা বেশ গুছিয়ে কানে তুলে দিত! ব্যাস, তারপর নাও না! নৈলে, ঐ যে বললুম, কর্তাদের নিজেদের মাথা কোথায়—যে মাথা ঘামাবে?···"

আমার দিকে একটু হেসে চাইতে বললাম—"এখানটা ঠিক বুঝলাম না তো।"

"সে সময়টা পাঁটি বিলিতী যাল নতুন ঢুকেচে তো, কর্তাদের বোতল থেকে কুরসৎ পাকত কোথায় যে গাঁয়ে কি জমিদারিতে কোথায় কি হচ্ছে তার খোঁজ রাখবে? এদিকে উড়ো-কাপটা এর মুখ ওর মুখ দিয়ে একটা খবর পৌঁছল, তবেই, নৈলে একটা গুলতন পাকাতে হলে উদিকে জ্যেঠা আর ইদিকে কাকা—এদের দুজনাকে গিয়ে ধরতে হোত। অবিশ্যি দেওয়ান আছেন, খাজাঞ্চি আছেন, মোসাহেবরা আছেন, মোকা পেলে নিজেরাই এক আধটা কথা দিতেন কানে তুলে, কিন্তু ওনাদের মতন মোকা তো সব সময় পেতেন না এনারা।

গানের ব্যাপারেও তাই হোল। পাল চৌধুরীদের আলে খাঁকে নিয়ে সোরগোল পড়ে গেছে গাঁয়ে, এ-তরফের যারা তাদের পক্ষ চলা দায় অথচ কর্তা তখন খাস কামরা থেকে একবারও বেরোন নি যে কথাটা কানে গেছে কি না গেছে তার একটা হদিস পাওয়া যাবে। শেষে যাখন সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়, খাজাঞ্চি গোকুল লাহা কাকাকে ডেকে বললেন,—'বিদ্যাবন, আর যে রান থাকে না। সন্ধ্যের পর থেকে তো আবার নতুন ক'রে সুরু হবে।'···কাকা বললে—'দাঁড়ান, দেখি একবার হালচালটা।"

বরাতগুণে একটু পাতলা হয়ে এসেছিল খামারিটা, কাকা গিয়ে একটু খুটখাট শব্দ করতেই জিগ্যেস করলেন—'কে?'···না, 'আমি বিদ্যাবন।'

'ছিলিম সাজ, ছিলি কোথায় ?'

কথার তো জবাব দেওয়া দরকার ছোড থাকলেও—ছিলি কোথায় ? না থাকলেও ছিলি কোথায় ? কাকা ইচ্ছে করেই একটু গড়িমসি করে ছিলিমটা সাজলে, নল করে খামারি ভাইপো বার দুই তামাকও আদায় করলে, তারপর কতকটা যেন অনুতপ্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে ছিলিমটা গড়গড়ার মাথায় বসাতে বসাতেই ওটা ক'রে টুসকি দিয়ে গোটা তিনেক ছাই তুললে।

কত্তা একবার চোখে চাড়া দিয়ে দেখে নিয়ে জিগ্যেস করলেন—'রাত্তির প্রেচিস মনে হচ্ছে যেন ?'

একরকম সমস্ত রাত হুজুর।'

'ব্যাপারখানা কি ?'

কাকা সেখেনে কমাবার যেখেনে বাড়াবার সব বিস্তর করে বলে গেল, তারপর শেষের দিকে এসে একটু প্যাঁচ কষে দিলে—'এই তো গান হুজুর, যাদের একটুও কান আছে ওদিকে তাদের সমস্ত রাত চোখের পাতা এক করবার উপায় ছেল না—বোপার বলে আমি পড়ে আচি, কিন্তু কী সাড়াটাই জাগিয়ে দিয়েচে পাঁয়ে—আবার ঐ কারচুপিটা রয়েচে কিনা—বিশখানা ঘরে সিঁদ পাঁয়ের মধ্যে, সব এমনি হেতে ছিল গান শুনতে—এখন ওনাদের কোন্ শ্যাওড়াবনের আলে ঘাঁর জ্যোতিতে আর রাস্তা চলবার উপায় নেই হুজুর।'

হুকুম হোল—'দাওয়ানজীকে ডেকে নে আয়।'

দেওয়ান ছিলেন তখন মথুরা ঘোষাল, এসে এত্তালা দিলেন—"ডেকে পাঠিয়েছেন ?'

কত্তা চক্ষু বুজেই গড়গড়া টানতে টানতে বললেন—'বিন্দে ব্যাটা কি বলচে ?—একটু চোখ বুজেচি কি না বুজেচি এর মধ্যে নারানে পাল নাকি খুব এক চেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেচে ? এরকম হোলে তো আমার মসনের বাস উঠিয়ে চলে যেতে হয়। সব করছিলেন কি ? আপনারাও গানের চোটে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি ?

তেতেচেন দেখে এঁরা দুজনে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, দাওয়ানজী বললেন,—"ঘুম ঘুরে থাকু এ তরফের কেউ চোখের পাতা এক করতে পারেনি সমস্ত রাত ; হ্যাঁ কাকে গান বলে তা না জানত তো সে আলাদা কথা।'

চোখে চাড়া দিয়ে ঘুরে চাইলেন, বললেন—'ও-কথা বললে তো শুনব না। ঘুমুচ্ছিলেন না তো বিহিত কি করা হয়েচে ? আমায় কেন কেউ তুলে দেয় নি ? আমার ঘুম তো অত সস্তা নয়।'

নায়েব সাজিয়েই তো উপস্থিত হওয়া, ঘোষালমশাই বললেন—'এ তুচ্ছ কথা নিয়ে হুজুরের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে ? একে তো একটু আরাম করবেন সে ফুরসৎই হয় না বড় একটা। এই জন্যেই আর কেউ গা করে নি।'

পর্দার পর্দার মেজাজটা তুলতে হবে তো ? কত্তা জবাফুলের মতন চোখ দুটোতে আর একটু বেশি চাড়া দিয়ে ঘুরে চাইলেন—'ব্যাপারটা তুচ্ছ হোল আপনাদের কাছে ?'

দাওয়ানজী বললেন—'গান হোল সগ্‌গ্‌ থেকে আমদানী করা জিনিস হুজুর, কত ভালো ভালো কাজ করা হবে তাই দিয়ে। তা ভালো কাজ কি হোল, না, ঘরে ঘরে সিঁদ কাটানো—এই নিয়ে বাহবা, এই নিয়ে চাক ঢোল পেটানো। একটা লজ্জার কথাই, তবে মসনের নাকি এমনই হালাৎ হয়েচে—বহুদিন গান কাকে বলে তা না শুনে, তাই একেবারে হেদিয়ে পড়েচে তা এনিয়ে হুজুরের আরামে ব্যাঘাত দেওয়া এতে কারুর মন সরবে কেন ?'

কত্তা চোখ বুজে শুনছিলেন, বললেন—'বিন্দে ছিলিমটা পালটে দে।'...'আপনার হুঁকোটাও একটু কাৎ করুন দা'ঠাকুর।'

হুঁকোটা এগিয়ে ধরতে কলকেটা তুলে নিয়ে স্বয়ং গোটাকতক টান দিয়ে আবার বসিয়ে দিলে, কাতা আর বাঁধারিটা তুলে নিয়ে আরম্ভ করলে—

'তাহলে কথা হোল মসনেকে গানের মতন শোনাবার ব্যবস্থা কি করা যায় যাতে পালচৌধুরীদের মুখে চুণকালিও পড়ে, ইদিকে মসনেরও এ কাণ্ডালপনা ঘোচে, আর অন্যদিক দিয়েও একটা কাজের মতন কাজ হয়। আমলা মোসায়েব সবাইকে ডাকা হোল।

বেশ মনে আছে দা'ঠাকুর, তাখন তো একেবারেই ছেলেমানুষ আমরা, তবু তেমনি নাকি সাড়া পড়ে গেছল, আগাগোড়া সব একটু একটু করে মনে আসছে। বিরাশী সনের কথা; আশী একাশী দুটো বছর একফোঁটা বিষ্টি হয় নি, চারিদিক খটখট করচে, চাষের মাঠ ফেটে চৌচির। ইদিকে আষাঢ় মাস শেষ হয়, বিষ্টি দূরে থাক, আকাশে একটা কালো আঁচড় নেই কোথাও, সমস্ত দিন যেন জ্বলচে। গরম, সে অসহ্যি, রাত্তিরে ঘুমোয় কার সাধ্যি। সেদিনকার কথা। বাবা, জোঠা, ছোটকাকা উঠোনে বসে গুড়ুক খাচ্ছে, আমরাও ইদিক উদিক ছড়িয়ে রয়েচি, মেয়েরা দাওয়ায়, পালচৌধুরীদের ঘড়িতে রাত এগারটা বাজিয়ে দিলে, কিন্তু কেউ যে ঘরে গিয়ে বিছানায় উঠব তার জো নেই—এমনি তাত। চাষ আবাদের কথাই হচ্ছিল ওনাদের মধ্যে। বাবা আর ছোট কাকা—ঐ দিকটা দেখত। ছোটকাকা বললে—না, মন্বন্তর এসে পড়ল, কেউ ঠ্যাকাতে পারবে না এবার।'

ঠিক এই সময় কাকা দেউড়ী থেকে এসে উপস্থিত। ঠিক কথার মাঝখানে—যেন যাত্রার আসরে শ্রীরাধিকের কথা ফুরতে না ফুরতে বিশাখা সখী এসে ঢুকল।

আসতে আসতেই ছোটকাকাকে বললে—"কাল উঠেই আগে দুই মাটি কেটে ক্ষেতের আলগুলো মেরামত করে রাখগে।···মসলেতে কিনা মন্বন্তর!···মহিম রায় চৌধুরী এখনও বেঁচে, একটু সমঝে বুঝে কথা বলবি।"

জোঠা জিজ্ঞেস করলে—"যজ্ঞি করচে নাকি?...ঠাকুর দেবতারা আর ওসব খোসামোদে ভোলে না। জয়-মঙ্গলের স্তালেরা গত সনে তো তিরিশ মন ঘি পুড়িয়ে দিলে, হোল কিছু?"

কাকা ওনার হুঁকো থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে একটু তফাৎ হয়ে পেছন ফিরে বসল। দুটো টান দিয়ে মুখ পুরিয়ে বললে—'মহিম চৌধুরী খোসামোদের দিকে যায় না, নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে আসবে, দেবতাই হও কি যেই হও। ঘি তেলেপড়ি নয়, এবার একেবারে মল্লার!'

তারপর সব ভেঙে বললে। গান শুনিয়ে ঘরে ঘরে সিঁদ কাটানো, এতে বাহাদুরিটা কি যে তার জন্যে এত হৈচৈ? তাই ঠিক হয়েচে—তিন বছর থেকে শুকো চলেচে, মল্লারের আমদানি করতে হবে, তানসেন মিঞা বাদশার হুকুমে যা ক'রে জল নামাতেন। কাশীতে তখন সব চেয়ে বড় গুণপনা চলেন গিরিধারীলাল, সন্ধ্যেলেই লোক বেরিয়ে যাবে, বাহনা দিয়ে পাখোয়াজী সুদ্ধু সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

সকাল থেকেই কথাটা চারিয়ে পড়ল, আলে খাঁর দরবারী কানাড়া নিয়ে একটা হৈচৈ চলছেলই, তার ওপর এই নতুন ঢো উঠে মসনেকে একেবারে সরগম ক'রে তুললে। যেখানেই যান, হয় দরবারী কানাড়া না হয় মল্লার; কেউ মল্লার দরবারী কানাড়াকে ভাসিয়ে দিলে—জল কবে নামবে সে পরের কথা পরে। কথাটা বুঝলেন না দা'ঠাকুর?—আকাশ খুঁড়ে জল নামাবে, ফসল ফলাবে, একটা মন্বন্তরকে রাখবে ঠেকিয়ে, তার সামনে তো সিঁদ-কাটা দরবারী কানাড়া দাঁড়াতে পারেনা। আলে খাঁ ডুবল, গিরিধারীলালকে নিয়ে কাহিনী চারিয়ে পড়তে লাগল খাঁয়ে—বুড়োদের মুখ থেকে—তানারা শুনেছেন গিরিধারী-লালের গান, নীচে গান ধরলে ওপরে ইন্দ্রিরের সভায় মাদল বাজে—মল্লার গেয়ে বাবা বিশ্বনাথের মাথার ওপর থেকে মেঘোকিনীর জল নামিয়ে আনেন গিরিধারীলাল—এইরকম একসে এক কাহিনী সব, আলে খাঁ মাথা হেঁট করে মসনের আসর থেকে বেরিয়ে গেলেন; মল্লার যবে হবে তবে হবে।

কি হোতে না হোতে বলা যায় না দা'ঠাকুর, পিথিমীতে সবই তো সম্ভব, নৈলে একটা ছোট্ট লোহার কলে এতগুলো গাড়ীকে হাওয়ার মতন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি করে? কি

ছোঁয়া না ছোঁয়া বলা যায় না, তা ওদের এল গিরিধারীলাল বাহেন্দা নিতে পারলেন না, তাঁর নাকি কাশীবাসের স্বপ্নবারে ভঙ্গ পড়েছে একটা ছুতো বাহানা করলেন কিনা বলা যায় না, তবে খবরটা এইভাবে এসে পড়ল। ঠিক উঠতির মুখেই এই অবস্থা, সবাই একেবারে মনমরা হয়ে গেলেন যারা গুপ্তকের, মুখে চুনকালি লাগতে আরম্ভ করেছিল, তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, টিটকিরির

এদিকের এনাদের আবার পথ চলা সাধ হয়ে

কত্তা আবার খাসকামরায় ঢুকলেন, বোতলের ওপর বোতল চলতে লাগল।

এই অবস্থা চলুক কিছুদিন, তারপর একদিন কাকাই আবার সামলে নিলেন ব্যাপারটা।...লাটাঠাকুরের

এদিকে এই গুড়ুক পর্যন্তই সীমানা ?"

বললাম—"হাঁ, কেন বল দিকিন ?"

তাই জিজ্ঞেস করছি, একটু এগিয়ে থাকলে কথাটা বুঝতের ভালো করে। কথাটা হচ্ছে, বিলিতীর আলাদা আলাদা মার্কা আছে, তেমনি আবার গুড়ুকগুলিও তোয়ের করে নিতে পারা যায় যার যেরকম ধাতে সহ্য সেইরকম করে। কাকার হাত ওতে খুব হুরস্ত

কত্তার ধাত জানা তো, মেজাজ বুঝে ঠিক জিনিষটি বেছে করে হাতে তুলে দিতে পারত। ওটা সওয়াচর চলত না তো ; মনটা খুবই খারাপ, কিছুতে সামাচ্ছে না, কত্তা বললেন—বিচ্ছে একটা তোয়ের করতো বেশ জুতসই করে।"...আর এ জীবন রেখেই বা ফল কি ?

বেশ ধরন দিয়ে একটি গেলাস তোয়ের করে কেনা সুদ্ধা হাতে তুলে দিতে দিতে কাকা বললে—"হুজুর একটা কথা ; ছোট মুখে বড় কথা বলতে সাহস হয় না, তবে কথাগুলো বলেন, একেবারে মরমে গিয়ে লাগে, তাই..."

কত্তা চোখে চাড়া দিয়ে চেয়ে বললে—'শ্রীরাধিকের ঠে আওড়াচ্ছিস ?'

কাকা বললে—'পাকটা মেশাতে মেশাতে মনে পড়ল হুজুর—এই তো এতগুলো মার্কার খাঁটি রয়েছে পেরাগে —এ বলে আমার দেখ্, ও বলে আমার দেখ্, কিন্তু পাঁচটাকে একত্র করলে যেরকমটি দাঁড়ায়, কোনও সীটে একটা মার্কায় সেরকমটি দাঁড়ায় কি ?'

কাকার ওপর রাগতেন খুব কম তো ! একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললেন—পাঠ ছেড়ে হেঁয়ালি ধরলি ?'

কাকা বললে—'ঐ থেকে আমার মনে পড়ে গেল—একা গিরিধারীলালকে যদি নাই পাওয়া গেল, আরও গাইয়ে তো আছে উদিকে, ওনার ঘরের না হয়ে যদি একটু নিরেশই হয় তো ক্ষেতি কি ? একের জায়গায় দশকে এনে ফেললেই তো কাজ হাঁসিল হয়, বরং আসর ভালো করেই হয়। ওদিক থেকেও মিলিয়ে দেখুন হুজুর—আকাশ থেকে জল টেনে নামানো ছোল দৈবী ব্যাপার, এসব ব্যাপারে একের জায়গায় দশই ভালো—গাঁয়ে ওলাউঠো কি মায়ের দয়া হলে তো হুগলী থেকে বিন্দু চণ্ডালীকে ডাকা হয় না, যতই নাম-ডাক থাক তার ; লোকে দলবেঁধে নগর কেত্তনই বের করে।

কত্তা ওনার মুখের দিকে চোখ তুলে আস্তে আস্তে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে শুনছিলেন, শেষে একবার গেলাসটার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"বানিয়েচিস ভালো। এইটুকু খেয়ে নিস্। দাওয়ানজীকে ডেকে দে।"

—আজ্ঞে, ওটা ছোল বকশিষ ; মস্তবড় এক সমস্যা মিটিয়ে দিলে তো কাকা ?

তারপর দিনই আবার চারিদিকে লোক ছুটল, কাশী, প্রেয়াগ, লক্ষ্ণৌ ; ইদিকে বিষ্টুপুর, বর্ধমান ; কলকাতাতেও তখন কিছু কিছু উদিককোর ওস্তাদ এসে পড়েছে, বেছে বেছে সব বায়না দিয়ে নিয়ে আসতে লোক ছুটল। সে রকম গানের মোচ্ছব কেউ মননেতে আর কখনও দেখেনি দা'ঠাকুর। দেউড়ির সামনেই প্রকাণ্ড মাঠ, এখন আর দেখতে পাবেন না। নদীতে কেটে নিয়ে গেছে। সেই মাঠের দু'দিকে তাঁবু পড়ল, তারপর একে একে ওস্তাদেরা আসতে আরম্ভ করলে,—এগুলে কাছে-পিঠের যারা—বিষ্টুপুর, কলকাতা, বর্ধমান—সবার নাম তো মনে নেই—

একেবারে যারা নামকরা—বিষ্টুপুরের মনশ্যাম আচায্যি, বর্ধমান থেকে রামেশ্বরীলাল, ইন্দু খাঁ, কলকাতা থেকে সালেসলিম; তারপর হপ্তা না যেতে যেতে উদিক থেকেও সব আসতে শুরু করলে. কাশীর তফজ্জল খাঁ, নবাব শেখ, ধুরন্ধর রাও, প্রয়াগ থেকে নুরুল খাঁ, মথুরা থেকে সিকু চৌবে;—লক্ষ্ণৌ থেকে নামকরা কাউকে পাওয়া গেল না, নবাব ত তখন মেটেবুরুজে, তবু মাটির গুণ তো, না-না করেও জন-তিনেক এয়েছিল।···আজ্ঞে না, মেটেবুরুজে খোক পাঠানো হয় নি, পাঠালে যে নবাববাহাদুর ফিরিয়ে দিতেন এমন নয়, তবে আসে খাঁকে নিয়েই ব্যাপারটা দাঁড়াল তো—মেটেবুরুজকে একেবারে বাদ দেওয়া হোল।

কাকা নেই যে তুলেছেন কথাটা তাপ বুঝে. তার দিন দশেকের মধ্যে মসনে একেবারে গন্ধর্বপুরী হয়ে উঠল দা'ঠাকুর—মাথাগুণে তেত্রিশজন ধ্রুপদী, তাদের নিজের নিজের পাখোয়াজী. কিছু কাজ নেই, যখনই শোন তাঁবুতে তাঁবুতে রেওয়াজ চলেচে, সঙ্গে যে নফর বা ছিলিম বরদারটা সেও উঠতে বসতে গুণ গুণ ক'রে সর-গম ভাঁজচে,—ঐ যে বললুম মসনে একবারে গন্ধর্বপুরী হয়ে উঠল। আজ্ঞে শুরুও হয়েছিল বৈকি, হয় নি কেমন ক'রে বলব? তখনও তো পুরোদস্তুর গান নয়, যে-যার গলা সাধচে মাত্তোর, কেরাগে-লক্ষ্ণৌয়ের ওনারা ত্যাখনো এসে পৌঁছান নি, একদিন কোথাও কিছু নেই সন্ধ্যের সময় ঈশেন কোণে হঠাৎ একটু মেঘ, তার সঙ্গে খোঁ-খোঁ করে ডাক সঙ্গে সঙ্গে ঝড়, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টি। বিষ্টি অবশ্য কোঁটাকতক, ধুলোও ভিজল না; কিন্তু এই তিনবছর ধ'রে এ-বিষ্টিই বা কোথায় ছেল মশাই? মুখপাতেই এক হাত মল্লারের কারসাজি দেখিয়ে দিয়ে ওস্তাদেরা আরও দুন আদা খেয়ে লেগে গেলো। তারপর লক্ষ্ণৌ-প্রয়াগ এসে গেল, ঠিক ছোল অঘ্বাচীর দুদিন আগে গানের আসরটা বসবে। কথাটা বুঝলেন না দা'ঠাকুর?—এরা ডেকে নামিয়ে তো দিলে বিষ্টি, তারপরেই অঘ্বাচী এসে গেল, ত্যাখন আপন তোড়েই চলুক না। রোজ তো আর এই জলের মতন খরচ করে মল্লার গেয়ে জল নামানো যায় না।

মসনের অহিম রায়চৌধুরী গাইয়েদের দিয়ে বিষ্টি নামাচ্ছেন। চারিদিকের দশবিশখানা গ্রাম থেকে লোক ভেঙে পড়ল। রীতিমতো এক মেলা, রথের মেলার মতন দোকানপাট ব'সে গেল। মল্লার গান, রাগিণী গিয়ে একেবারে সোজা সেই আকাশে গুঁতো মারবে আজ্ঞে, বড়িখোলা বাদুর যেমন গোরুর পালানে চু মারে—তবে তো গিয়ে নামবে জল, তাই দেউড়ির সামনে ঐ মাঠেই হোল ব্যবস্থা—নামও পড়ে গিয়েছিল মল্লারের মাঠ—এখন আর নেই, নদীতে কেটে দিয়েচে, নৈলে দেখতেন। মাঠের দুদিকে তাঁবু পড়েচে, তবুও মাঝখানে তখনও বহুৎ জায়গা পড়ে, সেইখানে আসর ঠিক হোল, লোকের চাপ থেকে গাইয়েদের বাঁচবার জন্যে মাঠের পূব দিকে—দেউড়ীর ঠিক উল্টো দিকে আর কি—শালের খুঁটি পুতে এ-মুড়ো ও-মুড়ো শক্ত ক'রে বাঁশের বেড়া দিয়ে দেওয়া হোল। পাশেই রইল ঘোড় সওয়ারের পাহারা। কত্তারা, আমলা-মোসাহেবেরা দেউড়ির দিকে একটা সামিয়ানার নিচে বসলেন।

সময় আলাপ শুরু হবে, সতরঞ্চির ওপর জাজিম বিছিয়ে সে এক আসর হোল যেন রাজসূয় যজ্ঞি হচ্ছে। তারপর তাস্তটা কমে আসতে সবই যে-যার তাঁবু থেকে বেরুতে লাগলেন। ইনি কে?—না, কাশীর তফজ্জল হুসেন. পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুটির কাজ করা চোগা চাপকান, মাথায় লম্বা বেলদার টুপি, এই বাড়ি। এই গুর্খা টানা চোখ, পাশেই পাখোয়াজী দিলির খাঁ, পেছনে তানপুরো আর পাখোয়াজ নিয়ে নফরই বলুন বা ছিলিম বরদারই বলুন। আসর নিলেন যেন মৈনাক পাহাড় এসে বসল। ইনি কে?—না, মথুরার বিষ্টু চৌবে, বেলদার ঝিনচিনে কুর্তার ভেতর দিয়ে বুক যেন ফেটে বেরুচ্ছে, ইয়া গালপাট্টা, ইয়া ভুঁড়ি, সঙ্গে পাখোয়াজী চন্দ্রিকা পাড়ে। ইনি কে, না অমুক; ইনি কে, না অমুক। এক এক করে গলাই-লস্করী চালে সব যে-যার তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসরে গোল হয়ে তো বসলেন···'

আমি প্রশ্ন করলাম 'আগে আলাপ শুরু করলেন ?

...ওস্তাদের মধ্যে আবার এ-নিয়ে বড় অভিমান কিনা!'

স্বরূপ বললে—"আগে পিছের তো কথা নয় দা'ঠাকুর, নগর-কেত্তনের মতন তো; সে নয় পথে পথে ঘুরে বেরিয়ে আর এ হোলো এক জায়গায় সভা ক'রে ব'সে। আগে পিছের পাটই তো তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন করলাম—"এতেও ওঁরা রাজি হ'লেন?"

স্বরূপ একটু শুধু অদ্ভুত ধরণের হাসলে, তাতে

যাচ্ছে, কৌতুক আছে, কী যে নেই বললে—"হুঁকোটা একবার কাৎ করতে

কয়েকটা তাকিয়া কা... দিয়ে আরোপ বলকেটা বসিয়ে দিয়ে কাতা আর বাখারিটা নিলে, বার দুই চেঁচে মুখটা তুলে বললে—

বলুন না দা'ঠাকুর, জল নাবুক না নাবুক উনি তো জলের মতন ব্যয় হচ্ছে—রাত্তি হবে না কেন? হোল। তবে পুরোপুরি তো হোল না, তাইতেই শেষ পর্যন্ত

আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম—"কিছুই হোল না?"

সরল একটু স্মিত কাটলে, বললে—"কিছুই হবে না—এই সম্বর দা'ঠাকুর, দেখেশুনে এতগুলো তা বড় বড় ওস্তাদ একত্তর হয়েছে। তবে কথা হচ্ছে কোন্ কেত্তনে একটা কলি—যেমন ধরুন তা আপনিও গাইছেন, আমিও গাইচি, রামাও গাইছে শ্যামাও গাইছে, ধারাটা একদিকে বয়ে চলেছে—জোর হচ্ছে। এতে তো তা হতে পেলে না। নিজের নিজের গান নিজের নিজের আলাপ, নিজের নিজের গায়কী, তবেই যদি যেমন ধরানা—কেউ সরগমের বেটাকে হঠাৎ কিছে অন্য একজন সেইটেকেই ফেলতে এসে।··· কিছু মনে না করা অন্যায়, কিছু হোল বৈকি। আলাপ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রেথমেই কাশী আর প্রেয়াগে বেধে গেল—আজ্ঞে ঐ রাগিণীর চাল নিয়ে। তখন অত কিছু তো বুঝি না, দূর থেকে এইটুকু মাত্তোর দেখলুম—তানপুরোর আওয়াজ তুলে একটুখানি গলা ছেড়েই কাশীর তরফদার ছেলেন প্রেয়াগের মুকুল খাঁর দিকে ঘুরে সিংহনাদ করে উঠলেন—"ইয়ে কেয়া!!" ···বেরেই যেত, উনিও—"কৈও নেহি!!" করে ঘুরে রুখে এসেছেন, বধূয়া-লক্ষ্ণৌ-বিষ্ণুপুরের ওঁরা এসে থামিয়ে দিলেন। আবার থামল একটু দা'ঠাকুর। কিন্তু সে কতটুকু? কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই, এমন কি, পাখোয়াজেও মধুরা এক বোল ধরেচে তো লক্ষ্ণৌ ধরচে অন্য—মল্লার চলল, তবে ক্রেমেই তেত্রিশটা মল্লারে যেন জট পাকিয়ে আসতে লাগল। তা হোক, তবুও মল্লারই তো। আমরা ছেলেমানুষ অত লক্ষ্য করিনি, তবে পরে অনেকের মুখে শুনলুম—কাজি আরম্ভ হয়েছিল—শোনো কথা দা'ঠাকুর—নাকি উনিশ শতেছিল ইন্দির ঠাকুরের, পশ্চিমে একেবারে আকাশের কোলে একটুখানি নাকি উঠেছিল মেঘ, একটি বিদ্যুতের ঝিকিমিকি, ইন্দির মহারাজ একবার উঁকি মেরে নিয়েছিলেন দেখে। কিন্তু এতেই তো আর সাহস হোল না।

গোটাকতক সম্ ঘুরে যেতেই আড়াআড়িটা বেঁড়ে গেল কিনা, যে যার পাশে বসে আছে তার সঙ্গে তার, তাই থেকে আবার এ-পাড়ায়, ও-পাড়ায়, তারপরেই যে কার সঙ্গে কার নয় বুঝে ওঠা যায়। আগে মুখের কথায়, চড়া, তারপরে আরও চড়া, তারপরে আরও চড়া, তারপরে মাথামাখি, জাপটা-জাপটি। হিন্দী যা টিকরে বেরুচ্ছে ওরকম গালজন্দা আর চোখা-চোখা হিন্দী মসনেতে কেউ কখনো শোনে নি দা'ঠাকুর। তার সঙ্গে ফটফট ফটাফট—যেন বাজ পড়চে। ওনারা ওদিকবার সামিয়ানা থেকে ছুটে আসতে না আসতে—অন্যেক তানপুরা আর পাখোয়াজ সাবাড়—আজ্ঞে, কথায় না কুলুতে ঐগুলোকে অস্ত্র করে নিতে হোল কিনা যে-যার।··· কিছু হয়েছিল বৈকি, তবে মল্লার গিয়ে দীপক রাগে দাঁড়োল·····

আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইলাম।

"আজ্ঞে তাই।···অবশ্যি অনেকে বললে—এটা ওপক্ষের কাজ, গোলমালে ঢুকে পড়ে কাণ্ডটা ঘটিয়ে তুলেছেল একটু হবে; তবে তার তো আর সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া গেল না।···আসর যখন একেবারে গরম—কে বিষ্ণুপুর, কে লক্ষ্ণৌ, কে কাশী, কে প্রেয়াগ আর চিনতে পারা যাচ্ছে না, সেই সময় প্রায় জটলা ঘেঁষে দপ করে আগুন জলে উঠল। কেউ বলে ও-পক্ষের কাণ্ড, কেউ বলে মল্লার কুপিত হয়ে দীপকে গিয়ে দাঁড়াল। হয় তো এরকম দা'ঠাকুর—তন্তর মন্তরের কথাই ধরুন না, কুপিত হ'লে উল্টে ছোবল মারে তো

আজ্ঞে না, ক্ষ্যাম-ক্ষেতি যা হোল তা ঐ তানপুরো পাখোয়াজের ওপর দিয়েই। জল নাবাবে, তার জায়গায় দীপকের তাত লাগতেই পাঁজাপাঁজি ছেড়ে যে-যার তাঁবুর দিকে ছুটল তো, লোক-লস্করও ছেল যথেষ্ট, দীপককে তাড়াতাড়ি সাপটে ধেললে···প্রাণের ওপর আর হানো দিতে পারলে না।

নিজের চোখে দেখা দা'ঠাকুর, এই মসনেতে; রাগ-রাগিণী ফলেনা বললে তো আমি শুনবো না··· কাৎ করুন একবার হুঁকোটা।"

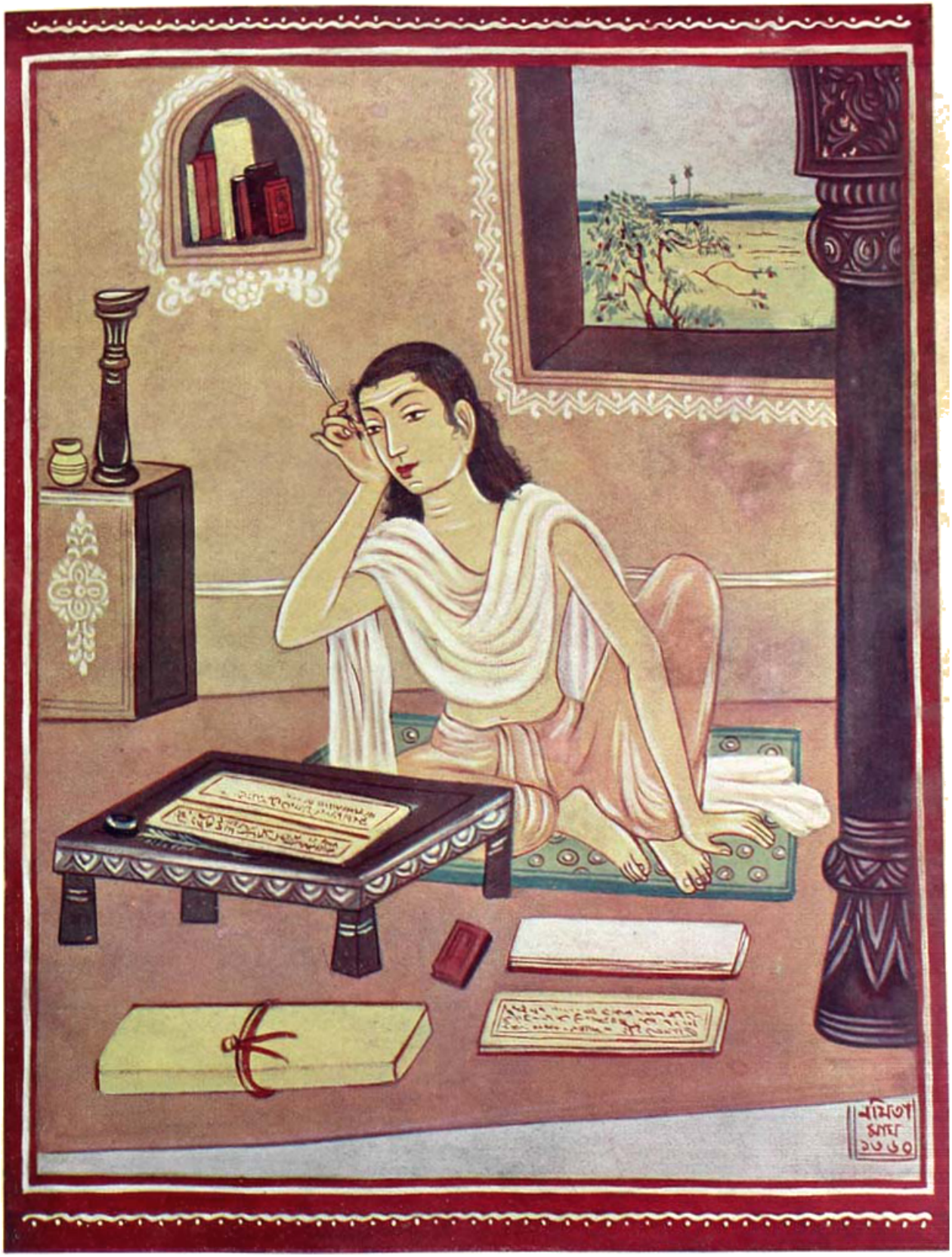

ইউনিয়ন প্রিন্টিং

জয়দেব

একটি বিজিত জাতির জীবন-সঙ্কট

নির্মলেন্দু মাল্লা

প্রায় বিয়োগান্ত নাটকের মতো। ভয়াবহ, সন্ত্রাস-সঙ্কুল। বেদনাদায়ক, অশ্রুকরুণ, পরিম্লান। যুদ্ধ—যুদ্ধের আত্মঘাতী উন্মাদনা—তারপর পরাজয়, আত্মধিক্কার, অপমান, দাসত্বশৃঙ্খল—যুদ্ধ শেষ হোল। সমগ্র জাতির শিয়রে কঠিন শবদেহের শান্তি ঘনিয়ে এল। দিন যায়—ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি কঠোর সত্য। পরাজয়ের লাঞ্ছনাতেই যুদ্ধের সমাপ্তি নয়, আরো আছে, এর প্রতিক্রিয়া বহু ব্যাপক, বহুদূর প্রসারিত। দিনে দিনে উগ্র হয়ে ওঠে এক একটি সমস্যা: এ পরাজয়ের বন্ধন কবে ঘুচবে, কবে সে পাবে আত্মরক্ষার অবাধ অধিকার, ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে আর যে জায়গা হয় না, তার প্রাকৃতিক সম্পদ যে ফুরিয়ে এসেছে, এই প্রগতির যুগে তার শিল্পব্যবস্থা যে বহুদূর পেছিয়ে পড়েছে, পৃথিবীর বাজারগুলি যে অন্যদেশের অধিকারে চলে গেছে। আজ আর তার সেই বাণিজ্য-পোতের উদ্ধত বিজয়-অভিযান নেই, নেই সেই সাম্রাজ্য বিস্তারের অপরিমেয় স্বপ্নকল্পনা। চতুর্দিকে অতলান্ত সমুদ্র। সমুদ্রের দুই পারে দুই শক্তি-গোষ্ঠী তার দিকে বজ্রকঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আর সমুদ্রের মাঝখানে এক ডুবু ডুবু প্রাণ প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করছে। প্রায় বিয়োগান্ত নাটকের মতো। ভয়াবহ বেদনাদায়ক।

জাপানের কথা বলছি।

সমস্যার আর শেষ নেই। রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সব দিক দিয়ে। এই দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর একটা প্রকট প্রতিচ্ছবি যেন সে।

রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার স্বরূপ

কোথাও যেন একটা কান্নার ধ্বনি শোনা যায়। মানুষের স্বগতোক্তি বিলাপ। ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল। উনিশ শো পঁয়তাল্লিশের ৬ই অগাষ্ট আণবিক বোমা পড়লো হিরোশিমায়। দু লক্ষ ষাট হাজার লোকের প্রাণ উবে গেল। তারপর নাগাসাকি জাপানের অন্ধকার আনাচে-কানাচে মৃত প্রেতাত্মার কান্না শোনা যেত। না, সে কথাও বলছি না। বলছি সত্যিকারের মানুষের কথা। ঘটনার সন্ধানে যেতে হবে টোকিও উপসাগরে। তারিখ, দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ। মার্কিণ জাহাজ মিসৌরীতে জাপানের 'আত্মসমর্পণ-অনুষ্ঠান' চলেছে। ম্যাকআর্থারের সামনে জেনারেল য়োশিজিরো উমেজু জাপানের পক্ষ থেকে সমগ্র জাতির আত্মসমর্পণের স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর দিচ্ছেন। একটু দূরেই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জাপানী সেনাপতিবর্গ। লজ্জায় অপমানে মাথা তাদের নীচু হয়ে এসেছে। কান্নাটা আসছে সেইখান থেকেই। এক জাপানী কর্ণেল কাঁদছেন।

দিনে দিনে সেই কান্নার অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট হয়ে এসেছে।

তারপর থেকেই সমগ্র জাতির জীবনে একটা বুদ্ধি-ভ্রংশতা দেখা দিল। মার্কিনী সামরিক শাসনের হাতে একটা জাতি তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তুলে দিল। শুধু তাই নয়, জাপানের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র 'মেইনিচির' প্রবীণ সম্পাদক মিঃ সিন-ইচিরো কুডোর সাম্প্রতিক রচনায় একথাও প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র জাতটাই যেন চিন্তা করতে ভুলে গেল, তাদের হয়ে মার্কিন শাসকরা চিন্তা করে দেবে, এমনি

তাদের মনোভাব। সমগ্র জাতি তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি তার স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সহজাত স্ফূর্তি খুঁজে পেল না।

প্রায় ছ'সাত বছর লেগে গেল আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে। অবশেষে ১৯৫২ সালের এপ্রিলে সে মিত্রশক্তির অধিকার থেকে মুক্ত হোল।

স্বাধীন জাপান আবার এই মুক্ত পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে সে এখন যথেষ্ট সচেতন।

জাপানের দুই পাশে দুই শক্তি পোষ্ট, এশিয়ায় রাশিয়া এবং মুক্ত মহাচীন, আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রশ্ন এই, জাপান কোন পন্থা অবলম্বন করবে।

ওই দুটি পথ ছাড়াও আর একটি পথ রয়ে গেছে। নিরপেক্ষতার পথ। সে পথটাই বা কেমন? জাপান কি শুধু বাস্তবতাবর্জিত উচ্চ আদর্শের বশবর্তী হয়ে সেই পথ না কি যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাবশতঃ অথবা পূর্ব এশিয়ার ঐতিহ্যের এই পথ অবলম্বন করবে? কিংবা অন্য কারণও থাকতে পারে, যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধ লাগে, কেউতো জিতবে না, দুপক্ষই সমূলে বিনষ্ট হবে, তার চেয়ে নিরপেক্ষ থাকাই ভালো।

যদিই জাপান নিরপেক্ষতার পথ গ্রহণ করে, তাহলেও সমস্যার সমাধান নেই, কারণ, জিজ্ঞাস্য এই :

১) জাপানের নিরপেক্ষতা কি অন্য জাতি মানবে?

জাপানের ভৌগোলিক ও তার সামরিক শক্তি কি তার নিরপেক্ষতার অনুকূল?

২) বর্তমান নীতিতে বিশ্বাসী রাশিয়া ও চীন কি তার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না?

(৩) জাপানের মত বাণিজ্য প্রধান পরমুখাপেক্ষী দেশের পক্ষে নিরপেক্ষতার নীতি কি সর্বাংশে অনুকূল?

(৪) গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়—নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণের দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান কি অসমাপ্ত থেকে যাবে না?

এই গেল সমস্যার একটি প্রধান দিক। আর একটা দিক হচ্ছে জাপান যে স্বাধীনতা পেয়েছে তা সর্বাংশে সম্পূর্ণ নয়। এখনো মার্কিন সৈন্যদল জাপানে রয়ে গেছে। অবশ্য তার নামটা পালটে গেছে। এখন আর অকুপেশন ফোর্স নয়, সিকিউরিটি ফোর্স, নিরাপত্তা বিধানের জন্যে মনোনীত সৈন্যদল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র মার্কিন-বিরোধী মনোভাব জাপানীদের মধ্যে জেগে উঠেছে।

কিন্তু এই মনোভাব দেশের সর্বত্র সমভাবে প্রসারিত হতে পারেনি। তার কারণ জাপানের সর্বদাই আশঙ্কা রাশিয়া তাকে গ্রাস করবার আশায় ওৎ পেতে আছে। এই সম্ভাব্য আক্রমণের ফলে যে শুধু সে-ই বিপন্ন হবে তা নয়, সারা প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নিরাপত্তার গণ্ডী রয়েছে তা ভেঙে যাবে এবং তার ফলে দুই মহাশক্তি তৃতীয় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্বন্ধে এই বোধটুকুর জন্যে জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারেনি।

এখানেই জাপানের পুনরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি আবার দেখা দিয়েছে। স্বাধীন জাপান মার্কিনদের ওপর ভরসা রেখে নিজের সৈন্যসজ্জায় অবহেলা দেখাতে পারে না, কেননা স্বাধীন হয়েছে সে, আত্মরক্ষার প্রধান দায়িত্ব তারই।

অথচ এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই জাপানী সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী এবং কমিউনিষ্টপার্টি আপত্তির লোরগোল ফেলে দিয়েছে। তাদের ধুয়ো হচ্ছে "পুনরস্ত্রীকরণ যুদ্ধের সমপর্যায়ভুক্ত।"

যুদ্ধের সাধ মরে গেছে জাপানের ওপর দিয়ে। বিষম ক্ষয় ক্ষতি তাকে সহ্য করতে হয়েছে, হচ্ছে। ঘরপোড়া গরুর মতো যুদ্ধের নামে তার হৃদয়ে আতঙ্ক জাগবারই কথা। তাই রাশিয়া আক্রমণের ভীতি সত্ত্বেও বামপন্থীদের এই মতকে অনেকে সমর্থন জানাচ্ছে।

দেশের যুবক সম্প্রদায় এই বলে আপত্তি তুলেছে: সমরসজ্জার তো আমাদের আগে ডাক পড়বে, যদি যুদ্ধ বাধে, আমরাই হবো প্রধান বলি। দরকার নেই এমন প্রাণঘাতী পুনরস্ত্রীকরণে।

দেশবাসীর বিশেষ বিশেষ অংশের বিরোধিতা ছাড়াও একটা গুরুতর শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন রয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে শাসনতন্ত্রের বর্তমান কাঠামোয় তার পুনরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়, কাজেই আগে তাকে শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ভাবতে হবে এই বাড়তি খরচের সঙ্কুলান হবে কোথা থেকে এবং তৃতীয়তঃ—রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের অপচেষ্টায় দেশবাসীর বিরূপাংশের মধ্যে যে যুদ্ধোন্মাদনার সৃষ্টি হবে তা রোধ করবে কে। জাতীয় চরিত্রকে শান্ত রাখতে হবে অথচ একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়তে হবে—এতখানি ভারসাম্য রক্ষা করা সত্যিই কঠিন।

কঠিন, কেননা জাপানের রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমানে পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং এক নিরবচ্ছিন্ন আত্মকলহে লিপ্ত। এদের মতামত এতই পরস্পর বিরোধী যে সত্যাসত্য বিচার করে দেশবাসীর পক্ষে তার একটা গ্রহণ করা সত্যিই কষ্টকর। পুনরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে আদর্শের পারস্পরিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

লিবারেল পার্টি বা উদারনৈতিক দলের মতে এখনি যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করতে গেলে জাতীয় অর্থ-নীতিতে বিষম গণ্ডগোল ঘটবে কাজেই আমেরিকার সাহায্য নিতেই হবে এবং ধীরে ধীরে পুনরস্ত্রসজ্জা সম্ভব করে তুলতে হবে।

প্রগ্রেসিভ পার্টি বা প্রগতিশীল দলের মতে জাতীয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে প্রতিরক্ষা বিভাগ গড়তে হবে এবং জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি নতুন করে বিবেচনা করতে হবে এবং বিদেশী সৈন্য ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

হাতোইয়ামা উদারনৈতিক দলের মতে নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে খুব শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সংস্থা গড়তে হবে এবং এর জন্যে দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করতে হবে।

দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদল এই বলে সমরসজ্জার বিরোধিতা করেছে যে আগে দেশের মধ্যে একটা সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রস্তুত করতে হবে এবং সাধারণ লোকের অন্নবস্ত্রের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে হবে, তারপর পুনরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন।

বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদল তো অস্ত্রসজ্জার ঘোরতর বিরোধিতা করেছে। তাদের যুক্তি হোলো জাপানে যতক্ষণ মার্কিণ সৈন্য রয়েছে ততক্ষণ অস্ত্রসজ্জার অর্থ হোলো যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারি করা, তাদের শক্তি জোগানো। এজন্যে, ঐ পার্টির মতে, সর্বপ্রথমে জাপ-মার্কিন্ নিরাপত্তা চুক্তি এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক চুক্তি রহিত করতে হবে।

এই একটি সমস্যা থেকেই বোঝা যাচ্ছে দলগুলির আদর্শগত মতভেদ কত গভীর। হাতোইয়ামা উদারনৈতিক দল যেখানে অস্ত্রসজ্জা চাইছেন সেখানে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দল সরাসরি নিরপেক্ষ থাকার পরামর্শ দিচ্ছে। এদের বক্তব্য হোলো উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থায় যোগদান না করে সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ড যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে তাহলে জাপানই বা তা পারবে না কেন।

জাপানের অর্থনৈতিক অধঃপতন এত গভীর যে কোন রাজনৈতিক দলই তার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারছে না। তাই ক্যাবিনেটে যে কোনো দলের দায়িত্ব অল্প, এবং এদের পারস্পরিক মতভেদে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ বিভ্রান্ত।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের স্বরূপ বিচার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে জাপান যে পন্থা অবলম্বন করেছিল এখন তা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তখন ছিল ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার

আর এখন—ঠাণ্ডায়—যুদ্ধোত্তর শাসনতন্ত্র থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি—"বিচার এবং শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশান্তিতে জাপান একান্ত আন্তরিকতাবে আস্থাবান। আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্যে রীতিপ্রকরণ অথবা সামরিক শক্তির ব্যবহারই উৎকৃষ্ট পন্থা যুদ্ধই জাতির সার্বভৌম অধিকার—এ দুটো মতবাদই জাপান চিরতরে পরিত্যাগ করছে (অনুচ্ছেদ ৯)।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সে দুরন্ত দুরাশা আর নেই। কাজেই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে জাপানকে এখন এই নয়া শাসনতন্ত্রের কাঠামো বর্ণে বর্ণে মেনে চলতে হবে। এমনটা নয় যে পুরোনো জিনিস ভেঙে গেছে তাকে নতুন করে গড়তে হবে—আজকের জাপানে অর্থনৈতিক সঙ্কট আরো গভীর, আরো ব্যাপক। মাত্র কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে তাকে এখন এগিয়ে গেলেই চলবে না, যোগান এবং চাহিদার সবদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এই ভেবে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি কোনো সঙ্কট ঘনীভূত হয় তবে তাতে যেন তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে

কোরিয়া যুদ্ধের ফলে উৎপাদন হার কিছু বেড়েছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। এই সত্যটি এমন মর্মান্তিক রূপে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে তার শিল্প কার্যে ব্যবহারের জন্য যে কাঁচামাল লাগে তার শতকরা আশি ভাগ আসে বাইরে থেকে এবং ভবিষ্যতে এই পরনির্ভরতা কমাবার কোনো আশা নেই। এই সমস্ত কাঁচামালের মধ্যে আছে কয়লা, লৌহপ্রস্তর, তেল, তুলো, উল, রবার, দস্তা, সল্ফাবীন এবং বক্সাইট। খাদ্য-শস্যের দিক থেকে তার যা উৎপাদন তাতে সে তার দেশবাসীর শতকরা আশীজনকে খাওয়াতে পারে এবং প্রতি বৎসর যে হারে লোক বাড়ছে তাতে করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত না হয়ে থাকা যায় না। খাদ্য এবং কাঁচামালের দিক থেকে জাপানের এই পরনির্ভরতা ঘোচবার নয়। এরপর রয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রশ্ন। যাক্, যে প্রশ্নের সমাধান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তা তুলে কোনো লাভ নেই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন তো না তুলে থাকা যাচ্ছে না। এই যে কোটি কোটি টাকার মালপত্র প্রতি বছর আমদানী করতে হবে সে টাকা। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয় পণ্য রপ্তানী করতে হবে। এইখানেই আর এক সঙ্কট। বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিযোগিতায় জাপান কিছুতেই তার পূর্ব আসন অধিকার করতে পারছে না। তার রপ্তানীর হার বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক ক্রমাগতই কমে চলেছে।

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে উৎপাদন ব্যয় কমাতে হবে এবং কাঁচা মাল আমদানীর পরিবর্তে দেশীয় জিনিষের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে।

১৯৪৯ সালে মার্কিণ শাসনের পক্ষ থেকে জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে একটি নারাত্মক উক্তি করা হয়: জাপানের যা সম্পদ আছে তাতে আগামী তিরিশ বছরে এই দুটোর একটা ঘটবে—যদি বৈদেশিক সাহায্য অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে জাপানে জীবনযাত্রার মান ১৯৩০—৩৪ খৃষ্টাব্দের সমতুল্য থাকবে আর তা না হলে সে স্বাবলম্বী হবে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুর্দশাকে বরণ করে। তখন তার জীবনযাত্রার মান কেবলমাত্র টিঁকে থাকার পর্যায়ে নেমে আসবে।

কাজেই জাপানকে ১৯৩০-৩৪ এর জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দেশীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার—এ দুটোই একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে।

মার্কিন শাসকের উক্তিগুলো যেন নিরাসক্ত কণ্ঠে মৃত্যু-দণ্ডাদেশের মত শোনায়, তাই না?

আজকের জাপান এই ঘোর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে বিনিদ্র চিন্তায় নির্নীথ প্রহর যাপন করছে।

জন-সমস্যা।

চিন্তার আর এক উৎস জাপানের জনবাহুল্য।

গত মহাযুদ্ধে জাপানের জাতীয় সম্পদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বিনষ্ট হয়েছে। ফলে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। এইদিক থেকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে তার আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, এক্ষেত্রে তা কেবলমাত্র বেকার সংখ্যা বৃদ্ধিতেই পরিণতি লাভ করবে।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ শুধু বন্ধ নয়, যেটুকু সাম্রাজ্য সে বিস্তার করেছিল সেটুকুও তার হাতছাড়া হয়েছে, পূর্বেকার আয়তনের তুলনায় এখন জাপান রাজ্য অর্ধাংশতে এসে ঠেকেছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ গুণতে গুণতেই সাগরপারের ভিটেমাটিগুলি চাঁটি হয়ে গেছে।

দাঁড়ান, আরো আছে। যুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত জাপানেও একটা অভূতপূর্ব বিষয় দেখা যায়। সেটি হচ্ছে দ্রুতগতিতে জন্মহারবৃদ্ধি। এইসঙ্গে সাম্রাজ্য চলে যাওয়ায় বাইরের দেশ থেকে জাপানী শরণার্থীদের আগমন ঘটতে থাকে এবং তাতে সমস্যা জটিলতর হয়।

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা এর একটা দাওয়াই বাতলাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে :—

(ক) জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(খ) ক্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজ দিতে হবে।

(গ) জাপানের বাইরে জাপানীরা কোথাও জায়গা পেতে পারে কিনা দেখতে হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের কথাটা না হয় বুঝলুম। কিন্তু সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের কাজ দেওয়া যায় কি করে?—এ প্রশ্ন বিশেষজ্ঞদের করা হলে তাঁরা মাথা চুলকে বলছেন, তাইতো, কৃষিতে আর তো লোক নেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াও আর সেই সব বাইরে রপ্তানী কর।

যখন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে বর্তমানের পৃথিবী-জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্যে, তীব্র প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্যে সে পথও বন্ধ, তখন তাঁরা মুচ্‌কে হেসে বলছেন, তাখো বাপু, সবই নির্ভর করে অর্থ সঞ্চয়, অর্থ বিনিয়োগ এবং তার সঞ্চালনের ওপর এবং সেটা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক-যুক্ত-রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের ওপর। কাজেই ওটার ওপরে আমাদের কোনো হাত নেই।*

আরু বাইরে নিয়ে যাওয়া? এইটুকু জানা গেছে যে ১৯৫২ সালে ব্রেজিল আঠারোটি জাপানী পরিবারকে ঠাঁই দিয়েছে। লোকসংখ্যা—নোট পঞ্চান্ন জন। হাতী ডুবতে বসেছে আর দশায় জল মাপছে। থাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

পরিবর্তনের পথে

সমাজ— সংস্কৃতি— স্বাতন্ত্র্য

যুদ্ধে একটা জাতি যখন হেরে যায় তখন তার কাছে বাইরের পরাভবটাই বড় হয়ে ওঠে, তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধীনতার মধ্যেই সে পরাজয়ের জ্বালাটাকে বেশী করে অনুভব করে।

কিন্তু আরো একটা দিক আছে।

সেখানের পরাজয় সবচেয়ে বড় পরাজয়।

কিন্তু জাতির অন্ধ অন্তরে সে বার্তা বড় একটা পৌঁছয় না।

অথচ তার একটা ক্ষতি কোথাও না কোথাও তিলে তিলে জমা হয়।

সমাজ-সংস্কৃতির দিক থেকে পরাজয়ের কথা বলছি :

প্রত্যেক জাতির একটা নির্দিষ্ট সমাজ বন্ধন আছে; একটা নির্দিষ্ট সংস্কৃতি আছে। সেইখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। সেইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। সেই নিয়েই তার গৌরব।

---

* জাপানের জনসংখ্যার ওপর লিখিত এক প্রবন্ধে জাপানের জনসমস্যা বিশেষজ্ঞ মিঃ শিন-ইচি মিহারা সম্প্রতি এইভাবেই তাঁর দায়িত্ব তথা জাতির প্রতি তাঁর কর্তব্য সেরেছেন। মিঃ মিহারা হচ্ছেন জাপানের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'মেইনিচি'র 'জনসমস্যা-গবেষণা সংস্থার' কার্যকারী পরিচালক।

এই সাংস্কৃতিক রূপকর্ম বা সামাজিক বন্ধন জাতির প্রাণধর্মের বিবর্তনে অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতের পথে ধীরে ধীরে সমগ্র গোষ্ঠীর ভেতর থেকে বিকশিত হয়। তা একটা বাইরে থেকে চাপানো কৃত্রিম জিনিস নয়।

যদি বাইরে থেকে চাপানো একটা বিষয় একটা জাত বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে—হয় সমাজের ভেতরে একদিন কোথাও একটা প্রচণ্ড গলদ লুকিয়েছিল—নয় সমগ্র জাতি আজ এক বিভ্রান্তিকর অবস্থার ভেতর দিয়ে চলেছে।

যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটল। ম্যাকআর্থারী শাসন দেশের মধ্যে চেপে বসল। রাতারাতি যেন সমগ্র দেশটা মার্কিনী সভ্যতার যত ভালো যত মন্দ সব কিছুকে একসঙ্গে গ্রাস করতে চাইলো। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদরা একেই বললেন, পরিবর্তন, বললেন, প্রগতি।

অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, তাঁদেরই বিভিন্ন রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে জাপানের সেই সাংস্কৃতিক বিকৃতির পরম বেদনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী জোয়ো নাকামুরা জাপানে এসে থিয়েটার দেখতে গেছেন। প্রথমে একটি জাপানী মেয়ে দেশীয় প্রথায় নাচগান করলে। অঙ্গে দেশীয় পোষাক কিমোনো, মাথায় জাপানী প্রথামত জটিল কেশবিন্যাস।

এই দৃশ্যটি দেখে প্রীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ নাকামুরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, পরক্ষণেই সেই মেয়েটি যখন প্রায় নগ্ন অবস্থায় ষ্টেজে এসে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মার্কিনী জাজ সঙ্গীত "টেকিও বুগি-উগি'র সঙ্গে নৃত্য দেখাতে সুরু করলে তখন তিনি বিস্ময়াহত না হয়ে পারেননি।

এই হচ্ছে পরিবর্তন তথা প্রগতির স্বরূপ।

কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। ম্যাকআর্থারের ভাষায়, আমরা এদেশকে আর কিছু দিতে না পারি অন্ততঃ দুটো জিনিষ দিয়েছি। সে দুটি হচ্ছে গণতন্ত্র এবং খৃষ্টধর্ম।

ফল কি হল দেখা যাক।

এতদিন পর্যন্ত জাপান আচ্ছন্ন ছিল রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র মহিমায়। এখন সম্রাট নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি কোনো দেবতার বংশোদ্ভূত নন। তিনি চলে এসেছেন সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ে। আজ আর তাঁকে ঘিরে দেশের মানুষগুলির নেই কোনো সম্ভ্রম অন্ধ কৌতূহল এবং অনুরক্তি। এখন যে-কেউ তাঁর দর্শন পেতে পারে।

এতদিনে সাধারণ মানুষ তার অধিকার বুঝতে শিখেছে। সে জানে কোনো গুপ্তচর আজ আর তার কণ্ঠরোধ করতে পারেনা। সে বুঝেছে এতদিনের সাম্রাজ্যলিপ্সা আসলে রাজাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কায়েমী রাজনীতিবিদদের চাল, যারা বরাবর জনসাধারণের ইচ্ছাকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করে এসেছে।

এই যে সাধারণ মানুষের মুক্তি এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে খৃষ্টধর্ম, যার প্রসার জাপানে বেড়েই চলেছে। এই দেশটিতে আজ পর্যন্ত কোন মহৎ জীবন-ধর্ম কিংবা দর্শন চিন্তার আবির্ভাব না হওয়ার জন্যে দেশবাসী রাজপূজার দিকেই ঝুঁকেছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরে শাসকশ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন পেয়ে তা জাতির হাড়ে-মজ্জায় মিশিয়ে গিয়েছে। ফলে নানা রকম আচার আচরণ, অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারে দেশবাসীর মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এবং জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্য রীতিনীতি গ্রহণের ফলে এইসব ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন এই: আজীবনের সংস্কার এক নিমেষে লুপ্ত হয়, না, চাপা পড়ে থাকে? জাপানের ক্ষেত্রে এর কোন্‌টা সত্য তা একমাত্র ভবিষ্যৎই উত্তর দেবে। আমরা বলব, অবস্থা দেখে মনে হয় দেশটি শুধু এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত নয়, একেবারে নবজন্ম গ্রহণ করছে। এবং নারী না হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করছি জন্মগ্রহণের ব্যাপারটা সত্যিই বেদনা-দায়ক।

অবশ্য বলতে পারেন ভবিষ্যতের একটা আশা থেকে যায়।

এ কথার প্রসঙ্গে শুধু বলব আজকের জাপানে শুধু প্রকট হয়ে উঠেছে জীবনের এক বিসদৃশ বৈষম্য এবং অসামঞ্জস্য।

জাপানীরা ঘরে ব্যবহার করে জাপানী পোষাক, বাইরে ইউরোপীয়। ঘরে তাদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা অন্য, বাইরের সঙ্গে তার নেই বিন্দুমাত্র মিল। বাইরে যখন যায়, পোষাক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থী মনটাকেও সেখানে রেখে যায়। জাপানী যুবকেরা আবার ঘরে বাইরে ইউরোপীয় পোষাক ব্যবহার করতে সুরু করেছেন। একদিকে পেয়েছেন তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা, অন্যদিকে ঘরের কোণে জমে রয়েছে শত শত বৎসরের সংস্কার। ফলে তাঁরা নতুন আলোয় দিশেহারা হয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ হারাচ্ছেন, গুরুজনদের প্রতি হারাচ্ছেন শ্রদ্ধা।

অন্যদিকে আর এক অভাবনীয় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

জাপানে এসেছে স্ত্রী-স্বাধীনতা।

শুধু স্বাধীনতা নয়, আলোকপ্রাপ্তা নারীরা ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় বেশ-ভূষা ও প্রসাধন-পারিপাট্যের পক্ষপাতী হয়ে পড়ছেন। তাঁরা আর নিজেদের রান্না-ঘরে আবদ্ধ রাখতে চাইছেন না। মার্কিনী সভ্যতার উদাহরণ দেখে তাঁরা চাইছেন তাঁদের নিভৃত গৃহকোণের প্রতিটি কাজ যেন যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত হয়।

অথচ নারীজাতির এক বৃহৎ অংশই কেবলমাত্র গৃহ উত্তপ্ত করণের যন্ত্রের অভাবেই এখনো পুরোনো স্বদেশীয় পোষাক পরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। শীতকালে না ঠাণ্ডা।

মন পড়ে আছে বিদেশী উপকরণের দিকে, অথচ হায় অভাবের তাড়নায় অঙ্গে স্বদেশী পোষাক। আবার ঘরে এক মন—বাইরে আর এক মন—সম্পূর্ণ অন্য মানুষ—এরকম অবস্থায় মানুষ একটা বিপরীতমুখী দ্বৈত চরিত্রের না হয়ে যায় না।

এবং আজকের জাপানে সেই অবস্থাই ঘটেছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ছাড়া অর্থাৎ রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক অবস্থার গভীর পরিবর্তন ও উন্নতি ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই।

এবং আমরা আগেই দেখিয়েছি সে পথের কত প্রতিবন্ধক।

তাহলে?

একটি বোমার আঘাতে হিরোশিমার আড়াই লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর সেই নারকীয় অবস্থা চিত্রে পরিস্ফুট করার জন্য এক শিল্পী দম্পতি, মারুকি ও আবাসাৎসু, আত্মনিয়োগ করেছেন। সুদীর্ঘ চার বৎসর ধরে পাঁচটি ছবি আঁকার পর তাঁরা বলেছেন, একটি বোমার আঘাতে যে সব প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে তার ছবি পরিপূর্ণভাবে আঁকতে তাঁদের বাকী জীবন লেগে যাবে।

কিন্তু সে ছবি সম্পূর্ণ করার আগে তো অনেক সংগ্রাম ঘটবে—আরো অজস্র আঘাত—প্রভূত অপমৃত্যু। তার ছবি কে আঁকবে? কে হবে তার স্তিমিতনেত্র দর্শক?

বোধ করি একমাত্র মহাকাল

দর্শনের খতিয়ান

শ্রীবন্ধু

কোথাকার, কোন্ মানুষের দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তা সম্ভবতঃ আজ আর নির্ণয় জানার উপায় নেই। কিন্তু মোটের ওপর সে যে বহুদিন আগেকার কথা এটা নিশ্চিত। দার্শনিক চিন্তার প্রবর্তক হিসাবে যে সব নাম, বা পরিচয় স্বরূপ যে সব উক্তি বিভিন্ন সভ্যসমাজের লিখিত ...ক, প্রত্নতাত্ত্বিকের আরম্ভ প্রাক-ইতিহাসে ...ার, তারও কিছু কিছু তিন, চার, এমন কি পাঁচ-...বছর পূর্বেকার। অনুমান অসঙ্গত হবে না মনের দিক থেকে এই চিন্তাস্রোতের গঙ্গোত্রীউৎস হয়ত আরো পশ্চাতে, হয়ত কপ্ বা আবেস্তার যাঁরা উদ্গাতা, সমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতাপুষ্ট ব্যাবিলন, সুমের, মহেঞ্জোদারোর মন্দিরে অজ্ঞাতনাম দেব-দেবীর যাঁরা উপাসক, মিশরের রা-দেবের যাঁরা ভক্ত, তাঁরাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মানুষ, আরো পূর্বতন কোন যুগের ভাব ও চিন্তার বাহকমাত্র—সে যুগ মানুষের স্মৃতির সুদূরতম দিগন্তরালে কবে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ...ক, পাঁচ-হাজার বছরও নিতান্ত কম সময় নয়। এই দীর্ঘদিনে কাজের ক্ষেত্রে মানুষ কত কিছু করেছে—কত সভ্যতা উঠেছে এবং বিলীন হয়েছে, কত রাজা, সাম্রাজ্য গড়েছে এবং ভেঙেছে, এই গড়া-ভাঙা, সৃষ্টি ও বিনষ্টির তালে তালে কত বিচিত্র বস্তু ও ব্যবস্থার উদ্ভব হোলো, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার কী অপরিমেয় উৎকর্ষ হোলো, কল্পনায় ও কর্মনৈপুণ্যে মানুষ নিজের কাছে নিজে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠলো। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের এই বিশাল উদ্যম, নিরন্তর চাঞ্চল্য ও অধ্যবসায়—এ শুধু মানুষের ইতিহাসের একটি দিক মাত্র। এর অপর দিকে আছে ভাব ও চিন্তার রাজ্যে এমনই অন্তহীন বিরামহীন সন্ধান। বস্তুতঃ সেই ধূলিরীক্ষ্য অতীতে, হয়ত মানব-চেতনা উন্মেষের একেবারে প্রথম স্তরে যে জীবন-জিজ্ঞাসা প্রথম মনে এসেছিল, তার স্রোত তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কোনদিনই স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বরং দিনে দিনে মানুষের কাজ যত বেড়েছে, বস্তুজগতের জ্ঞানের পরিসরও ক্রমে বিস্তৃততর হয়েছে, এবং নূতনতর, বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূল উৎস সম্বন্ধে তার চিন্তার ধারাও ক্রমে প্রবলতর হয়েছে, বহু শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধতর হয়েছে। দার্শনিক সাহিত্যের যে-কোন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারে দার্শনিক গ্রন্থের সংখ্যা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। বিপুলতার দিক থেকে চিন্তা জগতে মানুষের এই সৃষ্টি তার কর্মজীবনের সমগ্র কীর্তির চেয়েও কোন অংশে কম বিস্ময়কর নয়। বরং বহুক্ষেত্রে কর্মনৈপুণ্য আদৌ উৎসারিতই হয়েছে দার্শনিক চিন্তা থেকে। অবশ্য এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারস্পরিক। সে যা হোক, দার্শনিক গ্রন্থের সংখ্যাই কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের দার্শনিক প্রচেষ্টার একমাত্র বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। মানুষ মাত্রই অল্পবিস্তর দার্শনিক। সকলের মনেই কিছু না কিছু মৌলিক প্রশ্ন আছে। আজো যারা আদিম বর্বর অবস্থায় রয়েছে তাদেরও মনে জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে এবং কিছু কিছু তত্ত্ব-চলতি গোছের সমাধানও আছে—যতই মনগড়া সে সমাধান হোক। তথাকথিত সভ্যমানুষের নিরন্তর সমস্যাভারাক্রান্ত মনে প্রশ্নের সংখ্যা বেশী, সমাধানের

আগ্রহও সম্ভবতঃ বেশী। সুসঙ্গত ভাবে চিন্তা করবার এবং ভাষায় সে চিন্তাকে রূপ দেবার শক্তি কম লোকের আছে। যাঁরা সে কাজ করতে পেরেছেন বা পারছেন, তাঁরাই দার্শনিক নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু যদি ধরা যায় যে প্রশ্ন ও তার সমাধানের জন্য চিন্তা যত অসম্বদ্ধ ভাবেই হোক যারা করেছে এবং করছে তাদের তুলনায় সুসম্বদ্ধ চিন্তানায়কেরা সংখ্যার দিক থেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তা হলে দার্শনিক রাজ্যে মানুষের সামগ্রিক অধ্যবসায়ের পরিমাণ সম্পর্কে ভ্রান্তাগারিক বিস্ময় আরোই গভীর হতে বাধ্য।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে: এ অধ্যবসায়ের প্রেরণা কি?

উত্তর নানারকম হতে পারে। এক: অন্য পাঁচ রকম কামনা-বাসনার মত জ্ঞান লাভের ইচ্ছাও মানুষের সহজাত। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে মানুষ জানতে চায় সৃষ্টিতত্ত্ব—জগৎ কি? জীবন কি? কোথা থেকে এসব এলো? কেন এলো? কোন্ দিকে যাচ্ছে। অথবা আদৌ কোন দিকে যাচ্ছে কি না? এই জানতে চাওয়ার আগ্রহ থেকেই দর্শনের জন্ম ও তার বিকাশ।

সহজাত বৃত্তির ভিত্তিতে এরই একটু পরিবর্তিত সংস্করণের দ্বিতীয় উত্তর হতে পারে: মানুষ তার চৈতন্যের গভীরতম অভ্যন্তরে জানতে পাচ্ছে যে সে অসীম, অবাধ। কিন্তু তার সাধারণ অভিজ্ঞতায় সে অবিরত দেখছে সীমা এবং বাধা। মুক্তির জন্য বন্ধের দুর্বার তৃষ্ণা, অনন্তের জন্য সান্তের অন্তহীন আকুতি স্বভাবতঃই জ্ঞানৈষণার রূপ নিচ্ছে।

তৃতীয় আরো এক উত্তর হতে পারে: দার্শনিক জ্ঞানৈষণা বিবর্তনের ধারাপথে এসেছে। জীবনের একটি মাত্র সহজাত বৃত্তি আছে—সে হচ্ছে টিকে থাকার বৃত্তি। বাকী আর যা কিছু আজ সহজাত বলে মনে হয় সবই এই এক এবং আদিম বৃত্তির সম্প্রসারণ: মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে খেতে হয়, আচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হয়। (বেঁচে থাকতেই হচ্ছে কেন, সেটা দর্শনেরই অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন এবং আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিক)। খাদ্য আচ্ছাদনাদি সংগ্রহ করতে মানুষকে অবিরত একটার পর একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এবং এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে বা করার চেষ্টা করতে হয়েছে। এই চেষ্টারই পরিণতি দার্শনিক চিন্তা। নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে মানুষের যত, কিছু সৃষ্টি সবই এই চেষ্টার পরিণতি। আজ সকালের বাজার দর থেকে সুরু করে সুদূর নীহারিকাতত্ত্ব পর্যন্ত যা কিছু, সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদরান্নের তাগিদের সঙ্গে জড়িত। (প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মানুষের জ্ঞানের যত বিচিত্র দিক যত বিচিত্র প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে গড়ে উঠেছে তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্টির মূল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, এবং সে ভাবে দেখলে জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্তটাই দর্শন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে দর্শন বা দার্শনিক গবেষণা বলতে সেই বিশেষ চিন্তা-সংকলনকে লক্ষ্য করা হচ্ছে যার একান্ত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জীবনের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন, যেমন জগৎ ও জীবন কি, কেন, কোথা থেকে, কোথায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।) কোন একটি বিষয় নিয়ে তার কার্য-কারণ সম্পর্ক বিচার করতে করতে চিন্তা ক্রমশঃ এমন স্তরে পৌঁছে যেতে পারে যেখানে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের সম্বন্ধ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবে না। সম্বন্ধ কিন্তু থাকছেই। এবং দর্শনে এটা সর্বদাই তেমন অপ্রত্যক্ষও নয়। যেমন, ধরা যাক, মৃত্যুভয়। বেঁচে থাকবার ইচ্ছার সঙ্গে মৃত্যুর নিত্য সংঘাত। বাঁচতে হলে জীবনকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে মৃত্যুর সঙ্গে; সুতরাং মৃত্যুকেও বুঝতে হবে। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির মার থেকে ফসল বাঁচাবার আগ্রহে শুভ ও অশুভ শক্তিসম্পন্ন দেব দেবীর কল্পনা করা গেল। নানারকম স্তাবকতা করে এবং ঘুষ-ঘাষ দিয়ে তাঁদের খুশী করার ব্যবস্থাও না হয় হোলো।

এই রকম নানা খুচরো সমস্যা নানা রকম পুঁথিপাঠ বা কলা-কৌশল করে মীমাংসার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু তাতেও সব সমস্যা মিটছে কই? শেষে আছে মৃত্যু। তাকে কিছুতে বারণ করা যাচ্ছে না। সুতরাং ঐ মৌলিক কি, কেন-গুলির এমন একটা পরিপাটি জবাব চাই যার দ্বারা জীবন ও মৃত্যুর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তেমন ব্যাখ্যা যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন আছে সংশয় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, ভয়—এক কথায়, আছে যা কিছু জীবনের পরিপন্থী। সুতরাং বাঁচতে চ'লে জানতে হবে অর্থাৎ, জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান নয়, জীবনের জন্য জ্ঞান।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে দার্শনিক জ্ঞানের এই তিন ব্যাখ্যা যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন, মূলতঃ একই। জানি না, জানতে চাই; হতে চাই, হতে পাচ্ছি না; বাঁচতে চাই, কিন্তু মৃত্যু আছে—তিনটিরই সাধারণ উপাদান হচ্ছে সংঘাত। চাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়ার সংঘাত। সুতরাং বিস্তারিত তর্কের মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা চলে সংঘাতই হচ্ছে চিন্তার উৎস। সংঘাতের নিরসন মানুষের অধ্যবসায়ের লক্ষ্য। জীবনের আদি, অন্ত, গতি প্রকৃতি নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে মৌলিক সংঘাত আছে, তার নিরসনই হচ্ছে দার্শনিক অধ্যবসায়ের লক্ষ্য। এক কথায়, দর্শন হচ্ছে জীবন-জিজ্ঞাসা।

জীবন-জিজ্ঞাসার প্রেরণা বোঝা গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এর পরিণতি কি? যার জন্য চিন্তার রাজ্যে এই অশ্রান্ত অধ্যবসায়, তার সন্ধান মিলেছে কি? এমন কোন তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যার দ্বারা মানুষের জীবন বাধা-মুক্ত, সংঘাত-মুক্ত, স্বচ্ছন্দ হতে পারে, যার দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, এক সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের সম্পর্ক এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর সব রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভয়হেতুহীন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে? এমন কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যাকে অবলম্বন করে মানুষ এক কথায়, আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে?

কেউ এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছেন কি না, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কিন্তু খোলা চোখে আজকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে একথা বলা নিশ্চয় অন্যায় হয় না যে সংঘাতের নিরসন বিন্দুমাত্র হয় নি, বরং নানা অভিনব সংঘাতের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, এবং কর্মনৈপুণ্য বৃদ্ধির ফলে এই সব সংঘাতের ফল ক্রমশঃ কল্পনাতীত ভাবে ভয়াবহ হয়ে উঠছে। নিরন্তর ভয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ অন্ততঃ কখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে না। সুতরাং সাধারণভাবে মানুষের জীবন ক্রমশঃ তিক্ত, নিরানন্দ হয়ে উঠছে। নিরানন্দ জীবন কোন সৌন্দর্যের, কল্যাণের বাহক হয় না। একথা যদি সত্য হয় তবে এর মধ্যে আজকার সমাজজীবনের বহু গ্লানি ও কদর্যতার ব্যাখ্যা মিলবে।—পাঁচ-হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে সত্য, সৌন্দর্য্য ও সৎ-নীতি নিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বের নিরন্তর গবেষণার পরও মানব সমাজের বর্তমান রূপ যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তবে স্বভাবতঃই বলতে ইচ্ছা হয় দার্শনিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, সত্য কি এবং কোন্ পথে তা মানুষ আজও জানতে পারে নি।

কিন্তু এ রকম মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ দর্শন-ভক্তেরা এর মধ্যে মানুষের যুগ-যুগান্তের সংস্কৃতির একটি দিক সজ্ঞাৎ করার প্রচেষ্টা কল্পনা করে বিরক্ত হবেন। সুতরাং অবিলম্বে এ কথা স্বীকার করা দরকার এই যে উল্লিখিত মন্তব্যের মধ্যে তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই। একটি মাত্র প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্যই এ প্রবন্ধ। প্রশ্নটি হচ্ছে দার্শনিক প্রচেষ্টার ফল কি? মানুষের সংস্কৃতির সযত্ন রচিত উদ্যানে দর্শন-বৃক্ষ বহুশাখ সমন্বিত হয়ে বেড়ে উঠেছে। তার সৌন্দর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ কি শুধু চিন্তাবিলাসীর মনের বাগানের পাতাবাহার? অথবা এ গাছে ফুল ফুটবে, ফল ফলবে, এবং সে এমন ফল যার অমৃতস্বাদ মানুষকে তার সমস্তজর্জর জীবনে শান্তি দেবে, আনন্দ দেবে?

সাধারণ মানুষের চোখে দেখলে তেমন ফল এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু গাছের পাতার অন্তরালে এক-আধটা তেমন ফল লুকিয়ে কোথাও থাকতেও পারে। তার সন্ধান আবশ্যক। এই জন্য সন্ধানীদের কাছেই এ প্রশ্ন।

অবশ্য এ প্রশ্নের কয়েকটি চলতি জবাব আছে। কিন্তু নানা কারণে মনীষীগত ভাবে মানুষের কাছে সে জবাবগুলি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হচ্ছে না। চরম উত্তর পাবার আশায় এই বাঁধাধরা জবাবগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করে রাখা ভাল।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক দেশেই সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকের মধ্যে বিশেষ এক অংশ সেই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের—অতীতকালে প্রচলিত রীতিনীতির—অনুরক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ঐতিহ্য বা রীতিনীতির পরিবর্তে নিছক একটা কাল্পনিক আদর্শবাদের প্রতি অনুরক্তিও দেখতে পাওয়া যায়। এই ঐতিহ্য, রীতিনীতি বা আদর্শ-বাদের দার্শনিক ভিত্তি আছে বা থাকা সম্ভব, এবং এদের স্বপক্ষে কোন-না-কোন ঐতিহাসিক চিন্তানায়কের সমর্থন আছে। সুতরাং এঁদের অনুরক্তদের কাছে জীবনসমস্যার সমাধান অত্যন্ত সহজ। শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় যাঁরা বিশ্বাস করেন (বা তাঁদের ধারণা তাঁরা বিশ্বাস করেন) যে মনুর ব্যবস্থিত বর্ণাশ্রম মেনে চললে আমাদের জীবন নিরুপদ্রব হতে পারে। এমনি, মোজেস বা কনফুসিয়াসের নৈতিক অনু-শাসন, শারিয়াতের সমাজব্যবস্থা, প্লেটোর পরিকল্পিত রাজনিশাসিত রাষ্ট্র—সবেরই কিছু না কিছু অনুরক্ত আছেন। তাঁদের অনুরক্তি আন্তরিক নয় তাও হয়ত সব ক্ষেত্রে বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু তাঁদের নিজ নিজ আদর্শের প্রতি আস্থা অন্য বহু লোকের মধ্যে তাঁরা সংক্রামিত করতে পারছেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা তাঁদের আদর্শবাদের ব্যর্থতা সূচিত করছে। এ বিষয়ে বেশী আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে এই: দর্শন একটা ব্যাপক শব্দ। যে জ্ঞান এর লক্ষ্য তার দুটি স্তর আছে—গবেষণামূলক জ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা উদ্ভাসিত জ্ঞান। গবেষণা-মূলক জ্ঞান কখনো পূর্ণজ্ঞান হতে পারে না, কারণ বিচার বিশ্লেষণ করে যে মন সে নিজে খণ্ড, খণ্ডিত বস্তু ছাড়া সে কিছু ধারণাই করতে পারে না; সুতরাং অখণ্ডের জ্ঞান তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। অখণ্ড সত্য—যা জানলে মানুষের জীবন পূর্ণ হতে পারে—উদ্ভাসিত জ্ঞানের বিষয়, এবং তার জন্য অবতার বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের শরণাপন্ন হতে হবে—একমাত্র তাঁদের বা তাঁদের বিশেষ অনুরক্তজনের কৃপাতেই জিজ্ঞাসুর চেতনায় জ্ঞানের উদ্ভাস সম্ভব। অর্থাৎ ধর্ম। এইরকম স্বয়ং ঈশ্বর বা তৎপ্রেরিত পুরুষ-কথিত ধর্ম ভারতবর্ষে কয়েকটি আছে, আর আছে খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম। এইগুলিই প্রধান, তা ছাড়া আরও কিছু কিছু আছে।

ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক করার কারো সুবিধা হচ্ছে না। সুতরাং এ জবাব নীরবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর মাত্র দুটি কাজ করা যায়; সে হচ্ছে, এক, অবতারতত্ত্বে সরাসরি অবিশ্বাস করা এবং দুই, ভক্তার বা শান্তিরক্ষার খাতিরে প্রকাশ্যে বিশ্বাস ঘোষণা করে কার্যতঃ নিজ নিজ প্রকৃতি পরিচালিত পথে চলা। বস্তুতঃ মানুষ ঠিক তাই-ই করেছে। ঈশ্বর এক হতে পারেন, কিন্তু অবতার বহু। যে কোন একজন অবতারকে মেনেছে যত লোক, মানে নি তার চেয়ে অনেক বেশী। মেনেছে যারা তার মধ্যেও আন্তরিক ভাবে মেনেছে যত লোক, কার্যতঃ অমান্য করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং অবতার বা প্রেরিতদের সম্পর্কে মানুষের তিনটি প্রধান শ্রেণী আছে: (১) আন্তরিক বিশ্বাসী, (২) কার্যতঃ অবিশ্বাসী এবং (৩) প্রকাশ্য বিদ্রোহী। এই তিন দলের প্রত্যেকেরই অনেক উপদল আছে। এদের যে-কোন দল বা উপদলের সঙ্গে অন্য সমস্ত দল এবং উপদলের অবিরাম সংগ্রাম। সংগ্রামটা সব সময় এক অবতারের দলের সঙ্গে অন্য অবতারের দলের হচ্ছে তাই নয়। অনেক সময় একই অবতারের দলের এক উপদলের সঙ্গে আর এক উপদলেরও

হচ্ছে। ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা এই সংগ্রামের কাহিনীতে ভরা। ঈশ্বর কখনো অবতীর্ণ হয়েছেন ধর্ম-সংস্থাপনার্থে, কখনো শান্তি প্রচারের জন্য, কখনো অন্য কোন প্রয়োজনে। দু-চার-জন—'কোটিকে গুটিক'—তাঁর বাণী সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেও থাকতে পারেন, কিন্তু সমস্ত মানবজাতির জীবনের দিক থেকে দেখলে এই দুজন ব্যক্তির কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল তা ভাবা শক্ত। তফাৎ কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে সেই 'সত্য'—যা লাভ করলে আর কিছুই পাবার আগ্রহ থাকে না। যাতে প্রতিষ্ঠিত হলে দারুণতম দুঃখেও মানুষ অবিচলিত থাকতে পারে'—কোন অবতারের কাছ থেকেই আসে। পাওয়া যায় নি। হয়ত ধর্মপ্রবর্তকরা প্রত্যেকেই সেই সত্য করার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের সততায় সন্দেহ বা তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করার কোন অর্থ হয় না, তার কোন প্রয়োজনও নেই। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞানের উদ্ভাসন ঘটে নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন অজ্ঞানের রাজপথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে—তার জন্য বিশেষ কোন ধর্ম-প্রবর্তককে সরাসরি দায়ী করা যায় বা না-যায়, সে স্বতন্ত্র কথা।

সাম্প্রদায়িক ধার্মিকরা এর উত্তরে সাধারণতঃ বলে থাকেন যে প্রবর্তকরা 'সত্য' ঠিকই ব্যাখ্যা করেছেন; লোকে সেটা গ্রহণ করতে পারছে না তার কারণ তাদের নয়ো অজ্ঞানের চাপ এত বেশী যে তার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের আলো প্রবেশের কোন রন্ধ্র নেই। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই উক্তির মধ্যেই ব্যর্থতার স্বীকৃতি রয়েছে। পৃথিবীর মানুষ—অন্ততঃ অধিকাংশ মানুষ—সত্যজ্ঞানের জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উন্মুখ হয়ে আছে, অথবা নেই। যদি তারা উন্মুখ হয়ে আছে, তবে ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যের আলো অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদ করে তাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারা উচিত। আর যদি তারা সে আলো গ্রহণের উপযুক্তই না হয়েছে, তবে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হবারই কোন অর্থ হয় না।

তৃতীয় উত্তর হচ্ছে (এটা দ্বিতীয়েরই মত) এই যে, গবেষণামূলক পদ্ধতি দ্বারা সত্য জানা যাবে না। সত্য উদ্ভাসিত জ্ঞানের বিষয়। তবে তার জন্য প্রেরিত পুরুষের বা অবতারের পূজা বা এমনকি ঈশ্বরে বিশ্বাসও অপরিহার্য নয়। পূর্ণ সত্যের জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে। তাকে জাগ্রত করাই হচ্ছে উদ্ভাসন। পদ্ধতি হচ্ছে সেই সত্যের সঙ্গে সমগ্র সত্তার যোগসাধন করা। এই যোগসাধনায় যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁরা সত্য জেনেছেন। এক্ষেত্রে 'জানা' মানে 'হওয়া'।—এই-বারে 'সত্যের' একটা সংজ্ঞা পাওয়া গেল; সত্য ব্রহ্ম; তিনি অস্তিত্ব, চৈতন্য, ও জ্ঞান এই তিনের সমন্বিত পূর্ণতা। ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া—অর্থাৎ 'সত্তার' (বিশ্বে যা কিছু ছিল বা আছে বা হতে পারে তার সমগ্রতার) সঙ্গে আনন্দময় চেতনায় মিলিত হয়ে যাওয়া। আমাদের চেতনা এবং এই চেতনায় প্রকাশিত বস্তুবিশ্বের যাবতীয় কিছু সবই খণ্ডিত, কাল ও আকাশ-দ্বারা সীমিত। ব্রহ্মজ্ঞ—যেহেতু তিনি পূর্ণের সঙ্গে যুক্ত—কালা-কাশের প্রভাবের ঊর্ধ্বে, নিত্য, অনন্তকাল ও অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত। এই পরিব্যাপ্তির অর্থাৎ ব্রহ্মযুক্ততার অবস্থায় তিনি নিজে শুধু কালাকাশের প্রভাবের ওপরে তাই নয়, এই কালাকাশসীমিত বস্তুবিশ্বের যাবতীয় নিয়মাদির সাক্ষী এবং প্রভু। তিনি শুধু জ্ঞাতা ন'ন, নিয়ন্তাও।

এবারে আমরা নিতান্ত গুরুগম্ভীর ব্যাপারে এসে পড়েছি। দর্শনের অনুশীলনে কোন লাভ হয় নি—একথা অতঃপর আর বলা চলে না। অবশ্য এই শেষোক্ত তত্ত্বে জানা মানে 'হওয়া', এবং সেটা তপস্যাসাপেক্ষ; যে তপস্যা যারা করছে না, তারা জানবেও না, 'হবে'ও না। কিন্তু তবু এই তত্ত্বের মধ্যে যে স্পষ্টিত দাবী রয়েছে সেটা গবেষণা মূলক দর্শন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতে সত্যের সংজ্ঞা পাওয়া গেল, সত্য উপলব্ধির পদ্ধতি পাওয়া গেল, উপলব্ধির ফল কি হতে পারে তাও জানা গেল। সুতরাং দৃশ্যতঃ, অভিযোগের আর কোন হেতু থাকার কথা নয়

কিন্তু থাকছে। কারণ, ধর্মসাধনার ইতিহাসে যা দেখা যায়, যোগসাধনার ইতিহাসেও তাই—কদাচিৎ একটি দুটি মানুষ এই তত্ত্ব অবলম্বন করে উন্নততর জ্ঞানের স্তরে পৌঁছতে পেরে থাকতে পারেন, জনসাধারণের জীবনের কাঠামো তাঁদের সাধনার দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি।

অবশ্য ধর্মজীবনের প্রসঙ্গে যেমন, এই আপত্তিরও তেমনি মামুলী জবাব আছে: জনসাধারণের জীবনে পরিবর্তন আসে নি তার কারণ জনসাধারণ আজো তপস্যার শক্তি বা প্রবণতা বা আস্পৃহা অর্জন করে নি। যা তপস্যালভ্য, বিনা তপস্যায় তার স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়, এবং তা না-পাওয়ার জন্য যোগীদের দায়ী করা চলে না। এ যুক্তি অকাট্য।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে জনসাধারণের আত্যন্তিক কল্যাণের দিক থেকে দেখলে মানতে হবে যে এই যুক্তির মধ্যেও ব্যর্থতার স্বীকৃতি আছে। এই যুক্তির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত যা, তা পুরাপুরি মানলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে মানুষের দুঃখনিবৃত্তির জন্য অমৃতের সন্ধানে যার হওয়া গেল, সে অমৃত যখন মিললো তখন দেখা গেল যে অধিকাংশ মানুষেরই তাতে কোন অধিকার নেই। সিদ্ধান্ত—অধিকাংশ মানুষ চিরদিনই দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে বাধ্য, সম্ভবতঃ স্বয়ং স্রষ্টার এই অভিশাপ। অবশ্য কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব মিশ্রিত করে এ অভিশাপের দুঃসহ তীব্রতা কিঞ্চিৎ মৃদু করে আনার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে মূল পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় নি। কারণ, দেখা যাচ্ছে এই তত্ত্ব অনুসারে সমষ্টিজীবনের জন্য কিছু করণীয় নেই। মানুষ শুধু তার নিজের জীবন নিয়ে যতটুকু করতে পারে তাই তার পাথেয়। সুতরাং এমন চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্ভাব্যতার সন্ধান পেয়েও একথা না-ভেবে পারা যায় না যে কিছুই পাওয়া যায় নি, এবং তখন আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হয়।

সে গোড়াটা এই: মানুষ যেমন ব্যক্তি হিসাবে একক, তার সুখ দুঃখের সব অংশ নিছক তার একার, তেমনি সে সমষ্টি জীবনেরও একটা অংশ। সে সুখ বা যে দুঃখ তার নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার, তার ভাগ সে আর কাউকে দিতে পারে না, এটা সত্য বটে, কিন্তু সমষ্টি জীবনের সুখ দুঃখের ভাগ তাকে নিতেই হয় এটাও সমানই সত্য। এখন, ব্যক্তি হিসাবে মানুষ সুখী হতে চায়, সেই উদ্দেশ্যে সে নিজের সুবিধা, সুযোগ, রুচি ও প্রেরণা অনুসারে নিজের জীবন গড়ে নিতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টার জন্য তার বাইরের কোন উদ্দীপনা একান্ত অপরিহার্য নয়। কিন্তু যেহেতু সে সমষ্টিজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সে হেতু তার নিজের এবং বাইরের দিক থেকেও লক্ষ্য রাখা দরকার হয় যে সমষ্টি কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে তার জীবনচিত্র রচনা করছে কি

এইখানে প্রয়োজন হয় সৎ-নীতির, এবং কার্য-কারণ সম্পর্কের বোধ যখন মানুষের মনে উদ্বেলিত হয়েছে তখন থেকেই মানুষ একটা আদর্শ নৈতিক বিধানের সন্ধান করে আসছে। প্রত্যেক সমাজ তার আপন প্রয়োজন অনুসারে এক এক রকম নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা রচনা করে নিয়েছে। কিন্তু শুধু নৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের তৃপ্তি নেই। বরং মানুষের কর্মক্ষেত্র যত বিস্তৃততর হবে, বিশেষ এক নৈতিক ব্যবস্থার চৌহদ্দি ভেঙে বেরোবার আগ্রহও তার তত প্রবল হবে। এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ধর্ম এসে মানুষের জীবনকে একভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে: আত্মার অমরত্ব এবং পরলোক তত্ত্বের সাহায্যে নৈতিক বিধিব্যবস্থার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবার প্রয়াস করেছে। সামাজিক দিক থেকে দেখলে এ প্রয়াস সর্বাংশে ব্যর্থ হয় নি; ধর্মের বনিয়াদের ওপর এক একটা বিশাল সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এক এক সময়ে এই সংস্কৃতির আওতায় এমন সব মানুষের উদ্ভব হয়েছে যাঁদের আজো পর্য্যন্ত মানবতার শ্রেষ্ঠতম

প্রকাশ বলে গণ্য করা চলে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে এঁদের প্রভাব কোনদিনই স্থায়ী হয় নি। অর্থাৎ এঁদের জীবনের সত্য অন্যের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে নি। মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করবে সেই বস্তুকে যার সে তার অন্তরতম তৃষ্ণা ও বাইরের জীবনের অভিজ্ঞতা এ দুয়েরই সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে। তেমন কোন সামঞ্জস্য এনে দিতে পারে নি।

ছাড়া, ধর্মে (এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে বিচার-বিশ্লেষণমূলক দার্শনিক গবেষণাকে ধার্মিক ও যত অবজ্ঞাই করুন, তাঁরা নিজেরাও নিজ নিজ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে গবেষণাকে মোটেও বাদ দিতে পারেন নি; বস্তুতঃ তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় অনির্বচনীয় হলেও তাকে বচনীয় করে তোলবার চেষ্টার দুয়ের অন্ত নেই। যা বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় তা তো যায়-ই না, যেটুকু বোঝা যায় তা বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যেই বোঝানর চেষ্টা হয়েছে)—সব ধর্মেই এমন একটা কল্পলোক রচনা করা হয়েছে পরবর্তী, এমন কি অনেক সময় সমসাময়িক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর মানুষের নানা কারণে আস্থা

সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যেখানে সংঘর্ষ হয়েছে, মানুষ সাধারণতঃ ধর্মকে বাদ দিয়েছে, তটস্থ হয়ে বোঝবার চেষ্টা করে নি যে সংঘাতটা মূলের সঙ্গে অথবা কোন গৌণ অংশের সঙ্গে বা বাদ দিলেও মূলের কোন ক্ষতি হয় না। জমি থেকে ঘাস বেছে ফেলতে অনেক সময় ধানের চারাও উপড়ে যায়। বিজ্ঞানের আরো উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে আমাদের মনের জমিতে ধান চারা আর দু-চারটিও আছে কি না সন্দেহ। আজ মানুষের কর্মক্ষেত্র প্রায় সীমাহীন, বস্তুর জ্ঞানও বেড়েছে বিপুল, প্রকৃতির বিশাল সাম্রাজ্যের অপরিমিত সম্পদ মানুষের হাতে। অন্য দিকে ধর্মের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়েছে, প্রায় সমস্ত নীতির ভিত্তি ধ'সে গেছে, বস্তু সম্পদ ছাড়া আর কিছুই তার কাছে স্থায়ি-মূল্য নয়—এক কথায়, মানুষ অন্তরে আজ একান্ত রিক্ত। বস্তুজগতের বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে এই রিক্ত মন নিছক আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু করণীয়ের সন্ধান পাচ্ছে না। আজই সুতরাং দর্শনের চরম খতিয়ানের দিন। যদি এমন কোন সত্যের সন্ধান মিলে থাকে যার দ্বারা মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত প্রাপ্তি, সমস্ত তৃষ্ণা ও আস্পৃহা, তার ইহকাল ও পরকাল, তার দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, সবের মধ্যে সামঞ্জস্য করে সব কিছুকে এক সূত্রে এক নৈবেদ্যের মালার মত গেঁথে তুলতে পারা যায়, তবে তাকে উদ্ঘাটিত করার সময় আজই। আগামী কাল আর সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। যদি যোগতত্ত্বে সেই সত্য থাকে, তাকে পরিষ্কার ঘোষণা করতে হবে, তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে হবে। এবং যে হেতু এই তত্ত্ব বিশেষ করে ভারতবর্ষেই বার বার বিশেষ স্পর্ধার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে, যৌগিক প্রজ্ঞাকে লৌকিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারতবর্ষের।

এ দায়িত্ব কত অপরিহার্য সেটা আজকার সাম্প্রতিক-তম সমস্যার প্রসঙ্গে বোঝা যেতে পারে। আজ গোটা পৃথিবী কার্যতঃ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, তার একে অপর ভাগের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ হলে প্রলয়ংকর ব্যাপার হতে পারে। ভারতবর্ষ শান্তিদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অনেকের মতে এই ভূমিকায় সে অনেকখানি সফলও হয়েছে। এর জন্য বিভিন্নদিকে তার প্রশংসা ধ্বনিত হচ্ছে। নেতারা উৎফুল্ল, গর্বিত। অবশ্য তাতে কিছু আপত্তির কারণ নেই। আপত্তি হচ্ছে এই যে সম্ভবতঃ এ ভূমিকার প্রকৃত গুরুত্ব আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। যুদ্ধের নেশায় যদি লোকে যুদ্ধ করবার জন্য রুখে দাঁড়াতো, শান্তি-দূতের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারতো। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে (আশঙ্কিত) যুদ্ধের কারণ রয়েছে।

দু-পক্ষের প্রত্যেকেরই এমন কিছু রয়েছে যা তারা মূল্যবান মনে করে, এবং দরকার হলে তার জন্য তারা আত্মঘাতী সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত। দরকার যদি সত্যই হয় শান্তিসূত্রের নৈতিকবাক্যে, এমন কি কূটনৈতিক-বাক্যেও, কোন ফল হবে না। সুতরাং, শান্তি যদি রক্ষা করতে হয়—মানুষকে বাঁচাতে হলে করতেই হবে—তাহলে যে মূল্যবোধের উপর এই সমরসজ্জা, তাকেই বদলাতে হবে। কাজটা রাজনৈতিক নয়, আধ্যাত্মিক। অতএব কাজটা কোন একজন বা কয়েক-জন রাষ্ট্রনেতার নয়, এটা সমগ্র ভারতবর্ষের জন-সাধারণের যার পুরোভাগে থাকবেন তত্ত্বজ্ঞ যোগীরা যদি তেমন যোগী কেউ থাকেন।

এই যদিটা নিয়েই সমস্যা।

অনেকের মতে এ রকম প্রশ্ন উত্থাপন করাই ধৃষ্টতা। বহুলোকে বহুদিন ধরে এ মত পোষণ করে এসেছেন। কিন্তু তাতেই মতটার গুরুত্ব বেড়েছে তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ভারতবর্ষে প্রতিযুগেই দু-চারজন মানুষ যোগ-সিদ্ধি অর্জন করেছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁদের সিদ্ধি সমাজজীবনে কোন পরিবর্তন আনে নি। এটা সত্য যে এদেশের জনসাধারণ এই সব সিদ্ধপুরুষদের শ্রদ্ধা করে, হয়ত ভক্তিও করে, এঁদের কারো কারো জন্মদিবসাদি উদ্‌যাপিত হয়, সিদ্ধপীঠে মন্দির তৈরী করার জন্য বড় বড় চাঁদাও ওঠে। অর্থাৎ এক কথায়, লোকে এঁদের 'বিশ্বাস' করে। কিন্তু আলোচ্য সমস্যার প্রসঙ্গে এই বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। নিরীক্ষণ করে দেখলে বোঝা যাবে এই বিশ্বাসের মধ্যে ভক্তির চেয়ে ভয়ের অংশটাই বলবত্তর। সাধুকে না-মানলে সাংসারিক ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু মানার মধ্যে প্রাণশক্তির কোন একনিষ্ঠ সংকল্প নেই। মানাটা অভ্যাসের ব্যাপার, এর মধ্যে মনের নির্বাচনের কোন প্রশ্ন নেই। এই অভ্যস্ততার বিষ বিশেষ করে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে সংক্রামিত হয়ে গেছে বহুদিন আগে। এমন কি বড় বড় বুদ্ধিজীবীরাও এই বিষের প্রভাবমুক্ত নন। রাষ্ট্রপতির সাগানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ সুরু হচ্ছে হোম-যজ্ঞ করে, কুম্ভমেলায় গিয়ে নেতারা নাবার জল ঢালছেন, পুরী গিয়ে জগন্নাথের রথরজ্জু আকর্ষণ করছেন। সাধারণতঃ মনে হতে পারে এসব দলগত রাজনৈতিক কলাকৌশলেরই অন্তর্গত। কিন্তু বাস্তবিক তা নাও হতে পারে। মনে রাখতে হবে এই নেতারা ভারতীয় জনগণেরই অংশবাত্র—যে ভারতবর্ষের জনচিত্ত থেকে কোনরকম বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা বহুযুগ পূর্বে অন্তর্হিত হয়েছে। যজ্ঞ, গঙ্গাজল, রথরজ্জুর কোন আধ্যাত্মিক মূল্য আছে কি না ঐতিহ্যশাসিত মানুষ সে প্রশ্ন করবে না। কিন্তু জীবনচ্ছন্দ যে নিজে নির্বাচন করে নেওয়ার স্পর্ধা রাখে তার এ প্রশ্ন না করে উপায় নেই। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে ভারতের সমস্ত লোক, অন্ততঃ সমস্ত হিন্দু, প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্ধ উপাসক। সবাই জানে বহুলোক এসব আর মানে না। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে যারা মানছে না তাদের না-মানারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গঠিত হয় নি আপত্তি এইখানেই। মানা উচিত কি অনুচিত তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না-পেয়ে মানা বা না-মানা কোনটারই অর্থ হয় না। অতএব সবার আগে চাই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ। এই প্রমাণের জন্য আমাদের আগ্রহের অভাব এই সূচিত করে যে সিদ্ধপুরুষদের কথিত দিব্যজীবনের কল্পনা আমাদের অন্তর আলোড়িত করে নি। অধিকারিভেদবাদ বা মানসিক প্রস্তুতির কথা বলে এই না-করার যে ব্যাখ্যা চলে আসছে সেটা এখন বর্জন করার সময় এসেছে। হাজার হাজার বছর ধরে সিদ্ধপুরুষদের পূজা করেও লোকের মনে সিদ্ধির জন্য ব্যাকুলতা জাগে নি তার প্রধান কারণ সিদ্ধিতে তাদের আন্তরিক বিশ্বাস কখনোই হয় নি। যে জীবন তারা অযাচিত পেয়েছে তাকেই তারা পরিপূর্ণ আনন্দ পেয়েছে তা নয়, কিন্তু তবু সে জীবনই বাস্তব, একে বর্জন করে অদৃশ্য, অজ্ঞাত অবাস্তবের পিছে ছুটবে কিসের প্রেরণায়? এই

যদি কেউ করতে
তাদের অনেকে—হয়ত

যাদুকরের তরফ থেকে দম্ভ আসে, যেটা মনের বা আত্মার উপলব্ধির বস্তু, অন্যের কাছে তার প্রমাণ কি করে দেওয়া যায়? কিন্তু প্রশ্নটা শুনতে যত গুরুগম্ভীর, আসলে নয়। সুতরাং এর জবাবও সহজ। যোগতত্ত্বে উপলব্ধিটাই প্রধান যদিও, সেটাই একমাত্র দাবী নয়।

ব্রহ্মস্বরূপে যুক্ত হয়ে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিতি
এ দাবীর যদি ভিত্তি থাকে, তবে যুক্তিসঙ্গত
ভাবেই তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অতীত, ক্ষুধাতৃষ্ণার
ঊর্ধ্বনিদ্র, ভূত-ভবিষ্যৎজ্ঞাতা, সমস্ত কার্য-
কারণ-সম্পর্কের স্রষ্টা, অণিমা, লঘিমাদি আটরকম বিভূতি
করতলগত, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোন্‌টি এমন আছে যা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কাছেও প্রমাণ করা যায় না?

সিদ্ধযোগীরা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেন জানি না। কিন্তু অবিশ্বাসের কাছে এরকম প্রশ্ন করলে অনিবার্যভাবে প্রত্যুক্তি শুনতে হয়:—মানুষের সখ হয়েছে ভেল্কী দেখতে, আর যোগীরা অমনি ভেল্কী দেখিয়ে বেড়াবে? ভেল্কী দেখে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

নানা রকম শিষ্যের কাছে এই একই কথা শুনে শুনে এ রকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সম্ভবতঃ শ্লেষোক্তি ছাড়া আর কোন যুক্তি তাঁদের নেই, এবং শ্রোতাদের পক্ষেও তখন এই সুরেই জবাব দেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার প্রয়োজন নেই। শ্লেষোক্তির সরল উত্তরই দেওয়া যেতে পারে। সেটা এই: প্রথমতঃ হাত-সাফাই বা অন্য কোন কায়দা-কৌশল করে অসত্যকে সত্য বলে প্রতীয়মান করাটাই ভেল্কী। যোগসিদ্ধি যদি সত্য হয়, তবে সেটা ভেল্কী নয়; সুতরাং সেটা দেখবার প্রস্তাব ভেল্কী দেখাবার প্রস্তাব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই সিদ্ধাই (ওরফে ভেল্কী) দেখালে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে একথা যেমন নিশ্চয় করে বলা যায়না, হবে না তা-ও নিশ্চয় করে বলা যায় না। যেহেতু যোগসিদ্ধির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কেউ-ই এই ভেল্কী ব্যাপক ভাবে (বা আদৌ কোন ভাবে) দেখান নি, সেই হেতু যদি আজ কেউ দেখাতে পারেন তবে তার প্রতিক্রিয়া সমাজমনে কি হবে তা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করবার কোন ভিত্তি নেই।

তৃতীয়তঃ এ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু অনুমান করা যায়। যে জিনিষের অস্তিত্বে বা সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস নেই তাকে চোখের সমুখে জাজ্বল্যমান করে দেখালে লোকে অন্ততঃ চমকে উঠবে নিশ্চয়। মানুষের সমাজকে যদি বাঁচাতে হয় এবং উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আজ ব্যাপকভাবে এমনি একটা চমক সৃষ্টি করবার প্রয়োজন আছে।

বিজ্ঞান জগৎ

গ্রহান্তরে অভিযান

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

। ১৫-২০ বছরের মধ্যেই আকাশে একটা নতুন আবির্ভাব ঘটবে বলে মনে হয়। উপরের সেই চাঁদের মত অদ্ভুত আকৃতির ছোট্ট একটা

দেহটাকে নতুন ধরণের জেটপ্লেন বলে ভুল করবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই অদ্ভুত বস্তুপিণ্ডটাকে চাঁদের মতই একটা সাধারণ জিনিষ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

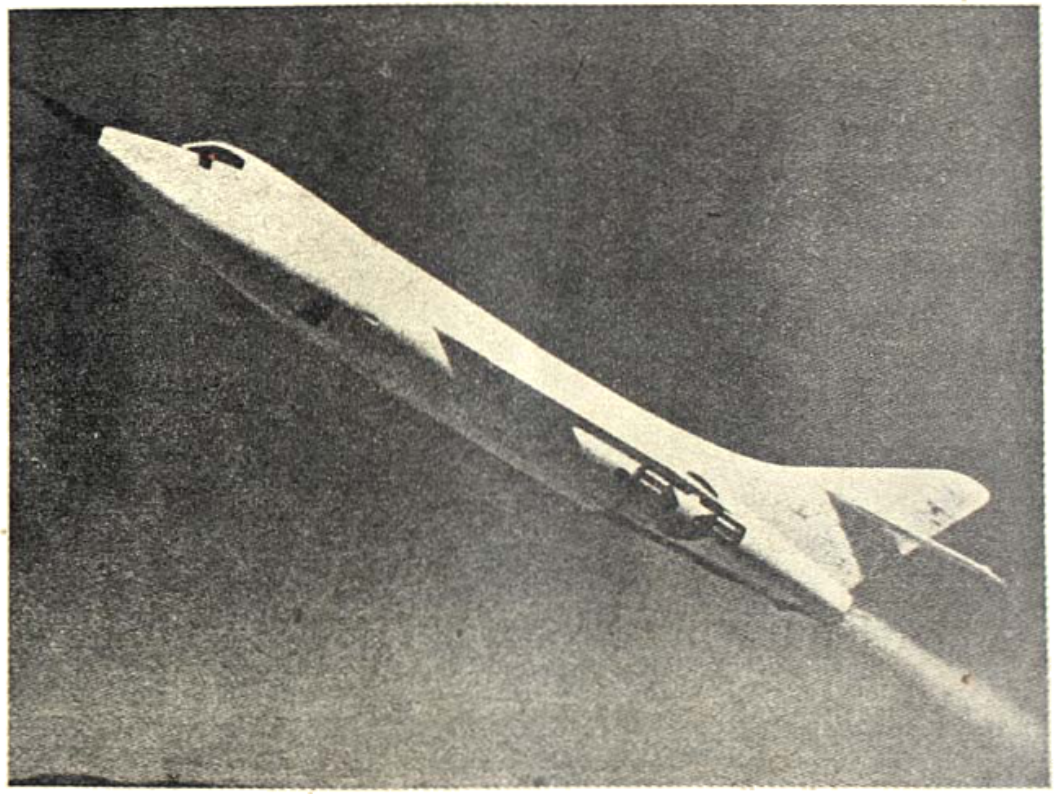

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে এই ধরণেরই যান সবচেয়ে উঁচুতে এবং দ্রুতগতিতে যাত্রীসহ ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আকাশের এদিক থেকে ওদিকে দ্রুতগতিতে তে দেখা যাবে। প্রথম প্রথম অনেকেই হয়তো

কিন্তু সত্যিকারের জিনিষটা হবে শূন্যে স্থাপি স্পেস-ষ্টেসন; অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে শূ একটা

অবস্থান করা। চন্দ্র যেমন শূন্যমার্গে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, এই স্পেস-ষ্টেসনটা হবে সেই রকমেরই একটা জিনিষ; তবে জিনিষটা হবে মানুষের তৈরী, আর চন্দ্রের চেয়ে অনেক ছোট।

আরম্ভমান কাল থেকেই মানুষ পৃথিবীর বাইরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কসমূহ দেখে আসছে। এদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। কিন্তু পৃথিবী থেকে অত দূরে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্বরূপ উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। মানুষ কিন্তু তবুও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। যন্ত্রপাতি সহযোগে এসব জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে তারা অনেক কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এতেও মানুষের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় নি। এখন তারা এসব গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে অভিযান চালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেমন করে সে অসীম শূন্যের ভিতর দিয়ে অভাবনীয় দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করবে? বিমানপোতই হচ্ছে তার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সাধারণ বিমানপোত যতই উন্নত ধরণের বা উচ্চ গতি-সম্পন্ন হোক না কেন, তার পক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে যাবার উপায় নেই। সাধারণ বিমানপোত চলে বাতাসের উপর ভর করে। যতই উর্ধ্বে ওঠা যায়, বাতাস ততই বিরলতর হতে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে গেলেই অসীম শূন্য। সেখানে না আছে বাতাস, না আছে আর কিছু। কাজেই এরূপ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে চলতে হলে এমন বিমানপোত তৈরী করতে হবে যাকে কোন রকমেই বাতাসের উপর নির্ভর করতে হয় না, একমাত্র ভিতরকার আলানী-পদার্থের বিস্ফোরণের ধাক্কায় প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলতে পারে। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। অনির্দিষ্টকাল চলবার মত পর্যাপ্ত আলানী নিয়ে যেতে পারে, এরকম একটা অতিকায় বিমানপোত নির্মাণ বর্তমানে অন্ততঃ সম্ভব নয়। তবে অধিকতর সহজ পন্থায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা মানুষের আয়ত্তাধীন হলে ভবিষ্যতে সে রকমের একটা কিছু করা হয়তো অসম্ভব হবে না। মানুষ কিন্তু ততদিন পর্যন্ত মহাশূন্যে অভিযানের প্রচেষ্টায় নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে রাজী নয়। যতখানি সম্পদ, যতখানি ক্ষমতা তার আয়ত্তে এসেছে তার সাহায্যেই সে এই অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য লাভের আশা রাখে। একটু আগে যে স্পেস-ষ্টেসনের কথা বলেছি সেটাই হবে মহাশূন্যে যাত্রা-পথের প্রাথমিক ব্যবস্থা। এই স্পেস-ষ্টেসন তৈরী হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যেই মহাশূন্যে বিচরণকারী বিমান-পোত, অর্থাৎ স্পেস-সিপ হয়তো সত্যসত্যই চন্দ্রলোকে সিয়ে অবতরণ করবে। তার পর থেকে স্পেস-সিপে চড়ে চন্দ্রলোকে যাওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হবে! তারপরে শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রহে অভিযান শুরু হবে এবং আধুনিক বিমানের মত মহাশূন্যে বিচরণকারী বিমানপোত

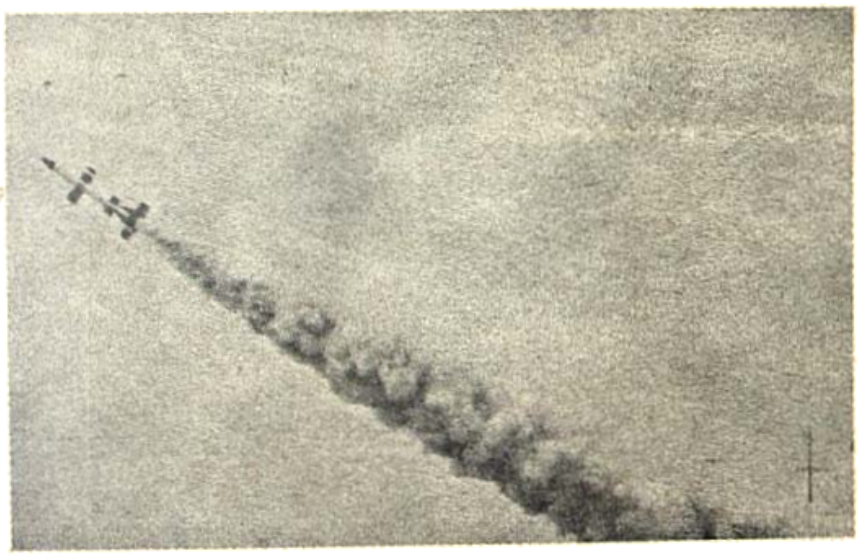

গ্রহান্তরে অভিযানের প্রথম প্রস্তুতি হিসেবে প্রথম যে দু-ষ্টেজ বা তিন-ষ্টেজ রকেটের পরিকল্পনা হয়েছে তা চলবার সময় এই রকেট চালিত যন্ত্রের মত দেখা যাবে।

কারী হারে তৈরী হতে থাকবে। চন্দ্রতো একশত
রেরও কম সময়ের মধ্যেই মানুষ অভাবনীয় দূরত্বে
স্থিত আমাদের নিকটতম নক্ষত্রলোকেও যাতায়াতের
স্থার জন্যে উপযোগী হয়ে উঠবে।

এসব কিন্তু নিছক কল্পনাবিলাসীর কথা নয়। প্রকৃত
পার যা সে কথাই বলা হচ্ছে। যেসব লব্ধপ্রতিষ্ঠ
ানিক এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাঁরা
বীর বাইরে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা কার্যকরী
। তোলবার জন্যে এখন থেকেই কাজে লেগে গেছেন।
স্তরে অভিযান চালাবার প্রথম পর্যায়ে ১০০০ মাইল
র্ধ একটা স্পেস-ষ্টেসন স্থাপন করাই হবে তাঁদের প্রথম

স্পেস-সিপ স্পেস-ষ্টে
অভিযান সুরু করা
অগ্রগতির পথে এক

প্রকৃত প্রস্তাবে
বিশেষজ্ঞেরা পৃথিবী
উপায় উদ্ভাবনে।
তার আগে কেউ
নানারকম পরিকল্পন
বছরেরও আগে ক
নামে একজন রাশি
পোতের সাহায্যে প

স্কাইরকেটটি শব্দগতির দ্বিগুণ বেগে ঊর্ধ্বাকাশে পরিভ্রমণ করেছে, সত্যিকারে
স্পেস সিপের সঙ্গে এই রকেট বিমানটির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

। সেই স্পেস-ষ্টেসনেই অতিকায় স্পেস-সিপ তৈরী
হবে। এই স্পেস-সিপ তৈরীর মালমসলা মালবাহী
নে করে পৃথিবী থেকে আমদানী করা হবে। এসব

১৯৭১ সালের মধ্যেই
হয়ে উঠতে পারেন;
ইউমাইটেড, ষ্টেটস্-

নিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং জার্মান রকেট সোসাইটি কর্তৃক তরল জ্বালানী-চালিত কয়েকটি ছোট ছোট কার্যকরী রকেট তৈরী হয়। পাঁচ পাউণ্ড ওজন নিয়ে এরকমের একটা রকেট প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে উঠেছিল। ১৯৩৬ সালের মধ্যে আরও অনেক রকেট তৈরী হয় এবং ঐ বছরই প্রোফেসর গডার্ডের রকেট পাউণ্ড ওজন নিয়ে সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে উঠতে সক্ষম হয়। ১৯৪১ সালে পিনে-মুণ্ডিতে জার্মান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে তৈরী হাজার পাউণ্ডেরও বেশী ওজনের রকেট কয়েক মাইল উপরে উঠতে সমর্থ হয়। এসব রেকর্ড ভঙ্গ করে ১৯৪৩ সালে জার্মান A-4 অথবা V-2-এর আবির্ভাব হয়।

পৃথিবী থেকে প্রায় হাজার মাইল ঊর্ধ্বে যে স্পেস ষ্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা হচ্ছে, এই চক্রাকার জিনিষটি তারই একটা নমুনা।

পূর্বে যত রকমের রকেট তৈরী হয়েছিল V-2 রকেটের সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয় না। কারণ সেকেণ্ডে ২.৭৫ পাউণ্ড জ্বালানী খরচ করে ১২½টন ওজন নিয়ে সেকেণ্ডে এক মাইল বেগে V-2 রকেট সোজাসুজি ১০০ মাইল উপরে উঠে যেতে পারে। V-2-এর সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ গভর্ণমেণ্ট এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নিউ মেক্সিকোতে রকেট পরীক্ষায় উদ্যোগী হন। এখান থেকেই একটা V-2 রকেটকে ১১৪ মাইল উপরে উঠানো সম্ভব হয়। এর কিছুকাল পরে ভাইকিং টাইপ রকেট পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করে হোয়াইট স্যাণ্ডস্ থেকে ১৩৪ মাইল উপরে উঠতে সক্ষম হয়।

কিন্তু যেখানে মহাশূন্যে অভিযানের কথা সেখানে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে ১০০ মাইল বা ১৫০ মাইল দূরত্ব কিছুই নয়। কাজেই বিশেষজ্ঞেরা দু-ষ্টেজ, তিন ষ্টেজ, এমন কি মাল্‌টি ষ্টেজ রকেট তৈরীর পরিকল্পনায় উঠে-পড়ে লাগলেন। এই একাধিক ষ্টেজের রকেটের ব্যাপার হচ্ছে, একই সঙ্গে দুটি কি তিনটি রকেট পরপর সাজানো থাকবে। নীচের প্রথম রকেটটা দ্বিতীয় রকেটটাকে বয়ে নিয়ে যাবে। সর্বোচ্চ গতিতে চলতে চলতে প্রথম বড় রকেটটার শক্তি যখন নিঃশেষিত হয়ে যাবে তখন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় দ্বিতীয় রকেটটিতে অগ্নি-সংযোগ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর ফলে দ্বিতীয় রকেটটি পূর্ণবেগে চলতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় অনেক বেশী দূরত্ব অতিক্রম করা সহজ-সাধ্য হওয়ারই কথা। এ ব্যবস্থায় নীচের প্রথমটি V-2 রকেট এর তার পরেরটি আমেরিকার WAC Corporal ব্যবহার করে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৫০ মাইল উপরে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এই দূরত্বই সোধহয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা।

এর পরে কি হবে—সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ২৫০ মাইলের পর ৩৫০ মাইল থেকে ৭০০ মাইল, তারপরে হয়তো হাজার মাইল এবং সর্বশেষে চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌঁছানো যাবে। এটা অবশ্য চন্দ্রলোকে মানুষের অভিযানের ব্যাপার নয়। এটা হবে শুধু একটা রকেট পাঠানোর ব্যাপার—মানুষের চন্দ্রলোকে অভিযানের ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। এই রকমের একটা রকেট চন্দ্র

ছেড়ে গিয়ে শুধু ফেটে পড়বে মাত্র। উইলি লি বলেছেন —আরোহীশূন্য এ রকমের একটা রকেট হবে মানুষের চন্দ্রলোকে অভিযানের অগ্রদূত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় রাসরি চন্দ্রলোকে পৌছাবার উপযোগী রকেট নির্মাণ সুবিধাজনক হলেও অন্য আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। সেটি হচ্ছে একটি অরবিট্যাল রকেট, অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি। এই রকেট চন্দ্রের উপরে গিয়েও পড়বে না বা পৃথিবীতেও ফিরে আসবে না—শূন্যে অবস্থান করে পৃথিবীর চতুর্দিকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করতে থাকবে।

চারদিকে ঘুরে বেড়াতে হলে তার গতিবেগ হওয়া চাই সেকেণ্ডে ৩'৭ মাইল। এরূপ গতিসম্পন্ন একটা রকেট মাত্র ৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। মোটের উপর পৃথিবীর যত নিকটে থাকবে, রকেটকে সেই কক্ষে ঘুরতে হলে তত অধিক বেগে চলতে হবে। যদি পৃথিবীর ৩৫০ মাইল দূর থেকে ঘুরতে হয় তবে রকেটের গতিবেগ হওয়া উচিত সেকেণ্ডে ৪½ মাইল। ২২,৩০০ মাইল দূরে থেকে রকেটের পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে লাগবে ২৪ ঘণ্টা।

রকেট যদি একবার পৃথিবীর বাইরে নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে পৌছুতে পারে এবং সেই কক্ষপথে চলবার উপযোগী

চন্দ্রলোকের সান্নিধ্যে স্পেস শিপের উপস্থিতির একটা আনুমানিক দৃশ্য

যথেষ্ট গতিবেগ পায় তবে বরাবর ঘুরে বেড়াবার জন্য আর কোন জ্বালানীর প্রয়োজন হবে না। সেটা তখন সৌরমণ্ডলের পরিবারভুক্ত নতুন একটা উপগ্রহে পরিণত হবে। উইলি লি'র ধারণা, বর্তমানে রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাতে এখনই

অবশ্যই এই স্পেস-ষ্টেসনটি কি রকমে সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞেরা বিভিন্ন রকমের পরি করেছেন; বিখ্যাত V-২ রকেট নির্মাতা ৬ন ব্রন এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০৩৭ ছ-ঘণ্টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী মনুষ্য অনু ষ্টেসন স্থাপন করা উচিত। এই জিনিষটা দেখ কুট ব্যাসের প্রকাণ্ড একটা চাকার মত। চাকাটার বেড়ের মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ১ থাকতে পারবে। চাকাটা কেন্দ্রের চতুর্দি থাকবার ফলে কেন্দ্রাতিগ শক্তির দরুণ এ মধ্যাকর্ষণের মত একটা আকর্ষণ অনুভ

অবশ্য রকেটে তৈরী করা সম্ভব। ন মানুষ থাকবে না। আপাততঃ এটা ন-ষ্টেসন। অতি উচ্চতায় শূন্যদেশের ভেতে এই স্পেস-ষ্টেসনে রেডার প্রভৃতি যন্ত্রিত যন্ত্রপাতি বসানো থাকবে। এটা ুদিত বৃহত্তর স্পেস-ষ্টেসনের প্রাথমিক মূলক মডেল মাত্র। এসব পরিকল্পনা ন্সের লিখিত 'Outer Space' নামক থেকে কয়েকখানা ছবি নেওয়া হলো।

অভিযানের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা পাওয়া যাবে।

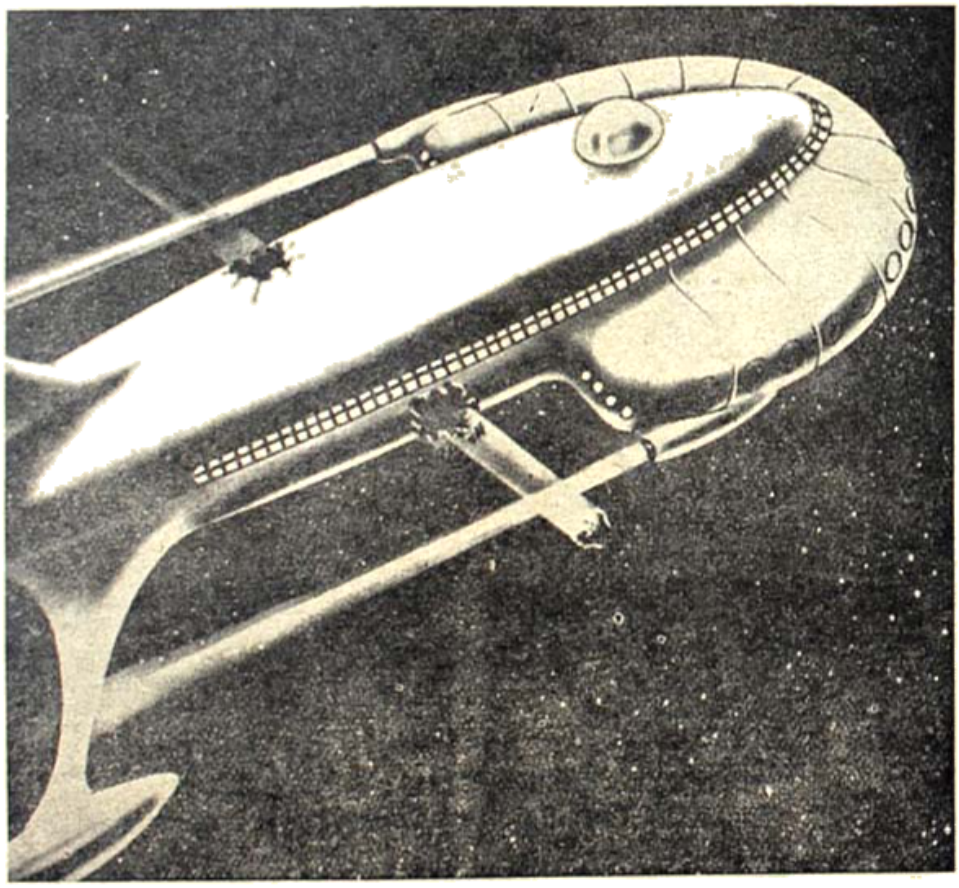

ভয়ংকারী স্পেস সিপের ছোট বড় উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষের ভয় সবচেয়ে বেশী। এই রকমে নানের লৌহ আবরণ অনায়াসেই বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আরোহীদের মাত্র ১৩ সেকেণ্ডের ম বিদীর্ণ স্থানের সংস্কার সাধন করতে হবে।

উইলি লি'র মতে এই চক্রাকার স্পেস-ষ্টেসনের অংশগুলি প্লাষ্টিকের হওয়াই উচিত এবং অংশগুলি রাবারের বেলুনের মত সঙ্কুচিত করে তিন ষ্টেজের রকেটের সাহায্যে ১০০০ মাইল উর্দ্ধে পাঠানো হবে। অবশ্য পৃথিবীর বাইরে অভিযাত্রীদের নিয়ে যাবার মত বিমান পোতের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মনুষ্য অধ্যুষিত স্পেস-ষ্টেসনের কথা নিরর্থক; অন্ততঃ ১০০০ মাইল উর্দ্ধে যাতায়াতকারী স্পেস-সিপের ব্যবস্থা পূর্বেই করতে হবে। এর জন্যে অবশ্য জনমুক্ত স্পেস-ষ্টেসন স্থাপনের ব্যবস্থা বিলম্বিত হবে না।

শূন্যে মনুষ্য বাসের উপযোগী স্পেস-ষ্টেসন স্থাপনের পর সেখান থেকে মহাশূন্যের দূরতর স্থানে সম্ভব হবে। একথা স্পষ্ট যে, সেই ষ্টেসন থেকে পরবর্তী অভিযানেই শুরু হবে চন্দ্রলোকে পৌঁছাবার জন্যে চন্দ্রলোকে পর্য্যন্ত স্পেস সিপ প্রথমবার চলেও অভিযাত্রীদের প্রথমেই সেখানে করবার সুবিধা হবে চন্দ্রের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে প্রথমে সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। এই পরিভ্রমণের ফলে চন্দ্রের যে দিকটা আমাদের কাছে অদৃশ্য সেই অজানা দিকটার খবর জানা যাবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থার জীবন-ধারণ সম্ভব, চন্দ্রপৃষ্ঠের অবস্থা তার বিপরীত হলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষ যখন সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবে, তখনই শুরু হবে শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে অভিযানের পরিচেষ্টা। মোটের পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে একবার মহাশূন্যে পদার্পণ করলেই হয়—কোন আর মানুষকে ঠেকাতে পারবে না, সে দূর থেকে দূরতর স্থানে এগিয়ে যাবেই। মহাবিশ্বের দূরতম স্থানে পদা না করা পর্যন্ত তার অভিযানের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে না।

বানপ্রস্থ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

বহুদিন পরে দেখা, একসঙ্গে কম করিয়াও বারোটা বছর জেলে কাটাইয়াছি, দেখিয়াই ভদ্রলোক খুশী হইলেন এবং আনন্দে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আছেন তবে? এখনও মরেন নি দেখছি।

হাসিয়া ফেলিলাম। পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, বেঁচে আছেন, এটাই খবর। কিন্তু আছেন কেমন?

—ভালোই।

—বেশ, বেশ। আমারও সেই মত, থাকতেই যদি হয়, তবে খারাপ থাকার কোন মানে হয় না। আপনি কি বলেন?

সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নাই আর, সব প্রশ্নের উত্তরও কেহ চাহে না, তাই নিজেই প্রশ্ন করিলাম, আপনি কেমন আছেন?

—আমি? বেশ স্বাধীন হয়েছে, এরপরেও প্রশ্ন করছেন, কেমন আছি?

ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিলাম।

—কথাটা বুঝতে পারেন নি?

—মাথার চুলেতো পাক ধরেছে, কিন্তু বুদ্ধিটা তো দেখছি বেশ কাঁচাই রেখেছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে মানে বেকার হয়েছি। স্বদেশী নাই, বোমা পিস্তল নাই, দল বাঁধা নাই, জেল খাটা নাই, হারানজারা বেটারা চলে গিয়ে আচ্ছা জব্দ করেছে, একেবারে বেকার বানিয়ে দিয়ে গেছে। করবারই যদি কিছু না রইল, তবে থাকা না-থাকা দুই-ই সমান। আপনি কি বলেন?

• • • •

আমি কি বলি? আমার নিজেরই ছবিটা যেন পুরানো বন্ধু সামনে আয়না ধরিয়া দেখাইয়া দিয়া গেলেন। সত্যই মনের দিক দিয়া আজ একেবারে বেকার হইয়া পড়িয়াছি, কারণ করণীয় বলিয়া মনের আর কোন ব্রত নাই। কিশোর বয়সে বিপ্লবীদলে ঢুকি, আর বয়স যখন চুয়াল্লিশ পার হইল, তখন দেশ স্বাধীন হইল। এরই ফলে আজ মনের এই বেকার অবস্থা।

এদিকে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীও বেকার বা কালতুর দলে পড়িয়া গিয়াছি, কারণ বয়সটা পঞ্চাশের পরেও আরও দেড়টা বছর আগাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, এখন জীবনে বানপ্রস্থের যুগ চলিতেছে। মনের বেকার অবস্থা আর বানপ্রস্থ একেবারে হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া হাজির হইয়াছে।

পঞ্চাশ পার হইলে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা বা নির্দেশ আছে। বানপ্রস্থের অর্থ কি? পণ্ডিতেরা কি বুঝেন জানিনা, আমি তো বানপ্রস্থের সোজা মানে বুঝি—বনে প্রস্থান। বনে কেন? বোধহয় পঞ্চাশের পর মানুষ আর সংসারের উপযুক্ত নয়, বনই তার প্রকৃত স্থান। বানপ্রস্থ শব্দটির মধ্যেও প্রস্থান শব্দটি নিহিত আছে। প্রস্থান শব্দটির অর্থ যদি প্রকৃত বা প্রকৃষ্ট স্থান করি তবে ভুল হয় কি? তাহা হইলে বানপ্রস্থের সেই একই অর্থ দাঁড়ায়—পঞ্চাশের পর সংসার নয়, বনই মানুষের প্রকৃত স্থান। কাজেই, শাস্ত্রের নির্দেশটির নির্গলিতার্থ শেষ পর্যন্ত এই পাওয়া গেল—বয়স যখন পঞ্চাশ পার হইবে, তখন সংসার হইতে মন সরাইয়া নিয়া বনে সরিয়া পড়িও।

সংসার হইতে মন সরাইয়া নেওয়াই তো যথেষ্ট, আবার বনে যাওয়ার 'আদেশ' কেন? এখানেও দেখিতেছি আদেশ উপদেশ ইত্যাদির মধ্যে 'দেশ' লুকানো আছে। আদেশ মানে যদি 'দেশ পর্যন্ত' বুঝায়, তবে পঞ্চাশের

পর বনটাই হইয়া দাঁড়ায় সেই দেশ, সেখানে পঞ্চাশের পর মানুষের আশ্রয় স্থান। দেশ স্বাধীন হইবার পর তবে এবার নিজের আপন দেশ বা স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে ইহাই কি আমার বা আমাদের ন্যায় লোকের বানপ্রস্থ?

তাহা হইলে সংসার হইতে মন সরানোই যথেষ্ট বলা চলে না, সেই মনের নূতন স্থানে স্থিতি বা প্রস্থানও যে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তবে বানপ্রস্থ আর বেকার একটি বা এক ব্যাপার নয় দেখা যাইতেছে। বেকারের কর্ম নাই, কিন্তু বানপ্রস্থের মধ্যে দেশ বা আপন আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার নির্দেশ আছে। বোধহয় এই জন্যই সংসার হইতে শুধু মন সরানোই নয়, সংসার হইতে সেই মন লইয়া নিজেরও সরিয়া পড়িবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বন শব্দটির মধ্যেও এই কর্ম নির্দেশ পাওয়া যাইবে। বানপ্রস্থের 'বন' বলিতে এদেশে বন-জঙ্গল অরণ্য বুঝায় না বুঝায় তপোবন, মানে তপস্যার আশ্রম। আর তপস্যার মত কঠিন কর্ম তো খুব বেশী নাই, হয়তো ইহাই প্রকৃত বৃহৎ কর্ম। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আশ্রমের মধ্যে বিশেষ শ্রমসাধ্য কর্মই খোলাভাবেই ব্যক্ত রহিয়াছে।

মোটামুটি তবে এইটুকুই এযাবৎ পাওয়া গেল যে, পঞ্চাশের পর আর সংসার নয়, তপোবন, সংসার-ধর্ম নয়, তখন তপস্যা-ধর্ম। আচ্ছা সংসার গেলে থাকে কি? থাকে বা থাকি একা 'আমি', আর থাকে সংসারের বাইরে বন বা তপোবন। বনে বা তপোবনে এখন আমি নিজে একাই নিজের মুখোমুখী, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। কাজেই তপোবনে আমার কর্মতপস্যা একমাত্র নিজেকে লইয়া এবং কেবল একা নিজেরই জন্য। এখন একটি মাত্র প্রশ্ন থাকে—কে আমি? এই আমার 'আমি'-কে জানা ও জয় করাই তখন হয় জীবনের শেষ বা চরম ব্রত।

আচ্ছা, পঞ্চাশের পর বানপ্রস্থ তথা এই ব্রত গ্রহণের উপদেশ কেন? আগে হইতে দোষ কি? পরেও তো হইতে পারে? পঞ্চাশ পার হইলেই তবে বলং ব্রজেৎ, 'পঞ্চাশ' কি সত্যই এখানে আয়ুর সংখ্যাজ্ঞাপক? পঞ্চাশেও অনেকের শক্তি সামর্থ্যে ভাঁটি আসে না, তখনও অনেকের জীবনে শক্তির পূর্ণ জোয়ারই দেখা যায়। তাহাদিগকে পঞ্চাশ বছর পার হইলেই সংসার হইতে সরানোর কোন অর্থ ও সার্থকতা আছে কি?

বরং ইহাতে সংসারক্ষেত্রে ফুল ফুটানো ফল ধরানোর প্রচুর শক্তি ও সম্ভাবনাকে অসময়ে উৎপাটিত করা হয়। ইহা সংসার ও মানুষটি উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। কাজেই সন্দেহ হয় যে, 'পঞ্চাশ' বলিতে হয়তো পঞ্চাশ বছরই ঠিক নাও বুঝাইতে পারে। 'পঞ্চাশের উর্ধ্বে' বলিতে আয়ুর সংখ্যা নয়, অন্য কিছুই হয়তো বুঝানো হইয়াছে—মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু সে অন্য কিছুটা কি? ঠিক যে কি, তাহা জানি না। তবে এইটুকু অনুমান করিতে পারি যে, পঞ্চাশ দেহের নয়, মনেরই আয়ুর পরিমাপক বা নির্দেশক একটা সংখ্যা সংকেত।

পঞ্চাশকে কেন সংকেত বলিতে চাই? 'পঞ্চাশ'কে একটি শব্দ মনে না করিয়া দুইটি শব্দের সমাহার বলিয়া গ্রহণ করিলে সংকেতটুকু হয়তো ধরা পড়িতে পারে। দেহের নয় মনের আয়ু বা অবস্থার ইঙ্গিতই তখন পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। পঞ্চাশ = পঞ্চ + আশ এইভাবে শব্দটাকে বিশ্লেষ করিলে 'পঞ্চাশের উর্ধ্বে' কথাটার বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা একটা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। পঞ্চ আশ মানে পাঁচ রকম আশা, আর সেই পাঁচরকম আশা পার হইলে অর্থাৎ মিটিলে পঞ্চাশের পারে বা উর্দ্ধে যাওয়া হয়। আর, আশা হইল মনের, মনের পাঁচরকম আশা যখন শেষ হইয়াছে, তখনই সংসার হইতে মন সরাইবার জন্য পঞ্চাশের পর বনে যাইবার আদেশ বা উপদেশটির অর্থ ও সার্থকতা একটা পাওয়া যায়।

অবশ্য পঞ্চাশ মানে পাঁচরকম আশা বলিতে মনের বহু ও বিবিধ রকম আশাই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু মনের সেই বিচিত্র ও বিভিন্ন রকমের আশাগুলিকে ঠিক পাঁচটি

তবে যদি বিভক্ত বা শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তাহাই পঞ্চাশ আকারের অর্থেই পঞ্চ আশা হইতে পারে। কাজেই, এদিকে একটা চেষ্টা করা গেলের হইবেনা। সংসারে মানুষের জীবনযাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণ ছায়াচিত্র লইলেই চেষ্টাটার একটা ফল পাওয়া হয়তো সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে।

সংসারে মানুষ যখন প্রথম আসে বা স্থান গ্রহণ করে, তখন তাহার শিশুরূপ বা অবস্থা। সেই অবস্থায় তাহার একমাত্র কর্ম হইল গ্রহণ, যথা খাদ্যাদি। কেন খাদ্যাদির জন্য তাহার এত আশা বা প্রয়াস? গ্রহণের ফল বা পরের অবস্থাটা দেখিলেই উত্তরটি পাওয়া যাইবে। গ্রহণের পরে দেখা যায় শিশুর বর্ধন। দেহ ও মনের বর্ধনের আশা আছে, তাই শিশুর গ্রহণের এত আশা। বর্ধনেই তো মানুষের আশা বা জীবনযাত্রা শেষ হয় না। কাজেই প্রশ্ন—তারপর কি? কিম্বা, কি আশায় তাহার এই বর্ধন? পরবর্তী আশা বা অবস্থাটার খোঁজ লইলেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

পরের অবস্থাতে আসিয়া দেখি, সেই দেহমনে বর্ধিত ও পরিণত মানুষটিই আবার তাহারই মত মানুষ আনে বা জন্ম দেয়। সংসারে সন্ততি আনা অর্থাৎ বর্ধনের পরে প্রজননই তাহার পরবর্তী আশা বা অবস্থা। কিন্তু এখানেই তো মানুষের আশা বা অবস্থার শেষ নহে, ইহার পরেও তাহার আর একটি রূপ দেখা যায়, তাহা হইল তাহার পালকরূপ, যাহাদিগকে সংসারে আনিয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করা। কাজেই, দেখা যায় যে, প্রজননের পর পাওয়া যায় পরিপালন। চলতি কথায় ইহাই সংসার পরিপালন।

সংসারক্ষেত্রে আবির্ভাবের পর প্রথম গ্রহণ, পরে বর্ধন, তারপরে প্রজনন, অর্থাৎ সংসার সৃষ্টি এবং তারপরে সেই আপন সৃষ্ট, সৃষ্টি রক্ষা অর্থাৎ পরিপালন। এই তো মানুষের সমস্ত সংসার তথা জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণ চিত্র। ইতিমধ্যে তাহার সৃষ্ট সংসার মানে সন্ততি ও গ্রহণ বর্ধন-প্রজনন ইত্যাদি অবস্থায় উপনীত হইয়া পড়ে। তখন?

তখনই পঞ্চাশের শেষ আশ অর্থাৎ পঞ্চম আশা বা অবস্থা দেখা দেয়। তাহা হইল নিজের সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সংসারকে দেওয়া বা শোনানো। অর্থাৎ জীবনকে যখন জীবন দিয়া জানা হইয়া গিয়াছে, তখনই আরম্ভ হয় জীবন-কীর্তন। কীর্তন মানে সংসার বা জীবনের সৎ ও শুভ দিকটি বা কাহিনীটুকু শোনানো।

সংসারে ও জীবনে গ্রহণ, বর্ধন, প্রজনন, পরিপালন এবং কীর্তন এই পঞ্চাশ (পঞ্চ+আশ) যখন পার বা শেষ হয়, তখন তো সংসারে মানুষ একেবারে বেকার বা উদ্বৃত্ত মানুষ। গাছ ততক্ষণই ফলকে ধরিয়া রাখে, যতক্ষণ না ফল পাকে এবং বোঁটা শুষ্ক হয়। তারপর গাছ তাহার এত সাধনার সিদ্ধি যে ফলটি, তাহাকেও বর্জন করে। মানুষের জীবনেও 'পঞ্চাশ' পার হইলে তেমনি বর্জনের পালা আসে। তখন সংসারই বর্জন করুক বা সংসারকেই বর্জন করুক, অর্থ সেই একই। অর্থাৎ, তখন সংসারের বৃন্তের সঙ্গে মানুষের যোগটি ছিন্ন হইয়াছে কাজেই পঞ্চাশের পর তখন বনং ব্রজেৎ মানে বানপ্রস্থ।

• • • •

বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তাই একেবারে বেকার হইয়া পড়িয়াছেন, করণীয় বলিয়া কোন ব্রতই এখন খুঁজিয়া পান না, এক বাঁচিয়া থাকা ছাড়া। কিন্তু আমি দেখিতেছি একেবারে উল্টা ব্যাপার, দেশ স্বাধীন হইবার পর এক কঠিনতর ব্রতই বানপ্রস্থ লইতে ডাক দিতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনেক সৈনিক-সঙ্গী ছিল। কিন্তু বানপ্রস্থের সাধনায় নিঃসঙ্গ একক নিজে। কোন সঙ্গী এই ব্রতে নাই, এই ব্রতের ইহাই নিয়ম।

দ্বিতীয় আর একটা ব্যাপারও দেখিতেছি যে, পূর্বে ছিল দেশের স্বাধীনতা, এখন সেখানে মধ্যে দাঁড়াইয়াছে

অর্থাৎ মুক্তি। স্বাধীনতা বিদেশী শাসন হইতে এই স্বাধীনতা পৃথিবীর কোটি করিয়া থাকে, কিন্তু মুক্তি হইল নিজের সবরকম বন্ধন, আসক্তি ইত্যাদি হইতে মুক্তি। কিন্তু জীবনে জীবিত দেহে মৃত্যুকে অতিক্রম করাই হইল মুক্তি এবং এই মুক্তি বা আত্মার স্বাধীনতা কোটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষও লাভ করে কিনা সন্দেহ। যাঁহারা সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এদেশে বলা হয় জীবন্মুক্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেশ স্বাধীন হইবার পর বেকার নয়, বানপ্রস্থ। অর্থাৎ কঠিনই শুধু নহে এক দুঃসাধ্য আদিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই মত গ্রহণের সাহস শক্তি সকলের থাকে তাই তাহাদের জীবনে যে অবস্থাটি শুধু আসে, বানপ্রস্থের জীবনটি কখনো দেখেনা।

যাহার দেখা, তিনি মহা-ভাগ্যবান। বানপ্রস্থের একমাত্র তাঁহার জীবনেই আসে মহা-প্রস্থান, সাধারণে, জীবনে যাহা পরম মৃত্যু, তাঁহার জীবনে মহামুক্তি। মহামুক্তিদায়ক আর যাহাই হউক, বেকার নহেন। বন্ধুর সঙ্গে, আমার এইখানেই তফাৎ। তিনি বেকারকে এখনও বানপ্রস্থে পরিণত করেন নাই করিতে পারেন নাই, তাই দেশ স্বাধীন হইবার পর এমন ছন্ন বা আশ্রয়হীন অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্ষণ-স্বপ্ন

মন্মথ রায়

[একাঙ্কিকা]

পাত্র-পাত্রী

ঐ কথা ; মেয়ী ট্রেযোর্ণ কলেজের এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী

নন্দিতার তরুণী মা

নন্দলালের বন্ধু মালয় প্রবাসী ব্যবসায়ী-আনন্দ মোহন সাহাস্তের এক-মাত্র পুত্র।

—প্রথম দৃশ্য—

[ধানবাদ। নন্দলাল সেনের গৃহে উপবেশন কক্ষ। নন্দলাল সেন, নন্দা দেবী ও নন্দিতা দেবী—তিনজনেই মোটর-ভ্রমণের উপযোগী পোষাক পরিহিত। একটি গোল-টেবিল ঘিরিয়া তিনজনে বসিয়া চা পান করিতেছেন। আহা সেবা সরকার একটি থার্মোফ্লাস্ক আনিয়া নন্দিতা দেবীর সম্মুখে ধরিল।]

সেবা ॥ মিস্‌নিনি! থার্মোফ্লাস্কে চা নিতে বলেছো। সঙ্গে রাখবে, না গাড়ীর কেরিয়ারে দেবো?

নন্দিতা ॥ তোমার বুদ্ধি হ'বে কবে সেবা? কেরিয়ার থেকে যখন ওটা বের হবে, তখন কি ওটা আর থার্মোফ্লাস্ক থাকবে। আর চা-টা চেয়েছি পথের জন্যে—ধানবাদ থেকে আসান-সোলে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নয়।

[সেবা নীরবে থার্মোফ্লাস্কটি টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল]

নন্দলাল ॥ তুমি ওকে বড়ো বেশী বকো নন্দিতা।

নন্দিতা ॥ শুনলে মা? বাবার কথা শুনলে মনে হয়, সেবাই ওর মেয়ে—আমি নই।

তা' বলবো—সেবার চাল-চলনটা তোমার বাবার প্রশ্রয়ে এবাড়ীর মেয়ের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমার মতো নয়।

নন্দিতা ॥ চেহারাটাও আমার মতো নয়। আমি তখনই বলেছিলাম, এতো 'প্রেটী' আয়া আমার দরকার নেই। তা' বাবার দয়াটাই তখন বড়ো হলো,—আমার মতামতটা ভেসে গেল।

নন্দলাল ॥ খাজাঞ্চীবাবুর শালী—পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তার ঘাড়ে চাপলো। ছাপোষা লোক

—নিজেরই সংসার চলে না। ম্যাট্রিক পাশ —দেখতে সুশ্রী—তোমার আয়া হলেই মানায় —এই বলে আমায় যখন ধরলো, তখন তোমার মনটাই বাড়লো—ওইটেই আমি ভেবেছিলাম মা। কিন্তু এখন যখন দেখছি, তুমি খুসী নও, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়াই ভালো। খুকলি মা নন্দিতা, সেবার বরাত খুললো। ঠিক দেখিস্—ছিল আয়া, হবে অফিসের ক্লার্ক বা আর কিছু—তার মানে পেতো আশী—পাবে দেড়শো।

[দেখা গেল, কুণ্ঠিত চিত্তে সেবা দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে]

সেবা ॥ আসবো ?

নন্দিতা ॥ কেন ?

সেবা ॥ দিদিমণি, তুমি বোধহয় 'এপ্রো'টা নিতে ভুলে গেছো।

নন্দিতা ॥ (তাড়াতাড়ি ভ্যানিটী ব্যাগটি খুলিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া) তাইতো! বাঁচালে। 'থ্যাঙ্কস্'।

[সেবার প্রস্থান]

নন্দলাল ॥ (হাতঘড়ি দেখিয়া) না, আর দেরী করা চলে না। এখনি রওনা না হলে আসানসোল পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। পিকনিকের সান্ধ্য-আসরটাই আমরা 'মিস্' করবো।

নন্দা ॥ কেবলি ভয় হচ্ছে, আমরাও চলে যাবো, আর যদি কলকাতা থেকে নন্দন এসে পড়ে ?

[নন্দলাল পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিলেন ও চোখে চশমা দিয়া, উহা পাঠ করিতে লাগিলেন]

নন্দলাল ॥ [পাঠ]

"শ্রীচরণ কমলেষু,

প্রণাম শতকোটী নিবেদনমিদং জ্যাঠা-মহাশয়, আমি আগামীকল্য প্রাতের ট্রেণে রওনা হইয়া বেলা বারোটায় ধানবাদ পৌঁছিব। অপরিচিত জায়গা বলিয়া আমি সকালের ট্রেণে গিয়া দুপুরে পৌঁছানোই স্থির করিয়াছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক—শ্রীনন্দন দাশগুপ্ত।"

বারোটার ট্রেণ কখন চলে গেছে। এখন তিনটে বাজে। আজতো এলোই না। কালও যদি আসে—আসবে সেই দুপুরে। আসান-সোল ডাকবাংলোয় আজ রাতটা কাটিয়ে কাল দুপুরের অনেক আগেই আমরা এখানে ফিরতে পারবো। ঐ চিঠি পড়ে একথা কি মনে করা যায় যে, আজ আর তার আসবার সম্ভাবনা আছে ? তোর কী মনে হয় মা ?

নন্দিতা ॥ ঐ চিঠি পড়ে বাবা ?

নন্দলাল ॥ হ্যাঁ মা, তোর কী মনে হয় ?

নন্দিতা ॥ লোকটি একটি ভূত—সিঙ্গাপুরী ভূত। নইলে এযুগে কেউ কখনো লেখে না—(বাবার হাত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে লাগিল) —"প্রণাম শতকোটী নিবেদনমিদং"। বাব্বাঃ! দাঁত ভেঙে যাবে।

নন্দলাল ॥ আমাদের আনন্দমোহন আজ তিরিশ বছর সিঙ্গাপুরে ব্যবসা করছে। বছরের পর বছর রোজগার তার এতোই বেড়ে যাচ্ছে যে, দেশে ফেরবার ফুরসত নেই। বর্মাবাসী হলেও সে বাংলার সংস্কৃতি ছাড়েনি। ছেলে বড় হতে না হতেই আমাকে চিঠি লিখে পাঠালো সংস্কৃত আর বাঙলা বই আর ব্যাকরণ পাঠিয়ে দাও—ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবো, বাংলা শেখাবো। এ চিঠি তারই নমুনা। হাসির কথা নয় মা। আমাদের ছোট বেলাতেও এই রকম চিঠি লেখাই রেওয়াজ ছিল। কোটী প্রণাম না জানালে আমার বাবাও চটে যেতেন। কোটিপতি হয়েও বন্ধু আনন্দমোহন তার ছেলেকেও কোটী কোটী প্রণামের মন্ত্রটা শেখাতে ভোলেনি।

সেবার প্রবেশ

কর্তাবাবা, আপনার এই শালটা—
এই গরমে আবার শাল কেন?

নন্দলাল। আগো, ও ঠিকই এনেছে। আসানসোলে এই দুটোমাস দিনে যেমন গরম, শেষ রাতটায় আবার তেমনি ঠাণ্ডা—হ্যাঁ, এখানকার চেয়েও। ওটা আমার সুটকেসে দিয়ে দাও।

[সেবা চলিয়া যাইতেছিল, নন্দা ডাকিল]

আর শোনো।

[সেবা দাঁড়াইল]

আসানসোল থেকে সকালে রওনা হয়ে গোটা দশেকের মধ্যেই আমরা বাড়ী ফিরবো। বারোটার ট্রেণে কলকাতা থেকে নন্দন আসতে পারে। পথের কথা বলা যায় না—তাও আবার মোটর গাড়ীতে আসবো। এমনও হয়তো হতে পারে,—নন্দন এসে গেল, আমরা তখনও পথে। তাই বলে যেন তার আদর-আপ্যায়ন কি অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়। মনে রেখো,—সে আমাদের ছবু জামাই।

সেবা। জানি কর্তামা।

নন্দিতা। (চটিয়া) জানো! তুমি কি করে জানলে?

সেবা। আজ দুদিন ধরে আপনাদের মুখে তাঁর কথাইতো কেবল শুনছি।

তুমি ভুলে যাও—তুমি আয়া। আমাদের সব কথা তোমার শোনবার মতোও নয়,—শোনা উচিতও নয়। না বাবা, এসব আমি সইতে পারিনা। আমি দেখেছি, আমাদের আশে-পাশে ওর যখন দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়, তবু কাজের অছিলা করে থাকে।

নন্দা। কিন্তু দূরে দূরে থাকলে সেও আবার এক বিপদ। ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি—তার ওপর সব কিছু বুঝিয়ে বলা—তাও আবার বলবো এক, বুঝবে এক, করবে আর এক। তার চেয়ে এ বরং ভালো।...তবে হ্যাঁ, শুনতে দোষ নেই,—শুনেছো বলা দোষ।

নন্দলাল। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) তা' যা বলেছো! এসব শিখো সেবা,—শিখো। হ্যাঁ, আর দেখ, এই যে তোমার কর্তামা বলছিলেন,—কাল আমরা রয়েছি পথে, এদিকে এসে গেছে নন্দন বাবাজী। তা' যদি এসেই যান, কী করে চিনবে তুমি?

সেবা। কেন? তিনি কি তাঁর নাম বলবেন না?

নন্দিতা। হ্যাঁ। নন্দন দাশগুপ্ত—নামটা মনে রেখো।

সেবা। নামটা আমার অবশ্যই মনে থাকবে দিদিমণি। কিন্তু ও নামের আর কেউ তো আসতে পারেন।

[সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল]

নন্দিতা। (রাগিয়া গিয়া) যতো সব আজগুবি কথা! নন্দন নাম যেন ছড়াছড়ি যাচ্ছে।

সেবা। না, তা' যাচ্ছেনা বটে দিদিমণি, কিন্তু চোর-জোচ্চোরের ছড়াছড়ি। ঐ নামটি নিয়ে—

নন্দিতা। (চটিয়া গিয়া) বাবা! লুকিয়ে লুকিয়ে সব ডিটেক্‌টিভ্‌ নভেল পড়ে। তাই এই সব উদ্ভট কথা।

নন্দলাল। কিন্তু মা, কাগজে তো আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, এ সবও হচ্ছে। কিন্তু সেবা, বুদ্ধির বহরটা যদিও তোমার বেশী চোর-জোচ্চোরের সাহসের বহর অতোটা হবে না—আমার বাড়ীতে।

নন্দা। না বাপু, বলা যায় না। আমরা কেউ রইলাম না—

নন্দলাল। আমরা থাকলেই বা কী করতাম? ও ছেলেকে আমরা কেউ দেখেছি? কী করে বলবো দেখতে কেমন? চিনবো কী করে? বার্মা থেকে এর আগে কখনও কি এদেশে এসেছে?

নন্দিতা। ন্যাড়দিন ধরে এতো করে তোমাদের বলছি

বার্মাতে একটা ফটোর জন্যে লেখো।

নন্দলাল ॥ না, না, না, তাতে আনন্দ ভাবতো, তার ছেলের চেহারা দেখে তবে বুঝি তোর সঙ্গে তার বিয়েতে আমি রাজী হবো। কোটিপতি লোক—হয়তো চটেই যেতো। তাই আমি ফটো চাইনি। কিন্তু খবর নিয়েতো জেনেছি, চেহারার কার্তিকটি। বুঝলে সেবা, ও তুমি দেখলেই চিনবে। কিন্তু আর এতোটুকু দেরী নয়। ওঠো—ওঠো সব—

[সকলে গট্‌গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছু পরে মোটর স্টার্ট দিয়া চলিয়া যাইবার শব্দ শোনা গেল। ক্ষণপরে সেবা ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই কলিং বেল ঘন ঘন বাজাইতে লাগিল। এদিক ওদিক হইতে বাবুর্চি, খানসামা, বয়, দ্বারবান প্রভৃতি ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

সেবা ॥ মন দিয়ে সব শোনো,—আমার ওপর বাড়ীর ভার ছেড়ে দিয়ে ওঁরা সব আসানসোলে কী এক নেমন্তন্ন রাখতে গেলেন। ফিরবেন কাল দুপুরে। কিন্তু ওঁরা বাড়ী নেই বলেই যে কাজে তোমরা গাফিলতী করবে, তা চলবেনা।

বাবুর্চি ॥ বাঃ! তা কেন করবো?

খানসামা ॥ ওঁরা নেই,—তুমি আছো সেবাদি। হুকুম করবে, তাই করবো।

সেবা ॥ ঠিক আছে। রহিম! তোমার শালীর অসুখ—দেখতে যাবে বলে এক রাত্তিরের ছুটি চেয়েছিলে। ছুটি মঞ্জুর হলো। তুমি যেতে পারো। কিন্তু ফিরে আসতে হবে কাল সকাল আটটায়। কাল আমাদের হবু জামাইবাবু আসছেন। ভাল ভাল সব রান্না করতে হবে। তোমার শালীর কাছ থেকে দু' একটা নতুন রান্না শিখে এসো বরং। তোমার একঘেয়ে রান্না আর ভাল লাগে না।

বাবুর্চি ॥ জরুর

[বাবুর্চির প্রস্থান]

সেবা ॥ রাজাদুর!

দ্বারবান ॥ বলিয়ে দিদি।

সেবা ॥ তোমাকে একটা ভারী জরুরী কাজ দিচ্ছি। বাজারে রামসীতার মেলা বসেছে। মেলাটা ভাল জমেছে কিনা দেখে এসো। হবু জামাই হয়তো দেখতে যেতে চাইবেন।

রাজাদুর ॥ জরুর, আভি জাতাহুঁ। (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) মেলামেঁ রামলীলা ছোটী হ্যায়। ক্যায়সা ছোটী হ্যায় ইসকে রিপোর্ট মেমসাহেবকে লিয়ে মুঝে কাল সুবহ্‌ ওয়াপস্‌ আনা পড়েগা। (গম্ভীর ভাবে) তাই ফিরবে।

[আনন্দচিত্তে রাজাদুরের প্রস্থান

সেবা ॥ আর ভোলা, তোমাকেও একটা সাংঘাতিক কাজের ভার দিচ্ছি। হবু জামাই হয়তো এসেই মিসিমণিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে চাইবেন। কোন্ সিনেমায় কী ছবি হচ্ছে,—সব জেনে শুনে এসো। যেটা ভাল, সেটা বরং তুমি নিজে দেখে এসো। আমি জানি, তুমি যেতে চাইবে না। হয়তো বলবে, তোমার বাপ মরেছে—

খানসামা ॥ না, না, তা' কেন বলবো সেবাদি? মরতে মরতেও হুকুম তামিল আমি করবোই। না, না, সে তুমি কিছু ভেবোনা সেবাদি। আমি এখনই যাচ্ছি এই বিকেলের শো-তে। ফিরে এসে রিপোর্ট দিচ্ছি। ঠিক রিপোর্ট দিয়েছি কি না, রাতের শো-তে গিয়ে তুমি সেটা যাচাই করে নিতে পারো সেবাদি।

সেবা ॥ আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

[খানসামার প্রস্থান]

বালক-ভৃত্য। আমি কি দোষ করলাম সেবাদি ? সবাইকে তুমি বাইরে পাঠালে,—একা আমিই বুঝি খাঁচার পাখী হয়ে চুপটি করে বসে থাকবো ?

সে কী কথারে নীলমণি ! ছুটি আজ আমাদের সবার। আমি যে আমি—আমারও। ……গলা ছেড়ে গা' দেখি আমার সঙ্গে।

[সেবা গলা ছাড়িয়া গান ধরিল]

(গান)

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি।
আজ আমাদের ছুটারে ভাই,আজ আমাদের ছুটী ॥"

বালক-ভৃত্য। সেবা-দি, তুমি এমন চেঁচিয়ে গান গাইছো ! সাহেবরা জানলে তোমার আস্ত রক্ষে নেই।

[কোনও ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সেবা পূর্ববৎ গান গাহিয়াই চলিল। গান গাইতে গাইতে উচ্ছ্বসিত ভাবে লাফাইয়া লাফাইয়া গিয়া জানালার পর্দাগুলি সরাইয়া রুদ্ধ জানালাগুলি একে একে খুলিয়া দিল। গানটি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে বাড়ীতে একটি মোটর গাড়ী প্রবেশ করার শব্দ শোনা গেল। মোটর-হর্ণ বাজিয়া উঠিল। সেবা গান শেষ করিল]

বালক-ভৃত্য। সাহেবরা ফিরে এসেছে সেবা-দি—সাহেবরা ফিরে এসেছে। তুমি কী সর্বনাশ করেছো, এখনি বুঝবে। আমি পালাই—

[বালক-ভৃত্যের পলায়ন। বাহির হইতে একজন আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

আগন্তুক ॥ (বাহির হইতে) ইহাইতো শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন মহাশয়ের গৃহ ?

ভেতরে আসুন।

[আগন্তুক কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া সেবার সহিত নমস্কার বিনিময় করিল দেখা গেল, আগন্তুক বয়সে তরুণ, সুদর্শন ও অভিজাত পোষাক পরিহিত। রুমাল দিয়া মুখের ধুলা মুছিল]

হ্যাঁ, এইটেই শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনের গৃহ। কেন বলুন তো ?

আগন্তুক ॥ দেখুন, কলিকাতা হইতে দ্বিপ্রহরের ট্রেণে আজ আমার এখানে পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ট্রেণ ধরিতে না পারায় আমি আমার কাকার মোটর গাড়ী লইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।

সেবা ॥ ও ! আপনিই তবে—

আগন্তুক ॥ (সস্মিতহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই বর্ষাবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দাশগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র নন্দন শ্রীনন্দন দাশগুপ্ত।

সেবা ॥ (উচ্ছ্বসিতভাবে) ও—আপনি ! আসুন—বসুন। আপনি আজ বারোটার ট্রেণে এলেন না দেখে সবাই ভাবলেন,—আপনি কাল বারোটার ট্রেণে আসবেন। আপনি চিঠিতেও ঐ রকমই লিখেছেন। ওঁরা তাই একটু আগে চলে গেলেন আসানসোলে একটা নেমন্তন্ন রাখতে। কাল সকালে ফিরবেন।

নন্দন ॥ ওঁরা—অর্থাৎ !……শ্রীযুক্ত সেন ?

সেবা ॥ শুধু শ্রীযুক্ত সেন নন, শ্রীযুক্তা সেনও বটে।

নন্দন ॥ আর তাঁদের কন্যা ? শ্রীমতী নন্দিতা দেবী ? তিনিও কি তবে গিয়াছেন ?

সেবা ॥ তার আগে আপনি বলুন,—নন্দিতা দেবী যদি গিয়েই থাকেন, তবে আপনি কী করবেন ?

নন্দন ॥ আমিও এখনি কলিকাতা রওনা হইব।—আর কী করিব ?

(হাসিয়া) আর যদি তিনি না গিয়ে থাকেন ?

নন্দন ॥ আনন্দে থাকিয়া যাইব। তিনি আছেন? কোথায় তিনি? (সেবাকে হাসিতে দেখিয়া) ও—আপনি! আমাকে ক্ষমা করুন, নন্দিতা দেবী।

সেবা ॥ বসুন।

নন্দন ॥ কী আশ্চর্য দেখুন। আপনিই নন্দিতা দেবী—আমার সম্মুখে যখন দণ্ডায়মানা, তখন কিনা আমি ভাবিতেছিলাম—তিনি কোথায়—যাঁহাকে দেখিবার জন্য সুদূর সিঙ্গাপুর হইতে আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি। অদৃষ্টের কী পরিহাস! (হাসিয়া) পরিহাসই বটে! আসুন—ভেতরে আসুন।

(নন্দনকে লইয়া সেবা গৃহাভ্যন্তরে গেল।)

—দ্বিতীয়-দৃশ্য—

[পূর্বোক্ত দৃশ্যে বর্ণিত নন্দলাল সেনের উপবেশন-কক্ষ। পরদিন সকাল। সেবা কতকগুলি ফুল ফুলদানিতে সযত্নে সাজাইতেছে। বালক-ভৃত্য নীলমণি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে]

নীলমণি ॥ এ কী সেবাদি! যে সব ফুল তোলবার হুকুম নেই, সে সব ফুলও তুমি আজ তুলছো? দিদিমণি ফিরে এসে দেখলে আগুন হয়ে যাবে না?

সেবা ॥ না। এ ফুলগুলো আজকের জন্যেই দিদিমণি মনে মনে জীইয়ে রেখেছিলেন।

নীলমণি ॥ সে রেখেছিলেন নিজে তুলবেন বলে। তুমি তুললে যে?

সেবা ॥ তুললাম তো—যা হয়, হবে। নীলমণি, দরজা-জানোলার পর্দাগুলো তুই টেনে দে।

নীলমণি ॥ কেন সেবাদি? আমার কাছে কিন্তু এই-ই ভাল লাগে,—ঘরে কেমন রোদ এসেছে।

সেবা ॥ আমাদের কাছে ভালো লাগলেইতো চলবে না। যেখানকার যা নিয়ম।

(নীলমণি পর্দাগুলি টানিয়া দিতে লাগিল।)

নীলমণি ॥ আচ্ছা সেবাদি, বর-জামাই এখনি এতো ঘুনোচ্ছে,—যখন সত্যি সত্যি জামাই হবে, তখন তারে ছয়তো হবে কুম্ভকর্ণ। চায়ের জল চাপিয়ে বসে থাকতে হবে সারাদিন। সে তোমার বড়ো কম বিপদ হবে না।

সেবা ॥ তা যা বলেছিস্! দেখে এলুম, এখনো ওঠেননি।

নীলমণি ॥ লোকে বলবে কী! আমরা তো জানি, রাতে চুরি করে বসে দিনে ঘুনোয় চোরেরা।

চুপ! এ সব বলতে নেই, নীলমণি। তুই ছুটে গিয়ে দেখে আয়তো, বাবুর্চি, খানসামারা এসে কাজে লেগে গেছে কিনা। কর্তাদেরও ফেরবার সময় হয়ে এলো।

(নীলমণির প্রস্থান। ফুলদানীগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সেবা গাহিতে লাগিল—)

সেবা ॥ আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।"

(তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নন্দনের প্রবেশ)

নন্দিতা। দেখ দেখি, আমার নিদ্রা-ভঙ্গের কী বিলম্ব হইল!

সেবা ॥ (হাসিয়া) নিদ্রা-ভঙ্গ নয়, বল ঘুম ভাঙতে। বিলম্ব নয়,—বল দেরী। আমরা বলি,—দেখ্-দেখি, ঘুম ভাঙতে কতো দেরী হলো! এটা বললে, তোমারও দাঁত ভাঙবে না,—বুঝতেও কারোর কষ্ট হবে না।

নন্দন ॥ হাঁা, তোমাকে আমার শিক্ষক হইতে হইবে। তবেই না আমি ইহা পারিব, নন্দিতা।

শিক্ষক নয়,—বল মাষ্টার।

(সেবা কলিং বেল টিপিলে খানসামা তোলার প্রবেশ।)

(তোলার প্রস্থান।)

মাষ্টার হইবে পুংলিঙ্গ,—তুমি কী হইবে নন্দিতা ?

ও—হ্যাঁ। আমি মাষ্টারণী।

ঠিক। আমি স্বামী,—তুমি স্ত্রী। আমি পতি —তুমি পত্নী। আমি তোমার প্রিয়তম,—তুমি আমার প্রিয়তমা। আসিবার পূর্বে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া আমি শিক্ষা করিয়া,—মানে, শিখিয়া আসিয়াছি, নন্দিতা। তোমার নিকটও আমি কিছু কম শিক্ষা করিলামে না গত রাত্রিতে। তুমি শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিতা হইবে নন্দিতা, ইতঃপূর্বে আমি কখনও সম্পূর্ণ রাত্রি জাগ্রত থাকি নাই।

এসব কথা বলতে নেই,—কাউকে বলোনা যেন।

না না, আর কাহাকেও বলিব না,—আর কাহাকেও বলিব না। বিগত রজনীর মধুর স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

সেবা ॥ আমারও।

নন্দন ॥ বিগত রজনীর শেষ ভাগে তুমি যেন আমাকে কী বলিতে গিয়া থামিয়া গেলে,—ক্রন্দন করিতে লাগিলে। তখন হইতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। তোমার পিতামাতা আসিবার পূর্বেই আমি উহা শ্রবণ করিতে,—মানে, শুনিতে চাই। বল,—বল, প্রিয়া।

[আবেগে সেবার হাত দুইখানি ধরিল।]

সেবা না, না, এখন হাত ধরতে নেই। এখনি সব আসবে কিনা।

(হাত ছাড়িয়া দিয়া) অবে তুমি বল।

(খানসামা তোলা ট্রেতে করিয়া নন্দনের জন্য চা দিয়া গেল। সেবা উহা পরিবেশন করিতে লাগিল)

নন্দন ॥ চা পান করিব আমি একাকী ? তুমি ?

সেবা ॥ হ্যাঁ, তুমি একাই চা খাবে। আমি খাবো না।

নন্দন ॥ কেন ?

সেবা ॥ আমার চা বলা হয়নি। তোমাকে আমি তা এখন বলবো ! আর তা' যখন বলবো, তোমার সঙ্গে আমার চা খাওয়া আর চলবে না।

নন্দন ॥ ইহা উত্তম। রমণীগণের চা-পান আমার পিতৃদেব অনুমোদন করেন না,—আমিও না। তুমি কী বলিবে, বল প্রিয়া।

সেবা ॥ রাতের অন্ধকারে যা' বলা সহজ ছিল, দিনের আলোতে তা' বলা সহজ নয়। আমার যা' বলার, তা, এই চিঠিতে আমি লিখেছি। চা খেতে খেতে পড়।

[সেবা নন্দনকে একখানি চিঠি দিল। নন্দন উক্ত চিঠি পড়িতে শুরু করিলে সেবা তাহার অলক্ষ্যে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।]

নন্দন। (চিঠি পড়িতে পড়িতে) একী ! তুমি নন্দিতা নও ? তোমার নাম সেবা ? তুমি আয়া ? না, না, না, ইহা হইতে পারে না। নন্দিতা—প্রিয়া—

[সেবাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে অন্দরের দিকে ছুটিল এবং ক্ষণপরেই দেখা গেল, সেবা এ ঘরে ছুটিয়া আসিল ও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিল নন্দন। নন্দন সেবাকে ধরিয়া ফেলিল]

নন্দন ॥ পরিহাসই যদি নয়, তবে ছলনা কেন ?

(সেবা নীরব রহিল)

নন্দন ॥ নীরবে থাকিলে চলিবে না। তোমাকে বলিতেই হইবে।

সেবা ॥ আমার হাত ছাড়—কেউ হয় তো এসে পড়বে। তুমি বোসো। আমি বলছি।

(নন্দন বসিল। সেবা তাহার পার্শ্বে আর একখানি সোফায় বসিল।)

নন্দন ॥ বল।

সেবা ॥ এ ষড়যন্ত্র বিধাতার—আমার নয়। আমার অদৃষ্টে যে সৌভাগ্য তিনি লেখেন নি, সেই সৌভাগ্যের সব কিছু সুযোগ তিনি ঘটিয়ে দিলেন আমার জীবনে কাল রাত্রে। তুমি এলে—আমাকে তুমি দেখলে—ভুল করে আমাকেই ভাবলে তোমার সেই মানসী। হই না কেন আমি আয়া—হই না কেন দাসী, তবু আমি মানুষ—রক্ত-মাংসের মানুষ। আমার লোভ হলো। তোমার ভুল ভাঙতে আমার মায়া হলো। ভাবলাম এই একটা তো রাত—সারা জীবনে এই একটা রাতেই আমার কাছে এসেছে আমার রাজপুত্র—আমি 'না' বলতে পারলাম না।

নন্দন ॥ কিন্তু ইহার পরিণাম কী সেবা?..... না, না, তুমি নীরব থাকিলে চলিবে না। ইহার পরিণাম?

সেবা ॥ পরিণাম একটা শূন্য—তার বেশী কিছু নয় নন্দন।

নন্দন ॥ প্রহেলিকা ছাড়। বল।

সেবা ॥ এ বাড়ী—এ ঘর—এ সংসার থেকে আমি এখনি চলে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট পরে আমার ছায়াও তোমার চোখে পড়বে না নন্দন। মনে করো, এ এক স্বপ্ন-স্বপ্ন। আমি চলে গেলে আর তা' তোমার মনেও পড়বে না নন্দন।

[যাইবার জন্য উঠিল]

নন্দন ॥ দাঁড়াও নারী। প্রথম প্রেমের ক্ষতচিহ্ন সারা জীবনেও যে আমার দূর হইবে না নারী। পলায়ন করিয়া তুমি বাঁচিতে পার কিন্তু আমি? বেশ, আমি যাব না। আমি থাকবো। আমার দুঃসাহসের এই কাহিনী আমার এই ছলনা তোমার হাতে অস্ত্র হয়ে শোভা পাক্। তার আঘাত সইবার শক্তি—কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, আমি পেয়েছি নন্দন—আমি পেয়েছি।

[বাহিরে একখানি মোটর আসিয়া থামিবার শব্দ শোনা গেল]

সেবা ॥ ঐ যে ওঁরা এলেন। আমি চললাম আমার দৈনন্দিন কাজে। আপনাকে আর এক পেয়ালা চা দেবো?

নন্দন ॥ অবশ্য দিবে।

সেবা ॥ আনছি।

(সেবার প্রস্থান। ক্ষণপরেই নন্দলাল, নন্দা ও নন্দিতার প্রবেশ।)

নন্দলাল ॥ বাইরে গাড়ী দেখেই আমি বুঝেছি, তুমি নিশ্চয়ই নন্দন?

নন্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[নন্দলালকে প্রণাম করিয়া উঠিল।]

নন্দলাল ॥ ইনি আমার স্ত্রী।

(নন্দন নন্দারেবীকে প্রণাম করিল।)

নন্দলাল ॥ আমার মেয়ে নন্দিতা।

(নন্দন ও নন্দিতা নমস্কার বিনিময় করিল।)

নন্দলাল ॥ বোসো।

(সকলে বসিল।)

নন্দলাল ॥ সব কুশল তো?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল ॥ কলকাতা থেকে মোটরে চলে এসেছো?

নন্দন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দলাল ॥ ভালো—ভালো। 'এডভেঞ্চার' আমিও ভালবাসতাম বয়সকালে। তা' কখন এলে।

নন্দন ॥ আজ্ঞে, গতকল্য অপরাহ্নে।

(সকলে চমকিয়া উঠিল)

নন্দা ॥ কাল!

নন্দন ; আজ্ঞে—কাল।

নন্দলাল তো ! বটেই তো ! চা খাও সেবা।

[কাপে চা ঢালিয়া সেবা কাপটি নন্দনকে দিতে গেল। নন্দন উহা দুই হাতে আগ্রহে ধরিতে গেল। আবেগাতিশয্যে কাপটি তাহার হাত হইতে মেঝেতে সশব্দে পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া গেল]

(চীৎকার করিয়া সেবার উদ্দেশে) 'ইডিয়ট্'। আচ্ছেল মেয়েছো !

না, না, উহার কোনও দোষ হয় নাই। ভুল আমারই। দোষ যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহার জন্যও দায়ী আমি।

[সেবা কাপের ভগ্নাংশগুলি কুড়াইতে গেল। নন্দন তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। পিতা, মাতা, ও কন্যা পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল]

[সেবা চা'রিজনের উপযোগী চা একটি ট্রেতে করিয়া আসিয়া হাজির হইল]

কে শ্রদ্ধা করি।

[পিতা, মাতা ও কন্যা – পরস্পরের চাওয়াচাওয়ি। হঠাৎ পিতা বলিয়া উঠিলেন,—]

যবনিকা

জোনাকি

সুশীল রায়

একটা মস্ত তামাশা বলে মনে হচ্ছে তাদের। মনে হচ্ছে এটা একটা মস্ত প্রহসন। এ যেন ঠিক তাদের দু-জনের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা নয়, এ যেন একটা আজগুবি নাটকের একটা খণ্ড চিত্র মাত্র।

কোথায় সেই কলকাতার চকমেলানো জমকালো কোঠাবাড়ি, আর কোথায় এই কাঁকড়াপুকুরির নারিকেল-কুঞ্জে ঘেরা এই চৌচালা ঘর?

পাশে হাত দিয়ে বসে আছে মেটে দাওয়ার উপর দুই বোন। নিজেদের নামের সঙ্গেও বুঝি এদের দুজনের তেমন-কোনো সম্পর্ক নেই। কে-যে মাধবী, আর কে-যে মধুমালা—তা যেন এখন তাদের দুজনকেই চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিতে হবে।

একটা অদ্ভুত শব্দ হল তাদের ঘরের পিছনের বাঁশঝাড়ে।

—কি ও? চমকে উঠল মাধবী।

মধুমালা তার বোনের মুখের দিকে তাকাল; তারও যে একটু ভয় করে নি, এমন নয়। কিন্তু একসঙ্গে দু-জনেই যদি ভয় পেয়ে যায় তা হলে অভয় দেবে কে? মধুমালা তাই বলল, হয় তো কোনো পাখি।

মাধবীর সন্দেহ গেল না। কিছুক্ষণ সে কাঠ হয়ে বসে বলল, পাখির গলা চিনি নে? কলকাতার চিড়িয়াখানায় পাখি দেখি নি? এ নিশ্চয় অন্য-কিছু হবে। আমার গা ছমছম্ করছে, দিদি।

মধুমালা আবার অভয় দিয়ে বলল, ভয় পেয়ে লাভটা কী? তার-চে বরং বেপরোয়া হয়ে বসে থাকাই ভালো। মনে করাই যাক-না, এ নিশ্চয় কোনো আজব পাখি।

একটা আজব রাজ্যেই যখন এসে পড়েছে তারা, তখন সব-কিছুকেই আজব ব'লে মেনে নিতে ক্ষতি কি।

মাধবী বলল, সবই যদি আজব ব'লে মেনে নিতে হয়; তা হলে বাছবিচারের কোনো ধার-ধারবো না কিন্তু। বাবাকেও ছেড়ে কথা বলব না, তিনিও যে একটা আজব জীব—এ কথা কিন্তু তাঁকে চেঁচিয়ে জানিয়ে দেব।

মধুমালা বলল, দিদিমণিরা কি মুখস্ত করাতেন মনে নেই? পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি—

বাধা দিল মাধবী, বলল, সে পিতা কোন্ পিতা? যে পিতা স্নেহ দিয়ে মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে ছেলে মেয়েদের মানুষ করেন। যে পিতা কেবল টাকার থলি ছড়িয়ে নিজের কাজ শেষ করেন, সে পিতার কথা নিশ্চয় নয়।

মধুমালা চুপ করে গেল। মাধবী এখন বড় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, এখন কথা বললে ওর অসংলগ্ন কথারই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

নিজেকে সংযত রেখেছে ও শাসনে রেখেছে মধুমালা। পিনাকীভূষণের এই খেয়ালী কাণ্ডটার জন্যে তার মনের মধ্যেও তাপ আছে। সেই তাপ এক-এক সময় তার সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত ক'রে তোলে, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে মধুমালা। সকলেই যদি একসঙ্গে পাগলামি আরম্ভ করে দেয় তা হলে এই মজাটা দেখবেই-বা কে, আর উপভোগই-বা করবে কে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মধুমালা বলল, বাবা যদি তাঁর কাজে ক্রটি ক'রে থাকেন তাহলে তাঁর দেখা-দেখি আমরাও আমাদের কথায় আচারে বা আচরণে ক্রটি দেখাব কেন?

আবার হেসে উঠল মাধবী. বলল, হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠলে তুমি কোথা থেকে দিদি? হঠাৎ এমন ভারিক্কি আর এমন বুদ্ধিমতী?

মধুবালা হেসে ফেলল, বলল, তোর চেয়ে বয়সে তো বড়। তাই একটু দিদি গিরি ফলাবার সাধ হয়েছে। বইতে এতদিন যা-কিছু পড়েছি সবই মনের মধ্যে ভটলা করছিল, আজ সুযোগ যখন পেয়েছি, এমন একটা নির্জন জায়গা যখন পেয়েছি তখন সেই সব কথা একটু-একটু করে ঝাউতে নিচ্ছি মাত্র।

—তা আওড়াও। একটু না হয় দূরে বসে আবৃত্তি কর। আমার কানের কাছে ব'সে ব'সে ওসব কথা যদি বলতে থাক তাহলে এখুনি আমি উঠে চলে যাব।

—কোথায়? একটু চিমটি কেটেই যেন জিজ্ঞাসা করল মধুবালা।

দিদির মুখের দিকে তাকাল মাধবী। সে-মুখে কোনো ভাব দেখতে পেল না—ব্যঙ্গের কিংবা বিদ্রূপের। কিন্তু মাধবীর মনের মধ্যে খটকা লাগল একটা। এখানে এসে পৌঁছনো অবধি সে পালাই পালাই করছে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় তার কোনো ঠিক নেই, কোনো নিশ্চয়তাই নেই তার। সেইজন্যে এই কিছুক্ষণ আগে সে একটু শান্ত হয়ে বসেছে। কিন্তু শান্ত হয়ে বসা আর মন শান্ত রাখা—এক কথা নয়। নিজের অজানিতেই তাই তার মুখ দিয়ে আবার, বেরিয়ে পড়েছে ওই কথা—আমি উঠে চলে যাব।

কতটা অসহায় আর কতটা যে নিরাশ্রয় তারা, এখন একটু একটু করে যেন বুঝতে পারছে মাধবীও।

হীরে-বসানো সোনার খাঁচায় বন্দী করে রাখা হল একজোড়া পাখী; মুক্তোর ঘুঙুর পরানো হল পায়ে; ঠোঁটে রং মাখানো হল; পালকে পুরু করে পালিশ লাগিয়ে খুব বাহার দেওয়া হল চেহারায়। এইভাবে তাদের অনেকদিন ধ'রে পোষ মানানো হল; নানারকম বুলি মুখস্থ করার জন্যে রাখা হল অনেক বুলি-বিশারদকে। অবশেষে একদিন কী খেয়াল হল, খুলে দেওয়া হল খাঁচা; খাঁচার পাখিকে বলা হল বনে গিয়ে বাস করতে, গাছে বসে শিশ দিয়ে গান গাইতে। বনে এনে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের। কিন্তু বনের পাখিরা চেয়ে রইল তাদের দিকে অবাক চোখে—এমন আজব পাখি তারা তো কখনো দেখেনি। এদের গলায় যে স্বর বাজে তা যে অদ্ভুত। এ ভাষা তো কোনো পাখির ভাষা নয়। গাছে গাছে উড়ে বেড়াবে তার শক্তিই-বা কই। পালিশের ভারে পাখা কেবল ভারী হয়েই নেই, গায়ের সঙ্গে আটকে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও গাছের ডাল থেকে পিছলে যায় পা, তাতে শক্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই; গাছের ডাল কামড়ে ধরার মত পায়ের নখে কোনো বল নেই। সুতরাং ফিরে যাবে তারা সেই হীরে-বসানো সোনার খাঁচায়? এতদিনের অভ্যাসে সেই স্বর্ণপিঞ্জর তাদের সারা শরীরে সোনার স্বাদ মাখিয়ে রেখেছে; ঝুলে ঝুলে সেই হীরের টুকরো থেকে যেভাবে আলো ঠিকরে বের হত তাতে মনে হত ঐ টুকরোগুলি বুঝি সূর্যেরই এক-একটি সহোদর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই খাঁচায়। প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে। বনের এই ছায়ার মায়া ও সবুজের সংকেত ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে সেই খাঁচার বন্দীশালায়।

কিন্তু—দুই বোনই কাঁকড়াপুঞ্জির এই নারিকেলকুঞ্জ-বেষ্টিত চৌচালা ঘরের বেটে দাওয়ার উপর খুঁটি হেলান দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ফিরে যাবার রাস্তা হয়তো আছে; কিন্তু ফিরে গিয়ে আবার সেই দাঁড়ে বসে মুখস্থ করা বুলি আওড়াবে তার কোনো সুযোগ নেই, সম্ভাবনাও নেই। সেই সোনার খাঁচাটা আর তাদের নেই। অন্য-কোন আজব পাখির ঝাঁক এসে এখন হয়তো বাস করছে সেখানে।

তাদের সেই বিরাট বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিয়ে এসেছেন পিনাকীভূষণ।

এ এক বিচিত্র সন্ন্যাস পিনাকীভূষণের। এর কোনো মানে খুঁজে পায়না মাধবী আর মধুবালা। কিন্তু প্রতিবাদ করে যখন কোনো প্রতিকার নেই তখন নীরবে মেনে

নেওয়া ছাড়া উপায় কি? তারা দু-জন তাই পিনাকী-ভূষণের প্রতীক্ষায় বসে আছে চুপচাপ।

—স্টেশন কি এর মধ্যে আরো অনেকটা দূরে স'রে গেছে, দিদি? বাবা ফিরছেন না এখনো। এক অচেনা রাজ্যের একটা বনের মধ্যে তিনি যে তাঁর দুই মেয়েকে বসিয়ে রেখে গেছেন, সে-খেয়াল আছে তো তাঁর? আবার ভুলে গেলেন আমাদের কথা?

মধুমালা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোর সব আজগুবি চিন্তা। ভুলে যাবেন কেন? আসবেন এক্ষুনি।

মাধবী বলল, আমরাও বড় অদ্ভুত জীব, দিদি। বাবার উপর এত ভরসা ক'রে কেন-যে বসে আছি, তাই ভাবি। তিনি আসুন বা না আসুন, আমাদের তাতে বয়ে আসে কী? আমাদের নির্বাসন দেওয়াই যখন তাঁর ইচ্ছে, তখন সে নির্বাসন আমরা মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলেই কিন্তু পারি।

মধুমালাও তাই মনে করে। কিন্তু নির্বাসন গ্রহণ করার মধ্যে যে মানসিক সাহস দরকার, সে-সাহস তাদের আছে কিনা—এইটেই চিন্তার বিষয়। একটু আগে বাঁশ-ঝাড়ের ওপাশ থেকে একটা অচেনা শব্দ শুনেই তারা ভীত হয়ে উঠেছিল। এখন তো শুধু দিনের আলো আছে। একটু পরেই যখন রাত্রি নামবে ঝাঁকড়াপুঞ্জির এই ঘন অরণ্যে, তখন এখানে বসে গলা ছেড়ে রোদন করলেও কেউ শুনবে না। সেই শব্দহীন রাত্রি ভেদ করে কত রকমের অচেনা শব্দই যে তাদের ভয় দেখাবে তার কি কোনো হিসেব আছে?

দুই বোন বসে রইল চুপচাপ করে। তাদের মনে পড়ে তাদের মায়ের কথা। মাধবীর ভালো মনে থাকার কথা নয়। তখন সে খুবই ছোট। কিন্তু মধুমালার মনে পড়ে একটু-একটু। শহরের কোলাহলে, অত ব্যস্তসমস্ত জীবনের কলরবের মধ্যে মায়ের কথা তেমন মনে পড়েনি। তাদের। কিন্তু আজ বড় বেশি ক'রে মনে পড়ছে।

মধুমালা শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল।

—কি হল, দিদি? মাধবী ওইটুকু শব্দেই ভীত হয়ে উঠল, ওকি, অমন করে নিঃশ্বাস ফেলছ যে!

—কিছু না।

—নিশ্চয় কিছু। কি হল আমাদের খুলে বল দিদি। মধুমালার হাত চেপে ধরল মাধবী।

মধুমালা বলল, বাবার সম্বন্ধে রূঢ় হয়োনা। হতে নেই। তাঁর সঙ্গে কড়া ভাষায় কথা বলো না।

মাধবী বলল, বাবার সঙ্গে কথা বলতে আমার ব'য়ে গেছে। বাবাকেই বলে দিও আমার সঙ্গে যেন কোনো কথা না বলেন।

এসব কথা শুনে মধুমালারই কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকে। তাদের সেই নন্দনকাননের সিঁড়ি আর রেলিং দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড প্রাসাদের অধীশ্বরী ছিল মাত্র তারা দু'জন—দুই বোন। সেখানে রোজ দুবেলা দেখা হয়েছে তাদের। কিন্তু তখন একদিনও সে ধরতে পারেনি মাধবীর মনে এত তাপ আছে, এত তেজ আছে। আজ এখানে এসে তারা নিবিড় হয়ে বসেছে এত কাছাকাছি, এমন কাছাকাছি বসার সুযোগ অবশ্য তারা পায়নি সেই নন্দন-কাননে। তখন তাদের কত কাজ—কত সঙ্গী, কত আনন্দ, কত ব্যস্ততা; কত গান, কত পিয়ানো, কত জলসা; কত বিচিত্র জীবনতরঙ্গ। আজ সব ঢেউ ভেঙে গিয়ে জীবনটা একটা মসৃণ নিথর হ্রদের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। তারা তাই পেয়েছে কাছাকাছি বসার সুযোগ, দুজন দুজনকে চেনার অবকাশ।

এবার মধুমালাও উতলা হ'য়েছে, বলল, বাবা আসছেন না এখনো?

চমকে উঠল মাধবী, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, সর্প-সর্প ক'রে উঠল কি?

—কোথায়?

আঙুল দিয়ে দেখালো মাধবী পুকুরের কিনারের ঝোপের দিকটা।

মধুমালা বলল, সাপ নিশ্চয় না।

—কি ক'রে বুঝলি?

—তাহলে এতক্ষণে দেখা যেত।

মাধবী জবাব দিল না। সাপের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মধুবালাকে দেখা দেওয়ার জন্যে তাকে যেন কিলবিল ক'রে কোপ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

একটু পরে মাধবী বলল, অসম্ভব।

—কি হল!

—এই বনে বাস করতে পারব না।

মধুবালা এবার বিরক্ত হয়েছে, বলল, বাবা এলে বলিস।

এসে গেছেন পিনাকী। গলা পাওয়া যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট উচ্চকিত ক'রে অনর্গল কথা বলতে বলতে তিনি আসছেন। তাঁর উল্লাসের বুঝি আর অন্ত নেই। কিসে যে বাবার এত কথা আসছে কে জানে। সাহেব সেজে মটোরগাড়ী বাবুড়ে শহরের ঝরঝরে তকতকে রাস্তায় যিনি চলাফেরা করে এলেন এতদিন, এই বনবাদাড়ে এসে তাঁর মুষড়ে যাওয়াটাই তো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সবই বরাবর বিপরীত। একই বাড়ীতে বাস ক'রে একদিনের জন্যে মেয়েদের খোঁজ নিলেন না, আবার হঠাৎ সোহাগ উথলে উথলে—মেয়েদের নিয়ে এলেন সঙ্গে ক'রে এক অচেনা নতুন রাজ্যে। সবই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড।

একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। মধুবালা ও মাধবী তৈরী হ'য়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ এই নির্জনে একা-একা ব'সে তাদের মন নীইয়ে গিয়েছিল, গলার স্বরে ও পায়ের শব্দে তারা যেন চাঙ্গা হ'য়ে উঠল।

বাঁধের ওপারে প্রায় ছয়-সাত জনের মাথা দেখা গেল। এত লোক এল কোন্‌খান থেকে? এখানে এসেই পিনাকী বুঝি সবাইকে জোগাড় করলেন।

নারকেল-গাছের বেড়া ভেদ ক'রে সবলে ঢুকে পড়ল। মনে হল যেন দুর্ধর্ষ জাঙাল ভেঙে একটা সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করল একদল দুঃসাহসী সৈনিক।

দূর থেকেই গলা ছেড়ে ব'লে উঠলেন পিনাকী, কেমন জব্দ। কেমন একা-একা বসিয়ে রেখেছি এতক্ষণ!

মাধবী কি-যেন বলতে যাচ্ছিল, মধুবালা বলল, চুপ।

কিতীশ আর হেরম্ব তো সঙ্গে আছেই, তা ছাড়া আরো কয়েকজন।

পিনাকী বললেন, জটিলতার গিঁট খোলা কি অতই সহজ? গ্রামের সরল জীবন যাপনের জন্যে আসা গেল এখানে, কিন্তু লটবহরের অন্ত নেই। ভাগ্যিস পাওয়া গিয়েছিল এদের, তাই রক্ষে। নইলে দশ দফায় বয়ে নিয়ে আসতে হত।

জনা-চারেক সাঁওতাল-ছোকরা একে একে বারান্দার উপর মালপত্র রাখতে আরম্ভ করল।

হেরম্ব আর কিতীশও খালি-হাতে হাওয়া খেতে খেতে আসে নি। কিছু-না কিছু-না ক'রেও তাদের হাতেও টুকিটাকি মালপত্র অনেক।

এরা না হয় জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে এল, কিন্তু ওটি কে? একটু তফাতে একা দাঁড়িয়ে?

পিনাকী বললেন, এটি আমার নতুন বন্ধু। আলোক। ভাগ্যিস একে পেয়েছিলাম, তাই এই বিরাট লগেজ নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল। তা না হলে এখনো বসে থাকতে হত স্টেশনে। কন্‌ট্রাক্টারি ক'রে ক'রে মেজাজই হয়ে গেছে রুক্ষ; ফাঁকা স্টেশনে কুলীকুলী ক'রে চেঁচাচ্ছি, কোনো সাড়া না পেয়ে চারদিক অন্ধকার দেখছি, হঠাৎ সামনে এসে হাজির হল এই আলোক।

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন পিনাকী, বললেন, কি বল হে?—আর এরা আমার মেয়ে—মধুবালা মাধবী।

মধুবালারা হাত তুলে নমস্কার করল। মধুবালা বলল, আলাপ তো করে দিলে, বাবা। কিন্তু ওঁকে বলতে দিই কোথায়?

আলোক বলল, ব্যস্ত হবেন না।

হেরম্ব আর কিতীশ হোল্ডঅল খোলার জন্যে প্রাণপণ শক্তিতে স্ট্র্যাপ ধ'রে টানাটানি করতে লাগল। বেজায় টাইট হ'য়ে গেছে।

—কিন্তু ওদের দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন।

সাঁওতাল ছোকরাদের দেখিয়ে বলল।

আলোক বলল, এই, দাঁড়িয়ে দেখছ কি। যাও না, ওটা খুলে দাও না।

কিন্তু দরকার হল না। ইতিমধ্যে হোল্ডঅল খুলে গেছে। মধুমালা একটা মোটা সুজনি টেনে বার ক'রে কাঁচা মেঝের উপরেই সেটা বিছিয়ে দিয়ে বলল, বসো বাবা। একটু বিশ্রাম কর।

এদিকে এরা বিশ্রামে বসল; ওদিকে ওরা গোল মাল-পত্র গোছগাছ করতে।

কিন্তু খাপ খাচ্ছেনা কিছুতে। এরা নিজেরাও যেমন এই পরিবেশের মধ্যে একেবারে বেখাপ, তাদেরগুটে কল বেডিং কুকার বিছানা বালিশ ইত্যাদি সবই এখানে তেমনি খাপছাড়া মনে হচ্ছে।

ঘরের বাইরে দাওয়ায় ব'সে পিনাকীভূষণ প্রাণখোলা হাসি হাসছেন ও গল্প করছেন আলোকের সঙ্গে।

নারকেল-গাছের পাতার ডগা থেকে বিকেলের শেষ আলো এর মধ্যে পিছলে পার হ'য়ে গিয়েছে আকাশের দিকে। এখন সে আকাশে সেই আলো বিন্দুর আকার নিয়ে তারা হয়ে ফুটে উঠছে একে একে, আর কাঁকড়া-পুকুর নারিকেলকুঞ্জে ধীরে ধীরে নেমে আসছে ঘন-অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা।

সেই যবনিকার নেপথ্যে পড়ে গেল একটি নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধিরা—একটি শহুরে পরিবার।

অন্ধকারের মধ্যে হৈ-হৈ আরম্ভ ক'রে দিলেন পিনাকীভূষণ। জীবনে আজ যেন তাঁর অন্ধকারের সঙ্গে প্রথম এক অন্তরঙ্গ পরিচয়।

পিনাকীভূষণ বলছেন, কি হে আলোক? তুমি নামেই আলোক। একটু আলো-টালো বিতরণ করো। তোমাদের দেশের জোনাকিগুলো কেমন? অত নিজীব কেন? একটু দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠতে পারে না?

অন্ধকারের মধ্যে বসে বসে হাসছিল আলোক এমন মজার মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়ে তার বড় ভালো লাগছে।

আলোক বলল, যেতে গিয়ে নিয়ে আসি একটা লণ্ঠন, কি বলেন?

—উঁহুঁ। চুপ করে ব'সো এখানে সুবোধ বালকের মত। যা ব্যবস্থা করার করবে আমার মেয়েরা।

হেরম্ব আর ক্ষিতীশ অনেকটা তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে। কড়া মনিব বলেই তারা জানে পিনাকীভূষণকে। সেই মনিব এমন প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন, এমন অন্তরঙ্গ ভাবে আলাপ করতে পারেন আলোকের মত অমন নগণ্য একটা লোকের সঙ্গে? সারাদিন সুট-হ্যাট-কোটে যিনি পাকা সাহেব, সেই পিনাকী এখন ধুতি-পাঞ্জাবীতে সেজে পাটির উপর বসে অন্ধকারের সঙ্গে আলাপ করছেন?

হেরম্ব আর ক্ষিতীশ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গলা খুসখুস করে উঠলেও গলা সাফ করে নেওয়ার জন্যে একটু কাশতে পর্যন্ত ভরসা করছে না।

আলোক বলল, আমরা গ্রামে আছি অনেকদিন, অন্ধকার জিনিসটা আমাদের সয়ে গেছে। নিয়ে আসি একটা লণ্ঠন, কি বলেন?

পিনাকীভূষণ বললেন, ঐ দেখ।

মধুমালা একটা লণ্ঠন নিয়ে এল ও ঘর থেকে। এটা জ্বালতেই সে ফ্যাসাদে প'ড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুই বোন মিলে মাথা খাটিয়ে অনেক কষ্টে আলোটা জ্বালতে পেরেছে এতক্ষণে।

ক্ষিতীশদের চোখে আলো পড়তেই ওরা সংকোচে একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল। পিনাকীভূষণের মত কড়া মনিবের অমন সুকুমারে-তরুতরে দুটি মেয়ের সামনে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াতে তাদের কেমন-যেন সংকোচ হচ্ছে। আগেও তারা দেখেছে এই মেয়েদের। আপিস-ঘরে বসে দেখত—নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছে দুই বোন। তখন সংকোচ ছিল না, যেন না তখন সম্পর্ক ছিল না কিছুই। কিন্তু এখন যে তারা

একটা চৌচালার বাসিন্দে হতে চলেছে। এখন তাই অজানা কারণেই তাদের মধ্যে কেন-যেন জড়তা এসে গেছে অস্বাভাবিক রকমের। লণ্ঠনের আলোর ক্ষীণ শিখার সম্মুখে দাঁড়াতেও তাই তাদের এই সংকোচ।

আলোক বলল, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করছেন।

পিনাকীর জবাব একেবারে তৈরি, বললেন, কুলীর যদি ধর, কিছু না থাকত তাহলে কী করতে

—কি আর করতাম।, আলোক বলল, গরিবের বাড়িতে দুটি-ডাল-ভাত খাবার কথা বলতাম।

—থাক ইউ। পিনাকী আলোকের পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলেন, তুমি একটা মানুষ না হে, তুমি একটা চুম্বক। তোমার আকর্ষণ-শক্তি অসাধারণ। আমাকে এরি মধ্যে বশ করে ফেলেছ।

অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখে আলাদা আলাদা ভাবে জ্বলছে হেরম্ব আর কিতীশ। আলোকের স্পর্ধাটা সহ্য করতে পারছে না তারা। পিনাকীভূষণের মত মানুষকে ডাল-ভাত খাওয়ার কথা বলতে পারল ও কোন্ ভরসায়? মানুষ চেনেনা আলোক। সকলকেই নিজের মত গেঁয়ো বলে মনে করে হয়তো। পিনাকীভূষণ লোকটা যে কে ও কি, তা জানে না ও। অন্ত হওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধে। কোনো কথা হিসেব ক'রে বলার দায়িত্ব তাদের থাকে না।

—অমন প্যাঁচার মত স্বভাব কোথা থেকে পেলে হে তোমরা। ওহে হেরম্ব আর কিতীশ। পিনাকীভূষণ ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন হঠাৎ।

হেরম্বরা একেবারে যেন জব্দ ক'রে নিবে গেল। ঘুর থেকেই বলল, এখানে বেশ হাওয়া, একটু বিশ্রাম করছি।

—তা বেশ। অনেক পরিশ্রম গেছে। জিনিষপত্র টানা কম ঝঞ্ঝাটের কাজ নয়।

উঁহু। পিনাকীভূষণ যেন আবার একটা ঘা দিলেন তাদের। তারা কি আর মোট বয়েছে। মোট বয়ে নিয়ে এল তো ঐ সাঁওতাল কুলীরা। মধুমালা আর মাধবী কি মনে করছে? হয়তো ভাবছে, হেরম্বরাই বয়ে নিয়ে আসছিল। মাঝপথ থেকে কুলী জোগাড় ক'রে তাদের ঘাড়ে মাল চাপিয়ে দেওয়া হয়।

তারা এখানে এসে ভালো করেছে, কি খারাপ করেছে সেই কথাই ভাবছিল দু জন। না এসেই-বা উপায় ছিল কি। পিনাকীভূষণ কারবার গুটিয়ে দিলেন, তারা হয়ে গেল বেকার।

বেকার-জীবন আর বোকার জীবন তো একই জিনিস। তাই সে জীবন লোভনীয় বোধ হল না তাদের। একটা কোনো বুহতের আশ্রয়ে থাকা ভালো। পিনাকীভূষণের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা তাই তাঁর সঙ্গী হয়ে চলে এল এখানে।

ওদিকের ঘর থেকে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এবং সেইসঙ্গে ব্যস্ততার একটা খসখস শব্দ।

—কি করছিস তোরা ওদিকে?

মধুমালার গলা শোনা গেল—একটু গোছগাছ করে নিচ্ছি, বাবা।

ঘর গোছানোর সময় তো অনেক পাওয়া যাবে, এখন ভদ্রতার খাতিরেও তো একবার এদিকে আসা দরকার। কিন্তু ভরসা ক'রে একথা বলতে পারলেন না পিনাকীভূষণ।

আলোককে বললেন, তোমার নিমন্ত্রণটা কিন্তু জমা রইল। একদিন গিয়ে খেয়ে আসব। শুক্তো, মোচার ঘন্ট, ডাঁটাচচ্চড়ি কতদিন খাইনি তার ঠিক নেই। আমার মেয়েরা হয়তো ওসব জিনিসের নামই শোনেনি কখনো।

আলোক আশ্চর্য হল, কেন, এসব তো পাওয়া যায় কলকাতাতেও।

—যায়, কিন্তু খায় কে? আর দেয়ই বা কে?

—বুঝতে পারলাম না।

পিনাকীভূষণ গলা ছেড়ে বলে উঠলেন, পারবে পারবে, সবই জানবে, সবই বুঝতে পারবে। আছি তো এখানে। ভালো হয়ে বসি, সব কথাই বলব ধীরে ধীরে।

ওঘরে মাধবীরা, এবং বারান্দার কোণে অন্ধকারের আড়ালে হেরম্ব আর ক্ষিতীশ বিরক্ত হতে লাগল পিনাকী ভূষণের উপর। কেন, এত ফ্রাঙ্ক হবার দরকারটা কি। সব কথাই বলতে হবে ঐ ছেলেটাকে তার কি মানে আছে? এত বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার, এত বড় একজন টাকাওয়ালা লোক, তার পেটে কত রকমের কথা জমা হয়ে থাকবে। তা না, কেবল সব কথা বলে ফেলার জন্যে একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততা।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, তোমার কি কি খেতে ইচ্ছে করে জানালে দিদি সব নিজে হাতে রান্না ক'রে খাওয়াবে বলছে।

—গ্র্যাণ্ড। এ তো উত্তম প্রস্তাব। কি বল হে, আলোক। বেশ ঐ কথাই রইল। একদিন একটা ফিষ্ট করা যাবে তা হলে। মধুবালা, এই মধু—

—কি বাবা?

—বোসো এখানে। মাধু, বোসো।

দুজনে বসল। লণ্ঠনের আলো পড়ল দু-জনের মুখে। মাজাঘষা গালে আলো পড়ে মস্ত দেখাচ্ছে না তো। আলোক আড়চোখে একবার দেখে নিল ওদের মুখ।

আড়াল থেকে ওঁৎ পেতে ছিল হেরম্বরা। আলোক চুরি ক'রে একবার তাকাল বটে মেয়ে দুটির মুখের দিকে, কিন্তু সে জানল না, সে ধরা পড়ে গেল প্রাণীর কাছে।

পিনাকীভূষণের কোম্পানির ষ্টেনোগ্রাফার আর করেসপণ্ডেন্স ক্লার্ক ব'লেই তাদের পরিচয় ছিল এক কালে। কিন্তু এখন তারা সে পরিচয় মুছে ফেলে নতুন পরিচয়ে পরিচিত হবার জন্যে ভারি ব্যগ্র।

আকাশের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। আকাশের তারা যে সংখ্যায় এত, তা শহরের আকাশ দেখে জানা শক্ত। সেই তারার দিকে তাকাল হেরম্বরা। এক-একটা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত জ্বলছে এক-একটি তারা। বড় লোভনীয়, বড় রমণীয় ওরা। কিন্তু হাতের নাগালের কত বাইরে। হাজার চেষ্টা করলেও কখনো ধরা যাবে না।

তার চেয়ে ওইগুলিই ভালো। গাছে গাছে ওটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে আর নিবে যাচ্ছে। ওই জোনাকিরাই ভালো। হতে পারে নকল তারা। তা হোক। আসল যদি এতই দুর্লভ, তাহলে আসলে কাজ কি?

আশ্চর্য, অন্ধকারের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে মধুবালা। তার খোঁপায় আটকে গেছে একটা জোনাকি —দপদপ করছে।

হেরম্ব আর ক্ষিতীশ প্রায় একসঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, কুড়িয়ে নেয় ওই জোনাকিটা। কিন্তু ওই খোঁপার স্পর্শে ও বুঝি আর জোনাকি নেই—তারা হয়ে গেছে। ওটা চলে গেছে তাদের নাগালের বাইরে।

ঠিকানা

প্রভাত দেবসরকার

পড়ে—

যথেষ্টস্থল

নিশ্বাস ফেলে ট্রামে চলতে নিজের ভুলটা

মনের ভুল। সে আর এখন

কারণটা অসুস্থতা নয়—

কি, সময়-সংক্ষেপের জন্যে

কিন্তু—

যতটুকু চলেও কিছুটা অভিমান হয় অমরেশের—

তাকে জানানো উচিত ছিল,—ট্রামে নয় বাসে যাতায়াত করবো কাল থেকে ; আমাকে খুঁজো না !

শুধু শুধু একজনকে খোঁজার যেমন মানে হয় না, তেমনি আপন গতিবিধি অকারণে আর একজনকে জানানরও কোন মানে নেই। সম্পর্ক কিছু যখন নেই। সাত বছর এক ট্রামে এক পথে অফিস পৌঁছেচে— ও শেষে আগে নেমে গেছে, অমরেশ আগে উঠে শেষে নেমেছে ! ফেরার পথেও তাই, আগে পরের হিসেব একই, সোজা ! মধ্যমণি ও চিরকালের।

টিকিট-চেকে একটি যাত্রীর সামনে এতক্ষণ অপেক্ষা করা আর পাঁচজন যাত্রীর অসুবিধা করা। একটু বোধ হয় জোরেই কণ্ডাক্টার তাগাদা দিলে, টিকিট ! টিকিট

অমরেশ তেমনি অন্যমনস্ক, শরীরটা তেমনি আকুঞ্চিত। অনেকে নামছে, উঠছে—কিন্তু সে উঠলো না আজও ! কি হ'লো ? শেষে বিরক্ত হ'য়ে পাশ থেকে একজন বললেন, দিয়ে দিন্ না মশাই ! আমরা যে সেলুন দু'দিক থেকে—

স্নেহের স্থিতিস্থাপকতা ফিরে আসে, সম্বিৎও সেই সঙ্গে। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে মাদুলি টিকিটটা সামনে মেলে ধরে অমরেশ। মুখে বলে, সরি !

কণ্ডাক্টার পাশ ফেরে। ঘণ্টার দড়িটা হাত বাড়িয়ে টেনে দেয়। পাশের ভদ্রলোক মুখ-চেনা, বললেন, রোজ দেখছে, চিন্‌তে পারে না ! তবু টিকিট চাইবে— আশ্চর্য !

অপ্রস্তুত ভাবটা গেলেও সান্ত্বনা কিছু নেই সহযাত্রীর সমর্থনে।

ও না ওঠ্‌বার কারণ কি ? ছেড়ে দিলে নাকি চাকরি-বাকরি, না ঘর-সংসার ক'রছে ?

অসম্ভব না হলেও ভাবতে কেমন যেন ভার হয় মনের—সে বিয়ে-থা ক'রে ঘোরটার আড়ালে নিজেকে

লুকিয়ে রেখেছে, সুযোগ বুঝে আড়ালে সরে গেছে—কৌতুকের চেয়ে সঙ্কোচ অভিমান হয় বুঝি। এ অবস্থান্তর যেন নিদারুণ অধঃপতনের সামিল। দুঃখ হয় না, রাগ হয় ওর ওপর।

একেবারে প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে অমরেশের। ছুঁচ গলাবার জায়গা ছিল না, নিয়মমত তবু ট্রামটা সেদিন এই ষ্টপে দাঁড়িয়েছিল—যাত্রীরা তেড়িয়া, কেন বাঁধছো, কেন বাঁধছো! চক্ষের পলকে ফাঁক গলে গেল—নিষ্কম্প দীপ শিখার মত সে ধীর-স্থির পদক্ষেপে সংরক্ষিত আসনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। 'লেডিজ্ প্লীজ্!'

আর আশ্চর্য মনে আছে অমরেশের, ঘণ্টা নাড়া দড়ির মুখে ইংরেজীতে লেখা অক্ষরগুলো: To avoid accident only conductor, should ring bell! মুখস্থর মত কথাগুলো অনেকদিন মনে মনে আপনা-আপনি নিঃশব্দে উচ্চারিত হ'য়েছিল তারপর। এমন ভাল কথা নয়, এমন আপ্ত বাক্যও নয়, তবু সেদিন অকারণে মনের মধ্যে কি-জানি-এক মোহ সৃষ্টি করেছিল কথাগুলো। দুনিয়ার এত কথার মধ্যে অদ্ভুত অর্থপূর্ণ মনে হ'য়েছিল কথাগুলো সেদিন, তারপর কতদিন!

ট্রামটা পুরোন বলেই বোধ হয় লেখাগুলো অস্পষ্ট। ঐতো দেখা যাচ্ছে চোখের ওপর, পড়াও যাচ্ছে। মধ্যবর্তী 'ওন্‌লি' কথাটার যেন কোন মানে হয় —কাকে বোঝাচ্ছে? বরং চোখে লাগে, মনে বাধে বেসুরো হয়ে। যে পারে যেমন পারে ঘণ্টা বাজাক—দুর্ঘটনা যদি ঘটে তখন নিজেরাই সাবধান হ'য়ে যাবে—ঘণ্টাবাজানর একচেটিয়া অধিকার বিশেষ একজনকে না দিলে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই। ঘটুক না কেন দুর্ঘটনা!

মনে মনে হাসি পায় সেদিনের কথা ভেবে। ঐ কথাতেই অমরেশ কি পেয়েছিল! সময় হলে একদিন বলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আর সুযোগ এলো না। সে আজও উঠলো না। ষ্টপ্ পেরিয়ে ট্রামটা খড়্-খড়্ করে অনেকটা চলে এসেছে—আর একটা ষ্টপ্ এলো বলে!

আজ আপিস কামাই ক'রলে কেমন হয়? নোটিশ পাবার পরও রোজ-রোজ যে আপিস ক'রতে হবে এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে? কেবল শরীর খারাপেই যে ছুটি নিতে হ'বে তারও কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। মন খারাপ হ'তে নেই একদিন—আর হ'লে ছুটি নেওয়া চলবে না কেন সেই অজুহাতে? শরীর মনে তফাৎ কতটুকু!

পরের ষ্টপে পৌঁছবার আগেই অমরেশ তড়াক করে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। আর একটু হ'লেই ভূতলশায়ী হ'তো। পা দুটো তখনো কাঁপছে থর্ থর্ করে। ফুটপাথে উঠে নিজের বোকামিতে নিজেই অমরেশ অবাক হ'য়ে গেল—আর একটু দেরী ক'রলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেত। এত তাড়াই বা সে কিসের অনুভব ক'রলে?

ছুটির মানে পথের মাঝখানে চুপটি করে' ভূতভবিষ্যতের মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার যেমন কোন মানে নেই, তেমনি আবার উল্টোমুখো ট্রাম ধরে' এত্রি মধ্যে বাড়ি ফেরারও কোন মানে নেই। কি হ'বে দাঁড়িয়ে থেকে উর্দ্ধমুখে, কি হ'বে বাড়ি ফিরে নিম্নমুখে? ন যযৌ, ন তস্থৌ।

দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণ কেটে গেল, কত যুগ যেন। পর্দায় যে ছবি পড়ে তার রাগ বুঝি কিছু থাকে না পর্দায়—ছবির পর ছবি আসে, যায়; তারপর এক সময় নিশ্ছবি, শূন্য হ'য়ে যায় পটভূমি। মনের পটভূমে রাজপথের কোলাহলময় চলচ্চিত্রে কোন চিহ্ন থাকে না। এই লোক-জন, গাড়ি-ঘোড়া, নিত্যপ্রবহমান জীবনস্রোত কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অমরেশের—মন-খারাপ বলে যে-অমরেশ আপিস-মুখো ট্রাম থেকে এইমাত্র নেমে পড়েছে, একান্ত ছুটি ভোগ ক'রবে বলে বাঁপ দিয়েছে অজানা পথে! বিচ্ছিন্নও বুঝি সবার থেকে সে।

একসময় ছুটি-ছুটি এগিয়ে চলল অমরেশ সামনের দিকে। এসে দাঁড়াল সেই ষ্টপে, যেখান থেকে সহযাত্রী হ'তো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, অপেক্ষা করলে—কত ওঠা-নামার কত তাড়া-হুড়া ক'রতে লাগল মনে মনে। দেখে মনে হয়, শেষ ট্রামের জন্যে শেষ ক্ষণ অপেক্ষা করবে বুঝি। ও না ওঠা পর্যন্ত হয়তো নেবে এখানে।

কিন্তু সময়ের স্রোতে মানুষের স্রোত ক্রমে কমে আসে। এবার যারা উঠছে, নামছে, সময়ের বুড়ি ছোঁয়ার তাদের কোন দায় নেই! একটা ক্লান্ত অবকাশের ছায়া নেমেছে রাজপথে এখন।

অমরেশ শুধু জানে, এইখান থেকে সে উঠতো রোজ। গাড়ীটা এইখানে থামবার আগেই চোখ বুজে এক থেকে বাট গোণার মধ্যে সে বলে দিতে পারতো তার নিশ্চিত আরোহণ।

যতক্ষণ ও না-উঠতো ততক্ষণ মনে হ'তো ট্রামটা খালি-খালি। অত ভিড়ে কত শূন্য বোধ হ'তো ও না-ওঠা পর্যন্ত। এই পর্যন্ত আসতো অমরেশ মনে মনে বাজী ধরতে ধরতে—ও উঠবেই, না উঠলেও—

নিজের কাছে বাজী হারবার কোনদিন আবশ্যক হয়নি। সাত বছরে একদিনও তাকে নিরাশ করেনি। ঠিক উঠেছে এই ষ্টপ থেকে।

আজ মনে হচ্ছে অমরেশের, তখন সাহস করে যদি জেনে নিত ওর বাসাটা—

এই মোড়ে সে এসে দাঁড়াত কোন রাস্তায়, কত নম্বর বাড়ি থেকে—কতখানি হাঁটতে হোত ওকে রোজ ট্রাম লাইন পর্যন্ত আসতে?

ওর নামটাও পর্যন্ত জানে না অমরেশ। সাত বছরে একদিনও যা মনে হয়নি, আজ তাই মনে হ'চ্ছে অমরেশের, চোখের পরিচয়টা যদি তখন ব্যক্ত ক'রে নিত মুখে—

জানতে পারা যেত উঠ-উঠি ক'দিন ওর অনুপস্থিতির কারণ অনায়াসে। হয়তো এখান থেকে খুব কাছে ক' পা ডাইনে কি বামে, কি, ও মোড়ের ঐ বড় রাস্তার শেষ সীমায় পদ্মপুকুরের এক ধারে ওদের বাসা। যদি সত্যিকারের ওর শরীর খারাপ না হ'তো, বাড়িতে বসে ছুটি এমনি ভোগ করছে—তাহ'লে চুপি-চুপি নীচু সুরে জিজ্ঞেস করতো মনখারাপের কারণ কি? আজ আপিস গেলেনা কি ঐ জন্যে?

এ ছুট পেরিয়ে ও ছুটে এসে অমরেশ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, এপাড়ার মেয়ে বলে যদি পাওয়া যায় ওকে কোন দোকান পসরার মাঝখানে। আপিস না-যাওয়াটা ওর শখ হ'তে পারে, দীর্ঘ বিশ্রামের কোন অজুহাত। টুকি-টাকি কেনার অছিলা।

না, পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়, একটি অজানা মেয়ের সন্ধানে এমনি ঘুরে বেড়ান! আপিসে যে এল না, সে শুধু শুধু রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে কেন? কি দায় পড়েছে!

হঠাৎ দেরী হ'লো যে বড়? কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস ক'রলে সহকর্মী কোন।

এমনি। মাথা গুঁজে নিজের সিটে এসে বসল অমরেশ অপ্রস্তুতের এক শেষ, সত্যি কোন কারণ নেই দেখাবার মত—মনকে আর কত আঁখি ঠারবে!

তবু বিমল ছাড়ে না, কাছে এসে চেয়ার টেনে নিয়ে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি—ডিপো টু ডিপো?

কি জানি বিরক্ত হয় অমরেশ। সহকর্মীর কৌতুকের মধ্যে কেমন যেন বক্রোক্তি আছে। এদের জন্য একদিন দেরীতে আসবারও উপায় নেই!

কেন কৈফিয়ৎ দেবে? দেরী কি মানুষের হয় না, কাজ কি মানুষের থাকে না এক-আধ দিন! তোমাদের অত জমা-খরচে দরকার কি! তার ইচ্ছে সে দেরী ক'রে আপিসে আসবে!

আরো কাছে এসে বিমল চোখ ঘুরিয়ে খোসা-ছাড়ান সিদ্ধ আলুর মত মুখ করে' বললে, কি! ট্রামের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল পথে!

সে খবরে তোমার দরকার কি! নিজের কাজ কর। অমরেশ চটে ওঠে অকারণে। তারপর ফাইল খুলে এমন ভাবে বসে থাকে যেন ফাইল ছাড়া আপিসে দেখবার শোনবার-মেশবার কোন বস্তুই নেই। পাশের লোকের বাজে কথা শোনবার তার অবসর নেই।

চুপ করে' খানিকটা বসে বিমল উঠে যায়। অমরেশের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়। অন্তরঙ্গ না হ'লেও একসঙ্গে এতদিন কাজ করবার পরও কি সামান্য রহস্য করবার অধিকার জন্মায় নি—কি মনে করে তাকে অমরেশ? ছোটলোক কোথাকার!

আর সহকর্মীরা লক্ষ্য করছিল, অমরেশের অকারণ উষ্মার কারণটা তাদেরও বোধগম্য নয়। একটা নিঃশব্দ ছি-ছি'কার অমরেশের চারদিকে সঞ্চারিত হ'লো। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে লোকটার, না হ'লে কেউ সহকর্মীদের সঙ্গে অমন করে কথা বলে! সুখ-দুঃখের কথা সহকর্মীরাই জিজ্ঞেস করে!

সারাদিন অমরেশ মুখ বুজে কাটালে। আপিসের সবাই যেন তাকে একঘরে করে রেখেছে, কি সেই একলা-একলা থাকতে চেয়েছে! নিজের কাছে নিজের লজ্জার যেন আর শেষ নেই। ছি, ছি!

ফেরবার পথে আবার ওর কথা মনে পড়ল। আপিস না এলে যদিও ফেরবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তবু একবার ভিড়ের মাঝখানে অমরেশ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। না, দ্রষ্টব্য কিছু নেই।

ও বুঝি এখান থেকে ফেরে না! আর পথ পরিবর্তন করে থাকলে এ ষ্টপেরই বা দরকার কি! কে জানে ও আজকাল কি ভাবে কোথা দিয়ে যাতায়াত ক'রছে। চাকরিটা আছে তো?

হঠাৎ বুকটা কেমন দুর-দুর করে ওঠে। মোচড়ও দেয় বুঝি। সেদিন কাগজে দিয়েছিল অনেক লোকের একসঙ্গে চাকরি চলে যাবে। দশ-পনের হাজার। ও কি তাদের দলে?

কিচ্ছু জানা নেই, কোথায় চাকরি, কি চাকরি—কেবল জানা আছে ও এইখানে নেমে বড় রাস্তাটা পেরিয়ে পুব মুখো কোথায় যেত যেন টুক-টুক ক'রে। ও অদৃশ্য হবার অনেক আগেই ট্রামটা দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে চলে আসতো। অমরেশ বরাবর লক্ষ্য করেছে, এই ষ্টপে ট্রামটা হয়েই ছেড়ে দিতো—চক্ষের পলক যেন।

আজ বোধ হয় ব্যতিক্রম হলো, এখানে ট্রামটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। জানালার বাইরে অমরেশ চেয়ে দেখলে—ওঠবার যাত্রী বিশেষ নেই,—দু' একজন, তাও শক্ত সমর্থ—দেরী করবার কোনই কারণ নেই। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে দেখল কনডাক্টারও অনেক আগেই দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়েছে। তবু ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে, কিসের অপেক্ষা করছে কে জানে কি হ'লো? দেরী কেন ছেড়ে যেতে?

প্রশ্নটা অনেক মুখে ফেরবার আগেই ট্রামটা একবার ঝাঁকানি দিলে। অমরেশ মাথার ওপর কালো রঙটা ধরে' সামলে নিয়ে দেখলে, একটি বর্ষীয়সী মেমসাহেল পার্শী মহিলা অনেক কষ্টে ট্রাম থেকে নেমে গেলেন। যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল এমনি ভাবে যাত্রীরা কেউ-কেউ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সরে-সরে দাঁড়ালেন। ট্রামও চলতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ কি খেয়াল হলো অমরেশের। মরিয়া হয়ে ঠেলে-ঠুলে এগিয়ে এসে দুর্ঘটনা এড়াবার দড়িটায় টান দিলে। কিন্তু ট্রামটা বাঁধবার আগেই যাদুঘরের বাঁকটার মুখে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

নার্ভাস কনডাক্টার সহযাত্রীরা দেখে বলে উঠলো, পাগল নাকি, কতক্ষণ ট্রামটা বেঁধেছিল খেয়াল হয়নি! মরবার জন্যে নামলো—ঐ করেই মরে সব।

আঘাটায় এমনি করে দড়ি-ছেঁড়া হয়ে নেমে পড়ার জন্যে মনে মনে অমরেশের হাসি পেল। আজ মনটাকে সে কিছুতে নিজের বশে আনতে পারছে না। আর যেন সহ্য ক'রতে পারছে না—

উল্টোমুখে হাঁটতে হাঁটতে অমরেশের মনে হলো

(যা আর কোনদিন হয়নি। কি আশ্চর্য এই শহরে একই সময়ে তারা পরস্পরের সাক্ষাৎ পেয়েছে—দুজনের হাতে ঘড়ির আশ্চর্য মিল ছিল! কেবল খুসীই হয়েছে কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনি এমন মিল রোজই সংঘটিত হতো কি করে! ঘড়ির কাঁটা কি আপনি ঘুরতো আসতে যেতে?

কিন্তু আজকের সচেতনতা যদি কাল থাকতো, যেন একদিন যদি সাহস করে জিজ্ঞেস করা যেত, কি আশ্চর্য দেখুন, we never missed the bus. কাঁটায় কাঁটায় এক।

ভিড়ের মাঝে কথাগুলো কেমন করে যেন হারিয়ে ছিল। বলার চেয়ে না-বলায় যেন সেদিন আনন্দ পাওয়া যেত বেশি। ও উঠলে উদ্ভাসিত মুখে অমরেশ চেয়ে দেখতো। ও নেমে গেলে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো। সাত ঘণ্টা পরে আবার ওঠা, আবার নামা—আবার চাওয়া, আবার না-চাওয়া, আনন্দ-বেদনায় অদ্ভুত অনুভব।

ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো, এত করে অমরেশ যখন বোঝাবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। বলে বোঝাবার মত নিশ্চয়ই নির্বোধ ছিলনা ও।

ঠিক জায়গায় এসে ঠিক পথটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন্ পথে ও চাকরি করতে যেত কে জানে—এই বরাবর কিন্তু এইখানেই যে, তার নিশ্চয়তা কি? পথের ওপর উৎসুক দৃষ্টি পেতে অমরেশ রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে। কত লোক-জন, নারীপুরুষ, কত আনা-গোনা—উজান স্রোতের কি উচ্ছ্বাস!

না, আরো খানিকটা অমরেশ এগিয়ে চললো। যদি সাক্ষাৎ মেলে, বলবে—

নিজে থেকে কিছুই বলবে না অমরেশ ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'লে। বরং এমন ভাব করবে, যেন এই প্রথম দেখছে ওকে—সে-দর্শন শুধু বিস্ময়ের, আনন্দের কিছু নেই। তবে ও যদি কিছু বলে—

তখন অভিভূত হ'য়ে কোন উত্তরই করতে পারবে না অমরেশ। মিথ্যে বলতে গিয়ে ধরা পড়বে। তারপর আজকের সন্ধ্যার কোন একটা পান্থশালায় তাদের ঘরে সত্যিকারের পরিচয়, নাম ধাম, গোত্র জেনে নেবে উভয় উভয়ের। একটি মুখর সন্ধ্যায় সাত বছরের বোবা দিনগুলির কথা কয়ে উঠবে বাঁধ-ভাঙা উচ্ছলতায়!

গাড়ি-ঘোড়া কমে গিয়ে রাজপথের শান্তি ফিরে এল, ফিরে যারা যাবার তারা ফিরে গেল, আজকের সন্ধ্যা বোবাই কেবল নয়, কেমন হতচেতন যেন। চাকরি ক'রে অনেক মেয়েই বাড়ি ফিরলো! ও কিন্তু ফিরলো না—ফিরলেও এপথ দিয়ে গেল না। আর কোথায় কোন্‌খানে ওর প্রাত্যহিকতা সুরু হ'য়েছে!

ফিরে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অমরেশের মনে হ'লো, মিথ্যে ওকে খুঁজতে এসেছিল ছুতে পাওয়ার মত। হুড্ ডিপার্টমেণ্ট তো উঠে গেছে, ও তো সেখানেই কাজ করতো—না হ'লে এইখানে নামতো কেন, এত জায়গা থাকতে! ওকে দেখলেও মনে হ'তো, সিভিল সাপ্লাই-এ বুঝি কাজ করে মেয়েটি।

যদি চাকরি যায়, যেন যাওয়াই উচিত ছিল—এতদিন না-যাওয়ার কোন মানে ছিল না। আশ্চর্য মনের ভাব গতিক্! এতক্ষণ পরে তবু অমরেশ মনের স্বস্তি ফিরে পায়। খুসী হয়েছে ওর চাকরি নেই বলে। চাকরি করতো বলে ভারি দেমাক ছিল মেয়েটির, আশ-পাশের কাউকে দেখেও দেখতো না—গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না মানুষ বলে। একদিন কি আলাপ করতে নেই অমরেশের সঙ্গে—এমন কি চাকরি যে তার এত!

এত খুসী বুঝি আর কিছুতে হ'তো না অমরেশ—কল্পনায় ওর চাকরি যাওয়ার অবস্থায় যত খুসী হ'য়েছে আজ সে। মনে মনে এই যেন সে চাইছিল এতদিন। ওর চাকরি যাক, চোখের ওপর ওর অমন গরবিনীর মত চলা-ফেরা অসহ্য!

তা ছাড়া মেয়েদের চাকরির পক্ষপাতী ছিল না অমরেশ মোটেই। বেশ হয়েছে, চাকরি গেছে। ও চাকরি ওদের যাওয়াই উচিত—

অতঃপর একটা সিগারেট ধরালে অমরেশ আরাম করে। পরপর ক'টা ট্রামের হাতছানি উপেক্ষা করলে। তাড়া নেই বাড়ি ফেরবার, তার চেয়ে বরং কোথাও, নাম-না-জানা জায়গায় গেলে হ'তো। সুশীল সুবোধের মত বাড়ি নাই বা ফিরলো আজ। তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে', বসে নেই নিশ্চিত আজ। কাউকে কোন কথাও দেওয়া নেই যে, বাড়ি এসে অপেক্ষা করবে!'

কিন্তু যাবে কোথায়? নাম-না-জানা জায়গাটা কি! যাবার জায়গা দীপমালা সহরের অনেক আছে। পকেটে পয়সা থাকলে আবার ভাবনা!

নিজের নাম শুনে অমরেশ চমকে ফিরে তাকালে। দূর থেকে কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকছে। কাছে আসতে অমরেশ চিনলে, সন্তোষবাবু—এক পাড়ায় বাস করেন। যদিও মুখ-চেনা পরিচয়, তবুও উনি ভদ্রতা করেন পথে-ঘাটে দেখা হ'লেই।

কি মশাই, এখানে দাঁড়িয়ে যে বড়! বাড়ি ফেরেননি? সন্তোষবাবু অতিমাত্রায় আন্তরিক হবার চেষ্টা করেন। কাছে আসেন।

এই ফিরবো এবার! অন্যমনস্কের মত অমরেশ জবাব দিলে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে।

আপনার আপিস বুঝি এই দিকে? সন্তোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না। এস্‌প্লানেড্। সামনাসামনি হ'য়ে অমরেশ বললে, কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করচি—এদিকেও একটা বড় আপিস আছে কিনা! ফুড ডিপার্টমেন্ট! একটা কৌতুক যেন প্রকাশ পায় সন্তোষবাবুর কথায়। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট অর্থাৎ আর ক'দিন, পাট উঠতে তো আর দেরী নেই—ভাবনা হবারই কথা! ওঠা আপিসে কাজ ক'রতে ক'রতে বাড়ি ফিরতে কারো ইচ্ছে করে?

পকেট থেকে সিগারেট বার করে' অমরেশ সহৃদয় পড়শীর সামনে বাড়িয়ে ধরলে, আসুন!

ধন্যবাদ, আমি খাই না! সন্তোষবাবু শিষ্টাচারসম্মত ভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন। সামনের ট্রামটা দেখে ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, উঠবেন নাকি?

অমরেশ কোন আগ্রহ দেখালে না। লোকটা এখন গেলে বাঁচা যায়। কি বকর-বকর আরম্ভ ক'রেছে যা তা।

কিন্তু সন্তোষবাবু ট্রাম ছেড়ে দিলেন। পড়শীকে একলা ফেলে যেতে কেমন তাঁর মন চাইল না। অমরেশকে দেখে আজ সে কি ভেবেছে কে জানে।

অমরেশ বললে, কই, গেলেন না?

না, তেমন তাড়া নেই ফেরবার! সন্তোষবাবু যেন হাসলেন।

দেখে অমরেশও হাসলে অকারণে! আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে! ছিনে জোঁক!

তার চেয়ে আসুন, একটা রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসা যাক। এখানে দাঁড়িয়ে ধুলো খেয়ে লাভ কি?—আসুন না, গল্প করা যাবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমরেশ বললে, চলুন। ছাড়বেন না যখন—

সন্তোষবাবু সে ধার দিয়েও
অভ্যর্থনা করলেন।

চায়ে চুমুক দিয়েই সন্তোষবাবু সহানুভূতির সুরে বললেন, কি কাণ্ড বলুন দিকি, এক সঙ্গে অতগুলো লোকের চাকরি যাবে! কন্ট্রোল তো উঠলো, এখন এদের কি ব্যবস্থা—সত্যি চাল আটা খাবে কে?

ভাববার কথা, তবু অমরেশ ভাবনায় যেন ওঠে না। চুপ ক'রে চায়ের কাপটা ঠোঁটের আগায় ধরে থাকে। বলে নিজের ভাবনা কে ভাবে তার নেই ঠিক, এখন বিশ-পঁচিশ হাজারের ভাবনা ভাব—তাও এমন উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধ্যায়, এমন একটা নামকরা চায়ের দোকানে

বসে' অত্যন্ত বেরসিক লোকটা। সঙ্গে না এলেই হ'তো, মনটাকে আরো তিতো করে' দিলে এই ভর সন্ধ্যেয়!

হঠাৎ সন্তোষবাবু বললেন, আর কিছু খাবেন? কি মশাই, কথা বলেন না কেন?

না। আপনি বলুন আমি শুনি—ভদ্রতা করে অমরেশ বললে।

একটু উৎসাহ পান সন্তোষবাবু। বললেন, বলবো কি, দেখে-শুনে যা হ'য়ে যাচ্ছি, কোন দিকে সুবিধে নেই আর! চোখের ওপর দেখতেই তো পাচ্ছেন ব্যাপার!

অবাক হ'য়ে অমরেশ সন্তোষবাবুর মুখের দিকে চায়। চা খাবার নাম করে' ভদ্রলোক তাকে কি শোনাতে নিয়ে এল?

কিছু জিজ্ঞেস করবার পূর্বেই সন্তোষবাবু বললেন, এক দিক থেকে কিন্তু ভালে হ'য়েছে, এবার মেয়েগুলোর সত্যিকারের একটা ব্যবস্থা হবে! অমন আর ইচ্ছে মত—

সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ প্রতিবাদ করলে, কি বলছেন যা তা! চাকরি গেলে আবার কি ব্যবস্থা হবে?

হয়, মশাই হয়, হওয়াতে জানতে হয়! আপনার আমার পিসি-মাসি কত চাকরি করতো! তাঁদের ব্যবস্থা হয়নি? প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করেই সন্তোষবাবু একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন মেয়েদের চাকরির কুফল সম্বন্ধে। আর কিছু না হোক, ওরা সত্যিকারের ভালবাসতে শিখবে তখন, চাকরি-চাকরি করে' ওদের মনটা রুক্ষ হয়ে উঠবে না। সচিব, সখী বোকেন তো!

না, যতটা বেরসিক ভাবা গিয়েছিল ততটা বেরসিক হয়তো সন্তোষবাবু নন। সরস ক'রে আধুনিকাদের সম্বন্ধে ভাববার অনেক কথা বললেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস চাকরি না করলেই মেয়েরা ভাল থাকে, সংসারের কল্যাণ হয়, শ্রীবৃদ্ধি ঘটে!

কথায় কথায় আসল কথায় এসেন সন্তোষবাবু। তিনি একটি চাকরি-ওলা মেয়ের দ্বারা বড় নাকাল হয়েছেন—বড় দাগা পেয়েছেন মনে। এতদিন বিয়ে হ'য়েই যেত, কিন্তু মাঝখান থেকে ঐ চাকরি বাদ সেধেছে। হঠাৎ চাকরি পেয়ে মেয়েটির মাথা ঘুরে গেছে। সন্তোষবাবুকে আর গ্রাহ্যই করে না। নানা অজুহাতে আজ ক'বছর তাঁকে কেবলি ঘোরাচ্ছে মেয়েটি! কি ভাল মেয়ে ছিল, কি হয়ে গেছে! কার সাধ্য এখন তার সামনে এগোয়—পুরোদস্তুর যাকে বলে—

আর কিছু বলবার দরকার হ'লো না। সন্তোষবাবুর বক্তব্য সম্পূর্ণ হবার আগেই অমরেশ উঠে পড়ে বললে, মাপ করবেন, আমাকে এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে!

সন্তোষবাবু কিছু মনে ক'রলেন না। ব্যর্থক হাসি হেসে বললেন, সাম বডি সামহোয়ার ওয়েটিং? বেশ আছেন মশাই, চাকরিটা করচেন ভাল, আপনার আর ভাবনা কি!

চেয়ার ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে সন্তোষবাবুর বাকি কথাগুলো অমরেশের কানে গেল: কি কুক্ষণে যে তখন এই চাকরিতে ঢুকেছিলুম!—এখন কোন্ লজ্জায় তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আই কাণ্ট! আই কাণ্ট!

কে জানে সন্তোষবাবু কাঁদলেন কিনা!

এতক্ষণ ভদ্রলোকের সমস্ত আলাপটা একটা করুণ বিলাপের মত মনে হ'য়ে ওঠে। অমরেশ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে—সন্তোষবাবু টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে বসে আছেন।

* *

দেখা হ'তে ও বললে, বসুন না!

অমরেশ ট্রামের রডটা ধরে খানিক ইতস্ততঃ ক'রলে। অনেকগুলো উৎসুক চোখ তাকে লক্ষ্য করছে।

ওর আলগোছা স্বরটা আগ্রহে সিক্ত মনে হ'লো এবার, বসুন না!

অমরেশ পাশে বসল। খানিকটা চুপচাপ এসে মেয়েটি একবার জিজ্ঞেস করলে নীচু সুরে, আপিস থেকে ফিরছেন?

অমরেশের সব গুলিয়ে যায়।

পারে না।

তারপর ওর নামবার ষ্টপটা ছাড়িয়ে আসতে অমরেশ জড়তা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলে, নামবেন না এখানে?

মেয়েটি উত্তর দিলে না, হাসলে কেবল।

বাসা বদলেছেন বুঝি?

না! তেমনি হাসলে ও।

তা হ'লে এদিকে! কাজ আছে বুঝি? জিজ্ঞেস ক'রে যেন বড় লজ্জায় পড়ে অমরেশ। পাশে বসতে বলেছে বলে মাথায় উঠবে নাকি!

অমরেশের নামবার ষ্টপটাও পেরিয়ে গেল। অমরেশ নামবার চেষ্টা করলে না। বেশ বোঝা যায়, দু'জনের মধ্যে পরে নামবার প্রতিযোগিতা চলছে মনে মনে। ছেড়ে যাবার সঙ্কোচ কেউ কাটাতে পারছে না।

শেষে একসঙ্গে দুজনকেই নামতে হয়—ডিপোর পর সামনে আর এগিয়ে চলে না ট্রামটা।

ট্রাম থেকে নেমে দু'জনেই দু'জনের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে—গন্তব্য হারিয়ে গেছে যেন।

অমরেশ বললে, আসুন, পার্কটায় গিয়ে বসি! তাড়া আছে?

না! ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। ধূপছায়া সন্ধ্যা আকাশে কিসের কৌতুক যেন আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। অসংখ্য তারার ফুল ফুটল শব্দহীন তারার নৈবেদ্য হ'য়ে। সাত বছর পরে ওদের বুঝি মিলন হ'লো।

ওরা এসে পার্কে বসল নির্জন একটা গাছতলা বেছে নিয়ে। অমরেশ পা ছড়িয়ে আরাম ও পা মুড়ে আঁট-সাঁট হ'য়ে। ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে অন্যমনস্কের মত নাড়া-চাড়া ক'রতে ক'রতে ও বললে, দেখতে না পেয়ে খুব অবাক হয়েছিলেন তো?

অমরেশ স্বীকার করলে, তা হ'য়েছিলুম বৈকি! আপনিও হ'তেন—

ও হাসলে শব্দ ক'রে। হাসির কথা যেন বলেছে অমরেশ।

গম্ভীর হ'য়ে অমরেশ জিজ্ঞেস করলে, কি, হ'তেন না?

হাসি থামিয়ে খানিক চুপ ক'রে থেকে ও বললে, হতুম!

খুশী হয়ে অমরেশ বললে, আপনার ঠিকানা জানিনা—কি যে অসুবিধে হ'য়েছিল—পাগলের মত—

ও কোন উত্তর করলে না, ভ্যানিটি ব্যাগটার ওপর হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

খুঁজে খুঁজে হার মেনেছিলুম। ঠিকানা না জানলে কি অসুবিধে হয় আগে কি ভেবেছি কখনো! ওর একটা হাত, বুঝি অমরেশ কখন নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। কে জানে আপনি ধরা দেওয়ার মোহ ওকে পেয়ে বসে কিনা। দু'জনেই অনেকক্ষণ নীরব থাকে।

তারপর আকাশের তারারা স্পষ্ট হয়ে ফুটলে ওরা একসঙ্গে পার্কের বাইরে এসে দাঁড়াল। বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে বুঝি খানিক অপেক্ষা করলে।

মেয়েটি আবিষ্ট মনে ভ্যানিটী ব্যাগ খুলে এক টিলতে কাগজ নিয়ে বুকের ভেতর থেকে ফাউন্টেন বার করে খস খস করে কি লিখে অমরেশের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে, এই নিন আমার ঠিকানা,—

হাত না বাড়িয়ে সুপ্তোত্থিতের মত অমরেশ বললে, ঠিকানা? দিন!

মেয়েটি যেন মিইয়ে গেল, কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করলে অমরেশের আত্মহাতিশয্যে। ছি, ছি, কে চেয়েছিল তার ঠিকানা?

কি বুঝলে অমরেশ, নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলে না। ধরা গলায় বললে, কাল থেকে আমি বেকার!

চীৎকারের মত শোনাল অমরেশের সহজ কথাটা। তারপর সব চুপ হয়ে গেল একেবারে।

মাথা নীচু ক'রে একলা-একলা রাস্তা পার হ'তে হ'তে সুলেখা এই ভেবে আপাত লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পায়, ভাগ্যিস অমরেশকে সে তার নিজের চাকরি যাওয়ার কথাটা বলে ফেলেনি!

উপযাচক হ'য়ে ঠিকানা দেওয়ার মানেটা তা' হলে একেবারে স্পষ্ট হয়ে যেত।

কলিকাতার ছাত্র

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

কিছুদিন যাবৎ কলকাতার ছাত্রদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ যাচ্ছিল। তার মধ্যে প্রধান কথাই হল ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধ নেই, পড়াশুনায় তারা মন দেয় না এবং রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে পাঠাভ্যাসকে অবহেলা ক'রে তারা নানা রকম অশিষ্টাচরণ করে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাংলা দেশের ছাত্ররা অত্যন্ত খারাপ করে, পরীক্ষায় পাশ করার পরে অধীত বিষয়ে তাদের বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করতে গেলে হতাশ হতে হয়। এইসব অভিযোগ বাস্তবিক খুবই সত্য। কিন্তু এর কারণ কি তা অনুসন্ধান না ক'রে কেবল ছাত্রদের নিন্দা করলে, ঠিক বিচার হবে না। বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব সবচেয়ে বেশী এবং বলা চলে বাংলাদেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি। কলকাতার এই সব ছাত্র প্রায় সবই বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র, আদর্শ-নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ছিল। আজ হঠাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের সম্বন্ধে এই সব অভিযোগ শুনলে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই মনে সন্দেহ জাগে। এতদিন আমরা কেবল ছেলেদের উপর দোষারোপ করেই নিশ্চিন্ত রয়েছি। হঠাৎ ছাত্রদের ভিতর এমনি একটা পরিবর্তন কেন এল তার কারণ অনুসন্ধান ক'রে তার প্রতিকারের চেষ্টা আমরা করিনি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার ছাত্রদের সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করিয়ে তার রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। এই রিপোর্ট পাঠ করলে কলকাতার ছাত্রদের অবস্থা সম্বন্ধে যে ছবি আমরা পাই, তা অত্যন্ত করুণ এবং বিষাদময়। এই অবস্থার ভিতর ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা হলে, তাদের কাছ থেকে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ আশা করা কঠিন। এই রিপোর্টের শেষ প্যারাতে বলা হ'য়েছে—প্রধান সমস্যা হল দারিদ্র্য—(The principal problem at the bottom is that of poverty)

ছাত্রদের জীবনকে কলেজের কয়েক ঘণ্টা দিয়ে বিচার করলেই চলবে না। নিজেদের গৃহে ও কলেজের বাইরে তারা যে আবেষ্টনে দিন কাটায়, সেটা একটা প্রধান বিচার্য বিষয়। স্নাতকোত্তর (Post-Graduate) শ্রেণী বাদ দিয়ে স্নাতক-পূর্ব (Under-Graduate) ক্লাশ সমূহে ৪৩ হাজারের উপর ছেলে ছাত্র কলকাতায় আছে। মেয়ে ছাত্রীদের এর ভিতর ধরা হয়নি। তার মধ্যে ২৩,৩০০ ছাত্র অর্থাৎ শতকরা ৫৫জন যে গৃহে বাস করে তাতে জন প্রতি তারা স্থান পায় ২৪ বর্গ ফিট, অর্থাৎ সাধারণ একখানা চৌকি কোন রকমে যে স্থানে ধরতে পারে। আর প্রায় ৮,০০০ ছাত্রের গৃহে মাথা পিছু বাসস্থান হচ্ছে ৫৫ বর্গ ফিট। এমনি স্থানে একখানা চৌকি, একটি সাধারণ ছোট চেয়ার একখানা টেবিল আর হয়ত পুস্তক রাখার একটা থাক কোন রকমে হতে পারে। এইসব ছাত্র নিজেদের কোন আত্মীয় স্বজনের বা কোন পরিচিত ব্যক্তির গৃহে বাস করে। এমন সংকীর্ণ স্থানে বাস ক'রে তারা পড়াশুনা করবে বা সুস্থ মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠবে, এ আশা করা নিতান্ত দুরাশা। মাত্র ৪,৩০০ ছাত্র কলেজের হোষ্টেলে এবং মেসে (Mess) বাস করে। এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। আর বাকি শতকরা ৬০।৬২ জনের যা ব্যবস্থা তাতে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে

যায়। কলেজে ছাত্ররা পড়ে সাধারণতঃ চার ঘণ্টা আর বাকি ২০ ঘণ্টা এমনি আবেষ্টনে বাস করলে তাদের কাছ থেকে মহৎ কিছু আশা করা চলেনা।

পূর্বের উল্লিখিত ৪৩,০০০ ছাত্রের মধ্যে ছাত্র এমনি পরিবারে বাস করে যে পরিবারে মাথা পিছু আয় মাসিক ৩০ টাকারও কম। আরও ১৪,০০০ ছাত্রের পরিবারে মাথাপিছু মাসিক আয় ৩০ হতে ৫০ টাকার মধ্যে। এই টাকার মধ্যে বাড়িভাড়া, ভদ্রলোকের উপযোগী কর্সা জামা কাপড়, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার খরচ, ছেলেপেলেদের স্কুলকলেজের বেতন প্রভৃতি সবই যোগাতে হয়। আজকালকার দিনে যে এই আয়তে পর্যাপ্ত আহার হ'তে পারে না—তা সহজেই অনুমেয়। অনেক সময় স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে এসে সাধারণ জলখাবারও এদের জোটে না। বহুছাত্র তাদের পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারে না। শতকরা ৪৩ জন ছাত্র প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারে এবং শতকরা ৫৭ জনে তা পারে না। এই ৫৭ জনের মধ্যে অনেকে সহপাঠীর নিকট বা কলেজ থেকে পুস্তক চাওয়াতে করে পড়ে কিন্তু শতকরা প্রায় ১২।১৩ জন কোন উপায়েই তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারে না।

ছাত্রদের মধ্যে ১৪৬০০ হল পূর্ববঙ্গবাসী।* এরমধ্যে প্রায় ১২০০০ হল আইনত উদ্বাস্তু। ৬০০০ অবাঙ্গালী ছাত্র এখানে আছে। ৩০,৫০০ ছাত্র নিজেদের পিতা-মাতার সহিত বাস করে এবং এদের অনেকেরই অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আর প্রায় ৩৫০০ নিকট আত্মীয়ের সাথে বাস করে এবং প্রায় ৫০০০ দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে বাস করে। এই ৮০০০এর উপর ছাত্রের আর্থিক অবস্থা এবং বসবাস ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

এবার কলেজের অবস্থার দিকে দেখা যাক। এক একটা কলেজে ৬ হাজার, ৭ হাজার ছাত্র। ক্লাসের স্থান সংকীর্ণ। অধ্যাপকসংখ্যা ছাত্রসংখ্যার তুলনায় অনেক কম. লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা কোন কোন কলেজে ছাত্রের সংখ্যার চেয়েও কম। কলেজে কোন কোচিংএর (coaching) ব্যবস্থা নেই। ছাত্রদের প্রতি অধ্যাপকরা যে বিশেষ নজর দিতে পারেন না, তা সবাই মেনে নেয়। অনেক সময় ছাত্ররা খালি হাজিরা দিয়েই ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যায় এবং কোন কোন সময় অপরের দ্বারা হাজিরা দিয়ে সোনরকমে পার্সেন্টেজ রাখে। অধ্যাপকগণ যে এ অবস্থা জানেন না তা নয়; কিন্তু এর প্রতিকার করার মতো মনের গতি, ক্ষমতা ও ব্যবস্থা নেই।

কলেজে কেউ এদের খোঁজ খবরও নেয় না; কলেজের প্রতি বা অধ্যয়নের বিষয়ের প্রতি এদের মনকে আকর্ষণ করবার কোন ব্যবস্থাই নেই। ছাত্রদের মধ্যে ক্রীড়া বা চিত্তাকর্ষক কোন খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রায় নেই। ন্যাশনাল কাডেট কোর বা এমনি সব সংস্থাতে যোগ দেবার মতন এদের মনের উৎসাহ বা শরীরের সামর্থ্য থাকে না। প্রায় কোন বিষয়েই এদের মনে কোন আকর্ষণ জন্মেনা। গৃহের অবস্থা পূর্বে যা বলেছি তা থেকে এটা অনুমান করা চলে যে সেখানেও তাদের মনের খোরাক বিশেষ কিছু নেই। পড়বার স্থান নেই; ক্ষুধার সময় খাদ্য পায় না; বাড়ীর সকলের মুখেই কেবল অভাবের কথা; ভবিষ্যতের আশা ভরসাও বিশেষ কিছুই নেই। কাজেই তাদের চরিত্রে বা মনে কোন জিনিসের প্রতিই কোন মমতা জন্মে না; গড্ডালিকার চেয়ে ভাসবার প্রবৃত্তিই প্রবল হয়; ক্ষুদ্র স্বার্থ তাদের অন্ধ করে তোলে; প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তাদের ক্ষিপ্ত করে। নিজেদের জীবনের প্রতিও তাদের কোন মমতা থাকে না। যার বর্তমান বিষাদময় ও দুঃখময়, যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সে ত সামাজিক কালাপাহাড় হতে বাধ্য।

এ সমস্যার সমাধান কি? বাংলার ছাত্রদের ভগ্ন মনোভাব ফিরিয়ে না আনতে পারলে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কলকাতার যে ছবি আমরা পেলাম, মোটামুটি মফঃস্বলের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। পূর্বেই বলেছি এ সমস্যার মূলে হল দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্য ছাত্রদের নয়

সমস্ত বাংলা দেশের। তাদের অভিভাবকদের, তাদের শিক্ষকদের, তাদের প্রতিবেশীদের সকলেরই, জীবনে তারা দেখছে দারিদ্র্য। হঠাৎ একদিনে বাঙালীকে ধনী করার কোন ফন্দি কারও জানা নেই, কাজেই ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। কলকাতার বেসরকারী কলেজ সমূহে মাথাপিছু প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার জন্য বছরে ১১৫৲ টাকা খরচ করা হয় এবং কমার্সের (Commerce) ছাত্রদের জন্য মাত্র ৯০৲ টাকা। এই টাকার শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন থেকে উঠানো হয়। বাংলা ভাষায় আছে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা, কলকাতার কলেজের শিক্ষা সেভাবেই চলছে। সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য মাত্র শতকরা ১০ টাকা। তাই বর্তমানে অবস্থার বিশেষ দরকার সরকারী বা বেসরকারী ফীসের নিকট হাতে সাহায্য বাড়ানো।

যদি কলকাতার ছাত্রদের কলকাতাতেই রাখতে হয়, তাহলে কলেজের সংখ্যা অন্ততঃ ডবল করা দরকার। শতকরা মাত্র ১০ জন ছাত্র হোষ্টেলে ও মেসে থাকে; বাকি সবাই থাকে আত্মীয়-স্বজনের গৃহে, কাজেই খুব চেষ্টা করলেও হয়ত শতকরা ৪।৫ জন ছাত্রকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যেতে পারা যেতে পারে। তাই প্রধান প্রয়োজন হল কলকাতার কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে কমিটি হয়েছিল তাঁদের মতে কোন কলেজেই ১৫০০ উপর ছাত্র রাখা উচিত নয়। এই মত অনুসারে কলিকাতার শিক্ষার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা উচিত।

ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে যোগাযোগ বর্তমানে অত্যন্ত কম। বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভবও নয়। ছাত্রদের সঙ্গে যদি শিক্ষার অধিনায়কদের যোগাযোগ না থাকে, তাহলে ছাত্রদের জীবনে শিক্ষার এবং শিক্ষকদের কোন প্রভাব আশা করা যায় না। সেই সংযোগ স্থাপন করার জন্য কলেজের কয় ঘণ্টার বাইরেও ছাত্রদের জীবন যাতে সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। বর্তমানে বাড়িতে বা কলেজে ছাত্রদের মনের বিকাশের উপযোগী পরিস্থিতি নেই। তাই কলেজের বাইরে খেলাধূলা ও আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়ে তাদের পাঠানুরাগ ও চরিত্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা উচিত। যে রিপোর্ট নিয়ে আমরা এ আলোচনা শুরু করেছি, সে রিপোর্টে বলা হয়েছে ছাত্রদের জন্য কলকাতা সহরে কয়েকটি দিবা ছাত্র-আবাস (Day Students' Home) স্থাপন করা উচিত। এইসব গৃহে ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা হবে না—অর্থাৎ সেগুলি হোষ্টেল বা মেস হবে না। কিন্তু দিনের বেলা তারা ওখানে এসে খেলাধূলা করবে, মেলামেশা করবে; কিছু পড়াশুনার ব্যবস্থাও সেখানে থাকবে। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে কিছু পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থাও সেখানে করা হবে। এ প্রস্তাব মূলতঃ অনুমোদন করি; কিন্তু কার্যতঃ এ সম্বন্ধে কতগুলো অসুবিধা আছে। সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। যদি এমনি কোন আবাস স্থাপিত হয় তাহলে প্রথম থেকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাতে এগুলো কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে না যায় এবং এদের পরিচালনা যাতে ছাত্রদের চরিত্রগঠনের অনুকূল হয়।

কলিকাতার বর্তমান অবস্থায় ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যোগাযোগ কিছুই নেই। হয়ত এই অবস্থা সর্বত্রই কিছু পরিমাণে আছে; কিন্তু কলিকাতায় এই যোগাযোগের অভাব অত্যন্ত বেশী। ছাত্রগণ কি করে—তাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে কাটে—তার কোন খবরই শিক্ষকগণ রাখেন না। তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধান্ধাতেই ব্যস্ত। ক্লাসের ভিতরও শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত দৃষ্টি যেন না;—বা অবস্থা এমন পর্যায়ে উঠেছে—যে তাঁদের পক্ষে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। ছাত্ররা তা সহ্য করতে চায় না, এবং শিক্ষকগণ সাহস পান না। অনুপস্থিত থেকেও নাম ডাকার সময় অন্যকে দিয়ে হাজিরা দেওয়ানো হয়,—শিক্ষকগণ জেনেও তার প্রতিকার করতে সাহসী হন না। প্রায় বছরই ক্লাসে পাঠ্য বিষয় সব পড়ানো হয় না, শিক্ষকগণ কোন রকমে দায় শোধ করার মতো পড়িয়ে যান;—অবসর সময় তাঁরা গৃহ শিক্ষকের কাজ করেন। অনেক সময় নিজ বেতনের তিন-চারগুণ অর্থ তাঁরা উপার্জন করেন

দীপিকা—কাব্যগ্রন্থ—সুমিত্রা

প্রাপ্তিস্থান ঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ

৫৪/৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

'দীপিকা' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমতের সারাংশ ঃ—

.....লেখিকার কবিতার হাত বড়ই মধুর : কবিতাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছ এবং সরল..... বেদনাবিধুর হৃদয়ের অকপট প্রকাশ। মানবতার দিকেও মনের বাপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাবান্বিত ধ্বনি ও সুর হইলেও কবির স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। **যুগান্তর**—২৪।১।৫৪

.....নারীহৃদয়ের স্নিগ্ধ সৌকুমার্যে কবিতাগুলি অভিষিক্ত। অসাধারণ না হইলেও প্রীতিকর

প্রবাসী—১৩৬১

.....এ কাব্যের নিরভিমান সারল্য আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। কবিতাগুলি সবই সুলিখিত ভাবের বৈচিত্র্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতাও লক্ষ্যণীয়। কিন্তু কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। বড় কথা হ'ল কবিতাগুলির সহজ স্বাতন্ত্র্যিকত্ব। **দেশ**—১৬ই মাঘ ১৩৬০, (শ্রীপ্রেমেন মিত্র)

.....দীপিকার কবিতাগুলি অত্যন্ত বক্তব্যস্পষ্ট ও ভাষার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।.....সহজ ও সরলভাবে হৃদয়ের বিভিন্নভাবকে ব্যক্ত করেছেন লেখিকা গুচ্ছকাব্যের মধ্যে। **দৈনিক বসুমতী**—২৮।২।৫৪

.....যে আন্তরিক আবেগ গীতিকবিতাকে প্রাণবন্ত করে, এ কবিতাগুলিতে তার অভাব নেই। তার সঙ্গে মিলেছে নারীহৃদয়ের স্নিগ্ধ সৌকুমার্য মধুর নম্রতা।.....তাঁর এ দান আমরা আশা করি, বাণী মন্দিরে সাদরে গৃহীত হবে। **মঞ্জিরা**—ফাল্গুন, ১৩৬০

"বিপ্লবের পদচিহ্ন"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

মূল্য—৪৲ টাকা।

বাংলার বিপ্লবযুগের উজ্জ্বল ইতিহাস, বহু অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যে সমৃদ্ধ। একবার আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে পারবেন না। আজই আপনার গ্রন্থাগারের জন্য একখানা কিনুন—বইখানা আপনার গ্রন্থাগারের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

".....যাহাদের প্রাণদানে ও সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতার প্রথম ভিত্তি রচিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই কাহিনী এই "বিপ্লবের পদচিহ্নে" এবং বাঙ্গালীর বুকে এই পদচিহ্ন যতদিন অম্লান ও স্পষ্ট রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর মৃত্যু নাই—ইহাই হইল গ্রন্থের মর্মবাণী।" ".....পাঠকসমাজকে ভূপেনবাবু যে রসপরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে উপন্যাস এবং নাটকই শুধু নহে, রোমাঞ্চকর কাহিনীরও রসাস্বাদন পাইবেন।" —"দেশ"

প্রাপ্তিস্থান ঃ সরস্বতী লাইব্রেরী

৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

ঃ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

মন্তিরা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] তবুও শিক্ষার আগ্রহ ও আদর্শ

[illegible] যদি এগিয়ে না আসেন,

[illegible] করা কঠিন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর

[illegible] সম্প্রতি দিল্লী গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী,

[illegible] সাথে কলিকাতার শিক্ষাসংকট নিয়ে

[illegible]

দ্বিপ্রহর

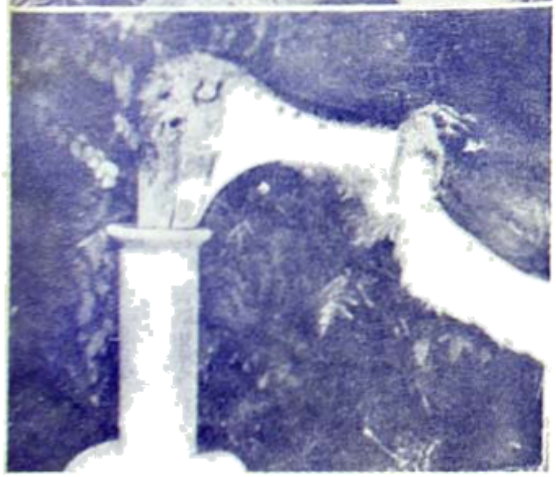

চিত্রে প্রবাদ কাহিনী

সহজে ফেরৎ পাবার সুযোগ রেখে
ভাল সুদে টাকা খাটাবার উপায়—
আমাদের

৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাস্ সার্টিফিকেট

কেনা

- পূর্ণ মেয়াদান্তে সার্বিক লভ্যতা ৩৲ টাকার উপর সুদ পাওয়া যায়।
- ৬ মাসান্তে যে কোন সময় টাকা তুলতে পারা যায়।
- ৫০৲ টাকা বা তার যে কোন গুণণীয়ক পরিমাণ 'ক্যাস্ সার্টিফিকেট' কেনা যায়—কোন ঊর্দ্ধসীমা নির্দ্দিষ্ট নাই।
- আমাদের সেবা ও তৎপরতা সর্ব্বদাই পাবেন।

★

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪৩ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রসুই দিয়ে রান্না করুন

উৎসবের আনন্দ
বাড়াতে চাই
রসুই-এর তৈরি খাবার—
যেমন সুস্বাদু
তেমনি পুষ্টিকর।
ঘরে ঘরে তাই
রসুই-এর এত আদর।

প্রস্তুতকারক
হিন্দুস্থান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
মার্কেটিং এজেন্ট্স্
এন. আর. সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা

কোমল ত্বকের জন্য চাই
স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ সাবান

॥

—প্রসাধনে—

কেরালা স্যাণ্ডাল উড্
এবং
কেরালা টয়লেট সোপ

॥

—স্বাস্থ্যরক্ষায়—

কেরালা কোলটার সোপ

॥

—অন্যান্য কাজে—

কেরালা ওয়াস্‌ওয়েল
বার সোপ

| | | | | | | |

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে
উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত

সোল এজেণ্টস্—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম

ওভারসীজ্ কর্পোরেশন লিঃ

২২ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

গ্রাম—পেডাগগি

ফোন—ব্যাঙ্ক ৪২০৭

হাত

বিজন ভট্টাচার্য্য

প্রশ্ন নিশ্চয়ই ছিল, নইলে জীবন্তে মরণ হোল না গোলগোবিন্দ'র।

কেউটে সাপের দাঁতে যেমন বিষ, গোলগোবিন্দে'র মনেও তেমনি অনর্থের কালকূট। মনগড়া মানসের স্বার্থ বিবরে সে নিজের আনন্দে যতো উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই চলুক না কেন, থাকে ভালো, কিন্তু সেই নৈরাজ্য সাধনায় যদি কেউ কোনো ব্যাঘাত ঘটায়, তো আর রক্ষে নেই,—ঠিক ছুবলে দেবে।

কালসাপেরই কালড়, বিষে বিষে নীল হ'য়ে গেছে বরদেহ, কিন্তু সরযূর মরণ নেই।

জীবন্তে মরবার এতটুকু প্রশ্রয় নেই এখানে। তাই মরেও বেঁচে আছে সরযূ।

সেদিনও বাড়ী ফিরে শুনলাম কি না কি একটা তুচ্ছ কারণে গোলগোবিন্দ চুলের মুঠি ধরে টান মেরে ফেলে দিয়েছে কলতলায় সরযূকে। কি? না উনুন ঝাড়বার পর পোড়া কয়লাগুলো বেড়ে বেছে ধুয়ে গোলগোবিন্দ'র অভিরুচি মতো সরযূ সেদিন নাকি টিকটিক উনুন ধারে সাজিয়ে রাখে নি। এই নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত, কথাকাটাকাটি, তারপরেই আর কি, একতরফা হামলা। বালতির ওপর পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গেছে, চশমাটা ভেঙেছে, সরযূর।

খবর তো নয়, যেন খানিকটা গলানো সীসে ঢেলে দিল কানের ভেতর কমলা আফিস থেকে বাড়ী ফিরতেই। বিরক্ত হয়ে বলি,—

: থাক, চুপ করো। ভালো লাগেনা আমার ও সব কথা শুনতে।

চুপ ক'রে যায় কমলা।

কর্মক্লান্ত দিন শেষের একটি সন্ধ্যায় আগুন জ্বালিয়ে বিয়ে চা আনতে চলে গেল কমলা।

খবরটার অবিশ্যি নতুনত্ব কিছু ছিল না। কারণ, এর আগেও অনেক অনেক দিন, এমনই কোনো দুর্ঘটনার দাবদাহে, জলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে আমার চোখে। আজ না হয়, একটু বেশীই জখম হয়েছে সরযূ। সে কথা নয়। আমার শুধু অসহ্য লাগে একটা কথা ভেবে, যে সরযূর সমস্যা কেন আমার সমস্যা হবে?—আর যদি তা হয়ই, তবে তার কোনো প্রতিকার হবে না কেন!

এদিকে পাকাদলিল গোলগোবিন্দ'র হাতে—অগ্নি সাক্ষী ক'রে শাস্ত্রীয় আচারে সরযূকে বিয়ে করে তার ইহকাল পরকাল জ্বালিয়ে দেবার অবাধ অধিকার লাভ করেছে গোলগোবিন্দ। আশ্চর্য!

ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াটা আইনের চোখে নিঃসন্দেহে বে-আইনী। অপরের সংসারে, আমার মতামতের সত্যিই কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু সরযূর? ক্লান্তি আসে ঠিক তখনই। সরযূরও কি কিছু করবার নেই?

কথায় কথায় উনি। সম্বন্ধসূচক দুই অক্ষরের একটি ছোট্ট কথা, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে কথাটার এমনই নামমাহাত্ম্য যে আজ ছাব্বিস বছর বয়সেও গোলগোবিন্দ'র উদ্দেশে উনি বলতে সরযূর দুই চোখ উল্‌টে পাল্‌টে সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। আর এ একবার না, যতোবার উচ্চারণ করে, ঠিক ততবারই।

সত্যি এমন পতিভক্তি দেখা যায় না। অনেকে অনেক কথা বলে এ নিয়ে। কেউ বলে আদিখ্যেতা, অমন পতিভক্তির মুখে নুড়ো জ্বেলে দাও। কেউ বলে, না ক'রে করবে কি? মেয়েমানুষ! গোলগোবিন্দ'র যে ঘরে বাইরে দু-দিকে টান! এদিকে বেটের কোলে

পাঁচটি।... অবলা মেয়েমানুষ সহ্য না ক'রে যায় কোন্ চুলোয় ?

বলে, নিজের হাতে ক'রে কপাল পুড়িয়েছে পুরুষ ব্যাটাছেলের স্বভাবই উরুকু। তবে মন যাঁচাতে জানতে হয় মেয়েছেলের। এ সব কথা কি আর খুলে বলে বোঝানো যায় ?

এ সবই মেয়েমহলের নিরেকড়া সমালোচনা, কান-ভাঙানো আর আসর জাঁকানো—এতে ক'রে সরযূ-বালার কোনো লাভ হয় না। পরচর্চায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে আনন্দ পায় শুধু অপরে।

যে যাই বলুক, সরযূর কিন্তু নিষ্ঠার শেষ নেই। দোলগোবিন্দ'র অভিরুচি মতো সরযূ বলে, কয়, হাসে, স্বামী অন্যায়ের কোন কিছু না তুলে। নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সংগোপনে রেখে, গভীর নিশীথে বারব্রত আচার অনুষ্ঠানে দেবদেবীর আশীর্বাদ টেনে আনায় দোলগোবিন্দ'র মাথায় বছরের পর বছর।

কিন্তু তবু দোলগোবিন্দ খুশী হয় না। পান থেকে চুন খসলেই ক্ষেপে ওঠে জানোয়ারের মতো।

আস পাশ সামনে খোলা মেলা, যাওয়া আসার পথ বারোয়ারী, দুপাটী দাঁত চিপে দোলগোবিন্দ চলে যায় একেবারে পেছন দিককার শোবার ঘরে। আঁধার ঘর; কলসীটা এখানে আনায় ভালো। ঢুকেই আলনা থেকে সরযূর জামাকাপড়গুলো টান মেরে মাটিতে ফেলে দেয় দোলগোবিন্দ। শিক্ষার দাবী কলাতে পারে, এমন যদি কোনো ছেলে মেয়ে হৈবাত সামনে আসে, তো আঁচড়ে, কামড়ে, খাবড়ে মার করে দেয় তাকে, তারপর ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত হন্তে হয়ে পায়চারী করতে থাকে সরযূর অপেক্ষায়; পায়চারী করে আর নিজের মাংস নিজেই ছিঁড়ে খায় দোলগোবিন্দ গায়ের জ্বালায়। তারপর এক সময় না এক সময় মোকাবিলা সুরু হয়ই নখে দাঁতে।

প্রত্যেকটা ঘটনাই কেলেঙ্কারীর একশেষ। কোন দুর্ঘটনাই চাপা থাকে না। দু একদিন বাদেই টুকরো টুকরো বাদবিসংবাদের খবর অরক্ষিত রন্ধ্র পথ দিয়ে পাঁচ কানে যায়। তারপর ঘরের শত্রু বিভীষণেরও অভাব নেই সংসারে। বেটাইমে আদর বাড়াতে গিয়ে খাঁটা খেয়ে কেঁদে ফেরে দোলগোবিন্দ'র যে ছেলেটা, সেই ফাঁস করে দেয় ইতিবৃত্তান্ত—মাকে বাসা আজ মেরেছে। তারপর এই খবরের সঙ্গে সরযূর কপালের কালসিটে দাগ মিলিয়ে ভাড়াটে বউরাও সত্যাসত্য যাচাই করে নেয়। সরযূ কিন্তু তখনও দোলগোবিন্দকে বাঁচিয়ে চলে; বলে, বাটি ছুঁড়ে মেরেছে কোলের ছেলে বাচ্চু। কিন্তু আজে বাজে কথার তলে মনের আগুন চাপা থাকে না।

দোলগোবিন্দ'র খামখেয়ালের গল্প ইনিয়ে বিনিয়ে হাসিমুখে বলতে গিয়েও নয়নজলে বুক ভেসে যায় সরযূর।

পাশাপাশি বসবাস, ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হয় সব অশ্রাব্য কাহিনী,—আজ বকেছে, কাল ধরেছে, পরশুদিন লাথি মেরেছে—সব নোংরা ব্যাপার।

বহুদিনের সম্পর্ক, সরযূও আসে, খোমটা টেনে বসে আমার স্বাস্থ্যতার কমলার সঙ্গে গল্পগুজব করে, কথার ঢংএ দোলগোবিন্দ সম্পর্কে আমার কাছে নালিশও যে করে না—একথাও বলতে পারি না।

বলা বাহুল্য সরযূকে আমার ভালো লাগে। সরযূর পল্লবঘন সরমান্বিত মুখখানার কথা অনেকদিন কমলাকেও বলেছি। বলেছি সরযূকে ভাল লাগে বলেই ওর নিগ্রহে আমাকে কষ্ট দেয়; কমলা হিংসুটে-পনা করে নি। সরযূর নিগ্রহে আমার কপালে ও পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় বন্ধুর মতই। দেখে শুনে অনেক সময় কমলাও অসহ্য হয়ে ওঠে দোলগোবিন্দ'র ওপর। তখন আমি আবার কমলাকে আশ্বস্তি দেই।

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে আরও পরে একদিন রাত্তির বেলা। ঘুমুচ্ছি, পাশে শুয়ে আছে কমলা, ঘুমে অচেতন। হঠাৎ হট্টগোলে মাঝ রাত্তিরে উঠে বসলাম।

কমলাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিয়ে আর্তনাদ শুনে বাইরে ছুটে যাই। দেখি দোলগোবিন্দ'র ঘরের সামনে ক্ষুদ্র একটা জনতা অন্ধকারে ঘোঁট পাকাচ্ছে। একটু এগিয়ে যেতেই কাপড় পোড়ার ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসে। ভয় হয়, আগুন টাগুন লাগে নি তো। দৃকপাতহীন ছুটে গিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাই। দেখি ঘুলঘুলি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অনর্গল। কেরোসিনের উগ্র গন্ধও নিশ্বাসে অনুভব করি। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খোলে। ছিটকে পড়ি একেবারে ঘরের ভেতর। সামনেই দোলগোবিন্দ। উদভ্রান্ত প্রশ্ন করি, কি ব্যাপার মশাই! দোলগোবিন্দ তৈরী হয়েই ছিল। জিজ্ঞাসামাত্র ফেটে পড়ে রাগত-নিনাদে,—ঐ দেখুন, চারানজাদী আমার হাতে হাতকড়া পরাতে চায়, দেখুন। চেয়ে দেখি, ধোঁয়াটে একগাদা বিছানা বালিশের মাঝখানে হেটমুণ্ড করে বসে আছে সরযূ। পরনের কাপড় আর মশারীটা খাবলা খাবলা করে খোল হয়ে পুড়ে গেছে। চেষ্টা করেও মরতে না পেরে লজ্জায় কালো হয়ে গেছে সরযূর ফর্সা মুখখানা। দোলগোবিন্দ চেঁচিয়ে বলেন, বেঁচে থেকে কিছু করতে পারছে না, মাগী তাই মরে আমাকে মারতে চায়।

সামনেই প্রত্যক্ষ নজির—সরযূ, চেঁচিয়েই বাজী মাৎ করে দোলগোবিন্দ। বক্তব্য থাকলেও কথা বলা যায় না। আপোষে রফা করে দেব আর পাঁচজন কর্তাব্যক্তি, দোলগোবিন্দকে পরামর্শ দেয়,—এ নিয়ে আর হৈ হাঙ্গামা করবেন না। কেলেঙ্কারী হবে। চেপে যান।

আমিও চেপে যাই। মনটা কিন্তু আততায়ীর মত আসামীর আশপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করে। খালি মনে হয় খুন করে ফেলি দোলগোবিন্দকে।

আর এক মুহূর্ত না। মাসের পনেরো দিন থাকতেই নোটিশ দিই—বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি মাসান্তে। দোল-গোবিন্দ'র বক্তব্য ছিল, কিন্তু এক মাসের ভাড়া আমার অগ্রিম জমা দেওয়া ছিল। সুতরাং আইনগত কোন অন্তরিক্ষেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। এক বাড়ী, তাও ভগবানচন্দ্রের অশেষ কৃপা, অক্লেশে পেয়ে যাই চৌরাস্তার ওপরেই পার্ক সার্কাসে।

বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে বেশ চাউর হয়ে গেছে খবরটা আত্মীয়বন্ধু-পরিজন মহলে। প্রত্যেকেরই সনির্বন্ধ অনুরোধ, বাড়ী ছাড়বার আগেই তাকে যেন আইনানুগভাবে বহাল করে দিয়ে যাই। আমি কিন্তু কাউকেই কোন কথা কবুল করি না। সংক্ষেপে শুধু আশ্বাস দিয়ে যাই, চেষ্টা করবো।

চলে যাচ্ছি,—খবরটা যেমন এক পক্ষে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে, তেমনি যাদের পিছনে ফেলে যাচ্ছি তাদের নিরাশ করেছে। ঢুকতে বেরুতে এক একজনের সঙ্গে দেখা হয় আর আকুল প্রশ্ন ওঠে, হাঁ মশাই!—শুনলুম নাকি চলে যাচ্ছেন।—হাঁ বাবা, আমাদের ছেড়ে চল্লে বাবা!

অনেক দিন পাশা পাশি বাস, তা একটু মায়া পড়ে বৈ কি!

দরচাইতে কষ্ট হয় সরযূর কথা মনে করে। আজ পর্যন্ত কোনোদিন কথা বলিনি ভদ্রমহিলার সংগে। কারণ ঘটলেও এড়িয়ে গেছি। তবে কানু ঘুষুর মারফতে, বক্তব্য অব্যক্ত থাকলেও তার বিনিময় যে একেবারে হয়নি বললে ভুল বলা হবে। তা ছাড়া স্ত্রী কমলার সংগে বন্ধুত্ব নিবন্ধন হেতু কোনো ছেলেপড়া ক্লান্ত বিকেলে চায়ের আসরে সরযূর ক্লান্ত চোখের নম্র ছায়ায় যে মিনতি প্রেতের মতো। আমাদের বৈত সংসারের পানের বাটা চায়ের পেয়ালা সুরভি জর্দার কৌটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ছায়ার মতো কেঁপে কেঁপে সরে যেত। সে কথাও আমি খেপে খেপে রেখেছি মনে। চোখোচোখি হতেই সরযূর সে কি সংকোচ, সে কি ভয়! কথায় কথায় ব্যথাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আমিও যে তার সংগে সমব্যথী হয়ে উঠতে চেয়েছি, সরযূও সেটা বুঝতে পারতো। এতে ক'রে আমারও ক্ষতি হয়নি। অপরপক্ষে সরযূর যদি এতে ক'রে একটুও লাভ হয় তো সেই আমার সান্ত্বনা।

ঘাক ডালে যখন যেতেই হবে, তখন সময়ের কথা ভেবে লাভ নেই। শনিবার, মাসের শেষ তারিখ হলেও ওটা হ'লো না। বিয়ের তারিখ ছিল ওটা আমাদের। গিন্নী আপত্তি করলেন। অন্য কোনো কারণে নয়, ঐদিনটিতে তিনি নিজেকে মধুরের মতো মনে করবেন ব'লে। বললেন, ছৈ ছাপোষা ওদিন পালোই ভালো লাগেনা আজকের দিনে কাল চলো। আমি আপত্তি তুললাম না। একটা দিনের তো ব্যাপার।

দুপুর বেলা। হাফ-ডে চাকরী সেরে সকাল সকাল ফিরেছি। বারোগাছা রজনীগন্ধার ডাঁটা আর স্তবকটা ধূপকাঠির একটি খুচরো সওদা, কোনোটাই ভুল করিনি আনতে। কমলাও খুব খুসী। চায়ের জল চড়ানো ছেলে। আর আমিও হাত মুখ ধুয়ে আরাম কেদারাতে গা ঢেলে দিলাম। তপ্তাহত হয়েছিলাম, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। এসে দরজা খুলে দেখি অমরেই মল্লিক বক্স। বললাম : আরে প্রতুল যে, আয় আয়। তারপর? আফিস থেকে তো?

গিন্নীকে ডাক দিয়ে বললাম, ওগো প্রতুল এসেছে।

বন্ধুকে বসিয়ে কমলাকে খবর দিতে গেলাম ভেতরে। বুঝিয়ে বললাম : "সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানটির কথা বোকার মত ভুলোনা প্রতুলের সামনে।" চোখ পাকিয়ে গিন্নী বললেন—কেন বললে কি অপরাধ?

কমলাকে বুঝিয়ে বলি : অপরাধের কথা নয়। ব্যাপারটা তোমার আমার কাছে টাট্‌কা হ'লেও প্রতুলের কাছে নেহাৎই বাসি। বিশেষতঃ সে এখন নতুন বিয়ে করেছে, বুঝলেনা?"

কমলা বক্তব্যটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করল কিনা বুঝতে পারলাম না। পুরোনো চোখে নতুন দিনের হদিস্ দিয়ে, চায়ের ট্রে হাতে সে নৃত্যপরা ছন্দে বাইরের ঘরে চলে যায়। আমি অনুগমন করি মাত্র।

পর্বদিনের শুভ মহরৎটির সুরুতেই ছোট্ট একটি চায়ের নেমন্তন্ন ক'রে বেশ জমিয়ে তোলা গেল। প্রতুল দেখলাম আমার মতোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের বৌ-য়ের প্রশংসা করে গেল অনেকক্ষণ ধ'রে। দেখলাম পূর্বেকার ক্রমেডীয়ান মনস্তত্ত্বের ছাট্, সুনন্দা একটানে তার বেণীর মতোই খুলে দিয়েছে প্রতুলের বাধা থেকে। বেশ ভালো লাগল প্রতুলকে। বললাম—

তা'হলে বেশ ভালোই আছিস বল্?

এতক্ষণে প্রতুল যেন টের পেল, সে খুব ভালো নেই। সমস্যার কথা পেড়ে চোখ বড় বড় করে বললে—

: সে বৌ তো তাই একরকম হয়েছে। কিন্তু থাকবার জায়গা পাচ্ছিনা। আমি থাকি বেলগাছিয়া, বন্ধুর বাড়ী, আর বৌ থাকে বালিগঞ্জে দিদির বাড়ী। কোনোখানেই একসংগে মাথা গোঁজবার মতো এতটুকু ঠাঁই নেই। ঐ হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমায়, দেখাসাক্ষাৎ হয় আর কি দিনের বেলা। আর সন্ধ্যের পরই যে যার আশ্রয়। এই হয়েছে এক মর্মান্তিক ব্যাপার ভাই। তা তুই শুনলুম বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছিস। আমাকে যে করে পারিস ভজিয়ে দিয়ে যা। বুঝতেই তো পারছিস্।

ঘটনার গুরুত্ব সাংঘাতিক। সত্যিই এ রকম ক'রে বাঁচা যায় না। বাড়ীর আর সব ভাগীর নাম সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হলাম, প্রতুলকে প্রত্যক্ষভাবে ওয়ারিশ সাব্যস্ত করে বললাম—

: বেশ। কাল সকালেই তুই সুনন্দাকে নিয়ে চলে আয়। বাড়ীটা আপাততঃ আমার নামেই থাক্। দু'মাস বাদে তুই আইনমাফিক নিজের নামেই ভাড়া দিস্।

হাতে যেন চাঁদ পেল প্রতুল। সাহায্য ক'রে আর স্বীকৃতি পেয়ে, আমারও মন ভরে গেল। স্বস্তির আনন্দে হাঁফ্ ছেড়ে প্রতুল বিদায় নিল সেদিনকার মতো।

সেদিন রাত্রে কেন জানি না, ঘুম হোল না একেবারে। সরযূর কথাই মনে হচ্ছিল শুয়ে শুয়ে। সন্ধ্যে রাত্তিরেও দু'তিনবার এসেছিল সরযূ। অদ্ভুত ওর আনাগোনা! আমার স্ত্রী আবার একটু ফল-

যোগের আয়োজন করেছিলেন। দু পাঁচজন অভ্যাগতও এসেছিলেন সন্ধ্যাবেলা। সবাই চেনা জানা পাড়া-পড়শী। আমার ওঁর বন্ধুবান্ধব। কমলা ব্যস্ত ছিল প্লেট সাজাতে। সুতরাং আমাকেই আদর আপ্যায়ন করতে হচ্ছিল এঘর ওঘর ক'রে। সেই সময় দেখে-ছিলাম সরযূকে ঘুরতি ফিরতি দু'তিনবার। বেশ সেজেগুজে এসেছিল সরযূ। অপূর্ব দেখাচ্ছিল সরযূকে। কিন্তু, ঐ পাঁচজনের ভীড়েও কেমন যেন একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখার অভ্যেস ওর।

একবার সিগারেট না কি যেন একটা আনতে গেছি—দেখি একলা ঘরে বসে আছে সরযূ। বিছানায় চুপ ক'রে ব'সে আছে। ব'সে আছে, আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গোটা বিছানাটা দেখছে। মসৃণ তকতকে বিছানা,- দ্রষ্টব্য এমন কিছুই পড়ে নেই। সরযূ তবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কি দেখছিল সে, সরযূই জানে। আমায় দেখে কেমন যেন একটু চমকে ওঠে। বিব্রত বোধ ক'রে তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। কমলাকে ডেকে বলি :—

: কাল যখন চলেই যাবে, তখন সরযূকে অমন একলাটি না বসিয়ে পাঁচজনের মাঝখানে রেখে একটু গল্পগুজব কর। একলাটি বসে থাকতে ওর বোধ হয় ভালো লাগছে না।

কমলা বোধ হয় একটু কিন্তু করেই তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বললাম—

: বোঝই তো, ভেতরে ভেতরে ও কতো বিপন্ন। আমরা কাল চলে যাবো, বলে মনে মনে বোধ হয় কষ্ট পাচ্ছে সরযূ। তাই তোমায় বললাম কথাটা। কিছু মনে ক'রো না।

অনেক রাত। সবাই চলে গেছে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে। কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি জেগে আছি। সিগারেটটা শেষ হয়ে গেলেই শোব আর কি। সাত পাঁচ ভাবছি। এমন সময়,—কমলা! ছোট্ট করে একটি নরম গলার ডাক শুনলাম দরজার ওধারে।

কমলাকে দু' একবার ডাকলাম, কিন্তু সাড়া পেলাম না। সারাদিন খাটা খাটুনীর পর একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার শুনলাম—কমলা! কিন্তু কে সাড়া দেবে? অগত্যা নিজেই দরজা খুলে এগিয়ে গেলাম। দেখি সরযূ। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়াটা কাঁপছে দেয়ালের গায়ে। মিষ্টি করে বললাম, "কমলাকে ডাকছেন?" কিন্তু, কমলা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেকে দেব?

শান্ত গলায় সরযূ বলল—

না থাক। দাঁড়িয়ে রইল সরযূ। যেন আরও কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। এমন সময় সেই বলল—

শুনলাম কালই নাকি চলে যাচ্ছেন? জানা কথা কিন্তু উত্তরটা মনে হোল সরযূ আমার মুখ থেকেই শুনতে চায়। কুণ্ঠিতভাবে বললাম

হ্যাঁ, মানে.....

বক্তব্য শেষ না করতেই—ঘুরে দাঁড়াল সরযূ আমার দিকে। বেদনাহত একজোড়া বড় বড় কালো-চোখ। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। একটু পরেই দেখি, দেয়ালের গা থেকে সরে সরে যাচ্ছে ছায়া। তাকাতেই দেখি, সরযূ চলে গেছে, নেই সরযূ। দরজাটা আস্তে বন্ধ করে আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

ঘুম নেই চোখে। অন্ধকারে চোখ চেয়ে জেগে আছি তখনও। ঘুট ঘাট শব্দ—ইঁদুরেরা কথা কইছে। দূরে কোথাও কুকুর ডাকে। আমি কান পেতে শুনি। হঠাৎ শুনতে পাই দুমদাম করেকটা বিশ্রিশ্ব আওয়াজের পরই বুক বিদারণ তির্যক একটা তীব্র সুতীব্র আর্তনাদে অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কি হোল কার? কান পেতে আছি। সরযূর গলা শুনলাম—

মেরে ফ্যাল না!—মেরে ফ্যাল। অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে উঠলাম অন্ধকারে। ঢিপ ঢিপ করে হৃৎপিণ্ডের নাচন সুরু হোল বেতালায়। বালিশে কান চেপে

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। ঘুমের তাগাদায় প্রতিবারে কিছিয়ে হাত কমলার কণ্ঠে। সাড়া ক'বার চেষ্টা করবার ছাড়বার উত্তর পেলাম না। তারপর নিয়ে পড়েছি কিসের নেই।

সকাল বেলা। কাজের ভীড়ে রাতের করবারও অবকাশ নেই। পাশের ঘরে কমলা সুনন্দার কাছে ছিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে বেডটীর সুবিধে অসুবিধের। প্রতুল মালপত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে বারান্দায়। বরজাস দাঁড়িয়ে ভাড়া করা লরী আনারই সংসারের মালপত্র কাঁধে করে নেবী হচ্ছে দেখে বেগে রেগে ফুঁসছে। উকিলের মতো ডিপ্লমেন্ট কেটে এগিয়ে এল সুনন্দা। বলল—

বিভাবরী পোছাল সার? বেলা যে দশটা বাজে। বোকার মতো হাসতে হাসতে নিজে তৈরী হয়ে নিলাম চটপট্। সুনন্দাকে বললাম—

বেডশুনে গোছগাছ করে নিও।

বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। প্রতুলের মুখ ছুঁয়ে মুচকি হেসে সুনন্দা বলল—

অসুবিধে হ'লে আপনি তো রইলেনই বলা যাবে। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললাম—

অবশ্যই।

ঘুমের ঘোরে পড়তে পড়তে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছি পার্ক সার্কাসে। নতুন বাসা পেয়ে আশ মিটেছে কমলার। এখানে সব কিছুরই সুবিধে আছে, দক্ষিণ খোলা দু-খানা বেশ বড় বড় ঘর। সামনে টানা বারান্দা। বরলাভের মতোই পাওয়া গেছে এই ডুপ্লিকেট বাজারে। ইতিমধ্যে সুনন্দারা নাকি আমার অনুপস্থিতিতে দু-একদিন বেড়িয়েও গেছে। বাড়ী দেখে ওরাও মুগ্ধ। যাবার সময় সুনন্দা নাকি কমলাকে বলেছে—

এ বাড়ীটা তোমরা করে ছাড়বে ভাই?

মাস কয়েক কেটে গেছে। শনিবার। সিনেমায় গেলাম সেদিন কমলাকে নিয়ে ম্যাটিনিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি যে আড়াইটে টাকাই লোকসান চলে গেল। বাংলা দেশে তোলা হিন্দী ছবি, ইন্টারভ্যালের আগেই উসখুস্ করতে লাগল কমলা। বলল—

: চল, বরং বাইরে বেড়াই। আমি তো এক পায়েই খাড়া হয়েছিলাম। কমলা বলতেই বেরিয়ে গেলাম হল থেকে। সবে সাড়ে তিনটে। কোথায় যাই, কোথায় যাই। গেলাম প্রতুলের ওখানে। কমলাকে বললাম—

সিনেমা থেকে উঠে এসেছি এ কথাটা আর বলোনা। সুনন্দা দুঃখ পাবে। তাবুবে সময় কাটাতে এসেছে স্বামী-স্ত্রীতে!"

মন্দ কাটলনা বিকেলটা। আড্ডা মেরে। প্রতুলের পেশা অডিটিং। আর নেশা হচ্ছে কবিতা লেখা। স্থান-কাল পাত্র ডিঙিয়ে অনেক আজব কথার অবতারণা করে প্রতুল, শুনতে মন্দ লাগেনা মাঝে মাঝে। প্রত্যক্ষ ছেড়ে, দেখা যায়না, এমন অনেক সমস্যার কথা কবিতায় বলতে চায় প্রতুল। যে সত্যি নতুন ক'রে ভাবতে বসতে ইচ্ছে ক'রে সমাজ সংসার সম্পর্কে। কাব্যের সমস্যা জীবনের খরতরো বোহানায় কি ভাবে নির্ধারিত হচ্ছে, স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্তের জীবন, এ জীবন প্রচলিত সমৃদ্ধি আর সুখ-সম্ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে, সার্থক হয়েও আজ কেন অসার্থক,—এই সব আলোচনার সূত্র ধরে কেমন করে জানিনা সরযূর কথাটা তুলে ফেলে প্রতুল। ইতিমধ্যেই নজরে পড়েছে ব্যাপারটা প্রতুলের। আড়ালে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—

: আর পারছিনা ভাই। সত্যিই বলছি তোকে, মাইরি অসহ্য হয়ে উঠেছে। কি সাংঘাতিক ভয় হচ্ছে ভদ্রলোককে খুনটুন না করে ফেলি, তাই আস্তানা খুঁজছি। ছিলি কি করে তুই এখানে?

ইতিমধ্যেই সুনন্দারা এলো আলোচনার মাঝখানে। কাজেই ওপ্রসংগে আর কোন কথা হ'লনা। খোস্ গল্পে রাত গড়িয়ে ঢং ঢং করে ন-টা বাজল। সেদিনকার মতো

বিদায় নিলাম আমরা।

জুড়োতে এসে পুড়িয়ে গেলাম মনটা। মনের চৌকাঠে জুড়ে দেখলাম সরযূ,—পল্লবঘন চোখের পাতায় নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ক-মাস একেবারেই ঘুম হয়না আমার। শরীরও দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। ডাক্তার বলেছে মাথারই অসুখ চোখে ভর করছে।

ওষুধপত্তর খাচ্ছি। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিনা একেবারেই। দিনের বেলা যদিও একভাবে কাটে, রাত্তির আর কাটতে চায়না। কমলা ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে পড়েছে। জমানো টাকা যা দুএকহাজার ছিল, প্রায় খরচ হয়ে এসেছে। এ বাড়ীওয়ালা নেহাৎই ভদ্রলোক। বকেয়া ভাড়ার টাকার কথা উচ্চারণও করেন না বিপদ দেখে। মাঝে মাঝে আসেন, খোঁজপত্তর নেন, আশ্বাস দিয়ে চলে যান মাত্র। কমলা ঠেলার চোটে তাঁকে বাবা বলে ডেকেছে। ভদ্রলোক বলেছেন,—মা, তুমি আমার মেয়ের মতো। এখানেও এক নাটকীয় পরিস্থিতি,—মহেন্দ্রবাবু অর্থাৎ আমার পার্ক সার্কাসের যে বাড়ীওয়ালা, তাঁর নাকি ঠিক কমলার মতোই একটি মেয়ে ছিল। দুর্ভাগ্য মহেন্দ্রবাবুর, মেয়েটি গত তিনবছর হোল টাইফয়েড রোগে মারা গেছে। সন্তানসন্ততি বলতে ভদ্রলোকের কোথাও কেউ নেই। শুধু আছে বৈভব। শুনলাম কমলাকে নাকি তিনি এমন কথাও বলেছেন, দরকার হলেই কমলা যেন তাঁর ঠেঙে টাকা চাইতে ইতস্ততঃ না করে। ধার হিসেবেই দেবেন, সুতরাং মনে করবার কিছুই নেই কমলার। অসুখবিসুখ সারলে, পরে সেই টাকা ঘুরিয়ে দিলেই চলবে। প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত নিঃসন্দেহে।

তা কিছু কিছু ঘটনা সংসারে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে বইকি! তা সে যাই হোক, করণীয় যা তা কমলাই বুঝবে। সব কথা কমলা আমাকে ইদানীং জানায়ও না। জানায় না কারণটা হয়তো আমার মাথার ঠিক থাকেনা বলেই। কমলা আমাকে আশ্বাস দেয়, তুমি একদম ভেবনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মনে মনে হাসি। আমি, কতো ঠিক যে বেঠিক হয়ে গেল, আমি যদি তা তোমাকে জানাতে পারতাম! কান্না আসে আমার। কমলা আমার একমুখ দাড়ি-ভরতি গালে হাত বুলিয়ে দেয়।

জীয়ন্তে মরণ হয়েছে আমার। আর সেই মড়া কোলে করে কমলা দিনরাত বেহুলার মতোই বসে থাকে আর কাঁদে।

কয়েকদিন পর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়েছে। শুয়ে আছি চুপ করে বিছানায়। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত দুখানা দেখছি নিজের। দেখি ফুলে মোটা মোটা হয়ে গেছে আঙুলগুলো। ফেটে ফেটে রক্ত বেরিয়েছে, থেঁৎলে থেঁৎলে সব ক-টা আঙুলের ডগায়। শিউরে উঠি। একি বিশ্রী চেহারা হোল হাতের আমার! ডাকতেই কমলা আসে। বিছানার পাশে বসে আমার ডানহাতটা ওর কোলে তুলে নেয়। প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যে করে বলে, কাল রাতে আমি না কি অযথা অত্যাচার করেছি হাত দুখানার ওপর। হাত দিয়ে কি কখনো দেওয়াল ভাঙা যায়? গুলার্ড লোশানে প্যাঁৎলানো আঙুলগুলো ভিজিয়ে কতো রাত অবধি যে দুঁ দিয়েছে কমলা।

গভীর মমতায় কমলার চোখ দুটো ঢল্ ঢল্ করতে থাকে আমার চোখে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ জেগে জেগেই আঁৎকে উঠি। মনে হয়, যেন কমলা নয়, আমার কাছে সরযূ বসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভীষণ ভয় করে; কমলার হাতখানা প্রাণপণে জড়িয়ে ধ'রে চোখ বুঁজি আমি। বাইরেটা অন্ধকার। তেমনি দুনিরীক্ষ্য আমি। আমার ভেতরে আরও অন্ধকার। তারপর ক্লান্তিতে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না।

স্বপ্ন আমি বড় একটা দেখি না। ঘুমই নেই তার স্বপ্ন আসবে কোত্থেকে? কিন্তু আজ রাতে তার ব্যতিক্রম হোল। ঘুমের ঘোরে দেখতে পেলাম, তিমির একটা কলার তীর,—অনন্ত একটা হাউই-এর মতো—

অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে সরযূ। ছায়ার মতো কাঁপছে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য অব্যর্থ হয়ে। দেখি, অগ্নিমুখী সেই তীর, দীর্ঘ অন্ধকার পথ পরিক্রমার মতো কমলা, সুনন্দা ও আরো কতো কতো মেঘের বক্ষ ভেদ ক'রে আসার মতো ঝঞ্ঝাকারে শাঁক দিয়ে সরযূর দিকে ছুটে চলেছে।

ঘুমের ঘোরে একবার মনে হ'ল, স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমার এমন শক্তি নেই যে সেই তুহিন জড়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করি। সমস্ত শক্তি সংহত করেও বিছানা ছাড়তে কমলাকে পাই না। এক-মুহূর্ত পরেই আবার বিস্মৃতি। দেখি সরযূ। অন্ধকারে কালো কাপড় জড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই উঠে বসি বিছানার ওপর। জুতোটা কোন পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি ধ'রে নীচে নেমে যাই আমি তারপর ছুটতে থাকি দৃক্‌পাতহীন। অন্ধকার নির্জন রাস্তা। হোঁচট খেয়ে খেয়েও ছুটতে থাকি আমি।

কত পথ অতিক্রম করে এসেছি জানি না। হয় তো অনেকটাই। সামনেই মসজিদ্। রাতের অন্ধকারে গম্বুজটা সুস্পষ্ট। আমি অকুতোভয়। আর একটু এগিয়ে গেলেই আর কি সরযূকে উদ্ধার করা যাবে।

অন্ধকারে আমি এক ছরন্ত ঘোড়সওয়ার। সামনে দোলগোবিন্দ'র তিনতলা বাড়ীর ফটক। দেউড়ীর দরজা বন্ধ। তবু আমার অসুবিধে হয় না। পংগু আমি, গিরি লঙ্ঘন করি। পাঁচিল টপ্‌কে একেবারে ভেতরে লাফিয়ে পড়েছি। কুকুর ছিল একটা দোল-গোবিন্দ'র। ঘেউ ঘেউ ক'রে রুখে এল। কিন্তু আমার ভয় নেই। আমি কুকুরটাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে থাকি। চেলাবুখ, চুপ করে ল্যাজ নাড়তে থাকে কুকুরটা। লাফিয়ে পড়তেই চোট লেগে গিয়েছিল হাঁটুতে। দাঁড়াতে গিয়ে লাট খেয়ে ঘুরে পড়ি আমি দু'তিনবার। কিন্তু তবু আমার কষ্টের বোধ নেই। ঘুষে ছিঁচ্‌ড়ে গিয়ে এগিয়ে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াই আমি। এগিয়ে চলি সামনের দিকে।

সামনেই দরজা। সজোরে কড়ানেড়ে দৈত্যের মতো জুড়ে দাঁড়াই কবাট।

: কে?

সাড়া দিই না। ঝন্‌ঝনিয়ে কড়া নাড়ি।

: কে?

এবারেও উত্তর দিই না। দুনিবার একটা দানবীয় স্পৃহায় সড় সড় করে ওঠে আমার ফুলো মোটা হাত দুখানা। থাঁৎলানো আঙুলগুলো নিস্‌পিস্ ক'রে কিলবিলিয়ে ওঠে অন্ধকারে। আমি অপেক্ষা করতে থাকি।

দরজা খুলে পথ রোধ করে দাঁড়ায় দোলগোবিন্দ। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি চাই আমি অত রাত্তিরে।

আমি কোনো কথা বলি না। প্রাণপণে শুধু হাত দুখানাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। দুখানা হাত, যেন দুই দৈত্য—নড়তে সুরু করেছে আমার দু-পাশে।

দোলগোবিন্দ প্রশ্ন করে—

এত রাত্তিরে আপনি! একা ঢুকলেনই বা কি করে?

আমি কি বলব! আমার হাতদুখানা তখন দোল-গোবিন্দের হাত বেয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

দোলগোবিন্দ ভুল বোঝে। আপ্যায়নের ইংগিত মনে করে প্রশ্রয় দিয়ে বলে—

: খুব ভাড়াটে বসিয়ে গেছেন মশাই, ভদ্দরলোক মোটেই সুবিধের নয়।

কে কার কথা শোনে। দোলগোবিন্দের অংগস্পর্শে আমার শিরা উপশিরায় তখন তাণ্ডব সুরু হয়ে গেছে। দু-খানা হাত তখন দোলগোবিন্দের কাঁধের ওপর সেই সেই ক'রে নাচছে। দোলগোবিন্দবাবু ভুল বোঝেন। বলেন—

: চলুন, পাশের ঘরে যাই, বসবেন চলুন।

পাশের ঘর,—সেই ঘর,—যে ঘরে আমারি চোখে, সরযূ মৃত্যুবাণের অপেক্ষা করে বসে থাকে দিনরাত।

পাশের ঘর। মুখোমুখি দাঁড়ায় দোলগোবিন্দ। আলোতে এবার আমি দোলগোবিন্দের চোখে পরিষ্কার ফুটে উঠি। আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে, একটু অবাক হয় দোলগোবিন্দ। বলে,—

কি নিশ্চিন্ত দেখতে হয়েছেন বলাই আপনি ? অন্তত বিমুখ করেছিল না কি ?

আমার সব কথা তখন হাতে ভর করেছে। আমি থর থর করে কাঁপ্‌ছি। চোখে চোখ রেখে দোলগোবিন্দ শুধু প্রশ্ন করে—

: কি—কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে ?

আমি উত্তর দিই না। প্রত্যুত্তরে আমার হাত দুখানাই বজ্রকঠিন ভঙ্গিতে ধরে দোলগোবিন্দের কণ্ঠদেশ। দোলগোবিন্দ আমাকে একটা ঝটকা মেরে ফেলে দেয়। কিন্তু আমার হাত দুখানা তখনও দোলগোবিন্দের টুঁটি টিপে থাকে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, সেই বলার তীব্রতাকে আমার গাণ্ডীবী দুখানা হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিচ্ছে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। একটু পরেই আমার দুখানা দৈত্য হাতের মাঝখানে ধড়ফড় করে এলিয়ে পড়ে দোলগোবিন্দ। আমি নিঃসাড়ে বেরিয়ে যাই ঘর থেকে।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে উঠতে দেরী হয়ে গেছে সেদিন। সমস্ত রাত্রির দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ভোরবেলা বোধহয় ঘুমটা চেপে এসেছিল।

চোখ খুলেই দেখি প্রতুল। শিয়রে ব'সে আছে চুপ করে। একটু আশ্চর্য হই। কি একটা বলতে চেষ্টা করি, বলতে পারি না। এমন দুর্বল লাগে নিজেকে।

: কেমন আছিস্ ?

সস্নেহ প্রশ্ন করে প্রতুল।

সংক্ষেপে জবাব দিই—ভালোই।

পাশ ফিরে শুতেই নিজের হাতখানার দিকে নজর পড়ে আমার। মনে পড়ে স্বপ্নে দেখা সেই দৈত্য হাতের কথা। কিন্তু আশ্চর্য, সেই হাতের সঙ্গে এ হাতের যেন একেবারেই মিল নেই। এ হাত দুটো চিরকাল আমার হাত। রুগ্ন, রোগা রোগা। আঙুলের ডগাগুলো অবিশ্যি একটু কাটা-কাটা,—সেটা বোধহয় ঠাণ্ডাতেই।

একটু পরে কমলা আমাদের দুজনকে চা টোষ্ট দিয়ে যায়। বলে—

তোমরা খাও, আমি আসছি।

চ'লে যায় কমলা পাশের ঘরে।

এতক্ষণে একটু ভালো লাগে। সকালবেলা বোধহয় সব কিছুরই একটু নতুন করে ভালো লাগে। একটু হেসে বলি—

তারপর প্রতুল ? ভোরবেলা ? কি মনে করে ?

প্রতুল আমতা আমতা করে বলে—

এমনিই। দেখতে এলাম তোকে কেমন আছিস্। তাছাড়া এক কাণ্ড হয়েছে……

বলতে গিয়ে চেপে যায় প্রতুল। ঢোক গিলে বলে—

আচ্ছা দাঁড়া, বৌদি আসুন ! ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠি আমি। এমন কি ব্যাপার ঘটতে পারে, যা প্রতুল বলতে পারে না ! প্রতুলও দেখি চঞ্চল হয়ে উঠেছে খবরটা চেপে রেখে।

একটু পরেই চায়ের পেয়ালা নিয়ে কমলা ঘরে ঢোকে। স্মিত হেসে প্রশ্ন করে,

ব্যাপার কি ? এত সকালে ?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে—বসুন বৌদি, কথা আছে। সাংঘাতিক সব কাণ্ড বাপু !

রুদ্ধনিঃশ্বাসে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতুলকে আমি বলতে শুনি—

: গতরাতে খুন হয়ে গেছেন দোলগোবিন্দবাবু।

চায়ের কাপটায় ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠে খানিকটা চা ছলকে পড়ে যায় আমার বিছানায়। প্রতুল বলে যায়—

খুন জখম না, একবিন্দু রক্তপাত না। লাস দেখে মনে হোল কে যেন গলা টিপে মেরে রেখে গেছে দোলগোবিন্দ বাবুকে।"

কমলা হতবাক্। আমার মুখেও কথা নেই নিজের হাতখানা শুধু দর্পণের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি,—খ্যাংলানো আঙুলের ডগাগুলো তখনও নীল হয়ে আছে রক্তের উচ্ছ্বাসে।

আততায়ীর স্বাক্ষর যদিও বা থাকে সে দোলগোবিন্দের গলায়, হাতের আঙুলে তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই।

স্বদেশীর জন্মকথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

স্বদেশী-আন্দোলন বলিতে ১৯০৫-৬ সনের বঙ্গভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত 'বয়কট' অর্থাৎ বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলনের কথা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। 'স্বদেশী'—এই শব্দটির গোড়ার কথা সম্বন্ধে এখানে যৎকিঞ্চিৎ বলিব।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আমাদের দেশে এক বিশেষ অর্থে 'স্বদেশী' কথাটি প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। 'স্বদেশী'—অর্থাৎ, স্বদেশজাত শিল্প। সেই যুগে যখন বিদেশী শিল্প দ্রব্য আমাদের দেশকে ছাইয়া ফেলিতে উদ্যত সেই সময়ে জীবিত বা জীবন্মৃত স্বদেশজাত শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের সূচনা হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয় শিল্প প্রয়োগ হেতু পাশ্চাত্য জগতে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়। আমাদের দেশের শিল্প প্রধানতঃ রাজনীতিক কারণে ধ্বংসোন্মুখ হইলেও পরে যে এই কারণেই মুখ্যতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা আজ বেশী করিয়া বলার আবশ্যক করে না। এই বিপর্যয় হইতে উদ্ধারের প্রয়াস আমরা প্রথম দেখি গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলার মধ্যে। হিন্দু মেলা প্রতি বৎসর স্বদেশজাত কৃষি ও শিল্পদ্রব্য এবং স্বদেশীয় যন্ত্রপাতি আর চরকা-তাঁতের প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেন। কলিকাতার বাহিরেও এই মেলার আদর্শে শাখারূপে বা স্বতন্ত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইত। কলিকাতার সন্নিকটে বারুইপুরে এবং সুদূর মফঃস্বলে, যেমন ফরিদপুর, দিনাজপুরে, এই সকল খাঁটি স্বদেশী মেলার আয়োজন হইয়াছিল। স্বদেশজাত দ্রব্যাদির সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় গীতবাদ্য আমোদ-আহ্লাদেরও অনুষ্ঠান চলিত।

এই ভাবে দেশবাসীর মনে যে আত্মচেতনার ক্রমশঃ উন্মেষ হইতে থাকে তাহা কোন কোন স্থলে সভা-সমিতির মধ্যেও দানা বাঁধিয়া উঠে। ১৮৭৫ সনে ঢাকায় একটি সভা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, মাঞ্চেষ্টারের কাপড় তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না; তন্তুবায়েরাও বলিলেন, তাঁহারা বিলাতী সুতা ব্যবহারে বিরত থাকিবেন। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং তাহার ব্যাপক ব্যবহার সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য কেহ কেহ লেখনীও ধারণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, ভূদেব-মধুসূদন-রাজনারায়ণের সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্রের কথা সর্বাগ্রে আমাদের মনে উদিত হয়। তিনি শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজীনে' ১৮৭৬ সনে (জানুয়ারী-জুন সংখ্যা) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি লেখেন, পূজা-মণ্ডপে, বিবাহ-বাসরে, শ্রাদ্ধ-সভায়, এমনকি গৃহসজ্জার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারেও আজ বিলাতী দ্রব্যের ছড়াছড়ি। এই আত্মঘাতী কার্য দ্বারা যে আমরা মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনিতেছি এ ধারণা আমাদের মধ্যে এখনও জন্মে নাই। এসময় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, স্বদেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতার উন্মেষ সাধন। কিরূপে ইহা সম্ভব? ইহার উপায়ও ভোলানাথ বাৎলাইয়া দিয়াছিলেন। বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারে যে আগ্রহ আমাদের মধ্যে জাগিয়াছে তাহা স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে দ্রুত ফিরাইয়া আনিলেই আমরা অনেকটা সফল হইতে পারিব। ভোলানাথ এ প্রচেষ্টার নাম দিলেন—'Moral hostility' বা নৈতিক বৈরিতা। তিনি বলেন, এ নিমিত্ত আইনসভার শরণ লইবার প্রয়োজন নাই, রাজা-উজীরও বিশেষ আবশ্যক করিবে না। জাতির মনে স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্য ব্যবহারের ভাবটি দৃঢ়বদ্ধ করাইতে পারিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই 'Moral hostility' বা নৈতিক বৈরিতা পরবর্তী কালের 'বয়কট' কথারই জোতক। 'বয়কট' শব্দটির উদ্ভবের কাহিনী বড় চমৎকার। ক্যাপ্টেন চার্লস স্যানিংহাম বয়কট নামক (১৮৩২-৯৭) এক ব্যক্তি কোন ইংরেজ জমিদারের প্রতিনিধি হইয়া আয়র্লণ্ড যান। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। ১৮৮০ সনে তিনি প্রজাদের খাজনা এত উচ্চ হারে বাড়াইয়া দিলেন যে তাহারা তাহা দিতে অসমর্থ হইল। তাহাদের অনুনয়-বিনয়ে বয়কট কর্ণপাত করিলেন না, জোরজুলুম করিয়া খাজনা আদায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রজারা জোট করিয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করে। ফল তা ছাড়িয়া গেল, এমন একজনও পাওয়া গেল না যে, তাঁহার নিকট খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করে, লোকাভাবে পত্র আদান-প্রদানও বন্ধ। বয়কট সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়া 'একঘরে' হইলেন। অবশেষে ইংলণ্ড হইতে সৈন্যদল গিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনে। ইহার কিছুকাল পরে বিদেশীদ্রব্য সর্বপ্রকারে বর্জন ব্যাপারে এই 'বয়কট' কথাটির ব্যবহার সুরু হয়। ইহার প্রথম প্রয়োগ দেখি চীনা কর্তৃক মার্কিন দ্রব্যাদি বর্জনে, স্বদেশী আন্দোলনের কিয়ৎকাল পূর্বে।

এই সব আলোচনার ফলে সপ্তম দশকেই বাংলার ও বাংলার বাহিরে কিছু কিছু কলকারখানা, বিশেষতঃ কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ম্যাঞ্চেস্টারে অমনি আন্দোলন উপস্থিত হইল। তথাকার শিল্পপতিরা রব তুলিলেন, ভারতীয় শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিনও ছুটি দেওয়া হয় না। পবিত্র 'Sabbath Day' বা রবিবারেও তাহাদের খাটিতে হয়। কি নির্মম অত্যাচার! অমনি ভারতসচিব এখানে বড়লাটকে লিখিলেন, বড়লাটও আদেশ দিলেন —কারখানা রবিবার বন্ধ রাখিতে হইবে। সপ্তাহে একদিন শ্রমিকদের বিশ্রামদান মানবতাসম্মত, সন্দেহ নাই, কিন্তু জনৈক ইংরেজ মনীষী বলিয়াছেন, ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পপতিদের দাবীর মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ভারতীয় মিলে বস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়া যাইতেছিল, তাহাতে বাধা দিবার জন্যই উহারা ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত করে।

আবার রক্ষণশীল সরকারও তখন এই সকল শিল্পপতির নিতান্তই বশংবদ ছিলেন। পূর্বে বিদেশী বস্ত্রের উপরে ভারত-সরকার আমদানী শুল্ক বসাইয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার দাবী করিল এই শুল্ক তুলিয়া দিতে হইবে। আর কি কথা আছে? ভারত-সচিব যে তাহাদেরই লোক। বড়লাটের নিকট নির্দেশ আসিলে তিনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর আমদানী বস্ত্রের উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া লইলেন। তখন এখানে রাজনৈতিক চেতনা কতকটা দেখা দিতেছিল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা নিখিল ভারতের প্রতিভূ স্বরূপ ১৮৭৯ সনের ২৭শে মার্চ কলিকাতায় একটি জনসভা আহ্বান করিলেন। সভায় ভারত সরকার কর্তৃক ভারতের স্বার্থহানিকর এই নীতির প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই পক্ষপাতমূলক নির্দেশ প্রত্যাহার করার নিমিত্তও সভা সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু ভারত সরকারের ঐ নীতি রদ হইল না।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ক্রমে রাজনীতির চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। কারণ তাঁহারা বুঝিলেন যে, শাসনে অধিকার প্রতিষ্ঠা না হইলে স্বদেশের উন্নতি বা স্বার্থমূলক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কিন্তু 'স্বদেশী' চর্চা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অষ্টম দশকে রাষ্ট্রীয় নেতারা এই দিকে তেমন অবহিত হন নাই। এই সময় ভূতত্ত্ব-বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মী প্রমথনাথ বসু এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া স্বদেশবাসীকে শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে অবহিত করাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। স্বদেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগে শিল্প উৎপাদনার্থ কলকারখানা স্থাপনে এবং ইহার উপযোগী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষালাভে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে ১৮৮৩-৮৪ সনে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত

কলেজসমূহে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান অনুশীলন এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতাও বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হয়। ১৮৭৬-৭৮ সনে এ উদ্দেশ্যে কিছিৎ আলোচনা ও আন্দোলনও চলে হইয়াছিল কিন্তু তাহা তখন কার্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। বোম্বাই নগরীতে কিন্তু নির্মিত একটি বিজ্ঞানালয় 'ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন' নামে ঐ প্রতিষ্ঠিত হয়। জামসেদজী নাসারবানজী টাটা নামে ঐ অঞ্চলে কাপড়ের কলও প্রতিষ্ঠা

এ নির্মিত বাংলাদেশেও যাহাতে কার্যতি চেষ্টা শুরু হয় তাহার একটি আভা হইল সনে। এই বৎসর কলিকাতায় ভারতবর্ষের নূতো প্রথম শিল্প-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। ইহার সভাপতিরূপে প্রমথনাথ বসু স্বদেশবাসীদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠন, তত্ত্বকৌশল নূতন সংগ্রহ এবং এই শিল্পে যে-সব বিজ্ঞানী কারিগর হয়োজন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন। এই প্রথম শিল্প সম্মেলন হইতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন বা সভা গঠিত হয়। এ সভা ২৮ বৎসরকাল নূতন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা দেশবাসীদের মধ্যে শিল্পজ্ঞান প্রচারকল্পে যত্নবান হইয়াছিলেন। সভার পক্ষে বিশেষ বিশেষ বক্তা স্বদেশের শিল্প সম্পদ এবং শিল্পোন্নয়নের উপায় সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। বৎসরে একবার করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্যের ও কৃষি-শিল্পমূলক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রকার আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে কয়েকটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

শিল্পসভার কার্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় নেতৃবর্গ ১৯০১ সনে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় উহারই অঙ্গরূপে একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই সময় হইতে শিল্পপ্রদর্শনী কংগ্রেসের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০১ সনে অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। কংগ্রেস অধিবেশনান্তে তিনি কলিকাতায় বৌবাজারে 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস' নামে একটি স্বদেশী শিল্পালয় স্থাপন করেন। এই শিল্পালয়টি একটি যৌথ কোম্পানী রূপে ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে ইহার কিছু কাল পূর্বে একটি স্বদেশী ভাণ্ডার খুলেন (ভারতী আশ্বিন ১৩০৭)।

দুঃখ-দৈন্য, দুর্ভিক্ষ-মহামারী যেন আমাদের নিত্যসঙ্গী স্বদেশের আর্থিক দুর্গতি ক্রমে চরমে উঠিতে থাকে কংগ্রেসের শিল্প-প্রদর্শনী এবং স্বদেশীভাণ্ডার স্থাপন ইহা নিরাকরণে মোটেই যথেষ্ট নহে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং এদেশীয় কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত শতাব্দীর শেষ দশকে 'ডন্ ম্যাগাজিন'-এর মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোচনা-গবেষণার দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। ১৯০৩ সনে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই পত্রিকাখানিকে উহার মুখপত্র করিয়া লইলেন এবং দেশীয় কুটীর-শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যমূলক প্রবন্ধ প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। ইহার পূর্বে প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ প্রমথনাথ বসু স্বদেশের শিল্পোন্নয়নে ও যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন ১৯০৩ সনে এই উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া প্রমথনাথ লিখিলেন :

"A movement has been going on for some time past in different parts of India which is known as the Swadeshi (or Patriotic) movement···

"A great central organisation with branches in all important towns having for its object the promotion of the interest of indigenous manufacturers will go a long way

towards at least a partial solution of the complicated problem of industrial improvement. Such a movement will need in its apostles the exercise of even greater energy, greater patriotism, greater self-sacrifice than the National Congress. A properly organised Swadesi movement will demonstrate more forcibly than the National Congress, that the apparently heterogenous peoples of India are capable of uniting for the common good of their country. It will do for struggling industries in India what is done for them by Government in independent countries by bounties and tariffs." ("A Plea for a Patriotic Movement"—*The National Magazine*, May 1905. Cf. *Essays and Letters* by P. N. Bose.)

প্রমথনাথ বলেন, ১৯০৩ সনের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই 'স্বদেশী' আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাকে কার্যকরী করিতে হইলে নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী, স্বদেশপ্রেমিক কর্মী প্রয়োজন। কংগ্রেসের নেতাদের দ্বারা এ কার্যসাধন সম্ভবপর নহে। তিনি বলেন, এ নিমিত্ত একটি কেন্দ্রীয় সভার মাধ্যমে স্বদেশবাসীদের মনে শিল্প-সচেতনতা জাগ্রত করা একান্ত আবশ্যক। এই সচেতনতা জন্মিলে শিল্প সংরক্ষণ করে স্বাধীন দেশের সরকার যাহা যাহা করিয়া থাকেন এদেশে আমরা নিজেরাই তাহা করিতে পারিব। দুই বৎসর পরেই প্রমথনাথ প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সভা স্থাপিত হইল। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে, ১৯০৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন কালে নিখিল-ভারত শিল্প-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রথিতযশা রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতায় ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়। বরোদার মহারাজা এ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বোম্বাইয়ের শিল্পপতি ঠাকুরদাস দামোদরদাস ঠাকরসি। প্রমথনাথ বসু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি সকলকে অবহিত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

কিন্তু যে স্বদেশী প্রেরণা ১৯০৩ সনের পূর্বেই আমাদের মধ্যে দেখা দেয় তাহা ১৯০৫ সনে স্বদেশী তথা 'বয়কট' আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে কতখানি কার্যকরী হইবার উপক্রম হয় সে সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলি। প্রমথনাথ বসু ভূতত্ত্ব বিভাগের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরভঞ্জের 'ভূতত্ত্ববিদ্' পদে নিযুক্ত হন ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে। ইহার দুই মাসের মধ্যেই তিনি ময়ূরভঞ্জের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত গোরুমহিষাদি পাহাড় অঞ্চলের বহু যোজন ব্যাপী বিরাট লৌহখনি আবিষ্কার করিলেন। জামসেদজী টাটা তখন মধ্যপ্রদেশে রাঁচি ও রায়গড় অঞ্চলের লৌহখনি হইতে লৌহ নিষ্কাশন অর্থকরী শিল্প হিসাবে করা যায় কিনা তাহার পরীক্ষা করাইতেছিলেন। টাটা গোরুমহিষাদির বিপুল লৌহখনির কথা প্রমথনাথের পত্র মারফত অবগত হন। তিনি ইহার পরই মারা যান। তবে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার পুত্রগণ ময়ূরভঞ্জের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া বর্তমান টাটা লৌহ ইস্পাত কোম্পানীর পত্তনের সূচনা করেন। এরূপ বিরাট স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠান সমগ্র এশিয়ায় এই প্রথম। এক জন বাঙালীর আবিষ্কারের ফলেই আজ ইহা সম্ভব হইয়াছে।

গত দশকে বাংলাদেশে যে কয়েকটি যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল, দুই একটি বাদে প্রায় সবই অনভিজ্ঞতা হেতু টিকিতে পারে নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সুপরিচালনার গুণে ভারতবর্ষে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প-সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। স্বদেশী শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ

ভারতবর্ষের সমগ্র জাতির অন্তস্তলে তীক্ষ্ণ
ভেদ উপস্থিত করিল। এই প্রসঙ্গে দুই জন ইংরেজ
মনীষীর কথা আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। উঁহাদের
একজন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল,
দ্বিতীয় জন সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর টমাস
হলাণ্ড। তাঁহাদিগের এবং অন্যান্য দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন
ব্যাপারে কাহার লেখনী ধারণ করেন। হলাণ্ড
এডিনবরাতে নূতন করিয়া শুনাইলেন ভারতবর্ষের
অফুরন্ত খনিজ সম্পদের কথা। তাঁহার এই কথাগুলি
এখনও আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

হ্যাভেল বলিয়াছিলেন, ইউনাইটেড কোম্পানীর পক্ষে
ভারতবর্ষে ছইয়া পূর্বদেশে বিভিন্ন

"As far as our mineral researches are concerned, there is unlimited room for profitable enterprise. The country is sufficiently endowed by Nature, not only to meet its requirements, but to take advantage of its central position for competing with others in the Indian Ocean markets, but until we find the chemical, metallurgical and mechanical workshops as attractive to our high-caste students the class-

for law and literature now the cry of Swadeshi, no matter how the spirit it embodies, will remain but an empty word."

হলাণ্ড বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা দ্বারা এই সকল আহরণের জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানাইলেন। দীর্ঘকালের 'স্বদেশী' ভাবনা স্বদেশী আন্দোলনের ভিতরে একটি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে:

—সদ্য প্রকাশিত কয়েকখানা বই—

মানুষ প্রেম

ছিপক্লিফ—মানুষ না শয়তান ক্যাথেরিনের মনে জানা দিয়েছিল এ প্রশ্ন। কে এই মানুষ—যার নিষ্ঠুর লোভের সীমা নেই? শয়তান কি শেষে এলো পৃথিবীতে শুধু ধ্বংস করতে? সব কিছুই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিলে—নিজের প্রেমিকাকেও বাদ দিলে না। অদ্ভুত প্রেমের কাহিনী। তিন শত পৃষ্ঠার বই সুরম্য প্রচ্ছদপট। সুন্দর বাঁধাই।

অনুবাদ—**অশোক গুহ**

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

চালিয়াৎ চন্দর

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

একটি ছোট ছেলে···মুখে তার বড় বড় চালের কথা···

॥ দেড় টাকা ॥

এক যে ছিল পুতুল

এক যে ছিল পুতুল·····রাজা নয়, রাণী নয়—কাঠের পুতুল কিন্তু কাঠের পুতুল হলে কি হবে, সে সে কাঠ নয়। গোটা মানুষ জাতটাই এই কাঠে। সেই কাঠে গড়া মিষ্টুদ কাহিনী। পড়তে পড়তে মনে হবে সে যেন বড় আপনজন। আমাদেরই একজন। ছেলেমেয়েদের জন্যে এই কাহিনী লিখেছেন:

অশোক গুহ ॥ দু'টাকা ॥

চীনা লণ্ঠন

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

• • •

ভারতচন্দ্র রায়ের—**বিদ্যাসুন্দর**

চার টাকা

অশোক গুহের আর কয়েকখানা বই—

সবার সেরা দেশে ॥ আড়াই টাকা ॥

সাদা ঘোড়া দুই টাকা

রূপায়নী বুক শপ

১৩।১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—

ইন্‌সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :

ইন্‌সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস

কলিকাতা—১৩

১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রথম সাড়ে ষোল বৎসরে পাঁচটি সাফল্যপূর্ণ ভ্যালুয়েসনের প্রত্যেকটিতে পলিসিহোল্ডারগণকে বোনাস ও শেয়ারহোল্ডারগণকে লাভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমা জগতে ইহা একটি অভূতপূর্ব কৃতিত্ব।

এন্ সি দত্ত, ব্যারিষ্টার এম. এল্, সি

—চেয়ারম্যান—

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস

দীপক চৌধুরী লিখিত

শঙ্খবিষ

বাঙালীর জীবনে যেবেছে ভগবান বিবর্জিত ঘোরা তমিস্রা—জন্ম উঠেছে শঙ্খবিষের ক্রমসঞ্চয়। আধুনিক মহাবিত্ত বাঙালী জীবনের অন্তরঙ্গল চিত্র এই **শঙ্খবিষ**

ইম্পিরিয়াল সাইজে ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য—৭.০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নতুন গল্প-সংগ্রহ

অসবর্ণা—২৷৷০

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

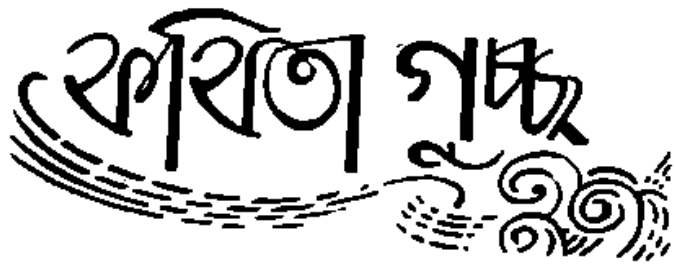

রূপনারায়ণ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রূপনারায়ণ, রূপনারায়ণ
দুলালে আমার মন।
এ পথে আমারে টেনেছে তোমার
নামের আকর্ষণ।
সুন্দর গ্রামগুলি—
আঁকা যেন চিত্রে 'তুলি'.
সারা দিন চলে আলোছায়া আর
জলে জলে আলোপন।

দৃষ্টি পরিধি যত দূর যায়
সকলি শ্যামায়মান,
ঘাটে ঘাটে করে জনগণ ভিড়,
মাঠে মাঠে রোপে ধান।
রূপের নাহিকো ওর,
জুড়ানো নয়ন মোর,
শ্রবণে আমার পশিছে কেবল
তব জল-কলতান।

(৩)

রূপনারায়ণ রূপায়িত হলো
তোমাতে বাঙালী হিয়া.
চঞ্চল তবু স্নেহ মায়া তব
চলিয়াছ বিলাইয়া।
বহিতেছ কত ভার
পার ও দুর্বার,
তোলো নাই পথ, চলিয়াছ তুমি
ভালবাসা নিয়া দিয়া।

(৪)

রেখে গেছ তব স্নেহ ও রৌদ্রে
কবিতা আমার প্রিয়,
নারায়ণ তুমি ভাবগ্রাহী যে
প্রণাম আমার নিয়ো।
মাগি আমি তব পাশ—
ওই তব উচ্ছ্বাস,
তোমার বিশাল কমনীয়তার
একটু আমাকে দিয়ো

মাস্তুল সজাগ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বিন্দুবিন্দু বৃষ্টি দিয়ে সন্ধ্যার স্বপনগুলি গড়েছি।
ধূসর রাত্রির বুকে জানি তারা অবলুপ্ত হবে।
কালপুরুষের এক নির্নিমেষ ইশারায় মিশে
দিগন্তের পরপারে লীন হবে প্রত্যুষসঙ্গমে।

তবু স্বপ্ন গ'ড়ে যাব সমুজ্জ্বল প্রাণের উল্লাসে।
বৃষ্টি দিয়ে আর নয়, তার চেয়ে কঠিন কিছুতে,
মনের আকাশে নয়, পৃথিবীর সবল অস্থিতে
এমন স্বপন গড়ব, হারাবেনা ছুঁতে নাই ছুঁতে।

সেখানে সমাপ্তি নয়। সে স্বপ্নকে সত্য ক'রে তো
দারুণ দাহিক দেবো, যত কিছু ভগ্ন অংশ ভাগ
সেও তো আমারই কৃত্য; উন্মথিত দুঃখ বেদনার
আঁধার সিন্ধুর বুকে আমার এ মাস্তুল সজাগ।

দুটি হাসি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

উজ্জ্বল তোমার হাসি, দুর্লভ উপমা।
তবুও অনন্তা শোনো, আরেক প্রদীপে
দেখেছি আমার মুখ নিরুপম জ্যোতির সমীপে।

•

পাড়ার গলির মুখে বসে থাকে নেয়ামৎ বুড়ো
বারোমাস ছিন্নবাস, জীবনকে তবু সে করে ক্ষমা—
আমি যাকে এক পয়সা দিতে গিয়ে ভাবি
সে আমায় দিতে পারে কুবেরের ভাণ্ডারের চাবি,
শোকশুভ্র মুখে তার কী-অপার করুণার হাসি
মোমের মতন জ্বলে সারাবেলা পরম নিগূঢ়
সমাহিত উল্লাসে উদাসী।

বলাই বাহুল্য তার ভিক্ষার ঝুলিটি
সদাই বাড়ন্ত থাকে।
দিনান্তে কে তবে লিখে রাখে
মলিন ললাটে ওর বরাভয় দেবতার চিঠি!
নেয়ামৎ বুড়ো তাই যখন যা পায়
সন্ধ্যার আজানে তার ত্রিভুবন আনন্দে কাঁপায়॥

দুপুরে

অনিমেষ সেন

সূর্যকর অবিরাম ঝরে পৃথিবীতে সোনার মতন।
দূর মাঠে দুপুর হাওয়ার স্বর
কেঁদেকে কাঁদিয়াছে
সুদূর প্রান্তর।

এখানে রাশির শেষে সোনার রেখায়
সমুদ্রের পাল তোলা নাও চুপচাপ
পড়ে থাকে অজানা মায়ায়।
উতল চিলের চোখে
দুপুরের সব মধু খুঁজে নেয় নিরালা আলয়।

রোদের ছায়া
ভেঙে যায়
পাইনের বনে।
বিকেল বটাক্ষ কপসীরা উড়ে যেতে যেতে
স্বপ্ন-দুতি ফেলে নেয় নেহ তটে—
একমুঠো ঘুম আনে
ঘুম আর মায়া
নীলাঞ্জন চোখের পাতায়।

কাছে এস

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আরো কাছে এস জীবনের আরো কাছে
ফুলের মতন ফুটে থাকো তুমি আমার জীবন মাঝে,
ভোরের আলোর মতন ভরাও মন
সোনা রোদে দিক চিক মিক করে জীবনেরে অনুক্ষণ।

রাত্রির এলোকেশে
নয়নের যত স্বপ্নের মায়া ঝরে যদি যায় শেষে,
জোনাকিরা আলো জেলে দিক জেলে দিক
তোমার আমার হৃদয় আজিকে দুজনাকে চিনে নিক।
মান অভিমান অনেক করেছি খেলেছি অনেক খেলা
রাত্রি নেমেছে জীবনের তটে মিছে বয়ে যায় বেলা,
এস কাছে এস থেকো নাকো দূরে, দূর আকাশের মত
এত কাছে তুমি তবু এতদূর জীবন বেদনাহত।

পলাশ ফুলের কত না ফুলের ঝরে যাওয়া ভীরু দল
ভ্রমরের সাথে মিছে করে গেছে ছল,
দুহাত বাড়ায়ে যতবার হায় টেনে নিতে গেছে কাছে
ঝরে ঝরে গেছে ভ্রমরের বুকে সে ব্যথার সুর বাজে।
স্বপ্নের তারা ঝরে যদি যায় রাত্রির-ক্রন্দনে
ঝরে যদি যায় জীবনের আশা, তবুও আমার মনে
তোমারই স্বপ্নে চারিদিক আজো উজ্জ্বল কেন বল,
সুবর্ণা মেয়ে সময় যে নাই রাত্রি যে শেষ হল।

নেতাজীর আকাঙ্ক্ষা—

"৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে অবস্থিত কেমিক্যাল এসোসিয়েশন-এর তৈরী "কাজল কালি" আমি ব্যবহার করেছি। বড়ই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই কালি ফাউন্টেন পেনের সম্পূর্ণ উপযোগী। যতদিন ইহা ব্যবহার করেছি কোন কষ্ট বা অসুবিধা বোধ করিনি। 'কাজল কালি' প্রস্তুত-কারকদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। আশা করি ভারতবর্ষের জনগণ এই কালি ব্যবহার করে এই জাতীয়-শিল্পটির শ্রীবর্ধন করবেন।"

Subhas Chandra Bose

অঙ্গুলীনা

স্নেহাকর ভট্টাচার্য।

একটি হৃদয় ভেঙে হৃদয়ের চারিদিকে ছড়ালো কখন।
একটি প্রাচীন মুখ বিকেলের ছায়া হয়ে ঘিরে আছে মন।

পৃথিবীর আলোর গভীরে, মায়া-নীল
শুভ্রতায় সহসা উন্মীল
দমকা হাওয়ার চড়া গমকে গমকে
চোখের পলকে
আকাশে রক্তিম রঙ ছড়ালো, এমন
স্মরণের সোধূলিতে একমুঠো অনেক মরণ।
রাতের অসীমে, দূরে
অপরূপ অমর্ত্যের সুরে
একটি অমর তনু অঙ্গুলীন থেকে
আমাকেই ডেকে
কী এক আশ্চর্য দাবি
মেটাতে চেয়েছে আজ, সেই কথা ভাবি।
ঘুলায় ধূসর সিঁড়ি বেয়ে
কবেকার কোন উদাসীনতার মূল্যের কঠিন পণ নিয়ে
সমস্ত বেদনা আজ গুচ্ছ বেঁধে ফিরে দিতে চাও
নিজেকে ছড়াও—
সূক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্মতর হয়ে
মায়াবী রোদের সমারোহে।
জীবনের জ্যোতির্ময় আয়ের তারায়
মুহূর্তের যে গান হারায়
তাদের উজ্জ্বল তীর কতকাল পরে
শূন্যতার বহ রোদে ঝড়ে
অনেক অযুত বর্ষে সময়ের জটাজাল ছিঁড়ে
বুকের নির্জনে ফিরে
হলো সৈব বিদ্যুতের পাখি—
কোথায় লুকোবে মুখ, বেদনার ঘায়ে
আহত দুহাতে মুখ ঢাকি॥

বেগময় অন্ধকার 'মেলে'
ইস্পাতী কামরায় যেন চলন্ত রোদের ছায়া ফেলে
স্থির নিয়মের টানে
দিনগুলি দ্রুতায় ছুটে চলে কোথায় কে জানে!
অচেনা আলোর স্রোতে ভেসে যাওয়া—দিনান্তের পারে—
অন্যতায় মগ্ন-হয়ে-থাকা মন কেন বারে বারে
মগ্ন করো উদাসীন প্রবল মুঠিতে।
সীমাহীন পরম খুশিতে
দুরন্ত নৃত্যের ছন্দে দ্রুত পদপাতে
চরম মুহূর্তে দীপ্ত চকিত মুদ্রাতে
কোটাও ফোটাও শুধু, মনোবেতী, আকাশ-অপ্সরী:
আমার রক্তের নীড়ে ঘরে ঘরে যন্ত্রণার অরূপ মঞ্জরী!
পলাশে প্রদীপ্ত পক্ষ-প্রদীপের শিখা
চেনা সে স্পর্শের যেন আর এক প্রতীক,
সে আলোয় তরলিত রহস্যের অলোক ইশারা
টেনেছে, বিমুগ্ধ মন হারিয়েছে আর সব দিক।
কত যে যন্ত্রণা জানো এক থেকে অন্য কিছু হওয়া—
শরীরে ফাগুন জাগে নিরন্তর নিবিড় আগুনে,
সবুজের শঙ্খচূড় তোলে ক্ষিপ্র ফণা
সম্মোহের মদি জেগে, অপরূপ কারুকাজ বুনে।
কখনো জানি নি তার চোখের দুকৌটা ছিল জলে
ছিল এত জ্বালা—এত জ্বালা
অস্তাচলে সূর্যের মত গেঁথে নিয়ে যাবে
আমার এ দিন আর রাত্রির মালা!
এবার আমাকে দাও মুক্তি দাও তবে,
নতুবা সংহত করো যন্ত্রণার অপার বিস্ময়
সর্বনাশের সেই পটভূমিকায়
উদ্ভাসিত হতে পারে সত্তা পরিচয়।

দিনের কাজের শেষে
অনেক ট্রামের ভিড় দ্রুততায় একই স্রোতে মেশে,
ক্লান্ত পায়ে ঘাস-ফুল ওড়া পথে একা একা হাঁটি
জীবনের মাটি
ভিজে যায় নীরব চোখের নীল জলে;
হয়ত কখনো বোলে
অবিস্মরণীয়
আনন্দের শ্বেত উত্তরীয়—
শিরায় শিরায় জ্বালা কখন জুড়িন হয় ওরে!
স্নায়ুর সহস্র দল কেঁপে ওঠে থরো থরো অন্তিম চূড়া
আজকে তোমার সাথে প্রত্যহের পথে যদি
মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়

আশ্বিনের পথাতিবাহন

শ্রীঅনিল কুমার রায়

কুরুবকবন বনমাউ তাল লোপাটি বকুল,
জল থৈ থৈ ধানের দুপুর, সাদা কাশফুল।
সবুজ স্বপ্নে আশাবরী গানে তিতির মুখর,
চাওয়ার নূপুর, কলনর্মর।

তীক্ষ্ণ নির্জন ছিঁড়ে মাঝে মাঝে সোয়েলের শিস্
ঘাসফুল ছুঁয়ে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে ছড়িয়ে।
কতো ফিস্‌ফিস্
গানে কানে কথা···তিতির বাবুই···ছিপ্পিছিপ্পি দিন
কহলো পাতার সবুজ সুজনী ঢাকা। উড্ডীন
প্রজাপতি। আর ধূ-ধূ পথ। দূরে নীলিম আকাশ
পথে রেখা টেনে দূরে উড়ে যায় ভিজে বালিহাঁস।

ইলুঘাসবন···রেলের লাইন···ছোট ছোট গ্রাম
মটরের ক্ষেত আহা সে পথের ঢেউ ভাঙলাম।
পলাশে রংয়ের আগুন। (হয়তো মনেও আমার
তোমাকে চাওয়ার নিশিগন্ধার কথার সেতার)

ভালবাসা আর ভালো-লাগা নিয়ে বনফুল ছুঁই
ডালিম-লালিম সন্ধ্যার বুঁই
ছুঁয়াতে জমাই। কেতকী কেয়ার ছন্দ নিলীন,
গৈরিক দিন! গৈরিক দিন!!

মনের ময়ূর,—
শুধু একমুঠি ঝরা শেফালির শ্রাবণের সুর
রূপকথা রোদে আকাশে ঝরায়,
মেঘের স্বরোদে তার-ই মূর্ছনা কেঁপে কেঁপে যায়।

মৌ-গুনগুন্ সুরেলা প্রহর পেরিয়ে এলেম,
দিলে না কিছুই আশা ভালবাসা দেহাতীত প্রেম।
আশমানী আশা ফিরোজা চোখের,
তুমি, তোমাকেই মনে মনে আহা চেয়েছি যে ফের।
পথের সিঁড়িকে ভাঙি আর ভাবি ভাবনা ছড়াই
আমি একা আর তুমি একা আহা একা দুজনাই।
সোনারঙ মেঘ কে জানে কোথায়,
রোদ্দুরে জলে, ছায়ার জাজিমে দূরে সরে যায়।

আশাবরী

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

মোহাচ্ছন্ন আমার ক্লান্তি সায়াহ্নের নম্রতম মেঘ :
বিকেলের ক্লান্ত চোখে শান্তি গলে সুষমার মোমে,
কান্তি ঢলে লাবণ্যিতে, কথা পায় শুদ্ধ স্রোতাবেগ
প্রাণের, গানের মন্ত্রে - জেগে-ওঠা সুরভির ছোঁয়ে।

বাথার কাহন বাজে পার্বণে পার্বণে সোকালয়ে—
কাঠি পড়ে ক্ষয়-ঢাকে ; দুঃখে, ভয়ে, নিয়মিত লয়ে
মনের শিশুর কান্না খান্ খান্ প্রান্তরের কোলে,
দিশাহারা সব নদী একে একে জনপথ ভোলে—
পাথরে শুকায়,
দু'হাতে লুকায়
মুখের তারুণ্যে যদি ফুটে ওঠে জীবনের ভাষা,
নিবিড় নেতির নিদ্রা মুছিয়েছে সব তার আশা।

মুখর যৌবন নিয়ে কতদিন ডেকে গেছি দ্বারে,
জীবনের রুক্ষমাঠে, কাঁসি-কাঠে, মিছিলের মুক্ত অভিসারে,
গঙ্গা-সাগরে, ঘরে, পাঁচালিতে, মেয়েদের তীব্র হাহাকারে
তাকে তো পাইনি খুঁজে যে আমাকে রাখী বেঁধে দেবে—
আমার ব্যাকুল হাত নম্রতাপে বুকে টেনে নেবে।

আমার গ্লানির জ্বালা তবু এই মেঘ দূর দেয়,
মুহূর্তে ঈশ্বর হ'য়ে এ-হৃদয়ে কত বর ঢালে।
প্রাণের ক্ষেতের কানে চুপিচুপি কী কথা যে বলে—
ধানের শীষের সোনা এ-মেঘের মায়া টেনে নেয়।

জল দেবে, জল দেবে—বলেছে সে,
প্রাণের বিশীর্ণ বিলে যৌবনের দীপ্ত স্রোতাভাস
আরক্ত পদ্মের কলি ফোটাবে যে তাকে ভালোবেসে,
প্রাণেরই প্রদীপ হবে এ কুসুম ; নহবৎ হবে সে আকাশ।
বুদ্ধির বিপন্ন পদ্মে ঘুণ ধ'রে গেলে
হৃদয়ের উপকূলে বিকেলের শান্ত-মেঘ জল ঢেলে যাবে।

বন্ধ্যার ব্যথা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

বঞ্জরি, তোর খোকাকে আজ নিয়ে
সারাটাদিন লাগ্‌ল বড় ভালো,
জড়িয়ে আমার হাত দু'খানি দিয়ে
আঁধার বুকে আন্‌ল কিসের আলো!
ছোট্ট মুখের ছোট্ট হাসিটুকু,
কোন্ পুলকে পূর্ণ করে বুক,
কোমল দেহের মধুর পরশসুখ
আজ্‌কে আমার জীবন জুড়ালো!

সেদিন দেখি, মুখুয্যেদের নীলা
ছোট্ট কাঁথার নাম লিখেছে "মিনি"
ছোট্ট মোজা বুন্‌ছে চারুশীলা,
ছোট্ট জুতোর ফুল তুলেছে বিনি,
তাদের খোকা দুষ্টু না-কি বড়ো,
পুতুল ভেঙে করবে ঘরে জড়ো,
মায়ের কাছে খা'বে দু'চার চড়ও,
দস্তিপনা কর্‌বে সারাদিনই!

পরশুদিনে ন'য়ের বাড়ী গিয়ে
খোপার সাথে ঝগড়া শুনি বসি,'
ছেলের ক'টা ছোট্ট কাপড় নিয়ে
হারিয়ে বুঝি ফেলেছে রামশনী!
আমিই শেষে খোকার কাপড়গুলি
আপন হাতে মিলিয়ে নিলাম তুলি,'
কাট্‌ল বেলা আপন গৃহ ভুলি,'
লাগ্‌ল ভাল দামের কষাকষি!

স্নানের ঘাটে সোপান বেয়ে বেয়ে
আস্‌ছে উঠে ছোট্ট পায়ের ছাপ,
জল্‌কে এসে দাঁড়িয়ে থাকি চেয়ে,
পাই যে বুকে দশমরুর তাপ!
কোন্ দেবতা অদৃষ্ট রেখা আঁকি'
কোন্ অবহার চিহ্ন গেছে রাখি,'
সন্ধানে তা'র ফির্‌ছে পোড়া আঁখি,
বুকের ভিতর কাঁদ্‌ছে অভিশাপ!

সেবার দেখি দাঁড়িয়ে দ্বারের পাশে
পয়লা-বোষের চার বছরের "তিনে,"
একটা শুধু পয়সা পাবার আশে
আমার কাছেই আসে রঙের দিনে,
ছোট্ট মুঠায় পয়সা দিলাম ভরে'
জিজ্ঞাসিলাম হাতদু'টী তা'র ধরে'—
"আমার কাছে আসিস্ এমন করে,'
নতুন পুতুল অনেক কোর কিনে।"

পূজার সময় পড়্‌ল ঢাকে কাঠি,
ছুট্‌বে পাড়ায় "নোটন," "বিনু," "বাণী,"
ছোট্ট পায়ের শব্দে কাঁপে মাটি,
হাস্তে ভরে শরৎ আকাশখানি!
নবারতে ওদের কলরবে
শীতের হাওয়া নিত্য মুখর হ'বে,
'পিঠের' দিনের আনন্দ-উৎসবে
ওরাই ধরায় স্বর্গ দেবে আনি'!

আলোক-হারা রুদ্ধ প্রাণের স্রোতে
কোন্ কামনার গোপন কমল ভাসে!
শুষ্ক মরুর বক্ষে কোথা হ'তে
দূর বনানীর ফুলের হাওয়া আসে!
কোন্ চকোরীর অন্ধ আঁখির কোণে
চাঁদের আলো ব্যথার স্বপন বোনে,
কোন্ চাতকীর পিয়াস-পাগল মনে
মেঘের আশা বিফল হ'য়ে যায়

একটি তারা

প্রভাকর মাঝি

একটি সোনালী তারা নীল নভে জ্বল্‌জ্বল করে
একটি ছন্দ ছুঁড়ে কবিতার নব জন্ম হয়।
টুকরো আলোক পেয়ে ফিকে হোল রাতের কুয়াসা—
হাজার তারার ভিড়ে ও-যেন স্বতন্ত্র অতিশয়।

আজিও অতীত হোতে সেই তারা উঠে আর ডুবে,
অনেক বেদার ফুলে বেজেছিল মরমিয়া বাঁশী,
অনেক পাহাড় মাঠে ডেকে ডেকে যায় চুপিসারে—
চোখে মুখে ফোটায় সে অপরূপ মোনালিসা-হাসি।

তারা জ্বলে। ফুল ফুটে। রাত বাড়ে—থমথমে রাত,
টুপটাপ টুপটাপ ঘাসে ঘাসে ঝরিছে শিশির।
আচমকা ভুলে যাই পৃথিবীতে রুটির লড়াই—
একটি তারার মাঝে চাপা পড়ে গ্লানি পৃথিবীর।

আজকে হঠাৎ দেখি নভবড়ে খাটিয়ার পরে,
তোমার চোখের কোণে ঐ তারা জ্বল্ জ্বল্ করে।

সবুজ জল

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শূন্য মাঠ ভরিয়ে তুমি অনেক জল ঢালো,
আমার মনে আশার আলো জ্বালো।
ঢাওয়াহ-কাঁপা ধানের শীষে আঁচল বিছিয়ে
আকাশে তুমি কি ছবি আঁকো,
বনকে ঘুরে মুগ্ধ রাখো;—
আমাকে তুমি ভোলাবে আজ এখন কী দিয়ে!
আশার পদধ্বনি শুনে হৃদয় ধরো ধরো
এখন কাঁপে, আবির্ভাবে আছ তুমি ভরো।

যেখান গেয়ে বৈঠা ঠেলে ভরা গাঙের নেয়ে,
আমাকে তুমি সে-গান দাও সে-গান দাও মেয়ে।
আমার মনে সবুজ আলো জ্বালো,
শূন্য মাঠে সবুজ জল ঢালো।
ঢালো—শিশির কণায় নয়,
সাগর-ভরা এ-নক্ষত্রময়—
ভরিয়ে দুটি কাজল চোখে আনো আশার আলো,
মনের মাঠে গানের সুরে সবুজ জল ঢালো।

আলো নয়গো জোনাক মেয়ে, তারার নীল ফুল—
আশ্বিনের কনক চাঁপা আলোয় ভরা ফুল।
ফুলের মালা আর গেঁথোনা—
আমাকে ভুলে আর থেকোনা,
আকাশে নীল জানালা মেয়ে ছড়াও মেঘ-চুল,
শূন্য মাঠ ভরিয়ে আনো ধানের শীষে ফুল।
আলেয়া নয়, আশার আলো জ্বালো,
দগ্ধমাঠ বুকে আমার সবুজ জল ঢালো।

শ্রাবণ নয়, ফাল্গুন নয়, স্নিগ্ধ চোখে হেসে
মেঘের বুকে বিজলী জেলে আসবে মরুদেশে।
এ-নয় ব্রহ্ম পদ্মাবতী, ময়নামতীর চর
যেখানে বাঁধে চখাচখী রাতের মায়াঘর।
মায়া নয় গো, প্রেমের পদধ্বনি শুনে এ বুক ধরো
ধরো

এখন কাঁপে, আবির্ভাবে হৃদয় ভরো ভরো।
যে-গান গেয়ে বৈঠা ঠেলে ভরা গাঙের নেয়ে
আমাকে তুমি সে গান দাও সে গান দাও মেয়ে।

দগ্ধ মাঠ বুকে আমার সবুজ জল ঢালো,
আলেয়া নয়, আমার মনে আশার আলো জ্বালো।

দীপান্বিতা

শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

কা'রা আমায় ডাকছে
মাউবনের একটানা বাঁশির শব্দে,
বন-শালিকের কাকলি-কণ্ঠে,—
ছোট্ট শিশির-বিন্দুর চঞ্চল চোখের মিনতি
আমায় ডাকছে।
তবু আমার যাবার তাড়া নেই। তবু
জানলার গরাদে হৃদয়টাকে বেঁধে রেখেছি,
এলোমেলো চোখদুটো শুধু
আকাশে-বাতাসে সাঁতার কাটে
বেকার চিলের মত।

তারপর তুমি এলে নিঃশব্দে
বহুপ্রতীক্ষিত বিস্ময়ের মত,
রোরুদ্যমান শিশুর মুখে মাতৃস্তন্যের মত।
সীমন্তের সঙ্কীর্ণ পথে
এঁকে আনলে আমার পরিক্রমণের ইঙ্গিত,
সর্ব অবয়বে মাখিয়ে আনলে আমার তৃষ্ণার তৃপ্তি,
আর দুখানি হাতে
আমার জীবনের কল্যাণ। তুমি এলে।

এইবার তুমি আমায় বিদায় দাও,
আমি যাই—
আকাঙ্খার ঘোড়ায় চেপে আলিঙ্গনের জয়যাত্রায়;
ওরা যে আমায় ডাকছে!

দু'চোখে তরল বেদনাটুকু নিয়ে
তুমি এসো
গ্রামান্তের শেষ শিশুগাছটা অবধি,
যেখান থেকে আমার ঘোড়া ছুটবে
উড়িয়ে ধুলো। সে-ধুলো যেন চোখে না লাগে মোর।

ওইখানে
নিষ্ঠার প্রদীপ জেলে
ধৈর্যের অকম্প শিখাটি ধ'রে রেখো সঙ্গোপনে।

ওই মাঠ দিয়েই ধুলো উড়িয়ে
আবার ফিরে আসবো,
তোমার জন্যে
নিয়ে আসবো রক্তকরবীর কবরী মাল্য।

তবে যদি মধ্যপথে
সংগ্রামের ষড়যন্ত্রে সহসা স্খলিত হয়ে পড়ি
শ্যেনদৃষ্টি শিকারীর অব্যর্থ সন্ধানে, আমি—
আমি হবো অবলুপ্ত। তবু
এম্পক্ষীরাজ আসবেই ফিরে,—
ললাটে তার শ্বেতচন্দনে লেখা থাকবে
আমাদের বিশ্ববিজয়ের সংবাদ,
মানুষের মূর্যজ্ঞান।
...তোমার প্রদীপে সেদিন বিশ্বে দীপান্বিতা!

প্রশ্ন

প্রীতিময়ী কর ভারতী

তিমির পথের পান্থের তোমার
কি চাহে হে মুসাফির!
ধন সম্পদ? অথবা অস্ত্রবল?
অভিনন্দন? কি প্রীতিভাষণ?
অথবা কি সুনিবিড়
বেদনায় ভরা দু'ফোঁটা চোখের জল?

মাটি

বাণী রায়

একটি উৎসবক্ষেত্রে যেমন মঞ্চে উপবিষ্টা একটি বিশিষ্টা মহিলাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। মুখখানি যেন আমার বিশেষ পরিচিত। আমার পরিচিত মুখের অধিকারিণী যেন আকারে বৃহৎ ও প্রকারে ভিন্ন রূপে এখানে বিরাজ করছেন।

কিন্তু, এ সেই পুরণো ছকের গল্প নয় একজনকে একভাবে চিনতাম, সে পরে অন্য রূপে দেখা দিল। কারণ আমার পরিচিতার সঙ্গে বিগত কালই আমার কার্যব্যপদেশে দেখা হয়েছিল। সুতরাং ভ্রান্তি-বিলাসের অবকাশ নেই।

সেই পরিচিত মুখখানিকে যে আমার এইরূপে দেখবার সাধ ছিল অবচেতন মনে! এমনি ডিমের আকারের মুখের কপোল স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে লাল আপেলের মত। চুলে-চোখে কালো রং রাত্রির কালিমা পেয়েছে গাঢ়-নিবিড় করে। রং-এ বিদ্যুতের দীপ্তি খেলছে। রাঙা ঠোঁটে প্রবালের বাসা। তাতে সুখের হাসি।

মঞ্চে উপবিষ্টা মহিলা পরিধান করেছেন বাসিগোলাপ রং পাতলা সিল্কন্। চওড়া বেনারসি পাড় বসানো। হাতে, গলায়, কানে, আঙুলে হীরা-পান্নার নিষ্ঠুর —দীপ্তি।

কিন্তু, কি করে হ'বে? সেই মুখের অধিকারিণী স্বাস্থ্যে, আনন্দে, প্রাচুর্যে এমন রূপ যদিও বা কখনো, কদাচিৎ লাভ করতেন, এমন বেশ তো কখনই দেখতাম না তাঁর অঙ্গে। কর্কশ-শাদা খদ্দর-পরা; অঙ্গের সরু পাড়টুকু খদ্দরের সাদা জামার পাশে যা একটু সামান্য রং ছিটিয়েছে। আর কোথাও রং নেই।

আস্তে ছোঁটে এলেন সভায় পুরণো কালো চটী-পরা পায়ে, হাতে কালো সস্তা ছাতা, শান্তিনিকেতনের বাতিল ক্যাসানের হাতব্যাগ। আস্তে মঞ্চে উঠলেন। যাদুকরের দণ্ডের ইঙ্গিতে যেন মঞ্চের মহারাণীর অঙ্গে অঙ্গে খদ্দর-ধারিণী মিলিয়ে গেলেন। পুরণো চটী ভেলভেটে রূপায়িত হ'ল, ব্যাগ রূপোর জালি-কাটা থলে হ'ল। সিণ্ডেরেলার কাহিনী আবার।

তবে, আমার সিণ্ডেরেলা রাজরাণী হ'লেও রাজবেশ ধারণ করবেননা, আমি জানি। যদিও মনে মনে আমার ভালবাসা তাঁকে এমন রূপ দিতে ভালবাসে, তিনি এমন সাজ গ্রহণ করবেন না।

খদ্দরধারিণীর মুখ আবার যেন মায়াবীদণ্ডের ছোঁয়ায় মঞ্চের মহারাণীর মুখে ভেসে উঠল। বহু কৃচ্ছ্রসাধনে ক্লিষ্ট-মুখ, সংযমের শাসনে কঠিন। চোখ যুগান্তব্যাপী সংগ্রামের অবসানে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে: সংগ্রাম যেন তাঁর প্রাণশক্তি নিঃশেষিত করে শুকনো খোলার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাঁকে পথের ধারে। পথিক হয়তো ফিরেও দেখেনা।

আমি চাই, ওই ললাট থেকে চিন্তার রেখা চলে যাক, আমি চাই ওই মুখ আনন্দে ঝলমল্ করে উঠুক। সারা জীবন যিনি নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, জীবন তাঁকে ঐশ্বর্য এনে দিক।

বলেছিলাম একদিন, "কেন, এখন সংসারী হোন না?" আমার দিকে বিরক্তি ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি এক কথায় আমার আশার মূলদেশ উৎপাটিত করে দিলেন, "পাগল!"

ভাবলাম, জীবনে ত্যাগে যিনি অভ্যস্ত, ভোগ আর তাঁর গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

মঞ্চে যিনি বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে খদ্দরধারিণীর সাদৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর। শুনলাম, কোথাকার রাণী উনি। এখানে পারিতোষিক বিতরণে এসেছেন। আমার প্রস্তাবের পাত্রী খদ্দরধারিণীর স্নেহাস্পদা মঞ্চদাংকাঙ্ক্ষিণীরূপে তাহ'লে কি আমার অবচেতন মন এমনি রূপই দেখতে চায় তাঁর!

খদ্দরধারিণী ওই মঞ্চবিহারিণীর স্থানে বসতে পারেন। বহু মঞ্চে জীবনে বসেছেন তিনি—উচ্চতর মঞ্চে। অধিকতর গরিমার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। মঞ্চই তাঁর আসন ছিল।

মাটি সত্যই মাটি। এই মাটিকে ভালবাসে মানুষ! এই মাটির জন্য হৃদয়ের রক্ত দেয়। তবু তো মাটিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। মাটি ধূলো কাদার পুঞ্জীভূত আবর্জনা মাত্র থাকে।

দেশকে ভালবেসেছিলেন খদ্দরধারিণী।

উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন সারা জীবন। সেই নিষ্ঠুরতার অসচেতন চাঞ্চল্য তাঁকে মঞ্চচ্যুতা করেছে।

মাটি তার সমস্ত ঐশ্বর্য, সম্পদ উজাড় করে দিয়েছে এই মহারাণীকে। মাটির রাজত্ব তাঁর প্রাচুর্যের উৎস। আজ মাটির স্থূলসম্পত্তির তিনি রাণী। মাটি ভুলে গেছে, কে কবে তার উদ্দেশে জীবনের সমস্ত রক্তরাগ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে নিরাভরণ শুভ্রতা আশ্রয় করল। মাটির তাকে দিয়ে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ত্রিবর্ণ পতাকা উড়েছে। সে পতাকার আসন এখন ওই প্রাসাদচূড়া। স্বাধীন দেশের পুরস্কার আসে মহারাণীদের হাত দিয়ে—দেশসেবিকা সেখানে মঞ্চে বসেন না। নির্বিকার মাটি। সে কৃতজ্ঞতা জানেনা। মাটি কখনও না হ'তে পারেনা।

ব্রাউনিং-এর কবিতার ক্ষীণ সুর উৎসব-সভাকে আচ্ছন্ন করে আমার কানের কাছে করুণগুঞ্জনে বলে গেল :—'দেশপ্রেমিককে একবছর আগে আমার চলার রাস্তা গোলাপে ছেয়ে দিয়েছিল দেশবাসী। স্বর্ণ চাইলেও তারা আমাকে দেবার চেষ্টা করতো। আর আজ? বৃষ্টির নীচে রক্তাক্ত আমি চলেছি বধ্যভূমিতে, আজ শোভাযাত্রা দেশসেবকের পুরাতন কাহিনী এই।

পড়বার মত কয়েকখানা বই

জন বোয়ারের প্রসিদ্ধ উপন্যাস—এ পিলগ্রিমেজ
অনুবাদক—শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২.০

॥ এই উপন্যাসের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় এই যে মানুষের জীবন জটিলতম গ্রন্থির সমষ্টিমাত্র। পাপ কর্মই হোক, আর পুণ্য কর্মই হোক কোনটাই মানুষের ইচ্ছাধীন ক্রিয়া নয়। এই উপন্যাসের অধঃপতিতা নায়িকা রেগিনার প্রতি লেখক তাঁর দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই বইটিতে জনৈকা অধঃপতিতা নারীর মর্মস্পর্শী সকরুণ চিত্র ফুটে উঠেছে ॥

* * *

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়
রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী সিরিজ :

১। **মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত**

২। **রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা**

[প্রতি খণ্ড এক টাকা মাত্র।]

আর, এল. ষ্টিভেনসনের রহস্যময় রোমাঞ্চকর সচিত্র বই

ডক্টর জেকীল এণ্ড মিষ্টার হাইড্
অনুবাদক—শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়— ১॥০

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত—

॥ সিনেমা পর্দায় এই বইটির রূপ পেয়েছে "সাদা কালো" নাম নিয়ে ॥

* * *

॥ ছাত্রমহলে অতি সুপরিচিত

Prof. **M. Sen's**

INTER BENGALI DIGEST Rs. 3/-

॥ প্রতিবছর এই বইটি থেকে প্রশ্ন আসে এটাই বিশেষত্ব ॥

শ্রী ভা র তী পা ব্ লি শা র্স

৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রসারমুখী রাজনীতি

নগেন দত্ত

ইউরোপীয় ইতিহাস যখন পুরাতন পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া নূতন পথে আবর্তিত হইতেছিল, তখনও নূতন পৃথিবীর জাতিগুলির ইউরোপীয় সমাজের প্রতি কোন কৌতূহল ছিল না বলিলেই হয়, বরং আত্মরক্ষার তাগিদে তাহারা সঙ্কোচশীল হইয়া পড়িয়াছিল। পুরাতন পৃথিবীতে যে-সব ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার ঢেউ নূতন পৃথিবীতে আসিয়া লাগিয়াছে। পুরাতন পৃথিবীর যত দ্বন্দ্ব কলহ তাহাও নূতন পৃথিবীতে আশ্রয় লইয়াছে। ফলে আমেরিকা ইউরোপকে অনেকটা বৈর ভাব লইয়া দেখিতে শিখিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে উভয় মহাদেশের এই বৈরিতা কালে কালে এক প্রতিদ্বন্দ্বীতার রূপ পরিগ্রহ করে। একদিন ইউরোপীয় জাতির অধিরাজ্য প্রসারমুখীনতা প্রতিরোধ করিতে গিয়া মার্কিন জাতি এক ভুলমার্গগামী 'নিরপেক্ষ'-নীতি সৃষ্টি করিল কিন্তু তাহাও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসারমুখী।

বস্তুত পক্ষে এই সন্দেহ ও বৈরিতা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অনুসরণ না করিয়া কূটনীতিতে আশ্রয় লইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনরো যে নীতি ঘোষণা করিলেন, তাহা ঐ জাতীয় মনোভাবের একটি বাহ্য লক্ষণ মাত্র। এই মনরো নীতিকে অনেকে 'নিরপেক্ষ' নীতির একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন। কিন্তু আসলে ইহা 'নিরপেক্ষ' নীতি নহে, এবং ইহা মার্কিনী সম্প্রসারণ নীতির ভূমিকা মাত্র। গত একশত বছর ধরিয়া মার্কিন জাতি এই নীতিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে নাই এমন কোন রাজনৈতিক ঘটনা গত একশ বছরের মধ্যে মার্কিন দেশে কমই ঘটিয়াছে। অর্থাৎ যখনই কোন জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তখনই মার্কিন জাতি মনরো নীতির মধ্যে তাহার সমাধান খুঁজিয়াছে। আর প্রকৃত পক্ষে সমাধানও পাইয়াছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইবে, মনরোনীতি মার্কিন জাতির প্রসারশীল মনের ও তাহার পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তিমূল হিসাবে কাজ করিয়াছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনরো যখন ঐ নীতি ঘোষণা করেন তখনও মার্কিন রাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তেমন শঙ্কাবিহীন ছিল না। কেননা, ফরাসী, স্পেন, ব্রিটেন তখনও উপনিবেশের মারফৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আমেরিকা মহাদেশে বিস্তার করিতেছিল। এই প্রভাবের বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তখন মার্কিনরা ভারি উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তখনকার রাজনৈতিক জগৎ—বিশেষ করিয়া মার্কিন রাজনৈতিক জগৎ—সাধারণ-তন্ত্রের আদর্শবাদে পরিপুষ্ট ছিল, ইউরোপে তখন রাজতন্ত্র ও রাজকীয় উত্তরাধিকারবাদ বেশ প্রবল। অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়া—সবাই এই রাজতন্ত্রের সমর্থক। এখানে যে 'উত্তরাধিকারবাদ' কথাটি প্রয়োগ করা হইল তাহার অর্থ এই: নেপোলিয়ানের রাজ্য জয়ের পূর্বে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহারই বংশাবলী পুনরায় রাজ্যাধিকার পাইবেন—তাহা জনসাধারণ সমর্থন করুক চাই না-ই করুক।

রাজক্ষমতা পূত, ইহা অমলিন, অক্ষয় ও অব্যয়। এই 'পবিত্র' দায়িত্বের এক নয়া দর্শন তখন ইউরোপের শাসক শ্রেণীর মনে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় জনসাধারণ ইহা মানিয়া লয় নাই। এদিকে Holy Alliance 'পবিত্র আঁতাত' রাজতন্ত্রের ঘোর পক্ষপাতী, অন্যদিকে ব্রিটিশ (ঠিক সম্পূর্ণ নহে) ও মার্কিনরা

সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী। মার্কিনরা অবশ্য নিজ স্বার্থেই সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাড়া ইউরোপীয় আদর্শবাদের ঢেউ এদেশেও পৌঁছিয়াছিল। আজ যেমন পূর্ব ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের লড়াই চলিতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে অনুরূপ লড়াই—রাজতন্ত্র বনাম সাধারণতন্ত্রে চলিয়াছিল। দেশের সাধারণ মানুষ এই রাজনৈতিক আদর্শবাদের ঘূর্ণিতে পড়িয়া কতকটা বিভ্রান্ত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, পূর্বেই বলিয়াছি মার্কিন রাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তেমন নিরঙ্কুশ ছিলনা। তাই স্পেনের নিকট হইতে ফ্লোরিডা হস্তগত করিবার পর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি একটু স্তম্ভি বোধ করিতেছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনরা ফ্লোরিডার অধিকার পায় কিন্তু তখনও পুরোপুরি স্পেনীয় উপনিবেশের অবসান শান্ত নহে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় উপনিবেশ বিজয়ী হইবার অব্যবহিত পরই তাহাদের স্বাধীনতা মার্কিনরা স্বীকার করিয়া লয়। বস্তুত পক্ষে এই সুযোগটির জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা করিতেছিল। এই সমস্ত উপনিবেশ যদি রাজতন্ত্রের বাইরে নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিতে পারে তবে মার্কিন রাষ্ট্রের আর উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই।

সাধারণতন্ত্রবাদের নূতন নেশা তৎকালে সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ক্যানিং নিজে সাধারণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ ঘটনাচক্রে তিনিই মনরো নীতির বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। কূটনীতিতে এইরূপ হয় —বাঘেও অনেক সময় ধান খায়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব অনেকটা দায়ে পড়িয়াই এই কার্য করিয়াছিলেন। এখানে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা ইউরোপীয় কূটনীতির একটি ভগ্নাংশ লইয়া আলোচনা করিতেছি। নেপোলিয়ন ইউরোপে যে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে চালু করিয়াছিলেন—তাহা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ব্রিটিশ বাণিজ্য সেই যে মার খাইল তাহা সামলাইয়া লইতে বহু সময় গিয়াছে। ব্রিটিশ বণিকেরা ইউরোপ হইতে মার খাইয়া সোজা আমেরিকা মহাদেশের দিকে ছুটিল। আজ যেমন মার্কিন জাহাজ ব্রিটিশ জাহাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সর্বত্র চলাফেরা করিতেছে—তৎকালে তেমন ছিল না। ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্য আমেরিকা মহাদেশে ঝাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এই স্বার্থ ব্রিটিশ কূটনীতি সহসা বিসর্জন দিতে রাজী নহে। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক কারণও ছিল, বিদ্রোহী স্পেনীয় উপনিবেশের নেতৃত্ব যেন আনা পাছে মার্কিনদের হাতে চলিয়া যায়। এইসব বিভিন্ন কারণে রাজতন্ত্রী ক্যানিং সাধারণতন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করিলেন। কাজেই বাঘে-মহিষে একই স্বার্থের ঘাটে জল খাইল। অবশ্য ক্যানিংএর মার্কিনদের সাথে রাজনৈতিক গলিতে এই রূপ ভাবে দেনাপাওনা করিয়া বসায় রাজা ৪র্থ জর্জের রাজরক্ত চন্দনে চর্চিত করিয়া উঠিয়াছিল। তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। কেননা, ব্রিটিশ বণিক শ্রেণী তখন রীতিমত ক্ষমতার লাটিম খেলিতে শুরু করিয়াছে। ব্রিটিশ বণিক শ্রেণীর তাগিদ পাইয়া ক্যানিং স্পেনীয় উপনিবেশের রাজনৈতিক স্বাধীন সত্তা মানিয়া লইলেন। এদিকে মার্কিনরা স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া দল বাঁধিয়া ব্যবসা করিতে লাগিয়া গেল। ব্রিটিশ বণিকের ইহা কাম্য নহে। অথচ ইহার বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করিবার নাই। মার্কিনদের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ সুযোগ বলিতে হইবে, কেননা নৌ-বাণিজ্যে ব্রিটিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা এড়াইয়া এই বাণিজ্য লাভ তথা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার—ইহা সহসা বড় একটা ঘটেনা।

মার্কিন মনরো নীতির মূল উপাদান ইহাতে মিলিবে। ব্রিটিশ বণিকের বাণিজ্যস্বার্থ আর মার্কিন বণিকের নিকটতম বাজারের স্বার্থ উভয় মিলিয়া সাজাত হইল বটে, কিন্তু আদর্শবাদকে কেহই ছাড়িল না। বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, তাহারা স্পেনীয় উপনিবেশের রাজনৈতিক স্বাধীন সত্তা

লইয়াছে যদি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম শর্ত বলা হয় তবে তাহা স্পেনীয় উপনিবেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বস্তুর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অব্যবহিত ফল হিসাবে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার চেতনা সৃষ্টি, এবং এই চেতনা অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি অতি প্রবল হয় এবং সে যদি তাহার অর্থনৈতিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয় তবে নবলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ অর্থের ন্যায় বোধ হইবে। কেননা, সে অর্থ-নৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুভূতি কিরূপ তাহা উপলব্ধি করিবে স্পেনীয় উপনিবেশের এমন ছিল যে স্বাধীনভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাইতে পারে। ইতিহাসের গতি অবশ্যই সর্পিল বলিতে হইবে। কেননা, আজ মার্কিন কূটনীতি একদিকে একটি জাতি চীনের রাজনৈতিক সত্তা মানিয়া বিরোধ করিতেছে। কারণ ইহা বৈপ্লবিক পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু স্পেনীয় উপনিবেশের মার্কিন কূটনীতি এমন কথা ভাবে নাই। স্পেনীয় উপনিবেশ বিদ্রোহ করিয়াই রাজনৈতিক অর্জন করিয়াছিল। বরং রাজতন্ত্রের তরফদার চতুর্থ জর্জ স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা মানিয়া লইতে দ্বিধা করিতেছিলেন। ইহা অবশ্য তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর। তখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্র প্রগতিশীল ছিল। আজ রাজনৈতিক চিন্তার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে—সাধারণতন্ত্রবাদের সেই ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক সত্তা নাই।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার জার একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য হইল আলাস্কা দেশে এক রুশজাতির লোক ছাড়া আর কাহারো মৎস্য শিকার, বাণিজ্য ও নৌচলাচলে অধিকার থাকিবে না। প্রকাশ থাকে যে, আলাস্কা একদিন রাশিয়ার অধীনে ছিল। মার্কিনরা পরে এই দেশ কিনিয়া লইয়াছে। এই ঘটনা ক্রয়-বাণিজ্যের পূর্বের। জারের এই ঘোষণা মার্কিন রাষ্ট্র সচিব এ্যাডমস্ খুশী মনে গ্রহণ করেন নাই।

তখন রুশ রাজ্যের সীমানা এবং মার্কিন রাজ্যের সীমানা পাশাপাশি চলিতেছিল। কাজেই জারের প্রতি নবীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বাভাবিক। এবং মার্কিন রাষ্ট্রসচিব এ্যাডামস্-এর এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুরোমাত্রায় ছিল। রাষ্ট্রপতি মনরো অবশ্য ততটা অবিশ্বাসী ছিলেন না। না থাকিলে কি হইবে—মনরোনীতি তো রাষ্ট্রপতি মনরোর রচিত নহে, উহা আসলে রাষ্ট্রসচিব এ্যাডমস্-এর রচিত। কাজেই যখন একটি বিশেষ 'নিরপেক্ষ' নীতি পূর্ণাবয়ব-ধারণ করিতেছে তখন রুশ ঘোষণাও একটু ইন্ধন যোগাইল বই কি। এবং বর্তমান রুশ মার্কিন পারস্পরিক সন্দেহ অতীত ইতিহাসের প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। রাষ্ট্রপতি মনরোর মনে যাহাই থাকুক না কেন, এ্যাডামস্ একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কেন না রাষ্ট্রসচিব টের পাইয়াছিলেন যে, কলম্বিয়াতে রুশ প্রতিনিধি প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই প্রভাবকে বিদূরিত করিতে মার্কিনরা ব্যতিব্যস্ত, তারপর আর এক প্রভাব! ইহা দানা বাঁধিতে দেওয়া সম্ভব নয়। মোদ্দাকথা, আমেরিকা মহাদেশে রুশ-রাজনৈতিক কার্য-ক্রম মার্কিনদের দৃষ্টিতে প্রীতিপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

অন্য রাষ্ট্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও নিজের শক্তি বিস্তার করা মার্কিনী সম্প্রসারণ নীতির প্রথম রূপ ছিল—তাই রাষ্ট্রপতি মনরো পূর্ব গোলার্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হুমকি দিয়াছিলেন।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচক বলেন—Another factor which has tended to draw a line of cleavage between the United States and Latin America is that the United States is by far the strongest power in the Western Hemisphere, both in an economic

and military or naval sense, and has unfortunately pursued an imperialistic policy toward its Latin American neighbors" এই মন্তব্য অবশ্য পরবর্তী যুগের নীতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তবু ইহা মনে রাখা উচিত যে ইহার ভিত্তি পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। একদিন যে পররাষ্ট্র-নীতি শুধু মাত্র রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া প্রগতিশীল বলিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, অল্পকালের মধ্যেই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হারাইয়া গৌণ হইয়া পড়িল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এক নূতন নীতি ঘোষণা করিলেন। এই বাহ্যত মনে হইল যেন মনরো নীতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করিতেছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা নহে ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল মনরো নীতিকে কেন্দ্র-বিন্দু ধরিয়া যতদূর সম্ভব প্রভাবের পরিধি বাড়াইয়া যাওয়া। আমেরিকা মহাদেশে একটি নব্য রাজনৈতিক পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে আমেরিকা মহাদেশের কোন রাষ্ট্রই যাহাতে আর ফিরিয়া যায়; অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র হয় স্বাধীন থাকিবে নয়ত-বা মার্কিন প্রভাবকে স্বীকার করিবে। এই পোল্ক নীতি মূলত মেক্সিকোর অভ্যন্তরীণ বিরোধকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হয়।

কেননা, তখন মেক্সিকোর অভ্যন্তরে ইউক্যাটান প্রদেশে আমেরিকা-ভারতীয়দের বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের কোন কার্যকরী পরিণতি হয় নাই বটে, তাহা হইলেও বিদ্রোহীরা হয়ত কোন ইউরোপীয় শক্তিকে মানিয়া লইতে রাজী ছিল। রাষ্ট্রপতি পোল্ক এই আশার মূলে চাট দিয়া এক নীতি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল এক ঘোষণায় বলেন, ...according to our established policy, we could not concent to a transfer of this 'dominion and soveringty' to..... Europeam power." সাদা কথায় এইরূপ দাঁড়ায় যে, আমাদের গৃহীত নীতি অনুসারে আমরা কোন ইউরোপীয় শক্তিকে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মতি দিতে পারিনা। মনরো নীতির পর পোল্কের এই ঘোষণা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, মার্কিন প্রসারমুখীনতার প্রথম উপলব্ধি বলিতে হইবে। এই জাতীয় নীতি বিশ্লেষণ করিলে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে: ছোট-খাট রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সর্তাধীনে সঙ্কীর্ণ থাকিবে। অন্যথায় ক্ষুদ্র-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অতি বৃহতের ইচ্ছাধীনে রক্ষাবদ্ধ থাকিবে। বস্তুত পক্ষে রাষ্ট্রনীতিতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সম্বন্ধ চিরদিন এইভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তবুও কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে অনেক সময় কোন রাষ্ট্রের মনকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে: ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে টেক্সাস্ এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউ মেক্সিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সান্নিধ্যে আসিয়া নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা ইহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এই রাজনৈতিক আদান-প্রদানের মাঝে কার কতটা অংশ তাহার চুলচেরা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাতে মার্কিন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রসারমুখীনতার পরিচয় মেলে।

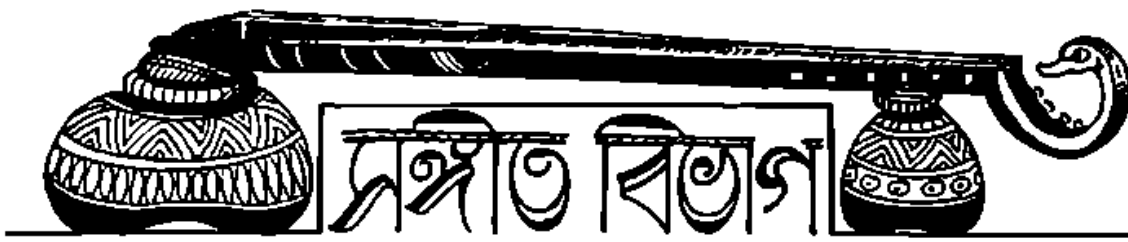

সঙ্গীতের অবদান+

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা অথবা বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা কিংবা দেবীপুরাণোক্ত দুর্গাপূজার পূজার দিনে দেবীর স্নান কার্য শেষে। এই স্নান কথিত মন্ত্রতন্ত্রাদি সহকারে দেবীকে মণ্ডপে আনয়ন করত এই কলস জলের দ্বারায় স্নান করাইতে হয়। দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীকে নানাপ্রকার দুর্গা সম্বন্ধের সম্বন্ধে বাদ্যাদির দ্বারায় একটি বিরহতালী বা আসরে বাদিয়া তদুপরি দর্পণ স্থাপনপূর্বক স্নান কার্য সর্বপ্রকার স্থানীয় সামগ্রীর একত্রীকরণের জলধারায় স্নান বৈদিক মন্ত্রতন্ত্রাদির কক্ষযন্ত্রবেদি ১।১; সানবের কক্ষ-পাঠে কর্তব্য। গঙ্গাজলে, বৃষ্টিজলে, সরস্বতীনদীজলে, সমুদ্রজলে, পদ্মরেণুযুক্তজলে, নির্ঝরোদকে, সর্বতীর্থজলে এবং চন্দনবাসিতজলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্নান করণীয়। এই স্নান নানা রাগ-রাগিণীর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

গঙ্গাজলপূরিতঘট দ্বারায়—মালবরাগ—বিজয়বাদ্যসহ,
বৃষ্টিজলপূরিতঘট দ্বারায়—ললিতরাগ—বিজয়বাদ্যসহ,
সরস্বতীজলপূরিতঘট দ্বারায়—বিভাসরাগ—দুন্দুভিবাদ্যসহ,
সাগরোদকপূরিতঘট দ্বারায়—ভৈরবীরাগ—বিজয়বাদ্যসহ,
পদ্মরজোমিশ্রিতজলপূরিতঘট দ্বারায়—কেদাররাগে—ইন্দ্রাভিষেকবাদ্যসহ,
নির্ঝরোদকপূরিতঘট দ্বারায়—বরাড়ীরাগ—শঙ্খবাদ্যসহ,
সর্বতীর্থোদকপূরিতঘট দ্বারায়—বসন্তরাগ—পঞ্চমশব্দ-বাদ্যসহ,
শীতলজলপূরিতঘট দ্বারায়—ধানসীরাগ—বিজয়বাদ্যসহ
(পুরোহিত-দর্পণ, দ্বাবিংশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃঃ ৭৬৩, ৭৬৪-৬৭, ৭৬৬-৭৮৭, ৮০৩-৮০৪)।

মতান্তরে—

গঙ্গাজল-ঘট দ্বারায়—রামকিরিরাগ—ত্রিভুবনবিজয়-বাদ্যসহ,
বৃষ্টিজল-ঘট দ্বারায়—মেঘরাগ—ইন্দ্রাভিষেকবাদ্যসহ,
তীর্থজল-ঘট দ্বারায়—দেশালরাগ—রাজ্যাভিষেকবাদ্যসহ,—
সাগরজল-ঘট দ্বারায়—ধানুশীরাগ—মধুকরবিজয়বাদ্যসহ,
সুগন্ধিজল-ঘট দ্বারায়—বসন্তরাগ—বীরমর্দনবাদ্যসহ,
নির্ঝরজল-ঘট দ্বারায়—গৌরীরাগ—পঞ্চশীলবাদ্যসহ,
নানাতীর্থজল-ঘট দ্বারায়—গুর্জ্জরীরাগ—সংগ্রামবিজয়-বাদ্যসহ,
ফলোদক-ঘট দ্বারায়—শ্রীরাগ—ত্রিভুবনবিজয়বাদ্যসহ

নির্বাহ হয়

(দুর্গোৎসবপদ্ধতি: বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্তা দামবেদীয়া যজুর্বেদীয়া চ। সিদ্ধান্তভূষণ-ব্যাকরণ-কাব্য-স্মৃতিতীর্থোপাধিকেন শ্রীহরেন্দ্রনাথঠাকুরচক্রবর্ত্তিনা সম্পাদিতা। বরিশাল। দ্বিতীয় সংস্করণম্। ১৩৩৫। তালপত্রে মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ। পত্রাণি ২৯-২৬)।

রাগ।

মালব রাগ—সম্পূরণ। ষ ঁ ম ঁ ধ ঁ। মতান্তরে ষ ঁ ম ঁ।
ললিত রাগ—সম্পূরণ। অথবা খাড়ব (প-বর্জিত)। ষ ঁ ধ ঁ।

মতান্তরে সম্পূর্ণ গ ঁ। রা—৩০ দণ্ডের সময়ে গেয়।

বিভাস রাগ—ওড়ব (ন-নি-বর্জ্জিত), কিন্তু দ্রষ্টব্য বচৎ। মতান্তরে খাড়ব (ম-বর্জ্জিত)। দিবা ৯-১০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

ভৈরবী রাগ—সম্পূরণ। গ ঁ গ ঁ ধ ঁ নি ঁ। দিবা ১-৪ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

কেদার রাগ—সম্পূরণ। মতান্তরে ম ঁ ম ঁ। রাত্রি ১-৪ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। অথবা রাত্রি ২১ ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

খরাড়ী, খেরাড়ী রাগ—খাড়ব (প-বর্জ্জিত) গ ঁ ধ ঁ। মতান্তরে সম্পূরণ। গ ঁ ম ঁ ধ ঁ।

বসন্ত রাগ—খাড়ব (প—বর্জ্জিত)। গ ঁ ম পঞ্চম। সম্পূরণ। গ ঁ ম ঁ। মতান্তরে গ ঁ।

মানসী রাগ—সম্পূরণ। গ ঁ ম ঁ ধ ঁ। দিবা ২৪—২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

† অবদান—অব (শুদ্ধি অর্থে, পূজার্থে—দা (দান করা) † অন (ভাববাচ্যে); অবদানং কর্ম্মশুদ্ধং—অভিধান-চিন্তামণৌ মর্ত্ত্যকাণ্ডে একাদশ পর্য্যায়ঃ; অবদানং কর্ম্মবৃত্তং—অমরকোষে সঙ্কীর্ণ-বর্গে ৩। সোৎকর্ষং চরিতং বৃত্তং শুদ্ধিশ্চ শুদ্ধরূপমভিপ্রেতং কর্ম্ম অবদানং, দৈপ শোধনে, দুটু—শাম্বিকসিংহরমুনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা অমরকোষ-টীকায়াম্। পূজা বা অর্চ্চনার্থ দান oblation, দান gift, সম্পাদিত কর্ম্ম, কীর্ত্তি—"দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস, প্রাচীন অবদানের ইতিহাস, এখনও রচিত হয় নাই"—"প্রবাসী," ১৩২৭, ১. ৬. "শিক্ষার ধীত।" পালি সাহিত্যে "অবদান" কথার প্রয়োগ খুব দেখা যায়—যেমন, কাশ্মীরীমহাকবিক্ষেমেন্দ্রকৃত "বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা", "অবদান-কল্পলতা," "জীমূতবাহনাবদান" ("বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা" গ্রন্থের অষ্টোত্তর শততম পল্লব), প্রকৃতি, প্রকৃতি।

•"নব্যভারত," ফাল্গুন, ১৩০৪, পৃঃ ৪৯১; "মন্দিরা" ভাদ্র, ১৩৮১, পৃঃ ৩১৩, ৩১৪, "রাগ বসন্ত।"

রাগ।

মতান্তরে—রামকিরি, রামকেলি রাগ—সম্পূরণ। গ ঁ ধ ঁ। মতান্তরে রে ঁ গ ঁ নি নি ঁ। দিবা ১—৪ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

মেঘ রাগ—খাড়ব (গ-বর্জ্জিত)। নি ঁ। মতান্তরে খাড়ব (ধ-বর্জ্জিত) ও নি (শুদ্ধ)। মতান্তরে খাড়ব (নি-বর্জ্জিত) ও গ কোমল। রাত্রি ১৬—২০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

দেবসাখ, দেশাল রাগ—সম্পূরণ। গ ঁ নি ঁ। মতান্তরে গ ঁ। দিবা ১৭-২০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

ধনশ্রী, ধানুসী রাগ—সম্পূরণ। গ ঁ ম ঁ ধ ঁ। দিবা ২৪—২৮ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

মল্লার রাগ—সম্পূরণ।

গৌরী রাগ—সম্পূরণ। গ ঁ ম ঁ ধ ঁ।

গুর্জ্জরী রাগ—ওড়ব (প-বর্জ্জিত)।

দিবা ১১—১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

শ্রীরাগ—সম্পূরণ। গ ঁ ম ঁ ধ ঁ।

বিজয়বাদ্য—জয়ঢাক।

দুন্দুভি—ঢাক, নাগরা—"ভেরী তুরী বাজে ভাল কাংস্য বাদ্য করতাল পটহ দুন্দুভি বাজে ঝীঁঝে"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

শঙ্খ—রণবাদ্য-যন্ত্র বিশেষ। যেমন, পাঞ্চজন্য—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ; অনন্ত-বিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ; পৌণ্ড্র—ভীমের শঙ্খ; দেবদত্ত—অর্জ্জুনের শঙ্খ; সুঘোষ—নকুলের শঙ্খ; মণিপুষ্পক—সহদেবের শঙ্খ।

গীতা ১।১৫—১৬।

পঞ্চম—গানের ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ সপ্তস্বরের পঞ্চম স্বর। কোকিলকণ্ঠ তুল্য স্বর—"পঞ্চমেতে গায় পিক নাচে অলিগণ"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী। প্রাচীন মতে ছয় রাগের তৃতীয় রাগ।

মন্দাকিনীর জলের দ্বারায় রাজ্যাভিষেকের স্নানও সুপ্রাচীন [illegible] ন ব্যতিরেকে অভিষেক ক্রিয়া হয় না। † অভিষেককালীন গীতাদি করণের প্রথা রামায়ণ, মহাভারতেও দেখা যায়। বৈদিক যুগের গান উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত তিন স্বর ভেদে গীত হইত। ষড়বেদাঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষা-গ্রন্থে বিশেষ * পাণিনীয়-শিক্ষা, নারদীয়-শিক্ষা, যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা গ্রন্থে উহার বিধান পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডল সোম স্তুতিতে ভরপুর! সোম আহরণে এবং অভিষবণে সঙ্গীত হইত! সমগ্র সামবেদ সোম যাগানুষ্ঠানে গীত হইত। সামগান উদাত্তাদি স্বরে গীত হইত। গান্ধর্ববিদ্যার প্রচলন অর্বাচীন কালের। ভরত মুনি গান্ধর্ববিদ্যার প্রচলন সম্ভবতঃ করেন। বৈদিক সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী ছিল না বলিয়া মনে হয়! অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত গান্ধর্ববিদ্যার প্রচলনে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট ভরত মুনি হইয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। গান্ধর্ববিদ্যা "পঞ্চম বেদ" নামে অভিহিত হইতে কোথাও কোথাও শুনা যায়!

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি মাঘ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন ‡ তাঁহার রচিত "শিশুপাল বধ" সংস্কৃত ভাষার এক মহাকাব্য। অর্থগৌরবে, পদলালিত্যে, বিষয়সম্ভারে মহাকবির এই কাব্য শীর্ষস্থানীয়! মাঘের সঙ্গীত-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি "শিশুপাল বধের" প্রথম সর্গের দশম শ্লোকে সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন অতি অপূর্ব ভাবে! সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল! সঙ্গীত-শাস্ত্রের কূট বিষয়ের অবতারণা অতীব দক্ষতার সহিতই ঐ গাথাতে লিপিবদ্ধ। সঙ্গীতানোদীদের অভিরুচির জন্য নিম্নে সন্নিবদ্ধ করা হইল। পাঠক-পাঠিকা বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন মাঘ কবির প্রজ্ঞাপারমিতায়! গাথাটি এই :

"রণদ্ভিরাঘট্টনয়া নভস্বতঃ
পৃথগ্‌বিভিন্নশ্রুতিমণ্ডলৈঃ স্বরৈঃ।
স্ফুটীভবদ্‌গ্রামবিশেষমূর্চ্ছনা-
মবেক্ষমাণং মহতীং মুহুর্মুহুঃ॥"

বায়ুরাঘাতে স্বকীয় বীণা মহতীতে বিভিন্ন স্বর প্রাদুর্ভূত হইতেছিল, উহাদের শ্রুতিমণ্ডল পৃথক্ প্রকাশিত হইতেছিল, তৎ প্রভাবে গ্রামবিশেষের মূর্চ্ছনা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছিল—মুনি তাহাই বারংবার অবলোকন করিতেছিলেন! দৃশ্যটি দেবর্ষি নারদের বাসুদেবের আবাসে যাওয়ার পথে হয়। কবি কল্পনার অপূর্ব সমাবেশ! পাঠক-পাঠিকাবর্গের কৌতূহল হইতে পারে, তন্নিমিত্ত টীকাকারের বিবৃতিও প্রদত্ত হইল। বিষয়টি বোধগম্য করার জন্য লেখক প্রয়াসী! টীকাকার বল্লভদেব (আবির্ভাবকাল খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ, কাশ্মীরী গ্রন্থকার—"সন্দেহবিষৌষধি" নামে টীকার) বলেন— * * * * অত্র তু বৈদগ্ধ্যাখ্যাপনায়। তত্র শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ স্বরাঃ ষড়্‌জর্ষভগান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাঃ সপ্ত। ষড়্‌জমধ্যমৌ দ্বৌ গ্রামৌ গান্ধারশ্চ। অত্র তু স্বরূপং স্ববর্ণাদেব জ্ঞাতুং শক্যং তৎস্থত্বাৎ। "উত্তরমন্দ্রা রজনী তৃতীয়া তূর্ত্তরায়তা। চতুর্থী শুদ্ধষড়্‌জা তু পঞ্চমী মৎসরীকৃতা॥ অশ্বক্রান্তা তু ষষ্ঠী স্যাৎ সপ্তমী চাভিরুদ্গতা। স্বরক্রমগতা বিদ্যাৎ সপ্তৈতাঃ ষড়্‌জ-মূর্চ্ছনাঃ॥

† "ভারতী", অগ্রহায়ণ, ১৩০৯, পৃঃ ৭৪৫, ৭৪৬—৭৪৭, ১৩১০, ১ম, "ঐন্দ্র মহাভিষেক।"

On the Siksas vide F. Kielhorn, Ind. Ant, 5, 1876; On the Paniniya Siksa vide A. Weber, Ind. Stud. 4; A collection of Siksas—Benares Sanskrit Series, Benares, 1893; TS. VI, 1; VII, 5; TB. III, 9; Aps. Gr. Su. VI, 14, 4, etc., etc.

‡ প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য সিদ্ধর্ষি মাঘের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ইহা দ্বারা মাঘকে ৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের লোক বলিয়া অনুমিত হয়। জার্মান্ পণ্ডিত জ্যাকোবির মতে ইনি বিখ্যাত কবি ভারবির ('কিরাতার্জুনীয়' মহাকাব্য প্রণেতার) পূর্ববর্তী।

সৌবীরা মধ্যমগ্রামে হরিণাশ্বা তথৈব চ। স্যাৎ কালেঃ-পরতা চৈব চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা॥ মার্গী চ পৌরবী চৈব হ্যষ্টকা চ যথাক্রমম্। সর্বাস্ত পঞ্চ ষট্ সপ্তসাধারণকৃতাঃ স্মৃতাঃ॥" শ্রুতীনাং স্বরং বিভাগঃ—"ষড়্জেন গৃহীতো যঃ ষড়্জো গ্রামধ্বনির্ভবেৎ। ততশ্চোর্ধ্বং তৃতীয়ঃ স্যাদৃষভস্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ততো দ্বিতীয়ো গান্ধারশ্চতুর্থো মধ্যমস্ততঃ। পঞ্চমাৎ পঞ্চমবত্বৎবৎ তৃতীয়ো দৈবতস্ততঃ॥ নিষাদতো দ্বিতীয়স্তু ততঃ ষড়্জশ্চতুর্থকঃ। পঞ্চমো মধ্যমে গ্রামে মধ্যমাস্তৃতীয়কঃ॥ এবং ধ্বনিবিশেষাদ্বৈঃ সর্বান্ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতান্। ব্যবস্থিতাস্বরান্বেত্তি স বেত্তি স্বর-মণ্ডলম্॥" • কোলাচলমল্লিনাথসূরিকৃত (খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী, অন্ধ্রবাসী, মাদ্রাজ, সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার) "সর্বস্বম্" টীকায় উদ্ধৃত—"শ্রুত্যারব্ধমনুরণনং স্বরঃ" ইতি লক্ষণাৎ। তদুক্তং রত্নাকরে—

"শ্রুত্যনন্তরভাবী যঃ স্নিগ্ধোঽনুরণনাত্মকঃ।
স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতুশ্চিত্তং স স্বর উচ্যতে॥"

স্বর—tone. ষড়্জাদয়ঃ সপ্তলক্ষণাঃ—

"শ্রুতিতাঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ।
পঞ্চমো দৈবতশ্চাথ নিষাদ ইতি সপ্ত তে॥"

স্বর—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, দৈবত এবং নিষাদ এই সপ্ত স্বর বা সুর। ইঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, মহাদেব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য—"সপ্তস্বর তিন গ্রাম মূর্ছনা একুশ নাম শ্রুতিকলা সতত সঙ্গিনী"—অন্নদামঙ্গল † "শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভকাবয়বঃ শব্দ-বিশেষঃ।" তদুক্তং—

"প্রথমশ্রবণাচ্ছব্দঃ শ্রূয়তে হ্রস্বমাত্রকঃ।
সা শ্রুতিঃ সম্পরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়বলক্ষণা॥"

শ্রুতিসংখ্যানিয়মশ্চ দর্শিতঃ—

"চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ।
দ্বিত্রিনিষাদগান্ধারৌ ত্রিদ্বির্ঋষভ-দৈবতৌ॥"

শ্রুতি—সঙ্গীতের এক স্বর হইতে স্বরান্তর প্রকাশ কালে উভয়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সুরাংশ সকল শ্রুত হয়, তাহাই শ্রুতি। শ্রুতি—২২টি। সা—৪; তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী। ঋ—৩; দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা। গ—২; রৌদ্রী, ক্রোধা। ম—৪; সন্দীপনী, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী। প—৪; ক্ষিতী, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপী। ধ—৩; মদন্তী, রোহিণী, রম্যা। নি—২; উগ্রা, ক্ষোভিণী।‡

শ্রুতি—a particular note being starter and a part of the whole sound. 22 kinds of শ্রুতি or নাদ—of which a particular number only is contained in or exhibited by a particular স্বর (tone).

"ষড়্জাদ্যপরনামকানাং স্বরসঙ্ঘাতভেদানাং ত্রয়াণাং" (গ্রামবিশেষাণাং) গ্রাম লক্ষণম্—

"যথা কুটুম্বিনঃ সর্বেঽপ্যেকীভূতা ভবন্তি হি।
তথা স্বরাণাং সাম্যেহো গ্রামমিত্যভিধীয়তে॥
ষড়্জগ্রামো ভবেদাদৌ মধ্যমগ্রাম এব চ।
গান্ধারগ্রাম ইত্যেতদ্ গ্রামত্রয়মুদাহৃতম্॥"

তথা—"নব্যাবর্তোঽথ জীমূতঃ সুভদ্রো গ্রামকাস্তরঃ।
ষড়্জমধ্যমগান্ধারস্ত্রয়াণাং জন্মহেতবঃ॥"

গ্রাম—সঙ্গীতে মূর্ছনা এবং তানের পদ্ধা। ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার—এই তিন গ্রাম বা তিন স্বরশ্রেণী। গ্রাম—gamut, i.e. the whole musical scale.

মূর্ছনা—regulated rise and fall. তল্লক্ষণম্—

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
সা মূর্ছেত্যুচ্যতে গ্রামদ্বা এতাঃ সপ্ত সপ্ত চ॥"

গ্রামত্রয়েঽপি প্রত্যেকং সপ্ত সপ্ত মূর্ছনা ইত্যেক-বিংশতিঃ মূর্ছনা ভবন্তি।

• Edited by Ram Chandra Kak & Harbhatta Shastri, Srinagar, Kashmir, 1935, pp. 7-8. From the Original manuscript in His Highness' Private Library, No. 241. Section 13. Of birch-bark. Old and decayed. Written in Sarada Script.

† "নব্যভারত," জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪, পৃঃ ৯৪, ৫. ম. "এবার নামকরণ" ও দ্রষ্টব্য।

‡ সঙ্গীত-রত্নাকরে ১।৩।৩৭।৩৯; নামান্তর সঙ্গীত-ভাষ্যে

মূর্চ্ছনা—সঙ্গীতের সপ্তস্বরের আরোহণ বা অবরোহণের ক্রম ; কণ্ঠের কম্পনজনিত স্বর বিস্তার। সংখ্যা—২১টি। ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, মধ্যমধ্যা, ষড়্জমধ্যা, পঞ্চমী, উৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবতী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেচরা, চরা, সরাবতী, বিশালা—সঙ্গীত-রত্নাকরে। সঙ্গীত-দর্পণে ১।৫৭-৭০ ; ১।২২-২৮ ; সঙ্গীত-পারিজাতে ১।৩৫-৩৭ ; সঙ্গীত-মহোদধি ১।১৬-৫২ ; নারদ-সংহিতা ২।৪২-৬১।

বাদিত্র—তারযন্ত্র।

"বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী।
মহতী নারদস্য স্যাৎ সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী
—ইতি বৈজয়ন্তী।

বিশ্বাবসুর তারযন্ত্রের নাম বৃহতী, তুম্বুরুর কলাবতী, নারদের মহতী, সরস্বতীর কচ্ছপী।

সভাই, মার্গ সঙ্গীতের সমঝ্‌দার (*Connoisseur*—from Fr. *Connoitre*—*L. cognoscere* to know ; one who knows a subject well ; a critical judge in art, musics, &c.) ছিলেন ; টীকাকারেরাও ছিলেন কৃপাস্ত্রীরুতিঃ সঙ্গীতকলায় !

পাঠানসম্রাট্ আলাউদ্দীন্ খল্‌জী (Alauddin Khalji) র (১২৯৬—১৩১৫ খ্রীঃ) সভাকবি ছিলেন বিখ্যাত কবি আমীর খসরু (Amir Khusru)। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিক্ষা, সৃষ্টি, জ্ঞান-পরিমার এবং মহত্ত্বের বিষয়ে নিজামীর *Haft Asman* এর প্রত্যুত্তরে খসরুর *Nuh-Sipehr* কবিতা নয়টি সর্গে রচিত হয়। উহার তৃতীয় সর্গে ভারতের বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ভারতই তাঁহার জন্মভূমি ছিল—"India is the land of my birth." নিজামুদ্দীন্ অলিয়া (Nizamuddin Auliya) এর প্রিয় শিষ্য ছিলেন আমীর খসরু। খসরু ভারতে জন্মগ্রহণ করেন (Patyali, 1253 A. D.)। বিদ্যাবত্তায় এবং কলাদক্ষতায় তাঁহার সমকক্ষ কোথাও ছিল না, এমন কি পারস্যেও নহে ! সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শিতার জন্য তিনি ফার্সী ভাষায় কবিদের মধ্যে ও অনন্যসাধারণ ছিলেন। তাঁহার কবিত্বের এবং ব্যক্তিত্বের সার হইতেছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। তাঁহার কীর্তি বিঘোষিত করে গজল্ † গানে। পারস্য কবি সাদী এবং জামী খসরুকে অতি উচ্চ স্থান দিতেন ! খসরু ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রচলিত নাই। তিনি সঙ্গীতের নয়টি বিষয়ে উদ্ভাবন করেন। তাহা এই—*qaul, qalbana, tarana, khayal, naqsh, gul, basit, tallana, sohla.* এই সব ফার্সী এবং হিন্দী মিশ্রিত। তাঁহার সময়ে উত্তর ভারতে প্রধানতঃ প্রচলন ছিল—*kabit, man, dhruva, parband* এবং *dhurpad. Tarana* শুদ্ধভাবের গীতিমূলক ; *qaul* এবং *qalbana* গীতি এবং স্থূল দর্শনমূলক ! খসরুর কৃতিত্ব হইতেছে 'সেতার' ‡ এবং 'ঢোলক' আবিষ্কারে। 'সেতার' এবং 'ঢোলকে' সঙ্গীত হওয়ার নিমিত্তই উহাদের উদ্ভাবন খসরু কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তাঁহার রাগ-রাগিণী পারস্য এবং ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সমন্বয়ে। 'সেতার' এবং 'ঢোলক' বাদিত্রের বাদনের জন্য তৎকর্তৃক ১৭টি তাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলাউদ্দীন্ খল্‌জীর সময়ে সঙ্গীত বিষয়ে নায়ক গোপাল। সম্রাট্ খসরুকে "*Qawwali*" উপাধিতে ভূষিত করেন। যেহেতু, তিনি *qaul* এতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদবধি *qaul* এ যাঁহারা বিশেষজ্ঞ হইতেন, তাঁহারাই "*Qawwali*" উপাধিতে সম্মানাস্পদ হইতেন ! *Qaul* অথবা *qalbana* র কতকাংশ আরবী এবং ফার্সী ভাষায় (Persianised Hindi) রচিত। কোরাণের

† আরবী শব্দ, অর্থ—প্রেমসঙ্গীত, গীতিকবিতা বা কাব্য, গাথা—ode.

‡ ফার্সী শব্দ, অর্থ—সে (তিন), ত্রিতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। সংস্কৃত—"ত্রিতন্ত্রী বীণা।" ঢোলক—হিন্দী ঢোলক। ঢোলের অনুকরণে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্র। যাত্রা পাঁচালী ও . ঐক্যতানবাদ্যাদিতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

বরেত্‌ সুদীর্ঘ আলাপের পরিবর্ত্তে স্বরে 'অক্ষরী'তে আবৃত্তি করা হইত। 'অক্ষরী'র পরে 'অক্ষর' হইত উর্দুতে (Persianised Hindi) অথবা ফার্সী (Persian)তে। ভারতীয় শব্দের উপরে অতিশয় মুগ্ধ থাকায় খস্‌রু; তাঁহার কবিতা রচনায় সহজ ভাবেই উহার প্রয়োগ করেন। খস্‌রুর ন্যায় আর কোন কবিই ফার্সী কবিতায় ভারতীয় শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহার করেন নাই। ইহাই তাঁহার মাতৃভূমির প্রতি অনবদ্য প্রীতি, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয়। * বৈজুবাওরা ছিলেন সম্রাট্‌ আলা-উদ্দীনের সভা-গায়ক। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্রাট্‌কে সঙ্গীত রচনা করিয়া শুনাইতেন। সংসারবিরাগী, নিরভিমানী, সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। বনের হিংস্র পশু হিংসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে গান শুনিতে আসিত। ইতিহাস না থাকিলে কিংবদন্তি অনেক সময়ে বিশ্বাস্য হয়। প্রবাদ আছে—এক সময়ে বৈজুবাওরা গুরুর সঙ্গে নদীর ধারে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে গুরু জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার সঙ্গীত-বিদ্যার জ্ঞান কিরূপ জন্মিয়াছে?" বাওরা নিকটস্থ একটি খড়িকা তুলিয়া জলে ডুবাইয়া গুরুকে দেখান। বিনয়ের অবতারের উত্তর অপূর্ব্ব, প্রণিধান যোগ্য! পাঠক-পাঠিকার পরিতৃপ্তির জন্য বৈজুবাওরার একটি সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

† ভৈরব—চৌতাল।

জয় সরস্বতী গঙ্গা গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ শক্তি সূরয
সর্বদেব ধ্যাবৈ।
সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইশ মূরছনা উনপঞ্চাশ কূটতান
দেহো আবৈ॥
উরপ তিরপ লাগ্‌ভাট রাগ-রাগিণী পুত্রবধূ সহিত
কণ্ঠ সমাবৈ।
কহে বৈজুবাওরে সর্বদেব দয়া করো রাগ রঙ্গ তান
তাল লয় অক্ষর পাবৈ॥

* Hindusthan Standard, Sunday, January 30, 1938, p. 21.

—সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,
দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩০৭ সাল,
বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ১৩১২

রচনার ভিতরে সঙ্গীতের নানা বিষয়ের উল্লেখন বড়ই মনোরম! ছায়ালোকের প্রদর্শনীতে বৈজুবাওরাকে তানসেনের সমসাময়িকরূপ নিতান্ত মূঢ়তারই পরিচায়ক! কেননা, আকবর বাদশাহের (১৫৫৬—১৬০৫ খ্রীঃ) "দরবার-ই-নওরত্ন" সভার অন্যতম সভাসদ্‌ ছিলেন মিঞা তানসেন। নওরত্নের সভা ছিলেন—আবুল ফজল, বৈজী, বিহারীমল, টোডরমল, আব্দুর রহিম খান-খানান, বীরবল, তানসেন, হাকিম হুমায়ুন, মোল্লা দো-পীয়াজা। তানসেন ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামী এবং গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক মুহম্মদ গওসের ইঁহার সঙ্গীত-গুরু ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা শহরে তানসেনের মৃত্যু হয়। বৈজুবাওরা তানসেন অপেক্ষা সার্দ্ধ দুইশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন!

ভৈরব—সম্পূর্ণ। সিধা—বেলা
গেয়। গ্রীষ্মকালের।
ধৈবত—গান্ধার গিরি। রিষভ—সংবাদী।
গান্ধার বাদী।
স্বরজ—অবিসংবাদী বা অস্থায়ী।
ক ঁ র ঁ নি নি ঁ।

ভৈরব রাগের ধ্যান—

গঙ্গাধরঃ শশিকলা-তিলকত্রিনেত্রঃ।
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজচর্মবাসাঃ॥
ভাস্বত্ত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী।
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ॥

—সঙ্গীত-দর্পণে ২।৪১

নিখিল করাল আলা দহিছে পরাণে,
ধ্বনিছে ভৈরব-রাগ জগত-বীণায়! * * * * *

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
২১৮, ১. ৮.
"বর্ষা-গীতি।"

...তুমি ধ্রুপদী ছিলেন। ধ্রুপদ-সঙ্গীতের স্থান সকল সঙ্গীতের উর্দ্ধে উচ্চে কারণ, সঙ্গীত-শাস্ত্রের মূল নিহিত এই ধ্রুপদের মধ্যেই। যাঁহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা তাঁহারা ধ্রুপদকে কাহারও নিম্ন থাকেন। ধ্রুপদের মধ্যে একটা বিরাট, উদার ও গম্ভীর এবং ইহার সৌন্দর্য্য অন্তর্নিহিত। উহার ... ইইতে ছইলে সঙ্গীতের অন্তর্দৃষ্টি থাকাও একান্ত ... হইয়াছেন। ধ্রুপদের প্রচলন মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হিন্দু আমলেই বিদ্যমান ছিল। যে প্রধান চারি রকমের গানের প্রচলন আছে, তাহার মধ্যে ধ্রুপদ প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত। নায়ক, চুলুক, ওস্তাদ, বাহিকী, ইঁহারা সাধক এবং প্রচারক ছিলেন। তৎপর অনুপ্রেরণায় সঙ্গীতই ইহাতে সন্নিবিষ্ট। তজ্জন্য ধ্রুপদের "ধ্রুব-পদ" নামান্তর আছে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলিয়া। স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতের চর্চা করিতেন। তাঁহার তানপুরা, পাখোয়াজ, প্রভৃতি, বাদ্য-যন্ত্র অদ্যাপি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করেন। তাহাতে তিনি সুর-সংযোগও করিয়া দেন। "বীর বাণী" নামে তাহা পুস্তক আকারে প্রকাশিত আছে। স্বামীজী ধ্রুপদী ছিলেন। তাঁহার ধ্রুপদ সম্বন্ধের উক্তিটী বড়ই যথার্থ—"A song needs no explanation. It is like the fragrance of a flower. Whoever wants the fragrance of a rose to be analysed?" *—যে সব music মানুষের soft feelings উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল, টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার কর্ত্তে হ'বে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কাঠামো বহা প্রাণতা আনতে হবে।" *

* বাঙ্গালা ধ্রুপদ-মালা, প্রথম ভাগ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা, শ্রাবণ—১৩৪৫ সাল।

শিষ্যের জীবনাবসানের পূর্ব্বে মুহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের শেষ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে এই উপদেশও বাস্তবিক মর্ম্মস্পর্শী—"সঙ্গীতের সার ধ্রুপদ। ধ্রুপদ শিক্ষা করিলেই রাগ রাগিণীর মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অন্য সকলই তখন সরল হইয়া আসে।" † সঙ্গীতজ্ঞদের তাহাই শ্রেয়ঃ! গোপাল নায়ক সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। সঙ্গীতপণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করায় তিনি "নায়ক" উপাধি প্রাপ্ত হন—এরূপ জনশ্রুতি। "নায়ক" শব্দের তাৎপর্য্য এই—যিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্ম অবগত আছেন; যিনি মার্গ এবং দেশী এই দুই মতের সঙ্গীত করিতে পারেন; যিনি ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল, ঠুংরি ও গজল গানের—এই পঞ্চ বিভাগের যে কোন প্রকার গান শুদ্ধ করিয়া গাহিতে ও সকল তাল বাজাইতে ও নৃত্য করিতে জানেন—মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৪ সাল, পৃঃ ১১৮৫। ইদানীং কেহ কেহ "নায়ক" পদবাচ্য হন। যে সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের আছে কি না? না থাকিলে শব্দের অপ-ব্যবহার এবং অবমাননা করা হয় না কি? নায়ক গোপালের একটি গান :—

: মূলতান—তিনা তেতালা।

সপ্ত সুর ছয় রাগ, রাগিণী সাতেক রাগ, এমনকানুনে বাঁশরী বেসালা হায়।

† "সোনার বাংলা", ঢাকা, ষোড়শ বর্ষ, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৪৪শ সংখ্যা, পৃঃ ৪—৮; দ্র. "গীত-বিতানে অবিনাশচন্দ্র।"

"রবিবাসরের বুগান্তর", কলিকাতা সংস্করণ, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৪৮, পৃঃ ১২, কলম ৭—৮; পৃঃ ৬, কলম ৭; ঐ, ঐ, ঐ, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৯, পৃঃ ১২, কলম ৭—৮; পৃঃ ঐ, কলম ৫ (শেষাংশ)।

: খাড়ব (ব-বর্জিত)। মতান্তরে সম্পূর্ণ। See বচৎ। (গ॰ গ॰ ম ধ॰)। দিবা ২১-২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

প্রথম রাগ ভৈরো রাগ, কৌশিক হিণ্ডোল রাগ, দীপক মল্লার মালব, খটম বেসালা হয়॥

ছত্ত ছত্ত ভার্যা সঙ্গে লাগে লাগ একসে এক আলা হায়।

এরসি স্তনকি বিশালা, মোহি ব্রজবালা,
বাজায় নন্দলালা, গোপালকো জপমালা হায়॥

—সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯।১১

সঙ্গীতের মধ্যে সঙ্গীতের প্রণালী, নির্দেশ, রাগ-রাগিণীর বিকাশ!

সঙ্গীতামোদীদের হৃদয়ে বিস্ময় জাগায়! নিম্নের সঙ্গীতরচয়িতার নাম স্মরণ হইতেছে না! সঙ্গীতের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের তথা শব্দতত্ত্বের ঔচিত্য বিচার চমৎকার! তাহা নিঃসন্দেহ! উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি একটি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদের। আরও পঙ্‌ক্তি উহার আছে কি না স্মরণে আসে না! থাকিলে বড় বেশী নাই! তাহাও বিস্মরণ হইতেছে!

ধ্রুপদ—মেঘ রাগ।

সলিতা গহর ভরে যেন প্রমাণ
উছল চলত তীর্থে বারপার যমুদে
পাতি সন্দেহরা উপজত জনতাহিঁ। *

---

* আধুনিক উর্দুতে 'সন্দেহরা'র স্থানে সন্দেহকা হইত —শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

"নব্যভারত", বৈশাখ, ১৩০৯, পৃঃ ১৮, ৫ম, "ভাষাতত্ত্ব"।২)

মেঘ রাগ—ষাড়ব (গ-বর্জিত)। নি। মতান্তরে ষাড়ব (ধ-বর্জিত) ও নি (শুদ্ধ)।

মতান্তরে ষাড়ব (নি-বর্জিত) ও গ কোমল। রাত্রি ১৬—২০ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। মেঘ রাগ।

সঙ্গীত-দর্পণে—২।৭৬

নীলোৎপলাভবপুরিন্দুসমানবৈলৈঃ। পীতাম্বরস্তুবিত-
চাতক-যাচমানঃ॥
পীযূষ-মন্দহসিতো ঘনমধ্যবর্ত্তী। বীরেষু রাজতি যুবা
কিল মেঘরাগঃ॥
—ইতি ধ্যানম্।

পিতৃদেব স্বনামধন্য অবিনাশচন্দ্রের একটি লেখায় মিঞা তানসেনের কথা আছে। অবিষ্টানেরও উল্লেখ দেখা যায়। সঙ্গীত-চর্চ্চার স্থান বলিয়া হইয়া থাকিবে—

দুনিয়ার বাদশাহী
এমন তো আর নাহি,
হোক্ রুম্ হোক্ হিন্দুস্তান;
যেখেনি দরদ-খাঁ,
কল্যাণে কানাড়ায়,
এ মুলুক্ মিঞা তানসান!

—"নব্যভারত," ফাল্গুন, ১৩০৪, "মজলেপেচার," পৃঃ ৪৯১। প্রাচীনকালে য়ুরোপমহাদেশের অন্তর্গত "রোম" দেশকে "রুম্" বলা হইত। সঙ্গীত-কলার চর্চ্চা ছিল। সঙ্গীতের স্বরলিপি ভারত হইতে পারস্যবাসীদের মধ্যে এবং তৎপর আরববাসীদের ভিতরে প্রচারিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Guido d' Arezzo কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রবর্ত্তিত করান হয় (Von Bohlen, *Das alte Indien*, ii. 195 (1830), & Benfey, *Indien*, p. 299 (in *Ersch and Gruber's Encyclopaedia*, Vol. XVII, 1840)।

ভারত-হিন্দুস্তান! প্রাচীন সভ্যতার জন্য জগতের গৌরবস্থানীয়!

Allama Dr. Muhammad Iqbalএর জাতীয় সঙ্গীতের পঙ্‌ক্তিতে অনুরণিত:—

সারে জঁহাসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।

হিন্দী হৈঁ হম্, বতন্ হৈ হিন্দোস্তাঁ হমারা॥ &c.

"বন্দনা," প্রথম সংস্করণ, কার্ত্তিক, ১৩৫৩, পৃঃ ১২১-১২২। "মুক্তির গান," পৃঃ ২-৩।

দরদ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ—"দৃতিকাদিনিবদ্ধশ্চৈব দরদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" দৃ-অচ্, —কর্ম্মবাচ্যে। "মন্দিরা," আষাঢ়, ১৩৬১, পৃঃ ১৮৮-৯৯। কল্যাণ—সম্পূর্ণ। বাদী গিরি গান্ধার। রিষভ সংবাদী। যত স্বর অস্থায়ী। দরদ পঞ্চম বিস্বর ব্যতীত। আর পাঁচ স্বর তীব্রেতে।

রজনীর প্রথম প্রহরে গেয়। মতান্তরে ওডব ম-নি-ধবিত। * No. ৫৫৫ বৎ। কানাড়া মতান্তরে কানাড়া, কাহড়া—সম্পূর্ণ। রাত্রি চারি প্রহরে। বাদী শুদ্ধ। সমবাদী পঞ্চমেতে সংবাদী। অন্য পাঁচ স্বর অধমাদী। স্বর টোড়ীর কোমল। স্বরপূর্ণ এবং বিস্তারবহুল রাগিণী। অষ্টবিধ প্রকার মূর্ছনা। 'কাহু'—কানাই। 'কানাড়া' আলাপে বাঁশী বাজান শ্রীকৃষ্ণ গোপিনী-গোপদের তন্ময় করিয়া তুলিতেন। "দরবারী-কানাড়া" অতি মধুর রাগিণী তানসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইনিই "নায়ক" পদবাচ্যে সম্পূর্ণ অধিকারী বটে! বৈজুবাওরাও তাহাই। দরবারী কানহরা—সম্পূর্ণ। গ॑ ধ॑ নি॑। See বৃহৎ। কোমী কানহরা—সম্পূর্ণ (গ॑ নি॑)। নায়কী কানহরা—সম্পূর্ণ গ॑ নি॑। অড়ানা। খাড়ব। (ধ—বর্জ্জিত)। গ॑ নি॑ মতান্তরে সম্পূর্ণ। প্রকৃতি, প্রকৃতি।

নিত্য তানসেন অনেকানেক সঙ্গীত রচনা করেন। আকবর শাহ্ সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া "তানসেন" উপাধি প্রদান এবং দুই লক্ষ টাকা তন্নিমিত্ত পুরস্কার দিয়াছিলেন। তানসেন "সঙ্গীতসার" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

: টোড়ী—চৌতালে।

গাও নর্দ্দ বিশাও, শরত পত মহল চাও, উনপঞ্চাশ
কোটি তান উঠায়রে বিশ্রাম পায়ও।
গীত ছন্দঃ বহু নহু ভনক কাহন আলাপ তান তানকে
আড় লাগে হীরা পাই খরজ জীজীর তা মধুর
পঞ্চ রাগ ছিপাও॥
হোরী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী ধুরপ ধুরপ করনাল
কো রিঝাও।
শ্রীহরিদাস সেবক তানসেন গায়ও রাজারাম জিরে
কিও নোহ্ তব অবর খরস আওরে করারে
আকবর সে পারিষ পায়ও॥

: টোড়ী—ঋ॑ গ॑ ঽ॑ ধ॑। নি ও নি॑।

ভৈরব রাগের স্ত্রী—টোড়ী। চতুরদণ্ডীমতানুসারে বৃহৎ-সঙ্গীত-রত্নাকরে। মতান্তরে অন্যতম আদি রাগ কৌশিকের স্ত্রী টোড়ি রাগিণী—সঙ্গীত-দর্পণে। দিবা ১১-১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়।

সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮।৫৪

নানা রাগ রাগিণীতে, তালে, তানসেনের সঙ্গীত রচনা তাঁহার সঙ্গীত শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্য সূচিত করে! অর্থসম্পদে তদানীন্তন সময়ে তানসেনের রচনা অত্যন্ত খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। তানসেন সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। আকবর বাদশাহের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন—"সহস্র বর্ষের মধ্যে এরূপ উচ্চশ্রেণীর গায়ক দেখা যায় নাই।" সঙ্গীতকলাবিদ্ মালবাধিপতিও আকবরের সভায় ছিলেন। সঙ্গীতের মধ্যে সঙ্গীত-কলাবিষয়ক তর্ক, সঙ্গীত-গুরুর প্রতি সম্মাননা, প্রতিপালকের উপরে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন এই সঙ্গীতের বিশেষত্ব! "তানসেন" উপাধির সার্থকতা পরিস্ফুট!

টোড়ী

সঙ্গীত-দর্পণে—২।৫৩

তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ।
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা ৮
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে।
বীণাধরা রাজতি টোডিকেয়ং॥
—ইতি ধ্যানম্।

রামচন্দ্রপুর, বরিশাল, পূর্ব্ববঙ্গ। বরিশাল নগরের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের নির্ম্মাচিত ভূতপূর্ব্ব সভ্য। ভূতপূর্ব্ব কার্য্যকরী সভাপতি, "সঙ্গীত-সঙ্ঘ", বরিশাল। বিশিষ্ট বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিদ্, সঙ্গীতশিপাসু, প্রভৃতি, ব্যক্তিগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং উৎসাহে ১৩৩৩ সালে সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ স্বর্গত লালমোহন মুখোপাধ্যায় (গোস্বামী) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বরিশাল শহরে ঐ "সঙ্গীত-সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বরূপচন্দ্র গুহ রোডস্থ "স্বরূপ বাবুর বাসা"র "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" উদ্যোগে ঝুলন উপলক্ষে বর্ষা-উৎসব অনুষ্ঠানে মৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য—"কাশীপুরনিবাসী", বরিশাল, ৭ম বর্ষ, ১৩৫৩, ১৮শ-২১শ সংখ্যা, পৃঃ ২-৩, কলম ৩-৪, ১; "বরিশাল হিতৈষী", ৫৫ ভাগ, ১৩৫৩ সন, ১৯শ সংখ্যা, পৃঃ ৬, কলম ২; ঐ, ৫৫ ভাগ, ১৩৫৩ সন, ৩১শ সংখ্যা, পৃঃ ৭, কলম ১ পঠিতব্য।

বাংলা গান ও ভারতীয় রাগসঙ্গীত

রাজ্যেশ্বর মিত্র

"নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশের ভাষা পুরে কি আশা"—এই উক্তিটি স্মরণযোগ্য গীতরচয়িতা নিধুবাবুর এবং কেবলমাত্র এইরকম উক্তি করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, নিজে স্বদেশের ভাষায় হিন্দী, উর্দু গানকে ভেঙে রচনা করে এই উক্তিকে সার্থক করে তুলেছেন। বাংলাগানেরও মূলমন্ত্র ঐ একই। ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ভাণ্ডারে যেরকমই থাক না কেন, বাংলার সঙ্গীতভাণ্ডারে তাকে হুবহু এনে বসানো হয় নি; তাকে স্বদেশীয় রুচি অনুসারে সুসংস্কৃত করে কিছু (অনেক সময় বেশ কিছু) রূপান্তরিত করে আমরা আমাদের ভাণ্ডারজাত করেছি। আমাদের সঙ্গীতক্ষেত্রে বাইরে থেকে বীজ এনে আমরা বপন করিনি। সেখানে আপনা থেকে সুরের যে কাণ্ডটি বেড়ে উঠেছে বড় জোর বাইরে থেকে সুরের একটি শাখা এনে তার সঙ্গে যোজিত করে একটি কলমের গাছ তৈরী করেছি। বাংলা গানের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রণ এমনি ভাবেই হয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালেও একই জিনিস চোখে পড়বে। পাঠান, তুর্কী, মোগলের দল বাংলাদেশে দিল্লীর রাজসরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে এসে কিছুদিন বাদেই দিল্লীর শিকল কেটেছেন, নিজেদের প্রচার করেছেন স্বাধীন বাংলার সুলতান হিসাবে। বাংলার খুনই এমনি। জাহগাটা যত খারাপ যত অস্বাস্থ্যকরই হোক না কেন, একটা স্বাধীন মনোবৃত্তি চিরকালই বাঙালীর মধ্যে ছিল—আজও আছে। তাই গোটা মুসলমান রাজত্বে সুলতান-বাদশারা দুর্ধর্ষ বাঘা বাঘা আমলাদের শাস্তির জন্য পাঠিয়েছেন বাংলার "দোজখে।" কিন্তু, পাঠিয়েই পস্তেছেন—বাংলার সুন্দরবনের বাঘ ঘরেও সাংঘাতিক, তাই তাদের ব্যাঘ্রত্ব বাংলার ঘরেও পরিপুষ্ট হয়েছে এবং তাঁদের কার্যকলাপে দিল্লীপ্রাসাদদূতে সুলতান-বাদসাদের তক্তা বার বার ছুটে গিয়েছে। এই সব হঠাৎসজানো নবাবরা ঘরের বাঙালীদের সঙ্গে মিলেছেন তাদের মধ্যে নতুন জিনিস মিশিয়েছেন এবং তাকেও বাঙালী আপনার করেই আপন করে নিয়েছে।

খুব প্রাচীন যুগের সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত আমরা পাই না সুতরাং উদাহরণ সহযোগে বোঝাবার উপায় নেই, কিন্তু মুসলমান যুগের আরম্ভ থেকেই বাঙালীর এই স্বকীয় সৃষ্টির পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের অনেক নমুনা দেওয়া যায়। জয়দেব একটি মস্তবড় উদাহরণ। সেকালকার প্রচলিত পদ্ধতি থেকে পৃথক ভাবে জয়দেব একটি বিচিত্র প্রবন্ধ রচনা করলেন। এমনকি যে সব রাগগুলি ব্যবহার করলেন তার মধ্যেও তাঁর একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব বর্তমান, যার ফলে তাঁর ব্যবহৃত "দেশাখ" রাগ "জয়দেবী দেশাখ" এবং 'রামকরী' রাগ "জয়দেবী রামকরী" নামে বিখ্যাত হয়েছিল। এই বিশেষত্বের জন্য জয়দেবের সঙ্গীত এক সময় বাংলাদেশে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে সারা ভারতে সমাদৃত হয়।

এর পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গীতাংশ আলোচনা করে দেখলে বোঝা যায় এই যুগেও বাংলা উত্তর ভারতের গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বাংলার নিজস্ব রীতি প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত আছে উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে। বহু রাগ আছে যা বাংলায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিভিন্ন রাগ, গীতরূপ ও রীতির উল্লেখ দেখে মনে হয় বহুল সংমিশ্রণে এই নাট্যগীতিটি একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সৃষ্টি যাতে তদানীন্তন উত্তরভারতীয় সঙ্গীত যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষিত হয়ে স্থানলাভ করেছে। অনেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে লোক-

সঙ্গীত বলে উল্লেখ করেন কিন্তু সঙ্গীতের দিক দিয়ে বিচার করলে একে কিছু উচ্চস্তরের নাট্যগীতিই বলতে হয় কেননা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট কলাকৌশল এতে বিদ্যমান।

পরবর্তীকালে বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের সময়ও সঙ্গীতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে কীর্তনের অভ্যুদয় ঘটেছে। কীর্তনের প্রাচীন রীতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সে যুগের প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতিকে যথেষ্ট পরিবর্তিত করে এই নবরীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সেযুগে বাংলায় খাঁটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যবহার কেমন ছিল এবং সেটা আদৌ ছিল কি না। এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সেযুগের প্রচলিত উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত বাংলার উচ্চাঙ্গ আসরেও চলত এবং বেশ দরবারি ভাবেই চলত। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্মণসেনের রাজসভার উল্লেখ করা যায়। সেখানে বেশ উঁচুদরের গানবাজনাই চলত। পরবর্তীকালেও মুসলমান রাজারা বাইরে থেকে ওস্তাদদের আনার ফলে তাঁদের কাছ থেকেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাংলার শিল্পীদের ভিতর প্রচলিত হয়েছিল। বাংলাতে অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রকার জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁদের রচনা দেখলে বোঝা যায় উত্তরভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পদ্ধতিও বাংলাদেশে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু—মস্তবড় কথা হচ্ছে এই যে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের টেকনিক সুবিধে পেলেই বাঙালীরা স্বকীয় পদ্ধতিতে বদলে নিয়েছেন এবং স্বতন্ত্র সঙ্গীতকলা সৃষ্টি করেছেন। উত্তরভারতীয় গোঁড়া সঙ্গীতকলা অপেক্ষা বাংলার নিজস্ব শিল্পের দিকেই বাঙালীর টান ছিল অনেক বেশি। মুসলমান রাজত্বের শেষ দিকে উত্তর ভারতীয় প্রবন্ধাদির চলন বাংলায় কিরকম ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ভক্তিরত্নাকরের গানগুলি থেকে। জয়দেবের প্রভাব বাংলার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তখনো যথেষ্ট বিদ্যমান। নানারকম গানের সঙ্গে ধ্রুপদও বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল কিন্তু খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। সেকালে বাংলায় ধ্রুপদ সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই গাওয়া হত এইরকম উল্লেখ আছে। বাংলায় তখনও ধ্রুপদী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে, বিশেষ করে উনবিংশ শতকে ধ্রুপদগায়ক ভারত জুড়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন কিন্তু তথাপি বাংলায় ধ্রুপদ তেমন প্রাধান্য লাভ করে নি। এর কারণ হচ্ছে বাঙালী মনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ধ্রুপদ তেমন করে খাপ খায় নি। ধরাবাঁধা ক্লাসিক-রীতি অনুসরণ করে চলা এবং একটা একঘেয়ে আভাষ্ট ভারি পরিবেশের মধ্যে থাকা—বাঙালির মন কোনকালেই এটা চায় নি, এখনও চায় না। সুতরাং ভাল বাংলা গান ধ্রুপদে তেমন মেলে না। পরে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ধ্রুপদের কিছু আদর হয়েছিল এবং ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতাগণ ধ্রুবপদ্ধতির অনুসরণে অনেক গান রচনা করেছিলেন কিন্তু তাকে ধ্রুপদ আখ্যা দিলে ভুল হবে। ধ্রুপদের একটা ধরণ তার মধ্যে আছে বলেই সে ধ্রুপদ নয়। শ্রেণী বিভাগ করতে হলে তাকে ধ্রুপদের শ্রেণীতে পাকাপাকিভাবে নেওয়া চলবে না। ধ্রুপদ বলতে আমরা বুঝি, পুরোপুরি ধ্রুপদের টেকনিক যাতে আছে তেমন রচনা। ব্রাহ্মসঙ্গীতের ধ্রুপদে তা নেই, কেবলমাত্র ধ্রুপদের একটা ছায়া আছে। এই কারণে এই গান বড় জোর ধ্রুপদভঙ্গির কাব্যসঙ্গীত তার বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ নিয়ে সম্প্রতি অনেক গলাবাজি চলছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু ধ্রুপদের কিছু ভঙ্গী তাঁর গানে এনেছেন সেই কারণেই তাকে ধ্রুপদ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয় এবং অনুরূপভাবে টপ্পার আঙ্গিক নিয়ে তিনি যে গান রচনা করেছেন তাকে রবীন্দ্রনাথের টপ্পা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

যাই হোক, এ আবার অন্য ব্যাপার, সুতরাং পূর্ব-প্রসঙ্গেই ফিরি। অতঃপর মুসলমান রাজত্বের একেবারে শেষে বাংলা গান আবার উত্তর ভারতের গানকে নিজের মত করে ভেঙে গড়ল। এইখান থেকে সুরু হল

টপ্পার সুর নিধুবাবু বিহার
কিন্তু তাঁর হাতে বাংলার টপ্পা একটা
নিয়ে গড়ে উঠল। বস্তুত নিধুবাবুর
বাংলা কাব্যসঙ্গীতের অধিকাংশ
রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ—এঁরা সকলেই
ভারতীয় সঙ্গীতের সুর আদর্শ নিয়েছেন কিন্তু
তাঁদের রচনায় রূপ বিষয়বস্তু বিশেষ
অতুলপ্রসাদ একেবারে সঙ্গীতের কাছে ঋণ স্বীকার
কাজল অনুসরণ করেও একটা আলাদা স্বাতন্ত্র্য
করে গেছেন। বর্তমান যুগে দিলীপকুমার
গানে যেখানে উত্তর ভারতীয় পদ্ধতি
সেখানেও একটি স্বকীয় ভঙ্গী এনে তাকে
দিয়েছেন।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে বাঙালী চিরকালই সঙ্গীত আজ গানের রাজা বাঙালী নয়

শারদীয় উৎসবে
আপনার প্রিয়জনকে তৃপ্তি দেবে
ইম্পিরিয়াল চা
6নং রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

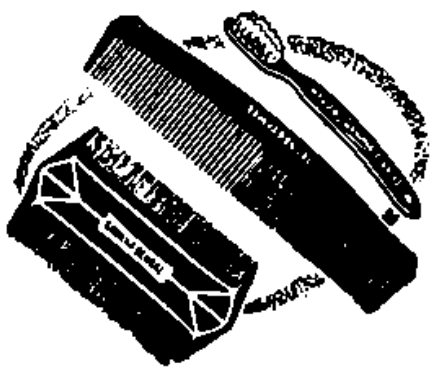

"শঙ্খ" (SANKHA) মার্কা চিরুণী
ও
"পূর্ণিমা"
ও বিদেশীর শ্রেষ্ঠ।
পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত হয়।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
JESSORE COMB INDUSTRY CO.
Calcutta—9.

আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

ইংরাজীতে একটি কথা আছে, "An ounce of creation is worth a pound of criticism." এক রতি সৃষ্টি একপালা সমালোচনার সমান্। কথাটা সত্য। সেই সব সমালোচনামূলক রচনার কথা প্রত্যাগ করা হবে, যে সমালোচনায় সৃষ্টিধর্মী কোন বালাই নাই। কিন্তু সমালোচনা যদি রসান্বিত হয়, তার ভিতর যদি লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার গুরু পরিচয় থাকে, তা হলে আর তথাকথিত সমালোচনা থাকে না, অতিরিক্ত সৃষ্টিধর্মী রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই শ্রেণীর রচনার সম্পর্কে উপরের আপত্তিটা খুব

সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা-রীতির প্রবক্তা হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা উদ্ধৃতি করতে পারি। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য' এবং 'পঞ্চভূত'-এর কোন প্রবন্ধে রবিগুরু যে সমালোচনার রীতি প্রবর্তন করেছেন তা একাধারে চিন্তাসমৃদ্ধ সমালোচনা ও রস-সমালোচনা। সেই সকল রচনায় একদিকে যেমন গভীর মননশীলতার দ্যুতি বিকীরণ করছে অন্যদিকে তেমনি রসিক মনের শ্রেষ্ঠ সংবেদনশীলতাকেও প্রকাশ করছে। চিন্তার উৎকর্ষ আর রসসিক্ততার মিলে রবীন্দ্রকৃত সাহিত্যসমালোচনা আমাদের সাহিত্য সমালোচনারীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয়ে রইল।

হয় আধুনিক সমালোচনারীতির ভিতর রবীন্দ্রপ্রদর্শিত চিন্তাসমৃদ্ধি ও রসসিক্ততা ছাড়া আরও একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করা দরকার—সমাজ সচেতনতা। একালীন সাহিত্যে সমাজচেতনার পরিসর পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখকেরা যেমন কথা এবং কাব্যসৃষ্টির কালে সামাজিক পটভূমিকে বাদ দিতে পারেন না, তেমনি সমালোচককেও এ বিষয়ে অবহিত হয়েই লেখনী চালনা করতে হয়। খতিয়ে দেখতে গেলে, এ ক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্বটাই বেশী। কেন না তাঁর কাজ বিশ্লেষণ, এবং এই বিশ্লেষণের কাজে সব দিকের হিসাব লওয়াটাই পন্থা। একটি সৃষ্টিধর্মী রচনা কোন্ কোন্ উপাদানের সমবায়ে গঠিত হয়েছে তা নিরূপণ ও চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব সমালোচকের। কথিত উপাদান সমূহের অন্যতম উপাদান হল সমাজ চেতনা। সুতরাং এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে সমালোচকের অনবহিত হওয়ার উপায় নাই। এবং যত বেশী তিনি এ বিষয়ে সচেতনতার প্রমাণ দেবেন তত তাঁর সমালোচনা বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। সমাজচৈতন্য বাদ দিয়ে আজকের দিনে সাহিত্য সমালোচনায় ব্রতী হওয়ার অর্থ সমালোচনার একটি মূল উপাদানকেই বর্জন করা। এ পথে সাহিত্য সমালোচকের দায়িত্ব পালিত হতে পারে না।

আধুনিক সমালোচনা রীতিতে সমাজচেতনার উপর প্রাধান্য আরোপের আরও একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে এ যুগের অতিরিক্ত রাজনীতিসচেতনতা। এক সময় শিল্পসাহিত্যের পরিসরের ভিতর ধর্মীয় চেতনার আধিপত্য ছিল। এক্ষণে ধর্মচেতনার স্থান অধিকার করেছে রাজনীতিচেতনা। বিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রবহমান মনোভাব বলতে রাজনীতিকে বোঝায়, আর এই রাজনীতি প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষে মানুষের জীবনের উপর ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। রাজনীতি মানুষের বহির্জীবন তো বটেই

মনোজীবনেরও অনেকখানি অংশ জুড়ে বসেছে। সুতরাং স্বভাবতঃ শিল্প সাহিত্য এর প্রভাব পরিধির অন্তর্গত হয়েছে। এখনকার লেখকবৃন্দ চান বা না চান তাঁরা তাঁদের সাহিত্যপ্রয়াসকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে পারেন না। তাঁরা রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও রাজনীতি তাঁদের অব্যাহতি দেয় না। ফলে জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, প্রত্যেক আধুনিক লেখকের রচনার উপর রাজনীতির কিঞ্চিৎ ছাপ এসে পড়েই। সমাজের সব চাইতে সচেতন শ্রেণী হল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, তারও ভিতর আবার বেশী সচেতন হল শিল্পী শ্রেণী। কাজে কাজেই এ যুগের একটি শক্তিশালী প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে লেখকদের নিস্পৃহ থাকবার কোন উপায়ই নেই। প্রত্যেকটি চিন্তা-আন্দোলন তাঁদের মনের তীরে এসে না নিজে এবং তাঁদের মনোযোগের একাংশ নিজের অনুকূলে আকর্ষণ করে নিচ্ছে।

এই যদি সৃষ্টিধর্মী লেখকদের বেলায় সত্য হয়, তা হলে সমালোচকদের বেলায় সে কথা আরও কত বেশী সত্য তা সহজেই অনুমান করা চলে। কেন না চিন্তা-মূলকতা সমালোচকদের স্বভাবের একেবারে মজ্জায় নিহিত। ভাবজগতের যে কোনরূপ আন্দোলন তাঁদের মনোজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর দিনানুদৈনিক রাজনীতির বাইরে যে বৃহত্তর রাজনীতি-বিজ্ঞান, সেটি যেহেতু ভাবজগতেরই একটি অঙ্গ, তারও প্রভাব সমালোচকের উপর অবধারিত। বুদ্ধিপ্রাখর্য ও মননশীলতা সত্যিকার সমালোচকের একটি প্রধান অবলম্বন। এই দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত না করতে পারলে সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত করতে পারা কঠিন কাজ। তবে মাত্র এ দুটি গুণেই সমালোচকের বৈশিষ্ট্য নিঃশেষিত নয়। সেই সমালোচকই শ্রেষ্ঠ সমালোচক, যিনি মননশীলতার সঙ্গে রসরসিকতার সুসমঞ্জস ঐক্য-বিধানে সমর্থ। রসরসিকতার যাদুপ্রভাবে সমালোচনার নবজীবনপ্রাপ্তি ঘটে, তার গোত্র বদল হয়। হৃদয়-সংবেদনসহ সৃষ্টিধর্মী রচনার ভাতে উঠতে হলে সমালোচনাকে যে এই পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

তবে শুধুমাত্র রসরসিকতার পথ সমালোচনার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা এই দিকটির উপর অনুপাত-অতিরিক্ত ঝোঁক ন্যস্ত করেন বুঝতে হবে তাঁদের সমাজচেতনা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চেতনা দুর্বল। তাঁদের মানসিক গঠনের ভিতর মননশীলতার দিক আশানুরূপ সমৃদ্ধ নয় বলেই তাঁরা যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধির উপরে রসিকতার আদর্শকে স্থাপন করেন। কিন্তু এ কথা বলা প্রয়োজন যুক্তি আর বিচারবুদ্ধির বুনিয়াদ পাকা না হলে শ্রেষ্ঠ রসিকতার ক্ষমতাও তার আকাঙ্ক্ষিত মন থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে। আধুনিক সাহিত্যে সমালোচকের ভূমিকার সহিত সমাজচেতনার যোগ অতি নিগূঢ়। যে সমালোচকের মানসিকতার ভিতর সমাজচৈতন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রবল নয় বা তা বিদ্যমান থাকলেও বিকৃতবুদ্ধির দ্বারা কবলিত, তিনি যত বড় রসিক ও সাহিত্যবোদ্ধা হোন-না কেন, তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ সর্তাধীনে গ্রহণ করা উচিত। আমাদের ভাবজগতের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর সম্পৃক্ত। আজকের দিনের অগ্রসর চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ সাহিত্যচিন্তা বলে অনুনিরপেক্ষ সরলীকৃত কোন চিন্তা থাকতে পারে না। কাজেই আর কোন কারণে হলেও এই পরস্পর সম্পৃক্ততার জন্যই সাহিত্যচিন্তাকে অন্যান্য চিন্তার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এক বিভাগের চিন্তার মধ্যে মস্ত বড়ো ফাঁক ও ফাঁকী রেখে সাহিত্য-চিন্তাকে কী ভাবে যে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত রাখা যায় ভালো বোঝা যায় না।

বক্তব্যোক্ত অপূর্ণতার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা সুপরিচিত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সমালোচনারীতির উল্লেখ করতে পারি। আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই মোহিতলালের স্থান। মোহিতলালের সহজাত রসরসিকতা, কবিপ্রাণতা, সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য, সর্বোপরি বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি

তাঁকে ঘরাই একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। মোহিতলালের অন্যাভিচারী মন্তব্যগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু আমাদের এ সকল মন্তব্য সর্তবিরহিত নয়। মোহিতলালের সমালোচন শক্তির উচ্চ প্রশংসা করেও আমরা বলব, তাঁর সমাজ-চেতনা ছিল নিতান্ত দুর্বল। তাত্ত্বিক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বিচারবুদ্ধির বেদনাদায়ক ভ্রান্তি ও আত্যন্তিক নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে নিতান্ত একদেশদর্শী করে তুলেছিল। যদি কেউ বলেন, মোহিতলালের এই একপেশে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকে গুলিয়ে ফেলে যৌক্তিকতা থাকতে পারে না, সাহিত্য স্বতন্ত্র বিষয়, আমরা সে কথা মানতে অক্ষম। সাহিত্য [illegible] কিছু অনপেক্ষ বিশুদ্ধ ব্যাপার নয়; তার সঙ্গে সকল বিভাগের চিন্তার ঘনিষ্ঠ যোগ বিদ্যমান। জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিতান্ত সঙ্কীর্ণতার নীতি অবলম্বন করে সাহিত্যে উদারনীতি অবলম্বনের কোথাও বড় হবার একটি গলদ

মোহিতলালের সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করা হল সুপরিচিত সমালোচক শ্রীদেবনাথ বিনী সম্পর্কেও সেগুলি অবিকল প্রয়োগ করা চলে। সাহিত্য সমালোচনা রীতির ক্ষেত্রে তিনি মোহিতলালেরই একজন under study. যদিও মতপ্রকাশের উগ্রতায় ও প্রত্যয়-দৃঢ়তায় মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর মিল সামান্য, মোহিতলাল তবুও বলিষ্ঠতার এতটুকু উপাদান প্রবন্ধের রচনায় নাই, তা হলেও দুইয়ের মনোভঙ্গি এক এই হিসেবে যে, দুইয়েরই দৃষ্টিকোণ অতিরিক্ত মাত্রায় সাহিত্য-ঘেঁষা। সমাজচেতনা তথা প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার পরিচয় যেমন মোহিতলালের রচনায় পাওয়া যায় না, তেমনি প্রবন্ধ বিনীর ন্যূনতাও এই দিক দিয়ে স্পষ্ট। তদুপরি তাঁর চিন্তাধারা অতিরিক্ত মাত্রায় রবীন্দ্রভাবে ভাবিত হওয়ায় সেটিও নিরপেক্ষ সমা-লোচনার পথে একটি বাধার সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক সমালোচনায় মৌলিকতা কম, বাঁধা পথের অনুবৃত্তি বেশী। বিশেষ, সেই বাঁধা পথ রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত রেখাচিত্রের অনুসারী। চিন্তার মৌলিকত্বে আর কল্পনার অভিনবত্বে বিনী মহাশয় রবীন্দ্রনাথ থেকে এক-চুল অগ্রসর হতে পারেন নি, এতে আধুনিক রবীন্দ্র শিষ্যদের মানসিক দৈন্যই শুধু প্রমাণিত হয়।

পুরাতন রবীন্দ্র শিষ্যদের সম্পর্কে বোধ করি এ কথা বলার যো ছিল না। বিখ্যাত সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের সর্বগ্রাসী প্রভাব-পরিধির মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এমন একটা স্বকীয়তা ছিল যা তাঁর রচনাকে কোন সময়েই গতানুগতিক হতে দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একজন সমালোচক এবং স্বরচিত সাহিত্যের স্বয়ং একজন প্রধান বিচারক ('আত্মপরিচয়' ও বিভিন্ন রবীন্দ্র সাহিত্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে লিখিত পত্রাবলী দ্রষ্টব্য। হওয়া সত্ত্বেও তিনি অজিতকুমারের অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ ও গ্রহণ করতেন। তাতেই প্রমাণ, সমালোচক হিসাবে অজিতকুমারের মৌলিকতার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। এবং এতে আরও বোঝায় যে, ব্যক্তিগত পরিচয় বা বন্ধুপ্রীতি এই আস্থার উৎস ছিল না। অজিতকুমারের মতো স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও অন্ত-র্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক আমাদের সাহিত্যে যদি আরও দু'একজন জন্মাতেন, তা হলে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের চেহারা বদলে যেত।

আমরা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে প্রগতিশীল চিন্তাধারার নিকট সম্পর্কের কথা বলেছি। এই নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অনেক সময় আবার উল্টো দিক থেকে বিপদ দেখা দেয়। সে বিপদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

সমাজ সচেতন বামপন্থী চিন্তাধারা অনেক সময় তদনুগত সমালোচককে ফরমুলার বাঁধা অনুশাসন মেনে চলতে প্ররোচিত করে। এটি নিরপেক্ষ সমালোচনার পক্ষে অতি ক্ষতিকর বস্তু। ফরমুলার শাসন মানেই

হল পূর্বচিন্তিত বাঁধা মতের শাসন। এই শাসন একবার মেনে নিলে মৌলিকতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শকে চিরতরে বিসর্জন দিতে হয়। কেন না এ জাতীয় সমালোচনরীতিতে সিদ্ধান্ত কখনও আপনার যুক্তি অনুসরণ করে আপনি চলে না, তা পূর্বগঠিত কোনও বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত এখানে যুক্তি পরম্পরা থেকে স্বতঃ-প্রবাহিত নয় তা পূর্বাহ্নে নিরূপিত কোন বিশেষ মতবাদের ছকের অধীনএ বাঁধা ফরমূলার আঁটো সাঁটো ফ্রেমের মধ্যে লেখকের মতকে জোর করে ধরাতে গেলে যে জাতীয় বিপত্তি দেখা দেওয়া সম্ভব এবম্বিধ সমালোচনায় সে বিপত্তির উদ্ভব পদে পদে।

বলা বাহুল্য, জনপ্রিয় কোন মতবাদের প্রতি সমালোচকের আত্যন্তিক আনুগত্যের মনোভাব তাঁর নিরপেক্ষতার হানিকর। অথবা বলা যেতে পারে, এতে মৌলিকতা খর্ব হয়। বক্তব্যের পিছনে যে অনুপাতে পূর্ব-ধারণার প্রাধান্য থাকে, সে অনুপাতে চিন্তার স্বাধীনতার অপলব ঘটে। তাছাড়া এতে যুক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। যেখানে প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য যুক্তি, যুক্তিপরম্পরার অনুসরণে প্রতিপাদ্য নয়, সেস্থলে বক্তব্য স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে পরিসমাপ্তি লাভ করতে পারে না। বিদ্যুতিটিকে মতবাদের জুলুম আখ্যা দিলে বুঝি তার স্বরূপের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দু-একজন কৃতীসমালোচকের রচনা পদ্ধতির ভিতর উপরি উক্ত ফরমূলা প্রীতির প্রভাব চোখে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও 'বঙ্কিম মানস' ও মঙ্গলকাব্যের আলোচক ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দারের নাম এ ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। দু'জনেই তীক্ষ্ণধী লেখক এবং দু'জনার মধ্যেই সমালোচনা শক্তি সহজাত। ডক্টর নিহাররঞ্জনের মধ্যে আছে সহজ রসরসিকতা, আর ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দারের মধ্যে আছে মননশীলতার দীপ্তি, কিন্তু মার্ক্সীয় চিন্তাবিজ্ঞানের প্রতি আত্যন্তিক ঝোঁক এঁদের উভয়েরই রচনাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ফরমূলা-ঘেঁষা করে তুলেছে। মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দান করবার জন্যই যেন তাঁদের যুক্তির উদ্ভাবনা, অর্থনীতি যে সমাজ ও শিল্পচিন্তাকে প্রবল ভাবে প্রভাবিত করে এটি পাকেচক্রে প্রমাণ করাই যেন তাঁদের তাবৎ সমালোচন-প্রয়াসের লক্ষ্য। তার অর্থ, যুক্তির স্বাধীনতা তাঁদের নিকট মুখ্য নয়, ভালোলাগা-মন্দলাগার নিজস্ব মূল্য যেন তাঁদের চোখে তেমন নেই, সবটাই মত-বাদের মাপকাঠিতে হুবহুকপা। সমালোচনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই পথে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না, বলাই বাহুল্য।

ফরমূলা-ঘেঁষা সমালোচনার মতো কিতাবি (academic) সমালোচনাও বড়ো কম বিপত্তির সৃষ্টি করে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহিত্য-অধ্যাপকদের মধ্যে এ জাতীয় সমালোচন রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। বিশেষ, ডক্টরেট-ডিগ্রীধারীরা এর মুখ্য প্রবক্তা। কিতাবী সমা-লোচনার ত্রুটি এইখানে যে, তা প্রচলিত প্রযোক্ত norm সমূহের বাইরে এক পা-ও অগ্রসর হতে নারাজ। সমা-লোচনার নিজস্ব রীতি পদ্ধতি ও মান গড়ে তোলার চাইতে সনাতন আদর্শকে আঁকড়ে ধরাটাই এ জাতীয় সমালোচনায় সমধিক নিরাপদ মনে করা হয়। ফলে এতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় হয়তো মেলে, মৌলিকতা প্রকাশ পায় না। সমালোচকের নিজস্ব রুচি ও পছন্দ এবং রসগ্রহিষ্ণুতা যেখানে পুরাতন পাঠ্যকিতাবের বর্ণিত আদর্শের দ্বারা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত, সে স্থলে স্বাধীন চিন্তার উপর বড় বেশী চাপ পড়তে বাধ্য। পড়েও থাকে। কিতাবী সমা-লোচকদের মুস্কিল হচ্ছে এই যে, তাঁদের দৃষ্টি প্রাচীনের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নিবদ্ধ। সাহিত্যের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ তাঁদের চোখে কম বেশী অনুপস্থিত। যা প্রথা-সম্মত ও ধারাবাহিক, গতানুগতিকত্বের লক্ষণ যার মধ্যে স্পষ্ট, তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে এঁদের যে পরিমাণ উৎসাহ, নূতনের প্রতি তাঁদের উৎসাহ তার সিকির সিকিও নয়। এখানেই সৃষ্টিধর্মী সমালোচকদের সঙ্গে কিতাবী সমালোচকদের মূল পার্থক্য। সৃষ্টিধর্মী সমা-লোচকেরা নিজেই নিজেদের রীতির উদ্ভাবক। পক্ষান্তরে কিতাবী সমালোচকগণ পুরাতন রীতির দাস। প্রথার অনুমোদন না পেলে এঁরা কোন রচনাকেই—তা সে যতই উৎকর্ষচিহ্ন মণ্ডিত হোক-না কেন,—উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করতে ভরসা পান না। কিতাবী সমালোচকদের উপর পুরাতনের এই আধিপত্য তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আগাগোড়া খণ্ডিত করে রেখেছে।

আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সংজ্ঞা ও নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা তাঁদের সমালোচন-রীতিকে ওজনের ভাবে নিখুঁত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের এই ধরণের সমালোচক আখ্যা দেওয়া যায়। অন্যপক্ষে সাহিত্য বিভাগের পড়াশুনায় উচ্চ উপাধিলাভের সূত্রে যাঁরা ইংরেজী তথা ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের standard গ্রন্থসকল অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেক সময় এ জাতীয় ধরাবাঁধা মনোভাব গড়ে উঠতে দেখা যায়। কিতাবী অধ্যয়নব্যবস্থার যেমন বহু ভালো দিক আছে, তেমনি অসুবিধাও হয়তো কম নেই। দৃষ্টিভঙ্গীর কথিত সঙ্কীর্ণতা এ জাতীয় এক অসুবিধা। এই সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে উদারতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠা খুবই কঠিন কাজ—বিশেষতঃ সমসাময়িক কালের প্রতি বীতস্পৃহ মনোভাব যদি পূর্ব থেকেই বদ্ধমূল থাকে তা হলে তো আরও মুস্কিল। আমাদের সাহিত্যের কতিপয় উচ্চ-উপাধিধারী অধ্যাপক-সমালোচকের মধ্যে সমসাময়িক কালের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যে উদাসীনতা ও বিরূপতার ভাব দেখা যায় তার মূল এই কিতাবী অভ্যাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। কিতাবী সমালোচনায় চিন্তার সংযম আছে, চিন্তার ঔদার্য নেই। আর ঔদার্য ব্যতিরেকে সমালোচনা যে কিছু পরিমাণে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে তা না বললেও চলে।

আমাদের সাহিত্যে আর এক ধরণের সমালোচক আছেন যাঁরা নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করে থাকেন। পুরাতন রসবিচারের আদর্শের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করে সম্পূর্ণ নিজস্ব রুচি ও পছন্দের ভিত্তিতে সমসাময়িক কালের রচনাদি সম্পর্কে রায় দেওয়ার একটা রেওয়াজ সমালোচনা-সাহিত্যে প্রচলিত আছে বটে—বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ের বেলায় এই রীতির সমূহ উপযোগিতা স্বীকার্য—; কিন্তু এই আদর্শকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশ্রয় দিলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা সমালোচনার স্বাধীনতা অভিভূত হয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। শুধু তা-ই নয়, এতে অনেক সময় ব্যক্তিগত পরিচয় ও বন্ধুত্ব ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের ছদ্মবেশ ধরে সমালোচককে সত্যভ্রষ্ট করে। পুরাতন সমালোচনরীতির আদর্শের উপর আত্যন্তিক নির্ভরশীলতার মনোভাব যেমন অশ্রদ্ধেয়, তেমনি ঐতিহ্যবিচ্যুত এই একান্ত ব্যক্তিগত সমালোচন-পদ্ধতিও অশ্রদ্ধেয়। এই রীতির দ্বারা বস্তুতঃ উপকৃত হয়, সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন সমালোচক বিধিবদ্ধ ভাবে এই রীতির অনুশীলন করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু মহাশয়কে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বাবু শক্তিশালী সমালোচক, কিন্তু মনে হয় একটু অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অধীন। সাহিত্য-সমালোচনার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের প্রতি যদি তাঁর তেমন অনুরাগ থাকত, তা হলে বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সুকুমার রায়কে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি তিনি কখনই করতে পারতেন না। নিতান্ত বিজাতীয় ভাবের ভাবুক, একান্তরূপে পাশ্চাত্য-নির্ভর সমসাময়িক কতিপয় কবি সম্পর্কে তাঁর অতিরিক্ত প্রশংসা মনোভাবের মূলেও যে সেই একই ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ কাজ করছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

বিপত্তির তালিকা এখানেই নিঃশেষিত নয়। আমরা ইতিপূর্বে ফরমুলা ধর্মী সমালোচনরীতির বিপদের উল্লেখ করেছি। কিন্তু—সেখানে শুধু রাজনৈতিক-মতবাদ-নিয়ন্ত্রিত সমালোচনার কথাই বলা হয়েছে, রাজনৈতিকদল নিয়ন্ত্রিত সমালোচনার কথা বলা হয় নি। তাজ্জবের বিষয় এই যে, এ জাতীয় সমালোচনাও বাংলা দেশে হয়ে থাকে, এবং কম্যুনিষ্টদল এ পথের সর্বপ্রধান পথিক। কম্যুনিষ্ট শিল্পী সমালোচকদের বিচারে সেই সমালোচনা অভ্রান্ত যে সমালোচনার দ্বারা পার্টির উদ্দেশ্যকে কিছু পরিমাণেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়। পার্টির অন্তর্গত কবি সাহিত্যিকদের রচনাদি সম্পর্কে এঁদের মুখপত্রগুলিতে 'তম-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণমণ্ডিত যে সমালোচনা সচরাচর প্রকাশিত হয়ে থাকে তা আসলে সমালোচনা নয়, আত্ম-প্রচার। দলীয়তার আবহাওয়ার এঁদের স্বাভাবিক সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন। সত্যনিষ্ঠার উপরে দলনিষ্ঠাকে স্থান দিলে বুদ্ধিবিকার কেউ রোধ করতে পারে না, সে কথা আশা করি বিশদ বিস্তারের অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩১নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'বন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সপ্তদশ বর্ষ | কার্তিক—১৩৬১ | সপ্তম সংখ্যা

ইন্দোচীন

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ।

অধুনা ইন্দোচীন খবরের কাগজের মারফৎ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। গত ৭ বছর এর নানা অংশে একটা যুদ্ধ চলছিল; এই যুদ্ধকে পুরাপুরি গৃহযুদ্ধও বলা চলে না বা পুরাপুরি আন্তর্জাতিক যুদ্ধও বলা যায় না। আবার নিছক একে বৈপ্লবিক উত্থান বলা যায় কিনা তাও সন্দেহ। বাঙালী পাঠকদের কাছে এই দেশটি হয়ত সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত নয়। এর অতি প্রাচীন কাহিনী বাদ দিলেও, এর বর্তমান ইতিহাসও অনেকেরই ভাল জানা নেই। এর ভৌগোলিক ও জাতিতাত্ত্বিক (ethnological) পরিচয়ও আমাদের নিকট সুস্পষ্ট নয়। আমরা এই প্রবন্ধে তারই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

গত কয়েক মাসে কাগজের আলোচনার ফলে অনেকেই এটা জেনেছেন যে প্রধানত তিনটি রাষ্ট্র নিয়ে এই দেশটি গঠিত। আনাম, কম্বোজ বা কম্বোডিয়া ও লাওস্। তন্মধ্যে আনাম ও কম্বোডিয়া হল ফরাসীদের রক্ষিত রাষ্ট্র (protectorate) এবং লাওস্ হল ফরাসীদের উপনিবেশ। কিন্তু তাতেই এদেশের রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক পরিচয় সম্পূর্ণ হল না। আনামের অন্তর্গত কোচিন-চীনও ফরাসীদের একটি উপনিবেশ এবং ফরাসীদের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন। এই কোচিন-চীনই ফরাসীরা সর্ব প্রথম এই অঞ্চলে অধিকার করে। ১৭৮৭ সালে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ও বাণিজ্যের উপলক্ষে ফরাসীরা প্রথম কোচিন-চীনে উপস্থিত হয় এবং বহু অধিবাসীকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। প্রায় ৫০ বছর পর ফরাসীদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে ও স্থানীয় খৃষ্টানদের রাষ্ট্রের প্রতি এই আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটে। তার ফলে ফরাসী নিপীড়ন এবং স্থানীয় খৃষ্টান অধিবাসীদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। ১৮৫৯ সালে ফরাসী ও স্পেন একযোগে এখানে সামরিক অভিযান পাঠায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজ তখন ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে বিব্রত ছিল; তা না হলে হয়ত ইংরেজ ফ্রান্সকে ঐ অঞ্চলে এতটা স্বাধীনতা দিত না। ১৮৬১।৬২ সালে আনাম ফরাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে সন্ধি স্থাপন করল। এবং কোচিন-চীন ফরাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

কোচিন-চীন হল আনামের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এবং কম্বোজের উত্তরে। এর পর ফ্রান্সের দৃষ্টি পড়ল কম্বোজের উপর। কম্বোজ রাজ্য প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে কম্বোজের যোগাযোগ প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। কম্বোজ পুরাপুরি ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে। কম্বোজের খমের (khmer) সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের একটা গৌরবের বস্তু। আনামও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; কিন্তু সেখানে চীনা-সভ্যতার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কোচিন জয় করার পরই কম্বোজকে নিজের ভাবে আনার জন্য ফ্রান্স তৎপর হল। ১৮৬৬

এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের উত্থান এবং প্রাচ্য এশিয়ার জাতি সমূহের প্রতি উৎসাহ ও প্রয়োচনা দান, প্রভৃতি মিলে ইন্দোচীনে অসন্তোষ ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল।

এরপর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানীরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্ব হতেই এশিয়া থেকে য়ুরোপীয় প্রভাব বিতাড়নের নেতারূপে নিজেকে জাহির করছিল। ফ্রান্সের পতন হওয়ার পরই জাপান ইন্দোচীনে অবতরণ করে এবং কার্যতঃ দখল করে। তখনও সে যুদ্ধে খোলাখুলি ভাবে যোগ দেয়নি। এই সময় জাপান যদি ইন্দোচীনের অধিবাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করত, যদি তারা ইন্দোচীনকে একটা অধীনস্থ রাজ্য বা উপনিবেশ বলে মনে না করে, স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে হয়ত অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত। জাপান এর দেড় বছর পর যুদ্ধে যোগদান করে। দু'তিন মাসের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকম সামরিক জয়লাভ ক'রে একেবারে চমক লাগিয়ে দেয়। এর তিন বছর পর যুদ্ধের গতি ফিরতে লাগল। জাপানের অধিকৃত প্রাচ্য এশিয়ার সমস্ত অঞ্চলে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি জেগে উঠল। ইন্দোচীনেও এই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হল। এখানে মনে রাখা দরকার যে ইন্দোচীন একটা একঠাম রাজ্য নয়। আনামী ও কম্বোজী দুটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় লোককে বিদেশী শাসন এক ক'রে রেখেছিল মাত্র। কম্বোজীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত; আনামীরা হল প্রধানতঃ কনফিউসীয় ধর্মাবলম্বী ও চৈনিক ও খৃষ্টিয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত: উভয়ের মধ্যে ভাষা ও রক্তের সম্বন্ধও নেই, সাংস্কৃতিক বন্ধনও নেই। বৈপ্লবিক ও জাতীয় আন্দোলন যা কিছু হয়েছে তার বেশির ভাগই আনামীদের মধ্যে। ইন্দোচীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ হল, তারও প্রধান স্থান ছিল আনাম এবং উদ্যোক্তা ছিল আনামীরা। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন ডাঃ হো চী মিন। জাপানের পরাজয়ের অল্পপূর্বে হো চী মিনের দল ভিয়েটমিন নামে এক দল গঠন ক'রে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। স্থানীয় লোকদের নিকট আনামের নাম হলো ভিয়েটনাম, শ্যামদেশের নাম তথাকার অধিবাসীদের নিকট থাইভূমি (Thailand)। ডাঃ হোর দলের নাম ভিয়েটমিন, এর অর্থ হল ভিয়েটনাম অগ্রণী দল—Viet Nam Front.

জাপানীদের পতনের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ডাঃ হো'র দল ভিয়েটনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Viet Nam Democratic Republic) নামে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করল।

জাপানীদের পরাজয় এবং ইন্দোচীন থেকে বিদায়ের পর আনামে হো চী মিনের দলই রাষ্ট্রের অধিকারী হল। মিত্রশক্তি কার্যতঃ এ সরকারকে মেনেও নিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস থেকে ভিয়েটমিন সরকারই ওখানে চালু ছিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজের ও অন্যান্য মিত্রশক্তির বাহিনী আনামে যেতে শুরু করল। ফরাসী সৈন্যও সেপ্টেম্বর মাসে ওখানে যায়। তখনও ফরাসী সরকার ওখানকার ভিয়েটমিন সরকারকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ফরাসীদের মনে আশা ছিল যে আগের মতো তারা ওখানে আধিপত্য বিস্তার করবে।

ইংরেজ ও এলব্যাজরা ভারতবর্ষে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন মেনে নিয়ে নিজেরা সরে পড়ল; কিন্তু ফরাসীরা তা করতে রাজী হয় নি। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ওখানে এক নির্বাচন হয়। তাতে ভিয়েটমিন দল অনেক বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়। ভিয়েটমিনদের এই জয়ে ফরাসী শাসকগণ খুশি হতে পারেনি। বর্তমান গোলমালের সূত্রপাত এখান থেকেই। এতদিন পর্যন্ত ডাঃ হো চী মিন ও তাঁর ভিয়েটমিন দল ঠিক কমিউনিষ্ট ছিল না। এই নির্বাচনের পর ফরাসীরা যখন শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করল, তখন থেকে ওখানকার কমিউনিষ্ট দল—টোঙ বো (Tong Bo) ও ভিয়েটমিন দলের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হল। জাপানী অধিকারের সময় ভিয়েটমিন দল গেরিলা যুদ্ধ বাহিনী হিসাবে আনামের বহুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ তাদের হাত থেকে ক্ষমতা নিতে হলে, যুদ্ধ করা ভিন্ন ফ্রান্সের কোন গত্যন্তর রইল না। সেটা যে খুব সহজ নয়, তা উপলব্ধি করে মার্চ মাসে ফরাসী সংঘের (French Union) অন্তর্গত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক (Republic) রাষ্ট্র হিসাবে ফ্রান্স ভিয়েটনামকে স্বীকার করে নিল। হো চী মিনের সরকারের সঙ্গে এই সর্তে এক সন্ধিও স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু এই সন্ধি শেষ পর্যন্ত মান্য করা হয়নি।

সন্ধি সর্ত ভঙ্গ করার জন্য উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের

উপর বোমাবর্ষণ করে। মোটের উপর ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ফরাসী বাহিনী ভিয়েটমিন সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করল। হো চী মিনের বিরুদ্ধে আনামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাও দাইকে স্বাধীন সম্রাট হিসেবে দাঁড় করিয়ে ফ্রান্স আনাম-বাসীদের ভুলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সকলেই ধরে নিল যে সম্রাট বাও দাই ফরাসীদের হাতের পুতুল।

অনেক আলাপ আলোচনা ও দরাদরির পর ১৯৪৯ সালের মে মাসে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ (French National Assembly) এক আইন পাশ করল তাতে ঠোঙ্কিন, আনাম ও কোচিন-চীনকে একত্র করে ফরাসী সংঘের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হল এবং সম্রাট বাও দাই তার শাসনকর্তা হলেন। তখন আনামের অধিকাংশ স্থান ভিয়েটমিন গরিলা বাহিনীর অধীনে। আজ ভিয়েটমিন দলকে

এবং ডাঃ হো চী মিনকে কমিউনিষ্ট বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। হয়ত নানা কারণে আজ ভিয়েটমিন দল সত্যই কমিউনিষ্ট প্রভাবে এসেছে। ১৯৪৬ সালে ডাঃ হো চী মিন ও তাঁর দল এভাবে কমিউনিষ্ট প্রভাবের অধীন ছিল না। ডাঃ হো চী মিন ব্যক্তিগতভাবে হয়ত বহুদিন যাবৎই মার্কস মতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব তাঁর উপর কিছু কম ছিল না। ইংরেজরা যে দূরদৃষ্টির পরিচয় ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে দেখিয়েছে ফরাসীরা যদি ৪৬-৪৭ সালে সে দূরদৃষ্টির পরিচয় ইন্দো-চীনে দেখাত, তাহলে হো চী মিন এতটা কমিউনিষ্ট প্রভাবে যেতেন না—এটা অনেকটা জোর করে বলা যায়। ডাঃ হো আনামে অত্যন্ত জনপ্রিয়; তার অত্যন্ত সাদা সিধা চাল চলতি, সহজ জীবনযাত্রা এবং জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁকে ও অঞ্চলে প্রায় গান্ধীর স্থান দিয়েছিল। তিনি বহুবার প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ফ্রান্সের সাথে আনামের সংযোগ ও সম্পর্ক ছেদ করতে তিনি ইচ্ছুক নন। কিন্তু ফ্রান্স সম্রাট বাও দাইর প্রতিক্রিয়ামূলক রাজ্য দাঁড় করার জন্য ব্যস্ত হল।

ব্রিটেন ও আমেরিকা বাও দাইর সরকারকেই স্বীকার করে নিল। অপরদিকে চীন ভিয়েটমিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানাল। কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়া, হাঙ্গেরি, পোলাণ্ড প্রভৃতি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ভিয়েটমিন রাষ্ট্রকে স্বীকার করল। অবস্থার চাপে পড়ে ভিয়েটমিন রাষ্ট্র কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্গত হতে বাধ্য হ'ল।

আট বছর ওই ক্ষুদ্র দেশে যুদ্ধ চলল ফ্রান্সের লোকক্ষয় এবং অর্থক্ষয় বহু হয়েছে ওই যুদ্ধে আমেরিকার অর্থ সাহায্য বাতীত ফ্রান্সের খাস তহবিল হতে খরচ হয়েছে বহু কোটি টাকা। কিন্তু এত লোকক্ষয় এবং অর্থক্ষয় করেও ফ্রান্স ভিয়েটনাম জয় করতে পারেনি। লাভের মধ্যে হয়েছে একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে চললে যে দেশ বহু গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত, তা আজ প্রায় সম্পূর্ণ কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়েছে;—ফ্রান্সের দূরদৃষ্টির অভাব এবং প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এই অবস্থার জন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাট্যের মূল সুর

শ্রীতারক ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেই এক একটা জীবন সত্য বিস্ফুরিত হয়ে ওঠে—তাঁর কাব্যে শুধু শিল্পের ফুলই ফুটে নেই, ভাবগভীর আদর্শের ফলও আছে। তাঁর নাটক পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলে তাকে মুদিত করেই শেষ হয় না—তার মনকে তার অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত করে তুলে নিগূঢ় সত্যের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই যে এক একটি তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট; কিন্তু তাঁর সমগ্র নাট্য প্রবাহের মধ্যে যেন একটি মূল সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সেই সুরটি হচ্ছে জীবনের সহজ প্রকাশ—সমস্ত আবিলতা সমস্ত আবর্জনা অপসারিত করে, জড়তার সমস্ত আবরণ ভেদ করে প্রাণের অভ্যুত্থান। রবীন্দ্র কাব্যের মধ্যেও এই সুরটি নানা ছলে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে কবি বিশুদ্ধ প্রাণবাদী না হলেও বেগবান্ প্রাণ প্রবাহের জয় তাঁর কাব্যে বহু বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে তাঁর কবিচিত্তের অসংখ্য ভাবনার একটি ভাবনামাত্র। দুই একটি কাব্য ছাড়া তিনি বিশেষ কোথাও প্রাণের সিঞ্চারিণী শক্তিকে কাব্যের মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করেন নি। বিচিত্র কল্পনার মধ্যে অবগাহন করেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি হয়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় একদিকে যেমন অপূর্ব রসরূপায়ণ, অপরদিকে তেমনই সমগ্র চিত্তের এক অচিন্ত্য ঊর্ধ্বায়ণ। কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই অতিপরিচিত বাস্তব জীবন ও জগৎ থেকে স্বতন্ত্র একটা ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত—তাঁর কবিতা যদি না আমাদের পরিচিত শিল্পকলার অনিন্দ্য মাধুর্য নিয়ে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ সঞ্চারিত করে দিত, তা হলে হয়তো সেগুলোকে বোধিগ্রন্থে নয় বলে মনে হত। তাঁর কল্পনার শিল্প-স্বর্গে আমাদের প্রতিদিনের হাসি-কান্নার স্থান নেই, বা থাকলেও, কবির আত্মরঙ্গভূমির ছটায় সেই আনন্দ বেদনা নবরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর কাব্যে আমরা বাস্তব জগতের দোঁয়া বা সন্ধ্যা প্রদীপের ক্ষীণ আলো পাই না—সেখানে পাই মেঘলোকের নিবিড় রুদ্ধ গাম্ভীর্য, স্থিরা দামিনীর দীপ্তি।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মনোভূমি কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ স্বর্গ নয়, আমাদের এই অতিপরিচিত জগৎই কবির ভাবদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদেরই হৃদয়ের বাসনা-কামনাকে তিনি রূপায়িত করেছেন—তাঁর নাটকের প্রতিটি চরিত্রে মানব হৃদয়ের ছাপনি আছে। অবশ্য ভাবদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে জীবনের জটিলতায় মানুষের আসল-বৈশিষ্ট্যটুকু হারিয়ে যেতে না দিয়ে তার সত্য পরিচয়কেই নিষ্কম্প শিখার মতো প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন—মানুষের প্রকৃতিকে কোথাও তিনি রামধনুর মতো একই সঙ্গে সাত রঙে বিশ্লিষ্ট করেন নি। মানবচরিত্রের নিখুঁত চিত্রণ করে তিনি তার সত্যরূপই গ্রহণ করে নাট্যলীলার মধ্য দিয়ে তাকে পরিস্ফুট বা ক্বচিৎ বিবর্তিত করে তুলেছেন। সেইসব চরিত্র কবিসৃষ্ট মায়ালোকে বিচরণ করে নি, আমাদের পরিচিত জগৎই তাদের বিহারভূমি।

কাব্যের মধ্যে কবির চিত্ত সমস্ত সংশয় সমস্ত বিরোধ অবলীলায় অতিক্রম করে নানা পথাবের মধ্য দিয়ে কেবলই বিকশিত হতে হতে চলেছে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে সংশয়ের মধ্যে অন্ধতার মধ্যে রেখে তাকে সবলে সত্যজিজ্ঞাসার পথে আকর্ষণ করেছেন। জীবনের সত্যরূপটা মানুষের কাছে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে; সে জীবনসত্যকে নানা আবরণে আবৃত করে ফেলেছে; যে বস্তুপুঞ্জকে, যে জড় সংস্কারকে সে

জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে বিদূরিত করে প্রাণশক্তিকে প্রকাশিত করার সংকল্পই যেন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। কাব্য জীবনে তাঁর জীবন সহজ স্বতোবিকাশশালী, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তিনি যেন সত্য অনুভূতিকে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিতে উদ্যত হয়েছেন। নানা ঘটনা সংঘাতের কুহেলিকা ভেদ করে তাঁর কবি কল্পনার সত্য প্রভাতসূর্যের মতো দীপ্ততর হতে হতে প্রকাশিত হয়েছে।

'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, "অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মহাশক্তির যে অনির্বচনীয় ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে, আপন হয়ে, ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালোবাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাইনে। তারা আমার এত আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে তো এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিতে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অন্যভাবে সমগ্র করে, আপন করে, লাভ করছে যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!"

এই সামঞ্জস্যের অভাবই মানুষের জীবনকে যেন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। তার ধনলোভ বা রাজ্যলোভ কোথাও স্ফীত হয়ে মানুষের প্রয়োজনের অন্নকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, তার ধর্মবুদ্ধি জড়তার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে কোথাও বা অন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছে আবার কোথাও বা মানবদাস ভগবানের অদ্ভুতর কল্পনায় মানুষকে প্ররোচিত করেছে। জীবনধর্মের, প্রাণশক্তির এই যে পঙ্গুতা, এই যে ব্যর্থতা, এর অবসানই রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের মূল সূত্র। মানুষের প্রাণশক্তিকে যথার্থ মুক্তি দিয়ে তার জীবনকে স্বাভাবিকী বলক্রিয়ার মধ্যে জাগ্রত করার কামনাই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে বার বার প্রণোদিত করেছে। তাঁর সমগ্র নাট্যরচনার মধ্যে বিরুদ্ধতার বহুবিধ রূপ ও প্রাণের অমিত তেজে প্রকাশের বিচিত্র কল্পনা ফুটে উঠেছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে দেখি যে এক সন্ন্যাসী জগতের সব কিছুকে ফেলে দিয়ে, সংসারের সমস্ত বন্ধনকে আবর্জনার মতো পরিত্যাগ করে নিজেকে সমাজের বাইরে অপসৃত করেছে। তার বিশ্বাস এই যে হৃদয়বৃত্তিকে ছেদন করলেই সত্যলাভ সম্ভবপর হবে। কিন্তু হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করে সে-যে জীবনের মূল সত্যকেই অস্বীকার করে বসেছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরে সত্যের স্পর্শতার কাছে এসে তার বিচ্ছিন্ন হৃদয়কে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত করে তুলল। এই নাটকের শেষে বালিকার মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর আকুলতা শোকমাত্র নয়, তা আর কৃচ্ছ্র পীড়িত জীবনের বিচ্ছিন্ন খাতে হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বসিত প্লাবন। 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির জীবনেও এমনিই একটি উচ্ছ্বাস দেখা গেছে জয়সিংহের মৃত্যুতে। প্রাণকণিকা যে কী অমূল্য সম্পদ তা যতদিন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি, ততদিন তিনি ধর্মের কাছে মানুষের জীবনকে, তার সাধনাকে বলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি—দেবীর অঞ্জন শুধু ছাগরক্তে কেন, রাজরক্তে ভাসিয়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু যখন প্রাণের প্রকৃত মূল্য তাঁর কাছে জয়সিংহের মৃত্যুতে প্রকাশিত হল, তখন তাঁর সমস্ত মোহ, সমস্ত দম্ভ, লোকধর্মের প্রতি সমস্ত আনুগত্য এক মুহূর্তে অপসারিত হল।

বস্তুত লোকধর্মকে, আচারকে আমরা এমনিই একটা অচল পাথরের বেদীতে বসিয়ে তাকে চিরন্তন বলে কল্পনা করি যে মানুষের জীবনকেও তার কাছে বলি দিতে আমরা দ্বিধা বোধ করিনা। এই জন্যই ধর্মের নামে আমরা এমন একটা কারাগার গড়ে তুলি যে, সে কেউ তার কঠিন নিয়মচর্চায় এতটুকু শৈথিল্য দেখায় তাকে অনেক আঘাত

সহ্য করতে হয়।—যে সব মহাপ্রাণ সত্যের যথার্থ রূপটিকে প্রকাশিত করবার ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁদের অজস্র অপমান, নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

'মালিনী' নাট্য কাব্যটি ধর্মের প্রচলিত রূপের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষার পুঞ্জের মত নির্মল নির্বিকল্প হয়ে শুব্ধ হয়ে ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকল্প তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে ছতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মনুষ্যের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্ধ মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"—

"কাহিনী"র নাটকবিতায় ধর্মের লোকায়ত সরলীকৃত কৃত্রিম রূপের বিরুদ্ধে সত্যানুসন্ধিৎসু চিত্তের অভিযোগ আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি এখানে যে ধর্মের কথা বলেছেন তা অধ্যাত্মপিপাসা নয়, আবার পাশ্চাত্য আদর্শের ময়্যালিটিও নয়—জীবনের মধ্যে ওতপ্রোত যে সত্য আদর্শ রবীন্দ্রনাথ এখানে তারই জয়গান করেছেন।

ধর্ম যখন কোনো একটা বিশিষ্ট আচার পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে যে কী নির্জীবতা কী কঠোরতা এসে পড়তে পারে 'অচলায়তনে' তার একটা রূপ দেখা যায়। এই নাটকে গোপপাংশুদের কর্মনিষ্ঠা বা দর্ভকদের ভক্তিবিহ্বলতার মধ্যে যে একদেশদর্শিতা বা সামঞ্জস্যের অভাব আছে বটে, কিন্তু তা অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ অনুবর্তনপন্থীদের ভয়াবহ আচার-নিষ্ঠার তুলনায় উপেক্ষণীয়। খোঁড়াগীর অচলায়তনে আবদ্ধ হয়ে ধর্ম শুধুই বিকৃত হয়ে ওঠে না, মানুষের সমস্ত প্রাণশক্তিকে সে আচ্ছন্ন করে ফেলে তার প্রকাশের নবতর সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে। আচারের দাস হয়ে মানুষ ক্রমে ক্রমে তার প্রাণধর্মকেই অস্বীকার করে বসে। তখন অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙার মতো একটা বড়ো বিপ্লবের আয়োজন দেখা যায়।

'নটির পূজা' নাটকের মূল সুরটিও এইভাবে অনড়, জীর্ণ, বিকৃত ধর্মাদর্শের জায়গায় নতুন প্রাণময় সহজ ধর্মকে প্রাণ দিয়ে বরণ করার কাহিনীতে বেজে উঠেছে। যে প্রাণশক্তিকে নটী নবধর্মের বেদীতে নিবেদন করেছে, তা জরাজীর্ণ প্রাচীন পদ্ধতিকে অপসারিত করবার শক্তি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছে। নটীর আত্মদান রাজরোষে মৃত্যুমাত্র নয়, তার প্রাণদানে মানুষের অন্য প্রাণশক্তিরই জয় ঘোষিত হয়েছে। এই প্রাণশক্তির কাছে সমস্ত বাধা, সমস্ত বিকৃতি, বিপদের সমস্ত সম্ভাবনা তুচ্ছ হয়ে যায়। এই শক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের মূলে বর্তমান। যে ধর্ম মানুষের বিচিত্র শক্তির বিচিত্র লীলা স্বীকার করে না, তার মধ্য থেকে জীবনের পরম সত্যটুকু অন্তর্হিত হয়ে যায়; অথচ তার প্রাচীন আবরণে প্রাণশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য তার কী নিদারুণ অপচেষ্টা! কিন্তু সমস্ত আবরণ ভেদ করে, সমস্ত জীর্ণতা পরিহার করে প্রাণের প্রকাশ হয়, সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

কেবল ধর্মের মধ্যে নয়, আমাদের জীবনে এমন বহু অর্থহীন অভ্যাস বা সংস্কার আছে, যেগুলোর পায়ে আমরা দাসখত লিখে দিয়েছি। কোথাও বা সেগুলো মূঢ় সংস্কার, আবার কোথাও বা সেগুলোর সঙ্গে স্বার্থবোধ জড়িত হয়ে থাকে। জীবনের সত্য উপলব্ধি সেই সব অন্ধতায় হারিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সব নিরর্থ অভ্যাস বা সংস্কারকে নাটকের মধ্যে চিত্রিত করে সত্যের আলোকে মূঢ়তার অন্ধকার অপসারিত করে দিয়েছেন।

'মুক্তধারা'র মধ্যে প্রবল জাতীয়তা ধর্মের স্থান

নিয়েছে। এখানে দেবতাকে রাজ্যের শাসকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তরকূটের অধিবাসীরা মনে করে যে প্রকৃতি যে ধনের ভার দিয়েছে তাতে একমাত্র তাদেরই অধিকার, তাদের পূজাতুষ্ট দেবতা ভৈরব তাদের পক্ষ হয়ে শিবতরাইয়ের লোকদের শাস্তি বিধান করবেন। এই স্বার্থজড়িত সংস্কার মানুষের মনকে যে কতখানি বিকৃত বিষাক্ত করে তুলতে পারে 'মুক্তধারা'য় তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিকার, এই বিষাক্ত এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে অভিজিৎকে জীবন দিয়ে এর দূর করতে হয়েছিল। বাঁধভাঙা মুক্তধারা প্রাণ বন্যারই প্রতীক—সমস্ত প্রতিরোধ ভাসিয়ে দিয়ে সে একদিন প্রবাহিত হবেই—এ যেন প্রকৃতিরই নির্দেশ।

'ফাল্গুনী'র মধ্যে চিরপ্রবহমান প্রাণধারার শাশ্বতী মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। আমাদের চারপাশে জড়তার আবরণ এত প্রবল; এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন প্রাণের ধারা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেছে—শুধু বিজ্ঞতার, সতর্কতার নিষেধবাণী চারদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে। কিন্তু শীতের পরে বসন্তের আবির্ভাব যেমন সুনিশ্চিত, সব আবর্জনা সব জড়তা অপসারিত করে দিয়ে প্রাণের অভ্যুত্থানও তেমনই অবশ্যম্ভাবী। 'ফাল্গুনী'র গীতিনৃত্য নাট্যকাহিনীতে প্রাণের নবীনরূপে আবির্ভাব ঘোষিত হয়েছে।

'কালের যাত্রা' আর 'তাসের দেশ' নাটক দুটিতেও অভ্যাসজীর্ণ পুরাতনের পরাভব আর নবীনের প্রকাশ ব্যক্ত হয়েছে। 'কালের যাত্রা'য় পুরাতন সমাজবিধির জীর্ণতা, ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—সেই সঙ্গে অবহেলিত মানব-শক্তির উত্থানের কল্পনা আছে। 'তাসের দেশ' অভ্যাসের মরুভূমিতে প্রাণের বর্ষণধারা এই দুটো নাটকে কোনো দৃঢ়মূল প্রবল বিরুদ্ধশক্তি নেই, কিন্তু আচার, সংস্কার, অভ্যাস যে কী করে আমাদের নজ্জায় নজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে আমাদের দুর্বল করে তুলেছে তার ছবি আছে।

'ডাকঘর' আর 'রক্তকরবী' নাটকদুটির মধ্যে এই সুরটি শিল্পকলায় অপরূপ হয়ে বেজে উঠেছে। 'ডাকঘরে'র মধ্যে দেখি, চারদিকে অভ্যস্ত দিন যাপনার বাঁধা প্রাণের সত্তা প্রকাশ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরন্তনী প্রাণশক্তির যে সুরটি অহরহ বেজে চলেছে, মানুষের জীবনের কোলাহলের মধ্যে তা শোনা যায় না। সেই সুরের স্পর্শ এসে লাগে গৃহকোণে আবদ্ধ বালকের মনে—প্রাণের সর্বব্যাপী প্রকাশ তার সচকিত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। 'রক্তকরবী'তে প্রাণবন্যার যে সুরটি বেজে উঠেছে সেটি হচ্ছে ফসল কাটার সুর। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'—এ ডাক শুধু প্রয়োজনের নয়, এ যেন সারা প্রাণকেই প্রকৃতির লীলাবিকাশের মাধুর্যে পরিপূরিত করে তোলা। যান্ত্রিকতা প্রচণ্ড হয়ে উঠে মানুষের শোণিতপান করছে—মানুষের প্রাণ অতৃপ্ত থেকে হাহাকার করে ওঠে—মানুষ যে যন্ত্র হয়ে যেতে পারে না! নন্দিনী যে রক্তকরবীর সন্ধান নিয়ে আসে, প্রতি মানুষের হৃদয়ের গভীরে যে তার জন্য একটা কামনা আছে। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিকতার নেতা রাজাকেও সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আবরণ ধ্বংস করে লীলাময় প্রাণধারায় নিজেকে মিলিয়ে দেবার জন্য প্রলয়-সাধনা করতে হয়। হৃদয় যেখানে উপবাসী থাকে সেখানে নীরস যন্ত্রের আশ্রয়ে মানুষের মন তিলে তিলে বিদিয়ে উঠতে থাকে। সেই যন্ত্র কারাগারের বিষবাষ্প থেকে প্রাণকে মুক্ত করবার জন্য মানুষকেই সাধনা করতে হবে। প্রয়োজন হলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তার অমর প্রাণশক্তির চরম উদ্বোধ ঘটতে পারে।

নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে এমন একটি জীবনদর্শনকে বারে বারে বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা জীবন চিত্রের মধ্যে প্রস্ফুরিত করে তুলেছেন, এ বড়ো বিস্ময়ের কথা। তাঁর কাব্য সম্ভারের মধ্যে একটিমাত্র মূলতত্ত্বের এমন নানাভাবে প্রকাশ দেখা যায় না। কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রসগত সিদ্ধিকেই বড়ো করে দেখেছেন—জীবনজিজ্ঞাসা যেন তাঁর কাছে বহু ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে পড়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে তত্ত্ব থাকলেও সেগুলোর মধ্যে যে সচেতন শিল্প রচনা আছে, তা স্মরণযোগ্য। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই একটি শঙ্কটকেই নানাভাবে রূপায়িত করেছেন। কেবল ভাব-জীবনের বহু বিচিত্র ভঙ্গিকে অবলম্বন করায় সেগুলোর মধ্যে স্বাদের বৈচিত্র্য এসেছে। সেক্সপীয়রের নাটকে বহির্জীবনের বিচিত্র ঘটনাই প্রাধান্যলাভ করেছে; কিন্তু ভাবদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথের নাটকে অন্তর্লীন প্রাণ-লীলাই তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।

মণিপুর প্রসঙ্গ (১১)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মণিপুরের রাজনীতিতে পর পর যে দুইজন প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন—থাঙ্গাল জেনারেল ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ। মণিপুরে তাঁহাদের মত দেশ প্রেমিক খুব কমই জন্মিয়াছেন; এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে চরম দণ্ড তাঁহারা বরিয়া লইয়াছিলেন—সকল দেশে এবং সকল যুগে খুব কম লোকই তাহা গ্রহণ করিতে সাহস করে।

থাঙ্গাল জেনারেল—

মণিপুরের ইতিহাসে থাঙ্গাল জেনারেল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হইলেও লোকে তাঁহাকে থাঙ্গাল মেজর বলিয়াই ডাকিত। সাধারণ মণিপুরীদের চেয়ে তিনি ঈষৎ কালো এবং খর্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সবল দেহ, উন্নত নাসিকা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিত। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তাঁহার কর্মশক্তি অটুট ছিল। কেহ কেহ বলেন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল নাগাকুলে, পরে মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মণিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। তিনি ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া সারা জীবন মণিপুরের সেবা করার পর ১৮৯১ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে ইংরেজের ফাঁসি-কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করেন। মারজিৎ সিং যখন মণিপুরের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে নিকটতম জ্ঞাতিদের হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন এই থাঙ্গাল মেজরের পিতৃব্য কৌশলে মারজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীর সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। থাঙ্গাল মেজর অতি অল্প বয়সেই রাজদরবারের কাজে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একবার তিনি থাঙ্গাল গ্রামের বিদ্রোহী নাগাদিগকে সায়েস্তা করার জন্য সংকারী হিসাবে মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নাম হয় থাঙ্গাল। ইহার পর যদিও তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজসরকারে অনেক উচ্চপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি "থাঙ্গাল মেজর" নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৪ সনে নরসিংহের বিরুদ্ধে মহারাণী কুমুদিনী দেবীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর তিনিও মহারাণীর সঙ্গে কাছাড়ে যাইয়া নাবালক চন্দ্রকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৫০ সনে নরসিংহের মৃত্যুর পর চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে তিনিও পুনরায় মণিপুরে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার সাহায্য না পাইলে চন্দ্রকীর্তির পক্ষে সিংহাসন উদ্ধার করা সম্ভব হইত কিনা বলা যায়না। মহারাজ চন্দ্রকীর্তির সিংহাসন আরোহণের পরও কোন প্রকার গুরুতর এবং বিপদজনক কাজ উপস্থিত হইলেই তাহার ভার পড়িত থাঙ্গাল মেজরের উপর। অকৃত্রিম আনুগত্য এবং রাজসেবার ফলে তিনি মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজদরবারে একজন প্রধান সভাসদরূপে বিবেচিত হইতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন মহারাজ চন্দ্রকীর্তির রাজ্যের একটি দৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ। কিন্তু এক সময় কোন কারণে মহারাজের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহাকে রাজদরবারের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কুলক সাহেব তখন মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট। মণিপুরে আসিয়াই তিনি তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মহারাজ পুনরায় থাঙ্গাল মেজরের উপর সদয় হইয়াছিলেন। চালচলনে তত মার্জিত না হইলেও তাঁহার মন এবং মুখ এক কথা কহিত। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির;

কিন্তু বিদ্রোহী প্রজাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম দূতের ন্যায় ভয় করিত। ইংরেজী-ভাষা না জানিয়াও তিনি ইংরেজের স্বভাব এবং রীতিনীতির খবর রাখিতেন। মণিপুরের ভৌগলিক আয়তন এবং বিভিন্ন যায়গার অবস্থান তাঁহার নখদর্পণে ছিল। ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত মণিপুরের সীমা নির্দ্দেশক কমিশনের সঙ্গে তিনি মণিপুরের প্রতিনিধি হিসাবে স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজের শক্তিসামর্থ্যের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সেইজন্য তিনি কখনও ইংরেজকে চটাইতে চাহিতেন না। কিন্তু যেখানে মণিপুরের স্বার্থ জড়িত আছে, সেখানে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করিয়া জানকবুল করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাঁহার মত লোক যে কোন বড় রাষ্ট্রের কর্ণধার হইতে পারিতেন। মহারাজ চূড়াচন্দের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ভাব ছিল; সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের প্রতাপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্য বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। টিকেন্দ্রজিৎও খাজাল মেজরকে ভয় করিয়া চলিতেন। চূড়াচন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতির পর টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখার জন্য পুনরায় রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজদরবারে আগের মত তাঁহার প্রাধান্য বজায় থাকিলে চূড়াচন্দ্রকে হয়ত এই-ভাবে মণিপুর হইতে বিদায় লইতে হইত না এবং সেই সম্পর্কে মণিপুরের ঘটনাবলিও এতদূর গড়াইত না। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ যতই থাকুক ইংরেজের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধিয়া গেল তখন তিনি নিজের কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। পুত্রশোকগ্রস্ত কোন পিতার প্ররোচনায় এবং পুরাণোক্ত নির্দ্দেশের প্রতি অবিচলিত আস্থার বশে ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাণদণ্ডের নির্দ্দেশ দিয়া তিনি নিজেও ডুবিলেন এবং মণিপুরকেও ডুবাইয়া গেলেন। এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার বশে বিবেক বুদ্ধি না হারাইলে তাঁহাকে জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ইংরেজের ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইত না এবং আশ্রিতের হত্যার কলঙ্কে মণিপুরের ইতিহাসও কলঙ্কিত হইত না।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ—১৮৫৮ সনে টিকেন্দ্রজিতের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। লেখাপড়ায় তেমন মনো-যোগ না থাকিলেও মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি পরিষ্কার বাংলা এবং হিন্দীভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেবের নিকট তিনি কিছুদিন ইংরেজীও পড়িয়াছিলেন. কিন্তু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। ১৫ ১৬ বৎসর বয়সেই ব্যাঘ্রাদি ও ভয়ানক জন্তু শিকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বল ছিল অসীম। মুক্ত তরবারি হস্তে বড় বড় বাঘের সম্মুখে একাকী লাফাইয়া পড়িতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি এইভাবে সর্বদা ব্যাঘ্র শিকারের অন্বেষণে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'কৈরেং' বলিয়া ডাকিতেন। মণিপুরীগণও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে ভালবাসিত। ২১ বৎসর বয়সে তিনি পিতার নির্দেশে জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে নাগা যুদ্ধে যাইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। সেকালে ভারতের রাজা মহারাজা এমনকি ছোটখাট জমিদার পরিবারে পর্যন্ত বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সেই চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জনান্তরে ৮টি বিবাহ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শারীরিক শক্তিতে মণিপুর রাজ্যে তাঁহার কোন জুড়ি ছিল না। পলো খেলাতেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। শ্রীমতী-পত্নী তাঁহার গ্রন্থে টিকেন্দ্রজিতের উদার এবং অমায়িক স্বভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ অন্যান্য রাজপুরুষের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার বিবেচনায় কাহাকেও কোন অন্যায় কার্য করিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। স্থান কাল পাত্র ভেদে ন্যায় অন্যায় বোধেরও তারতম্য হয়। একজন ইউরোপীয়ের নিকট গো-হত্যা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও একজন

মণিপুরীর নিকট তাহা নরহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। একবার টিকেন্দ্রজিৎ একজন নাগাকে গো-হত্যার অপরাধে কঠোর শাস্তি দেন, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। এই আচরণের জন্য তিনি জনষ্টন সাহেবের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্তির মৃত্যুর পর টিকেন্দ্রজিৎ যে রাজ্যের মধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিবেন এ সম্বন্ধে জনষ্টন সাহেবের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহার হাতে ক্ষমতা গেলে মণিপুরের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাও যে অপরিবর্তিত থাকিবে না জনষ্টন সাহেব একথাও ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টদের বিরাগভাজন থাকা নিজের পক্ষেই ক্ষতিকর বিবেচনা করিয়া পরবর্তী এজেন্টদের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রক্ষা করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রীনউড সাহেবের সহিত তাঁহার বেশী রকম মাখামাখি হইয়াছিল। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা এবং আনুসঙ্গিক চিঠি পত্রাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া সুরচন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতির ব্যাপারে গ্রীনউড সাহেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পরোক্ষ সমর্থন না থাকিলে টিকেন্দ্রজিৎ এরূপ করিতে সাহস করিতেন কিনা এবং সাহায্য না পাইলে এত সহজে সফল হইতেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এই ঘটনাই টিকেন্দ্রজিৎ এবং মণিপুরের কাল হইল। ভারত সরকারের অহেতুক ক্রোধের ফলে কুইন্টন, গ্রীনউড, প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারীগণ প্রাণ হারাইলেন। তাহাদেরই রক্তের প্রতিশোধে দলে দলে ইংরেজ সৈন্য মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ পতাকা উড়াইল। বিচার-প্রহসনের দ্বারা টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসি দিয়া ইংরেজ শাসকদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে ৯ বৎসরের একমাত্র পুত্র চৌবাকে রাখিয়া মণিপুরের বীর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সমস্ত মণিপুরকে শোকগ্রস্ত করিয়া নির্ভিক চিত্তে মৃত্যু দণ্ড গ্রহণ করেন। সেদিন অসহায় মণিপুরের রমণীগণ চোখের জলে এই মৃত্যু দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই প্রতিবাদ আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অন্য একটী মহিলা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট পৌছিয়াছিল কিনা, তাহা কে জানে!

অন্তর্ধান মেঘ

পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রীনউড সাহেব সুরচন্দ্রের মণিপুর হইতে বিদায় হওয়ার সময়, তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এই মর্মে একটি ছাড়-পত্র তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। কাছাড়ে আসিয়া সুরচন্দ্র এই ছাড়পত্রের অর্থ অবগত হওয়া মাত্রই তারযোগে ভারত সরকারের নিকট ইহার প্রতিবাদ জানান ("Just now opening Political Agent's Pass learn that I abdicated, wholly untrue. Political Agent misunderstood me, shall submit full representation later on. Solicit reconsideration and help"—Correspondence relating to Manipur—1891 P. 8)। অতঃপর তিনি এক চিঠিতে জানান—"আমি যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম এবং সকল লোকেই আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মিঃ গ্রীনউড সে পক্ষে মত দিলেন না। অধিকন্তু রেসিডেন্সি রক্ষকগণের দ্বারা আমার অনুগত সৈন্যগণকে তিনি নিরস্ত্র করিলেন।" ইহার উত্তরে গ্রীনউড সাহেব লিখিলেন, "অপরাহ্নে রেসিডেন্সিতে এত অধিক সংখ্যক মণিপুরী একত্র হইল যে, আমি তাহাদের অনেককে (বিশেষতঃ অস্ত্রধারীগণকে) জিনের সহিত বিদায় করিলাম।...রাত্রে রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কাও না হইতেছিল এমত নয়। তদবস্থা ঘটিলে যাহাতে সে সব রক্ষা পায়..... আমি পূর্বোক্ত মত কার্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে

মহারাজের মনে যে অত্যন্ত কষ্ট হইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন লোকে বলিবে যে আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়াছি। তৎপরই তিনি গদি পরিত্যাগপূর্বক উদাসীনাবস্থায় বৃন্দাবন গমনের কথা উত্থাপন করিলেন।" (বঙ্গানুবাদ)। অথচ সুরচন্দ্রের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর তিনি চীফ কমিশনারের নিকট তারযোগে সংবাদ দিয়াছিলেন—

রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কা করিবেন না। মহারাজ এবং তাঁহার ভ্রাতারা লোক সংগ্রহ করিয়া সৈন্যশিবিরে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন।

(বঙ্গানুবাদ)

রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কা স্পষ্টতই গ্রীনউড সাহেবের পক্ষাৎ কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। চিফ্ কমিশনার সুরচন্দ্রের রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়নের সংবাদ পাওয়া মাত্রই গ্রীনউড সাহেবকে তারযোগে জানাইয়াছিলেন, —"উপদ্রবের মধ্যে আপোষ করিবার চেষ্টা করিবেন না। আবশ্যক বোধ করিলে, সৈন্য পাঠাইবার জন্য তিনি যেন সংবাদ দিবেন। সেখানকার সেনানায়ককে আপনার নিকট দুইশত বন্দুকধারী পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইল।" (বঙ্গানুবাদ)। কিন্তু গ্রীনউড সাহেব সেই উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অবিলম্বে নিজ দায়িত্বে সুরচন্দ্রকে নিরস্ত্র করিয়া কাছাড়ে পাঠাইয়া দিলেন। সুরচন্দ্র যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন পুনর্দখল করিতে ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট ছিলেন উভয়ের পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীনউড সাহেব তাঁহাকে নিরস্ত্র করার পর—তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া কুলচন্দ্রকে মণিপুরের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যোগী আরম্ভ করিয়া দিলেন। মণিপুরে থাকাকালে সুরচন্দ্রের এমন কোন চিঠি-পত্র পাওয়া যায় না যাহাতে প্রমাণিত হয় তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বন্ধু টিকেন্দ্রজিতের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ সফল করিবার উদ্দেশ্যে গ্রীনউড সাহেব নিজেই এই কথা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠিপত্রে টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে একটি কথারও উল্লেখ না থাকায় এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়।

গ্রীনউড সাহেব মণিপুরে আসার পরই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—সুরচন্দ্র ইংরেজের যতবড় মিত্রই হউক—আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবেন না। রেসিডেন্সি রক্ষার্থ সৈন্য সংখ্যা বাড়ানর অনুমতিও তিনি দেন নাই। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন গোড়া হিন্দু, সেইজন্য গ্রীনউড সাহেবের ব্যক্তিগত অনেক আচরণ তিনি পছন্দ করিতেন না। রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর তিনি সেখানে জাতি নষ্ট হওয়ার ভয়ে জল গ্রহণ পর্যন্ত করেন নাই। একবার গ্রীনউড সাহেব মণিপুরী ভদ্রমহিলাদের ছায়াচিত্র তোলার ইচ্ছায় মহারাজের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। মর্যাদাহানিকর বিবেচনা করিয়া মহারাজা ইহাতে সম্মতি দেন নাই। অবশেষে টিকেন্দ্রজিতের যোগাড়যন্ত্রে গ্রীনউড সাহেব গোপনে কতিপয় চিত্র তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজের এই সব আচরণের জন্য গ্রীনউড সাহেবও তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন।

পক্ষান্তরে টিকেন্দ্রজিৎ গ্রীনউড সাহেবকে সহজেই বুঝিয়া লইয়াছিলেন। মণিপুরের মত ইংরেজ বর্জিত দেশে তিনি সর্বদা গ্রীনউড সাহেবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পলো খেলা এবং শিকারে সহযোগিতা দ্বারা নিঃসঙ্গ ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টকে আনন্দ দান করিয়া অচিরেই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় গ্রীনউড সাহেবের নত নূতন এবং অনভিজ্ঞ কর্মচারী সহজেই তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

রাজ্যচ্যুত সুরচন্দ্র, আসামের চিফ কমিশনার কুইন্টন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে শিলচরে আসেন। কিন্তু কুইন্টন সাহেব তখন স্থানান্তরে থাকায় তিনি কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলেন।

চিফ্ কমিশনারের প্রধান সেক্রেটারি কলিকাতার পুলিস কমিশনারকে তারযোগে এই সংবাদ জানাইয়া মহারাজের সঙ্গে একজন পুলিস ইনিস্পেক্টর মোতায়েন করেন। উক্ত ইনিস্পেক্টর তখন তাঁহাকে কলিকাতার পুলিস কমিশনারের হাতে সমর্পণ করিয়া চলিয়া আসে। এইভাবে রাজবন্দীর মত কলিকাতা আসিয়া ইংরেজের সাহায্য লাভের আশায় ভারত-গভর্ণমেণ্ট এবং আদালতের চিফ্ কমিশনারের নিকট পত্রদ্বারা লিখিয়া জানাইলেন যে, "……ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ পলিটিক্যাল এজেণ্ট, আমার রাজধানীতে সর্বদা অবস্থিতি করেন। যদিও আমি রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম, অথচ আমার আপদ বিপদে গভর্ণমেণ্ট আমাকে রক্ষা করিবেন ও আশ্রয় দিবেন এ ধারণা আমার মনে সর্বদাই ছিল। ইতিপূর্বে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমার পিতার প্রভুত্ব রক্ষার সহায়তা—এবং কেহ তাঁহার অধিকারের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন (Govt. Order Feb. 1851)। আমার নিজের পক্ষেও যে সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে, আমার তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি মুহূর্তের জন্যও ভাবি নাই যে, আবশ্যক হইলে, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিশ্রুত সাহায্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন. আমার সমরেই গভর্ণমেণ্ট দুইবার (অর্থাৎ বড় চৌবা এবং যোগেন্দ্র সিং বিদ্রোহী হইলে) বল প্রয়োগ করিয়া মণিপুরের শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। মণিপুরে সেরূপ শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্যভাব প্রদর্শন করা হয়, ইহা নিশ্চয়, তাহা যে গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন, আমি কখনও ভাবি নাই।" (১৪ই নভেম্বর, ১৮৯০ সনের পত্রের বঙ্গানুবাদ)।

সুরচন্দ্রকে পুনরায় মণিপুরের সিংহাসনে বসিতে সাহায্য করা সম্পর্কে ভারত সরকারের তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু গ্রীমউড সাহেব চিফ্ কমিশনারের নিকট লম্বা চিঠি দ্বারা তাহার মনে সুরচন্দ্রের অনুপযুক্ততা সম্পর্কে ধারণা জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার মতে সুরচন্দ্র পুনরায় ফিরিয়া আসিলে রাজ্যে সমূহ অনর্থ ঘটিবে এবং সেজন্য ইংরেজ সরকারকেও নানা দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে (পত্র নং ৩৪১ সি. ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯০ সন)। আমলাতন্ত্রের নিয়মানুসারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধীনস্থ কর্মচারীদের বিবরণ সর্বদাই বেদবাক্যবৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিফ্ কমিশনার কুইন্টন সাহেব পলিটিক্যাল এজেণ্টের মত-ই সমর্থন করিয়া ভারত সরকারের নিকট পত্র দেন (পত্র নং ৪২০ পি. ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৯০ সন, পত্র ১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন. পত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন)। বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন এক তারে (তার সংবাদ নং ২৭ এন-ই. ৪ই জুন, ১৮৯১ সন) জানাইয়াছিলেন।

৪ন। ……আমরা তাঁহাকে পুনঃস্থাপিত ও মণিপুর রাজ্যে তাঁহার প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কুইন্টন পত্রদ্বারা ও নষ্টীভাষিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধির নিকট তদ্বিরুদ্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত মৌখিক আপত্তি করায়, আমরা ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। গ্রীমউড ও মহারাজের পুনঃস্থাপনের বিরোধী ছিলেন। ৬ষ্ঠ। তথাচ আমাদের মন্ত্রীপ্রাপ্ত একজন অধিপতির বিরুদ্ধে যে কোন রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইবে—ষড়যন্ত্রকারীরা যে কোন শাস্তি পাইবে না এবং মণিপুরের রাজশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে সেনাপতির হস্তগত হইবে—ইহা আমাদের অসহ্য হইয়াছিল।…… এই হেতু সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত করা আমরা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম কুইন্টন যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই।" (বঙ্গানুবাদ)।

অবশেষে ভারত গভর্ণমেণ্ট কুইন্টন সাহেবকে জানাইলেন যে, "১ম। যদি কুলচন্দ্র মণিপুরের ব্রিটিশ

রেসিডেন্সিতে রক্ষক সৈন্য রাখিতে বেন : ২য়। পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শ মত রাজকার্য চালাইতে সম্মত হন এবং ৩য়। টিকেন্দ্রজিতের নির্বাসনের অনুমোদন ও তৎপক্ষে সাহায্য প্রদান করেন, তবে তাঁহাকেই ভারত গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন।" (তার সংবাদ ১৮ই মার্চ ১৮৯১ সন, বঙ্গানুবাদ।) লর্ড ল্যান্সডাউনের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল প্রস্তাবে দুর্বল কুলচন্দ্র অবশ্যই সম্মত হইবেন। এদিকে স্থির হইল সুরচন্দ্রের নিকটও লেখা হইবে—তিনি আর রাজত্ব পাইবেন না—কুলচন্দ্রকেই মহারাজা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন।" যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া হইবে। তাঁহাকে বৃত্তিভোগী হইয়া গভর্ণমেণ্টের মনোনীত স্থানে থাকিতে হইবে। যাঁহারা সুরচন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়া কুলচন্দ্রকেই সিংহাসন দেওয়া হইবে : কিন্তু সুরচন্দ্র বিনা দোষে নির্বাসিত থাকিবেন ভারত সরকারের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার সমর্থনে কোন যুক্তি খাটে না। সুরচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি দুর্বল; কিন্তু কুলচন্দ্রেরই বা এমন কি অধিকতর যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সুরচন্দ্র বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় সর্বদা জনষ্টন সাহেবের পাশে পাশে থাকিয়া তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এই দুঃসময়ে উপরোক্ত সর্তে তাঁহাকেই মণিপুরের সিংহাসনে বসিতে সাহায্য করিলে—ন্যায় বিচার হইত।

ভারত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে চিফ্ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব ৭ই মার্চ গোলাঘাট হইতে মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্ণেল স্কীনের অধীনে আসামের ৪ শত বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্য ছিল। শিলচর হইতেও আরও ২ শত গুর্খা সৈন্য মণিপুরের দিকে রওনা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের আদেশ ছিল টিকেন্দ্রজিৎ যাহাতে কোন প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে বা গোল বাধাইতে না পারে এমন কোন উপায়ে তাঁহাকে বন্দী করিয়া নির্বাসিত করিতে হইবে (পত্র নং ৩৮০ই, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন বঙ্গানুবাদ)। কুইণ্টন সাহেব টিকেন্দ্রজিৎ এবং মণিপুর রাজ্যের ভাবগতিক জানিবার জন্য অধীনস্থ এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার গর্ডন সাহেবকে মণিপুরে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যথা সম্ভব সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ১৮ই মার্চ কইরং নামক স্থানে চিফ্ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রীমউড সাহেব মিঃ গর্ডনকে জানাইয়াছিলেন যে "টিকেন্দ্রজিৎ কখনই আত্মসমর্পণ করিবেন না এবং তাহাকে বন্দী করাও সহজ নয়।" মিঃ কুইণ্টন মিঃ গর্ডনের নিকট এই সমস্ত শুনিয়া গভর্ণর জেনারেলের আদেশ জ্ঞাপনার্থ দরবার ডাকিয়া সেখানে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন [তার সংবাদ—১৮ই মার্চ ১৮৯১ সন, আসামের চিফ কমিশনার (ক্যাপ্টেন কৈরং) হইতে কলিকাতা ভারত গভর্ণমেণ্টকে]। অথচ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট লর্ড ল্যান্সডাউনের তারে (তার সংবাদ নং ২৭ এম-ই, ৫ই জুন ১৮৯১ সন) দেখা যায়—"সেনাপতিকে দরবারে গ্রেপ্তার করিবার যুক্তি, বোধ করি ২১শে মার্চ তারিখে সেরুমাইয়ে স্থির হয় এবং গর্ডনের ৭ই মে তারিখের তারের সংবাদ পাইবার পূর্বে কুইণ্টন যে কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতাম না।" প্রয়োজন বোধে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য বড়লাটের মত উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণও যে সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা-ভাষণে কিরূপ অভ্যস্ত ছিলেন ইহা তাহারই একটি নিদর্শন মাত্র।

কুইণ্টন সাহেব লেঃ গর্ডনের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রীমউড সাহেবকে ইম্ফল হইতে দশ মাইল দূরে সেরুমাই নামক স্থানে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। ২১শে মার্চ গ্রীমউড সাহেব সেখানে যাওয়ার পর চিফ্ কমিশনার তাঁহার মণিপুর

আগমনের উদ্দেশ্যের কথা তাহাকে সর্বপ্রথম খুলিয়া বলেন। মিঃ গ্রীমউড "সেনাপতিকে গ্রেপ্তার ও স্থানান্তরিত করার বিরোধী ছিলেন।" কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ লঙ্ঘন করাও তাহার পক্ষে সঙ্গত ছিল না। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি মণিপুরে ফিরিয়া আসিয়া রেসিডেন্সিতে দরবারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে মনোযোগী হইলেন। সেদিন মিঃ কুইন্টন ও মিঃ গ্রীমউড ব্যতীত এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার লেঃ গর্ডন চিফ্ কমিশনারের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ কলিন্স এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ উডস্, আসামের টেলিগ্রাফ বিভাগের মিঃ মেলভিল্ ও মিঃ উইলিয়ামস্, কর্ণেল স্কীণে, ক্যাপ্টেন বুচার, লেফট্যানেণ্ট চেটার্টন, এডজুটেণ্ট লেফট্যানেণ্ট লুগার্ড, ক্যাপ্টেন বইলো, লেফট্যানেণ্ট সিমসন্, লাট ভাউসিলের তৎকালীন সমর সচিবের ভ্রাতুষ্পুত্র লেফট্যানেণ্ট ব্র্যাকেনবারি, ডাক্তার কালভার্ট প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারীগণও সেদিন সাইতে ছিলেন।

এদিকে মণিপুরে মহারাজ কুলচন্দ্র এবং তাঁহার সভাসদ্গণও অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। লাটসাহেবের নিকট তাঁহাকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত পত্রের কোন জবাব তখনও তিনি পান নাই। অধিকন্তু শূরচন্দ্র কর্তৃক সিংহাসন লাভের জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট ঘন ঘন দরবাস্তের খবরও তিনি পাইয়াছিলেন। এই সময় আরও একটি সংবাদে তাঁহারা আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ পান "অনতিবিলম্বেই মণিপুরে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র শিকার করা হইবে" (A large tiger is shortly to be bagged in Manipur)।

কলিকাতায় অবস্থিত টিকেন্দ্রজিতের কোন মণিপুরী বন্ধু তাঁহাকে এইরূপ তার করিয়া সাবধান করিয়া থাকিবেন। এই সংবাদ ব্যতীত চিফ্ কমিশনারের আগমনের ১৫।১৬ দিন পূর্ব হইতেই মণিপুরে নানারূপ গুজব রটিতেছিল। তন্মধ্যে একটি হইতেছে চিফ্ কমিশনার ১৮ শত সৈন্যসহ শূরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করার জন্য নিজই মণিপুরে আসিতেছেন। ইহা লইয়া রাজদরবারে নানা জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। এসম্বন্ধে পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও তাঁহারা কোন খবর জানিতে পারেন নাই। মণিপুর সরকার তাহাদের নিজস্ব সংবাদদাতার মারফৎ সসৈন্যে চিফ্ কমিশনারের আগমনের সংবাদ পাইয়াছিলেন,- কিন্তু শূরচন্দ্র যে সেই সঙ্গে ছিলেন না—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল শূরচন্দ্রও অবশ্যই সেই সঙ্গে আছেন। শূরচন্দ্রকে মণিপুরে প্রবেশ করিতে বাধা দিবার জন্য মহারাজকুমার অতৌসার অধীনে এক হাজার সৈন্য মোতায়েন স্থির করা হইল। গ্রীমউড সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া মহারাজ কুলচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ এই বিপদজনক সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে মহারাজ কুলচন্দ্র তাহাকে জানাইলেন "ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, কেবল শূরচন্দ্রকে বাধা দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।" মহারাজ কুলচন্দ্র শূরচন্দ্র সম্বন্ধে যথার্থ খবর সংগ্রহের জন্য তাঁহার কেরাণী বাবু রামাচরণ মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতায় গোলাপ সিং নামক জনৈক বিশ্বস্ত মণিপুরীর নিকট তার করিতে নির্দেশ দিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি নিজে চিফ্ কমিশনারের নিকট পত্র লিখিলেন —"তিনি শুনিয়াছেন কমিশনার ভূতপূর্ব মহারাজা শূরচন্দ্রকে লইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার সহিত অনেক ব্রিটিশ সৈন্য আছে। এসকল কথা যথার্থ কিনা?" তদুত্তরে চিফ্ কমিশনার জানাইলেন যে "শূরচন্দ্র তাহার সহিত নাই। আর বহু সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে থাকার বিষয়ে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের হুকুম প্রতিপালন করিতেছেন।" ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতেও তার সংবাদের উত্তর আসিল—"শূরচন্দ্র কোথাও যান নাই—"পূর্বের মত কলিকাতাতেই রহিয়াছেন।"

নির্দিষ্ট দিনে চিফ কমিশনার কুইন্টন সাহেব মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ইম্ফল সৈন্যসহ ইম্ফল হইতে ৮ মাইল দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দনা করিয়া আনিয়াছিলেন। রাজধানীতে তাঁহার সম্মানার্থ যথারিতি তোপধ্বনি সহ মহারাজাও তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্বর্দনা করিলেন।

[ক্রমশঃ

আধুনিক কবিতায় নৈরাশ্যের সুর

সন্তোষকুমার অধিকারী

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের আকাশে সাহিত্য-সাধনার ধারা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটি পরিণতির সন্ধান করে ফিরছে এবং আজও যে সেই পরিণতির দিগন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি একথা বললে খুব ভুল বলা হবে না। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাস্তবানুসারী নয় অথবা রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ভাববাদী কবি—এমন অনেক কথা আধুনিক কবিদের মুখে শোনা গিয়েছিলো। একদা বিদ্রোহী এই কবি-গোষ্ঠির কাব্যচিন্তার ধারা বিষয়, আঙ্গিক ও প্রকাশ ভঙ্গীতে এমনকি অলংকরণেও অভিনবত্বের সন্ধান করে ফিরেছে। কিন্তু তার সমসাময়িক কালের মধ্যেই তাঁদের রচনা বিস্মৃত হতে বসেছে। এবং নতুনতম দল তাঁদের তথা-কথিত বিদ্রোহী কবিগোষ্ঠির সাধনাকে পরিত্যাগ করেই নতুনভাবে পরীক্ষা সুরু করেছেন।

তবুও তাঁদের মধ্যে দুএকজনের কাব্য বাংলাসাহিত্যে কিছুকালের জন্যে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। কারণ তাঁদের রচনায় জীবনবোধের একটা সুর যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো। কেউ কেউ যেন সন্ধান করে সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিলেন। তবু অনেক সময় এমন হয় যে মাকড়সা নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। তেমনি যে দুজন কবির কথা আমি বলবো, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আত্মমোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ফলে নিজের স্ফীত মোহে অন্ধ হ'য়ে বর্তমানকে অতিক্রম করে এগোতে পারলেন না তাঁরা।

কাব্যই হো'ক চিত্রকলাই হো'ক আর সঙ্গীতই হো'ক, রসশিল্প—যাকে চলিত কথায় আর্ট বলে—সে জীবনের অনুসরণ নয়, জীবনের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্ব-সাহিত্য সাধনার ইতিহাসেও দেখা যায় যে জীবনবোধ নেই, জীবনের গভীরতার উপলব্ধি নেই এমন কোন সাহিত্যিক দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি। শুধু জীবনের উপলব্ধিই নয় জীবনের মহত্তর প্রকাশের পথকে—বলিষ্ঠ আদর্শের স্বপ্নে ফুটিয়ে তোলাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ধর্ম বলে পণ্ডিত হ'য়েছে। টলষ্টয়, গেটে বা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথ কেউই জীবনের ঐশ্বর্যে আস্থা হারাননি। তাই তাঁদের সাহিত্য চিরযুগের সাহিত্য; তাঁদের আশাবাদ চিরকালের আশার প্রেরণা।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্যোগ এই যে আজকের মানুষ সবদিক থেকে আশা হারিয়ে ফেলেছে। শুধু বাংলাদেশের কথা ভাবলেও আমরা দেখতে পাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সুরু হ'য়েছে নানা দুর্বিপাক। পরাধীনতার গ্লানি, শাসনের রক্তচক্ষু, শোষণের অত্যাচার, জীবন ধারণের সামর্থ্যের অভাব.....পঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, বাঙ্গা.....নানা আঘাতে মানুষের মন যে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে এ'কথা না ভেবেও বলা চলে। তার ওপরে সাহিত্যে যারা বিদ্রোহী হওয়ার ভূমিকা নিলো তাদের মধ্যেও ছিলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাই এ'যুগের সাহিত্য সাধনা বাস্তবানুসারী হ'য়েছে বটে কিন্তু ক্ষণিকের দুর্যোগকে কাটিয়ে কালজয়ী হ'তে পারেনি। আজকের সাহিত্যিকের মনে নেই প্রত্যয়ের সুতীক্ষ্ণ প্রকাশ; বরং সংশয়ের ও দুঃখের জালে তাঁদের মন অভিভূত।

আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রর নাম নিশ্চয়ই অন্যতম এবং নিঃসংশয়ে জনপ্রিয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রর রচনায় ভাষার সূক্ষ্ম কারুকুশলতাও অনুভবের ব্যঞ্জনা। এমনকি তাঁর চিন্তাধারা গতানুগতিকতার ধারা থেকে মুক্ত, তাঁর কল্পনায় রয়েছে দুঃসাহস। এই যুগেরই আর একজন কবি সমালোচক অমোহিতলাল মজুমদার প্রেমেন্দ্র কবিতার উল্লেখে বলেছেন যে—কবি যে তাঁর কাব্যদর্শনে কি বলতে চেয়েছেন সেটা কোনখানেই পরিস্ফুট হয়নি।

মোহিতলাল তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন তার প্রথম পংক্তি হ'চ্ছে—

"মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!"

কবিতাটি পড়ে বোঝা যায় যে জীবন সম্বন্ধে কবির ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। জীবনের কোন সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টির সামনে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠেনি। শুধু যে সম্ভাবনাকে খুঁজে পাচ্ছেন না কবি তাই নয়, সংশয়ের বেদনায় মন তাঁর আচ্ছন্ন। তাই তিনি পরের কয়েকটি পংক্তিতে বলছেন।

"মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?

জীবনে এই যে হতাশা এই হতাশার ধূসরতা যে কত গভীর তা নীচের অংশটুকু থেকেই বোঝা যায়

"এ মাটির ঢেলা কবে কে চুঁড়িলো স্বপনের
পানে তাই
পৃথিবী যাহার নাম
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্য্যেরে অবিরাম।"

ব্যর্থতাবোধের নিদারুণ গ্লানিতে সমাচ্ছন্ন কবির মন। তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন চেষ্টা নেই। প্রেমেন্দ্র শুধু কবি নন গল্পকারও। কিন্তু তাঁর গল্প উপন্যাসেও সেই নৈরাশ্যের হাহাকার। তাঁর গল্পের চরিত্রে আকস্মিকতার রূঢ় আঘাত। মন যেখানেই আশার মুকুলিত হ'য়ে উঠ্‌তে চায় সেইখানেই তার ব্যর্থতা করুণ হ'য়ে ওঠে। "সংসার সীমান্তে" "ভবিষ্যতের ভার" প্রভৃতি গল্পগুলিই এ'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যে ব্যর্থতাবোধ প্রেমেনের রচনায় শুধু হাহাকারের ঝড় সৃষ্টি করেছে সমসাময়িক আর একটি কবির চিত্তে কিন্তু তাই স্থিতি পেয়েছে নির্ভরতায়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কাব্য রচনায় দুঃখের প্রকাশ রয়েছে গভীর ভাবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে জীবনে বিশ্বাস হারাননি কবি। তিনি যেন জীবন দেবতার দুঃখময় রূপটাকেই শুধু দেখছেন। কিন্তু সে রূপের অন্তরালে যে জীবনের মহত্ত্ব তাকে অস্বীকার করছেন না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র'র মনে চিন্তার মধ্যেও রয়েছে কুয়াশা। মানুষের প্রতি তাঁর রয়েছে দরদ কিন্তু মানুষের শক্তির অতীতে এক অদৃষ্ট শক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস। এই অদৃষ্ট শক্তির কাছেই তিনি আত্মসমর্পণ করছেন।

"মৃত্যু পথযাত্রী কিম্বা শীর্ণ দুর্বল শিথিল বাহু দিয়ে
আঁকড়ে ধরবার
চেষ্টা করে বলে "আমি তোমায় ছেড়ে যাবোনা,
আমায় রাখ"
অসহায় বন্ধু বলে, "অন্ধকারে তোমার হাত খুঁজে
পাচ্ছিনা বন্ধু!"

• • • •

"দেখি মৃত্যুর শিয়রে নেওয়া চির-বিলাপের শপথ
শাপ হ'য়ে ওঠে,
—জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন
বিদ্রূপ?"

প্রথম অধ্যায়ে প্রেমেন্দ্রর রচনায় যে দরদ ও সহানুভূতির ছবি ফুটে উঠেছিলো পরের অধ্যায়ে, সেটাই শুধু হতাশার ধূসর বয়ে ফিরে এলো। তাই "মহানগর" গল্পের রচয়িতা "শৃঙ্খল"এর মত কাহিনীর সৃষ্টি করলেন। যে কাহিনীর চরিত্রেরা বেঁচে রয়েছে শুধু অন্তর্জাত ঘৃণার বহ্নুৎসব দেখবে বলে। জীবনকে যারা জেনেছে চরম বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বিদ্বেষ বা ঘৃণার কলংকে মনকে ধূসর হ'তে দেন নি। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের মত জীবন দেবতার সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তবুও তাঁর সমগ্র রচনায় কোনখানেই আশার সুর বেজে ওঠেনি। জীবন দেবতার বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গি। মানুষের মধ্যে দিয়ে তিনি দুঃখের স্বাদকে পেতে চান। এই হ'চ্ছে যতীন্দ্রনাথের ভাবনা। কয়েকটি কবিতা পড়লেই তাঁর এই চিন্তাধারাকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

"ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন
গান গেয়ে ভুতো দান অপেক্ষা
নহে কভু বেশী পুণ্য।"

"তবু ভয় ভয় চারিদিকে ছয়, আলোক পাইল লোক
শুধাই তোমায় কি আলো পেয়েছে অন্ধাস্তের চোখ?"
"কেমনে আমারে বুঝাবে বন্ধু, কেমনে বুঝি এ' কথা
কোমল গড়ানো যে বুক সেখানে কেন সুকঠিন ব্যথা?
মোর চেয়ে কেবা জানে?
হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে?"

এই নিদারুণ দুঃখবোধএর হাত থেকে মুক্ত হ'তে না পারলে যে সাহিত্যে কালজয়ী হওয়া যাবেনা—এ' বোধ কি আলোচ্য কবিদের নেই? হয়ত আছে; তাই অন্ধকারের মাঝে আলোর স্ফুলিঙ্গ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় হঠাৎ কয়েকটি পংক্তি খুঁজে পাওয়া যায়

"কে গাবে নূতন গীতা
কে ঘুচাবে এই সুখসন্ন্যাস গেরুয়ার বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য দেখাবে দুখের নয় মূর্তিখানি।"

প্রেমেন্দ্র'র কবিতায় যেন একটা ভবিষ্যৎ উঁকি দেয়

"পায়ের শব্দ শুনতে পাও?
নিভৃত নগ্ন পায়ের মহাসঙ্গীত!"

কিন্তু এ' বৈচিত্র্য কবি মনের নিরাবাসকেই মূর্ত করে তোলে মাত্র।

এ'যুগের আরও দুটি কবির নাম করতে পারি। তাঁদের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যাঁর সমস্ত কাব্যমন্থনের পর এই ধারণা আসবে মনে যে জীবনটা কিছুই নয়। সারাজীবন ধ'রে পদে পদে শুধু প্রতারণা... ব্যর্থতা। কিছুই আমাদের প্রাপ্য নেই জীবনের কাছে।

"জীবনের সার কথা শিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।"

কবি জীবনানন্দের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা কম। পরলোক বা পরমপুরুষদের নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। তবুও ত' এই সূর্যময় অনন্ত জীবনপ্রবাহকে স্বীকৃত বলে মেনে নিতে পারেন না কবি। তবুও ত' তাঁর দৃষ্টিতে গোধূলি সন্ধ্যার রিক্ততা।

এই নৈরাশ্যবোধ যে কাব্যের বা শিল্পের ধর্ম হ'তে পারে না, জীবনে বিশ্বাস হারিয়েছে যারা, তাদের আত্মবিলাপ যে মানুষ চিরদিন শুনবেনা—একথাই আজ প্রমাণিত হ'চ্ছে সাহিত্যের বারবার দিক্ পরিবর্তনে। কারা বা সাহিত্য থেকে মানুষ প্রেরণা পেতে চায়—সে প্রেরণা দুঃখের প্রাবণে তার হৃদয়াকাশে সূর্যের কিরণ মেলে দেবে। বর্তমান যুগের এই দুর্যোগ উত্তীর্ণ হ'য়ে নতুন আকাশের প্রত্যুষকে বেরবেই পৃথিবী। জীবন মৃত্যুর চেয়ে বড়।

"তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

তাই নতুন যুগের দ্রষ্টা কবির চোখে থাকবে স্বপ্ন—

"তারপর হৃত্তশাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে
কোটানো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছদের মুখে।
সংহতি কঠিন করে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়,
শাখায় শাখায় বাধাপ্রতিহত হবে জানি বড়
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে,
জানি তারা মুকরিত হবে নব অরণ্যের গানে।"

কাব্যে, সাহিত্যে ও চিন্তার আদর্শে আমরা নতুন প্রত্যাশা পাবো বলেই অপেক্ষা করে রয়েছি।

মন

এইচ্. এ বেটস্

অনুবাদক—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

[বৃটিশ লেখক এইচ্. এ. বেটস্ ১৯০৪ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। কথা সাহিত্যে এঁর দান সমসাময়িক বৃটিশ সাহিত্যের গৌরব। গল্প ও উপন্যাসের লেখা লেখকরূপে হিসাবে এঁর খ্যাতি সমধিক। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সমারসেট মম এঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এঁর রচনার প্রশংসা করেছেন। মমের মতে 'The author is vigorous, original and bold']

চালু জমিটার ছেলেটা আর বুড়ো ঘোড়া চাষছে। লাঙলটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা বুড়ো হাড়সর্বস্ব চেষ্টনাট ঘোড়ার দিক কিন্তু আবহাওয়া এত সুন্দর যেন মনে হয় এপ্রিলের একটা দিন। উজ্জ্বল নীল আকাশে সাদা আর ধূসর রঙের মেঘগুলো পশ্চিম দিকে বল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে প্রভাতী সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার জন্যে। নেমের সজরণশীল ছায়া চালু জমিটার অনেকটা জায়গা জুড়ে অন্ধকার করে রাখে আবার সরে গিয়ে উপত্যকার অন্য প্রান্তের সবুজ আর হরিৎবর্ণের আবাদী আর অনাবাদী জমিগুলোকে ছায়াময় করে ফেলে। নতুন আলোর স্পর্শ সর্বত্র, আর এই স্পর্শ সৃষ্টি করে নতুন জীবনের অপূর্ব এক অনুভূতি। কর্ষিত জমিটার এবড়ো-খেবড়ো নালাগুলো আলো আঁধারের সংমিশ্রণে অপূর্ব উজ্জ্বল দেখায়। পায়ের তলায় কালো মাটি লম্বা লম্বা ফালি হয়ে পড়ে রয়েছে, সূর্যের আলোয় ইস্পাতের মত মাটি জ্বলছে। তবে লাঙলের ফলার চেয়ে কিছুটা অনুজ্জ্বল এই যা তফাৎ।

জমি চালু হওয়ার জন্যে লাঙল দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। চালু জমির ওপর থেকে লাঙলটা যখন নীচের দিকে নামে, তখন বুড়োকে লাঙলের চলার পথ ঠিক সোজা করে রাখতে হয়, লাঙলের মুঠোটা জোর করে টেনে রাখতে হয় ওপর দিকে। কিন্তু লাঙলটাকে যখন ঠেলে ওপরে ওঠাতে হয়, তখন অনবরত চীৎকার করতে করতে ঘোড়াটার পিঠে ছিপটী মারতে হয়, ওকে তোলবার জন্যে। ওপরে উঠে বুড়ো আর ছেলেটা থেমে পড়ে।

ওপরে ওঠার পরিশ্রমে ঘোড়াটার নাড়িভুঁড়ি বের হবার উপক্রম, ওকে একমিনিট দম নেবার সুযোগ দিতে হবে। বিরাট ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়াটা মাথা নীচু করে দম নেয়। ঝুঁকতে ঝুঁকতে ঘোড়াটা চেয়ে থাকে মাটির দিকে। লাঙলের মুঠোর ভর দিয়ে দাঁড়ায় বুড়ো আর ছেলেটা 'এ্যাশ' গাছের লাঠিতে নতুন নতুন বৃত্তাকার দাগ খোদাই করে।

ঘোড়াটারই মত জরাজীর্ণ বুড়ো লোকটা চুপচাপ বসে থাকে মাটির দিকে চেয়ে আর মাঝে মাঝে সাদা চুলে ভর্তি মাথাটা চুলকোয়। ছেলেটা বকে যায় বুড়োর অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও। অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছেলেটা পুরোন সেই কথার জের টানে। অন্য জমিতে ও দেখেছে লোকে দুটো, তিনটে এমন কি চারটে ঘোড়া নিয়ে লাঙল দেয়, কি সুন্দর ব্যবস্থা ওদের! ছেলেটা তাই জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা একটার বেশী দুটো ঘোড়ায় লাঙল চালাই না কেন?'

—'আমাদের আর সেই যে, তাই।'

উঁচু জমি থেকে তলায় নেমে ওরা মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে আসে। জমির গায়ে লাগান বেড়াটার পাশ

দিয়ে যেন কুঁড়ে থেকে বুক হয়ে এ: জলছে।

ছেলেটা বলে ওঠে, "উঃ কি গরম, আমি আমার জামা খুলে ফেল্‌ছি।"

—'উঁহু ওরকম করো না। মাত্র মার্চ মাস, আর জামা খুলে ফেলাটা ঠিক নয়। পরে থাকো জামাটা, শুনতে পাচ্ছ?' বুড়ো দিগন্ত জোড়া মেঘের ছুটোছুটিতে চকল অদ্ভুত নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো বলে ওঠে, 'ভাল লাগে না। বড় কড়া রোদ, সহ্য করা যায় না। আমরা দুপুরে খাবার আগে ভিজে জামা পরব'খন।'

এমনি করে উঁচু ঢালু উপত্যকার কষ্ট করে ওঠা তারপর বিশ্রাম করা; আবার ছুটতে ছুটতে নীচের দিকে নামার পর বিশ্রাম করা। চলতে থাকে ওদের দিনগুলো। লাঙল চালিয়ে ওরা জমিটার মাটি ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। সকাল শেষ হয়ে আসছে, মেঘ-গুলো ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে; সাদা মেঘগুলো ক্রমশঃ ধূসর লাল রঙের হয়ে উঠছে। সারা আকাশটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত গম্ভীর পাহাড়ের মত মেঘে ছেয়ে গেছে। সূর্যের আলো মাটিতে এখন কম সময়ই পড়ছে। হলদে 'কলট্‌সফুট' ফুলের সতেজ শাখাগুলো লাঙলের ফলায় উঠে এসেছে মাটি থেকে, চাপা পড়েছে ক্ষতবিক্ষত জমিটার মাটিগুলোতে—তবু সকালের মত ওগুলোকে শুকনো দেখায় না। একটু আগে সূর্যালোকিত মাটির বুকে মেঘের ছায়ার লুকোচুরি খেলছিল কিন্তু এখন সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে যাওয়ার জন্যে আলোর এক ঝলক মাঝে মাঝে শুধু আকাশ জুড়ি মেঘের শাসন উপেক্ষা করে মাটির বুকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, হলুদ রঙের দ্বীপের জলের বুকে ভেসে বেড়ানোর মত।

প্রায় এগারোটার সময় ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আর সারা জায়গা জুড়ে বৃষ্টি পড়তে সুরু করে দিল অজস্র ধারায়। বসন্তকালের বৃষ্টি হঠাৎ হয় আর বেশ জোরেই হয়। এক মুহূর্তে যেন মনে হয় শীত আবার ফিরে এসেছে। দূরের জমিগুলো অন্ধকার, পরিত্যক্ত বলে মনে হয় ওগুলোকে, জমির লাঙলের ফলায় তৈরী উঁচু নিচু নালীগুলো ভিজে গিয়ে মৃতের মত দেখায়।

বুড়ো আর ছেলেটা ওপরের দিকে ছোটে জমিটার শেষে মাথা গোঁজবার মত ঝোপের তৈরী একটা চালাঘরের দিকে। ওরা চালাঘরটায় গিয়ে ওঠে। ঘরটার মাথায় বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে, ওরা বাইরে রাস্তায় গাড়ী চলার আওয়াজ শুনতে পায়। একটু পরে একজন লম্বা নাকওয়ালা লোক বৃষ্টিতে ছুটতে ছুটতে চালাঘরের দিকে এগিয়ে আসে। লোকটার পায়ে জুতোর ওপরে হরিণের চামড়ার ঢাকা, মাথায় চেক্‌ টুপী আর লম্বা সাদা আলখাল্লা গায়ে।

টুপীটা থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলে অভি-জাতসুলভ ভঙ্গীতে লোকটা বলে ওঠে, 'নিকুচী করেছে হতচ্ছাড়া আবহাওয়ার!' বুড়ো ওকে দুধওয়ালা সম্বোধন করে কথা কয় আর ছেলেটা এক কোণে একটা পুরোন নিড়েনের মইয়ের ওপর বসে থাকে। ছেলেটা যদিও ওদের কথাবার্তায় যোগ দেয় না তবু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, ওদের কথাগুলো মন দিয়ে শোনে।

কিছুক্ষণ পরে চালাঘরের বাইরে আবার কয়েকটা পদশব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকল আর একটী লোক। রাস্তাঘাট দেখা শোনা করে লোকটা। ঘোড়ার মত শক্ত পা'ওয়ালা লোকটার কাঁধের ওপর একটা বোঝা, কাঁধের আবরণের মত বোঝাটা দেখাচ্ছে। দুধওয়ালার প্রতি তীব্র অবজ্ঞায় আর গভীর ঔদাসীন্যে ও' ঘরে ঘুরে বেড়ায়। ও' নিজে একাই যেন চালাঘরটা অধিকার করে বসে। খেয়াল খুশীতে অলস পায়চারী করতে থাকে ও' ঘরটায়, যেন ঘরটায় ওরই একমাত্র অধিকার।

দুধওয়ালা মন্তব্য করে ওঠে, 'হতচ্ছাড়া আবহাওয়া!"

বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে দুধওয়ালাকে প্রতিবাদ করবার ভঙ্গিতে, 'আমাদের দরকার এরকম।'

—'মানে, কার দরকার, কেন?'

—'আমাদের দরকার, আমার আর 'জো'র। যত বৃষ্টি হবে, তত কম কাজ করতে হবে। কি গো জো, তাই না?'

বুড়ো সায় দেয়, 'হ্যাঁ তাই।'

দুধওয়ালা বলে ওঠে, 'চুলোয় যাক্, আমার কাজের ক্ষতি হয় এতে।'

বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে, 'তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলেই পার। বেচারী দুধওয়ালা খালি পিছিয়ে পড়ে আছে, যেন ঠিক গরুর লেজের মত!'

দুধওয়ালা চুপচাপ থাকে কিন্তু ওর মুখটা অদ্ভুত কালো হয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে ও রাগে ফুঁসছে। এই মুহূর্তে মনে হয় নিশ্চয় একটা ঝগড়া হবে। কোণ থেকে ছেলেটা গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করে ব্যাপারটা, ওর মনের কোণে সামান্য একটা আশংকা জাগে, একটা গণ্ডগোল লাগল বলে।

আর ঝগড়া বেধে যাবার সম্ভাবনা আছে বলেই হয়ত বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে আবার, 'ওয়াগের ব্যাপার শুনেছ, ওয়াগ থম্পসন?'

—'ওয়াগের কি হল?' বুড়ো জিজ্ঞাসা করে।

—'মারা গেছে।'

দুধওয়ালা বলে ওঠে, 'মারা গেছে! সেকি, তাকে যে আজ সকালে দেখলাম!'

বিরাট গোছের লোকটা বলে, 'ওকে আর তুমি দেখতে পাবে না, ও মারা গেছে।'

বুড়ো বৃষ্টির জলের মধ্যে সামনের প্রসারিত জমিটার দিকে তাকিয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। যেন ওর কিছু ভাববার নেই, ও জানে না ও কিইবা বলবে? সমস্ত ব্যাপারটাই এত অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত যে বিশ্বাস করে উঠতে পারা যায় না।

বিরাট গোছের লোকটা আবার বলে ওঠে, 'সত্যিই ও মারা গেছে।'

—'কি করে মরল?'

—'এমনি হঠাৎ পড়ে মরে গেল।'

তিনটে লোকই বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বাইরে এখনও জোরে বৃষ্টি পড়ছে। জমির গর্তগুলো কাদা রঙের জলে ভর্তি হয়ে উঠেছে। তারই পাখীগুলো এখনও গান গেয়ে চলেছে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত হিস্ হিস্ শব্দের মাঝে পাখীর গান ওরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

বুড়ো বলে ওঠে, 'খবরটায় বড় আঘাত পেলাম। খুব শক্ত সমর্থ লোক ছিল ওয়াগ।

দুধওয়ালা বলে, 'যা বলেছ খুবই জোয়ান ছিল লোকটা আর মোটাও ছিল।'

—'মোটা ছিল, উঁহু খুব মোটা নয়, আমার চেয়ে ত' নয়ই'—বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে।

—'ওর মুখটা ছিল ভয়ানক লাল, খুব বেশী লাল।'

বিরাট গোছের লোকটা ভেতরের জামার পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বার করে শব্দ করে খোলে। প্রথমে বুড়োকে তারপর দুধওয়ালাকে কৌটোটা এগিয়ে দেয়। ওরা দুজনে নীরবে নস্য তুলে নেয় আঙুলের ডগায়। ও নিজে এক টিপ্ তুলে নেয়। মেঝেতে ছড়িয়ে যাওয়া নস্যির মিষ্টি গন্ধ চালাঘরটায় ভেসে বেড়ায়।

—'এরকম নস্যি নিতে আর কোন বাচ্ছাকে দেখিনি বেচারী ওয়াগ ছাড়া' বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে।

দুধওয়ালা বলে, বাচ্ছা, 'আমার ত মনে হয় ওর বয়স বাট হবে।'

—'আরও বেশী'

বুড়ো এইবার কথা বলে, 'ওয়াগের বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি। আমরা দুজনে লাঙল চালিয়েছি। বাচ্ছারাই

সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে কিনা, তাই ওর বয়স পঁয়ষট্টি।'

বুড়ো হঠাৎ থেমে যায়, অতীত স্মৃতি ওর মনে পড়ে। বাইরে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু লোকগুলো যেন এই মুহূর্তে সে কথা ভুলে গেছে। যেন মৃত লোকটির কথা ভাবা ছাড়া অন্য কিছু ওরা ভাবতে পারেনা এখন।

বিরাট গোছের লোকটা এবার বলে, 'ওরাগকে মাছ ধরতে দেখেছ কখনও, সুন্দর মাছ ধরত!'

বুড়ো বলে, 'কতবার দেখেছি যাকে বলে পাকা হাত। একেবারে ওস্তাদ মাছ ধরায়। ওর সঙ্গে যেতাম কিনা। ভাল গুলী ছুঁড়তেও পারত ও। যখন আমরা বাচ্চা ছিলাম, তখন আমরা একবার একটা 'পাইক' মাছ গুলী করে মেরেছিলাম। জলের ওপর মাছটা ভাসছিল, ওরাগ গুলী চালাল। সুন্দর পাইকটা এখনও দেখতে পাচ্ছি যেন!'

দুধওয়ালা বলে, 'সব সময়ই ত' 'ছুএক' নিয়েই ব্যস্ত থাকত।'

—'ছুএক কোথায় হয়েছে ও তুঁকে বার করত। খাওয়া যায় এমনি সব ছুএকগুলোই ওর জীবিকা ছিল কিনা! তাছাড়া মাছ ধরা, গান গাওয়া কত কি!' বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে।

বুড়ো বলে আবার, 'ও সুন্দর গাইতে পারত। ওকে গাইতে শুনেছ সেই গানটা, যে তরী আমায় নিয়ে গেল। সেই যে—'

'আমার কামনা যে নিতি
তরীটির বুকে যাইগো ফিরে···'

বুড়ো থেমে যায়, বাকী কথাগুলো ও মনে করতে চেষ্টা করে' কিন্তু পারে না। আবার চালাঘরটায় নীরবতা নেমে আসে।

ঘরের কোণে বসে ছেলেটা চুপচাপ শোনে। ধীরে ধীরে ওর মনে একটা অজানা অদেখা লোকের ছবি গড়ে ওঠে। স্বপ্নের মত লোকটা ধরা দেয় ওর মনে। সজীব হয়ে ফুটে ওঠে ওরাগ ওর চোখের সামনে। লোকটার প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকে ওর। ছবিটা যত স্পষ্ট হয় ততই ও অনুভব করে ও যেন চেনে সেই লালমুখো মোটা মিষ্টি স্বভাব লোকটাকে যে লোকটা মাছ ধরে, নৌকা বায়, গান গায় সারা জীবন ধরে। এই অকৃত্যাশিত অনুভূতি ওকে অভিভূত করে ফেলে। ও চুপচাপ বিহ্বল মন নিয়ে বসে থাকে। তারপর হঠাৎই এই জমে ওঠা আবেগ সহ্য করতে না পেরে ও কেঁদে ফেলে। ওর কান্নার শব্দে ঘরের অন্য লোকেরা বিস্মিত হয়ে ওর দিকে চায়।

বিরাট গোছের লোকটা বলে ওঠে, 'ছিঁচ-কাঁদুনি সুরু হল এখানেও!'

—'কি হল তোমার এ্যাঁ, কাঁদছ কেন?

—'কিছুতে ছুরত ও ভয় পেয়েছে।'

—'কিসে ভয় পেলে, এ্যাঁ কাঁদছ কেন?'

—'জানি না, কিছুর জন্যে নয়।'

—'তার মানে, কিছুর জন্যে নয় মানে কি?'

—'এ কার ছেলে?'

বুড়ো বলে এবার, 'আমার নেয়ে এমার। এই কাঁদছ কেন?'

—'এমনি।' ছেলেটা বলে।

—'বড় কোমল স্বভাব এ ছেলেটার; বাচ্চারা এমনিই।'

—'এই এদিকে এস, কাঁদে না, চোখ মুছে নাও। অনেক বৃষ্টিই হয়েছে বাইরে, আর দরকার নেই, এস।'

ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ কেঁদে ছেলেটা কান্না থামিয়ে দেয়। চোখের জলের অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে ও দেখে বাইরে বৃষ্টিও কমে আসছে। মেঘের উপত্যকা পেরিয়ে চলে গেছে। দুধওয়ালা আর বিরাট গোছের লোকটা বাইরে বেরিয়ে আসে।

'আঃ—নীল আকাশ' দুধওয়ালা বলে।

—'হাঁ, তাড়াতাড়ি যাও এবার। সন্ধ্যের

ছাড়েই না ছন্ন ছন্ন

ছন্নছাড়া জমিটার বেড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়. একমুহূর্ত পরে বিরাট গোছের লোকটা বুড়োকে বিদায় জানিয়ে ওকে অনুসরণ করে।

বুড়ো আর ছেলে লাঙলের কাছে ফিরে আসে নীল আকাশের ফালি মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি মারে আর কখনো মেঘমুক্ত হতে থাকে. সূর্যের আলো মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে ওঠে জমির বুকে। মাটির গন্ধে কাদা রসের ভরে যাওয়া জলে রোদের আলো এসে জল আলোয় অহঙ্কার রূপোর মত

বৃষ্টি ধোয়া লাঙলের ফলার

বুড়ো লাঙলের মুঠোটা ধরে, 'হেই ওঠ্ ওঠ্' লাঙল এগিয়ে চলে ভিজে মাটির ওপরে। ঘোড়াটা চলে আস্তে আস্তে আর লাঙলের ফলাটা চেপে বসে মাটির আরও গভীরে।

ঘোড়াটার মুখের পাশে যেতে যেতে অকর্ষিত জমিটার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেটা মৃত লোকটার কথা একদম ভুলে গেছে। কলই সঙ্কুট গাছগুলোর মধ্য থেকে ডাকই পাখী-গুলো শব্দ করতে করতে উড়ে যায় ওপরে। সেখান থেকে ওরা ওপরে ওঠে সে জায়গাটা ও ভাল ভাবে লক্ষ্য করে। ও খালি ভাবছে ওখানে গেলে ও হয়ত পাখীর ডিম খুঁজে পেতেও পারে!

কিন্তু বুড়ো সব সময় আকাশের দূর কোণে সূর্যের আলোয় আলোকিত মেঘগুলোর দিকে চেয়ে থাকে, যেন মৃত বন্ধুর স্মৃতিতে ও তন্ময় হয়ে গেছে। আর ওদের দুজনের অন্যমনস্কতার মাঝে লাঙলটা নিজেই মাটি ভেঙে পথ করে চলেছে।

বেড়াল

সমীরণ লাল গুপ্ত

সইর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ফিরবার সময় তুলতুলে সাদা রংয়ের একটি বেড়াল ছানা বুকে করে বাড়ী ফিরলো গৌরীরাণী। স্বামী শংকর আপিস থেকে ফিরে এসে দেখে; গৌরী বেড়াল ছানাটাকে নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেড়ালটা এখনো মায়ের দুধ ছাড়েনি বোধ হয় তাই গৌরী তাকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াতে পারছেনা কোন মতেই।

তবুও তার হাত থেকে নিস্তার নেই! বেড়াল ছানাটা যতই আপত্তি করুকনা কেন—গৌরী তাকে দুধ খাওয়াবেই। আত্মরক্ষার জন্ত ওইটুকু জীবটা কি-ই বা করতে পারে? তবুও আঁচড়ে কামড়ে গৌরীকে যতদূর সম্ভব অতিষ্ঠ করে তুলতে কসুর করছেনা! আর তারই জন্ত গৌরী মারমুখী!

"এ্যাই ও দুষ্টু, খা শীগ্‌গীর নয় মারবো।...আবার ফ্যালে? এবার ঠিক পিট্টি খাবে। আদর দেই সত্য কিন্তু অত্যাচারের শাস্তিও আবার ভাল হাতেই দিতে জানি—হ্যাঁ! চোপ্...চোপ্, আবার ম্যাও.....।"

শংকর পেছন থেকে হেসে ফেলে বলল—"আহা-হা মার নামে বাধা দিওনা; বেচারীর শেষ সময় উপস্থিত!" গৌরী ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘোমটাটা বুকের ওপর একটু টেনে দিয়ে বলল—"শেষ সময় না হাতী। ওর শেষ সময় হলেও বা আমার কি দোষ? নিজের স্বভাবের দোষে নিজে মরছে, তাতে কার কি?"

শংকর আপিসের পোষাক খুলতে খুলতে বলল—"তা ছেড়ে দাওনা কেন বাপু? তাহলে তো কোন পক্ষেরই ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না!"

—"হ্যাঁ, ছেড়ে দিতেই এনেছি কিনা?"—গৌরী জোর করতে লাগলো বাকী দুধটা খাওয়াবার জন্ত।

"কোত্থেকে আনলে একে?"—

গৌরী বলল—"যেতে যেতে সুব্রতাদের বাড়ী গেলুম, দেখি ওদের গোয়াল ঘরে একটা ভাঙা বালতীর মধ্যে তিনটে বাচ্চা মেউ মেউ করছে। ভাবলুম, তুলতুলের কাছে বলে একটা চা' নিয়ে আসবো। আমায় আর বলতে হ'লনা। সুব্রতাই কথায় কথায় বলল—"বেড়াল বাচ্চা নিবি নাকি ভাই? একটা কালো মাদী বেড়াল তিনটে বাচ্চা বিইয়েছে মাস দেড়েক আগে। তাই, তিনটের নিদে মারা বাড়ীটা তছ্‌নছ্ করে আর রাখলোনা কিছু। রান্নাঘরের তাকের ওপর চায়ের কাপ প্লেট থাকে, দস্তিগুলো সেগুলোকে ঠেলে ঠেলে ফেলে ভাঙবে। ছোট বাচ্চাটা থাকে মেঝেতে, সেটাকে অবশ্যি আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করে দেবে। দুই গণ্ডি ভাই একটা নিস্ তবুও অন্ততঃ একটার দস্তিপনা থেকে রেহাই পাই! নয়তো কোনদিন নোড়া মেরে মেরো মাথা গুঁড়িয়ে।"

আমি বললুম—"বলছিস্ যখন, একটা তাহলে নিয়েই যাই! তাই নিয়ে এলুম।

শংকর চেয়ারে বসে টেবিল ফ্যানটা খুলে দিয়ে বললে—"বেশ করেছ এনেছ। এবার ও বেচারীকে রেখে আমার কিছু খাবার থাকে তো দাও—!

—"দিচ্ছি।" গৌরী উঠে পড়ল বেড়াল ছানাটা নিয়ে।

গৌরীই সখ করে একটা ময়না পুষেছিল। ক'দিন আগে সেটা মরে গেছে। তারই পরিত্যক্ত খাঁচাটাতে বেড়াল ছানাটা বন্দী করে রেখে শংকরকে জল খাবার এনে দিল।

পাঁচ বছর ঘরে বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোন সন্তান হয়নি গৌরীর। মেডিকেল একজামিনে জানা গেছে সন্তান হবার কোন সম্ভাবনাই আর নেই। প্রথম যেদিন গৌরী খবরটা শুনলো, শংকর সেদিন গৌরীর প্রাণ সংশয়ের

আশংকা করেছিল। এমন একটা কিছু আশংকা করা অস্বাভাবিক কিছু ছিলনা। বরং আশানুরূপ খুব একটা মারাত্মক রকম কিছু হোলোনা কেমন করে এইটেই আশ্চর্যের বিষয়।

একটু চাপা ধরণের মেয়ে গৌরী। তাই এমন দুঃসংবাদ শুনে পাতলা ঠোঁট দুটি খানি কেঁপে উঠেছিল একটু। শুধু কি যেন একটা ধপ্ করে জমে ওঠা আগুনের হল্কা ভেতরটাকে তার খাক্ করে দিচ্ছিল।

খবর পেয়ে মফঃস্বল থেকে গৌরীর মা-বাপ এসে গৌরীকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁদের হেফাজতে মাস দুইেক থেকেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল গৌরী। কেবল পশুপাখী পুষবার একটা বাই চাপলো মাথায়। একপাল পায়রা পুষলো প্রথম। পাশের বাড়ীর হলো বেড়ালটা একটা অবশ্যি খেয়ে নিল সেগুলো। তার পর পুষলো কুকুর—সেটা আছে এখনো। শেষে মহনা. সেটা মরে গিয়ে এবার এলো বেড়াল।

শংকর বললো—"বেড়াল তো আনলে কিন্তু ওইটুকু বাচ্চা. রাতে মা-ছাড়া থাকতে পারবে তো, মা কুকুরটার মত আলিয়ে মারবে?"

গৌরী টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট আর জলের গ্লাস নাবিয়ে রেখে বলল—"না কিছু করবে না। ওরা আদর বোঝে। বিছানায় নিয়ে শুলে দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোবে দেখো।" শংকর চুপ করে খাবার খেয়ে চলল।

বাস্তবিকই খুব একটা জ্বালাতন করল না বেড়ালটা। গৌরী ঠিকই বলেছিল, ওরা আদর বোঝে।

প্রথম একটু ছটফট করে গৌরীর কোলের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি চোখ বুজলে নতুন অতিথিটি। ভোর রাতের দিকে শংকর চোখ মেলে দেখলো,. কোলের কাছ ছেড়ে বিড়ালটা গৌরীর বুকের কাছটিতে এসে ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শব্দে দিব্যি আরেশ করে ঘুমুচ্ছে। আর গৌরী যেন তার অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতার যাদুতে বেড়াল ছানাটার মনের সমস্ত ভয় ভরকে দূর করে দিয়ে তাকে রাতারাতি আপনতর করে নিয়েছে।

পরদিন গোয়ালাকে আর একপো করে দুধ বেশী দিতে বলে দেওয়া হোলো। ঠিক হ'ল; ভোরে নিজেদের সাথে চা পাউরুটি খাবে। দুপুরে দুধমাখা ভাত রাতে খালি দুধ; রাতে আর ভাত নয়। এত খেয়ে শেষটায় বিছানায় অপকর্ম করলে তখন?

গৌরীর যাদু জানা আছে কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। কারণ ওইটুকু বেড়াল ছানা মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনলে কেঁদে কেটে আকুল হয়. তাকে কিনা গৌরী এমনভাবে বশ করে নিল যে, মার কাছ থেকে বহু দূরে একটা সম্পূর্ণ অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে এসে পর্যন্ত একটা ভয় ভীতি কিম্বা সামান্য একটু উদ্বেগও নেই মনের মধ্যে।

শংকর বিস্মিত হয়ে যায়।

আর বিস্মিত হয়ে যায় বেড়াল ছানাটার কার্যকলাপ দেখে।

ভোরে সবার সাথে বাটিতে করে চা দেওয়া হয় তাকে, কিন্তু একবাটি শেষ করে খাবার দিয়ে গৌরীর পা আঁচড়ে তাকে উত্যক্ত করে তুলে আরো খানিকটা চা আদায় করে তবে ছাড়বে।

কোনদিন বা আপিস থেকে এসে দেখবে; গৌরী হয়তো শুয়ে আছে বিছানায় আর বেড়ালটা গৌরীর আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা নিয়ে দিব্যি খেলা করে যাচ্ছে। অথবা কোনদিন দেখবে. কড়ি কাঠ থেকে ওর খেলার জন্যই দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া একটা লাল অথবা ফুল নিয়ে মনের আনন্দে কামড়া কামড়ি করছে।

শংকর উপহাস করে, "তুমি তো সাকরেদ একটি বেশ জোগালে, এবার আমাকেও একটির খোঁজ নিতে হবে। অবিশ্যি একটু শিক্ষিত চাই। যাতে চা করে দিতে পারে, বেলা সাতটার সময় ঠিকমত ঘুম থেকে তুলে দিতে পারে। তোমার তো আর এসব দিকে নজর দেবার ফুরসতই নেই একরকম।"

গৌরী বিস্ময়ে চোখ বড় করে। বলে, "বুঝেছি

সভীন আনবার মতলব। আলোই না। দুই সতীনে মিলে শেষে যখন আমারের ফর্দা বাহির করব; বীর-পুরুষের তখন ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে হবে ঠিক।"

দুজনেই হেসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

কদিন বাদে একদিন দুপুরে সেই সুলতা গৌরীর বাড়ী বেড়াতে এলো। মোটা মোটা মস্তন তার-ভারিক্কি চেহারাটা গহনার বোঝাই। হাঁটার অভ্যাস নেই তার চর্বিসর্বস্ব অমন চেকনাই দেহটির ওপর গহনার বাহুল্য সর্বশরীরকে তার ঘামিয়ে একেবারে চুপ চুপে করে ছেড়েছে।

গৌরী টেবিল ফ্যানটা খুলে দিল।

"হঠাৎ এমন দুপুর বেলা কেন ভাই? গৌরী শুধালো।

"—দুপুর বেলা ছাড়া সময় কই? দিনরাত সর্বক্ষণইতো উনুনের পদসেবা করতে হচ্ছে। আজ উনি ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাদবপুর গেলেন এক বন্ধুর বিয়েতে তাই না এলুম। আমায়ও যেতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন কিন্তু কে বাবা ওই এক পাল হাঁস মুরগীর সঙ্গে। রাস্তাঘাটে গাড়ী ঘোড়ার সেই ছটো পুটি। এটা সামলাও তো ওটা যায়, ওটা সামলাওতো আরটা যায়। তার চেয়ে বারটা সেই সামলাক আমি বাবা ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই।" সুলতা বিছানার ওপর পাছটো ছড়িয়ে আয়েশ করে শুলো।

"তা তোর বর কইরে গৌরী?"—

—"আপিসে। তুই শো, আমি বরং তোর জন্য সরবৎ করে নিয়ে আসি।"

সরবৎ খেয়ে সুলতা বলল—"হ্যা একখান হয়েছে; সেই কালো মাদী বেড়াল, যেটার বাচ্চা এনেছিস্—সে মাগীতো মরো মরো। আর বাচ্চা দুটো মরে গিয়েই অমন হয়েছে। আমি বলি, দুঃখু করে কি হবে ভাই, অমনতো কত বিয়াচ্ছো কত মরছে। দু'দিন বর্ষ বর, ফের আরেক পাল বিয়োতে পারবে খন।" কি বলিস? —সুলতা পান খাওয়া ভাঙা ভাঙা দাঁত দুপাটি বের করে কুৎসিৎ হাসি হাসলো। গৌরী কোন মতামত প্রকাশ করল না। খালি সরবৎ-এর গ্লাসটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

গল্পগুজব শেষ করে সুলতাকে রিকশায় তোর দিয়ে এগিয়ে দিয়ে পেছন ফিরতেই গৌরীর কানে গেল একটি সকরুণ ডাক—"মিউ"

গৌরী ফিরে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। ওমা! এযে সুলতাদের সেই কালো মাদী বেড়ালটা! কিন্তু এ-কি হয়েছে চেহারা? লোম ওঠা দেহটা রোগা। চোখ দুটো ঘোলাটে! গলার মধ্যে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ! হাঁটতে গেয়ে ঘুরে পড়ে যায়!

গৌরীর মায়া হল। চুক্ চুক্ করে ডেকে ভেতরে এনে একটুকরো পাউরুটি ছুঁড়ে দিল বেড়ালীটার মুখের কাছে। কিন্তু সে তা স্পর্শ করল না। খালি বসে যাওয়া ঘোলাটে চোখে গৌরীর দিকে করুণভাবে একবার তাকিয়ে আবার ডাকলো—"মিউ।"

গৌরী অনুমান করলো, বাচ্চাটাকে একবার দেখতে চায় হয়তো। তাড়াতাড়ি তাই বড় ঘর থেকে বাচ্চাটা নিয়ে এলো। কিন্তু বেড়ালীটার কাছে ছেড়ে দিলনা। কি-না-কি রোগ আছে ওর মধ্যে, কে জানে?

বাচ্চা দেখেই বেড়ালীটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। রুগ্ন-দেহের ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে বারকয়েক জোর গলায় "মিউ মিউ" করে ডেকে উঠলো।

গৌরীর কোলের মধ্যে থেকে অমনি পক্ষও সাড়া তুলছে ততক্ষণে।

কিন্তু গৌরী কিছুতেই বেড়াল ছানাটাকে ছাড়বেনা। দেখতে হয়তো ওখান থেকেই দেবনা বাপু। আদি-ব্যাধির শরীর নিয়ে বাচ্চাটাকে আদর না করলেই কি নয়! নিজের সাথে সাথে তার সর্বনাশটিও না করে ছোড়াচ্ছি পাচ্ছনা, কেমন?

মা-বেড়ালটা এমন সময় হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে গৌরীর কোল থেকে বাচ্চাটা ছিনিয়ে নেবার মতলব করল; কিন্তু রুগ্ন দেহে একটু উঠেই পড়ে গেল মাটিতে। গৌরী রেগে উঠলো; "তবেরে হারামজাদি, বেরো বেরো এবাড়ী

নিজেতো মরবেই, সাথে সাথে বাচ্চাটার অমঙ্গল না করলেই চলছেনা তোমার, বেরো শীগ্‌গির।"

গৌরী তাড়া করতেই বেড়ালীটা পালিয়ে গেল।

তখনকার মত পালিয়ে গেলেও একটু বাদেই ফিরে এলো। গৌরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বাচ্চাটাকে শেষ বারের মত বুকে না নিতে পারলে তার মরা হবেনা কিছুতেই। সেই আশা নিয়েই উঠানের এককোণে কতকগুলো পরিত্যক্ত ভাঙাচুরো বাক্সের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলো বেড়ালীটা।

শংকর অফিস থেকে ফিরতেই মুখ ভার করল গৌরী —"বেড়াল ছানাটা আমি কাউকে দিতে পারবোনা কিন্তু।"

—"বেশ তো, কে নিতে বলছে তোমায়?"—

গৌরী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল—"কে আবার মা'টা এসেছে। এমন রোগা দেখতে; আর চোখমুখ বসে গেছে। শীগ্‌গিরই মরবে বোধ হয়। ওই রোগা মরকের কাছে কিছুতেই আমি বাচ্চাটাকে যেতে দেবো না, এই বলে রাখলুম কিন্তু—।"

শংকর কোন উত্তর না দিয়ে কোট খুলতে লাগলো।

...গৌরী কিছুতেই বেড়াল ছানাটাকে হস্তান্তরিত করতে পারলেনা। ওই পচা গলা, আধমরা মা-টার কাছেতো নয়ই। অন্য কারুর কাছেও নয়। ভেতরের একটা অসীম শূন্যতাকে সে ভরাট করেছে ওই ক্ষুদ্র জীবটাকে অন্তরের সমস্ত অবরুদ্ধ স্নেহের মাধুরী দিলিয়ে দিয়ে। নিজের যা কিছু ছিল উজাড় করে দিয়ে পূর্ণ হয়েছে তার মাতৃত্ব। সেই পরিতৃপ্ত, কানায় কানায় পূর্ণ মাতৃত্বের পরিধায় বিরহের মহাসাগরের উত্তালতা সে কিছুতেই সইতে পারবে না। এমন সময় একটা করুণ আকুতি ভরা কান্নার শব্দে চমক ভাঙলো গৌরীর। পেছন ফিরে দেখলো বেড়াল ছা'টা হাপুস নয়নে কাঁদছে। গৌরী ব্যস্ত হয়ে কোলে তুলে নিল তাকে! কোমল করে বলল—"কাঁদবার কি হ'ল, এইতো আমি—!"

কিন্তু ওইটুকু জীবটার মধ্যেও আজ যেন কি হয়েছে। সে যেন বুঝতে পেরেছে, গৌরী তার আসল মা নয়। তার আসল মা, তার গর্ভধারিণী হতভাগী হয়তো মনের দুঃখে এতক্ষণে বহু দূর দেশে চলে গেছে। অর্থের জৌলুশে থেকে গৌরীর বুকের যে উষ্ণ স্বাদ সে পেয়েছে তা মাতৃত্বের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ভরা হলেও তার গর্ভধারিণীর তুলতুলে নোমশ কোলটার মত অকৃত্রিম নয়।

গৌরী বেড়াল ছানাটাকে কিছুতেই কোলের মধ্যে রাখতে পারলো না। আঁচড়ে কামড়ে গৌরীর মোহ বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে দোর দিয়ে ছুট মারলো সে। গৌরীও অনুসরণ করল তাকে।

উঠানে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল গৌরী।

মা আর ছেলেতে মিলে একটু অপূর্ব করুণ মিলনান্ত দৃশ্যের অবতারণা করে মাতিয়ে তুলেছে উঠানের একটা দিক। আরো আশ্চর্যের বিষয়, মা-বেড়ালটার দেহের সমস্ত অবশতা, দৈন্যদিন্য আর রুগ্নতা যেন মুহূর্তের মধ্যে লোপ পেয়েছে। মা আর ছেলেতে মিলে এমন একটা অনাবিল স্নিগ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে তা দেখে গৌরীর মনের সমস্ত হীন স্বার্থপরতার ঘোর কেটে গেল মুহূর্তে। এই মুহূর্তে সে অনুভব করল তার মাতৃত্বে খুঁত, দুর্বলতা ছিল কোথায়।

বাড়ীর ঝি হা হা করে ছুটে আসছিল। গৌরী বাধা দিল তাকে—"ওদের কাছে যেয়োনা ঝিনুর মা, আমি ওদের আরেকটু দেখি!"

ঝিনুর মা কর্ত্রীর এই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হল।

শংকর বাইরে বেরুবার মুখে, গৌরীকে এমন তন্ময় অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল। আরো বিস্মিত হ'ল গৌরীকে এতখানি প্রাণখোলা অনাবিল পরিতৃপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—যা সে গত পাঁচটি বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়নি গৌরীর মধ্যে।

কাঁটা

মানবেন্দ্র পাল

খুকুর ওপর প্রমীলার এই যে অত্যাচার—সে কি তার নিজের ছেলে নয় বলেই?

কোনো স্ত্রীলোক যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে এটা ভাবাও কঠিন। তাহলে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে কোমল মনোভাব যুগে যুগে মানুষ পোষণ করে এসেছে, অকস্মাৎ সে ধারার যেন ছন্দপতন ঘটে।

সব ফুলই গোলাপ নয়, তবু বেগুনগাছেও যে ফুল ফোটে তার কোন বিশেষ মূল্য না থাকলেও তার পাপড়ি কখনো স্বভাব হারায় না। আপন কোমলতায় সে ঐশ্বর্যবতী।

অবশ্য প্রমীলা কখনো মানুষ খুন করে নি। কিম্বা নির্দয়ভাবে হত্যা করেনি কোনো জীব। কারও ঘরে আগুন জ্বালিয়ে সর্বনাশ সাধনের জন্যেও কখনো উদ্‌গ্রীব হয়নি। তবু পাড়ার তার যে পরিচয় সেটা বড়ো সুখদায়ক নয়। অথচ শত্রু কেউই নয় তারা।

প্রমীলা সে কথা বোঝে কিনা জানা নেই। হয়তো সে বোঝে, তাই পাড়ার কারও কাছে কোনো কথা বলে না। সুখ দুঃখ নিয়ে কোনো আলোচনাই কারও সঙ্গে করে না।

অথবা এইটিই তার স্বভাব।

কারণ তার কাঁদ পর্যন্ত কাটা চুল—তার উঁচু করে পরা ময়লা থান—তার চোখের উগ্র দৃষ্টি—গায়ের ময়লা—তেল-না-মাখা রুক্ষ চেহারা—এসবই যেন তার স্বভাবকে পাড়ার সকলের কাছ থেকে একটা নিদারুণ ব্যতিক্রমের মধ্যে প্রকট করে তুলেছে।

সহরের প্রান্তে খ্যাতিহীন বস্তীর মধ্যে প্রমীলার ছোট্ট কুঁড়ে। সেইখানেই তার সংসার। সঙ্গীও আছে একজন। তার ওপর প্রমীলার যে ব্যবহার—পাড়ার লোকের কাছে সেইটিই নির্দয়তার চরম নিদর্শন।.....

ঠক্ ঠক্ ঠক্!

প্রমীলা তখন পিটোচ্ছিল ছেলেটিকে।

—বল্ হারামজাদা, আজ মাস্তর এত কম রোজগার হল কেন? বল্।

ঠক্ ঠক্ ঠক্!

—কে? প্রমীলা গর্জে ওঠে।

—আমি গো, গোপালা।

—কেনে?

—আছা খোলোই না দিদি।

প্রমীলা বিরক্ত হয়ে দরোজা খুলে দেয়। সামনেই গোপালে। প্রমীলা প্রশ্ন করে না। শুধু ভুরুটা কুঁচকে ওঠে।

গোপালে হাসে। বলে—চারটে টাকা দিবি?

প্রমীলা ঝংকার দিয়ে ওঠে—কেনে? আমি কি টাকার চাষ করি না কারুলেওলা। মরণ! আবার দাঁত বের করে হাসছে।

রাজু আর রাধেশ্যাম কোথায় লুকিয়েছিল। হঠাৎ সামনে এসে হাততালি দিয়ে বললে,—দাঁড়া মাগী, তোর গুষ্টিকে এবার মুঠ করছি; লজ্জা করে না, ওই রুগ্নি ছেলেটাকে ভাড়িয়ে রোজগার করিস্—টাকা জমাস্ আর প্রতিবেশীর দুঃসময়ে ধারবর্জ দিস্ না!

প্রমীলা রাগে কথা বলতে পারে না। ওদের মুখের সামনেই সশব্দে কাঁপাট বন্ধ করে দেয়। গোপাল, রাজু, রাধেশ্যাম ওর ঘরের চারিদিকে খানিকক্ষণ হেসে-ডাক ডেকে চলে যায়।

তবু এর জন্যে প্রমীলাকে দোষ দেওয়া যায় এ বস্তীতে সে এসেছে তা আজ অনেকদিন হল, কিন্তু কেউ তেমন করে তার সঙ্গে মেশেনি। যারা মিশেছে

কেবল শকুনির মতো একটা হিংস্র দৃষ্টি নিয়েই এসেছে গেছে—যেটুকু কথা তারা বলেছে, তাতে ঝাল এত বেশি যে প্রমীলা তার উত্তর পর্যন্ত দেয় নি কোনো দিন। তবু তারা প্রতিবেশী।

অথচ এই প্রতিবেশীর হাতে যদি অসময়ে একটা টাকাও এগিয়ে দেয় তাহলে সে টাকা আর কোনোদিন ফেরত পাবে না। প্রমীলা এসত্য জেনেছে।

সেই একটা টাকা নিয়েই তারা অভাবের নামে হৈ চৈ করবে—মুড়ি আলুর চপ কিনে তাদের আড্ডায় বসে প্রমীলার শ্রাদ্ধ করবে।

প্রমীলা বুঝতে পারে না—তার সঙ্গে এ শত্রুতা কেন।

যত বুঝতে চায় ততই দিনে দিনে ওর নীরস চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে—বেজায় রুক্ষ হয়—কথা বন্ধ করে দেয় প্রতিবেশীর সঙ্গে।

রস নেই, ঝড় নেই ঠিক পাঁচটার সময় প্রমীলা উঠবেই। এবং উঠেই জোরে জোরে ঠেলে দেবে ছেলেটাকে—এই হতচ্ছাড়া। নবাবপুত্তুর, ওঠ্ শীগ্‌গির।

এখনো পড়ে পড়ে লাটসাহেবী হচ্ছে!

ধড়মড় করে উঠে বসে ছেলেটি। সমস্ত রাত ভাল ঘুম হয় নি। স্যাঁত স্যেঁতে মাটি—তার সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি নেমেছে মাটির দেওয়াল চুঁইয়ে। ছেঁড়া চট পেতে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। মাথাটাও তার ভার। ইচ্ছে করে আরও খানিকটা ঘুমোয়।—কিন্তু উপায় নেই। আর একটু ঘুমোলেই প্রমীলা এখুনি কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে তুলবে।

কর্কশস্বরে এমনি সময় প্রমীলা বলে—ওঠ, ওঠ, ওঠো গো রাজপুত্তুর, ওঠো!' কাস্ট টেরেনটা কি ধরবে না ধরবেনা? বলি মতলবটা কি?

উঃ মুখ করেছে কী! তাও তো বিধেতা চোখে দিষ্টি দেয় নি। নইলে বোধ হয় ভস্ম করে দিত।—হারে গত জন্মের পুত্তুর আমার!

ছেলেটির নাম সুখু। জন্মান্ধ।

করে প্রমীলা তাকে কোগাড় করেছে তার সত্য তথ্য কেউ জানেনা।

বস্তীর প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেছে এবং প্রত্যেককেই এক একরকম উত্তর দিয়েছে প্রমীলা। এবং এই বানানো কাহিনী অকপটে বলে যেতে কখনো এতটুকু সংকোচ বোধ করে নি।

কিন্তু এই প্রমীলাকেই যখন ট্রেনে ট্রেনে গাড়িতে গাড়িতে দেখা যায় অন্ধ পুত্রের হাত ধরে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে তখন কে ভাবতে পারে প্রমীলার বীভৎস দিকটার কথা?

তখন প্রমীলার ওই ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোই বেদনায় ছল ছল করে ওঠে—ওই কর্কশ কণ্ঠস্বর তখন হঠাৎই অশ্রুভরাক্রান্ত হয়ে ওঠে,—মাথার ওপর দিয়ে কপাল, পর্য্যন্ত নেমে আসে অবগুণ্ঠন। দুই কল্পিত হাতে অন্ধ ছেলের দুই হাত ধরে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় এই প্রমীলা।

বেশি কথা বলতে হয় না, শুধু 'বাবা' সম্ভাষণ ক'রে একটু কাতর চাহনি। তাতেই কাজ হয়ে যায়। দু' পয়সা এক পয়সা যে যা পারে তাই দেয় সমবাথা জানিয়ে।—আহা যার একমাত্র পুত্র জন্মান্ধ সে হতভাগীর ভবিষ্যৎ জীবন না জানি কী নিদারুণ!

নিদারুণ সত্যিই—প্রমীলাকেও বাঁচতে হবে তো! অন্ধ বলে সুখুরও পেটের ক্ষুধাতো মেরে যায় নি।

একদিন ওমনি ভোর বেলায় উঠতে পারেনি প্রমীলা। সুখুও প্রাণভরে ঘুমিয়েছে। কখন সকালের দুটো লোকাল বেরিয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। যখন প্রমীলার ঘুম ভাঙলো তখন তার ছেঁচাবেড়ার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে মুখের ওপর পড়েছে।

ধড়মড় করে উঠে দেখে সুখু তখনো দিব্যি আরামে পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে।

দেখবামাত্রই প্রমীলার সর্বাঙ্গ রাগে রি রি করে উঠল। তখনই সে মারধোর করতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ মাথায় এল আর এক ফন্দি!

তখনি পাঠকাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরালো। তার পর লোহার শিকটা কিছুক্ষণ তাতিয়ে হঠাৎ সেটা চেপে ধরল ঘুমন্ত সুখুর গালে।

দারুণ আর্তনাদ করে সুখু লাফিয়ে উঠল আর সেই মুহূর্তে খল্ খল্ করে হেসে উঠল প্রমীলা ;—কেমন আর ঘুমুবে বাছা? বড়ো আরাম—এ্যাঁ! বসে বসে খাবে নবাবপুত্তুর! মনে ছিল না, টেরেনে বেরোতে হবে?

কিন্তু প্রমীলার ভৎর্সনা চাপা দিয়ে বারো বছরের সুখুর কান্না তখন মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে।—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল!

বস্তীর লোকে ছুটে এল। ধরাধরি করে সুখুকে নিয়ে গেল ডাক্তার খানায়। গোপাল শাসিয়ে উঠল—জ্বালীকে জেলে দেব।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। প্রমীলারও জেল হয়নি, সুখুও সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। লাভের মধ্যে সুখুর মুখের ওপর আবির্ভূত হল আর একটা ভীষণ দাগ।

সেই দাগ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রমীলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল সুখুকে।

এবং পরের দিন থেকেই প্রমীলার ভিক্ষা প্রার্থনার আবেদন-বাক্য-সমষ্টির মধ্যে আর একটি বাক্য যুক্ত হল—দেখুন বাবু, ভগবানের মার! রাতের বেলায় জল খেতে উঠতে গিয়ে একেবারে পিদিমের ওপর পড়েছে। আহা বাছা আমার একে অন্ধ—

প্রমীলা চোখে কাপড় চাপা দেয়।

রাত দশটা নাগাদ লাস্ট লোকালে ফিরে আসে প্রমীলা। তখন সুখুর সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে অচল। ঘরে ঢুকেই ওর নিজের কোনটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রমীলার উৎসাহ কমেনা। বাড়ী ফিরেই ছুটো চাল ডাল ফুটিয়ে নেয়। তারপর ঘুমন্ত সুখুকে টানা হেঁচড়া মার বকুনি দিয়ে তোলে।

অতবাত্রে সুখুর আর ভালো করে খাওয়া হয় না। খিদে যখন পেয়েছিল তখন দু'পয়সার চানাচুরের বরাদ্দ প্রমীলা করে দিয়েছিল, তাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়না, হয় অপমৃত্যু।

ঘুমোতে ঘুমোতেই সুখু দুমুঠো মুখে দিয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ে। তার চোখে তখন ঘুম—শুধু ঘুম। তার স্বল্পপরিচিত পৃথিবী তখন তলিয়ে যায় ঘুমের অতল-স্পর্শী—গর্ভে। হয়তো মনে মনে ভাবেও—এ ঘুম যেন তার অনেক অনেক রাত্রির ঘুমের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। এ ঘুম যেন আর না ভাঙে ভগবান। তাহলে—

তাহলে আর যাই হোক কাল সকালে আর ধড়মড় করে উঠে টেরেন ধরতে হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য! প্রমীলার ক্লান্তি বলে কিছু নেই। দুপুর রাতে যখন সমস্ত বস্তী নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন নিজের ঘরে দরজা ভালো করে বন্ধ করে কোমরে গোঁজা একটা ময়লা থলি বের করে। তারপর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সেই থলি উপুড় করে। আর অমনি মাটিতে জমে ওঠে স্তূপে পয়সা—ডবল পয়সা—আনি দোয়ানির ঐশ্বর্য!

পিদিমের ঘোলাটে আলোয় প্রমীলার দুই লুব্ধ চোখ অকস্মাৎ কেমন যেন চক্ চক্ করে ওঠে। তখন আর তার বাহ্যজ্ঞান কিছু নেই। মাথার কাপড় খুলে গেছে—অনাবৃত পিঠের পাশ দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ময়লা কাপড়ের একপ্রান্ত, আর কোমরের কাছে ঢিলে হয়ে গেছে খিট। তা যাক। এই দুপুর রাত্রে তার এই তিরিশ পারের অযত্নপোষিত দেহের লাভে নিশ্চয়ই কেউ উঁকি দেবেনা আজ। দিলেও তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই প্রমীলার।

তার শক্ত খাঁটি দেহ না হয় আজ ঢিলে হতে চলেছে কিন্তু পঁচিশের কাছে যখন তার বয়েস—স্বামী সোহাগের অত্যাচারমুক্ত নিঃসন্তান প্রমীলার সেই আনমনা চঞ্চল বয়েসটা কি সেদিনও পুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল?

হয়তো যায়নি। কিন্তু প্রমীলার কাছে পুরুষ চিরদিনই অতি সাধারণ—তারই মতো ভীরু।

ছেলেবেলা থেকে প্রমীলা শুরু করেছে লড়াই বাঁচবার জন্যে পাশে পুরুষকেও দেখেছে সে সেই একই রণসজ্জায়। এর চেয়ে বেশি নতুন কোনো পরিচয় সংগ্রহ করবার সুযোগ প্রমীলা আজ পর্যন্ত পায়নি।

সে শুধু জানে পয়সা। ছোটোবেলা থেকে শিখেছে সে পথে পথে ভিক্ষে করতে। নকল কান্নায় চোখ ভ'রে জল এনে সে পথিকের মন ভিজিয়েছে—আজও মন ভিজিয়েই চলে

সে জানে পয়সা তাকে জমাতেই হবে। অন্য কারও জন্যে নয়, নিজেরই জন্যে। এমনি করে ঝড়-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে পথে পথে হাত পাতা—তার শরীরে বেশিদিন সইবে না। একদিন ভেঙে পড়বেই। সেদিন? সেদিন কি সুখু এসে দাঁড়াবে তার পাশে?

আশা করেনা প্রমীলা।

সুখু কে?

সত্য তার ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো। তার সবচেয়ে পরিচয়—সে তার কেউ নয়। সে আজ আছে, কাল হয়তো চলে যাবে অন্য কোথাও। হয়তো তারই মতো কেউ একদিন ভুলিয়ে বশ করে নেবে। ওর ওপর কি নির্ভর করা যায়?

নিস্তব্ধ রাত্রে প্রমীলা আনি, পয়সা এক এক সার সাজিয়ে রাখছে গুণে গুণে। তারপর—

তারপর আছে আরও কাজ। এই রাত্রেই ওগুলিকে ছোটো হাঁড়ির মধ্যে পুরে পুঁতে রাখতে হবে মাটির নীচে।

সুখু বড়ো একটা কথা বলেনা প্রমীলার সঙ্গে। ঝগড়াও করে না। যখন খুব বিরক্ত বোধ করে কিম্বা রাগ হয় তখন তার চুলটা কুঁড়কে ওঠে। সেইটেই তার অধীরতার লক্ষণ।

পৌষমাসের দারুণ শীতে সে একদিন সাহস করে বলে ফেলল প্রমীলাকে—এত সকালে ওই ছেঁড়া গেঞ্জি পরে বড়ো কষ্ট হয়। যদি একটা জামা কিনে দেয়—

কথা শুনে প্রমীলা হাঁ হাঁ করে উঠল;

—চুপ কর্, চুপ কর্ হতভাগা। জামা গায়ে নবাবপুত্তুর সেজে উনি ভিক্ষে করবেন!

দাঁড়া, এবার থেকে ওই গেঞ্জিটুকুও খুলে নেব।

অন্ধ সুখু ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তাহলে বুঝি, প্রমীলা এখুনি তার গেঞ্জিটা খুলে নিতে আসছে। প্রাণপণে গেঞ্জিটা দুহাতে চেপে আর্তনাদ করে উঠল।

প্রমীলা সশব্দে একটা বিদ্রূপে হাসি হেসে উঠল। আবার নতুন করে তার মনে হল—সুখু পর। তার—কেউ নয়।

মাঘমাসের শেষে হঠাৎ কয়েকদিন বাদল নামল। দারুণ শীতে হাড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে—মাথা কন্ কন্ করে ওঠে—ঘর থেকে বেরোনো যায় না একপা।

আকস্মিকভাবে এই সময় হঠাৎ একদিন প্রমীলা বিছানা নিল।

একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে গেল। প্রমীলার জ্বর ছাড়ে না। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু তার চেয়ে অসহ্য তার এক একদিনের ক্ষতি। অথচ উপায়ইবা কি?

সুখু সেদিন পা টিপে টিপে অতি সংকোচে প্রমীলার কাছে এসে বসেছিল। সুখুকে দেখে প্রমীলার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

বললে—হতভাগা লক্ষীছাড়া বাঁদরমুখো, খুব সুখে আছিস্ না? বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা চোখের সামনে থেকে। দেখলে গা জ্বলে যায়। কেবল খাবে?

সুখুর মাথাটা নিচু হয়ে গেল। একটা কৈফিয়ৎ তার গলা বেয়ে উঠে আসছিল, সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল।

প্রমীলা তখনো চীৎকার করছে—যাওনা, দয়া করে

বড়ো রাস্তায় গিয়েও তো একটু দাঁড়াতে পার। না সেটুকু কষ্টও সইবে না সোনার অঙ্গে।

প্রমীলা মুখ ফিরিয়ে শুলো।

একটু পরে কানে এল লাঠির শব্দ—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

বুঝল, সুধু বেরোচ্ছে।

প্রমীলার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল—একটা আত্মতৃপ্তির হাসি।

বোধহয় প্রমীলার জীবনে এই রকম হাসি এই প্রথম।

বিকেলের দিকে প্রমীলার জ্বর ছেড়ে গেল। মাথা ধরাও গেছে অনেকক্ষণ। এখন শরীর বেশ ঝরঝরে। সমস্ত দুপুরটা ঘুমও হয়েছে ভালো। কিন্তু একটা ভাবনা যেন ওর মাথায় ঘুরছে—সুধু এখনো ফেরেনি।

তা না ফিরুক, যদি একটু সুবুদ্ধি হয়ে থাকে! পুরুষমানুষ যদি না খাটে তাহলে চলবে কী করে সারা জীবন? তা ছাড়া প্রমীলার চোখে পুরুষমাত্রই সমী।

…কিন্তু কিছুতো খেলও না!

তা বয়েস কম হলে কি হয়, এদিকে সেয়ানা আছে। দোকান থেকে কিছু কিনে খাবেই। নিজেকে শুকিয়ে রাখবার ছেলে ও নয়।

তা বলে সব পয়সা কটা খেয়ে ফতুর না করে দিলে বাঁচি। কাঁচা পয়সার লোভ—

…কিন্তু এখনো ফিরল না! এরপর সন্ধি হয়ে গেলে ফিরতে যে কষ্ট হবে!—অন্ধ, তার ওপর জল বৃষ্টি!

দূর ছাই! আর ভাবা যায় না। কচি খোকাতো নয়। এ পাড়ার সবাই চেনে। দরকার হলে হাত ধরে কেউ পৌঁছে দেবে।

প্রমীলার মাথায় আবার অন্য চিন্তা এল। ভাবলে, এক কাজ করলে হয়। এখন সুধু বাড়ী নেই, এই সময় একবার মাটির নীচ থেকে ভাঁড়টা খুলে টাকাপয়সাগুলো মিলিয়ে নিলে হয়। কত জমল। রাত্তিরে ঠিক সুবিধে হয় না গোনার।

কি—ন্ত—! দিন-দুপুর বেলা। এখনো রোদ যায় নি। তারপর যা পাড়া—যদি কেউ দেখে ফেলে? দরকার নেই।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রমীলার মাথাটা আবার কেমন যেন ভারী হয়ে ওঠে।

—ছোঁড়াটা পালিয়ে গেল না তো? ভুলিয়ে নিল না তো কেউ?

এই রে আবার মাথা ধরল না কি! তা হলেই সর্বনাশ।

তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে প্রমীলা।

ঘুম ভাঙল প্রমীলার চটাং দরজার শব্দ শুনে। ধড়মড় করে উঠে বসল। উঃ অনেক রাত হয়ে গেছে যে! লাষ্ট ট্রেন চলে গেল নাকি! সুধু—

দুম্—দুম্—দুম্!

—কে?

উত্তর নেই। আবার শব্দ হয় দুম্—দুম্—দুম্।

—কে এত রাত্রে?

—শিগ্‌গির খোলো। আমি গোপ্‌লা।

—আ মরণ, দরজাটা ভেঙে ফেলবে নাকি! হয়েছে কি?

উত্তর শোনা গেল না। শুধু দরজা খোলার শব্দ। যেন এখুনি কারা ভেঙে ঢুকে পড়তে চায়।

কী হল কি? ভাবতে ভাবতে প্রমীলা উঠে দরজাটা খুলে দেয়। অমনি ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে গোপ্‌লা, রামু, রাধেশ্যাম, লোটন, ভিক্ষু

প্রমীলার চোখ দুটো রাগে উত্তেজনায় জ্বলে ওঠে।

—কী এত রাত্রে?

গোপ্‌লা কোমরের ওপর হাত বেঁকিয়ে জিগ্‌গেস করলে—সুধু কোথা?

—ওর কথাই তো ভাবছিলাম এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে। সেই কোন্ সকালে গেছে—

গোপ্‌লা আর থাকতে পারল না। ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলে প্রমীলার গালে—বড় মেয়ে! ডাইনি!

উনি ভাবছিলেন সুখুর জন্যে! কেন পাঠিয়েছিলি একা একা? বল্ রাক্ষুসী বল্?

প্রমীলা চীৎকার করে উঠল—চুল ছাড়বি কিনা বল্ গোপ্‌লা!

গোপ্‌লা চুল ছেড়ে দিল।

বললে—আমি না হয় ছাড়লাম, কিন্তু পুলিস ছাড়বে না···যমেও ছাড়বে না। একেবারে ফাঁসী কাঠ। ন'ও, চলো ইষ্টিশানে। সুখুর নাম সনাক্ত করতে হবে।

প্রমীলার কণ্ঠ থেকে স্বর বেরোল না। কেবল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত দিয়ে গোপালের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলে—কী হয়েছে, আমায় সব কথা খুলে বলো না গোপাল দাদা!

—বলতে আমার কিছু হবে না। সবই পুলিস বাইরে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে চলো।

পুলিসের কাছে জবানবন্দী দিতে রাত অনেক হয়ে গেল। ফেরবার সময় সুখুর ক্ষত বিক্ষত দেহটার দিকে এগিয়ে যেতেই পুলিস বাধা দিল।

হেসে উঠল—মাগীর লোভ দেখো! এখনো নতুন খানাতল্লাসী করতে চায়। পাছে আজকের রোজগারটা সঙ্গেত বেটা ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পালায়!

সবাই হেসে উঠল। হাসল না কেবল দুজন। দারোগা আর প্রমীলা।

দারোগা বললে—তাহলে সুখুকে তুমি ট্রেনে বেরোতে বলোনি আজ?

—না, আমি বলেছিলাম, সামনের বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে।

—আচ্ছা, এখন বাড়ি যাও। পালিওনা যেন বস্তী ছেড়ে। দরকার চলেই কোর্টে হাজির হতে হবে।

প্রমীলা আর কোনো কথা বললেনা। নিঃশব্দে ফিরে চলল বস্তীর দিকে।

ঘন অন্ধকার শীতের রাত। হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সেই ঠাণ্ডার হাড়ের মধ্যেও কাঁপুনি জাগে।

অন্ধকারে একা এগিয়ে চলেছে প্রমীলা। আজ আর তার শীত লাগছেনা—তিন দিনের অনাহার পীড়িত ক্লান্ত দেহটাও যেন মনে হচ্ছেনা দুর্বল। চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার এক-একটা ছবি।

·····সুখুর ট্রেণে-কাটা ক্ষতবিক্ষত দেহ!

·····গোপ্‌লা আজ তার চুলের মুঠি ধরে গালে চড় মেরেছে! হতচ্ছাড়া মিনসে!

কাল থেকে তার আয়ের পথ গেল বন্ধ হয়ে! কে আর তার মুখ দেখে পয়সা দেবে?

·····পুলিস বলেছে, কোর্টে উঠতে হবে। কে জানে হয়তো তার জন্যে ফাঁসি-কাঠ তৈরী হচ্ছে। হয়তো তাই আজ দারোগা-বাবু তাকে বিশেষ কিছু গালমন্দ করলে না।

·····কিন্তু কেন? কেন তার ফাঁসী হবে? কেন তাকে কোর্টে যেতে হবে? সুখু তার কে? সুখু কেউ নয়। সুখুকে তো সে খুন করেনি।

·····তাকে তো শুধু বলেছিল, বড়ো রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াতে। তবু যদি সে মরতে যায়? যদি নিয়তি তাকে? তার জন্যে প্রমীলা কি করবে?

·····কিন্তু সত্যিই সুখু আর ফিরে আসবে না। আর সে কোনোদিন তার সঙ্গে ঝগড়া করবে না—শীতের সকালে আর কেউকোনোদিন চাইবেনা একটা জামা।

প্রমীলার বুক ঠেলে একটা সমস্ত কোঁপানি কেঁদিয়ে ওঠে। খেয়াল হয়, কখন সে বস্তীর ভেতর ঢুকে পড়েছে। সামনেই তার কুলুপবন্ধ দরজা।

সন্তর্পণে এগিয়ে যায় প্রমীলা। আঁচল থেকে চাবিটা বের করে তালার গায়ে লাগাতে চায় কিন্তু হাত কাঁপে থর্ থর্ করে।

ওপাশের আদখানা খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে জমাট কালো অন্ধকার—সুখুর দৃষ্টিহীন চোখের মতো যেন নিথর হয়ে রয়েছে।

প্রমীলার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

ছোটলোকের রসের কথাটা অমূল্যরতন সবিস্তারে নিবেদন ক'রতে যেতেই রমাপতি হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন : থাক্, আমি জানি!

যাও বা একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছিল, তাও যেন টান মেরে ছিঁড়ে ফেলা হ'লো।

সাত মুখে আবার দুর্ভাবনা ঘনিয়ে আসে। কাকা সব জেনে শুনে চুপটি করে আছেন! কোনদিক দিয়েই বুঝি আর বিশেষ সুবিধা নেই।

রমাপতি বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যাও—ব্যবস্থা একটা করতেই হ'বে! এদের ছ্যাদ্দটা তো করি আগে—

আর বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না শ্রোতাদের মুখে চোখে। কেমন যেন নিস্তেজ হ'য়ে থাকে সবাই। বোধহয় রমাপতিরও আর কিছু করবার কোন ক্ষমতা নেই। মুখেই কেবল বলছেন, এই করবো, সেই করবো!

কিন্তু কি করবেন?

শিবশঙ্কর বললে, ছ্যাদ্দটা এখনি হওয়া দরকার। নালিশ-মকদ্দমা যা করবার এখনিই করে' ফেলা উচিত! চুপ করে থাকলে আরো পেয়ে বসবে—

পঞ্চানন বাধা দিলে, আজকাল রোজই তো শুনতে পাই মিটিং করছে! পাঁচ গ্রামের লোক জড় করচে!

বিধুভূষণ বললে, উপস্থিত মিটিংগুলো বন্ধ করে' দেওয়া দরকার! আমাদের জায়গায় মিটিং করতে দেব না! নিজের বাড়িতে বসে ওরা যা পারে করুক!

রাজীবলোচন বললে, আর সে-সব ভাষা যদি শুনতেন!

গম্ভীর কণ্ঠে রমাপতি বললেন, সব শুনেচি, সব জানি! এখন ওদের বলবার দরুন বলুক না, বলতে দাও—দৌড়টা দেখই না।

আক্ষেপের সুরে কৃষ্ণধন বললে, আর কতো দেখবো! আর কত শোনা যায়! শুনলে গা জ্বলে যায়! এদিকেও যে—

ইঙ্গিতটায় সবাই লজ্জা পায়। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কেষ্টোটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। হ'চ্ছে এককথা, পাড়লে আর কি কথা—তোর অচল তা কাকা করবেন কি! তা হ'লে আর পরামর্শ চাওয়া কেন, যাও ওদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত কর! পেট চলে না আবার গাও জ্বলে!

রমাপতি বললেন, অসুবিধে একটু হ'বে বৈকি! বাঁধা ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল! তবে তেমন যদি বোধ কর একটা ব্যবস্থা করে নিতে পার যে যার মত! আমার কোন আপত্তি নেই!

এটা ভৎর্সনার কথা। সবাই বুঝতে পারে। আপত্তি নেই মানে ওঁর যথেষ্ট আপত্তি আছে! যে যার মত ব্যবস্থা মানে কি!

মুখে যাই বলা যাক, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত কৃষ্ণধনের উত্থাপিত সমস্যাটা কিন্তু মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না।

এদিকে সত্যিই অচল।—ঘড়ার জল গড়িয়ে আর কদ্দিন চলে? জানতে তো আর কারো বাকি নেই—মাটি বেচে পয়সা, সেই মাটিই যদি বেইমানী করে তা হ'লে করনীয়টা কি!

কৃষ্ণধন মরিয়া হ'য়ে বলে, তা ছাড়া আর উপায় কি। বাঁচতে তো হ'বে আগে—

শিবশঙ্কর বাক্রোক্তি করে, তা হ'লে মরতে এসেছিলে কেন। কোনরে জোর নেই, আবার লড়ায়ের শখ

তোমার জিনিষ, তুমি আধা কড়ি দিয়ে ব্যবস্থা করতে পার ইচ্ছে হ'লে—সাধটা একলা কারুর নয়।

আমারও নয়। কৃষ্ণধন ফোঁস পড়ে। তোমার উপদেশ চাওয়া হ'চ্ছে না। লম্বা লম্বা কথার কে ধার ধারে।

রমাপতি মাঝখানে পড়েন, কি হ'চ্ছে তোমাদের ছেলেমানুষি। কারুর কথা যদি কারুর সহ্য না হয় তা'হলে তো মুস্কিল! কেষ্ট কি বললে আর অমনি তুমি চিমটি কাটলে। ছি, ছি! অন্যায় কথা কেষ্ট কিছু বলেনি—

সমস্যাটা আবার নতুন করে উপলব্ধি করা যায়। সত্যিই বিষয়েও একটা খোলাখুলি আলোচনা হওয়া উচিত। কার কি অবস্থা, পরস্পরের দেখা দরকার এসময়। মুখের কথায় একতা আসে না। অভাবে মানুষ সব করতে পারে। অবস্থা বৈগুণ্যে একতা সম্ভব নয়।

রমাপতি বললেন, রাগের কথা নয়। এখন দেখা দরকার সত্যিকারের ক্ষতটা আমাদের কতখানি। এই যে কালী রাগ করে উঠে গেল, ওর মধ্যেও একটা কথা আছে। নারাণের সঙ্গে গণ্ডগোলটা চুকতো—আসলে কেষ্টর মত ও স্পষ্ট ক'রে বলতে পারেনি—

আবার চারাগুলো দীর্ঘ দেখায়—মনের দুর্বলতা কাহা বিশিষ্ট যেন। জোর কোথায়? জোর নেই তাদের কারো—আলো নিভলে সব অন্ধকার। এক এক কুঁ-এর দরকার কেবল।

রমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, বাইরের মহালও কি সব বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেদিক থেকে পাওনা গণ্ডা কিছু নেই?

সবাই চুপ করে থাকে। অর্থাৎ সেদিকে নির্ভাবনা। কবে হ'য়ে গেছে সে-সব বিলি ব্যবস্থা। দু'সন তিন সন ক'রে সব আগাম নেওয়া আছে, কারো বা কিস্তী কবালা শেষ।

রমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, কি? নিশ্চিন্ত!

খুবই বেখা শোনায় রমাপতির কথাটা। অবস্থা নিয়ে এরচেয়ে বেশি বক্রোক্তি বুঝি আর হয় না। জেনে শুনে কাকা টিকি ধরে নাড়া দিচ্ছেন। বোঝেন না উনি পুকুর ছেঁচে কদিন চলে!

রমাপতি চুপ করে' থাকেন। হয়তো ভাবেন, আশ্চর্য স্খলিত গতিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে গেছে। এই সেদিনের কথা স্বপ্নের মত যেন—মনে হ'য়েছিল অফুরন্ত, অগাধ, অপরিমিত। এর শেষ নেই, সুরু নেই— এমনিই চলবে চিরকাল, নিরবধিকাল! উদয়পুরের ঘোষেদের অবস্থার ইতর বিশেষ হ'বে না কোনকাল। যেমন ছিল কাল আজও তেমনি থাকবে, ভবিষ্যতেও তাই—অতিথি, অভ্যাগত, আশ্রিত, বন্ধু-বান্ধব, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব অটুট থাকবে। এই বংশে একদা ধন সঞ্চয়ের ইতিহাসটা যেমন অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর স্বপ্নের মত তেমনি তার নিঃশেষ নিঃশেষটা বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মত। হঠাৎ আসার মত হঠাৎ যাওয়া—তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার ইতিহাস নেই কোন। আর দুঃখও সেইজন্য।

ধন-জন-যৌবন দুরতি নিষেবাৎ কালঃ—নিজের মনে রমাপতি চমকে উঠলেন। তিনিও চলে যাবেন—আজকের যুদ্ধ জয় তাঁর পক্ষে কালকে বৃথা হ'য়ে যাবে, এই উত্তেজনা এই দুর্ভাবনার চিহ্ন মাত্র থাকবে না ঘোষবংশের ভবিষ্যৎ কুলপঞ্জীতে, কালাচাঁদ গোরাচাঁদ, শ্যামচাঁদ, নিমচাঁদ আরো অনেক চাঁদের হাটে তিনি মিলিয়ে যাবেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো কতটুকু সুখ দেবে?

কিছু না, কিছু না, কেউ না, কেউ না! যা হবার তা হ'বে, মিথ্যে ভাবনা!

শিবশঙ্কর বললে, জানেন তো সব। এখন গ্রামের এই ক'বিঘেই সম্বল। তার ওপর এই হাঙ্গামা।

হঠাৎ রমাপতি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, হাঙ্গামা! বেটারা মনে করে কি! মরে গেছি, না? কোন ভাবনা নেই কারো, আমি বলছি—তোমরা কেবল ঠিক থাকো। কি হ'য়েছে! চাষ হবে না? কুছ্ পরোয়া নেই—ধান

পড়ে জমি একবছর—উর্বরা শক্তি বাড়বে, জিরোতে পারবে। তারপর?

তক্তাপোষের উপর মুখগুলো কেমন দেখায় যেন বিশ্বাসে-সন্দেহে, উৎসাহে-নিরুৎসাহে কেমন যেন ছিঁজিজি।

রমাপতি বললেন, ঠিক আছে। শিবু তুমি কালই দেবীপুরে গিয়ে বাকি খাজনার নালিশ দিয়ে এসো, আর তোমরা এদিকে সব ঠিক রেখো। বটতলার মাঠ, আগুন খাকীর পোড়, যেখানে যেটুকু পতিত জমি আছে কালই বেড়া দিয়ে যাও, সেই সঙ্গে খানায় জানিয়ে রেখো। একটু টা-ফুঁ করুক, একশ চুয়ান্নিশ ধারা জারি করাব। কাল খানায় একটা বড় মাছ পাঠিয়ে দিয়ো।—পুকুরে তো নেই! কিনে দিতে হ'বে। উপায় কি! খুব ভোরে তিলজলায় পাঠালেই হবে!

একসঙ্গে সবার বুঝি হাই উঠলো। রমাপতির ঘড়িতে একটা ঘণ্টা পড়লো। বোঝা গেল না কটা। চোখ তুলেও ঘড়ির মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না, লণ্ঠনের বিক্ষিপ্ত আলোটা ঊর্ধ্বগামী হবার আগেই স্তিমিত হয়ে গেছে—ছায়া পড়েছে চতুর্দিকে।

টপ করে' আলোটা তুলে ধরে শিবশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলো, আড়াইটা। ইস্-স্—

এতক্ষণ রমাপতিই যেন এদের আটকে রেখেছিলেন জোর করে। আর সকলে বললে, অনেক রাত হ'য়েচে!

রমাপতি বললেন, হাঁ, বড্ড রাত হ'য়েচে, তোমরা যাও!

এক এক করে' সবাই উঠে গেল। হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে ঘরটা বড় উজ্জ্বল দেখাল। রমাপতি তক্তাপোষ থেকে নেমে এসে খড়মটা পায়ে দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন। ব্রহ্মদৈত্যের গদ সঞ্চারের মত আঁধারের বক্ষ ভেদ ক'রে খড়মের পদাঘাত শব্দ হ'তে লাগল, ঠক্, ঠক্—ঠকাস্ ঠক্!

এত রাত্রে এ আবার কি খেয়াল রমাপতির মনের।

স্ত্রী বিয়োগের পর একরকম বলতে গেলে রমাপতি ভেতর বাড়িতে ঢোকেন নি। তারপর কত দুর্ঘটনা ঘটে গেছে পরপর। ছেলে গেছে, ছেলের বউ গেছে, নাতি নাতনী গেছে ক'জন পরপর। মনে পড়লে মনে হয় চক্ষের পলক যেন—রুষ্ট বিধাতা পুরুষ যেন উপর্যুপরি ডিক্রীজারির পেয়াদা পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে মেরেছেন!

একদা দুঃখ-আঘাত যা পাবার ঐ বুক পেতেই রমাপতি সহ্য করেছেন। যখন সহ্য করতে পারেননি তখন হয় গৃহ-দেবতা লক্ষ্মীজনার্দনে আত্মসমর্পণ করেছেন, নয় চুপটি করে বৈঠকখানার ঘরে এসে বসেছেন প্রস্তর মূর্তির মত। স্বজনবন্ধু কারো কোন সান্ত্বনা বাক্য তখন তাঁর কানে পৌঁছায়নি। সে একদিন গেছে—

মৃত্যু শোকের ভয়াবহতা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল—সংসারের সমস্ত মায়ামমতার উত্তাপ নিতে গিয়ে আলাদীন বেদনায় কেমন ছট পাকিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ঐ বিস্তৃত খামারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে কাতর চোখে বার বার নিজের হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন রমাপতি। করতলের সমস্ত রক্ত কখন যেন নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছিল—হাতের রেখা-চিহ্নগুলো কালসিটে দাগে প্রকট হ'য়ে উঠেছিল।

কতদিন হাত মুঠো করে' চোখ বুজিয়ে বসেছিলেন রমাপতি। কতক্ষণ কে জানে। সেই পরিচিত স্বরে চমকে উঠে স্থির হয়ে গিয়েছিলেন রমাপতি: দাদু! দাদু!

চোখ মেললে যেন জগৎ বিদারক মর্মান্তিক কিছু দৃষ্টি গোচর হ'বে। রমাপতি তখনো চোখ বুজিয়ে ছিলেন। সাড়া দেবার তাঁর শক্তি নেই—কোন সম্বন্ধে আজ তিনি কারো কেউ নন। বিস্তৃত, লক্ষ তরুশ্রেণী মাঝে বৃদ্ধ রমাপতির সম্বন্ধ কোথায়? দাবানলের ভস্মস্তূপে সবুজের কামনা কই? অপরাধই কেবল বৃদ্ধ বনস্পতির।

দাদু! দাদু!

চোখ চেয়ে কাঠ হয়ে গেলেন রমাপতি। চোখের

পলক পড়ল না, স্থির। একমাত্র বাতিটা দুর্যোগে জ্বলছে টিম্ টিম্ করে।

মাধুরী ধীরে ধীরে দোর গোড়ায় এগিয়ে এসে দাঁড়াল —ডাকলে, দাদু, বেলা হয়ে গেছে। ওঠবে না? চান করবে না?

সে বাতির ঔজ্জ্বল্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে পরখ করতে লাগলেন রমাপতি। মনে হ'লো বড় ক্ষীণ সে দীপ বড় দুর্বল, বড় অসহায়। এখনি একটা হাওয়া উড়িয়ে নিতে যাবে, অন্ধকারে সব একাকার হ'য়ে যাবে। অন্ধ হ'য়ে যাবেন রমাপতি চিরজন্মের মত!

আর্ত্ত কণ্ঠে রমাপতি বললেন, বেলা হ'য়ে গেছে? তাই তো। ঘাটে কেউ নেই!

ছোট্ট মাধুরী এসে হাত ধরলে, ওঠ না, আর কত দেরী করবে?

নাতনীর মাথায় হাত রেখে স্নেহ বিগলিত কণ্ঠ কখন অশ্রু হয়ে অঝোর ধারায় ঝরতে লাগল।

শব্দ শুনে আজ চেয়ে দেখতে হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেলেন রমাপতি। কোন এক অপরিচিতা মায়াবিনী যেন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে।

দৃষ্টির বিহ্বলতা কাটলেও মুখে কথা সরল না রমাপতির। সেই ছোট্ট মাধুরী হঠাৎ যেন কত বড় হ'য়ে গেছে আজ। যৌবনের যাদুকরী প্রভায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণা হ'য়ে উঠেছে কখন। কেমন অদ্ভুত সঙ্কোচ বোধ করেন রমাপতি মনে মনে।

ঘরে ঢুকে মাধুরী বললে, দাদু, সেই তুমি বেলা করবে! এমনি ক'রলে কিন্তু—

রমাপতি তাড়াতাড়ি বললেন, না, না, এই যে উঠচি!

মাধুরী অনুযোগ ক'রলে, রোজ রোজ এমন করলে শরীর টিকবে?

কতদিন তোমাকে বলেচি কিছুতে শুনবে না। বুড়ো মানুষ—

সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি প্রতিবাদ করেন, আমি বুড়ো? কখ্খোন না।

মাধুরী হেসে ফেলে, না, নবীন যুবক। এখন উঠবে কিনা বল!

রহস্য করেন রমাপতি, না, বুড়োর খোঁজে আর দরকার কি?

মাধুরীও রাগ দেখায়, বেশ। আমিও চলে যাব—তোমার সংসার তুমি বোঝ।

তেমনি রহস্য করে রমাপতি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাবি?

যেখানে দু'চোখ যায়। বুঝি সত্যি সত্যি মাধুরী চলে যায়।

ওরে বাবা! কি সাংঘাতিক মেয়ে! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নাতনীর হাত ধরেন রমাপতি, আমাকে সত্যি তোর পছন্দ হয় না?

দাদুর গলাটা জড়িয়ে ধরে হেসে মাধুরী বললে, তোমাকে পছন্দ না হলে আর কাকে পছন্দ হবে। সোনামনি, যাদুমণি, দাদু ভাই!

বৃদ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলেন, ঠিক তো, আর কোথাও যাবি না? এই বুড়োকে নিয়ে সংসার করবি?

মাধুরী অসম্মতি জানায়, না বাপু, বুড়ো-খুড়ো আমি নিতে পারবো না। বুড়ো বরে আমার চলবে না।

নিজেকে সংশোধন করে রমাপতি বলেন, মানে আমার মত বুড়ো আর কি!

না, কোন বুড়োই চলবে না। মাধুরী ঘাড় বাঁকিয়ে বলে।

আমারও চলবে না কচি খুকীতে! রমাপতি মাথা নাড়েন।

যাকে নিয়ে চলবে সে তো আছেই তোমার—কুসুমদিদি, ভাবনা কি? বাঁচলুম।

বাঁচাচ্চি! এই কটা দিন যাক, হাঙ্গামাটা মিটুক তারপর দেখচি, কে চলে আর কে না চলে। এমন ঘুরে ঠেলবো তখন বুঝবি এই বুড়োর কদর কি! এখনো রাজী হ' বলচি—

অভাগীর দশা। কুসুমদির সঙ্গে ঝগড়া করি। কৌতুকে মাধুরী ঠোঁট বেঁকায়।

তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি? সতীন না হলে মেয়েমানুষ বশ হয়?

বিয়ে করলে তো! রমাপতির সামনে এগতে এগতে মাধুরী বললে।

কুসুমকে যদি ত্যাগ করি? রমাপতি নাতনীকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন।

তা আর হয়না! ছিঃ—মাধুরী মধুর ধিক্কার দেয়।

রমাপতি আর কিছু বলতে পারেন না।

সে বড় লজ্জার ব্যাপার! জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীও জেনেছে কুসুমের সঙ্গে তাঁর যে অবৈধ সম্বন্ধের ইতিহাসটা। স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিনের মধ্যেই রমাপতি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ ক'রতে বিশেষ উদ্যোগী হ'য়ে ওঠেন। পরিপূর্ণ সংসারে একটা কাল মেঘ দেখা দেয়। রমাপতির সংকল্প অবিচল, বিয়ে তিনি করবেনই—পাত্রীর সন্ধান, কথাবার্তা একরকম ঠিক। ঘর সয় না। আড়ালে এই নিয়ে হাসাহাসি ক'রলেও সামনে সকলে রমাপতিকে উৎসাহই দিলে—বিয়ে না করলে চলে? বুড়ো বয়সে দেখবে কে? কি আর এমন বয়েস হয়েছে! ঐ বয়েসে লোকে তিনবার বিয়ে করে, ইত্যাদি।

বাপের অভিরুচিতে মনে মনে বিরক্ত হ'লেও মুখে কিছু বলতে সাহস করেনি তারাপদ। লজ্জায় বুঝি মাথা হেঁট ক'রে চলতে হয় তাকে। বাপকে বুঝিয়ে পরামর্শ দেবার প্রবৃত্তি নেই তার। ভাস পেলে মানুষ কি করতে পারে! ছি, ছি!

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বিনা খবরে তারাপদর শ্বশুর এসে হাজির। বেয়াই-এর সঙ্গে রাতদিন কি সব পরামর্শ চলল। বুঝি বিয়ের কথা পাকাপাকি, উনিও আছেন এর মধ্যে। যে লোক বেয়াই বাড়ি তেরাত্তির কাটায় না তিনি কিনা বিনা খামখেয়ালে তেরদিন রইলেন! তারপর তিনি যখন চলে গেলেন তখন দেখা গেল, নস্কর পাড়ায় একটা পড়ো ভিটে জেগে উঠেছে—বাঁশ বাঁখারি আর খড়ে দিব্যি একটা গৃহস্থালী তৈরী হয়েছে। আরও ক'দিন পরে দেখা গেল, স্বয়ং রমাপতি নিয়মিত সন্ধ্যাকালে সেখানে এসে বসতে লাগলেন। তাঁর পরিচর্যায় যে নিযুক্তা হ'লো সে ঐ পড়ো ভিটেটার একদা উত্তরাধিকারিণী, শ্রীমতী কুসুম বালা। গ্রামে কুসুমের নিজের কোন ঘর ছিল না, আবার সব ঘরই তার নিজের ছিল।—স্বাস্থ্য ছিল অটুট, দেহশ্রী ছিল অনিন্দ্য! জানাশুনায় অনেক কুশ্রীতা তাকে ম্লান করতে পারেনি। কবে যেন তার সাত বছরে বিয়ে হ'য়েছিল, কবে যেন তার স্বামী তাড়ি খেয়ে তালগাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, কবে যেন সে তেপান্তরের মাঠ ঝাঁপিয়ে বাপ-ভাইএর কাছে পালিয়ে এসেছিল, কবে যেন যৌবন আলায় হাটে বাজারে ঘাটে কি সব কুকাজ করেছিল; তারাপদর শ্বশুর দেখে শুনে এমনি মেয়েকেই নিযুক্ত করে গেলেন বেয়াই রমাপতির কামনার ইন্ধন হিসাবে। রমাপতি শান্ত হলেন। ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

সেই কুসুমকে আর কখনো ত্যাগ ক'রতে পারেন রমাপতি! অনেক দুঃখের সান্ত্বনা সে! 'ছিঃ' তো বটেই, সামান্য রক্ষিতা হ'লেও ছলনার দিক থেকে কুসুম কোন অংশে হীন নয়! রমাপতির সংসারে দৈবাদুর্গতিতে পরমাত্মীয়ের কাজ করেছে—পরম স্নেহে মমতায় ঐ সাধের কুসুমটিকে প্রস্ফুটিত রেখেছে—মাধুরী ওরই ঘরে লালিত হয়েছে!

রহস্য করে রমাপতি বললেন, আমি কুসুমের মত নেব—সে যদি রাজী হয়?

তোমার মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে দেব! যা-মশায় যা পারেননি আমি তাই করবো! মাধুরী গম্ভীর কণ্ঠে বললে।

ওরে বাবা! দরকার নেই, কালই মল্লিকপুরে রসনচৌকির বায়না পাঠাচ্ছি—এ মেয়েকে আর একরত্তি ঘরে রাখা যাবে না। কি সাংঘাতিক বলে বিনা, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেবে! ছুঁচকলা নিয়ে সাপ পুষিছি! নতি যেন ভয় পেয়েছেন এমনি ভাবে রমাপতি বলেন।

মাধুরী খিল খিল করে হেসে ওঠে, এই তোমার সাহস? এই সাহস নিয়ে দ্রোপাচার্য সেজেছো? এ যুদ্ধে হার নিশ্চিত।

তার মানে? হঠাৎ গলার স্বর বদলে যায় রমাপতির, তুই কি করে জানলি? আমরা হারলো।

না, জিতবে! উদয়পুরের ঘোষেরা কখনো কারোর কাছে হেরেছে? কটা চালাকুলো কি করবে!

নাতনীর শ্লেষাত্মক কথাটা রমাপতি বুঝি ধরতে পারেন না। আত্মশ্লাঘায় মাথা নাড়েন আত্মপ্রসাদে, তবেই না!

[ক্রমশঃ]

কুটিরশিল্প ও আনুসঙ্গিক

মনোজ বসু

সম্প্রতি কুটির শিল্প লইয়া প্রচুর আলোচনা চলিতেছে। সরকার এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিতেছেন। পাছে আমাদের কোনরূপ বুঝিবার ত্রুটি হয় সেই জন্য বহু ব্যয় করিয়া প্রচারকার্য চালানো হইতেছে। যে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া এই সব প্রচার কার্য তাহারা অনভিজ্ঞ জনসাধারণ। কি উপায়ে কুটির শিল্প পুনরুদ্ধার করা যাইবে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার সহিত আরো যে বিশেষ বিশেষ কতগুলি সমস্যা জড়িত রহিয়াছে তাহা কেহই স্বীকার করিতেছেন না। ইতিপূর্বে যে সমস্ত কুটির শিল্পের পরিবারগণ বংশ পরম্পরায় কাজ করিত আজ সবই লোপ পাইয়াছেন অথবা যাঁহারা আছেন তাঁহারাও জীবন্মৃত অবস্থায় আছেন। তাহাদের সামাজিক জীবনের খবর আমরা বড় একটা রাখি না। খবর না রাখিবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে, যান্ত্রিক শিল্প-সম্ভার আমাদের আপনজনকে ছেয় করিয়া রেখাইতে শিখিয়াছে। এবং যাহাদের বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করিতে বলিতেছে তাহারাও একটি শ্রেণী—তাহারা নব্য শিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজের গড়া বস্তু। কিন্তু ইংরেজ যাহা দিয়া গিয়াছে তাহাতে গ্রহণ করিয়াছি-ই উপরন্তু এমন কতগুলি পকেট-শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছি যাহারা সমাজে পরগাছার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। ইহাদের ব্যবহারে শিল্প-বিপ্লব ত্বরান্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু জাতির অন্তর যেখানে বাস করে অর্থাৎ গ্রামে হাহাকার শুরু হইয়াছে। সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলই, তাহার উগ্ররূপ এতাবৎ কাল দেখা দেয় নাই। কিন্তু নব্য শিল্প-বিপ্লবের ফলে তাহা দেখা দিয়াছে। ইহা একপ্রকার মানসিক ব্যাধিরূপে দেখা দিয়াছে। যাহারা নগর হইতে পরিকল্পনা করিয়া গ্রামে ছুটিতেছেন তাহারা গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী বক্তৃতা করিতেছেন। সম্ভবত সোজা কথা জটিল করিয়া না বুঝাইতে পারিলে কর্তব্য সম্পাদন হয় না।

এই সোজা প্রশ্নটি সবার মনেই জাগিতেছে যে, কুটির শিল্প কি কুটিরেই প্রস্তুত হইবে না কতগুলি কুটিরবিশিষ্ট কারখানায় প্রস্তুত হইবে। যদি কুটিরে প্রস্তুত করিতে হয় তবে কুটিরবাসীদের শ্রেণিবদ্ধ করিয়া এক জায়গায় বাস করিবার সুযোগ দিতে হইবে। অন্যথায় 'দূর ছাই আর চোর পড়শীর' মত অবস্থা হইবে। যদি কুটিরে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয় তবে তাঁতির কুটির হইতে বস্ত্র সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথায় তাঁতির লাভ হাটের পথে নিঃশেষ হওয়া সম্ভব। কেননা, যে শ্রমের সময় সে হাটে-পথে নষ্ট করিবে সে সময় উৎপন্ন করিবার সুযোগ পাইবে। দ্বিতীয় কথা, বাজার অনির্দিষ্ট অর্থাৎ ক্রেতার পরিসংখ্যান উৎপাদনকারীর জানা নাই। কোন তাঁতি তাহার সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া দেখিল যে, বাজারের সে মালের চাহিদা নাই। যুদ্ধের সময় যে ধ্বংসকারী অর্থনীতির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার তিরোভাব ঘটিয়াছে। ফলে চেনা ক্রেতারা আবার বাজারে আনাগোনা করিতেছে। কিন্তু আজ কুটির শিল্পের কিছু অচেনা ক্রেতার প্রয়োজন। অর্থাৎ বিদেশী ক্রেতার প্রয়োজন। দুইটি কারণে ইহা প্রয়োজন—প্রথমতঃ, সে শ্রম, যে অধ্যবসায় নিয়োগ করিয়া কুটির শিল্পের পণ্য দ্রব্য প্রস্তুতি হইতেছে, তাহা নিতান্ত সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া ভারতে ব্যবহার করিবার সুযোগ সাধারণের নাই। সাধারণের সে অর্থবলও নাই। দ্বিতীয়তঃ এক কাঁচা মালের হিসাব ব্যতিরেকে কুটির

শিল্পের কর্মীদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঘণ্টা, দিন ও মাসের হিসাবের ব্যবস্থা নাই। ফলে কোন উৎপন্ন বস্তুর কত খরচ পড়িল, এবং কত লাভ পাইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে কি কোন চলতি দর বাঁধা নাই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বহু ক্রেতা বিপন্ন বোধ করেন। কোন বস্তুর তিন টাকা দাম বলিলে তাহা আসলে কত দাম বুঝিবার উপায় নাই। ক্রেতা তাঁহার চাহিদার তাগিদ বুঝিয়া দাম বলিলে, ঠকিতেও পারেন বা ন্যায্য মূল্যে পাইতেও পারেন। কিন্তু বিক্রেতার মনের ভাব, যাহা পার আদায় করিয়া লও। অবশ্য এ অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে নাই এমন নহে। কিন্তু সাধারণভাবে ক্রেতা এখনও বিপন্নবোধ করেন। এই ক্রেতাকে বিপন্ন অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে সরকারী তত্ত্বাবধানে এর একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া প্রয়োজন। কুটির শিল্প-জাত দ্রব্য বিদেশী ক্রেতার উদ্দেশে পাঠাইতে হইলে সব বিষয়ের একটা বৈজ্ঞানিক হিসাব হওয়ার প্রয়োজন। এই অবস্থার সুফল চেনা ক্রেতাও পাইবেন।

পূর্বাহ্নে বলিয়াছি যে কুটিরশিল্প কি কুটিরেই প্রস্তুত হইবে না কয়েকটি কুটিরবিশিষ্ট কারখানায়? এখানে 'কারখানা' কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের গ্রামের জনতা সর্বত্রই একস্থানে জড়ো হইয়া নাই। ইহারা অনেক স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। যেখানে জনতা বিক্ষিপ্ত সেইখানেই কয়েকটি কুটিরবিশিষ্ট কারখানার কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যান্ত্রিক কারখানায় শ্রমিক বস্তু উৎপন্ন করিল তাহা বাজারে বিক্রি করিবার এজেন্ট আলাদা রহিয়াছে; সেখানে শ্রেণীবদ্ধ শ্রমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কুটির শিল্পের আছে সেইরূপ উন্নতধরণের ব্যবস্থা নাই। ফলে কুটির শিল্পের কর্মীদের অনেককে ক্রেতা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। ইহা কোন-কোন ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের বিশেষ অসুবিধার কারণ বটে, কিন্তু ভবিষ্যত ক্রেতা-বিক্রেতা যদি পাশাপাশি বাস করিতে পারে—যেমন সহরে ঘটিয়া থাকে—তাহা হইলে কর্মীরা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে পারে। কিন্তু যাহার ক্ষেত্রে সংগঠন করিতে হইলে জনতাকে সরাইয়া নূতন ঢং-এ গ্রাম সাজাইতে হইবে। কম্যুনিটি প্রোজেক্ট নামে চালু যাহা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য অনেকটা এই ধরণের বটে, কিন্তু জনতার অপসারণ, বাসস্থান ও সংস্থান নূতনভাবে সংগঠন করা প্রয়োজন। এখানে হয় নদী অথবা রেল-পথকে চলাচল ব্যবস্থার কেন্দ্র ধরিয়া কাজ করিতে হইবে। নদী অথবা রেল-পথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়িয়া নূতন গ্রাম সংগঠন করিতে হইবে। বর্তমান যুগে চলাচল ব্যবস্থার সংলগ্ন না হইলে আয়ের কোন পন্থা নাই। যে সব গ্রামের চলাচল ব্যবস্থার অসদ্ভাব, সেখানে একটা গ্রাম্য স্কুলও ভাল ভাবে চলেনা কাজেই আয়ের কথাত দূরে পড়িয়া রহিল। কুটির শিল্প এই আয়ের পথ চালু রাখিতে হইলে চলাচল ব্যবস্থার সংলগ্ন হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ইহার অর্থ গ্রামের জনতাকে নূতন বসতি অঞ্চলের প্রতি উৎসাহিত করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সফল করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু দৃঢ়-চেষ্টা হইয়া কাজে হাত দিলে কালে তাহা সফল হইবেই। সরকার যখন জমিদারী নিজ হাতে লইতেছেন, তখন ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গে সঙ্গে জনতার বাস পরিবর্তনও সম্ভব। তাছাড়া গ্রামগুলিকে একটা নদী বা রেল-পথের অঞ্চলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গঠন না করিলে বিশাল ভূখণ্ডে যৌথ চাষের সুবিধা হইবে না। অবশ্য ইহা সবই নূতনভাবে ভাবিয়া লওয়ার কথা। ইহা সত্ত্বেও দেশে সর্বত্র নদী বা রেলপথ নাই। কিন্তু রাস্তা নির্মাণ-কার্য সুষ্ঠুভাবে না হইলে—পণ্যদ্রব্যের বাজার সমস্যা দেখা দিবে। কোথাও পণ্যের দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, কোথাও-বা পণ্যের প্রাচুর্য হেতু ক্রেতা-দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে ইহা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অন্য শিল্পতো দূরের কথা, কুটির শিল্পও নিছক কুটিরে হওয়া সম্ভব নহে—তাহার কারণ

সমাজ-জীবনের রুচির প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে সময়-চেতনা বোধ বাড়িয়াছে, উপরন্তু পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমনকি বিড়ি পর্যন্ত আজ যন্ত্রে তৈরী হইতে শুরু করিয়াছে অর্থাৎ যন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ব ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিতেছে। বৃহৎ যন্ত্রের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে, ক্ষুদ্র যন্ত্রের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে।

এই যন্ত্র সম্পর্কে এড়াইয়া শুধুমাত্র হস্তযন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান যুগের কুটিরশিল্প সম্ভার বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। একদিকে যেমন সময়-চেতনা বোধ বাড়িয়াছে অন্যদিকে প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; ফলে এমন কোন একটি সংস্থার প্রয়োজন যাহা কুটির শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর গবেষণা চালাইয়া যাইবেন। তাছাড়া পুঁজিরও পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেশী প্রয়োজন হইবে। কেননা, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নব নব উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা কুটির শিল্পে পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিবেন তাহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। কিন্তু সবার উপর যাহা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা হইতেছে—বর্তমান যুগে কুটির শিল্প একক বিচ্ছিন্ন গ্রামবাসীদেরদ্বারা সম্ভব নহে। ক্রেতা-বিক্রেতার সঙ্গলাভ হইতে বহু দূরে থাকিলে কুটির শিল্পের শ্রমিকরা বঞ্চিত হইবেই। সমবায় সমিতির মারফৎ বাজারের দর, চাহিদার জ্ঞান বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থায় সমবায় সমিতিকে নূতন করিয়া সংগঠন করা প্রয়োজন। কেননা, অধিকাংশ সমবায় সমিতি এই প্রথায় কার্য করার সুযোগ গ্রহণ করেন না।

[গ] [পূর্বানুবৃত্তি]

দিন দু'য়েক কেটে গেলে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ক্লাশে পড়াবার ফাঁকে নিজেই একদিন উপযাচক হ'য়ে তাঁর সঙ্গে অবকাশ মতো কখনো গিয়ে দেখা ক'রতে ব'লেছিলেন। এবারে আর ছুটির পরে অধ্যাপকদের কমন-রুমে নয়, সরাসরি তাঁর বাড়ীতে। বিষয়টা হচ্ছে সেই লেখা —সম্পাদকীয় গাম্ভীর্যে অণিমা সেদিন যে বিষয়ে অনুরোধ করে এসেছিল তাঁকে। আমি না গিয়ে বরং অণিমাকেই এক্ষেত্রে যাওয়া প্রয়োজন। লেডীজ-পিরিয়ডে লাইব্রেরী-রুমে বই ইস্যু ক'রতে গিয়ে বিষয়টা সম্পর্কে একবার সচেতন ক'রে দিলাম অণিমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আর্তনাদের ভঙ্গীতে হঠাৎ কেঁদে প'ড়লো অণিমা।—'তুমি সঙ্গে না গেলে ভেবেছ, আমি একা গিয়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের ঘরে ব'সে তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা ক'রবো? ওটি হ'চ্ছে না।'

ব'ললাম, 'সব কাজেই আমাকে কেন নিয়ে টানতে চাও? ম্যাগাজিনের ষোল আনা যে তুমিই ক'রছো, এ তো আর কারুর অজানা নেই! আমি তো সাক্ষী-গোপাল মাত্র। আসলে অর্ডার ক'রেছ তুমি, তোমারই গিয়ে হাতে ক'রে কপিটা নিয়ে আসা উচিৎ।'

কথা কেটে অণিমা ব'ললো, অর্ডার ক'রেছি ব'লেই আমাকে যেতে হবে, কেন, তুমিও তো সমর্থন ক'রেছিলে, তুমিই বা বাদ যেতে চাও কোন্ হিসেবে?'

বিষয়টাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে চেয়েই ব'ললাম, 'এর মধ্যে তো হিসেব নিকেশের পালা কিছু আসেনি! আসলে আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে তোমাকেই যেতে ব'লেছেন; তা ছাড়া বাড়ীটাও তোমাদের পাড়ার প্রায় কাছাকাছি, তোমারই যাওয়া সুবিধে।'

এত কথাতেও তবু কিন্তু রাজি করানো গেল না অণিমাকে। এতক্ষণে সে আসল কথায় এলো।—'কোনো অধ্যাপকের বাড়ী যাওয়া আমি পছন্দ করিনা সুমন্ত। আজকাল সংবাদপত্রে পর্যন্ত মাঝে মাঝে অধ্যাপকদের প্রণয়-লীলার ইতিহাস সাড়ম্বরে প্রকাশ পাচ্ছে। নিরেট ব্রহ্মচারীকেও কামিনী-আসক্ত ক'রে প্রেম-পত্র পরিবেশনে বড়-একটা দ্বিধা দেখা যায় না। এসব জেনেও কি আমাকে কোথাও একা ঠেলতে চাও?'

ব'ললাম, 'সংবাদপত্রের কথা তুলোনা যাক্। প্রৌঢ় অধ্যাপক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এ তোমার মনগড়া ভীতি। লোকে শুনলে তোমাকে দোষ দেবে।'

'—সেটা সহজ। যে দোষটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।' হেসে অণিমা ব'ললো, 'কিন্তু মানুষের মন যে সমুদ্রের চাইতেও গভীর, এ কথা ক'জনেই বা তলিয়ে দেখে! অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বিপত্নিক, জানো তো? কোনো মানুষই নিজের সাইকোলজি সম্পর্কে সচেতন নয়, এ্যাট্রেক্টারদের মতোই অনেকটা। তবে-তবে প্রৌঢ়ত্বে আর যুবত্বে খুব বেশী পার্থক্য আছে কি? দুর্বলতা মানুষেরই ধর্ম। অতএব রাজি থাকো তো চলো—একসঙ্গেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ি।'

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দেখলাম একেবারেই পরিষ্কার অণিমা। তাঁর বিপত্নিক হবার ঘটনাটা আমার জানা ছিলনা। হালে অনুরূপ কোনো ঘটন

ঘটলে ছাত্রমহলে যে বেশ-কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হ'তো, তাতে সন্দেহ নেই। শুনলাম, এ কলেজে এসে আমরা ভর্তি হবার আগেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। মৃতা স্ত্রীর প্রতি নিতে এ পর্যন্ত তাঁর ঘরে আর দ্বিতীয় নারীর আবির্ভাব ঘটেনি। তাই বলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে তিনি যে একেবারেই উদাসীন, তা নয়। কোনো শিক্ষিতা তরুণী পেলে তিনি বরং চুল আর গোঁফের পাকা অংশে কলপ লাগিয়ে প্রৌঢ়ত্বের উপর অনেকখানি যৌবনোচিত রং টেনে নিতে পারেন। খবরটা অণিমাই উদ্ধার ক'রেছে, উদ্ধার করা সম্ভব হ'য়েছে পাড়ার কাছাকাছি বাড়ী হওয়াতেই। সাইকোলজির অনারধর অধ্যাপকের এ যে কি অদ্ভুত খেয়াল, এ সাইকোলজিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। ভরসা দিয়ে অণিমাকে বললাম, 'তোমার কথাই রইল। অধ্যাপকের সদর দোরে আমি বরং তোমার গার্ডের কাজই ক'রবো।'

শেষ পর্যন্ত তা-ই ক'রলাম। সেদিন অধ্যাপকদের কমন-রুমে আমি হ'য়েছিলাম অণিমার অনুগামী, এবারে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের গৃহে অণিমাই আমার অনুগমন ক'রলো।

গিয়ে দুয়োরের কড়া ধরে নাড়াতেই দরজা খুলে গেল। সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে একটা তক্তপোষের উপরে নিয়ে বসালেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। ব'ললেন, 'এসে তোমরা ভালই ক'রেছ। লেখাটা প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছে, শুধু উপক্রমনিকাটুকু বাকী। অন্যান্য লেখা প্রিপারেশন হ'তে এখনও তো কিছু দেরী আছে, এর মধ্যে আমার হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

কেমন একটা বাহ্যিক ব্যাকুলতার সুর তুলে অণিমা ব'ললো, 'তাই বলে ফেলে রাখবেন না যেন! প্রেসে দিলে বরং প্রুফ দেখবার সময় ঠিক মতো মিলিয়ে দিতে পারবেন।'

শুষ্ক-তারাক্রান্ত মুখের কোথায় যেন একটুকরো হাসির আভা দেখা দিয়ে নিমেষের মধ্যেই আবার মিলিয়ে গেল। ভাবগদগদকণ্ঠে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ললেন, 'কাগুজ-কলমকে আশ্রয় ক'রে রচনার প্রকাশ ঘটলেও আসলে তার প্রধান ক্ষেত্র হ'চ্ছে মস্তিষ্ক। মাথাতেই যদি মিল না থাকে, তবে কি আর প্রুফে গিয়েই মিল টানা যায়? লিখতে গিয়ে শেষ অবধি গোটা একটা থিসিসে দাঁড়িয়ে গেল। সাইকোলজির কোনো চ্যাপ্টারই বাদ দিই নি। তা থাক্। আর বড়জোর দিন দু'য়েক, তার বেশী একটি বেলাও আর সময় নেবোনা।'

পাছে এই অবকাশে তিনি রচনার খানিকটা শুনিয়ে দিয়ে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে বসেন উদ্যোগী হ'য়ে তাই নিজেই এবারে গলা তুললাম।—'তাতে কি, দু'দিনে আর এমন-কি রামায়ণ অশুদ্ধ হ'চ্ছে! অবকাশ মতো তখন ব'সে বরং সবটা শুনেই প্রেসে পাঠিয়ে দেবো।'

—'তা-ই দিও।' কেমন একটা নিরুৎসাহ-কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ ক'রলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম এতক্ষণে। কিন্তু অধ্যাপক সিদ্ধান্তের যে তাতে চিত্ত ভ'রলো না, সেটুকু বুঝতে পারলুম বৈ কি! বুঝতে অবশ্য অণিমাকেও বেগ পেতে হয়নি। আমার কথায় মুখের উদ্যত হাসিকে সে অনেক কষ্টে চেপে গেছে। না চেপে গিয়ে উপায় ছিল না, প্রকাশ পেলে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কাছে লজ্জায় আর মুখ তুলে কথা বলা যেতো না। আসলে আলোচনার মার-প্যাঁচ থেকে অণিমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে নিজেই খানিকটা গর্ববোধ ক'রলাম। অণিমা সেজন্য আমাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল কিনা বলতে পারি না।

স্বল্পকাল থেমে পুনরায় গলা তুললেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত: 'চা খাও, চা আনাই তোমাদের জন্যে।'

আপত্তি ক'রলাম না। চা-তেষ্টা সত্যিই পেয়েছিল আমাদের উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই এবারে তিনি হাঁক দিলেন: ''ওরে সিষ্টু, বিষ্টু আছিস, ভালো ক'রে দু'পেয়ালা চা বানিয়ে আন না বাবা!'

বিষ্টু অর্থে বিষ্টুচরণ। স্বর্গধামে যারা মহেশ্বরের বাহন যেমন ষণ্ড, ধরাধামে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের একমাত্র বাহন তেমনি বিষ্টুচরণ। এটিও যে কম কুষ্মাণ্ড নয়, তা তার তৈরী চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই বুঝতে পারলুম। যেমন ভেতো, তেমনি চিনির আধিক্য।

জিজ্ঞেস্ ক'রলাম, 'বিষ্টুকে আপনি কত ক'রে মাইনে দেন, স্যার?'

—'সে কথা আর বলো কেন?' বসা অবস্থাতেই এবারে চেয়ারের উপরে পা দু'খানি গুটিয়ে নিয়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বল্লেন, 'চা যে ভালো করে নি, ত' বুঝতেই পেরেছি। ভালো ওর কিছুই হয় না, ভাত রাঁধা থেকে সুরু ক'রে চা তৈরী পর্যন্ত সব কিছু বিস্বাদ; অথচ এরই মজুরী মাসকাবারে পুরোপুরি বিশ টাকা। কিন্তু এ তো শুধু টাকার অঙ্ক, এ ছাড়াও খাওয়া-পরা আছে।'

বল্লাম, 'তা হ'লে আপনার মাইনের বেশীর ভাগটাই ওর পিছনে ঢালেন?'

—'না ঢেলে করি কি! বিষ্টু না হ'লেও যে আমি অচল।' কণ্ঠে এবারে খানিকটা ব্যথতার সুর টানলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত।

বল্লাম, 'বিষ্টু ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কোনো লোক নেই? সারা দেশটাই যেখানে চাকর, চাকরের অভাব কি সেখানে এ সহরে? আপনি ওকে বরং এবারে বিদায় দিন্ স্যার।'

—'ওইখানেই তো হ'য়েছে যত মুস্কিল।' থেমে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বল্লেন, 'ওকে বিদায় দেবার মালিক কি আমি, আমাকেই বরং ও বিদায় দিতে পারে। আসলে ব্যাপারটা কি জানো, তোমরা আমার প্রিয় ছাত্র, তোমাদের কাছে বলতে তো বাধা নেই, বিষ্টু এঘরে অনেক কাল থেকে র'য়েছে। আমার স্ত্রী তখন জীবিত। মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে জল দিয়েছিল এই বিষ্টু। কোনো-দিন ছেলেপিলের মুখ দেখিনি আমি, স্ত্রীর মৃত্যুকাল থেকে বিষ্টুর উপর তাই কেমন একটা পুত্রাধিক স্নেহ জন্মে গেল। আজও সেই স্নেহের নিগড়ে আঁটকে পড়ে আছি আমি। দোষ-ত্রুটির কথা যদি বলো তো বিষ্টু তার কোনোটা থেকেই মুক্ত নয়, তবু ওর উপর আমার ঐ কেমন একটা আসক্তি। একে আসক্তি না বলে দুর্বলতাও বলতে পারো। আমার ঘরের সব কিছু ওর নখ-দর্পণে ও-ই তো আগ্‌লে রাখে সব কিছু! নতুন লোককে দিয়ে কি আর এত সব হ'তে পারে? তা ছাড়া বিশ্বাসই বা করি কাকে! কোনোটা চোর, কোনোটা বাটপাড়। এই হ'য়েছে আজ দেশের হাল।'

ক্লাশে যেমন ক'রে বক্তৃতা দান, ঠিক্ তেমনি একটা লম্বা বক্তৃতার মতো বক্তব্য শেষ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। পাশে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—চায়ের কাপ শেষ ক'রে অলিমা উঠে গিয়ে কখন্ সামনের রকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এই উঠে যাবার অর্থটা বুঝে নিতে আমার বেগ পেতে হ'লো না। আসলে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের সাংসারিক আলোচনা-ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সে সরিয়ে রাখতে চায়। সরিয়েই রাখলো।

কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে পরে সহানুভূতির কণ্ঠে আমি বল্লাম, 'কাউকে আনিয়েও তো নিতে পারেন আপনাকে দেখাশোনা ক'রবার জন্যে। নইলে এই বয়সে আপনার যে কষ্টের একশেষ হ'চ্ছে।'

—'আর কষ্ট, কষ্টের জন্যেই যে জীবন।' বল্‌তে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল অধ্যাপক সিদ্ধান্তের। কিন্তু থাম্‌লেন না তিনি, বল্‌লেন, 'তা ছাড়া কেই বা এসে আমার ভার নিয়ে দাঁড়াবে বলো? ত্রিসংসারে এমন কেউ আত্মীয় নেই আমার।'

অলিমার ইতিপূর্বের বক্তব্যটাকে মিল ক'রে দেখ্‌তে চেষ্টা ক'রলাম একবার অধ্যাপকের ভাষণের সঙ্গে। এর চাইতে পরিষ্কার ক'রে আর-কিছু বল্‌বার থাকেনা মানুষের। বিশেষ ক'রে আমরা যেখানে নিতান্তই ছাত্র-ছাত্রী, সেখানে বক্তব্যের রেখায় রেখায় আর কতদূর অগ্রসর হ'তে পারেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত? তাঁর মনোগত

ইচ্ছা সম্পর্কে অন্ততঃ অনিমা যা ব'লেছে, তা যে একেবারেই অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেবো—এমন যুক্তিই বা কোথায়? বরং কেউ এসে স্বেচ্ছায় তাঁর জীবনের ভার নিয়ে দাঁড়ালেই যেন তিনি আশ্বস্ত হন্—এমনই একটা সুর বিশেষ ক'রে অনুরণিত হ'য়ে উঠেছে অধ্যাপকের কণ্ঠে।

ধরা না পড়ি, এইভাবে কিছুটা ঘুরিয়ে বল্লাম, 'আত্মীয় না থাকলেও কি আত্মীয় কেউ হ'তে পারেনা সংসারে?'

এ সময়ে অনিমা পাশে উপস্থিত থাকলে কথা শুনে-যে আমাকে মনে মনে শাপান্ত করতো, এ কথা নিশ্চিত; কিন্তু কণ্ঠস্বরের এমন এক পর্দায় কথাটা নেমে এ'লাম যে, অনিমার কান পর্যন্তও বোধ করি তা গিয়ে পৌঁছালো না।

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বল্লেন, 'তুমি দর্শনের ছাত্র, দার্শনিকের মতই উক্তি ক'রেছ। দর্শনের সাধক তো আমি নিজেও। কিন্তু দর্শন আর বিজ্ঞান যে এক বস্তু নয়, তা তো জানো? পৃথিবীর কঠিন পথ হ'লো সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। বস্তুবাদ না হ'লে বিজ্ঞান অচল। সেই বস্তুবাদের সঙ্গে আমাদের ভাববাদের মিল কোথায়, বলো? আসলে আত্মীয় পাবার মতো কঠিন বস্তু বোধ করি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

সুকুমার—আত্মীয় পাবার প্রয়াস তিনি কখন করেন নি। কিন্তু বস্তুবাদের পাথর বসানো সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় সবাই বোধ করি অনিমার মতো; অনিমার মতটাই বোধ করি সকলের হত। এখানে ব্যর্থতার কাঙালপনা ভিন্ন অধ্যাপক সিদ্ধান্তের আর কিইবা ক'রবার আছে? অথচ কথার সুরে জোর ক'রে যে কিছু-একটা প্রয়োগ ক'রবো—সে সাহসই বা কোথায়? কলেজ-কম্পাউণ্ডের বাইরে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের ঘরে বসে যে-এমন ঘরোয়া ভাবে কথাবার্তা বলতে পারছি—এইটুকুই যথেষ্ট। অল্পকাল নীরবে কাটিয়ে পরে একসময় বল্লাম, 'কথাটা মিথ্যা বলেননি স্যার। কিন্তু তবু আত্মীয় সৃষ্টির চেষ্টা ক'রে যেতে হবে বৈ কি! এ বয়সে আপনাকে কিছুতেই সামান্য একজন চাকরের উপর নির্ভর ক'রে চলা উচিৎ নয়।'

ভাববিহ্বল কণ্ঠে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বল্লেন 'ঔচিত্যের-সাগর দিয়ে কোনো সোয়ারী কি কখনও নৌকো নিয়ে যায়? সেখানে শুধু জল বুদ্বুদ দেখেই দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চল্‌তে হয়। এই ভাবেই চলেছে আপাতত। বাকী জীবনটাও এই ভাবেই কাটবে। তা নিয়ে আজ আর বিশেষ ভাবি না। বিষ্টুই আমার পক্ষে আপাতত যথেষ্ট। ও ছোকরাও আমাকে ছেড়ে কোথাও নড়তে চায় না।'

এবারে আর কেন যেন কথা কাটতে পারলুম না। বরং সহানুভূতির কণ্ঠেই ব'ল্লাম, 'সংসারে ও-ও বোধ করি একা, তাই কিছু-একটা ব'নেদী আশ্রয়ের এই ঐকান্তিক আসক্তি?

—কথাটা মিথ্যে বলোনি সুনন্দ।' গুরুভারাক্রান্ত মুখে খানিকটা যুক্তির আভাস ফুটে উঠলো অধ্যাপক সিদ্ধান্তের।—'বিষ্টুর তখন বোধ করি বছর সাতের বয়স হবে, আধ-ময়লা একটা হাফপ্যাণ্ট গায়ে একদিন কাতর মুখে এসে দাঁড়ালো আমার এই বাড়ী-বাড়ীর সামনে। আমি তখন সবে কলেজে রুজু হ'চ্ছি। বল্লো, বাড়ীতে আপনাদের লোকের দরকার আছে? গরীব মানুষ, সংসারে আমার কেউ নেই, বলেন তো থাকি।—দোরগোড়ায় আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বল্লাম, বলবার মানুষ উনি, ওঁর সঙ্গে কথা বলো। কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি—বিষ্টু শুধু কাজেই বহাল হয়নি, আমার সংসারের অনেক কিছু ভারকেই এক বেলার মধ্যে কাঁধে নিয়ে সে এরই মধ্যে এ বাড়ীতে পুরনো হ'য়ে উঠেছে।' ব'লে মুহূর্তের জন্য একবার থামলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত, তারপর বোধ করি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিয়ে বল্লেন, 'বিষ্টুকে সেদিন যিনি কাজ দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের হাতের সাজানো সংসার আজ প'ড়ে আছে, কিন্তু তিনি নেই। বিষ্টুকে তিনি স্নেহ

করতেন, কেন ক'রতেন জানিনা, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে বিষ্টুকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ কি তাঁর সেই স্নেহেরই অমর্যাদা ক'রতে পারি আমি?'

এর পরেও কি বিষ্টুকে নিয়ে আর আলোচনা করা চলে? বিষ্টুকে ছেড়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কথাটাই একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম। প্রতিদিন এমন কত মানুষকেই তো আমরা দেখি—যারা কর্সা ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বৃহত্তর দেশ ও সমাজের আলোচনায় নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-শোক-হাহাকারকে উত্তপ্ত বুকের মধ্যে নির্বিবাদে চেপে রাখতে চেষ্টা করে। চেপে না রেখে উপায় নেই, নইলে পৃথিবী তাদের পাগল ব'লবে। আসলে চাপাচাপির ব্যাপারটাই হ'চ্ছে সভ্যতা। অধ্যাপক সিদ্ধান্তও এই ভাবেই এতকাল তাঁর কলেজিয়ানা অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নিজের আসল ব্যক্তিটিকে আমাদের কাছে চাপা দিয়ে রেখে-ছিলেন। আজ তাঁর সেই এতকালের ঢাকা খুলে গেল। কিন্তু খুলে গেল বড় মর্মান্তিক ভাবে। এসেছিলাম তাঁর রচনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে যেতে, এসে পেলাম নতুন পাণ্ডু-লিপি—যার অক্ষরে অক্ষরে রয়েছে তাঁর ব্যর্থ জীবনের প্রচ্ছন্ন রচনা। পৃথিবীর যত সাইকোলজি তা—যে এই রচনাতেই গ্রন্থিবদ্ধ। অণিমার উপর মুহূর্তের জন্য একবার ক্রোধও হ'লো বড় কম নয়। সে শুধু এত-কাল একতরফাই বিচার ক'রেছে অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে, তাঁর সবখানি দিয়ে তাঁকে দেখতে পায় নি। অথচ লজিকের 'ফ্যালাসি' নিয়ে তাকে ডিবেট-ক্লাশে তর্ক ক'রতে দেখেছি অজস্র।

ঠিক এই মুহূর্তে দামনের রুক ছেড়ে অণিমা এসে আবার তার পূর্বস্থানে ব'সলো। প্রয়োজনের বাইরে যেন সে একটি কথাও ব'লতে প্রস্তুত নয়। ব'ললো, 'সামনের র'ব্বার নাগাদ সুমন্ত এলে ওর হাতেই তবে কপিটা দিয়ে দেবেন স্যার। বাড়ীতে দু'দিন ধ'রে মার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

স্নেহের কণ্ঠে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ললেন, 'বেশ আলো এলে যা হোক্; তুমি তো ব'সলেই না এসে।'

অণিমার হ'য়ে এবারে আমিই মুখ খুললাম।—
—'ব'সবার অবকাশটাও যে আপনারাই বন্ধ করেছেন স্যার। সামনে টেষ্ট, তারপরেই ফাইনাল।'

—'তাও বটে।' বাধ্য হ'য়েই এবারে ছেদ টানতে হ'লো অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে।

ভরসা পেয়ে ব'ললাম, 'এখন উঠি স্যার, আবার কোনো সময় আসবো।'

—'তাই এসো। ব'লে সামনের রুক পর্যন্ত উঠে এসে আমাদের বিদায় দিলেন তিনি।

পথে এসে অণিমাকে ব'ললাম, 'মানুষ সম্পর্কে তুমি কি সাধারণ ভদ্রতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছ?'

প্রশ্ন না বুঝে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একবার চোখ দু'টোকে তুলে ধ'রলো অণিমা আমার মুখের দিকে।

ব'ললাম, 'সভ্যতার ইতিহাসে একে অভদ্রতা ভিন্ন কি বলে? অধ্যাপকের বাড়ীতে এসে চা খেতে পারলে, অথচ ধীরভাবে ব'সে তাঁর দু'টো কথা শুনতে পারলে না! একে বলে কি?'

—'কি আবার বলে! তুমি তো শুনেছ, তা হ'লেই হ'লো।' ব'লে বেণীবদ্ধ গ্রীবাখানিকে ঈষৎ দোলালো অণিমা।

ব'ললাম, 'এই দাবী নিয়ে কি চিরকাল সব ক্ষেত্রেই চ'লতে পারবে?'

এবারে সেই বেণীবদ্ধ গ্রীবাখানিতে কেমন একটা ঢেউ তুলে অণিমা ব'ললো, 'বড্ড বাজে ব'কতে পারো তুমি সুমন্ত। হাঁটছো হাঁটো না?'

—'হাঁটতেই তো চ'লেছি, কিন্তু কি অসভ্যতা মিথ্যে কথা ব'লতে পারে মেয়েরা, শুধু সেই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য হ'চ্ছি।'

—'যথা?'

—'যথা তুমি।' ব'ললাম, 'সুস্থা গর্ভধারিণীকে অধ্যাপকের কাছে এমন রোগাক্রান্তা না ক'রলেই কি

চ'লতো না? আসলে বিদায় নেবার অজুহাতে মার সম্বন্ধে খানিকটা মিথ্যে কথাই তো ব'লে এলে! কি দরকার ছিল এমন মিথ্যের আশ্রয় নেবার?'

পথের মধ্যে সহসা এবারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো অনিমা। ব'ল্‌লো, 'বেশ ক'রেছি, আমার খুশী, আমি মিথ্যে ব'লেছি, তাতে তোমার কি?'

ব'ল্‌লাম, 'নাই বা কি। মিথ্যাচারিণীর প্রণয় আলেয়ার মতো-না একদিন আঘাত ক'রে বসে! তাই তো এত সতর্কতা।'

অনিমা দেখ্‌লাম ঠাট্টা ছেড়ে এবারে কণ্ঠস্বরকে খানিকটা চড়া ক'রেছে। ব'ল্‌লো, 'মেয়েরা ছেলে নয় যে, সাত ঘাটে ডুবে ডুবে জল খায়। তারা এক ঘাটেই ডোবে।'

মুখ টিপে হেসে ব'ল্‌লাম, 'সত্যি নাকি?'

কিন্তু দ্বিতীয়বার আর কথা তুল্‌লো না অনিমা। নীরবে পথ চ'ল্‌তে লাগ্‌লো।

জিজ্ঞেস্ ক'রলাম, 'তুমি কি আড়ি পাত্‌লে আমার সঙ্গে?'

গাম্ভীর্যের সুরে অনিমা ব'ললো, 'তুমি আমার কে যে আড়ি পাত্‌বো তোমার সঙ্গে!'

কিন্তু এ কথার আর জবাব দিতে হ'লো না। কথাটা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অনিমার কপট গাম্ভীর্য টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে গিয়ে একটা উদ্দাম হাসিতে রূপ পেলো। সে হাসিতে যোগ দিতে আমার বিলম্ব হ'লো না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনসমাবেশের আড়ালে প্রশস্ত পথের লঘু যাত্রার দু'জনের কাছে আমরা আবার দু'জনে সহজ হ'য়ে ধরা দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে পথের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি আমরা, অর্থাৎ আর দু'পা বাড়ালেই অনিমাদের বাড়ী। বাড়ী মানে পায়রার বাসোপযোগী সেই আবাস। স্বভাবতঃই বুঝতে পারি—জীবনে কখনও অনিমার গান শিখ্‌বার সুযোগ হয়নি কেন! জীবন যেখানে অক্টোপাশের মতো বন্দী—গান যে সেখানে পলাতক। সহজ কণ্ঠেই অনিমাকে বিদায় দিয়ে বল্‌লাম, 'যাও, এবারে গিয়ে সিলেকশান নিয়ে যেতে ওঠো; তোমার কাছে আজকের মতো আমার এই খানেই ছুটি।'

আপত্তি জানালোনা অনিমা, বললো, 'এস।' তারপর আমার মুখের দিকে স্বল্পক্ষণের জন্য একবার নীরবে তাকিয়ে সোজা বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।...

[ঘ]

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার অহেতুক ভীতিটা এবারে কাটলো, ব'লতে হ'বে। কিন্তু সংসারে সমস্ত পুরুষ সম্পর্কেই কি তার ভয় কেটেছে? ভয় না ব'লে ব'লতে হয় বিতৃষ্ণা। ইদানিং অন্যের সম্পর্কে কতকটা বিতৃষ্ণাই লক্ষ্য ক'রছিলাম অনিমার মধ্যে। এটা যে পৃথিবী সম্পর্কে সুস্থ রুচিবোধের পরিচায়ক নয়, একথা বুঝোয় কে তাকে? ব'লতে গেলেই রণচণ্ডীর মতো তর্কে অবতীর্ণ হয় অনিমা। এ সময়টা নিজেকে বড় বিপন্ন বোধ করি। সেই বিপন্নতার সুযোগ নিয়েই নিজের ঘিরোরীকে কায়েম করে বসে সে। এম্‌নি একটা ঘিরোরীর সূত্রই ঘটে গেল একদিন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আগে আগে কলেজে আমি কখনও কোনো ক্লাশ ফাঁকি দিলে সহপাঠি মনোতোষ স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে প্রক্সি দিয়ে এ্যাটেণ্ডেন্সের স্বর ঠিক রাখতো; ইদানিং মনোতোষের নিজের সুরই পাল্টে গেছে। অনিমার প্রতি তারও যে কিছু প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা ছিল, এটা গোড়ার দিকে বোঝা যায়নি; ক্রমে ধরা প'ড়লো। ব'ললো অবশ্য অনিমাই। সহাধ্যায়ী হিসেবে ক্লাশে মুখ-চেনাচেনি ছিল আগে থেকেই, ইদানীং একদিন ম্যাগাজিনের সূত্রেই অনিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজলো সে। সুযোগটা নিল অবশ্য তার নিজের একটি রচনা সম্পর্কেই। রচনার প্রতি স্বভাবতঃই কিছু আকর্ষণ ছিল মনোতোষের। গল্পের চেয়ে ভালো কবিতা খুঁজতো তার হাতে। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আমার লেখাটা যাচ্ছে তো ম্যাগাজিনে?'

সম্পাদকীয় গাম্ভীর্যে অণিমা বললো, 'এখনও কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

কথাটা স্বার্থবোধক। কিন্তু তাই ব'লে নিরাশ হবার পাত্র নয় মনোতোষ। ব'ললো, 'লেখাটা প'ড়েছেন তো নিশ্চয়ই, কেমন লাগলো?'

—'মন্দ কি!' ব'লে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল অণিমা, কিন্তু সহজেই ছেড়ে দিলনা তাকে মনোতোষ। ব'ললো, 'মন্দই যদি না লাগবে, তবে বলতে পারছেন না কেন মুখ ফুটে? তাছাড়া আর একটা কথা, যদি বিষয়টাকে নিজের মধ্যে রাখেন, তবে নিঃসংকোচে ব'লতে পারি।'

—'বলুন।' অলক্ষ্যে বুকের ভিতরটা তখন ঢিব ঢিব ক'রছিল অণিমার।

এতটুকুও দ্বিধা করলোনা মনোতোষ। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করতে করতে ব'ললো, 'পরশু রাত্রে হঠাৎ যেন কেন ঘুম এলোনা। আকাশে হাল্কা মেঘে আর জ্যোৎস্নায় কেমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠ্‌লো। খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা কবিতা এলো মনে।—'

বাধা দিয়ে অণিমা ব'ললো, 'সেই কবিতাটাই শোনাতে চান তো, কিন্তু কবিতা শুনবার মতো আমার একেবারেই মুড নেই এখন। প্লিজ!'

কিন্তু অণিমার না থাকলেও মনোতোষের যথেষ্ট মুড ছিল। ব'ল্‌লো, 'কবিতাটির পিছনে কিছু তাৎপর্য আছে বলেই আপনাকে জোর ক'রছি, নইলে এভাবে মিছেমিছি আপনার সময় নষ্ট ক'রতুম না। আপনাকে প্রেজেন্ট্ করবো ব'লেই কবিতার পংক্তিতে আপনার নাম জড়িয়ে র'য়েছে। অফেন্স নেবেন না, ক্লাসের সম্পর্কের দিক থেকে আপনাকে কবিতা উপহার দেবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।'

অণিমার সারা গায়ের মধ্য দিয়ে তখন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। রীতিমত একটা রোমান্টিক এ্যাটমস্ফিয়ার। উপায় নেই মনোতোষকে উপেক্ষা করে কোনো দিকে পা বাড়াবার। সংশয়ের কণ্ঠেই ব'ল্‌লো, 'ক্লাসে এত মেয়ে থাকতে হঠাৎ আমাকে নিয়েই বা আপনার এমন কবিতা রচনার প্রয়াস কেন?'

এবারেও উত্তর দিতে গিয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা ক'রলোনা মনোতোষ। ব'ল্‌লো, 'তা জানিনা, তবে আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে, মিস্ মিত্র।'

সঙ্কোচ কেটে গিয়ে এবারে একটা উদ্‌গত হাসিতে সারা দেহ কম্পার দিয়ে উঠলো অণিমার। নিজেকে যথা-সম্ভব চেপে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'সত্যি? কিন্তু ভালো-লাগবার মতো আমার মধ্যে এমন কি দেখলেন? না আছে রূপ, না আছে গুণ, নিতান্তই একটি সাধারণ মেয়ে।'

মনোতোষের মধ্যে এবারে ভাব এসে গিয়েছিল, ভাববিহ্বল কণ্ঠেই সে ব'ললো, 'আপনি আর যাই হোন, নিজের বিচারক ন'ন। কোনোদিন নিজেকে খোদ করি ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখেননি, তাই এমন ক'রে ব'ল্‌ছেন।'

—'হয়ত হবে।' ব'লে একটা উদ্‌গত হাসিকে গোপন করে নিতে চেষ্টা ক'রলো অণিমা।

কিন্তু তাতেও উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র অবদমিত হ'লোনা মনোতোষের। শেষ পর্যন্ত হয়ত আরও কিছুটা অগ্রসর হ'তো সে, কথার সুললিত ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তেই যাচ্ছিল মনোতোষ, কিন্তু অণিমার নিষ্ঠুর হৃদয় তার সমস্ত উচ্ছ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত ক'রলো। বললো, 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। এবারে অবকাশ মতো কখনও নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবো—সত্যিই ভালো লাগবার মতো কোনো আকর্ষণ আছে কিনা সেখানে! কবিতাটা আপাতত আপনি নাইবা পড়লেন! ওটা যখন আমাকে নিয়ে লিখেছেন, আমাকেই দিন, নিভৃতে ব'সে ব'সে উপভোগ ক'রে মনে মনে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।'

নিঃসঙ্কোচেই অণিমার হাতে কাগজের টুকরোটি তুলে

দিয়ে মনোতোষ ব'ললো, 'কৃতজ্ঞতা আমি চাইনা। আপনি বরং পড়ে ওটা ছিঁড়েই ফেলবেন।'

এবারে চেষ্টা ক'রে ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি ফোটাতে পারলো অণিমা। কিন্তু সে-হাসিতে কিসের ইঙ্গিত ছিল, সেটুকু বোধ করি ভালো ক'রে দেখবার অবকাশ হয়নি মনোতোষের। তবে অণিমা বিদায় নেবার কালে মনোতোষ হয়ত একথাটা স্পষ্টই বুঝে নিল যে, মস্ত একটা ভুল ক'রেছে সে, ভালোবাসার ক্ষেত্র অন্তত: এটা নয়। আর এই সামান্য ঘটনাটুকুর মধ্যেই তার সমস্ত গ্লানি চুকে যেতে পারতো—যদিনা আমার সঙ্গে অণিমার যোগাযোগটা ক্রমেই এত স্পষ্ট হয়ে উঠতো। আক্রোশটা তার শেষ পর্যন্ত অণিমাকে কেন্দ্র ক'রে আমার উপরেই ভারী হ'য়ে উঠলো। ওটাই স্বাভাবিক, এ যেকোনো মানুষেরই হয়, মনোতোষের বেলা তার ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই।

চা খেতে খেতে একদিন মনোতোষের সেই প্রণয়োচ্ছ্বাস নিয়ে হাসির আসর জমিয়ে তুললো অণিমা আমার অধ্যয়ন-কক্ষে। ব'ললো, 'আরেবাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ওস্মান আর জগৎ সিংহের মধ্যে একটা লড়াই না বাধে, তাই ভাবছি।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ব'ললাম, জমিয়ে নিয়েছ, বলো?'

হাসতে হাসতেই অণিমা ব'ললো, 'এমন ক'রে যে জমে ছিল, তাও কি আগে জানতুম!' তারপর মুখে স্বল্প গাম্ভীর্য টেনে ব'ললো, 'ছেলেরা যে এতখানি ছ্যাবলা আর বেহায়া, তোমাকে দেখে কিন্তু তা বিশ্বাস করতে পারিনি। আচ্ছা, তুমিই বলো তো, মনোতোষটা কী?'

চায়ের কাপ নিঃশেষ ক'রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, 'কেন, মানুষ।'

অণিমার কণ্ঠে এবারে কিছুটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেলো।—'একে তুমি ব'লছো মানুষ?'

—'মানুষ না তো কি?' ব'ললাম, 'অলজ্যান্ত লোকটি ক্লাশে আমাদের পাশাপাশি বেঞ্চে ব'সে অধ্যাপকের নোট নেয়, তবু তুমি তাকে ব'লবে মানুষ নয়? আস্পর্ধা তো তোমার কম নয় দেখ্‌ছি।'

মনোতোষের দেওয়া কবিতাটা ছিঁড়ে ফেলা দূরের কথা, বরং সেটা সঙ্গে নিয়েই এসেছিল অণিমা। এবারে আমার হাতের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ললো, 'আস্পর্ধা নয় তো কি! তোমাদের সভ্য সমাজে একে কি বলে, বলো?'

উত্তর না দিয়ে আলগোছে শুধু কাগজের টুকরোটাকে তুলে নিয়ে একবার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম অক্ষরগুলোর দিকে:

আকাশের কালো মেঘ তোমার বেণীর বন্ধে
হয় না কি হারা?
আসে না কি জ্যোৎস্না নেমে তোমার মুখের রঙে
আবিরের রাগে?

অণিমা অনিন্দ্যকান্তি—

অকস্মাৎ বিকট একটা উদ্দাম অট্টহাস্যে কণ্ঠ আমার ফেটে প'ড়লো। বললাম, 'এরপর তোমার বিরহে দেখ্‌ছি মনোতোষ সুইসাইড্ ক'রবে।'

হাসি অণিমারও এসেছিল। সেটুকু চেপে নিয়ে ব'ললো, 'এরা সুইসাইড ক'রতেও জানে না। এরা ভাবে—মেয়েরা দু'টো হেসে কথা ব'ললেই বুঝি ভালোবেসে ফেললো। হাউ ইডিয়েট! ভালো করে সহজ দৃষ্টিতেও এরা তাকাতে পারে না মেয়েদের দিকে, পারে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পলোকে কবিতার নৌকো ভাসিয়ে দিতে।'

বেশ লাগছিল অণিমার কথাগুলো শুনতে। ব'লতে গিয়ে অনেকখানি উত্তেজিত হয়ে উঠছিল সে। ভালো লাগছিল তার এই উত্তেজনার মুহূর্তটাকে। ঠোঁট আর ভ্রূর সে কি অদ্ভুত বিকাশ—ঠিক যেন রাগ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুরের একটা বৈদ্যুতিক সমন্বয়। বললাম 'যাই বলো, আমার কিন্তু রীতিমত এখন হিংসে হ'চ্ছে

মনোতোষকে। আমি যদি ওর মতো কবিতা লিখতে পারতাম—'

হঠাৎ কথা কেড়ে নিয়ে অণিমা ব'ললো, 'রোজ তবে আমার নামে একটা ক'রে কবিতা লিখতে, এই তো? দোহাই তোমার, তুমি গদ্য আছো, সেই ভালো। কবিদের আমি বড় ভয় করি।'

—'ঘৃণা তো আর করো না? নইলে আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসবে কেন? আসলে ওটা তোমার মনের বিকার। হাজার হলেও মানুষ মনোতোষ আর কবি মনোতোষ তো এক নয়।' থেমে কৌতুকের সুরে বললাম, 'তা ছাড়া বিশেষ কাউকে বেশী ভালোবাসো ব'লেই কি নির্বিশেষের প্রতি এমন অবিচার করবে তুমি?'

দেখলাম—এ কথার পর বড় বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করলো না অণিমা। উঠে যেতে যেতে বললো, 'তোমার একথার জবাব আজ মুলতুবী রাখলাম সুমন্ত। জানো তো মেয়েরা সকলই। আজই যদি সব কথার জবাব দেবো, তবে ভাবীকালের সঞ্চয় যে আর কিছুই থাকবে এটুকু অন্ততঃ ভবিতব্যের জন্যে তোলা থাক্।'

আমার অধ্যয়ন-কক্ষের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরের পথে পা বাড়ালো অণিমা। কিন্তু কথার মধ্যে যেটুকু তার ইঙ্গিত থেকে গেল, তা আমি কেন, পৃথিবীর যে কোনো পুরুষই বুঝতে পারবে। বিশেষ কোনো পুরুষের মধ্যে কোনো নারীর প্রেম এসে যখন আবদ্ধ হয়, নির্বিশেষ পুরুষকে তখন আর মানুষ বলেই মনে হয় না তার। প্রেমে তখন সে বিশ্ববিজয়িনী।—কথার ইঙ্গিত রেখে চ'লে গেল বটে অণিমা, কিন্তু তার সবকিছুকে মিলিয়ে আজ যেন আরও বেশী ভাল লাগলো তাকে; কিন্তু সেটুকু মনোতোষের মতো অমন নিঃসঙ্কোচে সত্যিই কি মুখ ফুটে বলতে পারলুম?

[ক্রমশঃ]

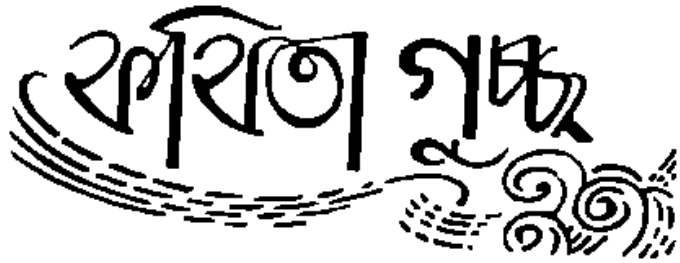

তোমাকে

শ্রীচিত্ত মিত্র

কোথা তুমি রই ?
কোনো রুদ্ধদ্বার কেন
দৃষ্টির আড়ালে

তুমি কি কিছুই নও অথবা কিছুই,
দুঃখেরাত্রির ঘরে রক্তিত শুধুই
প্রাণের বীণার তারে, গানের খেয়ালে ?
কোনো নেই-জানিনের তালে ?

পূর্বমুখ

আনন্দ বাগ্‌চি

শুক্ল-ওষ্ঠ অন্ধকার পৃথিবীর বুকের উপর
সমুদ্যত, নিরুচ্চার এই বন্ধ্যা তারা-খসা রাত
একটি নিশ্চল লৌহ মুষ্ট্যাঘাত যেন, চরাচর
স্তব্ধ চুপ। তবু এক বিবর্ণ বেপথুমান হাত
বর্ষাঘন দুর্ভাবনা মনের শিয়র ছুঁয়ে যায়
গাঢ়স্পর্শ রসায়নে। কোন এক নির্জন হৃদয়
অতীতের ঘর-চাড়া দুঃখ নিয়ে অবাক্ বাতায়
অশ্রুচোখে। রাত্রির সিঁড়ির মুখে দাঁড়ায় সময়।

জীবিকার যুদ্ধ-ক্লান্ত আমি নিত্য উত্তর-তিরিশ
জানুনত মুখে বসে ভাবি ব্যর্থতার ইতিহাস :
শুধু দিন যাপনের দীন গ্লানি। নিকটে শিরীষ
গাছে বাতাসের শিস। রাত্রি ঘরা-ভাবনার দাস।

শয্যার শরিক নও, তবু তুমি শর্বরী সান্যাল
অসেতু-সম্ভবা নাম, আজ রাত্রে হলে গতকাল।

নির্মোহ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনে আজ কবিতার জায়গা অফুরান।
বিরস গদ্যের দিন ঠাসবোনা জাজিম সমান।
নিয়তি নিষ্ঠুর অতি, সংসারও আমার বন্ধু নয়,
কঠিন সত্যের সাথে জন্মেছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

কিন্তু কেন ছবি একটা থেকে থেকে ভেসে ওঠে মনে—
যেন সেটা কোনোকালে ঘটেছিল আমারই জীবনে;
অথচ জানি না কবে এ ছবি কে গিয়েছিল এঁকে,
প্রায় সবই মুছে গেছে বিবর্ণ স্মরণ-পট থেকে;
কত রোদ কত বৃষ্টি, মেঘের বিষণ্ণ সমারোহ—
আকাশ কি রাখে তার কোন চিহ্ন, তার কোন মোহ?

বুঝি এক জ্যোৎস্নারাতে নির্জন পথের প্রান্তে এসে
কে যেন বিদায় নিল স্বপ্ন একটু সকরুণ হেসে,
বাতাসে হেনার গন্ধ, কুয়াশায় তারা দেখা তার,
আমার পায়ের নীচে রাশি রাশি গাঢ় অন্ধকার,
দূরে ফেলে আসা কোন্ শ্বেত সৌধ ঐ দেখা যায়,
গভীর রাত্রির সুরে বীণা বাজে—কোথায় কোথায়!

সচমকে ঝাড়া দিয়ে উঠে বলি—ওরে মন, ছিঃ,
এই রূঢ় বাস্তবের যুগেও কি হলি রোমান্টিক?
দূর কর্ মিথ্যা স্বপ্ন, শোন্, বিংশ শতাব্দীর সাঁঝে
ট্রাম চলে, বাস্ চলে—দূরে কারখানার বাঁশি বাজে।

তরকারীর বাগান

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ

কালি-কালি ক্ষেত আর সরু সরু নালী জলময়
ছবির মতন মনে হয়।

দারুণ গরমে
ওদের শ্যামল দেহে খানিক ধূসর ছবি জমে।
তবুও সবুজ লেখা প্রাণপণে রাখে ওরা টুকে,
দূর করে রাখে দুঃখকে।

মাঝে মাঝে ঝিরি-ঝিরি স্নেহ-ঢালা বৃষ্টির নীর
ভিজোয় সবুজ পাতা শাক-সব্জির;
বল দেয়, আর প্রাণ দেয়;
চুপি চুপি ঢেকে ফেলে গ্রীষ্মের যত অন্যায়।

ওদের স্বপ্ন দিল শীতে আর শরতে শিশির……
হঠাৎ রূপালী রেখা দেহে আর মনে কুমারীর।'''
পাবার নতুন, রোদে করে চিক্‌চিক্;
মনের বাসনা যেন, ফড়িংরা এসে দোলা দিক্।

ওদের নিটোল দেহ, শ্যাম-সম্ভার
নিঃশেষে করেছি উজাড়।
চির-অফুরান
ওরাই আমাকে দেবে প্রাণের জোগান।

মন-রাঙানিয়া

শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

রাঙিয়ে গেলে আমায় তুমি রাঙিয়ে গেলে
আবেগ-ভীরু ভালোবাসার প্রদীপ জেলে।

ভেবেছিলেম অসময়ের বন্ধু আমার
দিনের বেলা মিটিয়ে দিয়ে যা-কিছু তার
সবই এবার চুকিয়ে নেবো, এই গোধূলি
শুদ্ধ হাতে জড়ায় তাই নিলেম তুলি।
এই যে ব্যথা, এই বেদনা, এই পূরবী
রাতের শেষে আবার যদি ছড়ায় আলো
ভেবেছিলেম কখনো আর সে-ভৈরবী
জড়ায়-চুমে নেবেনা ঢেউ! তোমায় ভালো-
বাসার মতো আশার রঙে হৃদয় আমার
স্বপ্ন ছুঁয়ে রঙিন হ'য়ে উঠবে না আর!
ভেবেছিলেম এ-শীত বুঝি কখনো ফের
উদাস মনে নেবেনা গান বসন্তের।

অথচ একী! হঠাৎ আজ সিংহলের
বহ্নি-জ্বালা দীপ্তি নিয়ে তুমি কখন
দাঁড়ালে এসে,—দুচোখে ছায়া সমুদ্রের,—
পিপাসা-গাঢ় অতল গানে হৃদয়-মন
আলিয়ে দিলে, হারানো মনে স্মৃতি-নূপুর
দুলালো ঢেউ, শপথ ছড়ালো সূর্য-সুর।

দিনের শেষে শীতের ম্লান এই বিকেলে
রাঙিয়ে গেলে আমায় তুমি রাঙিয়ে গেলে।

সমুদ্র জাগার রাতে

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

রাতের সমুদ্র যেন সীমাহীন ক্ষণ সমাহিতি,
কান পেতে শোনা যায় তটে-ভাঙা তরঙ্গের স্বর।
নীল অন্ধকার বনে ভেসে-ওঠা আলো-আলা স্মৃতি
মুহূর্তের চেতনায় চকিত প্রহর।

গোণা যায় এইখানে ক্ষয়িষ্ণু জীবনের দোলা;
আপনাকে বিনিঃশেষে কভু যায় ভোলা।

যে-রাতে জড়ায় এই সমুদ্রের স্বপ্ন নিয়ে জাগে,
লক্ষ লক্ষ আলো-ঢেউ জীবনের তটে এসে ভাঙে।
কড়ি-ঝিনুকের আর শামুকের প্রাণ
শংখে শংখে গেয়ে ওঠে গান।
নক্ষত্র নিকটে আসে, শুদ্ধ হয় হাজার কুমীর
সাগরের অমেয় খুশির
বান ডাকে, কানে কানে চাঁদ কথা কয়।
বিরল এমন ক্ষণ, অবিশ্বাস্য এমন সঞ্চয়।

সকালে সমুদ্র-কন্যা থাকেনা মনের ত্রিসীমায়,
তবু রাত ভরে তার অধীর আহ্বান শোনা যায়।
মনে হয়,
অফুরন্ত জীবনের দুরন্ত সঞ্চয়
শেষ বিন্দু ঢেলে দিলে তবুও হৃদয় তৃপ্তি নয়।

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

মানুষের যত রকমের বৃত্তি আছে, তার মধ্যে সুকুমার-বৃত্তির স্থান সকলের উর্ধ্বে। রসের মধ্যে যেমন ভাব-সমাহিত শান্ত রস, বৃত্তির মধ্যে তেমনি সুকুমার-বৃত্তি জাগতিক সুস্থ জীবনসম্ভার পরিপূরক। স্নেহশীলতা, বদান্যতা, আতিথেয়তা, প্রেম, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যা কিছু—তা এই সুকুমার বৃত্তির লক্ষণ। শুধু মনুষ্য জগতেই নয়, পশু পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের জীবনেও এই বৃত্তিটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। যেমন রাগ, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, জিঘাংসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি জীবজগতের নিয়মবিরুদ্ধ রীতির পন্থানুসারী, তেমনি স্নেহশীলতা, বদান্যতা, আতিথেয়তা, প্রেম, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি জীবজগতের নিয়মসিদ্ধ ভাব-রীতির অনুগামী। এক কথায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিগুলিকে 'চণ্ডালবৃত্তি' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি-গুলিকে 'সুকুমারবৃত্তি' নামে আখ্যা দেওয়া যায়। এই উভয় বৃত্তিই জীবজগতের সহজাত বৃত্তি। জন্ম-কাল থেকেই এই উভয় বৃত্তির দ্বারা জীবদেহ সংগঠিত হয়ে ওঠে। আদালতের যত মামলা, তা মূলতঃ রাগী ও ফরিয়াদীর চণ্ডালবৃত্তি-জাত, আর প্রেম, ত্যাগ শ্রদ্ধা প্রভৃতি নৈতিক আদর্শবাদের যা-কিছু বাস্তব রূপায়ণ, তা সুকুমার-বৃত্তি-জাত। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ যদি দুর্বাশা, দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ তবে বশিষ্ট।

মানুষ মূলতঃ এই উভয় বৃত্তিজাত হলেও প্রধানতঃ সে চণ্ডালবৃত্তির আধিক্যের দ্বারা পরিচালিত। এই আধিক্যের কারণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। জীবমাত্রেই আকাঙ্ক্ষার দাস। ধনাকাঙ্ক্ষা, প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, বিষয়া-কাঙ্ক্ষা—এর কোনোটিকে ছাড়িয়েই মানুষকে নির্বিকল্প ভাবে কল্পনা করা যায় না। হরিমোহনের পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, নতুন চক্‌মেলানো বাড়ী দুলছে হরিমোহন; আমার তা ক্ষমতা-বহির্ভূত, অতএব হরিমোহন আমার ঈর্ষার পাত্র! বাণীকান্ত তার পাশের বাড়ীর কোনো অপ্সরী যোড়শীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হ'য়ে তাকে জীবনসঙ্গিনী ক'রে নিয়েছে, আমার ভাগ্যে তা হ'লো না ব'লে বাণীকান্তকে আমি মানসিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিংসা করি। প্রধানতঃ এই জাতীয় মানসিক কষ্টকল্পতা বা inferiority Complex থেকে চণ্ডালবৃত্তি প্রবলতর হ'য়ে ওঠে। কি সংসার ক্ষেত্রে, কি সামাজিক পরিবেশে, কি বৃহত্তর জগতে এই মানসিক কষ্টকল্পতা তার নিজের-নিজের ক্ষেত্রে প্রবল থেকে প্রবলতর হ'য়ে ওঠে, এবং ক্রমে জিঘাংসা-বৃত্তিতে এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এমনি ক'রেই সংসার ভাঙে, সমাজ ভাঙে, পৃথিবী ভাঙে। পৃথিবীর যত কিছু দাঙ্গা, যুদ্ধ, হানাহানি—তা এই চণ্ডালবৃত্তিরই বাস্তবরূপ। এ বৃত্তির যত বেশী চর্চা হয়, তত এর প্রসারতা ঘটে। রাজনীতি আর রাজনীতি-জাত যুদ্ধগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু এই প্রমাণের উপরেই কি পৃথিবীর স্থায়িত্ব নির্ভর ক'রে আছে? যদি থাকতো, তবে দেখা যেতো —পৃথিবী একটি বিরাট বিস্ফোরকের উপর চক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে তার নিজের সৃষ্টিকে প্রতিমুহূর্তে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে দিচ্ছে। পৃথিবীতে একদল চরিত্রভ্রষ্ট, গুণ্ডা ও দুর্নীতিপরায়ণ দুর্মুখ শয়তান থাকলেই তবে এত বড় সৃষ্টির রথখানি এগিয়ে চ'লতে পারতো। কিন্তু কার্যতঃ তা পারলো না। রাগের সঙ্গে তাই প্রয়োজন হলো রাগিনীর। সেই রাগিনী হচ্ছে মানুষের সুকুমার-বৃত্তি। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, সেবা, ত্যাগ

সাহচর্য, অনুকম্পা, দান প্রভৃতি বিষয়গুলি এই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। এ বৃত্তির যত বেশী আধিক্য পৃথিবী ততই বিভাময়ী হ'য়ে ওঠে।

এ নয় যে, মানুষ যেহেতু প্রধানতঃ চণ্ডালবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত, সেইহেতু সৎগুণগুলি তার মধ্যে অনুপস্থিত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণসত্তায় তার এই উভয় বৃত্তিই পাশাপাশি ক্রিয়াশীল রূপে দেখা দেয়। সদ্‌গুণগুলির চর্চার উপরেই মানুষের সুকুমার বৃত্তির বলিষ্ঠ বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে যত মানুষ তাঁদের এই বৃত্তির ইতিহাস স্বাক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন, সেই লিপিবদ্ধতার পিছনে আছে তাঁদের জীবনব্যাপী এই বৃত্তির অনুধ্যান, অনুশীলন ও চর্চা। চণ্ডালবৃত্তি মানুষকে দানবে পরিণত করে আর সুকুমারবৃত্তি মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। এর জন্য চাই অনুশীলন ও চর্চা। যে মানুষ জন্মান্তর হ'য়ে সৃষ্টিকে সংহারে রূপ দিয়েছে, সেই মানুষকে দিয়েই আবার মহৎ ও সৎকার্য সাধিত হ'তে পারে। যে বাল্মীকি ছিলেন দস্যু, তিনি হলেন ঋষি, যে সাজাহান ছিলেন শাসক সম্রাট, তিনি হলেন প্রেমিক, কবি।

সম্পর্কে ভগবান তথাগতের একটি বাণী উল্লেখযোগ্য :

'যদ্যপি পুষ্পকরাসিমিত্রা কল্পিয়া মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কর্ত্তব্যং কুশলং বহুং ॥'

অর্থাৎ—যেমন রাশি রাশি পুষ্পের দ্বারা সুন্দর একছড়া মালা গাঁথা যেতে পারে, তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা বহু সৎকর্ম সাধিত হতে পারে।

মানুষকে এইভাবেই দানব থেকে দেবত্বে উন্নীত হ'তে হয়। এ একটা ধ্যান, একটা অনুশীলন ও চর্চাসাপেক্ষ বিষয়। ত্যাগে যে আনন্দ, প্রেম আর ভালোবাসায় যে আনন্দ,—ভোগে বা হত্যাতেও কি সেই আনন্দ? তা নয়। উপনিষদের ঋষি তাই একদিন বলেছিলেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা।' অর্থাৎ—'ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো।' ভালবাসা একটি ত্যাগ, অনুকম্পা, প্রেম, প্রীতি, দয়া, করুণা, মমতা, সাহচর্য—প্রভৃতি সবকিছুই ত্যাগ। ত্যাগ আছে বলেই এগুলো এত মহৎ, এত উদার। ভারতবর্ষের বাণী এই উদারতার বাণী: ভারতবর্ষ চিরকাল উদার হতেই চেয়েছে, ঔদার্যের সাধনা করেছে সে চিরকাল। তার একদিকে সমুন্নত হিমালয়, আর একদিকে উদার-বিস্তৃত কন্যা কুমারিকা। দুটিই ধ্যানগম্ভীর বিশাল উদারতা। একদা ভারতবর্ষীয় সমাজ এই ধ্যানগাম্ভীর্যের উপাসনা দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অতীতের এতবড় ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের বর্তমান সমাজ পুরোপুরি বর্জন না করলেও মনে প্রাণে গ্রহণ ক'রে উঠতে পারছে না। আন্তর্জাতিক ভাবচেতনার ফলে এ সমাজ আজ যত বেশী মেধায় এগিয়েছে, মজ্জায় তার এককণাও ভ'রে ওঠেনি। ফলে তার চণ্ডালবৃত্তি যত বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ তার একশতাংশও ঘটছে না। একথার পিছনে বাস্তব সত্য আছে। মানুষের মনন-ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'য়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রবৃত্তিকে ওর না ক'রলে মানুষ তার জীবনসত্তায় পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারেনা, সেই প্রবৃত্তির কাছে মানুষ আজও দাস হয়েই আছে। ফলে মানুষ মুখে যতই নীতি ও ত্যাগের মহনীয়তা উচ্চারণ করুক, আসলে সে তার সহজাত ঈর্ষাকাতরতা, রাগ, দ্বেষ ও হিংসাকে বিসর্জন দিয়ে খাঁটি ত্যাগী ও প্রেমিক হতে পারছে না। এ শুধু আজকের ভারতবর্ষীয় সমাজ ব'লেই নয়, জাগতিক সমাজ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। সর্বত্রই তাই ভোগবাদের প্রয়াস প্রবলতর হ'য়ে উঠছে। অপরকে বঞ্চিত ক'রে নিজেকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াসই হ'চ্ছে ভোগবাদ। এর ফলে ঘটছে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, বিভেদ আর বিসম্বাদ। সমাজ ক্রমে অবনতির দিকে গিয়ে ভেঙে পড়ছে! এম্‌নি ক'রে ভাঙতে ভাঙতে একদা হয়ত এমন দিন আসবে —যখন সমাজের অস্তিত্বটুকুও আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

সেই সঙ্গে পৃথিবীর এই এতবড় সৃষ্টিও যদি ধ্বংস

হ'তো, তবে সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পরও সৃষ্টি তার আপন গতিতে অব্যাহত ভাবে চলতে থাকবে এবং তার সেই চলমান ক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজের মনুষ্যজীবনের পথে এগিয়ে চ'লতে হবে। সেই চলা সুন্দর হ'তে পারে একমাত্র তার সুকুমার বৃত্তির দ্বারা। তখন তার একথাই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন হবে যে—

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'

যতক্ষণ না প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ত্যাগ ক'রতে পারছে, প্রতিটি জীব প্রতিটি জীবকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ভালোবাসতে না পারছে, ততক্ষণ সমাজের উন্নতি নেই। ক্রমশঃই 'Give and Take' পলিসির দেওয়া-নেওয়ার কারবারে ব্যবসায়ে সমাজ ধীরে ধীরে একটি পণ্যশালায় পরিণত হতে চলেছে, তাতে মানুষ কখনও তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনা। হয় তাকে তবে পুরোমাত্রায় জড়ান হয়ে যেতে হবে, নয়তো মৃত্যু ছাড়া তার তখন আর সান্ত্বনার কিছু থাকবে না। কিন্তু মৃত্যুই বোধ করি জীবনের চরম সান্ত্বনা নয়। জীবনের শ্রেয়তাই যে মানুষের পরম প্রিয়। সেই শ্রেয়তাকে পেতে হ'লে চাই সুকুমার-বৃত্তিগুলির চর্চা ও অনুশীলন। জাতীয় জীবনের শ্রেয়তর কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষীয় সমাজকে আজ আবার নতুন ক'রে এই অনুষ্ঠানটিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই পথেই তার জীবন, এই পথেই তার সকল লাঞ্ছনার একমাত্র অবসান।

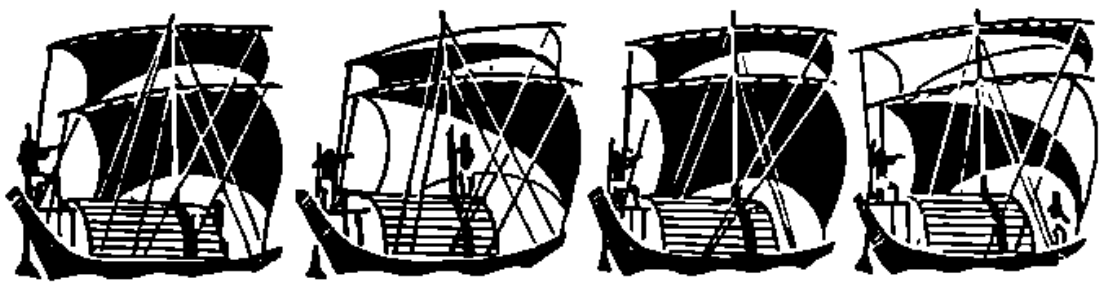

চীন-ভারত মৈত্রী ঃ
শ্রীনেহেরু ও চৌ এন্ লাই

ভারত-চীন মৈত্রীর গুরুত্ব

১৯শে অক্টোবর পিকিং বিমান ঘাটিতে সমবেত বিপুল জনতার উদ্দেশে শ্রীনেহেরু বলেন, "আমাদের দুইটি মহান দেশের মধ্যে মৈত্রী যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই তাহা কেবল-আমাদের নহে, সমগ্র এশিয়ার এবং সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে।"

২০শে অক্টোবর, পিকিং—

শ্রীনেহেরু চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মাও সে তুংএর স্বাস্থ্য কামনা করিয়া বলেন, "আজ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হইতেছে শান্তির।".....মতবিরোধের আদর্শের উপর জোর দিয়া শ্রীনেহেরু বলেন, একজাতি যদি অন্য জাতির উপর নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে, এক জাতি যদি নিজের জীবনাদর্শ গ্রহণ করিতে অন্য জাতিকে বাধ্য করে তবে সংঘর্ষ আসিতে বাধ্য হইবে। এই জন্যই আমরা একদেশের উপর অন্য দেশের প্রভুত্বের বিরোধী।"

শ্রীনেহেরু বলেন, "যে কোন মুহূর্তেই ভারত ও চীনের সম্পর্ক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। সেক্ষেত্রে বর্তমানের বিশৃঙ্খল ও সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে এই সম্পর্কের তাৎপর্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে।..... সেই বিচারে সব কিছুর উপরে মানুষেরই মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। চীন ও ভারতের প্রায় ১০০ কোটি মানুষের মূল্যকে কখনই অগ্রাহ্য করা যাইবে না।"

"দিল্লী হইতে পিকিং আসার পথে অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসের সমগ্র দৃশ্যপট আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। দুই হাজার বৎসরেরও বেশী কাল পূর্ব হইতে চীন ও ভারত পরস্পরকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতঃপর উভয় দেশের মধ্যে পর্যটন ও তীর্থযাত্রীর এক দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ধারা চলিতে থাকে। তাঁহারা শুভেচ্ছার দূতরূপে উভয় দেশের মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাবের আদান প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিরোধের কোন নজীর নাই, যে নজীর আছে তাহা শুধু বন্ধুত্ব, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের নজীর। এই দুই মহান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা এক গৌরবময় ঐতিহ্য।"

পিকিং, ২৬শে অক্টোবর—

এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীনেহেরু বলেন; "ভারত ও চীন উভয়েই শান্তিকামী; কারণ উন্নতির মূল ভিত্তি উভয়েরই কাম্য। ইহা আমাদের নিছক সদিচ্ছাই নয়; ইহা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও বটে। আবার কোন কোন ব্যাপারে আমাদের উভয়ের সমস্যা একই প্রকার এবং উভয়কে একই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। আমরা একে অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারি

চীন ও ভারতের অভিপ্রায় এই যে, উভয় দেশের কোটি কোটি লোক আমাদের সমৃদ্ধির অংশভাগী হউক।

আমি আশা করি, আমাদের উভয় দেশের মধ্যে বহু রকমের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। আমরা একে অন্যকে জানিব, ইহা খুবই বড় কথা। আধুনিক জগতে যে কোন দেশের পক্ষে বিচ্ছিন্ন থাকাটা নেহাৎই অসমঞ্জস ব্যাপার। যাহাতে অবাধে মেলামেশা চলিতে পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে অন্তরায় দূর করিতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় এক জাতি অন্য জাতিকে আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিবে এবং একের সম্পর্কে অন্যের গভীরতর জ্ঞানলাভ হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা ভারতবাসীরা শুধু চীনকেই নহে, অন্যান্য দেশকেও সহায়তা করিতেও প্রস্তুত।"

মাও-সেতুং

কোরিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন—"জেনেভা বৈঠকের পর এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে করা অনুচিত। এখনও এ সম্পর্কে আলোচনা চলা বিধেয়। তাহা হইলেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে আরও আলাপ আলোচনা হইবে এবং এইভাবে মীমাংসার ভিত্তি উদ্ভাবিত হইবে।"

ফরমোসা সম্পর্কে তিনি বলেন—"আমার সহিত চীন নেতৃবৃন্দের আলোচনায় বহুবার তাইওয়ানের (ফরমোসা) কথা উঠিয়াছে। তাইওয়ান সম্পর্কে চীনের মনোভাব সুবিদিত। আমাদের দিক হইতে বলিতে গেলে আমরা চীনের গণসরকারকে স্বীকার করি, অন্য কোন সরকারকে স্বীকার করি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উঠে না। তাইওয়ানের প্রশ্নটি খুবই দুরূহ। তবে আশা করি শান্তিপূর্ণ ভাবেই উহার সমাধান হইবে।"

শ্রীনেহেরু এক বিবৃতিতে বলেন,"……আমি বিশ্বাস করি যে আমার চীন পরিদর্শনের ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে এবং ইহা বিশ্বশান্তির পক্ষেও সহায়ক হইবে। চীন এবং ভারত শান্তির ভিত্তিতে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে চাহে। বর্তমান সময়ে বিশ্বে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

চীন এবং ভারত উভয় দেশেই জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা এক বিরাট কার্য। আমি বিশ্বাস করি যে চীন এবং ভারত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে। কতকগুলি বিষয়ে আমাদের উভয় দেশের সমস্যা এক ধরণের এবং আমরা পরস্পরের নিকট হইতে অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারি।"

২৭শে অক্টোবর শ্রীনেহেরু পিকিং বেতারে বক্তৃতায় বলেন :—"……

চীনে আসিয়া দেখিলাম, এক প্রাণবন্ত জাতি এক বিরাট কর্তব্যের দায়িত্ব লইয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহারা যে জয়ী হইবে সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মহাচীনের জন-নায়ক মাও সে তুংএর প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাকে দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এক শক্তিমান পুরুষরূপে, দক্ষ যোদ্ধা, বিপ্লবী নায়ক এবং শক্তিশালী সংগঠকরূপেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠাতার মহৎ ভূমিকায়ও তাঁহাকে আমি দেখতে চাই।"

পিকিং ২০শে অক্টোবর—

শ্রীনেহেরুর সম্মানার্থ আয়োজিত এক ভোজ-সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য কামনা করিয়া মিঃ চৌ এন লাই বলেন, "এশিয়ায় এবং সম্ভব হইলে অন্যত্রও শান্তি এলাকা সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করার যে নীতি ভারত গ্রহণ করিয়াছে চীন তাহা সমর্থন করিবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর এই নীতি আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এশিয়ায় শান্তির এলাকা সংস্থাপন ও উহা সম্প্রসারণের সাধারণ প্রচেষ্টায় আমরা ভারতের সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।"

পিকিং, ২১শে অক্টোবর—

গত জুন মাসে নয়াদিল্লী হইতে প্রচারিত যুক্ত বিবৃতিতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ভারত ও চীনের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের যে পঞ্চনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেগুলি গ্রহণের জন্য তাঁহারা সকল দেশের নিকট আবার আবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ লাই বলেন "এই বিবৃতি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। চীন ও ভারত শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের পঞ্চনীতির প্রবর্তক। সেই হিসাবে এই নীতি-গুলি যে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে রূপায়িত করার বিষয় এবং নীতিগুলি যে কাহারো পক্ষে ক্ষতিকর নহে; বরং উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর তাহা আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিবার বাধ্য-বাধকতা আমাদের রহিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ভারত ও চীনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি এবং বন্ধুত্ব-প্রণোদিত সহযোগিতার ফলে এশিয়া ও সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশও ক্রমে ক্রমে ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিবে। ভারত ও চীন এশিয়ার দুই বিরাট শক্তি। এই দুইটি দেশ একাধারে প্রাচীন ও নবীন। দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এই দুইটি দেশ ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইতিহাসের কোথাও এই দুইটি দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের কোন উল্লেখ নাই। সাম্প্রতিককালে দুইটি দেশই ঔপনিবেশিক পীড়ন ভোগ ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। বর্তমানে উভয়েই দেশগঠনের জন্য শান্তির আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষপাতী। দুইটি দেশই বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিতেছে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করিয়া পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহিতেছে। ইহাতে দুইটি দেশের সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। চীনের জনসাধারণ শ্রীনেহেরুকে যে বিপুল অভিনন্দন জানাইয়াছে উহাও তাহারই প্রমাণ।"

এবারের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

[আমেরিকার ঔপন্যাসিক মিঃ আর্নেষ্ট হেমিংওয়েকে সাহিত্য রচনার জন্য এই বৎসরের নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। সাহিত্য রচনার জন্য এই বৎসরের পুরস্কারের পরিমাণ ১৮১,৬৪৬ ক্রাউন (প্রায় ১২,৫০০ ষ্টার্লিং)। অন্যান্য বার অপেক্ষা এই বারের পুরস্কারের পরিমাণ অধিক।

নোবেল ফাউণ্ডেশনের পক্ষ হইতে সুইডিশ একাডেমি অব্ লিটারেচার কর্তৃক এই পুরস্কার প্রদান করা হইয়া থাকে। গত ৪৩ বৎসর ধরিয়া এই পুরস্কার প্রদান করা হইতেছে।]

হেমিংওয়ের পরিচয়

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই আমেরিকার ইলিনোয়ার এক পার্কে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাহার বয়স ৫৫ বৎসর।

সমসাময়িক যুগের "মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম" রূপে পূর্বেই হেমিংওয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে তাহার উপন্যাস "ফর হুম দি বেল টোলস" প্রকাশিত হইলে পাঠক মহলে তাঁহার খ্যাতি উত্তুঙ্গ হইয়া উঠে। গত বৎসর তাঁহার "দি ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী" র জন্য তাঁহাকে পুলিৎজার পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করা হয়: তিনি যুদ্ধের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, খুব কম প্রতিভাধর স্রষ্টারই সেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হইয়াছে তাই যুদ্ধের নৃশংসতা এবং মানুষের বেদনা তাঁহার কল্পনার উজ্জ্বল রঙে, অভিজ্ঞতার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে এবং রচনাশৈলীর গুণে সৃষ্টিগুলিতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

১৯১৭ সালে কলেজ ত্যাগের পর তিনি মিসৌরির "কানসাস সিটি ষ্টার" পত্রিকার রিপোর্টার নিযুক্ত হন কিন্তু ঐ কাজ ত্যাগ করিয়া তিনি ইতালী যান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এম্বুলান্স গাড়ীর ড্রাইভার হন। এইখানেই তিনি যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি গুরুতর রূপে আহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তখন তাহার বয়স প্রায় ১৯ বৎসর।

১৯২০ সালে "টরন্টো ষ্টার" পত্রিকা তাঁহাকে নিকট প্রাচ্যে সংবাদদাতা হিসাবে পাঠায়। অতঃপর ইন্টার ন্যাশনাল নিউস সার্ভিসের সংবাদদাতা হিসাবে তিনি প্যারিসে অবস্থান করেন। কয়েক বৎসর—তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ ফ্রান্স ও স্পেনে অতিবাহিত হয়। প্যারিসের আমেরিকান কলোনী হইতেই তিনি তাঁহার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস "দি সান অলসো রাইজেস"-এর উপাদান সংগ্রহ করেন। ইহা ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাই হেমিংওয়ের প্রথম উপন্যাস ও চতুর্থ গ্রন্থ।

কয়েক বৎসর পর হেমিংওয়ে ইতালী ও প্রথম মহাযুদ্ধে লব্ধ তাঁহার অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করিয়া "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস" উপন্যাস রচনা করেন। ইহা ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সংগে সংগে আমেরিকার সাহিত্যজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ইহাই প্রথম আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস বলিয়া অভিনন্দন লাভ করে। প্রেম ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসের আখ্যান। নায়ক-নায়িকা দুইজনে পরস্পরের মধ্যে এক পরম আশ্রয়

খুঁজিয়া পাইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধের নির্মমতায় তাহাদের নীড় ভাঙিয়া যায়। যুদ্ধের বীভৎসতায় বীতশ্রদ্ধ নায়ক সৈন্যবাহিনী হইতে পলায়নের সঙ্কল্প করে।

১৯৩০ সালে হেমিংওয়ে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ফ্লোরিডায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাস "টু হ্যাভ এণ্ড হ্যাভ নট" ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। আমেরিকান পটভূমিকায় ইহাই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। আমেরিকান জীবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। জনপ্রিয়তার দিক হইতে এই উপন্যাসখানি তত সাফল্য লাভ না করিলেও ইহাতে তাঁহার মননশীলতার বিকাশ লক্ষিত হইতে থাকে। ইহাতে তাঁহার প্রথম উপন্যাসের মত দুঃসাহসিকতার চমক লাগাইবার চেষ্টা নাই ইহাতে তাঁহার জীবন-দর্শন আত্মপ্রত্যয়ের নিষ্ঠায় কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৩৬ সালে তিনি সমর সংবাদদাতা হইয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। এই স্পেনীয় যুদ্ধের পরিণত অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস "ফর হুম দি বেল টোলস্" এবং নাটক "দি ফিফথ কলম"এর সৃষ্টি। "নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার পুস্তক সমালোচক ডোনাল্ড এডাম্স্ এই উপন্যাসকে হেমিংওয়ের "শ্রেষ্ঠতম" রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা আমেরিকান সাহিত্যের একটি কালজয়ী সৃষ্টিরূপে গণ্য হইবে বলিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

হেমিংওয়ে তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বহু বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত বক্তব্য একটি উপন্যাসেই চরম সামগ্রিকতার মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। একটি উপন্যাসের সঙ্গে আরেকটি উপন্যাসের অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে— একই ধারাবাহিকতা উপন্যাস হইতে উপন্যাসান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া বিষয়বস্তুকে ক্রমেই স্ফুট হইতে স্ফুটতর করিয়াছে। তাঁহার চারটি উপন্যাসকে একই নাটকের চারটি অঙ্ক বলা যায়; দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বিশৃঙ্খল সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ আত্ম-উদ্ঘাটন করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার বাস্তব জীবনের একই অভিজ্ঞতা এবং মানস লোকের একই আকুতি তাঁহার সমস্ত রচনার উৎস।

হেমিংওয়ে শুধু অনন্য প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকই নহেন, তাঁহার ছোটগল্পও কম আদৃত নয়। তাঁহার উপন্যাসের মত তাঁহার ছোট গল্পগুলিই উদ্দাম, বিপদ-বিলাসী জীবন-রসিকদের লইয়া লিখিত। হেমিংওয়ের ছোট গল্পগুলির একটি সঙ্কলন ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই তাঁহার "স্প্যানিশ আর্থ"-ও প্রকাশিত হয়।

হেমিংওয়ের ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রধানতঃ মৃত্যু ও যুদ্ধ লইয়া লিখিত। এই দুই বিষয়ে লিখিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে। কম সাহিত্যিকই তাঁহার মত যুদ্ধক্ষেত্রে এত বেশী সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি সমরসংবাদদাতা রূপে স্পেন, চীন, নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপে ছিলেন।

হেমিংওয়ে কখনই হলিউডের জন্য লিখেন নাই তবুও তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্প চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস" "ফর হুম্ দি বেল টোলস" ইত্যাদির চিত্ররূপ উল্লেখ-যোগ্য।

হেমিংওয়ে এ বৎসর জানুয়ারী মাসে নিজেই তাঁহার গল্পের কোন কোন নায়কের মত এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক নূতন উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহের জন্যে তিনি পূর্ব আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। বিমানে প্রমোদ ভ্রমণ করিবার সময় তিন দিনের মধ্যে দুইবার সঙ্গীন বিমান ভাঙিয়া পড়েন এবং এমন গভীর জঙ্গলে পড়েন "যেখানে হাতী, হিপ্পো, গণ্ডার, কুমীর বা যে কোন হিংস্র জানোয়ার থাকিতে পারিত।" তাঁহার এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্থান হইতে মাত্র কয়েক শত মাইল দূরে আফ্রিকার পর্বতের ক্রোড়ে তিনি তাঁহার "দি স্নোজ অব্ কিলিম্যাঞ্জারো"র এক কল্পিত নায়ককে মৃত্যুর মুখে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান ভগৎ

গ. চ. ভ.

ওষুধ-সমস্যা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত চিন্তাশীল এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্ বলেছিলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত Materia Medica যদি সমুদ্র-জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তবে সমুদ্র জলের অবস্থা খারাপ হতে পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাতে উপকার ছাড়া অপকার হবে না। সার উইলিয়াম অস্‌লারও বলেছিলেন, ওষুধের অসারতা সম্বন্ধে যিনি যত বেশী জানেন, তিনিই তত ভাল চিকিৎসক। কিন্তু যে যাই বলুক, অভিজ্ঞতার ফলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা একদিকে যেমন ওষুধ ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছেন, অপর দিকে তেমনি অজ্ঞতার ফলে ওষুধের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। অবশ্য নির্দিষ্ট ফলপ্রদ বিশেষ বিশেষ ওষুধের কথা নয়, প্রচলিত সাধারণ ভেষজ বা খনিজ ওষুধের কথাই বলা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ওষুধ প্রয়োগ করে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়; কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—অনুরূপ অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ-হিসাবে অন্য কোন নির্দোষ পদার্থ প্রয়োগ করেও একই রকমের সুফল লাভ হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর অজ্ঞাতসারে তার নিজের মানসিক প্রভাবে ওষুধের ক্রিয়া হয়ে থাকে। আমরা যাকে 'Faith cure' বলি, সেটাও তো এক রকমের 'cure' নিশ্চয়ই।

রুগ্ন অবস্থা থেকে নীরোগ অবস্থা সর্বথা বাঞ্ছনীয়। ওষুধের পরিবর্তে অন্য কোন জিনিষ প্রয়োগের ফলে আরোগ্য লাভের পর রোগী যদি তাকে ওষুধেরই অযথার্থ ফল বলে মনে করে, তাতে কিছু আসে যায় না। কাজেই কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এ ব্যাপারটাকে মোটেই উপেক্ষা করতে পারেন না। রোগ নিরাময়ের জন্যে তাঁকে যে কোন সুবিধাজনক উপায় বা সুযোগ গ্রহণ করতে হয়—ওষুধ সম্বন্ধে কোন খোঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

বর্তমান সভ্যতার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। যা কল্পনার বিষয়ীভূত বা কল্পনারও অতীত ছিল, বিজ্ঞান তাকে বাস্তব রূপ প্রদান করেছে। বিজ্ঞানের এই অসামান্য সাফল্য এবং প্রভাব দর্শনে জনসাধারণ যে এর প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে, এতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নেই। এর ফলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরূপ যাবতীয় বিষয়কেই নির্বিচারে গ্রহণ করতে অনেকেই কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। এরূপ বিশ্বাসের ফলে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা বা অসুবিধা যা-ই ঘটুক না কেন, অন্ততঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মহা অনিষ্ট সংসাধিত হয়ে থাকে। রোগযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে মানুষ মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ থেকে সুরু করে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হেকিমী প্রভৃতি যে কোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করতেই ইতস্ততঃ করে না; কিন্তু প্রকৃত শান্তি খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। কাজেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, জনসাধারণ তার উপরেই ভরসা করে বেশী।

কিন্তু বিজ্ঞানের অধুনাতন অগ্রগতির ফলে দেখা গেছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুমোদিত যে সব ওষুধ এতকাল অব্যর্থ রোগনাশক বলে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল তাদের অধিকাংশই যে কেবল অকেজো, তাই নয়, পরিণামে তারা বিবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে দেহযন্ত্রকে বিকল করে ফেলে।

যখন দেহযন্ত্রের কলকৌশল, রোগের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ওষুধ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছিল অপরিসীম তখন থেকেই ওষুধ সেবনের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ভল্টেয়ার তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসকের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, গুণাগুণ বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই, এমন সব ওষুধ চিকিৎসক রোগীর মুখে তোলে দেন, যার শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না। অবশ্য অতীতের সেই অনভিজ্ঞতা এবং অনিপুণ কর্মপ্রচেষ্টা থেকেই ক্রমশঃ ওষুধের গুণাগুণ নিরূপণ এবং প্রয়োগবিধির যথাবিহিত ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এরই ফলে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কারণ এবং শারীরবিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যসমূহ জানবার পথ সুগম হয়েছে।

কেন হয়, তখনকার দিনে সে রহস্য জানা ছিল না। কারুর জ্বর হলে বা কেউ শারীরিক যন্ত্রণায় কষ্ট পেলে—কি কারণে শরীরের তাপ বাড়লো বা শারীরিক যন্ত্রণা ঘটলো, সে কথা না জানায় শারীরিক লক্ষণগুলিকেই রোগ বলে ধরা হতো। অর্থাৎ ব্যাপারটা ছিল এ রকমের—যেন কম্পন, যন্ত্রণা বা গাত্রতাপ বৃদ্ধি করে শরীরটা বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিচ্ছে। যে কোনও রকমে এই লক্ষণগুলি দূর করতে পারলেই রোগ নিরাময় হবে—এই বিশ্বাসে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত রোগীর উপর যে কোনও রকম ব্যবস্থা প্রযুক্ত হতো। সে যুগে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিকশিত হয় নি; কাজেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওষুধের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্যে তখনকার দিনে মাথা ঘামাবার কারণ ছিল না। যেমন খারাপ আবহাওয়াটা আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক, কিন্তু আমরা তার কারণও খুঁজি না বা প্রতিকারও করতে পারি না, অথচ এর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্যে যে কোন রকম সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে থাকি—তখনকার দিনের ডাক্তারী বিদ্যাটা সেরূপ অজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও জনসাধারণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। কারণ ব্যাধিগ্রস্ত লোকের এ ছাড়া সান্ত্বনা লাভের আর কোন উপায়ই জানা ছিল না।

যে সময়ে মানুষ রোগের লক্ষণকেই রোগ বলে মনে করতো, সে সময়ে তারা এ-ও লক্ষ্য করেছিল যে, বনে-জঙ্গলে বা অন্যত্র এমন অনেক গাছপালা বা অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায় যা সেবনে শরীরে নানা-রকমের অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, এসব লক্ষণের সঙ্গে কোন রোগের লক্ষণ মিলে গেলেই সেটা সেই রোগ প্রতীকারের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও অনেক ওষুধ এই রীতি অনুসারেই ব্যবহার করা হতো। আফিং একটি প্রাচীন প্রচলিত ওষুধ। আফিং বীজাধারের নির্যাস ব্যথা-বেদনা প্রশমনে বা নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে—আফিং বা আফিং থেকে উৎপাদিত কোন ওষুধই আজ পর্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রোগ নিরাময়ে সক্ষম হয় নি। এরূপ আধুনিক কালে প্রচলিত ফক্স-গ্লোভ বা ডিজিটালিস একটি সুপরিচিত ওষুধ কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ওষুধটি কোন রোগাক্রান্ত হৃদ্‌যন্ত্রকে নিরাময় করতে পারে নি। ডিজিটালিস শুধু নির্যাস নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন কমাতে পারে মাত্র, অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা বিধান করতে পারে না। এ কারণেই আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে এর ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে।

গাছগাছড়া থেকে ওষুধরূপে ব্যবহৃত যেসব সক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। তারা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদের ব্যথা-বেদনা বা রোগযন্ত্রণা উপশম করবে কেন?

প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রাণী বা বিভিন্ন রকমের জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে থাকে। এদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই প্রধানতঃ উদ্ভিদদেহে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদিত হয়। কাজেই উদ্ভিদ দেহের প্রয়োজনে উৎপন্ন পদার্থ প্রাণীদেহের রোগ নিরাময় করবে—এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা শক্ত। তাছাড়া সত্যিকার রোগ-নাশক ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে মানুষ প্রায় সব রকমের উদ্ভিদকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সন্ধান মিলে নি। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি ঔষধের কিছু কিছু কার্যকারিতা দেখা গেছে—কিন্তু তারও কারণ সুস্পষ্ট। উদ্ভিদদেহে কোন কোন জীবাণু বা দূষিত পদার্থ ধ্বংসের জন্যে যে সব সক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয়—তা মনুষ্য-দেহে উৎপন্ন অনুরূপ অনিষ্টকারীপদার্থ বা জীবাণুগুলিকেও যে ধ্বংস করতে পারবে, এতে বিস্ময়-বোধ করবার কিছু নেই। মানুষের একটি গুরুতর রোগ দেখা যায়—উদ্ভিজ্জাত পদার্থ যাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করতে পারে। এটা যেন একটা আকস্মিক রাসায়নিক ঘটনার মত। এক জাতীয় উদ্ভিদ তার নিজের প্রয়োজনে কুইনাইন নামে একপ্রকার সক্রিয় প্রতিষেধক পদার্থ, অর্থাৎ ঔষধ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মানুষের শরীরে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, পদার্থটা ম্যালেরিয়া-জীবাণু বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয় এবং তার ফলে রোগের প্রভাব মন্দীভূত হতে থাকে। কুইনাইনের মত একটা উদ্ভিজ্জাত ঔষধের মনুষ্য-রোগ দূরীকরণে এই বিশেষত্ব যেন একটা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। তবে বিশেষ কোন এক একটি লক্ষণ বা শারীরক্রিয়ার কথা ধরলে কতকগুলি উদ্ভিদের এক একরকমের কার্যকরী ক্ষমতা লক্ষিত হয় বটে এবং সেই হিসাবে মরফিন, ষ্ট্রিকনিন, অ্যাট্রোপিন প্রভৃতি পদার্থসমূহ অনবরত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরা কোন কোন লক্ষণ বা শারীর-ক্রিয়াকে সাময়িকভাবে অনেকটা আচ্ছন্ন করে রাখে বটে, কিন্তু কোন রোগ নিরাময় করতে পারে না।

তাছাড়া রোগ-নিদান সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, বিভিন্ন রকমের এককৌষিক পরজীবি উদ্ভিদাণু মনুষ্যদেহে নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করে থাকে। এসব উদ্ভিদাণু মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে উপযুক্ত পরিবেশে অতি দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের দেহ-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থের দরুণ এবং অন্যান্য কারণে শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ যেখানে রোগোৎপত্তির কারণ সেখানে উদ্ভিজ্জাত পদার্থের রোগনাশক ক্ষমতার সন্ধানের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন—অনুসন্ধানের ফলে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কুইনাইনের মত নিউমোনিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ওষুধের সন্ধান পাওয়াও বিচিত্র নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষকেরাও অবশ্য এরূপ কোন সহজ-লভ্য আশুফলপ্রদ পদার্থ সন্ধানে চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, কুইনাইনের মত পদার্থের কথা বাদ দিলে ভৈষজ্যজাত অন্যান্য যে সব ওষুধ উৎপাদিত হয়েছে, তার কোন কোনটা কদাচিৎ কার্যকরী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ লোকের অনিষ্টসাধন করেছে।

খনিজ বা অজৈব পদার্থ সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটতে দেখা যায়। লৌহ, গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক প্রভৃতি পদার্থগুলির বিবিধ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং বরাবরই থাকবে। রক্তাল্পতায় লৌহ, উপদংশে পারদ, চর্মরোগে গন্ধকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবুও কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ-রূপে খনিজ পদার্থের ব্যবহার পরিত্যক্ত হতেই চলেছে। অ্যান্টিমনি নামক চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপরিচিত পদার্থটির কথাই ধরা যাক। চিকিৎসকেরা অনেককাল থেকেই এই পদার্থটিরবিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক রোগনাশক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অন্যান্য ওষুধের মত রোগ নিরাময়ে এর ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়েছে। এই পদার্থটা হৃৎস্পন্দন ও অন্যান্য অপরিহার্য শারীরিক প্রক্রিয়ায় অবসাদ আনে

মাত্র এবং খুব সম্ভব রোগের সর্বাবস্থায় এর দ্বারা উপকার ছাড়া অপকারই হয়ে থাকে বেশী!

রোগ নিরাময়ে ভেষজ এবং খনিজ পদার্থের অসারতা প্রতিপন্ন হলেও রোগ প্রতীকারের কোন ওষুধ নেই—এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। প্রাণীদেহের প্রয়োজনে শরীরের মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে যেসব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের কি অঙ্গ রূপান্তরে প্রয়োগ করা যায় না? অনুমানের উপর নির্ভর করে এক সময়ে কিন্তু এভাবেই তথাকথিত রোগনাশক নতুন নতুন ওষুধ প্রস্তুত হতো। হঠাৎ কারো এমন একটা উদ্ভিদ নজরে পড়লো যার আকৃতি-প্রকৃতি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদের চেয়ে অনেকটা অদ্ভুত ধরণের। হয়তো তার পাতাগুলি দেখতে প্রাণীদেহের অঙ্গবিশেষের মত। এরূপ সাদৃশ্য দেখেই সেই পাতার কাথ বা নির্যাস প্রস্তুত করে মনুষ্যের সেই অঙ্গবিশেষের অসুস্থতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হতো। এ থেকেই ক্রমশঃ মনুষ্যদেহের অঙ্গবিশেষের অসুস্থতা দূর করবার জন্যে অপর প্রাণীর অনুরূপ অঙ্গ-বিশেষের নির্যাস প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। এর ফলে ব্যাধি উপশমের ক্ষেত্রে কোন সাফল্য লাভ না ঘটলেও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কিন্তু কিছু সংশোধিত বা পরিবর্তিত উপায়ে এ থেকেই কতকগুলি deficiency disease-এর প্রতীকার সম্ভব হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীদেহ থেকে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করা সম্ভব হয়েছে যার প্রয়োগে সেই সেই পদার্থের অভাবজনিত রোগের অব্যর্থ প্রতীকার সম্ভব। সময়ে সময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের cretinism এবং বয়স্কদের myxœdema নামক রোগ হতে দেখা যায়। থাইরয়েড গ্রন্থিনিঃসৃত রসের অভাব বা স্বল্পতা-হেতুই এসব রোগ আত্মপ্রকাশ করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—কোন সুস্থ জীবজন্তুর থাইরেড গ্রন্থি বের করে এসব রোগীকে সেবন করালে বা নিঃসৃত রস অঙ্গ-ভাবে প্রয়োগ করলে খুব তাড়াতাড়ি বুদ্ধিবৃত্তি ও চেহারার পরিবর্তন ঘটে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কাজেই এই ধরণের ওষুধকেই প্রকৃত প্রস্তাবে অমোঘ ওষুধরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের পাকস্থলী খাদ্যোপযোগী পদার্থ গ্রহণেরই উপযোগী, তথাকথিত ওষুধরূপ বিষ আত্মসাৎ করবার জন্যে নয়। এই হিসাবে যথাযথরূপে কার্যকরী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ওষুধরূপে পরিচিত প্রত্যেকটি পদার্থকে বিষ হিসাবে ধরে নেওয়া উচিত। দুধ, মাখন প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর সঙ্গে নির্দোষ পদার্থ হিসাবে মিশ্রিত বোরিক অ্যাসিড, চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত স্যাকারিন প্রভৃতিরও নির্দোষিত প্রমাণিত হয় নি। এমন কি, কুইনাইনের মত পদার্থও আমাদের শরীরের পক্ষে বিষ ছাড়া আর কিছুই নয়। ম্যাচ্‌নিকফ বলেছিলেন, কুইনাইন রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলিকে অসাড় করে ফেলবার চেষ্টা করে। চিকিৎসক মাত্রেই একথা জানেন যে, কুইনাইন শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকটিত করে থাকে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়া প্যারা-সাইটের পক্ষে যতটা বিষাক্ত, আমাদের শরীরের পক্ষে ততটা নয়।

নোটের উপর, কোন নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করলে শরীরে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া দেখা যাবে, অথচ অন্য কোন রকমে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী হবে না—এমন কোন আদর্শ বা অব্যর্থ ভেষজের সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। আদর্শ হিপনটিক, আদর্শ অ্যান্টিসেপ্টিক বা আদর্শ অ্যানেস্থেটিকের আবিষ্কার এখনও সম্ভব হয় নি। তাছাড়া বর্তমান যুগের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধগুলি ক্ষেত্র বিশেষে অব্যর্থ ফলপ্রদ হলেও সম্পূর্ণরূপে কুফলমুক্ত নয়।

কাজেই ওষুধ ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন হলে ভেষজ এবং খনিজ ওষুধগুলিকে যতদূর সম্ভব পরিহার করে প্রাণিদেহোৎপন্ন ওষুধই ব্যবহার করা উচিত। আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা বুঝতে পেরেছে যে, রাসায়নিক কর্তৃক উৎপাদিত কতকগুলি পদার্থ শরীরের উপর যথাযথ ক্রিয়া করলেও স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্যে দেহযন্ত্র নিজেই নিজের ওষুধ প্রস্তুত করে থাকে। কোন কারণে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে বা কোন সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের অভাব হলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে। যথাযথভাবে এই জন্য ক্ষতি পূরণ করতে পারলেই স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটতে বাধ্য। বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র প্রকৃতি থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করেই এগিয়ে চলেছে।

বিজয়া

গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক – সকলকে আমাদের বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। শারদীয়া পূজা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। দুঃখ-দৈন্য বিরোধ ভুলে এ সময়ে সে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে চায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অভাব-অনটনের যে কালো ছায়া দেশকে আচ্ছন্ন করেছে তা আজও সম্পূর্ণ অপসৃত হয়নি, কিন্তু ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছে, আমরা অনুভব করছি। খাদ্যসমস্যার আজ সমাধান হয়েছে। ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল দেশবাসীর মুখে হাসির আভা ফুটিয়ে তুলেছে, অন্তরে আশ্বাস এনে দিয়েছে। বন্যার দুর্গতি-সত্ত্বেও আশা করছি, পরের কাছে আমাদের অন্নভিক্ষার প্রয়োজন হবেনা, হয়তো কিছু খাদ্য সামগ্রী আমরা রপ্তানিও করতে পারব। দোকানে-দোকানে এবার পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি পণ্যদ্রব্যের সংগ্রহ দেখা গিয়েছে এবং বিক্রিও হয়েছে আগের চেয়ে শতকরা ত্রিশভাগ অধিক। দেশবাসীর অবস্থা যে খুব সচ্ছল হয়েছে তা নয়, তবু আমরা যে ক্রমশঃ অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগোচ্ছি, এটা আশার কথা। সরকারী চেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্যম মিলিত হলে দুঃসহ দারিদ্র্যের পীড়ন থেকে আমরা অনতিকালমধ্যে মুক্ত হতে পারব।

কবি-বিদায়

পরপর দুজন বাঙালী কবি আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেলেন: যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা কাব্যে দু'জনই মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যতীন্দ্রনাথ 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' জীবনের দুঃখবেদনার গান গেয়ে গেছেন;

নম্র, বরঞ্চ সত্যসন্ধানী
বাস্তববাদী ন'ন, তিনিও রোমা
রচনা পরিণতি লাভ করেছে।

জীবনানন্দের কাব্য পুরোমাত্রায় রোমান্টিক। আধুনিক জীবনের কবিতা থেকে দূরে স'রে গিয়ে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে ঐকান্তিক যোগ অনুভব ক'রতে চেয়েছেন। অতি কোমল স্বপ্নের ছায়া ছড়িয়ে আছে তাঁর কাব্যের আকাশে। এ-যুগের সাধনার প্রতি তাঁর উপেক্ষা নেই, তবে তার জয়ঘোষণায় তিনি উৎসুক ন'ন। অতীতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। সে-যুগের স্মৃতি তাঁকে টানে। বহু সাধকের সাধনা সত্ত্বেও মানুষ আজও কাম্য শান্তিলাভ করতে পারেনি; বুদ্ধির পথে নয়, ভালোবাসার পথে আসবে মানুষের কল্যাণ; সেই কল্যাণকামনা তাঁর কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছে। মানুষ সহজ হোক্ এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। আজকের মানুষের ঔদ্ধত্য ও দুষ্টতা তাঁকে ক্লান্ত ক'রেছে। অন্য গ্রহ নক্ষত্রকে তিনি দেখেছেন মানবের ভবিষ্যৎ যাত্রার সঙ্গীরূপে। 'ঝরা পা' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। শেষের দিকের রচনায় অতি-চেতন মনের ছায়া (Sur-realism) এসে পড়ায় অনেক স্থান দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। হয়ত' তিনি নূতন পথের সন্ধানে চলেছিলেন, এ অস্পষ্টতাও কাটিয়ে উঠ্‌তেন। অকালে সে সাধনায় ছেদ প'ড়ে গেল।

নেহরুর চীন সফর

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু দুই সপ্তাহের জন্য চীন সফরে গিয়াছেন। স্বাভাবিক

অবস্থায় এটা হয়ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হত না। তাদের ও চীন দুটী প্রাচীন প্রতিবেশী দেশ। অন্ততঃ দুহাজার বছর এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ আছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাদের ও চীনের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা যুদ্ধ হয়নি; এই দুই দেশ পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাই পূর্বে বলেছি স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন ভ্রমণে যাওয়া খুব একটা বিচ্ছ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয়; কিন্তু বিশ্বরাজনীতির

পরিস্থিতিতে পণ্ডিতজীর চীন-ভ্রমণ একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

আন্তর্জাতিক সমাজে চীন আজ প্রায়

একঘরে—রুশিয়া ও তার সংশ্লিষ্ট কয়েকটী কমিউনিষ্ট দেশ ছাড়া অনেক দেশই বর্তমান চীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি

কমিউনিষ্ট গোষ্ঠির বহির্ভূত যে সব রাষ্ট্র চীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়েছে তার মধ্যে ভারত অন্যতম।

যদিও চীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করেছে তবুও পুরা-পুরি চীনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি। আমেরিকা বর্তমান চীন রাষ্ট্রের অত্যন্ত বিরোধী;

এমন কি সাং কাইশেকের নির্বাসিত চীন সরকারকে

সমর্থন করছে। কোন দেশ বর্তমান চীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করে বা তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ স্থাপন করে আমেরিকা তা চায় না। চীনের সাথে ব্যবসা করা বিষয়েও বহু বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে।

এমনি পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর চীন ভ্রমণে যাওয়া একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নিশ্চয়ই। চীন আজ কমিউনিষ্ট শাসনের অধীন; ভারতবর্ষ গণ-তান্ত্রিক শাসনের অধীন। উভয়ের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় পার্থক্য অনেকখানি। সংযুক্ত জাতি সংঘে (United Nations Organisation) কমিউনিষ্ট চীনের কোন স্থান নেই; অথচ ভারতবর্ষ সংযুক্ত জাতি সংঘের একটি বিশিষ্ট সদস্য। তা সত্ত্বেও গত ক'বছর যাবৎই ভারতবর্ষ চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এবং চীনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনেরও চেষ্টা করছে। অন্ততঃ ৪০ কোটি লোক চীনে বাস করে; গত হাজার বছরের মধ্যে চীনে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না; আজ তা স্থাপিত হয়েছে। কাজেই বিশ্ব রাজনীতিতে চীন আজ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। পূর্ব এশিয়ার কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে চীনকে বাদ দিয়ে তা সমাধান হয় না। অল্প কিছুদিন পূর্বে ফিলিপাইন দ্বীপের রাজধানী মেনিলা সহরে আমেরিকার অধিনায়কত্বে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া সংরক্ষণ সংস্থা (South-East Asia Defence Organisation) নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। যে সম্মেলনে এই সংস্থা স্থাপিত হয় তাতে চীন নিমন্ত্রিত হয়নি এবং নিমন্ত্রণ পেয়েও ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Indonesia) ও সিংহল যোগ দেয়নি। ইন্দোচীনের তিনটি ছোট ছোট রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যায়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে শ্যামদেশ ও ফিলিপাইন মাত্র এতে যোগ দিয়েছিল। পাকিস্থান অবশ্য গিয়েছিল, কিন্তু এই ভয়াসঙ্কসঙ্কুল দেশটীকে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার অন্তর্গত বলা কতটা সমীচীন তা বিবেচ্য। মধ্য প্রাচ্য সংরক্ষণ সংস্থা (Middle East Defence Organisation) সম্পর্কেও পাকিস্থান সমান উৎসাহী। কাজেই এই দেশটীকে কোন্ দলের মধ্যে ফেলা যায় তা সন্দেহের বিষয়।

পণ্ডিতজীর চীন ভ্রমণের মধ্যে এশিয়ার সংহতি স্থাপনের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা আমরা জানিনা তবে পণ্ডিতজীর অথবা ভারতের ইদানীংকার আন্তর্জাতিক নীতির মধ্যেই এশিয়ার সংহতি স্থাপনের চেষ্টা আছে একথা অনুমান করা যায়। এবং চীনের প্রতি ভারতের যে বর্তমান নীতি তারও একটী অনিবার্য ফল এশিয়ার সংহতি স্থাপন। পণ্ডিতজীর এই চীন ভ্রমণের ফলেও এশিয়ার সংহতির উপর একটা বিশেষ জোর পড়বে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এশিয়া এতদিন সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় জাতির অধীন ছিল। চীন নামে মাত্র স্বাধীন ছিল; কার্যতঃ চীন ও ইউরোপীয় জাতি সমূহের অধীন ছিল—অন্ততঃ

আর্থিক ব্যাপারে। গত বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া হতে ইউরোপের রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপ পাচ্ছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন ও পরাজিত জাপানের উপর হতে ইউরোপীয় প্রাধান্য লোপ পাওয়ায় ভারতের চেষ্টা সর্বত্র সুবিদিত। চাংকাইশেক-সরকারের আমলে চীন বস্তুত পাশ্চাত্যের কর্তৃত্বের অধীনেই ছিল। এই নূতন সরকার এসে চীন থেকে পাশ্চাত্য আধিপত্য লোপ করিয়েছে। চীনের বর্তমান সরকারকে কমিউনিষ্ট বলা হয় এবং হয়ত এ বিশেষণ অসঙ্গত নয়। কিন্তু চীন সরকারকে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট বলে অভিহিত করলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। কমিউনিজমের প্রতি এদের অনুরাগ যতটা চীনের জাতীয়-সত্তার প্রতি অনুরাগ তার চেয়ে কম নয়। রুশের সংগে চীনের মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের কথা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু চীনের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বাধীনতা এই মৈত্রীর নিকট বিসর্জন দিতে বর্তমান চীন সরকার কখনও রাজী হবে না। বৃটেনের শ্রমিক দলের নেতা এট্‌লী কয়েকজন শ্রমিক সদস্য সহ চীন ভ্রমণ করে বলেছেন যে বর্তমান চীন সরকার কমিউনিষ্ট হলেও চীনের জাতীয় সত্তায় বিশ্বাসী। চীন বা ভারতের জাতীয়তাবাদ কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না যদি এশিয়া হতে বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হতে পাশ্চাত্য আধিপত্য সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত না হয়। পণ্ডিত নেহরুর চীন ভ্রমণের অন্যতম ফল হচ্ছে এশিয়ার বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় সত্তার প্রতিষ্ঠার দাবী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন জাতির মনে কমিউনিষ্ট অনুপ্রবেশের ভীতি আছে। সে ভীতি হয়ত সম্পূর্ণ অমূলক নয়। এই অঞ্চলে কমিউনিষ্ট অনুপ্রবেশ চীনের সহায়তা বা উস্কানি ভিন্ন খুব সহজ নয়। চীনের পক্ষেও আমেরিকার ভীতি ভাববার বিষয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন অঞ্চলে আমেরিকার কোন আধিপত্য থাকলে চীনের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগের কারণ ঘটে। এর প্রতিরোধের জন্যই বিভিন্ন দেশে কমিউনিষ্ট প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি নেহরুর সংগে আলোচনার ফলে এই বিষ-চক্রের কোন প্রতিবিধান ঘটে তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাব আসবে। সমগ্র বিশ্বের শান্তির প্রশ্ন এর সংগে জড়িত আছে। চীন ও এশিয়ার সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগের সামনে এই অঞ্চলে আমেরিকা তার প্রভাব বিস্তার করতে অনেকটা সংকুচিত হবে এবং চীনও হয়ত এই অঞ্চলে কমিউনিষ্ট অনুপ্রবেশের বিস্তারের চেষ্টা থেকে বিরত হবে। চীনের আজ প্রধান চেষ্টা হল তার উন্নয়ন কাজ। কোরিয়া বা ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে গেলেই সে কাজে বাধা পড়ে। তাই আমরা আশাকরি নেহরুর চীন ভ্রমণের ফলে দঃ পূঃ এশিয়ার নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি রক্ষার চেষ্টা অনেকটা সহজ হবে।

সুয়েজ প্রণালী—

অনেক আলোচনা ও তর্ক কষাকষির পর বৃটেন সুয়েজ প্রণালী থেকে নিজের সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হয়েছে। সুয়েজ প্রণালীর সাথে অনেক রাজনীতি জড়িত আছে। নেপোলিয়ান সর্বপ্রথম মিশরের বিশেষত্বের প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতির পক্ষে মিশরের উপর আধিপত্য করা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তা নেপোলিয়ানই প্রথম অনুভব করেন। নেপোলিয়নেরই অনুরক্ত এবং কতকটা তাঁর শিষ্য এ্যালবেনীয়াবাসী ভাগ্যান্বেষী মহম্মদ আলী (Mehemet Ali) মিশরে আধুনিক ধরণের রাষ্ট্র স্থাপনে চেষ্টা করেন। ১৮৫৯ খৃঃ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার লেসেপস্ (Lesseps) সুয়েজ খাল কাটেন। এই সময়ে মিশরে ফরাসী প্রভাব ও সংস্কৃতিই বিশেষ চালু ছিল। কিন্তু সুয়েজখাল অন্ততঃ ১৮৭৭ খৃঃ থেকে ইংরেজেরই অধিকারে আছে, এবং মিশরও দীর্ঘকাল ইংরেজেরই ভাবে ছিল। সাম্রাজ্যিক ব্যাপারে ইংরেজের বুদ্ধির নিকট ইউরোপের অন্যান্য জাতি বরাবরই হার মেনেছে। মিশর প্রণালীর উপর ইংরেজের অধিকার তারই একটি দৃষ্টান্ত। মিশরের রাজার (Khedive) অংশ ১৮৭৫ সালে ইংরেজ কিনে নেয়; বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি (Disraeli) সুয়েজ খাল ও মিশর সম্বন্ধে

ইংরাজী ছিলেন। এর পর যখন বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরে মিশর কার্যতঃ বৃটেনের অধিকারেই ছিল।

১৯২২ সাল থেকে বৃটেন ধীরে ধীরে মিশর থেকে সরতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত খাস মিশরে কোন ইংরেজ সৈন্য থাকে নি। ১৯৩৬ সালে যে সন্ধি হয়—তাতে মিশরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর—খাস মিশর থেকে ইংরেজের সব সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সুয়েজ খালের আশে পাশে ইংরেজের সৈন্য রয়ে গেল। ইংরেজের প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য সুয়েজখালের আশেপাশে ছিল। সুয়েজ-খালের উপর ইংরেজের প্রভাব রাখার বিশেষ কারণ ছিল ভারতবর্ষের উপর—তার সাম্রাজ্যিক অধিকার রক্ষা করা। নেপোলিয়ান যখন মিশর জয়ের চেষ্টা করেন তখনও তাঁর অভিসন্ধি ছিল ভারত আক্রমণের রাস্তা সুগম করা, যদিও তখন পর্যন্ত সুয়েজখাল কাটা হয়নি।

সুয়েজখাল কাটার পর ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার রাস্তা অথবা সমস্ত প্রাচ্যে আসার রাস্তা অনেক সহজ হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হতে ইংরেজ সরে গেল; কিন্তু তবুও প্রাচ্য অঞ্চলে তার সাম্রাজ্যিক ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ রয়ে গেল। তাই সুয়েজ খালের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখা বৃটেন প্রয়োজনীয় বলে মনে করছিল। মিশরের পক্ষে সুয়েজ খালের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব জাতীয় সম্মানের প্রতীক। ভারতবর্ষের পক্ষে পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া যেমনি জাতীয় সম্মানের হানিকর বলে বিবেচিত হয়—তেমনি সুয়েজের উপর বিদেশী অধিকার মিশরীয়গণ তাদের জাতীয় সত্তার অবমাননাকর বলে মনে করে। তাই সুয়েজখাল নিয়ে মিশরে বার বারই আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলছিল। প্রায় তিন বছর পূর্বে মিশরের রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করে যেতে হল—তারও মূলে অনেকটা—সুয়েজখালের বিষয়ে ইংরেজের প্রতি তার কোমল মনোভাব। ইংরেজ যদিও একটা ক্রমেই বুঝছিল যে সুয়েজখালের পূর্বের প্রয়োজনীয়তা আর নেই তবুও এই খালের উপর তার আধিপত্য ছেড়ে দিতে রাজী হতে পারছিলনা। সে তখন, সাম্রাজ্যিক অভিলাষ মনে যতটাই থাক, মুখে অনেক ভাল কথাই বলে সাফাই দিচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই চার্চিল বলেছিলেন সুয়েজ খালের সমস্ত বোঝা ইংরেজের পক্ষে বহন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসাবেই বৃটেন তা বহন করছে। চার্চিল বলেন বিশ্বের ব্যবসা বাণিজ্যের অভিভাবক ও সেবক হিসাবে বৃটেন ওখানে আছে (We are there as servants and guardians of the commerce of the world)। এমনি নানা আজিলায় বহুদিন পর্যন্ত সুয়েজের উপরে বৃটেন তার আধিপত্য বজায় রাখছিল। কিন্তু মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনি সঙ্গীন হয়ে উঠল, সুয়েজের উপর তার আধিপত্য আর রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। গত জুলাই মাসে চার্চিল হঠাৎ ঘোষণা করলেন—হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের পর সুয়েজখালের আর বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা থাকল না। তাই তখন বৃটেন সুয়েজখাল থেকে নিজের সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হল।

২০শে অক্টোবর এই মর্মে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ধারা অনুসারে আগামী ২০ মাসের মধ্যে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হবে। ১৯৩৬ সালে উভয় দেশের মধ্যে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং যার বলে সুয়েজ-খালে এতদিন বৃটিশ সৈন্য অবস্থান করছিল সেই সন্ধিরও অবসান হল। নূতন চুক্তির একটা সর্তে বলা হয়েছে যে যদি কোন বৈদেশিক শক্তি ঐ অঞ্চলে হামলা করে তবে ইংরেজ সৈন্যকে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ চালাবার জন্য কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা মিশর দিবে। উভয় রাষ্ট্র এও স্বীকার করে নিয়েছে—সুয়েজখাল একটি আন্তর্জাতিক যাতা-য়াতের প্রণালী এবং এতে সর্বদেশের জাহাজের গতিবিধির অবাধ অধিকার থাকবে। ৭ বছর পর্যন্ত এই চুক্তি চালু থাকবে এবং এই বছর পর্যন্ত ওখানে ইংরেজের যে সব কলকব্জা ও সম্পত্তি আছে তা ইংরেজের অধিকারেই থাকবে।

মোটের উপর বলা চলে এই চুক্তির বলে মিশর তার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল এবং এশিয়া ও আফ্রিকার

উপর ইউরোপের আধিপত্যের আর একটি চিহ্ন অপসারিত হল।

ভারতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ইংরেজ ভারতবর্ষ হ'তে তার শাসন ও অধিকার অপসারিত করল। ইংরেজ চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ—অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে এরা চলতে পারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্যান্য স্থানেও তাদের চরিত্রের এই বিশেষত্ব দেখা গিয়েছে। অনেকটা চরিত্রগত এই গুণের জন্যেই ইংরেজরা একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী হয়েও বিশ্বের সর্বপ্রধান জাতি হয়ে উঠেছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজরা বুঝতে পারল যে দূরপ্রসারী সাম্রাজ্য রক্ষা করা আজকালকার দিনে সম্ভব নয়। তাই ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ হতে এরা সহজেই সরে পড়ল। কিন্তু ফরাসী ও পর্তুগীজগণ এই দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারল না।

ফ্রান্সের শেষ রাজবংশ বুর্বোঁ (Bourbon) সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে তারা পুরানো কোন কথা ভোলেনা এবং নূতন কোন কথাও শেখেনা (They don't forget anything old nor do they learn anything new)। হয়ত এই প্রবাদকথা কেবল তাদের রাজবংশের চরিত্রের পরিচায়ক নয়, সমস্ত ফরাসী জাতীর চরিত্রেরই পরিচায়ক। ভারতবর্ষে কয়েকটি ছোট অঞ্চলে ফরাসীদের অধিকার আছে। তন্মধ্যে কলকাতার নিকটবর্তী চন্দননগর ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত পণ্ডিচারী মাহে, য়ানোন (Yanon) ও কারিকাল এতদিন পর্যন্ত ফরাসী শাসনেই ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এই কয়টি অঞ্চল ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করার বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল।

১৯৪৮ সালের জুন মাসে ফ্রান্স এই কয়টি সহরকে হস্তান্তরিত করার নীতি একরকম স্বীকার করে নেয়। তখন কথা হয় এর প্রত্যেকটি সহরে আলাদা ভাবে জনমত গ্রহণ করে ভারত সরকারের হাতে এদের সমর্পণের বিষয় নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু জনমত গ্রহণ বা Referendumএর নানা বাধা উঠতে লাগল। এমন অভিযোগও বহুবার হয়েছে যে ফরাসী সরকারের সামরিক কর্মচারীরাও জনমত গ্রহণে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ওতানির পক্ষে রায় দিয়েছে। এ ৬ বছর এ সমস্যার কোনই মীমাংসা হয়নি। যে সামান্য ভূখণ্ড ফ্রান্সের হাতে ছিল তাতে যে ফ্রান্সের বিশেষ কোন আর্থিক লাভ হচ্ছিল, তা বলা চলে না।

ফরাসী অধিকৃত চার সমূহের মধ্যে পণ্ডিচারীই সব থেকে বড় এবং ফরাসী অধিকৃত ভারতের রাজধানী। পণ্ডিচারী একটা সহর নয়—১২, ১৩টা ছোট বড়লে বিভক্ত—এক অংশ থেকে আর এক অংশে যেতে হলে, ভারতবর্ষের ভিতর দিয়ে না গিয়ে উপায় নেই। ডাক, রেলওয়ে, খাদ্য সরবরাহ, কয়লা প্রভৃতি বহু ব্যাপারে, পণ্ডিচারী ভারতবর্ষের বদান্যতার উপর নির্ভর করত। মাহে, কারিকাল ও ইয়ানোন অতি ক্ষুদ্র স্থান; এদের সহর না বলে গ্রাম বলাই উচিত। এরাও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করত। এই সামান্য কয়টুকরা স্থানের জন্য ফ্রান্সকে বেশ কিছু ঝামেলা পোহাতে হত। সামরিক সরঞ্জাম ও সৈন্য ওখানে রাখতে হত এবং বছর বছর কিছু আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হত। তাছাড়া এই ব্যাপার নিয়ে ভারতবর্ষের সংগে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সম্পর্কও তিক্ত হচ্ছিল।

কয়েকমাস পূর্বে ফ্রান্সের নূতন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হল মেঁদেস্ ফ্রান্স (Mendes-France)। ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই তিনি একটা নূতন রাস্তা গ্রহণ করলেন। তাঁরই আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে ইন্দো-চীনের যুদ্ধ বন্ধ হল এবং ফ্রান্স একটা অত্যন্ত বিপদ জনক ও অস্বস্তিকর অবস্থা হতে অব্যাহতি পেল। উত্তর-আফ্রিকাতে ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চল সম্বন্ধেও তিনি নূতন নীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর এই নীতির অন্যতম ফল হল ভারতবর্ষের অন্তর্গত ওই কয়টি ক্ষুদ্র স্থান থেকে ফরাসী অধিকারের বিলোপ।

গত প্রায় ছমাস যাবৎ ভারত সরকারের সংগে ফরাসী সরকার এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। শাসনতান্ত্রিক নানা খুঁটিনাটির আলোচনায় অনেক সময় লেগেছে। শেষ পর্যন্ত ওই সব বিষয়ে মীমাংসা হবার পর সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনতার সম্মতি নেওয়া হবে। ওই চারটি সহরের মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত সভ্য এবং ফ্রান্সের আইন সভার নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য-দের মত গ্রহণ করা হবে। পণ্ডিচারি থেকে কয়েক মাইল

দুবে কিছুদিন পরে প্রায় নির্বাচিত সদস্যদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ১৭৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৭০ জন ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার মত দেয়; মাত্র ৮জন এর বিরোধিতা করে। ভোট গ্রহণের পর সত্যাগ্রহ ও পণ্ডিচেরীর জনতা খুব আনন্দ উৎসব করে। তার তিনদিন পর ভারতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। ১লা নভেম্বর হতে ফরাসী অধিকৃত ওই ৫টি শহর কার্যতঃ (de-facto) ভারতের সঙ্গে মিলিত হবে আইনতঃ (de-jure) মিলন হতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু ১লা নভেম্বর থেকে ফরাসী শাসন ভারত থেকে লোপ পেল।

ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা সম্বন্ধে ভারত সরকার তার সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এছাড়া স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের মধ্যে আর যা আছে তা সবই শাসনতান্ত্রিক খুঁটিনাটি ও আন্তঃকালীন ব্যবস্থার বিষয়ে। সমগ্র ফরাসীঅধিকৃত অঞ্চল, পরিমাণে হবে ১৯৬ বর্গমাইল এবং এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৩,২১,০০০। প্রায় পঞ্চাশই শ বছরের ফরাসী শাসন এই চুক্তির বলে লোপ পেল।

ফরাসী ও পর্টুগীজ অধিকৃত অঞ্চল সম্বন্ধে বহু ইতঃ ও অধৈর্য এই কয় বৎসরে স্বভাবতই নানা মহল হতে প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্সের অনুমতি ব্যতীত এক-তরফা (Unilateral) ব্যবস্থা দিয়ে এই কয়টি অঞ্চল দখল করা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ কঠিন ছিল না। সামরিক শক্তি প্রয়োগের কথা আমরা নোটেই তুলছি না এই প্রসঙ্গে; অর্থ নৈতিক বিধিনিষেধ দিয়েও ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের শাসন অত্যন্ত কঠিন করে তোলা ভারতবর্ষের পক্ষেও খুবই সহজ ছিল। কিন্তু শান্তিপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্মতির পথই হল ভারতের আন্তর্জাতিক নীতির গোড়ার কথা। তাই ভারত সরকার অধৈর্য হননি এবং তার ধৈর্যের ও রাষ্ট্রনীতির সুফল ভারত পেয়েছে। আশা করা যায় ফ্রান্সের সংগে ভারতের মৈত্রী ও সৌহার্দ্য শুধু অব্যাহতই থাকবে না বরং বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রসঙ্গে পর্টুগীজ অধিকৃত কয়েকটি অঞ্চল সম্বন্ধে আমরা আজও আশা রাখি এই পথেই তার সমাধান হবে। আমরা জানি গোয়া ও পর্টুগালের অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চল সমূহ সম্বন্ধে ভারতের জনমত আজ অত্যন্ত তীব্র এবং প্রায় অধৈর্য। আমরা এও জানি পর্টুগাল বরাবরই একটি প্রতিক্রিয়াশীল দেশ এবং সভ্যতার গণ্ডীর প্রায় বাইরে এবং পর্টুগালের ইতিহাসে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছাপ খুবই কম। বর্বর দুর্বৃত্ততা ও জলদস্যুতা এদের ইতিহাসের বড় কথা। তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারত থেকে পর্টুগালকেও সরে যেতে হবে। এ সম্বন্ধে আর একটি অঞ্চলের কথাও উল্লেখ করতে হয়। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্তি থেকেও ঠিক যেন পুরোপুরি ভারতের অঙ্গ ছিল না। বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা (External Affairs and Defence) ভিন্ন আর প্রায় সব বিষয়েই কাশ্মীর ভারতবর্ষের বাইরে ছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে কাশ্মীরের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Integration) এতদিন না হওয়াতে বহু তিক্ত কথা পার্লামেন্টে ও অন্যান্য স্থানে উচ্চারিত হয়েছে। ইদানীং কয়েকমাস পূর্বে কাশ্মীরের ভারতের সহিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সাধিত হয় এবং সেই অনুসারে এক আইন পার্লামেন্ট তিনমাস পূর্বে গ্রহণ করেছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় ভারতের সংহতি ব্যাহত হয়েছিল। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হল, ছয়শতের উপর দেশীয় রাজ্যকে ইংরেজরা যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়ে গেল; ভারতে ফরাসী ও পর্টুগীজ অধিকৃত অঞ্চল তখনও রয়ে গেল। ইংরেজ সরকারের ভারত ত্যাগের প্রস্তাব গ্রহণ করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪৬ সালের জুন মাসে যে প্রস্তাব পাশ করে তাতে বলা হয় ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস, নদী ও পাহাড় পর্বত ভারতকে একটা সংহত দেশ করে গড়েছে। এসব একেবারে ব্যর্থ হবে একথা সহজে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। দেশীয় রাজ্যসমূহ লোপ পেয়েছে এবং আজ তা সবই ভারতের অন্তর্ভুক্ত; কাশ্মীর আজ ভারতবর্ষের সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত; ভারত থেকে ফরাসী শাসনও লোপ পেল। এ সবই ভারতের ইতিহাস, ভূগোল নদী ও পাহাড় পর্বতের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের সংহতি জ্ঞাপন করছে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

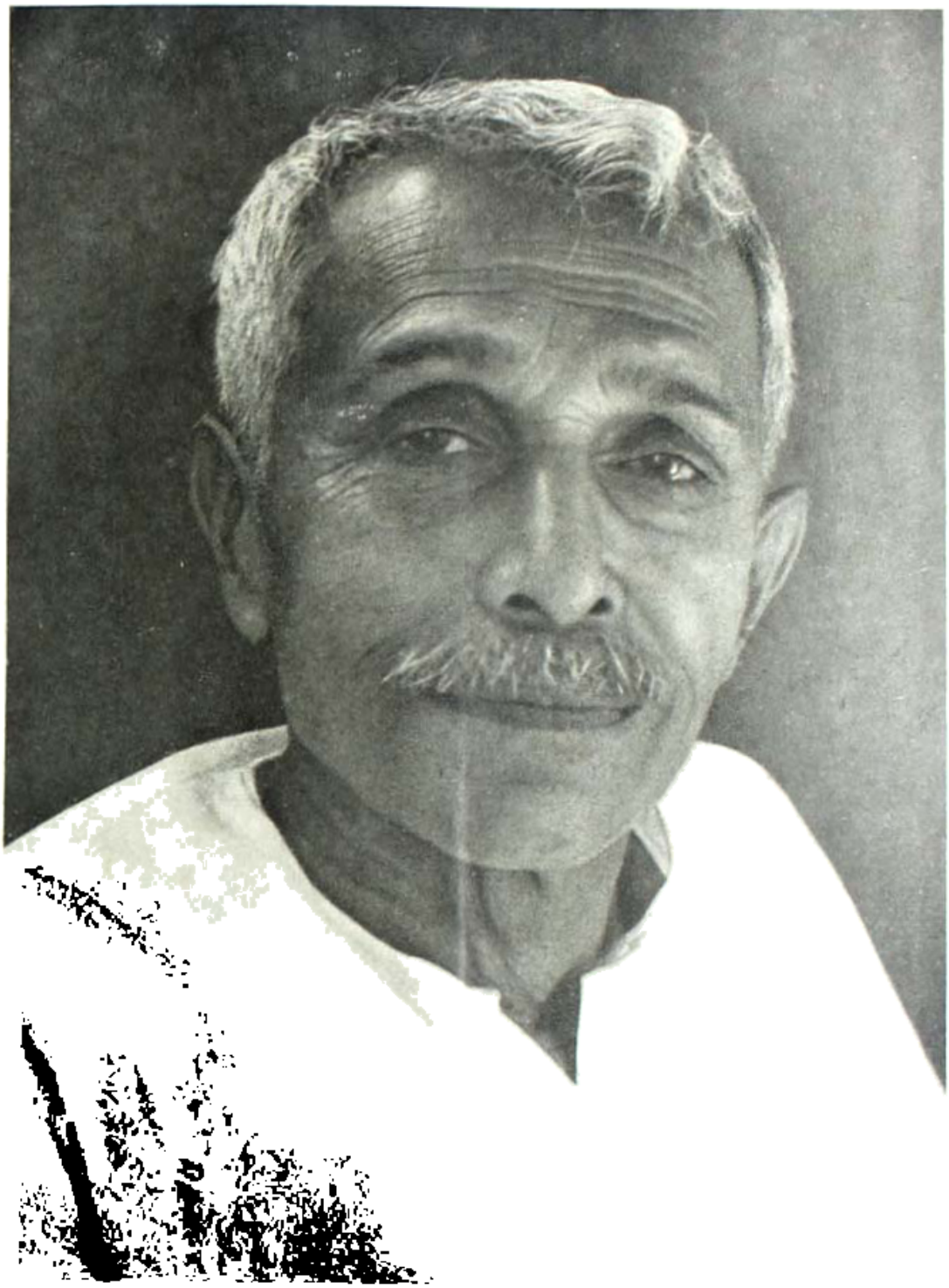

আমাদের কিরণদা

তিরোভাব ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সপ্তদশ বর্ষ অগ্রহায়ণ—১৩৬১ অষ্টম সংখ্যা

পুনর্গঠনে আমাদের সাফল্য

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনার সফলতা বিফলতা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য সর্বদা তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজন হয়। অজনিরপেক্ষ বিচারে কোন-কিছুকেই সফল বলে দাবী করা চলে না। সুতরাং ভারতের পুনর্গঠনের কাজ কতখানি সফল হল এবং সংবিধানের ভূমিকায় সন্নিবদ্ধ আদর্শই বা কতটা বাস্তবে রূপায়িত হল তা বুঝতে হবে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা। আমরা হামেশাই শুনতে পাই—অমুক অমুক দেশ পুনর্গঠনের কাজে আমাদের চেয়ে বেশী সফল হয়েছে। এরূপ তুলনা যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে করা হয় তবে নিশ্চয়ই গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনার যোগ্য। গত পাঁচ বৎসরে ভারতের পুনর্গঠনের কাজ কতখানি সফল হয়েছে তা তুলনামূলক বিচারের পটভূমিকায় পরীক্ষা করা যাক।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং এখানে প্রথম বিচার্য বিষয় হবে, স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার জনগণের অবস্থার কতখানি উন্নতি করতে পেরেছে, তাদের জীবনযাত্রার পথ পূর্বের চেয়ে কতখানি সহজ ও সুগম করতে পেরেছে। সাধারণ মানুষ প্রধানতঃ অন্নবস্ত্রের সমস্যায় পীড়িত। সুতরাং প্রথমতঃ দেখা যাক এই দুটি ক্ষেত্রে আমাদের সরকার মানুষের কতখানি উপকার করতে পেরেছে।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ভারতকে সংকট-জনক খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সেই সংকটজনক অবস্থা কয়েক বৎসর ধরেই চলতে থাকলো। তখন যে অনিবার্য দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাকে ঠেকিয়ে রাখা একটা নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ কথা গৌরবের সঙ্গেই বলা যায় যে, আমাদের জাতীয় সরকার তখন একটি লোককেও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেয় নি। ১৯৪৩ সালে বাংলার যে দুর্ভিক্ষ ৪০ লক্ষ লোককে মৃত্যুর গহ্বরে পাঠিয়েছিল তারই স্মৃতি এই সময়ে লোকের মনে বিভীষিকা জাগাচ্ছিল।

তারপর কয়েক বৎসর ধরে আমাদের খাদ্যাবস্থার উন্নতির জন্য একটা সুসংকল্প নিয়ে বিরাট প্রচেষ্টা চলেছে। খাদ্যে স্বাবলম্বন যেন সরকারের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। এমন কি দেশ বিভাগের পূর্বেও বহু বৎসর ধরেই ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বাবলম্বী ছিল না। দেশ বিভাগ ভারতকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত ও সেচব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চল থেকে বঞ্চিত করলো। ফলে ভারতের খাদ্যাবস্থা আরও বেশী

অভিহিত হয়ে উঠলো। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করে তোলার সংকল্পকে সাধারণতঃ ধামা ধরেই গণ্য করা হল। এরূপ প্রতিকূল সমালোচনার নিরুৎসাহ হয়ে সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকলো এবং তার ফলে আজ—এমন কি নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই—ভারত খাদ্যে প্রায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এই সফলতা কেমন করে সম্ভব হল? অনেকে সমালোচক বলবেন, ভাগ্যক্রমে পর পর দুই বৎসর সুবৃষ্টি হবার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি আমরা অকৃতজ্ঞ হতে চাই না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রায় অসম্ভব কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টাকেও ছোট ক'রে দেখা উচিত নয়।

বহুনিন্দিত কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরেই ৮ লক্ষ একার অনাবাদী জমি চাষ করেছে এবং ঐ একই সময়ে রাজ্য ট্রাক্টর সংস্থা করেছে ১২ লক্ষ একার। ভারত স্বাধীন হবার পর এ পর্যন্ত আমরা ৩ কোটি একার অনাবাদী জমি চাষ করেছি; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পরই করেছি ২ কোটি একার এবং এর বেশীর ভাগই করেছে চাষীরা সরকারী উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে, বিশেষ ক'রে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে। প্রধান ফসল যথা, চাউল গম, ইক্ষু, তুলা, পাট ও তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ২৯ কোটি ৭৫ লক্ষ একার জমি চাষ করা, কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই এর জন্য আমরা চাষ করেছি ৩০ কোটি ৯৯ লক্ষ একার অর্থাৎ পঞ্চম বৎসরের লক্ষ্যের চেয়েও এক কোটি ২৪ লক্ষ একার বেশী।

অধিকতর জমি চাষ করা ছাড়াও একার প্রতি অধিকতর ফসল উৎপাদনেরও চেষ্টা হয়েছে। এই কয়েক বৎসরে আমরা ৭০০০ নলকূপ খনন করেছি, প্রতিটি নলকূপের দ্বারা ৪০০ একার অধিক জমির সেচের ব্যবস্থা এবং তাতে ৬০ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। সরকার বহুল পরিমাণ সারও উৎপন্ন করেছে, সেচের জন্য ১৪ ০০০০টি সাধারণ কূপের সংস্কার করেছে, ১১০০০ পুকুর সংস্কার করেছে এবং ৩৪০০০ অন্যান্য (পাম্পিঙ্গান হইল) স্থাপন করেছে।

এই সমস্তের সমষ্টিগত ফল খাদ্যসংকট উত্তীর্ণ হ'তে আমাদের সাহায্য করেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের সর্বপ্রকার খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই উৎপন্ন হয়েছে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টন, অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ লক্ষ্যের চেয়েও ৩০ লক্ষ টন অধিক উৎপন্ন হয়েছে। চাউলে আমরা তৃতীয় বৎসরেই লক্ষ্যে পৌঁছেছি—লক্ষ্য ছিল দুই কোটি ৭২ লক্ষ টন, উৎপন্ন হয়েছে দুই কোটি ৭১ লক্ষ টন। গম আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যের চেয়ে ১০ লক্ষ টন কম উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য খাদ্যশস্য লক্ষ্যের চেয়ে ৪০ লক্ষ টন অধিক উৎপন্ন হয়েছে। তারপর অন্যান্য ফসলের বেলায়—তুলার লক্ষ্য ছিল ৪'১৭ লক্ষ বেল, ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপন্ন হয়েছে ৩'১৪ লক্ষ বেল; পাটের লক্ষ্য ছিল ৫৩ লক্ষ ৭০ হাজার বেল, ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপন্ন হয়েছে ৪৬ লক্ষ বেলের উপর, অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরেই আমরা প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিলাম। তারপরে অবশ্য পাট উৎপাদনে আমাদের কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে হঠাৎ দাম পড়ে যাবার ফলে এবং হয়তো কাঁচা পাট সরবরাহে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তির জন্য পরিবর্তিত নীতির ফলে। ইক্ষু উৎপাদনে ১৯৫২-৫৩ সালেই আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছেছিলাম, কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রতিকূল জলবায়ুবশতঃ কিছুটা কম উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ইক্ষুর উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে যাবার ফলে চিনির উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে চিনির ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে জনপ্রতি চিনির ব্যবহার ছিল ৫৯ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালে হয়েছে ১০ পাউণ্ড। এই অতিরিক্ত চিনি বাইরে থেকে আমদানি

করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের চিনির ব্যবহারের লক্ষ্য ছিল জনপ্রতি ৮·৭ পাউণ্ড এবং সে লক্ষ্য আমরা ছাড়িয়ে গেছি।

খাদ্যের পরেই আমাদের বস্ত্রের অবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বস্ত্রনিম্নে ১৯৫০ সাল থেকে প্রতি বৎসরেই আমরা অধিকতর উৎপন্ন করতে পেরেছি। এ কথা নিম্নের সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে। (দশ লক্ষ গজ হিসাবে সংখ্যা)

	কলে প্রস্তুত	হস্তচালিত তাঁতে	বিদ্যুৎচালিত তাঁতে
১৯৫০	৩,৬৬৪	৮০৪	১৪৮
১৯৫১	৪,০৭৬	৮৪৩	১৫০
১৯৫২	৪,৫৯৯	১,১০৮	২০৪
১৯৫৩	৪,৮৭৯	১২০০	২২০
১৯৫৪	২,৫১০	৪৪১	১০০
	(জুন পর্যন্ত)	(মে পর্যন্ত)	(মে পর্যন্ত)

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব ধরে এবং যে বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়েছে তা বাদ দিয়ে ১৯৫৩-৫৪ সালে জনপ্রতি বস্ত্র প্রাপ্তব্য হয়েছে ১৪·৭ গজ—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পঞ্চম বৎসরের লক্ষ্য ছিল ১৫ গজ। সুতরাং তৃতীয় বৎসরেই আমরা পঞ্চম বৎসরের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি বলা চলে। উপরের সংখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কলে প্রস্তুত বস্ত্রের লক্ষ্য ছিল ৯৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ অধিক উৎপন্ন করা, এবং সে লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে গেছি ১৯৫৩ সালের মধ্যেই। অধিকতর বস্ত্র ও চিনি ব্যবহারের পরিসংস্থান থেকে এ কথা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং তাদের ক্রয়শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিমেন্ট, সার প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গেছি। কেবল একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শিল্পজাত পণ্য, লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে আমরা সন্তোষজনক উন্নতি করতে পারি নি, নতুন কারখানা স্থাপনে বিলম্বের জন্য। বিদ্যুতের ব্যাপারে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যতালিকা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হয়েছি। পঞ্চম বৎসরের লক্ষ্য ছিল ১২ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রাদি স্থাপন—আমরা ইতিমধ্যেই ৭ লক্ষ বা ততোধিক কিলোওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

সমাজ-উন্নয়নের কাজে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে—যথা রাস্তা নির্মাণে, হাসপাতাল ও নতুন নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে আমরা অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছি। এতকালের অবহেলিত পল্লী-অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়নের কাজ যে প্রসারলাভ করছে এ কথার সাক্ষ্য দেবে বেশীর ভাগ রাজ্যের পল্লীবাসীগণই। সমাজ-উন্নয়ন সংস্থা এবং জাতীয় সেবামূলক সংগঠন এখন আমাদের পল্লীবাসীগণের এক-অষ্টমাংশের মধ্যে কাজ করছে। আগামী দুই বৎসরে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ১২০০০০ গ্রামে ও ৭ ৪ কোটি লোকের মধ্যে, অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ গ্রামে ও এক-চতুর্থাংশ লোকের মধ্যে এই কর্মতালিকা প্রসারিত করা। এই কর্মসূচী যে পল্লী-উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ফল দেবে সে কথা পল্লীবাসীগণও উৎসাহ সহকারে স্বীকার করে নিয়েছে। এই কাজে গত দুই বৎসরে সরকার যেখানে ৩৩৬ কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে, সেখানে পল্লীবাসীগণ নগদ টাকা, জিনিষপত্র ও শারীরিক শ্রমে স্বেচ্ছায় ১২৪ কোটি টাকা প্রদান করেছে—এতেই তাদের একাজে উৎসাহের প্রমাণ মেলে। পল্লী অঞ্চলে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১৮০০০ মাত্র, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০০০ ডাকঘর। জনগণের অবস্থার উন্নয়নে এগুলি সুনিশ্চিত সাফল্যের পরিচয়।

এখন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দেখা যাক। প্রথমেই বলে রাখি যে দুনিয়ার এই ধরণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হয় সোভিয়েট-রাশিয়ার প্রথম এর পূর্বে হাতে-কলমে পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভের কোনো

সুযোগ তাদের ছিল না। অধিকন্তু, ভারতের চেয়ে বোধ হয় অধিকতর প্রতিকূল পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদেরও কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছিল—দেশ বিভাগের ফলে, প্রায় এক কোটি বাস্তুচ্যুতের সমস্যার ভারে এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি-জনিত অন্যান্য কারণে। রাশিয়ার ছিল অনায়ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, অকর্ষিত, অনাবাদী বিরাট অঞ্চল —তার জনবসতির ঘনত্বও ছিল ভারতের ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। এ সৌভাগ্য ভারতের ছিল না। অতীত থেকে এবং প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবার ফলে রাশিয়া নির্বিঘ্নে অব্যাহতগতিতে তার নতুন ইতিহাস রচনা করতে পেরেছিল; কিন্তু আমাদের ছিল ঔপনিবেশিক ও আন্তর্জাতিক সর্বপ্রকারের দায়-দায়িত্ব, যার কতকগুলি আমাদের চলার পথে বাধা ও অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে এই তুলনামূলক হিসাব-নিকাশের পর, জনগণের হিতসাধনের কষ্টিপাথরে রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে বিচার করা যাক। তাদের পরিকল্পনার দুইটি পৃথক লক্ষ্য ছিল —প্রাথমিক এবং সর্বাধিক।

নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে তাদের লক্ষ্য ও সাফল্যের হিসাব দেওয়া গেল।

	খাদ্য শস্য দশ লক্ষ টন	চিনির বিট দশ লক্ষ টন	তুলা হাজার টন	তন্তু হাজার টন	বাঁশে দশলক্ষ টন	সুতীবস্ত্র দশ লক্ষ মিটার	পশম বস্ত্র দশ লক্ষ মিটার
১৯২৭-২৮ সালের সরকারী প্রকৃত সংখ্যা—							
১৯৩২-৩৩ সালের লক্ষ্য							
প্রাথমিক—				৪৮০		৪৩৬০	১৯২
সর্বাধিক—				৬২০		৪৭০০	২৭০
১৯৩২ সালের সরকারী প্রকৃত সংখ্যা—	৬৯·১	৬·৬	১২৭০	৪০০	২·১৪	২৭২০	৯১

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিকল্পনার পূর্বের চেয়ে ৪০ লক্ষ টন কম হয়েছে যদিও পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টন অধিক এবং সর্বাধিক লক্ষ ছিল ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টন অধিক উৎপন্ন করা। চিনির ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন তো দূরের কথা, পরিকল্পনার শেষ বৎসরেও পরিকল্পনার পূর্বের উৎপাদনের মাত্র অর্ধেকের কিছু বেশী হয়েছে। কাঁচা-তুলা উৎপাদন লক্ষ্যের অনেক নীচে এবং সুতী-বস্ত্র উৎপাদন পরিকল্পনা-পূর্বের উৎপাদনের চেয়েও নীচে নেমে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য আমাদের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর।

অবশ্য তাদের বৃহৎ মৌলিক শিল্পের (Heavy Industry) সাফল্য অনেক বেশী প্রশংসার যোগ্য। মনে হয় তারা বৃহৎ মৌলিক শিল্প ও সমর-শিল্পের দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছিল। এখানে তাদের বৃহৎ মৌলিক শিল্পের সাফল্যের সহিত আমাদের বৃহৎ মৌলিক শিল্পের সাফল্যের তুলনা করতে চাই না। তবে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আমাদের সিন্দ্রী সার তৈরীর কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা, পেরাম্বুর রেলগাড়ী তৈরীর কারখানা, সামরিক দ্রব্য তৈরীর কারখানা, গোলাবারুদ তৈরীর কারখানা, যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা, নতুন ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি সবেমাত্র স্থাপন করা হয়েছে এবং তার পুরা ফল পাওয়া যাবে পরবর্তী পরিকল্পনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। আমরা আশা করছি, এদিকে আমাদের অগ্রগতি পরবর্তী পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার কালের মধ্যেই দ্রুত ও

নজরে পড়বার মতো হবে। আমি মনে করি, আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের নিত্য-ব্যবহারোপযোগী পণ্য (consumers' goods) প্রস্তুতকে অগ্রাধিকার দেওয়া ও তার ফলে জনগণের জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তোলা এবং তারপরে জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকে মনোযোগ দেওয়া সমর্থনযোগ্য। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় আয়কে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি করা। আশা হয় ইতিমধ্যেই আমরা সে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি এবং এই পরিকল্পনাকালের শেষে সে আয় শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। যথেষ্ট জীতিউৎপাদনকারী ঘাটতি-অর্থনীতি (deficit-financing) সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে দমন করা গেছে এবং খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

আমি মনে করি, পুনর্গঠনের কাজে আমরা বাস্তবে যেটুকু করতে পেরেছি তার জন্য অথবা রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের সঙ্গে তুলনায় আমাদের দুঃখপ্রকাশ করবার কোনো কারণ নেই। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, রাশিয়ার শুধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়েই নয়, তার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলির সময়েও সেখানকার জনগণকে কী অসহনীয় দুঃখক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল এবং তা হয়েছিল সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাবে ও সেখানকার তৎকালীন অন্তর্বিধ অব্যবস্থার জন্য—ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। আমাদের দেশে কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কম উৎপাদন হলে তা বিদেশ থেকে আমদানী করে অভাব পূরণ করা হয়। কিন্তু রাশিয়ায় বিদেশ থেকে আমদানী করা প্রচলিত নীতি ছিল না এবং তা কার্যতঃ সহজও ছিল না। সাধারণতঃ কম সরবরাহ এবং কম ব্যবহারই ছিল সেখানকার ঘাটতি সমাধানের পন্থা। গত বৎসর সুপ্রিম সোভিয়েটে বক্তৃতাকালে ম্যালেনকভ রাশিয়ার কৃষি-নীতি যে সফল হয়নি তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন এবং দলের সেক্রেটারী ক্রুশ্চেভ এখন বারংবার সে বিষয়ের উল্লেখ করছেন ও কৃষি-শিল্প নীতির সংশোধন করছেন, যাতে জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভাল মাল স্বল্পমূল্যে বাজারে ছাড়া যায়। ক্রুশ্চেভ বিশেষ ক'রে উৎপন্ন মালের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে খেদ প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ার পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯২৮ সালে, আর তাঁরা জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ক'রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজতর ক'রে তুলবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন ১৯৫৩ সালে। তাঁরা অবলম্বন করেছেন সর্বাত্মক পদ্ধতি (Totalitarian method), যাতে দ্রুত ফল আশা করা যেতে পারে; কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও আছে, বিশেষ ক'রে মানুষের দুঃখক্লেশ ভোগের দিক। আমরা অনুসরণ করেছি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, যা জাতির জনক আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির চরম লক্ষ্য হিসাবে অনুসরণ করেছি জনগণের সেবার নীতি এবং মনে হয় আমরা এই গণতান্ত্রিক নীতি ও গান্ধীজির উপদেশ অনুসরণ ক'রে সন্তোষজনক সুফল পেয়েছে, জনগণকে কিছু পরিমাণ সন্তুষ্ট করতেও পেরেছি—সন্দিগ্ধচিত্ত রূঢ় সমালোচকরা যাই-ই বলুন না কেন।

কিন্তু আমরা অনুভব করি, এই সব সফলতা সম্বন্ধে জনসাধারণের কাছে সঠিকভাবে প্রচার করার একটা দায়িত্ব রয়েছে কংগ্রেসের, যে জনসাধারণকে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলি বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করছে মিথ্যা আশা দিয়ে আর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করে। অবশেষে আমি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, গান্ধীজীর পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা সুফল পেয়েছি এবং আজ আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্মুখীন হতে পারি।

মণিপুর প্রসঙ্গ (১২)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

[পূর্বানুবৃত্তি

দরবারের বিফলতা :—চিফ কমিশনারের আসার সঙ্গে সঙ্গেই রেসিডেন্সির ভিতরে স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হইল; যাহাতে দরবারের শেষে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করার সময় তিনি কোন রকমে পলাইয়া যাইতে না পারেন। ভারত সরকারের নির্দেশমত মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য মুসিক লালকে এবং একজন মণিপুরী অনুবাদকের উপর ভার দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজা কুলচন্দ্র সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ এবং অন্যান্য রাজভ্রাতা ও মন্ত্রীগণ রেসিডেন্সির বহির্দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্তও অনুবাদ কার্য্য শেষ না হওয়ায় তাঁহাদিগকে সেখানে দাঁড়া করাইয়া রাখা হইল। এইভাবে আধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। একজন দেশীয় রাজপতির পক্ষে তাঁহারই রাজ্যে অবস্থিত ইংরেজ কর্মচারীর বাড়ীর সম্মুখে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকা অত্যন্ত অমর্যাদাকর। চিফ কমিশনারের মত একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। সরকারী কর্মচারীদের এইরূপ অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যকর ব্যবহারে সাধারণ লোকের মন ও বিগড়াইয়া অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়। মণিপুরেও মহারাজা এবং তাঁহার ভাইদিগকে এইভাবে বাহিরে দাঁড়া করাইয়া না রাখিলে বিনা রক্তপাতে ইংরেজ সরকারের কাজ হাসিল হইত এবং ইংরেজ কর্মচারীদিগকেও নিজেদের কৃতকর্মের চরম ফল ভোগ করিতে হইত না।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের মন পূর্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল। রেসিডেন্সির বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকাকালে তিনি দরবার গৃহের চারিদিকে এবং অন্যত্র সশস্ত্র প্রহরীদের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। শুনা যায় কিছুদিন যাবৎ তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। সেইজন্য প্রখর রৌদ্রে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারায় আধ-ঘণ্টা পর তিনি নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। অহৌঙ্গা-ও তাঁহার অনুগমন করেন। মহারাজা এবং তাঁহার অপরাপর ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণ দুইঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকার পর রেসিডেন্সি গৃহে প্রবেশের অনুমতি পান। টিকেন্দ্রজিৎকে না দেখিয়া গ্রীমউড সাহেব তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাকে সমস্ত কথা জানান হইলে তিনি সেনাপতিকে আসিবার জন্য খবর দিতে বলেন। তাহার কথামত আয়াপুলেল টিকেন্দ্রজিতের নিকট গেলেন। প্রায় ২।০ টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন—টিকেন্দ্রজিতের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তাঁহার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। টিকেন্দ্রজিৎ অনুপস্থিত থাকায় সেদিন দরবার স্থগিত রাখিয়া মহারাজকে টিকেন্দ্রজিৎ এবং তাঁহার অন্যান্য ভাই এবং মন্ত্রীগণসহ পরদিন সকাল ৮টার সময় আসিতে বলা হইল। গ্রীমউড সাহেব একথা বিশেষভাবে জানাইয়া দিলেন যে টিকেন্দ্রজিৎকে ছাড়া দরবার হইবে না এবং ভারত সরকারের নির্দেশও প্রকাশ করা হইবে না। মহারাজা নিজে তাঁহার অন্যান্য ভাইগণের সহিত পর দিন দরবারে উপস্থিত হইবেন বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না; তবে তাঁহাকেও সঙ্গে আনিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা

করিবেন। এইভাবে সমস্ত দিন বৃথা নষ্ট করিয়া মহারাজা বেলা ৩টার সময় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

গ্রীমউড সাহেব রসিকবাবুকে সঙ্গে লইয়া সেইদিন বেলা ৪টার সময় এবং পরদিন (২৩শে মার্চ, সোমবার) ভোরে আরও একবার টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। দরবারের জন্য নির্দিষ্ট সময়েও কেহ আসিলেন না। মহারাজা লিখিয়া পাঠাইলেন—"অসুস্থতা হেতু যুবরাজ (সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ) আসিতে অক্ষম; যুবরাজ ব্যতীত আমার যাওয়া বিফল বিবেচনায় আমিও আসিলাম না। অনুগ্রহ করিয়া ভারত সরকারের নির্দেশ জানাইলে বাধিত হইব।" বেলা একটার সময় টিকেন্দ্রজিতের ভাবগতিক জানিবার জন্য রসিকবাবুকে পুনরায় পাঠান হইল। তিনি ৪টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। সেইদিন রাত্রে রেসিডেন্সিতে এক নাচে মহারাজা এবং তাহার ভাইগণ সকলেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু চিফ কমিশনার যখন বুঝিলেন টিকেন্দ্রজিৎ তাহাদের কোন ফাঁদেই পা দিবেন না তখন মিঃ গ্রীমউড, লেঃ সিমসন এবং রসিকবাবুকে সঙ্গে লইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ পত্রসহ নিজেই রাজপ্রাসাদের দরবার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমুচিত অভ্যর্থনাদির পর তিনি মহারাজের হাতে নির্দেশপত্র দিলেন। পত্রের মর্মার্থ ছিল—"ভারত গভর্ণমেণ্ট কুলচন্দ্রকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু দুর্ব্যবহারের নিমিত্ত টিকেন্দ্রজিৎকে নির্বাসিত করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বেই তাহাকে ইংরেজ কর্মচারী হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

মহারাজা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"সকল মন্ত্রীর মত ব্যতীত তিনি যুবরাজকে বন্দী করিতে অক্ষম।" মহারাজের নিকট তাঁহার (টিকেন্দ্রজিতের) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা চাওয়া হইলে একই কারণে তিনি অসম্মত হন। তখন তাঁহাকে মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আধঘণ্টা সময় দিয়া চিফ কমিশনার পুনরায় রেসিডেন্সিতে চলিয়া গেলেন। মহারাজের জরুরী আহ্বানে সকলেই আসিয়া তাঁহার বিশেষ মন্ত্রণা কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজ কেরাণী বামনবাবু কর্তৃক সরকারী আদেশ পত্রের মর্মার্থ বুঝাইয়া দেওয়ার পর মহারাজা সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বাগ্রে উঠিয়া বলিলেন—যদি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন তবে আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীগণ চিফ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়া ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। সেই অনুসারে মহারাজা চিফ কমিশনারকে লিখিলেন—"আমাকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করাতে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ এখন অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহার দেশত্যাগের কথা আপনাকে লিখিব।

গ্রীমউড সাহেব রসিকবাবুর সঙ্গে তখনও দরবার গৃহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার নিকট সেই পত্র দেওয়া হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অবিলম্বে টিকেন্দ্রজিতের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিতে বলিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাকে এযাত্রা চিফ কমিশনারকে নিযুক্ত করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় খবর আসিল মহারাজের অনুরোধে টিকেন্দ্রজিৎ সওয়া পাঁচটার সময় গ্রীমউড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছেন। অনতিবিলম্বেই টিকেন্দ্রজিৎ টুলিতে চড়িয়া দরবার গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রীমউড সাহেবেরও তখন তাঁহাকে পীড়িত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে ভারত সরকারের ইচ্ছা অনুসারে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে খোলাখুলিভাবে বলিলেন—টিকেন্দ্রজিৎ—মণিপুর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশের এইভাবে হস্তক্ষেপের অধিকার, কোথায় তাঁহার অপরাধ,

ইত্যাদি ঐতিহ্যগত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এবং মণিপুরে তাঁহার জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ইংরেজ সরকারকে এই অনিষ্টকর কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। অবশেষে বলিলেন—যদি নিতান্তই তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হয় তবে মহারাজা এবং মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অনুসারে সুস্থ হওয়ার পর তিনি নিজেই যাইয়া ইংরেজের নিকট ধরা দিবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর গ্রীমউড সাহেব রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসেন।

গ্রীমউড সাহেব চলিয়া আসার পর রেসিডেন্সী হইতে ঘোষণা করে ঘর দেওয়া হইল "কাল প্রাতে কমিশনার সাহেব রওয়ানা হইবেন—তাঁহার জিনিষপত্র বহিবার জন্য কুলির দরকার।" ইহা দ্বারা যুকানর চেষ্টা হইল পূর্বে যে ঠিক কমিশনারের টামু যাইবার কথা বলা হইয়াছিল, ২৪শে তারিখ যেন তাহাই হইবে। এইভাবে বুদ্ধিমান টিকেন্দ্রজিতের চোখে ধুলা দেওয়া সম্ভব হইল না। ঠিককমিশনারের আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই গোলযোগের আশঙ্কায় তাঁহার আদেশে রাজ্যের সমস্ত অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় রসদাদি রাজপ্রাসাদের ভিতরে মজুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। গ্রীমউড সাহেব গোপনে খবর পাইয়াছিলেন - টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার বাড়ীর চারিদিকে খাটোরের মধ্যে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন। সুতরাং বলপূর্বক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিলে যে প্রবল বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে একথা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। মণিপুরী সৈন্যগণ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবে এরূপ-গুজবও শোনা যাইতেছিল। সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইল। টিকেন্দ্রজিৎকে কৌশলে আপন মুঠার মধ্যে না পাওয়ায় কুইন্টন সাহেব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াই ছিলেন, তাহার উপর এইসব জনরব শুনিয়া তাহার আক্রোশের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। কোন দেশীয় লোক এইভাবে ইংরেজ কর্ম্মচারীর আদেশ অমান্য করিয়া চলিবে ইহা তাহার কল্পনারও অতীত। তিনি অবিলম্বে সামরিক কর্ম্মচারীদের এক গোপন বৈঠকে তাহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। তাহার সঙ্গে মাত্র ৪শত গুর্খা সৈন্য আসিয়াছিল, রেসিডেন্সির অধীনে সৈন্য সংখ্যাও একশতের কিছু কম ছিল; বলপ্রয়োগ করিতে গেলেই মণিপুরের রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বাধা অনিবার্য, সুতরাং এই অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে কিনা প্রশ্ন উঠিলে—একজন অফিসার বলিলেন শিলচর হইতে যে ২শত সৈন্য আসিতেছে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু কুইন্টন সাহেবের মনে ইংরেজ অফিসার কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্যের ক্ষমতার উপর অবিচলিত আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল তাহাদের এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সম্মুখে শত শত মণিপুরী সৈন্য স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। কুইন্টন সাহেব কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া শেষরাত্রে টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী চড়াও করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিলেন।

রেসিডেন্সির মণিপুরী কর্ম্মচারীগণ বিপদের আশঙ্কায় কোন ক্রমেই সেখান হইতে বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণের মধ্যে রসিক-বাবুর বাসা ছিল; তিনি নিজে যাইতে না পারিলেও পরিবারস্থ লোকজনকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। রেসিডেন্সির ডাক্তার লক্ষণপ্রসাদও তাহার পরিবার স্থানান্তরিত করেন। রাজকেরাণী বামন বাবু রাজপুরীর বহির্ভাগস্থ ঘেরার মধ্যে এক বাসায় বাস করিতেন। তিনিও যুদ্ধ অনিবার্য টের পাইয়া রাত্রি ১১টার সময় স্থানান্তরে গমন করেন। ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া এবং গুপ্তচরের সাহায্যে প্রকৃত খবর সংগ্রহ করিয়া টিকেন্দ্রজিৎও তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ ও মণিপুরের মধ্যে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে একথা রাজ্যের মধ্যে কাহারও অজানা রহিল না। আসন্ন প্রলয়ের পূর্বে চারিদিক থম থম করিতে লাগিল।

মণিপুরী সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই আশঙ্কায় সে রাত্রে রেসিডেন্সিতে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ

বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। ইংরেজের পক্ষের সৈন্যগণ রাত্রি প্রভাতের বহু পূর্বেই আদেশের অপেক্ষায় সজ্জিত হইয়া রহিল।

ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণ—

১৮৯১ সনের ২৪শে মার্চ মঙ্গলবার রাত্রি ৩½ টার সময় লেঃ ব্র্যাকেনবারি, ক্যাপ্টেন বুচার ও লেঃ মুগার্ড গুর্খা সৈন্যের দ্বারা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। সেনাপতির গৃহরক্ষী সৈনিকগণ তাহাদিগকে বাধা দেওয়ায় উভয় দলের মধ্যে গুলি ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয়। রাজপ্রাসাদ হইতেও ইংরেজ পক্ষের উপর গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রাসাদটি পাঁচসারি প্রাচীর এবং তিনদিকে গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় সেখানে প্রবেশ করা তেমন সহজসাধ্য ছিলনা। প্রচুর বন্দুক এবং গোলাবারুদ ছাড়াও মহারাজার অধীনে ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৪টি মাউন্টেনগান ছিল। কিছুক্ষণ অনবরত গুলি বর্ষণের পর সেনাপতির বাড়ীটি ইংরেজের হস্তগত হয়। টিকেন্দ্রজিৎ আগের দিন রাত্রেই সপরিবারে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা গেল না।

আক্রমণের প্রথম দিকেই লেঃ ব্র্যাকেনবারি গুরুতররূপে আহত হইয়া রেসিডেন্সির ভিতরে হাসপাতালে নীত হন। সেই দিনই মধ্য রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেনাপতির বাড়ী দখলে আসিলেও যুদ্ধ থামিল না; বরংচ' মণিপুরীদের জেদ আরও বাড়িয়া গেল। বেলা ১২টার সময় মিঃ কুইন্টন টেলিগ্রাফ অফিসে যাইয়া খবর পান তার কাটিয়া ফেলায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণিপুরের সমস্ত থানায় খবর চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং রেসিডেন্সী হইতে ভারত সরকারের নিকট খবর দেওয়ার কোন উপায়ই রহিল না। এদিকে ইংরেজ পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ফুরাইয়া আসিতেছে। রসিকবাবু বেগতিক দেখিয়া এরিংদুমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২টার পর হইতে পার্শ্ববর্তী বস্তি হইতে রেসিডেন্সির উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। ক্যাপ্টেন বইলো কয়েকজন সৈন্য সহ সেখানে যাইয়া—বস্তিগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ লাভ হইল না। সূর্য যতই পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতে লাগিল—রেসি ডেন্সির উপর আক্রমণের তীব্রতাও ততই বাড়িতে লাগিল। ৪½ টার সময় সেনাপতির বাড়ী হইতে সমস্ত সৈন্য উঠাইয়া আনিয়া রেসিডেন্সি রক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। মিঃ কুইন্টন, কর্ণেল স্কীনে ও মিঃ গ্রীনউড আহত দিগকে সঙ্গে লইয়া মাটির নীচে সুরক্ষিত কুঠরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত রেসিডেন্সিতে ইহাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করার দুরাশা ত্যাগ করিয়া তখন আত্মরক্ষার সমস্যাই বড় হইয়া দেখা দেয়। গ্রীনউড সাহেব কাছাড়ে পলাইয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মিঃ কুইন্টনের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ থামাইয়া মহারাজার সঙ্গে আপোষের আলোচনা আরম্ভ করা স্থির করিলেন। ইংরেজ পক্ষ হইতে যুদ্ধ বিরতির সঙ্কেত ঘোষিত হইল। টিকেন্দ্রজিতের নির্দেশে মণিপুরীগণও যুদ্ধ বন্ধ করিল। মিঃ কুইন্টন মহারাজের নিকট চিঠিতে জানাইলেন—"আপনি কি সর্তে আমাদের উপর আক্রমণ বন্ধ করিবেন এবং টেলিগ্রাফের তার মেরামত করিতে দিয়া গভর্ণর জেনারেলের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে দিবেন?" (বঙ্গানুবাদ)। তদুত্তরে মহারাজ বাংলাতে লিখেন..... আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না কিন্তু আপনাদের পক্ষীয় সৈন্যেরা, সর্বাগ্রে আক্রমণ করায় আমার লোকেরা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমার প্রাসাদে উপস্থিত কেহই নাই যে ইংরেজী ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে। কিন্তু সমর স্থগিতের পরেই আপনার পত্র পাইয়া আমি বুঝিতেছি, যে আপনি সন্ধি করিতে চাহেন। আপনাদের সৈন্য-সামন্তেরা যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তবে একমুহূর্ত মধ্যেই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি।"

আসের দিন সন্ধ্যাবেলায় রামাচরণ বাবুর কারাগারে গমনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রাত্রি ৯॥ টার সময় তাহাকে আনাইয়া সেই চিঠির তর্জ্জমা করান হয়। রামাচরণ বাবু কিছুক্ষণ পর আরও একখানি পত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন; তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল—"আমরা বিষম ফাঁদে পড়িয়াছি তাহারা আমাদের বন্দুকাদি [illegible]।" এই কথাগুলি একটুকরা কাগজে, পেন্সিলে লেখা—হিজিবিজি ও অস্পষ্ট না থাকায়, কে কাহাকে লিখিতেছে বুঝা যায় না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় —সাহেবদের পত্র পাওয়ার পর ইংরেজ কর্মচারীগণ উহা লিখিয়া সেক্রেটারীর তাঁবু আফিসে উইলিয়ামস্ সাহেবের নিকট পাঠাইতেছিলেন। তাহা পাইলে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট খবর দিতে পারিতেন। কিন্তু সেখানি মণিপুরীদের হাতে পড়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হইল না উপরন্তু ইংরেজ পক্ষের দুর্বলতা মণিপুরীদের নিকট আরও বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। মহারাজের পত্র পাওয়ার পর মিঃ কুইন্টন অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মহারাজও টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে

করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ার পর মিঃ কুইন্টন, কর্ণেল স্কীনে, মিঃ গ্রেঃ সিমসন ও মিঃ কনিস এই পাঁচজন ইংরেজ কর্মচারী একজন সিপাহী সহ রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন।

শোচনীয় হত্যাকাণ্ড—দরবার গৃহটি তখন বন্ধ থাকায় সেনাপতি সিংহের প্রাঙ্গণে সভা বসিল। কিছুদূরে নিম্নস্থ মণিপুরী সৈন্য এবং সাধারণ প্রজা নানারূপ কাণাঘুষা করিতেছিল। দরবারের ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। টিকেন্দ্রজিৎ অস্ত্র ত্যাগের কথাই বার বার জোর দিয়া বলেন। অবশেষে কাল প্রাতে পুনরায় আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সাহেবগণ রেসিডেন্সিতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ ও তোপখানার দিকে চলিলেন। অমনি চারিদিকে গোলমাল আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীমউড সাহেব তাহাদিগকে নিরাপদে রেসিডেন্সিতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রী অথৌম্বাকে অনুরোধ করিলেন। অথৌম্বা টিকেন্দ্রজিতের অনুমতিক্রমে সাহেবদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। যেই মাত্র তাহারা ফটকের মধ্য দিয়া বাহির হইলেন অমনি মণিপুরীগণ মার মার কাট কাট শব্দে সাহেবদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মেঃ সিমসন মস্তকে তরবারির কঠিন আঘাতে আহত হন। মহারাজের জমাদার যাত্রাসিং আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। অথৌম্বা তখন তাহাদিগকে দরবার গৃহের দিকে লইয়া চলেন। দরবার গৃহের ধাপের নীচে একজন মণিপুরীর বর্ষার আঘাতে শ্রীমউড সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলশায়ী হন। সেই ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যাত্রাসিং সাহেবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দরবার গৃহের বন্ধ দরজা জোরে ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া ফেলে। এদিকে ভয়ানক গোলমালের শব্দ শুনিয়া টিকেন্দ্রজিৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া মন্ত্রী অথৌম্বার উপর অবশিষ্ট সাহেবদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার ভার আদেশ দেন। সেই অনুসারে ৮।১০ জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দরবার গৃহে রাখা হইল।

যুবরাজ খাঙ্গাল জেনারেল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে তিনি তোপখানায় চলিয়া যান। সেখানে একজন পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ মণিপুরী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সাহেবদিগকে হত্যা করিতে বলে। বহুকাল যাবৎ মণিপুরীগণ আশুবাক্য স্বরূপ শুনিয়া আসিতেছে "মণিপুরে বিষম যুদ্ধ বাধিবে সে সময় ৩ জন শত্রুর শোণিত দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং তাহাদের পক্ষযুক্ত একত্রে একটি খাদে প্রোথিত করিতে না পারিলে, কিছুতেই মঙ্গল হইবে না।" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া খাঙ্গাল জেনারেল ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ইংরেজ কর্মচারীদের আচরণে তিনি পূর্ব হইতেই তাহাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তখন এইরূপ বে বার বার প্ররোচিত হওয়ায় তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উসর্ব নামক জমাদারকে সাহেবদিগকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। উসর্ব কি করিবে

বুঝিতে না পারিয়া যাত্রাসিংকে সঙ্গে লইয়া যুবরাজের নিকট যাইয়া এই আদেশের কথা জানাইল। যুবরাজ ইহা শুনা মাত্রই তোপখানায় আসিয়া থালাল জেনারেলকে এইরূপ অন্যায়ের কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়। শুনা যায় অসুস্থ অবস্থায় সমস্ত দিন টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি ও তখন কম হয় নাই। থালাল জেনারেলের সঙ্গে তর্কবিতর্কের অব্যবহিত পরেই তিনি তোপখানার মধ্যে নিদ্রা যান। এই সুযোগে থাঙ্গাল জেনারেল ইংংকর্বা নামক সর্দার চাপারাসিকে ডাকিয়া সাহেবদিগকে ঘাতক হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য যুবরাজের (টিকেন্দ্রজিতের) আদেশ হইয়াছে এইরূপ বলিলেন। যুবরাজ তখন সেই গৃহেই নিদ্রিত ছিলেন; সুতরাং সে থালাল জেনারেলের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজকীয় ঘাতককে ডাকাইয়া আনাইয়া সাহেবদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাহার নিকট সমর্পণ করিল। সাহেবদের সঙ্গে একজন শিখাবাদক গুর্খা সিপাহী ও ছিল সে ও রেহাই পাইল না। তাহাদের সকলের মস্তক ছেদ করিয়া একটি খাদে প্রোথিত করা হইল। এইভাবে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ মণিপুরীগণ পরম আহ্লাদিত হইল।

রেসিডেন্সি পরিত্যাগ ও কাছাড়ে পলায়ন—মিঃ কুইন্টন প্রভৃতি অনেকক্ষণ পূর্ব রাজবাড়ীতে গিয়াছেন; এদিকে রাত্রি ১২টা বাজিয়া যায় কিন্তু তখন পর্যন্ত ও রেসিডেন্সিতে তাহাদের সম্বন্ধে কোন খবর আসিয়া পৌঁছিল না। ১২টার সময় রাজবাটি হইতে একজন উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল—"চিফ কমিশনার ও তাহার সঙ্গীগণ আর ফিরবেন না।" সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় বন্দুকের আওয়াজ আরম্ভ হইয়া গেল। রেসিডেন্সিতে সকলেই মনে করিল চিফ কমিশনার প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে; অতএব সন্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই। অবিরত গুলি বর্ষণে রেসিডেন্সির বিভিন্ন অংশ ভাঙিয়া পড়িতেছিল। রেসিডেন্সিতে থাকিয়া আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীমতী পত্নী, ক্যাপ্টেন বইলো, ক্যাপ্টেন বুচার, মেঃ লুগার্ড ও মিঃ উডস্ দুইশত গুর্খাসৈন্য সহ গোপনে রেসিডেন্সি ত্যাগ করিয়া কাছাড়ের পথে রওয়ানা হইলেন। মণিপুরীগণ ইচ্ছা করিয়াই হউক অথবা পলায়নের খবর না পাওয়াতেই হউক—তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করে নাই। তাহাদের পলায়নের পর রেসিডেন্সি হইতে কোনরূপ বাধা না পাওয়ায় মণিপুরীগণ সেখানে ঢুকিয়া যাবতীয় জিনিষপত্র লুটপাট করিয়া গৃহে আগুন ধরাইয়া দিল।

পলায়নরত ইংরেজ পক্ষীয় অফিসার ও সৈন্যগণ দিবা-রাত্র পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব সত্বর পথে কাছাড় অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; স্থানে স্থানে মণিপুরীগণ ও তাহাদিগকে যথাসম্ভব নাজেহাল করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু নাগারা ইংরেজ পক্ষের সহায়তা না করিলেও নিরপেক্ষ ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিফকমিশনারের মণিপুরে আগমন উপলক্ষে কাছাড় হইতে ক্যাপ্টেন কাউলের অধীনে দুইশত গুর্খা সৈন্য আনার কথা ছিল। পলায়নরত ইংরেজ পক্ষ তাহাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় অনবরত পথ চলিতে লাগিল। ২৩শে তারিখ দ্বিপ্রহরে মেইমাতক পাহাড়ে সেই সৈন্যদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। ৩১শে মার্চ সকলে নিরিবিলি পার হইয়া ইংরেজ রাজ্যে প্রবেশ করে।

২৩শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্সি হইতে কোন খবর না পাওয়ায়, এবং মণিপুর হইতে কোহিমার আগত ব্রিটিশ রাজ্যের ব্যবসায়ীদের নিকট নানা গুজব শুনিয়া ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িল। শ্রীমতী পত্নী এবং তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতেই সরকার প্রথম নির্ভরযোগ্য খবর পায়—মণিপুর সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে চিফকমিশনার ও পলিটিক্যাল এজেন্ট সহ পাঁচজন ইংরেজ কর্মচারী বন্দী হইয়াছেন। তখন পর্যন্তও বহির্জগতে তাহাদের নিহত

হওয়ার সংবাদ পৌঁছায় নাই। তারত গভর্নমেন্ট অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মণিপুরের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালনার জন্য নানা স্থান হইতে কাছাড়, কোহিমা এবং টামুতে প্রচুর সৈন্য আমদানি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মণিপুরে লাংথাবাল নামক স্থানে অবস্থিত জনাপর বীরবল লাম্বাকোটির অধীন কতিপয় শুর্খা সৈন্য (43rd Light Infantry) সাহেবদের সঙ্গে না যাইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চিমদিকে কয়েকটি থানা পুড়াইয়া টামুতে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে তখন লেঃ গ্রাণ্টের অধীনে ইংরেজ পক্ষের কিছু সৈন্য ছিল। তিনি ইংরেজ সাহেবদের নিহত হওয়ার খবর শুনিয়া খুবই দুঃখিত হন এবং অন্যান্য সাহেবদের পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য ৬২ জন সৈন্য সহ ২৮শে মার্চ মণিপুরের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা তিনি খোংজোম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রায় বেড় হাজার মণিপুরী সৈন্যের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সহিত একনাগত ৮ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে কর্ণেল প্রেসগ্রেভের (Presgrave) নির্দেশে তিনি ৮ই এপ্রিল পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করেন। ফেরার পথে পেলেল নামক স্থানে ৩।৪ শত মণিপুরী সৈন্যের সঙ্গে তাহাদের আরও একটি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তখন লেসগ্রেভের বাহিনীও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় মণিপুরীগণ পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে মণিপুরের মহারাজের নিকট হইতে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট খবর আসে মিঃ কুইন্টন প্রভৃতি পাঁচজন সাহেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। শুনা যায় থাঙ্গাল জেনারেলের পরামর্শ অনুযায়ী এইরূপ সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পরই আবার খবর আসে—তাঁহার অজ্ঞাতে যুবরাজের আদেশে ইংরেজী বন্দীগণ নিহত হইয়াছেন (The Regent had sent a letter saying that the prisoners had been killed. I believe he stated they had fallen in the fight at first, but afterwards contradicted himself, and said they had been murdered by his brother, the Jubaraj, without his knowledge or consent—Mrs. Grimwood)। ইংরেজ পক্ষীয় লোকজন রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, পরদিন সকালে ব্যবসায়ী জানকীনাথ বণিক, রসিকবাবু এবং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত অপরাপর বিদেশী কর্মচারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। টিকেন্দ্রজিৎ কয়েকদিন পরই তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

ব্রিটিশ সৈন্যের মণিপুর অভিযান—

ব্রিটিশ পক্ষের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে কোহিমা, কাছাড় ও টামু এই তিন দিক হইতে তিন দলে প্রায় ৭।৮ হাজার সৈন্য মণিপুরের দিকে রওয়ানা হইল। কোহিমা হইতে মণিপুরের রাজধানি ইম্ফলের দূরত্ব ১০৪ মাইল, টামু হইতে ৪০।৬০ মাইল, কাছাড় হইতেও প্রায় ৭০।৮০ মাইল হইবে। মেজর কলেট এই বাহিনী তিনের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে ছিলেন নব-নিযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ মেকেব। মেজর কলেট ২৪শে এপ্রিল দলসহ কোহিমা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মণিপুরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং ব্রিটিশের ব্যাপক সমরায়োজনের কথা শুনিয়া কাছাড়ের ৩০।৩৫ হাজার মণিপুরী মণিপুরের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। শ্রীহট্ট, চাকা, শিলং, সোনাবাট, ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও প্রবাসী মণিপুরীদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নানা কৌশলে তাহা-দিগকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। ব্রিটিশ পক্ষের এই সমস্ত আয়োজনের কথা মণিপুরেও রাষ্ট্র হইয়াছিল। মেজর কলেট মণিপুরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মহারাজ কুলচন্দ্রকে এক চিঠিতে জানাইয়াছিলেন—"এখন ও যদি যুদ্ধাস্ত্র ছাড়িয়া থাকে, তবে আর যুদ্ধ বিগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। আমাদের শরণাগত হইলে, আপনার অপরাধের বিচার হইবে, তাহাতে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে কিনা জানিনা। কিন্তু প্রতিকূলতা করিলে,

নিশ্চিতই আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।" (বঙ্গানুবাদ)।

মেজর কলেট তাহার সঙ্গীয় বাহিনী সহ বিনা বাধায় মণিপুরে প্রবেশ করিয়া রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে মহারাজা এক চিঠিতে তাহাকে জানাইলেন—"ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না এবং এখনও নাই। আর আপনাদের প্রতিরোধ করিতে পারি এমন শক্তিও আমার নাই। ইংরাজ রাজের সহিত পূর্বাপর আমাদের মিত্রতা ও সদ্ভাব ছিল। অকস্মাৎ তাহা নষ্ট হওয়ায় আমি মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছি। এই সকল কারণে আমি এখন রাজধানী ছাড়িয়া চলিলাম। পরে যদি সন্ধি স্থাপনের সুবিধা দেখি তবেই আবার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" (বঙ্গানুবাদ)।

কাছাড় হইতে ব্রিটিশ বাহিনী ২৩শে এপ্রিল বিষ্ণুপুরের নিকট পৌঁছিলে তাহাদের সঙ্গে মণিপুরী সৈন্যের সামান্য সংঘর্ষ হয়। ২৪শে তারিখ টামুর সৈন্যদল পেলেল পৌঁছিলে মণিপুরী সৈন্য তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেয়। সেই যুদ্ধে লেঃ গ্রাণ্ট স্বয়ং আহত হন। অবশ্য ইংরেজ পক্ষই শেষে জয়লাভ করে। তাহারা তখন সেখান হইতে থৌবাল পৌঁছায়। এইভাবে একসঙ্গে তিন দিক হইতে আক্রমণ করিয়া মেজর কলেট ২৭শে এপ্রিল রাজধানী ইম্ফলে প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ পতাকা উড়াইল। রাজধানী পতনের পূর্বেই মহারাজা, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকলেই সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন। সাধারণ লোকও প্রাণভয়ে যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল। মেজর কলেট রাজপ্রাসাদে নিজের ক্যাম্প স্থাপন করিয়া রাজাময় ঘোষণা করিয়া দিলেন—"মহারাজ কুলচন্দ্রের রাজত্বকাল ফুরাইয়াছে। এখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের রাজ স্থানীয়। যে-কেহ ইংরাজের কোনরূপ প্রতিকূলতা বা কুলচন্দ্র, টিকেন্দ্রজিৎ বা থাঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতির পোষকতা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর যে ব্যক্তি মহারাজ যুবরাজ প্রভৃতিকে ধরিয়া দিতে পারিবে, সে নিম্নলিখিত হারে পুরস্কার পাইবে। মহারাজ ও যুবরাজ প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করিয়া; থাঙ্গাল জেনারেলের জন্য ২ হাজার; সুবেদার নিরঞ্জন সিং প্রভৃতির জন্য ১ হাজার টাকা হিসাবে।" (বঙ্গানুবাদ)।

রেসিডেন্সি হইতে ইংরেজদের পলায়নের পর মণিপুরীগণ প্রতিহিংসাবশে সেখানকার সমাধিগুলি অপবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে কুইন্টন প্রভৃতি সাহেবদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইল। এই সমস্ত দেখিয়া ইংরেজ অফিসারদের রক্ত আরও গরম হইয়া উঠে —কিন্তু শত্রুপক্ষ হইতে কোনরূপ বাধা না পাওয়ায় ইচ্ছামত গায়ের ঝাল মিটান গেল না। এদিকে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে তথাপি মণিপুরীদিগকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া জেনারেল কলেট পুনরায় ঘোষণা করিলেন—"আমরা সকলকেই অভয় দিতেছি—সকলে আসিয়া নিজ নিজ গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করুক। কেবল যাহারা শ্রীমণ্ডপ প্রভৃতির হত্যাধ, রেসিডেন্সি দাহ ও লুণ্ঠনে বা ইংরেজ সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করণ কার্যে লিপ্ত ছিল তাহাদেরই অপরাধের বিচার ও যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান হইবে। অন্য কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।" এইরূপ আশ্বাস পাইয়া ক্রমে সকলেই ফিরিয়া আসিল। ইহার পর আরেক ঘোষণায় ৭ দিনের মধ্যে সকলকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজের নিকট অর্পণ করিতে বলা হয়।

এদিকে সকলের আগে থাঙ্গাল জেনারেল ধরা পড়িলেন। মহারাজ কুলচন্দ্র চাঁদাদকুকিদের গ্রামে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিলেন। জনৈক বিশ্বাসঘাতক মণিপুরী ইংরেজের নিকট তাঁহার সন্ধান বলিয়া দেয়। তিনি তখন তাহাদের হস্তে ধরা পড়িয়া রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। ক্রমে নিরঞ্জন সিং, কাজেয় সিং, অরেঙ্বা প্রভৃতি সকলেই একে একে ধরা পড়িলেন। টিকেন্দ্রজিতের তখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি রাজধানীর অতি নিকটেই আত্মগোপন করিয়া ইংরেজের কার্যকলাপ লক্ষ করিতেছিলেন। অবশেষে আতঙ্গজান নামক গ্রামে

যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতের নিকট কাছাড় হইতে উকিল আনাইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। আদালত তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন "মণিপুরে যদি কাহাকেও পাওয়া যায়, তবে ও কাজে নিযুক্ত কর।" মণিপুরে তখন জ্ঞানকীনাথ বসাক ও রামাচরণ বাবু ভিন্ন, এই কাজের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিতে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যায়

যুবরাজের টিকেন্দ্রজিৎকেই সমর্থন

আরম্ভ হওয়ার দুইদিন পর যুবরাজের ইচ্ছানুসারে ব্যবসায়ী জ্ঞানকীনাথ বসাক তাঁহার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। জ্ঞানকী বাবুর আইন পাঠ পড়া ছিল না এবং তিনি কোন কালে আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"আমি ব্যবসায়ী, উকিল নহি এবং কিরূপে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে হয়, তাহার কিছুই জানি না। লিখিতে ও পড়িতে জানি, কিন্তু ভাল ভাষা মণিপুরে দুই বৎসর থাকায়, মণিপুরী বহুত লিখিয়াছি। বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা উর্দু ও জানি।"

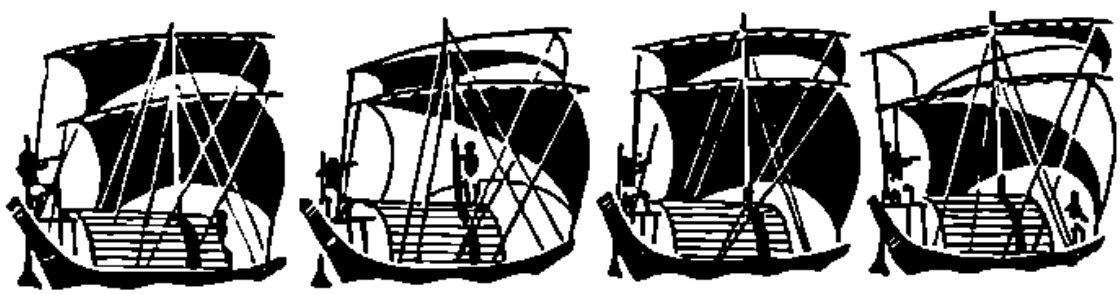

মালবিকার কাছে বলা

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

জানালাটা তুলে দিলাম। কলক দিয়ে শেষ বিকেলের রাঙা মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়ল। মালবিকাকে জানালার পাশের বেঞ্চটা দিয়ে আমি বসলাম ওর মুখোমুখি।

কতোটা রাস্তা আর বৈষ্ণবাটি থেকে হাওড়া—বড়ো জোর পঞ্চাশ মিনিটের মামলা। বললাম ওকে, "জানিস, একলা একলা কলেজে যেতে যে কী 'বশ্রী লাগে তা আর কী বলব—বিশেষ ক'রে যদি অল্-ষ্টপেজ্ গাড়ি হয়। তাকিয়ে ভাখ্"—চারদিকে একবার তাকিয়ে আস্তে বললাম, "লোকগুলো ঢুলছে সবাই! এমনি আমার বেলাতেও হয় অনেকদিন। আজ অবশ্য অন্য কোন্ দিক দিয়ে যে এক ঘণ্টা সময় কেটে যাবে বুঝতে-ই পারব না?"

আবদারের চোখে ও বলল, "একটা গল্প বলো না, শুনতে শুনতে যাই!"

সবিনয়ে বললাম, "গল্প-টল্প আমি জানি নে, লিখ্তে-টিখ্তে যদি-ও বা দু'একটা পারি—কিন্তু তা কেউ পড়ে না, জোর ক'রে ধ'রে পড়াতে হয়—বলতে আমি একদম পারি নে—ভগবান ওই গুণটি আমাকে ভুল ক'রে দেন নি।"

ওর আগ্রহভরা মিনতিতে একটা গল্প অবশ্য বলেছিলাম। ওর ভালো-ই লেগেছিল। কারণ, আমার সব কিছুই ওর ভালো লাগে। কিন্তু আপনাদের তা ভালো লাগবার কথা নয়। এক সংগে তিনটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প। আপনারা শুনে-ই বোধ হয় হাত-জোড় ক'রে বলবেন, "থাক্, হয়েছে, ও আর বলতে হবে না!" মালবিকা-ও ঠিক ওই রকম হাতজোড় করে ঠিক ওই কথা-ই বলেছিল। তা সত্ত্বে-ও বলেছিলাম। মোগলের হাতে পড়লে যে সাবে খানা না খেয়ে উপায় নেই—সেই মহাজনবাক্য স্মরণে রেখে-ই হয়তো সে শেষ পর্যন্ত শুনতে রাজী হয়েছিল।

আরম্ভ করলাম: "হ্যারিসন্ রোড্, আর কলেজ ষ্ট্রীট্ এসে যেখানে একবার মিলিত হ'য়ে-ই আবার যার যার মতো চ'লে গেছে—সেইখানে আছে ক্যালকাটা বুক ক্লাব। কলেজের শেষে বিনে-পয়সার বা অল্প-পয়সার আড্ডা মারবার জন্যে ওইখানে গিয়ে আমরা কয়েকজনে মিলিত হতাম। আড্ডা দেবার একেবারে স্বর্গধাম, দোতলার ঘর, একটা নির্জন সরু বারান্দা, তার মধ্যে কতকগুলি চেয়ার টেবিল পাতা।

সেদিন আমরা শুধু তিনজন···সুরজিৎ, জয়ন্ত আর আমি। বাইরে ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লাগছে মুখে চোখে, বাইরের কোনো শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, সারা দেহের শিরা-উপশিরায় কোন্ অজানা ব্যথার শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পাগলা হাওয়া, প্রাণ-মন উতলা হ'য়ে উঠ্ছে মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতন,—এ-সব কথা বলতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু দিনটে ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত—দুর্দান্ত গরম, হাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই। তাই, সুরজিৎ যখন বললো আজ প্রত্যেককে নিজের জীবনের ব্যর্থ প্রেমের সত্যি গল্প বলতে হবে তখন আমরা দু'জনে ওকে রীতিমতো মারতে উঠেছিলাম। কিন্তু সুরজিৎ সুরসিক বন্ধু, তক্ষুণি অর্ডার দিলে তিন গেলাস সরবতের। বলা বাহুল্য, আমরা তখন ওর কথা পালন করতে জান্ পর্যন্ত কবুল করতে পারতাম—গল্প বলা তো কোন্ ছার!

জয়ন্তই সমস্যার সমাধান ক'রে দিল—সুরজিৎ বলবে আগে। আমি বাঁচলাম, বারো সরবৎ খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা হ'লে আর হাজার বাজে গল্প বললে-ও কেউ চটবে না।

সুরজিৎ আরম্ভ করল : 'আমার কলেজ জীবনের একটা ঘটনা জানোই তো আমার কলেজ কোথায় ছিল। পরীক্ষা চলছিল তখন। ভীষণ উদ্বেগ। পাহাড়ের গায়ে গা বেয়ে সাইকেলে ক'রে রোজ আসি। প্রথম ক'টা পরীক্ষা হয়ে গেছে; একেবারে নম্বর হয় নি। তবু-ও এখন হ'তে হ'লে আজকের পরীক্ষায় পঁচানি থেকে নম্বর রাখতেই হবে। তাই, অন্যদিকে নজর দেবার আর সুযোগ নিই না চোখ দুটোকে। বিশেষ ক'রে, প্রত্যেকদিন পরীক্ষার শেষে তেতলা থেকে নামবার পথে-ই যে-দৃশ্য চোখে পড়ে তা থেকে চোখ ফেরানো উচিত না হ'লে-ও নেমে পড়ি তাড়াতাড়ি —বাড়ি ফিরে চট্ ক'রে আবার যাতে বই নিয়ে বসতে হয়।

কয়েকদিন একটা মোটর দেখেছি আমার অনেক আগে দিয়ে যেতে; বিশেষ লক্ষ্য করি নি। কিন্তু আজ কলেজে যাবার পথে ধুলো উড়িয়ে একেবারে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল মোটরটা। তাকিয়ে দেখলাম— ভেতরে ব'সে একজন সুন্দরী রূপসী যুবতিকা যা বলো তাই। সেই যাকে রোজ তেতলা থেকে নামবার পথে দেখি, তার মতোই যেন বোধ হ'ল। উদাস মনে চললাম কলেজের দিকে।

কেমিষ্ট্রি পরীক্ষা অবশ্য সেজন্য বিন্দুমাত্র ব্যাহত হ'ল না। নম্বর নম্বর—নির্ঘাত পাবো! স্বভাবতঃই মনে ছিল স্ফূর্তি। তাই, তেতলা থেকে নামবার পথে পা দু'টো যেন নিশ্চল হ'য়ে এলো। তাকিয়ে দেখলাম— সেই সুন্দরী রূপসী যুবতিকা - ব'সে আছে ব্যগ্র নয়নে, পরীক্ষা হ'য়ে গেছে অনেকটা আগে-ই। আমি আরেকবার তাকাতেই সে-ও আমার দিকে তাকালো, একটু হাসলো। বোধ হয় চিনে রাখলো এ অভদ্র দর্শককে।

পরের দিন। অ্যাডিশনাল পেপার পরীক্ষা। তাই তেমন গরজ নেই। বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে একটু আগেই—সেই নীলাভ মোটরটাকে যদি আরেকবার ধুলো উড়িয়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলতে দেখতে পাওয়া যায় সেই আশায়। নীল পাহাড়ের গায়ে সাইকেল ছেড়ে দিলাম; শিশিরে ভেজা গন্ধ-মেশা হাওয়া দু হাতে জাপটিয়ে ধরে আমাকে—যেন ছেড়ে দেবে না।

—সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে। ভয়ে, এই কী সেই? এগিয়ে গেলাম। আশ্চর্য যোগাযোগ! মোটরে ব'সে আছে আমার সেই পারমানেন্ট্ এপিথেট্—সেই সুন্দরী রূপসী যুবতিকা! বোঝা গেল গাড়িটা বিগড়ে গেছে।

আমার দৃষ্টি গাড়ির ভেতরে ছিল নিবদ্ধ; সে চোখ ফেরাতেই চট্ ক'রে বলে ফেললাম, "গাড়িটা বুঝি বিগড়ে গেল? পরীক্ষা আরম্ভ হ'তে-ও তো আর বেশি দেরি নেই।"

নিজের কথার স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেই পুলকিত হই।

এক চামচ মিষ্টি হাওয়ার মতো এক টুকরো হাসি হেসে বললে সে,—"দেখুন তো কী অলক্ষুণে কাণ্ড। পরীক্ষাটা মার্ডার হবে আমার। আপনারা ভালো ছেলে, মারবেন মজা!" অবাক, ও মনে মনে আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে আমার পরিচয় তা হ'লে তার অজানা নয়! বললাম—"না, না, ওটা আপনার কুসংস্কার—পরীক্ষা ভালো হবে ঠিক-ই; আর সময়-ও তো রয়েছে।"

—"সহজে সারবে ব'লে মনে হয় না,"—এসে নিবেদন করল তেলকালি-মাখা ওয়ধুত বুড়ো ড্রাইভার। আপনাকে আজ হেঁটেই যেতে হবে দিদিমণি!"

পুলকিত হ'য়ে উঠি একসঙ্গে যাওয়া যাবে ভেবে।

হঠাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিক শক্ খেলাম!

ড্রাইভার একজোড়া ভর দিয়ে হাঁটবার কাঠের পা বের করে। মেয়েটি দরজা ঠ'রে নেমে ডান পা মাটিতে ফেলে। ওর বাঁ পা নেই!!'

সরযূৎ এসে গিয়েছিল; আমরা কাঁটা দিয়ে চুষতে আরম্ভ করলাম।

সুরজিৎ শেষ করল—'আর আমি-ও—আজো,

আপনি আস্তে আস্তে আসুন, আমি চলি—ব'লেই সাই-কেলটায় চেপে—"

জয়ন্ত থামালো ওকে। চুমুক দিয়ে জয়ন্ত সরবতের গেলাসটা শেষ করে ফেলল; গেলাসের নিচে প'ড়ে রইল একগাদা বরফ। বহুকে ওই গেলাসে জল দিতে বলেই আরম্ভ করল জয়ন্ত:

'আমার ঘটনা কোনো নীলপাহাড়ের ভাঙা স্বপ্নের টুকরো দিয়ে গড়া তাজমহল নয়—এই কলকাতার স্থূল রাস্তার একটা ঘটনা। আমি ভাষা বলাতে পারি নে; এবং সেজন্যই তোমাদের মতো যেখানে সেখানে প্রেমে পড়ি নে। আমার ঘটনা তাই অনেকটা রাজনা ছাড়া গান, বা অলংকার-বিহীন মেয়ের মতোই।

সুরজিৎ এইখানে একটা "এন্‌কোর্" ছাড়ল!

জয়ন্ত বলে চলল: 'কলেজ-ষ্ট্রীটের এক আঁধার-করা বিকেল। দাঁড়িয়ে আছি উদ্দেশ্যহীন ভাবে, আর তাকিয়ে দেখছি দর্শনীয় বস্তু। হঠাৎ নজরে পড়ল—একজোড়া চোখ! তোমরা হলে বলতে সেই চোখদু'টোর ওপরে আঁকা বাঁকানো কালো ভুরু, সেই ভুরুর চারপাশে যেন একটা শ্বেতকমল, ভুরুদুটো যেন কালো ভোমরা! আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে অত সব অলীক জিনিস ভাবতে শিখা দেয় না; আমরা জানি চোখদু'টোর মধ্যে থাকে রেটিনা, তার ওপরে কোরয়েড্, তার ওপরে স্ক্লেরা—এবং আরো অনেক কিছু যা বললে ছন্দপতন হবে এখানে। যাই হোক, চোখদু'টো থেকে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সর্বাঙ্গে; আপাদমস্তক ঘুরে ফিরে আবার যখন সেই চোখজোড়ার ওপর ফিরে এলো আমার দৃষ্টি, তখনো দেখি সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে!

আশ্চর্য তো! তবে, আমার-ও তো চোখ আছে কেমন! একটা মেয়ের দৃষ্টিতে তা কখনো নীচে নামে না। আমি-ও রইলাম তাকিয়ে। যতোক্ষণ পারল সে-ও রইল তেমনি ভাবে। মনে মনে বেশ অবাক হলাম মেয়েটার সাহস দেখে! আমি-ই শেষে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আবার খানিকক্ষণ পরে যেই তাকিয়েছি, দেখি ঠিক তেমনিভাবে আছে তাকিয়ে! কয়েকবার এমনি হল। একবার হঠাৎ দেখলাম—চোখের ইসারায় সে ডাকছে আমাকে!! ডেকেই সে চলতে লাগল। আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। তাকিয়ে দেখি—কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছে সে, আবার ডাকছে চোখের ইসারায়! ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে আমি-ও দুরুদুরু বুকে চলতে লাগলাম। আবার কিছুদূর গিয়ে সে পিছন ফিরে তাকায়, তাকিয়ে হাসে, হেসে ইসারায় যেন ডাকে! শেষে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলতে লাগলাম।'

বহু এসে ওর গেলাসে জল দিয়ে গেল। কাত্তি দিয়ে বরফগুলোকে নাড়তে নাড়তে ব'লে চলল জয়ন্ত—'সত্যি, মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়েছিলাম ব'লেই কোন্ পথ দিয়ে কতোদূরে নিয়ে গেল সুন্দরী—বলতে পারব না। অর্জুন যেমন লক্ষ্যভেদ করবার সময়ে গুরুদেব, ভাইদের, এমন কী গাছের পাতাও দেখতে পায়নি, শুধু দেখেছিল পাখির দুটি চোখের তারা,—তেমনি আমি-ও বাইরের সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু তার নীলশাড়ির দিকে তাকিয়ে চলছিলাম! সেবার যে গাড়ি চাপা পড়লাম না কেন তা এখনো ভেবে বার করতে পারিনে!' বলা থামিয়ে গলা ভেজাতে লাগল সে।

সুরজিৎ অধৈর্যের সঙ্গে ব'লে ওঠে—"আগে শেষ করেই নাও না, তারপর বরফ খেও!"

জয়ন্তের নিজস্ব ভংগীতে ধীরে ধীরে বরফ-জল শেষ করল; দু'য়েক টুকরো বরফ যা প'ড়েছিল তা-ও চিবিয়ে নিল। তারপর, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আরম্ভ করল: 'হঠাৎ একসময়ে সম্বিত ফিরে পেলাম। এ যে কোন্ রাজ্যে নিয়ে এলো আমায় সুন্দরী। রহস্যময় আবছা-আঁধার-ভরা গলি, জানালায়-দরজায় প্রসাধন-পরায়ণা অনেক রূপসী—অনেক লোকের নিঃশব্দ আনাগোনা! আমার মানসী-ও এমনি এক দরজার নিকটবর্তী হ'তেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। মাথার মধ্যে টন্ টন্ করে উঠল! এক ঝটকায় ফিরে চললাম মুক্ত আলো নির্মল বাতাসের সন্ধানে!

জয়ন্ত থামল।

খম্‌থমে হইল।

এবার ওরা দু'জনে আমাকে আক্রমণ করল। পড়লাম মহা ফাঁপড়ে! এতক্ষণে অবশ্য ভেবে ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছি কোন্‌টা ব'লে এ-যাত্রা নিস্তার পাওয়া যায়। বললাম, 'সুরজিৎ যখন সরবৎ খাইয়েছে তখন আর না ব'লে উপায় নেই। তবে জয়ন্তের গল্পের কাছে আমারটা নস্যি!'

ওদের দু'জনে এখন তুমুল একতা। বললে,—'ভণিতা ছেড়ে বলো এবার!'

অগত্যা আমি আরম্ভ করলাম: 'আমাদের বাড়ির সামনেই একটা আধপুরোনো দোতলা বাড়ি। ওপর তলায় এক পরিবার আজ এসেছে—ভাড়াটে। সারা সকাল দেখলাম ওরা মোটঘাট তুলছে ওপরে। পরিবারে কে কে আছে দেখিনি: শুধু দেখেছিলাম যে একজন মোহিনী আছেন—সুরজিতের ভাষায় তাকে সুন্দরী রূপসী মুকুলিকা যাই বলো না কেন।

বলা বাহুল্য, সারা সকাল আমার পড়া হয়নি; আমার পড়বার টেবিলের সামনের জানালাটা ঠিক ও-বাড়ির দোতলা-মুখো!

দুপুরে ও-বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। পুলকের সংগে লক্ষ্য করেছিলাম, আগন্তুকদের মধ্যে সেই মোহিনীও আছেন।

কান পেতে বসেছিলাম পড়বার টেবিলে। পাশের ঘরে মা ও বৌদিদের সংগে তারা আলাপ করতে লাগলেন। আর আমি ভাবতে লাগলাম কী ক'রে নিজেকে জাহির করা যায় ওঁদের—বিশেষ ক'রে ওর—সামনে!

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে মা'দের সংগে ওঁরা আমাদের বাড়ি দেখতে দেখতে আমার পড়বার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কে কে দরজার সামনে ছিল লক্ষ্য করিনি, কিন্তু তাকে ঠিক-ই দেখতে পেলাম। দূর থেকে যতোটা সুন্দর দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি সুন্দর মনে হ'ল কাছ থেকে। মা এসে দেখালেন ঘরটা, তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার সেজ ছেলে, বি-এস্‌-সি পড়ছে প্রেসিডেন্সি কলেজে।" সত্যি মনে মনে চেয়েছিলাম আমার পরিচয় সে জানুক! তার মা তখন বললেন, "আমার এই মেয়ে-ও আই-এ-তে পড়ছে লেডি ব্র্যাবোর্ণে, খুব ভালো ছাত্রী, ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে।"

তাকিয়ে দেখলাম, লজ্জানত মুখে সে মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আমার দিকে তাকালো। একটু পরে-ই তারা তাদের বাসায় চ'লে গেল।

এর পরে কী আর পড়া চলে? পার্টিংটনের ইন্‌-অরগ্যানিক্‌ কেমিস্ট্রিটা খোলা-ই প'ড়ে রইল। মন চলে গেল ও-বাড়ির দোতলায়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম ওদিকে। নাঃ, তার দেখা নেই। তবুও রইলুম তাকিয়ে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—নাঃ, ততোক্ষণ আর থাকা যায়! ঘাড় নামিয়ে বইয়ের দিকে চোখ ফেরালুম। পরশু থেকে টেস্ট্‌ পরীক্ষা! ওলটাতে লাগলুম পাতা।

...হঠাৎ যেন একটা রঙিন্‌ শাড়ীর আবছা ছবি দেখতে পেলাম ও-বাড়ির দোতলায়; যখন তাকালুম, দেখি কেউ নেই!

ফেলে রাখলুম হোঁৎকা বইটে।

কিন্তু আর তার দেখা নেই! পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট—তবু-ও তার ছায়া পড়ল না দোতলায়।

রাগ ক'রে সশব্দে জানালাটা বন্ধ ক'রে পার্টিংটন নিয়ে ফের বসলাম।

...কিন্তু—ওর ওপর কী রাগ করে থাকা যায়? জানালাটা তাই খুলে দিলাম। খোলা রেখেই পড়তে লাগলাম, এবং খাতায় নোট্‌ করতে লেগে গেলাম।

কিন্তু একটু পরেই মনে হ'ল ও-বাড়ির দোতলায় রঙিন্‌ শাড়ি! মুখ তুলতেই একধারে স'রে গেল। একটুখানি সবুজ রঙের ছায়া তাও দেখতে পেলাম।

রঙিন্‌ শাড়ির নেশার কাছে টেস্ট্‌ পরীক্ষার ভাবনা ডুব মারল। বই খাতা বন্ধ ক'রে রেখে তাকিয়ে রইলাম। এবার যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার দেখা না পাব ততোক্ষণ উঠ্‌ব না, চোখ ফেরাব না! ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!

এবার অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। মাথায় সিমেন্টের কড়াই আর হাতে সিমেন্ট লাগাবার খুরপি নিয়ে একটা রাজমিস্ত্রি ও-বাড়ির দোতলায় দেখা দিলেন; তার-ই পরণে সবুজ রঙের একটা লুংগি, যাকে রঙিন্‌ শাড়ির অপভ্রংশ ব'লে মনে ক'রে এতক্ষণ হতাশ হচ্ছিলাম!'

গল্পের শেষে মালবিকাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কার গল্পটা ওর কাছে সবচেয়ে ভালো লাগল। বলা বাহুল্য, ও বলেছিল: "তোমার গল্পটা-ই!"

শিকার

পার্থপ্রতিম চৌধুরী

'শিকারের' কথা বলছিলেন, না মিঃ সেন ?—কুণ্ডলী-কৃত সিগারেটের ধোঁয়াটা একটা ফুৎকারে হাওয়ায় উড়িয়ে দেন শ্রীমন্ত ভৌমিক। জীবনে এক সত্যিকারের শিকার কাহিনীই জানি, এবং সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই আজ আমি বলবো শুনুন……

রায়বাহাদুর পুলক মিত্র। কোলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী আর কয়েকখানা গাড়ীও আছে ভদ্রলোকের। পৈতৃক জমিদারী রয়েছে কোলকাতার আশে পাশের নানান্ জায়গায়। এই পুলকবাবু লোকটি কিন্তু অদ্ভুত ধরণের; একা একাই থাকতে ভালোবাসেন—বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তাঁর একটু কমই ছিল। ভারী গম্ভীর প্রকৃতির লোক আর একটু খেয়ালীও। কোলকাতার বুকে তাঁর থাকবার যথেষ্ট সুবিধা থাকলেও বেশীর ভাগই কোলকাতার বাইরে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। একটা বিশেষ নেশা ছিল তাঁর—সে হচ্ছে এই শিকার—এই শিকারের নেশা। তাই এই শিকারের নেশাতেই তিনি কোলকাতার বাইরে জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াতেন। একটিমাত্র ছেলে ছিল তাঁর—বয়েস পাঁচ কি ছয়। এই ছেলেটিকে খুব ভালোবাসতেন আমাদের রায় বাহাদুর। জন্মের পর থেকেই ছেলেটি ওর মাকে হারায় —তাই বাবাকে কাছে পেলে সে আর ছাড়তে চায়না। রায়বাহাদুর যেখানেই যান, ছেলেটিকেও নিয়ে যান।

সেবার গ্রীষ্মের সময়ে রায়বাহাদুর পুলক মিত্র এসে হাজির হলেন সাঁওতাল পরগণার 'মদনপুর' নামে একটি অখ্যাত গ্রামে।

শিকারের নেশাটা কিছু উগ্র রকমেরই ছিল এই লোকটির; উগ্র বলছি এই জন্যেই, কেন না রায় সাহেবের হাতটা বিশেষ সুবিধার ছিল না, প্রায়ই নিসফুটিং হত।

সাঁওতাল পরগণার ওখানে বাঘের উৎপাত খুব বেশী শুরু হয়েছিল সেবার। প্রায় রাতেই বাঘের উৎপাত হত। পুলকবাবুও শিকারের গন্ধ পেয়ে সবাদিক গোছাতে শুরু করে দিলেন।

এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে আমিই একমাত্র বন্ধু ছিলাম। আর সঙ্গে এসেছিল খোকা আর চাকর ভজুয়া। একদিন সকালের দিকে ব্রেকফাষ্ট করছি এমন সময় মিঃ মিত্র হঠাৎ বলে উঠলেন—মিঃ ভৌমিক, ক'দিন ধরেই ভাবছি একটা বাঘ শিকার করব, উৎপাতও বেড়েই চলেছে—আজ রাতে সব বন্দোবস্তই করে রেখেছি—আপনার অসুবিধা হবেনা ত ?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেম।

খোকনকে রোজই বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যেত ভজুয়া। রাতের বাঘ শিকারের জন্য কয়েকদিন হ'লো হাট থেকে বেশ একটি নধরপুষ্ট ছাগলকে কিনে এনেছিল ভজুয়া—প্রভুর আদেশে। এই ছাগলটির সঙ্গে কিন্তু একদিনেই আমাদের খোকন বেশ ভাব পাতিয়ে বসেছিল। সে রোজ তাকে, নিজের হাতে খাইয়ে দিত; আর আশ্চর্য, ছাগলটাও অন্য কারুর হাতে খেতনা—খোকনকে কাছে না পেলেই সে চীৎকার শুরু করে দিত। খোকন দুষ্টুমি করে ছাগল ছানাকে 'কালু' বলেই ডাকত। ক্ষণও সে একে ছেড়ে থাকতে চায় না। খোকনের সঙ্গে এই ছাগলটির যে এই বন্ধুত্ব তা কিন্তু আমরা অতটা জানতাম না।

যাক্, ঘটনার কথাই বলি। রাত্রি তখন বোধ হয় দশটা হবে। বাইরের বারান্দায় এসে বসলাম; আমি আর পুলকবাবু। হুইস্কি চলল বোতলের পর বোতল

হারুলের তজুয়াকে ডেকে নীচে কিছুটা দূরে ছাগলটাকে বেঁধে রাখতে বলে—আমরা মাচাং নেমে এলাম। তার পরে ... নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে কখনো শোনা যায় হিংস্র নিশাচরের ভয়ঙ্কর কাঁপানো চীৎকার। আকাশে তারাও ছিলনা বেশি সেদিন: চাঁদ লুকিয়ে ছিল মেঘের নরম বুকে। গাছের বুকে বাজছিল বাতাসের ঝির্ ঝির্ সুর।

আমরা সবাই বন্দুক একেবারে রেডী। সিকস্ বোর্ গান্—কুল্ লোড্ করা। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটার দিকে তাকালাম—'এগারোটা চল্লিশ!' উঃ ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। আমি একটু ঝিমিয়ে পড়লাম। রায়-বাহাদুরের চোখে জেগে উঠেছে মাতকতা—নেশায় চুর হয়ে বসে আছেন তিনি। চোখদুটো তাঁর জ্বলছে বুনো পশুর মতো—বুঝলাম শিকারের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে।

হাত এগুতে লাগল। ছাগলটার চড়ার বার ডাকও শুনলাম—কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না। কতক্ষণ কেটে গেছে হুঁস ছিলনা। হঠাৎ রায়সাহেবের ধাক্কায় সম্বিত ফিরল—ডৌমিক. সামনে একটা লালচে নতুন কি বেরিয়ে গেল—ওই যে খস্ খস্ শব্দ করছে—

আমি সার্চ লাইট জ্বালতে গেলুম—কিন্তু রায়বাহাদুর নিষেধ করলেন। মাচাটা বড় কাছে ছিল বলেই হয়ত তিনি নিষেধ করলেন। ওদিকে ছাগলটাও আবার ডেকে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। বুঝলাম—ভীত হয়েছেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ পাশ থেকে বন্দুকটা নিয়ে তিনি দুবার শুট করে দিলেন আচমকা—সেই আধোআলোয় মাচাখানেই। এই রকমই শিকার করতেন তিনি। হঠাৎ গুলি করে বসতেন। কিছুক্ষণ পরেই একটা আর্ত চীৎকার কানে এসে পৌঁছিল। আমরা মাচা থেকে নেমেও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় তজুয়া সেখানে ছুটতে ছুটতে এলো—হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো—যে খোকন ঘরে নেই। শোবার আগেই সে বার বার বলেছিল.....'কালুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—ইত্যাদি.....' তাকে অনেক করে ভুলিয়েছিল তজুয়া—কিন্তু রাতের অন্ধকারে খোকাবাবু হঠাৎ কোথায় যে গেলেন.....

খোকনের ঘরের দরজাটা খোলাই রেখেছিল তজুয়া ভুল বশতঃ।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমার প্রাণটা অজানা আশংকাতে দুলে উঠল। আরো কিছুটা এগিয়ে পুলক বাবু বিকট অট্টহাস্য করে উঠলেন; তজুয়া ছাগলটার কাছে এগিয়ে গেল। সেখানে বাঘের চিহ্নও নেই। ছাগলটা কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে ঘাস চিবুচ্ছে। আর তাকে আঁকড়ে রয়েছে একটা পাঁচ ছ বছরের মানব শিশু—রক্তে তার সারাটা শরীর ভেসে যাচ্ছে। এবার আমি টর্চ জ্বাললাম—মিঃ মিত্র বাধা দিলেন না। তজুয়া কেঁদে উঠল—চীৎকার করে। মিঃ মিত্র নীরব, নিস্পন্দ, দাঁড়িয়ে রয়েছেন যেন, পাথরের ষ্ট্যাচু—হাতে তাঁর তখনও সেই বন্দুক।

আমি বললাম—: করেছেন কি মিঃ মিত্র?

: শিকার—শিকার করেছি—ডৌমিক শিকার।

আবার হাসতে লাগলেন রায়বাহাদুর। রায়বাহাদুর হঠাৎ আমার হাত থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন: কিন্তু আরও একটা কাজ বাকী আছে আমার—বলেই বুকে তুলে ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গেই জীবন্ত ছাগল ছানাটা মাটিতে পড়ে গেল—নিশ্চুপ ভাবে।

এ আবার কি হল—মিঃ মিত্র?

: শিকার এবং দ্বিতীয় শিকার—মিঃ মিত্র হাসিতে ফেটে পড়তে লাগলেন। আমি আর তজুয়া পাশে দাঁড়িয়ে রইলেম—নীরব. নিশ্চল ভাবে। বটের ডালে ডেকে উঠল একটা কুৎসিৎ প্যাঁচা।

চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে আমাদের গল্প শেষ করে মিঃ ডৌমিক. সমীর সেনের দিকে তাকালেন। তারপরে ধরালেন সিগারেট—সেই ধোঁয়ার স্মৃতির ভেতর থেকে ভেসে আসা আচমকা টুকরো ঘটনাটা আবার মিলিয়ে গেল—হারিয়ে গেল বিস্মৃতি সমুদ্রের অতল তলায়।

অ্যাশ ট্রের ওপর ছাইটা ঝেড়ে দিয়ে চোখটা তুলে বুজলেন শ্রীমন্ত ডৌমিক।

গরজ-আগ্রহ-প্রেরণা
MOTIVATION

অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ

কথায় বলে 'গরজ বড় বালাই।' একথা সত্য যে মানুষের সব কাজের পেছনেই কোন না কোন 'গরজ' বা প্রেরণা (Motivation) থাকে। তুমি কলেজে ভর্তি হ'য়েছ, খেটে খুটে পড়ছ কারণ তোমার 'গরজ' আছে পরীক্ষাটা ভাল করে পাশ করবার। পরীক্ষা ভাল পাশ করলে ভাল চাকরী পাওয়া যেতে পারে। তোমার ছোট ভাই বাটুর পড়ায় মন নেই —তুমি তাকে আগ্রহান্বিত করে তুলতে চাও, তাই কবিতা শোনালে 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'। বাটুর গাড়ী ঘোড়া চড়বার সখটা যদি প্রবল করে তুলতে পার তা হ'লে লেখাপড়ায় মন সে দেবে। এ ওষুধে যদি না ধরে তা হ'লে তাকে হয়তো লোভ দেখিয়ে বল "লক্ষী তো, এই পড়াটুকু শেষ করে ফেল, তা হলে এই 'লজেন্স' এইখানে তুলে রাখলুম—তোকে দু'হাতে দু'টো দেব।" এতেও যদি ফল না হয় তা হলে রাগ করে বল "পড়া যদি আজ না পারিস্—পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।" অর্থাৎ কথাটা হচ্ছে, কাজ আদায় করতে হলে 'গরজ' সৃষ্টি করা দরকার।

শিশুদের পক্ষে এটা বিষম দরকারী কথা। লেখা পড়ায় ছেলেমেয়েরা কেন মন দেয় না—কি করেই বা তাদের মন পাওয়া যেতে পারে। হালে লেখা জর্জ, জি, টম্পসন তাঁর চাইল্ড সাইকোলজীতে লিখছেন, 'সেকেলে মাষ্টার মশাই বা পিতামাতা যাকে বলেন 'অলস ছেলে' তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং যে সব ছেলে মস্তিষ্ক বা পেশীর ব্যবহারে কম আগ্রহ দেখাচ্ছে তার নিম্নলিখিত কোন না কোন অসুবিধা ঘটছে যার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন (১) দৈহিক শক্তির ক্ষীণতা যার কারণ হয়তো খাদ্যে পুষ্টির অভাব বা রসগ্রন্থির করণের অপ্রাচুর্য (২) মানসিক দ্বন্দ্ব—যার ফলে তার কোন বিষয়ে স্ফূর্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে (৩) আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব।

যে ছেলের সামনে এমন কাজ এসেছে যার জন্যে তার মানসিক পরিণতি অযথেষ্ট, কাজেই কি করে কাজটা সুসম্পন্ন করতে হবে তা সে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না—সে ছেলে সে কাজে স্বভাবতঃই উৎসাহ পাবে না আর তা সম্পন্ন করবার জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না—তাতে তার গরজ থাকবে বা—এটা বোঝা কঠিন নয়। 'গরজ'—আগ্রহ যেখানে থাকে সেখানে লেখাটা নিতান্তই সার সারা গোছের হয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষক বা পিতা মাতা নানা ভাবে মাথা খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন শিশুর বর্তমান আগ্রহ কিসে এবং তারপর চেষ্টা করেন শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চালনা করতে।' ১

ব্যাকগিয়োক্ শিক্ষা ব্যাপারটাকেই এই আগ্রহ বা গরজের ভিত্তিতে স্থাপিত করতে চেয়েছেন তাই তিনি 'শেখা'র সংজ্ঞা দিচ্ছেন "অভ্যাসের ফল হিসাবে কোন ক্রিয়ার পরিবর্তন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, হয়তো বা সব ক্ষেত্রেই এ পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি।" ২

গরজ বা আগ্রহ (Motivation) একটা মানসিক

১। G. G. Thompson—Child Psychology—P 13-14
Mr. Geoch—The Psychology of human Leaving.
Woodworth—Psychology P. 363

ব্যাপার। এই আগ্রহ যে দ্রব্যকে অবলম্বন করে—অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্যে এ আগ্রহ, সেটা বাইরের জিনিষ হতে পারে। সেটা 'আগ্রহ' নয়—সেটা আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক। আগ্রহকে ইংরেজীতে বলে Motive আর আগ্রহের বস্তুকে বলি incentive. উড্‌ওয়ার্থ বলছেন "আগ্রহটা হচ্ছে ব্যক্তির ভিতরে আর দ্রব্যটা হচ্ছে তার বাইরে। আগ্রহের বস্তু (incentive) হচ্ছে যা আগ্রহকে (Motive) আকর্ষণ করে।"

আগ্রহ ও উত্তেজক (stimulus)-ও এক কথা নয়। উত্তেজকও অনেক সময় বাইরের কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে মনের। তা ছাড়া উত্তেজক হচ্ছে যা বর্তমান মুহূর্তে কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীকে নাড়া দিচ্ছে। যেমন আলো এসে চোখে লাগল। কিন্তু আগ্রহটা বর্তমান মুহূর্তের ব্যাপার নয়। মনের মধ্যে অনেক অতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে ও সংশ্লিষ্ট হয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বর্তমান মুহূর্তে কোন দ্রব্য বা অবস্থাকে অবলম্বন করে আগ্রহ প্রকাশ লাভ করতে পারে—যেমন, নতুন ডিজাইনের পাড় শাড়ীখানা দেখে তোমার কিনতে আগ্রহ হোল। কিন্তু এই মুহূর্তের উত্তেজকই আগ্রহকে জন্ম দেয়নি। উত্তেজক উপস্থিত হওয়ার আগেই আগ্রহের বীজ মনের মধ্যে ছিল। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রশংসা লাভের প্রচ্ছন্ন বাসনাটি মনের মধ্যে ছিল। বর্তমান উত্তেজক তাকে প্রকাশ করেছে এই মাত্র।'

আগ্রহ বা গরজ (Motive) শারীরিক অর্থে একটা শক্তি (energy) নয়। 'ক্ষুধা' হচ্ছে খাদ্যের জন্য আগ্রহ কিন্তু এটা বাস্তবিক পক্ষে কোন শক্তি নয়—বরঞ্চ এ হচ্ছে শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে তার পাচনযন্ত্রটা। ক্ষুধা এ তাড়া লাগায় যে দেহদেবতার যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ-সম্ভারের প্রয়োজন হয়েছে। আগ্রহ (Motive) হ'চ্ছে শক্তির দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। এ শক্তির নিয়ামক।

আগ্রহ বা গরজ (Motive) সব সময়েই সচেতন ইচ্ছাসম্ভূত নয়। বরং জীবজগতের বহু অংশ অচেতন এবং প্রকৃতিদত্ত আগ্রহ (Motive) দ্বারা চালিত। এই আগ্রহগুলিকে সাধারণতঃ ইন্‌স্টিংট (Instinct) বলা হয়। আমরা এদের বলেছি সহজাত সংস্কার। বর্তমান কালে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ইনস্টিংট্‌ এ নামের পরিবর্তে "আম্‌লার্জড্‌ মোটিভস্‌" অশিক্ষিত আগ্রহ বা "ইয়েট মোটিভস্‌" বা "প্রকৃতিগত আগ্রহ' নাম ব্যবহারের পক্ষপাতী। প্রকৃতি নিজেই জীবের মধ্যে এ অচেতন আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি রক্ষা ও সৃষ্টি বিস্তারের প্রয়োজনে। প্রাণী জগতের এই আদিম আগ্রহকে বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন "এ্যানিমাল ড্রাইভস্‌" (Animal drives) বা জৈবিক তাড়না।

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এ তাড়নাগুলি বিদ্যমান্‌ তাই এদের জন্মগত ও আদিম বলে মনে করা হয়।

এ তাড়নাগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে।[৪] 'সহজাত সংস্কার' আলোচনা কালে এ আমরা দেখেছি উড্‌ওয়ার্থ এদের তিনটি প্রধান দলে ভাগ করবার পক্ষপাতী—নিরাপত্তা, আনন্দ ও কর্তৃত্ব (Security, pleasure and achivement.)

প্রাণীর জীবনের পরিবেশের মধ্যে এমন অনেক শক্তি ও দ্রব্য আছে যা তার পক্ষে হানিকর, বিরক্তিকর, বিপজ্জনক। প্রাণীর সহজ আদিম প্রবৃত্তি হচ্ছে এসব দ্রব্য বা অবস্থাকে এড়িয়ে চলা। ছোট কুকুর ছানা বা মানুষের বাচ্চা হঠাৎ তীব্র শব্দ শুনলে চকিতে মায়ের বুকে মুখ লুকায়—সে নিরাপত্তা খোঁজে।

কিন্তু বেঁচে থাকা একটা নেতিবাচক প্রক্রিয়া নয়। তাই প্রাণী যা বিরক্তিকর তাকে শুধু এড়ায় না, যা সুখকর তাকে সে খোঁজে। গরম মায়ের কোল শিশু খোঁজে—বেড়াল গরম উনুনের গা ঘেঁষে শোয়। এ হচ্ছে সুখ বা আনন্দের স্বাভাবিক তাড়না। শিশু

৪। Woodworth—Psychology P 362

৫। J. S. Ross—Basic Psychology P 30

মিষ্টি খাবার জন্য বায়না ধরে—লাল রং-এর ছবি চায়।

আবার এমন দ্রব্য বা অবস্থা আছে যা হানিকরও নয়, সুখকরও নয়। তাদের সম্পর্কে প্রাণীর ঔৎসুক্য আছে নেড়ে চেড়ে দেখবার (explanation), তাদের জানবার (acquaintance), বাধা দূরকরে তাদের আয়ত্ত করবার (mastery)। একেই বলা যেতে পারে কর্তৃত্ব (achievement) ৬

রস্ (J. S. Ross) আবার এ তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। (১) আত্মরক্ষা মূলক (Self motives)
(২) বংশ বা জাতি রক্ষা মূলক (Race motives) ও (৩) দলরক্ষা মূলক (hard motives)। এ তাড়না গুলি অবশ্যই পরস্পরবিরোধী বা বিচ্ছিন্ন নয়।

ম্যাকডুগাল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা, যে ভাবে এই আদিম তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তা আমরা দেখেছি।

আদিম প্রবৃত্তিগুলি জীবনের মূল উৎস তাই তাদের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা মনের এই তিনটি মৌলিক উপাদানেই উপস্থিত থাকে। এ তাড়নার ফলে (১) তার পরিবেশের কতক দ্রব্য বা অবস্থার দিকে প্রাণী দৃষ্টি দেয়,—কতক সবাকে সে উপেক্ষা করে (২) যে দ্রব্যের বা অবস্থার প্রতি প্রাণী আকৃষ্ট, তা পেলে সে সুখ অনুভব করে—এবং তা না পেলে সে ক্ষুব্ধ হয় (৩) যে দ্রব্যের প্রতি সে আকৃষ্ট তা আয়ত্ত করতে সে চেষ্টিত হয়। ৭

সব তাড়না সব প্রাণীতে সমান প্রবল নয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতিতে জাতিতে প্রভেদ আছে। এবং একই প্রাণীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন তাড়না অধিক প্রবল হয়। তথাপি তাড়নাগুলির মধ্যেও আবার কোনটি বেশী মৌলিক প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং কিছু পরীক্ষাও হয়েছে। যাদা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে। দুরকম খাঁচা বা বাক্স দিয়ে এ পরীক্ষা করা হয়। এ হচ্ছে একটা ঘূরন্ত খাঁচা (Activity cage) ইঁদুর যত অস্থির হয় ততই খাঁচাটা ঘোরে বেশী। কতবার ঘুরলো তা ঘুরবার জন্যে একটি ঘড়ির কাঁটা আছে। স্বাভাবিক সন্তুষ্ট অবস্থায় (যখন সে কোন তাড়নার বশবর্তী নয়) ইঁদুর কতটা নড়াচড়া করে তার গড়টা (Average) আগে দেখা হয়। তারপর বিভিন্ন তাড়নার বশবর্তী হয়ে ইঁদুরটা কতবার নড়াচড়া করে তা দেখা হয়। এ কয়টি তাড়না নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে (১) বাৎসল্য (২) তৃষ্ণা, (৩) ক্ষুধা, (৪) সঙ্গমেচ্ছা (৫) খুঁটে খুঁটে দেখা, বা নড়েচড়ে বেড়ানো (exploratory drive)। যে ইঁদুরের সদ্য বাচ্চা হয়েছে তাকে বাচ্চার থেকে বারে বারে সরিয়ে দেখা হয়, কতবার সে বাচ্চার কাছে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়। তেমনি তৃষ্ণার্ত ইঁদুরকে অল্প একটু জল খেতে দিয়ে, সরিয়ে এনে দেখা হয় কতবার সে জলের নিকটবর্তী হবার জন্যে অস্থির হয়। ক্ষুধা ও সঙ্গমেচ্ছায় ইঁদুরের চাঞ্চল্য ঠিক তেমনি করেই মাপা হয়। যে তাড়নায় ইঁদুরের চাঞ্চল্য যত বেশী সে তাড়না তার পক্ষে তত প্রবল এ কথা মনে করা হয়।

আবার অন্য রকম পরীক্ষা হচ্ছে, একটা তিন কোঠা-ওয়ালা বাক্স নিয়ে (obstruction box)। প্রথম কোঠায় তাড়নাপীড়িত ইঁদুরকে রাখা হয়, দ্বিতীয় কোঠাটি খালি কিন্তু তার নীচে সূক্ষ্ম খোলা বৈদ্যুতিক তার আছে যাতে এ কোঠা পার হতে ইঁদুরকে দৃঢ় বৈদ্যুতিক 'শক্' খেতে হয়; তৃতীয় কোঠাতে আছে ইঁদুরের ঈপ্সিত দ্রব্য (তার ছানা, বা খাদ্য, বা জল সঙ্গমেচ্ছু অন্য ইঁদুর, বা কাঠ জাকড়া, করাতের গুঁড়া ইত্যাদি)। ঈপ্সিত দ্রব্যকে পেতে গেলে তার 'শক্' খেতে হয়। তাড়না কতটা প্রবল তা মাপা যায় এ 'শক্' সত্ত্বেও ইঁদুর কতবার ঈপ্সিত দ্রব্যের সম্মুখীন হয়। সি, জে, ওয়ার্ডেন ৮ এ পরীক্ষাগুলি থেকে এ ফল পেয়েছেন (সময় কুড়ি মিনিট) :

৬। Woodworth—Psychology P 382—83

৭। Mcdougall Outline of Psychology

৮। C. J. Warden Animal Motivation.

তাড়না	ইঁদুর কতবার দ্বিতীয় কোঠা পার হল
বাৎসল্য	২২·৪
তৃষ্ণা	২০·৪
ক্ষুধা	১৮২
সঙ্গমেচ্ছা	১৩·৮
নাড়াচাড়া করা	৬·০
কোন তাড়না না থাকলে	৩·৫

এ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইঁদুরের পক্ষে বাৎসল্য সর্বাপেক্ষা প্রবল তাড়না। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফল কিন্তু এক নয়। ফ্রয়েড্‌পন্থীদের মতে জীবনের মৌলিক তাড়না হচ্ছে 'কাম' বা Sex। ওয়ার্ডেন এর পরীক্ষার ফল ফ্রয়েডের মতের প্রতিকূল।

এ আদিম তাড়নাগুলির সাহায্যে প্রকৃতি প্রাণীদের মধ্য দিয়ে তার অভিপ্রায় পূর্ণ করে নিচ্ছে। এ তাড়না না থাকলে সৃষ্টি অচল হোত। কিন্তু প্রকৃতির শক্তি অন্ধ ও অচেতন, মানুষ এ শক্তিগুলোকে সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। এখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

"পাখীরে দিয়েছো গান,
গায় সেই গান,
তার বেশী করে না সে দান" [৯]

কিন্তু মানুষ স্বভাবদত্ত ক্ষমতাকে সচেতনভাবে ব্যবহার করে গান সৃষ্টি করে। মানুষের শিক্ষার এ একটা মস্ত দিক। আদিম তাড়নাগুলিকে মানুষ সংহত করে শোভন, সুন্দর ও উদ্দেশ্যমুখী করেছে। শিক্ষকের পক্ষে এই আদিম তাড়নাগুলি পরম সহায়ক হতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি বিভিন্ন সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তিকে কি করে বুদ্ধিমান শিক্ষক শিক্ষার কাজে ব্যবহার করেন।

(২)

অর্জিত আগ্রহ—Acquired Motivation

মানুষের মধ্যেও আদিম তাড়নাগুলি রয়েছে তাদের থেকে পরিণত ও জটিল মানবিক বৃত্তি সবগুলিই ভাগ-শাস্ত্রের সূত্রানুসারে পাওয়া যাবে এ আশা করা ভুল। ম্যাকৃডুগ্যাল অবশ্য সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থ যে মত প্রকাশ করেছেন সেটাই সঙ্গত। তিনি বলেছেন "আমাদের এটা ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং এটা ধরে নেওয়া উচিতও হবে না যে পরিণত মানুষের সমস্ত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ কয়েকটি মাত্র আদিম তাড়না থেকেই বিভিন্ন পরিবর্তন বা মিশ্রণ দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। পরিবেশের প্রভাবে অথবা আরো ঠিক করে বললে, মানুষ তার পরিবেশকে যে ভাবে ব্যবহার করে, তার থেকে—সম্পূর্ণ নূতন আগ্রহের সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য মৌলিক তাড়নাগুলি তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবেই কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা নানাভাবে পরিবর্তিত হবে। আদিম প্রবৃত্তিটা একই থাকছে কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যবহারের প্রভূত পরিবর্তন ঘটছে।"

আদিম তাড়নাকে মানুষ তার সচেতন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে কাজে লাগায় তার একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যাক্ সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' থেকে। খাদ্যান্বেষণ মানুষের একটা আদিম জৈব তাড়না। আমাদের চণ্ডীদাসের খুড়ো এ তাড়নাকে কাজে লাগালেন—খেয়ে দৌড় পাড়াবার উদ্দেশ্য—

"সেই খুড়ো আজ কল ক'রেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চ'লে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা,
বলব কি আর কলের কিকির, বলতে না পাই ভাষা
ঘাড়ের সঙ্গে মস্ত জুড়ে একেবারে খাসা।
সামনে তাহার খাদ্য খোলে যার যে রকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তার 'খাব, খাব', মুখ চলে তার খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে যেতে।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বলাকা
১০। Woodworth—Psychology P 383

এম্নি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে
উৎসাহেতে হাঁস্ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।
ছেলে খেলে দু দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,
পাখার গন্ধে পাগল হ'য়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ঠেলে জোরান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল তবে চণ্ডীদাসের বুড়ো।"

এ অতুল কীর্তি শুধু চণ্ডীদাসের বুড়োর নয়, সমগ্র মানব জাতের।

মানুষের মধ্যে শুধু আদিম জৈব তাড়না নয়, তার মধ্যে থাকে উন্নতর, অভিজ্ঞতাপুষ্ট, অর্জিত আগ্রহ (Acquired motives)। আদিম জৈব আগ্রহ প্রাণীর সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অর্জিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিশিষ্ট। এরা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। রস্ তাই বলেছেন "সাধারণ সুস্থ মানুষের ব্যবহারের ধারা কেবলমাত্র জৈব তাড়না (যথা সংগ্রাম, নিরাপত্তা, আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, ঔৎসুক্য ইত্যাদি) দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তার ব্যবহারের পিছনে জৈব তাড়নার ভিত্তিতে গঠিত জটিলতর আগ্রহ থাকে যা তার পরিবেশের প্রভাব দ্বারা নিয়মিত। আদিম তাড়নাগুলি সমস্ত মনুষ্যত্বের সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অর্জিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এবং তারা প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার জটিল ঐক্যের দ্বারা সংবদ্ধ।' ১২ এই অর্জিত আগ্রহ (earned motives) গুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই অর্জিত আগ্রহগুলি সচেতন ও ক্ষণস্থায়ী নয়। এরা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের স্থায়ী অবচেতন মূল যার দ্বারা তার সমস্ত চিন্তা ও কর্ম নিয়মিত হয়। এগুলিকে বলতে পারি ব্যক্তির স্থায়ী কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী (attitudes), ঔৎসুক্য (interests) ও আদর্শ (purposes)।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অনন্দার সখ (hobby) হচ্ছে বাগানের। এ সখের জন্যে সে জমানো পয়সা চা বা সিনেমার খরচ করে না। সে রথের মেলায় কেওড়াতলার মোড়ে, শেয়ালদার মোড়ে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ফুলের গাছ সংগ্রহ করে। যাদের এ সখ আছে তাদের সঙ্গে নানা ফুলের গাছ সম্বন্ধে আলোচনা করে। তাদের সঙ্গে তার বিষম প্রতিযোগিতা। একপেলা খাওয়া না হলে তার তেমন দুঃখ নেই, কিন্তু তার একটি গাছ যদি কেউ নষ্ট করে তা হ'লে তাকে সে আস্ত রাখে না। অর্থাৎ এ সখ তার জীবনের অনেকগুলি, কর্ম, সুখ, দুঃখের কেন্দ্র। এ সখ আদিম জৈব প্রেরণা নয়। এটা অর্জিত অভিজ্ঞতা লব্ধ। এটা স্বাধিক একটা উত্তেজনা নয়। এটা তার বহু অভিজ্ঞতা অনুভূতির ফল। এটা তার জীবনের একটা স্থায়ী শক্তি ও অনুভূতির উৎস। প্রতি মুহূর্তেই সে কিছু বাগান ও ফুলগাছের কথা ভাবছে না। কিন্তু তার ফুলগাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তার প্রতি গভীর আকর্ষণ আছে। এতে তার জীবন দর্শন বা রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এ সুখের জগৎটি তার নিজস্ব সৃষ্টি।

এই যে অনুভূতির অবচেতন স্থায়ী উৎস এদের আমরা বলেছি ভাব (Sentiments)। এই ভাবের উদ্দেশ্য বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির আদিম সুখ দুঃখের অনুভূতি জড়িত। রস্ বলছেন—"ভাব (Sentiment) যেন সৌরজগৎ—সেই ভাবের উদ্দেশ্য বস্তু (end—object) হচ্ছে কেন্দ্রস্থ সূর্য, তার চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে জৈব আগ্রহগুলি আবর্তিত হচ্ছে।" ১৩ এই ভাবের উৎপত্তি নিম্ন প্রাণীজগতে সম্ভব নয়। পরিণত মানসিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বলেই শুধু এর উৎপত্তি সম্ভব। কাজেই রস্ ঠিকই বলছেন, "পরিণত ভাব কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সম্ভব।" ১৪ আমরা যাকে বলি মানুষের অনুরাগ, বিরাগ, (loves & hates) তার স্থায়ী ঔৎসুক্য (interests), অভ্যাস ও রুচি সবই হচ্ছে

১১। ৺সুকুমার রায় - আবোল তাবোল পৃঃ ৮

১২। J. S. Ross—Basic Psychology.

১৩। J. S. Ross – Basic Psychology P 49

১৪। J. S. Ross—Basic Psychology P 149

আজিত স্বপ্রেরণা (Acquired Motives)। যা আমাদের এই স্থায়ী প্রেরণার উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তা আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে না। আগ্রহ হচ্ছে মনোযোগের হেতু—তা প্রসুপ্ত মনোযোগকে আকর্ষণ করে—আর যেখানে মনোযোগ হচ্ছে সেখানে আগ্রহ কর্মের দিকে ধাবিত হোল। তাই ম্যাকডুগাল বললেন, "Interest is latent attention and attention is interest in action. "কবি গাইলেন, 'আন্‌মনা গো, আন্‌মনা,

তোমার কাছে আমার বাণীর থালাখানি আনলো না।"

কিন্তু লিখতে তো একথা বললে চলবে না। তাকে তো জানতে হবে আন্‌মনাকেও মন পাওয়ার মন্ত্র। তাকে পেতে হবে ঘুমন্ত মন-রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি।

লিখার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রথম সোপান হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণ করা। আর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হ'লে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। আর আগ্রহ সৃষ্টি করতে গেলে আপনি জৈব তাড়না আদিম ব্যক্তির প্রবলতম ভাব বা অহংকারকে কাজে লাগাতে হবে। মনোযোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) রবীন্দ্রনাথ এ কথাটি জেনে-ছিলেন তাই 'ছেলেটা' কবিতায় লিখলেন,

"অঙ্কের মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল,
বিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়,—
বলে 'ইঁদুরে কেটেছে'
এতোবড়ো বাঁদর।"
আমি বললুম, "সে ত্রুটি আমারই।
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তাহ'লে ওরে পোকা এত স্পষ্ট হ'ত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনোদিন ব্যাঙের পাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে—
আর নেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডী ?" ১৫

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছেলেটা।

মানুষের মূল আগ্রহগুলি কি ? সেগুলি জানলে তবে তো তোমার মন পাওয়া যাবে, তবে তো তোমার কাছে কাজ পাওয়া যাবে ? এ প্রশ্ন আলোচনা করেছেন অনেক সাহিত্যিক, অনেক বিজ্ঞানী। ডেল্ কার্নেগী একজন জনপ্রিয় লেখক। তাঁর একখানা বই আছে —বইখানার যথেষ্ট কাটতি। তাতে তিনি এ প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন। "তুমি কি চাও ? হয়তো বেশী অনেক কিছু নয়, কিন্তু সামান্য যা কিছু তুমি চাও তা তুমি চাওই আর তা না হলে তোমার চলে না।
প্রায় প্রত্যেক সুস্থ বয়স্ক মানুষই চায়

(১) স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিপোষণ
(২) খাদ্য
(৩) নিদ্রা
(৪) অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদি
(৫) পরলোকে শান্তি
(৬) কামাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি
(৭) সন্তানদের কল্যাণ
(৮) নিজের মূল্যের স্বীকৃতি। ১৬

এ তালিকাটি সকলের মনঃপূত না হতে পারে কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই কয়েকটি প্রধান আগ্রহ বা দাবী থাকে তাতে সন্দেহ নেই। সকলের কাছে সব আগ্রহ সমান দামী নয়। এখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। এ দাবিগুলি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে (এবং দাবীগুলির পরস্পরের মধ্যে খুব একটা গভীর ঐক্যের বন্ধন নাও থাকতে পারে।) যে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন আগ্রহগুলি একটি বৃহৎ কেন্দ্র বা আদর্শের দ্বারা সংহত ও সজীব সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তত প্রকট। তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ। তাঁরা তাঁদের বিচ্ছিন্ন ও ক্ষণিক প্রবৃত্তি দ্বারা বাতাহতাড়িত হাল মাস্তুলহীন নৌকার মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে তাড়িত হ'ন না। অল্প কয়টি বৃহৎ ও দৃঢ় আদর্শ তাদের

১৬। Dale carnegie—How to win friends and Influence people

জীবনকে ঐক্য ও সুষমা মণ্ডিত করে তোলে। যেমন গান্ধীজীর সমগ্র জীবন সত্য ও অহিংসার আদর্শ দ্বারা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তাঁকে বোঝা সহজ। এ জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের মত বহুবিভক্ত ও স্বতঃবিরোধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়।

আমরা সবাই জীবনকে এমনভাবে একটি বৃহৎ কেন্দ্রে সংহত করি না। তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই সমস্ত আগ্রহের একটি কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে আত্ম-তৃপ্তি। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় বলতে পারি অহংকার। আমাদের আগ্রহগুলোর নিজস্ব কোনো দাম নেই, কোন শক্তি নেই যদি না তারা 'অহং' এর সমর্থন পায়। পুরোনো অভিজ্ঞতাবাদীরা ভাবতেন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাগুলো স্বাধীন শক্তি, তারা ব্যক্তিকে চালায়। যেখানে বিপরীত দুটো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, সেখানে প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা জয়ী হয়ে ব্যক্তিকে 'চালনা' করে। এটা নিতান্ত ভুল কথা। 'অহং' কোন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বলেই তার জোর। আপাতদৃষ্টিতে সেটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা সেটা দ্বারাই ব্যক্তি চালিত হয় না। অনেক সময় দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে যেটা প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তি তার বিরুদ্ধেই বরং কাজ করছে। তার কারণ 'অহং' নিজেকে সংযুক্ত করেছে দুর্বল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। তাতেই দুর্বল আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে জয়ী হোল। বাস্তবিক পক্ষে প্রবল বা দুর্বল হয় অহংএর সমর্থনে বা অসমর্থনের ফলে। তাই দেখা যায় জৈব আদিম তাড়নার থেকে সভ্য মানুষের কাছে উচ্চতর সামাজিক অবস্থার মূল্য বেশী। ১৮

(আগামীবারে সমাপ্য)

১৮। Muzaffar Sherif—An outline of Social Psychology.

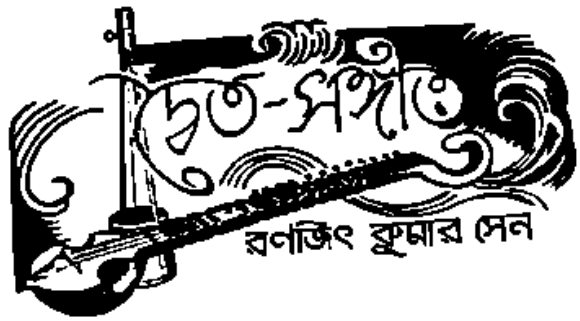

[৬] [পূর্বানুবৃত্তি]

কিন্তু মনোতোষ ক্রমেই অসম্ভব রকম গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। বুঝতে বাকী রইল না যে, এ গাম্ভীর্যের মূল কোথায়? অণিমার কাছ থেকে মনোতোষ ফিরে [illegible] হ'ছে। ছাই রে প্রেম! পাত্র-কবিতাটা পদ্মে তার উপযুক্ত মূল্য [illegible] দুঃখও হ'লো, বিস্ময়ও লাগলো। ছাপাখানায় ম্যাগাজিনের পাণ্ডুলিপিগুলো পাঠিয়ে দিয়ে অণিমাকে বল্‌লুম, 'কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না। মনোতোষের কবিতাটা এবারে অন্ততঃ সবার আগে ভালো ক'রে চারপাশে বর্ডার দিয়ে ছাপো। তবু একটা দিকে সান্ত্বনা থাকবে মনোতোষের।'

ঠোঁট চেপে অণিমা বল্‌লো, 'তুমি দেখ্‌ছি বিষয়টাকে এখনও ভুলতে পারোনি। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে, আরো ও কবিতা ছাপা হয় ম্যাগাজিনে।'

'তোমার ছোক্, মনোতোষ ভালো লেখে। কলেজের ছাত্র ব'লে ভালো লেখক হিসেবে ও দাবী ক'রতে পারে বৈকি? এখানে তোমার বা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্নটাই বড় নয়।'

দেখ্‌লাম—এবারে কথা না ব'লে কেমন একটা অভিমানের দৃষ্টি তুলে ধ'রলো আমার মুখের দিকে অণিমা। কিন্তু এখানে অণিমার অভিমানটাই বড় নয়, তার চাইতেও বড় সম্পাদনা-কার্যের দায়িত্ব-বোধ। মনোতোষের কবিতা ছেপে রাখ্‌লে সেই দায়িত্বেই শুধু ঘাটতি পড়তো না, একটা কড়ও উঠ্‌তো সেই সাথে। গ্লাশ ভর্তি ছেলেমেয়েদের মাথার উপর দিয়ে সেই কড়ের ঝাপ্টা এসে আলুথালু ক'রে দিত আমাদের। অণিমার মেয়েলী ব্যবস্থার উপর এইটুকুই যা পুরুষালী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। অণিমা অভিমান ক'রলো সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে রাগ ক'রলো না। রাগ ক'রলো তখন—যখন এবারে একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে গিয়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কাছ থেকে হাতে-হাতে তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসতে হ'লো। তাড়া খেয়ে আর একটা দিনও দেরী করেন নি অধ্যাপক, কিন্তু একটা নগ্নবড় ক্ষোভকে মনে মনে চেপে যেতে হয়েছে তাঁকে। কথা ছিল—প্রবন্ধটা শেষ হ'লে আমরা নীরব শ্রোতা হ'য়ে আদ্যোপান্ত শুনে তবেই রচনার কপি নিয়ে প্রেসে দেবো। কিন্তু এতবড় ধৈর্য ধারণে যে পরীক্ষার খাতায় অনেক আগেই ভালো নম্বর তুল্‌তে পারতুম, একথাটা জানা ছিল না অধ্যাপক সিদ্ধান্তের। নিজে তাই আড়ালে থেকে এবারে এক-রকম জোর ক'রেই ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম অণিমাকে তাঁর দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হ'লো।

কিন্তু হ'লে কি হবে, ফিরে এসে যখন সাম্‌নে দাঁড়ালো অণিমা, সারা মুখের আদল তখন তার বদ্‌লে গেছে, রাঙা পলাশের মতো একটা রক্ত আভায় সারা মুখখানি তার টল্‌মল্ ক'রছে। যুদ্ধ জয় ক'রে এলে মানুষের যা হয়। ব'ল্‌লাম, 'এবারে তুমি একেবারে সিদ্ধকাম। এরপর ভাগ্যচক্রে নিজেকে যদি কোনো অপরিচিত বরপক্ষের সাম্‌নে তুলে ধ'রতে হয়, তবে তোমার সিওর সাক্সেস্।'

এবারে মুখের সেই রক্ত আভার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে কেমন একটা নীলের স্পর্শ মেখে এলো অণিমার। কুপিত আবেশ। ব'ল্‌লো, 'তোমার সব কিছু বরদাস্ত ক'রতে পারি সমস্ত, শুধু এই ধরণের ঠাট্টাগুলো ছাড়ো। ভবিষ্যতে এমনি ক'রে তুমি আর কখনও বোলো না।'

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লাম, 'এই আমি উইথড্র ক'র্‌ছি, দোহাই, রাগ কোরো না লক্ষীটি।'

কিন্তু তখনও অণিমার ঠোঁট দু'টি কেমন একটা রুদ্ধ আবেগে কাঁপ্‌ছে। কে ব'ল্‌বে বিংশ শতাব্দীর মেয়ে! উনবিংশ শতাব্দীর লজ্জা নিয়ে আর সারা বুকে অভিমান চেপে এ যুগেও যে কোনো মেয়ে একা ঘর থেকে বেরিয়ে কলেজে আস্‌তে পারে, তা অণিমাকে না দেখ্‌লে বোঝাই যায় না। আসলে এইটেই ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমার সম্পর্কে কেমন ক'রে যে ওর এতখানি বৈচিত্র্য ঘট্‌লো—মাঝে মাঝে সেইটুকু ভেবেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। বিংশ শতাব্দীর প্রগতিবাদী যুবক হ'য়েও আমি কিন্তু ওর ঐ বৈশিষ্ট্যের জালেই উর্ণনাভের মতো জড়িয়ে গেলাম। অণিমা যদি আর-পাঁচজন মেয়ের মতো কাঁধে ভ্যানিটী ব্যাগ নিয়ে কখনও কোনো চ্যারিটি-শোর চাঁদা আদায়ে বেরোতো, কিম্বা হিল্ তোলা জুতোর রাস্তার পাথরকে সচকিত ক'রে বৃথাপথে পুরুষবন্ধুদের সহগামিনী হ'তো কোনো রেস্তোরাঁয় অথবা কোনো সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে, তা-হ'লে হয়ত দূর থেকেই অণিমাকে দেখে মনে মনে কোনো আধুনিক অভিনেত্রীর সঙ্গে মিলিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া যেতো, কিন্তু এমন ক'রে ভালবাসা যেতো না—যে ভালোবাসা, যে প্রেম আজ নিবিড় থেকে নিবিড়তম হ'য়ে উঠেছে ওর সঙ্গে।

যথাসময়েই ম্যাগাজিন প্রকাশিত হ'লো। অধ্যাপক সিদ্ধান্তের প্রবন্ধটাতেই বইয়ের প্রায় অর্দ্ধেকটা ভ'রে গেল। এই নিয়ে অধ্যাপক মহলে যে কিছু উষ্মার কারণ না ঘ'টলো, এমন নয়। ছাত্ররাও কেউ কেউ আলোড়ন তুললো এই নিয়ে। ম্যাগাজিনের একটা বায়গা নাকি নিতান্তই 'বৃদ্ধ বালকের ভিমরতি' দিয়ে সম্পাদকীয় বিভাগের ছেলেখেলায় সাজিয়ে দেওয়া হ'য়েছে; নইলে আরও অন্ততঃ তিনজন অধ্যাপকের চিন্তাশীল প্রবন্ধ এবং চারজন ছাত্র-ছাত্রীর বিভিন্ন রচনায় সংখ্যাখানি শোভন ও সমৃদ্ধ হ'তে পারতো। কিন্তু কি যে হ'তো আর কি যে হ'তে পারতো না—এই নিয়ে অন্ততঃ মনোতোষ হ'লে তার সাথে তর্ক ক'রতে পারতুম, কিন্তু এবারে মনোতোষের গলা একেবারেই নিষ্প্রভ। বুদ্ধি ক'রে তার কবিতা প্রকাশ ক'রেছিলাম, এইটুকুই যা রক্ষা। নইলে কবে হয়ত সে আমার আর অণিমার নামের উপর একটা কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে ব্ল্যাক বোর্ডে পড়িমাটির অপব্যবহার ক'রে অধ্যাপক সিদ্ধান্তকেই পরোক্ষে কিছু অপমান ক'রে ব'স্‌তো। আশ্চর্য নয় কিছু, যে ছেলে বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ-কিছু একটা উদ্দেশ্যমূলক কবিতা লিখে অণিমাকে সোজা এসে প্রেম প্রার্থনা ক'রতে পারে, সে যে বাঁকা পথে অধ্যাপকের গায়ে একটা সামান্য আঁচড় দিতে পারবে না, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ছুটির পর সেদিন একথার সূত্র নিয়েই কিছুক্ষণ কাটলো অণিমার সঙ্গে।

জিজ্ঞেস ক'রলাম,

থেকে?'

—'মনে আবার ক'রবো কি! জানো তো—যে যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না।' থেমে অণিমা ব'ল্‌লো, 'দেখ্‌লাম—অধ্যাপক মহলের আলোড়নটাই এবারে বেশী। জাইস্ প্রিন্সিপাল নাকি বলেছেন, ম্যাগাজিন সম্পর্কে নিয়ম করা উচিত—কারুর কোনো লেখাই চার, ছ' পৃষ্ঠার বেশী ছাপা চ'ল্‌বে না। শুনে অবধি অধ্যাপক সিদ্ধান্ত লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছেন; অথচ আমরা চেপে না ধ'রলে সত্যিই তো তিনি লিখ্‌তেন না। যাই বলো, অধ্যাপক মহলের বাড়াবাড়িটা কিন্তু ঠিক সহ্য ক'রবার মতো নয়!'

ঈষৎ ঠাট্টার সুরে ব'ল্লাম, 'মনে ভয় হ'য়েছে বুঝি? অধ্যাপক সিদ্ধান্তের ভয়ে আর ভয় নেই। প্রোফেসারদের তরফ থেকে কিছু মন্তব্য-প্রকাশ পেলে তাঁদের অন্ততঃ এটুকু ভয় থাকবে যে, প্রতিবাদ উত্থাপিত করবার মতো শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষেও কেউ আছে।'—কিন্তু কথাটা হঠাৎ ব'লে ফেলে নিজের জিভেই নিজে কামড় খেলাম। এ জাতীয় ঠাট্টা যে আর অনিমার সঙ্গে চ'ল্‌বে না, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই অনিমা আমাকে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে সাবধান ক'রে দিয়েছে। কিন্তু দিলে হবে কি, স্মরণে থাকলে তো সেই সাবধানতা। আসলে সংসারে ঠাট্টা ক'রবার মতো মানুষের একেবারেই অভাব। কলেজ-বন্ধু আর ক্লাস-ফ্রেণ্ড্‌ ব'ল্‌তে যাদের মধ্যে ব'সে সারাদিন কাটাই, তাদের একরকম ভয় করেই চ'ল্‌তে হয় এখন।

কিছু ভালোবাসার ক্ষেত্র, যা কিছু ঠাট্টার ক্ষেত্র —তা একমাত্র অনিমা। মাঝে মাঝে ভাবি—যদি কো-এডুকেশন-ক্লাস না থাকতো, যদি না ঘ'টতো অনিমার সঙ্গে পরিচয়, তবে অধ্যয়ন-তপস্যার মধ্য দিয়ে কী নিশ্চিন্তভাবেই না দিনগত পাপক্ষয় করতে হতো! অনিমার সঙ্গে রসিকতা করতে তাই এমন উন্মুখ হ'য়ে উঠি।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, কথাটার উপর এবারে আলো গুরুত্ব আরোপ ক'রলো না সে। বরং কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'জানো সুমন্ত, বাসার ইরানীং বাস করা বড় দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে।'

অধীর ঔৎসুক্যে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কারণ?'

সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে অনিমা ব'ল্‌লো, 'কারণ নতুন কিছু নয়, আমার এই বয়সের ভরা তরী আর সংসারের দারিদ্র্য। হয় বিয়ে, না হয় চাকুরী। এ কথা আগেও তোমাকে লুকোই নি। অথচ দু'টোই আপাততঃ আমার পক্ষে অসম্ভব। একদিকে আসন্ন পরীক্ষা, অন্যদিকে তেম্‌নি চাকুরীর অভাব। অথচ জানি, পাশ করে বেরিয়ে চাকুরি সংগ্রহ না ক'রলে হাবুডুবু খাবেন বাবা। আমাকে আজ পরের ঘরে ঠেলে দিলেই কি বাবার সংসার নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে? পারবে না। অথচ এই নিয়েই মার সঙ্গে বিরোধ।'

ব্যথাহতকণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'মা কি তবে বুঝতে রাজি ন'ন্ যে, পাশ করাটাই আগে প্রয়োজন! সামনে বৈশ্‌, এত দূর এগিয়ে এসে এ সময়ে কেউ ভরা-ডুবি করে?'

—'কার্যসিদ্ধি হ'লে হয়ত ভোবাতে মা'র আপত্তি নেই।' ব'ল্‌তে গিয়ে অনিমার চোখের পাতা দুটো অলক্ষ্যে একবার লাফিয়ে উঠ্‌লো।

ব'ল্‌লাম, 'তোমার মা এতখানি অবুঝ হবেন, তা ধারণার অতীত।'

শান্তকণ্ঠে অনিমা ব'ল্‌লো, 'সংসারে এমন কত বস্তুই তো মানুষের ধারণার অন্তরালে থেকে যায়। আসলে আমার মাকে যা মনে ক'রছ, ঠিক তা নয়। বাইরে থেকে মার অন্তরের কথাকে বুঝবার উপায় নেই। পরীক্ষায় যে এশিয়ার হচ্ছি, ফিসের টাকা আসবে কোত্থেকে?—এতবড় সমস্যা যে-সংসারে, সে-সংসারে মার অবুঝ হবার কারণ আছে বৈ কি! তাই নিয়েই তো ঝগড়া!

কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে ব'ল্‌লাম, 'ফিসের টাকা ধরো শেষ পর্যন্ত যোগাড়ই হ'লো, কিন্তু তুমি যা ব'ল্‌ছো—তা যে রীতিমত বিপদের কথা।'

ম্লান হেসে কি যেন একবার চিন্তা ক'রলো অনিমা। বোধ করি নিজের গোটা ভবিষ্যৎটার উপর দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আন্‌লো! তারপর ব'ল্‌লো, 'বিয়ের ভয় ক'রছো, এই তো? বিয়ে আমি ক'রবো না। এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি সুমন্ত, আমার ইচ্ছে ভিন্ন বিয়ে আমাকে কেউ দিতে পারবে না।'

ব'ল্‌লাম, 'মার মনেরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে! সত্য হ'লেও মায়ের প্রাণ। লেখাপড়া শিখে শেষ পর্যন্ত কি মায়ের মনে এতবড় একটা আঘাত দেওয়া তোমার উচিত হবে?'

—'লেখাপড়ার গর্ব আমার নেই, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে যদি মা আঘাত পান তো আমি কি ক'রতে পারি।' থেমে শিশুর মতো গলা ক'রে, এবারে অণিমা ব'লে গেল, 'আমি কি পাশ ক'রতে পারবো না সুমন্ত, পারবো না কি অনার্স নিয়ে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে?'

উৎসাহ দিয়ে ব'ললাম, 'আজ হঠাৎ মনের এই অস্বাভাবিক দীনতা কেন? একদিন তুমিই তো দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলে: অনার্স আমাকে পেতেই হবে। সংশয় আসবে কেন অণিমা, সাকসেস্ তোমার সুনিশ্চিত। এমন এগ্জামিনার নেই—যে তোমার পথ রোধ ক'রতে পারে।'

এবারে বোধ করি মনে মনে কিছুটা উৎসাহিত হ'য়েই থাকবে অণিমা। আর দ্বিরুক্তি না ক'রে কিছুক্ষণ কেমন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল' সে।

মনটা যে আজ ওর হঠাৎ বড় আঘাত-জর্জর হ'য়ে উঠেছে, একথা বুঝতে বাকী ছিল না। সন্ধ্যা প্রায় গড়িয়ে আসছিল। ওর মনের উপর খানিকটা সুস্থতা আনবার জন্যেই ব'ললাম, 'চলো না, খানিকটা হাওয়া খেয়ে তবে বাড়ী ফিরবো।'

আপত্তি না ক'রে এক কথাতেই রাজী হ'য়ে গেল অণিমা; কোনদিনই কোনো কথাতে আমার অরাজি হয়নি সে; আজও তাই মনে কোনো দ্বিধা না রেখেই বললো, 'চলো।'

কিন্তু আজ আর সেই প্রথম দিনের মতো শুক্লা তিথি নয়। সামনেই অমাবস্যা। কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার আকাশ জুড়ে। হাঁটতে হাঁটতে আবার এসে সেইখানটায় ব'সলাম—যেখান থেকে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করে সেদিন কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর দিয়ে দেখেছিলাম সন্ধ্যাকাশে স্নিগ্ধ মধুময় চাঁদের আবির্ভাবকে। আজও সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিংশার কৃষ্ণচূড়া, কিন্তু আজ আর তার শাখায় শাখায় ফুলের সমারোহ নেই, ভাসা ভাসা অন্ধকারে সেও আজ ধূসর হ'য়ে উঠেছে। অনুভূতির এও একটা অদ্ভুত লক্ষণ। জ্যোৎস্না আনে মানুষে মানুষে, দেশ-কাল-পাত্রে ব্যবধানের একটা সূক্ষ্ম রেখা টেনে; অন্ধকার আনে সব কিছুকে এক ক'রে দিয়ে। অপূর্ব একটা অনুভূতি লুকিয়ে র'য়েছে এই অন্ধকারকে কেন্দ্র ক'রে। মনে হ'লো—অন্ধকার ভিন্ন বুঝি সাম্যবাদ আদৌ সম্ভব নয়; যেখানেই অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠেছে, সেখানেই সমাজতন্ত্রবাদী সংগ্রামে সাম্যবাদ এগিয়ে এসেছে দ্রুত পায়ে।

নিজের অলক্ষ্যেই কণ্ঠস্বরকে একবার উদগ্র ক'রে তুললাম: 'জানো অণিমা, এতদিনে একটা ইজমের সন্ধান খুঁজে পেলাম।'

—'কি সেটা?' অন্ধকারের মধ্যেই চোখ দুটোকে একবার গাঢ় ক'রে আমার মুখের দিকে তাকালো অণিমা।

ব'ললাম, 'সারা দেশ আজ সাম্যবাদের নীতিতে ক্ষেপে উঠেছে, এর কারণ কি জানো?'

—'কি ব'লো?'

—'কারণ অমাবস্যা। দীপ্ত ভানু ঊর্ধ্বাকাশে তার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ক'রে দাঁড়িয়েছে, ফলে জড়-প্রকৃতির বুকে রচনা হ'য়েছে ছায়াপথ। এই ছায়াপাত ঘটেছে ব'লেই দেশে আজ এমন ক'রে সাম্যবাদী প্রয়াস গড়ে উঠেছে। আসলে অন্ধকার হ'চ্ছে সমতার আধার, সব একাকার সেখানে। সেই সমতা থেকেই সাম্যবাদ।'

শুনে খিল্ খিল ক'রে হেসে উঠলো অণিমা। অন্ধকারে ওর মুখের আদল স্পষ্ট হ'য়ে না উঠলেও হাসির ঝলক স্পষ্টই অনুভব ক'রতে পারলুম। যেন কোন্-গিরি গুহা থেকে অকস্মাৎ উঠে আসা উচ্ছ্বসিত নির্ঝরণ। ঝর্ণার মত হাসি অণিমার মুখে। ব'ললো, 'তুমি কি হঠাৎ পাগল হ'য়ে গেলে নাকি?'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কেন, লক্ষণ কিছু বুঝতে পারছো নাকি?

তেম্‌নি ক'রেই হাসির বেশ টেনে অণিমা ব'ল্‌লো, 'শুধুই আঁধার কোথায় বা সামাবাদ কোথায় বা অন্ধকার, যেমন তুমি, তেম্‌নি তোমার বিদ্রোহী। দেখ্‌ছি, একেবারে খ্যাপা কিলজফার হ'য়ে দাঁড়ালে তুমি।'

অণিমার মুখে যে ঠিক এম্‌নি একটা কথাই প্রকাশ পাবে, তা আমার আগেই জানা ছিল। আসলে ওকে হাসাতেই যে এখানে এই অন্ধকারে টেনে নিয়ে এলাম! অণিমা আমার সামাবাদের বিদ্রোহীকে স্বীকার করুক, এই অন্ধকারের বিলুপ্ত পরিবেশে তার আর আমার একাত্মতাকে তো স্বীকার ক'রবে বটেই। তা হ'লেই খুসী।

আসলে বিদ্রোহী কল্‌চাতে যে এখানে আসিনি, সে তো আমিও জানি। ব'ল্‌লাম, 'আসলে কি জানো, তোমাকে কাছে পেলেই আমার মনের নিশু অকস্মাৎ উন্মত্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। তাকে রোধ ক'রতে যাওয়া পাপ। প্রকৃতির কোলে যে বাড়ে, তাকে বাড়তে দাও।'

কথা কাটলো অণিমা।—'বাড়তে দিতে দিতে হঠাৎ যদি বড় বেশী বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়, তাকেও যে বরদাস্ত করা মুস্কিল।'

বল্‌লাম, 'কিন্তু মুস্কিল নেই। মুস্কিল আসানের জন্যেই যে আমাদের এই নয়দানের আশ্রয় নেওয়া!'

—কথায় তোমার সঙ্গে পারে কার সাধ্যি!' বলে কৃত্রিম পাণ্ডীত্যের ভান ক'রলো অণিমা।

সহজকণ্ঠেই ব'ল্‌লাম, 'কথা দিয়ে দরকারটাই বা কি! তার চাইতে এস, আরও কিছুটা এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে বসো, দু'জনের এক অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করি এই অন্ধকারকে।' প্রথম দিনের মতই আজও দক্ষিণ হাতখানিকে প্রসারিত ক'রে দিলাম অণিমার দিকে। দেখ্‌লাম—এবারও কিছুমাত্র দ্বিধা করলো না অণিমা, অত্যন্ত সহজেই আমার হাতে ধরা দিয়ে কাছে এগিয়ে এলো। ব'ল্‌লো, 'তোমাকে আজ হঠাৎ এমন কাব্যে পেলো কি ক'রে সুমন্ত?'

জবাব দেবার কিছুই ছিল না, তবু ব'ললাম, 'জানোতো, বেদনার সঙ্গে বেদনা যেখানে এসে বাসা বাঁধে, সেখানেই হয় সত্যিকারের কাব্যের সৃষ্টি!'

অণিমার চোখে এবারে বিস্ময়। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও সে-বিস্ময় স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, তার সঙ্গে ছোট্ট একটা জিজ্ঞাসা: 'কেন, তোমারও আবার ব্যথা বোধ ব'লে কিছু আছে নাকি?'

—'নেই আবার!' দু'হাতের বন্ধনের মধ্যে অণিমাকে আবদ্ধ ক'রে ব'ললাম, নিজেদের সংসারটাকেই তো তুমি কেবল বড় ক'রে দেখেছ, আমাদের সংসারটার দিকে তো তাকাও নি! আমার পড়ার ঘরের বাইরে যেখানে মা আর বাবার প্রাত্যহিক সংসার-ধর্ম খাড়া চেঁকির মতো উঁচিয়ে র'য়েছে, সেখানে আমার স্থান কতখানি সীমাবদ্ধ, ভাবতে পারো? আমি না হ'য়ে যদি সেখানে তুমি হ'তে, তবে আজকের এই কলেজিয়ানা একেবারেই বরবাদ হ'য়ে যেতো। দিদির জীবনে এ দুঃখ লক্ষ্য ক'রেছি। চেষ্টা ক'রে ম্যাট্রিকটাও পাশ ক'রতে পারেনি দিদি, তার আগেই তাকে বিয়ে দিলেন বাবা।—'

বাধা দিয়ে অণিমা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'মেয়েদের বেশী লেখা-পড়া তবে তোমাদের সংসারে অচল?'

ব'ল্‌লাম, 'অচল না হ'লেও কোনোদিন চালু দেখিনি। দিদির পরেই আগ্রহ কার্তিক তো একমাত্র আমি, অতএব তেমন ক'রে দেখ্‌বার সুযোগই বা পেলাম কোথায়! কিন্তু আমাকে দিয়েই বুঝ্‌তে পারি—শিক্ষার কি অদ্ভুত বন্দী দশা আমাদের ঘরে!'

মনে হ'লো, চোখ দু'টো যেন একবার কেঁপে উঠ্‌লো অণিমার!—'একথা তো এমন ক'রে কোনোদিন বলোনি তুমি?'

—ব'লবার মতো মনে করিনি ব'লেই বলিনি।' থেমে ব'ল্‌লাম, 'ব্যাপার কি জানো, তার জমিদারীর ঐতিহ্যে বাবা মানুষ। কাউন্সীর বিল অকল থেকে

এখনও আমাদের জমিদারীর কিছু আয় আছে, নিঃশেষিত জমিদারীর ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জীবনে কিছু-একটা ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বেছে নিতে হ'লেও সেই যাজনার টাকা তাদের কিছু-একটা অবলম্বন তো বটেই। খোঁড়া সনাতনধর্মী হিন্দু-রক্তে মানুষ বাবা, লেখা-পড়ার ব্যাপারটা খুব বেশী গ্রাহ্য করেন না কোনোদিন। কিন্তু এযুগের মানুষ হ'য়ে আমি কেন থাকবো সেই অন্ধ কুসংস্কারকে আঁকড়ে? জোর ক'রে তাই পড়ে চ'লেছি। জীবনে ইতি আর জ্ঞান ভিন্ন সব কিছুই মিথ্যে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অণিমা ব'ল্লো, 'কিন্তু —কিন্তু অতিবড় বিদ্বেষবাদিনী হ'য়েই বা তুমি কি ক'রবে? আসলে বিদ্বেষটাকেই হয়ত তোমার বাবা ভয় পান!'

ব'ল্লাম, 'বাবা ভয় পেলেও আমারও তো জীবন বোধ ব'লে কিছু আছে! নিজের শিক্ষা দিয়ে শক্তি দিয়ে যা অর্জন ক'রতে পারলুম না, তাকে আমি নিজের ব'লে ভাবতে পারিনা। আমি অন্ততঃ মানুষ হ'য়ে মানুষের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই। সেখানে স্নেহ হ'য়ে ভালোবাসা হ'য়ে চিরকাল আমাকে জড়িয়ে থাকবে তোমার এই হাত দু'খানি।'

কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে অণিমা ব'ল্লো, 'তরসার পথ যে তুমিই বন্ধ ক'রে দিচ্ছ সুমন্ত -'

আঁৎকে উঠ্লাম কথা শুনে।—'কেন?'

—'কেনরও জবাব চাই?' অণিমা ব'ল্লো, ভেবে-ছিলাম তুমি কিছু বুদ্ধিমান, এখন দেখ্ছি একেবারেই হাবা তুমি।'

—'হাবা হ'লেও নির্বোধ নই।' ব'ল্লাম, 'দরকার নেই সংসারের কথা ভিয়ে। তার চাইতে এই যে নিবিড় ক'রে সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তোমাকে পাচ্ছি, এই মুহূর্তটাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও ভোগ ক'রতে দাও আমাকে লক্ষীটি।'

—'বাকী আছে কি কিছু?' ব'লে আড়ালে হাসি চেপে নিল অণিমা।

ব'ল্লাম, 'সে কি আমার চাইতে তুমিই ভালো জানোনা? আসলে শেষের মধ্যে অশেষ আছে ব'লেই না মানুষের আকাঙ্ক্ষা কোথাও একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে না! বাকীটুকু আগামী দিনের জন্যে তোলা থাক্, নগদ মূল্যে আজ তাকে আগামীকালের জন্যে পুরনো ক'রে তুল্তে চাইনা।'

এবারে আর কেন যেন কথা ব'ল্তে পারলো না অণিমা। আলস্যজড়িত অবশ দেহখানিকে শুধু আরও সহজভাবে ছেড়ে দিল আমার দুই বাহু বন্ধনের মধ্যে। নীরবে তার কুন্তল এলায়িত কপোলে অধরের ছোট্ট একটা স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে ব'ল্লাম: 'জানিনা, এটুকু কতখানি সত্য হ'য়ে থাকবে জীবনে, শুধু এর একটা বিশেষ মূল্যের সাক্ষী হ'য়ে রইল আজকের দিগন্তপ্রসারী অন্ধকার। জানি, কোনোদিন ভুল বুঝ্লেও কখনো ভুল ক'রবে না তুমি।'

এবারও অণিমার মুখে কিছু-একটা কথা প্রকাশ পেলো না। তাবার জগৎ ছাড়িয়ে সে একেবারে অনুভূতির রাজ্যে গিয়ে ডুব দিয়েছে কিনা, কে ব'ল্বে! একটুকাল নীরব থেকে ব'ল্লাম, 'গান গাইতে ব'লে তোমাকে অপমান ক'রবো না, কিন্তু খুসী হবো—যদি আজ একটা আবৃত্তি শোনাও তুমি। একথা ব'লে অন্ততঃ নিজেকে প্রতারণা ক'রতে পারবে না যে—ভালো কবিতা কিছু তোমার মুখস্থ নেই।'

দেখ্লাম আলস্য কাটিয়ে উঠ্তে এবারে একটুও বেগ পেতে হ'লো না অণিমাকে। ব'ল্লো, 'খুসী হ'তে তো আমিও জানি! তুমিই বরং কিছু একটা আবৃত্তি করো, আমি শুনি।'

কথা কেটে ব'ল্লাম, আজ আর আমি নই, আজ শুধু তুমি! তোমার কাছ থেকেই আজ সবটুকু পেতে চাই, নইলে আমার এই তামস-তপস্যা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে!'

—'ভীষণ দুষ্টু তুমি, তোমাকে নিয়ে আর পারিনা।' ব'লে কিছুক্ষণের জন্য আবার থামলো অণিমা, তারপর

হেসে অণিমা ব'লে উঠলো, 'আজকের রাত্রিতে কি বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই কেটে দিতে চাও?'

একেবারেই নির্লজ্জ হ'য়ে ব'লে ফেললাম, 'বউ পেলে বইয়ের পাতা আপনিই বুজে যায়। তাতে অপরাধ নেই।'

—'ভালগার।' কেমন একটা অদ্ভুত স্বরে এবারে খিঁচিয়ে উঠলো। 'আর যাই হও, তুমি আর্টিষ্ট হ'তে পারবে না কোনোদিন হুমন্ত। বড্ড এক্সপ্রেস্ট্ তুমি।'

ব'লে ফেললাম, 'এক্সপ্রেশন থেকেই যে ইম্প্রেশন। কিছু ব'ললে কিছু ধারণা হবে কোত্থেকে? তোমরা অনুভব করো, আর আমরা অনুভব করাই। তাই তো আমরা পুরুষ। প্রকৃতির মধ্যে তাইতো আমাদের পরম আনন্দ। নারী হ'চ্ছে আমাদের সেই আনন্দের প্রকৃতি।'

—'আচ্ছা, হ'য়েছে, এবারে তোমার বক্তৃতা রেখে ওঠো। আমি আর দেরী ক'রতে পারছি না, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রলো এবারে অণিমা। বাধ্য হ'য়ে তাই উঠতে হ'লো। তারপর অন্ধকারের বুক চিরে পায়ে-হাঁটা পথে সোজা দু'জনে দু'দিকে—একেবারে বাড়ীমুখো।

[ক্রমশঃ]

তাই চলে চলে
নদীর পুরাতন আকাঙ্ক্ষা তাহারি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

উদ্বৃত্ত যৌবন-দম্ভের
নেই, তবু হালকা চলতা
আর একবার চুম্বন আবেগে
কাছে এগিয়ে আনলাম।
এতটুকুও তার সইলনা।
অকস্মাৎ আমার বাহুবন্ধন

প্রভাত দেবসরকার

উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

খাওয়া দাওয়া সেরে রমাপতি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছিলেন। দশ-বিশ ধাপ নেমেছেন কি পিছন থেকে মাধুরী বললে, খেয়েই অমনি বাইরে চললে!

সিঁড়ির মাঝখানে রমাপতি থমকে দাঁড়ালেন, নাতনীর আবার কি হুকুম হয়!

সিঁড়ির মাথার ওপর এসে মাধুরী বললে, শোবে না! বিছানা করেচি!

চোখ তুলে চেয়ে রমাপতি হেসে বললেন ছি, ছি লোকে শুনলে কি বলবে! দিন দুপুরে!

মাধুরী কপট ক্রোধ প্রকাশ করলে, তারি অসভ্য! না, তুমি যেতে পারবে না—উঠে এস বলচি! খানিক জিরিয়ে তারপর যেখানে খুসী যেও—

কেন? তোর কথায়! বুঝি নাতনীর শাসন আর মানতে চান না রমাপতি। অবাধ্যতা করতে চান।

যার কথায় হোক, এই ঠিক দুপুরে তুমি কোথাও যেতে পারবে না, বলে দিচ্ছি—মাধুরী শাসনের সুরে বললে।

রমাপতিও তেমনি মেজাজ দেখিয়ে বল্লেন, বললেই অমনি শুনচি! কেন, ছেলেমানুষ পেয়েচিস্ আমাকে?

মাধুরী হেসে ফেল্লে, না, তুমি খুব বুড়ো মানুষ এখন দয়া করে উঠে এস—তামাক পুড়ে যাচ্ছে। বিছানা করা আছে—কানে আঙুল দেন রমাপতি, বিছানা, বিছানা করিসনি বেহায়ার মত!

কেন? বিছানায় কি দোষ করলে! সিঁড়ির মুখে তেড়ে এসেছে মাধুরী। হঠাৎ বুঝি তামাকের গন্ধটা পান আমোদ করা মন মাতান, ক্ষুণ্ণ করা। দু'জনের কেউ কথা কয় না কিছুক্ষণ। অঘুরি তামাকের খোসবাই-এ কোথায় যেন মন-বোঝাবুঝির ইঙ্গিত রয়ে গেছে।

মনে মনে খুসী হয়েও নিস্পৃহ গলায় রমাপতি বললেন, চল তামাকটা খেয়েই যাই।

না, তোমাকে যেতে হবে না! খেয়ে উদ্ধার করচেন! সিঁড়ির সামনে মাধুরী দাঁড়িয়ে থাকে।

খোসামোদ করেন রমাপতি, তোর মত কেউ তামাকই সাজতে পারে না! বেটা চুনী তামাকের সঙ্গে লঙ্কা বিচি মেশায় আজকাল—কেশে কেশে দম বন্ধ হ'য়ে যায়।

তাই খাবার জন্যে রাতদিন বাইরের ঘরে পড়ে থাক! মুখেই কেবল—অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠ মাধুরীর।

তা বলে তোকে দিয়ে তামাক সাজাব রাতদিন? আমার দিদি কিনা তামাক সাজবে! আরশীতে দেখে আয়তো কি রকম হ'য়ে গেছে মুখের রঙটা—কেন কলকেতে ফুঁ দিতে গেলি! তামাকটা বাইরে খেতে দোষ কি! রেলিং ধরে রমাপতি ঊর্ধ্বমুখে উঠতে থাকেন।

চুনীদাকে বলেচি দু'বেলা দু'কল্কের বেশি যেন তামাক না সাজে! বেশ করে লঙ্কার বিচি দেয়! রাতদিন তামাক—

তাই বলি, ঘরের শত্রু বিভীষণ! সেই জন্যেই লোকগুলো আর মানতে চায় না। মাথায় ওঠে—রমাপতি মাধুরীর হাত ধরে নাড়া তাই জন্যে বেটার আস্পর্ধা আজকাল! তামাক চেয়ে পাওয়া যায় না, ডেকে ডেকে গলা ফাটালেও সাড়া মেলে না। কেমন যেন উড়ু উড়ু দেখতে পাই।

মাধুরী চুপ করে থাকে। মনেই হয় না ঠাকুর্দার কথাগুলো তার কানে যায়। ভেতরে ভেতরে কৌতুক বোধ করে।

চুনিদা। হারানচাদা চুনী আবার দাদা হ'লো কোত্থেকে। ছোটলোকের মান বাড়ান! এসব আবার কার কাছে শেখা হ'চ্ছে? ডাক্তার বুঝি? রাগই করেন রমাপতি।

হঠাৎ দু'জনেই চকিত হ'য়ে ওঠেন। সিঁড়ির তলায় একটি নারীমূর্তি দেখা যায়। অবগুণ্ঠনবতী হলেও মাধুরী চিনতে পারে—ওবাড়ীর ফুলকাকীমা, ডাক্তার কাকার স্ত্রী।

রমাপতি সরে দাঁড়ান। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর হঠাৎ আগমনে কেমন যেন বিচলিত বোধ করলেন। মানে উনি কখনো আসেন না এবাড়িতে।

মাধুরী বললে, তুমি যাও দাদু মায়ের ঘরে গিয়ে বসো। তোমাকে ডেকেছে আছে—নলটা খাটের ছত্রীতে কে লিখে আছে!

রমাপতি খাবার উপক্রম ক'রতে নীচের মাদুরটি স্পষ্ট গলায় বললে, না, উনি থাকুন। ওঁর কাছেই এসেছি—

হঠাৎ? দুজনেই বিস্ময় বোধ করে। সম্পর্ক যাই হোক, সহজে আসবার লোক ওঁরা নন।

রমাপতি এগিয়ে এলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আমাকে কিছু বলবেন না? বলুন।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েই ফুলকাকীমা গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম করলে। রমাপতিও হাত তুললেন।

সিঁড়ি বেয়ে মাধুরী নেমে এসে কাকীকে সঙ্গে করে উপরে উঠে এল। মানী অতিথির মান রাখার মত।

মায়ের ঘরে খাটের ওপর এসে রমাপতি বসলেন। কেমন যেন তার সব বিস্মরণ হ'লো। হঠাৎ ওবাড়ির বৌমা আবার কি উদ্দেশ্য নিয়ে এলেন? মনে হ'চ্ছে খুবই ভক্তিমতী বৌটি, বিয়ের পর ক'টা বছরই বা দেখেছেন—তখন খুবই ছেলেমানুষ, কি-ই বা বোঝা যায়! তার পর ঐ একগুয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র! ভেদ ভাতে আর কোন সম্বন্ধ রাখেনি!

মাধুরী দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, ঘরের বাইরে দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ইন্দু, ফুলকাকীমা! স্তব্ধ দ্বিপ্রহর অধিকতর স্তব্ধ মনে হয়। কেবল গড়গড়ার শব্দটা অধিকতর উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে।

মাধুরী দাদুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, কি কাকীমা! কি বলবে বল? ঘোমটাটা ইন্দুমতীর কপালের ওপর উঠে গেছে, সিঁথির সিন্দুর কিছুটা উদ্ভাসিত। যেন এই অতীত দ্বিপ্রহরে সঙ্গে কোথায় তার মিল আছে বর্ণে, ভাবে, সৌন্দর্যে!

ইন্দুমতী খানিক ইতস্তত করলে, হয়তো ভাবলে সত্যিকারের কিছু তার বলবার নেই। আসাটা তার উচিতই হয়নি। স্বামীকে যে কথা জিজ্ঞেস করে উত্তর পায়নি, এখানে তার প্রত্যাশা শুধু বৃথাই নয় অহেতুক। কি হ'বে জিজ্ঞেস করে, কি হবে দরবার করে! যদি গিয়েই থাকে তাকে ফিরে পাবার সম্ভাব জাতির সঙ্গে তারা রাখেনি।

মৃদুকণ্ঠে ইন্দুমতী বললে, আমরা কি বৈরাগী মহলের খাজনা আর পাব না?

কিছু সাড়াশব্দ ক'রলেন না রমাপতি। গড়গড়াও স্তব্ধ। ছাদের আলসের রোদ হেলে গেছে।

মাধুরী বললে, কি দাদু! কাকীমা জিজ্ঞেস করছেন?

রমাপতি বললেন, কেন? কেন? খাজনা দেবে না কেন!

মাঝখানে মাধুরী না থাকলে মুখোমুখি দেখাত ইন্দুমতী কে, বললে আপনার নিলাম খরিদ বলে লোক ফিরিয়ে দিয়েছে মহলের প্রজারা!

যেন ধরা পড়ে গেছেন রমাপতি, আমতা আমতা করলেন, নিলাম খরিদ তো অমন কত আছে, খাজনা না দেবার ফন্দি যত সব বেটাদের! কে গিয়েছিল?

ইন্দুমতী বললে, গুরুপদকে পাঠিয়েছিলুম।

ও গুরুপদ দুরুপদর সাধ্য নয়। যে বোকে-সোকে তাকে পাঠিও! আমি বলে দেব—রমাপতি বললেন।

যদি আমাদের স্বত্ব না থাকে তা হ'লে মিছি মিছি—ইন্দুমতীর স্পষ্ট বলতে যেন কেমন বাধে। হয়তো কোন্তে অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

থাকবে না কেন? আমি তো সুবোধকে সে-কথা অনেকদিনই বলেছি. আমার পত্তর আগে যেমন চল্‌ছিল এখনো তেমনি চলবে, এর মধ্যে আবার এসব কথা কেন·····ভেতরে আমাদের যাই হোক, বাইরের লোক জানবে কেন! সুবোধের যেমন কাণ্ড, আবার তোমাকে পাঠিয়েছে, নিজে আসতে পারেনি—বিষয়ের গুরুত্ব হালকা ক'রতে রমাপতি বললেন।

মুখটা যেন হঠাৎ বড় কঠিন মনে হ'লো ইন্দুমতীর। রুক্ষকণ্ঠে বললে, তিনি আমাকে পাঠাননি; এসব ব্যাপার নিয়ে তিনি কোনদিন আসবেনও না, বিষয়ের জন্ত তাঁর কোন ভাবনা নেই—

তাই তুমি ভাবচো! বুঝি শ্লেষ করে হাসলেন রমাপতি, বেশ! ওর দ্বারা কিছুতো হ'লো না!

চুপ করে রইল ইন্দুমতী। বড় সামলে নিল নিজেকে। গুরুজন!

আমি কালই পাইক পাঠিয়ে দেব, বেটাদের সমঝে দিয়ে আসবে! কার হুকুমে তারা খাজনা বন্ধ করে! ভঙ্গি করেন রমাপতি।

না। বেশ স্পষ্ট শোনায় ইন্দুমতীর কণ্ঠস্বর, তার দরকার হ'বে না। যা আমাদের আইনে নেই তা আমরা চাই না। আর কোনদিন লোক পাঠাব না ওখানে। সেই কথা আপনাকে জানাতে এসেচি।

মাধুরী বললে, কি বলচেন কাকীমা। শুধু শুধু খাজনা নেবেন না কেন। দাদুতো আপনাদের না দেবার কথা বলেন নি।

না, থাক। ইন্দুমতী ফেরবার উপক্রম করলে। মিছি মিছি গণ্ডগোলের সৃষ্টি।

এর মধ্যে গণ্ডগোলটা আবার কি দেখলে। বিষয় বুদ্ধি তো দেখচি তোমার খুব হয়েচে বৌমা। যাক সুবোধের একজন তবু—

শেষ করতে পারলেন না রমাপতি, ইন্দুমতী কোন উত্তর না দিয়ে সমস্ত লজ্জা আবরণ ঘুচিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে থেকে সরে গেল। স্পষ্ট অবজ্ঞার ভাব।

চোখের দৃষ্টি যেন শূন্য হ'য়ে গেল রমাপতির—পাথরের চোখের মত স্থির। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তাঁর আজন্মপ্রভুত্বের এ হেন ব্যবহার কেন! কেন!

হঠাৎ যেন কেমন হয়, বাইরের উদ্ধত হাওয়াটা ভেতরেও কখন প্রবেশ করেছে।

হাসাহাসি, সম্মান-অসম্মান, বড়-ছোটর ভেদ ঘুচে গেছে। কোন ফাঁকে কেউ কাউকে অপমান ক'রতে পারলে ছাড়ে না আজকাল। শ্বশুর, ভাসুর বলে আর পার পাবে না।

এ সাহস, এত বড় সাহস এলো কোত্থেকে? সুবোধের বউ কিনা বিষয় নিয়ে শ্বশুরের সামনে কথা বলতে সাহস করে। সুবোধ নিজে বললে, রমাপতি বুঝি এতটা বিমূঢ়, স্তব্ধ হ'তেন না। সেইটেই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন—বৈরাগী মহলের খাজনা বন্ধের ব্যাপার নিয়ে সুবোধ তাঁর কাছে আসবে, একটা সীমা-রেখার কথা বলবে। বুঝবে তখন—কিসে কি হয়।

ভয় নয়, এইটে তিনি মনে ভেবেছিলেন। যেমন কে তেমন। দেখবে না শুনবে, কেবল চাষাদের নিয়ে নাচার ফল বেরবে। অমনি সব মহল তিনি বেহাত করে দেবেন। সেই যে কথায় বলে না, পেটে নেই ভাত, নামের ঘটা আছে খুব।

তিনি ঢের দেখেছেন, এও তিনি দেখবেন—ঐ সুবোধই যদি নিজের স্বার্থের জন্তে তাঁর কাছে ছুটে না আসে তো তিনি কি বলেছেন।

কিন্তু কৈ, একি হলো?—সুবোধের স্ত্রী ইন্দুমতী এসে তাঁকে সে দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে গেল। যা তাদের নয়, তা তারা স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করতে পারে অন্যায় অপহরণও তারা সহ্য ক'রতে পারে। নীলাম খরিদের গোপন অঙ্কে কিছুমাত্র ভয় নেই তাদের।

সুবোধের তো কথাই নেই। এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে মাথাই ঘামায় না। হয়তো মনে মনে ঘৃণাই করে এই বৈষয়িক মনোবৃত্তিকে।

গড়গড়ার নল অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছিল। কলিকার আগুন হয়তো নিভে গিয়েছিল। তেজ মরা হোঁকের আলোয় অদ্ভুত মৌন দেখাচ্ছিল রমাপতিকে। এত বড় সাহস, এত বড় স্পর্ধা বাড়ির সামান্য একটা বৌ-এর। মুখ বেঁকিয়ে বলে গেল চাই না! মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর মহাভুভবতা! এ না মানার অর্থ অবজ্ঞা ছাড়া আর কি! যেন চোরকে সর্বস্ব তুলে দেওয়া—নাও নাও, আর কত চাও, আরও কত নেবে নাও! ভিক্ষা যাদের করা উচিত ছিল, তারাই কিনা দান করবার অহঙ্কার নিয়ে চলে গেল!

আগুন নিভে গেলে অঙ্গারের যে মূর্তি রমাপতি এখন তার চেয়ে বেশী কিছু নয়! সারামুখে ক্ষুব্ধ আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণ কর্তৃত্বের ক্লিষ্ট রেখা সমাচ্ছন্ন।

মাধুরীও কম অবাক হয়নি ইন্দু কাকীমার এই আকস্মিক আগমনে। ভারি শান্ত, নম্র, ধীর স্থির, ভারি ভাল ইন্দু কাকীমা—বাড়ির সেরা বউ! তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা যে বেরোবে ধারণাতীত! বিশেষ করে' দাদুর সামনে—

কাছে এসে মাধুরী ডাকলে, দাদু!

রমাপতি চমকে উঠ্‌লেন। মুখ লুকতে পারলে যেন তিনি বেঁচে যেতেন। রমাপতি কোন উত্তর ক'রলেন না। যেন শুনতে পাননি, চুপ করে রইলেন।

মাধুরী ডাকলে, দাদু! ফুলকাকীমা যা বললে—

রমাপতি আহত মর্যাদায় রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন, কি বললে? বলাবলির কি আছে। পারে মাথায় সব সমান হতে চাও তোমরা?

মাধুরী চমকে যায়। ঠিক দাদুর সঙ্গে এ আলোচনা সে করতে চায়নি! কিন্তু ফুল কাকীমার কথায় কোথায় যেন খোঁচা আছে।

কাছে এসে মাধুরী বললে, এতে রাগের কিছু আছে? তুমি তো বলতো ওদের বলে দেবে! তুমি জানই না ব্যাপারটা!

রমাপতি বললেন, তাই কি যৌবা বিশ্বাস করলেন! মনে করলেন আমি সব মেরে বাচ্ছি?

দাদুর পক্ষ নিয়ে মাধুরী বললে, বিশ্বাস করলে আর কি করা যাবে! তুমি তো নাও নি সত্যি!

না নিইনি; একটু বেশী জোর দিয়েই যেন কথাটা রমাপতি বললেন। বুঝুক কত ধানে কত চাল! বয়ে গেছে ওদের হ'য়ে ডানা আগলে থাকবার আমার! আর না। এককালে অনেক করেছি। চিরকাল যারা শত্রুতা করবে তাদের জন্যে আমার অত মাথা ব্যথা কেন! কথাগুলো শুনলি তো সুবোধের বউ-এর—চাই না। থাকলে তো চাইবি, রাখবার যোগ্যতা থাকলে তো রাখবি। চাই না।

ব্যাপারটা কিছু না বলে' যেন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রমাপতি অতঃপর। হঠাৎ মাধুরীকে সাক্ষী মানলেন, শুনলি তো তুই নিজের কানে। বাড়ির বৌ-ঝিও মান রেখে কথা বলে না—কোত্থেকে তাদের এত সাহস হয়?—কে এত সাহস যোগায়? দিনকাল কি হ'চ্ছে, কি শিক্ষা সব পাচ্ছেন!

মাধুরী চুপ করে যায়। যা বলবার তার ইচ্ছা ছিল, বিষয়টার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাও যেন গোলমাল হ'য়ে যায়। ফুলকাকীমার পরোক্ষ প্রতিবাদটী লক্ষণীয়। তাঁর মত কেউ বুঝি এমন করে' দাদুকে ধাক্কা দিতে পারতো না। দাদুকে তাই সে জিজ্ঞেস ক'রতে চায়, ফুলকাকীমার কথাগুলো সত্যি না মিথ্যে? দাদুর উদ্দেশ্য কি।

মৃদুকণ্ঠে মাধুরী বললে, ফুলকাকীমা হয়তো ঠিক ও ভেবে বলেন নি। জানি তো আজ কতদিন ধরে ওঁদের খুব টানাটানি যাচ্ছে—

রমাপতি সাড়া করলেন না। চুপ করে কি যেন ভাবছেন গভীর ভাবে।

মাধুরী বললে, কোথাও কিছু তো আর আদায়-পত্তর হ'চ্ছে না। তার ওপর কাকা তো ঐ, ডাক্তারী করে' এক পয়সা আনেন না। উনিই বা কি করে' চালান একা মেয়েমানুষ···খেতে তো কম নয় সংসারে।

রমাপতি হুংকার দিলেন, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর।

মাধুরী বললে, উনি বলে তাই চালাচ্ছেন, অন্য কেউ হ'লে আর—

রমাপতি বললেন, মেয়ে কর্তা। কালে কালে শেষ বয়সে আরো কত কি দেখতে হবে। সবে তো সুরু—

মাধুরী বললে, কাকা কিছু দেখেন না।

এদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো দেখে বেড়াচ্ছেন। পাত্তি নচ্ছার কোথাকার। ঘর শাসন করতে পারে না। হ'তো আমার বউ, জ্যান্ত কবর দিতুম।

মাধুরী শিউরে ওঠে। দাদুর মুখের দিকে সাহস করে চাইতে পারে না। এত ভাল দাদু কি নিদারুণ নিষ্ঠুর নিরুপায়। কোন মায়া দয়া, বিবেচনা তাঁর নেই যেন। বৃথা চেষ্টা তাঁর সহানুভূতি লাভে।

যদি ইন্দুকাকীমা তাঁর নিজের বৌ হ'ত, তা হ'লে—

এ বাড়ির বধূ নির্যাতনের অনেক কাহিনী মাধুরীর শোনা আছে। খুব বেশী দিনের কথাও তো নয়। পুড়ে-মরা তো আকছার। বিষ পানও কম নয়। আগুন আর বিষ একদিন ছিল এবাড়ির অন্তঃপুরিকাদের নিত্য সহায়—খাঁচার পোষা পাখী সোনার শিকলে হঠাৎ একদিন দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করে চলে যেত। অন্দর মহলের বাইরে সে-সংবাদ কচিৎ কখনো পৌঁছলে বিশেষ আলোড়ন উঠতো না। এত সুখ যদি সহ্য না হয় ঘোষবাবুরা কি করবেন? তা বলে তাঁদের তো দায়ী করা যায় না। অভাব কিছু রাখেননি সহধর্মিণীদের।

ওবাড়ির ছোটঠাকুমা বুড়ী বলেছিলেন, তোরা তো এখন অনেক কিছুই করছিস—জুতো পরছিস্ ইচ্ছেমত হেঁটে ইষ্টিশান পর্যন্ত যাচ্ছিস, শ্বশুর ভাসুরকে দেখে ঘোমটাটা পর্যন্ত টানিস না। চিক ছাড়াও আসরে পুরুষদের সঙ্গে বসছিস, নাটক-নভেল পড়ছিস্, হাসাহাসি করছিস্ রঙ্গরসে চলে পড়ছিস্। আমাদের কালে ওসব করবার হুকুমই ছিল না, জানতুম না এত-ও। যে বরকে তোরা টেঁকে-গুঁজে রাখিস এখন, আমরা তাঁর পা দুটি ছাড়া মুখের দিকে তাকাতে সাহসই করতুম্ না। কি বলনি, বাঘ না ভাল্লুক? তারও বাড়া। সেই কখন রাতের বেলা একবার দেখা হবে—তাও কি যে দেখবো কে জানে—বর না যম? আমার তো তোর ঠাকুরদার মুখটা এখন ভাল করে মনেই পড়ে না। দেখবো কি, সব সময় ওরে জড়সড়, কাঠ—খোঁক ভোড়া দেখলেই আদ্ধেক প্রাণ শুকিয়ে যেত! সে তুলনায় তোরা ছুঁড়িরা তো সগ্‌গে বাস করছিস।

একালের কোন এক বধূর আধুনিকতা-নিয়ে ঘোষ-বাড়ির অন্দর মহলে আন্দোলন উঠেছিল, নিন্দের বৃষ্টি কান পাতা দায় হ'য়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে বউ আর তার 'মেনীমুখো' স্বামীকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। শুধু কি জুতো পরে, এড়া-কাপড়ে চায়ের বাটিতে চুমুক দেয়—চুল-টানা বিবি-আনা আরো কত! বউটা প্রজাপাইকের সঙ্গে মাথার কাপড় খুলে হলগল করে' কথাবার্তা কইতো!

তখন এত বুদ্ধি হয়নি মাধুরীর, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে এবাড়ির বউদের সহবৎ শিক্ষা সম্বন্ধে গল্প সে শুনেছিল। ঐ ছোটঠাকুমা বুড়ি বলেছিলেন: তখনকার কাল হ'লে ও বৌকে আর বাঁচতে হ'তো না। মেয়েমানুষের মর্যাদা এ বাংলা কখনো সহ্য করেনি। এই তো সেদিনের কথা, নতুন ঘর করতে এসেছি, ঘোমটার ঢাকার হোঁচট খেয়ে খেয়ে পায়ের আঙুলের নখগুলো উঠে গেছে, খুঁড়িয়ে চলি। ও-বাড়ির সেজ কর্তার ছেলের বউ নাকি একদিন সদর ঘরে হৈ-হৈ শুনে ছুটে এসেছিল। বউটা একটু বইকো ছিল, ঘোমটা দিতে যখন-তখন ভুলে যেত—কিল খেতো স্বাশুড়ির, তার পর কদিন শুনলুম, বউটার খুব অসুখ, তার কদিন পরে শুনি মরে গেছে। কি ব্যাপার? এমনি নাকি শাস্তি করেছিল শ্বশুর-স্বামী। না হ'লে রোগ নেই ভোগ নেই, মরবে কেন!

কেন তোর ঠাকুরপো বাবা করেননি—কি রাগ ছিল সেকালের সব কর্তাদের—নাতি মেরে সিঁড়ি থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল। একটু এদিক ওদিক হবার তখন উপায় ছিল! মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মত থাকবে!

সেই রক্তের ঝাঁজ আছে রমাপতির দেহে। নিজের কি পরের কি, বৌ মানুষের কোন কথা তিনি সহ্য ক'রতে পারেন না।

মাধুরী চেয়ে চেয়ে অবাক হয়, এই দাদু তাকে কত ভালবাসেন। তার কত উঁচু-নীচু কথা অম্লান বদনে সহ্য করেন।

বুঝি মাধুরী ভয় পায়। এতদিন যাঁকে দেখে এসেছে তিনি নন—আর কেউ। কি ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ, আজ যদি তার মা বেঁচে থাকতো তা হ'লে কোন প্রতিকূল ব্যবহারে দাদু কি সত্যিই অমনি নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠতেন—অমনি ক্রূর, নিষ্ঠুর দেখাত?

নীরবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছে! রমাপতির মনে হয়, মাধুরী বুঝি বিষাদ করেছে সুবোধের বিষয় তিনি ফাঁক দিয়েছেন। দোষ তার দাদুরই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ।

মাধুরী ভাবছে, ফুলকাকীমা এমন কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেন যার জন্য দাদু এমন তীব্র হয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে গুরুজনকে অপমান করার অপরাধ কোথায়?

আরো যেন কি বুঝতে পারে মাধুরী! তার সন্ধানে কোথায় যেন আঘাত পেয়েছে সে। কতদিন সে মনে মনে ঐ ফুলকাকীমাদের আদর্শ ভেবেছে। ঐ সুবোধ কাকার মত একটি মানুষের কল্পনা আছে তার হৃদয়ের গোপন কন্দরে। হ'তে পারে তার দাদু প্রভাব প্রতিপত্তিতে আর সকলের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু সুবোধ কাকার তুলনায় কিছু নয়। সুবোধ কাকা অনেক অনেক বড়—এত বড় যার অনুভবই হয়, স্পষ্ট ধারণা সজে মানায় না। আর ফুলকাকীমা? অতীত বর্তমানে খুঁজে জোড়া মিলবে না।

দাদুর রাগের কোন মানে হয় না। কোন অপরাধ করেননি ফুলকাকীমা—স্বামীপুত্রের মুখে অন্ন যোগাতে না পারলে এর চেয়ে আরো অনেক বেশি কিছু করতো সে নিজে। অনেক সম্মান রেখেছেন ফুলকাকীমা!

দরজার বাইরে থেকে মাধুরী চলে যাচ্ছিল, রমাপতি ছায়া লক্ষ্য করে ডাকলেন, মধু শোন!

মাধুরী দাঁড়িয়ে থাকে। যেন এ ব্যাপারের সমস্ত তিক্ততা তারই সৃষ্ট। অপরাধ তারই।

সহজ সুরে রমাপতি বললেন, তুই তো কিছু সাহায্য করতে পারিস। আমি কি বারণ করেছি—

যার তার কাছে সাহায্য নেবার পাত্র ওঁরা নয়! শুনলে তো একটু আগে ফুলকাকীমার কথা। মাধুরীর কণ্ঠ বিচলিত শোনায়।

রমাপতি চুপ করে' থাকেন। কতটুকু বলতে তিনি আর কি ক'রতে পারেন। এত দম্ভ দয়ার পাত্রের তিনি সহ্য করেন কি করে! তবে মঙ্গল ওরা।

রমাপতি চীৎকার করে ওঠেন, পাত্র নয়! পাত্র নয়! যত দয়ার পাত্র আমরা। দেখা যাবে কে কাকে কত দয়া করতে পারে। আমারই খাবে, আমারই পরবে, আবার আমারই বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াবে—চালাকি পেয়েছে সব। চালাকি ভাঙবো।

ভয়ে লজ্জায় মাধুরী আর দাঁড়ায় না।

[ক্রমশঃ]

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কৃ. সে]

জীবনের অগ্রগতির অর্থ এই নয় যে, পশ্চাৎকে অস্বীকার ক'রে কেবলই সামনের পথে এগিয়ে চলা। পশ্চাৎ আছে ব'লেই সম্মুখ আছে, পশ্চাৎই সম্মুখকে বেগবান্ ক'রে তুলছে। আমি আজ যে শক্তি, সাহস ও মেধার অধিকারী, তার সঞ্চয় পশ্চাতের প্রাণরস থেকে। তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধ'রে আমার মধ্যে যে জীবনীশক্তি সঞ্চিত হ'য়েছে, তারই অমিত বীর্যে আমি আমার আগামী কালকে ফলবান্ ক'রে তুলতে পারছি। আমার অতীতের কাছে তাইতো আমার ভবিতব্যের ঋণ কেবলই বেড়ে বেড়ে চ'লেছে। আমি যতই এগিয়ে চলছি, যতই প্রগতিশীল হচ্ছি, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাও আমার ততই বেড়ে যাচ্ছে। অতীতকে যে মুহূর্তে অস্বীকার করি, সেই মুহূর্তে আমার প্রগতিশীলতার সমস্ত দম্ভ তার নিজের মধ্যে কুঁড়ে কুঁড়ে ঔদ্ধত্যের বিষে জর্জরিত হচ্ছে।

এগিয়ে চলার পথে মানুষের চিত্তে যতক্ষণ না এই বোধ জাগছে, ততক্ষণ তার চলা সার্থক হচ্ছে না। অতিরিক্ত অহমিকার অন্ধকারে সে কেবলই ঔদ্ধত্যের শাণিত পাথরে হোঁচট খেয়ে খেয়ে বিক্ষত হচ্ছে। একথা ব'লবো না যে অতীতকেই আমরা কেবল নানারূপে রূপায়িত ক'রে চ'লবো! মধ্যরাত্রে ব'সে ঘড়ির কাঁটাকে যদি আমরা ঘণ্টা বারো পিছনে সরিয়ে দিই, তা হলেই যেমন রাত্রিক্রিয়ার মতো মধ্যরাত্রি কখনও মধ্যদিনে পর্যবসিত হয় না, তেমনি অতীতকে কোথাও তার স্বকীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাইলেই সে প্রতিষ্ঠা পায় না। নতুন দিন নতুন গান নিয়ে আসে, নতুন যুগ আনে নতুন সুর। পুরাতনের ঐতিহ্যকে তার নিজের কালের মধ্যে যে চাকা পড়ে যেতে হয়, তা নয়, নতুনদিনের মধ্যে সে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। কালকের সকালের কাছে আজকের সকাল নতুন সন্দেহ নেই, কিন্তু রাত্রির কাছে দু'টো সকালের আবেদনই এক; দু'টো সকালই বেড়ে বেড়ে এক সময় রাত্রি হ'য়ে নৈসর্গিক সত্যকে রক্ষা ক'রছে। সকাল থেকে যে পথিক সন্ধ্যার দিকে যাত্রা ক'রছে, সে প্রগতির পথেই যাত্রা ক'রছে, প্রগতি অর্থে গতি, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত-চেতনার মধ্যে সকালের প্রতি শ্রদ্ধা কি সত্যিই সে হারাতে সকালই যে তাকে একটু একটু ক'রে সন্ধ্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছে! সকাল আছে বলেই তো তার সন্ধ্যার দিকে পদসঞ্চার সার্থক হচ্ছে।

আজকের বিশ্বব্যাপী প্রগতিবাদের যুগে শিক্ষিত জনসাধারণের একটা কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, আভিধানিক শব্দ হিসেবে 'প্রগতি' কথাটা আদৌ নতুন নয় বা মানুষের উপর তাকে ধ্বনিমাধুর্য্যে আরোপ করবার বিশেষ কোনো কারণ নেই। এতবড় যে বিশ্ব-সৃষ্টি সে নিজেই প্রগতিশীল। সৃষ্টি কোথাও থেমে নেই বা তার অচল রথখানিকে মানুষ কোথাও টেনে এগিয়ে নিচ্ছে না। নদী চিরকাল যেমন আপন গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, বাতাস যেমন তার নিজের লীলায় বয়ে যাচ্ছে, আগুন যেমন তার দাহিকাশক্তি দ্বারা দীপ্ত হচ্ছে, এই বিশ্বসৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই তেমনি আপন গতিতে ক্রমাগত এগিয়ে চ লেছে। এই এগিয়ে চলাই প্রগতি। যদি তার মধ্যে কোথাও কোনো বস্তু অসঙ্গে কোথাও থেমে পড়ছে, তার অক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বিশ্ব তার নিজের অগ্রযাত্রার পথে ক্রমাগত এগিয়ে চ'লছে।

আসলে যার যতবেশী জীবনীশক্তি, সে ততবেশী প্রগতিশীল। মানুষকে আমরা চিরকাল সেই অমিত

জীবনীশক্তিতেই উজ্জীবিত দেখতে চেয়েছি। এই দেখাই যে প্রগতির দেখা। কিন্তু তাই ব'লে কি সংসারে দুর্বল মানুষ নেই? আছে। দুর্বলতাই যে সব সময় প্রতিক্রিয়া বা রক্ষণশীলতার প্রতীক, তা নয়। একটি মানুষ দেহে দুর্বল ব'লেই যে মনে দুর্বল, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। যেখানে কোনো মানুষের সত্যিকারের দুর্বলতা, সেখানে প্রয়োজন সবলের শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসূচক সাহায্য দান। রেলের 'বগি' গাড়িগুলো যেমন ইঞ্জিনের সংযোগ ভিন্ন দুর্বল, অমিতশক্তি ইঞ্জিন এসে সংযুক্ত হ'লেই তবে বগিগুলোর প্রাণশক্তি জাগ্রত হয়, মানুষের বেলায়ও তেম্‌নি। আসলে প্রগতিবাদের মূলে সহযোগিতার প্রশ্নটিই বড়। জগৎকে সহ-অনুভূতির মধ্যে টান্‌তে হ'লে চাই সেই সহযোগিতা। আমার কোনো নিকট-আত্মীয় যেমন রক্তাল্পতা রোগে ভুগলে আমার সুস্থ দেহ থেকে রক্ত দিয়ে তাকে বলীয়ান ক'রে তুলি, তেম্‌নি সমাজের কোনো মানুষ যদি দুর্বল মস্তিষ্কজাত প্রতিক্রিয়াশীলতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে সবল মানুষদের প্রয়োজন তাদের শ্রদ্ধাশীল নীতির আদর্শ দিয়ে সেই দুর্বল মানুষটিকে নতুন আলোর পথে টেনে আনা। যেখানে তার সম্ভাবনা নেই, সেখানেও শ্রদ্ধা হারাবার কিছু নেই। যে মানুষটি বহু মানুষের নীতিগত আদর্শের পন্থা অনুসরণ ক'রতে পারছে না, তার নিজেরও একটি পরিকল্পিত আদর্শ আছে বটেই। আমি যদি দেব-দেবীর পূজাকে প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ ব'লে অভিহিত করি, তবে আমি যতখানি প্রগতিশীলতার অধিকারী ব'লে নিজেকে গণ্য ক'রতে চাই, যিনি দেব-দেবীর পূজার মধ্য দিয়ে প্রাণিত শক্তির দ্বারা এগিয়ে চল্‌বার পথ বেছে নিয়েছেন, তিনিও তেম্‌নি ঠিক ততখানি প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধ যূপকাষ্ঠে বলি হ'য়ে নেই। শুধু নীতিগত পন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

এই পন্থাগত পার্থক্য নিয়েই সমাজে আমরা সচরাচর বিরোধ লক্ষ্য করি। এর সবচাইতে বড় প্রতিষেধক হচ্ছে সমন্বিতকরণ। এখানে 'compromise'-এর প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্ন ওঠে 'Synthesis' সৃষ্টির। দু'টি সূত্রকে একত্রে গেঁথে দিলেই তবে Synthesis হয়। তার দ্বারা তথাকথিত প্রগতিবাদের ব্যত্যয় ঘটে না, বরং Synthesis বা সমন্বয়ের উঁচু পুল পেরিয়ে প্রগতিবাদের দৃপ্ত পদক্ষেপ আরও দৃঢ়, অগ্রগামী ও সুখকর হয়। সুখকর এই জন্য যে, সমন্বয়ের দ্বারা মানুষের যোগের অঙ্ক শুণের অঙ্কে বেড়ে যায়।

অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বভাবতঃই এই জ্ঞানকে বর্জন ক'রে চলেছেন। আমি যে পথে চল্‌ছি, সেইটেই খাঁটি পথ, সেইটেই প্রগতির সদর রাস্তা, বাকী যে পথ—তা অর্থহীন, তা রক্ষণশীলতার রজ্জুতে আবদ্ধ—এই মতবাদের বশবর্তী হ'য়েই আমাদের জনসাধারণের অনেকেই ক্রমেই একটা শ্রেণীগত চেতনার সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। তার ফলে বহু ক্ষেত্রেই বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। এবং নানাভাবেই এই বিপর্যয় এসে আজ আমাদের সমাজদেহে ভর করছে। ছেলে তার পিতার অনুশাসন মেনে চলছে না, ছাত্র তার শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতাকে গ্রাহ্য ক'রছে না, আধুনিক-আধুনিকারা প্রবীণ-প্রবীণাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখ্‌ছে না। এইভাবের নানা 'বীতশ্রদ্ধ' ঘটনা কখনও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, কখনও বা চোরাবালির মতো সমাজের আনাচ কানাচ থেকে প্রকাশ পেয়ে জাতীয় জীবনের উর্বর ললাটে অবঃপাতের চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। অথচ এদেশের ছেলেরা একদিন "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম" ব'লে পিতৃস্তোত্র উচ্চারণ ক'রে মহাজ্ঞানী মহাজনদের পন্থানুসরণের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্রগামী গতিকে মহনীয় ক'রে তুলেছিল। ছাত্ররা গুরুগৃহে গিয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তপস্যার মূল্যে জ্ঞান লাভ ক'রে মহৎ হ'য়েছিল; গুরু বা শিক্ষককে পিতৃ মর্যাদা দিয়ে বিদ্যালয়কে তপস্যার মন্দির বলে মনে করতো তারা। নবীনদের কাছে প্রবীণেরা ছিলেন পথপ্রদর্শক। আজকের মতো তখন পৃথিবীব্যাপী প্রগতিবাদের ঢেউ এমন উত্তাল হ'য়ে না

উঠলেও তারাও একটা স্থির বিন্দু থেকে ক্রমে প্রগতির পথেই যাত্রা ক'রেছিল। 'প্রগতি' শব্দটা তখন আজকের মতো এমন শ্রেণীচেতনায় উদগ্র হ'য়ে ওঠেনি। আজ প্রগতিবাদের অতি-চেতনার যুগে এদেশের সেই প্রাচীন ইতিহাস মানুষের মন থেকে বিদলিত হ'য়েছে। আজ প্রাচীনতাকে স্বীকার করা মানেই রক্ষণশীলতা। এযুগ কাঁচা ও ভাঁসার যুগ; পাকা নিয়ে, বয়স্কতার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে চলা এযুগে প্রায় অচল। নবীনদের আহ্বান ক'রে যে রবীন্দ্রনাথ বললেন: "আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা", সেই রবীন্দ্রনাথকেও এযুগে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অচল আখ্যা দিয়ে বর্জন ক'রবার একটা ঔদ্ধত্য মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তেমনি দেখা দিয়েছে প্রবীণদের সম্পর্কে নবীনদের অশ্রদ্ধা। এমন কি বর্তমানে শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই অশ্রদ্ধা এসে ভর ক'রেছে।—'প্রবীণেরা কি ক'রেছেন, কি দিয়েছেন, আমিই যা কিছু ক'রেছি, যা কিছু দিয়েছি'—এমনি একটা মানসিকতাই আজকের তরুণসমাজকে পেয়ে বসেছে। আসলে প্রবীণেরাও যে এককালে এযুগের নবীনদের মতোই তরুণ ছিলেন, তাঁরাও যে একদিন তাঁদের ভাবচেতনাকে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার অগ্রগামী পথে এগিয়ে দিয়ে প্রগতির বল্গাঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলেন, একথা আজকের নবীনদের মধ্যে অনেকেই ভাবতে পারেন না। আর পারেন না ব'লেই একটা দারুণ অসন্তোষ ও সাংস্কৃতিক দুঃস্থতা পঙ্কের মতো সমাজে বেড়ে উঠছে। এককালে রুশদেশেও এমনই একটা মনোবৃত্তিকে ভিত্তি ক'রে 'নিহিলিষ্ট' আন্দোলন সুরু হ'য়েছিল। ছেলে বাপকে সমীহ ক'রলো না, যাকিছু নিয়মানুবর্তিতা—তার বিরুদ্ধেই দারুণ একটা অনিয়ম ও বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠলো। সেদিন মনে হ'য়েছিল—এতবড় একটা প্রগতিশীল আন্দোলন পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু অধিককাল টিকলো না এই আন্দোলন। কখনও কোনো জাতি তার সুকুমার বৃত্তির উপর সংগঠিত হ'য়ে না উঠলে সে জাতি বড় হ'য়ে উঠতে পারে না। প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা—এগুলো হচ্ছে সেই সুকুমার বৃত্তি। 'নিহিলিষ্ট' আন্দোলনে তৎকালীন তরুণ-সমাজের মন থেকে এই বৃত্তি অপসৃত হ'য়েছিল বলেই দু'দিনেই এই আন্দোলন কুর্পূরের মতো উড়ে গেল। ফলে প্রগতি-বাদের নামে যে ঔদ্ধত্য জাতীয় জীবনকে ঘুনিয়ে তুলছিল, সেই ঔদ্ধত্যের কালোমেঘ অপসৃত হ'য়ে দেখা দিল প্রগতির নবীন ভাস্বর মূর্তি। দেশ এগিয়ে গেল। আমাদের দেশের নবীন সমাজকে আজ একথা ভেবে তাঁদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

আসলে প্রত্যেকটি যুগেরই একটি নিজস্ব গতি, নিজস্ব রীতি-পদ্ধতি ও টেকনিক আছে। যুগে যুগে সেই গতি সেই রীতি-পদ্ধতি ও টেকনিক পাল্টায়। কিন্তু পাল্টায় ব'লেই অতীত যুগটা নবীন যুগের কাছে নস্যাৎ হয়ে যাবে, একথা কল্পনা করা মূর্খতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় তিনি ছিলেন সব চাইতে প্রগতিবাদী মানুষ। আজকের নবীনকালে যদি তাঁকে রক্ষণশীলতার সংজ্ঞায় ফেলে কোনো অতি-প্রগতিবাদী লোক আস্ফালন করে, তবে সেই আস্ফালন তার উগ্র চরিত্রের দুর্লক্ষণ ব'লেই প্রতীয়মান হবে। আমরা যদি শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষকে বিচার ক'রে দেখি, তবে দেখবো—যাকে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে দূর থেকেই বর্জন ক'রে এসেছি, প্রকৃতপক্ষে তার বহিরাবরণের অন্তরালে এমন একটি 'চরৈবেতি'র সুর অনবরত অনুরণিত হচ্ছে, যে সুরের সঙ্গে তখনকার সঙ্গতের মতো তথাকথিত প্রগতিবাদীদের 'সঙ্গত' বেখাপ্পা এক অদ্ভুত ঐক্যতান বা অর্কেষ্ট্রার সৃষ্টি হয়। এজন্য চাই শ্রদ্ধা, চাই সহযোগিতা। মানুষ তার জন্মমুহূর্ত থেকেই প্রগতিশীল। শিশু তার সীমার বন্ধন ছাড়িয়ে অসীমকে ধ'রতে চায়; যাকিছু দুঃসাধ্য, যা কিছু দুরধিগম্য, যা কিছু সুন্দর ও সুশোভন—তার প্রতিই মানুষ চিরকাল প্রধাবিত হয়। এই প্রধাবনই প্রগতি। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও তার স্ব স্ব সমাজব্যবস্থা তাকে স্বীকার না ক'রে নিয়ে উপায় নেই। সেই স্বীকৃত পন্থার মধ্যে একদল মানুষ অগ্রযাত্রার অসীম শক্তি নিয়ে বন্ধনহীন নতুন পথ রচনা ক'রে নিজেরা যেমন এগিয়ে চলেন, তেমনি নিজেদের সহযোগিতা দ্বারা এগিয়ে নেন নির্বিশেষকে। তার জন্য সেই নির্বিশেষের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা জন্মে না, বরং শ্রদ্ধার দ্বারা তাঁরা সমষ্টিকে নিয়ে জয়যাত্রার পথ রচনা ক'রে চলেন। সমস্তদেশের প্রগতিবাদী সমাজকর্মীদের এই একই ইতিহাস। আমাদের দেশের নবীন সমাজে যতক্ষণ না সেই ইতিহাসের সার্থক রূপায়ন দেখা দিচ্ছে, ততক্ষণ এদেশের তথাকথিত প্রগতিবাদ ভুয়োদর্শনের রূপ নিয়েই বিরাজ ক'রবে, আমাদের জাতীয় জীবনে তা কার্যকরী হ'য়ে দাঁড়াবে না।

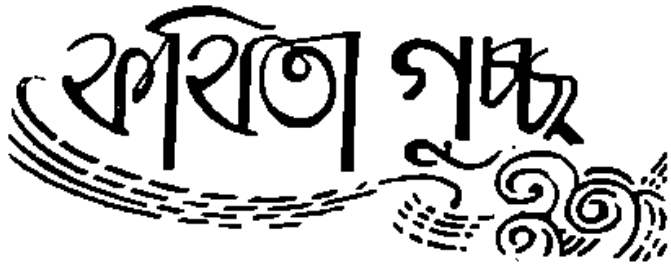

মুক্তি

অংশুপতি দাসগুপ্ত

পৃথিবী যেখানে শেষ হ'য়ে গেছে,—দিগন্তরেখা
আকাশে নীল,
সময় ছুটেছে উল্কার বেগে অসীম গগনে সীমানাহীন ;
তোমার চুলের বন্যার মতো ঘনঘনিবিড় অন্ধকার—
ঘুরে ঘুরে মরে জ্যোতির পুঞ্জ কামনাদীপ্ত কোটি তারায় ;
সেখানে কোথায় বাসনার গ্লানি তৃপ্তিহীন ?
সেখানে কোথায় বন্দী হৃদয় দীপ্তিহীন ?
শৃঙ্খল বাজে পলে পলে কোথা সে আকাশে এই
মূঢ় কারার ?
উদ্দাম নদী ছুটে চলে বেগে কূলে কূলে জাগে জলোচ্ছ্বাস,
ভেঙে ভেঙে পড়ে মাটির নমতা ঝড়ের বাতাসে দীর্ঘশ্বাস
ভাঙে আর গড়ে, ওঠে আর পড়ে, জাগে আর টুটে
পলকে প্রাণ,
কে বাঁধে কাহারে, বৃথা সে চেষ্টা, নেই এর কোন
প্রতিবিধান।
এখানে তোমার নিষেধের বেড়া নিমেষে লীন,
এখানে তোমার প্রবীণ ভ্রূকুটি অর্থহীন ;
জীর্ণ ও-ডোরে বাঁধা পড়ে কভু মহাজীবনের এ অভিযান ?
তুচ্ছ মাটির জীবন পেয়ালা,—এতে তো মেটেনা
তৃষা আমার,
অমৃতের ক্ষুধা মিটাতে কি পারে প্রাচীরেতে ঘেরা
এ কারাগার ?
তবে চলে এসো দিগন্তে যেথা আকাশ মাটিকে
বুকে জড়ায়,
যেখানে বন্ধিবাসনাদীপ্তি অবারিত তার আলো ছড়ায়—
চলে এসো তুমি যেখানে আবেগ নহে মলিন,
চিরকাল ধ'রে যেখানে তৃপ্তি সীমানাহীন ;
যেখানে ধরার মূঢ়বন্ধন অসীম ছুঁয়ায় ঘুরে সরায়।

সজল শিশিরের ভোরে

পরিমলকুমার ঘোষ

.....time is always time
And place is always and only place
And what is actual is actual for one
time
And only for one place (T. S. Eliot)

যদিও ক্লান্তি জানি আসবেই এ-ভালোবাসায়
ফাঁকি সব ধরা প'ড়ে যাবে
কাল কি পরশু—কিম্বা আজই
দুপুর ঘনালে হাসি পাবে
অনেক বোকামি মনে ক'রে।
তবু এই শালিকের নরম ডানায় কাঁপা ভোরে
একবারো ছুঁয়ে যেতে স্বপ্না, হবেনা তুমি রাজি,
বিশেষ, যখন রোদ ঠোঁট রাখে অশোক পাতায়

যদিও স্বপ্না তুমি স্বপ্নই জানি, কোনদিনও
ছিলেনা এখানে কিম্বা সেই ফেলে আসা
শ্রাবন্তী কি বিদিশায়। তবু এও জানি
ঠেলে ঠেলে স্থান আর কালের কুয়াশা
তোমাকে পেয়েছি এই মহুয়ার আস্তরের ভোরে
মহেঞ্জোদড়োর চেয়ে অনেক, অনেক বেশি ক'রে

তবুও হারাবো জানি স্বপ্না, তোমার-এ হাতছা
দুপুরে ঘামের বুকে ভোরের এ-শিশিরের
থাকবেনা এতোটুকু কণা।

ভাঙনের কূলে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজি বিশ্বব্যাপী এই ভাঙনের কূলে
স্থির, অচঞ্চল শুধু তুমি আর আমি,—
সর্বগ্রাসী মহামিষ্যা। আঁধারের বুকে
ঐ শুভ্র ত্রিযামার তারাদল যথা!
দিকে দিকে সর্বনাশ!—শুনিতে কি পাও
কল্লোলিয়া আসে ছুটে উতল, আবিল,
ফেনিল সংশয়স্রোত—পড়িতে উচ্ছসি'
মানুষের মর্মতটে? যায়—সব যায়,—
এ জীবনে যাহা কিছু সুন্দর, মধুর,
সুমহান্! এসো সখি, ধরো মোর হাত;
পদতলে চোরাবালি শুধু যায় সরি'
অবিশ্রাম। কোথা পাবো আত্মার আশ্রয়?
ভেসে যদি যায় সব—কোনো ক্ষতি নাই,—
প্রেম শুধু জেগে থাক্ শুকতারা প্রায়!

শীত

প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

সেদিন হারালো তবে! সে গানের, সে ভালোলাগার,
সে-ভালোবাসার দিন! মেঘ-মেয়ে! চোখ দুটি বুজে
নিরিবিলি নির্জনে ঘুম দেওয়া স্বপ্নের সবুজে,
রঙীন-রৌদ্রের রসে মনের ফসল ভরাবার
অলস-মুহূর্ত শেষ! শরতের স্ফটিক-দুপুর,
তারা-ভরা মায়া-রাত, নীল-ভোর, সবার সমাধি
হয়েছে। এবার তবে হৃদয়ের তারে তারে সাধি
আরেক গানের কলি: সময়ের অন্য এক সুর।
এখন হাওয়ায় কার কান্না-ভেজা স্বর ভেসে আসে।
হিম কুয়াশার কারসাজি: তাই ধূসর আকাশ;
মৃত-পাতাদের প্রেত উড়ে যায়: গাছের কঙ্কাল
নিস্তব্ধ নির্বাক; শুধু শিশিরে মাটির ঘাসে ঘাসে
করে কার অশ্রুজল। আহা তার আর্ত দীর্ঘশ্বাস
ঘুচে যেবে একদিন ফুল-কোটা বসন্তের কাল।

অচেনা পরশ

নগেন্দ্র দত্ত

আজ আছে কাল নেই,
পরশুর ভাবনা।
দুশ্চিন্তার ঝাঁপি,
পূর্ণ করা কেউটের ফণা।
+
তিমির রাত্রির পথে সূর্য্যের শর।
প্রভাতের পর্দা ছিঁড়ে আসে,
জেগে ওঠে উৎকণ্ঠার নূতন পহর।
+
দ্বারে কড়া নাড়ে,
ভয়ঙ্কর কাল, অচেনা পরশ।
আদালতি-তকমা-পরা দিন,
বকেয়া আদায় করে,
মনের রাজস্ব।
+
দিনটা ত যাই-যাই করে।
তবু যেন,
পুরোনো পাপীর মত,
পরিচিত কারাকক্ষ ঘিরে,
ঘোলা চোখে বার দুই চায়,
চলে না চরণ।
মেঘলা আকাশ ভরা বিষণ্ণ শ্রাবণ।

ডুবন্ত স্মৃতির নাও,
বিস্মৃতির জলে, স্বপ্ন আঁকাবাঁকা।
মাস্তুলের ডগা যায় দেখা,
কাক চিল উড়ে এসে বসে,
কমলার কোষাগুলো খসে,
সেরিমাটি দ্বীপ।
এরোতির কপালের টিপ,
অন্ধকার সীমান্তে নূতন প্রদীপ
জ্বলে ওঠে। সহসা আকাশ অট্টহাসে।
অকস্মাৎ অচেনা পরশ দ্বারে আসে।
+
রূপ নেই, গুণ নেই
আশার ফাল্গুন।
চেন কি তাহারে তুমি,
পৃথিবীর প্রথম মানুষ।

পুনরাবির্ভাব

বিবেককুমার রায়

সে আসে, সে আসে যেন বহু
দূর হ'তে পথ বেয়ে বেয়ে,
অনেক নূতন দেশ থেকে
অজানা আষাঢ়ে বন ছেয়ে।
মালতী, করবী, কেতকীর
পুঞ্জ পুঞ্জ সমারোহে তার
অরূপণ মোহ দিকে দিকে
ছড়ায়ে তো পড়েছে আবার।

আমি গান গাই, গান গাই,
পাখী গায় ফুল ফুটে ওঠে,
আনন্দে কি বেদনায়, আহা,
আকাশে মেঘেরা ডেকে ওঠে॥

নূতন চিনির কারখানা ও শোধনাগার

দেশের চিনির উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ২১টি চিনির কারখানা এবং ২টি চিনির শোধনাগার স্থাপনের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখের মতে ঐ চিনির কারখানাগুলির ১টি ১৯৫৪-৫৫ সালে, ৩টি ১৯৫৫-৫৬ সালে এবং অবশিষ্টগুলি ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠবে। কারখানাগুলির ১১টি স্থাপিত হবে বোম্বাইতে, এবং হায়দরাবাদ, অন্ধ্র, পেপসু এবং পাঞ্জাবের প্রত্যেকটিতে ২টি করে, আর মাদ্রাজ ও মহীশূরের প্রত্যেকটিতে ১টি করে কারখানা স্থাপিত হবে। শোধনাগারের মধ্যে একটি স্থাপিত হবে বোম্বাইয়ে এবং অপরটি সৌরাষ্ট্রে। এই নূতন কারখানাগুলির সামগ্রিক উৎপাদনক্ষমতা তিন লক্ষ টন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

নূতন শোধনাগার স্থাপনে সরকার সম্মতি দেওয়ায় ব্যবসায় মহলে বেশ বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিতর্ক এই নিয়ে যে এই সময়ে শোধনাগার স্থাপনের প্রকৃতই কারণ ছিল কিনা। যাঁরা শোধনাগার স্থাপনের বিপক্ষে তাঁদের মতে বর্তমানের চিনির অভাব কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী এবং এদেশে আখ থেকে সাদা চিনি উৎপাদন করবার কারখানার মধ্যেই যে ব্যবস্থা আছে তাতে নূতন কারখানাগুলি স্থাপিত হলে দেশের চিনির অভাব অবশ্যই মিটে যাবে। তখন এই বহু অর্থে নির্মিত শোধনাগার সরকার এবং শিল্পের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

অপরপক্ষে যাঁরা শোধনাগার স্থাপনকে সমর্থন করেছেন তাঁরা বলেছেন যে দেশে চিনির বর্তমান চাহিদা প্রায় ২০ লক্ষ টনের মত এবং সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ ১১ লক্ষ টন। কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণব্যবহার ক'রলেও চিনির উৎপাদন ১২।১৩ লক্ষ টনের বেশী হবে না, ফলে আমাদের বিদেশ থেকে আরও ৭ লক্ষ টনেরও বেশী চিনি আমদানী করবার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। তা' ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও চিনির চাহিদা বেড়ে যেতে বাধ্য; কাজেই চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা এখুনি হতে পারছি না। আর একটি দিকও দেখবার আছে যে, ওষুধ তৈরী কিম্বা সিরাপ প্রভৃতি উৎপাদন করবার জন্যও খুব ভাল করে পরিশোধিত চিনির চাহিদা সর্বদাই থাকবে।

শোধনাগার স্থাপনের সমর্থকেরাই অবশ্য যুক্তির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন অন্ততঃ সরকারের সহানুভূতি পাবার ব্যাপারে। কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে আমাদের আখ উৎপাদনের। আমাদের দেশের আখের একর প্রতি উৎপাদনও যেমনি অত্যন্ত কম, আখের মধ্যে চিনির অংশও তেমনি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে কম। এই দুইয়ের উন্নতি বিধান করতে না পারলে আমাদের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। নূতন কারখানাগুলি স্থাপিত হলে আখের চাহিদা এখন থেকে অনেক বেশী বেড়ে যাবে। এবিষয়ে সরকারী নীতি কতটা সাফল্যের পথে তা' ভেবে দেখা দরকার। অভিযোগ খুব শোনা যাচ্ছে যে, কতিপয় রাজ্যসরকার, বিশেষ ক'রে উত্তর প্রদেশ ও বিহার 'ইক্ষুকর' বাবদ

প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন, অথচ আখের উন্নয়নের জন্য সংগৃহীত এই অর্থের অতি অল্প অংশই তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন।

পাট তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আংশিকভাবে গৃহীত

ভারত সরকার পাট তদন্ত কমিশনের সুপারিশ সমূহের কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন। কাঁচাপাট ও পাট-দ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় এবং ফাটকা-বাজারের প্রকৃতি এবং ব্যবসায়ের উপর তার ফলাফল সম্বন্ধে তদন্ত এবং পাট-চাষী ও পাট-শিল্পকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া

সমস্যাই-বাণিজ্যের স্বার্থবিরোধী সকল প্রকার অসদাচরণ বন্ধ করবার জন্য এই কমিশন গত ১৯৪৩ সালের আগেস্ট মাসে নিযুক্ত হয়েছিল। দেশের পাট-শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার যেখানে সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে নূতন পাটের কারখানা স্থাপনে সম্মতি না দেবার জন্য কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন, সরকার তা' গ্রহণ করেছেন। কাঁচাপাটের রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা এবং ইন্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন অবাধের মত একটি সুসংহত সংস্থা গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে পাট উৎপাদনে 'গ্রেডিং' উপর বিশেষ নজর দেওয়া সম্বন্ধে কমিশন যে সমস্ত সুপারিশ করেছিলেন, সরকার তাও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য দেওয়া সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেন নাই। কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পাট-কমিশনার, মিল-মালিক এবং সমস্ত ব্যবসায়, ব্যাংকিং এবং কাইজাস এবং চাষীদের প্রতিনিধি এবং রাজ্য-সরকারগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতি পাট-দ্রব্যের মূল্যানুযায়ী কাঁচা পাটের মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। অবশ্য কমিশন একথাও বলেছিলেন যে, এসম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও বাঞ্ছনীয় নয়। যা' হোক সরকার মনে করেন যে কমিশন যে ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন তা, বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজ দেবে না। সরকার অবশ্য তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণ চলতে পারে না এই জন্য যে পাটশিল্প তার বেশীর ভাগ মাল কাটতির জন্য বিদেশের বাজারের ওপর নির্ভর করে থাকে। পাট কমিশনার কাঁচা পাটের দাম বেঁধে দিলেন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকত তা হলে স্বাভাবিক বাজারের শক্তিগুলির দ্বারাই এই দামটা ঠিক নির্ধারিত হোত। সরকারের মতে কাঁচা পাটের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা একটি দীর্ঘ-মেয়াদী সমস্যা এবং পাটের উৎপাদন ও শিল্পের প্রতিযোগিতা মূলক শক্তি বৃদ্ধির উপরই তা নির্ভর করে। একটি সু-বিধিবদ্ধ ফাটকা বাজার স্থাপন, আরও ভাল পরিবহণ ব্যবস্থা, কেনা-বেচার সুবিধা এবং অনুরূপ ব্যবস্থাও এবিষয়ে অনেকটা সাহায্য করবে।

এসকল ছাড়া আরও কতকগুলি সুপারিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু পাটচাষীদের ভাগ্য সম্পর্কে সকলেই যেন একটু অবহেলার নীতি নিয়েছেন বলে মনে হয়। সরকার কি কথার মার-প্যাঁচ দিয়ে আসল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেলেন না?

আমদানী ও রপ্তানী পরিষদদ্বয়ের বৈঠক

সম্প্রতি আমদানী ও রপ্তানী পরিষদদ্বয়ের ষাণ্মাসিক বৈঠক সমাপ্ত হয়ে গিয়াছে। রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ভারতে রপ্তানী বাণিজ্যে অবিচল উন্নতির লক্ষণকে স্বাগত করা হয়েছে। বিশেষ ক'রে চায়ের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় এ বৎসরের প্রথম ন' মাসের গত বৎসরের অনুরূপ সময় থেকে ৯ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা বেশী আয় হ'য়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে এ বৎসরই ভারতের চায়ের বিদেশের বাজারে সব চেয়ে বেশী কাটতি হয়েছে। ভারতবর্ষ যখন আন্তর্জাতিক চা সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন বিদেশের বাজারে তার স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চা সমিতির গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বিদেশের বাজারে প্রচার কার্য চালাবার ফলে, ভারতবর্ষ আবার তার হারানো বাজারগুলো ফিরিয়ে পেতে লাগল। ভারতের এই স্বাধীন

নীতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আজ আর কারো সন্দেহের কারণ নেই। প্রচার বিভাগ এবং সুসংহত বিক্রয় সংস্থা বিদেশের বাজার অটুট রাখা এবং প্রসারিত করবার পক্ষে অপরিহার্য। এ সম্পর্কে যাতে কোন প্রকার শৈথিল্য না ঘটে সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আমদানী বাণিজ্যের দিকে ভারতবর্ষ ক্রমাগত অনাবশ্যক দ্রব্যের আমদানী কমিয়ে দিয়ে আসছে, যাতে করে আবশ্যিক আমদানীর লেন-দেনের জন্য যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রার সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

রপ্তানী বাণিজ্যকে জোরদার করবার জন্য সরকার রপ্তানীশুল্কের যথাযথ সমন্বয় বিধান এবং বিদেশে রপ্তানীর বাজার প্রসারিত করবার জন্য আমদানী শুল্ক হ্রাস এবং রপ্তানী দ্রব্যের উপাদান হিসাবে কাঁচামালের আমদানী নিয়ন্ত্রণ বিধি-নিষেধের কঠোরতা হ্রাস করবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কেবলমাত্র পাট এবং তুলাজাত দ্রব্য ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যের রপ্তানী লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই।

সামুদ্রিক শুল্ক-পোতের উন্নয়ন

সামুদ্রিক বাণিজ্যকে মোটামুটী তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, উপকূল বাণিজ্য, সন্নিকট বাণিজ্য এবং সুদূর বাণিজ্য। ভারত সরকারের বাণিজ্য পোতের নীতি অনুসারে সম্পূর্ণ উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় পোতের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উপকূল বাণিজ্যকে সকল দেশই জাতীয় বাণিজ্যের স্বাভাব্য ক্ষেত্র বলে ধরে থাকে এবং ভারত সরকারের নীতি যথার্থই বটে। কিন্তু এই নীতির ফলে যে একটি বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তা বিশেষ লক্ষণীয়। কিছু সংখ্যক বৃহত্তর বাণিজ্যপোত সুদূর বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে সংরক্ষিত উপকূল বাণিজ্যে যোগ দিয়েছে। তা'তে ছোট শুল্ক পোত কোম্পানী-গুলি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না এবং সুদূর বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ বিদেশী শুল্ক-পোতগুলির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য পোতের পরিমাণ নিতান্তই কম। বৃটিশ সরকারের অধীনে থাকাকালে দেশে সামুদ্রিক পোত নির্মাণের প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় নাই। স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয় সরকার এবিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন বটে কিন্তু উন্নতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। বেসরকারী শিল্পমহল থেকে এবিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে এগিয়ে আসা দরকার। তদ্ভিন্ন যাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় তার জন্য আমরা সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি।

বিজ্ঞান জগৎ

গ. চ. ভ.

প্রাণীদেহে পাইররেড হরমোনের প্রভাব

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রত্যেকেই যেরূপ আকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে আকৃতি বরাবর একই রকমের থাকে না—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত থাকে। মানুষের শৈশব হইতে কৈশোর অবস্থার পার্থক্য অনেক। তারপর আবার যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যৌবন অতিক্রম করিবার পর বার্ধক্য পর্যন্ত আবার বিপরীত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। মোটের একটি মানুষের শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার আকৃতিগত গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। এমন কি, বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইবার পর তাহার আকৃতির সহিত পরিণত অবস্থার আকৃতির কোনই সাদৃশ্য লক্ষিত হয় মোটের

প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি উদ্ভিদ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ধক্য পর্যন্ত ক্রমাগত আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া চলিয়াছে; এই পরিবর্তনের কোথাও বিরাম নাই। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিণত অবস্থার আকৃতিকেই আমরা তাহাদের জাতীয় পরিচয়জ্ঞাপক নামরূপ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তাহাদের একটি বিশিষ্ট অবস্থার পরিচয় মাত্র; বিভিন্ন অবস্থার সমগ্র পরিচয় নহে। এইগুলি হইল সাধারণ পরিবর্তন এবং এই সাধারণ পরিবর্তনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষিত হয়। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা দেখা যায় না; মনে হয়, থামিয়া থামিয়া দফায় দফায় পরিবর্তন সাধিত হয়। মাকড়সা, কাঁকড়া-বিছা, কাঁকড়া, চিংড়ি, প্লেইস, টারবট, হ্যালিবাট প্রভৃতি প্রাণীদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শৈশব অবস্থা হইতে পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবার বিভিন্ন সময়ে ইহারা কয়েক দফায় এমন অদ্ভুত রূপান্তর পরিগ্রহ করে যে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বাহির করা দুষ্কর।

প্লেইস, টারবট, হ্যালিবাট প্রভৃতি মাছের ডিম হইতে বাচ্চা নির্গত হইবার পর তাহারা সাধারণ মাছের মতই সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। তখন বাচ্চাগুলিকে সাধারণ মাছের মতই দেখায়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উপর হইতে নীচের দিকে খাড়াভাবে ক্রমশঃ চ্যাপ্টা হইতে থাকে। তারপর জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ডান দিকেই হউক কিংবা বাম দিকেই হউক, ক্রমশঃ কাৎ হইতে থাকে। কাজেই একটি চোখ থাকে নীচের দিকে, আর একটি চোখ থাকে উপরের দিকে। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন থাকে না—নীচের চোখটি ক্রমশঃ ঘুরিয়া উপরের দিকে একপাশে সরিয়া আসে; মুখটি কিন্তু নীচের দিকে এক প্রান্তে বেঁকিয়া থাকে। মোটের উপর পরিণত অবস্থায় ইহারা এমনই এক অদ্ভুত আকৃতি পরিগ্রহণ করে যে, ইহাদের চোখ, মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গসংস্থানের কোন ঐক্য বা সমতা লক্ষিত হয় না। ব্যাঙের ডিম হইতে ব্যাঙাচি জন্মায়। ব্যাঙাচির হাত-পা কিছুই নাই—একটা

ডিম্বাকার পদার্থের পিছনের দিকে থাকে একটা লম্বা লেজ। কিছুকাল পরে জলের মধ্যে বিচরণ করিবার সময়েই তাহাদের পা গজায়। পা বাহির হইবার পর ব্যাঙাচি ডাঙ্গায় উঠিয়া আসে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে লেজটি অদৃশ্য হইয়া যায়।

কিন্তু ফড়িং, প্রজাপতি, মশা, মাছি প্রভৃতি প্রাণীদের আকৃতি পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। প্রজাপতি, ফড়িং, মশা-মাছির সহিত তাহাদের বাচ্চার কোনই সাদৃশ্য নাই। একমাত্র ফড়িং ছাড়া বাচ্চা অবস্থায় ইহারা প্রত্যেকেই থাকে হাত-পা ও ডানাশূন্য এক একটি সাধারণ কীট। এই বাচ্চা কীটগুলি কিছুদিন পরে অকস্মাৎ পুত্তলী অর্থাৎ গুটিতে রূপান্তরিত হয়। কিছুকাল পুত্তলী অবস্থায় নিশ্চেষ্ট ভাবে কাটাইবার পর সহসা একদিন কয়েক মিনিটের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফড়িঙের বাচ্চাগুলি জলের নীচেই বিচরণ করে। ইহারা পুত্তলির রূপ ধারণ করে না। উপযুক্ত সময় হইলেই জল হইতে বাহির হইয়া ফড়িঙের বাচ্চা লতাপাতার উপর বসিয়া শরীরটাকে শুকাইয়া লয়। তারপর বাচ্চাটার পিঠ ফাটিয়া যায় এবং সেই ফাটলের মধ্য দিয়া পূর্ণাঙ্গ ফড়িং বাহির হইয়া আসে। ইহাদের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণের ব্যাপারগুলি এমনই অদ্ভুত যে, রূপকথার ঘটনাও তাহার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

কয়েক জাতীয় পিঁপড়ে-মাকড়সার মধ্যেও অদ্ভুত রকমের রূপ-পরিবর্তনের ব্যাপার দেখা যায়। শেষ বারের খোলস বদলাইবার পূর্বপর্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। তারপর হঠাৎ একদিন শেষ বারের মত খোলস পরিত্যাগ করিবার সময় স্ত্রী-মাকড়সার রূপ পরিবর্তন করিয়া প্রায় দ্বিগুণ লম্বা বিকট-দর্শন পুরুষ মাকড়সার আকৃতি পরিগ্রহণ করে।

এই সকল স্বাভাবিক নিয়মিত ঘটনা ছাড়াও সময় সময় এমন কতকগুলি আকস্মিক রূপ-পরিবর্তনের ঘটনা দেখা যায়, যেগুলিকে সাধারণতঃ প্রকৃতির খেয়াল বলিয়াই মনে হয়। গুটিপোকা মুরগী কিছুকাল ডিম পাড়িবার পর অকস্মাৎ মোরগে রূপান্তরিত হওয়া অথবা মোরগের মুরগীতে রূপান্তরের ঘটনার কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য নজির আছে। তাছাড়া মানুষের মধ্যেও সময় সময় স্ত্রী পুরুষে এবং পুরুষ স্ত্রীতে রূপান্তরিত হওয়ার বহু খবর জানা গিয়াছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে জীব-জগতের রূপ-পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু কথা হইতেছে, কি উপায়ে এরূপ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীব-জগতের রূপ-পরিবর্তন ঘটিতেছে? দেহাভ্যন্তরে উৎপন্ন হরমোন নামে এক প্রকার রসায়নিক পদার্থই যে রূপ-পরিবর্তনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, বহুবিধ পরীক্ষার ফলে তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। থাইরয়েড হরমোনই বিশেষভাবে আকৃতি পরিবর্তন এবং দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি অদ্ভুত গ্ল্যাণ্ড, অর্থাৎ গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এণ্ডোক্রাইন, অর্থাৎ নালীশূন্য গ্ল্যাণ্ড নামে পরিচিত। এই ধরণের বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে বিভিন্ন প্রকারের রস নির্গত হইয়া সোজাসুজি রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই নালীশূন্য গ্রন্থি-নিঃসৃত রসই হরমোন নামে পরিচিত। প্রাণিদেহের আকৃতি পরিবর্তনে প্রত্যক্ষভাবে থাইরয়েড এবং পরোক্ষভাবে পিটুইটারী গ্রন্থি-নিঃসৃত হরমোনই অংশ গ্রহণ করে। আমাদের গলদেশের অভ্যন্তরে V-অক্ষরের মত বাঁকানো একটি স্ফীত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ফীত পদার্থটির দুই বাহু ল্যারিংস্-এর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। ইহাকেই থাইরয়েড গ্রন্থি বলা হয়। ইহার মধ্যে হলুদে রঙের তরল পদার্থপূর্ণ মুখবন্ধ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

থলি আছে। চলতি রক্তের এই তরল পদার্থই থাইরয়েড হরমোন। খাওয়াইয়া দিলেও হরমোন অপরিবর্তিত অবস্থায় খাদ্যনালীর ভিতর দিয়া রক্তের সহিত মিশিতে পারে। কাজেই গ্রন্থি শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণ সেবনেই শরীরের উপর প্রত্যক্ষ ফলাফল প্রত্যাশা করা সম্ভব। বিভিন্ন গ্রন্থিসজাত বিভিন্ন হরমোনের উপাদান নির্ণীত হওয়ার ফলে আজকাল হরমোন সংশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে।

থাইরয়েড গ্রন্থি-নিঃসৃত রস প্রাণীদের আকৃতি-পরিবর্তনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মেক্সিকোর কোন কোন হ্রদের জলে কয়েক ইঞ্চি লম্বা পাঁকাল মাছের মত এক রকমের কেঁচোতে পাওয়া যায়। এই প্রাণীগুলি আক্সোলোটল নামে পরিচিত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ছাড়া ইহাদের আকৃতিগত কোনই পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। কিন্তু এক মাত্রা থাইরয়েড গ্রন্থিচূর্ণ তাহার রস খাওয়াইয়া দিলে দিন কয়েকের মধ্যেই সেই জলচর আক্সোলোটল স্থলচর সিরিসিটিতে পরিণত হয়। ইহা পরীক্ষিত ঘটনা। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—জলচর আক্সোলোটলের থাইরয়েড গ্রন্থি থাকিলেও কোন কারণে তাহাদের রস-ক্ষরণ বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে তাহাদের রূপান্তর ঘটা সম্ভব হয় না। কাজেই তাহারা তাহাদের শৈশবাবস্থার আকৃতি লইয়াই বাঁচিয়া থাকে এবং সেই অবস্থায়ই বংশ-বৃদ্ধি করে। সেই জন্য বাহির হইতে অতিরিক্ত থাইরয়েড হরমোন দিলে তাহাদের দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

স্বাভাবিক অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের হ্রাস-বৃদ্ধিতে শারীরবৃত্তি ছাড়াও বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। পরিণত বয়স্ক মানুষের থাইরয়েড নিঃস্রাব কম হইলে মাইক্সোডিমা নামে একপ্রকার রোগ জন্মে। ইহার ফলে শরীরের ভিতরকার রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি মন্থর হইয়া যায়। হৃৎস্পন্দনের গতি হ্রাস পায়, শরীরের উত্তাপ কমিতে থাকে, গলার স্বর কর্কশ হইয়া পড়ে, ক্ষুধার উদ্রেক হয় না এবং মানসিক বৃত্তি পৈশাচিকতা পূর্ণ হইতে থাকে। ত্বকের নীচে সংযোগ রক্ষাকারী তন্তুসমূহ স্ফীত হইবার ফলে শরীর এবং চোখে-মুখে অস্বাভাবিক স্ফীতি দেখা দেয়। শরীরের মেদ বৃদ্ধি পায় এবং চুল উঠিতে থাকে। উপযুক্ত পরিমাণে থাইরক্সিন প্রয়োগে এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যায়। ছেলেদের থাইরয়েড গ্রন্থির এরূপ গোলযোগ ঘটিলে উল্লিখিত লক্ষণগুলি তো প্রকাশ পাইই, অধিকন্তু কঙ্কাল এবং মস্তিষ্কের বৃদ্ধিও বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় একটি ছেলে অনেককাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়েও তাহার আকৃতি বালকের মতই প্রতীয়মান হইবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিও চার-পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক অপেক্ষা বেশী হইবে না। এই অবস্থাকে বলা হয়—ক্রেটিনিজম। খাদ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়মিতভাবে থাইরক্সিন (সংশ্লেষিত থাইরয়েড হরমোন) সেবনে এই ভীষণ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অনেকেরই ধারণা বয়স্ক লোকের অতি সামান্য মাত্রায় থাইরয়েড নিঃস্রাব কম হইয়া থাকে। মধ্যবয়সী অনেক লোকেরই থাইরয়েড প্রয়োগে চুল গজাইতে এবং দৈহিক স্ফীতি কমিতে দেখা গিয়াছে। আবার অধিক পরিমাণ থাইরয়েড রস নির্গত হইবার ফলে এক্সোপথ্যালমিক গয়টার নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার ফলে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যায়, হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্যের দরুণ হৃৎকম্পন সুরু হয় এবং চোখ দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। কাজেই উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিমত ছাড়া থাইরয়েড ব্যবহার বিপজ্জনক হইতে পারে।

সুস্থ শরীরে এক মিলিগ্রাম পরিমিত থাইরক্সিন প্রবেশ করাইয়া দিলে দেহের সংগঠন-ক্রিয়া আশ্চর্যরূপে বাড়িয়া যায়; অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় দেহ-সংগঠন প্রক্রিয়ার যতটা অক্সিজেন প্রয়োজন, হরমোন প্রয়োগের পর সেই ক্ষেত্রে শতকরা দুই ভাগ বেশী অক্সিজেনের দরকার হইবে। থাইরক্সিনের মাত্রা অধিক হইলে

দেহ-সংগঠন প্রক্রিয়া এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির যোগান না পাইলে দেহতন্তুর উপাদান-সমূহ সেই ঘাটতি পূরণ করিবার ফলে শরীর অতি শীঘ্র ভাঙিয়া পড়ে। তাছাড়া অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরক্সিন প্রয়োগে মেজাজ বিগড়াইয়া যায়, উত্তেজনাপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য আত্মপ্রকাশ করে।

কতকগুলি বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে থাইরয়েড গ্রন্থি অপরিহার্য নহে। অস্ত্র-প্রয়োগে থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করিলেও জীবনীশক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে—অবশ্য অতি মন্থর গতিতে। স্বাভাবিক অবস্থার শরীরের পক্ষে যতটা অক্সিজেন দরকার, গ্রন্থি অপসারণের পর শতকরা তাহার প্রায় ৪০ ভাগ কমিয়া যায়, দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক হইতে অনেক নীচে নামিয়া আসে। মোটের উপর থাইরয়েড হরমোন যেন জীবনরূপ অগ্নিশিখার উপর, প্রবল বায়ুপ্রবাহের মত কাজ করে। শিখাকে উজ্জ্বলরূপে প্রজ্বলিত রাখিতে সবল বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজন। অন্যথায় আগুন নিবিবে কিন্তু ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিতে থাকিবে। থাইরয়েডের অভাবে জীবনীশক্তির সেরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে।

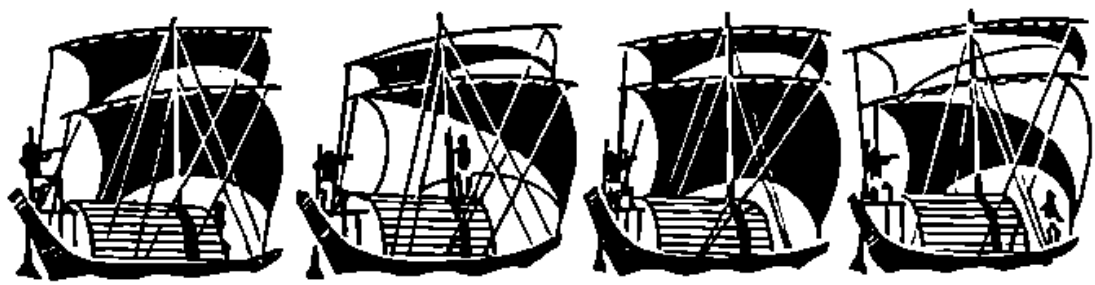

শরৎসাহিত্যের ব্যাপক যথাযথ সমালোচনা এখনও হয়নি। বর্তমান গ্রন্থে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সমস্ত গল্প (উপন্যাস ছাড়া) আলোচনা করেছেন। তাঁদের অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার ফলে এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তথ্যবিচার এবং বহু তথ্যের সমাবেশ হয়েছে। 'অবতরণিকা'য় তাঁরা বাঙালী মনের স্বরূপ আলোচনা করে, শরৎসাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখিয়েছেন, সমাজের সঙ্গে শরৎসাহিত্যের যোগ নির্দেশ করেছেন।

বস্তুতঃ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নিখুঁত ছবি আমরা আর কারও কাছ থেকে পাইনি। স্নেহ-প্রেমের যে গভীর শতমুখী ধারা অভাব-অনটনের মধ্যেও আমাদের সংসারকে সরস মধুর ক'রে রেখেছে তার সন্ধান দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। সেই কারণেই তিনি বাঙালীর এত প্রিয়। সাহিত্য প্রধানতঃ হৃদয়ের জিনিষ, তাই বুদ্ধিবাদীর দ্বিধা সত্ত্বেও সহজবত্তা গুণে শরৎসাহিত্য দেশবাসীর মন জয় করে নিয়েছে। সেই গুণটির কথা স্মরণ রেখেই গ্রন্থকারদ্বয় এ বইয়ে তাঁর সমালোচনা করেছেন।

একথাও তাঁরা ভুলে যাননি যে যত বড় সাহিত্যিকই হউন্ না কেন, তাঁর আবির্ভাবের পশ্চাতে জাতীয় সাহিত্যের একটি ঐতিহ্য আছে। পূর্বগামীদের অনুসরণ ক'রেই নবীনেরা অগ্রসর হ'ন, হয়তো নতুন আলোয় নতুন দৃশ্যাবলী তাঁরা দেখতে পান। এক্ষেত্রে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের দান উল্লেখ ক'রে তাঁরা শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তিন অংশে গ্রন্থখানি বিভক্ত: অবতরণিকা, উন্মেষন পর্ব, নবজাগরণ পর্ব। অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিচিত গল্পগুলিকেও গ্রন্থকারেরা ভোলেননি। যেমন, 'বোকা', 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া' 'বাল্য-স্মৃতি', 'হরিচরণ' প্রভৃতি। তাঁদের মতে 'রামের সুমতি' থেকে শুরু হয়েছে নবজাগরণ পর্ব, পূর্ববর্তী রচনাসমূহ উন্মেষন পর্বের অন্তর্গত।

জানবার ও ভাববার কথা বইখানিতে অনেক আছে তবু দু'টি একটি (আমাদের মতে ত্রুটি) বিষয়ে লেখক-লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যখন পড়ি: "ভাষা কখনও মিষ্টি হতে পারেনা। মিষ্টি হয় ভাব। ...তাই শরৎচন্দ্রের ভাষাই মিষ্ট" (অ, ৩৪-৩৫), তখন খটকা লাগেনা? আবার "একটার পর একটা চিত্র সন্নিবেশ করে চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বলেই শরৎচন্দ্রের গল্পগুলির Contextএর দরকার হয়না—যে-কোন স্থান থেকে পড়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যেরই এই প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

শঙ্খনাদ পত্রিকা
কলিকাতা ২০। মূল্য ৫৲

রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী' প্রবন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তারই রূপায়ন দেখেছি বললে কি অত্যুক্তি করা হবে?" এ উক্তিও কি বিভ্রমজনক নয়? চিত্র দ্বিতিমন্ত্রী, ভালো গল্প গতিধর্মী; কাদম্বরী রূপ-বর্ণনা-প্রধান, শরৎচন্দ্রের গল্প চরিত্রবর্ণনাপ্রধান। একটিতে অলঙ্কারের প্রাচুর্য, অন্যটিতে বিরলতা; প্রথমটিতে ঘটনা এগোয় না দ্বিতীয়টিতে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে;—এমন অবস্থায় দুইয়ের সাদৃশ্য কি তুলনীয়তা নয়?

অবশ্য, অনেক গুণের মধ্যে এ ত্রুটি উপেক্ষণীয়। পুস্তকখানি বাংলা-সমালোচনা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অভাব পূরণ করেছে।

অগ্নিমুখ (শারদীয়): দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা: ভাদ্র-আশ্বিন। দাম আট আনা। সম্পাদক: জগদিন্দ্র মণ্ডল, সনৎ চক্রবর্তী। ২৩।১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ) কলকাতা ২৫।

এই কবিতা-পত্রিকাখানি ইতিমধ্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান সংখ্যার সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে রুচিসম্মত সাহিত্যসজ্জা। ভিতরের একরঙা ছবি দু'খানিও অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর।

প্রথম কবিতা জীবনানন্দ দাশের 'রাত্রিদিন'। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর এর একটি বিশেষ মূল্য আমরা অনুভব করি। তা ছাড়া আছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মৃণালকান্তি সরকার ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আশরাফ সিদ্দিকী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, স্নেহাঙ্কর ভট্টাচার্য, সুমেন্দ্র গুহ, অনিমেষ সেন প্রভৃতির কবিতা; বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জাপানী কবিতা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছন্দ' এবং চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক কবিতা' বিষয়ক প্রবন্ধ; আর, অমল দত্ত, দিলীপ দত্ত, সরিৎ তোফদার ও ভূনাথ রায়-কৃত চা'রটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ। এ সংখ্যাখানিকে সুদৃশ্য ও সুপাঠ্য ক'রে তুলতে সম্পাদক-দ্বয় চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

রক্তের অক্ষরে: কমলা দাশগুপ্ত। নাভানা; ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩। দাম ৩৷০।

বাংলার বিপ্লব-কাহিনী অবলম্বনে অনেক বই বেরিয়েছে। বিভিন্ন লেখক লিখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। কেউ দিয়েছেন ঐতিহাসিক তথ্য, কেউ দিয়েছেন বিপ্লবী চিন্তাধারার সন্ধান, কেউবা করতে চেয়েছেন নিজের বা দলের প্রচার। বর্তমান গ্রন্থ পুরোপুরিভাবে এর কোনও শ্রেণীতে পড়ে না। বিপ্লবের—বিশেষ করে ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের বহু তথ্য উল্লিখিত হয়েছে এতে, তবু তথ্য পরিবেশন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। হিংসআন্দোলন থেকে অহিংস সংগ্রামে চলে আসা এবং মহাত্মাজীর অধীনে নোয়াখালিতে কাজ করার কথাও লেখিকা বলেছেন, কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে হিংসা-অহিংসার তুলনামূলক বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হননি। আর নিজের বা দলের গুণকীর্তনের প্রয়াস তাঁর আদৌ নেই। বরং সে বিষয়ে তাঁর সংযমই বেশী চোখে পড়ে। এতে যে গুণটি সর্বপ্রধান বলে মনে হয় সে হচ্ছে আপন হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্ব সংগ্রামের অনাড়ম্বর প্রকাশ। এ গ্রন্থ কমলা দাশগুপ্তর বিপ্লব-কাহিনী নয়, বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্তর ব্যক্তি-মনের ছবি। বিপ্লবের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে বাধ্য করেছে মা-বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, অন্তরের নিরুদ্ধ জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন তিনি, অথচ এ ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর। দুর্বলতা বা অনুশোচনার চিহ্ন এতে নেই কোথাও। 'ভুল করেছি এ মনোভাব তাঁর নয়। সত্যের সাধনায় উৎসর্গ করতে হয়েছে নিজেকে, আহুতি দিতে হয়েছে সকল প্রিয়বস্তু, সে তপস্যার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে মানসপটে। কত আনন্দের, কত বেদনার। বিশেষ করে বেদনার স্মৃতি। স্নেহ-প্রবণ উদার-হৃদয় পিতার অনুনয়, মায়ের উৎকণ্ঠা—কতদিন দাগ কেটে গেছে বুকের মধ্যে, তবু সব নীরবে সইতে হয়েছে, পাছে সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। উৎসর্গ পত্রে পড়ি: "যে লক্ষ লক্ষ মা-বাবাকে পরাধীন ভারতের ছেলেমেয়েরা

নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আগুনে কলসে দিয়েছিলেন. তাঁদের সকলকে স্মরণ করে আমার বাবার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে মাকে উৎসর্গ করলাম।" বুঝতে পারি অন্তরে কতখানি বেদনা গোপনে সঞ্চিত হয়ে আছে।

বিপ্লব-কালের কোন কোন ঘটনা এতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে. ঐ সবের এমন বিশদ বিবরণ অন্যত্র দুর্লভ। যেমন. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বৃত্তান্ত। ঐ সময়ের বহু দুঃসাহসীর কথা এ বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে। গুপ্ত ব্যায়াম সমিতি, মেয়েদের হষ্টেলে বাক্স ভর্তি বোমা লুকোনো, পুলিশের হাঙ্গামা, জেল-জীবন, মোহাখালির বিবরণ—প্রত্যেকটি অংশ উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক আর সব চেয়ে হৃদয়গ্রাহী লেখিকার আপন মনের উন্মোচন, সুখ-দুঃখের নিপুণ রেখাচিত্র। রচনায় সাহিত্যিক গুণ প্রচুর। 'মন্দির'র সম্পাদিকা রূপে তিনি একদিন যে যোগাত্যার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে-কথা আজ প্রীতিভরে স্মরণ করি।

বাংলা বর্ষলিপি : সম্পাদক শ্রীদিগিরকুমার আচার্য চৌধুরী. বি, এ। সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্রেস, কলিকাতা—১৯

গত ১১ বৎসর ধরে পুস্তকখানির পরিচালকগণ তথ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ পরিবেশন করে আসছেন। বাংলা ভাষায় এমন একখানি বর্ষ লিপির বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল ছাত্র-সমাজে দেশবিদেশের সংবাদে আগ্রহের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। পারিতোষিক হিসাবে এই ধরণের পুস্তক দিলে ভাল হয়। আমরা দেখে আনন্দিত হয়েছি যে এই পুস্তকখানি শিক্ষা-বিভাগের,ডিরেক্টর কর্তৃক প্রাইজ বই হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

রাজকন্যা : শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীবিমল সেন। ৩৩বি. কালীঘাট রোড্। কলিকাতা ২৫। মূল্য ১৷৷০।

মাঝে কিছুদিন বাংলা কবিতায় একটা রুক্ষতা এসেছিলো। অনেক কবি প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছিলেন। সে কোঁকটা এখন কেটে গেছে। কাব্যে শ্রী ফিরে এসেছে। 'রাজকন্যা' সেই কথাই মনে করিয়ে দিলো।

প্রথম কবিতা—বসন্ত : শালবনী। বসন্তের আমেজ কবিতাটিতে লেগেছে ; ছবিতে স্বপ্নমাধুরী।

"ফাল্গুনে শালের বন—যেন কোন কুমারীর মন—
চেয়ে থাকে—পাতায় জাফরী-বোনা রোদ-জানালায়,
শুন্ শুন্ মৌমাছির সুর তোলে। সময় তখন
আনমনা রাখালের মত ক্লান্ত কী বাঁশী বাজায়।"

শান্ত নিভৃত কত দূরের দেশ—তারই কল্পনায় কবির মন বিভোর। "পাষাণপুরী এ কলকাতা. কোথায় রাখি মন!" কখনও ভাবেন, "তালের পাখা টোপর চাকা প্রান্তরের ঝড়, কখনও "ব্যাঙের ডাক, ভিজে ঘাসে জল থই থই," কখনও বা মনে পড়ে :

"ডালিমের ডালে
কচিপাতাদের ঠোঁটে রুপালি সকালে
আসেনি সোনার রঙ্।"

যে লাবণ্যে কুটীরবাসিনীও রাজকন্যার শোভা নিয়ে দেখা দেন, সেই লাবণ্য নিয়েই গোবিন্দবাবুর কাব্যলক্ষ্মী আবির্ভূতা।

কিরণদা—

জাতির সেবায় নিজেকে একান্তভাবে বিলিয়ে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে যাঁরা একদিন এই শতাব্দীর গোড়ার কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন, তাঁদের আর একজনকে হারালাম। নাম নয়, যশ নয়, নিজের বিন্দুমাত্র সুখ বা স্বার্থ নয়, শুধু দেশকে গ'ড়ে তোলবার সাধনা ছিল এঁদের জীবন-ব্রত। তাই কিরণদাকে চিনত অনেকেই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা কম লোকেই জানত; তাঁর ব্যক্তিগত বা সাংসারিক জীবন ব'লে কোনকালে কিছু ছিল, এই কথাই বোধ হয় কারও মনে হয়নি। সে দিকটা তিনি চিরদিন আড়াল ক'রেই রেখেছিলেন। কাগজে কাগজেও তাঁর খ্যাতির প্রচার হয়নি। অথচ তাঁর মতো সাহসী, সহিষ্ণু, একাগ্র কর্মী বোধ হয় কোন দেশেই বেশি মেলে না। চুয়াত্তর বছর তাঁর বয়স হয়েছিল কিন্তু উৎসাহ ও কর্মশক্তি ছিল অফুরন্ত। শরীর ভালো না থাকলেও মনের বল কমেনি। এমন কি, শরীর খারাপ একথা তিনি সহজে স্বীকার করতে চাননি।

মূত্রাধারের ক্যান্‌সারে তিনি কিছুদিন যাবৎ ভুগছিলেন। প্রথমটা অসুখকে গ্রাহ্য করেননি, কাউকে বলেনওনি। বাড়াবাড়ি হবার পর সহকর্মী বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দেন; ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪, রবিবার সন্ধ্যাবেলায় সেইখানে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমবার সকালবেলায় শোকযাত্রা বাহির হয় এবং নিমতলা ঘাটে তাঁর দেহভস্ম সম্পন্ন হয়।

মত ও পথ সবচেয়ে বড় নয়, বড় মনুষ্যত্ব। তাই বিভিন্ন মতের কর্মী অনেকেই কিরণদা'কে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন সার্বজনীন কিরণদা। দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ কাজ—এই তিনি সকলের কাছে চাইতেন। তাঁর সস্নেহ কিলচড় এবং গালাগালি খায়নি, এমন পরিচিত লোক আছে কিনা সন্দেহ। যাকে দেখতেন তাকেই দু-একদিনে তিনি এমন আপন করে নিতেন, আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচারের কথা কারও কোনদিন মনেই উঠত না।

এত দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থেকেছেন খুব কম লোক। ১৯০৫ এর আন্দোলন থেকে ১৯৪২ এর আন্দোলন, কোনটা থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন থাকেননি। অরবিন্দ সম্পাদিত প্রথম 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ থেকে তিনি তার সঙ্গে এবং সর্ববিধ বিপ্লব-আয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নিরালম্ব স্বামী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী, যতীন মুখোপাধ্যায়—এঁদের সকলেরই তিনি ছিলেন সহকর্মী।

শুধু বিপ্লব নয়, পল্লী সংগঠনেও তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। খুলনা—দৌলতপুর-সত্যাশ্রম প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছিল, আর যে কয় বছর ছিল, তিনিই ছিলেন তার প্রাণ। সামান্য গোলপাতার ঘর থেকে প্রশস্ত স্থানে সুন্দর বাড়ীঘর, পাঠগৃহ, ব্যায়াগার, তাঁত-শালা ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; স্কুল-কলেজের ছেলেরা আসত পড়তে, খেলাধূলা করতে, ভিন্নমুসলমান গ্রামবাসী আসত ওষুধ পত্র নিতে। প্রায়ই দুপুরবেলায় দেখা যেত কিরণদা তাঁর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্সটি নিয়ে হেঁটে হেঁটে চাষাভুষা বা গরীব লোকদের বাড়ীতে চলেছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁর স্নেহ ও সেবা পেয়েছেন।

নৈতিক চরিত্র সবল না হলে দেশের কাজ করা যায় না—এ ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তা নিয়ে সময়ে সময়ে তিনি একটু আধটু গোঁড়ামিও প্রকাশ করতেন। অনুবর্তীরা তাঁকে ভক্তি এবং তাঁর কথার ভঙ্গীতে মনে মনে কৌতুক বোধ করলেও অন্তরে অন্তরে ভক্তি করত চিরদিন।

পরের দুঃখে গভীর সহানুভূতি বোধ করলেও নিজের দুঃখকে তিনি কখনও আমল দেননি। তাঁর মনোবলের কাছে সব বাধা এবং সর্বপ্রকার নিপীড়ন হয়েছে ব্যর্থ। বহুবৎসর তাঁকে কারাগারেই কাটাতে হয়েছে; যে-কদিন বাইরে থেকেছেন, ছাত্রপাঠের আংশিক অসাড়তা সত্ত্বেও অবিরাম ছুটোছুটি এবং পরিশ্রম করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তাঁর ছিল না, কিন্তু জ্ঞান ছিল গভীর—বিশেষতঃ ইতিহাস ও রাজনীতিশাস্ত্রে। ভারত ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান এবং যোগাযোগের পথ তিনি নখদর্পণে প্রত্যক্ষ করতেন।

'শিবাজী গুরু রামদাস স্বামী' ও 'চন্দ্রগুপ্তগুরু চাণক্য'—নামে তাঁর দুখানি বই আছে। তাতে তিনি মনোগত আদর্শ কতকটা ব্যক্ত করেছেন। দূরদর্শী চাণক্য অন্যায়কে দমনের জন্য সর্বপ্রকার কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য তাঁরই ইঙ্গিতে চলেছে অথচ তিনি অনাসক্ত, নির্লোভ। কিরণদার মতে, এমনি হওয়া উচিত রাজনৈতিক নেতার জীবন।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর কিরণদা গোলদীঘির কাছে গ্রন্থাগারসহ পাঠগৃহ স্থাপন করে তার কাজ নিয়েই থাকতেন। বিশেষ করে ছাত্রদের ডেকে আনতেন, পড়তে বলতেন, তাদের দেশপ্রেম ও নৈতিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করতেন। চঞ্চল মতিগতি নিয়ে বিপথে না ঘুরে তারা আত্মস্থ হোক, বড় আদর্শ অনুকরণ করুক, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। যুবশক্তিই দেশের ভবিষ্যৎকে গড়বে, তাই তরুণদের কথা তিনি এত ভাবতেন। পাঠগৃহের মারফতে যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিল, দেখা গিয়েছে, তাদের অনেকেরই আচরণে অনেকটা দায়িত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে; স্রোতে ভেসে যাওয়া সাধারণ যুবকদের থেকে তারা একটু স্বতন্ত্র।

তাঁর আকাঙ্ক্ষা সার্থক হোক। বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম নিশ্চয় লেখা থাকবে। তার চেয়ে উজ্জ্বলতর অক্ষরে লেখা থাকুক তাঁর অগণিত ভাইদের অন্তরে, তাঁর অমিত তেজ অনির্বাণ শিখায় অনুক অনুগামীদের কর্ম-উপাসনায়।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট :—

১০ই ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের যে আয়োজন হয়েছিল, তা আপাততঃ স্থগিত হওয়ায় সকলেই খুশী হয়েছেন। সরকার পূর্বে কর্মচারীদের দাবি সম্বন্ধে বিচারের ভার যাঁদের উপর দিয়েছিলেন তাঁদের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি; তা নিয়ে কর্মচারী সমিতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সরকার পুনর্বিচারের ভার দিয়েছেন শ্রীযুক্ত রাজাধ্যক্ষের উপর। পুনর্বিচারের ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষেরই ধৈর্যধারণ বাঞ্ছনীয়। কর্মচারী সমিতির অভিযোগ, তাঁরা যে সুযোগ-সুবিধা আপাততঃ অস্থায়ীভাবে ভোগ করছিলেন, তার কাটছাঁটের হুকুম দেওয়া সরকারের দিক থেকে ঠিক হয় নি। সরকারপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, নূতন বিচারকের নির্দেশ ঘোষণার পূর্বপর্যন্ত ঐ সব থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না।

আজকাল অর্থনৈতিক সমস্ত কাজকর্ম একান্তভাবে ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ব্যাঙ্ক-ধর্মঘট অর্থ সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি। ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু ধর্মঘটের মারাত্মক পরিণামের কথা চিন্তা করে' দেশবাসী উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না।

কলকাতা ও হাওড়া পুলিসের অনশন ধর্মঘট

অবস্থার উন্নতি দাবি ক'রে কলকাতার একদল সশস্ত্র পুলিস ১০ই ডিসেম্বর অনশন ধর্মঘট শুরু করে। পরে

অন্যশ্রেণীর পুলিসেরাও কেউ কেউ ধর্মঘটে যোগ দেয়। পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের দাবি সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন, আশ্বাস দেওয়ায় তারা পরদিন সন্ধ্যায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করে।

১২ই ডিসেম্বর থেকে হাওড়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুলিস-বাহিনীর একাংশ অনুরূপ কারণে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেছে। কর্তৃপক্ষ তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন জানানো সত্ত্বেও তারা ধর্মঘট থেকে বিরত হয়নি। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, জনসাধারণ পুলিসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেছিল, তারা বিচারাধীন। তারাই অপর সকলকে উত্তেজিত করে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিস-কর্মচারী সমিতি হাওড়া পুলিসের আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

নানাস্থানে ধর্মঘটের হিড়িক দেখে একটা কথা স্বতঃই মনে আসে। অভাব-অভিযোগ আমাদের অনেকেরই আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাপ্য সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন, দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই ততটা নই। যোগান না থাকলে চাহিদা মেটানো যায় না, এটা স্বতঃসিদ্ধ অথচ দেশের সম্পদবৃদ্ধিতে আত্মকূল্য করবার আগ্রহ বা চেষ্টা কম লোকেরই আছে। নিয়োগকারীর দিক থেকে কোথাও কোন ত্রুটি নেই, এ কথা আমাদের বক্তব্য নয়, কিন্তু নিয়োজিতেরাও সর্বত্র নির্দোষ নয়। সততার সঙ্গে কর্তব্যপালনে অনেকেই উদাসীন। ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি না হ'লে কোন দিয়োরি ইস্তাহার বা গণতান্ত্রিকতে দেশের উন্নতি হবে না, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

বর্তমানক্ষেত্রে, এ ধর্মঘট বিশেষরূপে আপত্তিকর, কারণ যাদের উপর শৃঙ্খলারক্ষার ভার তারা বিশৃঙ্খলার পথে চললে তাদের ঐ বিভাগের উপযুক্ত বলে করা কঠিন।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্ত্রিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

শ্রী টাইপ

আধুনিকতম ডিজাইনের

এবং

বর্ডার প্রভৃতি ষ্টক হইতে

সত্বাধিব

জে, সি, হই

১২বি, নেতাজী

কলিকাতা

ফোন : ব্যাঙ্ক ৫৩৮৯

দি

বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ

৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এজেন্সী

ও সংগঠন অফিস আছে

মাদ্রাজ অফিস—৪৩-বি, পেরেগু মাইন্স রিড

যুক্তপ্রদেশ—১১, বীচার রোড, এলাহাবাদ

আসাম অফিস—গৌহাটী, আসাম

পূর্ণিয়া অফিস—স্যাঙ্গী বাজার, পূর্ণিয়া

হাওড়া অফিস—২২, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া

—বাংলার বিপ্লবযুগের অপূর্ব ইতিহাস—

"বিপ্লবের পদচিহ্ন"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

আজই একখানা কিনে পড়ুন এবং ঘরে ঘরে পড়বার সুযোগ দিন। বইখানা আপনার গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে থাকবে।

—বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

বস্তুতঃ বইখানি পড়তে পড়তে শুধু ভূপেন্দ্রকুমারকে নয়, সমগ্র বিপ্লবীদলকে পাওয়া যায় যারা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও মহৎ। তাদের কর্মসাধনা, তাদের চিন্তাধারা যেন মাটির গভীরে সমগ্র জাতির তপস্যা,—মুক্তির জন্যে, এবং তারও চেয়ে বড়, আলোর জন্যে। এরই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের পরিচয় থাকা শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্য।

(তরুণের স্বপ্ন)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

.....শাসকশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিবরণ কারাগারের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে স্থিত মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মার পরাজয় স্বীকার না করবার অপূর্ব চিত্র।.....প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই বইয়ে ভূপেনবাবু শুধু নিজের কথাই বলেন নাই সহকর্মীদের কথা, পুলিশ কর্মচারী জেল কর্মচারী, সরকারী বড় কর্মচারীদের কথা, বিভিন্ন জেলের ব্যবস্থা, অবস্থা, তা সংশোধনের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম, জেলে পড়াশোনা, আদর্শ বিচার, দলাদলি, আমোদ-প্রমোদ—সব কথাই অত্যন্ত সরলভাবে বর্ণনা করেছেন।.....

.....বই খানার ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, লিখনভঙ্গী মনোজ্ঞ ও সরস। একবার আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠা যায় না। সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটা সবল সতেজ সহৃদয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। তা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আমরা সকলকেই বইখানা পড়তে অনুরোধ করি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা—

.....Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Ravindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengali youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. Only in the Easter Revolution in Ireland we can search for parallels of such acts of individual heroism. We should know the history of this period of Bengal. Let the world also know about them.

—Amrita Bazar Patrika—

সরস্বতী লাইব্রেরী

৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

পূজার অভিনয়ে নূতনত্ব চাহিলে

মন্মথ রায়ের নাটক

কারাগার- মুক্তির ডাক--মহুয়া

স্বনামখ্যাত নাটকত্রয় এক খণ্ডে প্রকাশিত : মূল্য ৩৲

জীবনটাই নাটক

নিমার্জা থিয়েটারে অভিনীত একাধারে পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক : ২॥০

মহাভারতী

১৯০৫ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুক্তি-আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেল একটি চাষী-পরিবারের পঞ্চাঙ্ক জীবন-নাটক একটিমাত্র দৃশ্যপটে রূপায়িত। মূল্য ২॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স : ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি:—৬

কার্য্যকারিতায়, স্থায়িত্বে ও গুণে

বেঙ্গল বেল্টিং

ও

বেঙ্গল হোস

অতুলনীয়

১ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট

কলিকাতা—১

ফোন : সিটি ১২১১, ১২৫২

Kirit Advertising Agency

Representative of :

FAMOUS NEWS PAPER & MAGAZINE

72, HINDUSTHAN PARK

BALLYGUNJ, CALCUTTA.

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও লৌন্দর্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প-সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

রূপকথা ২৲

বাবিলোনীয় উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটী সরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুধীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী"—বসুমতী।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২॥০

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসহ। সৃষ্টির আদি হতে সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির প্রাঞ্জল ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। যদিও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে। বিষয়বস্তুতে, ভাষার সরসতায়, ছবিতে ও প্রচ্ছদপটের পারিপাট্যে পুস্তকখানি অপূর্ব ও মনোজ্ঞ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২৲

—নরেন রায়—

ইস্কুলের ভূগোল যাওয়া যুগের এক অবিস্মরণীয় কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত আনন্দমঠের সন্তান সৈন্যদের সত্যকার ইতিহাস।

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —যুগান্ত

—মনোমোহন চক্রবর্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২॥০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২॥০

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

সরস্বতী লাইব্রেরী ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কবি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনখানি বই ঃ

কুটীরের গান—১॥০

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'কাব্যপরিচয়ে' এই গ্রন্থেরই কবিতা 'রাঙাডিঙিরী' স্থান পেয়েছিল। হেঁয়ালি নয়, মতবাদের উদ্গীরণ নয়,—প্রকৃতি আর জীবনের বিচিত্র মধুর রূপ নিয়েছে কবিতাগুলিতে। পূর্ববঙ্গের খাল, বিল, নদী, বন্দরের এমন ছবি আর কোথাও নেই। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন : "কুটীরের গান যে বাংলা দেশের সর্বনাশ ভরপুর, সে বাংলাদেশ আর আমাদের দেখা হবে না বলে novialgiaর ভাব আনে। আপনি তার সৌন্দর্যকে নিজের লেখনীর ফাঁদ পেতে ধরে রেখেছেন।"

নিশান নাও—১৸০

১২২-'৪ ৮এর মধ্যে রচিত স্বদেশী কবিতার সমষ্টি। "শেষের যে কবিতাগুলি গান্ধীজীকে নিয়ে লিখিত সেইগুলি বুকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে।—"শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

[প্রাপ্তিস্থান : ভবানীপুর বুক ব্যুরো। ১বি, রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।]

সাহিত্য প্রবাহ—৩৲

সাহিত্যসমালোচনার অপূর্ব গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া', 'মানসী', 'রক্তকরবী', গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ইক্‌বাল, হলি ; জাপানী কবিতা, অ্যাণ্টন চেখভ, সিলান্‌পা—দেশ-দেশান্তরের শ্রেষ্ঠসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার উদ্‌ঘাটিত। সর্বত্র প্রশংসিত।

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২ প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কার্তিকে। অন্য কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কার্তিক থেকে বৎসর সুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেবেন। 'মন্দিরা' প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের রিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

যথাসম্ভব নতুন বানান ব্যবহার করবেন। নকল রেখে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার: মাসিক:

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৫০৲

অর্ধ পৃষ্ঠা—২৮৲

সিকি পৃষ্ঠা—১৬৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা তজ্জন্য দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—"মন্দিরা"

৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ফোন:—বি. বি. ২৬৬০

UNIVERSITY

সপ্তদশ বর্ষ পৌষ—১৩৬১ নবম সংখ্যা

গরজ-আগ্রহ-প্রেরণা
MOTIVATION

অধ্যাপক নিভুরঞ্জন গুহ পূর্বানুবৃত্তি

আগ্রহ সৃষ্টির বাহ্য উপায় হচ্ছে পুরস্কার ও তিরস্কার। আগ্রহের একটা বস্তু (incentive) থাকা চাই। পুরস্কার পেলে মন খুশী হয়—আগ্রহ নিবিড়তর হয়। তিরস্কারও কখনো কখনো আগ্রহকে উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তিরস্কার আগ্রহকে স্তিমিত করে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য সামান্য হতে পারে। কিন্তু তার মানসিক মূল্য (Psychological value) কম নয়। শিক্ষক বা প্রিয়জনের একটু প্রশংসা বা নিন্দা, একটু মুখের হাসি বা ভ্রূকুটি পুরস্কার তিরস্কার হিসাবে যথেষ্ট হতে পারে শিক্ষকের এ কথাটা জানা খুব দরকার পুরস্কার আগ্রহকে উত্তেজিত করে তার কারণ পুরস্কার দ্বারা আমাদের অহং তৃপ্তি লাভ করে। এটা শিক্ষকের মস্ত সহায়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। "প্রাণের বন্ধু" অমিতার বিয়েতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। তারো খাওয়াদাওয়া হবে, তাই তুমি না খেয়েই গেছ বেশ ক্ষুধার্ত। চমৎকার রান্নার সুঘ্রাণ আসছে। কিন্তু অপরিচিত আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভর্তি। অমিতার মা বোন্ তাঁরা সব বড়লোক আছীয়া বা বাহবীদের আপ্যায়নে ব্যস্ত তোমাকে কেউ বসতে বল্‌লো না। অমিতাকে যেখানে সাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে তুমি অমিতার চুলটা বেঁধে দিচ্ছ হঠাৎ আর একজন বোর্ডেটোর বন্ধু এসে বল্লো—"একি ছন্দে বিশ্রী চুল বাঁধা! সরুন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।" অমিতাও বাধা দিলো না। নতুন বিলিতী ধাঁচে চুল বাঁধা হোল। তুমি বিষম রেগে না খেয়েই চলে এলে। বাড়ীতে এসেও লজ্জায় বল্লে না—না খেয়ে এসেছো—সে রাত উপবাসেই কাটলো। এখানে জৈব তাড়না ক্ষুধার চেয়ে অনেক বেশী বড় তোমার অভিমান। অমিতার বাড়ী খেলে না, সেখানেও কারণ হোল তোমার অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। নিজ বাড়ী এসে নিজের অপমানের কথা বল্লে না, সেখানেও যেচে প্রচণ্ড অহমিকা।

এ কথাটা সুশিক্ষকের খুব ভালো করে জানা চাই। ছাত্রকে উৎসাহী করে তুলতে গেলে তার অহংবোধকে কাজে লাগাতে হবে। এর একটা মস্ত উপায় প্রশংসা। তার উন্নতির এটা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তার অহংবুদ্ধি এতে

তৃপ্তি পায়। শাস্তি দিয়ে, লজ্জা দিয়েও হয়তো তার আহত পৌরুষকে উন্নত করে তোলা যেতে পারে কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। তাই বর্তমান শিক্ষানীতিতে শাসনের চেয়ে প্রশংসার স্থান বেশী। উইলিয়াম জেম্স ঠিকই বলেছেন মানুষের প্রকৃতিতে সকলের থেকে বড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অন্তে আমার গুণের আদর করুক—"The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated" এই কথাটাই ডিউইও প্রায় একভাবেই, বলেছেন মনুষ্যপ্রকৃতির গভীরতম দাবী হচ্ছে এই ইচ্ছা যে আমি বড় হবো—"The deepest urge in human nature is the desire to be important"। এটা খুব সাধারণ কথা, কিন্তু খুব মূল্যবান কথা। একথাটি যদি আমরা অন্যের সঙ্গে ব্যবহারের বেলা স্মরণ রাখতাম তা হলে সংসারে অনেকখানি সুখ বাড়তো অনেকখানি বেশী স্বাস্থ পাওয়া যেতো। সংসারে স্বামী স্ত্রীর কাছে চায় একটুখানি স্বীকৃতি যে তার দাম আছে বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে অনেকখানি সুবিধা আদায় করে নিয়ে থাকেন। তেমনি বুদ্ধিমান স্বামী স্ত্রীকে সময়ে একটুখানি প্রশংসা করলে (তার চেহারা তার রুচি তার বুদ্ধির) তাকে অনেক বেশী খাটিয়ে নিতে পারেন। এটা ব্যবসাদারীর মতো শোনাতে পারে। কিন্তু এটা গভীরভাবে সত্য। ভালবাসা মানেই তো পরস্পরের মূল্যের স্বীকৃতি। যখন বলি "তোমায় আমি ভালবাসি" তখন ঐ কথাটিই জানাতে চাই তুমি আমার কাছে দামী। এতে আমার অহংএরও গভীরতম তৃপ্তি কারণ তখন এ প্রত্যয় রইলো তুমি আমারই'। তাই যেখানে ভালবাসা সেখানেই আছে শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন। যেখানে নিজের মূল্য পাই সেখানেই নিজেকে দিতে পারি সব চেয়ে বেশী। যেখানে প্রেম—সেখানে জীবনের প্রসার, সেখানে সৃষ্টি, যেখানে ঘৃণা—সেখানে জীবনের সঙ্কোচন, সেখানে বন্ধ্যাত্ব। নীতিশিক্ষার শ্রেষ্ঠ কথা তাই ভালোবাসো, হিংসা কোরো না। স্যার পার্সিনান চমৎকার করে এ কথাটি বলেছেন "প্রেম হচ্ছে বিকাশ ও বিস্তারের মূলনীতি, কারণ, ভালবাসার বস্তুর সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার ঐশ্বর্যকে আমরা আবিষ্কার করি, বিকশিত করি, কিন্তু ঘৃণা হচ্ছে মৃত্যু ও সঙ্কোচের নীতি, কারণ এতে করে ঘৃণার বস্তুকে আমরা দূরে রাখি তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করি।"১৮

আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা অর্জিত আগ্রহের মূল উৎস। কিন্তু অহং তো বিচ্ছিন্ন বিশ্বনয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি সত্য সেই পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন করে তার আগ্রহের কোন মূল্য নেই। যখন ব্যক্তি আপন মূল্যের স্বীকৃতি খোঁজে—সে স্বীকৃতি কার কাছে খোঁজে? স্বীকৃতি তার সমাজের কাছে, তার দলের কাছে—গোষ্ঠীর কাছে! তাই সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের আগ্রহের আলোচনায়—এই সামাজিক স্বীকৃতির কথা ভুললে চলবে না। আদিম তাড়নাগুলি হ'চ্ছে জৈব-প্রয়োজন-সঞ্জাত (biogenetic) ও দৈহিক (physical) কিন্তু পরিণত সুস্থ মানুষের কামনা বাসনা আগ্রহ সমাজের মতামত প্রশংসা অপ্রশংসা দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই এই অর্জিত আগ্রহগুলি সমাজ-প্রয়োজন-সঞ্জাত—Sociogenetic এবং মানসিক (Psychological)। মানুষের সামাজিক জীব হিসাবে আগ্রহ নিজ সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আহরণ! তার বহু কর্মের প্রেরণা এইখানে খুঁজতে হবে। সে তাই প্রতিযোগিতায় রত হয়—দশজনের আগে সে যেতে চায়। মুজাফর শেরিফ তাই বলছেন "আমরা দেখি মানুষ চেষ্টিত হয় নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে উঁচুস্থান অধিকার করতে—সে গোষ্ঠী যাই হোক্ না কেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা দেখি সে চেষ্টা করে দলের মধ্যে প্রধান হতে…" ১৯

সুস্থ পরিণতির জন্য শিশুর জীবনে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে নিরাপত্তাবোধ,—স্নেহ, প্রীতি, প্রশংসা এবং

১৮ Sir Percy Nunn—Education, its data & principle.

১৯ Muzaffar Sherif—An Outline of Social Psychology

নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে উৎসাহ। শিশুর এটা সামাজিক অধিকার। গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হওয়া প্রশংসিত হওয়ার আগ্রহ কর্মোদ্যমের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস। সি এন ফ্লেমিং বলেছেন "মানুষের জীবনের প্রধান প্রয়োজন কি? সম্ভবতঃ প্রথম হচ্ছে নিরাপত্তা। এর জন্যে প্রয়োজন শুধু আর্থিক অভাব থেকে মুক্তি নয়, গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত হওয়া, (acceptance by the group) তার সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশের জন্যে দরকার সমাজের স্নেহ, স্বীকৃতি ও প্রশংসা……নিরাপত্তার পরে আসে নূতনের ক্ষেত্রে জীবনের অগ্রসরণ নূতন কর্মের জন্য উদ্যম, নূতন আগ্রহ সৃষ্টি, নূতন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা। জীবনের পরিণতি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরেই এই বিস্তারের জন্যে সুযোগ দানের প্রয়োজন অনুভূত হয়।" ২০

শিশুকালে নিরাপত্তা বোধের অভাব ও অভিজ্ঞতার বিস্তারের সুযোগের অভাব অনেক সময় ভবিষ্যৎ জীবনে বহু বিকৃতির জন্যে দায়ী। কিশোরদের অপরাধ-পরায়ণতার প্রধান কারণগুলির মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান কালে রাশিয়াতে শিক্ষার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির আগ্রহকে শুধু মাত্র তার নিজস্ব উন্নতির কাজে লাগার নয়, একটা সামাজিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ লাভের কাজে লাগানো হচ্ছে। গোড়ার থেকেই শিশু এ শিক্ষা পাচ্ছে যে বিচ্ছিন্নভাবে সে সত্য নয়, গোষ্ঠীর মধ্যেই সে সত্য।

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

অধ্যাপক কায়রভ ১৯৪০ সালে কম্যুনিষ্ট শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে লিখেছিলেন "কম্যুনিষ্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাত্মক বিকাশ। এই সর্বাত্মক বিকাশের শিক্ষার অর্থ হচ্ছে—বুদ্ধি, দৈহিক পরিশ্রম, নীতি, সৌন্দর্যবোধ, ও দেহ-চর্চা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা। ২১ ব্যক্তির এই আগ্রহকে সক্রিয় ও সার্থক করে তুলবার জন্যে রাশিয়া জোর দিয়েছে—সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর বিয়েট্রিস্ কিং লিখছেন—"কাজেই এটাই আশা করা যায়, যে সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্যে, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই আন্তরিক চেষ্টা হবে। এটা করা হচ্ছে সমস্ত শিশুর জন্যে শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়ে। এতে জাতি, ধর্ম, পিতা-মাতার সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা, বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি কিছুই বিচার করা হচ্ছে না। ২২

আমেরিকাতে ডিউই শিক্ষাকে সমাজ জীবনের অঙ্গ বলেই মনে করেছেন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহকে বাস্তব সমাজ-প্রয়োজন-অভিমুখী করার কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন। পুরোন ধরণের প্রচলিত শিক্ষায় শিশুর বাস্তব আগ্রহের দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় পুঁথি-নাকিক ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয় মাত্র।

এভাবে শিক্ষায় ছাত্রদের উৎসাহ সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব এবং তাদের শিক্ষা নিতান্তই প্রাণহীন হতে বাধ্য। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নূতন ব্যবস্থার প্রভেদ আলোচনা করে তিনি বলছেন "উপর থেকে চাপান শাসনের পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিত্বের চর্চা ও প্রকাশে উৎসাহ দান, স্বাভাবিক গতিচঞ্চলতা রুদ্ধ করার পরিবর্তে এখানে আছে স্বাধীন কর্মোদ্যম, পুস্তক ও শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা, প্রাণহীন অভ্যাসের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কতগুলি তথ্য বা কৌশল আয়ত্ত করার পরিবর্তে আছে—এমন সংহত

২০। C. M. Fleming—The Social Psychology of Education.

২১। Prof Kairov—Sovietskaya Pedagogika No. 6 1940

Beatrice King—Russia Goes to School P. (

ও জীবন উদ্দেশ্য সাধন যাতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক আগ্রহ কাজে লাগবে একটা দূর ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতির পরিবর্তে, বর্তমান অবস্থার সুষ্ঠু সুযোগ গ্রহণ ; কতকগুলি অনড়, অচল অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তে আছে—সদা পরিবর্তনশীল জগৎ ও অবস্থার সঙ্গে প্রাণপূর্ণ পরিচিতি।" ২৩

আমাদের দেশের শিক্ষার বিফলতার একটি মূল কারণ হচ্ছে এ শিক্ষা সামাজিক জীবন ও ব্যক্তির স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ শিক্ষা নিতান্তই পুঁথিগত—অ্যাবষ্ট্রাক্ট। এ কথা রবীন্দ্রনাথও খুব ভাল করে বুঝে ছিলেন তাই শান্তিনিকেতনে তিনি নূতন ধরণের শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন—যেখানে ছাত্রদের আগ্রহ রুচি ও স্বাধীনতা ব্যবহারের বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে শিশুকে সফল ও আনন্দময় করতে তিনি চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন "দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে, এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিষ হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা-বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার।" (২৪) শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হবে সমাজ জীবনের সঙ্গে পরিচিতি, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল ও শ্রদ্ধা এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়নে আগ্রহ সৃষ্টি এটাও তিনি বুঝেছিলেন।

ব্যক্তির আগ্রহকে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে কার্যকরী করে তুলতে গেলে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুইই আয়োজন আছে। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পৌরুষ জাগ্রত হয়, আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে আর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্তব্য ও সেবাবুদ্ধি জাগ্রত হয়—সংগঠনে উৎসাহ বাড়ে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটিরই প্রয়োজন আছে। আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার দ্বারা ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর বেশী জোর আর রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। সুশিক্ষক জানেন ছাত্রের আগ্রহকে এই দুই পথেই চালনা করে একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে।

যেখানে আগ্রহ তার উপযুক্ত বিষয় লাভে সমর্থ হয় সেখানে আসে তৃপ্তি। এটা মানসিক সুস্থতার পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতাপূর্ণ বর্তমান অসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থায় আমাদের বহু আগ্রহই পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয় না। সুস্থ সাধারণ মানুষ জানে যে আমাদের "যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না" এই পৃথিবীর নিয়ম তাই এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহজভাবেই সে নিতে চেষ্টা করে। কখনো বা সে আগ্রহকে সে স্তিমিত করে দুধের সাধ ঘোলে মেটায় (substitution)। মানুষের অভিমান যেখানে আহত হয় সেখানে সে উপায় খোঁজে সে আঘাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে। এর সুফল কুফল দুইই আছে। যে ছেলে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেলো না সে হয়তো ভাল খেলোয়াড় হয়েই নাম কিনলো—তার আগ্রহকে সে স্থানান্তরিত করলো। এ একধরণের ক্ষতিপূরণ (Compensation)। তার মন বললো "নাকের বদলে নরুন পেলুম টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্"। কিন্তু এমনও হতে পারে যে পত্রিকার সম্পাদক তার লেখা ফেরৎ পাঠিয়েছেন সে তার শোধ তুলল ছোট ভাইএর অঙ্কের খাতা ছিঁড়ে ফেলে, যেহেতু সে অঙ্ক ভুল করেছে ;—অথবা সম্পাদকরা নিতান্তই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এ রকম কুৎসা রটনা করে। যেখানে কোন ছেলে বা মেয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা বহু

২৩। John Dewey—Experience, Education & Traditional vs. Progressive Education
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ পৃঃ ৪৪

আগ্রহ পরিতৃপ্ত হওয়ার পথে বাধা আছে তার অক্ষমতার মধ্যে অথবা সমাজের অন্যান্যের ব্যবস্থার জন্যে—সেখানে তার মনে হতাশার (frustration) সৃষ্টি হয়, পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের গ্লানি তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে—এবং তা গঠনাত্মক পথে চালিত না হয়ে সমাজবিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজে নিরুদ্ধ শক্তির মুক্তি খোঁজে। কলকাতার ট্রাম বাস্ পোড়ানো, নানা হাঙ্গামায় ছেলের দল বারে বারে লিপ্ত হচ্ছে এটা সমাজের পক্ষে বিষম দুর্লক্ষণ। যেখানে দেখা যায় শিক্ষকেরা পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এই অজুহাতে জবরদস্তি করে পরীক্ষা বন্ধ করতে উদ্যত সেখানে বুঝতে হবে দেশের যুব সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক আগ্রহ সুস্থ স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ পাচ্ছে না। এবং এ রোগ বিস্তারলাভ করেছে—যুবকদের যারা গড়ে তুলবেন তাঁদেরও মধ্যে। শুধু শাস্তি দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা হবে না। দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের যুবকদের স্বাভাবিক আগ্রহের সুস্থ পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে, যাতে তাদের উচ্ছৃংখল আগ্রহ কল্যাণ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

আমাদের অভিমান প্রচণ্ড তাই হার মানতে আর পরাজয় নিজের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জা পাই। তাই যখন আমাদের আগ্রহের সকল পরিণতি ঘটলনা তখন আত্ম-মর্যাদা রক্ষার জন্যে নানা উপায় খুঁজি। একে ইংরাজীতে বলে defense mechanism। কখনো বা বাস্তব-জীবনের পরাজয়ের দুঃখ ভুলি জগতের কল্পনার রাজ্যে (day dream)। এই পলায়নী বৃত্তি (escapism) বাস্তব পরাজয়কে অস্বীকার করবার একটা পথ। কখনো বা নিজের পরাজয়ের নানা ছল ছুতা আবিষ্কার করি, পরকে দোষী করি (projection)। কখনো বলি 'আঙুর ফল টক' (sour grape mechanism)। আগ্রহ ছিল আই এ এস্ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, বিয়ে হোল ডাক্তারের সঙ্গে, তখন এই সান্ত্বনাই তুমি পাও যে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি এরা তো চাকর। এ সব দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন লোককে তুমি আন্তরিকভাবে অশ্রদ্ধা কর (Sweet pear mechanism) ডাক্তার স্বাধীন ব্যবসায়ী, দেশজিতে ব্রতী, এমন বিয়েই তুমি চেয়েছিলে। অথবা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেলে, এতে করে চোর যে ক্ষতিটা করেছে সেটাকে যেন তুমি অস্বীকার করলে। গভীর আগ্রহ যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, অথবা যখন তাকে অবদমন করতে বাধ্য হই তখন নানা মানসিক বিকারের সৃষ্টি হতে পারে সে কথা "অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এ বিকারের একটা ফল হতে পারে, আগ্রহের যে বস্তু আয়ত্ত হোল না তার প্রতি একটা অহেতুক ঘৃণা বা তীব্র ঘৃণার সঞ্চার। বিষম বিকারের ক্ষেত্রে হয়তো সে ঘটনার স্মৃতিলোপ ঘটে।

শিক্ষকের পক্ষে তাই সমস্যা শুধু ছাত্রদের আগ্রহসৃষ্টি নয় আগ্রহের স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি এবং বিচ্ছিন্ন আগ্রহকে কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীকরণ। জৈব আদিম আগ্রহকে সংযত করার প্রয়োজন আছে তার জন্যে দরকার বিচার বুদ্ধির বিকাশ। সেই জন্যেই উপদেশ হঠকারী হয়ে প্রবল ইন্দ্রিয় গ্রামের ক্ষণিক আগ্রহের বশবর্তী না হয়ে কিছুকালের জন্য কর্ম স্থগিত রাখা (postponement of action)। শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে সুষ্ঠু, শান্ত অথচ উৎসাহশীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ সুখ ও বৃহত্তম কর্ম-ক্ষমতা তখনই আসতে পারে যখন ব্যক্তি আত্মদ্বন্দ্বে দুর্বল নয়, যখন তার অসংযমী ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সে বহুধা-বিভক্ত নয়। ফ্রয়েডও তাই বলেছেন মানসিক বিকারের চিকিৎসা তখনই সফল হবে, যখন ব্যক্তি তার বিচ্ছিন্ন কামনাগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে মীমাংসা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারবে। ভারতীয় দর্শনে এই আত্মসংহতিকে বলা হয় যোগ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন যোগই হচ্ছে "কর্মসু কৌশলম্"। আদর্শ শিক্ষককে এই কৌশলটি জানতে হবে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন আর সকলের চেয়ে দরকারী কাজ সুস্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বসৃষ্টি। সে কঠিন কাজটির ভার আছে শিক্ষকের উপরে।

চিঠী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

চিঠী শব্দটি বৈদেশিক। শব্দ অর্থে চিঠী শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় খুব প্রচলিত। অবশ্য শব্দটি বাঙ্গালা নহে। বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যুৎপত্তি ভাষান্তর হইতে আগত—চিন্নী 'চিট্ঠী' 'চিট্ঠী' হইতে 'চিঠি', তাহা হইতে 'চিট্ঠী', 'চিঠী' (Chitti—Chiti (H.); Chithi (Ben.); Chithithi (Mar.); Chiti (Karn)—See H. H. Wilson's, "Glossary". Enlarged edition, Calcutta 1940, p. 175; Chitthi—H. Rev. T. Craven's, "New Royal Dictionary" Part Two, Lucknow, 1914, p. 61)। চিঠী শব্দের সম পর্য্যায় 'পত্র' শব্দ। শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত অভিধান হইতে আরম্ভ করিয়া লৌকিক সাহিত্যের প্রায় সর্ব্বত্র উহার প্রচলন দৃষ্ট হয়। 'লেখন' শব্দটিও 'পত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে আছে—'অসংবিধিতানি পুনর্লেখন সাধনানি" (Ed. with the comm. of Raghavabhatta. Ninth ed., N. S. Press, Bombay, 1926, p. 100)। প্রাচীন ভারতে অক্ষরবিন্যাসের, চিত্রীকরণের কথা ("লিখাবিনীলাগৃহভিত্তি কাবপি"—নৈষধচরিতে ১।৩৮; অন্তশ্চিত্রদর্শনেন স্বযোগ্যতানির্ণয়মাহ। 'হৃদয়বল্লভোঽভিলিখ্য রতিপতিব্যপদেশেনাপহৃতঃ"—রত্নাবলী ২।৮৮) পাণিনীয় ধাতুপাঠে 'লিখ্' ধাতু হইতে পাই। পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ শাকটায়নের (Vide Dr. O. Boehtlingk's, Panini, Vol. II, p. iii-v) 'লিপি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ" অথবা "অষ্টকাঃ পাণিনীয়াঃ" গ্রন্থের (সূত্রাচ্চ কোপধাৎ—পাঃ ৪।২।৬৫) ৩।২।২১ সূত্রে 'লিপি', 'লিবি' শব্দ একই পর্য্যায়ের।† তাঁহার সময়ে লিখিত পুস্তকের কথাও বিদিত ছিল, তাহাও তাঁহার ১।৩।৭৪ ৪।৩।৮৭; ৪।৩।১১৬ সূত্রের দ্বারাই জ্ঞাত হই।‡ পালি ভাষায় 'পিটক', 'নিকায়', 'জাতক'* শব্দের দ্বারা

† যেমন, 'লিপিকরঃ', 'লিবিকরঃ।' ‡ "সমুদাঙ্ভ্যো যমোঽপ্রন্থে।" "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে।" যেমন, সুভদ্রাধিকৃতা কৃতা গ্রন্থঃ, সৌভদ্রঃ। "কৃতে গ্রন্থে" যেমন, হৈকুপাদো গ্রন্থঃ।

* পিটক—The Buddhist scriptures consist of three great divisions, each of which is called *Pitakam*, 'a Basket.'' They are *Vinaya-pitakam*, *Suttapitakam*, *Abhidhammapitakam*. Ab. 524 gives *pitako* and *pitakam*, "a basket."—Robert Caesar Childers, A Dictionary of the Pali Language. London, 1875, p.506, col. 2;

নিকায়—The name Nikaya or Collection is given to certain divisions of the Tipitaka or Buddhist Scriptures. The five nikayas are the five divisions of the Sutta Pitaka, each containing a certain number of the discourses of Buddha and his apostles (E. Mon. 168, 169, 172; Alw. I. 63);—Do., Do., Do., Do. p. 251, col. 1;

জাতক—a jataka, or story of one of the former births of Buddha (জাতক). *Jatakam* is the tenth book of Khuddakanikaya, and contains five hundred and fifty "jatakas", or tales of the former births of Buddha.—Do Do., Do., Do., pp. 166-167, cols. 2&1.

'লেখনী', 'লেখা' এবং 'অক্ষর' প্রাচীনকালে যে বিদ্যমান ছিল, তাহাও বুঝা যায়। আর্য্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যে 'অক্ষর' অর্থে 'পরিমিত বাক্য' বা 'বর্ণের' কথাই প্রতীতি হয়।† পণিগণ কর্তৃক "বেদ" অপহরণ এবং দেবতাদের দ্বারা তাহা সমুদ্ধার, ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃ বোধগম্য হয় যে আর্য্যদের নিকটে লিখা অপরিচিত ছিল না। আর্য্যেরা যদি লিখা সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত থাকিতেন, তাহা হইলে পণিগণ কর্তৃক "বেদ" কখনই অপহরণ হইত না।‡ ঐ কার্য্যের দ্বারাই আর্য্যদের লিখা জ্ঞানের উৎকর্ষই সাধিত হইতেছে! পরবর্তীকালেও লেখার যে প্রচলন ছিল, উহারও আভাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলে নিহিত—"অস্মিন্ শুকোদরস্নিগ্ধে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু" (Act III)। এখানে 'পত্র' শব্দের প্রয়োগ অতি রমণীয়, সন্দেহ নাই! 'লেখ' শব্দের অর্থও 'পত্র', কিন্তু প্রচার বিরল। সংস্কৃতের অভিধানে এমন অনেক শব্দ আছে যে তাহার প্রয়োগ নাই, যদি বা থাকে তাহা হইলে বিরল! 'লেখ' অর্থে 'পত্র' ঐ পর্য্যায়-ভুক্ত বটে! লৌকিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অভিধান (কোশ) বৌদ্ধ অমরসিংহের "নামলিঙ্গানুশাসন" গ্রন্থে 'লেখ' অর্থে 'পত্র' পাওয়া যায় না। প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর "শাশ্বত-কোশে" —"লেখ্যদেবতয়োর্লেখ্যেলেখারাজিকদাহৃতা" (Ed. N. N. Kulkarni, Poona, 1929, p. 49), বৌদ্ধ অজয়পালের "নানার্থসংগ্রহে"—"লেখঃ স্যাদৈবতে লেখ্যে লেখাস্তাস্ত্রাভিরেখয়োঃ" (Ed. Sanskrit—Sahitya—Parishat, Vol. XVIII, No. II, p.352), ৪৭৬১ কলিযুগের (Corresponding to Samvat 1716 and A. C. 1660), কেশবের "কল্পদ্রুকোশে"—"স্ত্রিয়ু স্যাদ্যেহথ লিখনং লেখনং লেখ ইত্যপি" (Ed. Gaekwad's Oriental Series, No. XLII, 1928, p. 97); লেখ—A letter, an epistle (H. H. Wilson's, A Dictionary in Sanskrit & English, Third Edition, Calcutta, 1874, p. 620) 'লেখ' শব্দ পাওয়া যায়। কৌতূহল পাঠক-পাঠিকা প্রসিদ্ধ জার্মান্ পণ্ডিত Th. Zachariaeর *Die Indischen Worterbucher*, Strassburg, 1897, গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারিবেন। কোষে হয়ত বা অর্থ মিলে, কিন্তু প্রয়োগ বাহির করা কষ্টসাধ্য! অথচ প্রয়োগ না থাকিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয় না। 'পত্র' অর্থে 'লেখ' শব্দের প্রয়োগ এরূপ—"উত্তরোঽয়ং লেখার্থঃ পূর্ণঃ কথমস্তু" (মুদ্রারাক্ষস, Act I, ed. with the comm. of Dhundiraja by K. T. Telang, Seventh ed., Bombay, 1928, p. 85), also "লেখ-স্যানুক্তার্থং" (Act V. do., p. 238)। অর্থপ্রকাশনে ব্যুৎপত্তি বড়ই সহায়ক, তাই 'লেখ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—'লিখ্যতে লিখ্ ভাবে ঘঞ্ লেখনে। কর্মণি ঘঞ্। লেখ্যে। আধারে ঘঞ্। লেখনাধারে পত্রে "নির্দ্ধারিতেঽর্থে লেখেন।" Epistle, Letter ‡ বলার্থে 'লেখ'—'লিপি', 'লেখ্য', 'লেখন' অপেক্ষা সুষ্ঠু এবং ভাব-

†Rv. 1, 164, 45; Av. 9.25,27,29.1; See Yaska's commentary thereon (নৈরুক্তে পরিশিষ্টে ১৩।১।৯); অথৈষাক্ষরস্য স্তুতিঃ তাবৎ Rv. 1,164.39; Av. 9.28,8; Tait. Ar. 10,13; পুনঃ Rv. 10, 71, 8; নৈরুক্তে পরিশিষ্টে চ ১৩।১।১০-১৩; Durgacharya's comm. thereon; Chha. Upa. (of Samaveda) 2, 22, 3; Sankaracharya's comm. thereon; Pan. Siksa 3; অত এব অত্র জগতি ত্রেতাযুগস্য ইন্দ্রচন্দ্রস্তুতেশ্চ আদিতোঽক্ষরোৎপাদন কর্তার এবেতি সম্যগ্ বোধ্যম্ (See mine article on "দেবভাষা-দেবনাগরাক্ষরয়োরুৎপত্তিঃ"—সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, অষ্টাদশাব্দস্য ২য়-সংখ্যা, ১৮৫৭ শকীয়ে জ্যৈষ্ঠে, পত্রাণি ৪১-৪৩।

‡ Pāṇi—Name of a class of envious demons watching over treasures, Rv. (esp. x, 108); Av.; SBr.;—Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1899, p. 580, col. 2.

ছোতক ; বর্ণবিন্যাসে আধাসচীন, সুবোচ্চার্য লঘু শব্দের বহুল প্রচারে ক্ষতি কি ?*

লিখিত ব্যক্তির লেখাবলী ইতিহাস রূপেও মূল্যবান্। ইংরাজি ভাষায় Thomas Gray (1716—1771), Horace Walpole (1717—1797), Edmund Burke (1729—1797), Correspondence—4 Vols., 1844 ; William Cowper (1731—1800), Oliver Cromwell's Letters (1846) ; Gandhiji's (1869—1948), Correspondence with the Government —1942-1944 ; Sri Jawaharlal Nehru—Letters from a Father to his Daughter, Glimpses of World History (Being letters to his daughter containing a rambling account of history for young people—between October 1930 and August 1933. Published in two volumes, 1934—a work unique in character, retaining the letter-form written for a growing child), *Et cetera* ; ফার্সী ভাষায় "দস্তুর সিরিয়ান", প্রভৃতি, লেখাবলি ঐ উক্তির পরাকাষ্ঠা !

প্রাচীন যুগে "প্রাকৃত-প্রকাশের", পাণিনীয় ব্যাকরণের বৃত্তিকার বররুচি কাত্যায়ন (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি, তন্নিমিত্ত "বররুচি" আখ্যা প্রাপ্ত। জৈনকবি হেমচন্দ্রসূরি বিরচিত "স্থবিরাবলীচরিতে" বররুচির বিস্তৃত জীবনী দ্রষ্টব্য) প্রণীত "পত্রকৌমুদী" (সংস্কৃত), উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা ভাষার গঠন সময়ে রামরাম বসুর "লিপিমালা" (১৮০২ খ্রীঃ), মধ্য ও আধুনিক সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭—১৯০৫) "পত্রাবলি", রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২—১৮৯১) "পত্রকৌমুদী" (বাঙ্গালা), স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩—১৯০২) "পত্রাবলী", রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) "যাত্রী", "ছিন্নপত্র", ইত্যাদি, 'লেখ' নামক গ্রন্থ—সুরুচিসম্পন্ন, সুচিন্তিত, সুসংযত, সুলিখিত ! ইহারা সাহিত্যের নিদর্শন ! সত্যদ্রষ্টা, পথপ্রদর্শক পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি—

"ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ"

—ঋগ্বেদ ১০।১৪।১৪

তত্ত্বজ্ঞানকামীদের পরিতৃপ্তির জন্য পত্রে তথ্য উদ্ঘাটন-করণ—†

My dear Sures,

I hasten to give you another reference. It is the story of 'জানশ্রুতি' and 'রৈক' told in the "ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪ অধ্যায়, ১—৩ খণ্ড". I have already given you the story of 'সত্যকাম জাবাল' likewise told in the "ছান্দোগ্যোপনিষৎ" in the 4th and following khandas of the same 4th Adhyaya. I would ask you to read these stories in the English translation of that Upanisad in the "Sacred Books of the East". Both these stories are referred to in that topic of the Vedanta which is known as the 'অপশূদ্রাধিকরণ' (Vide "ব্রহ্মসূত্র, ১ অধ্যায়, ৩ পাদ, ৩৪—৩৮ সূত্র") and in which is answered in the negative the question whether a Sudra is entitled to the acquisition of the knowledge of Brahma

‡ Epistle—O. Fr., L. *epistola*-Gr. *epistole*—*epi*, *stellein*, to send. A literary or poetical work composed in the form of a letter. Letter—from O. Fr. *lettre* from Lat. *littera* 1. of alphabet, (pl.) epistle, missive (that which is sent, as a letter).

*"প্রবাসী", পৌষ, ১৩৫৯, পৃঃ ৩৭৪ দ্রষ্টব্য।

through the medium of the Vedas. Sankara's interpretation of the 'জানশ্রুতি'—legend undoubtedly supported by the 34th Sutra of that Adhikarana. It is, therefore, clear that the word 'শূদ্র' which occurs twice in that legend, was taken even by the author of the Brahma-sutras himself, who must have preceded his great commentator by very many centuries, as not meaning a 'শূদ্র' by caste. Standing, however, on the Upanisad text alone and apart the Brahma-sutras and their commentaries (Ramanuja too, I dare say, is in full agreement with Sankara here), one may be permitted to enquire what the real meaning of the word 'শূদ্র' that legend for, despite the interpretation which it has received as aforesaid, the question is by no means free from difficulty. I may tell you frankly that I have my own doubts, and here lies *your* loophole too. I should certainly be glad if I could give you some more references from the Vedic literature though I suspect that there cann't be many more there, and what is actually there, will go mostly against your thesis. But all this will entail a great deal of research which I am unable to undertake at present.

By the bye, the story of the 'অসুর', who along with 'ইন্দ্র' sought divine enlightenment from 'প্রজাপতি', is really, as I told you when you came to my place the other day, in the "ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮ অধ্যায়. The name of the 'অসুর' is 'বিরোচন'.

I hope you are all right.

Yours Sincerely,

Avinas.†

Sures Chandra Chakravarti, M.A., B.L.

Advocate, High Court, Calcutta •

হিন্দু-আইনের "নির্বৃঢ়" শব্দের বিবৃতি। শব্দটি বড়ই জটিল, তাহাই সরল ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এরূপে :

সর্ব্ববিধ হস্তান্তর করণের অধিকার সহিত সর্ব্ববিধ যথেচ্ছ উপভোগের স্বত্ব, এই হইল নির্বৃঢ় স্বত্বের অর্থ। দায়ভাগ বচনে "যথেষ্ট বিনিয়োগার্হত্ব" শব্দ দ্বারা সেই অর্থই সূচিত হইয়াছে। ঐ বচনে দুইটি স্বত্বের পার্থক্য দেখান হইতেছে—(১) একটী পতি বা পুত্র হইতে দায়রূপে নারী যে স্বত্ব লাভ করে ও (২) আর একটি, স্ত্রী-ধনরূপে নারী যে স্বত্ব লাভ করে। ঐ বচনে দায়ভাগকার বলিতেছেন যে, দ্বিতীয় স্বত্বটি নির্বৃঢ়, কিন্তু প্রথমটি নির্বৃঢ় নহে, কেননা তাহাতে নারীর "যথেষ্টবিনিয়োগার্হ" স্বত্ব অর্থাৎ যেমন দানবিক্রয়াদি হস্তান্তর করণের অধিকার নাই।

† অশেষশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নপ্রতীচ্যপ্রাচ্যদেশীয়নানাভাষা-বিশারদপ্রকৃষ্টশব্দতত্ত্ববিৎপ্রব্রতাত্ত্বিকপ্রকৃষ্টপ্রজ্ঞকলিকাতা-প্রবীণধর্ম্মাধিকরণস্বরাজহারাভিজ্ঞশাস্ত্রিএম্-এবি-এল্বিকর-বিমণ্ডিতমহামনীষাবিভূষিতবিষদ্বরীরবরস্বর্গতঅবিনাশ-চন্দ্রগুরুচতুর্ধুরীণমহোদয়ানাম্—"সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" অষ্টাদশাস্বস্য একসংখ্যা ১৪৩পত্রস্যপাদটীকায়াম্।

"মন্দিরা", পৌষ, ১৩৬০, পৃঃ ৫৫৪, পাদটীকা, পঙ্‌ক্তি ২।

• Author of "Law of Grants in Maintenance," "Studies Jurisprudence and International Law", "Philosophy of the Upanisads", "Daughter of Hindusthan", "বেদ নাথ", "লজ্জাদেবী", "বাসবী", "পরিতাপ", "অনিকেত ছেলে", "আত্মজীবনী", etc., etc.

তোমার প্রেরিত মুদ্রাবেতায় "নির্ঘুচ" শব্দ ছিল, আমি তাহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি মাত্র। তোমার প্রেরিত চোবার উদ্ধৃত ব্যয়ভাগ বাক্যের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। মিতাক্ষরা বলিয়া আর যে একটা বচন দিয়াছ, তাহা মিতাক্ষরায় নাই। মিতাক্ষরার সহিত আমাদের কোনও সংস্রবও নাই।*

সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাহার যে বিষয়ের জ্ঞান নাই, তাহার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নহে:

গ্রন্থ রচনাই তো কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু গ্রন্থের নাম রচনা তাতোধিক কঠিন। স্যার্ ওয়ালটার্ স্কটও তাঁহার এক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে এইরূপ একটা নালিশ করিয়া গিয়াছেন। আমি গ্রন্থকার নহি, গ্রন্থের নামও কখনও রচনা করি নাই। কিন্তু গ্রন্থকার মাত্রেই জানেন, কথাটা বড় সত্য। বিশেষতঃ এই দেশে, যেখানে নামের মোহ বড় মোহ! †

কিছু কাল হইল এই "নব্যভারতে"ই আমি "মুদীর দোকান" ** নামক এক পুস্তকের সমালোচনায় এক প্রকারের বেদ ব্যাখ্যায় আপত্তি করিয়াছিলাম। সে প্রণালী বঙ্গের সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত না হইলে বাঙ্গালায় বেদবিদ্যা কেন, কোনও বিদ্যারই যথার্থ পরিপুষ্টির সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি সত্যই প্রণিধান যোগ্য:

যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থ ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি এক ছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন। যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হলস্থূল বাধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই, তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২১৭, পাদটীকা, বসুমতী সংস্করণ, কলিকাতা, ১. ৩. বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা ভাষা।

* লেখকের পিতৃদেব অবিনাশচন্দ্রের লেখকের নিকটে লিখিত পত্রাংশ।

† লেখকের পিতৃদেবের রচনা "এবার নামকরণ" (সমালোচনীর) পাণ্ডুলিপির মুখপত্র। ঐ সমালোচনী "নব্যভারত", মাসিকপত্র ও সমালোচন, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩২৪, পৃঃ ৯১—১০৩; চৈত্র, ১৩২৫, পৃঃ ৫৪৩—৫৫৪ দ্রষ্টব্য।

** "নব্যভারত", মাঘ, ১৩১৭, পৃঃ ৬২৫—৬৩৪ দ্রষ্টব্য।

: "এবার নামকরণ" (সমালোচনীর) পাণ্ডুলিপির প্রথমার্দ্ধের ২য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যাঁহার লেখাবলি, তিনি ছিলেন বরিশাল নগরের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর নিবাসী আজীবন জাতীয় মহাসভাবলম্বী, স্বদেশী-যুগের কর্ম্মী—দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রিয় সহযোগী এবং স্নেহভাজন সজ্জন। যিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বশালী ছাত্র, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব এবং হিন্দু আইনের প্রামাণিক ব্যক্তি। যাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, পূত স্বভাব, চরিত্র-মাধুর্য্য সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিত—যিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বরণীয় এবং আদর্শ স্থল, জাতীয়তার এবং স্বাদেশিকতার মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন!

বাঙ্গালা অনুবাদ-সাহিত্যের ভূমিকা

(প্রথম অধ্যায়)

শ্রীহরপ্রসাদ বিশ্বাস

সুদূর অতীতকাল হইতে ভারতবর্ষে সংস্কৃতের প্রভাব অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত সাধারণের নিকট সহজবোধ্য নহে, ইহার নমুনতা আছে বটে, এবং নীতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ব্যতীতও এই ভাষায় রচিত কাব্য-নাটকাদির অভাব নাই, তথাপি ইহাতে পাণ্ডিত্য অর্জন না করিলে তাহা কিছুই উপভোগ করা যায় না, আর এইরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করাও সুযোগ ও শক্তির অভাবে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব সাধারণ লোকের ইহার প্রতি আকর্ষণের কারণ না থাকিলেও প্রয়োজনবোধে ইহার প্রতিপত্তি হ্রাস হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ এক বিস্তীর্ণ মহাদেশস্বরূপ। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ইহার বিভিন্ন প্রদেশসমূহে নানা প্রকার ভাষা নিজস্ব বিশিষ্টতার দরুণ বিভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়া থাকে। এইজন্য এক প্রদেশের ভাষা অপর প্রদেশের অধিবাসীদের পক্ষে সহজবোধ্য হয় না। ইহা ব্যতীত লিপির বিভিন্নতাও লক্ষণীয়। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এবং বঙ্গলিপিতে লিখিত কোন গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কোন ভাষা ও লিপিতে পরিবর্তিত না হইলে তদ্দেশ-বাসীগণের পক্ষে ইহা পাঠ করাই সম্ভবপর নহে। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থও সেইরূপ বাঙ্গালায় পরিবর্তিত না হইলে বাঙ্গালীগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন না। এইজন্য ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালেই সকল প্রদেশের ব্যবহারযোগ্য এক ভাষা ও লিপির প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। বর্তমান কালেও সংস্কৃত ভাষা অপ্রচলিত হইয়া যাওয়ার দরুণ আমরা অনুরূপ এক ভাষা ও লিপির প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। জাতীয় ও রাষ্ট্রিক ঐক্য বিধানের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী এক ভাষা ও লিপির প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

সাধারণতঃ এখন আমরা ইংরাজীতেই কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। কিন্তু অতীত যুগেও সাধারণের প্রয়োজন নির্বাহার্থে ভারতীয় মনীষিগণ এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া বিশেষ বিজ্ঞতার সহিতই ইহার সমাধান করিয়াছিলেন। আর্যগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন তখন তাঁহারা যে ভাষা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমিক পরিবর্তনে সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং ইহা আর্যগণের জাতীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। যুগে যুগে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ধারক বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষিগণ এই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ইহাকে ভাবসমৃদ্ধ ও প্রভূত ঐশ্বর্যশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন। আর্যগণের কৃষ্টি ও সভ্যতার সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, আর্য বংশধরেরা যেখানে যেভাবেই বর্তমান থাকুক না কেন স্বীয় কৃষ্টি রক্ষাকল্পে তাঁহারা সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তাঁহাদের কথ্যভাষার শব্দ গুলি যেভাবেই, পরিবর্তিত হউক না কেন, তদ্ধ পর্যায়েই তাহারা অবস্থান করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত হিন্দুগণের প্রাত্যহিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্টি ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। ফলে সংস্কৃত ভাষার সহিত সংস্কৃত চর্চাকারী ব্রাহ্মণগণও স্বাভাবিকভাবেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠেন।

স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, আবার ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিতুষ্টি সাধনের জন্য হরিশ্চন্দ্র পত্নী পুত্র বিক্রয় করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা প্রচারিত হইবার পরে খুলিধূসরিত ব্রাহ্মণের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া যে হিন্দু নৃপতিগণ কৃতার্থ বোধ করিতেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। গুরু, মন্ত্রী ও উপদেষ্টারূপে ব্রাহ্মণগণ হিন্দু রাজসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা ও বুদ্ধির বলে তাঁহারা যে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে সাহায্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় তাঁহাদের এই প্রাধান্য অব্যাহত থাকিতে পারে নাই। এই নবাগত শাসকগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে তাঁহাদের স্বজাতীয় লোকগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অতএব তখন ব্রাহ্মণের পরিবর্তে নবাব দরবারে মৌলবীগণের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বাভাবিক।

বিশেষতঃ এই দুইটি জাতির কৃষ্টির বিভিন্নতার দরুণ পুরাতন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি ও ভাষা পৃথক হওয়াতে হিন্দুর সনাতন আদর্শের প্রতি তাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। অতএব ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতের প্রভাব রাজদরবারে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। তথাপি হোসেন শাহের ন্যায় কোন কোন নবাবের দরবারে যে রূপ সনাতনের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়, ব্যক্তিগত কার্যদক্ষতার জন্য। ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোকগণও এইভাবে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ ও রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল ইহাদের প্রধান দৃষ্টান্তস্থানীয়। আবার পরাগল খাঁয়ের ন্যায় কোন কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে হিন্দুর কৃষ্টির প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রীতির পরিবর্তে ঔৎসুক্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতিসম্পন্ন আকবর ও দারার ন্যায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণকে বাদ দিলে সংস্কৃত ভাষা যে এই সময়ে উপযুক্ত রূপ রাজানুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এইরূপে মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ দরবারে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দুরাজত্বে রাজা ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক এবং ব্রাহ্মণগণ সমাজপতি। তাঁহারা বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন আর রাজা বা রাজপুরুষগণ তদনুযায়ী শাসন-কার্য নির্বাহ করিতেন। অতএব রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বদাই রাজাকে ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিতে হইত। মুসলমান রাজত্বে ব্রাহ্মণগণের রাজার উপর প্রভুত্ব লোপ পাইলেও সামাজিক প্রতিপত্তি অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং কিছু বর্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই বিরাট হিন্দুসমাজের রক্ষাকর্তা ছিলেন রাজা। এখন তাঁহার হস্ত হইতে রাজদণ্ড বিচ্যুত হওয়াতে জনসাধারণকে এই দুর্দিনে ব্রাহ্মণের উপদেশের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল, কারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষায় তাঁহারাই ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয়। অতএব সমাজের শাসন, রক্ষণ ও পরিচালনের দায়িত্ব এখন তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে সমাজের অনিষ্টকারী হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর

হইয়া তাঁহাদিগকে কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এইজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সে যাহাই হোক, বিদ্যা সকল অবস্থাতেই শ্লাঘনীয়, কিন্তু অর্থকরী হইলেই ইহার উপার্জনে লোকে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। বিদেশী শাসনের আমলে বিজাতীয় ভাষার সমাদরই বর্ধিত হয়। মুসলমান রাজত্বে সংস্কৃত বিদ্যার রাজদ্বারে অর্থাগমের সম্ভাবনা যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, ততই ইহার প্রসার সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। তৎপরিবর্তে যখন বিদেশী ভাষার প্রভাব বর্ধিত হইতে লাগিল, তখন সেই বিজাতীয় ভাষার চর্চা আর সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। যে শক্তিশালী সে ইহা আয়ত্ত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে লাগিল। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের পক্ষেই এই সুযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। এইভাবে অতীতের কঠোরতা অতিক্রম করিয়া দেশবাসিগণ মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গভাষা স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিবার সুযোগ লাভ করে।

প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার জন্য লোকে বিদেশীভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সর্ববিধ প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। আধ্যাত্মিকতা ভারতবাসিগণের একটা স্বাভাবিক বিশেষত্ব। হিন্দুগণের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। যাঁহারা অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামের চরিতাদি ভাষায় শ্রবণকারীগণের জন্য রৌরব-নরকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখন রাজদরবারে তাঁহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যতই এই নূতন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, ততই তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীন প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। অতএব বৈষয়িক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্যবিধ অভাব স্বাধীনভাবে মোচনের জন্যও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। তাহারা দেখিতে পাইতেছিল যে, সংস্কৃত ব্যতীতও অন্য এক বিদেশী ভাষার যাবতীয় রাজকার্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ মুসলমানগণ রাজকার্য-নির্বাহের জন্য সহকারী ভাষারূপে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন দলিলাদিতে ফার্সীর সহিত বাঙ্গালা অনুবাদও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে হিন্দুগণের মনে মাতৃভাষার প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক ইহারই ফলে পুরাণাদির অনুবাদের প্রেরণা প্রথমতঃ তাহারা লাভ করিয়া থাকিবে।

কিন্তু ইহার পূর্বেই নানাভাবে অনুবাদের কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির বেদে অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দুদিগকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই সম্পন্ন করিতে হইত। বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে দেবভাষা প্রয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অনেক সময় পুরোহিত মহাশয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মর্মার্থ বুঝাইয়া দিতেন। কবিরাজ মহাশয় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। এইভাবে সাধারণ লোকেও সংস্কৃত ও তাহার অনুবাদের সহিত একেবারে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু যখন বৈদেশিক শাসনকালে নানাভাবে দেশের পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইল, তখন বাঙ্গালা অনুবাদে এই সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভেরও প্রবৃত্তি লোকের মনে জাগরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে লোকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য প্রথমে আবির্ভূত হইল কথকতা। ইহা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অনুবাদের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি। ভাগবতাদি পুরাণ পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। লোকে পরিতৃপ্তির সহিত ইহার রসাস্বাদন করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের কৌতূহল বর্ধিত হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, যখন তাহারা আর পরের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। ইহারই ফলে

রামায়ণাদি পুরাণের বিষয় অনুবাদের প্রেরণায় সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদক বটেন, কিন্তু মহাভারতের আদি অনুবাদক সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী বোধ হয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না ; আর ভাগবতের আদি অনুবাদক মালাধর বসু ছিলেন কায়স্থ। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ একযোগে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা বিদেশী শাসনের ফলে সংঘটিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই বঙ্গদেশে বিদেশী শাসন প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ করে, আর ভাগবতাদির অনুবাদ আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। অর্থাৎ মুসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতে অনুবাদের যুগে পৌঁছিতে প্রায় তিনশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। বিদেশী শাসনের প্রথম যুগে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।

অনুবাদ-সাহিত্যের দুই বিভাগ লক্ষিত হয়। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। অতএব ইহার প্রতিই লোকের আকর্ষণ প্রথমতঃ পতিত হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য এই যুগের প্রারম্ভে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের প্রতিই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল অনুবাদও আবার বিশিষ্টতা সমন্বিত। তখন পুরাণের গল্পাংশ শ্রবণ করিতে পারিলেই লোকের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইত। অতএব এই প্রাথমিক যুগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদের কোনই প্রয়োজন ছিল না। এইজন্য প্রাচীন কথকতার আদর্শে তখন গল্পাংশের অনুবাদেরই প্রচলন হইয়াছিল। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসদেবের মহাভারত ও ভাগবতের ন্যায় এক একটি গ্রন্থকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই কবিগণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ সেই প্রাথমিক যুগে ইহার বেশী লোকের পক্ষে আবশ্যক হয় নাই।

আবার দেখা যাইতেছে যে, পুরাণের অনুবাদের পরে কাব্যগ্রন্থাদির অনুবাদে কবিগণ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কারণ মালাধর বসু বা কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কোন কবির রচিত এই জাতীয় গ্রন্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ অত্যধিক লোকপ্রিয়তা হেতু আদর্শস্থানীয় রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদের পরেই কল্পনাবিলাসের প্রতীকস্বরূপ কাব্যাদির প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণতঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সন্ধান করিবার পরই বিলাসিতার প্রতি লোকের আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদে কোন প্রাচীন কবিই আত্মনিয়োগ করেন নাই। বাঙ্গালীগণ অত্যধিক ভাবপ্রবণ বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, তথাপি কোন প্রাচীন কবি মেঘদূতের ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক, রূপসনাতনের বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধবাদি গ্রন্থের অনুবাদেই পরবর্তী কালে সাহিত্যের এই শাখা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। চৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে কবিগণ এই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ইহা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে আরম্ভ হইতে পারে নাই। সে যাহাই হোক, এই জাতীয় অনুবাদগ্রন্থ দ্বারা যে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষরূপে ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ব্রতভ্রষ্ট

শ্রীইলা দেবী

স্বপ্ন দেখছে মধুময়।

ভবিষ্যৎ যার নেই, বর্তমান যার থেমে গেছে অতীত ছাড়া তার আর কি উপায় আছে? আশ্রয়ও নয় সুষুপ্তিও নেই—দিবারাত্র অন্তহীন অন্ধকারের যবনিকা দুলছে সমুখে; তাই স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েই ত বেঁচে আছে মধুময়।

অনেক দূরের ছবি; ঝাপসা লাগছে চোখে। অকারণেই অন্ধ চোখ দুটো আর একবার রগড়ে নিল সে। দূরে কোথায় একটা পাখী ডাকছে সুরের রেশটা কানে লাগছে অনেক দিন আগে শোনা একটা পরিচিত পাখীর ডাকের মতন। কি যেন একটা মদির ফুলের গন্ধ আসছে—গন্ধটাও যেন চেনা। রৌদ্রে বড় কাঁঝ, মাঝে মাঝে এক এক ঝলক দমকা বাতাস হঠাৎ বেগে বেরে এসে স্নিগ্ধ করস্পর্শে চমকে দিয়ে আবার পলকে হারিয়ে যাচ্ছে। বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় স্বপ্ন দেখছে মধুময়।

এমনি এক তপ্ত মধ্যাহ্ন। মস্ত বড় উঠানের চারদিক ঘিরে ঘর তৈরী হচ্ছে। একদিকে কয়েকখানা ঘর তৈরী হয়ে গেছে, বর্তমান গৃহস্থ বসবাস করছে—অপর দিকে মিস্ত্রী কাজ করে চলেছে। মিস্ত্রী মজুরের আনাগোনায় ছাদ পিটুনীর বিচিত্র কলরবে পরিদর্শনরত কাকার হাঁকডাকে চারদিক মুখরিত। এদিকের বারান্দায় বসে অন্ধ ঠাকুরমা, এক বিস্ময়-বিমূঢ় বালক দাঁড়িয়ে মাঝখানে। কর্মব্যস্ত মজুরদের চাঞ্চল্যে মজুরাণী-দের অহেতুক হাস্যরোলে কাকার সেই সাফল্যের গর্বভরা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানিকে, ঠাকুমার মুখের বেদনার্ত তবু তৃপ্তিপূর্ণ হাসির মধ্যে অবোধ বালক অর্থ খুঁজে খুঁজে ব্যাকুল হচ্ছিল।

মধু পায়ে পায়ে এসে নিজের ঘরে দাঁড়ায়। এক-ফালি সরু একটু ঘর, সে বাড়ীর বড় ছেলে তারই যেন মর্যাদা। মধুময় নিজের হাতে ঘর সাজিয়েছে—ঘরের একপাশে তক্তপোষের উপর তার বিছানা, তারই একপাশে তার পড়ার টেবিল। দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি একখানা নতুন মাল্যশোভিত হয়ে গৃহস্বামীর প্রখর পরিচয় দিচ্ছে।

কে বুঝবে যে প্রত্যেক কালের একটা ভাষা আছে আছে, প্রত্যেক যুগের একটা বাণী। যুগ তার বাণী আকাশে বাতাসে ধরণীর ধূলিতে, মানুষে মানুষে এমন করে ছড়িয়ে দেয় যে যারই অনুভূতির যন্ত্রে তার বাঁধা থাকে তার মনেই এর সুর এসে বাজে—সেই স্বয়ংসৃষ্ট ধ্বনিতে কাণ না দিয়ে তার উপায় কি? দূরের শব্দকে কান বন্ধ করে বাধা দেওয়া যায় কিন্তু প্রাণের মধ্যে যার উৎপত্তি তাকে এড়ানো যাবে কি করে? আজকের দিনে সে কথা বলতে গেলে হয়তো ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবেনা কিন্তু সে যুগের বাতাসে স্বামীজীর অমর বাণী আর বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র কেঁপে কেঁপে বেড়াত। বাবা কাকা ছিলেন অন্ত জগতের জীব। আর্থিক উন্নতি করাটাই তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল! অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার মত মনও ছিল না—তাঁদের জগতে পৃথিবীর আর কিছুর অস্তিত্বও ছিলনা। হয়তো তাঁদের পক্ষে এইটাই ছিল স্বাভাবিক।

সোজা হয়ে উঠে বসলো মধুময়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। হয়তো মা থাকলে বুঝতো।

কিন্তু কেই বা ভাববে এত কথা? শীর্ণ মুখখানায় একটা ঔজ্জ্বল্যের আভা এল। বুঝতো—বুঝতো মেজ বি—

কত দিনের কথা, তবু স্পষ্ট মনে পড়ে।

অনেক রাত, চারদিক থমথম করছে। বড়দালানে কড়ি থেকে একটা হারিকেন ঝুলছে তার আলো দালানটির পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আলোয় আঁধারে একটা ঘনীভূত স্তব্ধতা। ক্রুদ্ধপদে পায়চারী করছেন ছোটকাকা। কোণের দিকে বাবার নির্দিষ্ট চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন বাবা। ঘরের দুয়োরে উৎকণ্ঠিত হয়ে জপের মালা হাতে বসে রয়েছেন ঠাকুরমা। শীতের রাত, ঘরে ঘরে দুয়োর দেওয়া। আর কেউ কোথাও জেগে নেই। ঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে দালানের বড় ঘড়িটার টিক টিক শব্দ বড় বেশী জোরে এসে কানে বাজছে। উঠানের অন্ধকার কোণে সেই শীতের রাতেও দাঁড়িয়ে আছে মেজদি।

সন্তর্পণে খিড়কী দরজা দিয়ে উঠানের ঘাসে পা রাখলো মধুময়—আশ্চর্য তবু শুনতে পেয়েছে মেজদি, ফিসফিস্ করে কাঁদ কাঁদ গলায় বল্লে, এত দেরী করলি ভাই, বাবা কাকা বড় রাগ করছেন যে রে.—

থমকে পড়লো মধুময়—জেগে আছেন? ঘুমোন নি?

ছোটকাকা বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মধু—কি হবে? উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় ভেঙে পড়ছে যেন মেজদি।

ম্লান একটু হাসলো মধুময়। উত্তর দিল না। এগিয়ে এসে দালানে দাঁড়ালো।

কে—?

গর্জন ক'রে ওঠেন ছোটকাকা। কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত, বড় তোর বাড় বেড়েছে, না?—হাত বাড়িয়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরতে যাবেন। দু পা পিছিয়ে যায় মধুময়।

আমায় ছোঁবেন না কাকা—

স্পর্ধায় ভাবণ সন্দেহ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কাকা—ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন 'তার মানে?'—ব্যাপারটা কি এর?

আমি রসিদের কাছে ছিলাম।—আমায় স্নান করতে হবে।

থমকে পড়েন কাকা.—চমকে ওঠেন বাবা—রসিদের কাছে? তার না পান-বসন্ত হয়েছে?

—হ্যাঁ। বেচারীকে দেখবার কেউ নেই ত; বড় কাতরাচ্ছিল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠেন কাকা—তাই দয়ার সাগর তুমি গিয়েছিলে তার সেবা করতে?

মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মধুময়—নিরুত্তর, তবু বাধ্য।

বাবা কি দেখলেন সেখানে কে জানে? বল্লেন যাও স্নান কর গে—কাল সকালে আমার কাছে এসো একবার।

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে ওঠেন এই শীতের রাতে এত রাত্তিরে চান করবি কি মধু? চান করতে হবে না। যা, কাপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে আয়।

কিন্তু ততক্ষণে কুয়াতলায় মাথায় জল ঢালছে মধু।

কাকা তাকিয়ে তাকিয়ে বল্লেন, পারেও ছোঁড়াটা!

বাবা স্বগোতক্তি করেন অস্ফুট, না করে—

কাপড় গামছা নিয়ে কুয়াতলায় মেজদি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। পরদিন সকালে আর উঠতে পারেনি মধুময়—একটি মাস গিয়েছিল সে ধাক্কা সামলাতে। সেরে উঠে অহরহ গুরুজনের উপদেশাবলী শুনতে শুনতে তিক্ত হয়ে উঠেছিল মন। কি করে সে বোঝাবে যে রুগ্ন রসিদের আর্তনাদকে উপেক্ষা করে চলে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার জীবনদেবতার সে আদেশ নয়, তার যুগের তা বাণী নয়।

তাল হয়ে 'বন্দেমাতরম' বলে শোভাযাত্রা করার অপরাধে পুলিশের হাতে পড়লো মধুময়। হৈ হৈ ব্যাপার পড়ে গেল চারিদিকে। নির্বিরোধী লোক বাবা—পুলিসের নামে তাঁর বুক কেঁপে উঠতো, তাছাড়াও ব্যবসায়ীর পক্ষে পুলিসের বক্রদৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষতিজনক। অনেক চেষ্টা করে তাকে খালাস করে আনা হ'ল বটে কিন্তু বাড়ীর সকলে তাকে বিপদ্‌বাহী হিসেবেই যেন নতুন করে দেখতে লাগলো। টেষ্ট পরীক্ষা ছিল সামনে,

দেওয়া হ'ল না—একটা বছর নষ্ট হল। বাবা কঠোর কণ্ঠে নিষেধ করে গেলেন রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সমস্ত পরিবারকে বিপন্ন করলে সে, এ তিনি সহ্য করবেন না।

সরকারের তৎকালীন দমননীতির ভয়াবহ রূপের সামনে দাঁড়িয়ে বিচলিত হওয়া তার পক্ষে অবশ্য অন্যায় হয়েছে বলা চলে না। এ নীতির স্বরূপ মধুমেরও অজানা নয়। সে প্রাণপণে মনস্থির ক'রে বই নিয়ে বসে থাকতে চেষ্টা করে।

ছোট ভাইটি এসে চুপি চুপি একদিন খবর দিল, জান দাদা, সমীরণদার নাকি কলেরা হয়েছে।

কলেরা হয়েছে সমীরণের? চমকে উঠলো মধুময়। সে যে মেডিং এ থাকে এখানে ত তার কেউ নেই কে তাকে দেখছে?

কি জানি?—

আর রাখা গেল না মধুময়কে। স্বামীজীর ছবিকে একবার প্রণাম করে খিড়কী দরজা দিয়ে এসে দাঁড়ালো সোজা সমীরণের রুগ্ন শয্যার পাশে।

সমীরণ চোখ তুলে বললে মধু, এসেছিস? আমি জানতাম তুই আসবি। এত দেরী করলি কেন রে?

মধু অক্লান্ত সেবা করলো—মায়ের মত অকুণ্ঠ দরদ দিয়ে তবু সার্থক হোল না। সব যখন শেষ হয়ে গেল তিন দিন পরে বাড়ী ফিরলো মধুময়। তার শোকার্ত ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে বাড়ীর সকলে নির্বাক হয়ে রইলো। কিছুই বলা হোল না—না উপদেশ না তিরস্কার।

কয়েকদিন মধু নিজের ঘরে রইলো। শুষ্ক, চিন্তামগ্ন বিষণ্ণ। মেজদি এসে খাবার দিয়ে যায়। বুঝিয়ে বলে, মধু, বাবা কাকা রাগ করেন, নাই বা গেলি এসবের মধ্যে।

আরক্ত চোখ তুলে মধু প্রশ্ন করে—কেন? এ কি মন্দ কাজ?

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেজদি—না, না মন্দ কাজ কেন হবে? সে কথা বলছি না—তবে এসব কাজে নামলে পড়াশুনোর ত ক্ষতি হবে—তোকে ত নিজের দিকটাও দেখতে হবে—মানুষ হতে হবে।

মানুষ হতে কি লাগে শুনি? কি করলে মানুষ হয়?

বিব্রত হয়ে ওঠে মেজদি—লেখাপড়া কর ভাল করে, বিদ্বান হও ভালো উপার্জ্জন কর তবেই ত মানুষ হবে। দশজনে ভাল বলবে। তা না, এসব করে বেড়িয়ে আর কি লাভ হবে?

মধুময় উত্তর দেয় না।

মেজদি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, রাগ করিস না মধু, বাবা কাকা রাগারাগি করেন—বড় খারাপ লাগে।

মধুময় নিরুত্তর। সারা রাত জেগে কাটলো মধুময়ের। মনস্থির আর সমাধান হয় না। সঙ্কল্প করবে? না ধ্যান করবে? পিতা না গুরু? কোনটা পথ আর কোনটা নয়? উত্তর আর পাওয়া যায় না। কানে আসে ঠাকুরমার কথা—কি বল বৌমা? ক'টি ছেলে মধুর মত হয়।

কয়েকটা দিন বিজ্ঞাপন দেখে আবেদনপত্র পাঠিয়ে ছিল সে, তার উত্তর আসতে যা বিলম্ব! তারপর এক রাত্রি নিদ্রিত বাবার পায়ের কাছে একটি প্রণাম রেখে ক্রন্দনরতা মেজদিকে পিছনে ফেলে বাড়ী ছাড়ল মধুময়। সে আজ কত দিনের কথা।

মধ্য ভারতের এক অরণ্যাবৃত ভূখণ্ড। কত দূর দেশ থেকে—স্নান বাংলার স্নেহের হাতছানি থেকে কেউ ডাক দেয়—বড় মন কেমন করে। বিপুলবিস্তার ব্রহ্মপুত্রের কূলে বসে পূর্ণিমা সন্ধ্যার যে দিনগুলো কেটেছে তার মাধুর্যের কি তুলনা হয়। সেই মহাদেবের উদাত্তগম্ভীর ধ্বনি কি ভুলতে পারা যায়? আম কাঁঠাল সুপুরীর ছায়ায় ঢাকা বাংলার পল্লীর টানকেই কি উপেক্ষা করা যায়? পিতার গম্ভীর মুখ, ঠাকুরমার ব্যাকুলতা, মেজদির গভীর স্নেহ, সহচরদের ভালবাসা, সব মিলে যে চমৎকার সঙ্গীত তার জীবন ভরে রেখেছিল তাকে প্রাণপণে মুছে ফেলতে চাইল মধুময়! সে যে কি সংগ্রাম, কাকে বোঝাবে?

ঝোঁকের মাথায় নিজেকে যেখানে উৎসর্গ করেছে মধুময়, সে একটা কুষ্ঠাশ্রম।

আশাহীন স্বজনবান্ধবহীন অসহায় জীবন্মৃত কতক গুলি নির্ঘৃণিত মানুষের আশ্রয়। হতভাগ্যদের জন্য মনে করুণা জাগে বটে, কিন্তু রোগের ভয়ঙ্করতায় আতঙ্কে প্রাণ শুকিয়ে ওঠে। এমনি একদল মানুষের অপভ্রংশের মধ্যে অতি সুকুমার বয়সে মধুময় এসে স্থান নিল।

এক ইতালিয়ান মিশনারী হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠাতা ফাদার আর তাঁর স্ত্রীকে দেখে সম্ভ্রমে বিস্ময়ে মাথা নত করেছিল মধুময়। কত দূরদেশ থেকে এই ঘৃণ্য রোগাক্রান্ত হতভাগ্যদের সেবাব্রত নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছেন

আরে কি আন্তরিকতার সঙ্গেই যে সে কাজ সম্পন্ন করে চলেছেন! দেখে দেখে বিদেশী-উৎসাহন-ব্রতধারী মধুময়ের ওঁদের প্রণাম করতে সাধ হোত। প্রথম সাক্ষাতেই তার পিঠ চাপড়ে পাকাদাড়ী নেড়ে ফাদার উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, তুমি এত ইয়ং, তুমি আসছ এই কাজে? ইয়াম্যান, আমি যে কি খুশী হয়েছি কি বলবো। এ কাজের পারিশ্রমিক আমি ত তোমায় দেব না, দেবেন ভগবান স্বয়ং।

বাড়ী ছেড়ে—প্রথম সম্পূর্ণ অজানা দেশে অজানা কাজে অগ্রসর হওয়ার যে ভীতিটা তার মন জুড়ে চেপে বসেছিল সেটা যেন নিমেষের মধ্যে কেটে গেল। এতাবৎ একাজে নেমে সে বাড়ীর সকলের অপ্রীতিভাজনই হয়েছে, সে গ্লানিও তার নিঃশেষে মুছে গেল। এতদিনে বুঝি সে যথাস্থানে এসে পৌঁছেছে।

রোগীদের দেখে প্রথম প্রথম বড় ভয় করতো; কিন্তু তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখে ক্রমে সমবেদনায় আর করুণায় মন ভরে উঠতে লাগলো—অবশেষে হাস-পাতালের প্রধান সহায় হয়ে উঠলো সে। তার মন থেকে ক্রমে ক্রমে বাংলার ছবি মুছে গিয়ে শাল আমলকীর বন। বাপ-কাকার সস্নেহ সতর্কতা ধ্বনিত হোল মিষ্টার পলের কণ্ঠে—ঠাকুরমা দেওদির কথার যেন আসল পাওয়া গেল স্নেহময়ী মিসেস পলের ব্যবহারে।

সার্থকতা পেয়েছে মধুময়। পেয়েছে তার ব্রত খুঁজে। মনের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সেই হারানো ছবি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে মধুময়। ছবির মত লাল ইঁটের বাড়ীখানা ফাদারের—গা ঘেঁষে আইভিলতা ওড়িয়ে উঠেছে। দুয়ারের দুপাশে পুষ্পিত ফুলের গাছ লাল কাঁকরের রাস্তা সোজা চলে গেছে টালির শেড দেওয়া দোচালা হাসপাতালটার দিকে। চারদিকে বিস্তৃত মাঠ শাল আমলকী দেবদারু আর বন্য গাছের বেষ্টনী। তার কোণ ঘেঁসে ছোট ছোট সবুজ কাঠের কুঁড়ে ঘর; লাল টালির ছাউনী। সামান্য একটু বাগান সামনে—দু'চারটে পাতাবাহার আর রঙীন ফুলের সমারোহ।—রোগীর মুখের হাসির মত হাসপাতালের স্নিগ্ধমাধুর্যকে একটু ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। বুধনী, মুংরী রূপলাল এরা সব সুস্থ রোগী, এরাই সেবার কাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। এদের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল পদে একান্ত উৎসাহে পরিচর্যা করে বেড়াচ্ছে মধুময়। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রে বসতো চিঠি লিখতে সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা ডাক্তারদের কাছে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে বসে কোন ডাক্তার যদি এদের রোগ যন্ত্রণা এতটুকু উপশমের কোন ওষুধ বার করে থাকেন তাই জানবার জন্য অসীম আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছেন ফাদার আর তাঁর সুযোগ্য সহচর মধুময়। রোগীর ভাগ্যে মন্দের সঙ্গে তারাও যেন আশা নিরাশার মধ্যে দুলতে থাকতো। নিজের রোপিত গাছে ফুলফোটা দেখবার জন্য যে আগ্রহ নিয়ে মালী চেয়ে থাকে তেমনি আগ্রহ নিয়ে রোগীর সুস্থতার আশা করতো মধুময়। এও এক নেশা। এই নেশার মধ্যে দিয়েই কয়েকটা বছর একটানা অতি দ্রুত কেটে গেল।

তারপর—

মধুময় সোজা হয়ে বসলো। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দিয়ে অন্ধ চোখের পাতাটা একবার মুছে নিল। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে বহুকষ্টে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দিয়েই মুখের কাছে তুলে ধরে একটু জল খেল। তারপর আবার বালিশে হেলান দিয়ে বসলো। সমুখের খোলা জানলাটা দিয়ে এক ঝলক রৌদ্রতপ্ত বাতাস বয়ে এলো—জানলার বাইরে দেবদারু গাছটার একটা ডাল ঝাপটে উঠলো—কোথায় একটা বাদুড় ডাকছে, বাইরে ব্যস্ত মালীর কণ্ঠস্বর। মধুময়ের দৃষ্টিতে রূপ নেই, তার ধ্বনির জগৎ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিশলো তপ্ত বাতাসের সঙ্গে।

সেদিনের স্মৃতিটা যদি মুছে ফেলা যেত। ফাদার, এটা কি হয়েছে বলতে পারেন?

গম্ভীর হয়ে গেল ফাদারের মুখ। এগিয়ে এসে কানের পাতায় চিমটি কাটলেন। আশ্চর্য, কোন অনুভূতিই যেন নেই। তবে? একটা গভীর আতঙ্ক মুহূর্তে গ্রাস করলো মধুময়কে। সমস্ত পৃথিবী চোখের সামনে যেন প্রচণ্ড বেগে ঘুরে উঠলো—মধুময়ের বেপথুমান দেহটি জড়বস্তুর মত সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

উঃ কী সে অসহ্য মর্মযাতনা। ছোটবেলার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ঠাকুরমার ঘরে যমরাজার বিচারের ছবি দেখত মধুময়। পাপীর নরকভোগের যে বিভীষিকাময় ছবিগুলো আতঙ্কে কম্পিত দেহে সে বাল্যকালে দেখেছে তার মনে হোত তার আজকের যন্ত্রণার কাছে সেগুলো নিতান্তই সামান্য—তুলনায় নিতান্তই লঘু। অদৃষ্টদেবতা তাকে নিয়ে যেন কঠিন রঙ্গভরে পরিহাস করলেন সে যে ঘর ছেড়েছে, আত্মীয়-বন্ধু ছেড়েছে, ভোগবাসনা ত্যাগ করেছে, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নিজের হাতে রাখেনি তার কি এই পুরস্কার? এতদিন ধরে সে কি করে পাপে দিয়ে এল ফুল?

স্বামীজীর একটি ছবিও সামনে ছিল না যে দুটো একবার জিজ্ঞাসা করে। চারদিকে শুধু রাবণরাজ। কোথাও শান্তির স্নিগ্ধতা নেই—না নিজের মনে, না অপরের কাছে।

ফাদার ও মিসেস পলও এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তাঁদের ছিল না। এই শোচনীয় অপমৃত্যু তাদেরও নীরবে দেখে যেতে হোল। রূপলাল এসে মাঝে মাঝে নিকটে দাঁড়ায়, বুধনী এসে গায় হাত দেয়—মধুময় চমকে ওঠে। হ্যাঁ, আর সম্ভ্রমের ব্যবধানের ত প্রয়োজন নেই। রোগ যে টিকা এঁকে দিয়ে তাকে এদের দলেই নামিয়ে দিয়েছে—তাই সমবেদনা জানাতে এল এতকাল যারা ছিল দাস আর সে দেবতা, তারাই—

হা হা করে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো মধুময়। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিগলিত সমবেদনায় ছল ছল চোখে তাকিয়ে রইলো সরল গ্রাম্য লোকগুলি।

তারপর। ক্রমে সমস্তের সর্বব্যাধিহর প্রলেপে শান্ত স্তিমিত হয়ে এল এই মর্মদাহ।

আর কাঁদেনা মধুময়—কিন্তু দ্রুত রোগ বেড়ে চলেছে, হাতের আঙুলগুলো তার চোখের সামনেই প্রতিদিন বিকৃত হতে লাগলো—নবাবিষ্কৃত আমেরিকান একটা ওষুধের গুণে সেটা একটু কমে গেলে অকস্মাৎ আক্রমণ হোল চোখে। দুর্বল মন,—কোনই প্রতিরোধ করতে পারল না—একটু একটু করে পৃথিবীর আলোর শেষ রশ্মিটুকুও তার চোখে নিভে গেল। হাসপাতালের একটি কটেজে দিবারাত্রের শয্যায় এতদিনের অশান্ত মধুময় শান্ত হয়ে শয্যা নিয়েছে। বুধনী আর রূপলাল পরিচর্যা করে।

খবর পেয়ে কাকা এসেছিলেন। অশ্রুভরা দুই চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন স্বপ্নবিলাসী আদর্শবাদী মধুময়ের প্রতিমূর্তি। দেশেরই একটা আশ্রমে রাখবেন বলে আনতে চাইলেন তাকে কিন্তু রাজী হোল না মধুময়।

কাকা চলে গেলেন। মধুময় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে লাগল। দৃষ্টি তার নেই তাই শব্দের জগৎ তার কাছে মুক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত ত নয়, বড় ধীরে ধীরে বাজছে মৃত্যুর মঞ্জীর।

বাসুদেবানন্দ এসেছিলেন এ অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে। রূপলাল গিয়ে কাছে দাঁড়ালো। তার বিশেষ অনুরোধ হাসপাতালের কুষ্ঠীতে এক বাঙালী রোগী আছে, তাকে একবার দেখে আসতে হবে!

মিথ্যা নয়—দেশের ডাক বাড়ীতে বাড়ীতে টান ধরেছে বড় উতলা আকুল হয়েছে মন।—জীবনের পাকে পাকে যে আকর্ষণ তা যেন বড় প্রচণ্ড তীব্র হয়ে বাজছে।

এখানে বাঙালী রোগী। বিস্মিত হলেন স্বামীজী কৌতূহলও হোল।

রূপলালকে অনুসরণ করে এসে দাঁড়ালেন শয্যা-প্রান্তে।

প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকছে মধুময়—ম্লানমুখে সিষ্টার নিকটে দাঁড়িয়ে, বুধনী বাতাস করছে।

বাবুজী বাঙালী বাবু আয়া হ্যায়—বাবুজী, বাবুজী—

রূপলালের ডাকে একটু যেন চেতনা এল।

বাসুদেবানন্দ সন্ন্যাসী—তবু মহারোগগ্রস্তকে স্পর্শ করতে এতক্ষণ যেন দ্বিধা বোধ করছিলেন—এইবারে ললাটে করস্পর্শ করে স্নিগ্ধস্বরে বললেন—কি কষ্ট হচ্ছে ভাই?

'ভাই'—কথাটা মগ্নচৈতন্যে কোথায় আঘাত করলো। ঘোলাটে চোখ প্রাণপণে বিস্ফারিত করলো মধুময়—সে এক কঠিন প্রয়াস। তারপর হতাশ হয়ে বললে আপনি বাঙালী?

হ্যাঁ ভাই। বড় যন্ত্রনা হচ্ছে? খুব কষ্ট হচ্ছে?

যন্ত্রণা হচ্ছে, সে হবে, সে হোক—কিন্তু কষ্ট ত সেজন্য নয়, একটি বড় কষ্ট হয় মাঝে মাঝে। একটি কথা, একটি কথার উত্তর আমায় দিন। বলুন ত আদর্শবাদ কি সংসারে সত্যিই অচল? এ শাস্তি আমার কেন হোল? আদর্শের পিছনে ছুটে কি তবে আমি ভুল করেছি? একি আমার ভুল? বলুন ফাদার, আপনি জবাব দিন—am I mistaken? উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসতে গেল মধুময়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল বাসুদেবানন্দকে। ব্যাণ্ডেজ খুলে গিয়েছে—বীভৎস ক্ষতাক্ত বিকৃত করাঙ্গুলগুলি বারকতক শূন্যে হাতড়িয়ে বেড়াল। দৃষ্টিহীন ঘোলাটে চোখে ভাষা নেই তবু ক্ষীত মুখে একটা বেদন আকুল ক্ষুব্ধতা—এক মিনিট মাত্র, তারপরই মুখ গুঁজড়ে শয্যায় পড়ে গেল মধুময়।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতেও সকলে ভুলে গেছে যেন।

তার শেষ কথাগুলি হা হা করে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ কি ভুল? am I mistaken? কে উত্তর দেবে?

মণিপুর প্রসঙ্গ (১২)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের সেক্রেটারী এইচ এম-দুরাণ্ডের ঘোষণা অনুযায়ী মহারাজা কুলীর সিংহের বিশ্বস্ত সেনাপতি ও প্রাক্তন মহারাজা নরসিংহের বংশধর চূড়াচাঁদ সিংকে যখন মণিপুরের সিংহাসনে বসান হয় তখন তিনি নিতান্ত নাবালক. তাঁহার সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মণিপুরকে একজন ইংরেজ শাসন কর্তার অধীনে রাখা স্থির হইল। এই সময় হইতে চূড়াচাঁদের আমল হইতে মণিপুরের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তখন হইতে অন্যান্য ভারতীয় সামন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে মণিপুরের আর কোন বিষয়ে প্রভেদ রহিল না। বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মণিপুর রাষ্ট্রের উপর ইংরেজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মণিপুরীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিত না। অন্যদিকে প্রবলতর শক্তির আশ্রয়ে থাকায় নরপতি চূড়াচাঁদ রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিয়া দর্প এবং নানা প্রজাহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ির আর কোন সুযোগ না থাকায় প্রজাগণ এইসব অহেতুক রক্তারক্তি এবং রক্তপাত হইতে রেহাই পাইল।

প্রাপ্ত বয়সে মহারাজ চূড়াচাঁদ সিং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও গোড়ার দিকে দেখা যায় তাঁহার মনোরঞ্জন অনেকেরই মনঃপুত হয় নাই। বিশেষত যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল তাহারা পরোক্ষ ভাবে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিরও চেষ্টা করিয়াছিল। ভারত সরকারের নিকট পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৮৯৫ '৯৬ সনের বিবরণে দেখা যায় মণিপুরের প্রথা অনুযায়ী চূড়াচাঁদ সিং সিংহাসনে আরোহণের পর

সেই সঙ্গে বংশ পরম্পরাক্রমে ৺গোবিন্দজীর পূজারী পুরাতন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় 'আরৈবাগণও পদচ্যুত হইলেন এবং তাহাদের স্থলে নূতন রাজবংশের পুরোহিত সম্প্রদায় আনৌবা' দিগকে নিযুক্ত করা হইল। আরৈবাগণ সংখ্যায় বেশী ছিলেন এবং মণিপুরী সমাজের উপর আনৌবাদের চেয়ে তাহাদের প্রভাব ছিল সুগভীর। সেইজন্য আরৈবা'দের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে ইম্ফল হইতে গ্রামে গ্রামে 'আনৌবা পুরোহিত পাঠান হইল। মণিপুরের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সুদৃঢ়; জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন, বিবাহ, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি সমস্ত কর্মেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ফলে তখন এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মে কোন্ পুরোহিতকে ডাকা হইবে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য দেখা দিতে লাগিল। রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেও 'অরৈবা'গণ সমাজের উপর তাহাদের প্রতিপত্তি সহজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না। সমাজের মধ্যে এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব সে সময়ে সকলেরই যথেষ্ট অশান্তি এবং দুর্ভোগের কারণ হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এই 'আরৈবা আনৌবা' বিরোধ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

ইংরেজ সরকার ভারতীয় রাজন্যবর্গদের বংশধরদিগকে ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য আজমীরে মেয়ো (Mayo) কলেজ নামক একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। বালক চূড়াচাঁদকেও শিক্ষালাভের জন্য সেই বিদ্যালয়ে পাঠান হইল। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাতেই চূড়াচাঁদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি নানাবিধ খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোরেও (Imperial Cadet Corps)

ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৯০৬ সনে ধনমঞ্জুরী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইষ্ট বেঙ্গল এবং আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ল্যান্সেলট হেয়ারে (Sir Lancelot Hare) সাহেবের উপস্থিতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। ইতিমধ্যে ১৯০১ সনে লর্ড কার্জন (Lord Curzon) এবং ১৯০৪ সনে লর্ড কিচনার (Lord Kichner) মণিপুর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের পর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাজার সভাপতিত্বে একটি দরবার গঠিত হয়। দরবারে ৬ জন মণিপুরী সাধারণ সভ্য এবং একজন ইংরেজ আই-সি-এস (I. C. S.) কর্মচারী উপ-সভাপতি Vice-President) পদে মনোনীত হইলেন। ১৯১৬ সনে মহারাজা দরবারের কার্যকলাপ পরিদর্শনের ভার (Supervisory Control) গ্রহণ করায় উপ-সভাপতির পদ তুলিয়া দিয়া আই-সি-এস কর্মচারীকেই সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ানি এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের উপর।

মণিপুরকে হাতে পাওয়ায় উত্তর পূর্ব অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে শান্তি এবং বৃটিশের প্রাধান্য বজায় রাখার কাজে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। ১৯০৪ হইতে ১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মণিপুরের বাহিনী মণিপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন কার্যে বহুবার ভারত সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৯১১ সনে আবর (Abor Expedition) ও মাকুয়ার (Makware Expedition) অভিযান, ১৯১২ সনে মিসমী অভিযান (Mishmi Expedition), ১৯১৪ সনে সদিয়া ও পাসিঘাট (Sadia and Pasighat) অভিযান এবং অবশেষে ১৯২১-২২ সনে হাইলাকান্দিতে চা-বাগানের কুলিদের হাঙ্গামা ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে A. B. Rly) ধর্মঘটের সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষে মণিপুরী বাহিনী যথেষ্ট কাজে আসিয়াছিল।

১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মণিপুর সরকার ভারত সরকারের অনুরোধে যুদ্ধের তহবিলে চাঁদাবাবদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা দান করে এবং প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ঋণস্বরূপ দেয়। পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্ণেল এইচ. ডব্লিউ. জি, কোল সি. এস. আই. (Colonel H. W. G. Cole C. S. I.) কর্তৃক পরিচালিত দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী (Labour Corps) মণিপুর হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়াছিল।

যুদ্ধের পর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মণিপুরের খাজনা ১০ বৎসর পর্যন্ত বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা করিয়া মকুব করিয়া দেয়। ভারত সরকার নিজ ব্যয়ে ইম্ফল হইতে কোহিমা পর্যন্ত গাড়ী চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা তৈরী করিয়া দেয়। ১৯১৭ সনে রাজা চূড়াচাঁদ সিংকে সি. বি. ই (C. B. E.) উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। অতঃপর ১৯১৮ সনে ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ড সাহেব Chelmsford তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন।

মণিপুর সরকার যখন যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিতে ব্যস্ত তখন হঠাৎ ১৯১৭ সনে মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলের থাদকুকি সম্প্রদায়ে চিংথাম থানাচাওবা সিং নামক একজন মণিপুরীর প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মহারাজা তাঁহার নাগা ও মণিপুরী বাহিনী লইয়া স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্রা করেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য নানাস্থানে ক্যাম্প স্থাপন করা হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর অবশেষে শান্তি স্থাপিত হয়। থানাচাওবা ব্রহ্মদেশে পলাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখান হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া মণিপুরে আনা হয়। আদালতের বিচারে তাহার প্রতি দীর্ঘকালের কারাদণ্ডাজ্ঞা হয়। এই সময় মহারাজা যে অঞ্চল পরিবর্শন করিয়াছিলেন তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানের নাম রাখা হয় চূড়াচাঁদপুর।

রাজ্যাভিষেকের পর মহারাজা চূড়াচাঁদ সিং প্রজাদের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। তিনি চিরাচরিত

'লাহুপ' অর্থাৎ বাধ্যতামূলক বেগার প্রথা রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে করদানের প্রথা প্রবর্তন করেন। সমস্ত রকমের দাসত্বপ্রথাও তাঁহার সময় উঠিয়া যায়। মণিপুরের অপরাপর প্রাক্তন রাজাদের মত মহারাজ চূড়াচাঁদও অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বৈষ্ণব তীর্থগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁহার নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের (১) সম্মুখে সোনার পাতে মোড়া দুই গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে গোবিন্দজীকে স্থাপন করেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী মহারাণী ধনমঞ্জুরী দেবী নবদ্বীপে সোনার পাতে মোড়া এক গম্বুজবিশিষ্ট 'সোনার মন্দির' নামে একটি মন্দির তৈরী করান। ১৯৩৪ সনে মহারাজা মণিপুরী সমাজের উন্নতি কল্পে নিখিল হিন্দু মণিপুরী মহাসভার আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাতে কাছাড়, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, জোরহাট, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, ব্রহ্মদেশ, মণিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে মণিপুরী সমাজের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

চূড়াচাঁদ মহারাজের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী কাবুই-নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মণিপুরের উপর ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহারাজের প্রতি তাহাদের আনুগত্য ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়ে। কাবুই আন্দোলনের স্রষ্টা এবং নায়কের নাম যাদোনাং (Jadonang)। ১৯২৭ সনের কিছু পূর্বে যাদোনাং এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়া কাবুই সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। কাবুইদের মনে তাহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে। যাদোনাং নিজেকে স্বাধীন কাবুই রাষ্ট্রের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নাগা এবং কুকি সম্প্রদায়ের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে থাকে। অনেকে তাহার দৈবশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া কাম্বিরণ (Kambirnn) নামক স্থানে তাহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজা এবং নানা উপঢৌকন পাঠাইত। অনেকে তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাকে কর দিত। ইহা অনেকটা মারাঠা বীর শিবাজী মহারাজ কর্তৃক প্রবর্তিত চৌথ এবং সরদেশমুখী নামক করের অনুরূপ। যাদোনাংএর ক্রিয়াকলাপে নাগাপাহাড়ের কমিশনার এবং মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যাদোনাংকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে মণিপুর সরকারের একদল সৈন্য কাম্বিরণ গ্রামে পাঠান হয়। যাদোনাং তখন কাছাড়ে। সেখানে মার্চ মাসে কাছাড় সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে যাদোনাংকে গ্রেপ্তার করার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পলিটিক্যাল এজেন্ট একজন ইংরেজ এবং একজন গুর্খা অফিসারের পরিচালনাধীন আসাম রাইফেলের এক প্ল্যাটুন সৈন্য বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়া কাম্বিরণে পাঠায়। সেখানে তাহারা যাদোনাংএর নাগাল না পাইয়া তাহার প্রবর্তিত নূতন ধর্মের দেব মূর্তিসহ মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া গাছের কাল মিটায়। অতঃপর কাছাড় সরকার কর্তৃক যাদোনাংএর গ্রেপ্তারের খবর আসে। তখন তাহারা জিরিঘাট হইতে যাদোনাংকে সঙ্গে লইয়া মণিপুরে ফিরিয়া আসে। যথাসময়ে পলিটিক্যাল এজেন্টের আদালতে তাহাদের বিচার হয়। বিচারে যাদোনাং এবং তাহার প্রধান ৬ জন অনুচরের প্রাণদণ্ড হয় এবং অন্যান্য আসামীদের প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

ইংরেজ রাজত্বে যেখানে যখন কোন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে ইংরেজ সরকার তখনই সেখানে বিপুল শক্তি প্রয়োগ করিয়া লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দান করিয়া একাধারে বিদ্রোহীদিগকে শায়েস্তা এবং জনসাধারণের

(১) ১৮৯১ সনের যুদ্ধের পর হইতে পুরাতন রাজপ্রাসাদ এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, ৪নং ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলের (4th Assam Rifle) ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান প্রাসাদটি ঐ স্থান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে মহারাজ চূড়াচাঁদের সময়ে নির্মিত হয়।

মনে ইংরেজের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করে নাই। এত সব সত্ত্বেও বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়া দূরে থাক আগুন আরও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। কাবুই আন্দোলনেও ঠিক তাহাই হয়। যাদোনাংএর ফাঁসির পর কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিল বিদ্রোহ এবারে করিয়া যাইবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। যাদোনাংএর অন্যতম প্রধানা শিষ্যা গাইদিলু (gaidileu) নামক এক কাবুই তরুণীর নেতৃত্বে কাবুইগণ তাহাদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯৩১ সনে ইম্ফল হইতে সৈন্যদল যখন বিদ্রোহী অঞ্চলে যায় তখন তাহারা গাইদিলুর উপর ততটা গুরুত্ব দেয় নাই। কিছুদিন পর গাইদিলু ধরা পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমতী গাইদিলু সরকারী লাপুর (১) চোখে ধুলা দিয়া গ্রামের লোকের সাহায্যে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। ইহার পর বহুরকম অত্যাচার এবং ফন্দি ফিকির করিয়াও অনেকদিন পর্যন্ত সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন কাচা নাগা (Kacha Naga), নাগাপাহাড়, উত্তর কাছাড়ের পাহাড় ও সমতল ভূমির নাগাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তখন মহাত্মাজী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল। ইহাতে কাবুইগণ আরও উৎসাহিত হইয়া থাকিবে (২)। গাইদিলু তখন নাগা অঞ্চলে রাণী বলিয়া পরিচিত। রাণী গাইদিলু কর্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে এ অঞ্চলে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮।১৯ বৎসর। মিশনারী স্কুলে নবম অথবা দশম শ্রেণীর (Class IX or X) বেশী বিদ্যা তাহার ছিল না।

(১) মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলে সরকারী চৌকিদার শ্রেণীর লোককে লাপু বলা হয়।

(২) "In Sylhet also many Nagas from the surrounding hills came to visit me with greetings and gifts. And from them and others I heard a story which India ought to know and to cherish. It was the story of a young woman of their tribe belonging to the Koboi Clan in the Naga Hills. She was of the priestly class and she had the unique opportunity among her people to receive some education in a mission school, where she reached the ninth or tenth class. Giudallo was her name and she was about nineteen. Six years ago when civil disobedience blazed over the length and breadth of India. News of Gandhi and the Congress reached her in her hill abode and found an echo in her heart. She dreamed of freedom for her people and an ending of the galling restrictions they suffered from, and she raised the banner of independence and called her people to rally round it." In the surma Valley—Dec. 9, 1937—The Unity of India—by Jawaharlal Nehru.

[ক্রমশঃ]

[৮] [পূর্বানুবৃত্তি]

এতক্ষণে যে-বিষয়টা একেবারেই ঢাকাঢাকি ছিল, অকস্মাৎ মনের রুদ্ধ আগল ভেঙ্গে এমনভাবে যে তা বেরিয়ে আসবে তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না কেউই—না অনিমা। অনিমাদের সাংসারিক পরিবেশের সীমার জন্যটিকে কেন্দ্র করে যেদিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মতো প্রথম গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিনই অনুভব করলাম—রুদ্ধ আগলের একটা কবাট খুলে গেল। সেটা অনিমার, আমার নয়। সে কবাট আর বন্ধ হয়নি, বরং হাকটাও আপনি থেকে খুলে এলো। তাই বলে যে-রুদ্ধ কবাটের আড়ালে আমার নিজের একটা বিশেষ মনকে এতকাল লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাও যে এমন করে কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে নিজের অলক্ষ্যেই উন্মুক্ত হয়ে পড়বে—এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু সত্যিই কি বিশেষ কিছু প্রস্তুতি নিয়ে অনিমাকে এত নিবিড় করে কাছে পেতে চেয়েছি? প্রচ্ছন্ন মন নিয়ে কখনও কি প্রেমের অমৃত লাভ হয়? অনিমার মধ্যে যে আমি সেই অমৃতই খুঁজেছি, মনটাকে তাই মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দিতে পেরেছি তার আকাশে! নিজের মনকে সঙ্কুচিত করে, আমাদের পারিবারিক আবহাওয়াটাকে একেবারেই ঢেকে রেখে যদি শুধু অনিমা সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল হ'তে যেতাম, সেটা হতো প্রেমের প্রহসন মাত্র। আসলে দু'জনকে দু'জনে জানবো—জানবো জগৎ দিয়ে, সমাজ দিয়ে, সংসার দিয়ে, দেশ-কাল-পাত্র সব কিছু দিয়ে। নইলে দুর্জনের কাছে দু'জনে খাঁটি হবো কি ক'রে, সার্থক হবো কি ক'রে, ধন্য হবো কি করে? তা না হলে যে প্রেম একেবারেই মিথ্যে।

আমি যেখানে নিজের কাছে নিজে অসুখী—সেখানে সুখ-সারথির কাছে নিজেকে মেলে ধরে আত্মতৃপ্তিই বোধ করছি বৈকি অনেকখানি! যেখানে অনিমা বলেছে—'ভরসার পথ যে তুমিই বন্ধ করে দিচ্ছ সুমন্ত!'—সে পথ বন্ধ থাকলেও অনিমা কি পারবে না তার দৃপ্ত চরণে সে বেড়া অতিক্রম করে আসতে, আমি হাত বাড়িয়ে থাকলেও কি পারবে না? আসলে যত নির্লজ্জের মতো আমাদের ভগ্ন জমিদারীর কণ্টকিত সংসারযাত্রাকে তার অনুভূতির সামনে তুলে ধরেছি, সে হয়তো ঠিক ততখানি নির্লজ্জের মতোই তাকে গ্রহণ করেনি! যদি করতো, তবে ধূসরাচ্ছন্ন অন্ধকার দিঙ্মণ্ডলকে সচকিত করে অমন মিষ্টি কণ্ঠের সুধা ছড়িয়ে আত্মস্তুতি শোনাতে পারতো না। তার সমস্ত মজ্জায় ভেসে উঠতো ঐ ধূসর অন্ধকারের মতোই একটা নিবিড় কারুণ্য। কিন্তু তার পরিবর্তে সে সুধা বর্ষণই করে গেল।

ইতিমধ্যে শীলা একাই এসে একদিন উপস্থিত আমাদের বাড়ীতে। কথা ছিল—অনিমার সঙ্গে এসে একদিন বাড়ীটা চিনে যাবে; তা'হলে শীলার পক্ষে একা একা আর যাতায়াতের কষ্ট হবে না। কিন্তু এবারে দেখলাম—বয়সে কিশোরী হ'লেও মেধায় সে যৌবনকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'একা একা এত দূর তুমি চিনে আসতে পারলে?'

—'কেন, আমাকে কি ছোট্ট খুকিটি ভেবেছেন না

কি ?' উত্তরে শীলা বললো, 'দিদির কাছ থেকে পত্রের নিশানা নিয়ে ঠিক এসে গেলাম তো ?'

বললাম, 'তা পৌঁছেচ বটে ! কিন্তু দিদি যে বড় এলো না ?'

—'দিদি আসতে পারলো না বলেই তো আমাকে পাঠালো। এই নিন্ চিঠি, এতেই সব লেখা আছে।' বলে হাতের মুঠো থেকে ছোট্ট একটুকরো কাগজ এগিয়ে ধরলো শীলা আমার দিকে।

অণিমার নিজের হাতেরই লেখা বটে : 'নিজে আসতে পারলুম না বলে কিছু মনে কোরো না। বইয়ের পাতায় কেন যেন আজ মন বসতে চায়নি। তবু চোখের সামনে ক্যালেণ্ডারের পাতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—টেষ্টের আর মাত্র পনেরোটা দিনও বাকী নেই। লাগামহীন মনটাকে তাই জোর করে চাবুক পেটাতে হচ্ছে। পার তো সাইকোলজির ডাইজেষ্টখানা শীলার সঙ্গে পাঠিয়ো। কয়েকটা প্যারাগ্রাফ নোট করে নিয়েই তোমাকে ফেরৎ পাঠাবো।'

সত্যিই এগিয়ে এলো টেষ্ট পরীক্ষা। এবারে কলেজ-জীবনের উপর দিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানার পালা। অণিমার চিঠির অক্ষরগুলো আরও যেন জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিল তা। শীলাকে ব'ল্লাম, 'দিদি পাঠিয়েছে ব'লেই তো এলে, না হ'লে বোধ করি আসতে না ?'

—'কেন আসতুম না ! মনে নেই—সেই যে ব'লেছিলেন, এলে আরও অনেক ছবি-ছড়ার বই দেবেন ! কই, দিন।' কচি মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগ্‌লো শীলা।

ব'ল্লাম, 'তুমি আসোনি ব'লেই তো বই এনে রাখিনি ! দুষ্টুমি ক'রে যদি পালিয়ে বেড়াবে, তবে বই এনে রাখবো কার জন্যে ?'

চটুল চোখে পিট্ পিট্ ক'রে তাকিয়ে শীলা ব'ললো, 'আপনি ভীষণ মিথ্যেবাদী, সুমন্তদা। আমি ভাব্‌লুম এলেই বুঝি বই পাবো।'

মনে মনে লজ্জা পেয়েই বললাম, 'এর পর কবে আসবে বলো ? সেদিন এসে যদি না পাও তবে আড়ি কোরো।'

নিশ্চিত কিছু একটা আশ্বাস পেয়ে বোধ করি এবারে খুসী হ'লো শীলা। ব'ল্লো, 'কাল পরশু বাদ দিয়ে ঠিক তরশুদিন। আসতে একটু দেরী হ'লে যেন হট্ ক'রে আবার কলেজে বেরিয়ে যাবেন না।'

ব'ল্লাম, 'আমাদের কলেজের সময়টা তো তোমার অজানা নেই, দিদিকে তো রোজই লক্ষ্য ক'রছো ! সুতরাং একটু আগেভাগেই না হয় আসতে চেষ্টা কোরো।'

—'আচ্ছা।' আমার মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের চারদিকের দেয়ালগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে সোচ্ছ্বাসে শীলা ব'ল্লো, 'বাঃ, আপনার ঘরে ভারী চমৎকার চমৎকার তো ক্যালেণ্ডার র'য়েছে সুমন্তদা ! অম্নি একটা ভালো ক্যালেণ্ডার আমাকে এনে দেবেন কিন্তু।'

আঙুল দিয়ে একটা বিশেষ ক্যালেণ্ডারকে দেখিয়ে দিল শীলা। বিশেষ অর্থে ছবিটা। শকুন্তলা একটা হরিণ-শিশুকে কোলে জড়িয়ে বসে আছে। ছবিটা দেখ্‌বার মতই বটে ! অণিমাও ছবিটার দিকে তাকিয়ে একদিন সোচ্ছ্বাসে বলে উঠেছিল : 'ভেরি সুইট্, ভেরি লাভ্‌লি।' এবারে মনে মনে ভাব্‌লাম—আমার পড়ার ঘরের দেয়াল থেকে ছবিটা গিয়ে যদি অণিমাদের দেয়ালে আশ্রয় নেয়, তা হলে হয়ত আরও লাভ্‌লি হবে। ব'ল্লাম, 'এটাই বরং তুমি নাও, আমি আবার কখনও একটা সংগ্রহ ক'রে নেবো।'

খুসীতে এবারে হাতে তালি বাজালো শীলা।—'কি মজা, দিদি দেখে অবাক হ'য়ে যাবে।'

দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডারটাকে খুলে এনে শীলার হাতে দিয়ে ব'ল্লাম, 'দিদিকে তো নিশ্চয়ই তুমি সব চাইতে বেশী ভালোবাসো, ক্যালেণ্ডারটা নিয়ে দিদির পড়ার যায়গাতেই টাঙিয়ে দিয়ো। তুমি আর দিদি দু'জনেই তবে সব সময় দেখতে পাবে।'

কথা শুনে মুখখানি হঠাৎ এবারে গোমরা হয়ে উঠলো শীলার। ব'লুলো, 'দিদিকে কিছু দিতে নেই, ভালোবাসি না ছাই। দিনরাত উঠতে বসতে আমাকে শুধু বকে দিদি।'

ব'লুলাম, 'সে কি একটা কথা! আসলে দিদি তোমাকে খুব ভালোবাসে, ভীষণ ভালোবাসে। আমাকেই তো কতদিন ব'লেছে—শীলার মতো লক্ষী মেয়ে দু'টি হয় না।'

—'ব'লেছে বুঝি!' গোমরা মুখখানিতে সহসা একরাশ খুশীর বন্যা ব'য়ে গেল শীলার। দেখ্লাম, এরপর আর নতুন ক'রে ক্যালেণ্ডারের প্রশ্ন তোলার কোনো মানে নেই। বইয়ের শেল্ফ্ থেকে সাইকোলজির ডাইজেষ্টখানা টেনে এনে শীলার হাতে দিয়ে ব'লুলাম, 'এটা ছোলো চিঠির জবাব। গিয়ে দিদির হাতে দিলেই চ'লবে।'

—'এবারে তা' হ'লে যাচ্ছি।'

—'এসো'। ব'লে দু'পা এগিয়ে দিলাম শীলাকে।

ফিরে এসে ঘরের দাওয়ায় পা দিতেই মা এসে সামনে দাঁড়ালেন। অনেকদিন থেকেই মার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। বাড়ীর উঠোনে বোধ করি মাসখানেক পরে এই প্রথম পা দিলেন তিনি। ইদানীং প্রায় ঘর আর রান্নাঘর বাইরে বড় একটা নামতেন না মা। রান্নাবান্নার জন্য বাড়ীতে সম্প্রতি একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখা হ'য়েছিল। বারান্দার ব'সেই মা তার উপর ফাই-ফরমাস খাটাতেন। আজ যখন উঠোন পেরিয়ে সহসা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, ভাবলাম—নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো অর্থ আছে। কিন্তু সে-অর্থ একেবারেই হাতে হাতে ধরা পড়বার মতো। বুদ্ধি মার কোনোকালেই খাটো নয়। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'মেয়েটি কে? ওকে তো কোনোদিন দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না!'

মনে পড়বার মতো হ'লে নিশ্চয়ই প'ড়তো, এই প্রসঙ্গে আর একটি দিনের কথা স্মরণে এলো—যেদিন প্রথম অণিমা এসে আমার অধ্যয়নকক্ষে ব'সেছিল। তখনও মার দেহ এত কাতর হয়নি, পাচক বহাল হয়নি সংসারে। দিব্যি হেঁটে বেড়িয়ে এঘর-ওঘর ক'রতেন মা। সেদিনও অণিমা চ'লে যাবার পর ঠিক এম্নি একটা প্রশ্নই তুলে ধ'রেছিলেন তিনি: মেয়েটি কে? এদিকে তো কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না!' উত্তরে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই ব'লেছিলাম, 'আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, কলেজে আমরা একই সঙ্গে পড়ি।' শুনে স্বল্পক্ষণের জন্য একবার থেমেছিলেন মা, তারপর পুনরায় সংশয়-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন তুলে ধ'রেছিলেন, 'মেয়েটি কায়েৎ না বামুন?' নিজেরা আমরা বৈদিক ব্রাহ্মণ, আচার না থাকলেও মার বিচার আছে পুরোপুরি; ওঁর প্রশ্নের পিছনে হয়ত কিছু উদ্বেগ থেকে থাকবে, কিন্তু তা' নিয়ে ভাবতে যাইনি বড় একটা। নিঃসঙ্কোচেই ব'লেছিলাম, 'ওরা মিত্রবংশের, কায়স্থদের মধ্যে ওরা কুলীন।' কিন্তু কুলীন হ'লেই যে কুলীনকুলসর্বস্বতা-প্রাপ্তি ঘটে না। সেইটেই বোধ করি মনে মনে একবার ভেবেছিলেন মা—তা অবিশ্যি আমার জান্বার সাধ্য ছিল না। মা শুধু ছোট ক'রে 'ও' ব'লে স'রে পড়েছিলেন সেদিন।

আজও মার প্রশ্নের উত্তরে তেম্নি সহজ এবং স্বাভাবিক কণ্ঠেই ব'লুলাম, 'শীলা এর আগে কখনও আমাদের এখানে আসেনি ব'লেই দেখনি। অণিমার ছোট বোন ও, অসাধারণ মেধা।'

—'ওদের বাড়ীতেও তবে তোর যাতায়াত আছে, বল?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আর-একবার চোখ দু'টোকে তুলে ধ'রলেন মা।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কেন বলো তো?'

মা ব'লুলেন, 'নইলে ওর মেধার পরিচয় পেলি কেমন ক'রে তুই?'

—'এই কথা?' হেসে বললাম, 'যাতায়াত নেই তবে একদিন যেতে হয়েছিল, সেটা ছিল শীলার জন্ম দিনের উৎসব। মেধার পরিচয় পেতে তো একটা মিনিট যথেষ্ট!'

—'তা বটে।' উত্তরে আর কিছু-একটাও বললেন

না মা। যেমনি করে মন্থর পায়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, ধীরে ধীরে আবার ঠিক তেমনি মন্থর পায়েই উঠোন পেরিয়ে শোবার ঘরের বারান্দার সিঁড়িতে গিয়ে পা রাখলেন।

কেন যে হঠাৎ তিনি এমনি করে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আর কেনই বা অকস্মিক এমন একটা প্রশ্নের অবতারণা করে নীরবে আবার ফিরে গেলেন, কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের মতই আমার কাছে তা আবৃত থেকে গেল। চেষ্টা করেও সেই আবরণ উন্মোচন করে আকাশের স্বচ্ছ নীলিমার মতো মার আসল বক্তব্যের নীলসমুদ্র আবিষ্কার করতে পারলুম না। লেখাপড়া শিখে জ্ঞান সঞ্চয় করলেও আসলে আমার সমস্ত জ্ঞানের গ্রন্থি যে একদিন মার জঠরেই সৃষ্টি হয়েছিল, একথা ভুলবো কি করে? মার মনের নাগাল পাওয়া দেখলাম সন্তানের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য।

কিন্তু দুঃসাধ্য হলেও আপাতত কিছু একটা সম্পর্কে সাধ্যরকম চেষ্টা করে দেখতে বাধা কি? টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিসের টাকা জমা দিতে হবে কলেজে। আমার নিজের সম্পর্কে আমি প্রস্তুত থাকলেও অনিমার অক্ষমতার কথা আমি ভুলিনি। ক্রিমিন্যাল কোর্টে সামান্য মোক্তারী করে ক'টাকাই বা রোজগার করতে পারেন ওর বাবা! একটুও লুকোয়নি সে কথা অনিমা, আমার কাছে তার কিছু লুকোচুরি করবার নেই বলেই লুকোয়নি। নিজের চোখে যদি সেদিন গিয়ে দেখে না আসতাম ওদের সাংসারিক পরিবেশটাকে, তবে হয়ত অনিমার কথাকে ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতাম চিরকাল। কিন্তু ওদের পারিবারিক অর্থনৈতিক মান—সে যে কতখানি পীড়াদায়ক, ভাবতেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। ফিসের টাকা হয়ত শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করাই সম্ভব হয়ে উঠবে না ওর বাবার পক্ষে! আর সংগ্রহ করতে না পারার অর্থ হচ্ছে একটা বছরের জন্য—চাই কি চির জীবনের জন্যই অনিমার পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। আর শুধুই কি পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ চাকরীর স্বপ্নেরও একেবারেই বিলুপ্তি ঘটবে। টিম টিম ক'রে যে বাতিটা নিতান্তই ভীরু চিত্তে জ্বলে চলেছে, অকস্মাৎ তা যদি কিছু-একটা দমকা হাওয়ায় নির্বাপিত হয়ে যায়, তবে যে ঘরের অন্ধকার কোনোকালেই আর ঘুচবে না, তাতে মিথ্যা কি! উপায়ান্তর হ'য়ে তাই নিজেই এবারে দুখানি চিঠি লিখলাম, একখানি চক্রধরপুরে জামাইবাবুর কাছে আর একখানি হাওড়ার বিল অফিসে আমাদের তহশীলদার হরিমোহন মণ্ডলকে। দু'জনের কাছে একই বয়ানের চিঠি: 'সম্প্রতি আমার নিজের কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। পত্র পাইয়া বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বোধ করি-এইটুকু অনায়াসেই বুঝিবেন যে, একটু বয়স হইলে সর্ববিষয়ে বাপ-মার কাছে আর হাত পাতা চলে না। সম্ভবমতো যত সত্বর সম্ভব শ'খানেক টাকা আমাকে আমার কলেজের ঠিকানায় পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। ভবিষ্যতে এ টাকা অবশ্যই পরিশোধ করিব। বিষয়টা বাবা কিংবা মার কানে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।...'

একরকম নির্লজ্জের মতই চিঠি দু'খানি নিয়ে ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে এলাম। জানতাম—জামাইবাবু কিম্বা হরিমোহন মণ্ডলের এমন অবস্থা নয়—যাতে এই সামান্য টাকা পাঠানো অসম্ভব হতে পারে। দু'জনের কাছ থেকে দু'শো। ফিসের টাকা জমা দিয়েও অনিমার হাতে কিছু থেকে যাবে। থেকে যাওয়াই দরকার। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তারও তো মুখ ফুটে সংসারের কাছে কিছু চাইবার পথ বন্ধ। জীবনের এত রুদ্ধ পথ অতিক্রম করেও কি অগ্রগতির পথে পা বাড়ানো কারুর পক্ষে সম্ভব? সেই অসম্ভবকে জয় করেই যে জীবনের অমের সহজতার পথকে বরণ করে নিতে আমরা পা বাড়িয়ে আছি! মনে মনে একবার উচ্চারণ করলাম: 'আমাদের এই দুরূহ অগ্রযাত্রার পথে তোমার আলোক-বর্তিকা তুলে ধরো ঈশ্বর।' তারপর পাঠ্য বইয়ের মধ্যে মনটাকে নির্বিবাদে ছেড়ে দিলাম। অনিমাকে নিয়ে ভাবতে ব'সে নিজের ভাবনাটাই বা কম কি! আমারও যে সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত আশা আর স্বপ্ন নির্ভর করছে সেই একটিমাত্র কথার উপর: 'পাশ করেছি।' এ পাশ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাশই নয়, জীবনের দুরতিক্রম্য পরীক্ষার পাশও বটে।

[ক্রমশঃ]

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু সে.]

সব চাইতে বড় বল হচ্ছে চরিত্র-বল। যে জাতি যে মানুষ বলহীন সেই জাতি বা সেই মানুষের মুক্তি নেই। চরিত্র অর্থে আমরা যে কেবল সাধুতাই তা নয়; যখন আমরা কোনো একটি মানুষের সমগ্রীন চরিত্র বিশ্লেষণ করি, তখন তার মধ্যে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে এমন কতকগুলো মহৎ গুণের সমষ্টি লক্ষ্য করি—যা তার ব্যক্তিসত্তাকে উন্নীত ক'রে তোলে। সে নিজে যেমন উন্নত হয়, তেমনি তার সেই মহৎ গুণাশ্রয়ী মনুষ্যত্বের স্পর্শে তার পারিপার্শ্বিককে সে উন্নত ক'রে

সেই মানুষটিই তো আসলে চরিত্র বলে বলীয়ান। স্কুলের শিক্ষক যখন তাঁর ছাত্রকে প্রশ্নপত্র দিয়ে লিখতে বলেন: Draw the character of Akbar, তখন ছাত্রের কাছে এপ্রশ্ন বড় নয় যে, বহুতর মোগল-পাঠশালার মতো আকবরও তাঁর হারেমে বহু সংখ্যক বেগম পোষণ ক'রতেন কিনা, কিম্বা ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছিল শুরু উজু ক'রে নামাজ পড়তেন কিনা! বরং ছাত্রের কাছে এই প্রশ্নই বড়, মুসলীম সম্রাটদের অবিমৃশ্য-কারী নীতির মধ্যে সম্রাট আকবর কিভাবে এক নতুন ঐতিহ্য বহন ক'রে এনে শুধু সাম্রাজ্যশাসনেই গুণের পরিচয় দিলেন না, গুণের পরিচয় দিলেন দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টিতেও; হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে রাজ্যশাসনের মূলস্তর কাজে নিযুক্ত ক'রে তিনি চেষ্টা ক'রলেন দেশের নৈতিক মর্যাদার মানোন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার সাধন ক'রতে। এই তো যথার্থ আকবরের চরিত্র। এই চরিত্র শুধু সম্রাট হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও তাঁকে বড় ক'রে তুলেছিল।

যিনি বড়, যিনি মহৎ, যিনি শ্রেয়, তিনিই তো যথার্থ শক্তিমান ও বলীয়ান। চরিত্র হ'চ্ছে সেই শক্তির প্রাণকোষ। সেই কোষ থেকে বিন্দু বিন্দু প্রাণ-নির্যাস ক্ষরিত হ'য়ে মানুষকে তার জীবন-সত্তায় সুদৃঢ় ক'রে তোলে। মানুষের শ্রেয়তার সঙ্গে সঙ্গে জাতিও শ্রেষ্ঠতার অধিকারী হয়। পৃথিবীতে যেসব জাতির নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হ'য়েছে, সেই সব জাতি তাদের স্ব স্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই ইতিহাসের পাতাকে উজ্জ্বল ক'রেছে।

জাতিতত্ত্বের বিচারে একদিন আমাদের এই ভারতবর্ষও ইতিহাসের গৌরবময় উজ্জ্বল পৃষ্ঠাকে আশ্রয় ক'রে শুধু নিজেই নিজের কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় শ্রেয়-সাধনায় উন্নত হয়নি, আত্মোন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠিকেও উন্নত ক'রেছে। ভোগবাদী পৃথিবী যেখানে জড়প্রকৃতির জটিল আবর্তের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উর্ধ্বস্তরে উঠতে পারেনি, ভারতবর্ষ সেখানে আত্মরতির যূপকাষ্ঠে বলি হ'য়ে না থেকে জগতকে উপহার দিল সমন্বয় ও ত্যাগধর্মের উদার বাণী। তার ভোগবতী শক্তির পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন সর্বত্যাগী শঙ্কর। কিন্তু বস্তুবাদী জগতে ভারতের ত্যাগধর্মের অর্থ এই নয় যে, সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সর্বমোহবিমুক্ত হ'য়ে ঝুলিকাঁধে দরবেশের মতো পথে বেরিয়ে পড়ো। তার অর্থ হ'চ্ছে এই যে, ভোগকে ত্যাগের সাধনায় গ্রহণ না ক'রলে সেই ভোগ দুর্ভোগেরই সৃষ্টি করে। ভোগের যে আগ্রহ, তা পশুচিত, আর ত্যাগের যে আগ্রহ, তা মানবোচিত। প্রাত্যহিক বস্তুবাদী জীবনের ব্যবহারিক পশুবৃত্তির সঙ্গে যেখানে মানবিক বৃত্তির সংযোগ ঘ'টলো না, সেখানে বুঝতে হবে—পশুতে আর মানুষে পার্থক্য নেই। এই কারণেই ভারতবর্ষ সেই মানবিক সৎবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে চেয়েছিল সমন্বয় ধর্মের সম্প্রসারণ। গুণের অঙ্কে যেমন যোগফল বেড়ে যায়, তেমনি সমন্বয়ের যোগফলে দেখা দেয় এক অপূর্ব মানবিক শ্রেয়তার প্রাচুর্য।

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা যায়, 'What are the fundamental characteristics of India ?' তবে তার প্রকৃত অর্থগত জবাব এই নয় যে, এখানকার কোন্ ভাঁটিখানায় ব'সে কোন্ জুয়ারী কত পাইট মদ গলাধঃকরণ ক'রলো, কিম্বা কোন্ বাজারে কোন্ মেছোনী সব চাইতে সস্তাদামে রুই কিম্বা ইলিস বিক্রী ক'রে গেল ; তার জবাব হ'চ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ কোনোকালেই সাম্রাজ্য বিস্তারের মোহে নিজের সুখকে বড় ক'রে দেখেনি, অপরের সুখের কারণে সে তার নিজেকে ত্যাগ ক'রেছে। এই জন্যই ভারতবর্ষ বার বার রাষ্ট্রবিপ্লবের জোয়ারে আত্মবিস্মৃতির মতো ভেসে গেছে ; রাজদণ্ডের পরিবর্তে সে বেছে নিয়েছে ন্যায়দণ্ড ; অন্যায় আর ভীরুতাকে সে তার দৃপ্ত চরিত্রের ন্যায়াচরণের দ্বারা রুখেছে ; তার পুরুষ আর নারীর মধ্যে এমন একটি নীতিগত ঐশ্বরিক সম্পর্ক আছে যা বহিরাগত আইনের কোনো অনুশাসন দিয়েই শিথিল করবার মতো নয়। যুগবিবর্তনে ভারত যদি কোনো শ্রেষ্ঠ সম্রাটের জন্ম দিয়ে থাকে, তবে সেই সম্রাট মন্ত্রী, সেনাপতি আর বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত রাজদরবারের স্বর্ণসিংহাসনে আসীন নন, তিনি বহু ভিক্ষু পরিবেষ্টিত মহাবোধি গৌতম বুদ্ধ, বহু কীর্তনীয়া পরিশোভিত শ্রীচৈতন্য এবং বিশ্বভারতীর নবমন্ত্র উদ্গাতা কবি রবীন্দ্রনাথ।

এই হ'চ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃত চরিত্র। এই চারিত্রিক বলই হ'চ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃত বল। বিগত আড়াই হাজার বছরেরও উপরে ভারতীয় জাতি এই চারিত্রিক ঐতিহ্যে ঐতিহ্যবান ছিল। তার ধর্মে কর্মে রাষ্ট্রে সমাজে এক উদার হৃদয়ের প্রকাশ সর্বত্র সঞ্চারশীল থেকে সর্ব কলুষকে অপনোদন করে জাতি হিসেবে নিজেকে বড় করে তুলেছিল।

কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে কি সেই ভারতবর্ষকে পাওয়া যায় ? বর্তমান সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রশ্ন দ্বিতীয় ব্যক্তিমাত্রেই করবেন। যে ভারতবর্ষের স্বরূপ আজ শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ, সেই ভারতবর্ষ আজ কোথায় ? কোথায় সেই মানবিক বিকাশ, কোথায় আজ জাতির সেই সম্প্রসারণ ? আজকের ইতিহাস জাতির কলঙ্কের ইতিহাস। ভারতের স্বাধীনতাও সেই কলঙ্কে আচ্ছন্ন। এর একটা কারণ যদিও তার সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা, কিন্তু এই পরাধীনতাই সবটা নয়। বাংলা যখন মুসলীম-অধিকৃত ছিল, তখনও যেমন শ্রীচৈতন্যের মতো অসাধারণ চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ইংরেজ অধিকৃত ভারত তথা বাংলায়ও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় অসাধারণ চরিত্র-বিকাশ ঘটেছে। সমাজের আর এক অধ্যায়ে অবশ্য পাপের কণ্টকবন জন্মেছে, কিন্তু সমাজ মানসের বৃহত্তর ক্ষেত্রকে তা আজকের মত এত বেশী আচ্ছোদিত করতে পারেনি। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল ভারতীয় জাতির উপর যে কালো ছায়া বিস্তার করলো, সেই ছায়া যেন চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস হয়ে জাতির জীবনে অন্ধকার ডেকে আনলো। ইংরেজের অধীনে থেকেও যে জাতির জীবন ছিল স্বাভাবিক, সেই জীবন সহসা দুষ্ট রিপুর সহস্র ফণা বিস্তার করে নিজেকেই দংশন ক'রতে উদ্যত হ'লো। জাতির জীবন ছেয়ে গেল কালোবাজারে, নরহত্যায়, নারী লাঞ্ছনায়, চুরি আর রাহাজানিতে। একটি সুরে বাঁধা বীণার তারগুলি কখন যেন কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে ছিঁড়ে তড়্‌বড় হয়ে গেল। ক্রমে আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে মাথা খাটিয়ে চিন্তা করতে অধিকাংশ মানুষ ভুলে গেছে। যারা শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী আর যারা অশিক্ষিত নিচুতলার লোক —শ্রেণীগত পার্থক্যের বেড়াটা তুলে নিলে দেখা যাবে— নীতির পার্থক্য থাকলেও জীবনের বহত্তর রুচির দিক দিয়ে উভয়ে আজ প্রায় সমান স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমেই একটা বুদ্ধি ও জ্ঞানবিবর্জিত চটুলতার জনপ্রিয় পরিবেশে জাতির বৃহত্তর জীবন আজ ভেসে চলেছে। এখানে চরিত্রের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছাবার মহৎ প্রয়াস কোথায়, কোথায় নিজের উদার জীবন প্রবাহের মধ্যে

বিকাশ বন্ধ করবার সেই যজ্ঞ নয়! একদিকে রাজ-নৈতিক কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আদায়ী বক্তৃতা ছাড়া আর যা কিছু তা ছায়াচিত্রের নটনটীদের নিয়ে দুষ্করতা, পানের জলসা কেঁচে 'ভক্তনিধি' প্রকাশের তীব্র আগ্রহ আর বিপুল বিশাল একটানা দারিদ্র্য। এর বাইরে যে জীবন আছে বা জীবনের কিছু অর্থ আছে, তা নিয়ে কারুরই বড় একটা আগ্রহ জিজ্ঞাসা নেই।

ইংরেজী কথায় কথায় আমাদের জাতীয় জীবনে একটা জিনিস চমৎকার এসে গিয়েছে, তা হচ্ছে—কোথাও কারুর কিছু আয়োন্নতি ঘটছে না, তখন তার একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত হচ্ছে সরকারের অব্যবস্থিত নীতি। কিন্তু সরকার তো এদেশে আজকে নয়, দেশকে শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাবার জন্য প্রত্যেক যুগেই সরকারী শাসন চলে আসছে, সে সরকারের রূপ যাই থাক না কেন; কিন্তু মানুষের জ্ঞানোজ্জ্বল বুদ্ধিকে অবদমিত করে জাতিকে চরিত্রভ্রষ্ট করার সুযোগ বোধ করি কোনো সরকারই কোনদিন না নিতে পারেন না। আসলে জাতির প্রাণ-চেতনা যা—জাতীয় সরকার তারই রূপ নিতে বাধ্য হয়ে থাকে। আজকে আমাদের জাতীয় দুর্দশা যদি সরকারী নীতির অনিবার্য ফলস্বরূপ এসে থাকে, তবে বুঝতে হবে না কি যে, সেই নীতির আশ্রয় ছিল আমাদের জাতির চরিত্রে, তারই ব্যবহারিক সহিংপ্রকাশ এই সরকারী ব্যবস্থা। জাতীয় চরিত্রভ্রষ্টতার এও যেমন একটা বড় দিক, তেমনি আর একটি বড় দিক হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবলোপ। যা কিছু শ্রমসাধ্য, চিন্তাসাপেক্ষ, তাকেই আমরা আজ বর্জন করেছি; তার পরিবর্তে যা গ্রহণ করেছি—তা অনেকাংশে পশুচিত প্রবৃত্তি আর চটুল ও লঘু প্রাণসত্তার। ছুরির ধার কমে কমে যখন সে ক্রমে ভোঁতা হয়ে পড়ে, তখন তার যে অবস্থা, জাতীয় জীবনে আমাদের আজ সেই অবস্থা। আমাদের চরিত্রে আজ ধার নেই বলে শক্তিও ক্ষয়িত হয়েছে। চরিত্রোন্মেষের দ্বারা সেই শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে হলে যে আত্মপ্রস্তুতি ও জীবনসাধনার প্রয়োজন, তার উদ্যমনা নেই। আমাদের সামগ্রিক জীবনে যতক্ষণ না সেই প্রস্তুতি আসচে, ততক্ষণ এই চরিত্রভ্রষ্টতার পাপ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের প্রাচীন চারিত্র-সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলির দিকে তাকিয়ে আমাদের আজকের এই দীনহীন পশুতার লজ্জায় কি নিজেরাই আমরা অধোবদন হইনা? আমাদের জাতীয় জীবন নতুন করে আজ আবার চরিত্র শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে তবেই এই হীন নির্বীর্যতার দুঃখ লজ্জা ও পাপ থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি এবং পৃথিবীকে আবার নতুন ক'রে আমাদের শুভসঙ্ঘ সমাজ-চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারি। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক।

দেশ ও বিদেশ

পঃ বঙ্গ-বিহার সীমানা মতামত

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গ-বিহার সীমানা বিরোধ বেশ কুয়াশার সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতকে যদি অখণ্ড ধরিয়া লওয়া যায়—তাহা হইলে আমাদের বিরোধের মূলসূত্র বিচার করিতে সুবিধা হইবে। কেননা গোটা ভারতের অভ্যন্তরে থাকিল বিভিন্ন রাজ্য—এই বিভিন্ন রাজ্য শাসনকার্য চালাইবার নিমিত্ত ভিন্ন হইল মাত্র। দক্ষিণ দেশে, মাদ্রাজ নাম দিয়া বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি একটি প্রদেশের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশী শাসন অবসান হইবার পর এই অহিতকর প্রদেশ বিভাগ বিলোপ হইবে ইহা সবাই আশা করিয়াছিল। বাঙ্গালা ব্রিটিশ যুগে হালিকর বিভাগের লক্ষ্যস্থল ছিল। বাঙ্গালীর ঐক্য ছিন্নভিন্ন হইলে রাজনৈতিক চেতনা ভিন্ন পথ ধরিবে তাই বৃটিশ শাসক ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া অবশ্য বাঙ্গালাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। আসাম ও বিহারে বাঙ্গালার খণ্ডছিন্ন অংশ লইয়া আপন-আপন প্রদেশের সীমানা বৃদ্ধি করিল। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গালা দুইবার ভাগ হইল। দেশ পর-শাসন হইতে ছিন্ন হইবার পর সবাই ভাবিতে শুরু করিয়াছে কাহার কতটুকু ছিল। এই পুনর্বিচারের মুখে বাঙ্গালী তাহার ন্যায্য অংশ ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে। ইহাতে বিহারের অখুসী হইবার কারণ দেখি না।

তবে কেন বিহার বিরূপ হইলেন? একথা বাঙ্গালী বাদে অন্য রাজ্যের অধিবাসীরাও ভাবিবেন। কারণ নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ইহার অর্থনৈতিক দিক। বিহার বাঙ্গালার যে অঞ্চল পাইয়াছে—তাহাতে বন-জঙ্গল সবই আছে—তাহাতে পয়সাও কম উপায় হইতেছে না। কিন্তু খনিজ সম্পদ যাহা রহিয়াছে, তাহা ত কেন্দ্রীয় সরকারের—ইহাতে স্থানীয় সরকারের কোন সুবিধা নাই। তবে হ্যাঁ, খনিজসম্পদসূত্রে আগত কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ যাহা রোজগার করিবেন তাহার পরোক্ষ ফল স্থানীয় সরকার অবশ্যই পাইবেন।

তারপর থাকিল জন—ইঁহারা কেহই হিন্দীভাষী নহেন, এবং বাঙ্গালার সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রথমতঃ বিহারীরা যদি মনে করেন যে বাঙ্গালার সংস্কৃতিকে জোর করিয়া তাঁরা শিখাইয়া লোপ করিবেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করিতে আমরা অনুরোধ করি। দ্বিতীয়, বিহার যদি জবরদস্তির পথ গ্রহণ করেন তবে অন্যত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। বিহার কংগ্রেস বলিয়াছেন, তাঁহারা সূচাগ্র পরিমাণ জমিও ছাড়িয়া দিবেন না। বস্তুত তাঁহারা জমি ছাড়িয়া দিবার মালিক কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি বিহার সরকার তথা বিহার রাজ্য একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মত ব্যবহার করিতে চান, তবে তাঁহারা ভারতের ঐক্য বিনাশকারী রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। বিচারের কি সেই শক্তি আছে? রাষ্ট্রের ঐক্য বিধানের নিমিত্ত যেকোন সীমানার যখন-তখন অদল-বদল সম্ভব হইতে পারে। তবে সেখানে ভাষা, সংস্কৃতি এবং শাসন-কার্যের সুবিধা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবার। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দাবীর পশ্চাতে ইহার সবকটির সমর্থন পাওয়া যাইবে। আমরা বিশ্বাস করি রাজ্য-সীমানা কমিশন এসব বিষয় বিবেচনা করিবেন। ইহা বাদে দেশেও ব্যাপক আন্দোলন হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

গোয়া মুক্তি অভিযান

পর্তুগীজ সরকার আবার তাঁহার নগ্নরূপ বিকাশ করিবার জন্য অবকাশ খুঁজিতেছেন। ইতিপূর্বে গোয়াতে

যাহা হইয়াছে তাহা সবাই জানেন। হমন অভিযান হইবে এই আশঙ্কায় পর্তুগীজ সরকার পূর্বাহ্নেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। পর্তুগীজ সরকার ব্রিটিশ সরকারকে নাকি জানাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা হমন অভিযানে বাধা দিবেন। কিন্তু সেই বাধা কি জাতীয়? যাঁহারা হমন অভিযানে বাহির হইবেন—শোনা যাইতেছে তাঁহারা নিরস্ত্র, এবং অহিংস স্বেচ্ছাসেবক মাত্র। ইঁহাদের ঠেকাইবার জন্য পর্তুগীজ সরকার কী রূপ বাধার সৃষ্টি বা ব্যবহার করিবেন? তাহা প্রতিপক্ষের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেই বাধা যদি অহিংস অভিযানকারীরা অতিক্রম করিতে পারেন তবে বুঝিব তাহাদের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে গোয়ায় যে বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছিল যদি তাহাই বাধার স্বরূপ হয় তবে আমাদের বিশ্বাস সত্যাগ্রহীরা অনায়াসে তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ অহিংস বাধা যত প্রবল হইবে অহিংস সৈনিকরা ততই নৈতিক শক্তিতে জয়ী হইবেন। অহিংস হমন-অভিযান সাফল্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

পূর্ববঙ্গ সমস্যা

শোনা যাইতেছে, হক মন্ত্রীসভার অপসারণের পর প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী যাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাঁহাকে আবার পূর্ব বঙ্গের নেতা হিসাবে গ্রহণ করিতে করাচীর কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি আছে। এই আপত্তির মূলে কি সত্য নিহিত আছে আমরা জানি না। তবে ইহা বোঝা যাইতেছে যে, পাকিস্তানের গভর্নরজেনারেল নিজেও হকসাহেবকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কোন আপত্তি টিকিত না। রাজনৈতিক প্রয়োজন যেখানে, সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ বা আপত্তি বড় বালাই নহে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে হক সাহেবের বার্ধক্য হেতু অন্য কোন নূতন নেতৃত্ব পূর্ববঙ্গে দানা বাঁধিতেছে। অথচ সাধারণের মনের উপর হক সাহেবের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই অবস্থায় জনসাধারণকে একেবারে নিরাশ করিয়া আনকোরা নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া তোলা বা বসাইয়া দেওয়া—এক দুরূহ সমস্যা। তবে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে হক সাহেবের নির্বাচিত ব্যক্তি গ্রহণ করায় অবস্থাটা অন্যরূপ দেখাইতেছে। হয়ত হক সাহেবকে শেষপর্যন্ত নূতন নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইবে।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

এবারের নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন পাটনা অধিবেশনে জাতির কাছে একটি আবেদন করিয়াছেন। সেই দাবী: পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা উচিত। আমরা প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত। জনসাধারণ যদি তাহার ন্যায্য গণতান্ত্রিক দাবী করিবার অধিকার চায় তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি দেখি না। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ বহুদিকপ্রসারী ও ব্যয়বহুল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে চালান দুষ্কর। যে কোন কারণে হোক শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইলে ছাত্রকে পূর্বের তুলনায় বহু বিষয় জানিতে ও বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান যথাযথভাবে না হউক অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবেশন করিতে হইলেই শিক্ষককে তাহার জন্য অতিরিক্ত শ্রম করিয়া জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। সেই অর্জিত জ্ঞানই ছাত্রদের পাওনা। কিন্তু সাধারণভাবে ছাত্রের অভিভাবক ও শিক্ষক আজ যে অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছে তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা অনুষ্ঠান বিশেষের সাহায্যের অবকাশ নাই। তাই শিক্ষাকরের ভিত্তিতে নূতন করিয়া শিক্ষা ও শিক্ষকের জন্য অর্থ সংকলন করিতে হইবে। সম্মেলনের প্রস্তাবটি এই মর্মে গৃহীত হইয়াছে:

"যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০ শত টাকা, বর্তমানে তাহাদের উপর শিক্ষাকর আরোপিত হইয়া থাকে যাহাদের বার্ষিক আয় পনেরোশত টাকা তাহাদের উপর শিক্ষাকর আরোপিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বিদে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর (যাহাদের ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায় রহিয়াছে) পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, বস্ত্র এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর উপর, ঘোড়দৌড়, মদ্য, বিলাসদ্রব্য ও সিনেমা প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের উপরও শিক্ষাকর বসাইতে হইবে।"

মার্শাল টিটোর ভারত ভ্রমণ

অতীতকাল হইতে ভারত বিদেশী অতিথিকে সম্বর্ধনা করিয়া আসিয়াছে। বর্তমান ভারত রাষ্ট্র তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু অতীত হইতে বর্তমান একটু বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে।

মার্শাল টিটো

আমরা ইতিপূর্বে ভারত ইতিহাসে যে কটি বিদেশী পর্যটকের কাহিনী পাই তাঁরা বেশীর ভাগই সংস্কৃতির দূত হিসাবে ভারতে আসিয়াছিলেন, বর্তমান বিশ্বে সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতিও যোগ হইয়াছে। বর্তমান ভারতবর্ষে দুই কারণেই পর্যটকেরা আসিতেছেন এবং আমাদের বিশ্বাস তাহারা আমাদের জাতিগঠনের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টার সত্য পরিচয় লইয়া দেশে ফিরিবেন।

আণবিক অস্ত্র ও রাজাজী

ভারতের প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী আমেরিকাকে ভয়মুক্ত নূতন জগৎ রচনার উদ্দেশ্যে অন্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত আণবিক বোমা কুমেরুর গভীরে বিসর্জন দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ২৬শে ডিসেম্বরের 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র লিখিত একপত্রে তিনি আবেদন জানাইয়াছেন।

রাজাগোপালাচারী

ক্ষমতা অর্জন দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আণবিক শক্তিকে সেই ক্ষমতা অর্জনের অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ চিরকাল নরকবাস। আণবিক বোমা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার 'ফলিতরূপ' পরিণাম সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া রাজাজী লিখিয়াছেন এখনও যাহা স্বপ্নাবৃত হইয়া আছে আলাপ-আলোচনার ফলে তাহা শীঘ্রই প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের মত হইয়া পড়িবে। আমরা এই ভয়ের ভাবটা হারাইয়া ফেলিব এবং মানুষের শত্রুই জয়ী হইবে। রাজাজী বলিয়াছেন, অন্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমেরিকা অথবা রাশিয়া এই কাজে অগ্রণী হউক।"

ভারতের নেতা, সাধারণ মানুষ সবাই ইহা সমর্থন করিবে।

নাই। একদা ভারতের ...
বলিয়াছেন। এই ...

...য়ার আত্মশক্তির মাঝে।
...হে। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের
...মুখে শুধু মাত্র এশিয়াই পড়ে
... বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্য-
...শুধু ইয়োরোপকে ভাবিত
...হ: আফ্রিকাকেও উদ্বুদ্ধ
...এশিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য
...র প্রথমেই আরম্ভ করিয়া-
...আফ্রিকাতে আজ পরিণতি
...নৈতিক চেতনা পরিণতির
...মাকিন সমাজকে দুইবার
... যুদ্ধ করিয়াছে ...

...লে জড়াইয়াছে। তবে এই
...এশিয়ার একটা বৃহৎ অংশ
...গাত্রীয় হিসাবে আফ্রিকার

বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ এই সব জাতিগুলির প্রতি তারা ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইতে সমর্থ হইবে না। ইহার মধ্যে এক তুর্কী ছাড়া প্রায় সবাই ভৌগোলিক বাধা ডিঙাইতে পারিবে না। কেননা, ভূগোলই ইহাদের এশিয়ার দিকে টানিয়া রাখিবে।

এগারোজন মার্কিন বৈমানিক—

এগারোজন মার্কিন বৈমানিককে লইয়া গোটা বিশ্বে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। এত হৈ-চৈ হইত না যদি না চৈনিক বিচারালয়ে ইহাদের দণ্ড হইত। এই ঘটনাটির পশ্চাতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। একটি মার্কিন আর একটি চীন। এই দুয়ের মতবাদের বিভিন্নতা উভয়ের বৈদেশিক নীতির নামে প্রতিফলিত হইতেছে। এক পক্ষ বলিতেছেন যে, এই বৈমানিকরা গুপ্তচর বৃত্তির কাজে রত ছিল। আর এক পক্ষ ইহা অস্বীকার করিতেছেন। মার্কিন রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মারফৎ চীনকে চাপ দিতেছে। ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে চীন অবধি দৌড়াইতে হইতেছে। এই দৌত্য-কার্যের ফল কি হইবে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু একটি ফল ইহা হইতে প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে। সেক্রেটারী জেনারেল আলাপ-আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, চীনের রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভ্য হইবার দাবী অযৌক্তিক নহে—দুইটি কারণে অযৌক্তিক নহে—প্রথম কারণ চীনের একতা, দ্বিতীয় কারণ, চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মূল ভূখণ্ডের উপর যে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা দেশবাসী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহা এখন বাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।—

বিশ্বের এতবড় একটা বৃহৎ অংশকে বাদ দিয়া কি ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—সবার প্রতিনিধি হইতে পারে?

রাষ্ট্রপুঞ্জের না মানিবার পক্ষে সঙ্গত কোন কারণ নাই—এতবড় বিরাট দেশের, এতগুলি লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে ধ্বনিত হইবে না,—ইহা অবাস্তব। এশিয়ার রাজনীতিতে চীনের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার সময় এখন পরিণত হইয়াছে।

মার্কিন সমর-সাহায্য ও এশিয়া

এতদিন পর মার্কিন রাষ্ট্র এশিয়ার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৪৩২ কোটি টাকার পরিকল্পনা লইয়া প্রস্তুত। কিন্তু সমর সাহায্য যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা নিজেরা উত্তর কালে কোন সমরানলে জড়াইয়া পড়িবেন কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

ফরমোসা, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, পাকিস্তান এই সাহায্য পরিকল্পনার আওতায় পড়িবে। বেশ ভাল কথা, এসব দেশের লোকেরা যদি নিজস্ব শিল্প বাণিজ্য না গড়িয়া অন্যের সাহায্যের প্রতি হাত বাড়াইয়া থাকে তবে সাধারণ মানুষের দুঃখের দিন কখনও দূর হইবে না। পরের দেওয়া অর্থ অবাঞ্ছিত কারণে খরচ করিয়া যেই দারিদ্র্য—সেই দারিদ্র্যের নামেই তাহারা আবার পড়িবে। এই সমর সাহায্য অর্থনীতির দিক দিয়া বিচার করাই ভাল। কেননা দেশেরই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জাতির অর্থনীতির একটা গূঢ় সম্বন্ধ পাকিয়া যায়। অর্থাৎ কোন দেশ যদি নিজস্ব প্রতিভা, শ্রম, অর্থ খাটাইয়া ট্যাঙ্ক তৈরী করিতে না পারে—তবে সে দেশবাসীর শ্রম জাতীয় অর্থনীতিতে নিয়োগ করিতে পারিল না বুঝিতে হইবে। বিদেশী শ্রমে সৃষ্ট ট্যাঙ্ক তাহার সামরিকভাবে কাজে লাগিতে পারে কিন্তু দেশের উদ্বৃত্ত শ্রমের সমস্যার সমাধান তাহাতে হইবে না। বিদেশী শ্রম বিদেশী শ্রমিককে নিয়োগ করিবে। বিদেশীর অস্ত্র যতই দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত হইবে, ততই দেশী শ্রমিক বেকার হইবে। ফলে শিল্প বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে না। কাজেই সামরিক সাহায্য মূলত মার্কিন রাষ্ট্রের আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতেছে, কেননা তাহার দেশের শ্রমিক শ্রম করিয়া লাভবান হইতেছে। তারপর ইহার সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যাও জড়িত রহিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ

ব্যবস্থায় দুই পক্ষ নেতৃত্ব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। সে অবস্থায় রাজনৈতিক সঙ্কট অনিবার্য। উক্ত দেশগুলির জনগণের ইচ্ছার কোন সম্মতি না পাইয়া বর্তমান রাষ্ট্রনেতারা ইহা গ্রহণ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল রাষ্ট্রের কর্ণধারদের উপর বর্তাইবে।

ভিয়েৎনাম শান্ত নহে

আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতি শ্রীদেশাই যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে ভিয়েৎনাম শান্ত নহে। গত কয়েক বছরের অশান্ত অবস্থায় নিজেদের মধ্যে দুইপক্ষ লড়াই করিয়াছে ফলে আপনার ঘরে আপনার জনকে দুশমন বুঝিয়াছে। ইহা বাদে বাহিরের শক্তি ভিয়েৎনামে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শোনা যাইতেছে মার্কিন রাষ্ট্র বাওদাই সরকারকে সমর সাহায্য দান করিবে মনস্থ করায় ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীদেশাই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন, "About 500,000 persons have moved across the 17th parallel to the south they belong to the Red River Delta, where French influence was considerable." এই উক্তি প্রমাণিত করে যে গত দিনের বিরোধের ঘা এখনও শুকায় নাই। তাছাড়া আরও আশঙ্কা করা হইতেছে যে, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন নির্বাচন হইবে তখন পরিস্থিতি হয়ত জটিলতর হইবে। ইতিমধ্যে যদি আন্তর্জাতিক অবস্থা গুরুতর হয় তবে হয়ত সমগ্র পরিকল্পনাই অন্য রূপ লইতে পারে—ইহা আশঙ্কার কথা। আমাদের মতে প্রাচ্যখণ্ডে গুরুতর যুদ্ধের পরিস্থিতি যাহাতে উদ্ভব না হয় তাহার জন্য না টানিবার জন্য প্রাচ্য শক্তিবর্গ সব সময় সচেতন থাকা উচিত। প্রাচ্যের বৃহৎ শক্তিবর্গের তীব্র প্রতিবাদের মুখে অনেকেই যুদ্ধ বাধাইতে সাহস পাইবে না। ভারতের নৈতিক প্রভাব এখানে অনেকখানি ক্রিয়াশীল হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

প্যারিস চুক্তি অনুমোদন ও প্রতিক্রিয়া

প্যারিস চুক্তি ফরাসী চেম্বার অব্ ডেপুটিজ মানিয়া লয় নাই। তাই ইউরোপীয় রাজনীতিতে ঘোলাটে স্রোত বহিতেছে। ফরাসী বরাবরই ইয়োরোপীয় রাজনীতির মধ্য মুকুটমণি বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা, বর্তমান শতাব্দীতে এবং ইতিপূর্বেও ইহাদের কারণে ইয়োরোপীয় রাজনীতি বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ফরাসী যেমন জার্মানীকে ভয় পায় জার্মানীও ফরাসীকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই দুই মহান জাতির দ্বন্দ্ব কলহ শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় আকাশেই বিভীষিকা সৃষ্টি করে নাই গোটা বিশ্বকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

রুশ শক্তি বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া ইয়োরোপ আতঙ্কিত। আমাদের মনে হয় এখানে আসল আশঙ্কার কারণ নাই। যদি প্রকৃতপক্ষে শঙ্কা করিবার কিছু থাকিয়া থাকে তবে তাহা ফরাসী-জার্মান সম্পর্ক। কেননা ইহাদের চিরন্তন বিরোধ যখনই নূতন আকারে দেখা দিবে তখনই গোটা ইয়োরোপ বাধ্য হইয়া তাহাতে জড়াইয়া পড়িবে। ভূগোল রাশিয়াকে তাহার কাছে রাখে নাই, রাখিয়াছে জার্মানীকে। সেই জার্মানী বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলে—সে বিরোধে আহুতি দিবার জন্য রাশিয়া আসিতে পারে ইহা সম্ভব। বিশেষত জার্মানী আজ যখন দ্বিধা-বিভক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হইল, রাশিয়ার ভয়ের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে সাড়ে চারি ডিভিসন সৈন্য রাখিয়া ফরাসী, জার্মানীর পরস্পরের ভয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস ঠেকানো যাইবে কি না?

ইংরেজ ফরাসীকে ধমক দিতেছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ফরাসীকে তোষণ-নীতির সোনার শিকলে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জাতির যাহা অস্থিমজ্জায় রহিয়াছে তাহা বাহিরের নিরাপত্তার আশ্বাসে প্রশমিত হইবে কিরূপে? হুমকি আর ধমকের ফল যাহাই হোক না কেন, ফরাসী জাতির প্রবৃত্তিগত সন্দেহকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যদিবা ফরাসী জাতীয় পরিষদ জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জা মানিয়া লয় তবু

তাহার সন্দেহ তাহাকে ক্ষমা করিবে না। কোন বিরূপ ঘটনার মধ্যে পড়িলে সে বাঁকিয়া দাঁড়াইবে। ইয়োরোপীয় রাজনীতির কর্তারা এই কথাটা ভাবিয়া কাজ করিবেন। কেননা, আজ ফরাসীর কাছে আসল সমস্যা রাশিয়া নহে জার্মানী—তার অর্থ সুসজ্জিত জার্মানী। জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া দেখিয়াছে যে, শীতের দেশে বুলেট বরফে আটকিয়া যায়। তার চাইতে অস্ত্রের উপর বুলেটের পরীক্ষা চলে ভাল। তাছাড়া পরাজিত জার্মানী আর একবার যে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবে না তার কোন প্রমাণ আছে? কিন্তু ইহাও ত সত্য যে, একটা জাতিকে আর কতদিন অস্ত্রবল শূন্য করিয়া রাখা যায়?

কাইরো শহরের ইহুদি

মিশর রাষ্ট্র দেখিতেছি বিবিধ ভয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাহার আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এইরূপ প্রবল যাহা শেষ পর্যন্ত—জেল, ফাঁসী, গুলি করিয়া দমন করিতে চাইয়াছে। যেহেতু মিশর সরকার ইস্রায়েলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়, সেই হেতুই আবার সেখানে ইহুদীরা, সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে কাহারো সদ্ভাব বা অসদ্ভাব থাকিতে পারে কিন্তু কোন ব্যক্তি বা তাহাদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগোষ্ঠী সন্দেহ

লে দুষ্ট হইলে বিশ্বে বিদেশী জনার বাস দায় তুলিয়া দিতে হয়। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে তাহা অচল বলিয়া স্বীকৃত হইবে। অবশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যদি ব্যক্তির এই জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করিতে হয়—সেও আচ্ছা। কিন্তু বাকির বিশ্বে যেন এইরূপ ধারণার সৃষ্টি না হইয়া যে, অমুক রাষ্ট্র অমুক জাতির প্রতি ঘৃণা বা সন্দেহ পোষণ করে। মিশরে ইহুদীদের জিওনিষ্ট কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইতেছে।

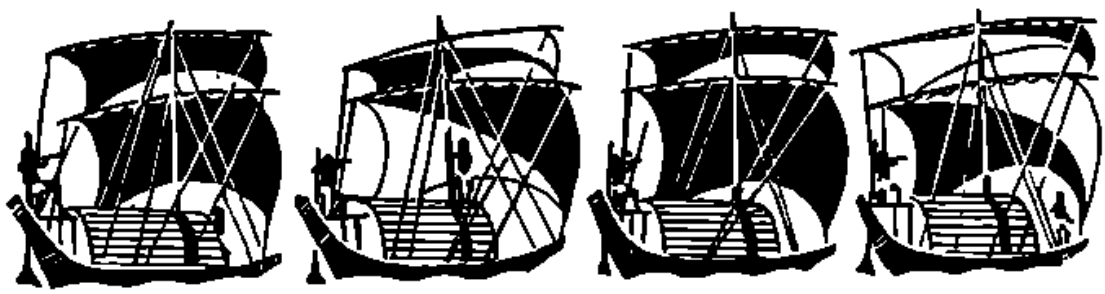

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সরকারী শিল্প-নীতি ও বে-সরকারী মহল

সম্প্রতি বঙ্গের দুর্গাপুরে দু'টি লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য শ্রী বি. এন্. বিড়লা কিছুদিন আগে এক প্রস্তাব করেছিলেন। বিড়লার এই প্রস্তাব সরকারী অনুমোদন লাভ না করায়, বে-সরকারী শিল্প মহলে সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিড়লার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকালে একথা বলা হ'য়েছে যে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের সরকারী শিল্পনীতি অনুসারেই সরকার ঐরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারী নীতি অনুসারেই নূতন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপনের অধিকার একমাত্র সরকারের থাকবে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হ'লে বে-সরকারী মহলের সহযোগিতাও গ্রহণ করা হবে। বে সরকারী মহল থেকে যুক্তি দেখানো হ'য়েছিল যে, ভারতের উন্নয়ন কার্যের জন্য প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমান চালু শিল্পগুলির সঙ্গে পরিকল্পিত কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা একত্র ক'রলেও, দেশে লোহার অভাব মিটতে অনেক বাকী থেকে যাবে। যা' হোক, সরকার এই যুক্তির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেখতে পান নাই। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গত ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির এক বৈঠকে বলেছিলেন যে, সমস্ত শ্রেণীর জন সাধারণের সহযোগিতা নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর সরকারের উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, বর্তমানে চালু শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রবার কোন অভিপ্রায় তাঁর সরকার রাখেন না। এই সব ব্যাপারের পরে বে-সরকারী মহল স্বভাবতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার বিবরণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সকলে যেমন আশা করেছিলেন, ভারতের অর্থ-মন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স অফ্ কমার্সের সাংবাৎসরিক সভায় অভিভাষণ প্রদানকালে বেসরকারী মহলের প্রশ্ন আলোচনা করেন। তিনি বলেছেন যে বে-সরকারী মহলের গতি-বিধির জন্য প্রচুর সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এই ধরণের অস্পষ্ট আশ্বাসে বে-সরকারী মহল বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নাই। অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর লোকসভায় অর্থনীতি সম্পর্কে বিতর্ক কালে বে-সরকারী মহলের প্রশ্নটি বেশ পরিষ্কার হয়। বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি স্থাপনের দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকলেও, দেশের উন্নয়ন কার্য চ'লবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতিতে বে-সরকারী মহলের স্থান ক্রমশঃই বেড়ে যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি থেকে সরকারের বর্তমান নীতি মোটেই পৃথক নয়। বিতর্ক কালে শ্রীনেহরু বলেছেন যে, ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্রের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক শ্রেণী-বর্ণহীন সমাজের দিকে এগিয়ে চ'লেছে কিন্তু দ্রুত রাষ্ট্রায়ত্ত নীতি গ্রহণ ক'রলে কর্ম-সংস্থান এবং উৎপাদনের অবনতি ঘটবে। তিনি অবশ্য একথা স্বীকার করেছেন যে শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বেড়ে চলেছে। পরিশেষে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, ভারতবর্ষের মত একটি অনুন্নত দেশে সরকারী উদ্যম ব্যতিরেকে এবং সরকারী মহলের পরিধি সম্প্রসারণ ও বে-সরকারী মহলের যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত দেশের

উন্নতি সম্ভব হবে না। কিন্তু যখনই বে-সরকারী মহলের উপর কিছু ছেড়ে দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে, কাজ করবার মত যথেষ্ট স্বাধীনতাও সেখানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বে-সরকারী মহল নেহেরুর নীতিতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নাই। তাঁরা মনে করেন যে এই নীতির ফলে শিল্পে বে-সরকারী অর্থ বিনিয়োগ মোটেই বৃদ্ধি পাবে না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাচ্ছে যে, যে অর্থ বিনিয়োগ করা হ'চ্ছে তা থেকে ভাল আয় পাওয়া যাবে এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত, ততক্ষণে কেউ নিজের অর্থের ঝুঁকি নিতে স্বীকৃত হবেন না। সরকারী নীতিতে এরকম কোন আশ্বাস পাওয়া যায় না। সাপ্তাহিক 'Capital' মন্তব্য করেছে যে, নেহেরুর নীতি সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের গণ্ডীর বাইরে এবং তাকে বলা যেতে পারে "নেহরুবাদ"। "It is a strange hybrid policy with which to face the future." কিন্তু সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রী জি. ডি. বিড়লা সরকারের বর্তমান শিল্পনীতি সম্বন্ধে কি বলেন? তিনি সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বলেছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বে-সরকারী মহলের উপর এক গুরু দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে এবং সরকারী শিল্পনীতির ফলে অর্থ-বিনিয়োগের বাজারে মন্দার কোন কারণ তিনি দেখতে পান না। সরকারের অর্থনীতি মূলগত আদর্শের উপযুক্ত উপলব্ধির অভাবই এই সব ব্যাপারের জন্য দায়ী।

নিখিল ভারত পল্লী ঋণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে এই তদন্ত কার্য পরিচালিত হয়। ছ'শ পল্লীগ্রাম ছাড়া আরও অনেক পল্লী অঞ্চল এবং সহরাঞ্চল যেখানে কেনা বেচা বা শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে, সে সকল জায়গাও এই তদন্তকার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রী এ. ডি. গোরওয়ালাকে সভাপতিরূপে নিয়ে এই তদন্ত কমিটি সরকারী ও বেসরকারী মহলেরও মতামত সংগ্রহ করেছেন। এই তদন্তের ফলে দেখা গিয়েছে যে পল্লী অঞ্চলে সরকার এবং সমবায়ের ঋণ ব্যবস্থা নিতান্তই নগণ্য। চাষীদের বর্তমান ঋণের পরিমাণ সমগ্র দেশের হিসাবে ৭৫০ কোটী টাকা কিন্তু সরকার ও সমবায়ের অবদান যথাক্রমে শতকরা ৩·৩ এবং ৩·১ ভাগ। শুধু তাই নয়, এই ঋণ কেবলমাত্র জোত জমিওয়ালা কৃষকগণই পেয়ে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত গরীব কৃষকগণ এই ঋণের কোন অংশই পায় না। কাজেই এখনও গ্রাম্য ঋণদাতৃগণ এবং ব্যবসায়ীগণ পল্লীর ঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ যোগান দিয়ে থাকেন। এই ঋণদাতৃগণ অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার দেন এবং কৃষকদের ফসলের কেনা বেচার মূল কর্তৃত্ব কেড়ে নেন এবং গ্রামের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব পেয়ে বসেন।

পল্লী অঞ্চলকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলবার জন্য চাই সুপরিকল্পিত অর্থনীতি। যে নীতি এতদিন অনুসৃত হয়ে এসেছে তার মধ্যে এখন অনেক ত্রুটী পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কাজেই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পল্লী অঞ্চলের জন্য নূতন অর্থনীতি রচনা করতে হবে। আনন্দের কথা যে গোরওয়ালা কমিটি এ বিষয়ে যে সুপারিশগুলি করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমবায় ঋণ ব্যবস্থা অকৃতকার্য হলেও, বর্তমান অবস্থায়, কমিটি মন্তব্য করেছেন যে, সমবায় উন্নয়নের প্রচেষ্টা করতে হবে। এজন্য কমিটি একটি একত্রীভূত পরিকল্পনার সুপারিশ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্নস্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠানে সরকার বৃহৎ অংশ গ্রহণ করবেন। এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যসরকার সমূহ ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে আরও অধিক সাহায্য পাওয়া সহজ হবে।

এই পরিকল্পনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আর একটি পরিকল্পনা আছে। সমবায় মার্কেটিং কার্য ও প্রক্রিয়া (Processing) এবং গুদামজাত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি স্থায়ীনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ওয়ার হাউসিং বোর্ড গঠন করতে হবে এবং

তাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখবেন। এক্ষেত্রেও সরকারই থাকবেন প্রধান অংশীদার।

কমিটি একটি State Bank of India নামে একটি ষ্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশও করেছেন, কারণ কমিটি মনে করেন যে কমার্শিয়াল ব্যাংকিংএ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকা উচিত। ইম্পিরিয়াল ব্যাংকিং এবং অন্তত কতিপয় ব্যাংক একত্রীভূত করে সমস্ত দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের টাকা আদান-প্রদানে সুবিধা করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু ঋণ দেবার ব্যাপারে এই ষ্টেট ব্যাংকের সাহায্যে মুক্ত বাজারের নীতি বজায় রেখে জাতীয় নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

কয়লা শিল্প কোন্ দিকে ?

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি যখন ক্রমশঃ স্থায়িত্ব ও উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, তখন কয়লা শিল্প ক্রমাগত অবনতির দিকে চলেছে বলে খুব শোনা যাচ্ছে। গত ১৩শে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ জে. ডব্লিউ. এন বাল্ডক, মাইনিং, জিওলজিক্যাল এণ্ড মেটালার্জিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক ডোজে ভাষণ প্রদান কালে কয়লা শিল্পের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৪৭ সালে কয়লার বিক্রয়মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল উৎপাদন খরচের পরিপ্রেক্ষিতে। তার কয়েক বৎসর পর কয়লার বিক্রয়মূল্য আরও নিম্নস্তরে বেঁধে দেওয়া হয়। অথচ তারপর থেকে কয়লার উৎপাদনের খরচ বেড়েই চলেছে। মজুরের খরচ বেড়েছে। তবে এ বিষয়টি বর্তমানে একটি ট্রাইবুনালের বিবেচনাধীন আছে বলে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য না করে শুধু এইটুকু বলেছেন যে, মজুরের খরচ আরও বেড়ে গেলে কয়লার মূল্যও বেড়ে যেতে বাধ্য। এ ছাড়া ষ্টোরস্, প্ল্যান্ট, এবং কল-কব্জার দামও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কয়লা বিক্রী করে খুব সামান্যই মুনাফা থাকে (অনেকে কয়লার খনি লোকসানে চালাতে বাধ্য হচ্ছে) এবং সেজন্য কয়লার উৎপাদন কমে যাচ্ছে. কয়লার খনিতে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উৎপাদন হ্রাস হবার কারণের মধ্যে সরকারের সংরক্ষণ নীতি ও অ-প্রচুর পরিবহন ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে দায়ী। মিঃ বাল্ডকের অভিযোগ ছাড়া আরও যে সব অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে কয়লা শিল্পে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। কয়লা শিল্পে উৎপাদন সরবরাহ, বিতরণ এবং মূল্য এই তিন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ আছে। শিল্পপতিগণ বলেন যে, বর্তমান অবস্থায় ঐ সব নিয়ন্ত্রণ অর্থহীন। এক কথায় শিল্পপতিগণ মনে করেন যে কয়লা শিল্প সমস্ত দিক থেকে নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং এরূপ চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প অত্যন্ত গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হবে।

কোল-কমিশনার শ্রীরামধানী অবশ্য শিল্পপতিদিগের সঙ্গে একমত নন। তিনি কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল না দেখবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখতে পান নাই। কয়লা শিল্পের বর্তমান সঙ্কটের যে ছবি তাঁরা এঁকেছেন তা অনেকাংশে অতিরঞ্জিত, তা নইলে যতদিন থেকে তারা হৈ চৈ করছেন এতদিনে তাঁদের অনেককেই ব্যবসায় গোটাবার ব্যবস্থা করতে হোত রিজার্ভ ফাণ্ড ভেঙ্গে এতদিন সমান হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকারের নীতি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কয়লা বিনিয়ন্ত্রণ করলে, দেশে মুদ্রা-স্ফীতি দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া দেশের সমস্ত অংশের প্রয়োজনানুযায়ী কয়লার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবারও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে সংরক্ষণ নীতির অবর্তমানে আমাদের সামান্য মেটালার্জিক্যাল কয়লার সঞ্চয় অত্যল্পকালমধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় বিনিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। কয়লা আমাদের গৃহকর্ম থেকে সুরু করে সমস্ত শিল্পেই আজ অপরিহার্য। কাজেই এ সম্পর্কে যে কোন নীতিই গভীর চিন্তার পর গ্রহণ করতে হবে।

প্রশান্ত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

ঘোষেদের অন্দর মহলে গায়ে-গায়ে ঘিঞ্জি গৃহ-নির্মাণের মধ্যে একদা সম্প্রীতির গলায়-গলায় ভাবটা আজো স্পষ্ট। শরিকানা ভাগ-বাঁটোয়ারার বাইরের জমি-জমার সীমানা নির্দেশ করা যত সহজ হয়েছে অন্দর-মহলের বাড়ি-ঘর ভাগ ক'রে নেওয়া বুঝি তত সহজ হয়নি। তাই আজো এক বাড়ীতে রেধে-বেড়ে-খেয়ে আর এক বাড়ীতে শুতে যেতে হয় কোন কোন অন্তঃ-পুরিকাদের—একজনের ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে দিয়ে আর একজনের আনাগোনা আইনত দোষণীয় হলেও ব্যবহারিক জীবনে আজো অচল হয়নি ঘোষবাবুদের অন্দর মহলে। এ বাড়ীর ছোটকাকী যদি বলেন তাঁর রান্না-ঘরের চৌকাঠ কেউ মাড়াবে না, তা হলে ও বাড়ীর রাঙাকাকী কালই তাঁর ভাঁড়ার ঘরের সামনের পথটায় কাঁটা বেড়া দিয়ে দেবেন—ন'কর্তার কাছে 'কমিশনের' ভাগ করে দেওয়া ছকটা এখনো আছে—পথটা যে তাঁদের ভাগেই পড়েছে!

ভাজক ভাজ্যের প্রকৃত ফল হিসেবে একঘরকে সাত ভাগ করে, যে যার অংশমত যদি পাঁচিল তুলে নেওয়া হত তা হলে তা আর বাসোপযোগী ঘর থাকতো না। তাই ভাইনে, বামে, মধ্যে বেকায়েদা দাবাবোড়ের মত অন্দর মহলের ঘরগুলো সুবিধে মত ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে। এক জনকে ডিঙিয়ে একজনকে মাড়িয়ে আর একজনকে ছুঁয়ে দিনে পঞ্চাশবার যাতায়াত করতে হয়। দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশা যেমন দিবারাত্র, আড়াআড়িও তেমনি অষ্টপ্রহর। এর ঘরে গরম কড়ার ছ্যাঁক শব্দ ওর কানে যেমন সহ্য হয় না, আবার ওর ঘরের মৃদু আলাপ এর ঘরে বিস্ফোরণের মত মনে হয়। মেলামেশা আছে, বিচ্ছেদ আছে; সন্দেহ আছে, বিশ্বাস আছে। আবার সামান্য কারণে উত্তেজনাও আছে—এতটুকু সর-নড় নিয়ে অকারণে তুমুল কলহ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ভাঁড়ার ঘরের পিছনে মাধুরী এসে চুপটি ক'রে দাঁড়াল। ইদানিং পথটা প্রায় অব্যবহৃত। ঝি-চাকরও বড় একটা এ পথটা দিয়ে হাটে না। আড়ি করার মত সোজা পথ ঘুরে গেছে। কেউ বাধা দেয়নি, তবু পথ থমকে দাঁড়িয়ে কি ভেবে বেঁকে গেছে—ঐ নোনাতলার ইটের বন ভেদ ক'রে শিউলিকাকাদের খিড়কীর মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে। হঠাৎ সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে চলার কি মানে হয়? কি ভেবেছে পথচারী কে জানে!

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে মাধুরী মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। ফুলকাকীমার ওখান থেকে পথ পরিবর্তনের প্রয়োচনা আসেনি তো? ওঁরা ডেকে ডেকে জনে-জনে বলেননি তো?—সুবিধা হলেও কেউ আর ও পথ মাড়িয়ো না, ওঁরা লোক ভাল নয়!

কিন্তু ফুলকাকীমা—

না, না তাঁর মুখ দিয়ে কখন অমনধারা কথা বেরোবে তাঁর কি দায় পড়েছে লোকের পথ ঠিক করবার! লোকেদের বজ্জাতি—বড়বাবু খেয়ে ফেলবেন!

পায়ে বুঝি কাঁটাই ফুটলো একটা! পথটা বুনো নটের ঝোপে আচ্ছন্ন। না-চলা পথে এমনি আরো কত আবর্জনা আছে।

সাবধানে পা ফেলে মাধুরী এগিয়ে এল। সুবোধ কাকার বাড়ির উঠোনের ওপর এসে দাঁড়াল। বাড়ীটা চারদিক থেকে ফাঁকা। বেড়া-বেড়, পাঁচিল বলে কিছু নেই, চারিদিক থেকে যেমন-তেমন পথ রান্নাঘরটার কাছে

দিয়ে ওটা শাকিয়ে উঠছে। সৈন্যদের বালাম-কোঠাটা ভীষণ বেহাক্কে।

চারদিক আশ্চর্য নিস্তব্ধ। একটা কাক পর্যন্ত ডাকছে না। কাকার ছেলে-মেয়েগুলোর সাড়া শব্দ, পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ কেমন একটা দুর্যোগের পূর্বাভাসের মত মনে হয়। ফুলকাকীমা কি বুঝতে পেরে কোথাও চলে গেছেন?

কিন্তু কি এমন দুর্যোগ যার জন্যে অন্তরমহলে তাঁর এত ভাবনা! মাঠের জমি মাঠে পড়ে আছে? এ বছর চাষ হবে না—তাতে অন্তঃপুরিকাদের ভাবনার কি আছে? আর কাকাই তো সব করাচ্ছেন—খাজনা কমাতে বলছেন!

কে জানে এতে কাকার কি সুবিধা হবে! তাঁরা যা আছে বরং তাতে তাঁরই বেশী অসুবিধা। চাষ না হলে সবারই অসুবিধা!

যেন রাত দুপুরে শত্রু শিবিরে গোয়েন্দাগিরি ক'রতে এসেছে মাধুরী—যেন শত্রুপক্ষের গোপন মন্ত্রণা গোপনে সংগ্রহের ভার নিয়েছে সে। রবাপতির চর, ঘৃণ্য গোয়েন্দা।

উঠানের একধারে দাঁড়িয়ে মাধুরী সাড়া করলে। কোন সাড়া ফিরে এল না, কেবল রান্নাবাড়ির ওধার থেকে অস্পষ্ট একটা আলাপ শুনতে পেল। ফুলকাকীমা আর কে যেন কথা কইছেন।

মাধুরী পা টিপে টিপে সরে এল কোপের নীচে, উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে আলাপটা।

ভিতরের লোকটি বলছে, আসল বাধা হলেন ঐ লোকটি—ঐ আপনার শ্বশুর। ওরা তো ছোঁক ছোঁক করছে, কেবল উনি মাঝখানে আছেন—নইলে এ্যাদ্দিনে কবে সাফ হয়ে যেত!

ফুলকাকীমা কিছু বললেন। না বোধ হয় চারে চিনি দেখাচ্ছেন—কাপের পেয়ালায় চামচে নাড়ার শব্দ হচ্ছে টুং টুং ক'রে।

ভিতরের লোকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, ডাক্তারবাবু একটু 'উইকনেস' আছে, না হলে আমি যা বলেছিলুম—ডিসেন্ট এ্যাকশান···বোঝাবুঝির কিছু নেই, লাঙল আমার জমিও আমার! হয় এই নাও, নয় জমি আমরা জোর ক'রে দখল করবো। জমমত সেই মত তৈরী করতে হবে!

ফুলকাকীমা এবার কি যেন বললেন স্পষ্ট শোনা গেল

লোকটি তেমনি উত্তেজিত, জমমত যখন আমার পক্ষে তখন ভয়টা কি? সবাই রাজী লাঙল নিয়ে মাঠে নামতে—

ফুলকাকীমা বললেন, রাজী থাকলে কি হবে, মাটি পাথর হ'য়ে আছে—লাঙলের ফলা ভেঙে যাবে! তোমার ডাক্তারবাবু আগার সবদিক ভেবে কাজ করেন—

না না, ঠাট্টা নয়। এই একটা সুযোগ! কিছু না—কেবল ভয় দেখান—

এখনো মগের মুল্লুক হয়নি! ইংরেজের চেয়ে এঁরা কম কড়া নয়! শাসন-ব্যবস্থা এতটুকু শিথিল করেননি।

নাঃ, আপনিও বৌদি এদের মত। মনে নেই সে-সব কথা—

কি সব কথা? ফুলকাকীমা প্রশ্ন ক'রলেন।

তেলেঙ্গানায় কি হ'চ্ছে? হুঁ, পুলিশ-পাহারা! চায়ের কাপটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখার শব্দ হ'লো—মাটির মেজে না হ'লে বুঝি ভেঙেই যেত কাপটা।

ফুলকাকীমা কোন কথা বললেন না। ব্যাপারটা মাধুরীও বুঝলে না। তেলেঙ্গানা, পুলিশ মানে কি?

খানিক থেমে ভিতরের লোকটি বললে, আমি আপনাকে বলতে পারি ঐ বুড়ো যদি না থাকতো তা হ'লে এত কাণ্ডই হতো না। ওর-ই জেদে এসব হচ্ছে! ওবাড়ীর কালীবাবুর সঙ্গে আমার কথা হ'য়েছে—

ফুলকাকীমা প্রশ্ন ক'রলেন, তিনি কি বললেন?

লোকটি হেসে উঠলো: একটা ব্যবস্থা করে' দিন! আপনি বললেই হ'বে—

ফুলকাকীমা কৌতুক করলেন, তোমাকে তা হ'লে

সবাই চেনে বল! কই, তোমার দাদার কাছে তো কেউ আসে না! তুমি বলচো দাদার জন্যে সব লোকসান হ'য়ে যাচ্ছে? হঠাৎ বড় গম্ভীর শোনাল ফুলকাকীমার কণ্ঠস্বর: তোমার দাদা চিরকালই অমনি!

ব্যস্ত হ'য়ে লোকটি বললে, না না, কি বলচেন!... দাদার সম্বন্ধে কোন হীন ধারণা নিয়ে একথা বলিনি। তিনি যা ভাল বুঝচেন করচেন—উদ্দেশ্য আমাদের এক, পথও এক, যাত্রা সুরু করা নিয়েই হয়তো কিছু মত-বিরোধ হ'চ্ছে, ও কিছু না। আপনি রাগ করলেন নাকি?

না, এতে রাগ করবার কি আছে! তা ছাড়া তোমাদের ব্যাপার আমরা কি বুঝি ভাই। বাইরে তোমরা কি ক'রবে না ক'রবে সে তোমরাই বোঝ।

লোকটির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের জন্যে ভিতরটা নীরব হ'য়ে রইল। বাইরে মাদুরী পা ঘসে ইতস্তত ক'রতে লাগল! পা ভুলে এগোতেই লোকটির গলা পাওয়া গেল আবার।

কই কিছু চাপালেন না উনুনে? আঁচটা মরে গেল যে!

ফুলকাকীমা চুপ্ করে' রইলেন বোধ হয়।

লোকটি জিজ্ঞেস ক'রলে, রান্না হ'বে না আজ?

হেসে ফুলকাকীমা বললেন, কেন, ভয় হ'চ্ছে?

না, তাই ভাবছি! বৌদি রান্নাবাড়া ছেড়ে দিলেন নাকি!

পারলে বেঁচে যেতুম। রোজ রোজ আর ভাল লাগে না—রাধ আর খাও, খাও আর রাধ! বেশ আছ ভাই তোমরা!

আপনিও লেগে পড়ুন আমাদের কাজে! কি, অমন ক'রে তাকালেন যে বড়! আমাদের পার্টিতে কত মেয়ে কর্মী আছে জানেন!

কত?

শতকরা বিশজন তো নিশ্চয়ই।

কি করেন তাঁরা?

অনেক কিছু! বেশী ভাগ তাদের দিয়েই হয়!

সবাই কি আমার মত রাধা-খাওয়ার মেয়ে!

কি বললেন! রাধা-খাওয়া, আপিস-আদালত পর্যন্ত করছে তারা!

সংসার ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা ভেসে পড়েছে?

তার মানে? কি বলছেন!

সংসারে আশ্রয় নেই বলে বাইরে আশ্রয় খুঁজছে! কি কাজ করে তারা বলুন?

ঠাট্টা করচেন বৌদি?

ঠাট্টা নয়, ভাবছি কেমন মেয়ে তাঁরা! আমি তাঁদের মত হ'তে পারবো কিনা! দুটো চিন্তা কি ক'রে এক করা যায়!

যাই বলুন দাদার কাজে আপনারও দায়িত্ব আছে—আপনারও কিছু করা উচিত।

কি করবো, মিটিং? চৌদ্দপুরুষের গুণ কীর্তন! সেটা কি খুব ভাল কাজ হ'বে ভাই!

লীলাদিকে তো আপনি দেখেছেন? প্রথম প্রথম তিনি আপনার মত বলতেন, এখন দেখুন তিনি কেমন কাজ ক'রচেন! কত নাম!...

ফুলকাকীমা হাসলেন, নামে দরকার নেই ভাই, এখন খেতে পারলে বাঁচি! আর ভাল লাগে না রোজ দুটি বেলা এমনি ক'রে হা-পিত্যেস হ'য়ে বসে থাকতে!

লোকটির যেন খেয়াল হ'লো, কি ব্যাপার! বুঝেছি, আমি আসচি...আপনি বসুন।

ফুলকাকীমা পিছন থেকে মানা ক'রলেন, ভিক্ষের অন্ন ঘোষ বংশের বৌরা স্বামী-পুত্রের মুখে ধরে না! আমাকে বলে যাও কোথায় যাচ্ছো? আর কেন যাচ্ছো?

ততক্ষণে লোকটি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মাদুরীকে সামনে একলা-একলা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাদুরী তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে দাবার ওপর উঠে এল। কিছু যেন কুণ্ঠা প্রকাশ পেল তার ব্যবহারে।

জলবন্ধু কেন যে নিজের মনে হাসলে সেই জানে। এই গ্রামে আসার পর এই বাড়ির অনেক সংবাদের সঙ্গে এই মেয়েটির সংবাদও সে রেখেছিল। এক নজরে চেনা

যায় এমনি মেয়েই ইনি—নাম না জানলেও বুঝেছে, ইনিই সেই।

হঠাৎ সামনে ফুলকাকীমাকে দেখে মাধুরী যেন ভেঙে পড়ল।

ধরা গলায় বললে, এই নাও কাকীমা, বৈরিগী বহুলের খাজনা,—দু'সন! দাদু পাঠিয়ে দিলেন!

ফুলকাকীমা হাত বাড়ালেন না। বললেন, ওতো আমাদের না। তুমি নিয়ে যাও, ঠাকুরকে আমার প্রণাম দিও!

কিন্তু—টাকাটা হাতের ওপর কাঁপতে লাগল।

কিন্তু কিছু নেই মা, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। নিজের যোগ্যতায় যা পাওয়া যায় না, অনুগ্রহে তা পাবার আশা নিজেকেই ছোট করা—তোমার কাকা তাই বলেন! ফুলকাকীমা বললেন।

কিন্তু বৈরিগীমহল একা আমাদের নয়! দাদুর উদ্দেশ্য তা নয়! মাধুরী কাঁপতে লাগল।

যাই হোক তোমার কাকাকে জিজ্ঞেস না করে এটাকা নিতে পারি না। নিজেরা খাজনা দেব না, অথচ প্রজাদের কাছ থেকে ষোল আনা আদায় করবো, এ হ'তে পারে না।

কি হ'তে পারে আর কি হ'তে পারে না, তার জন্যে দাদু আমাকে আপনার কাছে পাঠাননি। যা হওয়া উচিত, তাই ভেবেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা, না-করা আপনার অভিরুচি। বেশ রুক্ষ কণ্ঠেই মাধুরী জবাব দিলে।

ফুলকাকীমা বুঝি একটু থতমত খেয়ে যান মুহূর্তের জন্যে। বললেন, তিনি যা ভাল বুঝেছেন করেছেন, সে নিয়ে তো কোন অভিযোগ করিনি। আবার এখন তিনি যদি ফিরিয়ে দেন আমাদের গ্রহণ করার মুখ কোথায়? হাত তোলা বরাদ্দ বেশী দিন চলে না। আমাদের ভুল বুঝো না! তবু জানবো, নেই বলে আমরা চাচ্ছি না—নেই অথচ পাব, এটা ঠিক নয়।

তা হ'লে দাদুকে আপনি অপমানই করতে চান? হাতটা কঠিনভাবে মুঠো করে' মাধুরী পিছন ফেরে. বেশ!

ফুলকাকীমা শিউরে ওঠেন, কি বলছো! ছি, ছি. তিনি নমস্য, এতে তাঁকে অপমানের কি হ'লো! ছি. ছি—

নমস্য কেন হ'বেন, বুড়ো হাড় বজ্জাত!···আপনাদের সর্বনাশ করবার জন্যে বেঁচে আছেন। তাঁর জন্যেই বহু বিরোধ গ্রামের লোকের সঙ্গে, না হ'লে এ্যাদ্দিনে কাকা চাষাভুষোর হাতে স্বর্গ এনে দিতেন।

মাধুরী আর দাঁড়ায় না।

একটা উত্তরের জন্যে জগদীশ মুখিয়ে উঠতে সরে এসে ইন্দুমতী বাধা দিয়ে বললে, থাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। ও যদি ভুল শুনে থাকে আমরা কি করতে পারি?

জগদীশ পিছন ফিরতে ইন্দুমতী বললে, কোথায় চললে? আমি বলছি, ও চেষ্টা তুমি কখনো করো না। সম্মানের কথা ছেড়ে দিলেও এতে তোমাদেরই কাজের ক্ষতি হ'বে। এতখানি বেলা হ'লো ওঁর নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, তোমাকে ভাবতে হ'বে না ভাই। এস বরং আর এক কাপ চা খাও।

জগদীশ বললে, ফিরে এসে খাওয়া যাবে। ও-পাড়ায় আমার একটু কাজ আছে, সেরে আসি।

ইন্দুমতী কঠিন স্বরে বললে, কিন্তু যা বললুম যেন মনে থাকে। তুমি এদের নেতা হতে পার, কিন্তু আমরা এ গাঁয়ের জমিদার!

নীচু সুরে জগদীশ বললে, নিষেধ করে ভাল ক'রলেন না! আমিও তো আপনাদের একজন, আমার দায়িত্ব কম নয়।

যাক হ'য়েছে!—যাও সেরে এস। চা তৈরী থাকবে।

জগদীশ কি ভেবে ফিরে বললে, যিনি এসেছিলেন উনি রমাপতিবাবুর নাতনী না?

হ্যাঁ, আমার শ্বশুর-বি।

খুব তেজ আছে!

হেসে ইন্দুমতী বললে, বংশটা দেখতে হ'বে! উদয়পুরের ঘোষ! এক সময় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো!

আপনাকে দেখেও কিছুটা মালুম হয়। সেই বংশের বৌ আপনি! অতগুলো টাকা হাতের কাছে পেয়েও ত্যাগ করলেন—অথচ ধরতে গেলে টাকাগুলো আপনারই! জগদীশ বললে।

আমার নয়, তাই ত্যাগ করলুম। মেয়েটা নেহাৎ ভালবাসে বলে' দেবার জন্যে ছুটে এসেছিল। ইন্দুমতী বললে।

ভালবাসার মর্যাদা তো খুব রাখলেন। নিলেই পারতেন। জগদীশ বললে।

নিলেই বরং মর্যাদাটা ক্ষুণ্ণ করা হ'তো। যে ভালবাসা কেনা যায় তাকে কেউ মর্যাদা দেয় না। ইন্দুমতী রান্না-ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

জগদীশ খানিক চুপ করে উন্মুক্ত উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। এ ইন্দুমতীকে চেনে না। কালী-প্রসাদকে দিয়ে এবংশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার প্রকৃত পরিচয় এখনো সে জানতে পারেনি। ঘুঘু-খোবড়ান অবস্থা এখনো হয়নি। মূলে আঘাত না ক'রলে পড়বে না।

[ক্রমশঃ]

আবহাওয়া

দিবাকর

'মর্নিং শোস্ দি ডে!"

প্রকৃষ্ট রূপেই কবিত—সকালই দিনকে

'প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ হেরিনু—'

আজও সেই সকাল হ'লেও সেই দিন আর হয় না, বা সেই দিনে আর সেই সকালের কথা মনে পড়ায় না। সুতরাং কার্য-কারণের একটা সঠিক সম্বন্ধ অনুসন্ধানের আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। দরকার হয় বিশেষরূপে জানার। কেবল কাব্যে নয় বিজ্ঞানে মেঘ-বাতাস-জল বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। রামগিরির গিরিশৃঙ্গ ছেড়ে বঙ্গোপ-সাগরের বায়ুর চাপের আধিক্যের ওপর আবহাওয়া-বিদ্‌রা বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কলকাতায় হঠাৎ বৃষ্টি নামলে বঙ্গোপসাগরের 'ডিপ্রেশনকেই' দায়ী করা হয়।

'মর্নিং শোস্ দি ডে!'

হাওয়া আপিস থেকে অনেক হুসিয়ারী দেখা যায় দিনের মাঝখানেই বানচাল হ'য়ে যায়। যদি বলা হয়, আজ দিনটা চকচকে ঝকঝকে তকতকে থাকবে তা হ'লে বিশেষ করে' সকাল থেকেই দেখা যাবে আকাশ ঘসা কাচের মত হ'য়ে মুখ গোমড়া করেছে। রক্ষা সবদিন বিপরীতটা ঘটে না। লাখ কথার একটা কথাও খাটলে আমরা মেনে নিই—বলি বিজ্ঞান! 'সপ্তাহটা কেমন যাবের' মত আবহাওয়া বিদ্‌রা বলতে পারেন তাঁদের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সত্যি!

প্রকৃতি মানুষের চেয়ে পুরাতন। কিন্তু চিরযৌবনা, চিরনবীনা। সৃষ্টির প্রথম পর্বে যেমন ছিল আজো বোধহয় তেমনিই আছে—রূপের বিচিত্রতায় কত চেতনের সমক্ষে বিরাজমানা। বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ

তাকে এই নিত্যনতুনীকে বোঝবার চেষ্টা করছে—কখনো সেইকে আধারে প্রত্যক্ষ ক'রে খুশী হচ্ছে, কখনো বিস্ময়-ভয়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছে। নানামন্ত্রে উদাত্তকণ্ঠে তাকে তুষ্ট করবার অজুহাত খুঁজেছে। চন্দ্র-সূর্যের মত স্থির নয়, অস্থির রহস্যময়ী এই প্রকৃতি, মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঙ্গে নিগূঢ় কোনো সম্বন্ধ আছে এই প্রকৃতির। তাই বোঝাবুঝির শেষ নেই, নেই শেষ জানার আগ্রহের। কত মানুষের জন্মে, কত রাজ্যের উত্থান পতনে, প্রকৃতির কত দুর্যোগে মানুষ বারবার বলেছে, তোমায় চিনবো, তোমায় জানব—জ্ঞান বিজ্ঞানের নিগড়ে তোমায় বাঁধবো।

হয়তো একদিন প্রকৃতির এ রহস্যের যথাযথ হ'বে বড় ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছনর মত সকালের কাগজে বিজ্ঞাপিত হ'বে আবহাওয়ার সঠিক সংবাদটা—কতখানি নীল, কতখানি সাদা, কতখানি কালো থাকবে আকাশটা সারাদিন, কত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়বে সারা বছরে, মেঘ-রৌদ্রের খেলা কতদিন চলবে কোন্ কোন্ স্থানে। সর্বোপরি সভ্য মানুষের ব্যক্তিগত রাশি ফলের সঙ্গে বলে দেওয়া যাবে প্রকৃতির খেয়াল খুশীর ফলটাও!

• •

আজ মানুষের সব ব্যাপারেই এই ভবিষ্যবাণীর এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। বর্তমানের কার্য-কলাপ অপেক্ষা মানুষের চেতনা-বুদ্ধি আজ ভবিষ্যতের দিকে মুখ করে' গবাযাত্রা করে' আছে। জানিনা অদূরভবিষ্যতে সকল সভ্য-শিক্ষিত মানুষের ভাবনা-কামনা এবং কর্মের একটা ব্যবহারিক ছক আবহাওয়া আপিসের মত রাষ্ট্রদপ্তর থেকে উদ্ভূত হ'য়ে আকাশ-বাণীতে দৈনিক সংবাদের সঙ্গে প্রচারিত হবে কি না! হ'লে বোধ হয় এই বাঙালী জাতটার ভাল হয়। অনেক হাঁপাহাঁপি, ছোটাছুটির হাত থেকে রেহাই পায়। খোঁড়-খেঁজুরে পুনার জ্বরপনের কলঙ্কের জন্যে আর মুখ লুকতে হবে না।

তারও পর উল্টো যদি কিছু করে বসে মানুষ রাষ্ট্রনায়করা জানবেন, প্রভাতের মেঘডম্বরে দিবসের সূর্যও কখনো কল্‌কায় না! তাঁদের সম্বন্ধে কোন 'প্রফিসি ডেজারোস' হলেও তাঁদের শাসিত মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী স্বতঃই গ্রাহ্য।

এবং যথাযথ পালনে শুভ ফল দায়ক!

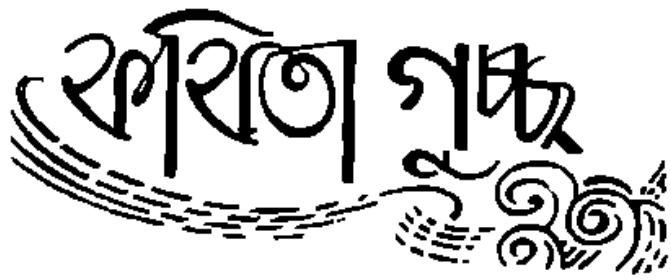

এখানে

প্রভাকর মাঝি

আকাশ নয়, আলোক নয়, তারার ঝিকিমিকি,
মস্ত বড় পৃথিবীটা কোথায় গেছে উবে।
সবুজটুকু নেইকো জেগে নরম কচি ঘাসে,
কঠিন মাটী—শিকারী ব্যাধ রয়েছে ওৎ পেতে।
তুবড়ো গাল—রসনা বেয়ে কেবল লালা ঝরে,
সারাটা দেহে সারাটা মনে হিংস্রতার ছাপ।
ফিসফিসিয়ে টুকরো কথা বাতাসে সুর তোলে,
মোমের মত মনটি বাধা পেয়েছে কংক্রিটে।

যে মন আছা, জানলা দিয়ে একটু নীল দেখে
পাখীর গানে, ফুলের ঘ্রাণে নিজেরে ভুলে যায়।
সে মন নেই, হৃদয় নেই, আবেগ থরোথরো—
হিসেবী এক কষছে শুধু আঁকের পরে আঁক।
নরম হাত, ফুলকো গাল, শিশির-ভেজা সুর
এখানে নয়—রুটির তরে হেথায় বাঁটোয়ারা।
বাইরে এক জগৎ আছে সে কথা গেছি ভুলে,
সেথা কি আছে আকাশ নীল, সোনালি তারাদল?

রাতের বৃষ্টি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

রাতের বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে স্বপ্নে কারা বলে:
আমাদের বুকে বহ্নি জ্বলে।
হাইড্রোজেন-অণু আমরা, ভবিষ্যের দুর্যোগবাহন
আমাদের মনে রেখো। সর্বনাশ হ'তে দেরী নেই;
ঘনিয়েছে কালরাত্রি, অস্তিমের দারুণ দাহন
এসেছে তোমার সম্মুখেই···।
—আসন্ন সঙ্কটে
পলায়নী মনোবৃত্তি স্বপ্নেও তৎপর হ'য়ে ওঠে।

রাতের বৃষ্টির শেষে যখন ছাদের ছোট ঘরে
অফুরন্ত রোদ এসে পড়ে,
তখন কালকের কথা মনে ক'রে শুধু হাসি পায়।
ডিয়েন বিয়েন ফু-র যাই হোক, আমরা অবিচল,
যতক্ষণ গান আছে, খেলা আছে রৌদ্রে ও ছায়ায়,
ততক্ষণ অকম্প্র, অটল।
—মৃত্যু দিয়ে ঠাসা
এ ধরায় আজ অবধি মেটেনি তো প্রাণের পিপাসা।

নূতন ডাক

বিবেককুমার রায়

সেও তো কোমল কোনো কর,
সেও তো করুণ কোনো চোখ,
সেও বুঝি লজ্জা থরথর
ছিলো কোনো মধুর আলোক।

চিনতে তো তাকে কোনো ভুল
করি নাই,—তোমার যে ফুল
ধূলিতলে গিয়েছিলো প'ড়ে,
সেও নিয়েছিলো হাত ভ'রে।

তবুও এসেছে আজ ডাক
সে ফুলের ডালি থাকে চেয়ে,
সংগ্রামের বাজে বুঝি শাঁখ;
বাঁশীতে গাহানা সুর চেয়ে

কি লাভ আজকে বলো আর
খুঁজে খুঁজে চেনা সে তারার
আলো যদি মেঘ এসে ঢাকে,
তবুও বিশ্বাসে চেয়ো তাকে॥

সাগরিকা রায়

অমিয়েষ সেন

অনেক দিনের পরে নির্জন রাস্তার ধারে
হাঁটিতে দেখেছি তারে
—সাগরিকা রায়, লামডিঙ্
শিলঙের পাহাড়ে পাহাড়ে
বেড়িয়েছে সে।
যখনই হয়েছে দেখা···
তীক্ষ্ণ দু'টি চোখ তুলে
বলেছেন:
"এই যে মিঃ সেন
কতদিন দেখা নাই আরে"।
সাগরিকা রায়—
কবেকার তীক্ষ্ণ মেয়ে
ভুলেছি তাহার নাম!
সেদিন দেখার পরে
ফের দু'টি চোখ তুলে
'হেসেছেন
চিনতে পারেন!"
রূপের জৌলুষে চারিদিক টলমল
—যেন হাজারো বাতির মালা।
অবাক তাকিয়ে থাকি—
"এই সাগরিকা রায়
সেই তীক্ষ্ণ ম্লান মালতীর বৃন্ত।"
জীবনের বৃন্ত ঘোরে
ঘোরে সময়ের চাকা
আজ যাহা ছিল
কাল তাহা নাই
সাগরিকা রায়—
দু'দশ বছর আরো চলে যদি যায়
তবু কী চমক দেবে তোমার চোখের ঐ বিদিক
রেখায়?

একটি খবর

সুবেন্দ্র গুহ

একটি খবর দিতে পারি।
যদি পারো আলো আলো রোদ নিয়ে তা'রি
শান্তিতে কোমল হও মৃদু সৌরভে—
এক সৌর সময়ের সবুজ স্বপ্নের ভীরু পাখিদের রবে।
একটি খবর দিতে পারি।

জানি না দেবার আছে আর কি, জানি না,
জীবনের আলো সোনা ধন শুধু শত মধু বেদনার দেনা
শোধ করে সব দিলো তার—
অন্য কোনো নেশা-রঙ, গুণ-গুণে গজমতি আয়োজন
যায় নি তো কেনা
সময়ের সঞ্চয়ে কেনা গেছে একটি খবরে অধিকার;
যদিও তোমার দাবি, জীবনের খনি খুঁড়ে হীরকের
আলোকের কারি,
একটি খবর দিতে পারি।
একটি খবর, যে-খবরে বলা যায় ভুলি নি
ভুলি নি—
একটি রাতের দানে হয়ে আছি ধন্য!
সময়ের শিয়রে তো নানা রঙ, প্রজাপতি-আলোর
সকাল
প্রায়শই গলে যায়, হাজার অশোক হয় লাল—
তবু সেই এক রাত প্রাচীন বটের মতো প্রীত ছায়া
রাখে ঘরে-ঘরে
জীবনের আলো ঘিরে, অশোকের লাল রঙ,
ভরে;—
সে-রাতে প্রথম তুমি আমার এ-হৃদয়ের উতল কেনায়
বুনোন শয্যায় এসে শুয়েছিলে কি করুণ টান,
জেগেছে প্রদীপে আলো মন্দির মায়ায়—
আর তুমি, ভীরু মেয়ে, আমার শিরার ভিড়ে স্বর্গের
মতো এসে নামো।

সে-রাত স্নেহের গেহ মেলে দেয় জীবনের সীমায়-
সীমায়;—
যদিও সময় সব মৌসুমী পাখির পাখায়
বয়ে যায়, বয়ে যাবে, জানি;
সব কথা বলা হলে যদিও হবে না বলা
শেষ কথাখানি!

সময় দেবে না প্রীতি বেশি এক রতি
যতো তাড়াতাড়ি শুরু, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি যতি
এঁকে দিতে হবে পথে, সমাপ্তির অনেক আগেই
তবুও প্রাচীন প্রেমে কথা-কলি সুর হবে প্রতিটি
বাঁকেই,
রঙচুট বাঁচা-মরা, কবিতার মনে তার অন্ধকার
অথৈ অথৈ!
একটি মন্ত্রের সুরে এ-খবর বলে যাবো, ভুলি নি,
ভুলি নি—
একটি রাতের দানে জীবনের সব আলোয় হয়ে
আছি ধন্য,
যদি পারো সুখী হও বিশ্রামে তা'রি—
একটি খবর দিতে পারি।

প্রতিবাদ

শ্রীআনন্দ

শৈলবালা বরণ করে ঘরে তুললেন তাঁর একমাত্র পুত্র নিশীথের স্ত্রী স্বপ্নাকে। এমন শুভদিনে পাছে নিশীথ কষ্ট পায় তাই কারণ থাকলেও শৈলবালা শুভকাজে সব কিছু চাপিয়ে গেলেন। আজকের এমন একটা স্মরণীয় দিনে তাঁর স্বামী শশীনাথ নেই—তাঁর চোখে জল রাখা না রাখবারই কথা। হয়ত স্বামীর অভাব উপলব্ধি করে গোপনে অশ্রুবিসর্জন করে থাকলেও পুত্রকে দিতে দেননি।

সাধারণ সচ্ছল গেরস্ত ঘরে বিয়েতে যেমন আমোদ আহ্লাদ হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হ'লো না। নিশীথের স্বর্গগত পিতার দূর সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয় ও শৈলবালার তরফ থেকেও আত্মীয় আত্মীয়া নিশীথের বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। বিয়ের পর চুকে গেলে যে যাঁর ঘরে ফিরে গেলেন শুধু রয়ে গেলেন শৈলবালার বিধবা ননদ সরলা।

গাঁয়ের ব্যাপার। মন চাইলেও স্বর্গগত স্বামীর মুখ চেয়ে তাঁর আদরের ভগিনীটিকে শৈলবালা বাইরে আপত্তি করতে পারলেন না বরং লৌকিকতা বজায় রাখতে গিয়ে বললেন, এ তো সব তোমারই ঠাকুরঝি। এবার আমার বৌমা এলেন। মাসখানেক না হয় থেকেই যাও না, ঠাকুরঝি।

পল্লীগ্রামের প্রৌঢ় বিধবাদের সাধারণতঃ স্বভাব যেমন হয়ে থাকে সরলারও স্বভাব সেই ছাঁচে ঢালা ছিল। তাই কৃত্রিম অশ্রুরাশি কিছু বর্ষণ করে জলভরা কণ্ঠে বললেন, থাকতে তো ইচ্ছে করে, বৌদি। কিন্তু তুমি তো জানোই এখানে থাকলে চারিদিকে শুধু দাদাকেই দেখি। অথচ তিনি নেই। আজ নিশীথের—

কথাটা সম্পূর্ণ না করেই সরলাবালা ডুকরে কেঁদে উঠলেন যেন এইমাত্র শশীনাথ দেহত্যাগ করলেন। গত ছাব্বিশ বছরের পুরানো স্মৃতি শৈলবালাকে যে কাঁদায় না এমন নয় তবে সরলাবালার মত ম্যাজিক করতে পারতেন না। আজ যা সরলার কাছ থেকে শৈলবালারই প্রাপ্য ছিল, সরলাকে এরূপ অমানুষিক ডুকরে কাঁদতে দেখে ও পুত্রের মঙ্গলার্থে শৈলবালা তাড়াতাড়ি ক্রন্দনরতা সরলাবালার একখানা হাত ধরে সান্ত্বনা দিলেন—ছিঃ! এ ক'দিন ভাই এমনি করে কাঁদতে নেই ঠাকুরঝি, নতুন বৌ—ক'দিন আমোদ আহ্লাদ করুক। আর আমরা যদি কাঁদি—তবে ওরা তো ছেলেমানুষ। ওদের কে দেখবে ভাই। চলো, ঘরে চলো।

ওষুধ ধরলো। অমন যে অশ্রুপ্লাবন—শৈলবালার সামান্য ওই কথাকটিতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

তাঁরা প্রৌঢ়া ও বিধবা বলে পাশের বাড়ীর নিশীথের বন্ধু শিবদাসের স্ত্রী লীলা এসেছিল নিশীথের বিবাহ ব্যাপারে সব কিছু সাহায্য করতে। তাছাড়া নিশীথের বিয়ের মূলেও নাকি ওই শিবদাসেরই ঘটকালি। গাঁয়ের বাড়ীতে শিবদাস বড় একটা থাকতো না। সারা বছর ওদের বাড়ীটা চাবি দেওয়াই পড়ে থাকতো। কেবল যে বছর ৺পূজার পালা ওদের পড়তো সেই বছরই শিবদাস গাঁয়ে আসতো। গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ওর চুকেই এসেছিল।

আজ দুছরর পর আবার স্ত্রীকে নিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। সেও ওই নিশীথের বিয়েকে উদ্দেশ করে। তাছাড়া ওদের যোগাযোগেই নিশীথের বিয়ে। বিয়ের খাটুনির হাত থেকে কিছুটা অব্যাহতি ও নিজে কিছুটা আনন্দ পাবার জন্যে সেও জোর করে তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে গ্রামে নিয়ে এসেছিল।

ফুলশয্যার ব্যাপারটা চুকে গেলে নিশীথের সঙ্গে তারাও আবার কলকাতা ফিরে যাবে—এই কথাই ঠিক ছিল।

উঠানে তুলসীমঞ্চতলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে শৈলবালা যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন দেখলেন তাঁরই পেছনে শীলা দাঁড়িয়ে। স্নেহমাখা কণ্ঠে তিনি বললেন, এসো বৌমা। তা' তোমাদের ওদিকের সব গোছ হয়ে গেছে তো?

—হ্যাঁ, মাসীমা। স্বপ্নাকে সাজিয়ে বসিয়ে এসেছি ওর ঘরে। পালঙ্কটার ওপর নতুন বিছানাটা মানিয়েছে বেশ। তবে আসল জিনিষ অর্থাৎ কিছু ফুল আর ফুলের মালাতো এখনও এসে পৌঁছল না। বলে শীলা শৈলবালার দিকে চাইল।

শীতের সন্ধ্যা। তাই দেখতে দেখতে চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। প্রদীপের আবছা আলোয় শীলার শুভ্র সুন্দর মুখখানা পুরান হলেও শৈলবালার কাছে আজ যেন নতুন মনে হলো। সত্যিই আজ এই মেয়েটি তাঁকে বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে! শৈলবালা গ্রাম্য বিধবা হলেও অন্তর তাঁর সঙ্কীর্ণ ছিল না। তাই ধীরে ধীরে শীলার চিবুক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন, স্বামী পুত্র নিয়ে বেঁচে থাকো, মা। ওর জন্যে ভেবো না। সবই যখন ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে ফুলশয্যের ফুলটাই কি বাদ যাবে মা? নিধুকে বলে রেখেছি। ও ঠিকই নিয়ে আসবে।

শৈলবালার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো সুন্দর ফুলের মালা আর একঝাঁকা টাটকা নানান রকমের তোলা ফুল নিয়ে নিধু তাদের মাঝখানে এসে অপরাধী কণ্ঠে বললো, দেরী হয়ে গেল, মা। দাদাবাবুর বিয়ে তাই বেছেগুছে ফুল তুলতেই একটু রাত হয়ে গেল।

—তা বেশ করেছিস। যা ঘরে দিয়ে আয়। শীলা মা গিয়ে সাজাবে'খন। বলে শীলার দিকে চেয়ে শৈলবালা বললেন, বৌমা। নাও তোমার জিনিষ এসে গেছে, তুমি ওদিকে যাও তাহলে। আমি ততক্ষণ এদিকের সব গোছগাছ করি।

নিধুকে নিয়ে শীলা চলে গেল নিশীথের শয্যা সাজাতে। ফুলশয্যা উপলক্ষ্যে শীলা শিবদাস ছাড়া আরও জনকয়েক স্থানীয় পরিচিত লোকেদের নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদেরই রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করতেই বোধ হয় শৈলবালা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

গ্রামের ব্যাপার। রাত্রি আটটা, সহরে এমন কিছু না হলেও গ্রামে তখন নিশুতি রাত বললেও চলে। তাই আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রিতরা যে যার খেয়ে গেল। শুধু রয়ে গিয়েছিল শীলা। স্ত্রী আচার শেষ হয়ে গেলে খাওয়া দাওয়া সেরে নতুন বৌ স্বপ্নাকে শোবার ঘরে ঠেলে দিয়ে একটু রসিকতা করে শীলাও তার বাড়ীতে চলে গেল।

শৈলবালা আর সরলাবালা অনেকক্ষণ নিজের নিজের বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিবদাস ও শীলা চলে গেলে সদর দরজা বন্ধ করে একটু তামাক টেনে নিধুও শুয়ে পড়লো।

নিশীথের ফুলশয্যা। তেমন ঘাঁটা সম্পর্কীয় কেউ না থাকায় তার ঘরের চারপাশে কোনও আড্ডিপাতার উপদ্রব ছিল না। আর থাকলেও তেমন বিশেষ সুবিধে হতো না দর্শকদের কারণ, নূতন বৌ স্বপ্না নিশীথের অপরিচিতা নয় যে সোহাগ করে তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

স্বপ্নার সঙ্গে এক কলেজে পুরো দু'বছর নিশীথ পড়েছিল, তবে স্বপ্না তার এক বছরের জুনিয়ার ছিল কলেজ জীবনেই ওদের দু'জনের পরিচয় হয় আর তা থেকেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে প্রেমে পর্যবসিত হ'য়েছিল। তারপর আই, এ পাশ করে বি, এ পড়তে পড়তেই স্বপ্না আধিক কারণে কলেজ ছেড়ে নিশীথেরা দিন গুণতো। তাদের প্রেম বোধ হয় সত্যিই খাঁটি ছিল তাই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভালোভাবে বি, এ পা

করে নিশীথ চাকরী পেয়ে বন্ধু শিবদাসের সহযোগিতায় সে প্রেমকে পরিপূর্ণ করতে পারলো।

অতএব বর ও বধূ দু'জনকার কাছে ছিল পরিচিত—নিতান্ত আপনভাবেই। তাই কথার মালা না গেঁথে মৃদুভাবেই নিশীথ তার স্ত্রী স্বপ্নাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সংগোপনে শুধু বললো, আমি সুখী হ'য়েছি তোমায় পেয়ে, স্বপ্না। আর তুমি?

স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ রেখে স্বপ্না কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, আমিও।

পরের দিন গোপনে স্বপ্নাকে ছোট্ট একটা সোহাগ করা চুম্বন দিয়ে আর প্রকাশ্যে মা ও পিসিমাকে প্রণাম করে সকাল ৯টার লোকালে নিশীথ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। সঙ্গে তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীও গেল। যাবার সময় স্বপ্নাকে আগামী সপ্তাহে শনিবার রাত্রে আসবার আশ্বাস দিয়েছিল নিশীথ।

বেশ আনন্দেই পনেরটা দিন কেটে গেল। মাঝে একবার নিশীথ এসেছিল তার স্বপ্না, মা ও পিসীমাকে দেখে যেতে। কলকাতায় নেসে তার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয় মনে করে কর্তব্যের খাতিরে শৈলবালা বারকয়েক পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন বৌমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। অন্তরে ইচ্ছে থাকলেও মা যদি দুঃখ পান এই ভয়ে সে বাইরে যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল। আড়ালে স্বপ্নাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখিয়ে নিশীথ কেটে পড়েছিল তার পুরান কর্মস্থলে।

সেদিন সকালের দিকে বাইরের বারান্দায় বসে স্বপ্না বসে বসে বমি করছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাই লক্ষ্য করলেন শৈলবালা আর সরলাবালা। আজ ক'দিন ধরে স্বপ্নার আহারেও রুচি কমে গিয়েছিল তাও শাশুড়ী দুজনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু মাত্র দিন পনেরর মধ্যে যে স্বপ্না পুত্রবতী হয়ে বমি করতে পারে তা' তাঁদের কল্পনাতীত ছিল। ওকে বমি করতে দেখে শৈলবালা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ বৌমা, শরীর কি তোমার খারাপ?

মুখটা ঘুরে ফেলে স্বপ্না বললো, না। তেমন কিছু নয়। এই একটু—। লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেল। "এই একটু" কী তা' শৈলবালা সরলাবালাও বেশ বুঝতে পারলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আনন্দের পরিবর্তে ওঁদের চোখে মুখে ফুটে ওঠলো একটা দুঃখের ছায়া। বুদ্ধিমতী শৈলবালা সেটা বাইরে প্রকাশ না করলেও সরলাবালা কিন্তু একটু জোরেই বলে উঠলেন, ঘেন্না বৌদি, ঘেন্না! আমি তখনই বলেছিলাম একে সহরে তার আবার কলেজে পড়া—ওর কি কিছুর ঠিক আছে? আমার নাম সরলা—আমি বলে রাখছি বৌএর ভরা দু'মাস! মাগো, কী ঘেন্নার কথা!

তারপর স্বর্গগত শশীনাথকে উদ্দেশ্য করে সরলাবালা কেঁদে চেঁচিয়ে উঠলেন, ও দাদাগো, তুমি কোথায়? তোমার ঘরে আজ এসব কী ঘেন্নার কথা!

সরলাবালার চীৎকারের বহর দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণে শৈলবালা ভবিষ্যৎ কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বললেন, "লক্ষ্মীটি ঠাকুরঝি! তুমি চুপ করো'খন। পরে যাহয় করা যাবে।

উপস্থিত চুপ করে সরলাবালা বললেন, আমি না হয় থামলাম। কিন্তু পাঁয়ের মুখ কি চাপা দেওয়া অত সহজ হ'বে বৌদি? দেখো পাড়াশুদ্ধ লোক জানতে পারবে।

স্বপ্নার বর্তমান অবস্থাটা চিন্তা করে শৈলবালা মনে মনে শিউরে উঠলেন। কিছুক্ষণ উঠানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, চলো ঠাকুরঝি পুকুরে ছুটো ডুব দিয়ে আসি। কথা শেষ করে গামছা নিয়ে ওঁরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন পুকুরের পথে।

ঘর থেকে স্বপ্না সব শুনতে পেয়েছিল। কারণ সত্যি হলেও সেতো ভগবানের কাছে আর সত্যিই দোষী নয় তার পবিত্র দেহের মধ্যে ভাবী সন্তান তো তার স্বামী নিশীথেরই দেওয়া উপহার—একথা লজ্জার মাথা খেয়ে শাশুড়িকে বলতে হবে? না, না, না, তা সে পারবে না। একথা নিশীথেরই স্বীকার করে ওঁদের জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। নয়ত ভবিষ্যতে শাশুড়ী দুজনের অকথ্য গঞ্জনা শুনতে শুনতে বিবাহিত জীবনটা হয়ত

তার তিক্ত হয়ে উঠবে···হয়তো নিজেকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ..না:···আর সে ভাবতে পারে না। দুর্বল শরীরটাকে বিছানার ওপর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে ঝিমোতে লাগলো স্বপ্না।

দেখতে দেখতে মাস দুই চলে গেল। সরলাবালার কথাই ঠিক হলো। গাঁয়ের প্রতিবেশীরা বিশেষ করে বৌ-ঝি-বিধবারা স্বপ্নার অবস্থা জানতে পেরে নাক সেঁটকাল, ছড়া বাঁধলো আবার টিকা টিপ্পনিও কাটলো। প্রতিবেশিনীদের স্বপ্না সব কিছুই সহ্য করতে পারতো কিন্তু আপন শাশুড়ী যখন তাকে ইদানীং দুরছাই করতেন তখন তার অসহ্য হয়ে পড়তো। তবুও ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে চুপ করে সে দিন গুনতো।

মধ্যে নিশীথ এসে স্বপ্নার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে স্নেহমাখা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তাতে কি? আমি তো জানি সন্তান আমার, স্বপ্না!

অভিমানে নিশীথের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বপ্না বলেছিল, কিন্তু ওঁরা তো জানেন না। কেন? তুমি পুরুষ—ওঁদের কাছে সত্যিটা স্বীকার করে নেবার সৎসাহস তোমার নেই?

—সৎসাহস আমার আছে। কিন্তু ওঁরা সে যুগের মানুষ। আমার স্বীকারকে হয়ত ওঁরা কদর্থ করবেন তখন আমার দুঃখের সীমা থাকবে না, স্বপ্না।

—নাগো, আমি আর মিথ্যে গঞ্জনা সহ্য করতে পারছি না। এ অপবাদ নারীর কাছে কতবড় পীড়াদায়ক তা তুমি পুরুষ বুকেও হয়ত বুঝবে না। বলে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অঝোরে কেঁদে ছিল স্বপ্না।

স্বপ্নার কম্পিত দেহখানা নিজের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিশীথ বলেছিল, আচ্ছা যত তাড়াতাড়ি পারি তোমায় নিয়ে যাব। তার পর আলো নিভিয়ে স্বামী স্ত্রী ওরা শুয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালে নিশীথ চলে গেল তার কর্মস্থলে আর ভবিষ্যতের আশায় রঙীন কল্পনার জাল বুনে সেই গাঁয়েই পড়ে রইল।

দুঃখ...লাঞ্ছনা...গঞ্জনা সব কিছু সহ্য করে স্বপ্না দিন গুনতে থাকে। কিন্তু একমাস দুমাস চলে গেল নিশীথ আর এলো না। তার পরিবর্তে আসতে লাগলো সান্ত্বনামাখা খানকয়েক চিঠি। প্রত্যেক চিঠিতেই নিশীথ আশা দিয়েছে যে কলকাতায় বাসা ঠিক হলেই স্বপ্নাকে নিয়ে আসবে। তাই প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়ী গিয়ে নিছি নিছি পয়সা নষ্ট না করে বরং তার জমানো উচিত। কেননা সামনে তাদের কত খরচ। নতুন অতিথি···নতুন সংসার···নতুন কত কি? তার জন্যে চাই প্রচুর টাকা। তাই সে প্রত্যেক রবিবার বাড়ী না গিয়ে ঠিক সময়ই একদিন গিয়ে স্বপ্নাকে কলকাতায় তার কাছে নিয়ে আসবে।

কিন্তু স্বপ্না যে গাঁয়ের বাড়ীতে কত অসহায় তা কি নিশীথ জানে? এদিকে তার ঘরে একদণ্ড থাকাই বর্তমানে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে তাকে লক্ষ্য করে মন্তব্যবর্ষণ হলেও তার অবর্তমানেই করতেন শৈলবালা আর সরলাবালা। বর্তমানে শৈলবালা সামনা সামনি তেমন কিছু স্বপ্নাকে না বললেও সরলাবালা বলতে ছাড়তো না। তবুও ব্যাচারী স্বপ্না সে সবই সহ্য করত শুধু নিশীথ ও তার ভাবী সন্তানের মুখ চেয়ে।

সেদিন উনুনে কী যেন কী চাপিয়ে শৈলবালা ও সরলাবালা কোথায় যেন গিয়েছিলেন। এদিকে তরকারিটা পুড়ে চাই হয়ে যাবার উপক্রম করতে ছুটে স্বপ্না সেটাকে নাবিয়ে রাখে। অবশ্য স্বপ্নার ওই অবস্থাটা এসে দৃষ্টিগোচর হতেই তার ওপর সরলাবালার কঠিন নির্দেশ ছিল ভবিষ্যতে তাদের কোন খাবারদাবারে স্বপ্না যেন হাত না দেয়।

কিন্তু তরকারীটা পুড়ে নষ্ট হয়ে গেলে পাছে তাঁরা খেতে না পারেন এই ভয়ে সব কিছু নিষেধ ভুলে তরকারীটা উনুন থেকে নামিয়ে ঘরে যাবার জন্যে সবেমাত্র স্বপ্না পা বাড়িয়েছে এমন সময় সরলাবালা ও শৈলবালা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। স্বপ্নাকে নাহান কড়াটার সামনে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সরলাবালা ফেটে পড়লেন, লজ্জা করে না? নিজের জাতধর্ম তো সব পুড়িয়ে খেয়েছ আবার আমাদেরটাও না খেয়ে ছাড়বে না?

প্রতিবাদ স্বপ্না করতে পারতো কিন্তু নিশীথ তাকে লিখিয়েছিল গুরুজনদের শত অপরাধেও প্রতিবাদ করতে নেই। তাই সে নিশ্চল পাষাণের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শৈলবালা গম্ভীর

কণ্ঠে বললেন, অমন সংএর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরে যাও।

সরলাবালা তাতে আরও একটু ইন্ধন যোগালেন, এত বড় একটা কলঙ্ক মেটে নিয়ে গুরুজনদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হেয়া করে না। ওমা! গলায় দড়ি জোটে না?

সীতা কেন যে মাটির ভেতর লুকিয়েছিলেন আজ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্বপ্না অন্তরে অন্তরে তা উপলব্ধি করলো। গ্রাম্য নারী—বিশেষ করে প্রৌঢ়া কুটিলা দিদিমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা জেনে বিনা প্রতিবাদে স্বপ্না সেস্থান ত্যাগ করলো।

—আ মর! মাগীর তেজ দেখো! বলে সরলাবালা চারদিকে গঙ্গাজল ছেটাতে সুরু করলেন। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করে মনে মনে শিউরে শৈলবালা ঘরের কাজে আবার মনোযোগ দিলেন।

বেলা একটু তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে এলো। দ্বিপ্রহরের খাওয়া দাওয়া সেরে সেই যে তাঁরা পাড়াবেড়াতে গিয়েছিলেন আর তখনও বাড়ী ফিরলেন অন্যদিন স্বপ্নার আবাহনটা কর্তব্যের খাতিরে বাইরের দাওয়ায় বার করে দিতেন সেদিন কিন্তু সেটুকুও করতে তাঁদের মনে বাধায় বেধে ছিল। অবশ্য সেদিন কিছু খাবার মত মনের অবস্থাও স্বপ্নার ছিল না।

সমস্ত দুপুর ধরে স্বপ্না তার ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিয়েছিল সন্ধ্যা হতেই একটা কালো চাদর জড়িয়ে চুপি চুপি সে রেলস্টেশনের পথ ধরলো। একটু পরেই রেললাইনে এসে পড়লো। দূরে একটা মেল-ট্রেনের ইঞ্জিনের বিরাট আলোটা এসে তার চোখেমুখে পড়ে ঝক্ ঝক্ করে উঠলো।

সন্ধ্যার পর শৈলবালা ও সরলাবালা বাড়ী ফিরে দেখলেন চারদিক তখনও অন্ধকার। কোথাও কোন আলো বা প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়নি। স্বপ্নার ঘরে ওকে না পেয়ে একবার বাড়ীর চারদিক খুঁজেও যখন পেলেন না তখন সরলাবালা বললেন, দাও বৌদি, চারদিকে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দাও! সব যেন অপবিত্তি হয়ে আছে। কথা শেষ করে মুখে একটা বিচিত্র শব্দ করে গঙ্গাজল আনতে তিনি চলে গেলেন ঘরে।

শৈলবালা কিন্তু সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিসের যেন আশঙ্কা করে শিউরে উঠলেন। চারদিকে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে যখন সরলাবালা শৈলবালার কাছে এসে দাঁড়ালেন তখন সদর ঠেলে 'মা' বলতে বলতে নিশীথ এসে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালো।

শৈলবালা ও সরলাবালাকে এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে নিশীথ বললো, মা! তোমরা এমন দাঁড়িয়ে কেন? চারদিক অন্ধকার—তোমার বৌ কোথায়, মা?

মুখ নীচু করে শৈলবালা নিরুত্তর রইলেন। একটু বাহাদুরী দেখাবার জন্যে সরলাবালা বললেন, বাবা সে পালিয়েছে বোধ হয়, তার আগের সোয়ামীর কাছে থাকগে, তোমার আবার—

এইবার সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো নিশীথের কাছে স্বপ্নার অন্তর্ধানের কারণ। সরলাবালাকে তখন একটা ধমকে থামিয়ে দিয়ে নিশীথ বললো, থামুন। যা' জানেন না তা' নিয়ে কথা বলবেন না।

স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ ভাইকে ভয় না করলেও তাঁর পুত্র নিশীথকে সরলাবালা কেমন যেন ভয় করতেন তাই একটা অসহায় দৃষ্টি নিয়ে শৈলবালার দিকে চাইলেন।

নিশীথ চীৎকার করে উঠলো, বুঝেছি, তোমাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হয়ত এতক্ষণ হতভাগী কিছু একটা করে বসেছে। মা, তোমরা কি ক'রেছ, মা?

তারপর গলাটাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে ব্যথিত কণ্ঠে নিশীথ আবার বললো, মা, তোমার কথায় কোন দিনই প্রতিবাদ করিনি। তাকেও আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু আজ যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে আমার নরকেও স্থান হবে না, তোমার ভুলও ভাঙবে না। আমি বলছি ভাবী সন্তান তোমার পুত্রেরই বলো, বলো, সে কোথায় এখন?

নিধু এসে জানালো, স্বপ্নাকে সে দেখে এসেছে পথের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়; বোধ হয়—রেল-লাইনের দিকে ছুটে চ'লেছিলো, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। প'ড়ে না গেলে, কে জানে হয়তো আত্মহত্যাই ক'রে বসতো।

বিজ্ঞান জগৎ

ব্লাড-প্রেসার ও তার প্রতিকার

গ. চ. ভ.

ব্লাড-প্রেসার অর্থাৎ রক্তের চাপ খুব বেশী হলে চিকিৎসকেরা কিছুকাল আগেও সিম্প্যাথেক্টমি করতেন। এই সিম্প্যাথেক্টমি অস্ত্রোপচারে তলপেট চিরে রক্তকোষ নিয়ন্ত্রক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু কেটে দেওয়া হয়। আজ প্রায় চার-পাঁচ বছর হলো হাইপারটেন্‌সন, অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপে চিকিৎসকেরা বড় একটা এ রকমের অস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত হন না। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে ওষুধ প্রয়োগের পরিবর্তে অস্ত্রপ্রয়োগে অনেকটা ভাল ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু হাইপারটেন্‌সনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগেই অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। আজকাল এমন কয়েকটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, চিকিৎসকেরা পছন্দমত তাদের যে কোন একটিকে উচ্চ রক্তচাপের রোগীর উপর ব্যবহার করে সুফল লাভ করে থাকেন। এদের কয়েকটি অতি পুরনো ওষুধ হলেও তাদের ভেষজ গুণ সম্প্রতি নতুন করে পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। বাকীগুলি নতুন আবিষ্কৃত ওষুধ—আধুনিক রাসায়নিক যাদুকরগণ কর্তৃক গবেষণাগারে তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই ওষুধ এককভাবে অথবা বিভিন্ন মাত্রায় কয়েকটির মিশ্রণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটা কথা হচ্ছে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা গুরুতর না-ও হতে পারে। কারণ সময় সময় দেখা যায়, ৩০।৪০ বছর যাবৎ উচ্চ রক্তচাপ থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ ৭০।৮০ বছর বয়স পর্যন্ত দিব্যি স্বাভাবিকভাবেই দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। এসব লোকের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপকে রোগ হিসেবে গণ্য করা যায় না। লোকের পরমায়ু যেখানে ৫৫ বছর থেকে ৬০ বছর, সেখানে যাদের বয়স ৬০ বা ৬১ পেরিয়ে গেছে তাদের উপর উচ্চ রক্তচাপের কুফলের সম্ভাবনা খুবই কম।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের রক্তচাপ-বিশেষজ্ঞ, হাইপারটেন্‌সন-সমস্যা সম্পর্কে পুনরনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষের গড়পড়তা আয়ুকাল যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, রক্তচাপের উচ্চতার মানও তদনুপাতে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। অল্প বয়স্কদের পক্ষে উচ্চ রক্তচাপ তেমন কিছু অনিষ্টকারক নয়, তবে এর ফলে আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রাদির অনিষ্ট ঘটতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্রনালী অথবা রক্ত-কোষসমূহের অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা থাকে। রক্তকোষের উপর উচ্চ চাপের ফলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, করোনারী থ্রম্বোসিস বা ইউরেমিয়া হতে পারে, এমন কি ষ্ট্রোকের ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এসব উৎপাতের কারণ না ঘটলে রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্যে আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের ওজন বৃদ্ধির ফলে ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যায়। ২৮ বছরের সুস্থ-সবল একটি লোক সিট-মেটালে কাজ করতো। এক সময়ে সে দেখলো—সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠলেই তার মাথা

হয়ে। রোজ এ রকম হতে থাকায় লোকটি ডাক্তার দেখায়। লোকটি লম্বায় ছিল ৫ফুট ৭ ইঞ্চি। শরীরের ওজন দেখা গেল, ১৮৩ পাউণ্ড এবং রক্তের চাপ ছিলো ১৯৫।১০০। চার্ট মিলিয়ে দেখা গেল, তার মত লোকের শরীরের স্বাভাবিক ওজন হওয়া উচিত ১৫৫ পাউণ্ড। রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে অবশ্য হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্রাশয় বা চোখের কোন অনিষ্ট হয় নি। স্বাস্থ্যাদি নিরীক্ষণ করে তার শরীরের ওজন যখন ১৬৯ পাউণ্ডে নেমে আসলো তখন দেখা গেল তার ব্লাডপ্রেসারও কমেছে—১১৮।৮০; অর্থাৎ তার বয়সী লোকের পক্ষে যা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে শারীরিক ওজন বৃদ্ধি ছাড়া ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধির আর কোন কারণই ছিল না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই কেবল খাদ্য নিয়ন্ত্রণে এ রকমের সুফল

সে সব ক্ষেত্রে তাদের খাদ্যবস্তুর

একাধিক প্রয়োজনীয় ওষুধ যোগ করে দেওয়া

৬১ বছর বয়স্ক আর একটি রোগীর বিবরণে দেখা যায়—ভদ্রলোক ব্লাড প্রেসারের দরুণ বিশ বছর যাবৎ নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করে আসছিলেন। ৬৪ বছর বয়সে ব্লাড প্রেসারের প্রতিকারের জন্যে তিনি অস্ত্রচিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁর বয়সের কথা বিবেচনা করে চিকিৎসক তাঁকে অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে ওষুধ ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। চিকিৎসার প্রথম অবস্থায় তাঁর মাথাধরার ব্যাপারটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর এবং ব্লাড প্রেসার ছিল ২১২।১১০; কিন্তু যেহেতু তাঁর ওজন ছিল মাত্র ১৪৫ পাউণ্ড সেহেতু ওজন কমিয়ে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওষুধ ব্যবহারের ফলে তাঁর রক্তের চাপ ক্রমশঃ কমে গিয়ে ১৫০।৯০তে দাঁড়ালো এবং ওজনও মাত্র পাঁচ পাউণ্ড কমে ১৪০ পাউণ্ড হলো। ওষুধ ব্যবহারের ফলে তাঁর মাথাধরাও একেবারে সেরে গেছে। অবসর গ্রহণ করে তিনি এখন সুখী মনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘর সহকারে নিয়মিত ওষুধ সেবনের ফলে তিনি এই গুরুতর ব্যাধির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন; অন্যথায় হয়তো অনেক আগেই তাঁকে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হতো।

ভারতবর্ষ, আমেরিকা, ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ব্লাড প্রেসার প্রতীকারক ভেষজ-উদ্ভিদাদি পাওয়া যায়। ব্লাড প্রেসারের বর্তমান ওষুধের চেয়ে আরও শক্তিশালী ভেষজ খুঁজে বের করবার জন্যে বড় বড় কতগুলি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বনে-জঙ্গলে কয়েক দল উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করেছেন। পঞ্চাশ বছরেরও আগে থেকে উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ এবং চিকিৎসকেরা জানতেন যে, সবুজ ও শ্বেত হেলেবোর (সবুজ—আমেরিকান; শ্বেত—ইউরোপীয়) গাছের নির্যাস বিশুদ্ধিকরণের পর প্রোটোভেরাট্রিন নামে একপ্রকার যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। নাড়ীর গতি হ্রাস করতে এবং রক্তের চাপ কমাতে এর ক্ষমতা খুবই অদ্ভুত। বেশীমাত্রায় এই ওষুধ সেবনে বমনোদ্রেক এবং স্বেদনির্গম হতে থাকে। ব্লাড প্রেসারের রোগীকে একটু বেশী মাত্রায় সেবন করালে সে সংজ্ঞাহীন অথবা অসাড় হয়ে পড়বে। প্রোটোভেরাট্রিনের ক্রিয়া এতই গভীর এবং অব্যবস্থিত যে, তখনকার দিনে যখন তখন এই ওষুধটি নির্ভয়ে ব্যবহার করতে কেউ ভরসা পেতেন না।

কাজেই এই ওষুধটা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হয়ে পড়লো। মাঝে মাঝে কদাচিৎ কখনও সামান্য কিছু ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশই ওষুধ-বিক্রেতার আলমারিতে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রইলো। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এই ওষুধটাই পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে বিশুদ্ধিকরণের পর নানাবাধা অবস্থায় প্রোটোভেরাট্রিন তৈরী হচ্ছে। চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী এই ওষুধ আজকাল উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় নির্বিঘ্নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উচ্চ রক্তচাপে আর একটি ওষুধও আজকাল খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্পগন্ধা বা রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা নামে এক প্রকার ভারতীয় উদ্ভিদ থেকে ওষুধটি তৈরী হয়। বহুকাল থেকেই পাশ্চাত্যচিকিৎসকেরা শুনে আসছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসকেরা রাউলফিয়ার শিকড়-চূর্ণ থেকে প্রস্তুত কাথের সাহায্যে রক্তের চাপ এবং তজ্জনিত মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণাদি উপশম করে থাকেন। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় চিকিৎসকেরা ওষুধের দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, সেহেতু পাশ্চাত্য এবং আমেরিকান চিকিৎসকেরা ভারতীয়দের উদ্ভাবিত এই রাউলফিয়া সম্বন্ধেও অনাস্থার ভাব পোষণ করতেন।

কিন্তু তাঁরা খুবই ভুল করেছিলেন।

কখনও কখনও দু-একবার রাউলফিয়া ব্যবহারের ফলে বিদেশীয় চিকিৎসকদের মনে ক্রমশঃ এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, ভারতীয় চিকিৎসকদের আবিষ্কৃত এই রাউলফিয়ার রক্তচাপ প্রশমনের সত্য সত্য একটা আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। রক্তচাপের উপর রাউলফিয়ার ক্রিয়া মন্থর গতিতে হলেও নিশ্চিত। এই ওষুধ প্রয়োগে রক্তের চাপ ধীরে ধীরে কমে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছায়। এতে নাড়ীর গতিও ধীরে ধীরে নিয়মিত হয়ে আসে। রক্তচাপে অনেকে ফেনোবার্বিট্যাল বা অন্যান্য বেদনানাশক ওষুধ ব্যবহার করে যেমন তন্দ্রালুতা বা অন্যান্য অস্বস্তি বোধ করেন, রাউলফিয়া ব্যবহারে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। আগে রাউলফিয়ার অবিশুদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হতো; এখন বিদেশীয় ওষুধ-প্রস্তুতকারকগণের চেষ্টায় রাসায়নিক উপায়ে বিশুদ্ধিকরণের পর সহস্রগুণ শক্তিশালী ওষুধ তৈরী হচ্ছে। রাউলফিয়া এখন নিঃসন্দিগ্ধভাবে একটি কার্যকরী ওষুধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্য কোন নতুন ওষুধ একে সহজে স্থানচ্যুত করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু রাসায়নিকেরা চুপ করে থাকবার পাত্র নন। আমেরিকান রাসায়নিকেরা এ বিষয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। অনেকদিন থেকেই জানা ছিল যে, টেট্রা-ইথাইল অ্যামোনিয়াম (এটামন) সংশ্লিষ্ট একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটা অবরোধের অবস্থার সৃষ্টি করে। পদার্থটা রক্তকোষের চাপ হাল্কা করে দেয়, ফলে রক্ত যেন রোগীর পায়ের দিকে নেমে আসে। এই ধারণা নিয়ে রাসায়নিকেরা হেক্সামিথাইল ডেরিভেটিভ্‌স্ (মিথিয়াম, হেক্সামেটন) তৈরী করেন। এই ওষুধ খাইয়ে দিলে অথবা ইন্‌জেকসন করলে ব্লাড প্রেসার হ্রাস পেতে থাকে। গুরুতর রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের পক্ষে আজকাল মিথিয়াম ও হেক্সামেটন খুবই সুফলপ্রদ দেখা যাচ্ছে। তবে এ ওষুধ খুবই সাবধানে ব্যবহার করতে হয়; কারণ একটু অসতর্কভাবে প্রয়োগ করলেই রক্তের চাপ এতটা নেমে যেতে পারে যাতে রোগী মূর্চ্ছিত এবং অসাড় হয়ে পড়ে। কিন্তু রক্তের চাপ কমাবার জন্যে চিকিৎসকদের পক্ষে এটা একটা খুবই সক্রিয় ওষুধ।

আজকাল বিশেষ পরিচিত আর একটা ওষুধ হচ্ছে —হাইড্রালাজাইন (অ্যাপ্রেসোলিন)। চেল্লা ড্রাগের চেয়ে এই ওষুধটা অনেক ধীরে এবং অপেক্ষাকৃত কম ক্রিয়া করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একটু বেড়ে যায় বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে রেসারপিন ট্যাবলেট ব্যবহার করলে সেসব অসুবিধা দেখা দেয় না।

অনেক ক্ষেত্রেই অজানা কারণে রক্তের চাপ বর্ধিত হয়ে থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, ইনফ্ল্যামেটরি প্যারালিসিস, ব্রেইন টিউমার বা নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগের সঙ্গে রক্তের চাপ বাড়তে দেখা যায়। সময় সময় কিডনির উপরকার ছোট্ট অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডটি কতকগুলি কারণে শরীরের চাহিদার চেয়েও বেশী অ্যাড্রিন্যালিন ক্ষরণ করতে থাকে। এর ফলে মাথাধরা, রক্তচাপ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, স্বেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে। এরূপ ব্যাপার অবশ্য খুব কমই ঘটে। এরূপ অবস্থায় অতিরিক্ত অ্যাড্রিন্যাল তন্তুগুলিকে অস্ত্রোপচারে দূরীভূত করলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে।

তবে আজকাল এ ধরণের রোগীকে হাসপাতালে রেখে প্রথমে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ডাইবেনেমাইন ও বেনোডিয়েইন ওষুধ-দুটি শিরার মধ্যে ইন্‌জেকসন করে দেওয়া হয়—তখন খুব সাবধানে থাকতে হয়; কারণ অনেক সময় গুরুতর প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; সম্প্রতি রেজিটিন নামে আর একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ওষুধটি মাংসপেশীতে 'ইন্‌জেক্ট' করে দেওয়া হয়। টেষ্ট, পজিটিভ হলে অন্যান্য ব্যবস্থা বা অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে।

* * * *

মোটের উপর, সাধারণ ব্লাড প্রেসারের জন্যে কয়েকটি সহজ নিয়ম পালন করলেই অনেকটা সুস্থভাবে থাকা যায়। সর্বদা শান্ত এবং ঠাণ্ডা থাকবার চেষ্টা করা উচিত। শরীরের ওজন যাতে স্বাভাবিক থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিমিত মাত্রায় নুন এবং মসলা ব্যবহার করা দরকার এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। কেবল এই কয়টি বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই অনেক ব্লাড প্রেসারের রোগী সুস্থ এবং দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হয়েছেন।

পুস্তক পরিচয়

উত্তর বসন্ত : শ্রীমৃণালকান্তি
কবিতাভবন : দেড় টাকা
প্রাপ্তিস্থান : সিগনেট বুকশপ ও 'মন্মথ' কার্যালয়॥

"হারানো স্মরণ যৌবন-রাঙা পাখি,
কোনো ফাল্গুনে আবার আসবে নাকি
ফেলবে মনের মাটিতে কোমল ছায়া,
শোনাবে পালক ঝরবে দু'একখানি ?
এখানে রইল নীলের নিমন্ত্রণ,
উত্তর মেঘ, অরুণা-হাতছানি।

(উত্তর মেঘ—৮)

উত্তর যৌবনের এই কোমল বেদনা গভীর প্রেম-ময়তায় মিশে এক অন্তরঙ্গ ললিত সুর হয়ে ছেয়ে আছে শ্রীমৃণালকান্তির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরবসন্তে'র কবিতাগুচ্ছ। 'আকাশ' এবং 'দিগন্ত' কাব্যগ্রন্থে হৃদয়ের নির্জনতায় প্রেম ও প্রকৃতির যে লীলার প্রথম প্রকাশ 'উত্তরবসন্তে' তাই হয়েছে আরো স্নিগ্ধ, সবুজ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ।

প্রেম—শুধু প্রেম কেন, যে কোনো বোধ ;—যেখানে একান্ত অনুভূতিসঞ্জাত হৃদয় সেখানে পরিপূর্ণ, সুনিবিড়াক। ভালোবাসার গভীর সুর অনুভূতিলব্ধ হলেই মনকে ছুঁয়ে যেতে পারে। তাই শ্রীমৃণালকান্তির কবিতা স্বল্পায়তন হলেও মনকে স্পর্শ করতে, আন্দোলিত করতে সক্ষম।

"হে অনন্তা, স্বপ্নতনু আকাশ-দুহিতা !
আমার অনল-তীর্থে দুঃখদীপে
একা-একা জ্বালো দীপান্বিতা।"

(উত্তর মেঘ—১৩)

এই মিতভাষণ শ্রীমৃণালকান্তির দুর্লভ গুণে পরিণত হয়েছে। যে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের জন্যে প্রত্যেকেরই সাধনা, এমন কি যুক্তবন্ধতা কিংবা পৌনঃপুনিকতার মূল্যেও যা না কি অনেকে অর্জন করে থাকেন। স্বল্প-কথায় বর্ণাঢ্য ছবি এঁকে—যে ছবির রঙের প্রয়োগ প্রতিবেশী চীন এবং জাপানের প্রাচীন কবিতার সহজ শুভ্রতার কথা স্মরণে এনে দেয়—এবং অগ্রগতির সহজ নিয়মে 'উত্তরবসন্তে' এসে শ্রীমৃণালকান্তি সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রবতারার নিকটবর্তী হয়েছেন।

'উত্তরবসন্তের' কবিতাগুচ্ছে ইতস্তত: অন্বেষণেও মাধুর্যমণ্ডিত অনেক নয়নলোভন খণ্ড ছবি দৃষ্টিগোচর হবে। উদাও শাদা মেঘ, স্তিমিত ফুলের স্বপ্ন, নির্জন নক্ষত্র, ঘাসফুলের কড়িং আর গাছের পাতায় আলো-ছায়ার কম্পনের ছবি যাতে রয়েছে খানিক সময়ের জন্যে বিশ্রামের উদার আহ্বান। আর সবশেষে পূর্ণ একদিনের বিশ্রামের অবকাশ।

"তোমার ম্লান মুখ
নীল চোখ,
এক মধুর দিনের
অলস ছবি।"

(মেঘলা দিন)

যে ভালবাসা নিরন্তর হৃদয়ের নদীতে ঢেউ তোলে যে ভালোবাসা ব্যাকুল সুদূর-প্রিয়তার জন্যে স্মরণীয় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হয়তো বা মতদ্বৈধতার অবকাশ দিয়েই—শ্রীমৃণালকান্তি তাঁর কবিতার সুরের সঙ্গে 'উত্তরবসন্তে'র প্রারম্ভে বার্গসর ঐশী প্রেমবাচক উক্তি যুক্ত করেছেন ; কিন্তু তাঁর সেই সুদূর-প্রেমে বেদনা যদি কোথাও ফুল হয়ে ফোটে, তবে সে ফুলের সৌরভটুকু ছেড়ে অন্যত্র মনোনিবেশ না করলেও মনে হয় সমালোচকের ত্রুটি হবেনা।

"প্রেমের তো মৃত্যু নেই,
আমারও হবে না অবসান—
এই ব্যথা, বিষণ্ণতা হবে স্বপ্ন
রৌদ্র, ফুল, গান।

(প্রেম)

তাঁর প্রেমের উৎস সম্পর্কে উৎসাহের কথা ছেড়ে দিলেও যদি এই ধনিষ্ঠ আন্তরিক আলাপন প্রিয় বা মনে হয়, তবে 'উত্তরবসন্ত' তৃপ্ত হবার মত কবিতাগুচ্ছে সঙ্কলন একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

স্নেহাকর ভট্টা

এবারের কংগ্রেস

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নূতন রকমের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। পূর্বে যে কোন রকমে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল সকল দলের প্রধান কর্মসূচী। অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন হ'ল কর্মসূচী বদলাবার, অথচ, সহসা নূতন কর্মসূচী নিয়ে এগোনো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'ল না। কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করলো, কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে শাসন ও গঠনের দায়িত্ব নিতে হ'লো। অন্যান্য দল স্বনভার লড়াইয়ে কিছুদিন মেতে উঠলো, তারপর কেউবা ঝিমিয়ে পড়লো, কেউ অন্তর্বিরোধে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। কংগ্রেসীদেরও আদর্শচ্যুতি একেবারে ঘটেনি এমন নয়, তবু মোটের উপর কংগ্রেস এখনও ভালোভাবে টিকে আছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনে যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে।

নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর

কংগ্রেসের এক অংশ রাষ্ট্রচালনার ভার হাতে নিয়েছে, আর এক অংশ নীতি-নির্ধারণ ও গঠনকার্যে ব্যাপৃত। এ ব্যবস্থার একটা সুফল এই যে, সাধারণ-কংগ্রেস প্রয়োজনমত রাষ্ট্রশক্তিকে কতকটা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

এবারের কংগ্রেস বসছে মাদ্রাজে—'আবাদী'তে। অধিবেশনস্থলের নাম দেওয়া হয়েছে সত্যমূর্তি নগর। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীযুক্ত ধেবর। বাইরের উল্লেখযোগ্য দর্শকদের মধ্যে থাকবেন কাশ্মীরের যুবরাজ করণসিং, পাকিস্তানের হাইকমিশনার জনাব গজনফর আলি খান এবং সম্ভবতঃ যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো।

এ অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হচ্ছে, সমাজতন্ত্রী নীতিকে কংগ্রেসের আদর্শ বলে ঘোষণা করা। কংগ্রেস সরকার ইতিপূর্বে ভারতকে কল্যাণ-রাষ্ট্র ব'লে অভিহিত করেছেন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকাতে শ্রেণীগত অর্থ বৈষম্য কমিয়ে আনবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন। বিলম্ব না ঘটিয়ে ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সফল করে তোলাই ভারত সরকারের উদ্দেশ্য ভারতীয় কংগ্রেসের এ প্রস্তাব স্পষ্টভাষায় সে প্রতিশ্রুতি

জাতির অর্থনৈতিক প্রগতি, ভারতে বিদেশী অধিকার সম্পূর্ণ বিলোপের আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ভারতের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণভাবে করেও প্রস্তাব উত্থাপিত হবে বলে জানা গিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য পূর্ণ আশানুরূপ না হলেও কোন দিকেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের দেশ কোন পথে কতটা এগিয়েছে বা এগোচ্ছে তার খবর না রেখে যাঁরা নিন্দায় মুখর হতে ভালবাসেন, তাঁদের দ্বারা যে দেশের কাজ ভালোভাবে হচ্ছে তা নয়, বস্তুত অহেতুক বিরোধিতা বন্ধ রেখে সমবেত ভাবে চেষ্টা করলে আমাদের

উন্নতি দ্রুততর হতে পারতো। কংগ্রেস বিরোধী অধিকাংশ দল যে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে এবং কংগ্রেস যে সাম্প্রতিক সংকট নিজ সমালোচনার কুয়াশা থেকে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করছে, তার কারণ অন্যান্য দল গঠনমূলক কর্মে নিজেদের সার্থকতা প্রমাণ করতে পারেনি আর কংগ্রেস

অবশ্য তা বলে কংগ্রেসীরা আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকলে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের এবং দেশের ক্ষতি করবেন। তাঁদের ভিতরে যে সকল দুর্বলতা রয়েছে সেগুলি দূর করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হতে হবে। প্রভুত্বস্পৃহা, পক্ষপাতিত্ব, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থান্বেষিতা প্রভৃতির ফলে প্রতিষ্ঠানের কোন কোন অংশ প্রায় বিকল। কয়েকজন সুযোগ্য নেতা এবং নিষ্ঠাবান কর্মীর কর্মক্ষমতাই এর খ্যাতি বাঁচিয়ে রেখেছে। জনচিত্তের সঙ্গে যোগরক্ষা

নূতন কর্মী সংগ্রহ, যুব মনে কাজের আগ্রহ সঞ্চার ও তরুণ সমাজকে উপযুক্তরূপে পরিচালনা—এসব ব্যাপারে কংগ্রেস আজ সম্পূর্ণ উদাসীন। ত্যাগ এবং সেবার আদর্শও হয়তো তার চোখে আজ কতকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। শৈথিল্য, অবসাদ বা আত্মবিচারে অক্ষমতা দেখা দিলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্ভব হয় না।

ভূদান

হায়দারাবাদ কংগ্রেসে আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের প্রশংসা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এবারেও কংগ্রেস এ আন্দোলনের সমর্থন করবে।

আচার্যজী দু'বৎসরে ৩৮ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করেছেন। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। জমিদারি-উচ্ছেদ-আইন সেই কারণেই বিভিন্ন রাজ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। বিনোবাজীর ভূদান এবিষয়ে সহায়তা করবে।

উগ্রপন্থী রাজনীতিকেরা জোর ক'রে ধনীর হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরীবকে বিলিয়ে দিতে চান। গান্ধীজী নৈতিক পন্থায় সাম্য আনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। বিনোবাজী তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ। যদি বিনা জবরদস্তিতে কাজ হয়, তবে জবরদস্তির সার্থকতা কোথায়? পুরোপুরি না হ'লেও যতদূর হয়, তাই বা তুচ্ছ কিসে?

একালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব আমাদের চিন্তা-রাজ্য অধিকার ক'রে রয়েছে। মনের উন্নতি বাদ দিয়ে বাইরের উন্নতি অর্থহীন, একথা আমরা ভুলতে বসেছি। এমন কি, আপাত-কার্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোন উপায় অবলম্বনে আমাদের আপত্তি নেই। কেউ কেউ স্পষ্টতঃই হিংসার প্রয়োজনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু হৃদয়ে ছুরি শানিয়ে ভাত-কাপড় পেয়েই কি মানুষ সার্থকতা লাভ করবে? মানব-সমাজে যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃত্রিমতা ও হিংস্রতা পুঞ্জীভূত হয়েছে, তার নিরাকরণের জন্য আজ সম্ভবতঃ মানসিক বা নৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন ঘটেছে। বহু মনীষী এ প্রয়োজন অনুভব ক'রেছেন। তাঁদের বাণী ও কর্ম হয়তো আগামী বিপ্লবের পূর্বাভাস।

সর্বোদয়

ভূদান সর্বোদয় আন্দোলনের অঙ্গ। সকলের একসঙ্গে উদয় হোক, উন্নতি হোক, এই কামনাই সর্বোদয়ের মূল প্রেরণা। এদিক্ থেকে সাম্যবাদের সঙ্গে তার পুরোপুরি মিল। তবে সর্বোদয়ের কার্য-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য আছে। ব্যক্তি ও পল্লী যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হ'তে চেষ্টা করবে, সর্বোদয় কর্মী এই চা'ন। প্রাচুর্যের সুখে নয়, প্রয়োজন সিদ্ধির সুখে সবাই সুখী হোক্, প্রকৃতির সঙ্গে, মাটির সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে চলুক স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকুক—এই তার আদর্শ। যক্ষপুরীর জাল আবরণের অন্তরালে থেকে যক্ষরাজ খনির তলের সোনা লুঠতে লোক পাঠিয়েছেন, আকাশের সোনা আর মাটি সোনা তার কি চোখে প'ড়বে?

এপথে পূর্ণসিদ্ধি আসুক না আসুক পল্লীর মানুষে কাছে যারা আপন হ'য়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারছেন, বেশ ভূষায়, চলাফেরায়, শ্রেণীবৈষম্যের চিহ্নকে বর্জন করেছে এবং সেবায় সততায়, ত্যাগে নিষ্ঠায় আমাদের সামা

একটি মহৎ আদর্শকে রক্ষা ক'রে চলেছেন, তাঁরা শ্রদ্ধেয় এবং অনেক বিষয়ে অনুসরণযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী একদিন সমগ্র ভারতীয় যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইদানিং এসমাজে যে চাপল্য দেখা দিয়েছে, তা দেশকে নানাভাবে দুর্বল ক'রে ফেলছে। নৈতিক পুনর্জাগরণে স্বামীজীর বাণী এবং জীবন আজও প্রেরণা জাগাতে পারে।

তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য,—ধর্মকে তিনি সংসার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি; সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অধিকার স্বীকার করেছিলেন। জনসেবাকে তিনি ধর্মসাধনার প্রধান সোপানরূপে নির্দেশ করেছিলেন এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মগঠন ছাড়া কোন ধর্ম হ'তে পারে না, একথাও বলেছিলেন।

নবীন ভারত যদি তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে বর্তমানের জড়তা ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

পাকিস্তান-প্রসঙ্গ

পাকিস্তানের ঘন ঘন রাজনৈতিক পরিবর্তন কৌতূহলজনক। জনমতে নির্বাচিত পূর্ববঙ্গীয় মন্ত্রিসভার অপসারণ আকস্মিক; গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ কর্তৃক পাকিস্তান সংবিধান-সভা ভেঙে দেওয়া ততোধিক অতর্কিত। প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলি নিজেও পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

সম্প্রতি সুরাবর্দি-সাহেব বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। সীমান্তপ্রদেশের ডাঃ খানসাহেবও নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের অন্যতম। পূর্ববঙ্গের গভর্নর ইস্কন্দর মির্জা কিছুকাল পূর্বে বলেছিলেন, ভারতে ফিরে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। এখন আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তা হবেনা। পূর্ববঙ্গের পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল, বোধহয় মন্ত্রিত্বপদ তাঁকে আর দেওয়া হবেনা। নূতন ক'রে নির্বাচন হবে শোনা যাচ্ছে।

ভারতের জাতীয় দিবসে পাক-গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ সরলবলে দিল্লীতে আসছেন মনে হয় পাকিস্তান সরকার পুরাতন নীতির ব্যর্থতা ক্রমশ বুঝতে পারছেন।

এজেন্ট ও ইকিষ্ট আবশ্যক

আমাদের জনপ্রিয় রেড কোর্ড ব্র্যাণ্ড জুতা, স্যাণ্ডেল, চপ্পল ও চামড়ার তৈয়ারী দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ বিনামূল্যে উপহারসহ উত্তম বেতন এবং কমিশনে এজেণ্ট ও ইকিষ্ট আবশ্যক।

বিনামূল্যে পুস্তিকা ও ১৯৫৫ সালের ক্যালেণ্ডারের জন্য লিখুন।

JOHN WHITE INDUSTRIES

Near Delhi Cloth Mills Chowk

DELHI

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

ফোন : ব্যাঙ্ক ৫৩৮৯

দি

বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স লিঃ

৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এজেন্সী

ও সংগঠন অফিস আছে

মাদ্রাজ অফিস—৪৩-বি, পেকেও গার্ডেন বিচ

যুক্তপ্রদেশ—৬২, লীডার রোড, এলাহাবাদ-৩

আসাম অফিস—নওগাঁ, আসাম

পূর্ণিয়া অফিস—ভাট্টা বাজার, পূর্ণিয়া

হাওড়া অফিস—২২, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া

Kirit Advertising Agency

Representative of:

FAMOUS NEWS PAPER & MAGAZINE

72 HINDUSTHAN PARK

BALLYGUNJ, CALCUTTA.

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২ প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কার্তিকে। অন্য কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কার্তিক থেকে বৎসর সুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেবেন। 'মন্দিরা' প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের রিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

যথাসম্ভব নকুন আনান ব্যবহার করবেন। নকল রেখে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অনালোচিত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা কেরৎ পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার: মাসিক:

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৫০৲

অর্ধ পৃষ্ঠা—২৮৲

সিকি পৃষ্ঠা—১৬৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা তজ্জন্য দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত সত্বর সম্ভব ব্লক ফেরৎ দেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

ম্যানেজার—'মন্দিরা'

৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ফোন:—বি. বি. ২৬৬০

—বাংলার বিপ্লববুগের অপূর্ব ইতিহাস—

"বিপ্লবের পদচিহ্ন"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

আজই একখানা কিনে পড়ুন এবং ঘরে ঘরে পড়বার সুযোগ দিন। বইখানা আপনার গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে থাকবে।

—বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

বস্তুতঃ বইখানি পড়তে পড়তে শুধু ভূপেন্দ্রকুমারকে নয়, সমগ্র বিপ্লবীদলকে পাওয়া যায় যারা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং খর্বতা সত্ত্বেও মহৎ। তাদের কর্মসাধনা, তাদের চিন্তাধারা যেন মাটির গভীরে সমগ্র জাতির তপস্যা,—মুক্তির জন্যে, এবং তারও চেয়ে বড়, আলোর জন্যে। এরই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের পরিচয় থাকা শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্য।

(তরুণের স্বপ্ন)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

.....শাসকশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিবরণ কারাগারের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে স্থিত মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মার পরাজয় স্বীকার না করবার অপূর্ব চিত্র।.....প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই বইয়ে ভূপেনবাবু শুধু নিজের কথাই বলেন নাই সহকর্মীদের কথা, পুলিশ কর্মচারী জেল কর্মচারী, সরকারী বড় কর্মচারীদের কথা, বিভিন্ন জেলের ব্যবস্থা, অবস্থা, তা সংশোধনের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম, জেলে পড়াশোনা, আদর্শ বিচার, দলাদলি, আমোদ-প্রমোদ—সব কথাই অত্যন্ত সরলভাবে বর্ণনা করেছেন।.....

.....বই খানার ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, লিখনভঙ্গী মনোজ্ঞ ও সরস। একবার আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠা যায় না। সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটা সবল সতেজ সহৃদয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। তা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আমরা সকলকেই বইখানা পড়তে অনুরোধ করি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা—

..... "Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Ravindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengali youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. Only in the Easter Revolution in Ireland we can search for parallels of such acts of individual heroism. We should know the history of this period of Bengal. Let the world also know about them.

—Amrita Bazar Patrika—

সরস্বতী লাইব্রেরী

৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প-সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

রূপকথা ২৲

বাবিলোনীয় উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটী সরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুধীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী"—বসুমতী।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২॥০

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসহ। সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির প্রাঞ্জল ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। যদিও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে। বিষয়বস্তুতে, ভাষার সরসতায়, চিত্রে ও প্রচ্ছদপটের পারিপাট্যে পুস্তকখানি অপূর্ব ও মনোজ্ঞ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২৲

—নরেন রায়—

বাঙলার ভুলে যাওয়া যুগের এক অগ্নিময় কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত আনন্দমঠের স্থান সৈন্যদের সত্যকার ইতিহাস।

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —স্বরাজ

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২॥০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২॥০

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

সরস্বতী লাইব্রেরী ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কবি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনখানি বই :

কুটীরের গান—১৷৹

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'কাব্যপরিচয়ে' এই গ্রন্থেরই কবিতা 'রাতভিখিরী' স্থান পেয়েছিল। হেঁয়ালি নয়, মতবাদের, উদ্গীরণ নয়,—প্রকৃতি আর জীবনের বিচিত্র মাধুরী রূপ নিয়েছে কবিতাগুলিতে। পূর্ববঙ্গের খাল, বিল, নদী, বন্দরের এমন ছবি আর কোথাও নেই। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন : "কুটীরের গান যে বাংলা দেশের বর্ণনার ভরপুর, সে বাংলাদেশ আর আমাদের দেখা হবে না বলে novtalgiaর ভাব আনে। আপনি তার সৌন্দর্যকে নিজের লেখনীর ফাঁদ পেতে ধরে রেখেছেন।"

নিশান নাও—১৸০

১৯২৮-'৪৮এর মধ্যে রচিত স্বদেশী কবিতার সমষ্টি। "শেষের যে কবিতাগুলি গান্ধীজীকে নিয়ে লিখিত সেইগুলি বুকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে।—"শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

[প্রাপ্তিস্থান : **ভবানীপুর বুক বুরো**। ১৷বি, রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।]

সাহিত্য প্রবাহ—৩৲

সাহিত্যসমালোচনার অপূর্ব গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া', 'মানসী', 'রক্তকরবী', গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ইকবাল, হলি ; জাপানী কবিতা, অ্যাটন চেখভ, সিলান্‌পা—দেশ দেশান্তরের শ্রেষ্ঠসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার উদ্‌ঘাটিত। সর্বত্র প্রশংসিত।

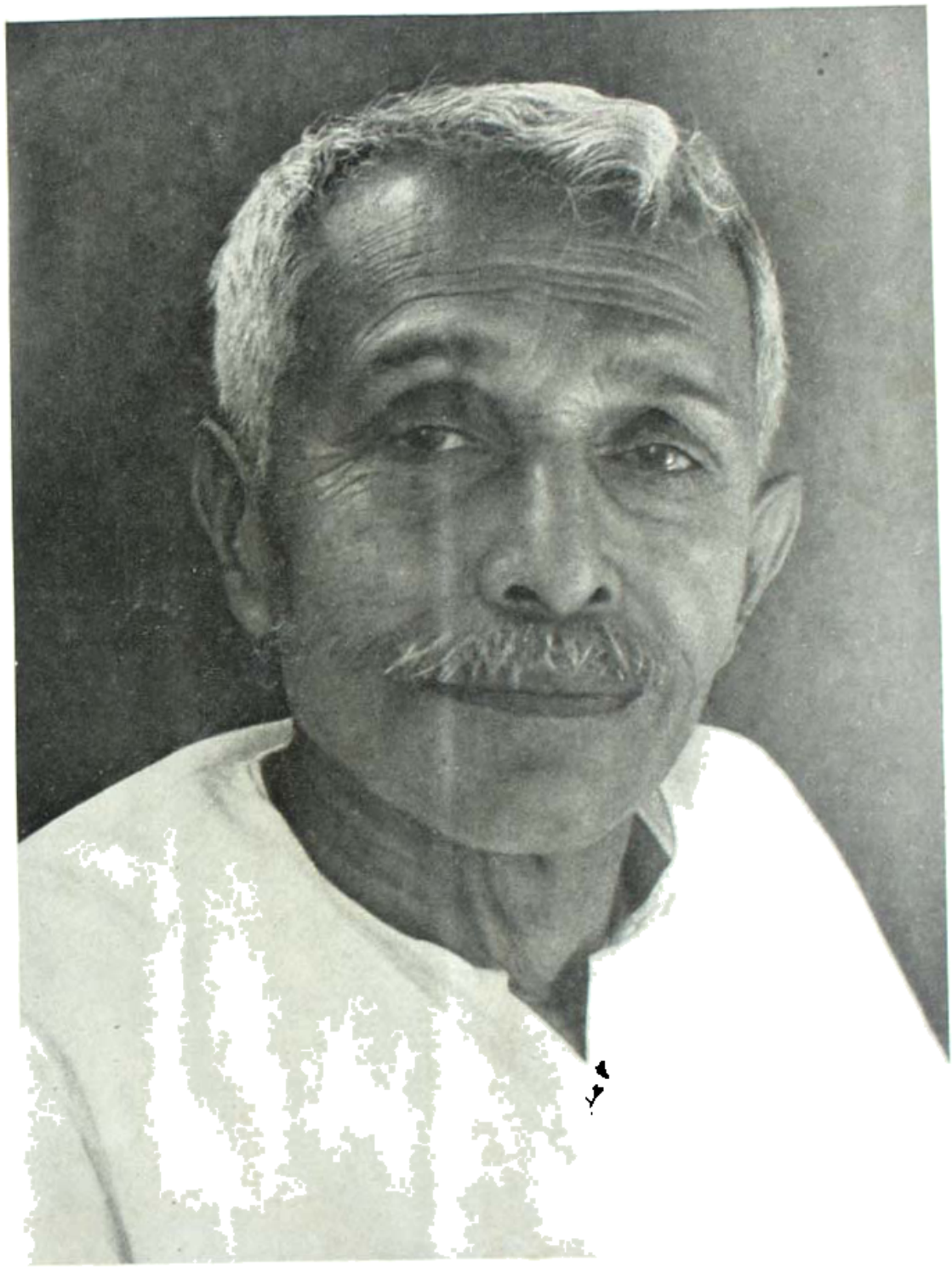

কিরণদা

মন্দিরা

সপ্তদশ বর্ষ | মাঘ—১৩৬৯ | দশম সংখ্যা

আমাদের কিরণদা

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি

কিরণদাকে প্রথম আমি দেখি অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র—৪৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, কলিকাতায়। চুপচাপ আসতেন—গায়ে একটা চাদর ঢাকা, খালি পা, মুখে শিশুর মত সরলতা মাখা। চুপিসাড়ে একটি ঘরে ঢুকতেন—সেখানে কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বসতেন। খুবই সামান্য পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতেন। নোতালায় আমাদের সমিতির অফিস, লাইব্রেরী, আলো-চনার ঘরগুলি ছিল। এটি সমগ্র বাংলার অনুশীলন সমিতির শীর্ষস্থানীয় কর্মস্থল। কয়েকবার দেখে তাঁর পায়ে আমার চোখ এঁটে গেল—মনে কৌতূহল জাগল। লোকটি কে? কেন আসেন? বেশী কারো সঙ্গে আলাপও তো করেন না। বড়দের বসবার ঘরে যান—আর ফিরে আসেন। আমরা তখন দ্বিতীয় ঘাকের সভ্য। বয়স অনুসারে সভ্যদের চারিভাগে বিভক্ত করা হ'ত। সবচেয়ে বড়রা—প্রথম শ্রেণী। তারপর যথাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী। দরদীর চোখ দেখে যায় চেনা! কিরণদার সঙ্গে মুচ্‌কে মুচ্‌কে নীরব হাসাহাসি, অর্থপূর্ণ চাওয়া-চাহি চলতে থাকল। ১৯০৮ সালে Incitement Violence (Newspapers) Act.-এ সরকারী হুকুমে হিংসাত্মক লেখাযুক্ত সংবাদপত্রের গলাটেপার ফলে বিপ্লবী কাগজ 'যুগান্তর' আইনের ফেরে এবং কানুনের চোখে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গুপ্ত 'যুগান্তরে' বাজার ছেয়ে গেল। এই ব্যাপারে কিরণদার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়। কিরণদা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অমরদা, কবিরাজ, অমরদা, (অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি এই কাজে লিপ্ত ছিলেন। এরই সংস্রবে কিরণদা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটি গুপ্ত প্রেস স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া আরো বন্ধুরা—বিশেষ করে যতীন্দ্রলোচন মিত্র, লাডলীমোহন মিত্র—এই পুণ্য কাজ করিতেন। কিরণদা এরই কিছু পূর্বে একটি যুব-মণ্ডলী স্থাপন করেন। দত্তীপাড়ায় তার প্রধান কেন্দ্র। যতীন্দ্রলোচন ঐ অঞ্চলের লোক সেও যুব-মণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিরণদা তাকে আস্তে আস্তে নিজের বিশ্বাসে এনে গুপ্ত 'যুগান্তর' প্রচার করতে অনুরোধ করেন। "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"—এই পরিচয় তখনও না থাকায় যতীন্দ্রলোচন বলল "গতিক ভাল নয়।" আমায় জানাল দুঃসংবাদ,—আমাদের পিছনে লোক লেগেছে, স্পাইটা আবার ভাঙাচোরা।" কিরণদাকে অলক্ষ্যে থেকে দেখাল, আমি বুঝলাম লোকটা

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

স্কটিশচার্চ কলেজে আই-এস-সি পড়িতে ১৯২০ সনে কলিকাতায় আসি। প্রথম তিন মাস ডাফ হষ্টেলে থাকার পর অশ্বিনীদত্ত হষ্টেলে স্থান পাই। সেখানে আসিয়াই কিরণদার সহিত পরিচয় হইল এবং তাঁহার স্নেহাশ্রয় লাভ করিলাম। প্রথম কয়েকদিন বুঝিতেই পারি নাই, তিনি অশ্বিনীদত্ত হষ্টেলের কেহ নহেন। সেখানে তাঁহার স্নেহাস্পদ কয়েকজন থাকেন, বলিয়া তিনি তাহাদের সহিত দেখা করিতে নিয়মিত আসিয়া থাকেন, ইহা জানিতে পারিয়া আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। কিরণদাকে কেন্দ্র করিয়া বিভূতি-রত্নীন-গোপাল। (লালা ও ছালদার)-সুধেন্দু-বসন্ত-উপেন্দ্র-পরিমল-(১নং ও ২নং)-বিনোদ-বিমল-সুবল-সুধাংশু-সজনীর একটি গোষ্ঠী গঠিত হইল। কিরণদা বয়সে অনেক বড় হইলেও শিশুসুলভ সরলতায় সকলের একান্ত আপন হইয়া উঠিলেন। এখন বুঝিতে পারি তরুণদের জীবনে দেশপ্রেম ও ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের গোপন উদ্দেশ্য এই একনিষ্ঠ বিপ্লববাদীর মনে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যই তাঁহাকে ভবিষ্যতে "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার" স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শুধু অশ্বিনীদত্ত হষ্টেলে নয়, কলিকাতার ছাত্র-অধ্যুষিত সকল মেসে হষ্টেলে তাঁহার নিত্য গতিবিধি ছিল। একদিন দেশের শত্রু অবাঞ্ছিত মানুষ মারিবার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন, পরে বুঝিয়াছিলাম—দেশের কলঙ্ক অবাঞ্ছিত অবাঞ্ছিতদের মানুষ করিয়া তুলিবার কাজই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কাছে একবার দাগী হইয়া তিনি নিরুপদ্রবে দেশের তরুণদের গড়িয়া তোলার কাজ করিতে পারেন নাই। ১৯০৭ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত বার বার ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন; ১৯১৫ হইতে ১৯৪৫ এই ত্রিশ বছরের মধ্যে প্রায় কুড়ি বছরই তিনি হয় জেলে, নয় দূর প্রবাসে নির্বাসিত অবস্থায় কাটাইয়াছেন। আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষীদের হাতে বার বার নিগৃহীত হওয়ার ফলে তাঁহার দেহ জখম হইয়াছিল, তাঁহার শরীরের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে তাঁহা অপেক্ষা কম মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি বহু-পূর্বেই এই অবস্থায় কাজের অযোগ্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার অসাধারণ মনের জোর একদিনের জন্যও তাঁহাকে কর্ম হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই। বিপ্লবী কিরণদার জীবনের কাহিনী অনেকে লিখিয়াছেন ও পরে বিস্তারিত হয়তো লিখিবেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বসুধৈব কুটুম্বকম্—মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধকরূপেই দেখিয়াছিলাম; সকল পরিচিত মানুষের হাসিকান্না সুখদুঃখ হর্ষবেদনা সম্পদবিপদে সমান সহানুভূতিসম্পন্ন উদারচরিত কিরণদাই আমার মন জুড়িয়া আছেন।

"বাংলাদেশের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এই এক বৈশিষ্ট্য বারংবার লক্ষিত হয়—হিংসাশ্রিত বিপ্লবকে জীবনের ধ্রুব মন্ত্র করিয়া যাঁহারা সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান যাঁহারা তাঁহারাই শেষে শান্ত ও অহিংস হইয়া বিশ্বপ্রেম ও মানবকল্যাণ সাধনার সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন; হয়তো দুই-একজনের ক্ষেত্রে পুলিশের চোখে ধুলি দেওয়াই এই ভোল বদলের গোড়ার কারণ ছিল, কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রেও চিত্তশুদ্ধি ঘটিতে বিলম্ব হয় নাই। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরালম্ব স্বামী হইয়াছেন, অরবিন্দ ঘোষ শ্রীঅরবিন্দ হইয়াছেন দেবব্রত বসু প্রজ্ঞানন্দ স্বামী হইয়াছেন, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক স্বামী ভবানন্দ হইয়াছেন, সতীশচন্দ্র সরকার নির্বাণ স্বামী হইয়াছেন, হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ হইয়াছেন। দেবব্রত বসু বা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের একনি

শিষ্য কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও কিরণদা হইয়াছেন। আজীবন ব্রহ্মচারী কিরণচন্দ্রের এই দাদা অভিধা সন্ন্যাসীর "স্বামী" অভিধারই সমপর্যায়ের। সে যুগের মহাবিপ্লবীদের এই পরিবর্তন মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ সেকালে বিপ্লবী হইতে হইলে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা গোড়াতেই চিত্তশুদ্ধির পাঠ লইতে হইত; গীতার কর্মযোগ অধ্যায় আয়ত্ত করিয়া ইঁহারা কাজে নামিতেন। কিরণদা স্বয়ং তাঁহার গুরুকে যে সকল বিশেষণ দ্বারা বন্দনা করিয়াছেন —"যিনি দেশসেবা ও জনসেবাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন, যিনি সবলতাকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ন্যায় ও ধর্মের বীর সাধক"—কিরণদা গুরুর কৃপায় নিজেও সেই সকল বিশেষণে অধিকারী হইয়াছিলেন। উপরে যাঁহাদের নাম করিলাম তাঁহাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেশপ্রেম সহজেই মানবপ্রেম তথা ঈশ্বরপ্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতা-আশ্রিত ভারতীয় বিপ্লববাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিরণদাও এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন।

কিরণদা নিজে খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন এবং বিশুদ্ধ নির্দোষ কৌতুক তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিত। আমি এই পথেই প্রথমে তাঁহার স্নেহ লাভ করি। অগিলতি হষ্টেলে একাসনী ঘরই (সিঙ্গল সীটেড্ রুম্) বেশি ছিল। প্রত্যেক ঘরেই নিজস্ব এক-একটি কুঁজার জল থাকিত। ছেলেরা প্রত্যহ কুঁজার জলবদলের ঝামেলা সহিতে প্রস্তুত ছিল না বলিয়া প্রায়শই জলে পোকা হইয়া দুর্গন্ধ বাহির হইত। সেই কুঁজাগুলি সংগ্রহ করিয়া ধ্বংস করা আমার একটি ব্যসনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। একদিন তেতলার বারান্দা হইতে সামনের উঠানে নিক্ষেপের দ্বারা জলভরা কুঁজানিধনযজ্ঞে মত্ত আছি, কিরণদার নিকট ধরা পড়িয়া গেলাম। প্রথমে শূয়োর-গরু ইত্যাদি কিরণদার প্রিয় সম্বোধনে অভিষিক্ত হইয়া কয়েক ঘা লাঠি খাইলাম। পরে কুঁজাবধের কারণ অবগত হইয়া তিনি খুব হাসিলেন এবং নিজেও দুই-একটি কুঁজা পরীক্ষান্তে নিক্ষেপের দ্বারা আমার দুষ্টামির সমর্থন করিলেন। ১৯৪৬ ১৬ই আগস্টের দাঙ্গার সময় আপার সারকুলার রোডস্থ সরস্বতী প্রেসের বারান্দা হইতে (মক্সিরা আফিস) এই কুঁজা দেখাইয়া তিনি কিভাবে একদল আক্রমণকারীকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল পূর্বের অগিলতি হষ্টেলের কুঁজাভাঙার কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের হোষ্টেলে তখন রাত্রি এগারোটায় মেন সুইচ টিপিয়া আলো বন্ধ করা হইত। অতিশয় পড়ুয়া ছেলেরা প্রত্যেকেই এক-একটি লণ্ঠন সংগ্রহ করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করিত। ইহাও আমার পছন্দসই ছিল না। একদিন লণ্ঠনগুলি পূর্বাহ্নে চুরি করিয়া সংগ্রহ করিলাম এবং ঠিক রাত্রি এগারোটার পূর্বে সেগুলি জ্বালিয়া আমাদের প্রাঙ্গণস্থিত পেয়ারা গাছের ডালে ডালে টাঙাইয়া রাখিলাম। ভাল ছেলেরা বৈদ্যুতিক আলো নিভিবার পর লণ্ঠন জ্বালিতে গিয়া হতভম্ব হইয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া আমার পেয়ারাগাছে রোশনাই-কীর্তি দেখিয়া হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। পরদিন তাহারা কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নামে নালিশ করিবে কি না পরামর্শ করিতেছে, এমন সময় কিরণদা আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন। রাত জাগিয়া লেখাপড়া করা তিনিও বরদাস্ত করিতেন না।

পরে পুরাতন 'যুগান্তরে'র ফাইল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার এই কৌতুকপ্রিয়তার আর একটি পরিচয় পাইয়াছিলাম। ১৯০৮—১৪ই ফেব্রুয়ারীর (৩রা ফাল্গুন, শনিবার ১৩১৪ সাল) 'যুগান্তরে' কিরণদা একটি কৌতুককর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, সেটি এই—

"কর্মখালি! কর্মখালি!! বিশেষ সুসংবাদ।

(বয়স বিভ্রাট)

অস্ট্রেলিয়ান কাছদায় গোঁফদাড়ি কামানোটাই নাকি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। তাহাতে বয়সের দোষ ধরে না। এখন দেখিতেছি সব উল্টো বুঝিলি রাম হইয়া গেল।

বিলাতের কিংসফোর্ড সাহেব খোঁজশূন্য যুবককে নাবালক পাতার রাখিয়া প্রিন্টারের ডিক্লারেশন নিতে চান না। কাজেই আমাদেরও বয়স বিয়াট ঘটিয়াছে। মুখুজ্যে মশাইয়ের খোঁজখাড়ি নাই কিন্তু বয়স ৪৫ হইলেও তিনি যুগান্তরের নাবালক হইতে পারিবেন না। অতএব যাঁহাদের খোঁজ আছে, বাড়ি আছে তাঁহারা তাড়াতাড়ি নমুনা ও দরিয়াপ সহ সত্বর যুগান্তরের প্রিন্টারের কাজের জন্য আবেদন করুন। আমাদের 'মানস' প্রিন্টারেরা যাঁহারা যুগান্তর অফিসে 'এপ্রেন্টিসি' করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও খোঁজাখাড়ি নাই। প্রতি সপ্তাহেই এক একজন প্রিন্টারের দরকার হইবে। সুতরাং বহু কর্মখালি আছে। সত্বর আবেদন করুন। Apply to A. B. C. D. CO. করকর্ড যুগান্তর, ৭৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।"

এই "মুখুজ্যে মহাশয়" আমাদের কিরণদা। বস্তুতঃ সেই বৎসরের মধ্যে 'যুগান্তরে'র চারজন প্রিন্টারকে পর পর গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিরণদার খোঁজখাড়ি ছিল না বলিয়া কিংসফোর্ড সাহেব তাঁহার দরখাস্ত নাবালকের দরখাস্ত বলিয়া বাতিল করিয়াছিলেন। ফলে ওই বিজ্ঞাপনের উদ্ভব।

কিরণদা যেমন কর্মী ছিলেন, তেমন ভাল লিখিতেও পারিতেন। 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' 'নবশক্তি'তে তাঁহার বহু রচনা আত্মগোপন করিয়া আছে। তাঁহার সতেজ লেখনী-প্রসূত 'কঃ পন্থাঃ' সে যুগে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। পরবর্তী যুগে দেশের তরুণদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী করিয়া তিনি 'শিবাজীগুরু রামদাস স্বামী' এবং 'চন্দ্রগুপ্তগুরু চাণক্য' লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। দুইটি গ্রন্থই বহুলপ্রচারিত। তাঁহার প্রকাশক এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিমিটেডের কাছে তাঁহার আরও দুইখানি বই এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। একখানি তিব্বতের সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত ও অন্যখানি বিসমার্ক ও জার্মান রাষ্ট্র সম্বন্ধে। দুইটি বিষয়েই তাঁহার অধ্যয়নলব্ধ গভীর জ্ঞান ছিল। বই দুইখানি অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

উপসংহারে, কিরণদা সম্পর্কে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিরজীবী, আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাহায্য ব্যতিরেকেও বাঁচিয়া থাকিবার বহু অবলম্বন তাঁহার জীবনে ছিল। ঐতিহাসিকেরা সেগুলির যথাযথ ব্যবহার করিবেন। আমাদের কিরণদা আমাদেরই একান্ত আপন জন হইয়া থাকিবেন। কাজেই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লিখিয়াছি :—

"পিতৃবিয়োগের পর এক ব্যক্তিকে উল্লাস প্রকাশ করিতে শুনা গিয়াছিল—একটা ছিল দুটো হ'ল। অর্থাৎ তামাকু সেবনে অভ্যস্ত ওই ব্যক্তির গোপনে সংগৃহীত একটি হুঁকার স্থলে প্রকাশ্যে পিতার হুঁকাটিও যুক্ত হইল। পিতৃহারার উল্লাসের অন্তরালে যে অশ্রুসিক্ত বেদনা ছিল, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিবেন। আমরাও আজ এই উল্লাস করিবার অবকাশ পাইয়াছি যে, স্বাধীনচেতা হে ষ্ট্রীট, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিবার কালে মুখের বা হাতের জলন্ত বিড়ি সিগারেট আর রাস্তা হইয়া মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিতে হইবে না, সিগারেটসেবী ভক্ত-ভাইদের আতঙ্ক কিরণদা আর লাঠি হাতে প্রত্যহ বৈকালে ওই দুইটি রাস্তায় টহল দিয়া ফিরিবেন না। এই উল্লাস যে কত বড় দুঃখের দ্যোতক কিরণদা যাঁহাদের দাদা ছিলেন না তাঁহারা বুঝিবেন না। পৃথিবীতে অনেক অনাত্মীয় মানুষ এক বা একাধিক মানুষের পরমাত্মীয় হইয়া উঠেন এইরূপ ঘটনা বিরল নহে, কিন্তু বসুধা অর্থাৎ কলিকাতার সৌচ ও যুবক সম্প্রদায়ের সত্যকার শ্রদ্ধেয় দাদা একমাত্র কিরণদাই হইতে পারিয়াছেন, সুযোর পাজী গাধা গরু দুষ্টু সম্বোধন যে কত মিষ্ট হইতে পারে, কিরণদার গালি যাঁহারা না খাইয়াছেন তাঁহারা তাহা কখনও জানিতে পারিবেন না।

কিরণদা অর্থাৎ কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা অতীত ইতিহাস আছে। তিনি মাদিবতলার সোমা ও যুগান্তর-সন্ধ্যা-নবশক্তির আমলের কর্মী। বারংবার জেল খাটিয়া-

ছেন, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, ভারতের বিপ্লববাদের গোপন রহস্যের কোন কোন চাবিকাঠি তাঁহার কাছে ছিল। এই সকল কথা যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মাঘের 'প্রবাসী'তে জংলীদার অর্থাৎ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "কিরণদা" প্রবন্ধ পড়ুন। আমরা আরও এক সত্ত কিরণদার সন্ধান পাইয়াছিলাম, যিনি শান্তি ও সংযমের অবতার, যিনি স্নেহে ও প্রেমে অদ্বিতীয়, যিনি দেশের ভবিষ্যৎ যুবক সম্প্রদায়কে মানুষ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যাঁহার স্থাপিত "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার" একটি সত্যকার আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে। আজ সেখানকার আনন্দস্বরূপ কিরণদার তিরোভাব ঘটিল, কিন্তু আমরা যদি সেখানে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন বজায় রাখার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবেই কিরণদার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হইবে।"

কিরণ দা

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

ছন্নছাড়া যাকে বলে তারই একটি চরম দৃষ্টান্ত আর কি—বাড়ী নাই, ঘর নাই, আত্মীয়-পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কিরণদার বাড়ী কোথায় ছিল, তা-ও কি বিশেষ কেউ জানে? যত্র তত্র ভোজন, সেনেট হলের বারান্দায় খবরের কাগজের পুলিন্দা শিয়রে দিয়ে ঘুমানো—যে বয়সে মানুষ কিছু করতে চেষ্টা করে, সে বয়সে এইভাবেই জীবন কেটেছে। একান্ত বৃদ্ধ আচরণে প্রকৃতিতে কতকটা শিশুর কাছাকাছি ফিরে আসে: জীবনে যে মাতা পুত্রেরও দায়িত্ব নিতে রাজী নয়, সেও একরকম ছন্নছাড়া, আর সে যুগে বাংলার কতকগুলি ছেলে মন্ত্র শিখেছিল: 'আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর?' এই মন্ত্রের সাধনা করেই কিরণদা হলেন ছন্নছাড়া।

১৯১৮ সাল। রাজসাহী জেলে প্রথম এক বন্ধুর কাছে কিরণদার একটুখানি পরিচয় শুনলাম, বললেন মেদিনীপুর জেলে আর একটি মানুষ দেখলাম, কিরণদা। অমন মানুষ হয় না। এর আগে আরও একটু পরিচয় শুনেছিলাম, তখন নাম শুনি নাই। ভারতরক্ষা আইনে প্রথম যেদিন প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রীতে ঢুকালো, আমায় ঢুকিয়ে দিয়ে জেলার চলে যাবার পর ওখানকার ইউরোপিয়ান সার্জেন এসে সমস্বরে যেন জেলের আইন-কানুন মেনে চলি; তারপর বললো, এইমাত্র আপনার এই সেল যিনি ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি বয়স্ক লোক, হাত ভাঙা, পা ভাঙা, আমরা সেই জন্যে তাঁকে একটু খাতির করে চলতাম; আর তিনি করতেন কি, সুযোগ সুবিধা পেলেই, ভালো লাগাবার এই যে ফোকরটা এর উপর উঠে দেয়াল ধরে ওর ওপর দিয়ে পাশের সেলের লোকের সঙ্গে কথা বলতেন। শুনে শ্রদ্ধা জাগলো।

১৯২০ সালের শেষাশেষি খালাস হয়ে যেদিন কলকাতায় পৌঁছলাম, ষ্টেশনে যাঁদের সঙ্গে দেখা হ'ল, তার ভিতর প্রথম পরিচয় হ'ল কিরণদার সঙ্গে। এর অল্প কিছু পরের কথা। নাগপুরে গান্ধীজির সঙ্গে, পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এবং অন্যান্য জায়গায় আরও অনেকের সঙ্গে আলোচনা ক'রে যে কার্যক্রম স্থির হয়, তার ফলে দৌলতপুর রওনা হচ্ছি একদল কর্মী নিয়ে, উদ্দেশ্য—"সত্যাশ্রম" বলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ব। খবর পেলাম, কিরণদা অসুস্থ অবস্থায় সিমলায় এক ছাড়া বাড়ীতে শুয়ে আছেন—সেখানে আর যাঁরা ছিলেন, কাজের উৎসাহে তাঁরা মফঃস্বলে চ'লে গেছেন, ওঁর দেখাশুনোর বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। গিয়ে

কিরণদা আমাদের সঙ্গে নৈলতপুরে চলুন।

কথাতেই উনি রাজী হয়ে গেলেন। তাগিস, উনি গিয়েছিলেন—তা হ'লে "সত্যাশ্রম" যা হয়েছিল, তা-ও কিছু হ'ত না; যাওয়ার অল্প পরেই কৃষ্ণলের আর চাকর হ'ল খাইসিস, জীবনের ডাক পড়লো বুলিপঙ্কে, আর আমি তো আশ্রম আর রোগীর জন্য মাকার যোগাড় আর সেবাশুশ্রূষার জন্যে বাইরে বাইরেই কাটাতাম।

কিরণদার কথা ধীরে ধীরে পরে শুনেছি, দেখেছিও অনেক কিছু। আমাদের দেশে কথায় বলে, যেমনি গুরু তেমনি চেলা। রাজনীতির ক্ষেত্রে কিরণদার দীক্ষা দেবব্রত বসুর হাতে। দেবব্রত বাবু মানিকতলা বোমার মামলায় পড়েছিলেন। পরে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে 'উদ্বোধনে' কাজ করতেন। কিরণদার মুখেই এঁর কথা শুনেছি ফেলের কোণে একখানি টুল নিয়ে বসে থাকতেন, মনের মতো লোক দেখলেই ক'রে পারেন আলাপ জমিয়ে রাজনীতির দীক্ষা দেবা করতেন। কিরণদাকে দেখেছি—যখন তিনি লাইব্রেরীতে ছিলেন—রাস্তায় চলতে চলতে দেখতেন, একটি ছেলে, মুখে বুদ্ধির আর তেজস্বিতার ছাপ, আর কোনো উপলক্ষ না পেলে জিজ্ঞেস করতেন, এখন ক'টা বেজেছে?—তারপর একটু আলাপ একটা খাতির, একটা লজেঞ্জ, তারপর শনৈঃ শনৈঃ আসেন, আমার ওখানে যাবে, বই পড়বে, মানুষ হতে হবে। অজস্র স্নেহ—তারপর কিরণদারই গোটাকতক রাহিবুলির ভাবার: 'আর'যার কোথায়?'

'মানুষ হ'তে হবে'—এই মন্ত্র মুখে নিয়ে কিরণদা শেষ জীবনে গড়লেন "প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ"। আমাদের সেকালের দীক্ষার মধ্যে ছিল, সময় আর কথা যে ঠিক না রাখবে, তাকে সহজে বিশ্বাস করবে না। কিরণদা সেকালের কোনো দীক্ষাই কোনো দিন ভোলেন নাই। ঠিক ঘড়ির কাঁটাটি ধরে পাঠগৃহের দরজা খুলতেন আর বন্ধ করতেন। চলতে চলতে একদিন মতের বিরোধ হ'ল—কিরণদা আমাদের বাসা ছেড়ে চলে এলেন। এখানেও সেই একই কথা। কিরণদা যা ধরেছেন, তার আর নড়চড় নেই। কিরণদা বলেন যে মদ তাকে ত্যাগ করতে হবে। আমরা বলি, মদ যে, সে-ও তো মানুষই। এখানেও সেই আদর্শ আর আদর্শের অভিব্যক্তির প্রশ্ন! আমরাও এককালে মদ যাকে মনে করতাম, তাকে পরিহার করেই চলতাম—তখনকার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এর একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কিরণদা যা একবার ধরেছেন, তা কখনও ছাড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না—যত দুঃখক্লেশই জীবনে আসুক না কেন।

কিরণদা আমাদের বাসা ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু আমাদেরও তিনি ছাড়তে পারেন নাই, আমরাও তাঁকে ছাড়তে পারিনি। আজ বার বার করেই মনে আসছে, কত বন্ধুকে তিনি বলেছেন, অরুণ-সুপেনের কাজই ত আমি করছি। পাকিস্তানের এক অংশ থেকে আর এক অংশে যেতে অনেক সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। কিন্তু অরুণদা ক'লকাতায় পৌঁছেই একবার আর ক'লকাতা ছাড়বার আগে অন্ততঃ আর একবার কিরণদার সঙ্গে দেখা করেছেন। সর্বদা তাঁর খোঁজ-খবর করেছেন। আজ কথাটাকে গোপন করতে আটকাচ্ছে, তাই স্বীকার করছি, কিরণদা ইদানীং যে কাজ করতেন, অনেক সময় সংশয় হ'ত এক উষর ভূমির চাষ করছেন। মানুষ হবার গোড়ার কথা দায়িত্ব নেওয়া। তা নেবার মতো ছেলে কি কিরণদা এ যুগে পাবেন? ভুল ভাঙলো শেষ ক'দিনে হাসপাতালে ওখানে ওঁকে দেখতে ত আমরা অনেকেই যেতাম কিন্তু সত্যিকার দায়িত্ব নিয়ে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে কিরণদার সেবাযত্ন ও করেছে 'পাঠগৃহে'র ছেলেরাই। কিরণদার শেষ ক'দিনের অসহ্য যন্ত্রণার সামনে ওদের ভারাক্রান্ত মুখ দেখে অনেক সময় নিজের দুর্বলতা ঢাকতে আমায় সরে যেতে হয়েছে!

দেখে দেখে মনে হয়েছে, কিরণদার যে আদর্শের বিবর্তন হয়নি এবং হয়তো হবার কখনও প্রয়োজন হবে না—তার বীজ তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও ছড়িয়ে গেছেন:

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥

কিরণদার স্মৃতি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

কিরণদা সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এমন ভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলাম—যে তাঁকে আলাদা ক'রে দেখা ও বিচার করা সহজ নয়। বার বার তাগিদ আসছে—'মন্ত্রিরা'র বিশেষ সংখ্যার জন্য কিছু লিখতে হবে। যখনই লেখার কথা মনে করি—তখনই একটা আড়ষ্টতা আসে। বহু বছর পূর্বে যৌবনের প্রারম্ভে পড়েছিলাম—দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু. তাঁর মৃত্যুর পর সবাই আশা করেছিল—বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গ-দর্শনে দীনবন্ধু সম্বন্ধে অনেক কথা থাকবে। কিন্তু মাত্র ২।৪ লাইনে দীনবন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ বঙ্গ-দর্শনে বের হয়েছিল। কারণ তাঁদের অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কিছুই লিখতে পারলেন না। কিন্তু কিরণদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে তার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল। জেলে ও বাইরে বহু বছর একসঙ্গে বাস করেছি; এক সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর কাজ ও আমার কাজ—এর মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না বহু বছর ধ'রে।

তবুও কিছু লিখতে হবে। ১৯১৬ সালে মেদিনীপুর জেলে কিরণদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখনও তিনি একটি রহস্যময় লোক; কোন সুনির্দিষ্ট উপদলের (Group) সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ ছিল না। সেটা হ'ল—অত্যন্ত সতর্কতার যুগ; চারিদিকে কেবল শত্রুর জাল অনেকে দেখত। ঐ জেলের প্রায়-অন্ধকার ২৫টি খুপরিতে (Cell) আমরা ২৫জন ছিলাম। তার মধ্যে ২।৪ জন ছিলেন—যাঁরা নিজেদের ছায়াকেও বিশ্বাস করতেন না; ছায়া দেখেও হয়ত তাঁরা আঁতকে উঠতেন—পুলিশের গুপ্তচর মনে ক'রে। কেউ কারোর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে ভরসা পেতেন না। পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা সরকারী নিয়মেও আটকাত, আমাদের মনের বাধাও তাতে কম ছিল না। এই অবস্থায় কিরণদার সঙ্গে দেখা। তিনি ছিলেন আবার অতিরিক্ত সতর্ক। বৃদ্ধ অবিনাশ চক্রবর্তী ছাড়া আর কারও সঙ্গে তিনি মন খুলে কথা বলতেন না। এর মধ্যে আমরা জনকয়েক তরুণ ছিলাম—সরকারী বিধান, মনের বিধা ও রাজনৈতিক বাধা—সব অতিক্রম ক'রে চলতাম। যার সঙ্গে ভাল লাগত—তার সঙ্গেই প্রাণ খুলে মিশতাম—সর্বপ্রকার আলোচনা করতাম। প্রবীণরা সাবধান ক'রে দিতেন; আবার একদল হয়ত আমাদের ঐ প্রাণখোলা মেলা-মেশাকে হিংসার চোখে দেখতেন এবং পিছনে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করতেন। জানি না কেন কিরণদা আমাকে দু'এক দিন সাবধান ক'রে দিলেন। প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর কথা উল্লেখ ক'রেই তিনি আমায় সাবধান করলেন। মেদিনীপুরে তাঁর সঙ্গে আর বিশেষ পরিচয় হ'ল না। কিন্তু এটা বুঝলাম তিনি আমায় স্নেহ করেন। সে হ'ল ১৯১৬ সালের কথা।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সন্ত সবাই ধরা পড়েছি। ভবিষ্যৎ কি জানি;—হয়ত যাবজ্জীবন ঐ প্রায়-অন্ধকার কারাকক্ষে বাস। হয়ত তার চেয়েও বেশী কিছু। মেদিনীপুর জেলের কুখ্যাত এক শ' ডিগ্রী (Hundred Cells) ভারতের মধ্যে সব চেয়ে খারাপ খুপরি বা Cell। আমাদের ২৫টা খুপরির ঠিক সামনে—মাত্র দু-আড়াই হাত স্থান ফাঁক দিয়ে আবার ২৫টা খুপরি—এবং এই ৫০টা খুপরি একই ছাদের নীচে। পিছন দিকে ছোট একটু জানলা আছে;—লোহার শিক ও জালি দিয়ে সুরক্ষিত। আলো-বাতাস আসার পথ ঐটুকুই। জেলের পরিভাষায় একে বলা হয় Corridor Cells। ব্রহ্মদেশ, ভারত ও বর্তমানের পাকিস্তানের বহু জেল দেখেছি; কোথা-ও ঐ রকম Cell বা খুপরি দেখিনি। বাংলা দেশের—অর্থাৎ পূর্বেকার বাংলাদেশের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নামজাদা

বন্দীদের কয়েদীদের জন্য ঐ খুপরির ব্যবস্থা হয়েছিল। ইংরাজ সরকার আমাদের নিলেন ঐ জেলের ঐ সব খুপরির মধ্যে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এক ইংরেজ;—লেখা-পড়া কিছুই জানতেন না; বাস্তবিক ছিলেন জেলের কারখানার foreman বা বড় মিস্ত্রী। জেলের বড় কর্তা (Inspector General of Prisons) —যুকানন যখন আমাদের দেখতে এলেন, তখন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাকি তাঁকে বলেছিলেন—"এই সব খুপরি হ'ল বদমায়েস-গুণ্ডাদের জন্য; এদের রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে?" যুকানন সাহেব জবাব দিয়েছিলেন—"They are worse than the worst criminals"—অর্থাৎ সবচেয়ে বদমায়েস পাপী কয়েদীদের চেয়েও এরা খারাপ। আমাদের প্রতি সরকারের মনোভাবের পরিচয় এই রকম নানাভাবেই আমরা পেয়েছিলাম।

এমনি আবেষ্টনে আমরা তবুও হাসিখেলা দিয়ে দিন-গুলিকে সহজ করতে চাইছিলাম। তাতে-ও বাধা আসছিল যে কথা পূর্বে বলেছি।

চার মাস পর হঠাৎ একদিন হুকুম এল—বদলি হচ্ছি অন্য জেলে। দশমাস বহরমপুর জেলে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাতে হল। তারপর একদিন রাত দুপুরে হুকুম এল—চলুন! কোথায়? কলিকাতা! এই বদলির খবরটা সরকারীভাবে আমাকে জানালো—যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে; কিন্তু জেল অফিসের কয়েদীরা আমায় ২।৩ দিন পূর্বে জানিয়ে গিয়েছিল—বদলির হুকুম এসেছে।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে গেলাম বিকাল একটা কি দুটোর সময়; আবার রাত বারটায় হৈ হৈ সুরু হল' 'pack up Babu!' বাবু, উঠে মাল পত্র গুছিয়ে নাও। কোথায়? জানি না। দেখলাম, বহু পুরাতন সহকর্মী এর মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে ওখানে এসেছে। সবাই বের হ'ল ৪৪ ডিগ্রী (44 cells) থেকে। জেলের দরজায় ২টা পুলিসের বড় গাড়ী (police van) দাঁড়িয়ে আছে; আর আছে এক পাল পুলিশ। অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে উঠলাম; এটা সবাই বুঝলাম—বাংলার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন আলিপুর জেলের রাজবন্দীদের দুঃখহরতাল (hunger strike) চলছে; Rowlatt Commission তখন ভারত ভ্রমণ করছে—আমাদের বিরুদ্ধে কি কিঅন্ত সাজানো যায় সেই তদন্তের জন্যে। অপর দিকে আবার মণ্টেগু সাহেব (Montague) তখন ভারতে। বাংলার বাইরে যাচ্ছে এটা বুঝে সবাই তারস্বরে গান ধরল—"সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি।" পুলিশের বাধা ও ধমকানি আমাদের সুর রোধ করতে পারল না।

হাওড়া ষ্টেশন একদম জনমানব শূণ্য; কেবল চার-দিকে সশস্ত্র পুলিশ। একটা special train (বিশেষ গাড়ী) প্রস্তুত ছিল। এক এক কক্ষে ৩।৪ জন ক'রে আমরা উঠলাম; প্রতি কক্ষে পুলিশ ৪।৬ জন ক'রে; তাছাড়া আলাদা কক্ষেও পুলিশ ছিল। গাড়ী আর কোথাও থামল না, থামল হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে। সেখান থেকে মোটর গাড়ী ক'রে আমাদের ২৩।২৪ জনকে নিয়ে গেল হাজারিবাগ জেলে। সেখানে আবার দেখা হ'ল কিরণদার সঙ্গে।

রাজবন্দীদের ভাগ করা হ'ল—x ও y class, বেশী ও কম বিপদজনক শ্রেণীতে। কিরণদা ও আমি 'x' শ্রেণীতে পড়লাম; এবং একই আঙ্গিনায় (yard এ) আবদ্ধ হলাম। আমরা ১২।১৪ জন ছিলাম। এক একজন এক একটা খুপরি বা cell এ থাকতাম। মেদিনীপুরের মতো অত কড়া ও কঠিন ব্যবস্থা এখানে ছিল না। এর মধ্যে কিরণদা হ'লেন অসুস্থ। তাঁর সেবা করার জন্য পালা ক'রে আমরা ২জন ক'রে তাঁর খুপরিতে রাত্রে থাকতাম। তাঁর খাওয়া দাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করতে হ'ল। তরল খাদ্য ভিন্ন কোন খাদ্য দেওয়া হ'ত না। কোন কোন দিন ডাক্তার বেশ ভয় পেতেন; কখনও নাড়ী পাওয়া কঠিন হ'ত। অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে কিরণদার জীবন অবসানের আশঙ্কাও করতে হয়েছে সেই অবস্থায় কিরণদার শুশ্রূষার সম্পূর্ণ ভার আমাদের

নিতে হয়েছিল ; বন্ধুবর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সে সময় এতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। হয়ত তাঁর অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হ'ত না। আর সাহায্য করতেন শ্রীঅমলা মজুমদার। কেরোসিন ষ্টোভে কিরণদার জন্য রান্না ক'রে দিয়েছি দিনের পর দিন কয়েক মাস ধ'রে। কিরণদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এখানে।

১৯২০ সালের জুন মাসে জেল থেকে খালাস হয়ে এসেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের কাজে যোগ দিই এবং সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপনের ব্যবস্থা করি। কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতে। জুলাই বা আগষ্টে সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপন করি এবং তার সব ভার ও দায়িত্ব নিলেন কিরণদা। কিরণদা মুক্তি পান আমার বেশ কিছুদিন পূর্বে। শ্যামসুন্দর বাবু তখন Servant কাগজ সংগঠন করছেন ; কিরণদা ছিলেন তাঁর একজন সহায়ক। তাঁর দুর্বল দেহ ও বিকল পা নিয়ে হেটে হেটে তিনি Servant কাগজের Share বিক্রি ক'রে অর্থ তুলতেন। খালাসের পর আমারও Servantএ যোগ দেবার কথা হয়, শ্যামবাবু আমায় খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে মতের অনৈক্য হওয়াতে, কিরণদা ও অন্যান্য কয়েকজন মুক্ত রাজনৈতিক বন্দী Servantএর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আমার পক্ষেও আর Servantএ যোগ দেওয়া সম্ভব হ'ল না। কিরণদাকে নিয়ে সরস্বতী লাইব্রেরী স্থাপন করলাম। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তখনও জেল থেকে মুক্ত হন নি।

এর পর হ'তে কিরণদার সঙ্গে একই পরিবারের লোকের মতো বাস করেছি। খুব অসুস্থ হ'য়ে তিনি দৌলৎপুর যান ; সেখানকার সত্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁকে নিয়ে যান। এবং সুস্থ হয়ে তিনিই কার্যত ঐ আশ্রমের পরিচালক হন। দৌলৎপুর কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের উপর কিরণদার ও সত্যাশ্রমের যে প্রভাব তখন হয়েছিল তা ইংরাজ কর্তৃপক্ষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। ১৯২৩ সালের শেষ দিকে আবার ধর-পাকড় শুরু হয়। কিরণদা ও আমি প্রথম খেপ থেকে অব্যাহতি পেলাম কিন্তু ১৯২৪এর ১২ই জানুয়ারী আমরা উত্তরে শ্রীসরস্বতী প্রেসের বাড়ি থেকে ধৃত হলাম। প্রত্যক্ষ উপলক্ষ ছিল গোপীনাথ সাহা কর্তৃক টেগার্ট ভ্রমে ডে (Day) নামক এক ইংরেজকে হত্যা করা।

গোপীনাথ হুগলির ছেলে ; শ্রীভূপতি মজুমদারের সংস্পর্শে সে রাজনীতির আবর্তে আসে। সরস্বতী লাইব্রেরীর কাজে সে বহুদিন নিযুক্ত ছিল ; তারপর কিছুদিন দৌলতপুর সত্যাশ্রমে ও পরে বরিশাল শঙ্কর মঠে কয়েকমাস থাকে। আমাদের সঙ্গেই সে বাস করেছে। কিন্তু ঐ সময় একদল যুবক ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে—সশস্ত্র গোপন আন্দোলনের জন্য। আমরা তখন গান্ধীজির অসহযোগের সঙ্গে কাজ করছি ; ঐ সময় সশস্ত্র গোপন ষড়যন্ত্র করা আমরা সমর্থন করিনি। গোপীনাথের তরুণ রক্তে তখন আত্মোৎসর্গের ঢেউ খেলছে ; সে আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল। আমাদের বাসগৃহ ছেড়ে চ'লে গেল। ডে-কে হত্যা করার দু'তিন দিন পূর্বে একদিন সে এল ; বহু সময় আমার কাছে বসে রইল। যাকে গভীরভাবে স্নেহ করতাম, সে আমাদের ছেড়ে গেল—এই ক্ষোভ আমার মনে ছিল। কিছু বলবে—সে আভাস দেওয়া সত্ত্বেও, আমি ভাল ভাবে গোপীনাথের সঙ্গে কথা বলিনি না। আজ ৩০ বছর পরও এই দুঃখ আমার মনে জাগে—কেন ওর কথা শুনি নি! হয়ত বা ঐ দিন কথা ব'লে শেষ বিদায় নিতে এসেছিল ;—হয়ত বা তা হ'লে তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম। কিরণদা-ও গোপীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ;—সে আমাদের সকলেরই অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল।

সরস্বতী লাইব্রেরী কিরণদারই হাতে গড়া ; তার সংস্রবে ঐ লাইব্রেরীতে যারা কাজ করেছে—তাদের মধ্যে গোপীনাথ, তারকেশ্বর ও অমূল্য সেনগুপ্ত জীবন দিয়ে সরস্বতী লাইব্রেরীর স্মৃতিকে পুণ্যময় করে গিয়েছে।

সাংঘাতিক আঘাতের থেকে ফিরে যাচ্ছিলো মাত্র।
অম্বিকা বাবু আলিপুর জেলে নিজের বিছানায় আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। এরা-ও কিরণদার সঙ্গে এক সঙ্গে সরস্বতী লাইব্রেরীতে কাজ করেছে। সরস্বতী লাইব্রেরী নামত ব্যবসার প্রতিষ্ঠান ছিল; কিন্তু কার্যত ছিল—রাজনৈতিক কর্মের কেন্দ্র ও ক্ষেত্র আর কিরণদা ছিলেন তার কেন্দ্রমণি।
লিখেছে! আজও আমার মন ঠিক
স্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব ঘটনা দেখতে পায়ে
ঐ সব কাহিনী আজও আমাদের সত্তার অঙ্গ হয়ে
এক একবার জেলে যেতাম আর সরস্বতী
গুটিয়ে ফেলতে হ'তো, আবার খালাস হয়ে
নতুন করে তাকে সুরু করতে হ'তো। ১৯১৬ সালে,
১৯১৪ সালে ১৯২৮ সালে ও পরিশেষে ১৯৩১ সালে
'রে সরস্বতী লাইব্রেরীকে গুটিয়ে রাখতে
হয়েছে। কত লোক এসেছে, কত লোক গিয়েছে। বাংলার রাজনীতিতে তখন একটা দুষ্ট প্রভাব বিপ্লবীর নিঃশ্বাস পেয়ে যে ছেলেদের মাতিয়ে তুলছিল তাতেই কিশু হল গোপীনাথ, এবং তাতেই অম্বিকা নিজ বন্ধু হত্যা ক'রে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করল।

দেশ স্বাধীন হ'ল। আজও সরস্বতী লাইব্রেরী একটা স্মৃতি ও ঐতিহ্য হ'য়ে আছে। বছর বছর লোকসান দিয়ে এখনও এটা চালানো হচ্ছে,—কারণ একে গুটিয়ে ফেলতে যেন বাধে, যেন মনে হয় নিজেদের সত্তার একটা অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এক একবার গুনবার সময় দেখা যেত—কত লোকের কাছে পাওনা আছে, যাদের কোন ঠিক ঠিকানা নেই; আবার দেনাও অনেকের কাছে থাকত। পাওনা প্রায় অনেকের কাছ থেকেই আদায় হয় নি; দেনাও হয়ত সকলের দেওয়া হয় নি। এ সবই কিরণদার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত; তাই আজ স্মৃতির মন্থনে এসব কথা আসছে।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিয়ে কিরণদা জেল থেকে খালাস হলেন, আমি খালাস হই তার পাঁচছয় মাস পরে। বাইরে থেকে কিরণদা চিঠি লিখতেন,—আমি জবাব দিতাম। ঠিক হয়, কোনো গ্রামে গিয়ে বসবেন। এই বয়সে ও এই স্বাস্থ্যে তাঁর পক্ষে কলকাতার থেকে কোন কাজ করা সঙ্গত হবে না। কিন্তু তাঁর মন চাইত যুবকদের সঙ্গে মিশতে, তাদের চরিত্র গঠনের দিকেই তাঁর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল। তাই তিনি সুরু করলেন প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নাম থেকেই সরস্বতী লাইব্রেরী ও শ্রীসরস্বতী প্রেস স্থাপিত হয়। এই পাঠাগারও তাঁরই স্মৃতিতে। হাওড়াতে একটা স্কুল হয়েছে প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর নামে; নদিয়াতে একটা গ্রাম সেবাকেন্দ্রও তাঁরই নামে হয়েছে।

স্বামীজী জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধক। তিনি এক দিকে ছিলেন কঠিন কর্মযোগী; নিষ্কাম কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ব'লেই তাঁকে বলছি কর্মযোগী। অপর দিকে ছিলেন জ্ঞানযোগী। তাঁর প্রণীত বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তক তাঁর বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবে। আবার তাঁকে আমরা দেখেছি ভক্তিমূলক স্তোত্র করতে করতে তন্ময় হ'য়ে অশ্রুবর্ষণ করছেন। কিরণদাকে কেউ কখনও ধর্মালোচনা ও পূজা-অর্চনা করতে দেখেনি। কিন্তু কিরণদা যৌবনে ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন এক গৃহী সাধকের কাছ থেকে। তাঁর নাম হ'ল ৺সারদাচরণ মৈত্র; তিনি ছিলেন প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর গুরুভাই। হয়ত কিরণদা তাঁর গুরুর কাছ থেকে স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ পেয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কিরণদার সাক্ষাৎ খুবই কম সময়ের; কিন্তু তবুও তাঁকেই কিরণদা গুরু ব'লে মনে করতেন।

কিরণদার বাল্য ও যৌবনকাল সম্বন্ধে কারও সঙ্গে তিনি কোন আলোচনা করতেন না। কিরণদাকে সবাই জানে—বিশেষভাবে তিনি নারীদের এড়িয়ে চলতেন। এ নিয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হ'ত। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর মনের ধারণা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও অনমনীয় ছিল। অথচ যৌবনের প্রারম্ভে কিরণদার বিয়ে হ'য়েছিল; তাঁর বিবাহিত জীবন অত্যন্ত স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। অল্প

দিনের মধ্যেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়। এর কিছু কাল পরেই তিনি পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। ২৭।২৮ বছর অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে তাঁকে আমি জানি। এর মধ্যে বোধ হয় একবার ঘণ্টা খানেকের জন্য তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের বরানগরের বাসায় গিয়েছিলেন, বাড়ীঘরের কোন প্রসঙ্গও তিনি আলোচনা ক'রতেন না।

মত ও আদর্শের দিক দিয়ে কিরণদাকে বলা যেতে পারে, অত্যন্ত পুরাতন পন্থী। কিন্তু এটা তাঁর সঠিক পরিচয় নয়। জাতিভেদ বা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পার্থক্য তিনি একেবারেই জানতেন না। সর্ব শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁর দরদ ছিল সমান; এর সীমানা নির্দেশের একটাই মানদণ্ড ছিল—বঞ্চিত ও বঞ্চনাকারীর (exploited & exploiter) পার্থক্য। আর্তের সেবার জন্য তাঁর ক্ষীণ শরীর ও দুর্বল পা নিয়ে দু'তিন মাইল হেটে যেতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

যাঁরা কিরণদাকে জেলখানায় দেখেছেন, তাঁরা জানেন কিরণদার আদর্শ নিষ্ঠা কি রকম উগ্র ছিল। এক একটা দিকে ঝোঁকের বশে সহবাসীদের পক্ষে যে কতটা অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে পারে সে দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না—যেমন ভ্রূক্ষেপ করতেন না তাঁর নিজের কায়িক অসুবিধার দিকে। ৬টার সময় বেড়াতে যাবেন, সঙ্গীদেরও ঠিক ৬টায় হাজির হ'তে হবে ২।১ মিনিট এদিক ওদিক হ'লেই মুস্কিল। সরস্বতী প্রেসের উপরে একটা মেস (mess), সেখানে একটা কক্ষে কিরণদা থাকতেন। আরও ১০।১২টি লোক সেখানে থাকত। তাদের চলা-ফেরা ও জীবনযাত্রা নিয়ে প্রায় কিরণদা রাগ করতেন এবং তারপর তাঁর নিজের শরীরও খারাপ হ'ত। উভয় পক্ষ থেকে অভিযোগ পেতাম। অনেক দিন পর্যন্ত ভাল রাখা সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু তারপর আর হ'ল না। কিরণদা আমাদের বাসস্থল ছেড়ে গেলেন। আমি তখন দিল্লীতে; ফিরে এসেই কিরণদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেক কথা হ'লো। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হ'লো—তাঁর বাসের কক্ষ ঠিক পূর্বের মতোই আছে ও থাকবে। যখনই তিনি মনে করবেন, নূতন বাসস্থলে কোন অসুবিধা হচ্ছে, ওখানে চলে যাবেন। প্রায় প্রতিবার এসেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি আমায় আশ্বাস দিতেন—ভাল আছেন। যারা তাঁর সব চেয়ে নিকট ও স্নেহভাজন ছিল—তাদের উপরই এই সময় তাঁর অভিযোগ বেশী হয়েছিল। তার মধ্যে শ্রীসুধীর রায় এখনও দুঃখ করে, কিরণদার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হ'লেও, তাঁর সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়েছিল। শেষ দু' বছর যাঁরা কিরণদার ভার নিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহের যুবককর্মিগণ এবং দ্বিতীয় দেবু অর্থাৎ শ্রীত্রিদিবেশ বসু। কিরণদা কারও একার কিরণদা ছিলেন না, তাই এঁদের প্রতি কোন ধন্যবাদ জ্ঞাপন বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অনধিকার। তবুও এঁরা যে কিরণদাকে শান্তি দিতে পেরেছেন এবং কিরণদা যে এঁদের সংস্রবে আনন্দ পেয়েছেন এটা আজ স্মরণ না ক'রে পারছি না। যতই দূরে থাকুন না কেন, তিনিও আমাদের ত্যাগ করেননি, আমরাও তাঁকে ত্যাগ করিনি। প্রত্যেক দিন বেলা ৯টার সময় সরস্বতী প্রেসে phone ক'রে তিনি খবর নিতেন—ওখানে কে কেমন আছে। এটা তাঁর একেবারে ঘড়ি-ধরা নিয়মে চলত। মৃত্যুর মাস তিনেক পূর্বে আমায় দিল্লীতে চিঠি দিলেন—তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে; পাঠগৃহের স্থায়ী ব্যবস্থা যেন সত্বর করি। তার পরই তিনি রাঁচী চলে যান, পূজার সময় বাদুড়ার কাছে বেড়াতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় পূজার পর নভেম্বরে। তখনও ঐ কথাই বললেন আমিও তাঁকে ভরসা দিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এত সত্বর যে তিনি চলে যাবেন—ভাবি নি।

পাঠগৃহের নিজস্ব বাড়ী তৈরী করার নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন। জানি না—তা সম্ভব হবে কি না। কিরণদার ভক্ত ও অনুগত লোকের সংখ্যা বহু—হয়ত কয়েক সহস্র হবে। এঁরা যদি সবাই মিলে এজন্য চেষ্টা করেন, তবে এটা এমন কিছু দুঃসাধ্য নয়। এঁদের সকলের কাছে আমাদের এই আবেদন—বাংলার ছাত্র ও যুবকদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য এই প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহকে যেন এঁরা সবাই গড়ে তুলতে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সেইটেই হ'বে কিরণদার প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কিরণদা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯২২। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ। বন্ধুর সঙ্গে গেলাম—খুলনা, দৌলতপুরে। প্রথম আলাপ হ'ল কিরণদা'র সঙ্গে। শ্যামবর্ণ, দুস্বকায়, একটু পা টেনে চলেন, একখানা হাত প্রায় অসাড়, দেশের কাজ করবার জন্যে একটি আশ্রম খুলেছেন ডাকঘরের সামনে। ছোট্ট গোলপাতার ঘরে আশ্রম। দুটি ছেলে সেখানে থাকে তাঁর সঙ্গে।

কিছুদিন পরেই বাবা বদলি হয়ে দৌলতপুরে এলেন সেটেলমেন্টার চার্জে। আমিও দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হ'লাম। কিরণদার সঙ্গে পরিচয় হ'লো। রোজ সকালে বিকেলে তাঁর ওখানে যাই। আশ্রমিকদের সঙ্গে চিঁড়ে দিয়ে জলপান করি। নানা কথা শুনি, খবরের কাগজ পড়ি।

পরে আশ্রম উঠে যায় বড় জায়গায়, বড় বাড়ীতে, কলেজের কাছে পার্লারায়। সেখানে উঁচু শানবাঁধানো মেঝে, তিন কামরা একখানা ঘর, আলাদা রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, বারান্দাসহ, মস্তবড় উঠোন, পাশে খেলার মাঠ। কলেজের অনেক ছেলে আসত, কেউ খেলত, কেউ ব্যায়াম করত, কেউবা বই পড়ত। কিরণদা' সকলের সঙ্গেই খানিকটা গল্প করতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতে করতেই পাড়ি, শুধার, পাগল প্রভৃতি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়ন করতেন।

আমার বেশির ভাগ সময় কাটত বই নিয়ে। সাহিত্যের নেশা যথাসম্ভব বাড়ীতেই মেটাতাম, এখানে পেতাম অজস্র নানারকমের বই আর কাগজ—দর্শন, রাজনীতি, জীবনী, নানা বিষয়ের। পড়লাম, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, যতীন মুখুজ্যে প্রভৃতির জীবনী, ম্যাট্‌সিনি, কার্ল মার্ক্স, পীপ্‌লস্ মার্ক্স, মানবেন্দ্র রায়ের বই দু'একখানা।

আমি হ'লাম কিরণদার জেরানি। লিখতে তাঁর অসুবিধা হ'ত। চিঠি লিখে দিতাম আশ্রমের খবর জানিয়ে—কখনও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে, কখনও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে, কখনও অন্য কাউকে। খবর পেতাম তাঁদের চিঠির, সাহায্য দানের।

'রামদাস স্বামী' আগেই বেরিয়েছিল। নতুন সংস্করণের মুখে ভাষা-সংস্কার করতে দিলেন কিরণদা।' গুরুগম্ভীর রচনা, বিশেষ পরিবর্তন করতে সাহস হ'লো না। সামান্য অদলবদল করলাম। 'চাণক্য' রচনার আয়োজন চলছে। রামদয়ালদা' এন্‌সাইক্লোপীডিয়া থেকে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আমাকে কিরণদা ভার দিলেন তার অনুবাদের এবং আরও কতক অংশ লিখে দেবার। 'মুদ্রারাক্ষস' অবলম্বনে কৌটিল্যের গুপ্তচর-নীতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে জানলাম প্রাচীন রাজনীতির কৌতূহলদীপক রহস্য। ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠার সঙ্গে আদেশ পালন করলাম। বই বেরুলে একখানি আমাকে উপহার দিয়ে আমাদের বন্ধুদের কাছে যখন বললেন, 'এ বই তো ও-ই লিখেছে', মনে মনে আনন্দ অনুভব করলাম এবং সংকোচও—কারণ, উপকরণ তো সবই তাঁর জোগানো, স্থানে স্থানে শব্দ গেঁথে দিয়েছি মাত্র।

ক্ষয়রোগে অবসন্ন চারুদা' থাকতেন একখানি কামরায়। প্রতিদিন গিয়ে তাঁকে বই পড়ে শোনাতাম। মাঝে মাঝে তিনি দূরে সরে বসতে বলতেন। সরে বসতাম। এ রোগের ভীষণতা তখনও ভালো করে' উপলব্ধি করিনি। আর, আদর্শবাদের স্বপ্নের ঘোরে তখন চলেছে জীবন। একদিন তাঁর ইচ্ছানুসারে সব ছেলেকে খাওয়ান হয়েছিল। কিরণদা, ভূপেনদা তদারক করছিলেন। সংসারের বাইরে নির্মল আনন্দের সন্ধান সেদিন পেয়েছিলাম এই সত্যাশ্রমে। তা বাড়ীর বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে দিনের মধ্যে বহুবার

এখানে ছুটে আসতাম। ভাইকে, ভাগ্নেকেও রোজ নিয়ে যেতাম এর পবিত্র আবহাওয়ায়।

কোনদিন দুপুর বেলায় কিরণদা বেরুতেন গ্রামবাসী গরীব লোকদের বাড়ীর উদ্দেশে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স নিয়ে। ব'লে যেতেন, ব'স্, দু' ঘণ্টা বাদে আস্‌ব। আর একবার স্নেহস্পর্শ না পেয়ে চলে যেতে মন সরতনা।

কবিতার নেশা ছিল আমার। বড় কবিদের কবিতা পড়ে শোনাতাম অনেককে। নিজে লিখতাম 'বালক', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বিজলী', অনিলবরণ রায়ের 'সারথি' প্রভৃতিতে। কিরণদা একদিন ঠাট্টা করে বললেন, 'পুলক নাচিছে গাছে গাছে'। বন্ধু-মহলে নাম হ'য়ে গেল PNG:. বন্ধুরা অনেকে বিজ্ঞানের ছাত্র, রাসায়নিক ফর্মুলার বেঁধে দিলো কথাটিকে।

আশ্রম উপলক্ষ্য করে কতজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন! নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পরিচয়। কেষ্টদা', প্রফুল্লদা', বিনয়দা', অনন্তদা', রসিকদা' ভূপেনদা'—অনেক নাম মনে আসে আজও। সকলের খবর এখন আর পাইনা। সেদিন চিত্তবিকাশের যে সুযোগ দৌলতপুরে পেয়েছিলাম, তা বোধ হয় আজকের দিনে সহজে কোথাও জোটেনা। সে আদর্শবাদের দিনই বুঝি হারিয়ে গেছে।

ডাকঘরের কাছে ছিল দারোগাবাবুদের বাড়ী। দু'একবার তাঁদের জেরায় পড়তে হয়েছে। আশ্রমে কি হয়, কে কি বলেন এবং করেন—এই ধরণের প্রশ্ন করেছেন দু'একজন। যথাসম্ভব উত্তর এড়িয়ে গেছি।

একবার একজন রাস্তা থেকে থানায় ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দিন দুই আগে আশ্রমে কে এসেছেন, কোথা থেকে, কি উদ্দেশ্যে। এসেছিলেন আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী। বললাম, স্বামীজী বলে ডাকি, আর কিছু জানিনা।' দারোগাবাবু হঠাৎ ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'গলায় গলায় খাতির আর আসল নামটা জানোনা? নিম্নস্বরে জানালাম, সবাই স্বামীজী ডাকে, আমিও তাই ডাকি; দু'একটা কুশল প্রশ্ন ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কোন কথা আমার হয়নি। কতকটা ভয় দেখিয়ে সেযাত্রা তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন।

ভূপেনদা আশ্রমে এলে সাহিত্য চর্চার সুযোগ হ'ত। কিরণদার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা জমত না। তবে ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের আভাস পেয়ে অবাক হ'তাম।

আশ্রম পর্ব শেষ হবার পরও বহুদিন দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। আশীর্বাদ পেয়েছি। ছাত্রাবস্থার সেই সরল জীবন নতুন করে ফিরে পেয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে।

প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে গেলেন সেখানে। আমার লেখা বই সঙ্গে ক'রে নিয়ে বললেন, সেগুলো দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন ছেলেদের সঙ্গে এবং—লেখক যখন বালক, তখন থেকে কি করে' তিনি তাকে শাসন করেছেন, ভালনা করেছেন, তারও উল্লেখ করলেন।

যখনই দেখা হ'ত, তখনই তাঁর হাসিমুখ। দু'এক সময়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কি রকম দেখছিস্ আমাকে? শরীরটা ভালোই আছে, না রে?

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শরীরটা ভালোই আছে এই কথাই তিনি ভাবতে চেয়েছেন। তবু চলে যেতে হলো তাঁর। পথ ছেড়ে দিতে হ'ল আমাদের।

আজও ভাবি, কোথা থেকে তিনি পেতেন কাজের ঐ উদ্দীপনা, অমিত তেজ, অফুরন্ত আনন্দ? 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা'র যুগ থেকে স্বাধীনতা লাভের যুগ পর্যন্ত অশ্রান্ত কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে হাসিমুখেই চ'লে গেলেন।

কারও কারও মুখে শুনেছি, বিপ্লবীরা সাধারণ নীতি মানেন না। কিরণদার নীতিবোধ চিরদিনই দেখেছি প্রখর। চরিত্রের সামান্য শৈথিল্যও তাঁকে ব্যথিত করত। দৌলতপুরের ছাত্রেরা অনেক সময়ে বিনা

ছেলেদের নৈতিক জীবন গড়ার দিকে তিনি বিশেষ ভাবে মন দিয়েছিলেন। বিপ্লবের দিনেও তার প্রয়োজন ছিল, আজ তার প্রয়োজন আরও বেশি। সেদিন মুক্তি সংগ্রামের উদ্দীপনা তরুণ মনকে জাগিয়ে রাখত। এখন সে উদ্দীপনা নেই, জাতীয় চরিত্রে নানারকমের দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করছে। এ থেকে নিজেদের উদ্ধার করতে হবে। নইলে স্বাধীনতা হবে অর্থহীন। এই চাপল্যের যুগেও ছেলেরা যে তাঁর কাছে ধরা দিত, তাঁর শাসন মানত, তার কারণ ভালোবাসা দিয়ে বশ করতে তিনি জানতেন। ভালোবাসার মধ্য দিয়ে জাতির নৈতিক জীবনের ভিত্তিকে শক্ত ক'রে গড়ে তোলাকে তিনি চমকপ্রদ বড় কাজের চেয়ে অনেক বড় কাজ ব'লে মনে ক'রেছিলেন, তাই একান্তভাবে সেই কাজেই আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন।

মণিপুর প্রসঙ্গ (১২)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

আসাম গভর্ণমেণ্ট এই আন্দোলন দমনের ভার গ্রহণ করে। সরকারের নির্দেশে নাগা পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার আসাম রাইফেলের সিপাহীদিগকে সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহী অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। দিনের পর দিন জনসাধারণের উপর স্ত্রীপুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে। গুলিতে বা প্রহারে কত লোক নিহত বা পঙ্গু হয় তাহার কোন সীমা সংখ্যা নাই। সরকার পক্ষ হইতে রাণী গাইদিলুকে যে ধরাইয়া দিতে সাহায্য করিবে তাহাকে প্রথমতঃ ২০০৲ টাকা পরে তাহা বাড়াইয়া ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচার করা হয়—যে যে গ্রামের লোক তাহাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে ১০ বৎসর পর্যন্ত সেই গ্রামের লোককে কোন প্রকার খাজনা দিতে হইবে না।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক এইরূপ অক্লান্ত চেষ্টার ফলে নাগা 'জোয়ান অব আর্ক' রাণী গাইদিলু অবশেষে ধরা পড়িয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার 'The Unity of India' গ্রন্থে গাইদিলু সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

"Perhaps she thought, rather prematurely, that the British Empire still functioned effectively and aggressively and it took vengeance on her and her people. Many villages were burnt and destroyed and this heroine girl was captured and sentenced to transportation for life. And now she lives in some prison in Assam, wasting her bright young womanhood in dark cells and solitude. Six years she has been there, what torment and suppression of spirit they have brought to her, who in the pride of her youth dared to challenge an Empire! She can roam no more in the hill country through the forest glades, or sing in the fresh crisp air of the mountains. This wild young thing sits cabined in darkness, with a few yards, may be, of space in the day time, eating her fiery heart in desolation and confinement. And India does not even know of this brave child of her hills, with the free spirit of the mountains in her. But her own people remember the Gindallo Rani and think of her with love and pride. And a day will come when India will remember her and cherish her, and bring her out of her prison cell.

But our so-called Provincial Autonomy will not help in bringing about this release. More is needed. For the Excluded Areas are outside the ken of our provincial ministries, and, strange to say, they are even more cut off from us now than they

were before the advent of 'Provincial Auto-

Even questions about Gindallo were not allowed to be put in the Assam Assembly.

And I thought of Gindallo, the Rani sitting her prison cell. What thoughts were hers, what regrets, what dreams?" (In the Surma Vally, Dec. 9, 1937. The Unity of India—by Jawaharlal Nehru).

১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের পর কংগ্রেসের নেতৃবর্গ রাণী গাইদিলুর মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রাণী গাইদিলু পুনরায় নিজ এলাকায় চলিয়া আসেন। ১৯৪৯ সনে ভারতের সঙ্গে মণিপুর যুক্ত হওয়ার পর অপরাপর সম্প্রদায়ের মত কাবুই সম্প্রদায়ও দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রাণী গাইদিলু ১৯৫৩ সনে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজেদের সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করার কথা জানাইয়া গিয়াছেন। বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি অনুন্নত পার্বত্য উপজাতি বলিয়া কাবুই নাগাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়টি সেই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠায় স্থান লাভে বঞ্চিত হইবে না।

চূড়াচাঁদ মহারাজের সময় মণিপুর রাষ্ট্র এবং মণিপুরী সমাজ ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় জড়ত্ব কাটাইয়া উঠিয়া প্রগতির পথে ধাবিত হয়। জাতীয় জাগরণের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি প্রথম প্রকাশ পায় ভাষা ও কৃষ্টির মধ্যে। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিক হইতেই মাইনর স্কুলগুলি ক্রমশঃ হাই স্কুলে পরিণত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষারও গোড়াপত্তন হয়। ১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মণিপুরী ভাষায় ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেয়। ১৯৩১ সনে মণিপুরী ভাষা আই-এ (I. A,) পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিমধ্যে মণিপুরী সাহিত্যিকগণ অজস্র কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক লিখিয়া এবং অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া নিজেদের মাতৃভাষার সম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধি করিয়া চলেন। এই সময় মণিপুরী নাট্যাভিনয়েরও যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং মণিপুরী নৃত্য মণিপুরের বাহিরে ভারতের নানাস্থানে জনপ্রিয় হইতে থাকে। মহারাজা এই সমস্ত বিষয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় মণিপুরের খেলোয়াড়গণ গৌহাটি, শিলচর প্রভৃতি স্থানে পলো খেলা এবং নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের পরিচালনাধীন ছিল। তিনি নিজের পুত্রদের জন্যও আধুনিক উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ কুমার বোধচন্দ্র সিংকে তিনি ১৯২২ সনে বিলাত পাঠান। অপর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত সিং এবং লোকেন্দ্র সিং যথাক্রমে এলাহাবাদ ও মেয়ো কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। চূড়াচাঁদ মহারাজের সময় ১৯২৯—৩৪ সনে ওয়াহেংবাম্ নয়মাও সিং প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার করেন। রাজসরকার হইতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। ইংরাজ সরকার মহারাজের ব্যবহার এবং কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কে-সি-এস-আই (K. C. S. I.) উপাধি দান করে। ১৯৩৭ সনে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে "গৌর ভক্তি রসার্ণব" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

চূড়াচাঁদ মহারাজের রাজত্বের শেষভাগে ১৯৩৯ সনে ইউরোপে ২য় মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই সময় কতিপয় অতিরিক্ত মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কৌশলে ধান চালের দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই বা

ধান কিনিয়া মজুদ করিয়া রাখে ইহাতে, অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ লোকের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। মণিপুরের মেয়েরা সব ব্যাপারেই সকলের আগে অগ্রসর হইয়া আসে। ব্যবসায়ীদের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মেয়েরা এক ব্যাপক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করে। মণিপুরের ইতিহাসে ইহা 'নুপীলান' (মেয়েদের সংগ্রাম) নামে খ্যাত। এ যাত্রায়ও পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শে মণিপুর সরকার আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েদের এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। সরকার নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সংযত করিতে রাজী হইলে আন্দোলন বন্ধ হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে মণিপুরের উপর আক্রমণের কোন আশঙ্কা দেখা না দিলেও, চূড়াচাঁদ মহারাজ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের মত তখনও ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই। ১৯৪১ সনে মণিপুরের পক্ষ হইতে 'মণিপুর ফাইটার প্লেন' (Manipur Fighter Plane) নামে ৫৮ হাজার টাকার একটি জঙ্গী বিমান দান করা হয়। মহারাজ তখন ৫৬ বৎসরের বৃদ্ধ। ধর্মের প্রবল আকর্ষণে রাজনৈতিক জীবনের প্রতি তাঁহার সমস্ত মোহ কাটিয়া যায়। সেইজন্য তিনি ১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জীবিতকালেই আপন জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ কুমার বোধচন্দ্র সিংকে সিংহাসনে বসাইয়া নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে নবদ্বীপ ধামে তিনি ইহলোক ছাড়িয়া অমরলোকে চলিয়া যান।

মহারাজ বোধচন্দ্র সিং

(১৯৪১—১৯৪৯)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—

মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাপান অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিয়া এশিয়াখণ্ডে ইংরেজ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্র পক্ষের ঘাঁটিগুলি ততটা সুদৃঢ় না থাকায় তাহাদের পক্ষে বেশীক্ষণ জাপানের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। জাপবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে পার্লহার্বার হইতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করিয়া লয়। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর ব্রহ্মদেশ সমস্তই জাপানের করতলগত হয়। যুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ইংরেজ এবং আমেরিকার কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু জাপানের পক্ষে যত শীঘ্র উপরোক্ত অঞ্চল দখল করা সম্ভব হইয়াছিল ভারতের উপর আক্রমণ চালান ততশীঘ্র সম্ভব হইল না। নব বিজিত অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিতে এবং নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মিত্রপক্ষও ইত্যবসরে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর সৈন্য আমদানি করিয়া নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষিত করার সুযোগ পায়। স্থল এবং জল দুই পথেই ভারতের উপর জাপ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। এই স্থলপথে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার মাত্র দুইটি অপেক্ষাকৃত সুগম পথ রহিয়াছে। একটি আরাকানের মধ্য দিয়া অপরটি মণিপুরের মধ্য দিয়া জাপ-সৈন্যের ভারত অভিযান কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিলেও বিমান হইতে বোমা বর্ষণ চলিতে থাকে। ১৯৪২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের উপর মণিপুরীগণ ক্রমাগত বোমা বর্ষণ আরম্ভ হয়। আত্মরক্ষার মণিপুরীগণ জন্য দূরে গ্রামাঞ্চলে পালাইয়া যাইতে থাকে।

১৯৪৩ সনের শেষ ভাগে ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিবার আয়োজন চলিতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তখন মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এড্‌মিরাল মাউন্টব্যাটেন। মিত্রপক্ষ হইতে স্থির হইল—জেনারেল ষ্টীলওয়েল উত্তর আসামে লিডো হইতে চীনা এবং মার্কিণ সৈন্য লইয়া উত্তর ব্রহ্মে

মীটকিনা (Mytkyina) অভিমুখে যাত্রা করিবেন। উইলওয়েলের বিশ্বাস ছিল, যদি ইম্ফল হইতে মাউন্ট-ব্যাটেনের ৪র্থ কোর (Mountbatten's IVth Corps) ইতিমধ্যে পূব দিকে অগ্রসর হইয়া শ্বেবো-মোনিওয়া (Shwebo-Monywa area) অঞ্চল দখল করিতে পারে তবে তিনি সহজেই মীটকিনা হস্তগত করিতে পারিবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল উইলওয়েল দুই ডিভিসন চীনা সৈন্য লইয়া মীটকিনা অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিলেন। জাপানীদের বাধা সত্ত্বেও তাহার অগ্রগতি সমভাবে চলিতে লাগিল। ১৯৪৪ সনে জানুয়ারি মাসের মাঝা-মাঝি জেনারেল ক্রীষ্টিসন (General Christison) আরাকানের মধ্য দিয়া অভিযান আরম্ভ করিলেন। এদিকে অপরপক্ষও বসিয়া ছিল না। পূর্বে ব্রহ্মদেশে তাহাদের ৫ ডিভিসন সৈন্য ছিল; ১৯৪৩ সনের নভেম্বর মাসে তাহা বাড়াইয়া ৮ ডিভিসন করা হইল। তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের মতে জাপান ভারতের জনগণকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তখন পূর্বভারতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল (১)।

ইচ্ছাকৃতভাবে কার্যকারণ সম্বন্ধ গোপন রাখার ফলে চার্চিল সাহেবের উক্তিতে সত্য বিকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের মতামত না লইয়া বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করায় যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয় তাহা সকলেরই জানা আছে। ভারতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ১৯৪২ সনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বলে। ইংরেজ সরকার তখন ভারতের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইলে জাপান কখনই ভারত আক্রমণের কল্পনা করিত না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকার সে পথে না যাইয়া আসন্ন সমস্যা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য অতর্কিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে। বিক্ষুব্ধ জনতা শাসনযন্ত্রের উপর প্রবল আঘাত হানে; দিকে দিকে ভারত ছাড় রব উঠে। যুদ্ধের দরুণ সমগ্র ভারতই তখন একটি সৈন্যাবাসে পরিণত ছিল। নিরস্ত্র জনসাধারণের পক্ষে এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়া সাফল্য অর্জন করা সম্ভব না হইলেও ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ রহিয়াই গেল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব হইতেই সমস্ত ব্যাপার আন্দাজ করিয়া বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিয়া ভারত স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সনের জানুয়ারি মাসে সরকারের চক্ষে ধুলা দিয়া ভারত হইতে জার্মাণীতে চলিয়া যান। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখলের পর তিনি সিঙ্গাপুরে চলিয়া আসিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। এসমস্ত খবর চার্চিল সরকারের অজানা ছিল না। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের কোন জনবহুল প্রান্তে একবার কোনরকমে প্রবেশ করিতে পারিলে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন যে সমস্ত দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিবর্তে জাপ-বাহিনী প্রবেশ করিলে সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা-ত ছিলই না, উপরন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই সক্রিয়ভাবে তাহাতে বাধা দিতেন। পণ্ডিত নেহেরু জাপান এবং ইংরেজকে সেকথা খোলাখুলি ভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ

(১) "The Japanese also had a plan. Since November they had increased their strength in Burma from five divisions to eight, and they proposed to invade Eastern India and raise the flag of rebellion against the British." Page—496, Closing the Ring The Second World War. Vol. V—Winston S. Churchill.

রাখার একমাত্র অর্থ এই যে, ইংরেজ ইহা ভাল করিয়াই জানিত—তখন ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার জন্য সমরায়োজনের নেতৃত্ব ছিল সুভাষচন্দ্র গঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে। সেই জন্য ভারতে বিদ্রোহের আশংকা ব্যক্ত করিলেও তাহার পিছনের প্রকৃত কারণ সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের পক্ষে খুলিয়া বলা শক্ত ছিল। জাপানী সৈন্য ভারতে প্রবেশ করিলেই যদি বিপ্লবের কোন আশংকা থাকিত তবে ইংরেজ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাপ-আক্রমণ রূপে এত ফলাও করিয়া ভারতময় প্রচার করিত না। ইহাতেই প্রমাণিত হয় —যদি ভারতের উপর প্রকৃতই জাপ-আক্রমণ হইত, তবে জনসাধারণ বিদ্রোহ না করিয়া জাপানকে রুখিবার জন্য ইংরেজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের মনেও কোন সন্দেহ ছিল না।

১৯৪৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আরাকান ফ্রন্টে প্রবল বাধা পাওয়ায় ইংরেজ সৈন্যের অগ্রগতি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, উপরন্তু তাহাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চলে। মিত্রপক্ষের ৭নং ডিভিসন সৈন্যদল অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিমান হইতে যথাসময়ে রসদাদি না আনিলে সে যাত্রা চট্টগ্রাম-বন্দর হাতছাড়া হইয়া যাইত। যথোপযুক্ত জঙ্গী বিমানের অভাবে বিপক্ষের এই পাল্টা আক্রমণ অবশেষে ব্যর্থ হয়। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে ইম্ফলের উপর আক্রমণের তোড়জোড় আরম্ভ হয়। তাহাতে মীটকিনা অভিমুখে জেনারেল স্টীলওয়েলের অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হইলেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে আমেরিকান বিমান ও রসদসম্ভারের সাহায্যে তাহা পুনরায় আরম্ভ হয়। ৮ই মার্চ (১৯৪৪ সন) ৩ ডিভিসন আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরে মিত্রপক্ষের 'সেন্ট্রাল ফ্রন্টে'র উপর অভিযান চালায়। জেনারেল স্কুনেস (Gen. Scoones) তাহার ৪র্থনং কোর এবং ৩ ডিভিসন সৈন্য লইয়া ইম্ফল উপত্যকায় পশ্চাদপসরণ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম লক্ষ্য ছিল ডিমাপুর রেলষ্টেশন সহ 'ইম্ফল-ডিমাপুর রোড' দখল করিয়া ইম্ফলে অবরুদ্ধ বৃটিশ রসদাগার হস্তগত করা এবং পশ্চাৎ হইতে জেনারেল স্টীলওয়েলের স্থলপথ কাটিয়া দেওয়া। মার্চ মাসের শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ, তাহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ইম্ফল-ডিমাপুর রোড' দখল করিয়া কোহিমা এবং ইম্ফলের উপর প্রবল চাপ দেয়। মিত্রপক্ষ বিমানের সাহায্যে তাড়াতাড়ি আরাকান ফ্রন্ট হইতে ৫নং এবং ৭নং 'ইণ্ডিয়ান ডিভিসন' যথাক্রমে ইম্ফল এবং ডিমাপুরে লইয়া আসে। এই যুদ্ধে একমাত্র ইম্ফলেই মিত্রপক্ষের ৬০ হাজার সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। জুন মাসের ৩য় সপ্তাহে অবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল (১)। ইহার পর মিত্রপক্ষের সুদিন ফিরিয়া আসে। বিষেণপুরসহ মণিপুর রাজ্যের প্রায় ১৪০০ বর্গমাইল জায়গা ৬ মাস পর্যন্ত অধিকারে রাখার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুর হইতে পশ্চাদপসরণ করে। এই যুদ্ধে তাহাদের প্রায় ৭।৮ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। উপযুক্ত রসদ এবং বিমানের অভাবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই অধ্যায় এইখানেই সমাপ্ত হয়। যুদ্ধের পরে মিত্রপক্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজের এই অভিযানের কথা

(১) "In the third week in June the situation was critical, and it seemed possible, after all the efforts of the previous two months, that early in July the IVth Corps would finally run out of reserves. But on June 22, with a week and a half in hand, the 2nd and 5th Indian Divisions met at a point twenty-nine miles north of Imphal and the road to the plain was open. On the same day the convoys began to roll in". Quoted from Admiral Mountbatten' report by Winston S. Churchill in 'Closing the ring'.

গোপন রাখিয়াছিল। জনসাধারণ যখন এই খবর পায় তখন আর এসম্পর্কে তাহাদের কোন করণীয় ছিল না।

মহারাজা বোধচন্দ্র সিং যুদ্ধের সময় মণিপুরেই ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত খুশী হয়। যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব মণিপুরেও ছড়াইয়া পড়ে। মণিপুরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। মহারাজা ১৯৪৭ সনে নূতন বিধান তৈরীর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। নূতন বিধান রচিত হওয়ার পর মণিপুর রাজ্যে সর্বপ্রথম গণভোটের

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহা-

ভ্রাতা শ্রীপ্রিয়ব্রত সিং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ

ইতিপূর্বেই ১৯৩৮ সনে মহারাজের দিমাডা, চুড়াচাঁদ মহারাজের অন্যতমা পত্নী ধনমঞ্জুরী দেবীর বদান্যতায় ইম্ফল সহরে তাঁহার নামে ডি. এম্. কলেজ (D. M. College) স্থাপিত হইয়াছিল। এদিকে ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই তৎকালীন রাজ্যমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। মণিপুরবাসীর ইচ্ছানুসারে মহারাজ সর্দার প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দেন। ১৯৪৯ সনের ১৫ই অক্টোবর ভারত সরকার মণিপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন হইতেই পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ লোপ পায় এবং মণিপুর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (Indian Union) মধ্যে চিফ কমিশনার শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে (Part C State) পরিণত হয়। ভারত সরকার হইতে মহারাজকে বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মহারাজার ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার নিজের অধীনেই থাকে। মহারাজ বোধচন্দ্র সিং মণিপুর রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও মণিপুরী সমাজে তাঁহার সামাজিক মর্যাদা এবং ধর্মানুষ্ঠানের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ ই রহিয়াছে। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় এই সমস্ত অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছেন।

মণিপুর রাজ্যের শাসনবিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে, (ক) রাজ্যের উন্নয়ন, (খ) অর্থনৈতিক সমস্যা, এবং (গ) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, এই তিনটি প্রধান সমস্যা ভারত সরকারের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ভারতের দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলির চেয়েও অনেক অনুন্নত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকিলেও স্বল্প আয় এবং নানারকম প্রতিবন্ধকতার দরুণ দেশীয় নৃপতিগণ বিশেষ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিতে সক্ষম হইতেন না। মণিপুর রাজ্যেরও ঠিক একই অবস্থা ছিল। ভারত সরকার কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। মণিপুরের গ্রাম্যজীবনকে উন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে গ্রামের লোকের সহযোগিতায় থৌবাল অঞ্চলে প্রায় একশত গ্রাম লইয়া একটি ব্লকে (Block) 'কমিউনিটি পরিকল্পনা' (Community Project) অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই কাজসম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এইরূপ আরও ব্লকে কাজ আরম্ভ করার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। তদুপরি প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা (First Five Year Plan) অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে খরচ করার জন্য ১৫৪'৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

(১)	সমবায় (Co-operation)	৪ লক্ষ টাকা
(২)	কুটীর শিল্প (Cottage Industries)	৬ "
(৩)	কৃষি (Agriculture)	৮ "
(৪)	উন্নত পশু প্রজনন (Animal Husbandry)	২'৫
(৫)	চিকিৎসা (Medical)	৬
(৬)	বন (Forests)	৩
(৭)	যানবাহন (Transport	১০'৫

(৮)	বৈদ্যুতিক শক্তি (Power Projects)	১২
(৯)	শিক্ষা (Education)	১৭
(১০)	জনস্বাস্থ্য (Public Health)	২০
(১১)	রাস্তাঘাট (Communication)	৮১'৩ ,, ,,

মোট ১৫৪৮ লক্ষ টাকা

১৯৪২-৪৩ সন হইতেই পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সমস্ত অর্থই কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্যও খসড়া তৈরী হইতেছে। তাহাতে আরও বেশী টাকা খরচ হইবে আশা করা যায়। এই সমস্ত পরিকল্পনার দ্বারা মণিপুরের যে উন্নত ভবিষ্যৎ ক্রমে রচিত হইতেছে, ভারতের সঙ্গে যুক্ত না হইলে তাহা কোনরূপেই সম্ভব হইত না।

ভারত সরকার মণিপুরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টাও করিতেছেন। ইতিমধ্যেই পাঁচজন নেতৃস্থানীয় লোকের দ্বারা একটি উপদেষ্টা কমিটি (Advisory Council) গঠন করা হইয়াছে। নিয়ম এবং শৃঙ্খলা (Law and Order) ও সরকারী চাকুরী (Public Services) ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই আজ দেড় বৎসর যাবৎ উপদেষ্টাগণের পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে। নিয়োগ এবং বদলি ব্যাপারে তাঁহাদের আইনত কোন হাত না থাকিলেও মতামতের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। মণিপুর সরকারের বর্তমান আয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুকূল নয়। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এই রাজ্যের গড়ে বাৎসরিক আয় ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। মহারাজের আমলে ইহা অপেক্ষাও অনেক কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারকে বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে, হয় খরচ আরও বাড়াইতে হইবে নতুবা অন্যান্য বিষয়ে খরচ কমাইতে হইবে। শেষোক্ত ব্যবস্থা মণিপুরের বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কার্যে পরিণত করার পক্ষে উপযোগী হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থগিত রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়। মণিপুরের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া কিভাবে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় সেসম্বন্ধে ভারতসরকার বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন।

Ref.—

মণিপুর ইতিহাস (মণিপুরী ভাষায়)—রাজকুমার শ্রীমাহাল সিংহ,

2. Glimpse of Manipur—R. K. Snahal Singh, B. com,
3. বিজয় পাঞ্চালি—(মণিপুরী ভাষায়)—যুবরাজ কুলন সিং
Assam Dist. Gazetteers Vol IV 1905—B. E. Allen, C S.
5. History of the Assam Rifles—Colonel L. W. Shakespear, C. B., C. I. E.
6. Administration Reports (Manipur)—1932-33, '34-'35, '46-'47.
7. Manipur State Budget—1931-32, '41-42, '46-'47, '52-53,
8. The Second World War Vol. V—W. S. Churchill.
9. First Five Year Plan—Manipur
10. The Unity of India—Jawaharlal Nehru,

[ক্রমশঃ]

কবি মোহিতলালের কাব্যপাঠের ভূমিকা

প্রশান্তকুমার রায়

রবীন্দ্রনাথের মোহন স্পর্শে বাঙালীর অন্তর-সৌন্দর্য —কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে—সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে মনের এক বিচিত্র অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আরো যত জ্ঞানী-গুণী কবিরা প্রাণালোকের সন্ধান করে ফিরেছেন তাঁদের প্রায় সকলের প্রতিই কবিগুরুর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবিত-কালে আবির্ভূত হয়েও কবি মোহিতলাল কবিগুরুর সেই পূত আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। যে স্নেহচ্ছায়ায় বসে অপরাপর কবিরা অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভার অধিকারী হ'য়েও কাব্যপ্রতিভা বিকীর্ণ করবার সুযোগ ও উৎসাহ লাভ করেছেন, কবি মোহিতলালের ভাগ্যে সেই রবিচ্ছায়ার পরম আশ্রয় জোটেনি। ভালই হয়েছে; মোহিতলাল বাংলার কাব্য-জগতে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠান। কি ভাবে, কি ভাষায়, কি শব্দচয়নে মোহিত-লালের কাব্য রবীন্দ্র কাব্য থেকে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। অপরাপর কবিদের মত মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বা অনুসরণ করে কবিপ্রতিষ্ঠা লাভের সহজ পন্থাটি বেছে নেননি। এ যে কত বড় আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতার সাক্ষ্য বহন করছে তা রবীন্দ্রকাব্যের পাশে মোহিতলালের কাব্য পাঠ করলেই চোখে পড়বে। ভাব ভাষা ও ভঙ্গীর বলিষ্ঠতা বা পৌরুষই মোহিত-লালকে স্মরণীয়ের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তিনি যে ইচ্ছা করে রবীন্দ্রানুসরণ পরিহার করেছেন তা নয়, তাঁর অন্তর-ধাতু প্রকৃতিই তাঁকে পথান্তরের নির্দেশ দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে নানা ক্ষয়ক্ষতি ও বাধার স্রোতকে প্রতিহত করতে করতে একদিন স্রোতের মুখে নুড়ির কলধ্বনির মত আপনিই তিনি বেজে উঠলেন। জীবনের সেই বাজনা কোন সুরে কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে যদিও তার স্বরূপ আস্বাদন করবার জন্যে এই প্রবন্ধের অর্ঘ্য নিবেদন করতে বসেছি তবু জানি এ প্রয়াস অনেকটা 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'-এর তুল্য, কারণ মোহিতলালের কাব্য-সুষমা আস্বাদন করবার পথে সব চাইতে বড় বাধা হ'ল রবীন্দ্র কাব্যানুশীলনজাত প্রচণ্ড সংস্কার, যে সংস্কার আমাদের মজ্জায় মজ্জায় এত বেশী করে মিশে গেছে যে তার থেকে মনকে মুক্ত করে অন্য সুরে সুর মেলান কঠিন কাজ।

তবু একদিকে যেমন রবীন্দ্র স্নেহচ্ছায়ার বাইরে বসে মোহিতলাল কাব্য সাধনা করেছেন অন্যদিকে আপন আদর্শানুযায়ী লেখক তৈরীর ব্যাপারেও ক্রমাগত উৎসাহ সঞ্চার করেছেন তিনি। কাজী নজরুল ইস্‌লাম সেই উৎসাহের জোয়ারে ভেসে এসে বাংলা কাব্যের রাজ্যে উদিত হল। বাংলা কবিতায় এতদিন যে ললিত-বাণীর সাধনা চলছিল সহসা মোহিতলালের আবির্ভাবে তার ধারা পরিবর্তিত হ'য়ে সেই ললিত বাণী ও ভাব সাধনার সঙ্গে পৌরুষের যোগে বাংলা কাব্যে এক নূতনশ্রী মণ্ডিত হয়ে দেখা দিল। একদিকে যেমন বস্তুতন্ত্রের স্থান হ'ল মানুষের কাব্য কথায়, অন্যদিকে বাস্তবাতীত সুকুমার ভাব-সৌন্দর্যের রূপায়ণ সাহিত্য করে এক নতুন আবেশ সঞ্চার করল। মোহিতলাল, নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দিশারী। যতীন্দ্রনাথ যেখানে বস্তুকে বস্তু হিসেবেই মূল্য দিয়েছেন, কবি মোহিতলাল সেখানে বস্তুকে স্বীকার করে নিয়েও মহৎ কিছুর প্রতীক হিসেবে জীবন্ত-ভাবে তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর নজরুলের কাব্যে একটা উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাস অনেক সময় সার্থক কবিতা সৃষ্টির পথে বাধা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। উন্মাদনা মোহিতলালের কাব্যেও আছে কিন্তু সে উন্মাদনা ভাবের, ভাষার তা কখনো মাত্রা অতিক্রম করেনি। কেউ বলেছেন, মোহিতলাল অঘোরপন্থী কালাপাহাড়, কেউ বলেছেন দেহবাদী ইন্দ্রিয় পূজারী; কিন্তু কবি মোহিতলালের কাব্য পাঠে আপাতদৃষ্টিতে সেরকমটা

মনে হলেও গভীর ভাবে অনুশীলনের ফলে যে সত্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে তাকে কোনমতেই 'ইন্দ্রিয়পূজা' বলে আখ্যা দেওয়া যাবেনা। কেন, তা পরে আলোচনা করছি। মোহিতলালের কাব্য সাধারণ্যে তেমন সুলভ সমাদর লাভ না করার কারণও বোধহয় ওঁর কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবলোকে প্রবেশের পথ পরিচিতির দুরূহতা।

কবিরা অমৃত পথ যাত্রী। কবির বাসনালোক 'আনন্দম্ রূপম্ অমৃতম্।' এদিক থেকে প্রত্যেক কবিই সৌন্দর্য, আনন্দ ও রসসৃষ্টিতে মেতে ওঠে আর সাহিত্যে তার পরিণামের সুসম প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশের ব্যাপারে কতগুলি প্রথা ও সংস্কার কাজ করে থাকে সে সংস্কার হ'তে পারে নীতিগত, রীতিগত কিংবা রুচিগত। রবীন্দ্রকাব্য পাঠে বিমুগ্ধ বাঙালী পাঠকের মনে কবিতা সম্পর্কে যে একটা সংস্কার বা আদর্শ গড়ে উঠেছিল কবি মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ স্বপন-পসারী সেই সংস্কার বা আদর্শের ভিত্তিমূলে অকস্মাৎ নাড়া দিল :

"ফিরি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি—
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত—পান্না কি হীরা
মুকুতার হার দামী।"

* * *

"যে বীণা বাজাতে আলো-নীহারিকা
ছায়া পথে যায় থামি'—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন-পসারী আমি।"

কবি মোহিতলাল আধুনিক বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বপন-পসারী। আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগ ও কামনা, বাসনা, কল্পনার যে স্বপ্ন প্রত্যহের আঘাত-খাওয়া মানুষগুলি দেখে এবং দেখে মুগ্ধ হয় কবি তাকেই জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক পরম সম্পদ বলে মনে করেন। সে স্বপ্ন, সে আকাঙ্ক্ষা হয়ত ক্ষণিকের তবু সে তো মিথ্যে নয়। জগতের মহান স্বপ্নই এক কালে সত্য হয়ে দেখা দেয়। আর তা ছাড়া এই স্বপ্নই বা মিথ্যে কিসে? মানুষতো স্বপ্ন দেখতে চায়, দেখে খুশীও হয়। কবিও সেই স্বপ্ন-রচনা করেন :

"যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আঁকা আছে হৃদয়ের পাতে
জল-রেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা!"

মানুষের যত স্বপ্ন থাকনা সে ঐ জল-রেখার মতই মুহূর্তে মিলিয়ে তবু জীবনের সেও তো আরেক দিক, আরেক ছবি যা না হলে বিশ্বের সমগ্র লীলা বৈচিত্র্যই পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না। অনুভূতির ক্ষেত্রে জীবনের স্বপ্ন-বলয়ের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিই মোহিতলালের কাব্যের মূল সুর। চরম বা পরমকে কবি পেতে চান কিন্তু সেই চরম বা পরমের লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে যে আনুষঙ্গিকগুলিকে অবলম্বন করে যেতে হয় সেই সমস্ত আনুষঙ্গিকের অস্তিত্বও কবি পৃথকভাবে ভাবতে চান না, কেননা তা হলে তো দৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না :

"ফুলের ছিয়ার মধু,
চাহিনা চাহিনা বঁধু!
রেশমী-রঙীন্ পাপড়ি যদি না
চরিধারে পড়ে লুটে!"

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিত-লালের মিল স্পষ্ট; আরো, বেশী স্পষ্ট বৈষ্ণব মহাজনদের সঙ্গে। যদিও মোহিতলাল অবলম্বনকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে সমোৎসুক : "হায় দেহ তুমি ছাড়া নাই কেহ", তবু দেহের অপূর্ণতা সম্পর্কে তার অনুভূতি সজাগ : "আমি যে বঁধুরে কোলে ক'রে কাঁদি মুখপানে তার চেয়ে।'

যে অর্থে কবি বা শিল্পীকে বলা হয় সুন্দরের পূজারী মোহিতলাল সে অর্থে ই খাঁটি কবি। ওঁর

কাব্যে—ভাব, ছন্দ বা শব্দ প্রয়োগ—কোন দিক থেকেই যা সুন্দর নয় তার প্রশ্রয় নেই এবং যেখানেই রূপের সন্ধান পেয়েছে কবি সেখানেই তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর কাব্যের উপাদান। এই দিক থেকে কবি মোহিতলালকে রূপতান্ত্রিক কবি বললে খুব ভুল হবেনা :

"আমার দেবতা সুন্দর সে যে।
পূজা নয়, ভালোবাসি।"

এই ভালোবাসাকেবল সুন্দরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে পারেন কবি। ভালোবাসার বস্তুকে সুন্দর করে নেবার প্রশ্ন নয়, সুন্দরকে ভালোবাসার মধ্যে রূপময় করে রাখার চেষ্টা কবিমানসে বলবতী। এই সৌন্দর্যানুভূতিতে অনেকটা রাসিক ও ওমরখৈয়ামের স্পর্শ লেগে থাকতে পারে অন্ততঃ যখন দেখি অনিশ্চিত জীবনের ক্ষণগুলিকে আনন্দময় করে তুলবার ঐকান্তিক আকৃতি অনেকগুলি কবিতায় উদ্ভাসিত, তবে ঐ কবিদ্বয়ের সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে মোহিতলালের রূপানুভূতি যোগ করে এই কবির কবিমানসকে বুঝতে হবে। এই রূপের সাধনায় নারীর স্তুতিগান বারেবারে; এ নারী রক্তমাংসের নারীও বটে আবার ভাবানুষঙ্গ রমণীও বটে। এই রূপে মোহ আছে সত্য কিন্তু সে মোহে কবির সৌন্দর্যদৃষ্টি লুপ্ত করে লালসায় ভরে দিতে পারে না। ভাবের দিক থেকে যে রূপ ও সৌকুমার্য কল্পনা নিয়ে কবি মোহিতলাল বাংলা কাব্যের জগতে আবির্ভূত সে রূপ ও সে সৌন্দর্য শিল্প-প্রবৃত্তিতেও সমানভাবে অটুট থেকে কবিতাকে যথার্থ কাব্যশ্রীমণ্ডিত করেছে। সাবলীল ছন্দ ঝঙ্কারমুখর শব্দলহরী, দেশী ও বিদেশী শব্দের যুক্ত প্রয়োগ—সবকিছুই সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়ে কাব্যে বিদ্যমান। কবিতা রচনার সময় কবি সতর্ক দৃষ্টি রেখে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও চাপল্যকে সংযত করে রাখতে পেরেছিলেন বলে কাব্যে গাঢ়বদ্ধতা ও একটা দানা মোহিতলালের কাব্যকে অন্য কবির কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই সংযমের পিছনে কবির সমালোচক বুদ্ধি তীক্ষ্ণভাবে সর্বদা কাজ করত তাই এই তীক্ষ্ণতা কবি যে তাঁর কাব্যে বুদ্ধিবাদকে একটা বড় আসন দিবেন এতে আশ্চর্য কি! কবির অনুভূতি যখন তীব্রতম হয়ে উঠছে তখনও বুদ্ধির অলঙ্করণ কবিতায় তাঁকে তাঁকে আত্মগোপন করে একটা বক্তব্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে এবং সম্ভবতঃ এই জন্যেই মোহিতলালের কবিতা অলস কাব্যামোদীদের তৃপ্তি দিতে পারে না; মনের রাশ একটু শিথিল হলেই কাব্যের অর্থ ও সৌন্দর্য উভয়েই পাঠককে বঞ্চিত ক'রে কেবলমাত্র ছেঁড়া-তার সেতারের বেসুরো শব্দঝঙ্কারে পরিণত হয়। পাঠকের তা ভাল না লাগারই কথা। তাই মোহিতলালের কবিতা পাঠ করবার সময় একটু ধৈর্য, একটু সহৃদয় না হলে কাব্য সৌন্দর্য পাঠককে ফাঁকী দিবেই। মোহিতলাল তাঁর বিভিন্ন কবিতায় শব্দ ও অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্বন্ধ ঘটিয়ে যে আবেশ সৃষ্টি করেছেন সেই আবেশ তারাই গ্রহণ করতে পারবেন যারা শুধু সাহিত্য-রস পিপাসুই নন্ সেই সঙ্গে ভাষাশিল্পের অনুরাগীও বটেন। বস্তুতঃ শব্দ প্রয়োগের দিক বাদ দিলেও কবিতা গঠনপদ্ধতির যে ব্যাকরণ তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে পরিচিত না হলে সম্পূর্ণ কাব্যরস গ্রহণে বিপত্তি অনিবার্য। তাঁর গঠনপদ্ধতির সঙ্গে গ্রীক ভাস্কর্যের তুলনা চলে—একটা অনমনীয় বলিষ্ঠতা, পরিচ্ছন্নতা, স্পষ্টতা ও সামঞ্জস্য কবিতাগুলিকে প্রায় ক্ষেত্রেই গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ ক'রে তুলেছে অথচ সেই বলিষ্ঠতা ও ঋজুতাকে ঘিরে একটি লাবণ্য অহরহ বিরাজ করছে। কাব্যের নিজস্ব ছন্দও এইখানেই সুষমা ঢালছে। কবিতা সম্বন্ধে যে সংস্কার সাধারণের মনে বাসা বেঁধেছে—ললিত ভাব ও ভাষার সাধনা—সে সংস্কারের অনুবর্তী পাঠক মোহিত-লালের কাব্য আস্বাদনে পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে পারে না, কেননা এই কবি ললিতের সঙ্গে কঠোরের চিরন্তন-প্রিয়া সম্বন্ধ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। এমন কি ছাদ্যাচালের কবিতাগুলিতে যেখানে প্রধানতঃ কবিতাকে ছন্দের দোলায় লঘুনীর মত ভ্রুত ও সুষম ভঙ্গীতে চলতে দিয়েছেন কবি, সেখানেও একটা অন্তর্বাহী গভীর ভাবস্রোত লক্ষ্য করা যায়; পরিবেশ ও ভাবের অনুগামী ভাষা

প্রয়োগ করেও ছন্দোবৈচিত্র্যে কাব্য সর্বক্ষণ শ্রুতিকে পরিতৃপ্ত করে শ্রোতাকে উতলা করে তোলে। শ্রীমধুসূদন সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলাল যা বলেছেন—কান ও প্রাণের মিলিত সাধনা ছিল মধুসূদনের—কবি মোহিতলাল সম্পর্কেও সে উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যান্য অনেকদিক থেকেই মধুসূদনের সঙ্গে মোহিতলালের রচনার আদর্শগত একটা সাদৃশ্য ছিল। সনেট রচনায় অমিতাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে, শব্দ নির্বাচনে এবং ঐতিহ্যের নব ব্যাখ্যায় এই দুই কবিতে অশেষ মিল। সাহিত্য সাধনা ছাড়া মোহিতলালের অন্য কোন সাধনা ছিলনা এবং সেই সাধনাই তাঁর জীবন সাধনা। জীবনের রূপই তাঁর কাছে কাব্য। রূপ ছাড়া রসের কোন পৃথক সত্তা নেই, দেহ ছাড়া যেমন আত্মা। রূপের সার্থক অভিব্যক্তিই রসের সার্থক সংজ্ঞা এবং দেহের রহস্যময় বিকাশই আত্মার অস্তিত্বকে ধারণায় পৌঁছে দেয়; জীবন সাধনের কাছে কেবল দেহবিমুক্ত সুউচ্চ কল্প-মার্গে আত্মার সন্ধান সম্ভব নয়; কবিকেও তেমনি কেবল রসের ভাবনা ভাবলে চলেনা, রসকে সুষ্ঠু অভিব্যক্তি দিতে হবে কথায় এবং তা সম্ভব হয় রূপের মধ্য দিয়েই। কবি মোহিতলাল জীবনের সেই রূপকে গ্রহণ করেছেন যা দেহ, আত্মা চিত্তবৃত্তি সমূহের সব কিছুকেই অবলম্বন করে সত্যস্বরূপে বর্তমান। সেই রূপময় সত্তার মধ্য দিয়ে কাব্য রসের প্রস্ফুরণ কবিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেছে এবং সে জন্যে এই কবির রচনায় বারংবার সহজ প্রবৃত্তিগুলি এক কল্প-সৌন্দর্যে শোধিত হয়ে কাব্য-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যে নারী কবির কামনায় ধরা দিয়েছে সে রক্ত-মাংসের নারী হ'য়েও সমস্ত কিছু পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে। এইখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারা কবিকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে, এ অনুমান অসঙ্গত নয়, অন্ততঃ যখন দেখ্‌ছি এই কবির কাব্যে প্রায় সর্বত্রই জীবনের এক ব্যথাঘন মুহূর্তের দিকে কবিমন ছুটে চলেছে এবং সেই ব্যথা কখনো ওমরখৈয়ামী বিষাদে পরিণত না হয়ে এক একটি সত্য জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুতঃ মোহিতলালের কাব্যে মানুষের বাসনালোকের সংঘাতটি সর্বদাই যেন এক একটি জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে চলেছে। এ জিজ্ঞাসা নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সত্য ও নীতির, প্রেম ও সুন্দরের, পাপ-পুণ্যের, অতীত ও বর্তমানের এবং সর্বোপরি জীবন ও ইতিহাসের। বলা বাহুল্য, এজন্যে কবিকে বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়েছে, আবার প্রাণের নিক্তিতে তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্বকে লঘুগুরুর পর্যায় ওজন ক'রে নিতে হয়েছে এবং তা করতে গিয়ে কখনো কবিকে প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করতে হয়েছে, শাস্ত্র-অনুশাসনের পথ লঙ্ঘন করে পরমাত্মার স্থানে জীবাত্মাকে অধিষ্ঠিত করে কালা-পাহাড় আখ্যা গ্রহণ করতে হয়েছে, সুন্দরের অভি-ব্যক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে নারীদেহের সৌষ্ঠব সম্পদকে সহায়ক রূপে গ্রহণ করে তাকে বাসনার প্রতীক হিসেবে রূপশ্রী দান করতে হয়েছে। এ যে কত বড় রূপপিপাসা, কত বড় ধারণাশক্তি ও নিষ্ঠাপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা তা অক্ষরে লিখে পাঠকের মনে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় যদি না কবির ক্লাসিক্যাল ধর্মী কাব্য পাঠে পাঠকের সেই চেতনার উদয় হয়।

মাত্র চার পাঁচখানা কবিতা গ্রন্থ রচনা করে এযুগে সম্ভবতঃ বাংলা কাব্যের আর কোন কবি এমন বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন নি যেমন পেরেছেন কবি মোহিতলাল তাঁর স্বপন-পসারী, স্মরগরল, হেমন্ত-গোধূলি, বিস্মরণী কবিতা গ্রন্থে। কোন এক কথাসাহিত্যিক এই কবির চেতনার কোন ক্রমপরিণতি কাব্যে না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হবার কিছু নেই কারণ মোহিতলালের সমগ্র কবিতাগুচ্ছের মূলসুর কখনোই বিবর্তিত হয়নি; হয়নি যে তার কারণ কবির চিন্তা একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে আকর্ষণ করে কাব্যে প্রলম্বিত হয়েছে তির্যগভঙ্গীতে। কিন্তু সব মানুষের মত কবি মোহিতলালেরও মূল চিন্তায় যখন অন্য এক চেতনার ঢেউ উঠল তখনই তিনি স্বেচ্ছায় কাব্যসাধনা ত্যাগ করে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ক্ষুরধার উদ্যত লেখনী চালনা করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক রূপে দেখা দিলেন। কিন্তু সে এক গ্রন্থান্তরের পরিচয় বলে কবি মোহিত লালের কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা অপটু হস্তে এইখানেই শেষ করছি।

[ছ]

সংসারে দিদি বলতে আমার ঐ চক্রধরপুরের একই মাত্র দিদি। বয়সে মিঠেমিষ্টি না হলেও কাছাকাছি। ঠাট্টা ইয়ার্কিটা তাই আগাগোড়াই চলে আসছে। একবার তাই ছিলেবে আমার জুলুমটাও সহ্য করতে হয়েছে তাকে মাঝে মাঝে। তার পিছনে অবিশ্যি স্নেহের মূর্তি জামাইবাবু যদি না থাকতেন, তবে কি ছোড় বলতে

সঙ্গতিপন্ন অবস্থা বলেই অবশ্য স্নেহের আতিশয্য প্রকাশে কার্পণ্য নেই তাঁর কোনোকালে। এবারে জামাইবাবুর চিঠির জবাবে দেখলাম দিদিই উপযাচক হয়ে যেচে চিঠি লিখেছে আমাকে, সেই সঙ্গে একশো টাকার একটা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার। এ না হলে আর দিদি! মনে মনে ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে একান্ত আগ্রহেই তাড়াতাড়ি খামখানি খুললাম। দেখলাম, ছেলেবেলা না হলেও এখনও সেই ঠাট্টা-রসিকতার বহর এতটুকুও কমেনি দিদির।—"বি.এ পড়তে পড়তে বিয়ের কিছু যোগাযোগ ঘটাচ্ছিস না তো কোথাও? তোকে নিয়ে বিশ্বাস নেই, যে একগুঁয়ে একরোখা ছেলে তুই! শুনেছি, তোদের আবার কো-এডুকেশন ক্লাস। দেখিস, শেষ পর্যন্ত আবার যাচ্ছেতা কিছু বাধিয়ে না বসিস। টাকার প্রয়োজনের কথা লিখেছিস, জরুরী মনে করে তাই টেলিগ্রাফেই পাঠালাম। এই দিয়ে শাড়ী ব্লাউজ কিনতে গেলে চটাৎই আবার হাতশূন্য হয়ে পড়বি। তখন কিন্তু আমায় অবস্থাটাও বিপজ্জনক হবে।"—হাসি পেল দিদির চিঠি পড়ে। অনুমান তবে কিছু-একটা করেছে বটে। কিন্তু এই নিয়ে রসিকতা করলেও কোনোদিন যে প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে না, এবিষয়ে ধ্রুব।

টেষ্ট পরীক্ষা সবে মাত্র শেষ হয়েছিল। মোটামুটি মন্দ হয়নি পরীক্ষা। অধিমার নম্বর অধিকন্তু বেশী থাকবে সন্দেহ নেই। বেশী থাকলটাই শ্রেয়। ভাবলাম টাকাটা এবারে তার হাতে তুলে দিয়েই তবে দিদির চিঠির জবাব দেবো। ইতিমধ্যে বাউন্ডলীর বিল দেবে হরিমোহন মণ্ডলের এক রেজেষ্ট্রী এসে উপস্থিত। চিঠির সঙ্গে থাকা আমার চাহিদার মাত্র এক-চতুর্থাংশ মুদ্রা। সর্বসাকুল্যে মাত্র পঁচিশ। রেজিষ্ট্রী খুলেই সমস্তটা মা যেন কেমন একখণ্ড অনন্ত অন্ধকারের মতই সহসা জ্বলে উঠলো। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করবার জন্যেই কি তবে হরিমোহন মণ্ডলকে অমন কাতর প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম? সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি এদের হাড়ে হাড়ে। রসিয়ে রসিয়ে লিখেছে: 'বহু চেষ্টা করিয়া তবে এই পঁচিশ টাকা পাঠাইতে পারিলাম। ইহাকে অগ্র ভাবে খরচা লিখিয়া তবে কর্তাবাবুর কাছে আমাকে আয়ব্যয়ের পুরা হিসাব পাঠাইতে হইবে। দিনকালে অবস্থা খারাপ, খাজনাপত্রের ইদানিং আর তেমন আদা নাই ইত্যাদি।' মনে মনে বললাম, খাজনাপ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাক না কেন! দুনিয়ার মা একস্তরে এসে না দাঁড়ালে মানুষে মানুষে সাম্যবাদ আস কি করে! কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ যে আম নিতান্ত স্বার্থান্ধ হৃদয়েরই ব্যর্থতাসূচক উক্তি—সে ক কি আমার কাছেই কিছু ঢাকা রইল! তাই না পাওনাকে হাসি মুখেই গ্রহণ করে হরিমোহনকে জাম বাবুর সঙ্গে একত্রে যোগ করে রাখলাম। মোটা

অন্তটা যাহোক একশো পঁচিশে দাঁড়ালো। অণিমার কিস্ দাখিলের ব্যাপারটা অন্ততঃ ঠেকে থাকবে না এতে।

কলেজ-বোর্ডে কিস্ দাখিলের নোটিশ আগে থেকেই ঝুলছিল। দেখলাম, সময় আর আদৌ বসে নেই। এবারে তাই নিজে থেকেই একদিন সন্ধ্যার দিকে উদ্যোগ করে বেরিয়ে পড়লাম অণিমাদের বাড়ীর দিকে। বাড়ী ছাড়া উপায় নেই, কলেজের দৈনন্দিন এ্যাটেণ্ডেন্সের সম্পর্ক কেটেছে, অতএব বাসা ভিন্ন দেখা পাবার পথ কোথায়! জানতুম—এভাবে হঠাৎ আজ আমাকে আচমকা তাদের বাড়ীর দরজায় দেখতে পেয়ে খুশীতে উছলে পড়বে অণিমা, সেই সঙ্গে শীলাও। বলতে ভুলে গেছি যে, এবারে যখনদিনেই কিন্তু শীলা এসে বাড়ীতে আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমি অবিশ্যি তাতে পিছ-পা হইনি। রংচঙে মলাটের মনোরম খান দু'য়েক ছবি ও ছড়া'র বই এনে রেখেছিলাম তার জন্তে। হাতে তুলে দিতেই খুশীতে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসেছিল শীলা আমার ঘর থেকে। আজ অবিশ্যি ছবি ও ছড়ার বই নয়, পুরোপুরি একশো পঁচিশ টাকা, তাও শীলার জন্তে নয়—শীলার দিদির জন্তে।

কিন্তু এসে পৌঁছাতেই অভ্যর্থনাটা কিন্তু সেই প্রথম বারের মতো অণিমার পক্ষ থেকে এলো না, এলো শীলার দিক থেকে। শীলাই দরজা খুলে দিয়ে বৈঠক-খানাঘরের সংলগ্ন তাদের ষ্টাডিরুমে নিয়ে গিয়ে বসালো। বললো, 'কি মজা, আপনি আজ আমাদের এখানে আসবেন, এ কথা ভাবতেই পারিনি সুমন্ত দা!'

বললাম, 'তা তো যেন পারোনি, কিন্তু তোমার দিদি কোথায়?'

—জানি নেই, বাড়ী ছেড়ে পালায় নি দিদি, বাড়ীর ভিতরে ব্যস্ত আছে।' দ্রুত কথার ভারে কণ্ঠকে ভারাক্রান্ত করে তুললো শীলা। বললো, 'বসুন, একটু বাদেই ডাকছি দিদিকে।'

সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে খানিকটা অসহিষ্ণু হয়েই উঠছিলাম। শীলার সঙ্গে বসে কতক্ষণই বা গল্প করা যায়? বললাম, 'দেরী মানে, এক্ষুণি যা নয় কেন?'

বোধ করি এবারে কিছুটা হজা পেল শীলা, বললো, 'বসুন না, দেখবেন—দেরীর মানেটা এরপর আপনি নিজে থেকেই ধরতে পারবেন।'

একথা দিয়ে কি বলতে চাইল ও, বুঝতে পারলুম না। বাড়ীর ভিতর থেকে তখন কেমন একটা কাপড়া গোছের উচ্চ কণ্ঠস্বর দেয়াল ভেদ করে ভেসে আসছিল এদিকে। দু'টিই নারীকণ্ঠ! কেউই ছেড়ে কথা কইবার মতো নয়। একজনের কণ্ঠ স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো: 'লেখাপড়া আর লেখাপড়া, নিকুচি করি অমন বি.এ, এম.এ পাশের। বাপ মরতে-মরতেও এখনও সংসারে পয়সা এনে দু'গ্রাস ভাতের ব্যবস্থা করছে। আর লেখাপড়া শিখে দিব্যি চক্ষু বুজে তো দু'বেলা গিলছিস। লজ্জা থাকলে পারতি না কি এরই মধ্যে দু'পয়সা কামাই করবার চেষ্টা করে বুড়ো বাপটাকে বিশ্রাম দিতে! কত মেয়ে শুনি ম্যাট্রিক পাশ করেই দিব্যি মোটা মোটা মাইনের কত জায়গায় চাকরী করছে! সেদিক দিয়ে কেন ছাইবি, বসে বসে গিলবি আর বাপের আদ্দু কর করে বি.এ পাশ দিয়ে মেমসাহেব হবি। কোথাও কারুর ঘরে গতি হলেও বুঝতাম—একদিকের সুরাহা হলো, তাও তো নয়: গায়ে পড়ে সম্বন্ধের কথা তুলতে গেলেও তো দেখি নোটা পণের অঙ্ক ছাড়া কেউ কথা বলে না। পোড়ারমুখীর কপালের কথা আর বলি কাকে!'

উত্তরে দ্বিতীয় কণ্ঠের তাপও বড় কম প্রকাশ পেলো না। আত্মপ্রত্যয়ের স্পষ্ট ঘোষণা: 'কাউকে বলতে হবে না তোমাকে! পারিতো এরপর গলায় দড়ি দিয়েই তোমার গর্ভযন্ত্রণার জ্বালা মিটাবো। কেন যে তুমি আমার মা না হয়ে সৎমা হলে না, শুধু এই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই।'

কণ্ঠস্বর অপরিচিত ছিল না। স্পষ্টই বুঝলাম—কণ্ঠস্বরের মানুষ দু'টি আর কেউ নয়, অরুণাংশু দেবী

আর তার মেয়ে অনিমা। শীলার জন্মদিনে যেদিন প্রথম এসে অরুণাংশু দেবীর হাত থেকে মিষ্টির প্লেট নিয়ে অনিমা আর শীলার সঙ্গে মিষ্টান্ন ভোজের মহোৎসব সৃষ্টি ক'রে তুলেছিলাম—সেদিন মনে হ'য়েছিল— এ বাড়ীর কি অদ্ভুত সাংস্কৃতিক আবহাওয়া! তারপর দুঃখের কিছুটা আভাষ পেলাম অনিমার মুখে। আমার নিজের জীবনের ব্যর্থতা দিয়ে সেদিন কিছুটা পরিমাপ ক'রতে গিয়েছিলাম অনিমার সেই দুঃখক্লান্ত উক্তিকে। কিন্তু এমন ভাবে যে সে-দুঃখ অন্তঃশীলা স্রোতের প্রায় এ সংসারের মর্ম্ম-মূল দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, তা কল্পনা ক'রতে পারিনি। আগে যা ভেবেছিলাম, তা একেবারেই ভুল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা গা একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো: শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই গলায় দড়ি দেবে না তো অনিমা!

ইতিমধ্যে আচমকা পাশ থেকে শীলার কণ্ঠে বেজে উঠ্‌লো: 'আপনার এবারের বই দু'টো আগের বই দুটোর চাইতেও সুন্দর। সেদিন বিড়াল আর গিনিপিগের একটা গল্প প'ড়তে প'ড়তে গড়াগড়ি যাচ্ছিলাম আর কি: ছড়াগুলোও তেমনি, ভারী চমৎকার।'

কিন্তু শীলার কোনো কথাতেই আর মন ব'সছিল না। বাড়ীর ভিতর থেকে যে-অশোভন উক্তিগুলো অনবরত ভেসে আসছিল, কান দু'টো সেদিকেই সজাগ হ'য়ে গেল। শুনতে গিয়ে আড়ালে ব'সে নিজেও বড় কম লজ্জা বোধ ক'রছিলাম না। একটা কিছু হুঁ-হাঁ' ক'রে যে শীলাকে প্রশমিত ক'রতে পারবো, তারও ভরসা কম। এর চাইতে বোধ করি এখান থেকে উঠে যাওয়াই মঙ্গল ছিল কিন্তু তাতে যে সর্ব-নাজল্য রক্ষিত হবে না, তাতে ভুল কি! অনিমার হাতে টাকার গোছাটা তুলে দিতে না পারা পর্যন্ত আমিই বা নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি কই? বাধ্য হয়েই তাই অপেক্ষা ক'রতে হ'লো এবং শীলার কথারও জবাব দিতে হ'লো সেই সঙ্গে। ব'ললাম, 'তা হ'লে বই দু'খানি আনা আমার সার্থক হ'য়েছে, কি বলো?'

—'এমন বইয়ের কি তুলনা হয়!' মিষ্টি হেসে শীলা ব'ললো, 'লজেন্‌চুষের চাইতেও মিষ্টি মিষ্টি সব ছড়া আর গল্প।'

ব'ললাম, 'এম্‌নি সব বই পেলে তুমি তবে লজেন্‌চুষ না খেয়েও থাকতে পারো?'

—'ধু-ব।' ব'লে কচি কচি ঠোঁট দু'টির বিচিত্র একটা ভঙ্গী ক'রলো শীলা।

বেশ লাগ্‌লো দেখতে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ইতিমধ্যে ঝড়ের মতো সশব্দে দরজা খুলে এসে ঘরে প্রবেশ ক'রলো অনিমা, এবং হঠাৎ সাম্‌নে আমাকে দেখেই বিস্ময়ে চোখ দু'টো কপালে তুল্‌লো। শীলা কিন্তু বুঝে-শুনেই উঠে এবারে ঘর ছেড়ে পালালো, না পালিয়ে তার উপায় ছিল না। বাড়ীর ভিতরে এতক্ষণ মা আর দিদির মাথা যেভাবে কার্পেসের মতো তেতে উঠেছিল, রাগের ঝাল্‌টা শেষ পর্যন্ত কেন-না শীলার উপর দিয়েই ঝেরে দিয়ে বসে দিদি!

অনিমার চোখমুখ থেকে তখনও আগুনের জ্বালা কমেনি। তারই উপর দিয়ে খানিকটা স্বাভাবিকতার আভাস টেনে এনে জিজ্ঞেস ক'রলো: 'তুমি? এ আমি ভাব্‌তেই পারিনি। কতক্ষণ এসেছ?'

খানিকটা মিথ্যে কথার আশ্রয় নিয়েই এবারে ব'লতে হ'লো: 'বেশীক্ষণ নয়, আমিও এলাম আর তুমিও এসে ঘরে ঢুকলে।'

অনিমা ব'ললো, 'আর একটু আগে আস্‌তে তো শুনতে পেতে কিষ্কিন্ধা পর্ব্ব!'

ব'ললাম, 'কেন, কি ব্যাপার, রামায়ণ গান হ'চ্ছিল নাকি বাড়ীতে?'

—'রামায়ণই বটে! এ যুগের রামায়ণ গান এম্‌নি ক'রেই গাওয়া হয়।' থেমে অনিমা ব'ললো, 'তা—রামায়ণ গানই ব'লতে পারো। শুনলে কোনোদিন আর এ বাড়ী মুখো হ'তে না।'

ব'ললাম, 'হেঁয়ালী রেখে পরিষ্কার ক'রেই বলো না কেন কথাটা! সাইকোলজি নিয়ে পরীক্ষা দিলেও সব সময় কি আর হেঁয়ালীটা ভালো লাগে?'

—'কিন্তু আমার পক্ষে যে হেঁয়ালী না ক'রে উপায় নেই সুমন্ত!' অণিমা ব'ল্‌লো, 'যে মুহূর্ত্তে হেঁয়ালীর ভিৎ ধ্ব'সে প'ড়বে, সেই মুহূর্ত্তে জ্ব'লে প'ড়বে আমাদের গোটা সংসারের ঐতিহ্যও। তাকে মিথ্যে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে লাভ নেই।'

ব'ল্‌লাম, 'তবে থাক, কাজ নেই হেঁয়ালী ভেঙে। কিন্তু সত্যিই কি শেষ পর্য্যন্ত তুমি গলায় দড়ি দেবে নাকি?'

—'হাউ রিপক্লিট্ ইউ আর!' কেটে প'ড়লো এবারে অণিমা: 'তবে যে ব'ল্‌লে—এইমাত্র তুমি এসেছ! দরজার আড়াল থেকে কিছুই তবে এতক্ষণ তোমার কাছে লুকোয়নি, দেখ্‌তে পাচ্ছি।'

—'দেখ্‌তে তুমি ঠিক পাওনি।' ব'ল্‌লাম, 'লুকোবার যা, তা লুকিয়েই ছিল, শুধু ঐ কথাটাই কেবল কানে এসেছিল।'

দারুণ একটা অস্বস্তি নিয়েই এবারে অণিমা ব'ল্‌লো: 'আই এ্যাম্ টু টায়ার্ড, সুমন্ত। তোমাকে সেদিন যা ব'লেছিলাম, আজ তারই আর-এক পশলা হ'য়ে গেল। মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আসে জানি, তাই ব'লে কোনো মা তার মেয়েকে কখনও বিষ চোখে দেখে ব'লেও কি কোনো ইতিহাসে পেয়েছ?'—কথাগুলো অপেক্ষাকৃত চাপাকণ্ঠেই ব'ল্‌লো অণিমা।

ব'ল্‌লাম, 'ওটাও দারিদ্র্যেরই দোষ। তা নিয়ে দুঃখ ক'রতেও নেই, লজ্জা পেতেও নেই। তা যাক্, কলেজে ফিস্ কবে জমা দিচ্ছ বলো?'—কণ্ঠকটা কথান্তরে টানতে চেষ্টা ক'রলাম অণিমাকে।

তেম্‌নি অস্বস্তি নিয়েই ব্যর্থতার কণ্ঠে অণিমা ব'ল্‌লো: 'আমার বোধ হয় আর পরীক্ষা দেওয়া হ'লো না সুমন্ত! ফিসের টাকার প্রশ্নটা অবিশ্যি আছে, কিন্তু তার চাইতেও আজ বড় সমস্যা হচ্ছে আমার মন। মনের দিক থেকে আজ আর কোনো কিছুতেই সাড়া পাচ্ছি না।'

অণিমার এ দুর্বলতা আজ্‌কের নতুন নয়। আগের মতো এবারও তাই সান্ত্বনা দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'আজ আবার নতুন ক'রে নিজের সম্বন্ধে এ দীনতা কেন, বলো তো? ক্ষুরধার সংসার-পথকে দৃপ্তপদে অতিক্রম করার মধ্যেই তো জয়ের আনন্দ। তুমি তো কোনোদিন এমন দুর্বল ছিলে না!'

—'মানুষ অবস্থার দাস জানো। তাতে আবার এই পোড়া বাংলাদেশের মেয়ে!' খেপে অণিমা ব'ল্‌লো, 'সংসারে তোমরা পুরুষেরা কতটুকু বুঝবে মেয়েদের গ্লানি? এ দেশে মেয়ে হ'য়ে জন্মানো পাপ!'

—'তা হলে তো ব'ল্‌তে হয়, পুরুষের জন্মটাও নিতান্তই অপরাধমূলক।' ব'ল্‌লাম, 'সাইকোলজির ছাত্রী হ'য়ে এটুকু মনে করি নিশ্চয়ই তুমি বুঝবে!'

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে অণিমা ব'ল্‌লো, 'বুঝবার মতো আজ আর মনও নেই, মাথাও নেই। এ নিয়ে তাই আর তর্ক ক'রতে পারবো না তোমার সঙ্গে।'

দরজার কাছে টুক্ ক'রে কিসের যেন একটা শব্দ হ'লো। ভাব্‌লাম—লীলাই হয়ত এলো! কিন্তু সে-ই যে লীলা গেছে, আর তার দেখা নেই। দেখা পাবো, এমন ভরসাও বোধ ক'রলাম শব্দটা নিতান্তই একটা শব্দ মাত্র, কারুর আগমনের ইঙ্গিত নয়।

লীলার কথাটাই তাই একবার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম অণিমাকে, বাধা দিয়ে অণিমা হঠাৎ ব'ল্‌লো, 'তুমি যদি আজ অন্ততঃ চাকরী ক'রতে সুমন্ত!'

আধখানি কথাকে হঠাৎ এমন ভাবে ব'লে কী যে ইঙ্গিত করতে চাইল অণিমা, সেটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হ'লোনা। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হ'তো চাকরী ক'রলে?'

—'কি আবার হ'তো!' মনের আসল কথাকে খুলে ব'লতে হয়ত কিছু সঙ্কোচ বোধ করলো অণিমা, তাই বোধ করি আসল বক্তব্যকে চাপা দিয়ে বল্‌লো, 'এতকাল

গুচ্ছের কাগজ আর লেখা ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে, ও-কাজ ছেড়ে যেন সত্যিই ভালো লাগছে না। তুমি চাকুরে হ'লে তোমার মাইনের টাকার ছোট্ট মতোও একখানি মাসিক কি ত্রৈমাসিক বার ক'রে অবসর সময়টা তার মধ্যে ডুবে থাকতে পারতুম।'

এবারে সত্যি সত্যিই হাসি পেলো। ব'ললাম, 'এই না ব'লেছিলে পাশ ক'রে বেরিয়েই তবে পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা দেখবে?'

অনিমা কিন্তু হাসলো না, ব'ললো, 'তা আর হয়েছে! এখনই ঘরে তিষ্ঠোনো বিপদ, এরপর চাকরী ক'রে সংসারে টাকা না ঢাললে কি নিস্তার আছে! পত্রিকা প্রকাশ ক'রে অন্ততঃ সেটা সম্ভব নয় নিশ্চয়ই। বাংলা দেশের পাঠকদের অবস্থা আমার চাইতে খুব বেশী উন্নত হ'লেও না-হয় বুঝতাম, এখানে বিনে পয়সার খদ্দের পাওয়াও মুস্কিল। বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর ক'রে এদেশে সাপ্তাহিক কাগজ চালানো ছাড়া গতি নেই।'

হাসি চেপে রাখতে পারছিলাম না, ব'ললাম, 'এমনি কাগজই তবে তুমি চালাবে!'

—'ক্ষতি কি!' অনিমা ব'ললো, 'ব্যবসা না বাড়লেও কালচার তো বাড়বে! মানুষের মনে কাগজ পড়বার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়াও যে একটা বড় কাজ! এ কাজই বা ক'জন পারে?'

তা সত্যিই পারে না, পারলে আর এদেশের দুঃখ ছিল কিসে! অনিমার কথা শুনে বরং মুগ্ধই হ'লাম এবারে। কিন্তু তাতেও যে পয়সার প্রয়োজন, বিরাট অর্থনৈতিক ভিত্তি ভিন্ন যে সে কাজও সম্ভব নয়, একথাটা বোধ করি কথার উচ্ছ্বাসে একেবারেই ভুলে গিয়ে থাকবে অনিমা। তা থাকুক। অনিমাও সত্যি সত্যি কিছু কাগজ বার ক'রছে না, অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নটাও তাই স্বপ্ন ভিন্ন কিছু নয়। সামনের দেয়ালের দিকে একবার চোখ দু'টি তুলে ধরলাম। শীলা দেখলাম সত্যি সত্যিই আমার কথা রেখেছে। আমার ঘর থেকে সেদিন ক্যালেণ্ডারখানিকে এনে তার দিদির পড়ার টেবলের সামনেই টাঙিয়ে রেখেছে। জানতে বাকী ছিল না যে, শীলারও পড়বার যায়গা এই ঘরে।

স্বল্পক্ষণ থেমে অনিমাই আবার প্রশ্ন ক'রলো: 'কি দেখছো, ক্যালেণ্ডার?'

বললাম, 'দেখছি কেমন মানিয়েছে।'

—'এ তুমি ক'রতে গেলে কেন, বলো তো?' অনিমা ব'লুলো, 'যে ছবি তোমার ঘর আলো ক'রে ছিল, তাকে এমন ক'রেও শীলার হাতে তুলে দিতে পারলে? এ তুমি ভালো করোনি, যাই বলো।'

বললাম, 'এই বা মন্দ হ'লো কিসে! ঘর আলো ক'রবার মতো গুণই যদি ছবিটার র'য়েছে, তা হ'লে এসেই বা সে এমন কি অপরাধ ক'রলো? তুমি ভালোবেসেছিলে একদিন ছবিটাকে, তোমার সেই ভালোবাসার বস্তুকে আমি কেবল আমার ভালোবাসার মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, এইটুকু যা তফাৎ। তোমার এখানে এনে টাঙিয়ে রাখতেই শীলাকে সেদিন আমি ব'লে দিয়েছিলাম। ডাকো না একবার শীলাকে, ও নিশ্চয়ই তোমার ভয়ে এখান থেকে উঠে গিয়ে আড়ালে কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।'

—'রাখুক। মাথাটা একেই ভারী হ'য়ে আছে, এরপর তুমি আর এমনি ক'রে ঝামেলা বাধিও না।'

পাল্টা যে কথাটার উপর জোর দেব, এমন কষ্টই নয় অনিমার। অরুণাংশু দেবী এতক্ষণ অন্দরমহলের নিভৃতে থেকে কি ক'রছেন, কি জানি! শীলা নিশ্চয়ই গিয়ে ঘটা ক'রে আমার আসার খবরটা দেয়নি, দিলে অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও একবার হয়ত আমার সামনে এসে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যেতেন অরুণাংশু দেবী। একটা দিনের একটা মুহূর্তের পরিচয়, সেই বা একেবারে কম কি! কিন্তু দেখলাম, তেমন কোনো সম্ভাবনাই নেই।

মনে মনে একটা-কিছু আত্মপ্রস্তুতি নিয়ে অনিমার কথার জবাবে এবারে জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'তোমার বাবা বুঝি বাড়ীতে নেই?'

—'কেন বলো তো?

—'না, এম্‌নি।' থেমে ব'ল্‌লাম, 'দু'দিন এসে গেলাম তোমাদের বাড়ীতে, তবু তোমার বাবার সঙ্গে একটা দিনও পরিচয় হ'লো না। বাবার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা বোধ করি এখনও তিক্ত হয়নি নিশ্চয়ই?'

—'কেমন ক'রে বুঝলে?' চোখ দু'টোকে একবার স্থির ক'রলো অণিমা।

ব'ল্‌লাম, 'বড় মেয়ে সাধারণত একটু ফেভারিট্ হয় বাপের। সাইকোলজির সঙ্গে সেন্সোলজির একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে এখানে।'

অণিমা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'হঠাৎ এমন থিয়োরী আমার আবিষ্কার ক'রলে কোথেকে তুমি?'

ব'ল্‌লাম, 'আবিষ্কার নয়, একেবারে ইউনিভার্সাল ট্রুথ্। বিশ্বসংসারে সাধারণত তা-ই হ'য়ে থাকে ব'লে শুনেছি। তা যাক্। ফিসের টাকার কিছু ব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে পেরেছ কি?'

চোখ ঘুরিয়ে অণিমা বল্‌লো, 'এই কারণেই তবে বাবাকে নিয়ে টানাটানি ক'রছিলে এতক্ষণ? বাবা গরীব মানুষ; রোজগারপাতি আজকাল নেই ব'ল্‌লেই চলে; দুঃখ হয় বাবার মুখের দিকে তাকাতে গেলে। শেষপর্যন্ত হয়ত হ্যাণ্ডনোটেই বাবাকে টাকা ধার ক'রতে হবে!'

ব'ল্‌লাম, 'তা আর দরকার হবে না। তোমার ফিসের টাকা আগে থেকেই যোগার হ'য়ে আছে।' পকেট থেকে এবারে টাকার গোছাটা বার ক'রে নিয়ে অণিমার হাতে তুলে দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'আশা করি স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ ক'রে আমাকে তুমি কিছুটাও শান্তি দেবে লক্ষ্মীটি! ব'লেছি তো, কখনও তোমার বাবার উপকারে আসতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে ক'রবো আমি। প্লিজ, কালই গিয়ে তুমি ফিস্ দাখিল ক'রে এসো।'

আশ্চর্য হয়েই গিয়েছিল অণিমা, কিন্তু তার চাইতেও অভিভূত হ'লো বেশী। নিশ্চিত আপত্তি ক'রবার জন্য মুখ বাড়িয়েও এমন কথা মুখ ফুটে ব'লতে পারলো না—'এ দয়া কেন তুমি করলে সুমন্ত?' বরং নীরবে খানিকক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অণিমা। ধীরে ধীরে সেই দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে ধারায় অশ্রু নেমে এলো তার দু'গাল বেয়ে। একি তার কৃতজ্ঞতা—না নিরুদ্ধ মনের বেদনার অভিব্যক্তি, কিছুই বুঝতে পারলুম না। ব'ল্‌লাম, 'একি, এম্‌নি ক'রে চোখের জল ফেল্‌লে কেন তুমি?'

এবারে আঁচলে চোখ দু'টোকে মুছে নিয়ে অণিমা শুধু বল্‌লো, 'কই, না তো, ও কিছু নয়।'

কিন্তু এ যে কতখানি, তা কে বুঝবে? ভাব্‌লাম, কাজ ফুরিয়েছে, এবারে আর ব'সে থাকার প্রয়োজন নেই। উঠ্‌বার উদ্যোগ ক'রে তাই ব'ল্‌লাম, 'আজকের মতো উঠি, এরপর সময় ক'রে কখনও তুমি যেয়ো।'

অণিমা ব'ল্‌লো, 'আজ আর এক কাপ চা এনেও তোমাকে দিতে পারলুম না। অথচ চা চিনি ঘরেই র'য়েছে। তবুও প্রস্তুতিতে বাধ্‌লো।'

ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে আস্‌তে আসতে ব'ল্‌লাম, 'তোমার সঙ্গে কি আমার চায়ের ভদ্রতাটাই বড় হ'লো? এতক্ষণ এই যে তোমাকে কাছে পেলাম, একি কিছু নয়? আসি এখন।'

—'এস'। সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এসে দাঁড়িয়ে বিদায় দিল আমাকে অণিমা। চোখ দু'টো তখনও তার ছল্‌ছল্ ক'রছিল। মনে হচ্ছিল—আবার বুঝি ধারা বর্ষিত হ'য়ে তার সেই সহজ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দেবে!

[৬]

অণিমাকে টাকাটা অবিশ্যি সেদিন গোপনেই দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তাদের সংসারে শেষপর্যন্ত আর কথাটা গোপন থাকেনি। গোপন যে থাকবে না, একদিন যে জানাজানি হ'য়ে প'ড়বেই, একথা আমিও জানতাম; কিন্তু এই নিয়ে শেষপর্যন্ত যে অণিমার বাবা অমূল্যধনবাবু আত্মপীড়া বোধ করবেন এবং অবশেষে বিষয়টাকে কেন্দ্র

ক'রে অরুণাংশু দেবীর সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে কগড়া ক'রে শেষপর্যন্ত খাওয়া ফেলে সিঁড়ি ছেড়ে উঠে যাবেন, এতটা কল্পনা ক'রতে পারিনি। ফিস্ জমা দেবার পর অণিমার মুখ থেকেই একদিন কথাটা জান্‌তে পেরে মনে মনে খানিকটা অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়লাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম মানুষের চরিত্র দেখে। দারিদ্র্যে ডুবে যেতে বসেছেন ভদ্রলোক, এমন অবস্থা ছিল না যে যথাসময়ে টাকা সংগ্রহ ক'রে মেয়ের পরীক্ষার পথটাকে প্রশস্ত ক'রে দিতে পারেন, সেখানে আর-কেউ এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেও প্রশান্ত চিত্তে তাকে গ্রহণ ক'রতে পারলেন না তিনি; বিষয়টাকে নিজের ব্যক্তিত্বের অপমান মনে ক'রে আত্মপীড়ায় জর্জরিত হলেন শুধু। এমন মানুষ সংসারের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রবাহে খানিকটা ভরাবহ বই কি! আগে বুঝিনি, এবারে বুঝ্‌লাম—কি দুর্বিসহ ভরাবহতার মধ্যেই না শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে প্রতিমুহূর্তে কর্তব্যকর্ম পালন ক'রে চল্‌তে হচ্ছে অণিমাকে। সবদিক থেকেই কেমন একটা মর্মান্তিক ব্যর্থতায় জীবনটা আজ ভ'রে উঠেছে অণিমার; জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমারও কি অপমান বেজেছে বুকে?'

জবাব দিলনা অণিমা, শুধু কেমন একটা বেদনাহত দৃষ্টি মেলে ধ'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অণিমার এ দৃষ্টি আমার অপরিচিত ছিল না। বল্‌লাম, 'কথাটা ব'লে মনে হচ্ছে পরোক্ষে তোমাকে আঘাত দিলাম; কিন্তু বিশ্বাস করো, এমন ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না।'

মন্দ্রকণ্ঠে অণিমা ব'ল্‌লো, 'কোনো আঘাতই আজ আর এ বুকে এসে বাজে না। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে ক্রমশঃ পাথর ক'রে নিতেই চেষ্টা ক'রছি।'

ব'ল্‌লাম, 'জীবনে আর কারুর তাতে ক্ষতি না হোক্, আমার ক্ষতির পরিমাণটা বাট্‌ধারার মাপের বাইরে গিয়েই দাঁড়াবে। আকাশে অগ্নিসঙ্কেত হ'লেই কি তারাদের মৃত্যু ঘটে? আবার তো তারা একই নিয়মের ললিত লাস্যে প্রতি সন্ধ্যার সহাস্যে এসে আকাশ-বাসরকে জাগিয়ে তোলে! জীবনে আঘাত এলেই কি মনটাকে পাষাণে পরিণত ক'রতে হবে, মন যে তখন আবার নতুন সুরে নতুন গীতালী রচনা ক'রবে, নইলে জীবনের পরিপূর্ণতা কোথায়!'

—'জীবনের পরিপূর্ণতা!' ম্লান একবার হাস্‌লো অণিমা, তারপর ব'ল্‌লো, তোমার আবৃত্তি তোমাকেই তবে আজ শুনিয়ে বলি—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

মিলন হ'বে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবন বঁধু হবে তোমার
নিত্য অনুগতা;
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

একেবারে হিউমেন-সাইকোলজির শেষ স্তর। এখানে এসে আর কোনো কথা নয়, 'একেবারে চির শান্তি।'

নিজের মধ্যে যে ইদানিং কতখানি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল অণিমা, ওর গান প্রতি কথাতেই তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বহুবার বহুভাবে চেষ্টা ক'রেও ওকে একথাটা বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারি নি যে, ভীরুতা বা কাপুরুষতা এ যুগে রীতিমত অপরাধ, নিজেকে জোর ক'রে এযুগে তুলে না ধ'রলে কেউ তাকে তুলে ধরে না। নিজেকে জোর ক'রে জাগাতে হবে। এ যুগ কান্নার যুগ নয়, জীবনের গভীর আশাবাদে বিশ্বাসী হ'য়ে হৃদয়কে নাচিয়ে দিতে হবে। পরাজয়ের ইতিহাসে পঙ্গু সৈনিকবৃত্তি ক'রে জীবনকে শুধু অপমান করা মাত্র, এ যুগের ইতিহাসকে নতুন ক'রে লিখে যেতে হবে রক্তের অক্ষরে, রীতিমত রাজর্ষি হ'য়ে দাঁড়াতে হবে নিজের মধ্যে।—কথাগুলি জলের মতই স্বচ্ছ বটে অণিমার কাছে, কিন্তু নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আজ আর এক পা-ও এগোতে পারছে না সে

সাম্‌নের দিকে। জীবনে বয়সের অধিকারে বড় হয়ে উঠ্‌বার আলা বড় কঠিন আলা। কিন্তু সে আলা তো সংসারের সব ছেলেমেয়েরই পক্ষে প্রায় একই রকমের! তা নিয়ে সংসারে একা অনিমাই বা এমন দুঃখ ক'রবে কেন?

ব'ল্‌লাম, 'সে শাস্তি একা তোমার জন্যে নয়, তোমার আমার দু'জনের জন্যেই। মিলনের রাখীবন্ধন কি মনে মনে আজও আমাদের বাঁধা হয়নি? মৃত্যু দিয়েই যদি জীবনকে পূর্ণ করতে চাও, তবে মনে ক'রে দেখ—আমিই তোমার সেই মৃত্যু কিনা! শুভ দৃষ্টিপাতে জীবনবধূর সাথে সেখানে একদেহে মিশে গেছি আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান হাতখানিকে বাড়িয়ে আমার মুখখানিকে চেপে ধরলো অনিমা. ব'ল্‌লো, 'ছিঃ, ও কথা মুখেও এনো না। জীবনের প্রতীক তুমি, মৃত্যু দিয়ে বিচার ক'রে তোমাকে আমি কোনোদিনই নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে জড়াতে পারবোনা। এ পৃথিবীতে জীবনের প্রতীক-চিহ্ন ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে তুমি আমার কাছে চিরকাল সেইভাবেই অক্ষয় হ'য়ে জেগে থেকো। সেইখানেই আমার পরম জয়, আর সব মিথ্যা।'

অনিমার সেই হাতের তালুতে মৃদু একটা চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'মিথ্যাই যেন হয়। আর সবকিছু মিথ্যে না হ'লে যে তুমি আর আমি বাঁচি হ'য়ে উঠ্‌তে পারবো না!'

এতটুকুও আর দাঁড়ালো না অনিমা। আমার মুখের উপর দিয়ে আর-একবার মৃদু দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চোখের আড়াল হ'য়ে গেল সে।

একথা ভুলিনি যে, ক'দিন বাদেই আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা। সময় ক'রে বই নিয়ে ব'স্‌বার তাই তাগিদ রয়েছে পিছনে। তাগিদটা অবিশ্যি আমার চাইতে অনিমারই বেশী। কারণ অনার্স ওকে পেতেই হবে, অনার্স না পেলে সংসারে কেউ ওর সম্মান দেবে না, এমন কি গর্ভধারিণী অরুণাংশু দেবী পর্যন্ত না। মা হ'য়ে সংসারে তিনি সৎমার অভিনয় ক'রে চ'লেছেন। আশ্চর্য মানুষই বটে।

আশ্চর্য মানুষ আমার নিজের মা-ই বা কম কি! অরুণাংশু দেবীকে তবু খানিকটা চেনা যায়। নামের সঙ্গে তাঁর সূর্যদীপ্তিটা স্পষ্ট প্রকাশিত। কিন্তু আমার মা সেখানে চিরকাল কেমন একটা হেঁয়ালীতে আচ্ছন্ন। মাকে কোনোদিন ঠিক মার মতো ক'রে পাইনি ব'লেই হয়ত ধারণাটা এমনি ক'রে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকবে। চিঠিতে একদিন চক্রধরপুর থেকে দিদি যেকথা লিখেছিল, একতিলও তার মিথ্যে নয়। চিরকালের একরোখা একগুঁয়ে স্বভাবটাকে একদিনের জন্যও যদি পরিবর্তন করতে পারলাম আমি! এই একগুঁয়েমি ক'রেই একদিন কলেজে ভর্তি হ'য়েছিলাম, এই একরোখা স্বভাব নিয়েই মা-বাবার কাছ থেকে চিরকাল দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছি নিজেকে। ছোট বেলা থেকে এ বিশ্বাসটা যেন কেমন ক'রেই জন্মে গিয়েছিল যে, জীবনে মা-বাবার বড় একটা স্নেহ না পাই ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন এ সংসারের সমস্ত সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার যে আমার হাতেই আসবে—তাতে ভুল নেই।

আসন্ন পরীক্ষার চাপে মাথাটা অসম্ভব ভারী হ'য়ে উঠেছিল। একটু বেশী মন নিয়েই প'ড়ছিলাম সেদিন। সহসা মনে হ'লো, একটি জুড়ি গাড়ী হঠাৎ এসে যেন আমাদের গেটের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে প'ড়লো। এমন গাড়ী মাঝে মাঝেই এসে দাঁড়ায়। আত্মীয়-স্বজনের তো অন্ত নেই সংসারে! আজ না হয় ওর জমিদারীর উপর বাণিজ্যলক্ষ্মীর আসন সাজিয়ে আমাদের সংসারটাকে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন বাবা, কিন্তু ঠাকুরদাদার জমিদারীতে বাবা ছিলেন কুমার বাহাদুর। বাহাদুরীও ছিল তেম্‌নি। আত্মীয়-স্বজনের অভাব থাকবার কথা নয়। অবস্থা প'ড়ে গেলেও পুরনো কালের জের

এখনও মাঝে মাঝেই লেগে রয়েছে। ছুটী গাড়ীটার আকস্মিক এই আবির্ভাবটাকে তাই নতুন ব'লে বোধ হয়নি কিছু। হয়নি ব'লেই বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে মনটাকে আরও নিবিড় ক'রে ডুবিয়ে দিলাম।

এমনি ক'রে বোধ করি ঘণ্টা দু'য়েকও কাটলো

অকস্মাৎ মা'র গলায় শব্দ শুনে কান খাড়া করতে হলো। আমাকেই ডাকছেন মা। আমায় সভায় সময় এমনি করে কখনও তিনি ডাকেন না, ডাকার হেতুও অবিশ্যি নেই। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক আমার একরকমেই অল্প। দু'বেলা দুমুঠো অন্ন গ্রহণের ব্যাপার ভিন্ন মা-বাবার সাংসারিক চক্রে প্রবেশ আমার বড় একটা ঘটে ওঠে না বললেই হয়। মার গলার শব্দে তাই কতকটা বিস্মিতই হলাম। সাড়া দিয়ে উঠে এসে মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো—একটি মধ্যবয়স্কা মহিলার পা ঘেঁষে দোহারা গড়নের একটি স্বল্পবয়স্কা তরুণী বসে আছে। আমাকে লক্ষ্য করে বোধ করি সলজ্জে মাথাটা একটু নামিয়ে নিল। মা এদের নিয়ে এতক্ষণ গল্পে মজে ছিলেন। বুঝতে বাকী রইল না যে—ঘণ্টা দু'য়েক আগে ছুটি গাড়ীটা আমাদের গেটে এসে এদেরই নামিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু এমন কত লোককেই তো নামিয়ে দিয়ে যায় কত সময়, কত লোককে নিয়েই তো মা আর বাবার উৎসাহের অন্ত থাকে না, তাই বলে এমন ভাবে কখনও না ভেবে পাঠাননি। পাশে তাকিয়ে দেখলাম—বত্রিশ ইঞ্চির একটা চামড়ার সুটকেশ খাড়া ভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে, অন্য কোনো আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। সুটকেশটা যে আগন্তুকা মহিলা দুটির সঙ্গে এসেছে, বুঝতে তা কষ্ট হলো না।

মা বললেন, 'আমার দিদির ননদ হৈমন্তী আর তার মেয়ে শুভশ্রী। তুই তো কখনও দেখিস নি, চিনবি কেমন করে! হৈমন্তীকে প্রণাম কর খোকা।'

বাড়ীতে মা আমাকে খোকা বলেই ডাকেন। কথা-রত মধ্যবয়স্কা মহিলাটির পায়ের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে হৈমন্তী ব'ললেন, 'থাক, থাক, প্রণামের মধ্যে কি আছে, এতেই হয়েছে। বেঁচে বর্তে সুখে থাকো, তাতেই সকলের আনন্দ।'

মাথা তুলে সোজা হয়ে আবার দাঁড়ালাম কিন্তু কি বলবো খুঁজে উঠতে পারলুম না।

মা বললেন, 'তোর তো আবার পরীক্ষার পড়া, নইলে একটা দিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সহরের সব জায়গাগুলো ওদের দেখাতে পারতিস্!'

অস্ফুটকণ্ঠে বললাম, 'এ কি কলকাতা যে, পথে পথে দেখবার জিনিষ সব ছড়িয়ে রয়েছে! আমাদের কলেজ আর আদালত ভিন্ন এখানে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। আর আছে সহরের শেষপ্রান্তে হরি সভার এক আড্ডা। সেখানে গিয়ে কারো ভালো লাগার কথা নয়।'

হেমন্তের কথা শুনে তরুণীটি হেসে মুখ লুকালো।

হৈমন্তী বললেন, 'হরিসভায় যোগ দেবার বয়সটাকে প্রায় এগিয়ে এনেছি। এর পরের বার যখন আসবো, তখন নিয়ে যেয়ো। এবারে আর ও পথ দিয়ে দরকার নেই।'

মা বললেন, 'কথাটা মিথ্যে বলেনি খোকা। মফঃস্বল সহর, দেখবার মতো সত্যিই কিছু নেই। তবে কাঁকা হাওয়ায় দু'দণ্ড পথে বেরোলেও ভালো লাগে। কলকাতা শুনি নাকি একেবারেই ঘিঞ্জি জায়গা। আমি হলে এতদিনে সেখানে দম বন্ধ হয়ে মরতাম।'

ভগবান সেদিক থেকে রক্ষা করেছেন মাকে। ক'ল-কাতায় গিয়ে বাস করা তো দূরের কথা, কলকাতা-দর্শন পর্যন্ত মার জীবনে অঘটিত ঘটে ওঠেনি। আমি মাত্র দু'বার গিয়ে ঠিক হাতে গুণে দুদিন করে চারদিন মাত্র থেকে এসেছি। ফিরে এসে অণিমাকে কেন্দ্র করে কেবলই ভেবেছি—আমাদের ভবিষ্যৎ-সংসার রচনা করবে কলকাতারই কোনো প্রশস্ত রাস্তার সুরম্য অট্টালিকায় কিন্তু শুধে সৌধনির্মানম্। আজও তা স্বপ্ন হয়েই মনের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে; কবে তা বাস্তবে রূপ পাবে কবে সুখের আকাশে শান্তির শ্বেত পারাবতকে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের নলিতলাস্যে মুখর হয়ে উঠতে পারবে অণিমাকে নিয়ে, কে জানে!

মার কথার জের টেনে হৈমন্তী বললেন, 'আমরা এ

বেশ আছি। কলকাতায় বাস করে মিথ্যে হয়রাণি। তা—লেখাপড়া নিয়ে দিব্যি আছো তুমি, তাই না?'

শেষের প্রশ্নটা অবশ্য আমাকে উদ্দেশ করেই করলেন হৈমন্তী। উত্তর দিতেই যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে হাসির ছলে ঈষৎ শ্লেষ প্রকাশ করে মা বললেন, 'দিব্যি আছে বৈ কি! ঘর-সংসারের দিকে নজর দিয়ে বাপকে একটু সাহায্য করা ওর কুষ্ঠিতেও লেখেনি। বন্ধু-বান্ধবেরাই ওর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে।'

বান্ধবী শব্দটা বোধ করি ইচ্ছে করেই উচ্চারণ করলেন না মা, কিন্তু তাঁর আক্রমণ স্থলটা সেইখানেই। উমার ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়, প্রথমতঃ আমার কলেজে পড়া, দ্বিতীয়তঃ অনিমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। এরপর আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। সুবিনীত কণ্ঠেই বললাম, 'আমি এখন আসি, আমার যথেষ্ট পড়া রয়েছে।'

মা বললেন, 'এই এলো, আবার দুদিন বাদেই ওরা রওনা হয়ে যাবে। পড়া তো তোর রোজই আছে, দু'দণ্ড বসে না-হয় একটু আলাপই কর খোকা।'

বললাম, 'আলাপ-পরিচয় গল্প-গুজবের জন্যে তো তুমিই রয়েছ, আমার আলাপে গল্প জমবে কেন! তুমিই বরং ততক্ষণ জমাও, আমি পড়তে যাই—।'

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলাম না। মা'র সামনে থেকে চলে এসে দাওয়ার সিঁড়িতে কি ভেবে হঠাৎ একবার ক্ষণকালের জন্য দাঁড়ালাম। মা আর বার দিদির ননদ হৈমন্তী তখন মুখোমুখি হয়ে বসেছেন। স্পষ্ট কানে এলো—

মা বললেন, 'খোকাকে যে কোনোদিন আমি পেটে ধরেছিলাম, ওর মুখের দিকে তাকালে আজ আর তা মনেই হয় না। একটুও যদি কথা শোনে খোকা!'

উত্তরে হৈমন্তী বললেন, 'সংসারে সকলেই তো আর টাকা আনা পাই নিয়ে চলতে জানে না। খোকা না হয় পড়াশুনোর পথটাকেই জীবনে বেছে নিয়েছে, তাতে এমন কীই বা অন্যায় করেছে ও! ভালো লেখাপড়া শিখলে যে ভালো কাজ পাওয়া যায়, এতে তো আর ভুল নেই!'

—'নিকুচি করি অমন কাজের। ওদের বংশে কি কেউ কখনও চাকরী করেছে যে লেখাপড়া করে শেষ পর্যন্ত ও পরের গোলাম হবে!' থেমে না বললেন, 'আসলে এ হচ্ছে কপাল, সুকলি বোন! শাস্ত্রে বলে—আমি যাই বলে, কপাল যার সঙ্গে। কপালে যা লেখা আছে আমার, খণ্ডাবে কে?'

হাসি পেলো মার খেদোক্তি শুনে। নীতির দিক থেকে অরুণাংশু দেবী আর আমার মার মধ্যে আজ আর এতটুকুও পার্থক্য নেই। আমাদের মা থেকেও মা নেই—না আমরা সন্তান হয়েও সন্তানধর্ম পালন করে চলতে পারছি না—কোনটা ঠিক?

পা টিপে টিপে দাওয়ার সিঁড়ি থেকে নেমে এলাম নিজের অধ্যয়নকক্ষে। এটা একান্তই আমার জগৎ, এখানে একচ্ছত্র সম্রাট আমি। মনে পড়ে না—বাবা পর্যন্ত কোনোদিন অনাবশ্যক ভাবে এসে প্রবেশ করেছেন এখানে। তথ্য জমিদারীর ব্যবসায়ী জীবনে বাবার এমন সময়ও নেই যে দু'দণ্ড এসে কাছে ডেকে কথা বলবেন। আমার অধ্যয়নকক্ষের চার-দেয়ালের মধ্যে এখানে অপ্রতিহত রাজত্ব মিলিয়ে রয়েছি আমি। সেই রাজত্বে এসে যখন-তখন প্রবেশ করবার একমাত্র ছাড়পত্র রয়েছে অনিমা আর শীলার। অনিমা আর শীলা। কিন্তু হঠাৎ যেন মনটা কেমন ঘুরে গেল! বার দুয়েক নিজের মনেই উচ্চারণ করলাম—তনুশ্রী—হৈমন্তী—তনুশ্রী। দিব্যি কাব্যিক নাম। কিন্তু কারুর চেহারাতেই কাব্যের কোনো লক্ষণ সুস্পষ্ট নয়। সাধারণ পারিপাট্যের একটা ইঙ্গিতে ভরে উঠেছে মাত্র মুখশ্রী দুটি। তাকে সুন্দর আখ্যায় আখ্যায়িত করা না গেলেও সুরুচির নিদর্শন বলে মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু তা নিয়ে অনিমার সঙ্গে তুলনা চলে না, অনিমা একেবারেই স্বতন্ত্র জগতের মেয়ে—যাকে বলে একটা 'ক্লাস'।

তা যাক্। আপাততঃ বইয়ের পৃষ্ঠাতেই আবার মনঃসংযোগ ক'রলাম। না ক'রে উপায় কি, মা কালীর খাড়ার মতো মাথার উপরে ঝুলছে আসন্ন পরীক্ষার মুহূর্তগুলি। পাশ করতে না পারলে বাড়ীতেও মুখ দেখাতে পারবো না। নিজের একগুঁয়েমি নিয়ে নিজেকেই শেষ পর্যন্ত অপ্রস্তুত হতে হবে। তা থেকে অন্ততঃ ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই।

[ক্রমশঃ

অপরাধ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

সবধানে কড়াটা নাড়লাম। একবার নয় দু'দুবার, সাড়া পেলাম না কোনও। সামনের উঠোনটা পেরিয়ে আমার কড়া নাড়ার আওয়াজ বাড়ীর বাসিন্দাদের কানে পৌঁছেছে কিনা, এটাই স্বাভাবিক ভেবে, সঙ্কোচ ভাব কাটিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম 'খোকা আছিস?'

এবার উত্তর এল বাড়ীর ভেতর থেকে, 'কে'?

গলা শুনে বললাম, 'আমি শেখর'।

সামনের আলোটা জ্বলে ওঠে। সুকুমার নেমে আসে তাড়াতাড়ি, 'তুমি, আরে এস।' ওকে অনুসরণ করলাম। সামনের ঘাস ভর্তি উঠোনটা মাড়িয়ে ওর বাড়ীতে পা দিলাম। কতদিন সুকুমারের আসিনি অথচ এই বাড়ীটা আমাদের কৈশোরের তীর্থ ছিল বললেই হয়। জীবনের কল্পনা আর সাধনার কিছু কিছু এ বাড়ীতে বসেই করেছে আমাদের। অনেক কথা ভিড় করে এল একের পর এক।

ছাত্র জীবনের পর চাকরী জীবন। বয়সে ছোট হলেও, সুকুমার আর আমি একসঙ্গেই পাশ করে বেরিয়েছি, যুদ্ধের সময় ঢুকেছি একই জায়গায় দায়িত্ব করতে। ওর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল চাকরী জীবনের সুরুতেই। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার একটা কারণে মতান্তর গুরুতর হয়ে উঠল আর ভীরু দুর্বল সুকুমার কর্তৃপক্ষের দলকে আমার বিপক্ষেই সায় দিয়ে ফেলল। চাকরী রাগ করে আমি ছেড়ে দিলাম আর সেই থেকে স্বভাবদুর্বল লোকটার ওপর একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব গেল। চাকরী-জীবনের যোগসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের বাঁধনও শিথিল হয়ে এল। তারপর অনেক-দিন ওর সঙ্গে দেখা নাই। আমি ভোলবার চেষ্টা করলেও ও কিন্তু ভোলে নি। বিয়ে করার সময় নিমন্ত্রণও করে গিয়েছিল, বাইরে থাকার অজুহাতে যাই নি ওর বিয়েতেও।

সুকুমার আমার এই অপ্রত্যাশিত আসাতে বিস্মিত হয়েছে বেশ বুঝতে পারি, তবু আমি যে ওর বিস্ময় টের পেয়েছি, তা বুঝতে দিই না ওকে। সহজ ভাবেই ঢুকি ওর শোবার ঘরে।

—'বল'। ওর কথায় ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলটার সামনে রাখার চেয়ারটায় বসে পড়ি। সুকুমার বসে বিছানায়। ওর মুখটা অদ্ভুত একটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি কিছু বলব তারই জন্যে ও সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

যেখানে যবনিকা পড়ে গিয়েছিল, সে প্রসঙ্গ সন্তর্পণে বাদ দিলাম। সহাস্যেই বললাম, "বৌ কোথায়, দেখাও'—ওর তুমি সম্বোধনে ওকে তুই বলে আর যেন সম্বোধন করতে দ্বিধা লাগে।

—'আসছে', ছেলেমানুষী খুশীতে উত্তর দেয় সুকুমার।

ওর ঘরটা ভাল ভাবে চোখ বুলিয়ে নিই। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো ঘরখানা, নিপুণ হাতের শুধু কৃতিত্ব নয়, একটা রুচির পরিচয়ও লক্ষ্য করা যায় সহজেই।

কি কথা দিয়ে আলাপের সূত্রপাত করব ভেবে পাই না, সুকুমারের বউ এসে আমাকে অস্বস্তি থেকে উদ্ধার করল।

দেখলাম ওকে। শ্যামল রঙের ছিপছিপে মেয়েটী, মুখের একটা অপূর্ব শ্রী সত্যি মুগ্ধ করবার মত। চায়ের কাপের পাত্রটা টেবিলের উপর রেখে, এক কাপ বাড়িয়ে দেন উনি, 'নিন্।'

সুকুমার একটা ঢোক টেনে নেয়, 'মঞ্জুকে তোমার পরিচয় দেবার কিছু দরকার হবে না শেখর।

হাসতে হাসতে বললাম, 'কেন, উনি তো আমায় দেখেন নি এর আগে?'

মঞ্জুবৌদিই বললেন, 'আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনার সব কথা শুনেছি যে! আর চাইবা যেতে হল বলে বিয়েতে নাই বা এলেন, তার পরেও কি আসতে নেই?' অভিযোগটা আসবে ভাবতে পারিনি। এতক্ষণ পরে সুকুমারের বাড়ীতে আসার যেন সঙ্কোচটা পেয়ে বসে। সহজ হবার সমস্ত প্রচেষ্টাই যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। সুকুমারের অসহায় মুখখানার দিকে চেয়ে, নিজেকে সমর্থন করবার সমস্ত উৎসাহ নিভে যায়। শ্যামল রঙের মেয়েটীর দিকে চেয়ে আমতা আমতা করে বলি, 'আসতে ত চাই, কিন্তু এত ঝঞ্ঝাট, সময় করে উঠতে পারি না।

মঞ্জুবৌদি হেসে ফেলেন, 'তাই বলুন কাজের মানুষ। এদিকে আপনার বন্ধু যা ঘর চিনেছেন, খালি অফিস আর বাড়ী, বাড়ী আর অফিস। কুঁড়ে হয়ে গেলেন আপনার বন্ধু একেবারে!'

—'আপনাদের ঘরে আনলে কুঁড়ে না হয়ে উপায় আছে! আপনার গেরস্থালী দেখে আমারই ত' কুঁড়ে হতে ইচ্ছা করছে।'

সুকুমার হেসে ফেলে। এখনও সংকোচ কাটাতে পারেনি ও। আমার সমস্ত কিছু সঙ্কোচকে মঞ্জুবৌদি উড়িয়ে দিতে পেরেছেন, এতে খুশী হয়ে উঠেছে সুকুমার। কিন্তু পুরোন সেই পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা নিয়ে ও এগিয়ে আসতে পারছে না। আমার এ বাড়ীতে না আসার যে অজুহাতই আমি দেখাই না কেন, ভীরু দুর্বল লোকটা সবই জানে।

মঞ্জুবৌদি জোগান দেন, 'তা অত যদি লোভ, করে ফেলুন না, বলুন না, জোগাড় দেবি!'

—'ধন্যবাদ, আমার জন্যে আপনি এ কষ্ট করতে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তার যে আর দরকার নেই, অতি শিগ্রী তারই ব্যবস্থা করে ফেলেছি নিজেই, আর তারই জন্যে আজ আপনাদের কাছে আসা।'

—'ওমা তাই বলুন, মিছেই ভাবছি।' মঞ্জুবৌদি হেসে উঠলেন খিলখিল্ করে।

...অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে। সুকুমারের বাড়ীতে অনেক দিন পরে আসার দুশ্চিন্তাটুকু মুছে গেছে।

—'আজ চলি সুকুমার।' সুকুমার ম্লান হাসে শুধু। উঠে পড়ি। হঠাৎ অনুনয়ের সুরে আমাকে চমকে দিয়ে সম্বোধন পালটেই সুকুমার বলে ওঠে, 'আবার আসিস্।' বুঝতে পারি অনেক কষ্টে ও তুমি থেকে তুইয়েতে নামাতে পেরেছে সম্বোধনটুকু।

—'বৌদি তাহলে ঠিক যাওয়া চাই কিন্তু।'

—'ঠিক যাব।' আসবেন কিন্তু আবার, কেমন।

সুকুমার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। সুকুমার হাতটা ধরে 'আসিস্ আবার, রোজই বাড়ী থাকি বেরোই না কোথাও, ভাল লাগে না। আসিস্ কেমন?' ওর হাতের অস্পষ্ট চাপটা অনুভব করতে করতে বাড়ী ফিরি।

...দিন গেছে। যাওয়া কিন্তু হয়নি ওদের বাড়ী। মঞ্জুবৌদি বিয়ের পর একদিন মায়াকে নিয়ে যাবার কথা বললেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি। ওখানে যাবার তাগিদও যেন কৈশোরের দিনগুলোর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। সেদিনের অনেক দিন পরে আবার অপ্রত্যাশিত ভাল লাগাটুকু যে পরে আর ভাল না লাগতেও পারে, তাই মনে হয়েছে। মায়ার সংসার আর ভালবাসায় মনটাকে আটকে রেখে চলতে চলতে সুকুমারের সেই অস্পষ্ট হাতের চাপও ভুলে গেছি।

হঠাৎ ট্রামে ওর সঙ্গে দেখা। বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে সুকুমারের। কুঁজো হয়ে গিয়েছে, মাথার চুল রুক্ষ ধরণের, মনে হয় যেন কঠিন রোগে ভুগেছে। আমাকে দেখে ম্লান হাসল। ওর আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওকে দেখে চেনা শক্ত, এমন বিশ্রী অবস্থা ওর চেহারার।

—'এমন দেখাচ্ছে কেন?'

—'শরীরটা নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। কিছুতেই সারছে না, ডাক্তার খালি বলছে রেষ্ট নাও। এদিকে আবার বদলী করে দিয়েছে ক্যাম্বেরীতে। রোজ ত্রিশ মাইল যাওয়া আসা।

লজ্জামুভূতিতে মন ভরে ওঠে। হঠাৎই ভাবলাম, অনেক দিন ওর বাড়ী যাই নি, সেই বিয়ের পর থেকে।

—'বৌদি ভাল আছেন ত?'

সুকুমার বলে শুধু 'তুই যাস্ না, প্রায়ই বলে তোর কথা', এ অভিযোগ যেন ওর নয়, মঞ্জুবৌদির। কোন কথা বলি না, বলবার ক্ষমতা আমার হারিয়ে গেছে। সুকুমারকে অবহেলা করবে জেনেও সেই শ্যামল রঙের মেয়েটির অভিযোগটাই যেন অন্তরের সৃষ্টি করে মনে। কণ্ডাক্টরের দিকে নজর দিই, হাতাটা এগাস্ত ওগাস্ত করি, কিন্তু সুকুমারের রোগপাণ্ডুর মুখখানার দিকে চেয়ে আমার না যাওয়ার কৈফিয়ৎ দেবার সাধ্য নেই।

অতিকষ্টে শুধু বলি, 'যাব একদিন—সংসারের যা

সুকুমারের বুকের দিকে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই সুকুমার আমার কথায় আস্থা আর রাখে কি না, তাই নিজের লজ্জায় সারা হয়ে উঠি। আর লজ্জার দুর্বলতা কাটাতেই বলি, 'বাড়ীর সব খবর ভাল ত?'

—'বাবা মারা গেছেন শুনেছিস্ ত?' ওর কথায় চমকে উঠি।

—'বাবা গেলেন হঠাৎ হার্ট ফেল হয়ে। বেশ সুস্থই ছিলেন, হঠাৎ কি যে হল!'

ট্রাম থামতে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। আমার ক্রটীকে খোঁচা দিতে দিতে সুকুমার আরও একে একে কি কথা বলত কে জানে। বলি শুধু 'যাব একদিন, আজ চলি কেমন।'

গেলাম একদিন। না দিয়ে পারলাম না। কিন্তু যাওয়াটা ঘটল ওর সঙ্গে দেখা হবার মাস দেড়েক পরে। কড়াটা নাড়লাম। সাড়া নেই কোনো। সুকুমারের ঘরে নীল আলোটা জ্বলছে। বিরক্ত হই, ঘরে আলো জ্বলছে, আর এই সন্ধ্যাবেলা শুনতে পায় না ওরা!

—'খোকা আছিস?' গলার আওয়াজ দিই। সুকুমারের উত্তর পাই না। দরজাটা খুলে যায়, দরজায় দাঁড়িয়ে মঞ্জুবৌদি।

বৌদি হাসলেন, বিষাদের ম্লানিমা সে হাসি ঢাকতে পারেনি। উনি বললেন, 'এই আপনার আসা, কতদিন পরে এলেন বলুন ত? এক বছর।'

'—আপনার মনে আছে এত?'···বললাম আমি।

—মেয়েদের কাছে পার নেই বুঝেছেন!···এগিয়ে যাচ্ছিলাম, বাধা পেলাম।

'—উঁহু সামনের দিকে নয়, এদিক দিয়ে।'

বিস্মিত হলাম, 'কেন?'

মঞ্জুবৌদি হেসে ফেলেন, 'এদিকটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, আসুন।'

সেদিনের কুঁজো হয়ে যাওয়া দুর্বল অসুস্থ সুকুমারের কথাটা মনে পড়ে গেল। তাই এ পরিবর্তন। সহজ হবার চেষ্টা যদিও করছি, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে একটা ছোট বাড়ীও বেঁচে থাকার জন্যে বিসর্জিত করতে হয়, সেই পরিস্থিতির কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে। সামনে মঞ্জুবৌদি এগিয়ে চলেছেন। অনুসরণ করছি ওঁকে; কিন্তু ভাবছি সঙ্গে সঙ্গে এই বিয়োগান্ত অধ্যায়ের অনেক আগেই হয়ত আমার আসা উচিত ছিল।

ঘরে ঢুকে একটা ধাক্কা খেলাম। সুকুমার শুয়ে রয়েছে বিছানায়। বুঝতে কষ্ট হল না, ওর এই শোওয়াটা রোগের শয্যা নেওয়া।

আবার আনলেন মঞ্জুবৌদি এক কাপ চা।

—'একি, এসব কেন আবার?'

'—এসব করতেই হয় বুঝেছেন, মায়াকে জিজ্ঞাসা করবেন। মায়াকে ত খুব আনলেন। আমারও সময় হয় না, যে নিজেই যাই।' আশ্চর্য শ্যামল রঙের এ মেয়েটা কি অদ্ভুত। সংসারের এই হীনতায় কাঁদতে জানে না অসুস্থ স্বামীর কথায় অপরের মন ভারী করতে চায় না, জীবনের কাছে হার মানতে জানে না এ মেয়ে।

—সুকুমারের শরীর ত খুব খারাপ দেখছি, ডাক্তার কি বলছে? সুকুমার এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, ম্লান হাসল

এবার ও. বলল, 'কি আর বলবে, বলে খালি রেষ্ট নাও। রেষ্ট আর রেষ্ট, রেষ্ট নিলে আমার সংসার কি করে চলবে তা কি করে জানবে বল ডাক্তার।'

পাংশু হয়ে ওঠে মঞ্জুবৌদির মুখ, স্বামীর এ দুর্বলতা সহ্য হয় না ওঁর। অনেক কষ্টে মঞ্জুবৌদি শুধু বলেন, 'তুমি বেশী কথা কয়ো না, ডাক্তার না তোমায় বারণ করেছেন।' সুকুমার চুপ করে যায় মঞ্জুবৌদির মুখের দিকে চেয়ে।

মঞ্জুবৌদি কথা শেষ করেন, 'শরীরটা ওঁর খুবই খারাপ, ডাক্তারবাবু বলেছেন রেষ্ট নিলেই আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন, কিন্তু আমার কথা শোনেন না। জোর করে আটকে রেখেছি কয়েকদিন।' ম্লান হাসেন মঞ্জু-বৌদি।

ঘরটার দিকে সেদিনের মত আর একবার চোখ বুলিয়ে নিই। ঘরের সেই শ্রী আজ আর নেই। সুকুমার যে বিছানায় শুয়ে আছে, তা রোগীর বিছানা হওয়া উচিত নয়। দুশ্চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে মনের সাম্য গেছে হারিয়ে, তাই রুচি আর শ্রী তলিয়ে গেছে, বেঁচে থাকার প্রয়াস ছাড়া কিছু নেই আর জীবনে।

নিজেদের কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন মঞ্জুবৌদি। আমাদের কথাই শুনলেন জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা করে।

'আজ চলি বৌদি। সুকুমার, চল্লুম।'...আমার কথায় সুকুমার গদমটার অল্প ঘাড় নাড়ে, তারপর রোগা হাতটা বার করে আমার হাতটা ধরে বলে ওঠে, 'আসিস্ ভাই মাঝে-মাঝে, শুয়ে-শুয়ে পাগল হয়ে উঠেছি।'

নামছি সিঁড়ি দিয়ে। মঞ্জুবৌদি বলে ওঠলেন, 'আবার আসবেন। রোগে ভুগে-ভুগে আপনার বন্ধু অস্থির হয়ে পড়েছেন, আমি একা বোকাতে পারি না। আপনি তবু এলে উনি আনন্দ পান। আসবেন কেমন?' চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বের নীচে বৌদির মুখের দিকে চেয়ে মনে হল যেন বৌদি উত্তর চান আমার কাছ থেকে, তাই বললাম, 'নিশ্চয়ই আসব।'

...আরও কেটে গেছে কিছুদিন। পটলডাঙার মোড় থেকে ট্রামে যিনি উঠলেন তাঁর দিকে চেয়ে চমকে গেলাম। মঞ্জুবৌদি! পরণের সাদা কাপড়টা দেখে বুকটা ধক করে' উঠল। গলাটা শুকিয়ে এল। বৌদি আমার দিকে চাইলেন। উঠে দাঁড়াতেই বললেন মঞ্জুবৌদি, 'উঠলেন কেন, বসুন না।' সসংকোচে বসে রইলাম। বৌদি পাশে বসলেন। কি বলব ওঁকে, কিছু বলবার ক্ষমতা আমার হারিয়ে গেছে এই মুহূর্তে।

—'এখান থেকে উঠলেন, কোথায় গিয়েছিলেন?'

—'দাদার কাছে এসেছিলাম।' বৌদি বললেন।

কেন জানি না জিজ্ঞাসা করতে পারি না সুকুমারের কথা, হঠাৎ কি এমন ঘটনা। চুপচাপ।

বৌদি কলেজ ষ্ট্রীট আসতেই বলে উঠলেন, 'এখানেই নামব।' বৌদি নামলেন, আমিও নেমে পড়লাম।

পাশাপাশি চলতে-চলতে বললাম। 'খোকার হঠাৎ...

—'খুবই দুর্বল ছিলেন, হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। আপনাকে আর একবার দেখতে পাবেন আশা করেছিলেন। আপনার খোঁজও নিয়েছিলাম, আপনি ছিলেন না কলকাতায়।' বৌদির স্বল্প কটী কথায় কোন অভিযোগ নেই, আমি জানি আমার অপরাধও কিছু নেই, তবু সেই স্বভাবদুর্বলের নিরীহ লোকটা তার শেষ সময়েও আশা করেছিল আমাকে, এই চিন্তাটা তীব্র একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে মনে।

মঞ্জুবৌদি হাত জোড় করে নমস্কার করেন, 'আচ্ছা, চলি।' আমি শুধু স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকি পথের মাঝে। আজ আর বলে গেলেন না উনি, আসবেন কিন্তু একদিন। সিঁড়ির ধারে অনুনয়ে-ভরা সেই মুখখানা, আর সুকুমারের সেই শীর্ণ হাতটার কাতর ছবি সব যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

মঞ্জুবৌদিকে আর দেখা যাচ্ছে না॥

প্রদীপের তলে

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

ভৈরবগড় টাউনের উপকণ্ঠে সেটল্‌মেণ্ট বিভাগের তাঁবু পড়েছে। জরীপের কাজে এসেছেন সেটল্‌মেণ্ট অফিসার মিঃ লাহিড়ী। সঙ্গে কয়েকজন অধস্তন কর্মচারী আর লোকাল কানেক্টর অফিসের একজন সাব-অ্যাসিষ্টেণ্ট গিরিজা দত্ত।

গিরিনালার সানুদেশে শ্যামল প্রান্তরের বুকে উড়ে আসা বনহংসীর মত দেখায় তাঁদের সাদা তাঁবুগুলি।

জায়গাটি ভারতের উচ্চপ্রান্তে বলা চলে। আগেকার ও. টি. আর. লাইনের একটা ষ্টেশন থেকে আরও মাইল ত্রিশেক মোটর বাসের পথ। হিমালয়ের পাদদেশে তরাইয়ের হিংস্র অরণ্যের প্রান্তে কয়েকটি ছোট টাউন আর গ্রাম নিয়ে ভৈরবগড় মহকুমা। মহকুমার মাঝখানে প্রাচীন কালভৈরবের মন্দিরের সুমুখ দিয়ে হিমালয়ের তুষার-গলা জল বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে কোশীনদীর একটা শাখা। শীতে বিরহীনির মত শীর্ণা বর্ষায় নিষ্ঠুর কৌতুকময়ী. উন্মাদিনী, ভয়ঙ্করী।

এসব অঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে নেকড়েরা রাতে দলবেঁধে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যার পর মানুষ বেরুতে সাহস করে না। গভীর নিশীথ রাতে সুদূর তরাইয়ের গহন অরণ্যের হিংস্র পশুর গর্জন শোনা যায়।

অপরাহ্নে মিঃ লাহিড়ী জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্যে ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁবুর সুমুখের পথ কিছুটা দূরে যেখানে বাঁক নিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে···সেই বাঁকের ধার ঘেঁষে একটা ভয়ঙ্কর খাদ খাড়া হাজার দুই ফুট নীচে গড়িয়ে গেছে। দুশো বছর আগে কোশীনদীর একটা শাখা ঐ খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত প্রচণ্ড—ভূমিকম্পের পর শুকিয়ে গেছে।

জায়গাটি অস্বাভাবিক নির্জন ও নিস্তব্ধ। খাদের মাথার ওপর কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছ ঝুঁকে পড়ে ছায়া অন্ধকারে রহস্যময় করে তুলেছে। পথের সেই অংশটা পার হতে দিনের বেলায়ও অনেকের গা ছম্ ছম্ করে। বিরামহীন ঝিল্লীধ্বনি সে নিস্তব্ধতাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

মিঃ লাহিড়ীর সাহসের খ্যাতি ছিল। খাদের প্রান্ত কিনারে দাঁড়িয়ে ছড়িটা পিছনে ধরে সন্তর্পণে নীচের দিকে উঁকি দিলেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। মিঃ লাহিড়ীর মনে কেমন যেন এক অজানা ভীতির সঞ্চার হল। কিন্তু জায়গাটা মন্ত্রের মত এক দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে আকৃষ্ট করতে লাগল। আলোকের চারিদিকে মোহমুগ্ধ পতঙ্গের মত পথের সেই বাঁকটার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে-ঘুরে সেই অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে বার বার মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন।

কতক্ষণ সেখানে ঐভাবে ঘুরেছিলেন খেয়াল ছিল না। বহুক্ষণ পরে তাঁরই তাঁবুর এক কুলি সেলাম করতে চমক ভাঙল। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে এলেন।

পাহাড়ী পল্লীতে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তাঁবুতে অনেকের সঙ্গে কথাবার্তায় ভুলে গেলেন খাদের কথা। রাত্রে আহারের পর বিছানায় শুয়ে গিরিজাবাবুর সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প করলেন। কিন্তু তিনি সামান্য ব্যাপারে ভয় পেয়েছেন একথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় লজ্জায় বিকালের কথাটা তাঁকে জানালেন না।

গল্প করতে-করতে গিরিজাবাবু একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু মিঃ লাহিড়ীর সহজে ঘুম এল না। ঘড়ির খাটিয়ায় পড়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন

তাঁবুর সঙ্কীর্ণ বাতায়ন পথে গ্রীষ্মের রাত্রির বাতাস বইতে লাগল। কখন এক সময় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছিল··· তার শুভ্র স্বপ্নবেণু ছড়িয়ে পড়ল পথে প্রান্তরে আর গিরি-অরণ্যে। বাতাসে ভেসে এল নাম-না-জানা ফুলের ঘন গন্ধ।

হঠাৎ এক সময় মিঃ লাহিড়ীর মনে হ'ল বাতায়নের বাইরে একটি স্থানীয় মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখা-চোখী হতেই চুপিচুপি হাতছানি দিয়ে ডাকল। তার ডাকে যুঝি কি এক ব্যাকুলতা ছিল—মিঃ লাহিড়ী উঠে বসে ইতস্তত করতে লাগলেন। অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি! আলুথালু বেশ—মনে হ'ল কোন বিপদগ্রস্ত অবস্থায় সাহায্য ভিক্ষা করছে।

মিঃ লাহিড়ীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হল নিঃশব্দে বাইরে এলেন। চাঁদের আলোয় এবার মেয়েটির মুখ দেখতে পেলেন। শুভ্র জ্যোৎস্নার মত লাবণ্যময়, স্নিগ্ধ মুখশ্রী। পল্লবঘন কাল চোখে করুণ মিনতি। মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করতে উদ্যত হতেই সে উঠে তর্জনী স্পর্শ করে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে নির্দেশ জানিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল।

মিঃ লাহিড়ী নিঃশব্দে তার অনুসরণ করতে লাগলেন। জ্যোৎস্নার আলপনা আঁকা পথে করাপাতার মচমচ শব্দ। গভীর রাত্রীর বাতাসে অরণ্যের মর্মর ধ্বনী। আলুলায়িত কেশা নিঃশব্দচারিণীকে দ্রুত অনুসরণ করে মাঠ ছেড়ে পথে উঠলেন। তারপর অপরাহ্নের সেই চড়াই পথে এগিয়ে চললেন। চলার বেগ বুঝি করে মেয়েটি এবার প্রায় ছুটতে লাগল। যথাসাধ্য দ্রুত অনুসরণ করেও কিছুটা পেছিয়ে পড়লেন।

কিন্তু ওকি! কোন দিকে যাচ্ছে মেয়েটি, খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়াল কেন? মুহূর্তমাত্র! পরক্ষণেই মিঃ লাহিড়ীর আতঙ্ক বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে দুইবাহু প্রসারিত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর খাদের মধ্যে। পরক্ষণেই সেই তমসাবৃত অতল গহ্বরের মধ্য থেকে উঠে এল এক অমানুষিক নারীকণ্ঠের নিদারুণ আর্তস্বর ...ওঃ···হো···হোঃ···হো···হো···

কী ভয়ঙ্কর সে শব্দ। সে কি গগনস্পর্শী অট্টহাসি না মর্মন্তুদী হাহাকার! মিঃ লাহিড়ীর সমস্ত দেহ বারে বারে শিউরি উঠল।

কিন্তু কোথায় গেল সেই রহস্যময়ী মেয়েটি, মিঃ লাহিড়ী খাদের মুখের দিকে পা বাড়ালেন। অকস্মাৎ পিছনে একটা শংকিত ব্যাকুল চীৎকার ও সবল আকর্ষণে থমকে দাঁড়ালেন। মিঃ লাহিড়ী।

মিঃ লাহিড়ীর সম্বিত ফিরে এলো। তাকিয়ে দেখলেন তাঁর একটা পা খাদের শেষ প্রান্তে আর গিরিজাবাবু সবল মুষ্টিতে তাঁর বাহুমূল আকর্ষণ করছেন। মিঃ লাহিড়ীর বিহ্বল চোখ বার বার কেঁপে উঠলেন।

শুষ্ক গম্ভীর কণ্ঠে গিরিজাবাবু বললেন, ক্যাম্পে ফিরে চলুন মিঃ লাহিড়ী।

মিঃ লাহিড়ী স্বপ্নোত্থিতের মত গিরিজাবাবুর সঙ্গে ফিরে এলেন। তখনও দু'চোখে আতঙ্কের ছায়া। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, কি ব্যাপার গিরিজাবাবু, কিছু সে বুঝতে পারছি না আমি তো ক্যাম্পে শুয়ে ছিলাম।

বিস্ময়াহত গিরিজাবাবু নতমুখে কী চিন্তা করছিলেন, বললেন, আমারই ভুল মিঃ লাহিড়ী। আগেই সকলকে সাবধান করে রাখা উচিত ছিল। গতবার সেটেলমেন্টের সময় ও একজন কেরানী গভীর রাতে ক্যাম্প থেকে উঠে গিয়ে ওই খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারা গিয়েছিল।

মিঃ লাহিড়ী তৎক্ষণে কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। শয্যায় বসে বললেন, কেন, কারণ কী গিরিজাবাবু—এর পিছনে কি কোনো·····

হাঁ, এই দেশের একটি সুন্দরী মেয়ের জীবনের বড় করুণ কাহিনী আছে মিঃ লাহিড়ী।

মিঃ লাহিড়ী বললেন, বলুন কি জানেন গিরিজাবাবু:

গিরিজাবাবু হাসলেন, তবে আসুন গল্পই করা যাক। আজ রাত্রে আর সহজে ঘুমই আসবে না। কিন্তু তার আগে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক।

গিরিজাবাবু স্টোভ ধরাতে বসলেন।

মিঃ লাহিড়ীর দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে, ঘুমা-

স্মিত হাস্যে চুরুট দিয়ে গিরিজাবাবু আরম্ভ করলেন।—

আমার ঠাকুর্দার মুখে শোনা গল্প। প্রায় দেড়শ বছর কি তারও আগের ঘটনা। বৃটিশরা তখন এদেশে আসেনি।

এখান থেকে কিছুটা দূরে কয়েক ঘর চাষী পরিবারের বাস। এদেরই একটি মেয়ের নাম ছিল চন্দ্রা। তার বাবা শিউশরণ জাতিতে বেদে। মাঠে চাষবাস করত আর অবসর সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাঁশি বাজিয়ে সাপের খেলা দেখিয়ে, আর সাপে কাটার ওষুধ বিক্রী করে দু পয়সা রোজগার করত। সংসারে অভাব ছিল না।

মেয়ে তো নয় যেন দেবকন্যা। লোকে বলত মহকুমার মধ্যে শিউশরণের মেয়ের মত এমন রূপ আর নেই।

চন্দ্রার তখন বিয়ের বয়স। সবাইে জানত তখন সর্দারের ছেলে মোহন ছাড়া আর কারোর সঙ্গে শিউশরণ মেয়ের বিয়ে দেবে না। তা' তার যত পয়সাই থাকুক না কেন! শিউশরণ এতটুকু বয়স থেকে তার মা মরা মেয়ের সঙ্গে ওই বাপমা মরা ছেলেটিকে মানুষ করেছিল। বলত, মোহন ছাড়া আমার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বিশ খানা গ্রামের মধ্যে দেখিয়ে দিতে পারে কেউ?

আর দুমাস পরেই তাদের বিয়ের দিন স্থির করেছে শিউশরণ।

কিন্তু নিয়তির পথ মানুষের যে চিরদিনই অজানা। আর সেই দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার পথে এইদুটি তরুণ তরুণীর জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এলো।

একদিন অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে শিউশরণের কুঁড়ের সুমুখের পথে কাল ভৈরবের মন্দিরের রাম শিঙা বেজে উঠল। সেই শিঙার অর্থ বিশ পঁচিশখানা গ্রামের লোকের অজানা নয়।

শিউশরণের বুক শুকিয়ে গেল। মাথার পাগড়ীটা বসাতে বসাতে বাইরে এসে দেখলে তারই কুঁড়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন কাল ভৈরব মন্দিরের মোহন্তের চারজন প্রধান শিষ্য। সকলেরই পরণে রক্তাম্বর।

শিঙা বাজিয়ে তারা ঘোষণা করলেন মোহন্তের আদেশে গতরাত্রে দেবাদিদেব শঙ্কর মন্দিরের মোহন্ত মঙ্গলাদিকে স্বপ্নে জানিয়েছেন শিউশরণের কন্যা ভক্তিমতী চন্দ্রার সেবালাভের জন্য দেবাদিদেব আকুল হয়েছেন। আগামী অমাবস্যার রাত্রে দেবদাসী চন্দ্রার দেবভোগ্য পবিত্র দেহ মন্দিরে যথাযথ-রূপে মন্ত্রপূত করা হবে।

গ্রামের লোক ধন্য ধন্য করে উঠল।

কিন্তু শিউশরণ জানে, মঙ্গলাদির পাষাণ অট্টালিকার একবার যে প্রবেশ করে জীবিতকালে সে আর বাইরে আসে না।

চন্দ্রা জানে গৃহের সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চিরদিনের মত তাকে বিদায় নিতে হবে। তার পিতা মাতা, মহিপ্রিয়—পৃথিবীর কোন মানুষের সঙ্গে থাকবেনা কোন সম্পর্ক। দেবসেবাই হবে জীবনের একমাত্র সাধ আর আশা।

মিঃ লাহিড়ীর সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললেন, আজ এ সিনিট গিরিজাবাবু। সুটকেশ থেকে ছাতানা চুরুট বার করলেন, দেখুন একটা খেয়ে ভুলতে পারবেন না। গিরিজাবাবুর দিকে একটা বাড়িয়ে দিলেন।

শরতের নিশীথ রাত্রির আকাশে তখন সুরু হয়েছে বাদল মেঘের নিঃশব্দ পদসঞ্চার। তরল অন্ধকার দিগন্তবিসারী পার্বত্য-উপত্যকায় মৃদুর গুরুতা। রাত্রির বাতাসে সঞ্চারিত অরণ্যের দুর্বোধ্য ভাষা।

মিঃ লাহিড়ী চুরুট ধরিয়ে বললেন, হাঁ, দেবদাসী প্রথার কথা আগেও শুনেছি। এখনও আছে নাকি এসব দত্তবাবু?

—আছে বইকি। দেশের ইন্টিরিয়রে এখনও আছে বলে শুনেছি।

তখনকার দিনে এই কাল ভৈরবের কথা বহু দূর দূর দেশের লোক পর্যন্ত জানত। তবু তখনকার দিনে ইংরেজের রেল ষ্টীমার আসেনি। চার পাঁচশো মাইল দূর থেকেও লোক নৌকায় বা পায়ে হেঁটেও আসত।

কতদিন আগে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা—তা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। শোনা যায় এক শৈব রাজা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা করেছিলেন।

নিকষ কালো পাথরে গাঁথা গগনচুম্বী মন্দির। পূর্ব ভারতের মন্দিরের মত তীক্ষ্ণ শীর্ষ নয়। মাথার উপর কানাত সমেত সম্বুজের মত অর্ধবৃত্তাকার। মন্দির শীর্ষে এক প্রকাণ্ড রক্ত ত্রিশূল। রৌদ্রোদ্ভাসিত নীল আকাশের বুকে মুখব্যাদন করে থাকে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে নিকষ কালো পাথরের গড়া কাল-ভৈরবের বিশাল আবক্ষ বিগ্রহ।

সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথে মাথা নত করে প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে সব অন্ধকার মনে হয়। তারপর অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এলে প্রদীপের স্বল্প আলোকের আলো-আঁধারের এক মহারহস্যের মধ্যে ধীরে ধীরে চোখের সুমুখে জেগে ওঠে কালভৈরবের বিশাল বিগ্রহ। প্রদীপের ম্লান আলোয় মরকতের সবুজ দুটি চক্ষু আর রক্তনীলার ত্রিনয়ন থেকে ভয়ঙ্কর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। অস্ফুট আলোকেও দেখা যায় একটা জীবন্ত কালো সাপ ফণা তুলে কালো পাষাণ জটা বেষ্টন করে ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকায়। বিগ্রহের এক হাতে রক্তমাখা সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল অপর হাতে বিশাল ডমরু। পুরোহিতের জলদমন্দ্র কণ্ঠের গম্ভীর ওঙ্কার মন্ত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে পাষাণ গাত্রে প্রতিধ্বনীত হয়। চন্দন আর অগুরুর গন্ধ সে রহস্যের মধ্যে অসীম ভক্তির অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দেয়।

দেশ বিদেশের শত শত নরনারীর ভক্তিমন্ত্রে মন্দিরের অভ্যন্তর আর সুমুখের প্রাঙ্গণ সকাল সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে থাকে—'জয় শঙ্কর শিবশম্ভু মহাদেও।'

মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণের অপর দিকে মোহন্তের অট্টালিকা। বংশপরম্পরায় মন্দিরের একটি স্থায়ী পূজারী। অমসৃণ কালো পাথরের দ্বিতল অট্টালিকা। ঊর্ধ্বে সঙ্কীর্ণ গবাক্ষ পথে আলো বাতাসের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত।

যে সময়ের কথা, বজ্রপাণি তখন দ্বাদশ বংশানুক্রমিক মোহন্ত। আশে পাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বজ্রপাণির দুর্দান্ত প্রভাব। বহু মানুষের ধারণা অমাবস্যার গভীর নিশীথে বজ্রপাণি কাল ভৈরবের সঙ্গে কথা বলেন। গভীর রাত্রে মন্দিরের সুমুখের পথ অতিক্রম করার সময় কোন কোন লোক মন্দিরের মধ্যে শুনেছে এক মহা গম্ভীর কণ্ঠধ্বনী।

পুরুষসিংহ বজ্রপাণির তরাইয়ের শাল প্রাংশুর মত দেহ। গ্রানাইটের মত কঠিন ও মসৃণ। কণ্ঠে আর বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের মালা। সুবিস্তৃত বাহুমূল আর প্রকাণ্ড বক্ষ রক্তচন্দনচর্চিত। অঙ্গে সর্বক্ষণ রক্তাম্বর বাস। পূজার সময় কণ্ঠ বেষ্টন করে থাকে এক ঘৃতাবর্ণা নাগিনী। দুটি বিশাল চোখের দৃষ্টিতে পিঙ্গল দ্যুতি। সে চোখের দিকে তাকালে মনে হয় মানুষ বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে।

পূজার শেষে এক হাতে সিঁদুর মাখা দীর্ঘ ত্রিশূল অপর হাতে ডমরু নিয়ে দূর আকাশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে বজ্রপাণি মন্দির প্রাঙ্গণ অতিক্রম করেন—

'ওঁ শিব শম্ভু হর হর ওঁ শঙ্কর।'

ত্রস্তচকিত নরনারী মোহন্তের পথের দুপাশে পদধূলায় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু চরণ স্পর্শ করার দুঃসাহস কারো নেই। বজ্রপাণির চরণের ললিত ধূলিকণা পরম শ্রদ্ধায় দুহাতে তুলে নিয়ে মাথায় বুকে স্পর্শ করে। সকলেই জানে মোহন্তের বংশ দেব-অংশ-সম্ভূত।

সাধারণ মানুষ বজ্রপাণিকে শুধু ভয়ই করে না ভক্তিও করে। দূর দূরান্তের লোক পর্যন্ত জানে বজ্রপাণি অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী।

বন্যার সঙ্গে এখানকার মানুষের আজন্ম পরিচয়। কিন্তু বজ্রপাণির সময় একবার যা বন্যা এসেছিল, এমন একশো বছরেও একবার আসে না।

সেবার প্রলয়ঙ্করী বর্ষায় পাহাড় থেকে ভয়ঙ্কর বন্যা নেমে এলো। ভৈরব নদীর জলরাশি উন্মত্ত যূথ হস্তীর মত শত লক্ষ শুঁড় দিয়ে পাড় ভাঙতে

ভাঙতে তরাইয়ের গহন অরণ্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো উপড়ে নিয়ে শত সহস্র গ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটে চলল। সে বন্যার স্রোতে শুধু মানুষ নয় গভীর অরণ্যের হিংস্র জীবজন্তু পর্যন্ত ভেসে চলল।

ভয়ার্ত আতঙ্কিত গ্রামবাসী বজ্রপাণির চরণতলে লুটিয়ে পড়ল।

সকলের উন্মুখ আবর্তিত বারিরাশির মধ্যে বজ্রপাণি প্রচণ্ড মূর্তির মত দাঁড়ালেন। এক হাতে সকাণ্ড ত্রিশূল অপর হাতে ডমরু। কটিদেশ পর্যন্ত বন্যার জলে নিমগ্ন।

ডমরুর প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে বজ্রপাণি অমানুষিকণ্ঠে হুঙ্কার করতে লাগলেন—

"ওঁ শিবশম্ভু—হরহর—মহাদেও। ওঁ শিবশম্ভু শঙ্কর :"

আতঙ্কিত মানুষ নিশ্বাস রোধ করে শুনতে লাগল সেই শুরুগম্ভীর মহা ওঙ্কার ধ্বনি।

শিউরে উঠল ভয়ঙ্করী প্রলয়রূপী নদী, কেঁপে উঠল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। বৃদ্ধ ক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ সৈন্যের মত ছিন্নভিন্ন দিশাহারা মেঘ দিকে দিগ্বিদিকে ছুটে চলল।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে উন্মত্ত নদী ভয়ার্ত শ্বাপদের মত লাফ ঝাঁপ করে নেমে যেতে লাগল নিজের বিবরে।

আর এক বছর এলো অনাবৃষ্টি।

আকাশের মার্তণ্ড বিশাল অগ্নি-জিহ্বা মেলে মাটির সমুদয় রস নিঃশেষে লেহন করে নিল।

মেঘ চিহ্নহীন শুষ্ক পাণ্ডুর আকাশের তলে ভয়ার্ত মানুষ হাহাকার করে উঠল। কালভৈরবের পাষাণ মন্দির দ্বারে মুহুর্মুহু মানুষ মাথা খুঁড়তে লাগল।—

পানি দেও—হে ভৈরব—হে শঙ্কর—পানি দেও।

বৃষ্টি নয়, অগণিত মানুষের চোখের জলে সিক্ত হ'ল মন্দির প্রাঙ্গণ।

বজ্রপাণি ত্রিশূল হাতে বরাভয় নিয়ে বেরিয়ে এলেন মন্দির চত্বরে।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে শত সহস্র মানুষ আশায় আনন্দে জয় ধ্বনি করে উঠল। সে জয়ধ্বনি বুঝি বা প্রতিধ্বনিত হ'ল আকাশে।

বজ্রপাণি বজ্র কঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—দুনিয়ায় অনাচার ঘটেছে। মানুষের মনে প্রবেশ করেছে শয়তান কালভৈরবীর মহাপূজার আয়োজন কর, নয়তো পৃথিবী জ্বলে যাবে—ধ্বংস হবে সৃষ্টি।

আতঙ্কে পুরুষেরা কেঁপে উঠল, মেয়েরা উঠল কেঁদে।

পাঁচদিন থেকে সারা দেশে হুলুস্থুল পড়ে গেল। দিগ্বিদিক থেকে অসংখ্য নরনারী দলে দলে তাদের শেষ সম্বলটুকু উজাড় করে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বজ্রপাণির মন্দির প্রাঙ্গণে স্তূপাকার করতে লাগল।

পাঁচদিন ব্যাপী চলল মহাপূজা। ক্ষুধার্ত মানুষ পেল প্রসাদ। শেষ দুদিন এক রাত্রি বজ্রপাণি পূজার আসনে বসে রইলেন।

কিন্তু কোথায় বৃষ্টি? মাথার ওপর করাল সূর্য তেমনই নির্মম হাসি হাসতে লাগল।

শেষের রাতে বজ্রপাণি তাঁর অষ্টাঙ্গিকা শীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের নিকষ অন্ধকার আকাশের তলে সমস্ত রাত্রি ডমরু বাজিয়ে তালদমন্দ্রকণ্ঠে কালভৈরবের পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করে বিচরণ করতে লাগলেন। বজ্রপাণির ডমরুর সঘন নিনাদ আর বজ্রকণ্ঠের ঝম্ ঝম্ ধ্বনি দিক চক্রবাল পর্যন্ত তমসাবৃত মহাশূন্যের বক্ষে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নিদ্রাহীন, উৎকণ্ঠিত মানুষ সারারাত্রিব্যাপী শুনল সেই অমানুষিক কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু কোথায় মেঘ? কোথায় বৃষ্টি?

বজ্রপাণির মহাপূজা কি তবে ব্যর্থ হবে? এমন কথা যে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তবে যে সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে যাবে, মিথ্যা হয়ে যাবে কালভৈরব।

মহাপূজার পরের দিন অপরাহ্নে ঈশান কোণের আকাশে কালো অজগরের মত ফণা তুলে দাঁড়াল নিকষ কালো মেঘ। চক্ষের পলকে সেই অজগরের

কণা বিস্তৃত হ'ল উন্মত্ত আকাশের দিকে দিকে। পাহের মাথায় মাথায় ধূলি উড়িয়ে ছুটে এল প্রলয় ঝঞ্ঝা। উন্মত্ত আকাশের মেঘের বুকে বেজে উঠল কালভৈরবের মহাডমরু। শাণিত ত্রিশূল কালো মেঘের বুক চিরে আকাশের দিকে দিকে ছুটে চলল।

প্রলয় মাথায় করে, বজ্রকে তুচ্ছ করে উৎসুক নরনারী ঘরের বাইরে ছুটে এল।

তারপর!

আকাশের শীতল অমৃত অজস্র ধারায় নেমে এলো—শুষ্ক বিদীর্ণ ধরিত্রীর তৃষ্ণার্ত বক্ষে।

বজ্রনিনাদের সঙ্গে শোনা গেল বজ্রপাণির অট্টহাসি।

অনেকের অনুমান বজ্রপাণির পাষাণহর্ম্যে লৌহ-সিন্দুকের অন্ধকার গহ্বরে চিরবন্দী হয়ে আছে শত সহস্র মণি-মুক্তা। দেশ বিদেশের ধনী দরিদ্র শত সহস্র মানুষ শঙ্করের চরণে পূজা আর প্রণামী নিবেদন। মন্দির সংলগ্ন দুশো বিঘা লাখেরাজ জমি। কৃষকেরা সে জমি চাষ করে, ফসল পাকলে তুলে নিয়ে যায়।

কালভৈরবের মন্দিরের অপেক্ষাও রহস্যময় বজ্রপাণির পাষাণহর্ম্য। সে গৃহের অধিবাসীদের আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। কোনদিন কেউ জানতে পারেনি বজ্রপাণি ব্যতিরেকে সেখানে দ্বিতীয় রক্তমাংসের মানুষ কারা থাকে। বজ্রপাণির অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছাড়া সে সংবাদ আর কেউ জানে না। তারা প্রচার করে বজ্রপাণির অন্দরমহল সম্বন্ধে কোন কৌতূহল মহাপাপ।

গভীর রাত্রে যখন পৃথিবী নিস্তব্ধ হয়ে আসে তেমন সময় কখনও-কখনও বজ্রপাণির অন্ধকার অট্টালিকার অভ্যন্তরে শোনা যায় নারীর অস্ফুট আর্তক্রন্দন। ভক্ত-শিষ্যেরা বলেন—দেশে অনাচার ঘটলে মহাদেবী শঙ্করী শঙ্করের পূজারীর কাছে কেঁদে-কেঁদে অভিযোগ জানিয়ে যান।

মন্দিরের মোহন্তের দেবদাসী রাখার প্রথা বজ্রপাণির বংশে শত দশপুরুষ চলে আসছে। যে বংশ থেকে গ্রহণ করা হয় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মন্দিরের সম্পত্তি থেকে তারা কন্যার পিতামাতার জীবিত কাল পর্যন্ত শস্য ও মুদ্রার মাসিক দান লাভ করে।

মোহন্তের ভক্ত শিষ্যেরা দেবদাসী সংগ্রহ করে।

দেবদাসীদের আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র আচার আচরণের সম্বন্ধে বজ্রপাণি বজ্রের মতই কঠিন ও নির্মম। তাদের মধ্যে কোন অনাচার, ভৈরবের পূজার আয়োজনে সামান্য মাত্র ত্রুটিও তিনি ক্ষমা করেন না।

শোনা যায় আচারভ্রষ্টা অবাধ্য ও অপবিত্রচিত্ত দেবদাসীদের তিনি কঠিন শাস্তি দান করেন। বিশেষ করে নূতন দেবদাসীদের প্রথমই তাকে শাস্তি বিধান করতে হত।

পাষাণ অট্টালিকার ভূমিস্থে একটি চির-অন্ধকার কক্ষে তারা নির্বাসন দণ্ড লাভ করত। অষ্টপ্রহরের মধ্যে একবার মাত্র সন্ধ্যায় লৌহদ্বার উদ্ঘাটিত করে দাসী খাদ্যের সঙ্গে একটি বাতি জেলে দিয়ে যেত।

তবে বজ্রপাণি প্রায় প্রতি রাত্রেই সেই অন্ধকূপের আত্মশুদ্ধির ভগ্ন দর্শন দান করতেন।

কিন্তু সমস্ত কিছুর পরও সেই দণ্ডতাপিনী আত্ম-শুদ্ধিতে অক্ষম হলে কালভৈরবের নির্দেশে বজ্রপাণিকে মিষ্টুর ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হত।

সে শাস্তি মৃত্যু দণ্ড। কৃষ্ণকক্ষে বজ্রপাণি নিজহাতে ঝাঁপি মুক্ত করে দিতেন—এক বিষধর কালসর্প।

কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষ—নাস্তিক কি পাপিষ্ঠ, আস্তিক কি নাস্তিক সকলের প্রতিই নাকি বজ্রপাণির ক্ষমা আকাশের মতই উদার। তাই সে পাপিষ্ঠার আত্মার মুক্তির জন্য বজ্রপাণি শঙ্করের চরণে করুণ আবেদন জানাতেন।

বজ্রপাণির বিরাট মন্দিরের প্রসাদ ও ভোগের আয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পায়। তাই অন্ততঃ দশজন দেবদাসীর কম মন্দিরের আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। শঙ্করনাথের পর দশজন দেবদাসী গ্রহণের জন্য বজ্রপাণিকে স্বপ্নে আদেশ জানালেন।

শিউশরণের গৃহে শূলপাণির স্বপ্নাদেশ প্রচারের পর আমাবস্যা তিথি প্রায় ঘনিয়ে এল।

চন্দ্রা আর মোহন সেদিন অন্ধকারে জীবনের শেষ-বারের মত মিলিত হ'ল। তাদের বহুদিনের মিলনের স্মৃতি বিজড়িত ওই মরা নদীর খাদের অদূরের তরুবিথী-তলে চারাবনে নিরালায়।

গোধূলির আকাশে সেদিন রাঙা মেঘের ঘটা। পাহাড়ী বনে প্রান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার সোনার আঁচল সে অপরূপ ছবি আজ চেয়ে দেখল না চন্দ্রা আর মোহন। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় তাদের কণ্ঠ ভাষাহীন দুজনের তপ্ত অশ্রু নিয়ে প্রিয়তমের বাহুমূলে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে বসেছিল চন্দ্রা।

মোহন নিজের হাতের মধ্যে তার হাত টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিল, কেঁদনা চন্দ্রা। জানি আজই আমাদের শেষ দেখা। কিন্তু শঙ্কর তোমাকে তাঁর সেবার জন্যই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সেই সেবাই তোমার জীবনের ব্রত করে নাও।

কিন্তু চন্দ্রা আরও আকুল হয়ে, মোহনের হাত ছড়িয়ে ধরে তার কোলে মুখ রেখে অধীর কান্নায় ভেঙে পড়ল। চন্দ্রার মাথায় হাত রেখে মোহন মর্মর মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বহুক্ষণ পরে ক্রন্দসী প্রিয়ার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে নিয়ে তার ক্রন্দনস্ফুরিত আরক্ত অধরে জীবনের শেষ চুম্বন এঁকে দিল।

মুহূর্তে ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা।

বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অস্ত্রধারী কয়েক ব্যক্তি। একজন সবলে মোহনের কেশগুচ্ছ নিষ্ঠুর মুষ্টির মধ্যে ধরে গর্জন করে উঠল—

পাপিষ্ঠ তুই দেবভোগ্যা রমণীর দেহ উচ্ছিষ্ট করলি। শয়তান তোর পাপের শেষ নাই। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'। আর একজন মোহনের বক্ষের সম্মুখে তুলে ধরল তীক্ষ্ণ ত্রিশূল।

সহসা অগ্রসুখী চন্দ্রা উন্মাদিনীর মত মোহনের বক্ষের সম্মুখে উদ্যত ত্রিশূলের সম্মুখে ছুটে এল। এক ব্যক্তি সবলে তার বাহুমূল আকর্ষণ করে ঘুরে নিয়ে যাবার প্রয়াস করতেই চন্দ্রা দংশনে-দংশনে তার বাহু রক্তাক্ত করে দিল।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা তাকে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। কয়েকজন মোহনকে খাদের দিকে নিয়ে চলল। তবে কি...

মহা আশঙ্কায় চন্দ্রার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল। তার আশঙ্কা মিথ্যা নয়! খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মোহনকে ছুরির মুখে দুলিয়ে সেই ভয়ঙ্কর গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করল। ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে এক অসহায় ভয়ার্ত আর্তনাদ ক্ষণিকের জন্য আকাশ বিদীর্ণ করে খাদের অতল অরণ্যের চিরনীরবতার ক্রোড়ে চিরদিনের মত বিলীন হ'য়ে গেল।

উন্মাদিনী চন্দ্রা আতঙ্কবিস্ফারিত নেত্রে সে দৃশ্য দেখে তীব্রস্বরে কেঁদে উঠল। পরক্ষণে তার বন্ধন জর্জরিত দেহ মূর্চ্ছায় এলিয়ে পড়ল।

পাপিষ্ঠা চন্দ্রা! বজ্রপাণি তার দেহের ও আত্মার পবিত্রতার জন্য শঙ্করের আদেশে কঠিন শাস্তি দান করলেন। ভূগর্ভের অন্ধকার পাষাণ কক্ষে বন্দী রইল চন্দ্রা।

কিন্তু একপক্ষ কালের মধ্যেও বজ্রপাণি যখন চন্দ্রার কোনো পরিবর্তন ও আত্মিক উন্নতি লক্ষ্য করলেন না, তখন তার চরম দণ্ডের আদেশ জানিয়ে গেলেন।

চন্দ্রার জীবনে শেষ রাত্রি ঘনিয়ে এল।

সেদিন সন্ধ্যার পর দাসী চন্দ্রার কক্ষে নিঃশব্দে প্রদীপ ও শেষ আহার্য রেখে গেল। কিন্তু চন্দ্রা সেদিকে ফিরেও তাকাল না। স্বল্পালোকিত কক্ষে দীর্ঘ অনশনশীর্ণ দেহে আলুলায়িত কেশে পাষাণ প্রাচীরে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার জীবনের শেষ রাত্রে অনুভব করল মোহনের আত্মা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সেদিন সন্ধ্যার পরই সুরু হয়েছে ঘন দুর্যোগ। ভূনিম্নের নিভৃত কক্ষেও শোনা গেল আকাশের সঘন বজ্রনিনাদ।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে প্রকোষ্ঠের লৌহদ্বার উন্মুক্ত করে প্রবেশ করলেন বজ্রপাণি। হাতে মুক্তাকার রক্তবর্ণ বেতস পেটিকা। শৈশবে জ্ঞানোন্মেষে চন্দ্রা যাকে সাক্ষাৎ দেবতার অনুচর রূপেই জেনেছিল—এই গভীর নিশীথে তার প্রকাণ্ড ক্রূর মুখটা মনে হল পিশাচের মত ভয়ঙ্কর। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত দুয়ারে দাঁড়াল। দু'চোখে নিষ্ঠুর কুটিল হাসি।

শিউরে উঠল চন্দ্রা।

অতি ক্ষুদ্র পাষাণ প্রকোষ্ঠ। বজ্রপাণি কক্ষের প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। অনতিউচ্চ ছাদ দীর্ঘদেহের শির স্পর্শ করল।

আতঙ্কিত চন্দ্রা নিদারুণ শঙ্কায় কঠিন হয়ে বসল।

বজ্রপাণির কঠিন মুখ ক্রূর হাসিতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। চন্দ্রার প্রায় সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দেহ ঈষৎ নত করে বেতস পেটিকার তালা সহসা উন্মুক্ত করে দিলেন। নিমেষে চন্দ্রার সম্মুখে উদ্যত ফণায় লাফিয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর কালনাগিনী। একপা পিছিয়ে গেলেন বজ্রপাণি...। হা-হা-হা, প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ কাঁপতে লাগল।

কিন্তু জীবনে এই প্রথম ও শেষ ভুল করেছিলেন বজ্রপাণি। জানতেন না চন্দ্রা বেদের মেয়ে, শৈশব থেকে সাপ নিয়ে খেলা করেছে।

চকিতে ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। দংশন করার পূর্বেই চন্দ্রা ক্ষিপ্রহস্তের মৃদুমুষ্টিতে ধরে ফেলল উদ্যত ফণা কালনাগিনীর কাল কণ্ঠ। চক্ষের পলকে তাকে নিক্ষেপ করল বজ্রপাণির অঙ্গে। এমনিই আকস্মিক, এমনিই অভাবনীয় ঘটনা যে বজ্রপাণি সতর্ক হবারও সময় পেলেন না।

অট্টহাসি চকিতে স্তব্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে এক ভয়ঙ্কর হিংস্র আর্তনাদ করে বসে পড়লেন। অম্বরের মত প্রকাণ্ড কাল বুকের বামদিকে দুটি রক্তবিন্দু পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও বজ্রপাণি নির্মম মুষ্টির পেষণে কালনাগিনীর কাল দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করতে উদ্যত হলেন।

উন্মুক্ত দ্বার পথে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্রা। রাত্রে বজ্রপাণির গৃহে দ্বিতীয় পুরুষের অবস্থান নিষিদ্ধ ছিল। কেহই তাকে বাধা দিল না।

শরতের আকাশে তখন প্রলয়ের উন্মাদ নর্তন। শুক্লপক্ষ রাত্রি। কিন্তু অমাবস্যার মত করাল অন্ধকারে নিমগ্না। পৃথিবীতে ঝরে পড়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। আকাশে বজ্র আর ঝঞ্ঝার মধ্যে ছুটে চলল উন্মাদিনী চন্দ্রা। নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত পথরেখা। বজ্রের চকিত আলোয় পথ চিনে ছুটে চলল। বন্ধুর পথে তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে রক্তাক্ত হ'ল তার কোমল পদতল। বাতাসে উড়ল তার ছিন্ন অঞ্চল আর আলুলায়িত কেশগুচ্ছ। দীর্ঘ দিনের অনাহারক্লিষ্ট দুর্বল দেহ প্রবল ঝটিকার মুখে বার বার পথে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে চলল। ছুটে চলল সেই দিকে যেখানে সে তার প্রিয়তমকে হারিয়েছে। তার দু'নয়নে প্রিয় অভিসারের আনন্দদ্যুতি। মোহন যে তার প্রতীক্ষায় দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে বুকে করে নেবে বলে।

চন্দ্রা খাদের মুখে পৌঁছাল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর দুই বাহু প্রসারিত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই অতলস্পর্শী অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে।

ওকি! গিরিজাবাবু চমকে বাইরে তাকালেন। চাঁদ ডুবে গেছে। রক্ত-মেঘে থমথমে আকাশে তখন ঝড় উঠেছে। কি ভয়ঙ্কর তার বেগ। মুঁটি শুদ্ধ তাঁবু যেন উপড়ে উড়িয়ে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে বুঝি।

মিঃ লাহিড়ীর মনে হ'ল ঝড় নয়, যেন কোন বিক্ষুব্ধ আত্মা উন্মত্ত আবেগে নিশীথ রাত্রির আকাশ বাতাস আলোড়িত করে তুলেছে।

ফিরতি পথে

শ্রীঋত্বিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ; ভোরে উঠে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, আমার ইংলণ্ডে থাকবার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। ক'দিনই বা হ'ল এদেশে এসেছি কিন্তু এ' ক'দিনের মধ্যে এদেশের প্রতি এত মায়া পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে চারতলা থেকে বাক্স-পেঁটরা নামালাম। সনুর মত আমার কেমব্রিজের সহপাঠী অমল ঘোষ এসেছিল। দু'জনে মিলে কাজ করাতে অনেক সুবিধা হ'ল। আমাদের ট্রেণ দুপুর দেড়টায় সেণ্ট প্যাংক্রাস্ ষ্টেশন থেকে ছাড়বে এবং বিকেল চারটে নাগাদ টিল্‌বারীতে গিয়ে পৌছুবে।

ষ্টেশনে যাবার ঠিক আগে বেন্থাম-হলের ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে এসে আমার কাছে বিদায় চাইল। সে একটি পুরোপুরি অনুষ্ঠানের সামিল। আমি এতটা প্রত্যাশা করি নি। বেন্থাম-হলের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে ইতালীয়ান ছাত্রছাত্রী ছিল ; লণ্ডনে সামার স্কুলে (Summer School) ইংরিজি শেখবার জন্য এসেছিল। তারা সবাই ইতালীয়ান ভাষায় আমাকে অনেক রকম শুভেচ্ছা জানাল। কতক বুঝলাম, বাকীটা অনুমান করে নিলাম তারপর পরস্পরের ঠিকানার আদান প্রদান। এটি বিদায় অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, অথচ ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে, মাত্র কয়েকদিন পরে পরস্পরের মধ্যে কোন রকম যোগাযোগ থাকবে না। সবাই তা ভালভাবে জানে, কি বিদায় বেলার সাইকলজি (Psychology) এমন যে প্রত্যেক বিদায় প্রার্থীর মনে নিজের পরিচয়কে অক্ষয় করে রাখতে চায়।

আন্না মাজলা আমাকে এসে জানালো যে, তার ভাই পিয়েরো খুব অসুস্থ। তাই নীচে এসে সে আমাকে বিদায় জানাতে পারছে না। অগত্যা আমাকে তার ঘরে যেতে হ'ল। ছেলেটি খুব খামখেয়ালী ; লেখাপড়ায় মন নেই ; শুধু মধ্যে অঙ্কের ক্যারিকেচার করতে ওস্তাদ। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে এত কোমলতা ছিল তা আগে কখন বুঝতে পারি নি। দেখি, তার চোখে জল। আমার হাতে বিদায়কালের স্মৃতিচিহ্নরূপে একটি সিল্কের ইতালীয়ান টাই উপহার দিয়ে বল্ল, "আরিভেডেরচি, সুনা।"

"আরিভেডেরচি, পিয়েরো।" আন্না আমাকে গেট পর্য্যন্ত পৌছে দিল। সেখানে আরো অনেকে অপেক্ষা করছিল। বিদায়ের পালা শেষ করে ট্যাক্সিতে উঠলাম।

সেণ্ট প্যাংক্রাস্ ষ্টেশনে গিয়ে দেখি অনেক লোকের ভীড়। দু' একজন চেনা মুখের দেখা মেলাতে প্রাণ যেন একটু চাঙ্গা হ'ল। ট্রেণ যখন ছাড়ল তখন অনেকের মুখে চাঞ্চল্যের আভাস। একটি ছেলে, পরে জানলাম সে মাত্র ছ' মাস বিলেতে কাটিয়েছে, সে ত' প্রায় কেঁদেই ফেলল। বিদেশ ছেড়ে যেতেও এত মায়া।

লণ্ডন ছাড়িয়ে আমাদের ট্রেণ গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলল। সেদিন সত্যিই অপূর্ব্ব। চারিদিকে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা মাঠে, পার্কে ও রেল লাইনের দু'ধারে ড্যানডেলিয়ান ফুলের ঝাঁক মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে। সবুজ গাছপালাকে দিনের আলোয় কি সজীব এবং প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এত তাড়াহুড়ো করে যাওয়া কেন, আর কিছুদিন এদেশে থেকে যাই না।

বিকেলের দিকে জাহাজে উঠলাম। সিন্ধিয়ার জাহাজ "টি, এস, এস, জলজহর।" ইংলণ্ড-ভারত লাইনে এ নাকি তার শেষ যাত্রা। এর পর একে ভারত-ই আফ্রিকা লাইনে পণ্যবাহী জাহাজ হিসাবে চালানো হবে জাহাজ যখন ছাড়ল তখন যাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলছে, "আউ

ভিডারজেহেন" (Ouf viedersehen) কেউ বা গলা ছেড়ে (কবি স্বায়রনের মত) বলছে, "গুড বাই, মাই ইংলণ্ড।

জাহাজের যাত্রীরা প্রায় সবাই ভেটারেন (Veteren) কেউ জার্মাণীতে চার বছর কাটিয়েছেন; কেউ ডাবলিন হাসপাতালে হাউস সার্জ্জেন ছিলেন; কেউ বা প্যারিসে শিল্প চর্চ্চা শেষ করে দেশে ফিরছেন। ছাত্র এবং প্রাক্তন ছাত্রের সংখ্যা বেশী, এবং তাদের মধ্যে ডাক্তার ছিলেন সংখ্যাগুরু। প্রায় সবাই কৃতী ছাত্র। ভারতে মজা লাগে কত রকমের লোক যাত্রীদের মধ্যে আছেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টাউন প্লেনার, আর্টিষ্ট, ইকনমিষ্ট, পোলিটিসিয়ান, ধর্ম্মযাজক—কোন শ্রেণীর লোক বাদ পড়ে না। কেউ কেউ আবার ইউরোপীয়ান কার্ম্মের "কভেনেন্‌টেড অ্যাসিস্‌টেন্ট" হয়ে দেশে ফিরছেন। এত বিচিত্র সম্মেলন যেন একটি কর্ম্ম বিশেষে গঠিত জনসভা (Functional representative assembly)। অথচ এর মধ্যে ঐক্যবোধ কি সহজলভ্য। রাজনৈতিক জনসভায় যেটি ব্যতিক্রম বলে আমরা জানি, এখানে সেটি নিয়ম। সমুদ্রযাত্রার বিশেষত্ব এইখানে—অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী কম্‌রেডশিপ সৃষ্টির মধ্যে।

টেম্‌স্ নদী ছাড়িয়ে আমরা ইংলিশ চ্যানেলে গিয়ে পড়লাম। ডেকের ওপর উঠলে চোখে পড়ে অনন্ত সমুদ্র, প্রাণে সাড়া দেয় অন্তহীন কাল।—এ দুয়ের সমন্বয় সত্যি অপূর্ব। ক্ষণিকের জন্য মনকে অভিভূত করে। তার রেশ কেটে গেলে মনে হয় কি করি? কাজের তাগিদ নেই, পর্য্যাপ্ত অবসর এবং কর্ম্মপ্রেরণাহীন জীবন। গল্প গুজবে অবশ্য অনেক সময় কাটে। গল্পের সূত্র খুঁজতে অসুবিধা হয় না কারণ বিভিন্ন লোকের বিদেশে থাকাকালীন ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে। একজন তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে, অন্যেরা আলোচনায় যোগ দেয়। তর্ক ওঠে,—তর্ক হওয়া মোটেই স্বাভাবিক। তা'তে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়া যায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান দর্শন কোনো বিষয়ই আলোচনার বাইরে থাকে না। আমরা যেন জলের ওপরে একটি লোকসভা গঠন করেছি।

সূর্য্যাস্তের পর যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে, সমুদ্রের কলধ্বনি যখন আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে, তখন জাগতিক তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে ভাল লাগে না। তখন মন ভেসে যায় কল্পনালোকে। পুরোনো স্মৃতি মনে জাগে, কল্পনা তার রঙিন ডানা মেলে উড়ে চলে। প্রথম প্রথম স্বপ্নের ঘোরে মনে হত যে রোমে "লিডোর" পাশে বসে কাফেসোর গাওয়া "সান্তা লুকিয়া" শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে পড়ছি; বা ফরাসী রিভিয়েরার রোদ মাখানো তটভূমিতে অক্লেশে শুয়ে রয়েছি। এ কল্পনার নেশা যে শুধু আমার ছিল তা' নয়,—প্রায় প্রত্যেকেরই মনের অবস্থা অনুরূপ। সেদিন রাত্রে দেখি মণি ডেকের অন্ধকারে চুপ করে বসে একদৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, "কি হে একলা বসে সাগর-সঙ্গীত শোনা হচ্ছে।" আমার প্রশ্নে তার চমক ভাঙল। বল্ল "না, সাগরসঙ্গীত নয়, সুইজারল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখছি।" আমি বল্লাম, "তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে। যে একবার জেনিভা বা জুরিকে গেছে সে কি সে "দেশের টান অস্বীকার করতে পারে।" একটু চুপ করে মণি বল্ল, "জুরিকেও যাই নি, জেনিভাও দেখি নি। তবে আল্পসের পাদদেশে সেই যে স্বপ্নমাখা ছোট গ্রামখানি……।" গল্প গড়িয়ে চল্‌ল। প্রত্যেকদিন না হ'লেও প্রায়ই সন্ধ্যের সময় নিজেদের মধ্যে এই ধরণের প্রাণখোলা গল্প হ'ত।

আমাদের মধ্যে একজন আর্টিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে ব্যতিক্রম, কথাবার্ত্তা বা হাসিঠাট্টায় যোগ দিতেন না; হয়ত' তিনি স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী না হয়ত স্বেচ্ছায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। আমার কেমন ধারণা জন্মে ছিল যে সমশ্রেণীর লোকের অভাবে তাঁর অবস্থা অনেকটা হংসমধ্যে বকো যথার মত। একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার উপক্রম

করলাম। ফ্লোরেন্সের উফিৎসি মিউজিয়ামে তিনি কিছুকাল ছিলেন এবং তারপর প্যারিসের কোন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পনিকেতনে শিল্পচর্চা করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম রোমের বোর্গীস্ (Borghese) গ্যালারী তাঁর কেমন লেগেছে? তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "একঘেয়ে।" কিছুটা অপ্রস্তুতে পড়ে আমি চুপ করে রইলাম। মনে পড়ে গেল "মোনা লিসা" ছিলের সেই বন্ধু যেখানে ভূমধ্য লোয়েখ জগৎ প্রসিদ্ধ লুভ্রকে (Louvre) আর্টের সমাধিস্থল বলে পরিহাস করছেন। চরম আর্টিষ্টরা এই রকম হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে আমরা ইংলিশ চ্যানেল ছাড়িয়ে বে অব্ বিস্কেতে (Bay of Biscay) পড়েছি। চ্যানেল ঘুরে আমরা তখন দক্ষিণ ইংলণ্ডের কাছে এসেছি। আকাশে সেদিন ঘনঘটার আভাস। জাহাজের জনৈক কর্মচারী বললেন ঝড় হবার আশঙ্কা আছে তবে ভয়ের কারণ নেই। দক্ষিণ ইংলণ্ডের আলোকদীপ্ত তটভূমি ক্ষীণ-রেখার মত দেখাচ্ছে। কি অদ্ভুত এই শোভা। দূরে সারি সারি নিওন লাইটের প্রভা; একবার জ্বলছে, আরেকবার নিভছে। ঠিক যেন রূপকথায় বর্ণিত যাদুপুরী। আমরা অনুমান করতে লাগলাম - ইংলণ্ডের কোন অঞ্চল দেখা যাচ্ছে। কেউ বলে হেষ্টিংস, কেউ বলে ওয়ারদিং।...

আমাদের Sports এবং Entertainment Committee ঠিক হল। ডাঃ মল্লিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ডেকটেনিস ও ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন হল। তাছাড়া Children's day, Fancy dress Competition, Musical soiree প্রভৃতি পালন করবার ব্যবস্থা হ'ল।

• • • •

সেদিন ভোরে উঠে শুনি আমরা আইবেরিয়ান উপদ্বীপের উপকূলে এসে পড়েছি। একটু পরে তীরভূমি দেখা যাবে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, কুয়াশার রেশ নেই। শুভ্র ফেনার মুকুট পড়ে সাগরের ছোট ছোট ঢেউ দিনের আলোয় খেলে বেড়াচ্ছে। পরিস্থিতির সঙ্গে সৌষম্য বজায় রেখে জাহাজের মাইকের মধ্যে দিয়ে "April in Portugal" বেজে উঠল সত্যি সত্যি কিছুক্ষণ পরে যখন দেখলাম আকাশে দলে দলে বলাকা উড়ে যাচ্ছে তখন প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। পঞ্চদশ শতাব্দীর দিগ্‌ভ্রান্ত হতাশাচ্ছন্ন নাবিকেরা যখন অপ্রত্যাশিতভাবে স্থলের সন্ধান পেয়েছিল তখন তাদের মনে না জানি কী আনন্দের সূত্রপাত হয়েছিল!

প্রায় একঘণ্টা পর সৈকতরেখার দেখা মিলল আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে টেলিস্‌কোপের মধ্যে দিয়ে দেখতে লাগলাম। বালুভূমির পর লোহিত ধূসরাকার পাহাড়ের সারি। আশা ছিল যদি হঠাৎ কোন স্পেনিশ্ সুন্দরী দেখা মেলে; April hopes, fools of chance· সন্ধ্যের একটু আগে আমরা লিস্‌বন্ ছাড়িয়ে গেলাম আমরা বন্দর থেকে অনেক দূরে ছিলাম, তাই বিশেষ কিছু চোখে ধরা পড়ল না। দুঃখ রয়ে গেল কোন ছবি তুলতে পারলাম না। জিব্রালটারের বেলাতে ঠিক তাই। তার খাড়া পাহাড় ছাড়া কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না। আমরা এবার আফ্রিকার গা ঘেঁষে চলতে লাগলাম।

ভূমধ্যসাগরে ভালভাবেই সময় কেটেছিল। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে ক্যারাম ও ডেকটেনিস খেলা আরম্ভ করলাম। মাঝে একদিন নাচ ও গানের আসর হয়ে গেল। একটি ইংরিজি ও একটি হিন্দি ফিল্ম দেখান হ'লো। শুধু দুঃখ রয়ে গেল যাত্রাপথে টিউনিসিয়ার বা মাল্টার আমাদের জাহাজ থামল না।

আটদিন কি ন'দিন জাহাজে কাটানোর পর আমরা আলজিয়ার্সে গিয়ে পৌঁছুলাম। ভারত-ইংলণ্ড লাইনে যে সব জাহাজ চলাচল করে তারা সচরাচর আলজিয়ার্সে থামে না। ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম কুড়ি বছর আগে একবার এখানে তাঁরা নো

ফেলেছিলেন। মিশরীয় পুলিশ আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে নামবার অনুমতি দিল। ব্রেকফাষ্ট খেতে বসেছি এমন সময় শুনলাম ডাক এসেছে। চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। ডাঃ মল্লিক আমাদের ক'জনের চিঠি সংগ্রহ করতে গেলেন। তিনি ফিরে আসা মাত্র আমরা সবাই একসঙ্গে তাঁকে ছেঁকে ধরলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ অভাগার কপালে কোন চিঠি আছে কিনা। তিনি রহস্য করে উত্তর দিলেন যে আমার জন্যেই ডাকের থলি এসেছে। এই বলে তিনি গুণে গুণে এগারোটি চিঠি দিলেন। পাশ্চাত্য বিদায় জানাচ্ছে, প্রাচ্য অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল আমি যেন সকলের centre of interest, আগ্রহের কেন্দ্র।

দল বেঁধে আলেকজান্দ্রিয়ায় নামলাম। তিনটি ট্যাক্সী ভাড়া করা হ'ল। প্রথমে কাষ্টম্‌সে গিয়ে দর্শন দিলাম। কাষ্টম্‌সের অফিসার নোট করে নিলেন আমাদের কাছে ক'টা ক্যামেরা আছে, আর ক'জন ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ট্যাক্সী করে আমরা সমুদ্রতীরের প্রমেনাদ দিয়ে চললাম। পথে যেতে যেতে দেখি সব রাস্তার ফরাসী নাম—যেমন রু তুলুল রু গু আলবুকার্ক। ক্রাসে ল' কোৎদজুরের (La Cote d'azhar) অনুকরণে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, এবং ক্যাসিনো গড়া হয়েছে। তবে অত সুন্দর নয়। গাইডের কাছ থেকে জানলাম যে এ অঞ্চলে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের বাস। আমাদের সৌভাগ্য যে জেনারেল নেগিব সেদিন গাড়ী করে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর জিপের পেছনে সশস্ত্র পুলিশ ভ্যান। আমাদের ট্যাক্সী রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল এবং আমরা হাত তুলে অভিনন্দন জানালাম। পথে যেতে যেতে একস্থানে গ্রীক কিংবা রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ দেখলাম। গাইড বলল যে আমরা এখন ইউরোপিয়ান্ কোয়ার্টার্সে এসে পড়েছি। এ অঞ্চলে ফরাসী, ইতালিয়ান ও মল্টিস্‌দের বাস। তা' ছাড়া ইজিপ্‌সিয়ান অভিজাতদের অনেকে এখানে বাড়ী করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে এদেশের প্রগতিশীল অভিজাত সম্প্রদায় ফরাসী-ভাবাপন্ন—যদিও তার অধিকাংশ আরব অধিবাসীরা এখনও প্রাচীন মুসলিম প্রথায় চলে। ইউরোপিয়ান কোয়ার্টার্স এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ইজিপ্‌সিয়ান মেয়েরা বোরখা না পরে চলাফেরা করে। তাদের চেহারা এবং সাজসজ্জা অনেকটা ফরাসী কিংবা ইতালীয়ান্ মেয়েদের মত। সত্যি বলতে কি তাদের (shining blonde hair) স্বর্ণোজ্জ্বল কেশগুচ্ছ দেখে মনেই হয় না যে তারা এশিয়াবাসী। সেখানকার প্রাক্তন রাজপ্রাসাদের সামনে আমরা ছবি তুললাম। গাইড বলল, বর্তমান ফারুকের পিতামহের আমলে এর গঠন-কার্য শেষ হয়। প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ। অগত্যা আমরা সেখান থেকে সহরের মাঝখানে গিয়ে পড়লাম। যাবার পথে মুস্লামসজিদ দেখলাম। প্রকাণ্ড বড় মসজিদ—মধ্য প্রাচ্যে মুসলিম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। সহরের দোকান-বাজার দেখে আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার স্ফিংকস্ এবং ক্যাটাকোম্ব দেখতে গেলাম।—রোমে যে সব ক্যাটাকোম্ব দেখেছি তার তুলনায় এ কিছুই নয় তবে স্ফিংকসের মূর্তির মধ্যে আদিমকালের জান্তব ভয়াবহতা ওতঃপ্রোত রয়েছে।

সবশেষে সহরের নিকটবর্তী রাজোদ্যান দেখতে গেলাম। অনেকটা লণ্ডনের কিউ গার্ডেন্স কিংবা প্যারিসের বোয়া দ বুলোন্স (Bois de boulagne) জারদ্যাঁ ব্যাগাটেলের অনুকরণে গড়া। ফুলের বাগান, নকল পাহাড়, কৃত্রিম ফোয়ারা কিছুই বাদ পড়েনি; উপরন্তু কন্‌টিনেন্‌টাল স্টাইলের কাফে রয়েছে। দুপুর দুটো নাগাদ জাহাজে ফিরে এলাম। দেখি জাহাজের সামনে ফেরিওয়ালাদের ভীড়। পিরামিড আঁকা হ্যাণ্ড ব্যাগ, স্ফিংকস্-এর মূর্তি আঁকা স্লিপার, নানারকম কাঁচ ও পাথরের জিনিষ নিয়ে ফেরিওয়ালারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের জাহাজে ওঠা নিষেধ, তাই র‍্যাডিংএর কাছে সবাই জমায়েৎ হয়েছে। আমি দুটো কাঁচের খেলনা কিনতে গেলাম; তার দাম চাইল মাত্র এক শিলিং

আমার কাছে হাফ ক্রাউন ছিল,—কিন্তু তার ভাঙানী পাওয়া গেল না। ফেরিওয়ালা তখন দামের বদলে ছুটো সিগারেট চাইল। ইংলিশ সিগারেটের কি চাহিদা। প্রত্যেক ফেরিওয়ালা ক্রেতাদের কাছ থেকে নানা উপায়ে সিগারেট আদায় করতে লাগল।

দুপুর তিনটে নাগাদ জাহাজ ছাড়ল। এতক্ষণে পোলমানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বন্দরের ছোট ছোট পালতোলা নৌকাদের পেছনে ফেলে আমরা পোর্ট সৈয়দের দিকে চললাম। ক্রমেই রোদের তেজ ও গরমের মাপ্ট বাড়তে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের দোলানি আরম্ভ হল। আমাদের মধ্যে দু'একজন sea sick হয়ে কেবিনে পড়ে রইলেন। বিকেলের দিকে ডাঙাজের ডেকে দাঁড়িয়ে রস্ত মশাই (ওরফে ছেয় ভাট) চাই তুলছেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম "চল কি ?" রহস্য করে উত্তর দিলেন, "আর কি, এখানেই সভ্যতার শেষ এবং বর্বরতার আরম্ভ।

রবিবার দিন সকালে আমরা পোর্ট সৈয়দে গিয়ে পৌঁছলাম। গতবারের তুলনায় শহরটি পরিষ্কার বলে মনে হল। ফেরীওয়ালাদের উৎপাত কিছু কম। শহরের বিশেষ কিছু দেখবার নাই। ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্সের মূর্তি ইউরোপ ও এসিয়ার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিশরীয় ওলন্দাজ আক্রোশ থেকে এখনও তা রক্ষা পেয়েছে। জাহাজে ফিরে এসে দেখি ডেকে ম্যাজিক দেখবার ভীড়। বেলাই, তাস ও পাখীর বাচ্চা নিয়ে ম্যাজিশিয়ান নানা রকমের কারসাজি দেখাচ্ছে এবং পয়সা আদায় করছে। জাহাজ যখন ছাড়বার সময় হয়ে এলো তখন ম্যাজিশিয়ান বললে যে, এবার সে সবার সেরা যাদুখেলা দেখাবে। তবে তারজন্য তাকে অগ্রিম বখশিস্ দিতে হবে। এই বলে সে ছুটো কাগজের তৈরী হাঁস হাতে নিয়ে আমাদের বল্ল. "you say go there" দর্শকেরা সমস্বরে তিনবার বল্ল. "go" তখন সে ঈষৎ হেসে বললে, "you tell me go so, I go"। আমরা সবাই বোকা বনে গেলাম।

জাহাজ ছাড়বে দেখে ফেরীওয়ালারা জিনিষের দাম কমাচ্ছে। দর কষাকষি চলছে, লোকে কিনছেও বটে। নানা রকমের শোনা যাচ্ছে। "ডক্টর, ডক্টর, গিভ মি টু মোর সিগারেটস্।"

"মাদাম। স্যুভেনিয়ার ফ্রম ইজিপ্ট। মি গিভ ইউ হাফ প্রাইস" ছোট ছোট নৌকো থেকে দড়ি দিয়ে টুকরির মধ্যে করে জিনিষ ডেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে এবং দাম আদায় করছে।

"নো ডক্টর, মাইম নট নো চিপ।" একজন গোবেচারা গোছের ছেলে চুপ করে মজা দেখছিল। একজন ফুল-ওয়ালা তার দিকে চেঁচিয়ে বললে, "স্লাওয়ার, মঁসিয়ে, রোজেস্ অফ সোফিয়া, ফ্রেশ্, রোজেস।" ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "মঁসিয়ে, মঁসিয়ে, লিসন্ ফর টু মিনিংস ওন্লি,—ইওর গার্ল উইল বি হ্যাপী।

হুইসেল বাজল। জাহাজ দুলতে আরম্ভ করল। আমরা সুয়েজ ক্যানেলে প্রবেশ করলাম। সন্ধ্যের সময় সুয়েজের বন্দরভূমি থেকে ইংরেজ সৈন্যেরা শিষ দিয়ে ও হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাল। যতই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো ততই সুয়েজের শোভা বৃদ্ধি পেল। খালের উত্তর পাশের সারি সারি বাতি জ্বলে গেছে। সুয়েজের গভীর নীল জলে তাদের প্রতিচ্ছবি। দূরে লাইট হাউস থেকে তীব্র আলোক প্রতি-মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

লোহিত সাগরে আসবার পর থেকে ভীষণ গরম আরম্ভ হল। সূর্যের তেজ এত বেশী যে সব সময় সান্ গ্লাস (Sun Glass) পরে থাকতে হ'ত। আমাদের সঙ্গে জনৈকা নরওয়েজিয়ান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রথম প্রাচ্যে যাচ্ছেন। সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন। আমরা সবাই বলাবলি করতে লাগলাম ভারতবর্ষে তিনি কি-ভাবে থাকবেন। এই গরমের মধ্যে ডেক-টেনিস, ক্যারাম প্রতিযোগিতা হ'ল। Children's day-তে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে চকলেট, আপেল ও নানা রকমের খেলনা উপহার দেওয়া হ'ল।

এডেনে যখন পৌঁছলাম তখন গরম কিছুটা সয়ে গেছে। ঝিমলক করে বন্দরের ল্যাণ্ডিং ষ্টেশনে যেতে হল। এডেন যদিও আরব মরুভূমির অন্তর্গত, কিন্তু রাজনৈতিক unit হিসাবে বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত, এখানে ইষ্ট আফ্রিকার টাকা চলে। বোধহয় বৃটিশ সাম্রাজ্যে একমাত্র এই অংশে দশমিক মুদ্রার প্রথা প্রচলিত। এডেনের ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতীয়দের হাতে। বেশীর ভাগ দোকান হয় সিন্ধি না হয় বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীদের। ফ্রি শোর্ট বলে জিনিষ পত্তর অনেক সস্তা। সিগারেট, হাভানা চুরুট, লাইটার, ক্যামেরা ও বুশ্ শার্ট প্রভৃতি অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক কম দামে পাওয়া যায়। তবে এখানে দেখবার মত কিছু নেই। এর কাছে নাকি মরুদ্যান রয়েছে। অনেকে সখ করে সেখানে গিয়ে মরুদ্যানের ঠিক্ লবণাক্ত জল পান করে। আমাদের হাতে সময় ছিল না, আমরা তাই জাহাজে ফিরে আসলাম।

এডেন ছেড়ে চলে আসবার পর আমরা দিন গুনতে আরম্ভ ক'রলাম। সবাই বাক্স পেটরা গোছাবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগল। যারা পথে বেশী জিনিষ কিনেছে তাদের কষ্টম্স্-এর ভয়। আরব সাগর পার হতে দিন চার-পাঁচ লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর ভোরে আমাদের মধ্যে সে কি উত্তেজনা কখন বোম্বাই দেখা যাবে। মাইকে ঘোষণা করা হল যে বেলা এগারোটার সময় জাহাজে জল বন্ধ হয়ে যাবে।

নেশাখোরেরা শেষ বারের মত সস্তায় বিয়ার ও জিন্ পান করবার জন্য bar এ ছুটল। ইতিমধ্যে জিনিষপত্তর কেবিন থেকে বার করে ডেকে সাজিয়ে রাখা হল। সকলের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ। তবুও এর মধ্যে কোথাও বিরহের ব্যথা লুকিয়ে রয়েছে। তিন সপ্তাহ এক সঙ্গে কাটিয়েছি, এবার সেই কমরেডশিপ ভেঙ্গে যাবে। দুপুর তখন বারোটা। ঐ ত' বোম্বাই দেখা যাচ্ছে। কি-উজ্জ্বল সেই দৃশ্য। সূর্যের প্রখর কিরণে চারিদিক জ্যোতির্ময়। ক্রমে বোম্বাই নগর আরো স্পষ্ট হয়ে আমাদের দৃষ্টিগোচরে এল। আমরা সবাই উৎগ্রীব হয়ে দেখতে লাগলাম। ঐ ত' মেরীন ড্রাইভ দেখাচ্ছে—তার ওপর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। Gateway of India এবং হোটেল তাজকে কি জমকালো দেখাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখেই ত' দুবছর আগে দেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। ছেলে বলল যে দীর্ঘযাত্রার পর ইংরেজ নাবিকেরা যখন ইংলণ্ডের তীরভূমি দেখতে পায় তখন তারা সমস্বরে মাতৃভূমির জয়গান গায়। আমরা কি গাইব? কেন আমাদের দেশ ত' গানে লীন নয়।...আমরা এক সঙ্গে গাইতে শুরু ক'রলাম,

"……ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ,
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার, এই দেশেতে জন্ম যেন
এই দেশেতে মরি।"……

সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ সোনাজলের ফোয়ারা ছিটিয়ে সে গানের প্রতিধ্বনিকে দেশের মাটির কাছে নিয়ে গেল। হঠাৎ যেন দিব্য চক্ষু খুলে গেল, মনে হল আমার মাতৃভূমি কি সুন্দর, তাঁর আকর্ষণ কি দুর্নিবার। ধন্য হোক আমার দেশ!!!...

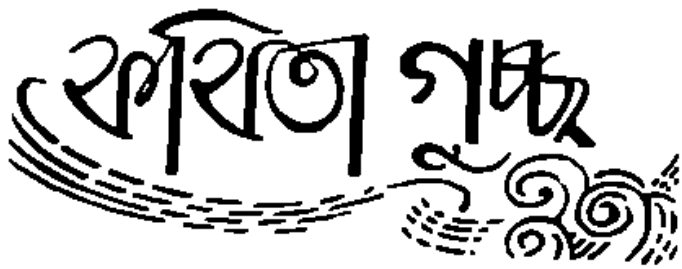

ভালোবাসা

—বিভূতি ভট্টাচার্য

এখানে বসেছি চেয়ে চেয়ে শুধু কতদিন সন্ধ্যায়,
পড়ন্ত রোদ আর দীপশিখা মেখে,
বাতায়নে এসে কথা কয় ইসারায়,
চুপ্‌চাপ বোজ চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে।

বসেছি তখন ডানায় আঁধার বেঁধে
ঘরে ফিরে চলে নভোচারী পাখীদল,
বকুলকলিতে ঝিরঝিরানিরে মেখে
নীলাকাশে করে কি বধুর কোলাহল।

নম্রকিশোরী দীপশিখা দেখা একা
প্রতীক্ষারতা ক্ষণ-অভিসার তরে,
প্রিয়তম সেই সৌরগ্রহের দেখা
হয়তো খানিক ভীরু হিয়া দেবে ভরে।

অমনি করেই প্রতিদিন বেলাশেষে
আমি যদি আসি তোমারই ওপথ পরে,
বাতায়নে প্রিয়া তুমি কিগো সেথা এসে
দাঁড়াবে ক্ষণেক, দাঁড়াবে আমার তরে?

অন্ত-বিকেলে

বুদ্ধদেব ঘটক

এই ত বিকেল এলো লঘুপক্ষ আশার মতোন
ছড়িয়ে গোধূলি আলো রেখাঙ্কিত ডালের ডালে
এইত শালিখ-শিশু ডানা-গুঁড়ে ধুলোর পোহালে
সোহাগী সৌরসোনা ঠোঁটে তুলে চড়ুয়ের মন
ফিরে গেলো অন্ধকারে। তারপর তুমি এলে, নির্জনতা
ছায়া-ছায়া আলো ঢেলে তুমি এলে নিঃশব্দ নির্জনে
হলুদ ঘাসের বনে, জরা-ক্লান্ত আমাদের মনে
বিলোলে আকণ্ঠ এক স্নিগ্ধ-সুধা শান্তির বারতা!

তবুতো মুহূর্ত যাবে, নির্জনতা, আকাশের সবটুকু সোনা
প্রান্তরের গাঙ ছুঁয়ে দিগম্বরে এখনি ফুরোবে
এখনি বিলীন হবে ঘরোঘরো ভীড়ের মূর্ছনা
সময় শীতের হিম আবারোতো দু'হাতে কুড়োবে
ঘুরবে নিকষ ছায়া ব্যথা-ম্লান অন্ধকার ঢেলে
তবু মন দাঁড়াবে না কখনো বা এ রক্ত-বিকেলে!!

উজ্জয়িনী

শ্রীকৃষ্ণনাথ বাকচী

ক্ষতি-লাভের খতিয়ানে পাওনা এবং দেনা
হাজার জনের বাজার মাঝে চলছে বেচাকেনা।
চেনা মেয়ের মুখের মতন মিছিল স্রোতের বাঁকে
মিলিয়ে যে যায় এক পলকে চমক দিয়ে ডাকে।
চিনি তোমায় চিনি
চিরকালের নিরুদ্দেশের মায়া উজ্জয়িনী।

রাজা থাকুন রাজা নিয়ে নেই মোহ তার পর
অশ্রুমতী নদীর তীরে আমার কুঁড়ে ঘর।
মেঘের ছায়া ঘাসে ঘাসে, কূলে আকুল ঢেউ
হারা হরিণ অন্বেষণে এলে সেথায় কেউ,
বলব, বিদেশিনী!
ঘোমটা মুখে কিসের দুখে, প্রাণে বুলাও মণি।

আমার মধু মালঞ্চে ফুল ফুটবে সারা বেলা
আপন মনে সাথীর সনে করবে ময়ূর খেলা।
আলো ছায়ার মেলামেশার নেশায় ভরপুর
দুপুরে তার একতারাতে মৌমাছিদের সুর।
সন্ধ্যা বিরহিণী
ধূসর নীল বিষণ্ণতায় এলিয়ে দেয় বেণী।

রত্নময়ী চউরলী কি চিৎপুরেতেই থাকি
ইতিহাসের হিসাব নিকাশ নিমেষে হয় ফাঁকি।
ডাকে আমায় বুকের বুকে কান্না কলরোলে
দোলে তখন মালবিকার স্বপ্ন আঁচল দোলে।
শুনি ঘণ্টা ধ্বনি
মহাকালের মন্দিরে এই কাছেই উজ্জয়িনী।

আসিছে সন্ধ্যা

শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য

আসিছে সন্ধ্যা, অতি মন্থর গতি,—
দিনের আলোক হয়ে এলো অবসান,
সারা দিবসের কর্ম-ক্লান্ত-অতি,—
লভিবে এবার অস্তরবির দান।

তাই বসে থাকা দিগন্ত পানে চেয়ে,
নাই ত্বরা আর কোনও কাজ সাধিবার,—
ছায়া-পাল তুলি আসিবে কখন নেয়ে,
সান্ধ্য লগনে খেয়া করিবারে পার!

প্রস্তুতি, ঐ, আহ্বান করি যায়,
অসীম নীলিমা মেঘ মন্ত্রিত ভাষে,
বুকে শুনি কার বেজেছে করুণ বীণ;
যত শুরুভার নামিয়া এসেছে পায়,

কাজের প্রেরণা পলায়েছে কোন্ ফাঁকে,
অন্ত শিয়রে আজ,—গুণিতেছি বসি দিন।

একটি মিনারের স্বপ্ন

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাটি থেকে থরে থরে পোড়া ইট সাজিয়ে হাজার।
আমারে এ রূপ দিতে হলো শখ যে কোন রাজার
আজ তার নাম নাই পৃথিবীর কোন ইতিহাসে!
আমি শুধু আছি, (আহা সেই রাজা যদি ফিরে আসে,
তবে ছুটি চেয়ে নিই !) আর ভাল লাগে না এখন
আকাশ প্রহরা দেওয়া ! নীচে কত চাপানটী বন।

হাতছানি দিয়ে ডাকে ! মন টানে সাদা বালি হাঁস !
কখনো কি খুলবে না আকাশের এ করুণ ফাঁস ?
বালুরেখা নদীচরে বসে যদি শালিখের মেলা
আমি কেন দূরে থাকি ? কী করুণ এই ছেলেখেলা
আমার হৃদয় নিয়ে ! দূর বাঁধে চলে রেলগাড়ী !
(আহা যদি একবার তার মতো দিতে পারি পাড়ি ;
মন-মতো কোনখানে, চোখ-চেনা আকাশ পেরিয়ে !)
আমার হৃদয় বাঁধা বনানীর নীল ফিতে দিয়ে !

আত্মগ্লানি

প্রসেনজিৎ সিংহ

আমার এ দুপুরের চোখ নিয়ে ডুব দিই নির্জন রাতে,
অনেক অতলে দেখি অজস্র ঝিনুকের ডানা,
বিতাড়িত এক ভীড় মেয়েদের মত
এখানে ওখানে প'ড়ে ছড়িয়ে রেদায়।

হে আমার বিকৃত বিকৃত মন !
এ আঁধার হাতড়িয়ে কি-বা পেতে পার ;
যদি কিছু পার দাও, পরিশোধ নেই,
এই কথা কি ক'রে বা নিতে পার মেনে,
আমার কলঙ্কিত এ ইহদী মন ?

আমার এ নীলা চোখে যদি ডুব দিই
ভেবে রাখি এই শেষ—একেবারে শেষ
নিহরিত উজ্জ্বল পৃথিবীকে পাওয়া ॥

গভীর নীরবে খালি মুক্তাই খুঁজে
কেটে যাবে এ জীবন ; শ্যামল মাটিতে আর ওঠাবে
কো

নেশা-পাওয়া দুপুরের ব্যাকুলিত ডাক
কেঁদে কেঁদে মুছে যাবে গোধূলির পথে ॥

সমাজ ও জাতীয়জীবন

[র. কু. সে.]

ভারতীয় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিষয় নিয়ে বর্তমানে অবস্থা ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। এর প্রথম অঙ্কুর দেখা দেয় বৃটিশ আমলে কংগ্রেসী মহলে। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়ে ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনমূলক কাজ হিসেবে যে যে বিষয়গুলিকে তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গ্রহণ ক'রেছিলেন, তার মধ্যে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি ছিল অন্যতম। বৃটিশ সরকার ভারতকে নানা-ভাগে নানাপ্রদেশে ও নানা জাতিবর্ণে পৃথক ক'রে ভারতীয় ঐক্যশক্তির ক্ষয়িত জীবনধারার উপর চেয়েছিল নির্বিরোধে তাদের শাসনযন্ত্র চালিয়ে যেতে। ভারতবাসী দেখ্‌লো—এই ভাবে তাদের অপরাজেয় ঐক্যশক্তিকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিয়ে তাদের একতা থেকে পৃথক ক'রে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় সমাজদেহ ক্রমেই ক্ষীণাঙ্গ হ'য়ে প'ড়ছে। এই ভৌগোলিক বাঁটোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও ধ্বংস অনিবার্য। এই অনিবার্য ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল সেদিন একমাত্র কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উপর। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়ে তাই তাঁরা সেদিন ঘোষণা ক'রেছিলেন, যে স্বায়ত্তশাসন বা রাজশক্তি হাতে পেয়ে তাঁদের প্রথম কাজ হবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দ্বারা দেশকে তার জাতীয়-জীবনে উন্নত করে তোলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সালের এই দীর্ঘ বেয়াল্লিশ বছরের মধ্যেও ভারতের গণশক্তি তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিতই ছিল। কাজ চল্‌ছিল কেবল শৃঙ্খল ভাঙায়, কেবল আন্দোলনকে জিইয়ে রেখে এগিয়ে যাবার।

তারপর ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই একদিন স্বাধীনতা এলো, সন্দেহ নেই। সে স্বাধীনতা নকল স্বাধীনতা ব'লে আখ্যাত হ'লেও সেই স্বাধীনতাকে ভিত্তি ক'রেই এদেশের মানুষেরা কংগ্রেসকে তার পূর্ব-প্রতিশ্রুত উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে চাইলো নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আত্মমর্যাদায় বেঁচে থাকতে। সাম্প্রতিককালে এই দাবীর একটা মস্তবড় কারণ হ'চ্ছে ভারতের কোনো কোনো প্রদেশের জনসংখ্যানুপাতে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার অসামঞ্জস্য। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাবের দাবী সর্বাগ্রগণ্য, কিন্তু 'Exchange of Population'এর ফলে পাঞ্জাবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি বড় হ'য়ে উঠ্‌বার সুযোগ পেলো না—যেমন পেলো পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতার মূলে দেশবিভাগের চরম লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গকেই। পশ্চিমবঙ্গ হবে সমগ্র বাঙালীর 'Home land', পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষেরা এখানে এসে তাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখে চ'লতে পারবে, এই দাবীর স্বীকৃতিতেই স্বাধীনতার পথ প্রশস্ততর হ'লো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ পারলোনা তার এই লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল জীবনকে জমি দিয়ে, অর্থ দিয়ে, ব্যবসা বা চাকুরী দিয়ে এবং শিক্ষা আর স্বাস্থ্য দিয়ে রক্ষা ক'রতে। সরকারী ব্যবস্থায় তাদের কতক অংশকে পাঠানো হ'লো সুদূর আন্দামানে, কতক অংশকে বা বিহার আসাম ও উড়িষ্যায়। কিন্তু সেখানেও একটা মস্তবড় প্রশ্ন দেখা দিল। অবাঙালীয়ানা পরিবেশ ও সরকারী নীতির মধ্যে কতকাল বাঙালী সংস্কৃতি রক্ষা পাবে—এইটেই হ'লো প্রধান দুর্ভাবনা। বাঙালীর জীবনে এ

দুর্ভাবনা জাগতো না—যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আইন ক'রে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'তো যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই প্রত্যেক প্রদেশবাসীর স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা ও শিক্ষার মান সংরক্ষিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই উদার পন্থা গ্রহণ করেননি। উপরন্তু এই একই সময়ে বিহার, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে 'বাঙাল খ্যাদা' আন্দোলন তীব্র হ'য়ে উঠ্‌লো। এর পিছনে হয়ত উক্ত বিভিন্ন প্রদেশের অনেকের এমন একটা নৈতিক ভীতি ছিল যে, শিক্ষিত বুদ্ধিজীব বাঙালীরা গিয়ে তাঁদের চাকুরীর আসনগুলি কেড়ে নেবে। কিন্তু বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ ক'রলে অনায়াসে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন যে বাঙালী-চরিত্রে প্রাদেশিকতার কৃষ্ণটিকা নেই, সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে থাকতেই তার আনন্দ। 'বাঙাল খ্যাদা' আন্দোলনে সেই আনন্দই যে কেবল তার ব্যাহত হ'লো, তাই নয়, প্রদেশগত অর্থনৈতিক সমস্যাও সেই সঙ্গে অত্যধিক বেড়ে গেল। বহু বাঙালীকে ফিরে আসতে হ'লো তাদের নিজেদের প্রদেশে, অথচ পশ্চিমবঙ্গ আগাগোড়াই 'Deficit Province',

বাঙালীর জীবন সমস্যা যখন এইভাবে অত্যুগ্র হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন সে জোরের সঙ্গে দাবী জানালো ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের। ইতিহাসের নজির টানলে বাংলার মানচিত্রকে একদা দেখা যেতো ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। কিন্তু সে ইতিহাস বাদ দিয়েও যা তার ছিল, ১৯০৫ সালে অবিমৃষ্যকারী কার্জন নীতির ফলে তার একটা বিরাট অংশ গিয়ে যুক্ত হতে বাধ্য হলো বিহার প্রদেশের সঙ্গে। বাঙালী চাইলো সেই অংশগুলিকে ফিরে পেতে, নইলে তার জনসমষ্টির জীবনরক্ষা সম্ভব নয়। দাবী হিসেবে এ দাবী তার ন্যায্য দাবী, কিন্তু একদা-বিঘোষিত কংগ্রেসী নীতির দোহাই দিয়ে এ দাবী আজ উঠ্‌বার প্রয়োজন ছিল না—যদি কেন্দ্রীয় সরকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বুদ্ধির সঙ্গে প্রদেশগত এই সমস্যার সমাধান ক'রতে পারতেন। কিন্তু বহুতর নানা সমস্যার মোহে প'ড়ে এই সমস্যাটি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃতপক্ষে ঔদাসীন্যেরই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। ফলে সমস্যাটি তীব্রতর হ'য়ে উঠ্‌তে বাধা থাকলো না। থাকলো না আরও একটি কারণে। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কে উদাসীন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্র প্রদেশের দাবীকে মেনে নিলেন। জননেতা শ্রীরামলুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অন্ধ্রের ভাষাগত প্রদেশ গঠনের কার্যটিকে কেন্দ্রীয় সরকার শৃঙ্খলার সঙ্গে সংযোজিত ক'রে দিলেন। এর পিছনে এমন কি গূঢ় রাজনীতি লুকিয়ে আছে, তা জনগণের বুদ্ধির অগম্য।

আজ পশ্চিমবঙ্গের দাবীর প্যান্টা দাবী উঠেছে বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম থেকে। কেউ দাবী ক'রছে গোটা কলকাতা নগরীকে, কেউ বা দাবী ক'রছে দার্জিলিং, মালদহ ও মেদিনীপুর জেলাকে। বাংলার ন্যায্য দাবী স্বীকৃতি পাওয়া দূরে থাক, উল্টে বিহার থেকে পশ্চিম-বঙ্গকে উচ্ছেদ ক'রবার একটা তীব্র ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। রক্তপণীল বিহারবাসীর চাপে আজ সেখানে শুধু বাংলাভাষাই বিপর্যস্ত নয়, বাঙালী এমন কি বঙ্গভাষী সাঁওতাল শ্রেণীরা পর্যন্ত বিপর্যস্ত। অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে বাংলার নেতৃবৃন্দ, এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যন্ত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন স্বীকার ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের দাবীগুলিকে মানবার জন্য ইত্তাহার পাঠালেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহজ বুদ্ধির রাস্তা খোলা ছিল, তাঁরা একটি বাউণ্ডারী কমিশন গঠন ক'রে বিষয়টিকে তাঁদের বিচারের উপর ছেড়ে দিলেন। সম্প্রতি বাউণ্ডারী কমিশন তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক সফরে বেরিয়ে এলাহাবাদ তলব ক'রে ফিরছেন। এদিকে প্রতিদিনের সংবাদে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা নীচতা পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিহারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের থেকে সুরু ক'রে প্রত্যেকটি নাগরিককে ক্রমেই বাঙালী বিদ্বেষী ক'রে তোলা হচ্ছে এবং বাঙালী

উপর অত্যাচার ক'রে তাদের দাবীর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।

এ যেমন একদিকের ঘটনা, আর একদিকের ঘটনা তেমনি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট-দ্বয়ের বিবৃতিগত বিরোধ। অথচ কংগ্রেস বস্তুটি কোন প্রদেশগত প্রতিষ্ঠান নয়, তা হচ্ছে অখণ্ড একটি ভারত-দেহ। এই বিরোধের ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলির মধ্যে যেমন ফাটল ধ'রছে, তেমনি প্রদেশগত বিরোধের ফলে ভারতের অখণ্ড সমাজ দেহও ক্রমে ভেঙে প'ড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু অবশ্য দু' একবার এ কথার উল্লেখ ক'রেছেন, কিন্তু তা ক'রেছেন অন্য সমস্যা সমাধান করার পর। ফলে বিষয়টি প্রহসনে দাঁড়িয়েছে। আজ বিহার থেকে বাঙালী উচ্ছেদের মহড়া দেখে মনে প'ড়ছে ১৯৪৬ সালে বিহার থেকে মুসলমান উচ্ছেদের ঘটনাটিকে। অবশ্য পারম্পর্যে শ্রীনেহেরু সেদিন ঘোষণা ক'রেছিলেন যে যদি এই নৃশংস কার্য বন্ধ না হয়, তবে নভশ্চারী এরোপ্লেন থেকে বোমা নিক্ষেপ ক'রে এই বীভৎস প্রাণ-হন্তাকারী লীলার তিনি অবসান ঘটাবেন এবং কার্যতঃ ঘটিয়েছিলেনও তাই। আজ সেই বিহারেই যখন বাঙালী খুন চ'লেছে, তখনও শ্রীনেহেরুর হস্তক্ষেপ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মূলতঃ আমরা ভারতকে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ ব'লেই স্বীকার ক'রে থাকি। এখানে প্রদেশগত প্রশ্নটি একেবারেই অর্থহীন। আমরা বাঙালী কিম্বা বিহারী হবার চাইতে ভারতবাসী ব'লতে গর্ববোধ করি। এই একজাতীয়তার ভিত্তিতে যদি প্রদেশগত এই আঘাতগুলি এসে আক্রমণ করে, তবে অবস্থাটা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা কল্পনা করা যায় না। অদূরভবিষ্যতে এমন ঘটনা একেবারেই অসম্ভব নয় যে—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে একটা বড় রকমের কিছু লড়াই বেধে যাবে।

বাউণ্ডারী কমিশনের 'রায়' বেরোলেই যে প্রদেশগুলি সুবোধ বালকের মতো শান্ত হ'য়ে যাবে, তা মনে ক'রবার হেতু নেই। স্বার্থ যেখানে প্রবলতর, অস্ত্র সেখানে খাড়া প্রহরীর মতোই সুসজ্জিত। অতএব যে আগুন একবার জ্বলেছে, সে আগুন নিভ্‌বার সম্ভাবনা সহসা কম। যথাসময়ে এর একমাত্র প্রতিকার ছিল কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের হাতে। তাঁরা এইভাবে সমস্যাটির সমাধান ক'রতে পারতেন যে, যেহেতু উনিশ শো সাতচল্লিশোত্তর ভারত উনিশ শো পাঁচ সালের ভারত নয়, এবং তার ভৌগোলিক পরিবেশ ও সমস্যাও এক নয়, সেই হেতু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতেই ভাষাগত প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন আজ আর ওঠে না। বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও আসলে প্রতিটি প্রদেশ মিলে ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড। অতএব প্রত্যেক প্রদেশের নাগরিক জনসাধারণের সুখ সুবিধে প্রত্যেক প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সংরক্ষিত হবে। তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে কোন ব্যবধানই কোথাও সৃষ্টি হ'তে দেওয়া হবে না। যদি কোনো প্রদেশে এই নীতির বিরোধিতা দেখা যায়, তবে তাকে কঠোর হস্তে অবদমিত করা হবে। যেহেতু বাংলার সমস্যা ভারতের সমস্ত সমস্যার চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সেই হেতু এই প্রদেশের সমস্যাটিকে অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হচ্ছে পূর্বাহ্নেই সমাধান করা। এবং এই সমাধানের পথে যা কিছু করণীয়, তা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতাতেই করা হবে।

এই পথেই তবে আজকের উচ্চারিত ও অভিলষিত সমাজতান্ত্রিক কাজ দ্রুত, সহজ ও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারতো। কিন্তু তার পরিবর্তে সমস্যাটি ক্রমেই জটিল হ'তে জটিলতর হ'তে হ'তে আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা কেবল পীড়াদায়ক হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু তার চাইতেও মর্মান্তিক রূপ নিয়ে এদেশের সমাজ-দেহকে অনবরত আঘাত ক'রছে এবং ভারতের জাতীয় জীবন ক্রমেই মনুষ্যত্বের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে পশুত্বের অতল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'য়ে প'ড়ছে। এই অবস্থা থেকে অবিলম্বে পরিত্রাণের পথের সন্ধান না পেলে কেবল যে অগণিত মনুষ্য পরিবারের জীবনই ধ্বংস হ'য়ে যাবে তা নয়, সেই ধ্বংসের সঙ্গে ভারত-আত্মারও ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু সেই ধ্বংস ডেকে আনতে বোধ করি ভারতের জনসাধারণ বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কেউই চাইবেন না। যদি না চান, তবে জাতির এত বড় কলঙ্কের মুখোসটাকে ছিঁড়ে ফেলে ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকেরই আজ কর্তব্য হ'চ্ছে—এই অবিমৃষ্যকারী নীতির অবসান ঘটানো এবং প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রত্যেকটি প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনচর্চার প্রবর্তন সাধন। একমাত্র এই শান্তির শুভ পথেই সমাজতন্ত্র সম্ভব, অন্য পথে নয়।

দেশ ও বিদেশ

...ক্ত প্রয়োজন তাহা জাতির নেতৃবর্গ মানিয়া
। এই সাত আট বছরে দাদা বড়
...নি নিরপরাধী হইয়াছে বটে, তবে সে

...ন্ত্রের এই নীতির
...ীকার করিয়াছে। কিন্তু যে
...ণ হওয়া উচিত তাহা
...াদের আভ্যন্তরীণ নৈতিক
... নাই। যুদ্ধের সময় যেসব
...বসিয়াছিল তাহা আজিও
...ঠনকালে যে সর্বাঙ্গীন কৃচ্ছ্র-

...গামিতা অর্থনীতির ...
...সাম্যাবস্থায় ...
...করিতে ...
...মানুষ ...
...রহিয়াছে ...
...অধ্যায় রচনা ...
...বিলাসিতা ...

য়া গিয়াছে। যে সব কারণে বিলাসিতা প্রশ্রয় পায় তাহার ।

ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রকট হইয়া রণ অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এবং শ্রেণীর।

৫০তম জন্মদিন ভারতের হইয়াছে। "সাংস্কৃতিক-প্রধান উপস্থিত শ্রদ্ধাবান্ নাগরিকগণের ! নিঃসংশয়ে আলোড়িত হইয়া ও আজি, চে বীর পূর্ণ কর।

সাধারণ ব্যক্তির যে জন্ম-লগ্ন সঙ্কোচের ক্ষুদ্র পরিবারের পঙ্ক্তিতে লালিত ও সীমায়িত থাকে; সমষ্টির আগ্রহনদ্ধ অসাধারণ আবির্ভাব যে তাহারই এক গুণ ব্যতিক্রম ও নিশ্চিহ্ন সীমায় সর্বজনীন এই দিনটির দ্বিপ্রহর ১২-২০ মিনিটে সহস্র সহস্র গৃহোত্থিত আবাহনের শঙ্খনাদ ও হুলুধ্বনিতে সেই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিই প্রকাশ পায়। কালের প্রবাহে বিলীন আটাশ বৎসরের পর নেতাজীর ৫৯তম জন্মদিবসকে উপলক্ষ্য করিয়া ৫৯টি তোপধ্বনি এবং নেতাজীর প্রতিকৃতির উপর বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি দিবসটিকে আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়া তোলে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

আবাদী কংগ্রেস—

এবারকার আবাদী কংগ্রেস অধিবেশন বিভিন্ন দিক হইতে গুরুত্ব পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যাহা এতদিন জাতির অন্তরে স্বপ্নের মত বিরাজ করিতেছিল তাহা আজ যেন বাস্তব রূপে পর্যবসিত হইতে বসিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবের বলেন, 'গান্ধিজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সকল সময়ই রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে সামাজিক গণতন্ত্র বুঝিত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি বলেন যে, সাম্যবাদী বা পুঁজিবাদী ছাঁচে অর্থনৈতিক কর্মসূচী আমাদের সমস্যা

শ্রীদেবের

সমাধান করিতে পারিবে না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্য। যদিও আমরা অর্থ নৈতিক দিকটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি না তবুও আমরা মনে করি যে, মানুষের নৈতিকবোধের মৌলিক প্রেরণার উপরই একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।' এই মন্তব্য সর্বৈব ঠিক নহে। কেননা মানুষকে তাহার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে। নৈতিক শক্তি আর দশটা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আমরা যাহাকে সাদা কথায় নৈতিক শক্তি বলিয়া থাকি তাহা মূলতঃ দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য হইতে আসিয়া থাকে—মূলের সনদ অপসারিত হইলেই অন্যান্য বলগুলি বিনষ্ট হইবে। তবে নৈতিক বল অন্যান্য বলের চাইতে যে মহৎ ও প্রবল ইহা সবাই স্বীকার করিবেন।

ভারত-পাক সম্পর্ক

প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ ভারতে উপস্থিত থাকাতে এবার ভারত-পাক সম্পর্কে একটি নূতন দিক উন্মুক্ত হইল। অতীতে আমাদের যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন আমরা বর্তমানকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। আলাপ আলোচনার দ্বারা অনেক বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব তাহা আমরা স্বীকার করি। এই দুই রাষ্ট্র পাশাপাশি বাস করিয়া কখনই বিরোধের ভিত্তির উপর দিন যাপন করিতে পারে না। ইহা আজ উভয় রাষ্ট্রেরই বুঝিবার দিন আসিয়াছে। বস্তুত পক্ষে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ তাহা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "I shall try to make them understand our position and the need for an early settelment so that both countries can really get together and march ahead."

ফরমোসা ও বিশ্ব পরিস্থিতি

প্যারিস চুক্তির কূটনৈতিক চালের পর এশিয়ায় আবার উত্তাল তরঙ্গ শুরু হইয়াছে। মার্কিণ কূটনীতি স্থির নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই। ফরমোসাকে কেন্দ্র করিয়া সে আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য সবাই ব্যাকুল। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিণ নিজেদের মধ্যে আঁতাত করিয়া মোটামুটি বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। ফলে আঞ্জাস, সিয়াটো তাহার পরিপোষক হিসাবে আসিল; ইহারা সবই বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে। চীন যতই নিজ শক্তির উপর ভর করিতে শুরু করিয়াছে ততই মার্কিণ রাষ্ট্র

তাহার ...ক্তি পরীক্ষার জন্য আগাইয়া আ...
আসলে ...মার্কিণ কূটনীতি শুধু চীনকে চীন বলি...
না বোঝে রুশ-চীন বলিয়া। পরাজিত জাপা...
...র রাজনৈতিক সম্বিৎ ফিরিয়া পাই...

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

...আশাই পোষণ করি। কিন্তু ...
...সাম্রে যে, সবার আশা শুভেচ্ছ...
...ভঙ্গ উঠিল। মার্কিণ কূটনীতি ...
...মুখ ফিরাইয়াছে তখন ...
...বার তাকাইতে হইবে। ...
...তি দেখিয়া তাহাই মনে হয়...

...জাগের বালুকাময়...
...প্রাচ্য সম্বন্ধে যাহা অ...

তাই প্রশান্ত মহাসাগরের ... ফরমোসা দ্বীপে ... সংরক্ষিত হইতেছে। ... শক্তির ... মূল ভূখণ্ড ... হইয়াছেন ... পরেও ...

হইয়া থাকে। আরব লীগের শক্তিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ এইরূপ কাঁচা যে, তাহা শত্রু হন, ও পর প্রভাব ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র তাহাদের আধিক স্বচ্ছলতার জন্য বিদেশের নিকট নির্ভরশীল এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা কোথাও তেলের সূত্রে (ইরাক) কোথাও পেট্রল সূত্রে (সৌদি আরব) আসিয়াছে। কাজেই ইহারা সব সময় নিজেদের কথা বলিবার সুযোগ পায় না। কার্যত ইরাক-তুরস্ক চুক্তিধারা ইরাক এইরূপ আইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে পরের ইচ্ছায় নিজের ঘর সামলাইতে হইতেছে। ইহার উপর নিজের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব লইয়া আহত সিংহের মত গর্জন করিতেছে। মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্ক-ইরাক চুক্তি, এশিয়ার এই অঞ্চলে পাক-তুরস্ক চুক্তি, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে অনেকটা সহোদর ভাইয়ের মত কাজ করিতেছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি আরব রাজ-রাজড়াদের না হইয়া অপরের নীতি হইয়াছে। কাজেই ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর উক্তি আসলে কাহার তাহা বলা মুস্কিল। নিজের দাঁত চাপ দিয়া আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছে আসলে তাহা যাহারা চাপ সহ্য করিতে পারে তাহাদেরই উপর পড়িতেছে। ফলে আরব লীগের তাজন ছাড়া অথবা জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রুশ-জাপ সম্বন্ধ নির্ণয়—

খবরে বেতারে জানানো হইয়াছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়মিত ও স্বাভাবিক করিবার উদ্দেশ্যে জাপানের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিবার প্রস্তাব রাশিয়া উত্থাপন করিয়াছে। জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, তিনি রুশ বিবৃতিটিকে সহকারী বলিয়া মনে করেন না—কারণ উহার স্বাক্ষর, ঠিকানা অথবা তারিখ ইহার কোনটিই নাই। জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অবশ্য বলিয়াছেন, জাপ সরকার সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত আছেন।

খবরে পড়িয়া মনে হয় যে, দুই পক্ষেরই 'সম্পর্ক' স্থাপনে আপত্তি নাই—এখন কেউ একজন আগাইয়া আসিলেই হয়।

কমনওয়েলথ সম্মেলন—

কমনওয়েলথ সম্মেলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন—আজ দেখা যাইতেছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি ক্রমশই এশিয়ার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি ইতিপূর্বে নিজ ক্ষমতায় বলে যাহা করিয়াছে আজ তাহা নাই—অর্থাৎ ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক স্বাধিকারবোধ ব্রিটেনকে আপনার ঘরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এদিকে কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি তেমন কূটনীতির চালে পড়ে নাই। অর্থাৎ কানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি তেমন গুরুতর কূটনীতির ফাঁদে পা দেয় নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রধানত চীন—এসবই যেন আজ ভারতের বৈদেশিক নীতির অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যরা অবশ্য এই রূপ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই। কাজেই ব্রিটিশের প্রাচ্য নীতি ভারতকে বাদ দিয়া সফল হওয়া সম্ভব নয়। এবারকার কমনওয়েলথ সম্মেলন তাহা প্রমাণ করিয়াছে। সমস্ত আলোচনার মধ্যে ইন্দোচীন, ফরমোসা অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছে। ভারতের বৈদেশিক নীতির সার্থকতা আর কিছুদিনের মধ্যেই সর্বত্র অনুভূত হইবে!

মেণ্ডেস ফ্রান্স মন্ত্রীত্বের পতন

এক অনাস্থা প্রস্তাবে মেণ্ডেস ফ্রান্স মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। সাংবাদিকের নিকট মঁ ফ্রান্স বলেন যে, আমার নিজের জন্য নহে, দেশের প্রতি আমার যে মমত্ববোধ বা দুঃখ আছে তাহা আমি ঢাকি নাই। মেণ্ডেস ফ্রান্স ফরাসী জাতির রাজনীতির মধ্যে অনেকটা দৈত্য কুলের প্রহ্লাদের মত। যে জাতি আদর্শবাদের কথাও বলিবে, আবার সাম্রাজ্যবাদী নীতিও চালাইবে তাহার মাঝে স্পষ্টবাদিতা একটি মহৎ গুণ। বস্তুতপক্ষে ফরাসী জাতি বহুদিন হইতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে দুর্বলতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দুর্বলতার দুর্গ হইতে মেণ্ডেস ফ্রান্স ফরাসীকে অনেকটা দূর টানিয়া আনিয়াছিলেন। ইন্দোচীন সমস্যায় মেণ্ডেস ফ্রান্স যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন সেই সাহস তাঁহার ইউরোপীয় রাজনীতির বেলায় বিপদের কারণ হইয়াছে। পান্নার যখন বিপদ ভারী হইয়াছে তখনই বিদায়। ফরাসী সাম্রাজ্য তাহার মস্তিষ্ক রক্ষার অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু মেণ্ডেস ফ্রান্সকে বিদায় দিয়া কি ফরাসী জাতীয় পরিষদ সাম্রাজ্যে শান্তি আনিতে পারিবেন? টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্কো এই সব উপনিবেশ তাদের আত্মকর্তৃত্বের দাবী পরিহার করিবেন এইরূপ ও মনে হয় না। দক্ষিণপন্থী ফরাসী রাজনীতিকেরা তাদের দুর্বল নীতিধারায় শুধু বিসন্বাদ বাড়াইতে পারিবেন। ফলে হয়ত ফরাসীকে একদিন উপনিবেশের বন্ধুত্ব ও উপনিবেশ সবই হারাইতে হইবে।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

কিছুদিন পরে জগবন্ধু আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। মনে হয় বাইরে থেকে কিছু শক্তি যেন সে সঞ্চয় করে এনেছে। প্রজা-আন্দোলনকে উজ্জীবিত করবার মন্ত্র এখন যেন সে-ই জানে কেবল।

আবার একটা বড় করে, সভা ডাকা হ'লো বেণীর সদর বাড়িটার সামনে—আবার একটা উত্তেজনার ভাব উস্কে দেওয়া হ'লো সবার মুখে মুখে—দেখনা, এইবার কি কাণ্ডটা হয়! জগবন্ধুবাবু অমনি-অমনি ফিরে আসেননি, তিনি শুধু-শুধু রূপ দেখাতে আসেননি! আন্দোলনের যারা কিছু না বুঝে কেবল হৈ-হট্টগোলটাই বোঝে, মনে করে গোলমাল একটা না বাধলে কিছুই হ'লো না, তাদের পক্ষে জগবন্ধুর পুনরাবির্ভাব মনে বিশেষ আশার সঞ্চার করলে—এইবার একটা কাণ্ড হ'বে!

আজ মিটিং-এর উত্তেজনা বেশী। বিশেষ করে, জমি-জমার কোনই ধার ধারে না যারা কোনকালে তাদের মধ্যে আলোচনাটা সমধিক উচ্চকণ্ঠ। খটখটে বাক্সদের মত হ'য়ে আছে তারা।

বেণী সবাইকে চুপ ক'রতে বললে, গোলমাল যদি করবে শুনবে কি! তাহ'লে তোমরাই বল। ডাক্তারবাবু আপনি থামুন!

সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়। অর্থাৎ বুড়োর কথা মত শোনা যাক নজার কথা! বলুন ডাক্তারবাবু কি বলবেন!

খানিক পরে আবার গোলমাল সুরু হয়—কে কার কথা শোনে! আজ কথা শোনবার ধৈর্য কারো নেই—দু'মাস ধরে অনেক কথা শোনা হ'য়েছে।

বেণী থামাতে যেতেই একজন বলে উঠলো, আতদিন কেবল কথাই শোনবো! হ'বেনটা কি বলুন?

হঠাৎ যেন সভা চমকে ওঠে। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের মত অপ্রস্তুত ভাব হয় সভার! বেণী কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস ক'রলে, কি হওয়াতে চাও শুনি? কি আবার হ'বে!

তা হ'লে?

প্রশ্নটা আবার যেন সবাইকে চমকে দেয়! কিছু যদি নাই হবে তা হলে সভা ক'রে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি! এত কথার দরকারই বা কি!

বেণী আবার বললে, করে দেখ, শোন!

অধৈর্য কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন হয়, কত আর চুপ করে থাকবো। শুনে শুনে কান পচে গেল গিয়ে—

তাচ্ছিল্যের সুরটা সভা শুদ্ধ সকলকে স্পর্শ করে বুঝি। পাশ থেকে প্রশ্নকারীকে সকলে থামিয়ে দেয়—আরে চুপ কর না তুমি! কি আরম্ভ করলে!

ডাক্তারবাবু বললেন, না, না, ওকে বলতে দাও! বল নিতাই—

নিতাই আজ বেপরোয়া—কোন সঙ্কোচ, লজ্জা তার নেই। বললে, অনেক কথাই ত আপনারা বললেন এবার দয়া ক'রে বলুন কর্তব্যটা আমাদের কি হবেন। জমি আমরা পাব কি না?

ডাক্তারবাবু চুপ করে রইলেন। মনে মনে দিধায় পড়লেন। কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। জমার

হার কমান নিয়ে আন্দোলন, জমির কথা হঠাৎ কি বলবেন! কঠিন প্রশ্ন।

বেণী উত্তর দিল, নিশ্চয়ই পাবে—হাল গরু নিয়ে মাঠে চলে যাও! যতটা পার লাঙল ফোটাও গিয়ে!

নিতাই অপ্রস্তুত বোধ করলে। মনে হ'লো বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে সে আজ গোড়া থেকেই। মুখের কথা, জমি চাইলেই অমনি পাবে! দানপত্র তৈরী আছে! ডাক্তারবাবু সব জমির মালিক কিনা।

ডাক্তারবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, জগবন্ধু উঠে বললে, বেণীবাবুর কথাটা ঠিক নয়! শুধু জমির হার কমিয়ে মুষ্টিমেয় কজনের সুবিধের জন্যে আমাদের এ সংগ্রাম নয়। এ গ্রামের সবাই যাতে জমি পায় তারও ব্যবস্থা এ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে করতে হবে। সবার জন্যে জমি চাই।

নতুন কথা নয়, তবু যেন নতুন মনে হয়। নিতাই কিন্তু আরো অপ্রস্তুত বোধ করে। ছেলেমানুষের মত সভার মাঝখানে জমি চাওয়াটা তার উচিত হয়নি।

জগবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আন্দোলন আমাদের সফল হয়নি এখনো—এখনো আমাদের ন্যায্য দাবী বাবুরা মেনে নেয়নি। এখন আমাদের সেই দাবী আদায়ের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। বৈধভাবে যদি না হয়—

জগবন্ধু খানিক চুপ ক'রে চারদিক চেয়ে অপেক্ষা করলে—ইশারায় বুঝি অনুমোদন চাইলে।

কেড়ে নেব! হাঁ, জোর করেই লাঙল ফোটাব। লাঙল যার জমি তার—দুনিয়ার কৃষক এক হও!

হঠাৎ বাঁধ ভাঙার মত সকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—স্লোগানে চীৎকারে আকাশ ভরে গেল—উদয়পুর কাঁপতে লাগল।

বেণীর মুখে কোন কথা নেই, ডাক্তারবাবুও চুপ। এ তরঙ্গ রোধ করবার বুঝি তাদের ক্ষমতা নেই।

জগবন্ধু স্বর ঘুরিয়ে বক্তৃতার ঢঙ-এ বললে, ভাই সব, আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি আর অপেক্ষা করবো না! এইবার আমাদের কাজ আরম্ভ করবো—মাঠে গিয়ে আমরা জমি দখল করবো, যেখানে আমাদের মেহনতের ফল অপহৃত হয়েছে সেখানেই আমরা হাত বাড়াবো—কেড়ে নেব, ছিনিয়ে নেব জোর করে।

সভা দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। জমি-জমা, ধান-মান, ঘর-বাড়ী সব আমাদের ফেরৎ চাই! দুনিয়ার সকল কৃষক এক হও! ইনকিলাপ জিন্দাবাদ!

হঠাৎ সুর নামিয়ে জগবন্ধু বললে, আর সাতদিনের নোটিশ আমরা দেব। একটা কিছু হয় ভাল, না হলে দলবদ্ধভাবে আমরা সংগ্রাম করবো। জমিতে লাঙল ছুটিয়ে দেখাব প্রকৃত জমির মালিক কারা। ওরা বাধা দেবে, ভয় দেখাবে, বাবুরা লাল পাগড়ী আমদানি ক'রবে ...কিন্তু আমাদের ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। হালের মুঠো আমরা শক্ত ক'রে ধরবো—প্রয়োজন হ'লে শত্রুর বুকের ওপর দিয়ে সে হাল চালিয়ে নিয়ে যাব।

কৃষক আন্দোলনের সভার উপযোগী হ'লেও কথাগুলো কেমন যেন অনভিপ্রেত, অবান্তর, মনে হ'লো বেণীর। মিথ্যে একটা বিপদকে যেন রোষের বশে টেনে আনা হচ্ছে। পায়ের ওপর পা দিয়ে ঝগড়া বাধান কেবল!

তবু চুপ ক'রে থাকতেই হয়। আর পারা যায় না, যা হয় হোক একটা। হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থা!

জগবন্ধু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, অনেক সহ্য আমরা করেছি, অনেক সবুরও করেছি, আর নয়...সাত দিনের পর আর একটি দিনও নয়...আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়বো...যেমন করে পারি আমাদের দাবী আদায় ক'রে নেব...শত্রুকে শেষ ক'রে ছাড়বো।

এবার ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় কেউ তাঁকে লক্ষ্য করেনি। তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন। বৃথা চেষ্টা। জগবন্ধু হাত পা ছুঁড়তে লাগল তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে। ধীরে ধীরে ডাক্তার সভাস্থল ত্যাগ করলেন। এরা আজ তাঁর কথা শুনবে না। তাঁর কথার ওপর আর কারো আস্থা নেই।

নন্দরদের পুকুরের পাড় দিয়ে চুপি চুপি যেন সরে পড়ছিলেন ডাক্তার। নিজের মনেও যেন কোথায় গ্লানি

বোধ ক'রছিলেন। কৃষকদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তিনি চরিতার্থ করতে পারেন নি—ব্যর্থ নেতৃত্ব! কেবল অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে এ কাজ করা যায় না। দাবী যখন মানেনি তখন তাকে জোর ক'রে মানাতে হবে—জগবন্ধু ঠিকই বলেছে। আর তো করবার কিছু নেই! চুপ ক'রে থাকা মানেই দুর্বলতা।

আশেপাশে অন্ধকারে সব যেন অবলুপ্ত হয়ে আছে—মাঝে মাঝে হৈ-হৈ শব্দ আসছে—গলা ফাটিয়ে ওরা চীৎকার করছে, শোভাযাত্রা বার ক'রেছে!

বুঝি ভয় পেয়েই চমকে উঠলো ডাক্তার, সামনে একটা ছায়া মূর্তি!

ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন, কে-ও, কে?

সুবাসিনী এগিয়ে এসে বললে, আমি ডাক্তারবাবু!

তুই এখানে! কোথায় যাচ্ছিস?

সুবাসিনী দাঁড়াল, অনেক দিনের সাধ যেন সে আজ এই লোকটির কাছে ব্যক্ত করলো অকপটে, আমাকে আপনাদের কাজে নিন্ ডাক্তারবাবু!

পুকুরের পাড়টা সরু, দুজনে পাশাপাশি চলা যায় না। থেমে পড়ে ডাক্তার বললেন, তুই কি কাজ করবি রে? চাষ করতে পারিস?

চাষ করা ছাড়া কি আর কোন কাজ নেই যা আমাকে দিয়ে হ'তে পারে? সুবাসিনীও থেমে গেছে ডাক্তার বাবুর পিছনে।

ঘরের কাজ কর মন দিয়ে। ডাক্তার চলতে চলতে বলেন।

চাষার মেয়ে আশ্চর্য সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, ঘরের কাজ আর কত করবো বাবু!

ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন, মুখোমুখি চেয়ে দেখলেন—যেন বেণী নওলের মেয়েই নয় এ, সানের পুকুরে অবরসবরে যাকে জল আনতে দেখা যায় সে মেয়ে এ নয়! অদ্ভুত মনে হচ্ছে মেয়েটিকে—

সুবাসিনী বললে, আপনারা এত করছেন, তো একটু করতে পারি আপনাদের সেবা।

সেবা? ডাক্তারবাবু যেন নিজেকেই প্রশ্ন ক'রলেন, তারপর খানিক থেমে বললেন, দরকার হ'লে বলবো। তোকে ডাকব।

তার আগে বলবেন না? চাষার মেয়ের যেন সাহস বেড়ে গেছে বড়!

[ক্রমশঃ

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কুটীর শিল্পোন্নয়নে সরকারী মনোভাব

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কুটীর শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অথচ কুটীর শিল্প বরাবরই অবহেলিত হয়ে এসেছে, প্রধানতঃ সরকারী ঔদাসীন্যে স্বাধীনতা লাভ করার পর জাতীয় সরকার বুঝতে পেরেছেন যে, কুটীর শিল্পের প্রসার না করতে পারলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কিছুতেই সবল হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে কুটীর শিল্পের জন্য একটি পৃথক দপ্তর খোলা হয়েছে এবং বর্তমানে তার দায়িত্বে আছেন উপমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো মহাশয়। এই দপ্তর খোলার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার কুটীর শিল্প সম্পর্কে খুব কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন। উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজই কুটীর শিল্পে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। কাজেই প্রথমে ঐ দুইটি রাজ্যের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বেশী। কুটীর শিল্পে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাজে সর্বপ্রথম হস্তচালিত তাঁতের তন্তুবায়দের নিয়ে গঠিত এক শিল্পীয় সমবায় মালাবারের এক বহন কারখানা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলবার জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। যদিও এই আরম্ভ তেমন বৃহৎ কিছু নয়, কিন্তু এর গুরুত্ব যথেষ্ট. বিশেষ করে এই জন্যে যে. এখন থেকে এই কারখানার শ্রমিকেরাই লাভের অংশীদার হবে। সরকারের আর একটি সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পরিকল্পনা প্রণেতাদের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের জন্য একটি সংস্থা (Small Industries Corporation) স্থাপন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কুড়ি লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে এই সংস্থা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে রেজিষ্টারীভুক্ত হবে এবং এর প্রধান কাজ হবে সরকারী অর্ডারসমূহকে উপযুক্তভাবে সরবরাহ দেবার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করে তোলা।

ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা জাতীয় আয় সম্পর্কে বাৎসরিক পুস্তিকার যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছেন তা'তে দেখা যায় যে, বিগত বৎসরের তুলনায় ১৯৬১-৬২ সালের আর্থিক বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ৬৬০ কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছে। ঐ বৎসর মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ, তাঁরা অনুমান করেছেন, ১১১০ কোটি টাকা। হিসেব করলে দেখা যাবে যে, ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ঐ বৎসর মাথাপিছু আয় ৩৫% বেড়েছে এবং মাথাপিছু মোট আয় হয়েছে ২৭৩ টাকা। জাতীয় সম্পদের এই বৃদ্ধির জন্য কৃষি বিভাগের দান থাকলেও, শিল্প বিভাগ থেকেই এসেছে বৃহত্তর অংশ। রেলপথ থেকেও আয় ক্রমাগত বৃদ্ধির দিকেই দেখা যাচ্ছে।

জাতীয় আয় বেড়েছে শুনলে মনে স্ফূর্তি আপনা থেকেই এসে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন চিন্তা করি যে, ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬১-৬২ সালে আমরা বেশী সুখী ছিলাম কিনা, তখনই আনন্দের ঘোর কেটে যায়। জাতীয় সম্পদ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ও গিয়েছে বেড়ে। অঙ্কের হিসেবে অবশ্য জীবনযাত্রার ব্যয়াধিক্য বাদ দিয়েও আমাদের মাথাপিছু ২·২% আয় বেড়েছে। তা'হলে কি এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয় না যে, জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং জাতীয় সম্পদ বণ্টনের এই সকল গলদ দূর করতে না পারলে আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে বলার মধ্যে বিশেষ সার্থকতা নেই।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ক্রেডিট এণ্ড ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন—

অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর সম্প্রতি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ক্রেডিট এণ্ড ইন্‌ভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন ভারতীয় কোম্পানী আইনে রেজিষ্টারীভুক্ত হয়েছে। এই কর্পোরেশনের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এবং প্রথম জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব কোষাধ্যক্ষ মিঃ পার্সিভাল্ স্পেন্সার বীল। প্রথমে মিঃ বিলকে চেয়ারম্যান করবার প্রস্তাব উঠলে ভারতীয় মূলধন নিয়োগকারীদের মধ্যে একটু অসন্তোষের গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু পরে শ্রীমুদালিয়ারকে চেয়ারম্যান ও মিঃ বীলকে জেনারেল ম্যানেজার নির্বাচন করা অতি বিচক্ষণতার কাজই হয়েছে। শ্রীমুদালিয়ার ও মিঃ বীল্ উভয়েই কেবলমাত্র বহু অভিজ্ঞই নন্ এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের কর্মদক্ষতার জন্য তাঁদের যশ সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্যের অর্থের বাজারে মিঃ বীলের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। সুতরাং তাঁকে এই কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার উপর শ্রীমুদালিয়ারের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠান যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

এই কর্পোরেশনের প্রাথমিক মূলধন সাড়ে সতেরো কোটি টাকা ধরা যেতে পারে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া গিয়েছে পাঁচ কোটি টাকা; ভারত সরকার বিনা সুদে ঋণ দিয়েছেন সাড়ে সাত কোটি টাকা এবং বাকি পাঁচ কোটি টাকা যা হচ্ছে প্রকৃত মূলধন তার এক কোটি বৃটিশ লগ্নীকারীর, ৫০ লক্ষ আমেরিকান লগ্নীকারী এবং অবশিষ্ট সাড়ে তিন কোটি টাকা ভারতীয় লগ্নীকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। ভারতের সাড়ে তিন কোটি টাকার মধ্যে আবার দুই কোটি টাকার শেয়ার নির্দিষ্ট ছিল ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির জন্য এবং ইতিমধ্যেই তা সম্পূর্ণরূপে বিক্রী হয়ে গিয়েছে। বাকি দেড় কোটি টাকার শেয়ার (প্রতিটি ১০০ টাকা) অবিলম্বেই সাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা চলছে।

এই কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশীয় ও বিদেশীয় মূলধনকে অংশ গ্রহণ করতে কর্পোরেশন উৎসাহিত করবে। কর্পোরেশন দীর্ঘ ও মাঝারি দীর্ঘ ঋণের মাধ্যমে বেসরকারী মহলে অর্থের যোগান দেবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পীয় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারীকৃত মূলধনও কর্পোরেশন যোগান দিতে প্রস্তুত থাকবে এবং ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানেও গ্যারাণ্টি দেবে। সর্বোপরি ভারতীয় শিল্পে কারিগরী ও পরিচালন ব্যবস্থার যোগান দেওয়া এবং সহায়তা করা এই কর্পোরেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ক্রেডিট একটি জটিল ব্যাপার। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমর্থন প্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানটি যে অনতিকাল মধ্যেই ভারতীয় শিল্প মহলে অর্থের সংস্থান করে দিয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলির কাজ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে তাতে সন্দেহ নেই।

টেক্সটাইল্ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

বস্ত্রশিল্পের বিভিন্নদিকে একটি ব্যাপক তদন্ত করবার জন্য ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি টেক্সটাইল্ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই তদন্ত কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো। মিল, হস্তচালিত তাঁত ও বাষ্পচালিত তাঁতের পরস্পর সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে প্রত্যেকটির স্থান নির্ণয় করাই ছিল এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। তদন্তকার্য সম্পাদন করে গত সেপ্টেম্বর মাসে কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেন। দেশে উত্তরোত্তর বস্ত্রোৎপাদনে বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে আশা করেছেন যে, ভবিষ্যতেও বস্ত্রোৎপাদনের এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে। ১৯৬০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি ধরে এবং মাথা পিছু ১৮ গজ কাপড় বরাদ্দ করে কমিটি হিসাব করেছেন যে ঐসময় কাপড়ের চাহিদা হবে ৭২,০০০ লক্ষ গজ। বর্তমানে কাপড়ের কাটতির পরিমাণ ৫৬,০০০ লক্ষ গজ। হস্ত-চালিত ও বাষ্পচালিত তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা উন্নত ধরণের অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে বাড়িয়ে অতিরিক্ত ১৬,০০০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থায় কিছুসংখ্যক লোক অবশ্য কর্মচ্যুত হয়ে পড়বে, কিন্তু কমিটি মন্তব্য করেছেন যে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এই সকল শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

হস্তচালিত ও বাষ্পচালিত তাঁত সম্পর্কে যে সংরক্ষণ নীতি বর্তমান আছে কমিটি তা সমর্থন করেছেন, অন্ততঃ আরও কিছু কালের জন্য। বস্ত্রশিল্পে র‍্যাশনালাইজেসনের জন্য কমিটি মন্তব্য করেছেন যে, ২০ বৎসরে দেশের বর্তমান তাঁতের অর্ধেক প্রতিবছর ৫০০০ হিসাবে

স্বয়ংক্রিয় করে তোলা সম্ভব। কিন্তু একাজে হাত দেবার আগে শ্রমিকের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে অথবা সরকারী নীতি অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। রপ্তানী সম্পর্কে কমিটি জাপান, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করে বহুনিম্নে র‍্যাশনালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষৎ স্থাপন করাকে কমিটি সমর্থন করেছেন। বহুনিম্নের যন্ত্র সয়ংক্রিয় করবার পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ, অতিরিক্ত শুল্ক কাটার উপায় এবং তার উপযুক্ত অবস্থিতি প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ দেবার জন্য কমিটি একটি উপদেষ্টা সমিতি নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। খনি শিল্পের জন্যও একটি পৃথক তদন্তের জন্য কমিটি সুপারিশ করেছেন। ১৯৬০ সালে অতিরিক্ত ১৬,০০০ গজ কাপড় উৎপাদনের জন্য যে আরও ১১ লক্ষ খাঁট তুলার প্রয়োজন হবে। কমিটি মনে করেন যে সেচব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তুলার উৎপাদনও বেড়ে গিয়ে মিলের চাহিদা মেটাতে পারবে।

মধ্যপ্রাচ্য-ভারত বাণিজ্য

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তুর্কীস্তান মিশর এবং সুদানের সঙ্গেই আমাদের বাণিজ্য চলে বেশী। ঐ সব দেশে আমরা রপ্তানী করি চা, মিলজাত কাপড়, চটের থলি ইত্যাদি। আর ঐসব অঞ্চল থেকে আমদানী করি প্রধানতঃ তুলা এবং পেট্রোলিয়াম্। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে এই বাণিজ্যের লেনদেন বহুদিন থেকে ভারতের প্রতিকূলে চলেছে। ১৯৪৩—৪৪ সালে তার পরিমাণ ছিল সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকার উপর এবং বর্তমান আর্থিক বছরের এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে এগারো কোটি টাকার উপর। এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রেশম বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষৎ

কিছুদিন হয় রেশমবস্ত্রের (art silk) রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষৎ স্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় রেশম বস্ত্রের যথেষ্ট ভবিষ্যৎ আছে। ১৯৪১—৪২ সালে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র রপ্তানী হয়েছিল এবং তার মূল্য ছিল এক কোটি সতেরো লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালে রপ্তানী হয়েছে মাত্র সাড়ে আটচল্লিশ লক্ষ টাকার কিছু বেশী মূল্যের রেশম কাপড়। এই বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষৎ গঠিত হয়েছে এবং তার কাজ হবে সর্বদা রপ্তানীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং বরাবরের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং নূতন বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করা। এই পরিষৎ বিদেশে বাণিজ্য-দল পাঠানো কিংবা বিদেশের বাজারে প্রতিনিধি নিয়োগ করা অথবা উৎপাদকদের সংবাদ সরবরাহ প্রভৃতি কাজও করতে পারে। আশা করা যায় এই পরিষৎ দ্রব্য ও প্যাকিংয়ের মান স্থির করে দেবে এবং রপ্তানী দ্রব্য পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সংস্থা স্থাপন করবে। জানা গিয়েছে প্লাষ্টিকের, খেলাধূলার ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের এবং মরিচ, তামাক, গালা ও অভ্রের জন্যও এইরূপ পরিষৎ শীঘ্রই স্থাপন করা হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কার্পাস, রেশম ও রেয়ন বস্ত্রের জন্য ইতিপূর্বেই দুইটি রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষৎ গঠিত হয়েছে।

১৯৪৪—৪৫ সালে ইক্ষুর উৎপাদন

ভারত সরকারের খাদ্য এবং কৃষি বিভাগের অন্তর্গত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের অনুমান যে ১৯৪৪-৪৫ সালে ইক্ষুর উৎপাদন চারশ' চুয়াত্তর কোটি টনের উপর হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের উৎপাদন শতকরা ১২·৭ ভাগ বেড়ে যাবে। উত্তর প্রদেশের পরে অন্ধ্র এবং মাদ্রাজ থেকেই উৎপাদন বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। গুড়ের উচ্চমূল্য, ভাল আবহাওয়া এবং সেচের সুব্যবস্থার জন্যই এরূপ হয়েছে। কিন্তু বিহার এবং পাঞ্জাবের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়া বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশের ইক্ষু কীট-পতঙ্গ ও জলের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ভারত সরকার আগামী ঋতুতে আখের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আখের চাষের জমি নির্দিষ্ট করে রাখবার জন্য রাজ্য-সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আখ চাষীদের প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম্ সালফেট সরবরাহ করা হবে এবং এসব কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য কৃষি অফিসারদের নিয়োগ করা হবে।

করুণানিধানে

আর একজন কবিকে আমরা হারালাম। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে যাঁরা বাংলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন করুণানিধান তাঁদের অন্যতম। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কবিতার একদিক থেকে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের কবিতায় আছে ছন্দের মধুর ঝঙ্কার, মনোরম প্রকৃতিচিত্র এবং কোমল স্বপ্নমায়া। মোহিতলাল তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গীর বিশেষ প্রশংসা করেছেন। একজন আধুনিক কবি বলেছেন,—রবীন্দ্রপন্থী কবিদের কাব্যের কোন সার্থকতা নেই, কেননা রাবীন্দ্রিক ভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তো রবীন্দ্রনাথেই মেলে। কিন্তু রবীন্দ্রপন্থী কবি মানেই যে স্বাতন্ত্র্যহীন কবি, এ কথা মনে করা বোধহয় অসঙ্গত। সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান প্রভৃতি রবীন্দ্রভঙ্গীর অনুরাগী হ'লেও ভাবে ও রচনা পদ্ধতিতে বিশিষ্ট।

"পিছন পানে, চাইনু ফিরে অন্ধকারে
চন্দ্রকলা ডুবছে মোদের সিন্ধুপারে"···
"স্বপন দেখিছে ভূর্জ বনানী সবুজ টোপর পরি'
করুণাতলায় করিছে কাহার রতনের শঙ্খরী"···
"বাঁশীর রাগিনী মুরছি' রয়েছে মর্মর রূপ ধরি'
বঁধুর পরশে ঘুমায় হরণে মমতাজ সুন্দরী"···
"যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ঝলক"

এসব রচনায় যেমন ভাষার কোমলতা, তেমনি অন্যত্র বলিষ্ঠতা এবং গাম্ভীর্যেরও অভাব নেই।

"ছিঁড়ি' অতীতের অবগুণ্ঠন
বক্ষার সম ধায় লুণ্ঠন
শুনি পানি পথে মোগলের রথে
রণদুন্দুভিছিন্নী।"

"অমৃতের ধ্রুবতারা মেশে যেথা শেষ মোহনায়
দাঁড়াইল ব্রহ্মচারী অনন্ত সে অকূল বেলায়।"

কোন-কোন কবিতায় চয়ন ভাষা ও ছন্দের অলঙ্কারে ভাব আড়াল হয়ে গেছে, কিন্তু সে সর্বত্র নয়। কানে' ছোট্ট রসে-পরিপূর্ণ নিটোল কবিতা।

তাঁর বয়েস হয়েছিল অনেক। জীবিত কবিদের মধ্যে সম্ভবতঃ তাঁর চেয়ে বৃদ্ধ কেউ নেই। সংসারের দুঃখকষ্টের আঘাত তাঁকে অনেক সইতে হয়েছে। বহুদিন তিনি ছিলেন বিপত্নীক। বিবাহের মধুর স্মৃতি তিনি অক্ষয় ক'রে রেখে গেছেন 'শেষ বাসরে' কবিতায়। জীবন নয়ন ক'রে যে অশ্রু এঁকা রেখে গেলেন কালের পাত্রে, আমরা যেন তার অমর্যাদা না করি।

কর্মোসা

কর্মোসা নিয়ে গোলযোগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এখন আশা হচ্ছে বড় রকম বিপত্তি কিছু ঘটবেনা। শান্তিকামী দেশগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে যদি প্রবলতর দেশগুলিকে দমনিত করে রাখতে পারে তবেই পৃথিবী বাঁচবে। অবশ্য শক্তিমানেরা আর একটা যুদ্ধের পরিণাম কি হবে বোঝেনা এমন নয়, তবু অস্ত্রের জোরে আর টাকার জোরে তারা গরম হয়ে আছে। উত্তেজনায় একবার আত্মহারা হ'লে তারা যে বিশ্বধ্বংসের আগুন জ্বালাবে, সে-আগুনে সকল মতবাদ, সকল আদর্শই হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—বাদ-বঞ্চিত কেউ বাদ পড়বে না।

সীমানা-কমিশন

ভারতীয় রাজ্যগুলির পরস্পর সীমানা নির্দিষ্ট করবার জন্য তদন্ত-কমিশন বসেছে। তা নিয়ে কাগজে কতকগুলি

অপ্রীতিকর ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে। বিহার লোক সভার শ্রদ্ধাভাজন কংগ্রেস-নেতা শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বাঙালী কর্মীদের উপর মারপিটের কথা উল্লেখ করে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। যারা অশিক্ষিত, তাঁরা অন্ধভাবে কিছু করলে বোঝা যায়। কিন্তু শিক্ষিতেরা যদি তেমন কাজ করেন তবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। অথচ, এসব ক্ষেত্রে জনসাধারণ নিজে থেকে কিছু করেনা শিক্ষিত লোকদের উস্কানিতেই করে।

পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন কার্য

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "আমি একাধারে স্বপ্নদর্শী এবং নির্মাতা।" তাঁর উৎসাহ, কর্মশক্তি এবং দৃঢ়তা সম্বন্ধে কারও সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযুক্ত সহযোগী বা সহকর্মী অভাবে কেমন ক'রে তাঁর অনেক উদ্যম ব্যাহত হচ্ছে তা দেখে দুঃখ হয়। জনসাধারণেরও মুখরোচক সমালোচনায় যত প্রবৃত্তি, গঠনকাজে তত আগ্রহ দেখা যায় না; এ অবস্থা শোচনীয়।

কমনওয়েল্থ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন

যুক্তরাজ্য এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রমণ্ডলের প্রধান মন্ত্রিগণের সম্মেলন ইংলণ্ডে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হ'লো। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এখানেও তাঁর শান্তি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। যদি আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্র রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও সংঘর্ষ এড়িয়ে পরস্পরের সহায়তায় জনকল্যাণের কাজে অগ্রসর হ'তে পারি, তবে আজকের বিরোধ কণ্টকিত পৃথিবীতে একটা মহৎ কাজ সাধিত হবে। আদর্শ বা তত্ত্বগত পার্থক্য মানুষে মানুষে বরাবরই ছিল এবং থাকবে। তা সত্ত্বেও রোজকার জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলা সম্ভব এবং সেই চেষ্টাই আজ আমাদের করতে হবে। 'সহ অবস্থিতির' নীতি ভারতবর্ষ চিরদিনই অনুসরণ ক'রে এসেছে; এখনও সে সেই নীতিতে বিশ্বাসী। অবশ্য, কোনও নীতিই অপরিবর্তনীয় নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তন ক'রতে হলেও মানুষ স্বভাবতঃ সাধারণ অবস্থার নীতির কথাই উল্লেখ করে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩১নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩১নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

অ্যাস্‌কো

ASCO বার ও ট্যাবলেট সাবান

ASCO BAR

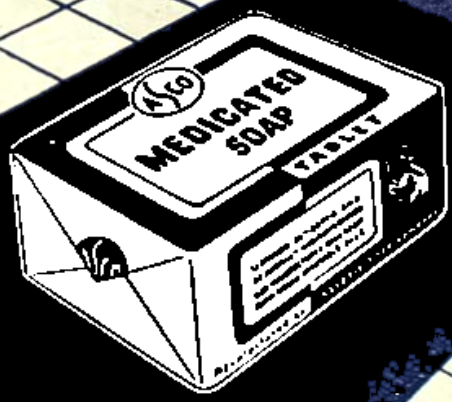

স্পেশ্যাল হাউসহোল্ড ট্যাবলেট্
সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য।
মেডিকেটেড ট্যাবলেট
রোগীর ঘরে এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনে।

এসিয়াটিক সোপ কোম্পানী, কলিকাতা

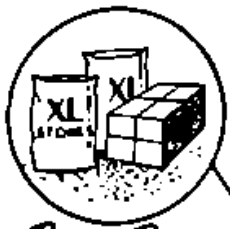

Paper Bags

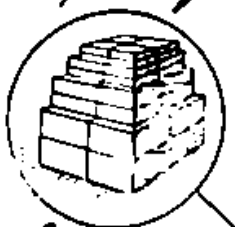

Cartons, etc.

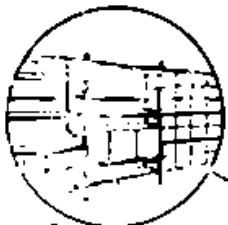

Storing

Road-making

Runways

Serving THE INDIAN INDUSTRIES

The superior Kraft paper made by the Orient Paper Mills serves numerous needs of national industries and business. The paper bags, cartons and boxes, made from Orient papers and boards, ensure full protection for indigenous merchandise and also heighten its consumer appeal. The moisture-proof paper guarantees absolute safety for goods in storage. Kraft paper is contributing its share to the important work of building and repairing roads and runways.

With heavy monsoons on, there is a big demand on Kraft paper which is an essential ingredient in making the roofs lastingly waterproof.

Speedy Orient papers ... it does pay to go to every need of yours.

ORIENT now manufactures:

1. Kraft Paper, plain and ribbed.
2. Waterproof paper.
3. Boards—Simplex, Duplex, Triplex and Coloured Triplex.

ORIENT Paper Mills LIMITED

সপ্তদশ বর্ষ ফাল্গুন—১৩৬১ একাদশ সংখ্যা

কবি করুণানিধান

শ্রীগুরুসদয় দে

করুণানিধানের কাব্যপাঠ আজকাল পাঠক-সমাজ কর্তৃক একরকম পরিত্যক্ত হয়েছে। অতি-আধুনিক কবি নামধারী অনেক অ-কবির নাম পাঠক-সাধারণের মুখে মুখে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে পাঠকদের জ্ঞানের উপর মাত্র নির্ভর করলে বাংলা সাহিত্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যে কোনকালে কোন কবি কাব্য রচনা করেছিলেন এমন কথা অনুমান করাও কঠিন হ'য়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক নিগ্রহ-ভোগ থেকে যে সমস্ত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকেরা কোনরূপেই অব্যাহতি পান না তাঁদের মধ্যেও করুণানিধান-প্রীতির চেয়ে কবির প্রতি একটা তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত অনুকম্পার সুরই বেশী লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রশিষ্য এই কবির কাব্য পাঠে এমন অবস্থার সৃষ্টি কেন হলো তার মূল অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দুটি কারণ দেখতে পাই। প্রথমতঃ বাংলাদেশের পাঠক-সমাজ যে ধরণের কাব্য-পাঠ ও কাব্য-রসাস্বাদনে অভ্যস্ত করুণানিধান সেই অতিপরিচিত কাব্য-রস-সমুদ্রেরই তরংগ না তুলে তাঁর নিজের খুশীমত নতুন একটি রস-স্রোত সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন। কবি-আবিষ্কৃত এই স্বতন্ত্র রস-স্রোতের মর্মান্ত-মূর্ছনা অনুভব করতে হ'লে পিপাসার যেমন কিছু বদবদল করতে হয়; তেমনি কাব্য-রসাস্বাদনের কোন নির্দিষ্ট মাদুলির মোহও পরিত্যাগ ক'রে নতুন মন্ত্রে নতুনভাবে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু করুণানিধানের ভক্ত তেমন দেখা গেল না। দ্বিতীয় কারণ যেটা সম্ভব বলে মনে হয়। তা হচ্ছে এই কাব্য-চর্চায় আমরা reality-র যে বাস্তব অর্থ ক'রে নিয়েছি—সেই স্থূল বস্তুতন্ত্রিকতা —তারই প্রত্যক্ষ আকর্ষণে আমাদের মানসিক প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং অতি-আধুনিক ইংরেজী কবিতার ভাবসম্পদের সংগে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে সাদৃশ্য রেখে ইংরেজী-আনা যে বাংলা অক্ষরে লেখা কবিতার অজস্র ধারাবর্ষণ হচ্ছে তার সৌরভে মুগ্ধ হ'য়ে জীবনের সেই পেলব-কোমল ভাব-সম্পদের দিকটি বিস্মৃত হ'তে চলেছি।

করুণানিধানের কাব্যের একটু ভিতরে প্রবেশ করলেই অর্থাৎ কবির 'personal idiosyncracy of expression'-এর অন্তরালে যেখানে সেই style বা কবি-ব্যক্তিত্ব বাণীর একটি বিশিষ্ট সুরে সংগীত-সাধনা ক'রে চলেছে, সেই সংগীত-আসরের উপযুক্ত শ্রোতা হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই আমরা করুণানিধানী কাব্য-সংগীতের রসোপলব্ধি করতে পারবো।

মোটামুটিভাবে বলতে পারি, বাংলাকাব্যে বিহারীলাল যে আত্মমুখ subjective ভাব-কল্পনার সূত্রপাত করে-

ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথে যার চরম পুষ্টি হয়েছে—করুণানিধানও সেই আত্মমুখ subjectivity-রই কবি। কিন্তু করুণানিধানের কাব্যে subjectivity-ই সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে শাখাবিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ ভাব-কল্পনা subjectivity-র চূড়ান্ত করেছে এবং কাব্যের আসল যে পরিচয়, সেই 'form and treatment'-এর আশ্চর্য সম্পৃক্তি ও পরিচ্ছন্ন পারিপাট্য—রবীন্দ্রকাব্যে তা' সাধারণ দৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু করুণানিধানের কাব্যে ভাবের এক অন্তর্মুখী রসোজ্জ্বলতা ও সংযমবিহীন উদ্বেলতা কাব্যের যেমন form-এর দিকটি তেমনি treatment-এর দিকটি কিয়ৎ পরিমাণে অস্বীকার করেছে। সেইজন্য তাঁর অনেক কবিতাই কাব্যগত রসোৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু এই ত্রুটিই কাব্যের ভিতরকার কবিটিকে অতি সহজে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছে।

আমরাও এই আলোচনার ভিতর দিয়ে আমাদের কবিটিকেই চিনে নিতে চেষ্টা করবো। 'সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি' কবিতায় কবি নিজেই বলছেন—

সংসারে নাই ঠাঁই-ঠিকানা, একলা কাটাই দিন,
কৈফিয়তের ভয় রাখি না—সব দায়িত্বহীন।
বনের ফাঁকে কুড়িয়ে বেড়াই শুকনো ঝরা ফুল,
চিজিবিজি লেখা খাতায় কাটি কতই ভুল!

কবি বলছেন, তিনি সংসারের কোনপ্রকার বন্ধন অনুভব করেন না, কোথাও তাঁকে কোন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার উত্তর করতে হয় না;—তিনি সর্বপ্রকার সমস্যামুক্ত দায়িত্বহীন জীবন যাপন করেন এবং 'বনের ফাঁকে' 'শুকনো ঝরা ফুল' কুড়িয়ে বেড়ানোতে আর 'চিজিবিজি লেখা খাতায়' ভুল কেটে কেটেই তাঁর সময় অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ যে সৌন্দর্যময়তার পূজারী তিনি—যার অনুভূতি ও ধ্যান তাঁর কবি-স্বভাব—সেই সৌন্দর্যময়তার উপলব্ধির মুহূর্তে বস্তুজীবনের কোন ক্রন্দন বা পীড়ন, কোন বিক্ষোভ আলোড়ন তিনি অনুভব করেন না। তাই সন্ধ্যালক্ষ্মীকে আহ্বান ক'রে তিনি বলতে পারছেন—

তোমার আলো সব ভুলালো লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি চুলের তারার মালা;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি তোমার সোহাগ পেয়ে।
ঝলক-টাকা কোমল পলক, নয়ন সরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার চুলের সুরভি।

কোহিনূরের টিপ্‌টি তারে, কানে রতন দুল,
বরণ-কালের তরুণ বধূ রে দুলালী ফুল!
এস নেমে আমার ঘরে, তালী-বনের তলে।
এস মানস-নন্দিনি মোর, এস আমার কোলে।

করুণানিধানের কাব্য বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখতে পাবো, তাতে এই দুঃখ-দুর্দশাময় সমস্যা-কণ্টকিত জীবনের কোন স্বীকৃতি নেই; 'কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের' গীতি-ঝংকার নেই। করুণানিধান তাঁর কাব্যে এর কোন কারণও দেখান নি, কোন যাদু-মন্ত্রবলে যে তিনি বস্তুজীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন সে বিষয়ে একটি কথাও তিনি বলেন নি। তাঁর কাব্যে তাঁর কবি-স্বভাবের প্রকাশ আছে, কিন্তু স্বভাবের নির্ণায়ক পটভূমিকা নেই। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মুহূর্তে সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে কবির অন্তরে যে আবেগ-কম্পিত ভাব-শিহরণ জেগেছে, কবি শুধু সেই শিহরণটিকেই ভাষা ও ছন্দের বাঁধুনিতে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন, জীবনের ক্রমাভিব্যক্তিকে কাব্যায়িত করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তাঁর কাব্যের যে জীবন, সে জীবন প্রাচীন বাংলার শান্তি-সুধা-স্নিগ্ধ নদী-অরণ্যবেষ্টিত পল্লী পরিবেশে গঠিত আবেগময়-তার জীবন—অবারিত মাঠ, সুনীল আকাশ, সু-স্নিগ্ধ সমীরণ। মন্ত্রিত নদী কল্লোল, বন-বীথির মায়া, 'চোখ গেল', 'বউ কথা কও'-এর কাকলি—এ-সবের মধ্যে পর্যাপ্ত অবকাশের আনন্দভোগী জীবন। এ প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবির আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি—

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি নয়ন মেলিয়ে
লুকানো কোন্ ঝর্‌ণা ছুটে পাথর ঠেলিয়ে।
ভাবে সিঁদুর মেঘের মায়া,
সাথী-হারা তরুর ছায়া,
শিউরে উঠি আপ্‌নাকে মোর হারিয়ে ফেলিয়ে।
পাহাড়-শিরে মেঘের পাহাড়, তার উপরে কালো
কিনারাতে কে জ্বালিল পুরাণো সেই আলো?
ভুলিয়ে দিল দুখের জ্বালা,
দুলিয়ে দিল মুক্তা মালা,
তেমনিতর আগের মত লাগ্‌ছে আবার ভালো।
কাছের পাহাড় সবুজ- রঙা, দূরেরগুলি নীল,
বুনো হাঁসে উড়ে আসে, মেল্‌ছে পাখা চিল।
জাগ্‌ছে চূড়া রৌদ্র লেগে'
গেলছে আলো ভাঙা মেঘে,

সাঁজ-তারকার ডাক শোনে গো এই দরদী দিল।
বড় বড় গাছের সারি দেখায় সব ছোট,—
ওরে পথিক পরদেশীয়া, উপর পানে ওঠো।
এই দুনিয়া বদ্‌লে যাবে,
নতুন ছবি দেখ্‌তে পাবে,
রঙের রসে ডুবিয়ে তুলি এঁকেছে কোন্ গোটো।
তুমি গোপন কলধ্বনি নীরবতার পারে,
এক-টানা সে বিরহী-সুরে চলেছি তার পানে।
বনপাখীর নিমন্ত্রণে
চলেছি আজ কোন্ বিজনে?
কাকলিতে কি আকুতি! বুঝিনে তার মানে।

[শেষ অংশ]

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই দ্বন্দ্ব-কোলাহল-মুখর সমস্যা পীড়িত যুগে কবি এই জীবন লাভ করলেন কোথা হ'তে?

আমার বিশ্বাস, এর মূলে রয়েছে কবির প্রকৃতি-প্রেম। করুণা-নিধান মূলতঃ প্রকৃতিরই কবি। তবে তাঁর প্রকৃতি-প্রেম ও ভিন্ন প্রকারের। জীবনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন ব্যবহারিক সমস্যাকে অতিক্রম করেছেন, তেমনি তাঁর প্রকৃতি-প্রেমকে তিনি সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসা-মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের মত প্রকৃতির প্রাণসত্তা বা শক্তি-ক্ষমতা আবিষ্কারের চেষ্টা, রবীন্দ্রনাথের মত মানব-জীবনের সংগে প্রকৃতির রক্তের সম্পর্কটি অনুভব করবার অভি-স্বভাব তাঁর প্রকৃতি-প্রেমকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। প্রকৃতির অতলান্ত অন্তঃসৌন্দর্য নয়—তার যে একটি সহজ সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য রয়েছে, সেই সৌন্দর্যের অনুভূতিতেই কবি-প্রাণের সুরধুনীর মূল থেকে তরংগ ধ্বনির মূর্ছনা শোনা গিয়েছে এবং সেই মূর্ছনাই সত্যকেরই এক মায়া-রূপ কাব্যের মধ্যে স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে। কবির যেন কোন সমস্যার কথা ভেবে দেখবারও অবকাশ নেই—প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা-মাত্রই তিনি মুগ্ধতার আবেশে আত্মহারা হয়ে পড়েন। প্রকৃতি তাঁর কাছে যেন জীবন্ত প্রিয়া-রূপিনী এক নারী। তার দেহ-সৌন্দর্য, বনপল্লব-রেখার কম্পন—সর্বোপরি প্রকৃতির অকৃপণ উদার সাহচর্য কবির অন্তরে আনন্দের জোয়ার উচ্ছল ক'রে তোলে এবং তাতে ক'রেই জীবনের দুঃখ-বৈক্লব, তাপ-জ্বালাও

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

যেমন, তেমনি প্রকৃতির রহস্য-চিন্তাও কবির পক্ষে বিস্মৃত হ'য়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এই আবেশ-মুগ্ধ অবস্থায় কবির কণ্ঠে যে সব সুর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে তাতে সুর-রসিকের বিহ্বল আত্মবিস্মৃতিটুকুই মাত্র ব্যক্ত হ'য়েছে। তাই প্রকৃতির রূপ-কীর্তন করতে গিয়ে কবি সর্বত্র চিত্রের যথাযথতা রক্ষা করতে পারেন নি, স্পষ্ট ভাষায় চিত্রকে রাঙাতেও পারেন নি—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে কবির রূপদর্শন-জাত অন্তর্মূর্ছনাটুকু। উদাহরণ-স্বরূপ 'মোহিনী' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

অদূরে কোন্ ভূধর বীণার নির্ঝরিণীর তারে,
নির্জনতার কি সুর বাজে গভীর গুহার পারে।
মেঘ সাগরে জোয়ার এল ঘূর্ণি হওয়ায় ভেসে,

হারার চেয়ে কোমল আলো লুকায় সেথা এসে।
হাজার তারায় খচিত তার দুখার কাঁচলিতে
পথ হারালো জ্যোৎস্না-কণা অকূল অচিহ্নিতে,—
কর্ণে এসে পৌঁছিল সে, গুপ্ত লোকান্তরে,
উঠ্‌ছে মৃদু-গম্ভীর বাণী, ডাক্‌ছে সুদূর স্বরে।
অস্ত গেল ধরার ছবি, ডুবল চন্দ্রকর,
লিখল উষা স্বর্ণ-লিপি, রহস্য-অক্ষর।
এম্‌নি কি এক তন্দ্রা-ঘোরে বন্দী ক'রে হায়,
কে আমারে অন্ত-পারে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

উদ্ধৃত আবেগের অবস্থাই এরূপ। ঠিক ঠিক কথা বলা যায় না, যা বলবার তা-ই যেন বলা হয় না, সপ্তকের মীড় টানতে গিয়ে মাত্রা যেন শুধুই কেটে যায়। সেখানে ভাষা যথাযথ নয়, রাগ ঠিক নয়, সুর-বিন্যাস স্থির নয়—কেবল অধীর আনন্দ, উদ্বেল আবেগ। সমস্ত অসামঞ্জস্য আর অর্থহীনতার মধ্যেও কবির অন্তরের সেই আকুতিটি আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না।

করুণানিধানের কাব্যসৃষ্টির মূলে এই অতিরিক্ত আকুতি-উৎকণ্ঠারই সক্রিয়তা রয়েছে। এই আকুতি যেখানে যত অকৃত্রিম ও পরিচ্ছন্ন, সেখানেই করুণানিধানের কবি ব্যক্তিত্বও তত সুপ্রকাশিত ও মনোমুগ্ধকর, সেলস ও পুষ্পপ্রাণ। যেমন—

(১) ওগো মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলিয়ে কে—
এই দিল্ ভোলাকে পাগল ক'রে ভুলিয়েছে?
ওই সন্ধ্যাতারা চেনে গো তার সন্ধ্যামণির দুল দু'টি
ওরে ক্যাপা হাওয়া পালায় চুলের ফুল লুটি। (সে)

(২) স্বর্ণা ধারা গাইছে গো তার নূপুর পরা পা'র কাছে,
ভোরের পাখী উঠ্‌ছে ডাকি ফুটছে আলো শাল গাছে।
মৌয়া ফুলের মদালসে
ওড়নাখানি গেছে খসে,
তখনও তার মুখের 'পরে ভ্রমর চিকণ জাল আছে।
(দুষ্কারাণী)

(৩) এতদিন ধরি বলি বলি করি
যে কামনা বুকে রয়েছে গুমরি
আজি সমীরণে অধরে অধরে তাহা কি জানাতে পারি,
জাগাতে পারি কি মৃদু গুঞ্জন,
চারু চুম্বন, সুধা চুম্বন?
হে বঁধু আজি এ মধুর বাদলে মন সামালিতে নারি।
(বর্ষায়)

এই কারণেই করুণানিধানের কবিস্বভাব কাব্যচর্চা অপেক্ষা সংগীত চর্চার অধিকতর অনুকূল। সংগীতে ভাবের বাণীরূপের প্রয়োজন পড়ে না, পড়ে সুর রূপের। আমি তার একটি প্রমাণ দেব—

মেঘের পুরীর পর্দা দুলে' নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে
কোন্ তারকার ইংগিতে আজ পৌঁছিব গো কোন্ দেশে
হাওয়ায় বাজা বীণার তানে
মন ছোটে আজ কোন্ উজানে?
সুরু গুহায় নূপুর শুনি' কোন্ পুলিনে যাই ভেসে?
লো সুষমা, এসেছি আজ, ছিঁড়িয়া ডোর শৃংখলে—
ডাকছে আমায় অস্ত তারা প্রাণ যে আজি চঞ্চলে!
কোন্ পথে ওই অচল চলে?
শান্তিজলের তর্পাতলে
ফুটবে কবে মানস মৃণাল শুভ্র সোনার উৎপলে?
(তন্দ্রাপথে)

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এ কবিতায় কবির সংগীত প্রাণতা ভাষা ও ছন্দের বাঁধুনির উপরে একটা অব্যক্ত সুরের রেখাজাল বয়ন করেছে।

পূর্বে যে প্রকৃতি প্রেমের কথা উল্লেখ করেছি, সেই প্রকৃতি প্রেমের দ্বারাই করুণানিধানের যাবতীয় মানসিক উৎকণ্ঠাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাঁর প্রেমানুভূতি, তাঁর তীর্থ দর্শন, তাঁর মনীষি রূপ বন্দনা—সর্বত্র সেই প্রকৃতি প্রেমের শাসন লক্ষ্য করা যায়। যে কবিতার জন্ম প্রকৃতি প্রেমের অনুভূতি থেকে নয়, সে কবিতাও পদ্য হয়েছে, কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু সে কথা পরে। আপাততঃ দুটি প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে। প্রথমতঃ করুণানিধানের প্রকৃতিপ্রেম করুণানিধানকে কোন বিশিষ্ট কবি দৃষ্টির অধিকারী করেছে এবং দ্বিতীয়তঃ এই প্রকৃতিপ্রেমের প্রভাব তাঁর কবি মানসে লক্ষণীয় উৎকণ্ঠা কিছু এনে দিয়েছে কিনা।

প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য আমি 'প্রাক্তনী' কবিতার সাহায্য গ্রহণ করবো। কবি বলছেন—

চুকিয়ে খেলা আকাশ পথে একটি পথিক তারা,
মর্ত্যবালার রূপের প্রীতে জাগিয়ে দিল মোরে,
পাশির তলে লুকায় পাশি; আঁখি পলক হারা,
কি দেখিলাম স্বপ্ন ছবি জাগন্ত ঘুম ঘোরে।

এই 'জাগন্ত ঘুম ঘোরে' 'স্বপ্ন ছবি, দেখার দৃষ্টিই করুণানিধানের বিশিষ্ট কবি দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি প্রকৃতিপ্রেম-সঞ্জাত। কবিশেখর কালিদাস রায় এই দৃষ্টিকেই 'স্বপ্নরসে'র দৃষ্টি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কালিদাস রায় বলেছেন, "কবির স্বপ্নদৃষ্টি শুধু বর্তমানের পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিরেই স্বপ্ন মাধুরীময় করে নাই, অতীতের স্মৃতির পথে

ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার পথেও কবি স্বপ্ন দৃষ্টিকে প্রেরণা করিয়াছেন। আপনার সকল সুখ দুঃখ, জীবনের সকল ভাব অনুভূতির উপরও তিনি স্বপ্ন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সেজন্য এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতায় স্বপ্ন, মায়া, মায়া, তন্দ্রা, তন্ময়তা, বিহ্বলতা ইত্যাদি কথারও বার বার উল্লেখ আছে।" কিন্তু আমি একে স্বপ্নরসের সৃষ্টি বলবো না। স্বপ্নের জন্য বস্তু জগতের বিস্মৃতি থেকে এবং স্বপ্নের ক্যামেরায় যে ছবিগুলি ধরা যায় সেগুলির Positive চেহারাও জগৎ ও জীবনের এমন বিকৃত Negative প্রকাশ যে তাতে কোন কিছুর সত্যতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। করুণানিধানের কাব্যে বস্তুজগতের পরিপূর্ণ বিস্মৃতি কোথা-ও নেই। যা আছে তা হচ্ছে 'জাগন্ত-ঘুম-ঘোর', অর্থাৎ বস্তুজগতের পরিপূর্ণ বিস্মৃতিও নয়, আবার বস্তু জগতের মধ্যেই পরিপূর্ণ জাগরণও নয়—অথচ এই দু'য়ের মাঝামাঝি আধ-ঘুম আধ-জাগরণের তন্দ্রাচ্ছন্ন একটি পুলকাবস্থা। করুণানিধান আমাদের এই জাগরণের জগতের সংগে আত্মহারা সুপ্তির জগতের একটি সেতু রচনা করেছেন। 'জাগন্ত ঘুম ঘোরে' 'পলক হারা' নেত্রে যখন পৃথিবীর উপর, জীবনের উপর। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের উপর যখন তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, তখন সমস্ত কিছুই তাঁর দৃষ্টিপথে 'মধুরকল্পি কুয়াসার চেলী' হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর যথার্থ রূপ তাঁর কাছে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, জীবনের স্খলন পতন ত্রুটি আর আনন্দ উল্লাস, সুখের প্রতিটি মুহূর্ত পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর এবং জীবনের যে রূপ তাঁর মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাতে যেমন খাঁটি রূপ-সত্য নেই—আছে রঙ আজ্ঞোদিত ছবির ছায়া, তেমনি সে ছবির ছায়াও মায়িক বা অসত্য নয়। বাংলা সাহিত্যে এই দৃষ্টিই করুণানিধানের নিজস্ব কবি-দৃষ্টি। উদাহরণ—

হেথায় তা'রা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোস্না মাখে,
গিরি দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন কালর
ধূসর পাষাণ সিঁথির তটে—
অস্ফুট ভাসে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে। (স্বপ্নালোকে)

অথবা—

যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে—
যেথা যেথা তুলিয়াছে রূপার ফলক,
মাঝখী লতার ফাঁকে বকুলের তলে,
কে তরুণী মূর্তি ধরি' ধরে চন্দ্রালোক!
(কানে কানে)

করুণানিধানের কাব্যে রূপ-জগতের কোন স্বাধীন প্রকাশ নেই;—রূপ সেখানে সৌন্দর্যের ভটগ্রাবী ভাব-কল্লোলোচ্ছ্বাসের নীচের অস্পষ্ট মৃত্তিকা অংশটুকুর মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু রূপকে কেন্দ্র ক'রেই কবির মনে সৌন্দর্য-প্লাবন স্ফুরিত হ'তে পেরেছে। রূপকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে নয়—স্বীকার ক'রে, রূপেরই উপর দিয়ে আত্মহারা কবিপ্রাণের সুরক্ষ্মতি লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে। করুণানিধানের Subjectivity-র বিশেষত্ব এইখানে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা। প্রকৃতি প্রেমের প্রভাবে তাঁর কবি মানসের দু'টি আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে এই প্রকৃতি-প্রেম সারল্যের প্রতি কবি-মানসের আনুগত্য এনে দিয়েছে—

ছুটব আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কুটির হ'তে
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার কুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে সুরের মিঠে স্রোতে।
(বাসনা)

এবং অন্যদিকে কবির সৌন্দর্যানুভূতির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক আকৃতির সংযোগ ঘটিয়েছে।—

সারাদিনের শ্রান্তি ভরা, নিবিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম ভোগ করিব রাতে।
না ফুটিতেই উষার আঁখি
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
বংকারিব 'জয় জগদীশ' প্রাণের একতারাতে। (ঐ)

এই আধ্যাত্মিক আকৃতিই কবির প্রকৃতি প্রেমকে পরিদৃষ্ট করেছে এবং পরে কবির কাব্যপ্রবণতার সম্পূর্ণ নির্বাসন ঘটিয়েছে। 'পদ্মাতটে' কবিতায় সন্ধ্যার ম্লানায়মান পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রূপবিলাসী কবির অন্তরে বেদনার একটি মীড় মূর্ছিত হচ্ছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই আধ্যাত্ম-আকৃতি-জাত আর একটি অনুভূতি—সৌন্দর্যের নশ্বরতার বোধ—কবির রূপ-মুগ্ধতাকে পীড়িত করেছে। সৌন্দর্য নশ্বরতার সেই অনুভূতি ও দার্শনিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আভাস ক'রে উপস্থিত হয় নি;—সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন বিচ্ছিন্ন একটি আবেগ কবির রূপানুভূতির পেলবতাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে।

[আগামীবারে সমাপ্য

ভূদানব্রত কি ভিক্ষাবৃত্তি ?

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়

ভূদানব্রত কি ভিক্ষাবৃত্তি ? বাংলা দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদ পত্র "যুগান্তর" তাহাই মনে করে। সংবাদপত্র জগতে যুগান্তরের স্থান ও মর্যাদানুযায়ী এই মতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতেই হইবে এবং ইহাকে নিছক সুবিধাবাদীসম্মত ও দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তবে যাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব যত বেশি তাহার দায়িত্বও তত বেশি। সেইদিক হইতে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, যুগান্তরের বক্তব্যানুযায়ী তাহার মতামত দায়িত্বপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা।

ভূদানকে যুগান্তর যে নিছক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া কিছুই মনে করে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ সে রাখে নাই। প্রবন্ধের শিরোনামা "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" ১৪ জানুয়ারী রবিবারের যুগান্তর দ্রষ্টব্য) হইতে সুরু করিয়া প্রবন্ধের সমাপ্তিবাক্য "ভারতবর্ষব্যাপী এই প্রকাণ্ডবৃহৎ ভিক্ষাবৃত্তি কেন ?" তে একথা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভূদানে একদিকে দান (ভূ-দান কথাতেই তাহা প্রকাশ) ও অপরদিকে গ্রহণ যে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মাত্র ইহাকে অবলম্বন করিয়া ভূদানকে নিছক ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন হইবে ? উত্তরে বস্ত্রহীন বলিয়া কি শিশু ও অতিবৃদ্ধ এক ? উত্তরে পাঠ্যপুস্তকসহ বিদ্যালয়ে গমনাগমন করে বলিয়া কি শিক্ষক ও ছাত্র এক ? উত্তরই অপরকে বলপূর্বক অধিকারচ্যুত করিবার পন্থায় বিশ্বাসী বলিয়া কি বিপ্লব ও দস্যুতা এক ?

বস্তুতঃ কেবলমাত্র দাতা-গ্রহীতার সম্বন্ধের জন্য কোন উপায় নিছক ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিণত হয় না। শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ভিক্ষুণী অনাথপিণ্ডদ-সুতা যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা "নগর-লক্ষ্মী" বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদা সংগ্রহ বা গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহার কার্যকে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি বলিয়া মনে করি নাই। সম্প্রতি বন্যা পীড়িতের সাহায্যের জন্য যে "পত্রিকা-যুগান্তর-অমৃত বন্যা সাহায্য তহবীল" খোলা হইয়াছে তাহাকেও আমরা নিছক ভিক্ষা-তহবীল মনে করি না এবং "নৈব নৈব চ" তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। ভূদানে যুগান্তরের বিশ্বাস নাই এবং সেজন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিশ্বাসী কোন লোকের আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি বলিয়া সমগ্র ভূদান আন্দোলনকে যুগান্তর যেভাবে হেয় ও খেলো করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদ না জানাইয়া পারিলাম না।

একথা বলিলে ভুল ও অন্যায় হইবে যে, ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন যুক্তি যুগান্তর দেয় নাই। তবে এই সকল যুক্তির মধ্যে যথার্থ যুক্তি হইতে অযুক্তির সংখ্যাই অধিক। যুগান্তর যখন প্রশ্ন করে যে, ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৫ কোটী একর জমি কিভাবে সংগৃহীত হইবে বা জমি-সংক্রান্ত অন্যান্য জটিলতার কথা উল্লেখ করে তখন ইহাদের গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু যুগান্তর যখন ভূদান যাবিশ-সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সমর্থন-পুষ্ট বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া উক্তি করে "সুতরাং খটকা জাগে বৈকি", তখন আমাদের মনে খটকা জাগে, যুগান্তর কি কোন বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদীদের নিকট হইতে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য লেখনী ধরিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ভদ্রলোকের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন

"নিছক জনপ্রিয়তা যদি আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনার নিজস্ব কোন মত থাকবে না—সেটা থাকবে সেটা মতান্তর।" আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যুগান্তর কি অবশেষে "মতান্তর"এ পরিণত হইতে চলিল।

যুগান্তরের ন্যায় পত্রিকাকে কি একথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ক্ষেত্র বিশেষে সন্দেহ প্রকাশ ও সত্য-সাব্যস্ত প্রায় এক হইয়া যায়; যেমন কাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করা আর তাহাকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করা প্রায় এক। যুগান্তরের কাছে যাহা খটকা বা সন্দেহ, বহু চরম-গরম-পন্থীদের নিকট তাহা সত্য; এবং যুগান্তরের সন্দেহ তাহাদের নিকট সমর্থনরূপ আশিস্। তবে ভূদান-আন্দোলনকারীদের ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই; কারণ তাঁহারা যদি এইরূপ সন্দেহ ও অসঙ্গত ইঙ্গিতের জন্য প্রস্তুত না হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তবে সে দোষ তাঁহাদের, যাঁহারা সন্দেহ বা ইঙ্গিত করেন, তাঁহাদের নয়! তবে ইহাও ঠিক যে, যুগান্তরের ন্যায় পত্রিকা হইতে এইরূপ অশোভন ইঙ্গিত আমরা আশা করি নাই।

যুগান্তরের বক্তব্য বিষয় মোটামুটি তিনটি। প্রথম, যে সকল বড়লোকদের "জীবনে জনসেবা ও ত্যাগ, অহিংসাব্রত ও তিতিক্ষার বিন্দুমাত্র নিদর্শন নাই" সেই সমস্ত বড়লোকেরা ভূদান সমর্থন করিয়া "চালাকীর দ্বারা মহৎ কার্য" করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শান্ত বিনোবাজী এই বড়লোকদের কৌশলের পরিবর্তনকে হৃদয়ের পরিবর্তন বলিয়া স্থির করিয়া নিয়াছেন। ফলে বিনোবার ভূমিব্রতের পবিত্রতার সঙ্গে বড়লোকদের চালাকীটাও মাহাত্ম্য অর্জন করিতেছে।

দ্বিতীয়, যে মার্কিণ সামরিকবাদ এশিয়ার বুকে দাপাদাপি করিতেছে তাহার সঙ্গে ভূদানের একটা গোপন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়—অন্ততঃ খটকা জাগিবার মত কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

তৃতীয়, ভূদান হইতেছে "অতীতের সেই গরু ও চরকার যুগে এবং মন্ত্রতন্ত্র, পুরোহিত, যাগযজ্ঞ, ভূতপ্রেত, যক্ষরক্ষ, কাড়কুক ইত্যাদির মধ্যে ফিরিয়া যাইবার" একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু "ইতিহাসের অনিবার্য গতিতে, রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তনে এবং শ্রেণীগত সংঘর্ষের চাপে" ভূদানযজ্ঞ ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

আমরা জ্যোতিষ জানি না এবং "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" বা "ইতিহাসের অনিবার্য গতি" ও অদৃষ্ট বা ভাগ্যের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা এখনও পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই—কাজেই ভূদানযজ্ঞ ব্যর্থ হইতে বাধ্য কিনা, তাহা পূর্ব হইতে স্থির করিতে আমরা অপারগ। তবে যদি তাহা ব্যর্থই হয় তাহাতে ক্ষোভের কিছু নাই। ভারতের ইতিহাসে বহু মানুষের বহু শুভ সংকল্প ও প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে ব্যর্থ হইয়াছে এবং ভূদানও হইতে পারে। এমনকি যে ইতিহাসের অনিবার্য গতি ও প্রয়োজনীয়তায় যুগান্তরের এত বিশ্বাস তাহাদের অস্তিত্বও বর্তমান এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে পূর্বের ন্যায় আর নিরাপদ নাই। পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধে ঐ সকল মারাত্মক অস্ত্রের অবাধ ব্যবহারে সমস্ত মনুষ্য জাতির লোপ পাওয়া আর অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং মনুষ্যজাতি লোপ পাইলে তাহার ইতিহাস বাঁচিয়া থাকিবে এরূপ আশা বাতুলতা মাত্র। ইতিহাস না থাকিলে তাহার "অনিবার্য গতি"- ও অনিবার্যতাবে শুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার "প্রয়োজনীয়তা"র আর কাহারও প্রয়োজন থাকিবে না।

সে যাহাই হউক, ইহা ভাবিতে সত্যই আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় যে ভূদানের সমর্থকদের মধ্যে যুগান্তর রাজা-জমিদার ও মুনাফা-লোভী ধনিক ছাড়া আর কাহাকেও খুঁজিয়া পায় নাই। যুগান্তরকে কি আমাদের একথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ভূদান সমর্থন করিয়াছে এবং সকল দলে এমন অনেক কর্মী ও নায়ক আছেন যাঁহাদের 'জীবনে জনসেবা ও ত্যাগ, অহিংসাব্রত ও তিতিক্ষার বা নিদর্শন আছে। ভূদান প্রসঙ্গে কি তাহাদের কোন মূল ও মর্যাদা নাই?

কিন্তু আমরা আরও বেশী আশ্চর্যান্বিত হই যখন দেখি

যুগান্তরের মতে তুলান অতীতের ভূতপ্রেত, কাউ-
কুঁকের মতো ফিরিয়া যাইবার একটি প্রচেষ্টা।
তুলানের স্বরূপ যা করা এই লেখা
উদ্দেশ্য নহে অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিরা
করিয়াছেন প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে
কিন্তু যুগান্তরের উক্ত অমৃত উক্তি দেখিয়া
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া
তুলানের বিকৃত ব্যাখ্যা জন্য যুগান্তর লেখনী
ধারণ করিয়াছে তুলান সম্বন্ধে হাজার মতামতগুলি যেন একটি
বিশেষ ফরমুলা অনুযায়ী গঠন করা হইয়াছে। শ্রেণীগত
দ্বন্দ্ব, রক্তাক্ত বিপ্লব, ইতিহাসের অনিবার্য গতি ও
প্রয়োজনীয়তা, আন্তর্জাতিক সমস্ত সমস্যার মূলকারণ
হিসাবে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কুচক্রান্ত নির্দেশ, দেশের
সকলপ্রকার কল্যাণকর প্রচেষ্টার পশ্চাতে মুনাফাখোরী
ধনিকদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার ইত্যাদি হইতেছে ঐ বিশেষ
ফরমুলারই অভিব্যক্তি। যুগান্তর বা অপর যে কেহ যদি
ঐ ফরমুলাকে গ্রহণ করে তবে তাহাতে আমাদের
আপত্তি নাই। আমাদের আপত্তি সেইখানে যেখানে ঐ
ফরমুলা অনুযায়ী যাহা নির্ণয় হয় তাহাকেই সত্য ও
বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া প্রচার করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই
বলিয়া পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে "অবাস্তব,
অলৌকিক ও মিথ্যাকে সত্যের মর্যাদা দিয়া মানুষের
যুক্তিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা
হইতেছে।"

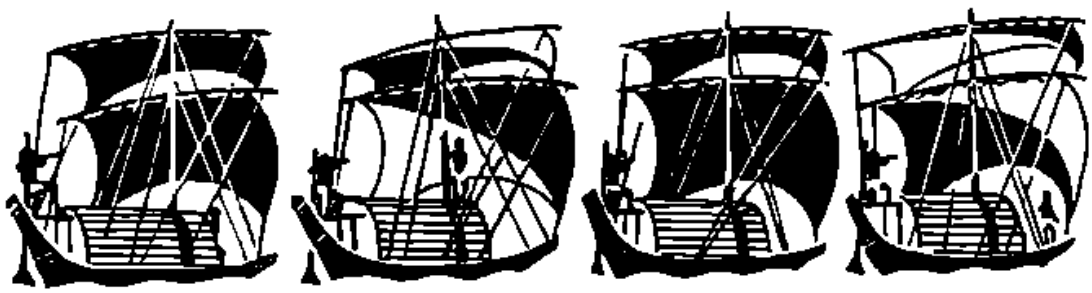

সমালোচক প্রমথ চৌধুরী

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বাংলাসাহিত্যের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসের পথে দুইটি সালে দিশারীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে—একটি ১২৭৯ আর একটি ১৩২১। এই দুই সালের ব্যবধান প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের হইলেও উহাদের যুগপ্রেরণার কোনও দুস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ দুই সালেই আমরা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়া পুরাতনকে বর্জন করিয়াছি। এবং যে নূতনকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা কেবলমাত্র বহিরঙ্গের পরিবর্তন নয় জীবনের অন্তর্মুখী ভাবচেতনারও একটি আমূল পরিবর্তন বটে। ১২৭৯ সালের শুভারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রসিক সমাজে অভূতপূর্ব এক আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। বাঙালী জাতি যেন শতাব্দীর মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অভিযানে জয়যাত্রা করে। নব-জাগৃতির যুগের বাঙালীর এই সাধনা আবার ১৩২১ সালে নবতনরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সমগ্র সাহিত্যিক সমাজকে চমকিত করিয়া দেয়। তাহার একনিষ্ঠ তপশ্চর্যার সুফল যেন অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে আসিয়া পড়ে যখন বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে বাস্তবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রমথ চৌধুরী সবুজ পত্রের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেন। বস্তুতঃ একদিকে বঙ্গদর্শন এবং অপরদিকে 'সবুজ-পত্র' সুদূর অতীতকাল হইতে অনাগত ভবিষ্যৎ অবধি বাংলা সাহিত্যের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত আমরা অনেক পত্রিকার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকলের মূল্যকে অতিক্রম করিয়া ঐ দুইটি পত্রিকার যুক্তধারা অন্তঃসলিলধারে জাতির কল্পনাক্ষেত্রে আজিও প্রবহমান রহিয়াছে।

এই দুই যুগপত্রিকার স্রষ্টাপুরুষ দুইজনকে স্মরণকালে আর একজনকেও আমরা স্মরণ না করিয়া পারিনা। কারণ তিনি অবতার কল্পপুরুষের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া এই দুই যুগকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম বেষ্টনীতে দুইযুগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্বের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য তিনি নিজে ছিলেন যুগোত্তীর্ণ মনীষা ও প্রতিভার মূর্ত বিগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম-প্রমথ চৌধুরী স্বজনীপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথের দান কেবল মাত্র সাময়িক বন্যার দুকূলপ্লাবী স্রোত বহাইয়া দেয় নাই তাহা চিরস্রোতের ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন অদৃষ্টপূর্বজ্যোতিতে ভাস্বর জ্যোতিষ্কের ন্যায় সাহিত্যাকাশে উদীয়মান তখনকার কথা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের কথা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া বলিয়াছেন 'সমাপতো রাজপ-দুন্দুভ ধ্বনি:'। আবার প্রমথ চৌধুরী যখন সবুজপত্রের' তরীটি ভাসাইয়া রবীন্দ্রনাথের উপর হাল ছাড়িয়া দিলেন সেদিনও কবিগুরু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য ও দূরদর্শিতাবলে প্রমথ চৌধুরীকে অভিনন্দিত করিলেন এবং আপনার যৌবনাবেগের ক্লান্তি ভুলিয়া জড়ত্বের বাধাকের অপসারিত করিয়া কণ্ঠকণ্ঠে এই আহ্বানবাণী শুনাইলেন :

প্রমথ চৌধুরী

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই-বাঁচা"

কবি 'সবুজপত্রের' মধ্যে যে দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রমত্ত প্রযুক্ত ও অমরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, পরে করেক পংক্তিতে তাহাদের আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এবং প্রমথ চৌধুরী

'সবুজপত্র' কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই সঙ্গে সঙ্গে যাহা পাঠকের মনকে কর্ষিত করিয়া সুকুমার রুচিবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতির উন্মেষ করিয়াছে। বাঙালীর চিন্তা ধ্যান-ধারণা-সম্পদকে সুপথে চালিত করিয়া জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করিয়াছে। শুধু ঐটুকু বলিলেই ঐ দুই পত্রিকার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র নিজের সাহিত্যসৃষ্টিকে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তিনি একটি সাহিত্যিক সমাজ গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইহার ফলে 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যেমন অক্ষয় সরকার, রমেশ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ সাহিত্যের সাধনায় অগ্রসর হন তেমনি প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রভিন্ন এবং মৌলিক সৃজনীশক্তির স্বাক্ষরস্বরূপ একই সঙ্গে নলিনী গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, ধূর্জটী মুখোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, শিশির সেন প্রমুখ লেখক লেখিকার কৃতিকে সাহিত্যে সুধীসমাজে পরিবেশন করিয়াছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা 'সবুজপত্রের সেই অবিস্মরণীয় স্রষ্টার সৃষ্টিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারিব না। কারণ তাঁহার সৃষ্টিকর্ম একাধিক রূপে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। কাব্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ—রসসৃষ্টির এই তিনটি আধারকেই তিনি সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সনেট পঞ্চাশৎ' 'চার ইয়ারী কথা', 'আহুতি' 'নীললোহিত' যেমন রসিকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করে, তেমনি 'রায়তের কথা', 'দেশের কথা', 'নানাকথা' 'তেল-নুন-লকড়ি', 'বীরবলের হালখাতা' 'বীরবলের টিপ্পনি' ইত্যাদি পাঠকের রসচেতনায় এক অভূতপূর্ব কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া আনন্দ সঞ্চার করে। কিন্তু এক্ষণে আমরা রসস্রষ্টা প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ না করিয়া তাঁহার প্রতিভার অপর যে দিক অর্থাৎ রসপ্রবক্তা প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করিব। আর যেহেতু প্রমথ চৌধুরী একাধারে শিল্পী ও শিল্পের বিচারক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অতএব তাঁহার জীবনকে যে কোন একটি দৃষ্টি কোন্ হইতে বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহার সৃজনীনৈপুণ্য ও রসদৃষ্টির নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলিয়া রাখিব যে বিচারক প্রমথ চৌধুরীর সহিত পরিচিত হইতে হইলে অনুরাগী পাঠকের তাঁহার 'সবুজপত্র'-এর সহিত পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ঐ পত্রিকাতেই তাঁহার সমালোচনা শক্তির পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। আরও একটি কারণে 'সবুজপত্র' অপরিহার্য। উহাতে যে সকল বিচারমূলক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আজিও গ্রন্থাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি 'বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে'র 'প্রবন্ধসংগ্রহ'তেও অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভকাল হইতেই রসবিচার শক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় (বি.এ পাশ করিবার পর) তিনি কবি জয়দেব' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তৎকালীন সাহিত্য সভায় পাঠ করেন। ঐ সভাই পরে সাহিত্য পরিষদ নামে পরিচিত হয়। যাহা হউক 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধটিই প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সমালোচনা। ইহা প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকায় খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত হয়। পরে 'সবুজপত্রে' সম্পূর্ণরূপে পুনর্মুদ্রিত হয়।

কবি জয়দেব প্রাচীন সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' আমাদের বাঙলা গীতিকাব্যের জনক। যে সুমধুর ছন্দ সঙ্গীত ও ধ্বনিপ্রবাহ তাঁহার কাব্যের প্রাণ তাহা আমাদের শাশ্বত আবেদনের সামগ্রী। যুগে যুগে শত শত ভক্ত পাঠক এই কাব্যের রস-সাগরে অবগাহন করিয়াছেন এবং উহার অমৃতনিস্যন্দী ধারা আকণ্ঠ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমযুগের অন্যতম শক্তিশালী সমালোচক অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় জয়দেবের কবিমানসকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "বঙ্গের সাহিত্য জগতে জয়দেব আদিগুরু, তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। বঙ্গের ধর্ম জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য। এই চন্দ্র সূর্যের আলোক উত্তাপে বঙ্গ বৈষ্ণবের দিবস বিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত রহিয়াছে।" [নবজীবন—১২৯৩]

প্রমথ চৌধুরীর জয়দেব' যাঁহারা আনুপূর্বিক পড়িয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের বলিয়া দিতে হইবে না যে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সমালোচকের আলোচনার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি ধারার অগ্রসর হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি এপর্যন্ত যে সকল আলোচনার পরিচয় লাভ করিয়াছেন সেই সকল সমালোচনাগুলিতে একটি অনুকূল প্রশংসার সুর বর্তমান। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর আলোচনাটি গতানুগতিকতাবর্জিত সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি-

ভঙ্গীর নিদর্শন। ইহাতে তাঁহার চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধির স্বকীয়তাই প্রকাশিত হয় নাই—মননশীল পাঠকের রস পিপাসার অভিনবত্বও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরীর মানস গঠন কোন উপাদানে প্রস্তুত এই প্রবন্ধ হইতে তাহার একটি ইঙ্গিত লাভ করা যায়। যে বুদ্ধিবাদী মন যথা প্রাপ্ত জীবনকে যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না—প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সেই মনেরই অধিকারী। আমাদের সাহিত্যে এই বুদ্ধিবাদী মননশীলতা খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে একমাত্র বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কেহই এই গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন না। সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে ভর্তৃহরি ও ভাসকে বুদ্ধিবাদী কবি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এবং আমাদের বাঙলাকাব্যে ভারতচন্দ্রই প্রথম কবি যাঁহার কবিতায় বুদ্ধিবাদ অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রথম চৌধুরীর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে তাঁহাদের বলিয়া দিতে হইবে না যে ভাস এবং ভারত-চন্দ্রের প্রভাব তাঁহাকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে বুদ্ধিবাদী লেখক বলিতে প্রমথ চৌধুরীকেই সর্বাগ্রে বুঝাইবে। পূর্ববর্তীযুগের প্রতিভাশালী কোনও লেখক এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই, যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বুদ্ধি ও কল্পনা বা হৃদয়াবেগের যেরূপ অনবদ্য সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহা পৃথিবীর খুব কম কবির জীবনে ঘটিয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বুদ্ধির প্রাচুর্যতা না থাকিলেও ভাবাবেগের অভাব ছিলনা। বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী উভয়েই ক্লাসিক সাহিত্য স্রষ্টা হিসাবে একাসনে বসিবার যোগ্য। তথাপি উভয়ের সৃজন-নৈপুণ্যের এবং দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মূলগত পার্থক্য আছে। ঐ পার্থক্যটি বুঝিতে না পারিলে সমা-লোচক বঙ্কিম ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরীকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী উভয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা ও মনীষার আলোকে লালিত বর্দ্ধিত হইলেও দুইজনের চিন্তাধারা দুইটি বিভিন্ন রসে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, বেন্থাম, মিল, কোঁত, প্রমুখ পণ্ডিত ও দার্শনিক-গণের রচনার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের নিছিই Humanism (মানববাদ)-কে ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রেমধর্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্তি ও কর্মের দেহ-প্রাণ সংযোগ করিয়া সমাজ-কল্যাণের একটি সাকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ইংরাজ কবি ম্যাথু-আর্ণল্ডের ন্যায় তাঁহার মধ্যেও 'Social and moral passion for doing good' পাইয়া বসিয়াছিল। পক্ষান্তরে প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের ভল্‌টেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সুইফ্‌ট, পোপ প্রমুখ ভাবাবেগশূন্য লেখকগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এবং রেনাঁ (Renan), তেইন, (Taine), মালহার্বি (Malherbe) প্রমুখ সমালোচকের বিচার পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইয়া প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন: 'বাদিতমর্থং বেলোহপি ন বোধয়তি।'

আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যাইতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য মানসের পার্থক্যটি কোথায় তাহা বলিবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। আশা করি এক্ষণে মূল আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিলে এবং কেন প্রমথ চৌধুরী তাঁহার সমালোচনায় প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইয়াছেন জয়দেব হইতেই যাহার নমুনা পাওয়া যাইবে—সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচিত। এই কাব্যের সমালোচনাকালে প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন: "এ কাব্যের মুখ্য বর্ণিত বিষয় রাধাকৃষ্ণের রূপ, তাঁহাদের পরস্পরের বিরহে পরস্পরের দুঃখ প্রকাশ, মিলিত হইলে পরস্পরের কণ্ঠোপকূজন। অর্থাৎ কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের দেহের বর্ণনা ও তাঁহাদের মনোগত প্রেমভাবের বর্ণনা।... গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার।"

কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্যের পর প্রমথ চৌধুরী 'গীতগোবিন্দে'র কাব্যাংশের, দোষগুণের বিচার করিয়াছেন। কবি জয়দেবের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান অভিযোগ এই যে তিনি "প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গার রসকে কবিতার বর্ণিত বিষয় স্বরূপ স্থির করিয়াছেন।" ইহা ব্যতীত "জয়দেব বিরহের বর্ণনায় আদৌ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।" কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে যক্ষ-স্ত্রীর যে বিরহাবস্থা

রচিত হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে জয়দেবের বর্ণনার বিচিত্রতার অভাব এবং বিরহাবস্থার মধ্যে যে নূতন সৌন্দর্য আছে তাহার সম্পূর্ণ উল্লেখের অভাব—এই দুইটি ত্রুটি আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

জয়দেবের অভিসার বর্ণনাও প্রমথ চৌধুরীর মতে "বেশভূষার বর্ণনার নামান্তর।" তাহাতে অভিসারিকার মনের আবেগ—প্রেমের নিমিত্ত অবলা রমণীগণ কিরূপে নানারূপ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে"—ইহার আদৌ নির্দেশ নাই। পরিশেষে তাঁহার বসন্ত বর্ণনার বৈচিত্র্যহীনতা, উপমার পরানুকারিতার কথা উল্লেখ করিয়া প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন: "জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ—তুচ্ছই Khythm-এর অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত এক সকল একটি শ্লোক সম্পূর্ণরূপে অন্য আর একটির ছায়া।"

বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটি আগাগোড়া একটি প্রতিকূল আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যৌবনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সমালোচনাটির জন্য পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হইয়া আর একটি প্রসঙ্গে ঐ কাব্যের (মেঘনাদ বধ কবির সমাদরের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁহার এই প্রথম সমালোচনাটির কোন জীবনেও পরিবর্তন করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। অতএব ইহাকে তাঁহার অপরিণত বয়সের শুধু-অতিজাত্যপ্রসূত রচনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি রচনার কথা আমরা স্মরণ করিব। উহাও 'জয়দেব' কবির কাব্যালোচনা। উহার লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীরও পূর্বে বলিয়াছিলেন, "গীত গোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয় তিনি (জয়দেব) খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীনতার ঘারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বার রোধ করিয়াছেন। সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য রাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।"

প্রমথ চৌধুরীর এই সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথের প্রভাব যে আদৌ নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। 'জয়দেব' সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনার মধ্যে একমাত্র ইহাই সাধু ভাষায় রচিত। কারণ প্রমথ চৌধুরী তখন 'বীরবল' রূপে সাহিত্য জগতে আখ্যাত হন নাই এবং সবুজপত্রের উদয় হইতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল।

১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' তাহার নবীন কলেবর লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী উহার জন্য একটি মুখপত্র রচনা করিলেন। সাহিত্যের সংজ্ঞা কি, জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কোথায় ইত্যাদি ব্যর্থহীন ভাষায় আলোচনার পর প্রমথ চৌধুরী ইহা বুঝাইয়া দিলেন যে, বাংলা সাহিত্য যদি স্বদেশী সাহিত্যে পরিণত না হয় এবং দেশের মাটি হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন থাকে তবে তাহা হয় শুকাইয়া যাইবে নতুবা পরগাছার ন্যায় অবাঞ্ছিত ভাবে বাড়িয়া উঠিবে।

প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন, "পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটীতে শিকড় গাড়তে পারছেনা বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পরগাছার ফুল। অকিড-এর মত তার আকারের অপূর্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাকলেও, তার সৌরভ নেই। খাঁটী স্বদেশী বলে 'অন্নদামঙ্গল' ক্ষুদ্রপ্রাণ হলেও কাব্য, এবং কোন দেশেরই নয় বলে 'ব্রত্রসংহার' মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র ভাষার ও ভাবের একতার গুণে, সংযমের গুণে, তাঁর মনের কথা ফুলের মত সাকার করে তুলেছেন এবং সে ফুলে, যতই কীট হোক না কেন, প্রাণও আছে, গন্ধও আছে।"

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা লইয়া আজকাল বিশেষ আলোচনা না হইলেও এক সময়ে তাহা যথেষ্ট বিতর্কের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। 'সবুজপত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সুধী সমাজ কিছু বিচলিত হন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় উহার একটি জবাব 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে দুইটি বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাদানুবাদের অবসান ঘটান। ঐ প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয় আলোচনার সহিত প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন, "Realisticএর পুতুল নাচ এবং Idealism এর ছায়াবাজী উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে সে কারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে Realist এবং Idealist, কি বহির্জগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার 'সাহিত্য' 'সাহিত্যের পথে'

'সাহিত্যের স্বরূপ' ইত্যাদি গ্রন্থে সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ জিজ্ঞাসার বা কৌতূহলী পাঠকের সমস্যার সদুত্তর এবং সুসমাধান করিয়া দিয়াছেন. তেমনি প্রমথ চৌধুরীও তাঁহার বিদগ্ধ চিন্তা ও মৌলিক রসবোধের অনুবর্তী হইয়া সাহিত্যের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। চিরকিশোরকে লিখিত এক পত্রে 'সাহিত্যের বিষয়' কি তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন, "সাহিত্য হচ্ছে সেই বস্তু যার অন্তরে কোনও বিষয়ের নয় মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এবং যে-মন যত মহৎ যত সুন্দর, যত শক্তিশালী হবে তার প্রকাশও তত উজ্জ্বল তত মনোহারী হবে।" পরবর্তী অংশে তিনি আরও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত মনে করিয়াছেন। সাহিত্য যেমন ব্যক্তিত্বের বিকাশ তেমনি একথাও সত্য যে, "যাঁর বাণীর অন্তরে একটি বিশেষ মনের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর লেখাই সাহিত্য এবং এই কারণেই সাহিত্যে style-এর মাহাত্ম্য এত বেশী, কেননা styleএর যথার্থ অর্থ হচ্ছে মানুষের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গী—সাহিত্যের বিষয় হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র।"

'সাহিত্যের সার্থকতা' নামক প্রবন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, 'সাহিত্যই জীবনের একমাত্র সহায়, কেননা, একমাত্র সাহিত্যই মানুষকে বেঁচে থাকতে শেখায়, জীবন ধারণের কোনও অবাস্তব ফলের লোভ দেখিয়ে নয়, মানুষকে নিত্য নবজীবনে জীবিত ক'রে।... যখন দেখা যাবে সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমাজের অভিযোগটা বেড়ে চলেছে তখনই বুঝতে হবে নবসাহিত্য সৃষ্টির যুগ এসেছে। ...জীবনটা হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় সখ এবং এই সখের চর্চা করতেই সাহিত্যের সার্থকতা।"

সাহিত্যের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কাহারও মনস্তুষ্টি সাধন করা নয়। সেই কারণে সমাজের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে যাইলে সাহিত্য স্বধর্মচ্যুত হয়। 'সাহিত্যে খেলা' নামে একটি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলিয়াছেন, "সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। সাহিত্যে মানবতা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।"

'বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটিও একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। বঙ্কিম-মধুসূদনের যুগে যে সাহিত্য রচিত হইত আজ তাহা হইতেছে না। কারণ আজিকার সাহিত্যিক স্কট, মিল্টন, মিল ও কোঁতের রচনার অনুসরণের পক্ষপাতী নন। তথাপি এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, পরের অনুকরণ বা অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টি করিলে তাহা স্থায়ী সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ মেঘনাদ বধ বা দুর্গেশ নন্দিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। পাঠক চিত্তে উহাদের আবেদন আজিও অবসিত হয় নাই। অথচ ঐগুলি যে পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তার ও প্রেরণার সাক্ষাৎ অনুসরণ তাহাও বলা বাহুল্য। এই আলোচনার সূত্র ধরিয়া প্রমথ চৌধুরী আরও বলিয়াছেন, "রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা। শিলার গোটেকে, Musset Victor Hugoকে, মোপাসাঁ ফ্লোবেয়রকে, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের অবকাশ রঞ্জিনীর তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতা অপেক্ষা আর্টহিসেবে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং ঐশ্বর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুসমাহ, ছন্দ ও মিলে তালে ও মানে এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইতালিউন্নের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে।"

[আগামীবারে সমাপ্য]

মণিপুর প্রসঙ্গ (১২)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

শাসন প্রণালী

প্রাচীনকাল হইতে মণিপুরে রাজতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে। রাজাই ছিলেন মণিপুরের একচ্ছত্র অধিপতি। রাজ্যের উচ্চ পদগুলি বয়সের তারতম্য অনুসারে রাজার ভ্রাতা অথবা তাহাদের অবর্তমানে রাজপুত্রদের মধ্যে বণ্টন করা হইত। উচ্চ রাজ কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত একটি 'দরবারে'র উপর দৈনন্দিন শাসন কার্য পরিচালনের ভার থাকিত। রাজা এই দরবারের সভাপতি থাকিতেন। রাজার প্রথম অনুজ যুবরাজের পদ গ্রহণ করিতেন। রাজার মৃত্যুর পরই যুবরাজের স্থান, তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় অনুজ সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অনুজগণ যথাক্রমে হেডোহাম্বাল (Head of Police), শগোল হকুবা (অশ্বাধ্যক্ষ), শমুহকুবা (গজাধ্যক্ষ), লোলরই হকুবা (শিবিকাধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত হইতেন। রাজভ্রাতাদের অবর্তমানে অথবা তাহারা বিদ্রোহী হইলে রাজপুত্রদের মধ্যে উপরোক্ত পদগুলি বণ্টন করা হইত। এই সমস্ত অধ্যক্ষগণ পদাধিকারবলে প্রধান বিচারালয় চিরাপের (Chirap) সভ্য থাকিতেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্তির সময় আয়া পুরেল (Awa Purel) নামে পররাষ্ট্র সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়।

সৈন্য বিভাগ

প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মণিপুরীকেই রাজার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে হইত। ইহা ছাড়া মণিপুরের বিজয়া গারোট" অর্থাৎ সামরিক বিভাগের পরিচালনায় একটি স্থায়ী সৈন্যদলও ছিল। রাজভ্রাতাদের মধ্যে যিনি সেনাপতি হইতেন তিনিই পদাধিকার বলে বিজয়া গারোটের সভাপতিত্ব করিতেন। ৮টি কোম্পানীর ৮জন নেতৃত্ব, পররাষ্ট্রসচিব (যাহার উপর ব্রহ্মদেশ সম্পর্কিত বিষয় সমূহের ভার থাকিত) এবং নিম্নতর সামরিক কর্মচারীদের মধ্য হইতে ১১জন সহ এই ২০জন সভ্য দ্বারা বিজয়া গারোট গঠিত হইত। কোম্পানীগুলি তাহাদের নিজ নিজ এলাকার সামরিক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিত। সৈন্য বিভাগে অশ্বারোহী এবং পদাতিক দুই রকম সৈন্যই ছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে অশ্বারোহী সৈন্যের গুরুত্ব ততটা না থাকিলেও এমন এক সময় ছিল যখন অশ্বারোহী মণিপুরী শত্রুপক্ষের নিকট বিভীষিকা স্বরূপ ছিল।

যুদ্ধাস্ত্র

মণিপুরী সৈন্যদের বা একটি সার্বজনীন অস্ত্র; সকলের হাতেই একটা করিয়া থাকিত। ইহা ছাড়া বল্লম, পাথর ছুড়িবার যন্ত্র, তীর ধনুক, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি নানা অস্ত্রও যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই মণিপুরে আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহারের কথা শুনা যায়। সম্ভবতঃ রাজা খাবোম্বার সময় আক্রমণকারী চীনাদের নিকট হইতে মণিপুরীরা বারুদ তৈরীর কৌশল শিখিয়া থাকিবে! বারুদের সন্ধান পাওয়ার পর তাহারা নানারকম বন্দুক ও মুলেট তৈরী করিয়া যুদ্ধের সময় ব্যবহার করিত। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা খাগেম্বা ধাতু নির্মিত একটি বড় কামানও তৈরী করিয়াছিলেন।

মণিপুরী সৈন্য

মণিপুরী সৈন্য বহুবার বহু যুদ্ধে তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুশিক্ষিত সৈন্যের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, মহারাজা গম্ভীর সিং

তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচর সহ ব্রহ্মদেশের কবল হইতে মণিপুর পুনরুদ্ধার করিয়া সেই অসাধ্য কর্ম সাধন করেন। মণিপুর উদ্ধারের পর তিনি তাঁহার সৈন্য বিভাগকে যুগোপযোগী নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া আরও সুগঠিত এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে নানা সময়ে নানা বিপদে ইংরেজ সরকারকে মণিপুরী সৈন্যের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। মণিপুরীদের সৈনিক সুলভ নানাবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে মণিপুর রাষ্ট্রে যে সমস্ত বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ঘন ঘন রাষ্ট্র বিপ্লব এবং সৈন্য বিভাগে যোগ্য পরিচালকের অভাব। ১৮৯১ সনে মণিপুরের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার পর সৈন্য বিভাগের গুরুত্ব একেবারে কমিয়া যায়। তখন হইতে শুধু কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলনের প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ফলে মণিপুর আজ আত্মবিস্মৃত। বিদেশী সরকারের উদ্দেশ্যও বোধ হয় ইহাই ছিল। এখন লোকে মণিপুরকে জানে শুধু তাদের নৃত্যের বৈশিষ্ট্য দ্বারা। এমন একদিন ছিল যখন মণিপুরের ছেলে যেমন তার নৃত্যের ছন্দে রূপের ইন্দ্রপুরী সৃষ্টি করিতে পারিত, তেমনি আবার প্রয়োজন হইলে অসি হস্তে সমরাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইতেও পারিত। সে সব স্মৃতি মণিপুরীদের কাছেও আজ প্রায় রূপকথার মত কাল্পনিক। মিঃ হডসন তাহার গ্রন্থে (The Meitheis T. C. Hodson) সাধারণ মণিপুরীদের সামরিক গুণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The inherent defects of the Meithei, his dislike of sustained discipline, his preference of diplomatic methods, his employment of irregular troops...lack of honesty in those responsible for the equipment and commissariat of the forces, deprived the troops of all military value, which otherwise they might have possessed at the end of the period of independence in 1898. Yet the Meithei is far from being a coward, and in happier circumstances with better leading might be capable of military virtues."

হডসন সাহেব মিঃ গ্রীনউড প্রভৃতির ন্যায় কিছুদিন পরই মণিপুরে আসেন। সেইজন্য জাতিবর্ণ জনিত ক্ষোভের দরুণ তাহার কলমে মণিপুরীদের সম্বন্ধে একটু ঝাঁজ নিশান থাকা স্বাভাবিক। তাহা হইলেও সাধারণ মণিপুরীদের সাহস এবং সামরিক যোগ্যতার কথা তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়া গিয়াছেন।

বিচার বিভাগ—

বিচার কার্যের সুবিধার জন্য উপত্যকা অঞ্চল ১১ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র পঞ্চায়েৎ ছিল। সাধারণতঃ স্থানীয় লোকের মধ্যে সকলের আস্থা-ভাজন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই পঞ্চায়েতের সভাপতি করা হইত। পঞ্চায়েৎ স্থানীয় চুরি, মারপিট, জবরদস্তি, পরস্ত্রীগমন, বলাৎকার, জখম, খেসারত প্রভৃতি সাধারণ অপরাধের বিচার অথবা মীমাংসা করিত। দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলার বিচার একই আদালতে হইত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে পঞ্চায়েৎ ৫০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিত। কেবলমাত্র ইম্ফল পঞ্চায়েতের ১০০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা ছিল। পাহাড় অঞ্চলেও এইরূপ পঞ্চায়েতী প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছিল। লিমাং অঞ্চলে মুসলমান এবং মণিপুরীদের মধ্যে বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হইয়াছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভ্যগণ প্রত্যেকে সরকার হইতে ২½ একর নিষ্কর জমি পাইত। ইম্ফল পঞ্চায়েতের সভ্যগণ সেই স্থলে পাইত ৬২½ একর করিয়া।

রাজধানীতে নগর পঞ্চায়েৎ ব্যতীত আরও ৩টি উচ্চ বিচারালয় ছিল। যথা :—পাজা, সামরিক বিচারালয় এবং চিরাপ।

১। পাজা—স্থানীয় পঞ্চায়েতী বিচারালয়ে যে সমস্ত অভিযোগের বিচার চলিত না, সেইরূপ অভিযোগের বিচার হইত 'পাজা' নামক বিচারালয়ে।

সামরিক বিচারালয়ে শুধু সৈন্যদের বিচার হইত।

চিরাপ—ছিল বর্তমান হাইকোর্টের মত মণিপুর রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয়। নিম্ন আদালত কর্তৃক দণ্ডের পুনর্বিচার এবং সমস্ত রকম গুরুতর অভিযোগের বিচার এইখানেই হইত। এই বিচারালয়ে পূর্বে ১৩জন বিচারক ছিলেন, পরে কমাইয়া ৪জন করা হয়। তাহাদের প্রত্যেকে ১২৫ একর করিয়া জমি পাইতেন।

চিরাপের বিচারের পর রাজার নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করা যাইত। রাজ্যের মধ্যে রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক তিনি অন্যান্য সমস্ত বিচারালয়ের আদেশের রদবদল করিতে পারিতেন। মণিপুরে ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ার পর চিরাপের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হয়। দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার আগে যেমন ছিল তেমনি রহিল। নরহত্যা, রাজদ্রোহমূলক অপরাধের বিচারের ক্ষমতা চিরাপ হইতে পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্টে চলিয়া আসে। চিরাপের দণ্ডদানের ক্ষমতাও হ্রাস করিয়া ২ বৎসর জেল, ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা এবং বেত্রদণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইংরেজ প্রজা এবং মণিপুরের গিরিজনদের বিচার হইত পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্টে; চিরাপ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞার পুনর্বিচারও হইত সেইখানে। পলিটিক্যাল এজেন্ট আমাদের চীফ-কমিশনারের অনুমোদন লইয়া ৭ বৎসরের অধিক কারাদণ্ড এমন কি ফাঁসির হুকুম পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন।

দণ্ডবিধি—

ধর্মানুশাসন এবং লোকাচার অনুসারে মণিপুরে অভিযুক্তদের অপরাধ নির্ণয় এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত। ইহাতে যে অনেক সময় লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড প্রয়োগ হইত না এমন নয়। নরহত্যা এবং গো-হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল। প্রাচীনকালে খুনী যেভাবে খুন করিত, প্রাণদণ্ডের আদেশও তাহার প্রতি সেই ভাবেই পালন করা হইত। কর্ণেল জনষ্টন অনেক চেষ্টা করিয়া মুণ্ডচ্ছেদ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। বেত্রদণ্ডের আদেশ বিকালে বাজারের মধ্যে সর্বসমক্ষে পালন করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশত বেত্রাঘাতেরও হুকুম হইত; সহ্য করিতে না পারায় ইহাতেও অনেকের মৃত্যু হইত। মেয়েদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইত না। অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া বাজারের সমস্ত লোকের সামনে নানাভাবে নাজেহাল করা হইত; যাহাতে শুধু অপরাধী নিজে নহে অপর সকলেও পরিণাম ভাবিয়া বিপথগামী হইতে সাহস না পায়।

মুদ্রা—মণিপুরে কাঁসার তৈরী "ফ্রী" অঙ্কিত সেল নামক একপ্রকার ছোট মুদ্রার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে ৪৫০ হইতে ৫০০ সেলের বিনিময়ে একটি বৃটিশ ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যাইত। প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তৈরী চৌকো, গোল ইত্যাদি নানা আকৃতির ৮ রকমের সেল পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা চৌরজিৎ সিং রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন রাজা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রাজা জয়সিংহের সন্ধিপত্রে মণিপুরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেই স্বর্ণমুদ্রার কোন নিদর্শন এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মণিপুরে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের পর হইতে মণিপুরী মুদ্রার পাশে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি প্রভৃতি বৃটিশ-ভারতীয় মুদ্রা ও বাজারে চলিতে থাকে। কিন্তু তামার পয়সা বহুদিন পর্যন্ত অচল ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একবার মণিপুর সরকার পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শে ভারত সরকারের নিকট হইতে তামার পয়সা আনাইয়া চালু করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মেয়েরা গ্রহণ করিতে আপত্তি করায় ভারত সরকারকে সেগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

ভূমি ও রাজস্ব—মণিপুর রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন রাজা স্বয়ং। তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রজাদিগকে জমি ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দিতেন। ফুনান সেলুম্বা (Phoonan Saloomba) নামক একজন কর্মচারী

কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রত্যেক গ্রাম এবং তাহার সংলগ্ন খাসমহলের জমিগুলির তদারক এবং রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল গ্রামবাসীদের উপর। পদস্থ কর্মচারী ব্রাহ্মণ অথবা সৈনিকদিগকেও ছাড়া অনেক সময় ভূসম্পত্তি দান করিতেন। তাহাদিগকে ও নির্দিষ্ট কর দিতে হইত। এই সমস্ত কর উৎপন্ন শস্যের দ্বারা দেওয়া হইত, তবে পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না।

পানা বিভাগ—মণিপুরে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোককেই যুদ্ধের সময় রাজার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে হইত, সেই জন্য প্রাচীনকাল হইতেই মণিপুরী সমাজ নিম্নোক্ত ৬টি পানা বা সামরিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

১। খাবম পানা—সম্ভ্রান্তদের স্থান।
২। লাইকম পানা—দেবতাদের স্থান।
৩। অহালুপ পানা—যুদ্ধদের সঙ্ঘ।
৪। নাহারুপ পানা—যুবকদের সঙ্ঘ।
৫। হিতাক হানবা—তামাক যোগানদারদের এলাকা।
৬। পোৎসাংবা—নানারকম প্রহরীদের স্থান।

১৫১০ সনে রাজা কৈরেংবার সময়ে উপরোক্ত পানাগুলির সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। সামরিক প্রয়োজনেই এই সমস্ত বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং গরীব নেওয়াজ শামহেইবার সময় বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি প্রবর্তনের ফলে পানাগুলি এক একটি ছোট সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এক কথায় সমগ্র মণিপুরী সমাজ কতকগুলি সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। পূর্বে এই গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের দলপতির দ্বারা শাসিত হইত। কালক্রমে ইহাদের উপর নিংথৌজা গোষ্ঠীর একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ইহারা মণিপুরের রাজার অধীনে কতকগুলি সামরিক গোষ্ঠীরূপে পরিণত হয়। মণিপুরের উপর বার বার ব্রহ্মদেশের আক্রমণের ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত পানাগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের পর মহারাজা গম্ভীর সিং সম্ভবতঃ প্রাচীন প্রথা অনুসারে পানাগুলির পুনরায় পত্তন করেন।

এইরূপ স্বাভাবিক সামরিক গোষ্ঠী হইতে পানাগুলির উদ্ভব হইলেও ইহাদের সভ্যগণ যুদ্ধ ছাড়াও অনির্দিষ্ট 'লাম্লুপ' প্রথার (বাধ্যতামূলক রাজসেবা) অধীন ছিল। লাম্লুপ প্রথার প্রয়োজনে ৬টি পানাকে সর্বশুদ্ধ ১০৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়। লোই (অনুন্নত সম্প্রদায়) অথবা নাগা গ্রামগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। উপরোক্ত ১০৭ বিভাগের প্রত্যেকটি একাধিক রাজকর্মচারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। কোন কোন বিভাগে রাজধানী হইতে সমস্ত কর্মচারিগণ আসিত; কোথাও বা এলাকার অধিবাসীদের মধ্য হইতেই কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত এবং তাহাদের কাজের তদারক করার জন্য রাজধানী হইতে কর্মচারী পাঠান হইত। ইহারা সকলেই লাম্লুপ' কর্মচারী নামে পরিচিত। ইহাদের কেহ কেহ পদাধিকার বলে চিরাপের সভ্য ছিল। লাম্লুপ কর্মচারিগণ লাম্লুপ চিংবা নামক দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই দপ্তরের কাজ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং গ্রামের কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। লোই এবং নাগাদের এলাকায় বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত পদ ছিল তাহাদের চিহ্ন আজও লোপ পায় নাই। প্রত্যেক এলাকা এক এক জন নিংথৌ অর্থাৎ রাজার অধীন ছিল। এই নিংথৌগণ একবারে নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বাধীন অধিপতি ছিল, পরে তাহারা মণিপুরের রাজবংশের প্রভুত্ব মানিয়া লয়। নিংথৌর অধীন একজন সেনাপতি ছিল। সেনাপতির পর ৩য় এবং ৪র্থ পদ ছিল যথাক্রমে কুলাকপা মুপলাকপা; ইহাদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের দায়িত্ব ছিল। ৫ম পদ ছিল খুরাওহনবা (গ্রামবৃদ্ধ). ইহার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ৬ষ্ঠ পদ ছিল খুল-লাকপা অর্থাৎ মদের তত্ত্বাবধায়ক; ইহারা মদের স্বাদ ও গুণাগুণের প্রতি এবং গ্রামে আগত অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিত। ৭ম পাখাংলাকপা গ্রামের অবিবাহিত যুবক

মণিপুরের তত্ত্বাবধান করিত। ৮ম নাহারাকপা নাবালকদের উপর দৃষ্টি রাখিত। ইহারা ছাড়াও তেল্লোইহাকুবা তেল্লোই-ছিনাং, চিনাওবা, চিকপা, লাওমী-রাকপা, লাওমী-ছিনাং প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কর্মচারিগণ নৌকা তৈরী বা মেরামত, কৃষি ইত্যাদি নানা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিত।

লাহুপ

উপরে যে লাহুপ প্রথার কথা বলা হইয়াছে তাহা মৈতেই, ব্রাহ্মণ, মুসলমান এমন কি রাজপুরোহিতদের উপরও প্রযোজ্য ছিল। ১৬ বৎসরের উপর বয়স হইবা-

প্রত্যেক লোককে ৩০ দিন অন্তর অন্তর ১০ দিন

জোর জন্য বেগার খাটিতে হইত। রাজার

গৃহ এবং সরকারী নানাবিধ কাজ হইতে ধরিয়া

সাঁকো নির্মাণ এবং সংস্কার, গৃহ নির্মাণ, সোনা রূপা ও তাম্র-পিত্তলের কাজ, কাঠের কাজ, রন্ধন, দৈনন্দিন পূজার আয়োজন সংগ্রহ করা ইত্যাদি সমস্ত রকমের কাজই লাহুপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজের ভার থাকিত। গোষ্ঠিপতিরা সেই অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক পাঠাইত। সরকারী কর্মচারীরা ইহাদের কাজের তত্ত্বাবধান করিত। কেহ কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে এক টাকা জরিমানা দিতে হইত এবং এই টাকা দ্বারা লোক নিযুক্ত করাইয়া তাহার প্রতি নির্দিষ্ট কাজ করান হইত। অনেকে ইচ্ছা করিয়াই বেগার খাটার পরিবর্তে জরিমানার টাকা দিয়া দিত। পূর্বে পদস্থ রাজ কর্মচারীদের সেবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দুই একটি করিয়া নাগাগ্রাম দেওয়া হইত। এই সমস্ত গ্রামের লোকেরা যখন তখন বিনা মজুরীতে মালিকের সমস্ত কাজকর্ম করিয়া দিত। ইহাতে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হইত বলিয়া রাজা দেবেন্দ্র সিং এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেন। তাহা হইলেও অন্যান্যদের চেয়ে নাগা এবং কৌচদের উপর কাজের চাপ ছিল অনেক বেশী। আধুনিক কালে এই লাহুপ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়।

শিক্ষা

মণিপুরের রাজারা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। ১৮৪৪ সন পর্য্যন্ত রাজ্যের মধ্যে কোন বিদ্যালয় ছিল না। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিতে জানিতেন না এবং সেজন্য তাঁহারা লজ্জিত থাকা দূরে থাক বরং গর্বই বোধ করিতেন। সম্ভ্রান্তগণ লেখাপড়ার কাজকে হেয় জ্ঞান করিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৪৪ হইতে ৬০ সনের মধ্যে পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন গর্ডন (Capt. Gordon) নিজ ব্যয়ে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর স্কুলটি উঠিয়া যায়। ১৮৭২ সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট মুথালের (Major General W. F. Nuthall) চেষ্টায় একটি দেশী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তদানীন্তন বাংলা সরকার চার পাঁচ শত টাকা মূল্যের পুস্তকাদি দান করিয়া স্কুলটিকে সাহায্য করেন। কিন্তু স্থানীয় সরকারের আনুকূল্যের অভাবে স্কুলটি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে জনষ্টন সাহেবের চেষ্টায় ১৮৮৫ সনে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৯১ সনের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় স্কুলটি কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকিলেও ১৮৯২ সনের জুন মাস হইতে পুনরায় ইহা চালু হয়। তাহারপর হইতে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। এইভাবে ছেলেদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেও ১৯০১ সন পর্য্যন্ত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। মণিপুরী সমাজ পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি এইরূপ বিমুখ থাকিলেও তাহাদের চালচলন, সাধারণ বুদ্ধি, শিল্প নৈপুণ্য অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। এলেন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে (Assam district Gazetteers Vol. IX, 1905, B. C. Allen) যথার্থই

লিখিয়াছেন—They are well dressed well housed and clever craftsmen. Men and women alike are full of enterprise and intelligence, and few people manage better without schooling than the Manipuri.

ক্ষত্রিয়

মণিপুরের মৈতাই সম্প্রদায় উপবীতধারী ক্ষত্রিয়। ভারতের অন্যান্য স্থানের হিন্দু সমাজের মত মণিপুরী সমাজ বর্ণবৈষম্যের দ্বারা জর্জরিত নয়। মণিপুরের মধ্যে মৈতাইগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে সব দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিষ্ণুপুরীরা মণিপুরী বলিয়া আরও একটি সম্প্রদায় আছে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন পরীব মেওয়াজ ইহাদিগকে পশ্চিম হইতে আমদানি করিয়া ছিলেন। আবার এও শুনা যায় যে, ইহারা মণিপুরেরই লোক, কাছাড়ে বসবাস করিতেছিল; ব্রহ্মদেশের সৈন্য মণিপুর দখল করায় রাজা মারজিৎ সিং কাছাড়ে চলিয়া যাওয়ার সময় শ্রীবিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলাও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মণিপুর উদ্ধারের পর যাহারা এই শালগ্রাম শিলা পুনরায় মণিপুরে আনিয়াছিল তাহাদিগকে বিষ্ণুপুরীয়া মণিপুরী বলা হয়। তাহাদিগকে যে অঞ্চলে বসবাস করিতে দেওয়া হয় সেই অঞ্চলের নামও হয় বিষ্ণুপুর। যে কোন কারণেই হউক এই বিষ্ণুপুরীয়াদের স্থান মণিপুরের ক্ষত্রিয় সমাজে অপেক্ষাকৃত নিম্নে। ক্ষত্রিয় সমাজে সামাজিক পদমর্যাদায় মহারাজার পরের স্থানই হইতেছে মহারাজ কুমারদের। তাহারা সকলেই কোন না কোন মহারাজার ঔরসজাত সন্তান। মহারাজ কুমারদের পর রাজকুমারদের স্থান। রাজকুমারগণ কেহই রাজা অথবা মহারাজার পুত্র নয়, তাহারা তাহাদের পুত্রদের বংশধর। অর্থাৎ মহারাজ কুমারদের মধ্যে যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনি ছাড়া আর সকলের পুত্র কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বংশধরগণ রাজকুমার ও রাজকুমারী উপাধি পাইয়া থাকে। তবে রাজকুমারের ছেলেমেয়েরা রাজকুমার রাজকুমারী উপাধি পাইলেও রাজকুমারী এমনকি মহারাজকুমারীর ছেলেমেয়েরাও মাত্রের উপাধি পায় না। রাজকুমার সম্প্রদায় এক বংশের সন্তান বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণ

মণিপুরের ব্রাহ্মণদের পূর্ব পুরুষগণ অধিকাংশই বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছে। তাহাদের আচারনিষ্ঠা অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণদের মতই। বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদের বিবাহাদি ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখা যায় এক সময়ে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গেও তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য নষ্ট হইত না। মেয়েরা বিবাহের পর গোত্রান্তরিত হওয়া স্বামীদের বর্ণে প্রবেশ করিত। অর্থাৎ যে বর্ণ হইতেই আসুক না কেন ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাহ্মণই থাকে আর ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী হয় ক্ষত্রিয়। ক্রমাগত এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে ব্রাহ্মণদের চেহারার বৈশিষ্ট্য এখনও সহজেই চোখে ধরা পড়ে।

লাইরিক ইয়েংবুম

ইহারাও পশ্চিম হইতে আসিয়া মণিপুরী সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। উপবীতধারণ ও মন্ত্র দ্বারা ইত্যাদি উপাধি ব্যতীত মণিপুরীদের সঙ্গে আজ আর ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। তখন হইতে আজ পর্যন্ত কেরাণীগিরিই ইহাদের প্রধান কাজ।

লৌহ

ইহারা মণিপুরের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অগ্রসর সম্প্রদায়। ধর্ম এবং চাল চলনে মৈতাইদের মত হইলেও মণিপুরী সমাজের চক্ষে ইহারা অস্পৃশ্য। লৌহ সম্প্রদায় এক সময়ে মণিপুর উপত্যকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত স্বাধীন ছিল; ক্রমশঃ মৈতাইদের দ্বারা বিজিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। অনেক সময় গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত মৈতাইকেও লৌহ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদের সমাজে বাস করিতে বাধ্য করা হইত। মাছ ধরা, লবণ তৈরী, বেশম শিল্প ইত্যাদি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

মুসলমান—মণিপুরের মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। তাহারা এখানে আসার পর মণিপুরী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া এখানেই থাকিয়া যায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মত নিজেদের ধর্মানুমোদিত পোষাক পরিচ্ছদ আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া চলিলেও অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মণিপুরী মুসলমানদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

সমাজে মেয়েদের স্থান—মণিপুরী মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী কর্মঠ। ব্রাউন সাহেব

তাঁহার পুস্তকে (Statistical Account of Manipur —1873) যথার্থই লিখিয়াছেন—"It would be difficult to find a more industrious woman in India than the Manipuri" গৃহকর্ম, বস্ত্রবয়ন, সবজি বাগান, বাজারে ক্রয়বিক্রয় সবত্তই মেয়েরা করে কোন শ্রমকেই তাহারা হেয় মনে করে না। পরিবার প্রতিপালনের অধিকাংশ দায়িত্ব তাহারাই বহন করে। সেইজন্য সমাজে তাহাদের স্থান পুরুষের পাশাপাশি। চলাফেরা, কথাবার্তা বা ব্যবহারে মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। "The women of Manipur are shrewd, capable people, who at all stages of their career are allowed the fullest liberty. They exposed to the risks of infant marriage, or mewed up within the four walls of their houses.....", এলেন সাহেবের এই উক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন নাই। তবে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন থাকায় পারিবারিক জীবনে অনেক মেয়েরই নানা লাঞ্ছনা এবং দুঃখ কষ্ট মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়। বিবাহাদি ব্যাপারে দুই রকমের প্রথাই এখানে চালু আছে। হয় অভিভাবক-পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিয়া থাকেন,—অথবা বরকন্যা পূর্ব হইতেই পরিচয় সূত্রে প্রথিত হইয়া বিবাহবন্ধনে তাহাদের মিলন পাকাপাকি করিয়া লয়। বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ এবং বিধবা বিবাহে সমাজের কোন আপত্তি নাই।

মণিপুরী জীবন যাত্রা—মণিপুরী সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। এক এক বংশের লোকের জন্য নিজেদের পাড়া ভাগ করা আছে। সেই সমস্ত পাড়ায় নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবার এক বা একাধিক ঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে। মণিপুরীরা যে সুরুচি সম্পন্ন এবং সৌন্দর্যবিলাসী তাহা তাহাদের যে কোন পাড়ায় প্রবেশ করিলেই বুঝা যায়। বাড়ীর সামনে এবং দুই ধারে ফুল এবং সবজি বাগান, লেপা পোছা অঙ্গন, ঘরের ভিতরে মাটের উপর সুসজ্জিত বিছানা যথাস্থানে রক্ষিত মাদুর বসা আসন ও অন্যান্য জিনিষ পত্রাদি এসবের মধ্যে একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য এবং শুচিবোধ ফুটিয়া রহিয়াছে। পুরুষরা সাধারণতঃ বাড়ীতে কাচা সাদা ধবধবে ধুতি, সেইরকম একটি সাদা পাঞ্জাবী কাঁধের উপর একটি চাদর এবং কপালে শ্বেত চন্দনের লম্বা তিলক পরিয়া থাকে। মেয়েদের পোষাকেও জাঁকজমক কিছুই নাই। পরনে একটি রঙ্গিন ফানেক, গায়ে কাজ করা সাদা, সবুজ, গৈরিক অথবা কমলা রঙের মিহি একখানা চাদর নাকে শ্বেত চন্দনের একটি সরু রেখা এবং কানে শুধু কনক চাঁপা ফুল এই তাহাদের ভূষণ। রাজপরিবারের অথবা ধনীদের মেয়েরা কখনও কখনও সামান্য স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া থাকেন—কিন্তু সাধারণের মধ্যে উহার তেমন প্রচলন নাই। তথাপি এই অনাড়ম্বর পোষাক পরিচ্ছদের পরিপাট্য দেখিয়া মণিপুরীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। এবিষয়ে ইহাদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্যদের কোন তুলনা চলে না। মণিপুরীগণ তাহাদের আভিজাত্য বোধ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। মলিন বস্ত্র পরিহিত লোক অথবা ভিখারী এখানে প্রায় দেখা যায় না। নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং বস্ত্র মণিপুরেই উৎপন্ন হয়। কৃষি এবং কুটীর শিল্প এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই তাঁত আছে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন বিবাহযোগ্যা মেয়েদের একটি বিশেষ গুণের মধ্যে গণ্য। অর্থের প্রাচুর্য না থাকিলেও অন্ন বস্ত্র সুলভ থাকায় মণিপুরীদের সরল জীবন যাত্রার অভাববোধ তেমন নাই। এইজন্য জীবন সংগ্রামের গুরুভার এখানকার জীবনকে দলিত করিতে পারে নাই। অবসর বিনোদনের জন্য নৃত্যগীত এবং নানা-রকম ক্রীড়া ও উৎসবাদি এখানে বার মাস লাগিয়াই আছে।

আগামীবারে সমাপ্য

ধূম্রকেতু

তুষারশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে চাকরি প্রার্থী বেকারেরা যেখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল সেখানে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল সাধুচরণ। প্রকাণ্ড দু'মহলের বাড়ী যার, মোটর ছাড়া যে রাস্তায় বেরোয় না একপাও, তাকে এমন জায়গায় চাকরি চাতকদের মধ্যে দেখবে এটা আশা করে নি সাধুচরণ।

সাধুচরণ দশ বছর ধরে একটানা কাটিয়েছে আমাদের বাড়ীতে। ওর বাবা ছিল আমাদের কারখানার এক কর্মচারীর বন্ধু। কর্মচারীটি সাধুচরণের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন কাকার কাছে এসে বললে, বড় গরীব বাবু। লোকটি নিজে বুড়ো হয়েছে খেটে খাবার সামর্থ্য নেই, ভরসা ওর একমাত্র এই—সাধুচরণ বলে ছেলেটি। বড়টা কাজ করত আপনার কারখানাতেই কলেরায় মারা গেছে তিন মাস আগে।

কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, রাইচরণ নাম ছিল না তার?

আজ্ঞে হাঁ, এ ছেলেটির একটা কিছু গতি না করলে ভয়ানক বিপদে পড়বে লোকটা, বাবু।

কাকা এবার শুধালেন, বয়স কত ছেলেটির?

সাধুচরণের বাবা ইতস্তত: করতে লাগল কাকার প্রশ্নটাতে। ভেবে বললে, দেখতে ছোট হলে কি হবে বাবু, বাড়ীর যে কোন কাজ করে দিতে পারবে ও। আর না পারে তো জুতোর ঠোক্কর দিয়ে করিয়ে নেবেন, আপনারা আমাদের না বাপ, দোষ করলে গাল দেবেন, আপত্তি করবো কেন বাবু?

কারখানায় কাজ করত রাইচরণের এক কাকা, সেও কলেরায় মারা গিয়েছিল। রাইচরণও ওই এক রোগেই মারা গিয়েছিল, তা না হ'লে সাধুচরণের বাবা সাধুচরণকে কারখানায় ঢোকাবার জন্যেই অনুরোধ করত। কাকা বুঝলেন এটা একটা কুসংস্কার, মনের ধোঁকা একটা ওদের। বোঝাতে গেলেও বুঝবে না কোন কথা। চুপ করে রইলেন গম্ভীর হয়ে।

আপনার বাড়ীতেই ওকে দয়া করে রাখতে হবে হুজুর। শুধু দু'বেলা দুমুঠো ভাত আর—

আর কি?

না, মাইনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারবো না হুজুরের কাছে কিছু। বাড়ীতে রাই-এর বিধবা বৌ আর এই বুড়ো—এদুটো প্রাণীর যাতে অন্ততঃ একবেলাও জোটে।

আচ্ছা সে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে তখন। ছেলেটিকে স্বয়ং পাঠিয়ে দিও দু' চার দিনের মধ্যে আমাদের বাড়ীতে কেমন?

সাধুচরণকে কুড়ি টাকা ক'রে দেওয়া হ'ত আমাদের বাড়ীর কাজ করবার জন্যে। কাজের মধ্যে ছিল ফাই-ফরমায়েস শোনা, দু' একখানা দরকারী চিঠিপত্র দু' চার জনের বাড়ী দিয়ে আসা, দোকানে যাওয়া কিম্বা বাজার করা। কাকার যেতো পায়ে মালিশ করার কাজেই কিন্তু সাধুর খুব সুনাম হয়েছিল কাকার কাছে। কাকা যেহেতু বাড়ীর কর্তা আমরাও বাধ্য হয়েই তাই প্রশংসা করতুম সাধুকে। কারণে অকারণে আমার কাছে সাধুর কদর ছিল দুটো কাজের জন্যে। স্নান করবার আগে সাধু বেশ কায়দা করে তেল মাখিয়ে দিত আমায়। হাত পিঠ পা চাপড়াতো যখন সে তেল মাখাতে লাগাতে, দিব্যি আরাম লাগত তখন। এ ছাড়া যখন তখন সিগারেট আনতে ছোটাতুম সাধুকে। বেশী করে একেবারে টিন বা প্যাকেট কিনে রাখার অভ্যাস ছিল না আমার। তা ছাড়া এ অভ্যাসের দরুণ সাধুর প্রাপ্তিযোগ ঘটত কিছু কিছু। বিড়ি খাবার দুটি করে পয়সা পেত সাধুচরণ—প্রত্যেকবার সিগারেট আনতে ছোটার জন্যে। এক একদিন সিগারেট বকসিস্ দিতে চাইতুম সাধুচরণকে, সাধুচরণ কিন্তু নেয় নি কোনদিন সে সিগারেট।

সাধুচরণ ছিল খুব বেশী কল্পনাপ্রবণ। মাঝে মাঝে বলত সে, লেখাপড়া শিখে আপনি বড়লাট হবেন বাবু। আমাকে তখন কিন্তু মন্ত্রী না করলে ভয়ানক অসুবিধা হবে আপনার। হবে না? যখন তখন সিগারেট আনতে ছুটবে না কেউ এক এই সাধুচরণ ছাড়া।

সাধুচরণ চাকর হলেও আমরা তাকে কেউ চাকরের মত দেখতুম না, মাইনে করা চাকরের মত গায়ে হাত করে কাজ কর্মও সারত না সে।

দশবছর কাটতে না কাটতেই সাধুচরণের বুড়ো বাপ মারা গেল। সাধুচরণ একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী গেল।

একমাস পরে সাধুচরণ ফিরে এসে বললে আমাকে এবার একেবারে ছুটি দিতে হবে বাবু।—আমরা অবাক হ'য়ে গেলুম নতুন কিছু বিপদ হ'ল কিনা সাধুচরণের কে জানে, কিন্তু তা নয়, সাধুচরণ ভ মাসে—তার বাল মরবার আগে পাড়ার একজনকে কথা দিয়ে গেছে সে তার মেয়েকেই বিয়ে করবে সাধুচরণ। যার মেয়ে সে নাকি সাধুকে মার্চেন্ট অফিসের দরোয়ান করে দেবে। সেখান থেকে ৪০৲।৬০৲ টাকা মাইনে পাবে সাধুচরণ, তার উপর পোষাক পাবে, সবচেয়ে বড় কথা মার্চেন্ট অফিসের দরোয়ান হওয়ার সম্মানটা সাধুচরণ বাপের কথা রাখলে, তাই ছেড়ে গেল আমাদের।

এরপর দু'বছর কাটল। অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটল এর মধ্যে। রাজার মধ্যে অনেকেই পথের ভিখারি হ'ল, পথের ভিখারিদের মধ্যেও অনেকে রাজা হয়ে থাকবে হয়তো বা।—আমাদের কারখানায় আগুন লাগল হঠাৎ একদিন। কেমন করে আগুন লাগল, কে লাগাল—সে কথায় লাভ নেই। কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যাকে ভিত্তি করে আমাদের জীবন-মরণ সব কিছু তাই যখন নষ্ট হল—পথে এসে দাঁড়ালুম আমরা।

একটা কিছু না করলে সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়বে বুঝলুম। কাকা অতিকষ্টে স্কুল মাষ্টারি জোটালেন একটা। আমি টুইশানি থেকে কর্মজীবন সুরু করলুম। সরকারি চাকরি মিলতে পারে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে গেলে, এই ভরসায় সার্টিফিকেটখানা নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—এমন সময় সাধুচরণের সঙ্গে দেখা।

আমাকে দেখে সাধু চমকে যাওয়াতে একেবারে বিদ্যুৎ হয়ে গেলুম আমি। লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল মাটির দিকে। চাকরির উমেদারির জন্য এভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে সাধুচরণের সঙ্গে আমি নিজেও ভাবিনি কোনদিন। সাধুচরণ নিজেই রক্ষা করলে আমাকে ভীষণ লজ্জার হাত থেকে।

আপনি বোধহয় এখানকার বড়বাবু হয়ে এসেছেন?

ঘাড়টাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেলাতে হ'ল একদিকে।

চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাধুচরণের।

তাহলে মিথ্যে কেন দাঁড়িয়ে মরচি রোদে। চলুন, আপনার ঘরে গিয়ে বসি খানিকক্ষণ পাখার তলায়। চাপা গলায় সাধু এবারে বলে বসল, কি জানেন বাবু, দেড় বছর ধরে বেয়ারা-গিরি করে এমন বাবু হয়ে গেছি না—

আমাকে বাবু বলে সম্বোধন করতে দেখে সাধুচরণের স্তরের কয়েকজন লোক সসম্ভ্রমে তাকিয়েছিল এতক্ষণ আমার দিকে; এরপর সাধু যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল স্বচ্ছন্দে তখন তারা অবাক হয়ে গেল আরও বেশী।

আত্মরক্ষার জন্যে সাধুর দিকে চেয়ে বললুম—এসো আমার সঙ্গে, গল্প করা যাবে।

একি, আপনার অফিস ঘরে যাবেন না?

আমাকে রাস্তায় নামতে দেখে আরও অবাক হল সাধুচরণ।

না, এখন ঘরে ঢুকলে ভয়ানক বেরী হয়ে যাবে। আমার আবার ডিউটি আছে অন্য জায়গায়। তা—তুমি দরোয়ানের চাকরি ছাড়লে কেন হঠাৎ সাধুচরণ?

জোচ্চর—একেবারে চোরা কোম্পানি বাবু।—আর হ'ল একমাস, তাতে কামাই হওয়ার জন্য দোষ হল আমার, মাইনে কাটা গেল। মারচেন্ট অফিসে কাজ করে সুখ নেই বাবু। গভরমেন্ট অফিসের পিয়ন বা বেয়ারা হওয়ার জন্যে নাম লেখাতে এসেছি তাই এখানে। আপনি যখন রয়েছেন এর ভেতরে—

আছি আর কোথায়! কালই বোধহয় আবার বদলী করবে আমাকে অন্য জায়গায়।

সাধুচরণ হতাশ হয়ে বললে কালই?

সামনে দাঁড়িয়েছিল একখানা বাস। আমি সাধুচরণের সামনে আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করলুম না।

আচ্ছা, এসো তাহলে তুমি, আমার আবার—

বাসে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম সজোরে। দিনটা বৃথা গেল। সকাল আটটায় দুমুঠো ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়েছিলাম—চাকরির জন্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে নাম লেখাবো বলে, কোথা থেকে যমদূতের মত এসে সাধুচরণ সব মাটি করে দিলে।

আলিঙ্গন

মানবেন্দ্র পাল

যদুনাথ ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি আজ ঝাপসা হয়ে গেছে. চামড়া গেছে কুঁচকে ; হাত-পা কাঁপে. লাঠি নইলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। কানেও কম শোনে যেন, কোকলা দাঁতে উচ্চারণও অস্পষ্ট।

তবু সে যদুনাথ ডাক্তার।

রাইগ্রামের অনেক সৌভাগ্য যে, আজও তারা চোখে দেখতে পায় যদুনাথ ডাক্তারকে। আজও তারা গর্ব করতে পারে—যদু ডাক্তার বেঁচে আছে।

আর যদু ডাক্তারের সৌভাগ্য বড়ো কম নয়। বয়েস তাঁকে টেনে এনেছে দুর্লঙ্ঘ্য এই আশীর সীমানায়। কেউ চায় না বড়ো একটা এত বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে। এ বেঁচে থাকা মানেই তো বোঝা হয়ে জায়গা জুড়ে থাকা। পলিতদন্ত, পলিত কেশ, অশক্ত, পরনির্ভর এ জড়পিণ্ডের কী মূল্য আছে ?

কিন্তু যদু ডাক্তারের কাছে এ জীবনের মূল্যও বড়ো কম নয়। তিনি বাঁচতে চান আরও বাঁচতে চান। যত পরনির্ভর হয়ে পড়েন, মনে মনে তত খুশী। ছেলে বৌএর অকৃত্রিম সেবা তাদের পদে পদে সাবধানতা, তাদের স্নেহশাসন-এর লোভ যেন দিনে দিনে পেয়ে বসেছে বুড়োকে।

একটু শীত শীত করলেই কাঁপা ভাঙা গলায় বৃদ্ধ ডাকবেন,—বৌমা !

রান্না ফেলে তখনই ছুটে আসবে কমলা ;—বাবা ডাকছেন ?

মিনমিনে গলায় বৃদ্ধ বলেন—গাটা দেখোতো বৌমা, হঠাৎ শীত শীত করল কেন ?

কমলা তখনই কপালে হাতে দিয়ে বৃদ্ধের উত্তাপ পরীক্ষা করে। না, কিছুই নয়। তবু বলতে হয়—আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন বাবা। আমি বরঞ্চ একটু দুধ গরম করে আনি।

বৃদ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গদগদ কণ্ঠে বলেন—তাই যাও।

কমলা চলে যায়।

দুপুরের দিকে প্রমথেশ রোগী দেখে বাড়ি ফেরে। রাইগ্রামের একমাত্র শিক্ষিত ডাক্তার। বাপের উপযুক্ত ব্যাটা। বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু শরীরের শক্তি অটুট। কাজে কর্মে তেমনি উৎসাহ। এই শরীরের উপর দিয়ে কত পরিশ্রম যায়, তবু কাতর নয়। টাকা উপায় করতে হবে। নাম কিনতে হবে গাঁয়ে সহরে। চওড়া কপালে তাই তার উচ্চাশার জ্বলটিকা ! বৃদ্ধ যদুনাথ পুত্রের কপালের দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেন।

প্রমথেশ এসেই নাড়ী পরীক্ষা করল আগে তারপর ষ্টেথস্কোপ বসিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলে বুকপিঠ। বৃদ্ধ যদুনাথ শিশুর মতো ছেলের হাতে আত্মসমর্পণ করে যেন নিশ্চিন্ত হয়। আরামে চোখ বুজে থাকে

পেছন পেছন কখন কমলাও এসে দাঁড়িয়েছে দুই চোখে তার উদ্‌বেগ।

—কেমন দেখলে ?

প্রমথেশ বললে—খারাপ কিছু নয়

ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

কমলা বললে—আমায় বলে কি হবে ? বাবাকে বুঝিয়ে বলো। আমার কথা তো শুনবেন না। দু' বেলা মোজা না পরেই বাইরে উঠোনে গিয়ে বসবেন। আমি আর কাহাতক নজর রাখি

যদুনাথ তাঁর সদ্যই লজ্জিত মুখ একবার প্রমথেশের

পানে তুলে মৃদুস্বরে বলেন—যা, বেলা যে গড়িয়ে গেল। নাওয়া-খাওয়া করে শেষে দিব্যি পড়িয়ে একটা বাধাবার বাধালি

প্রমথেশ ডাক্তার ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে চলে যায়।

প্রমথেশ চলে গেলে কমলা এগিয়ে এসে বদ্যনাথের গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে দিয়ে বললে—এবার একটু নিজের সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হোন বাবা। আর তো আপনার বয়েস নেই, যে বুঝতে পারবেন।

বদ্যনাথ সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—বৌমা, নাতবৌকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না। অসুখ বিসুখ করে নি তো?

কোথায় যেন আড়ি পেতে লুকিয়ে ছিল বীথিকা। পাগল মেয়ের মতো ছুটে এসে বললে—বালাই ষাট অসুখ করবে কেন?

কমলা একটু সংযত হয়ে বললে—বৌমা, তুমি এখানে বসে একটু গল্প করো। আমি বাবার খাবার যোগাড় করি।

কমলা চলে গেলে বীথিকা বুড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে,—শুনলে তো দাদু, মা কি বলে গেলেন?

বৃদ্ধ হেসে বললেন—শুনলুম তো। বসে বসে তোমায় আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে।

—গল্প করতে হবে না ছাই। কী শুনলে তবে? মা বলে গেলেন—শাসন করতে হবে।

—শাসন করতে! আমায়?

—হ্যাঁ গো, যত বয়েস বাড়ছে তত দুষ্টু হয়ে পড়ছ কি না। কারও কথা শোনো না, দু'বেলা খোঁজা পর না, কেবল—

—কেবল তোমাকে নাতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে কষ্ট দিই না তাই?

লজ্জা পেয়ে বীথিকা হাসিয়ে ওঠে—কের ঠাট্টা দাদু? এখনো কি আর আমার ঠাট্টা শোনার বয়েস আছে? জান কত বয়েস হল আমার?

বৃদ্ধ মুখ চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, কত?

বীথিকা ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে মনে মনে অনেক হিসেব নিকেশ করে বলে—তা একুশ তো বটেই।

—বটে!

—তার ওপর বিয়ে হয়েছে তিন বছর। তার ওপর নোটনই হয়েছে দেখোনা—

হঠাৎ বৃদ্ধ যেন চমকে উঠলেন।—নোটনের সাড়া পাচ্ছিনা কেন নাতবৌ? অসুখ বিসুখ করেনি তো?

বীথিকা ঝংকার দিয়ে বলে—তোমার মুখে কেবলই অসুখ আর অসুখ। অসুখ করবে কেন? বালাই। বুঝতে পারছ না, সপ্তাহে একদিন বাপকে পেয়েছে। এখন কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে বাপের কোলে কোলে।

বদ্যনাথ তেমনিভাবেই যেন একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—কিন্তু আমার কাছে ছোঁড়াটা মোটেই আসতে চায়না।

সুখের সংসার বদ্যনাথের।

এককালে তিনি ছিলেন এই প্রাচীন গ্রামের কর্ণধার। সেদিন তাঁর প্রতিপত্তি যশ খ্যাতি ঐশ্বর্য গ্রামের সকলের বিস্ময়ের এবং গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছিল। তারপর আজ তিনি শ্রান্ত—সংসারযুদ্ধে বিজয়ী ক্লান্ত সৈনিক। তাঁর যোগ্যতার উত্তরাধিকার অপাত্রে পড়ল না। একমাত্র পুত্র প্রমথেশ এগিয়ে এল সেই পথে। এবং অল্পকালেই পরিচিত হয়ে উঠল গ্রামে গ্রামে। সেই পরিচয়ের মূলে রইল আর একটি পরিচয়, সেটা হল বদ্য ডাক্তারের।—গাঁয়ের লোক প্রমথেশকে দেখলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতো—ওই বদ্যডাক্তারের ব্যাটা আসছে গো!

বদ্যডাক্তার যেখানে গিয়ে দাঁড়াতেন সেখানেই বাধত যমে মানুষে লড়াই, বদ্যডাক্তারের ব্যাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় সেখানে টেকে না যমের বড়াই।

কপাল গুণে কমলা এল এই সংসারে,—সে আজ অনেকদিন আগের কথা। মূর্তিমতী কমলাই যেন এলেন। ডাক্তারের সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে উঠল।

একে একে তিন ছেলে হল কমলার। বড়ো ছেলে সুজিত, এম-এ পাস করে চাকরি পেয়ে গেল কলকাতায় কোন এক সদাগরি অফিসে ভালো মাইনেতে। সেই সুজিতেরই বৌ বীথিকা। ফুলফুরির মতো হালকা হাসি ভরা মুখ, শরতের আকাশের একটুকরো সাদা মেঘের মতো নিরভিমান, নিরহংকার চটুল চপল গতি। বৃদ্ধ স্বামীর ডাক্তারের সঙ্গে তাই তার বড়ো ভাব। কমলা আসে শান্ত গাম্ভীর্যভরা উৎকণ্ঠা আর সেবা নিয়ে বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধের তাও ভালো লাগে। আবার বীথিকা আসে দৌরাত্ম্যভরা কলকাকলি নিয়ে—বৃদ্ধ কাঙালের মতো তারও পথ চেয়ে থাকেন বৈকি।

যদু ডাক্তারের সুখের অভাব নেই। তাই তিনি বেঁচে সুখী হতে চান।

কিন্তু কেউ জানে না, যদু ডাক্তারের মনের গোপনে তবু একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে;—একটা ব্যর্থতার গ্লানি।

নোটন বড়ো হচ্ছে।

নোটন বড়ো হচ্ছে আর সেই সঙ্গে তার স্বাস্থ্য লাবণ্যের সঙ্গে মিশে একটা অপূর্ব কমনীয়তার স্তরে উঠছে। দু বছরের দামাল শিশু টলমল্ করে হাঁটে, অস্ফুটস্বরে কত কি কথা বলে। কখনো পড়ে যায়, কখনো হোঁচট খায়, কখনো ছুটে যায় ছাগল ছানার পিছু পিছু। যে যখনই চোখের সামনে নোটনকে পায় তখনই একবার জোর করে তুলে নেয় বুকে। তারপর অন্ততঃ একটা চুমু দিয়ে ছেড়ে দেয়।

দু বছরের শিশু কোলে চ'ড়ে আদর খাবার লোভের চেয়ে ছুটোছুটির মধ্যে অনেক আনন্দ পায়। তাই তাকে ধরে রাখা দায়।

বৃদ্ধ যদুনাথ ঘরের বাইরে একটা জল-চৌকির ওপর বসে থাকেন। কার্তিক মাস থেকেই তাঁর গায়ে ফুল হাতা সোয়েটার, তার ওপর গরম কোট, গলায় মাফলার, পায়ে মোজা। কোলের ওপর রূপোর বাঁটওলা মোটা লাঠি। চুপচাপ বসে থাকেন, কখনো মনে মনে পুরনো সেকালের গানের সুর ভাঁজেন, কখনো স্তব আবৃত্তি করেন। হাত কাঁপে কিন্তু চোখের কাপসা দৃষ্টি সজাগ।

—ওপো বৌমা, ছাগল ঢুকল বাগানে। দেখো।

—ও নাতবৌ, বড়িগুলো সরাও, ছায়া পড়ল যে।

রান্নাঘরে বৌ নাতবৌ সবাই তটস্থ, কখন কি আদেশ হয়।

এমনি সময় হঠাৎ হয় তো সেখানে নোটনের আবির্ভাব। জাঙিয়া পরা নয়, গায়ে শুধু একটা ছিটের সার্ট। চুলগুলো এলোমেলো চোখের কাজল বেবড়ে গিয়েছে। নোটন একটা বল নিয়ে ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে।

ওমনি বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—বুকখানা কেমন চন্ চন্ করে ওঠে। তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকেন,—এসো, নোটনবাবা এসো।

কিন্তু বৃদ্ধের স্বর ভেঙে যায়। ভালো করে শোনা যায় না। নোটন কোনো সাড়া না দিয়ে খেলতে খেলতে দূরে সরে যায়।

কতক্ষণ বৃদ্ধ সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন। ওই এক-টুকরো ভাঙা প্রাণকে বুকের মাঝে আলিঙ্গন করবার জন্যে যেন তাঁর চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু ছুটে গিয়ে যে ধরবেন সে সাধ্য নেই।

এমনি সময়ে বীথিকা এসে এক বাটি মুড়ি দিয়ে যায়। বৃদ্ধের মুখ খুশিতে ভরে ওঠে।

বীথিকা মুড়ি রেখে চলে যাচ্ছিল, বৃদ্ধ ডাকলেন—নাতবৌ, নোটনকে একবার নিয়ে এসোনা।

একটু আপত্তির সুরে বীথিকা বললে—ও কি আসবে? যা ছেলে! তা ছাড়া এলেই এখুনি তো তোমায় বিরক্ত করবে দাদু।

বৃদ্ধের মুখে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। বললে,—তা করুক, তুমি ওকে ধরে নিয়ে এসো।

হাসি পেল ডাক্তারের। হায়রে! ওই বিরক্তিটুকুর লোভেই তো কত ভাগ্য নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু আমায় বিরক্ত করে কই ছোঁড়াটা?

বীথিকা নোটনকে ধরে নিয়ে এল দাদুর কাছে। দামাল দস্যি ছেলে বাগানে একগাছ ফুলের মধ্যে একটা নতুন খেলার সন্ধান পেয়েছিল এমনি সময় মা তাকে আনল ধরে।

চীৎকার করে কান্না কিন্তু বৃদ্ধ ডাকল—নোটনবাবা!

চোখ তুলে তাকাতেই নোটন দেখল একবাটি মুড়ি। তখনই এক মুঠো তুলে নিল। কান্না ভুলে গেল সেই সঙ্গে।

বীথিকা হেসে বললে—বাঃ দাদু, তুমি তো বেশ ফাঁদ পাততে শিখেছ।

বৃদ্ধ তার কোনো উত্তর দিলেন না। তখন কোলের লাঠিটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কম্পিত দুর্বল পায়ের ওপর ভর ক'রে দেওয়াল ধ'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। হাত দুটো কাঁপছে থর থর করে।

বীথিকা বিস্মিত হয়ে খপ্ করে বৃদ্ধের হাত ধরে ফেলে বললে—ওকি হঠাৎ উঠছ কেন নিজে নিজে?

একটু যেন অপ্রতিভ হ'য়ে গেলেন বৃদ্ধ। বললেন—না, এই একটু দাঁড়াচ্ছিলাম। নোটনকে একবার কোলে নিতে পারি কিনা দেখছিলাম।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন।

বীথিকা বৃদ্ধ ধনক দিয়ে গালে হাত রেখে বললে, —ওমা! কী আছেল তোমার দাদু! তোমার এই শরীর, তুমি নিতে চাও নোটনকে কোলে? তোমার কি জ্ঞানরতি হচ্ছে? গায়ে কি শক্তি আছে যে ছেলে কোলে করবে?

বীথিকা আর দাঁড়ালো না। তখনই নোটনকে কোলে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু বৃদ্ধ বসে রইলেন সেইখানেই। দেখলেন, কেমন স্বচ্ছন্দে নোটনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল নাতবৌ! নোটন তাঁর কেউ নয়,—তাকে কোলে ক'রে আদর করার অধিকারও নেই, শক্তিও নেই।

শক্তি নেই!

যে দীর্ঘশ্বাস এখনই বৃদ্ধের বুক থেকে বেরিয়ে গেল, জোতে বেদনায় সেই নিশ্বাসই যেন বড় হয়ে ফিরে এল। সে ঘূর্ণিবায়ুর ঝড়ে বৃদ্ধ আত্মহারা হয়ে পড়লেন, ভুলে গেলেন তাঁর এই কঠোর বর্তমান—ভুলে গেলেন তাঁর এই জরাজীর্ণ দেহভার। মনে হল, এক নিমেষে এই ঘূর্ণিবায়ুর মাঝে যেন ছিটকে এসে পড়েছে প্রায় চল্লিশ বছর পেছনের এক অবিস্মৃত অধ্যায়।

.....ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন যদুনাথ ডাক্তার। শক্ত তেজী ঘোড়া—শক্ত সওয়ার। মাইলের পর মাইল ছুটছে। একখানা দুখানা করে তিন তিনখানা গাঁ পেরিয়ে তবে রোগীর বাড়ি। এ তল্লাটে এক যদু ডাক্তার ছাড়া এমন কেউ নেই যে লড়তে পারে যমের সঙ্গে। তাই যদু ডাক্তারের দয়ার জন্যে কত আকুতি—কত সাধ্যসাধনা।

যদু ডাক্তার রাশভারী লোক। কথা বলেন কম। তবু হৃদয় আছে। গায়ে আছে শক্তি।

—কোন্ গাঁ, ঠাকুরতলা?

—আজ্ঞা হাঁ ডাক্তারবাবু।

—কত পথ হবে?

—তা তিনটে গাঁ পেরিয়ে—

—ক্রোশ পাঁচেক। আচ্ছা কাল ভোরে বেরোব।

রোগীর লোক ভয়ে ভয়ে হয়তো বলে যে, সেও না হয় থেকে যাক এইখানেই—পরের দিন সকালে এই গোরুর গাড়িতে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাবে।

যদু ডাক্তার সে কথা শুনে মৃদু হেসে বলেন—তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আমি যাব কাল ঘোড়ায়। যাব আর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরব।

তাই যদি না ফিরতে পারেন তাহলে আর শক্তির মূল্য কি? গোটা একটা দিনই যদি এক জায়গায় কাটিয়ে দিতে হয় তা হলে এগাঁয়ের ওগাঁয়ের আর পাঁচটা রোগীর ব্যবস্থা করবে কে?

পরের দিন প্রত্যূষে উঠেন ছোলা গুড় আদা চিবোতে চিবোতে যদু ডাক্তার লাফিয়ে ওঠেন ঘোড়ার পিঠে।

ফুল সার্টের ওপর ঢাল কোঁচা মেরে কাপড় পরা, তার ওপর গলাবন্ধ কোট, পায়ে মোজা, ভারী বুট। ঝড়ের মতো উড়ে চলেছেন যদুনাথ ডাক্তার এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। ধুলোয় সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে—কপালের দুপাশের কোঁকড়ানো অল্প চুল মলিন হয়ে উঠেছে।

ওমনি একদিন ভোরে বেরিয়েছেন যদু ডাক্তার। যাবেন খয়রামারী। ঘোড়া ছুটছে। আঁকা বাঁকা এবড়ো খেবড়ো পথ। তখনো সূর্যোদয় হয়নি। গাছের ফাঁকে পুব আকাশের লালিমা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, মোরগ ডাকছে মোল্লাপাড়ার আনাচে কানাচে।

হঠাৎ একটা সাঁকোর ধারে এসে শুনতে পেলেন একটা চাপা গোঙানি। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন ডাক্তার। বেশি খুঁজতে হল না! সাঁকোর ঠিক নীচে কাদার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। দেখে, হতভাগ্যের মাথা কেটে রক্ত ঝরছে তখনো। বুঝলেন, ডাকাতের লাঠি পড়েছে মাথায়। তখনই একবার নাড়ী পরীক্ষা করলেন; বুঝলেন ঘণ্টা দু'এক আগের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। পথিকের তখন জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

কী করবেন? একা এ অবস্থায় একে কোথায় রাখেন? মিনিট দুয়েক কী ভাবলেন ডাক্তার। একবার পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে নাড়ীর গতি মিলিয়ে নিলেন। তারপর কাঁধে করে সেই মানুষটাকে নিয়ে সাঁকোর ওপর উঠে এসে চড়লেন ঘোড়ায়।

ঘোড়ার পেটে ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা গুঁতো দিলেন। ঘোড়ার মুখ ফিরল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল বিপরীত দিকে কাঞ্চনতলার পানে—তা ক্রোশ তিনেকের পথ তো বটেই।

খয়রামারীতে ডাক্তারবাবুর এসে পৌঁছবার কথা ন'টার মধ্যে। যদু ডাক্তারের যেমন কথা তেমনি কাজ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তালে চলে তাঁর প্রাত্যহিক চলাফেরা।

খয়রামারীর লোক রোদের পানে তাকাচ্ছে আর ধুলো ভরা পথের পানে চাইছে—ডাক্তারবাবুর ঘোড়া দেখা যায় কি না।

এই বোধহয় প্রথম ব্যতিক্রম ডাক্তারের! খয়রামারীতে এলেন প্রায় কুড়ি মিনিট দেরিতে। রোগীরা সময়ের সেটুকু খেয়াল ধরতে পারল না। কিন্তু যদু ডাক্তার ঘড়িটা বের করে নিয়ে নিজেই লজ্জিত হয়ে বললেন—ওঃ বড্ড দেরি হয়ে গেল ভাই! কী করব কাঞ্চনতলার হাসপাতাল ঘুরে আসতে হল যে।

যদু ডাক্তার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। কোথায় গেল সেই সব দিন—সেই স্বাস্থ্য—সেই শক্তি—সেই আত্মপ্রত্যয়! হায় নাতবৌ তার সে চেহারা দেখল না। আজ সেদিনের কথা বললে বিশ্বাসও করবে না। অবিশ্বাসের হাসি হেসে সোহাগ করে গলাটা জড়িয়ে ধরবে শুধু।

তাই ভাবেন ডাক্তার—থাক্ থাক্, চাপা থাক্। সে-সব ইতিহাস চাপা থাক আজকের জরাজীর্ণ কংকালের নীচে।

কিন্তু তবু যে নিস্তার নেই। এক এক সময়ে বুকের এই জীর্ণ খাঁচার নীচে পাঁজরে পাঁজরে ঠোকাঠুকি লেগে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তখন আর ঘুমন্ত অতীত যেন চুপ ক'রে থাকতে পারে না। একটা উত্তেজনার মুহূর্তে সেই শক্তি মত্ত হয়ে জেগে ওঠে,—তখনই ডাক্তার কাঁপতে কাঁপতে লাঠিটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যান—তখনই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চান ওই নোটনের ছোট্ট শরীরটুকু। কিন্তু পারেন না।

সত্যিই আশি বছরের যদুনাথ ডাক্তার পেরে ওঠেন না দু বছরের একটা শিশুর সঙ্গে! কোথা দিয়ে পিছলে ছুটে পালিয়ে যায়, কেমন একরকম সমস্ত দেহটাকে শর সোজা ক'রে কোলে তোলার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে, একটা বিরক্তির ভিংকার চোখে মুখে ফুটিয়ে গড়াতে গড়াতে সরে যায়—বৃদ্ধ ডাক্তার আর তার নাগাল পান না।

কত অনুনয় বিনয় করেছেন বৃদ্ধ, কত প্রলোভ

দেখিয়েছে কিন্তু নোটন ভোলে নি। কি জানি কিছুতেই সে ধরা দেয় না যুদ্ধের কাছে। হয়তো এইটাই শিশুর স্নেহের জন্যে কাঙালপনা সেখানেই বিরক্তি। আর যেখানে শাসন সেইখানেই শিশুর মত বাড়না। চেয়ে কঠোর শাসক শিশুর জীবনে নেই অথচ সেই মায়েরই কোলটুকুর জন্যে তার কি ব্যাকুলতা!

ছ'বছরের শিশুর কাছে যদুনাথ ডাক্তারের এই পরাজয় প্রতিদিনের বিফল হচ্ছে। ঈর্ষা নয়, ক্রোধ নয়, গ্লানি নয় শুধু ব্যর্থতার একটা আঘাত—প্রাচুর্যময় স্নেহের একটি অব্যক্ত অক্ষম প্রকাশ দিনে দিনে বৃদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে চলল অসহিষ্ণুতার আবর্তে।

বৃদ্ধ বসে বসে ভাবেন আর চেয়ে থাকেন উঠোনের কোণে যেখানে নোটন খেলা করে ছাগলছানার সঙ্গে, দোল খায় পাশের বাড়ীর তেরো বছরের মেয়ের গলা ধরে।

সেদিন বাড়ীতে কর্মচাঞ্চল্য। ভোর হতেই কমলা আর বীথিকা উঠেছে। রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে অত্যন্ত অসময়ে। সকাল থেকেই সোরগোল। আরও একজন ঠিকে ঝি এসেছে।

নোটন ঘুম থেকে উঠতেই হাড়াকাড়ি। এ কোলে নেয়, ও চুমু খায়, কেউ হয়তো মাথায় চুলে হাত বুলোয়।

শুক্তিত এসেছে কাল, অসময়ে ছুটি নিয়ে একদিনের। প্রমথেশ তাকে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, কমলা বদলে—আজ তাড়াতাড়ি ফিরো। পাঁচজন আসবে তো!

—কে কে আসবে বৌমা? বৃদ্ধ বিছানা থেকে আধ-শোওয়া হয়ে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কমলার কানে সে কথা গেল না। আজ তার নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

—ও নাতবৌ, শুনছ?

রান্নাঘর থেকে জবাব এল—কেন দাদু?

—ওরে কে আছিস নোটনকে একবার নিয়ে আয় না। একবার সাজ তার দেখি ভালো করে।

কিন্তু নোটন আজ দুর্লভ। আজ সে কখন কার কোলে ঘুরছে বলা যায় না।

যায়।

বিকেল ফুরিয়ে এল। লোকজন খাওয়া দাওয়া করে চলে গেছে। একটু আগে বাড়ীর মেয়েরা খাওয়া শেষ করেছে।

আজ নোটনের দু'বছর পূর্ণ হ'ল। নোটনের জন্মদিন।

প্রমথেশ নাতির জন্মদিনে যথেষ্ট খরচ করেছে। যথেষ্ট পোষাক দিয়েছে নোটনকে, আর সেই সঙ্গে পরিয়ে দিয়েছে গলায় একটা সিনির লকেট দেওয়া হার। কর্ণা গলায় সোনার রঙ চিক্ চিক্ করছে। কিন্তু যদুনাথ ডাক্তার—

যদুনাথ ডাক্তার সত্যিই হতভাগ্য। আজ এই তাড়াহুড়ো আর ভিড়ের মাঝে কেউ আসে নি তার কাছে নোটনের হাত ধ'রে জন্মদিনের উপহার নিতে। এমনকি আশীর্বাদ করাও হয় নি।

আশ্চর্য! বীথিকারও কি উচিত ছিল না; নোটনকে একবার নিয়ে আসা আজকের এই বিশেষ দিনে। কোনো দিন তো নিজে থেকে উৎসাহ করে নিয়ে আসেই না নোটনকে। তাইতো নোটন এড়িয়ে চলে। তাইতো নোটন আজও চিনল না তাকে।

সেই অভিমানে বৃদ্ধ আজ আর পান নি ভালো ক'রে। অমন যে পায়েস, তাও মুখে দিল না। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখ এই যে, কেউ টের পেল না তার অভিমান; নাতবৌ এলনা একটিবারও তদারক করতে—খাওয়া কেমন হ'ল।

যে এল সে নতুন ঠিকে ঝি। ঝিটি মুণ্ড পায়েস এঁটো থালার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল স্বচ্ছন্দে।

বৃদ্ধ অভিমানে শুয়ে রইলেন সারা দুপুর বিকেল বালিশে মাথা গুঁজে।

সন্ধ্যের অন্ধকার কখন বৃদ্ধের ঘরে ঘনিয়ে এসেছে—কখন কে এসে সন্তর্পণে হ্যারিকেন জেলে দরজার একপাশে রেখে দিয়ে গেছে। বৃদ্ধ টের পান নি। হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ হ'ল—কি যেন একটা লাফিয়ে পড়ল বিছানায়। পরক্ষণেই একটা খিল খিল হাসি।

চমকে উঠল বৃদ্ধ—একটা বেড়াল শুয়ে তাঁর বিছানায়

উঠে পালিয়ে গেল জানালার দিকে।

সামনে একটা লাঠি হাতে ঠেঙে এসেছে

হঠাৎ বৃদ্ধের স্তিমিত দৃষ্টি ঘরের সেই মোলাটে আলোয় চক্ চক্ করে উঠল। কোঁকড়ানো চুল থেকে ঝুলছে একটা টিক্‌লি—সিল্কের একটা সার্টের ওপর চিক্ চিক্ করছে সোনার হার, চোখের কোলে কালো কাজল—পরণের প্যান্ট নেমে গিয়েছে পেটের নীচ পর্যন্ত। একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নোটনের সর্বাঙ্গ যেন টল্‌মল্ করছে, টল্‌মল্ করছে তার ছোট্ট শরীর বেয়ে অপূর্ব সুষমা।

কয়েক মুহূর্ত বৃদ্ধ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অকস্মাৎ তাঁর দুই চোখের মণি জ্বলে উঠল একটা অদ্ভুত উত্তেজনায়। জেগে উঠল তাঁর এই জরাকীর্ণ কাঙ্কালের নীচে সেই বুনন্দ অতীতটা। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগল—আগুন জ্বলল পেশীর নীচে শিরায় উপশিরায়। কোথা থেকে পল্লীপ্রান্তরের উঁচু নীচু ধূলোওরা পথ বেয়ে এসে দাঁড়ালো এক অশ্বারোহীর অশরীরী ছায়া। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ছায়া যেন এগিয়ে এসে দু' হাতে তুলে ধরল বৃদ্ধের অস্থিচর্মসার দেহ। সেই আকর্ষণে বৃদ্ধের চেতনা লোপ পেল থাকবার মুহূর্তও পেলেন না—তাঁরবার সময় পেলেন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন। পা দুটো করে—সমস্ত দেহ করছে টল্‌মল্,—খাটের চাদর বিছানা থেকে মাটিতে লুটোচ্ছে—মাথার বালিশ পড়ে গিয়েছে কখন। বৃদ্ধ জাপটে ধরতে গেলেন নোটনকে। তিন পাথরের মতো দুখানা হাত কাঁপছে—কাঁপছে তবু ধরা চাই নোটনকে। ওরস্ত বড়ো দুই ছেলে, তবু পালিয়ে বেড়ায়।

—নোটন বাবা! একটা চাপা স্বর ঘোড়ানির মতো বৃদ্ধের কণ্ঠনালী বেয়ে উঠে এল। পরক্ষণেই একটা শব্দ।

বাইরে ছুটোছুটি চেঁচামেচি শুরু হ'ল।

—কে পড়ল? কে পড়ল!

নোটন পড়ে নি। ছোটো ছোটো পায়ে ছুটতে ছুটতে এসে হঠাৎ জাপটে ধরেছে মাকে। খিল খিল করে হাসছে। যেন এটুকি কি একটা মজার খেলা হয়ে গেল ওই ঘরে।

মোহিতলালের দৃষ্টিতে উর্বশী

শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী

'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে কবি সমালোচক ৺মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার রসপরিবেশনের সূক্ষ্ম কুশলতা সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। (নিবন্ধ—বিহারীলাল চক্রবর্তী—পৃঃ ৪২—৪৯)। মোহিতলালের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পর তাঁর প্রবন্ধ সম্বন্ধে সমালোচনায় অগ্রসর হওয়ার সপক্ষে আমার দিবার মত মাত্র একটিই কৈফিয়ৎ আছে।—উপরি উক্ত গ্রন্থটি এতদিন দেখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারি নাই তবে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ একে একে দেখিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছি।

আসল প্রশ্নে আসা যাক; আচার্য মোহিতলালের অভিযোগ, কবিতাটির প্রথমাংশে কবি উর্বশীকে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী' রূপে ব্যক্ত করিয়াও কবিতার শেষাংশে বর্ণনার ধারায় ভাবসঙ্গতি রাখিতে পারেন নাই। 'উর্বশীর যে-চিত্র এখানে ফুটিয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্য-লক্ষ্মী কামনা-লক্ষ্মী• রূপেই দেখা দিয়াছে।'

উর্বশীকে কামনা-লক্ষ্মীরূপে চিত্রিত করায়ও তাঁহার আপত্তি নাই, কারণ তাহাই উর্বশীর সহজতম রূপ—'কিন্তু উর্বশীকে কবি আদর্শ সৌন্দর্যের আদি প্রতিমারূপে কল্পনা করিয়া এমন সকল চিত্র ও বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন যে তাহাতে স্ববিরোধী ভাবের সমাবেশ হইয়াছে।' সহজ কথায়,—তিনি বলিতে চাহিতেছেন, উর্বশীর মধ্যে সৌন্দর্য-মূর্তির পূর্ণ রূপ দিতে গিয়া কবি ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার 'মূল-কল্পনা বিচলিত' হইয়া তাহার মধ্যেকার কামনার স্তুতিতে অনাবশ্যকরূপে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কারণ, 'বিষভাণ্ডের ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে খাঁটি সৌন্দর্যানুভূতি আসিতে পারে না।' অথবা, 'এ উর্বশী লক্ষ্মীও নয় (!), বেদপুরাণের উর্বশীও নয়, অথবা রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টিও নয়; এ-উর্বশী কাল-জননী (তুলনীয়—নহ মাতা, নহ কন্যা) গ্রীক্ দেবী Aphrodite-এর নব্য-য়ুরোপীয় রোমান্টিক সংস্করণ'।

রবীন্দ্রনাথ মানসলোকে যাহা ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন, বাস্তবক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়াছেন, এ-কথা চিন্তা করাও কঠিন। তবে, রসসৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা এ-প্রশ্নের উত্তরে আসার পূর্বে 'উর্বশী' কল্পনার মূলকথা সম্বন্ধে দুটি-একটি যুক্তির উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। উক্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—উরু (মহৎ)—অশ্ (বশীভূত করা)+ক (কর্তৃ)+ঈপ্ (স্ত্রী। মহৎকেও বশীভূত করে যে নারী (মোহিনী?) তাহার প্রকৃত স্বরূপটি সুধী পাঠককে কল্পনা করিতে অনুরোধ করি। (তুলনীয়—'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল')। মাতা কন্যা বা বধূর পক্ষে মহৎকেও বশীভূত (!) করার প্রশ্ন আসে কি? দেবরাজ ইন্দ্রের ধর্ম-সহচরী হইয়াও যে-নারী তৎপুত্র অর্জুনকে প্রণয়ীরূপে কামনা করে, তাহার আদিরূপ কল্পনায় কমলালক্ষ্মীকে বাদ দিয়া সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর শুচিস্নিগ্ধ প্রতিমা কল্পনা কি রসসৃষ্টির দিক হইতে অধিকতর সমীচীন হইত? মোহিতলালের অভিযোগ, উর্বশী-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের নব্য-য়ুরোপীয় রোমান্টিক সংস্করণ। তাহারই উত্তরে এই কথা বলিলাম। যদিও কবিতা রচনায় খাঁটি রোমান্টিসিজ্‌ম

• 'কামনা-লক্ষ্মী' শব্দটিকে সাহিত্য সৃষ্টিতে অনিষ্ট-প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ বলে মনে হয়। কামনার কলুষ যেখানে বর্তমান, লক্ষ্মীর কল্পনা সেখানে মর্ম-পীড়াকর নহে কি? —লেখক।

য়ুরোপীয় সাহিত্যেরই দান—একথা আমরা অস্বীকার করি না।

'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে'—কি Swinburneএর—

And the waves of the Sea as she Came
Clove and the foam at her feet
Fawning'—হইতে ধার করা?

'তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত॥—

উদ্ধৃতিদ্বয়ের মধ্যে ভাবসাম্য আছেই। অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে সাম্য বাণীতীর্থের একই পথের পথিক দুই বন্ধুতে হঠাৎ দেখা হওয়ার মত—কাব্য সাগর-সঙ্গমে দুই প্রাণ-প্রবাহিণীর একই জলধারার সাথে মিলনের মত স্বতঃ-উৎসারিত। Swinburne-এর ভাবানুকরণ রবীন্দ্রনাথে সম্ভব নহে। সেক্সপীয়র বা শেলী-বায়রন্ প্রমুখ মহারথীদের কথা হইলে বরং চিন্তা করিবার অবকাশ ছিল।

আরও যেমন—

The light of thy bosom as fire
Between the wheel of the sun
And the flying flames of the air?

অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের "তব স্তনহার হ'তে সভাস্থলে (দিগন্তরে!) খসি' পড়ে তারা"—মনে হয়, লিপি চাতুর্যে তাৎপর্যতর (suggestive)। অবশ্য, মোহিতলাল অন্যত্র একথা স্বীকারও করিয়া গিয়াছেন—এ সকল যুক্তিই আসল অভিযোগের পাশকৌড় উত্তর circumstantial evidence) মাত্র। আমার বক্তব্য এই নয় যে Swinburne-এর ভাবরাজ্য হইতে রবীন্দ্রনাথ উর্বশী তথা সৌন্দর্য-লক্ষ্মী ধার করেছেন। উক্ত কল্পনায় ভারতীয় বেদ পুরাণ যে ধারণার নির্দেশ দেয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন অনন্যসাধারণ লিপি কুশলতায়। হইতে পারে, সৌন্দর্য বিচার পদ্ধতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে বর্তিয়াছে. ইতিহাসকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা যখন কাহারও নাই। মোহিতলালের অভিযোগ নির্ভুল হইলে, শিবসুন্দর রূপের অপেক্ষা কামনা উদ্ভূত রূপের প্রাধান্য কবিতাটির রস সৃষ্টির পথ ব্যাহত না করিয়া বরং রস পরিবেশন বাস্তবধর্মী হইয়া গাঢ়তর প্রকাশের আবেদন আনিয়াছে। কারণ, উর্বশী উর্বশীই—ইন্দ্র তাহার নিধুবন সঙ্গী. পুরুরবা তাহাকে মানবীরূপে বিবাহ করেন, কিন্তুর তপোভঙ্গ মানসে তাহার ভাঙ পড়ে, তাহার বিবসন মূর্তি দর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলিত হইয়া অগস্ত্য-বশিষ্ঠাদি-ঋষির জন্মদান করে উর্বশীর সহিত জন্য জননী সম্বন্ধে—আবার ইন্দ্রপুত্র অর্জুনও তাহার একথা কামনীয় হয়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, Aphrodite রচনা গৌরবে swinburne রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হইতে পারেন, কিন্তু পথিকৃৎ নহেন।

মোহিতলাল একাধারে কবি এবং সমালোচক—সূক্ষ্ম রসবোদ্ধা। তাঁহার অনুভূতি আমাদের ধারণার বহু উর্ধ্বে। তবু রসসৃষ্টি সম্বন্ধে যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, অসংকোচে তাহাই বলিবার স্বাধীনতা চাহিতেছি মাত্র—আমার উপলব্ধি অভ্রান্ত না হইতে পারে এবং রসসৃষ্টির ব্যাকরণও অঙ্কশাস্ত্রের মত বিধিবদ্ধ নহে, গৌরচন্দ্রিকায় এইটুকু গাহিয়া রাখি। তাঁহার সমালোচনার মাধ্যমে সাধারণভাবে কিছু কিছু পরিপাকের অসুবিধা অনুভব করিয়াছি, আর তাহার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আলোচ্য কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন. তাহা নিশ্চয়ই মোহিতলালের সন্ধানী দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। ভাবসঙ্গতি রক্ষার অনুরোধে এবং পাঠকগণের অনুস্মৃতির সুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বলা বাহুল্য আলোচনাটি কবির লিখিত একটি পত্রাংশ (২৯।২।১৯০৩)।

'মনে রাখতে হবে উর্বশী কে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়. সে স্বর্গের নর্তকী; দেবলোকের অমৃতপাত্রের সখী। দেবতার ভোগ নারীর হাসে নিয়ে

নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। তোক না সে দেহের সৌন্দর্য কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এইরূপ সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহ সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অনবদ্যতার উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চির যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নে অবিমিশ্র মাধুর্য।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড

অথবা সে নিছক নারী—মাতা, কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই —নারীর সৌন্দর্য মূর্তিই উর্বশীতে প্রকাশ।

যে নারীকে চিরন্তনী এক নারী সত্তাই আমাদের কল্পনার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন কবি অলোকসামান্য ভাষা ভঙ্গিমায় 'কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।' মাতা, কন্যা, জায়ার মধ্যে যে সেবা ও কল্যাণহস্তের এষণা, তাহা উর্বশীতে সম্ভব নহে। 'তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নহি আলো সন্ধ্যা দীপখানি।' —এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

'বিলাতের ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে খাঁটি সৌন্দর্যানুভূতি আসিতে পারে না।' —এই উক্তি কি নিরবচ্ছিন্ন সত্য? রসজগতে যাতায়াত করে যে সব নায়ক-নায়িকা শিল্পীর লেখনী মারফৎ, তাহারা বিলাতের ভয়ে কত হস্ত দূরে সরিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রসস্রষ্টার জগতে বিলাত দেখিয়া ভয় বাসা বাঁধে কি? শিল্পী নায়ক-নায়িকার হাতে বিষপাত্র তুলিয়া দেন নির্বিরোধে—'রোমিও ও জুলিয়েট' এতটুকুর তুলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করিয়া বসে চরমতম বিয়োগান্ত রচনার স্বতঃপ্রবাহে, কিন্তু মহাকবি সেক্সপীয়র পূর্ব হইতে সে বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ। শিল্পীর সৃষ্টিজগৎ সাধারণ হইতে বিভিন্ন। সুতরাং এই বালুকা-ভিত্তি-সম্বল উক্তি স্বীকার করি কোন দৃঢ় পাথর বাটীর উপর দাঁড়াইয়া!

প্রসঙ্গক্রমে মোহিতলাল বলাকার 'দুই নারী' কবিতায় উর্বশী ও লক্ষ্মী দুই রূপের প্রতি ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়াছেন এই কবিতাটি নাকি সৌন্দর্য বিচারের কষিপাথরে কষিত-কাঞ্চন, অর্থাৎ নিখাদ। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। তবুও বলা প্রয়োজন, যতদূর মনে পড়ে 'চয়নিকা'র অতি পুরাতন সংস্করণে কবিতাটি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে বর্জিত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বসংকলনে 'কল্পিতা'র ইহা স্থান পায় নাই। কিন্তু উর্বশী কায়েমী আসন দখল করিয়াছে উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু সেখানেও তো—

'একজন-তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্যে অগ্নিরসে কামনার সুরাপাত্র ভরি'

'নিদ্রাহীন যৌবনের গানে' দুহাতে ছড়াইতেছে। 'সুরাপাত্র'কে তো সমালোচক কোনক্রমে 'সুধাপাত্র' করিয়া নীতিবোধকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন না। তবুওতুই ছাড়পত্র দিয়া দিলেন। তবে 'বিলাতের' আপত্তি আসিল কেন? 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তাঁহার চোখে পীড়া জন্মাইতেছে, কিন্তু 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উর্বশী' হৃদয়ে চঞ্চল লেশ নাই। 'তেমনি কটাক্ষ-পাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল'—যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মুকুলিকা বালিকা বয়সী' উর্বশীর—

'আঁধার পাথার তলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা।'

—এ তথ্যের সন্ধানেও লেখনীকে বাস্ত করিয়াছেন।

'জীবন মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে, অনন্তের পূজার মন্দিরে' (দুই নারী) সেখানে যিনি স্থান দখল করিয়াছেন, সে জনা স্বৈরিনী উর্বশী নহেন—'লক্ষ্মী সে কল্যাণী, বিশ্বের জননী তাঁরে জানি।'

নারীর দুইটি বিভিন্ন রূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন—'মেয়েরা দুই জাতের···। একজাত প্রধানতঃ মা, আর একজাত প্রিয়া। কড়ুর সঙ্গে তুলনায়, মা হলেন বর্ষা কড়ু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে যেন বিগলিত ক'রে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত কড়ু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার

মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে ঢেউ, পৌঢ়ত্ব চিত্তের সেই মণিকোঠায়, সেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।'

কিন্তু উর্বশী এতটি জাতের কোন্‌টির অন্তর্গত? রবীন্দ্রনাথেরই কাব্যধারার অন্যত্র মঞ্জুলিকার (নিষ্কৃতি)

'হৃদয়লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রসস্তূপ মুঁড়ি'।

এখানেও কি উর্বশীর সন্ধান মেলা সম্ভব?

'কল্যাণী সেই মূর্তিখানি হৃদয়মাঝে
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা:
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরই পরশ ছিল সকল কাজে।'

লক্ষ্মীরূপা মঞ্জুলিকা জননীর এই স্নিগ্ধ ছবির মাঝে কি উর্বশীর ত্রিভুবনে যৌবন চঞ্চলকরা কটাক্ষ উঁকি দেয়? উর্বশীর মাঝে এ দান অসম্ভব। অর্জুন ভুল করিয়া তাহার মাঝে মাতৃত্ব সন্ধান করিতে গিয়াছিল, তাই তাহাকে ফল স্বরূপ অনিবার্য অভিশাপ কুড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু মঞ্জুলিকার 'হৃদয়লতার পাতার অন্তরালে' যে কুঁড়ি মুকুলিত হইয়াছিল তাহারই অনিবার্য কারণে 'রক্তে যে তার বাজে রিনিঝিনি'—এই রিনিঝিনির মাঝে উর্বশীর নূপুর নিক্কণ কানে বাজে—অন্তরা

হইয়া আসে, এক কামনাবাসনাময়ী নারী
আবেদনে—সহজ, সরল প্রকাশ

ইহার প্রকাশ কি অসুন্দর? তাহাকে অসতীত্ব বা অসংযম বলিয়া যাঁহারা চুল বাছিতে চাহেন, তাঁহারা মনুষ্য চরিত্রকে ঠিকভাবে অধ্যয়ন করিতে শিখেন নাই। 'প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা যায়, কিন্তু রুদ্ধ করা যায় কি?

ঐতিহাসের নৈতিক মাকে কামনাময় রূপ দর্শনের পূর্বে চক্ষু বন্ধ করিয়া বসি, কিন্তু তাহার মাঝেও যে এক কামনাবাসনাময়ী মূর্তি ও সত্তা সদা জাগ্রত রহিয়াছে, বিশেষ সময়ে, ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তাহা রূপে, রসে ও রঙে সঞ্জীবিত হইয়া শিল্পীর দৃষ্টিক্ষেত্রে তাহা নিখুঁত ধরা পড়ে। বাস্তবতাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টায় নীতির অধ্যাপক থাকে ছাড়া, কিন্তু পূর্ণ রসানুভূতির অভাব ঘটে। তাই আমাদের চোখে 'উর্বশী' সার্থক সৃষ্টি ও পূর্ণ রসোত্তীর্ণ স্বাক্ষর।

সমালোচনার ধারায় যে ভীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সমালোচক মোহিতলালের নিজেকে আহতগুপ্ত নীতিবাগীশ্‌ মোহিতলালকে যেন দেখিতে পাইলাম। তবে, ভরসার কথা—পরিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'অর্জুন-শিখণ্ডিনঃ।' একথা অনস্বীকার্য।

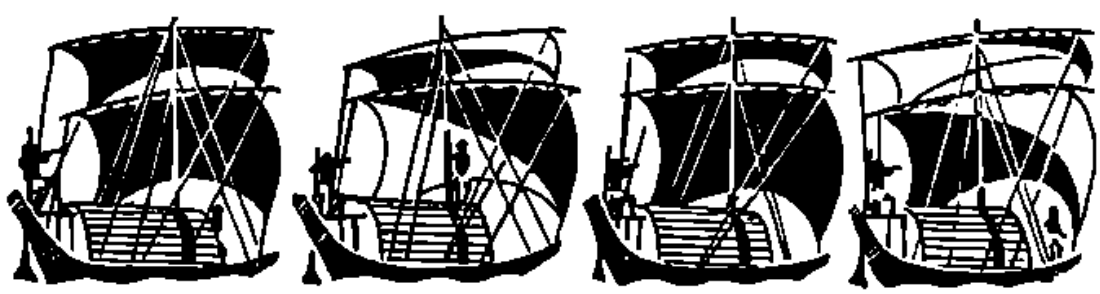

আলেকজান্দ্রিয়া

শ্রীসুচিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিলেত থেকে দেশে ফেরবার পথে আলেকজান্দ্রিয়া দেখবার সুযোগ ঘটে। লণ্ডনে জাহাজে উঠবার সময় আমাদের সকলের ধারণা ছিল যে আমরা প্রথমে পোর্ট সৈয়দে গিয়ে থামব। কিন্তু পরে জানতে পারলাম কোন বিশেষ কারণে আমাদের জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে থামবে। বাস্তবিক পক্ষে ভারত-ইংলণ্ড লাইনে যে সব জাহাজ সচরাচর চলাচল করে তারা পোর্ট সৈয়দের পর হয় মাল্টা না হয় মার্সেলস্-এর দিকে পাড়ি দেয়। নেহাৎ ঘটনাচক্রে এমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান দর্শনের সুযোগ পেয়ে আমরা সবাই খুশী হলাম।

মিশরীয় পুলিশ আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে নামবার অনুমতি দিল। দল বেঁধে নামলাম। অচেনা জায়গা। তাই ট্যাক্সী ভাড়া করতে হল। আমাদের সঙ্গে যে গাইড ছিল সে অল্পস্বল্প ইংরিজি বলতে জানত তবে অনায়াসে ফরাসীতে কথা বলতে পারত।

বলাবাহুল্য, আলেকজান্দ্রিয়া সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের অবকাশ ছিল না। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এর যে বৃত্তান্ত পড়েছি তা'তে এ' দেশ সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটি কল্পচ্ছবি রচিত হয়েছিল, যদিও ভালভাবেই জানতাম যে তার সঙ্গে আধুনিক পরিস্থিতির কোন সামঞ্জস্য থাকবে না। বাস্তবিক পক্ষে নবীন মিশর সম্বন্ধে আমরা ক'জনই বা খোঁজ রাখি? মিশরের কথা বলতে আমরা এখনও নীলনদের সভ্যতার কথা ভাবি, স্ফিংক্স্ এবং পিরামিডকে এদেশের প্রতীক বলে জানি। আমার মনে পড়ে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়েকজন মিশরীয় ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, তারা আমাদের এই জ্ঞানের স্বল্পতা নিয়ে হাসাহাসি ক'রত। তারা বলতে চাইত যে প্রাচীন ভ' কবে ধ্বসে গেছে, নীলনদের সভ্যতা ভ' কতকাল হ'ল মুছে গেছে; তাই অতীতের মায়া রেখে লাভ কি, নতুনের সঙ্গে তারা সমান তালে চলতে চায়। নবীন মিশরকে জানতে চাও ভ' কায়রো নগরী দেখে এস।.....

ট্যাক্সী করে সমুদ্র তীরবর্তী প্রমেনাদ (রাজপথ) দিয়ে চলতে চলতে আধুনিক মিশরের বাহ্যিক রূপ দেখতে লাগলাম। অধিকাংশ রাস্তার নাম ফরাসী ভাষায় লেখা। ফ্রান্সের ল' কোৎ দ্য জুরের (La Cote d' eazur) অনুকরণে বড় বড় বাড়ীঘর, মূর্তা, ক্যাসিনো তৈরী হয়েছে। মূর্তার (boulevard) দুই পাশে কন্টিনেন্টাল ষ্টাইলের কাফে। রাস্তা দিয়ে অত্যাধুনিক মডেলের গাড়ী চলাচল করছে। গাইডের কাছে জানলাম যে এ-অঞ্চলে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের বাস। তারা অধিকাংশ ফরাসী ভাবাপন্ন, যদিও বিপুলসংখ্যক আরব অধিবাসীরা এখনও প্রাচীন মুসলীম প্রথায় জীবনযাপন করে। রাস্তায় যাঁদের চলাফেরা ক'রতে দেখলাম তাঁর প্রায় সকলেই ইউরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিত। মিশরীয় যুবতীরাও পাশ্চাত্য কায়দায় সজ্জিত, তাঁদের চেহারার সঙ্গে ফরাসী এবং ইতালীয়ান মেয়েদের চেহারার অনেক মিল আছে ভেনেসিয়ান মেয়েদের মতন তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল কেশগুচ্ছ দেখলে মনেই হয় না যে তাঁরা এসিয়াবাসী গাইডের কাছে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে আজও অধ্যুষিত অঞ্চলে মহিলারা বোরখা পরে চলাফেরা করেন; মুসলিম প্রথা অনুযায়ী তা অবশ্য কর্তব্য কিন্তু এ' দেশের আইন-কানুন ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়নি, পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত এখানেও নারীদের সমান অধিকার রয়েছে। আমাদের দেশে যে হিন্দু আইন সংশোধক বিল (Hindu Code Bill) নি

অদ্যাবধি এত তর্ক-বিতর্ক চল্‌ছে, তা' বহুদিন আগে বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এর ফলাফল কি রকম দাঁড়িয়েছে তা' আমাদের মতন পরিদর্শকের পক্ষে বিচার করা অবান্তর।

প্রয়েনাদ দিবে যেতে যেতে আমরা একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চে পেলাম। গাড়ী থামিয়ে আমরা চার্চে ঢুকলাম। গীর্জার রঙীন কাচের জানলায় নানারকমের খোদাই কাজ,—বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মূর্তির খোদাই। অর্ধমূর্তাকার সিলিংএর গায়ে সেণ্ট্‌দের ছবি আঁকা। প্যারিসে বা রোমে যে সব ব্যাসিলিকা দেখেছি তার তুলনায় এ'টি অনেক ছোট, তবে মনে হ'ল যেন অক্সনে. বিশেষতঃ ধর্ম পরিবেশে প্রাচ্যের প্রভাব বেশী। আলেকজেন্দ্রিয়ার এই অঞ্চলে, ইতালীয়ান, মাল্টিস্ এবং ফরাসীদের বাস। তাঁরা সবাই ক্যাথলিক। মানুষ ধর্মকে সহজে অস্বীকার করতে চায় না, অন্ততঃ তার ইহলৌকিক প্রতিকৃতিকে রক্ষা করে চলে। তাই বিদেশী দেশে এসে তারা নিজেদের ধর্ম মন্দির গঠন করেছে। জান্‌তে পারলাম যে, যে সব ইউরোপীয় অধিবাসীরা গ্রীক Orthodox Churchএর অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্প্রদায়ের মন্দির গঠন করতে বাকী রাখেন নি।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ দেখ্‌বার পর আমরা প্রাক্তন রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ। গাইড বল্ল যে বর্তমান ফারুকের নির্বাসনের আমলে এর গঠনকার্য শেষ হয়। জনশ্রুতি যে দুনিয়ায় এ' রকম অট্টালিকা বেশী তার—বিরাটত্বে এবং রূপসজ্জায় তাজ্‌মাই বা ফন্‌টেন্‌ব্লুর সমতুল্য। ফারুকের পতনের পর এই প্রাসাদের পরিণতি কি হবে তা অনিশ্চিত, তবে শুনছি যে, তাজ্‌মাই বা ফন্‌টেন্‌ব্লুর রাজপ্রাসাদের মতন একেও মিউজিয়ামে পরিণত করা হবে। রাজরাজাদের ভাগ্য যে দিকে, তাদের বাসস্থানের পরিণতিও সেইদিকে!

সহরের মাঝখানে যাবার পথে সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদ দেখতে পেলাম। বিরাট মস্‌জিদ, তার গগনস্পর্শী মিনার মনে করিয়ে দেয় যে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। সহরের মাঝে দোকান বাজার বিস্তর। কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাশালী দোকান সিরী ব্যবসায়ীদের হস্তগত। পোষাক পরিচ্ছদ, হাতব্যাগ, কার্পেট প্রভৃতির চালান বেশী। ছোট খাট জিনিষের মধ্যে আমেরিকান ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন ও লিপ্‌ষ্টিক লাইটারে বাজার ছেয়ে গেছে। তা'ছাড়া পথের দু'পাশের চাকচিক্যপূর্ণ বিপণির Show Case-এ প্যারিসীয় প্রসাধনের সম্ভার। যে নগরীতে একদা কালে প্রেমের দেবী আফ্রোডিটের পূজার প্রচলন ছিল, সেখানে বিলাসের আয়োজন থাকা বিচিত্র কি? তা'ছাড়া বিদেশীয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশে আমার ধারণা, যে তারা বিলাসকে অন্যায় ভাবে নয় বরং তাকে জীবনের পরিপূরক হিসাবে নিতে চায়। জীবনকে উপভোগ করাই জীবনের সার্থকতা, Negation of life-কে তারা জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করে নি তাই অন্যান্য এসিয়াবাসীর তুলনায় তা'দেরকে সচরাচর খুব প্রাণবন্ত বলে মনে হয়।

দোকান বাজার দেখবার পর আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার পুরাতন অঞ্চলে স্ফিংকস্ এবং ক্যাটাকোম্ব দেখতে গেলাম রোমে যে সব ক্যাটাকোম্ব দেখেছি তার তুলনায় এ কিছুই নয়। হস্তত খননকার্য এখনও অনেক বাকী রয়েছে সেখান থেকে একটু দূরে ধূসর পাথরে গড়া স্ফিংকস্-এর মূর্তি (আলেকজান্দ্রিয়ার স্ফিংকস্), যুগ যুগ ধরে মরুর ঝড়ের ঝাপট প্রতিরোধ করে রয়েছে।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় এ মূর্তির মধ্যে একটি আদিম আভব ভাব ওতঃপ্রোত হয়েছে। ঠিক এমন জিনিস আর কোথাও দেখি নি। এ অঞ্চলে আর বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। মরুর আক্রমণে প্রাচীন ঐশ্বর্যশালিনীর প্রায় সব কিছুই লোপ পেয়েছে। বিস্তৃত বালিরাশির মাঝে এখানে ওখানে কোন ভাঙ্গা মূর্তি বা প্রস্তরখণ্ড চোখে পড়ে; কিন্তু এভাবে দেখলে তাদের প্রসঙ্গে কিছুই জান

যাই না। এরই কাছাকাছি নে জাহাজ হতে পাক-মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের বহু ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রেমের দেবী আফ্রোডিটি ও এপিসাট্ট হিথার ধ্যান মন্দির ছিল—এখন তার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

অতঃপর আমরা নগরের কাছে যে রাজোদ্যান আছে সেখানে। বেশ কিছুটা পথ যেতে হ'ল। প্রকাণ্ড বড় বাগান; অনেকটা লণ্ডনের কিউ গার্ডেন্স (Kew Gardens) কিংবা প্যারিসের বোয়া দ্য বুলোনস্ (bois de bologne) জায়গা। ব্যাগাটেলের অনুকরণে গড়া ফুলের বাগান, নকল পাহাড়, কৃত্রিম ফোয়ারা প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নি। শান্তিতে অবসর বিনোদনের আদর্শ স্থান।

আমাদের হাতে সময় ছিল না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাড়াতাড়ি করে জাহাজে ফিরে আসতে হ'ল। দেখি জাহাজের সামনে ফেরীওয়ালাদের কি ভীড়! পিরামিড আঁকা ব্যাগব্যাগ, স্ফিংকস্-এর মূর্তি আঁকা স্লিপার এবং নানারকম কাঁচ ও পাথরের জিনিষ নিয়ে ফেরীওয়ালারা ল্যাডিং-এর কাছে জমায়েৎ হয়েছে। ইংরিজি মুদ্রা এবং সিগারেটের মাধ্যমে কেনাবেচা চলছে। সবচেয়ে আকৃষ্ট লাগে সিগারেটের চাহিদা দেখে।

চারিদিকে দর কষাকষি এবং হট্টগোল।

বিকেল চারটে নাগাদ জাহাজ ছাড়ল। বন্দরের ছোট ছোট পাল তোলা নৌকা পিছনে ফেলে আমাদের জাহাজ দ্রুতগতিতে পোর্ট সৈয়দের দিকে এগিয়ে চলল। এতদিন আমরা ইউরোপীয় অঞ্চলাধীনে ছিলাম, এবার সত্যি সত্যি আমরা ইউরোপের শেষ সম্পর্ক কাটিয়ে রৌদ্রতপ্ত এশিয়াতে ফিরে যাচ্ছি। এই অনুভূতি মুহূর্তের জন্য আমাদের সকলকে অভিভূত করে তুলল। দিনান্তের আলোকে মনে হ'ল যেন দূর থেকে ইউরোপ আমাদের হাতছানি দিয়ে বিদায় জানাচ্ছে এবং সামনের বিস্তৃত ফেনিল সাগরের মধ্য দিয়ে এশিয়ার অভ্যর্থনা-বাণী আমাদের কানে ভেসে আসছে।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও কেমন যেন উদ্ভাসিত মনে হয়। প্রতিদিনের দেখার সঙ্গে এ দেখার যেন তুলনা হয়না। বেপী মণ্ডলের মেয়ে এমন কথা কোনদিন বলবে ডাক্তার যেন স্বপ্নেও ভাবেন নি। চাবী আন্দোলনে চাষার মেয়ের কি করণীয় আছে ভেবে পেলেন না ডাক্তার। একটু চুপ করে বললেন, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে নিস কি ক'রতে হবে!

তেমনি সাহসিকা সুবাসিনী, বললে, আপুনি বলুন, বাবা কি বলবে?—এই তাই সব সময়—

কি? বলে সুবাসিনীর মুখের দিকে চাইতে ডাক্তারের মনে হলো অন্ধকারে কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা। অকারণ!

কি ভেবে ডাক্তার বললেন, বেশ! কাল থেকে তুই একটা খাতা করবি—তাতে লিখবি, কে কে কবে তোদের বাড়ী খাওয়া দাওয়া করলে! সারাদিনে কি কথা তারা বললে—

কাজটা সুবাসিনীর বুঝি মনঃপুত হয় না। খাতা না করলেও এতো তার জানা। নিজে হাতে রান্না বাড়া সে করে, দেয়, খোয়। এ আবার একটা কাজ নাকি!

ডাক্তার বললেন, পছন্দ হলো না! তবে এক কাজ কর—তোদের পাড়ার যত ছোট ছেলে আছে তাদের নিয়ে একটা ইস্কুল কর, পাততাড়ি পড়া!—

সুবাসিনী তাতেও বুঝি রাজি নয়। মুখটা অন্ধকারে কেমন অস্পষ্ট করুণ মনে হয়। সামান্য একটা চাষীর মেয়েকে আর কি কাজের নির্দেশ দেবেন ডাক্তার ভেবে পান না! আর দিলেও তার দায়িত্ব নেবে কে! ঘরে বাপ আছে, খণ্ডর আছে, স্বামী আছে—সমাজ আছে! তাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে কে! পাগলী মেয়ে তাই কাজ কাজ করছে!

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা, তবে দেখব'খন—কি কাজ তোকে দেওয়া যায়!

সুবাসিনী ফিরতে ডাক্তার সাঁতরাদের সদর আটচালার পথটার ওপর এসে দাঁড়ালেন। মিছিলের আওয়াজটা থেকে থেকে ভেসে আসছে—জিন্দাবাদ! এক হও! লাঙল যার জমি তার! পশ্চিমপাড়ার বাবুদের গড়ের পারে আছে খোওয়াবাড়াটা।

মনে মনে কেমন যেন শঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন ডাক্তার। ঠিক পথ যেন তাঁরা নিতে পারেন নি। নিজে থেকে তাঁর যেন আত্মীয়বর্গ সবার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। বাইরে থেকে এতটা উত্তাপ সঞ্চারিত না ক'রে ভিতরে ভিতরে ওদের উত্তাপ হরণ করা উচিত ছিল। জগবন্ধু কি করতে কি ক'রে ফেলবে তার ঠিক কি—আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই তার কাজ! তারপর গ্রামের ভাল-মন্দ, ভবিষ্যৎ তার ভাবনার দরকার নেই। কে জানে এ ভাল করা না, মন্দ করা—প্রকৃত কল্যাণ কামনা করা!

ডাক্তারের মনে হলো, সামনে দুজন মানুষ যেন তাঁকে দেখে থতমত খেয়ে একটু আড়াল খুঁজছে। এগিয়ে আসতে ডাক্তার চিনলেন—কালীপ্রসাদ আর বৈকুণ্ঠ।

কালীপ্রসাদ প্রথমে কথা কইলে, কি ডাক্তার এদিকে?—কি মনে করে? দল ছাড়া?

ডাক্তার বৈকুণ্ঠকে লক্ষ্য করে বললেন, কি খুড়ো, আ সভায় যাওনি!

বৈকুণ্ঠ যেন অপ্রস্তুত বোধ ক'রলে সঙ্গে সঙ্গে। আমতা আমতা ক'রে বললে, এক ঠাঁই গেছিলাম—একটু কাজ ছিল।

কালীপ্রসাদ আবার জিজ্ঞেস করে

ছাড়ো আজ '

ডাক্তারের মুখ দিয়ে এখনই বেরিয়ে এল, আপনিও তো !

কালীপ্রসাদ অন্ধকারে মুখ ঢেকে বললে, আমাদের আবার দল ' কি হে বৈকুণ্ঠ, বলছিলুম না তোমায়—যারা পারে দলাদলি করুক, গরীব কায়েতের ছেলের অত দরকার কি বাপু '

ডাক্তার বললেন, তাই তফাতে আছেন ? ভাল ! কিন্তু এখানে ?

কালীপ্রসাদ যেন ধরা পড়ে যায়। বললে, একটু দরকার ছিল শাঁতরার সঙ্গে।

আর সেই জন্যে বৈকুণ্ঠ খুড়ো আজ সভায় যেতে পারেনি ' ডাক্তার শ্লেষ করলেন, ভাল, দরকার আপনাদের মিটলে হলো !

হঠাৎ কালীপ্রসাদ রেগে ওঠে, কেন তোমাকে দেখে ভয় নাকি ! খাঁয়ের কর্তা তুমি ? সব কথা তোমাকে জানাতে হবে !

ডাক্তার শান্ত স্বরে বললেন, তা কেন, বলছিলেন দলাদলির মধ্যে নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দল ভাঙার ব্যাপারে আছেন !

আরো রেগে ওঠে কালীপ্রসাদ, কি ভাবো তুমি সবাইকে—কেনা গোলাম ! তোমার কথামত সবাই উঠবে বসবে···কেন, কেন, কেন ?

বৈকুণ্ঠ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ছোটবাবু বাদ দিন...শুধু শুধু কি হচ্ছেন ? ডাক্তারবাবু আপনি আসেন—

মনে মনে বুঝি হাসেন ডাক্তার। দলছাড়া কালী-প্রসাদের কার্যকলাপএর চেয়ে আর কি ভাল হবে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে বৈকুণ্ঠখুড়ো তুমি একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছো ?

বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, কি যে বলেন, কি যে বলেন, ছোটবাবুর সঙ্গে আমার তেমন ধারা কোন কথাই হয়নি !...আর কি ব্যবস্থা করবো···এখানে তো চাষবাস আর হবেন না।

ডাক্তার বললেন, যাই কর, একটু ভেবেচিন্তে করো। কিছু হোক চাই নাই হোক, ওদের কথাও ভেবো খুড়ো···হয়তো এই সুবিধে, কিন্তু এরপর যে সুযোগ আসবে, তার ফল বংশপরম্পরা সবাই মিলে ভোগ করবে। বিশ্বাস হারিয়ো না খুড়ো !

বৈকুণ্ঠ চুপ। তার বলবার কিছু নেই। সত্যি কথা কালীপ্রসাদ তার সঙ্গে বিলি বন্দোবস্তের কথা বলছিল—জমার হার সে কিছু বাড়াতেও রাজী হয়েছে। তিরিশটাকা পর্যন্ত সে উঠেছে—তবে বেশী নয়, কেবল ছোটবাবুর খুব খোপের ঐ ক' বিঘে শালি—কেউ জানবে না, কাজ সে গোপনেই করবে। টাকাটা শুধু হাতেই দেবে, পাঁচ কিস্তিতে। ঐ সব হৈ-হট্টগোলের মধ্যে সে নেই ! বাবুদের খেয়েই তারা মানুষ। ঘোর কলি, সাতপো পাপ উপছে উঠেছেন ! আপনি দেখে নেবেন সব বেটাকেই শেষ পর্যন্ত আসতে হবে। ঐ বড়বাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরতে হবেন। মগের মুলুক নয়।

বৈকুণ্ঠর হয়ে কালীপ্রসাদ জবাব দিলে, খুব যে জ্ঞান দিলে। তোমরা কোন ভাবচো।—বিশ্বাস, বিশ্বাস করচো। কাকে বিশ্বাস করবে ? কতকগুলো চ্যাংড়ার কথায় ভাত-ভিত নষ্ট করবে তা বলে ? চেঁচিয়ে মিটিং করলেই হলো···জমি কোথায় যে জমার হার মুখের কথায় কমে যাবে। নিজে পারনি বাইরে থেকে লোক আমদানি করেচো এদের ক্ষেপাতে।

ডাক্তার একাদ জবাব দিলেন না। হয়তো ভাবলেন, একজন প্রজার সামনে আর রাগ দেখান উচিত নয়। তাড়াতাড়ির এখনো অনেক কিছু আছে। বৈকুণ্ঠই তার সম্বন্ধে অন্য ধারণা করে' নিতে পারে। এখন যা-ও বুঝিয়ে বলা যাচ্ছে—তখন একেবারে বেঁকে বসবে। কালীপ্রসাদের কুচক্রে একেবারে ধরা পড়বে।

নিছক ফিরে ডাক্তার বৈকুণ্ঠকে বললেন, কাল একবার এসো খুড়ো, একটা ডেপুটেশনের কথা আছে !

কালীপ্রসাদ যেন টিট্‌কারী দিলে, বুঝি সুবিধে হ'লো এবার—

ডাক্তার বললে, সেটা আপনি তো ভাল বোঝেন... এতক্ষণ তো তাই বোঝাচ্ছিলেন।

কালীপ্রসাদ তেমনি বিকৃত স্বরে বললে, তোমাদের মত নয়! কালীপ্রসাদ কারো তোয়াক্কা করে না। কোন্ বাপের বেটা আছে, এসে বলুক তো দেখি—আমি কার ধার ধারি। যা ইচ্ছে তোমরা কর!

বৈকুণ্ঠ থামিয়ে দিয়ে বললে, ছোটবাবু বাদ দিন, শুধু শুধু কি হ'চ্ছেন...বাদ দিন! কথা বাড়াচ্ছেন খালি!

ডাক্তার বললেন, ধারাধারিটা বেশী ভাল নয়। সত্যিকারের বোঝবার লোক আবার আছে তো! সব খবরই তো পাওয়া যায়!

কালীপ্রসাদ তেতে উঠে: কি খবর তোমরা পাও? যত সব ছোটলোক কাঁহাকার—

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, স্বগোত্রের ওপর অভিমান করে' এদের ঘর ভাঙবেন না দয়া করে। ফল ভাল হ'বে না!

কালীপ্রসাদ আবার মুখিয়ে উঠে—আবোল তাবোল বলতে থাকে, কেন তোমাকে দেখে ভয়! কে কার ঘর ভাঙচে জানা আছে!...বিভীষণ কোথাকার! আর মুখ নেড়ো না! দেখা যাবে কি তুমি করতে পার।... যখন উত্তম-মধ্যম পড়বে তখন দেখবো দল তোমার কোথায় থাকে! মুখ নাড়া বেরিয়ে যাবে...ঘর সন্ধানী কোথাকার!

ডাক্তার উত্তর দেবার আগেই শোভাযাত্রার দলটা অদূরে চীৎকার করে উঠলো! ইনকিলাপ জিন্দাবাদ! লাঙল যার জমি তার! আমাদের দাবী মানতে হবে! এক হও!

তিনজনেই চুপ। মনে মনে চমকে ওঠে বুঝি। বৈকুণ্ঠ সরে যায় আড়ালে। কালীপ্রসাদ কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একতাবদ্ধ কণ্ঠস্বরে বজ্রনিনাদ হয়।

খানিক পরে দু'জনের কাউকে দেখা যায় না। শোভাযাত্রা ওদিক ঘুরে পুব দিকে কোটাল পাড়া দিয়ে উত্তরে কয়াল পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। আকাশে বাতাসে অদ্ভুত অনুরণন বাজে যেন।

পথের ওপর ডাক্তার স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একটা অদ্ভুত আচ্ছন্ন করা চিন্তায় মন ভরে থাকে। এই পরিবেশ, এই গ্রাম, এই মানুষজন যেন তিনি কোনদিন দেখেননি। এমন ভয়চকিত, অনিশ্চিত অনুভূতি যেন তাঁর কোনকালে হয়নি। বিগত চল্লিশ বছরের ধ্যান-ধারণা এই কয়েকদিনের মধ্যে উল্টে গেল —শান্ত স্থির মহীরুহের মাথায় উঠে দাপাদাপি করে' শাখা-পল্লব ছিন্নভিন্ন করার মত গ্রাম জীবন আজ বিপর্যস্ত।

কে জানে ডাক্তার ভুল করেছেন কি না, কে জানে বিরোধের সূত্রটি যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, সহজ সুরে যা সাধিত হ'তে পারতো তাকে অযথা বিরোধের তারস্বরে যেন জটিল করা হচ্ছে, মঙ্গলের আশায় এক বিরাট অমঙ্গলকে যেন ডেকে আনা হচ্ছে! গ্রেটেষ্ট গুড্ আর গ্রেটেষ্ট ক্যাইন—এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক কি! কার ভাল, কি ভাল তারা চায়? কি ক্ষমতা আছেই বা তাঁর ভাল করার! মঙ্গলের পথ আর সামান্য ভালর পথ এক নয়। ক্রমে এ আন্দোলন যখন নখ-দন্ত বিস্তার ক'রবে ধ্বংসের পথে ধাবিত হ'বে তখন কোন্ শক্তিতে ডাক্তার তাঁকে রোধ করবেন? এ আন্দোলনের অসহযোগিতা ক্রমেই যদি উন্মত্ত হিংস্র হ'য়ে ওঠে কি দিয়ে ডাক্তার তাকে ঠেকাবেন? দায়িত্ব তখন কে নেবে?

এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে তাঁরা ছিলেন অহিংস সৈনিক। শত বিরুদ্ধ বিপরীত অবস্থাতেও তাঁরা অহিংসার পথ ত্যাগ করেননি, কত নির্যাতন, কত পীড়ন, লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন—মহাত্মা নির্দেশিত পথ তাঁরা ধ্রুব সত্যের মত পালন করে গেছেন, তাঁদের জয় হ'য়েছে।

আজ যেন আর সে পথে বিশ্বাস নেই—সে সাহস আস্থা নেই, দেশের লোকের সঙ্গে শত্রুতারও যেন শেষ নেই। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যা ক'রতে পারিনি আজ যেন আশা মিটিয়ে তাই ক'রতে চাইছে- দেশকে

চৌচির হয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে যেন তুষ সমস্যার! এ দেশ যেন তাদের নয়, আর কারো।

এ যেন এক আত্মঘাতী অভিমানে পেয়ে বসেছে তাদের। পরবশতার অবসানেও শান্তি নেই। পরশ্রীকাতরতায় জর্জর। ভেদে আর বিভেদে, দল আর উপদলে যেটুকু শুভ ছিল তাও বুঝি শেষ হ'য়ে যায়।

বিপ্লব! কার প্রতি বিপ্লব? কার জন্যে বিপ্লব? কেন বিপ্লব? এর ফল যেন অবিলম্বে বিশেষভাবেই জাতিকে একদিন পেতে হবে—আত্মকলহের ফল ভোগ করতে হবে, কুরু-নাশের লক্ষণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে!

কোন প্রয়োজন ছিল না জগবন্ধুকে গ্রামে ডেকে আনবার। এই শান্ত বাতাসকে উত্তপ্ত করবার। সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে স্থির হ'য়ে বসে বুঝি স্বচ্ছন্দে এর মীমাংসা করা যেত—সবার মনোমত করে একটা ব্যবস্থা করা যেত।

কবেকার উদয়পুর গঠনের ইতিহাস আজ অতীতের পঞ্জরে, কিন্তু তার ধ্বংসের ইতিহাস অদূর ভবিষ্যতে বুঝি প্রত্যক্ষ করা যায়। সে-ধ্বংসকাণ্ডে ডাক্তারের নাম বুঝি সর্বাগ্রে লিখিত হবে—এঁরই প্ররোচনায় উদয়পুর একদিন ভস্মস্তূপে পরিণত হ'য়ে ছিল। উদয়পুরের সকল দুঃখ চিরতরে ঘুচে গিয়েছিল। উদয়পুর আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে উদয়পুরের হয়তো কোন অস্তিত্বই থাকবে না! কত শত স্থান জনপদের সমাধির সঙ্গে উদয়পুরের নাম যোগ হবে! আত্মঘাতী উদয়পুর।

শোভাযাত্রার শব্দ শান্ত হ'য়ে গেছে। আশপাশে কোপঝাড়ে একটানা ঝিঁ-ঝিঁ ডাক শুরু হ'য়েছে, তেঁতুল গাছের মাথায় 'একশ' মানিক জ্বালা' জোনাকিরা উঠছে পড়ছে! মাথার ওপর আদিগন্ত নভপটে বিচিত্র ছায়াপথ পড়েছে—জড়াজড়ি নক্ষত্রের অস্পষ্ট দ্যুতিহীনতায় অদ্ভুত মনে হয় নীচটা।

কে জানে আজ কি তিথি। ঘোর অমাবস্যা নয়, পঞ্চমী কি ষষ্ঠী! চাঁদহীন আকাশে বিমর্ষতা স্পষ্ট!

ডাক্তার চলতে লাগলেন একা একা। মনে মনে সংকল্প করলেন, এই নব জাগরণের রূপকে আরো উজ্জ্বল, আরো আত্মমুখী আত্মানুসন্ধানী করে' তুলতে হ'বে। দাবী যা আছে তাকে অহঙ্কারে নয়, তিতিক্ষায় গ্রহণ করতে হ'বে—সমস্ত বিষ বিসর্জন ক'রতে হ'বে প্রজার আর জমীদারের বিরোধে। দু'জনেই ত্যাগের আদর্শে মুখোমুখি হ'তে হ'বে, এগিয়ে আসতে হবে, হাত মিলোতে হবে!

আপোষ মীমাংসাই হবে এ বিরোধের একমাত্র মহৌষধ। আলোচনার পথ তো এখনো উন্মুক্ত! রমাপতি তো এখনো একটা মীমাংসা করতে চান। বিভেদ সৃষ্টির দুর্বুদ্ধিটা যদি ঘুরিয়ে ফেলা যায় তা হলে সে মীমাংসা এখনো ফলবতী হ'তে পারে। আজ বড়কে যেমন ছোট হবার জন্যে দাবী করা হচ্ছে তেমনি ছোটকে উচ্চ হবার মহান আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। উদয়পুরকে উদয়পুরের স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, অঘটন এখনো এড়িয়ে চলতে হবে।

না, আজ রাত্রেই ডাক্তার নিজে থেকে একবার সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এ আন্দোলনের শুরুত্ব এবং যৌক্তিকতা করজোড়ে ভূস্বামীদের নিবেদন করবে। দরকার হলে ভিক্ষা করবে—তোমাদের অনেক আছে, তোমরা আর একটু ত্যাগ কর। বহুদিন ভোগ ক'রেছো আজ দুদিনে ওদের পক্ষে সামান্য ভোগের সুযোগ দাও। তোমাদের ভাল হবে, ওদের মঙ্গলে উদয়পুর উজ্জ্বল হবে—পুরোন দিনের শ্রী ফিরে আসবে।

কি আছে গ্রামে? কোথা গেল সে-দিন! অমি যাঁদের তাঁরাও কি আছেন! বারমাসে তের পার্বণ গেল কোথায়! কিছুই কি তোমরা বজায় রাখতে পারলে? কর্ষণে কর্ষণে শুধুই কি ভূমির মূল্য বেড়ে যাবে? কত ধান হ'তো আর আজ কত হচ্ছে! সে পালি, পলি, কাঠার মাপ এখন মন সের ছটাকে পৌঁছেচে, তবু কৃষকের দুবেলা অন্ন জোটে না—রোগে, শোকে, অভাবে জরাজীর্ণ বাংলার কৃষক! উদয়-অস্ত পরিশ্রম কেবল তাকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে

যায়। স্বামী, তুমিও তার দিকে চাও—তার মুখের অন্ন কেড়ে উদরের ভবিষ্যৎ, গাঁয়ের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত করো না। দয়া নয়, ভালবাসা, প্রীতির সম্বন্ধে পরস্পর আবার বেঁচে ওঠো—সহযোগে আবার সম্প্রীতি-ফিরে আসুক। উদয়পুরের দুর্দিন কেটে যাক।

বোধ হয় গ্রাম-সীমানার বাইরে এসে পড়েছিলেন ডাক্তার। হঠাৎ পেয়াল হ'তে চোখ তুলে পিছনে তাকাতে সব একাকার মনে হয়। পায়ের তলার সরু পথটা কেবল নিশানা—ঐখানে উদয়পুর। ঐ পথ গ্রামে ঢুকে কত খানা ডোবার ধার ঘেঁসে, কত ঢেঁকশাল, আটচালার মধ্য দিয়ে তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে. কি উদয়পুরের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছে! চারিদিকে কেবল মাঠ, এই পথ ছেড়ে খানিক সরে এলে দিশেহারার মত মনে হবে—কোথায় বা উদয়পুর, কোথায় বা রাধাপুর আর কোথায় বা পাকুড় দীঘড়া—বেনেটি কোন্‌খানে! তবু গ্রামের নামেই গ্রামবাসী, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, জীবন মরণ! উদয়পুর আমার!

কে জানে কেন এমন দিন এল! পরস্পরে কেনই-বা এমন বিভেদ সৃষ্টি হ'লো। গ্রামের কোন কিছুতেই আর সেই পূর্বেকার মত সর্বজনীন আবেদন নেই। প্রত্যেকে যেন বড় স্বতন্ত্র ব্যক্তি হ'য়ে উঠেছে! কি দিনকাল এল!

দুর্ভিক্ষের বছরটা যেন সব উলোট-পালট করে দিলে, গত মহাযুদ্ধের চাপে চোখ ফুটলো সবার। মানবতার অপমানে মানুষ উৎক্ষিপ্ত হ'লো। চুল ছিঁড়ে, মাথা কুটে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলে নিজেই! সমাজ-জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু কি প্রতিকার এর আছে? বটের ওপর থেকে মাথাটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কি বটটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে?

ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, শান্ত, নীরব—না জানলে কে বলবে ঐ উদয়পুর, ঐখানে বিরাট এক আন্দোলন সুরু হয়েছে.—জমির লড়াই!

ধীরে পদক্ষেপে ডাক্তার মাঠ থেকে উঠে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তার ওপর উঠলেন। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। আর একটু ভাববেন।

হঠাৎ ইন্দুমতীর কথা মনে পড়ল ডাক্তারের। আজ ক'দিন কেবল মনোমালিন্যের মধ্যে কাটছে। সেই এক সমস্যা—আজও ডাক্তার ঘরের দিকে ফিরেও তাকায় না। কোথা থেকে যে কি হয়, তার কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। সামান্য দু'মুঠো মুখের অন্ন তারও সংস্থান না বললে করেন না। সংসারের প্রতি এমন উদাসীনতা ইন্দুমতী সহ্য করবেন কেন! শুধু ডাক্তারই নন, গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁর সংসার এমন ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, হ'বে কেন!

অভাব অভিযোগ জানাবার নাম ক'রে অনেক অপ্রিয় কটু কথা শুনিয়েছে ইন্দুমতী। আবশ্যক হ'লে পিত্রালয়ে গিয়ে ওঠবার ভয়ও দেখিয়েছে। বলেছে স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থান যে করতে পারে না তার এত মাতব্বরি করে বেড়ান কেন! যার নিজের চাল চুলো নেই সে পরের চাল চুলোর কথা ভাবে কোন্ লজ্জায়!

ভেবে দেখলেন ডাক্তার এর চেয়ে ভাল অবস্থা যেন তাঁর কোনদিনই ছিল না। কিন্তু আজ হঠাৎ ইন্দুমতীর এত রাগের কারণ কি! তাও একটু বেশীই যেন। ইদানীং ইন্দুমতী কি ভাবছে যেন। একটুতেই মারমুখো হয়ে উঠে।

সেদিন মাধুরীর মুখের ওপর টাকাগুলো ফেরৎ দেওয়ার কোন কারণ নেই। জগবন্ধুর সঙ্গে আবার নিজ ঘর সংসারের কথা আলোচনা করার কোন যুক্তি নেই। কি যেন হ'য়েছে আজকাল ইন্দুমতীর—নানাভাবে প্রতি-বন্ধক হবার চেষ্টা করছে যেন।

গ্রামের মধ্যে নিবের ঝাঁপতলায় এসে পড়তে অন্ধকার কে যেন কথা কয়ে উঠলো, ডাক্তারবাবু!

কে? ডাক্তার এগিয়ে এলেন।

আমি পীতাম্বর। পীতাম্বর পথের ওপর দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, স্বরটা কেমন উৎসুক মনে হ'লো।

(ক্রমশঃ)

ভয়ঙ্করের ভাবনা

শ্রী

সাধারণ লোকের মতে মৃত্যু সম্পর্কে যে ভয় তার সমাক উপলব্ধি মৃত্যুর আসন্ন মুহূর্তে। তা ছাড়া মৃত্যু নিয়ে জীবিতাবস্থায় মানুষ বড় একটা মাথা ঘামায় না।

মৃত্যু, মৃত্যু! চোখের ওপর মৃত্যুর সহস্র প্রমাণ জল্ জল্ ক'রলেও জীবিত মানুষ মাত্রেই ভাবে তার ভাবনার কোন কারণ নেই। হোক মৃত্যু নিশ্চিত তবু, তার আগমন অনিশ্চিত অন্ততঃ তার পক্ষে, নির্দিষ্ট মৃত্যুর ভাবনা মানুষের গা-সওয়া!

কিন্তু সেই স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিধাতার অমোঘ বিধানে সংঘটিত না হয়ে মানুষেরই জ্ঞানবুদ্ধির খেলায়, ভেদবুদ্ধি মারফৎ সমস্ত মানব সমাজের উপর পতিত হয় তা হ'লে জীবিত সকল মানুষেরই ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। আজ পৃথিবীতে মানুষই সেই ভয়ের সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নিমেষে সৃষ্টিধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর মারণ অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অতঃপর গুটিকয়েক হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে মানুষ ধরা পৃষ্ঠ থেকে প্রাণের সমস্ত স্পন্দন স্তব্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এমন কি নিজেকেও। হাইড্রোজেন বোমার ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে এই সেদিন চিন্তানায়ক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন—If a sufficient number of such bombs are exploded, it is feared that whole human race may perish since the radioactive clouds cannot be compelled to respect frontiers.

কিন্তু তাতে কি! যারা এই অস্ত্র তৈরী করছেন শত্রুনিধনের জন্যে তাঁদের মনে অমন কোন ভয় নেই। Each side is engaged in manufacturing these bombs as fast as possible. The Americans, the Russians and Chinese have all boasted they can achieve victory by means of their bombs in spite of those of the orther side.

রাসেল বলছেন, এ অহঙ্কারের কোন মূল্য নেই কেননা হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয়ের আশা নেই! বোমা ফাটলে কোন বংশেই কেউ বাতি দিতে অবশিষ্ট থাকবেনা। হায় রে জয়! হায় রে অহঙ্কার!

এদিকে পরমতসহিষ্ণু হ'য়ে শান্তিতে সহ-অবস্থানের ইচ্ছে এইসব আবিষ্কারকদের নেই। পৃথিবীকে তাঁরা ভয়ের রাজ্যে পরিণত করতে চাইছেন। বা শত নিরস্ত্রব শান্তিকামী মানুষকে সেই ভীতি নরকে ঠেলে দিয়ে তাঁরা বিশ্বসংসারকে শাসাচ্ছেন—হয় এস্পার, নয় ওস্পার! বোমা ছাড়লুম বলে!

আজ বুঝি সব যায়! মানুষকে মানুষই শেষ করবে মানুষের চিন্তাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই তাই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে। মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে রাজাগোপালাচারী বলেছেন, the only way to get control over this hellish power that has been created is not the retaining of the power for the purposes of retaliation but unilaterally giving it up on your part. To seek safety through retaliation is to continue in fear. There is no 'safe' way to throw off fear. It must be thrown away not minding the consequences.

কিন্তু কে আগে অস্ত্র ত্যাগ করবে? বিশ্বাসের সেতুকে কে বাঁধবে?

চিন্তানায়ক রাসেল Uncommitted nations-এর কথা বলছেন।

Governments in either block fan the further difficulty that if one side proclaims the impossiblity of the H-bomb war while the other does not, they give a diplomatic advantage to the less reasonable side. If there is to be a detente it cannot begin from one side or from the other. It must be inaugurated by one or more uncommitted nations who are not hampered by considerations of prestige or by the desire to inspire terror in enemies.

এই মধ্যস্থতার ব্যাপারে ভারতকে নিয়োগের কথা তিনি বিশেষ ভাবে বলেছেন, India is uniquely filled to this task. India can ask both sides to admit that war offers no solution to their problems. India has every right to an initiative in this matter, since a great is likely to do as much harm to nations which are not belligerant as those which are.

শ্রীরাজাগোপালাচারী এই ভয়ঙ্কর অবস্থার সমাধান আর এক ভাবে ক'রতে চাইছেন। How shall we get rid of this mess, this fear that has been generated ? This or any other fear cannot be got rid of except by unilateral action and a trust in the law that rules god's world and which binds all thought and spirit in one close entanglement. Throw away and all will be well, at any rate no worse.

কিন্তু বেপেণ্ডুনে আমাদের বিশ্বাস অন্তরূপ। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন যুদ্ধই শান্তিবাদী, নিরপেক্ষ চিন্তানায়কদের স্বস্তি বাণে থেমে থাকেনি। গুটিকয়েক তথাকথিত রাষ্ট্রনায়কদের প্ররোচনায় বার বার পৃথিবীতে যুদ্ধ এসেছে। সামনাসামনি হাতাহাতি, গোলাগুলি, বারুদ বোমা থেকে শুরু করে' শেষশেষ সেই যুদ্ধ যদি চাই-ড্রোজেন বোমায় শেষ হয়, বিস্ময়ের কিছু নেই। এখন সর্বাত্মক সেই ধ্বংসের মুহূর্তের জন্যে অসহায় জীবের মত হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া মানুষের করার কিছু নেই। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কোন পক্ষই কারো কোন উপদেশ শুনতে রাজী হ'বেনা, কেননা সত্যিকারের বিশ্বাস কেউ কাউকে করে না!

আমরা মনে করি যতদিন না এই বোমার আবিষ্কারক এবং অধিকারী রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ অতি সামান্য জীবন সম্বন্ধে উৎসাহী এবং ক্ষমতাবান হয়ে তাঁদের রাষ্ট্রনায়কদের মনে নৈতিক এবং সামাজিক চাপ দিতে সক্ষম হচ্ছেন, ততদিন এই ভয়ঙ্কর বোমার ভয় দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মাথার সামনে উদ্যত থাকবে।

প্রকৃত জীবন বোধের অভাব এবং বাকি জীবনের নৈরাশ্য মানুষকে আজ ধ্বংসলীলার লিবিড় মনোযন্ত করে তুলেছে। আগেই মানুষকে তার থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

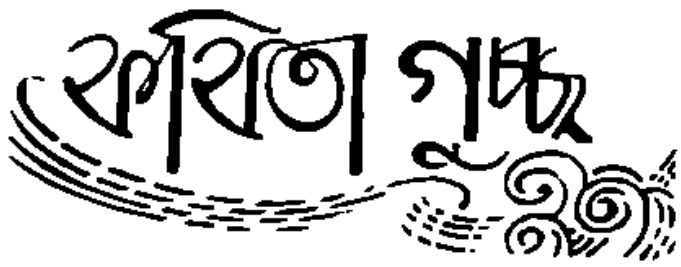

গ্রাম : শহর : সুর

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

এখানে সময় কাটাই নিতুই।
ঘর ছোপলায় বেড়া দেওয়া ঘর,
বাইরে এলেই মাঠে প্রান্তর,
আঙিনায় যুঁই, চালে লাউ পুঁই।

কাঠের পিঁড়িতে বসে হুঁকো হাতে
সন্ধ্যায় যার গল্প জমানো,
বিনিময় হয় খবর শুধানো,
সকলকে পাওয়া যায় একসাথে।

দুঃখের সুখের গল্প জমিয়ে,
গৃহ বিবাদের মিটিয়ে কলহ,
কেউ বলে : 'কিছু খবর বলহ,
অমিয় খাজনা দেবে কি কমিয়ে ?'

কেউ বলে : 'গাঁয়ে যায় না যে থাকা,
এখানে কিছুই মেলে না প্রচুর,
শহর কাপড়ে চালে ভরপুর,
যেখানেই যান সেখানেই টাকা।'

'গাঁয়ের মাথায় অশথ গাছের—'
কেউ বলে :—'জানো কি বয়স কতো,
দু'চার পুরুষ আছে অন্তত
দাঁড়িয়ে পাখীর গান শুনে ঢের।'

আমরাও তেমনি গাঁয়ের মানুষ,
অভ্যাস নেই যাওয়া ট্রামে বাসে,
গাঁয়ের লোকেরে দেখে তারা হাসে,
কী ছিল তাদেরো পূর্বপুরুষ !'

শহরের লোকে দেশকে ভাখেনি,
তাদের স্বপ্ন আছে ছাঁচে ঢালা,
জীবনে তাদের বহু জ্বালাপালা ;
সুখ খুঁজে তারা ? সুখ কী বুঝেনি ?

দেশ জননী যে ইসারা ছড়ায়—
এখানে ওখানে ধানের গুচ্ছে,
কাঁঠালের ভাগে, মধুর পুচ্ছে,
নদীর স্বচ্ছ জলের ধারায়।

আমরা ফলাই মাঠে মাঠে ধান,
তারপর দিই যতোই পাহারা,
শহরে সে-ধান নিয়ে যায় কারা,
আমরা পাইনা কোনো সন্ধান।

গ্রামগুলি তাই হচ্ছে যে খালি,
ইষ্টিশানের পথে কেউ চলে—
পাথরে বাঁধানো শহরের কোলে,
সেখানে আছে কি সুর ভাটিয়ালী ?

তবুও

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

জীবনের প্রতিছন্দ ম্লান হ'য়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
আরব্ধ কর্মের কক্ষে বেদনার বিষণ্ণ বিকেল,
রাত্রির অন্ধোর ধারা মাঝে মাঝে শ্রাবণী সন্ধ্যায়
মর্মে ঢালে বিষাদের বিড়ম্বিত আবিল আঁধার।

প্রিয়ার প্রণয় হাসি মনের স্তম্ভিত পরিবেশ—
পারেনা ছড়িয়ে দিতে মুঠা মুঠা আলোর আশ্বাস,
সাঙীর ডানার ডাকে এ মনের ভাঙেনা বিভ্রম
জীবনের আভরণে আবরণ নেমে আসে ধীরে।

একে একে সব যেন শূন্য গর্ভে লীন হয়ে যায়,
নাম-ডাক-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নসৌধ ধূলির মতন।
মনের ক্লান্তিরবুত্তে বিসারিত বিষণ্ণ গোধূলি—
আঁচলে বাঁধিতে চায় এজন্মের সর্ব উপচার!

তবুও তো বেঁচে আছি—বাঁচিবার সাধে মগ্ন মন
নিত্য মৃত্যু হানা দেয় রুদ্র তারে ধূর্ত ছলনায়।

যান্ত্রিক

প্রতিমন্যু মুখোপাধ্যায়

ক্ষীণকায় দীর্ঘপথ ধরিত্রীর সিঁথির মতন
দুদিকে শ্যামল বন গভীর নিদ্রায় অচেতন
দূর পর্বতের এক শিখরের সুদূর আহ্বান
আমাকে করেছে পাগল, অস্থির নিয়ত চলমান।
অগণন রাত্রিদিন মনে মনে গুনেছি প্রহর,
অথবা গ্লানির খাতে বহে গিয়ে হতাশা জর্জর
অশান্ত ঘূর্ণির ঝড় আমি যে তুলেছি অকারণ;
কখনো হৃদয় জুড়ে বেদনার কী অনুসরণ!

তাইতো যখনি সেই পর্বতের স্তব্ধ হাতছানি
দৃষ্টিতে দিয়েছে ধরা, তখনি নিশ্চিত মনে জানি
অজস্র আনন্দ আজ হৃদয়ের কন্দরে গুলন্ত,
আমার রক্তের স্রোতে সাড়ার সুস্পষ্ট অনুভব।

তখনি এপথে এক পথিকের দৃঢ় পদক্ষেপ,
বিগত সমস্ত ক্লান্তি, নিঃশেষিত সকল আক্ষেপ।

সেদিন সাইকোলজির চ্যাপ্টার খুলে ব'সতে গিয়ে কি ক'রণে যেন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে। আমাদের মাষ্টার মশাই। এমন আত্মভোলা সরল মানুষও এ যুগে হয়। ভালো মানুষ ব'লেই সংসারে তিনি সব দিক দিয়ে ঠকলেন। কলেজে অন্যান্য প্রফেসারদের কাছে তিনি উপহাসের পাত্র, প্রিন্সিপাল নিজেও নিত্যই অনুগ্রহের চোখেই দেখেন। এজন্য আজও তাঁর কিছু-একটা ইন্‌ক্রিমেন্ট্‌ বা উন্নতি চলো না। তা নিয়ে অবশ্য অধ্যাপক সিদ্ধান্তের অনুযোগ নেই কিছু। তিনি যা ক'রে—তাতে তাঁর আর রিষ্টুচরণের সিক্ত স্বচ্ছল ভাবেই

কিন্তু তাই ব'লে কলেজের নীতি কেন এমন

সকলকে আপন ঔদাসীন্য নিয়ে মুখ বুজে থাকেন বলে কি এত অবিচার হাসি মুখে সহ্য ক'রে যেতে হবে অধ্যাপক সিদ্ধান্তকেই? এমনি ক'রে অবিচারে অনাচারে যে পৃথিবী ক্রমেই ডুবে যেতে বসেছে! তার বিরুদ্ধে প্রয়োজন আজ একটা সুসংগঠিত সংগ্রামের। কিন্তু কে ক'রবে সেই সংগ্রাম? বাংলাদেশ যে আজ নেতৃত্বহীন হ'য়ে প'ড়েছে, নৈতিক জীবন থেকে অনেক দূরে আজ ছিটকে প'ড়ছে ছাত্র-সমাজ। ছাত্র হ'য়ে এ কলঙ্ক যে আমারও কলঙ্ক! কিন্তু কি ক'রতে পারি আমি, কি করবার মতো শক্তি আছে আমার? শুধু শ্রদ্ধা, শুধু অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন ভিন্ন আর কি ক'রতে পারি আমি? সেই শ্রদ্ধা যে অনেক আগেই তাঁকে দিয়েছি, দিয়েছি শুধু অধ্যাপক ব'লেই নয়, একটি সুন্দর অকৃত্রিম মানুষ ব'লে। অণিমার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টার সুর সেধেছি বটে, কিন্তু তা যে আমার অন্তরের সুর নয়, তা ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। ইদানিং কলেজের সঙ্গে বিযুক্ত হ'য়ে প'ড়েছি ব'লে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটাও একেবারেই মন্থীভূত হ'য়ে প'ড়েছিল। ইতিমধ্যে দিন দুয়েক আগে সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ একবার দেখা হ'য়ে গেল পথে। সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'প্রিপারেশন কেমন হ'চ্ছে?'

ব'ললাম, 'আপনার আশীর্বাদে বোধ করি এ বছরেই উৎরে যেতে পারবো। মোটামুটি রিভিশন ক'রে চ'লেছি।'

খুশী হ'লেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। বল্‌লেন, 'কিছু একটা খোরাক দেহে নিয়ে ষ্টাডি কোরো, তবে আর ব্রেণের উপর চাপ প'ড়বে না।'

ব'ল্‌লাম, কী বা পড়াশুনো করি, এটুকু চাপ ব্রেণের পক্ষে কিছুই নয়।'

শুনে এবারে আর কিছু-একটাও না বলে শুধু মুখ টিপে হাসলেন একবার অধ্যাপক সিদ্ধান্ত।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'শরীর আপনার সুস্থ আছে তো স্যার?'

—'হ্যাঁ, সুস্থই আছি, সুস্থ থাকতেই তো অন্ততঃ চেষ্টা করি।' অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বল্‌লেন, 'তবে কি জানো, মাঝে-মাঝে রিষ্টুচরণ বড় বেয়ারা কাজ ক'রে বসে। খাওয়া দাওয়ার পরিবেশন নিয়ে মাঝে মাঝে এত বেশী জোর করে যে তার ফলেই আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। অথচ ব'ল্‌লে ব্যাটা শুনবে না, উল্টে বলে—মা বেঁচে থেকে এ চাট্টি ছাতে তুলে দিলেও তো আপনি মুখে না তুলে পারতেন না। ব্যাটার যদি একটুও বুদ্ধি থাকে

সুনন্দ। আরে, মা আর তুই কি এক হলি? কিন্তু ব'লবো কাকে বলো, বিষ্টুচরণের ঐ এক খেয়াল।'

বললাম, 'ভালোই তো, আত্মীয়-বান্ধবহীন সংসারে বিষ্টুচরণ এটুকু যদি করে থাকে, তবে তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই তো উচিত। এ বয়সে আপনার দিকে এম্‌নি ক'রে কাউকে না তাকালে চলবে কেন?'

একথার কিছু-একটা উত্তর না দিয়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বললেন, 'ঠিক ক'রেছি, এবারে রিটায়ার ক'রে বাকি জীবনটা বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবো।'

বললাম, 'কলেজের পরিবেশ ছেড়ে তা কি আপনি সত্যিই পারবেন? তাতে কলেজেরও যে ক্ষতি হবে!'

—'কলেজের ক্ষতি হবে? হাসালে তুমি সুনন্দ। মাইনে দিয়ে প্রফেসার রাখবে কলেজ, আমি না থাকি আর কেউ আসবে; কলেজ ঠিকই চলে যাবে।' থেমে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বললেন, 'তবে আমি পারবো কিনা সেইটেই প্রশ্ন। পারবো নাইবা কেন, বলো? গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস ক'রলে এতদিনে তো কবেই পেন্সন নিতে হ'তো, বয়সটা তো সত্যি-সত্যিই ব'সে নেই। সাবেক কালে এবয়সে মানুষ বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রতো, এযুগে গোলামী না ক'রলে জীবিকা নির্বাহ হয় না, তাই—।'

কথাপ্রসঙ্গেই এবারে সাহসের উপর ভর ক'রে বললাম, 'অপরাধ মার্জনা ক'রবেন স্যার, ইচ্ছে ক'রলে তো আপনি বৃন্দাবনে না গিয়ে নিজের বাড়ীটাকেই বৃন্দাবন ক'রে তুলতে পারতেন! একমাত্র বিষ্টুচরণের সাহায্যটাই আপনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।'

এবারে আর এক মিনিটও দাঁড়ালেন না অধ্যাপক সিদ্ধান্ত, বললেন, 'ভেবে দেখেছি, কিন্তু স্কোপ পাই নি। আচ্ছা, আসি এখন; উইস্ ইউ সাকসেস্।' ধীরে ধীরে আবার সামনের পথে পা বাড়ালেন তিনি।

বুঝতে পারলুম না—কি বলতে চাইলেন তিনি তাঁর শেষ কথাটা দিয়ে! কিসের সাকসেস্, পরীক্ষার না আমার সঙ্গে অণিমার মিলনের? নতুন ক'রে নিজের সংসার রচনা সম্পর্কে ভেবে দেখেও তিনি সুযোগ পেয়ে ওঠেন নি, আমার আর অণিমার জীবনে সে সুযোগ এলে কি সত্যিই সুখী হবেন তিনি? হয়ত হবেন, হয়ত সত্যিই তাঁর যুক্ত কর প্রসারিত ক'রে আশীর্বাদ ক'রবেন তিনি আমাদের! আমরা যে সব চাইতে তাঁর প্রিয় ছাত্র, প্রিয় বলেই যে তাঁর স্নেহের সঙ্গে তাঁর প্রীতিও একই সঙ্গে লাভ করেছি। নইলে এম্‌নি ক'রে তাঁর মুখে মুখে কখনও কথা বলতেই পারতুম না। এমন মানুষ প্রিয় হ'য়েই জন্মান, প্রীতি দিয়েই সকলকে মুগ্ধ করেন; জীবিকার সূত্রে এঁরা কলেজের অধ্যাপক হয়ে এলেও এঁদের ভিতরের মানুষটি দুরন্ত বালকের মতোই অহর্নিশি বালক-বন্ধুদের সঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। অধ্যাপক সিদ্ধান্তও সেই মানুষ। অণিমা ভুল ক'রে তাঁকে চিন্‌তে পারে নি, সেটা অণিমার দোষ নয়, অণিমার চিরকালের নারী-মনের সংস্কারের দোষ, তা নিয়ে অনেক সময়ই অণিমাকে ঠাট্টায় ঠাট্টায় জর্জরিত ক'রে তুলেছি, বুঝতে পেরেছি—তাতে বিরক্ত হয়েছে অণিমা, সেই বিরক্তি দিয়েই তবু তার সংস্কার কাটাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পেরেছি কি? পারি নি। দেখলাম—মেয়েরা মত্ পাল্টাতে চাইলেও সংস্কার পাল্টাতে পারে না। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোনো প্রশ্ন নেই, এখানে সবাই তারা এক এবং অবিচ্ছিন্ন।

তা হোক্। পরীক্ষার হলে বসে কিন্তু এসব চিন্তা একটি বারের জন্যও মনে এলো না। পরীক্ষার গোড়ার দিকে 'প্রীচ' দেখতে এসে যেমন আশঙ্কা ছিল মনে, যেমন আশঙ্কা ছিল ইংরেজির ফার্ষ্ট পেপারখানি গার্ডের হাতে তুলে দিয়ে আসতে গিয়ে, ফিলজফি আর সাইকোলজির পেপারের দিন কিন্তু সেই আশঙ্কার পরিবর্তে কেমন একটা অপূর্ব খুসীতে সমস্তটা ভরপুর ভ'রে উঠলো। প্রায় সব ক'টি প্রশ্নই কমন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে এগুলোর প্রত্যেকটি ধ'রে ধ'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপক। তা ছাড়া কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁকে দিয়ে অণিমা যে বিষয়টা সম্পর্কে কয়মাস ধ'রে লিখিয়েছিল, সাইকোলজির প্রশ্ন-পত্রে হু-বহু সেই বিষয়গুলিই এসে গিয়েছে। কলম আর

থামতে চাই না। বেসের ঘোড়া যেভাবে কোমরে ঘা খেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে শুরু করে, সেই ভাবে দৌড়িয়ে চললো ছাত্রের কলম। কখন যে কোথা দিয়ে ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল, লক্ষ্য ছিল না। একসময় গার্ডের টেব্‌লে খাতা জমা দিয়ে মুক্ত ভয়ের বীরপুরুষের মতো বেরিয়ে এলাম হল থেকে। খোলা কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়াতেই অনিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারও মুখে দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য।

বললাম, 'ভিক্টরি অন্ টু ইউ, তোমারই জয় হ'লো অনিমা।'

ইচ্ছে করেই অনিমা ঘুরে বলতে চাইলো কথাটা।

বললাম, 'হল থেকে বেরিয়ে এসে এখনও কি মানে কিছু খুঁজে পেলে না? আমি যে তোমার ম্যাগাজিনের ভাগটাই লিখে দিয়ে এলাম খাতায়। এগ্‌জামিনার যত কড়াই হোক, ফুল মার্ক দিতে সে বাধ্য।'

হেসে অনিমা বললো, 'তা হ'লে কাজ কিছু আমি খারাপ করি নি বলো, কিছুটা অন্ততঃ খুশদৃষ্টিবোধ আছে!'

বললাম, 'কিছুটা নয়, পুরোপুরিই। এ কাজে সেদিন না হ'লেও আজ তুমি সমস্ত ছাত্র সমাজের ধন্যবাদভাজন হবে।'

—'সেটুকু তোমার প্রাপ্য।' অনিমা বললো, 'হাজার হোক, ম্যাগাজিনের আসল সম্পাদক তো তুমিই ছিলে!'

বললাম, 'তুমিই কি নকল ছিলে নাকি! ছেলেরা এসে তো রচনা প্রকাশ সম্পর্কে তোমাকেই ধ'রতো!'

মুখ টিপে হাসলো একবার অনিমা, বললো, 'তারা জানতো তোমার দুর্বলতা কোথায়! সংসারেও ছেলে মেয়েরা মা'র কাছেই আব্দার করে, তারা জানে—এ আব্দার বাবাই পালন ক'রবে।'

বললাম, 'এত শীগগিরই মা হয়ে বসেছ, এরপর কি করবে তুমি?'

— তোমার সঙ্গে পারফেক্ট নন-কোয়াপারেশন, নইলে তুমি ভক্ত হবে না।' থেমে অনিমা বললো, 'আচ্ছা তোমার কি একটুও পরীক্ষার ভাবনা নেই, তুমি কি বলোতো সুমন্ত!'

বললাম, 'পরীক্ষা যে শেষ করেই বেরোলাম, ও নিয়ে আর চিন্তা করে কি হবে! ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং হয় পাশ না হয় ফেল, এর মাঝামাঝি আর কিছু নেই।'

অনিমার কিন্তু তখনও অনার্স-পেপার বাকী পরীক্ষার চিন্তা তাই মাথা থেকে একেবারে কাটেনি বললো, 'অত সহজ হিসেবে চলতে গেলে তো পরীক্ষ না দিলেও চলতো, তবে আর এত প্রাণান্ত পরিশ্র কেন? তোমার ডিষ্টিংশন আর আমার অনার্স—এই নিয়েই আমরা ডিষ্টিংগুইশ্‌ড হবো, অনার্ড হবো। পরীক্ষ নিয়ে তাই কিছু ভাববার কারণ আছে বৈ কি।'

—'তুমি ভাবো, আমার আর ব্রেনে কুলোয় না। বলে বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম।

অনিমাও মিছেমিছি ফাঁকা কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে কিছু একটা আকাশ-পাতাল পরিকল্পনা করে মিথ্যে সময় অতিবাহিত করলো না। আমার পায়ের সঙ্গে তাল রেখে সেও এবারে পা চালালো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ীর অবস্থা কি রকম, শাঁখ না গম্ভীর?'

অনিমা বললো, 'আমি এখানে থাকতে আর শান্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু দুঃখ রয়ে গেল, মাকে পেলাম কিন্তু মার স্নেহ পেলাম না। অনেকে শিশুকাল থেকে মাতৃহারা হয়ে চিরজীবন মায়ের অভাব বোধ করে, আমার মা থেকেও মায়ের অভাব ঘুচলো না।'

বললাম, 'এর জন্যেও আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা দায়ী। স্নেহ বলো, ভালোবাসা বলো—সব কিছুর মূলে রয়েছে অর্থনীতি। মন যেখানে প্রতিমুহূর্তে বিকারগ্রস্ত স্নেহ সেখানে আপনি থেকেই পলাতক। তোমার আমার পৈতৃক সংসারচক্র আমাদের আজকের সমাজ ব্যবস্থারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; তা নিয়ে আমাদে দুঃখ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু হাহাকার করবো ন তার জন্যে।'

উত্তরে এবারে আর কিছু একটাও বললো না অণিমা।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিক্রম করে পুনরায় বললাম, 'এতদিন পড়াশুনো নিয়ে দিব্বি মেতে ছিলাম, কোথা দিয়ে দিনগুলি কেটে গেছে, টেরই পাইনি। পরীক্ষা শেষ করে এখন ভাবছি—মুহূর্তগুলি কি করে কাটাই!'

অণিমা বললো, গ্রন্থসমুদ্রে ঝাঁপ দাও; অবগাহনও হবে, মুক্তা আহরণও হবে।'

বললাম, 'কথাটা মন্দ নয় যদি অনুকূল পরিবেশ থাকতো, তার চাইতে চলো না—তোমার অনার্স শেষ হলে দু'জনে কোথাও বেরিয়ে পড়ি। তাতে মনেরও অনেকখানি পরিবর্তন হবে।'

—'আপাতত তারই বা সুযোগ কোথায়!' অণিমা বললো, 'ভেবেছি একেবারেই বেরোবো—আর যাতে না ফিরতে হয় এ সহরে। ঘর ছাড়তে পারলে আমিই কি কম সুখী হই সুমন্ত!'

—'ঘর বাঁধবার মতো পুঁজি নিয়েই ঘর ছাড়বার প্রশ্ন আসে। আমাদের পুঁজি হচ্ছে মন। মনের দিক দিয়ে তুমি তবে প্রস্তুত বলো?'—পা দুখানি হঠাৎ কেমন অচল হয়ে আসছিল, একবার থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালাম অণিমার মুখের দিকে।

অণিমা কিন্তু এতটুকুও সঙ্কোচ করল না, বললো, 'তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। তার জন্যে তো মনের অপ্রস্তুতি কোনোকালেই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু তার আগে আমাকে কাজ কিছু একটা পেতেই হবে। সংসারে মার স্নেহ না পাই, কিন্তু বাবার দারিদ্র্য তো আমার নিজের জীবন দিয়েই চিরকাল উপলব্ধি করলাম! আমি সংসারের বিরাগভাজন হলেও সংসারের প্রতি আমার কর্তব্য আছে। বাজারে বাবার বহু টাকা দেনা, দেনার দেনায় তলিয়ে গিয়ে আজ আর মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না বাবা। সেই দেনা আমাকে শোধ করতেই হবে, নইলে ভগবানের কাছে ক্ষমা পাবো না। নীলার অফুরন্ত ভবিষ্যৎ পড়ে আছে সামনে। সংসারের আঘাত থেকে নীলাকে রক্ষা করতেও যে আমার চাকরীর প্রয়োজন। এমনি করে যেদিন কর্তব্যের পাষাণচাপ থেকে মুক্ত হতে পারবো, সেদিনই না তোমাকে নিয়ে আমার বাসররচনা সার্থক হয়ে উঠবে! শুধু কিছু সময়ের প্রয়োজন, তার সাথে কিছু ধৈর্য।'

বললাম, 'পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করেই আবার বলি—তুমি চাকরী না করে আমি যদি করি, আমি যদি তোমার হয়ে তোমার বাবার সমস্ত দেনা একদিন শোধ করে দিতে পারি, তবে কি তুমি রাজি নও?'

—'তা হয় না সুমন্ত।' পেয়ে অণিমা বললো, 'পৃথিবীতে যাঁরা আমাকে আনলেন, যাঁদের মধ্য দিয়ে এ জগতে এসে একান্ত নিজের করে পেলাম তোমাকে, তাঁদের জন্যে আমাকেই যে কাজ করবার দরকার। বাপ মার ঋণ নাকি শোধ করা যায় না, কিন্তু ভগবানের কাছেও তো অন্তত: পরিষ্কার থাকা যায়। আমাকে অন্তত: সে সুযোগটুকু দাও তুমি সুমন্ত।'

বললাম, 'তুমি যদি সুখী হও, তবে তাই হোক। তোমাকে অসুখী রেখে আমি নিজেও যে একটা মুহূর্তের জন্যেও তিষ্ঠোতে পারবো না। চাকরী বরং ইতিমধ্যে আমি নিজেও একটা খুঁজবো।'

—'তাই খুঁজো। অন্তত: একঘায়ায় পৃথক ফলে লাভ নেই, এ তো ঠিকই!' বলে মুখ টিপে একবার হাসলো অণিমা। সেটুকু যে তার সহজ প্রাণের হাসি নয়, তা তার মুখের দিকে লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলুম। আজকের সমাজে গোলামী ভিন্ন আমাদের অন্নপথ কোথায়? বোধ করি একথাটা ভেবেই মনে মনে একবার অস্থির হয়ে উঠেছিল অণিমা। কিন্তু তা নিয়ে নতুন করে আর একটি কথাও তুললো না। পথও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। আর কয়েক পা এগোলেই অণিমাদের বাড়ী। নীরবে তাই আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বিদায় নিলো সে।

[৩]

আত্মীয়তার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে হৈমন্তী বোধ করি সম্পর্কে আমার মাসীই হন। মা'র দিদির ননদ, অতএব মাসীমার ননদ মাসী ভিন্ন কি! কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম দু'একদিনেই কিন্তু যাবার নাম ক'রছেন না হৈমন্তী। গেলে ভালো করতেন, বাড়ীটা অন্ততঃ কিছু ফাঁকা হ'তো; কিন্তু মার সঙ্গে ক্রমেই যেন তাঁর অদ্ভুত এক আত্মীয়তার লক্ষণ গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি জন্ম অবধি কোনোদিন কিন্তু এমন আত্মীয়কে অন্ততঃ একটা বেলার জন্যও আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে দেখিনি! মাসীমাকেই মাত্র বার-দু'য়েক দেখেছি এসে থেকে গেছেন, আর ইনি তো তাঁর ননদ, বিবাহিতা হ'য়ে একেবারেই আলাদা সংসারের মানুষ! কিন্তু হ'লে কি হবে, সংসারে কার সঙ্গে কখন সামান্য সম্পর্কটুকুও বৃহত্তর আত্মীয়তায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—সে বড় বিচিত্র ব্যাপার। মনে মনে ভাব্‌লাম—মা'র সঙ্গে হৈমন্তীর এমনই একটা ব্যাপার হয়ত ঘ'টে থাকবে!

দু'টুকেও বড় বেশী ক্ষতি ছিল না আমার। তাঁদের নিয়ে সহরের দ্রষ্টব্য স্থলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আন্‌বার জন্য মা অবিশ্যি করেকবারই আমাকে ব'লেছিলেন, কিন্তু কোনোবারই আমি রাজি হবার মতো জবাব দিতে পারিনি। দেখে শুনে মাও নিরস্ত হ'য়েছেন। আমার অধ্যয়ন-কক্ষে যেখানে আমার নিজের স্বাধীন সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত, নিজেকে নিয়ে আবার আমি খানিকটা সহজ হ'তে চেষ্টা ক'রলাম সেখানে। কিন্তু উপায় আছে কি সহজ হবার? ক'দিন হ'য়েই লক্ষ্য ক'রছিলাম—কে যেন আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার ঘরে এসে এলোমেলো জিনিষপত্র গুলোকে স্তরে স্তরে সুসজ্জিতভাবে গুছিয়ে রেখে যায়। গোছগাছের দিকে কোনোকালেই অবশ্য বড়-একটা দৃষ্টি ছিল না আমার। অগোছালো স্বভাবের মধ্যেই কেমন যেন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল—প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো চোখ বুলোলেই হাতের কাছে পেয়ে যেতাম। গুছিয়ে রাখার ফলে আমার সেই চির-কালের অভ্যাসের উপর বরং খানিকটা কুঠারাঘাতই হ'লো। এতকাল যা ছিল চোখের সাম্‌নে, এবারে তা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিশেষ একটা স্তর-বিন্যাসে। ফলে এতকাল চোখ বুলোলেই যা হাতের মুঠোয় পেয়ে যেতাম, এখন তা তত সহজেই চোখে পড়ে না। সেদিন কি একটা বই খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ বিরক্তিই হ'লো। রাগ হ'লে আমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বইটা খুঁজতে গিয়ে সেই ক্রোধ অকস্মাৎ ব্রহ্মতালুতে গিয়ে আঘাত ক'রলো। ছুঁড়ে তচ্‌নচ্‌ ক'রে ফেলে দিলাম সমস্ত কিছুকে। আর সেই মুহূর্তেই দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়ালো তনুশ্রী। মার আহ্বানে হৈমন্তীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবার অবকাশে কয়েকটা মুহূর্তই মাত্র একদিন দু'চোখের দৃষ্টি মেলে স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম মেয়েটিকে। তারপর এ' ক' দিনের মধ্যে এত স্পষ্টভাবে সেও যেমন আমার চোখের সাম্‌নে পড়েনি, আমিও বড় বেশী ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে দেখিনি তাকে।

দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েই খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লো সে: 'ওমা, এ কি কাণ্ড, এ যে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে নিয়েছেন।'

বিরক্তির মুহূর্তে বিরক্তিকর কথা শুন্‌লে স্বভাবতঃই ক্রোধ বেড়ে যায়, আমারও যে না গেল, তা নয়, কিন্তু কিছু একটাও না ব'লে শুধু একবার মুহূর্তের জন্য তনুশ্রীর মুখের দিকে তাকালাম।

এবারে আপন মনেই খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো তনুশ্রী, ব'ল্‌লো, 'আকাশের অবস্থাটা ভালো নয় দেখ্‌তে পাচ্ছি।'

—'কেন, এ সময়ে তো মেঘ হবার কথা নয়।' বই-গুলোকে ওলট-পালট করতে করতেই কথাটা বললাম।

—'কথা আবার নয়!' অতিকষ্টে হাসি গোপন করে তনুশ্রী বললো, 'যেমন মেঘ ক'রেছে, আষাঢ় ভেঙে পড়লো ব'লে।'

মানসিক অবস্থা এমন ছিল না যে, নিজেকে নিয়ে বিশেষ কিছু একটা ভাবতে পারি। তনুশ্রীর কথা শুনে এবারে কৌতূহলবশেই জানালা দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, দিব্যি স্বচ্ছ আকাশ। এবারে কিন্তু সত্যি-সত্যিই ক্রোধকে অবদমন করা কঠিন হয়ে পড়লো। বললাম, 'হয় চশমা নিন, না হয় কিছুকাল রাঁচী গিয়ে থেকে আসুন। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আপনার পক্ষে উচিত হবে না।'

—'কেন, খুব অস্বস্তিবোধ করছেন, তাই না?' তনুশ্রী বললো, 'তা ছাড়া এভাবে আপনি করে বলছেন কেন আমাকে? আমি আপনার চাইতে যে কত ছোট, সে কি জানেন না? তা ছাড়া—'

বইগুলোকে এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে দিতে-দিতে আবার প্রায় পূর্বের আকারে পাহাড় গড়ে উঠেছিল, তথাপি হাত দুখানি নিষ্ক্রিয় ছিল না। স্বল্পক্ষণের জন্ত আর একবার মুখ উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাছাড়া কি?'

—'না কিছু না।' চৌকাঠের ভিতরে পা গলিয়ে দিয়ে এবারে একপাশে এসে সরে দাঁড়ালো তনুশ্রী। তারপর একটুকাল থেমে বললো, 'আপনি বুঝি গোছগাছ কিছু পছন্দ করেন না?'

এবারে কেন যেন আপনি সম্বোধনটা আর মুখে এলো না।

বললাম, 'কেন বলো তো?'

—'নইলে এমন কালো মেঘে আকাশ ভারী হয়ে উঠবে কেন?' বলে তনুশ্রী আর একবার মৃদু হাসলো।

এবারে বুঝতে পারলুম—কোন আকাশে মেঘের কথা উল্লেখ করেছিল সে! বললাম, 'হাসি ঠাট্টারও একটা সীমা থাকা উচিত।'

কথা শুনে বোধ করি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো তনুশ্রী, বললো, 'ছিঃ ছিঃ, এই কি ধারণা করে নিয়েছেন যে, আমি আপনার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে পারি! অপরাধ হলে বরং নিজে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নেবো।'

বললাম, 'থাক, ক্ষমা আর চাইতে হবে না, এবার অনুগ্রহ করে নিজের কাজে গেলেই আমি খুশী হবো।' আসলে তনুশ্রীর এই অযাচিত উপস্থিতিতে মনে মনে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। সাইকোলজির ছাত্র হয়েও একপাটা কিছুতেই বুঝতে চাইলাম না যে, আমার সংস্পর্শে এসে মেয়েটি কিছুটা উচ্ছল হয়ে উঠতে চায়। এ পৃথিবীতে একমাত্র অলিমা ভিন্ন অপর কারুর উচ্ছলতার প্রতি সচেতন না হওয়াটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটুকু বোধ করি বুঝতে পারলো না তনুশ্রী। কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে বললো, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দেবেন?'

—'দেবার হ'লে নিশ্চয়ই দেবো।'

—'একটু আগে বইগুলো গুছানো অবস্থাতেই ভালো ছিল—না এখনই ভালো দেখাচ্ছে?' অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে প্রগাঢ় চোখ দুটোকে নিবদ্ধ করে রাখলো তনুশ্রী আমার মুখের দিকে।

বললাম, 'তা হলে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঘরে এসে তুমিই বইগুলোকে এমনি করে ওছিয়ে রেখে যাও?'

জবাব দিল না তনুশ্রী।

বললাম, 'যদি জানা না থাকে, তাই জানিয়ে রাখছি যে, তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছ। এ ঘরে এসে আমার কোনো জিনিষে কেউ হাত দেয়—তা আমি পছন্দ করি না। একথা আমার বাবা অবধি জানেন।'

শুনে এবারে সত্যি-সত্যিই আহত হ'লো তনুশ্রী। আসলে তাকে আঘাত দেবার জন্তেই কথাটার অবতারণা করলাম, নইলে মনের কুদ্ধ আগল ভেঙে এমন রূঢ়তার প্রকাশ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না।

অত্যন্ত নম্র কণ্ঠে এবারে তনুশ্রী বললো, 'ঘরে আসা না হয় না-ই পছন্দ করলেন, কিন্তু সাধারণ পছন্দ অপছন্দ বোধটুকুও তো আপনার আছে! যেখানে যে জিনিষটি থাকলে দেখতে ভালো দেখায়, সে কি আপনারই ভালো লাগে না?'

বললাম—সহজে সরে যাবার মতো মেয়ে নয় তনুশ্রী। কথা দিয়ে কথা কাটবার জন্যেই যেন সে ক্রমশঃ প্রস্তুত হচ্ছে। ব'ললাম, 'সংসারে ভালো লাগার কিছু মানদণ্ড নেই। ওটা যার যার রুচি আর ধাত অনুযায়ী গড়ে ওঠে। এ নিয়ে তর্ক করাও চলে না, দোষারোপ করাও চলে না।'

—'তা হ'লে আপনার রুচিটাকে কিন্তু খুব তারিফ করতে পারছি না।' ব'লে আর একবার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি টানতে চেষ্টা ক'রলো তনুশ্রী।

বললাম, 'রুচি সম্পর্কে এ পর্যন্ত কারুর কাছে কোনো জবাবদিহি দিতে হয় নি, তাই এ বিষয়ে কিছু ব'লতেও আমি অভ্যস্ত নই। এর পরে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কিছু উত্থাপন না ক'রলেই আমি খুশী হবো।

এবারে স্বল্পক্ষণের জন্য একবার থামলো তনুশ্রী, তারপর নম্রকণ্ঠে ব'ললো, 'আপনি কিন্তু অল্পতেই ভীষণ রেগে যান। দু'দিনের জন্যে আপনাদের এখানে বেড়াতে এসে তবে কি আপনার রাগটাই শুধু দেখে যাবো?'

কথা শুনে এবারে খানিকটা বিব্রত বোধই ক'রলাম। বললাম, 'আমার সঙ্গে বাড়ীর যা সম্পর্ক, তাতে আমার রাগ অনুরাগ নিয়ে কাউকে ভাবতেও হয় না, ধারও ধারতে হয় না। তুমিই বা ধারবে কেন?'

—'আমরা মেয়ে বলেই আমাদের খানিকটা ধারতে হয়' তনুশ্রী বললো, 'এখানে এলাম, মুখ ফুটে কারুর সঙ্গে দুটো ভালো ক'রে কথা বলতে পারি—এমন কাউকে পেলাম না। বড় তরফে বসে বসে কতক্ষণই বা কথা খেলা চলে? রয়েছেন আপনি, অথচ এসে অবধি দেখছি—সংসারে থেকেও সংসার সম্পর্কে আপনি পুরোমাত্রায় উদাসীন। দিনরাত চুপ চাপ বসে বসে যে আমার কিভাবে কাটছে, বুঝোতে পারবো না।'

বললাম, 'তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করা ভিন্ন আমার আর কিছুই করবার নেই।'

তাকিয়ে দেখলাম, একটু আগে হাসির বিভায় যেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল তনুশ্রী, এবার সে উজ্জ্বলতা কেটে গিয়ে কেমন একটা রুদ্ধ আবেগে থম্‌থম্ ক'রছে তার সারা মুখখানি। হয়ত এখনই আবার কিছু একটা ব'লে আমাকে মুখর ক'রে তুলবে! মুখর হ'তে দুঃখ ছিল না—যদি এই মুহূর্তে অনিমা এসে সামনে বসতো। মুখর হ'তেও তো খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি চাই! তনুশ্রীকে নিয়ে মন কি সত্যিই সেভাবে প্রস্তুত হ'তে পারলো? গায়ে পড়ে এসে দুঃখ নিয়ে যেতেও তাকে যেমন কেউ বলে নি, কথা বলার অছিলায় আত্মীয়তাকে গাঢ় ক'রে তুলতেও তাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি। তা যদি কেউ দিয়ে থাকে, তবে না, আমি নই। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাটা তাই বাইরের দুয়ার থেকে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। মনে মনে খানিকটা অধীর চাঞ্চল্য নিয়েই বিনা কারণে এবারে উঠে পড়লাম। উঠে পড়া ছাড়া গতি ছিল না। ঘরে বসে এমন অযাচিতভাবে তনুশ্রীর প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য মনটা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বললাম, 'বাইরে আমার কাজ রয়েছে, আমি বেরোচ্ছি।'

তনুশ্রী এবারে আর একটু কালও বিলম্ব ক'রলো না বা 'কোথায় বেরোচ্ছি' কিম্বা 'কখন ফিরছি' ব'লে কিছুমাত্র প্রশ্ন ক'রলো না। ধীরে ধীরে আবার চৌকাঠ পেরিয়ে উঠানের দিকে নেমে গেল।

এ সময়ে বাইরে বেরোবার আমার কিছুমাত্র তাগিদ ছিল না, তবু তনুশ্রীর কাছ থেকে নিজেকে এড়িয়ে নেবার জন্যেই পথের আশ্রয় নিতে হ'লো।

[ক্রমশঃ]

বৈ

লনকভ বিদায়

রাজনীতি সাধারণ রাজনীতির নিয়ম [illegible]
নহে। যেমন, যেখানে বহু দলীয় রাজনীতির
স্থিত্ব আছে—সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা [illegible]
করিবার অবকাশ [illegible] আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক [illegible]
কিছু না কিছু মতবিরোধ থাকে। কিন্তু [illegible]
নীতিতে মেই [illegible]

যে, মার্শাল বুলগানিন প্রধান [illegible]
এই প্রস্তাব যে পূর্ব হইতেই
প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে
সাধারণ নিয়ম হিসাবে ম্যালে
পদত্যাগ বিষয় বিবেচনা করি
হইত। ইহা সাধারণ রীতি
করিল তাহাকে ভদ্রতার খা
করা উচিত। এই প্রথা একদ
ম্যালেনকভ অপসারণ বুহ
করণ মাত্র। ইহাতে বৈদে
[illegible] সম্ভাবনা কম। সহ-
[illegible] ভাই সাজা হইয়া স্বীকার
[illegible]

২৮টি রাষ্ট্রের মিলিত সম্মেলন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই সমর্থন প্রসঙ্গে নেহেরুজী বলিয়াছেন, পৃথিবীর সেনাপতিরা যুদ্ধ এড়াইয়া যাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত। কারণ যুদ্ধের আসল রূপটা তাঁহাদের জানা আছে। যুদ্ধ বাধিলে যে কেহই জিতিবেনা সেটা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। এই মনোভাব অবশ্যই বিশ্ব শান্তির অনুকূলে বলিতে হইবে। শোনা যাইতেছে ব্রিটেনেরও মনোভাব অনুরূপ। রাশিয়াও সেই কথাই বলিতেছে। এমনকি সম্প্রতি আমেরিকাতে জেনারেল ম্যাক আর্থারও এইরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপে তিনটি দেশের মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া নেহেরুজী বলিয়াছেন, কহই স্বেচ্ছায় বিশ্বযুদ্ধ বাধাইবে না মনে হয়। কিন্তু বিপদ এই যে, হঠাৎ কোন ব্যাপারে বা কোন আকস্মিক ঘটনায় লড়াই বাধিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের

আণবিক বোমার গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ লইয়া যেভাবে অবিশ্বাস ও সন্দেহ বানা বাধিতেছে তাতে সব শুভেচ্ছাই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম। নেহেরুজী বলিয়াছেন, ওরূপ নয়। বস্তুতঃ পক্ষে তাহাই।

প্রয়োজনের বন্ধুত্ব

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারীর এক খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' চীনকে আশ্বাস দিয়াছে যে, চীন রক্ষার সংগ্রামে রাশিয়া তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু চীনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবে। এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া প্রস্তাব করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা চীনকে সাহায্য না করিলে রাশিয়া নিজেও প্রাচ্যদেশে ঠাঁই পাইবে না। ইতিপূর্বে রুশ বিপ্লব যে প্রভাব বিশ্বের জাতিসমূহের উপর বিস্তার করিয়াছিল তাহা গত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরও অটুট রহিয়াছে। কিন্তু ষ্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রেমলিনের শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন বিশ্বের চোখে দ্রুত ও সুদূর-প্রসারী বলিয়া বোধ হইতেছে। পক্ষান্তরে চীন অনেক দুরূহ ও দীর্ঘ গৃহ যুদ্ধের পর একটি স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মাও সেতুং-এর প্রভাব ইতিপূর্বেই ষ্টালিনের প্রভাবের সমকক্ষ ছিল। ষ্টালিন শেষ বয়সে বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য জাতিতা বিপ্লব সংগঠনে কাহারো চাইতে ন্যূন নহে। ইহার ফলে মার্কসবাদী বিপ্লবের একমাত্র নেতৃত্বের দাবী রুশরা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। এই জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার একটা ছোটখাট মহড়া কোরিয়া যুদ্ধে হইয়া গিয়াছে। রুশরা বিশাল দেশ চীনকে ঘাঁটায় নাই কাজেই প্রাচ্য সমস্যায় রাশিয়ার সহায়তা রাশিয়ার নিজের প্রয়োজন হইতে আসিয়াছে।

ব্রিটেনে আণবিক বোমা তৈরী করা হইবে

ব্রিটেন ঘোষণা করিয়াছে যে, হাইড্রোজেন বোমা সংক্রান্ত গবেষণা যে পর্যায় পৌঁছিয়াছে তাহার আরও প্রসারসাধন করিয়া ব্রিটেনে আণবিক বোমা তৈরী করা হইবে।

ব্রিটেনের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্যপক্ষকে উৎসাহিত বা দমিত করিবে তাহা নিরূপণ করার ক্ষমতা আমাদের নাই তবে ইহাতে প্রমাণ হয় যে কেহই বসিয়া নাই। যে যেমন পারিতেছে—সে তেমন শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী বোমা প্রস্তুত করিতেছে। শেষ পর্যন্ত কে কোথায় গিয়া ঠেকিবে তাহা পূর্বাহ্নে বলিয়া দেওয়া কঠিন। মনে হয় পৃথিবীতে ধ্বংস বীজাণুরা প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।

ডালেসের সতর্কবাণী

"পরিশেষে আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই যে, একথা যেন কেহ তাচ্ছিল্যভরে মনে না করেন যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে অনবরত একতরফা সুযোগ সুবিধা দিয়া বিশ্বে আবহমানকাল শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব একমাত্র অ-কম্যুনিষ্ট দেশসমূহেরই।" মিঃ ডালেসের এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হইবার পর চৌ এন লাইয়ের আর একটি অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি একে অপরকে শাসাইতে শুরু করিয়াছে। এই শাসানি উত্তরকালে কি পর্যায়ে পৌঁছাইবে তাহা বিশ্ববাসীর জানা নাই। বিশ্ব ফরমোজা ও পেস্কাডোর্স রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কাঁধে বহন করিয়া মার্কিণ রাজনীতি যেভাবে রোষ প্রকাশ করিতেছে

তাহাতে শেষ পর্যন্ত বেচারী চিয়াং কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন। সামান্য দ্বীপপুঞ্জের রক্ষায় আজ বিশ্ব ত্রিভুবন কাঁপিতেছে। কিন্তু এশিয়া অঞ্চলে এই সতর্কবাণীর অর্থ শুধু মূল চীন ও দ্বীপময় ফরমোজার পক্ষে অর্থবোধক নহে। কোনরূপ বিস্ফোট বাধিলে তাহা এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রাস করিবে এবং এই অনুন্নত মহাদেশের অধিবাসীরা পতঙ্গের মত প্রাণ হারাইবে। কাজেই হিরোসিমা যাতে দ্বিতীয়বার না ঘটে তাহার সর্বরূপ ব্যবস্থাই এশিয়াবাসীদের করিতে হইবে। তাছাড়া আর একটি ভয়ের কারণ আছে। যদি এশিয়াবাসীকে কোনক্রমে যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলা যায় তবে এশিয়াবাসীর অর্থনৈতিক গঠন ব্যাহত হইবে। ফলে বহু বছরের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা। কাজেই এশিয়ার রাজনীতি কোন অবস্থাতেই ইউরোপীয় রাজনীতির অনুরূপ নহে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এশিয়ার আজিও সম্পূর্ণ নহে।

নবরূপে 'সেতো'

সম্প্রতি ব্যাঙ্কক রাজনৈতিক অষ্টবজ্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবোদ্বিত রাজনৈতিক ঢেউ বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলির দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। যে মহাদেশের অধিকাংশ জনসাধারণ অর্ধাশনে ও নগ্নদেহে জীবন যাপন করে সে দেশে রাজনৈতিক মতবাদ কম্যুনিষ্ট ঘেঁসা হইবে ইহা সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে। কেন না, কম্যুনিষ্ট প্রচার এইরূপ চালু হইয়াছে যে, সব শান্তি সব স্বাচ্ছন্দ্য কম্যুনিজম আসিলেই হইবে। এশিয়ার যে অঞ্চলে অন্য কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদ লইয়া আন্দোলন হয় নাই, সেখানেই এই প্রচারকার্য করা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সুচিন্তিত জনমত নবীন রাজনৈতিক আদর্শবাদ গ্রহণ করিয়াছে—যেমন ভারতবর্ষ—সেখানে কম্যুনিজম ভয়ের কারণ নহে। কাজেই সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষ বাদে কম্যুনিষ্ট ভীতি সর্বত্র রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া যেসব পাশ্চাত্য জাতি প্রশান্ত মহাসাগরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া পশ্চিমী রক্ষাকবচ ভিক্ষা মাগিতেছে তাহাদের মধ্যে এই ভীতি অধিকতর প্রবল। বস্তুতঃপক্ষে তাহাদের রক্ষার্থে পাশ্চাত্য জাতিগুলির অবচেতন মনে একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। ইহা বাদে এশিয়া মহাদেশে পাশ্চাত্য জাতি প্রভুত্ব পোক্ত করিয়াছিল তাহা আরও কঠিন ও দৃঢ় করা যায় কিনা ও ইহা পাশ্চাত্য জাতিগুলির চিন্তার বিষয়। এই সব বিভিন্ন কারণে এশিয়াতে রাজনীতি একমাত্র কম্যুনিষ্ট প্রতিরোধক রাজনীতি হইয়াছে। মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পাশ্চাত্য জাতিগুলি নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছে তাই ব্যাঙ্কক সম্মেলনে দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যা প্রধান স্থান পাইয়াছে। বস্তুতঃ এইসব মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধান করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিবর্গ এশিয়া অঞ্চলে আবার ডানা মেলিবার ইচ্ছা করিতেছে। ইতিপূর্বে যেসব কূটনৈতিক দাবা খেলা চলিয়াছে তাহাতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এবার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। চীন প্রভাব মুক্ত, ভারত হাতছাড়া, কাজেই দেশ হিসাবে—রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে নহে—এই দুইজনার একজনও সঙ্গী না থাকিলে প্রাচ্যদেশে পারিয়া ওঠা যাইবে না। তাই ভারতের প্রতি আজ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির সদয় ভাব। এই সব কূটনৈতিক সম্মেলনের মধ্যে ভারতের স্থান কোথায় তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। ভারত জনবলে শক্তিশালী হইলেও, ভারতের শিল্পায়ন পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এখন বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

ভারত এবং অন্যান্য দেশের আপেক্ষিক অনগ্রসর অবস্থা অবশ্যই রাজনীতিতে প্রতিফলিত হইবে। সে অবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিণ বাণিজ্যনীতি কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা আজিও স্থির করা কঠিন। রুশিয়া ক্রমশ তাহার ছ'মার্গ পরিহার করিয়া প্রাচ্যদেশে বণিকেরবৃত্তি অবলম্বন করিতে চলিয়াছে। ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ বণিকেরা অনগ্রসর দেশকে উন্নত করিবার কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। ভারতে ইস্পাত শিল্পের গঠন-কার্যে এই নীতির

বিদেশে বোঝাতে যাবার উচিত নয়।
তাদের টাকাকে বাড়িয়ে তুলতে
তবে হয় এ বিষয়ে
অনেকখানি
ইংরেজের প্রত্যাবর্তন
মুক্ত কি তাহা বিদেশ ভাবে আমেরিকা
চাহা ভাবে যেটাই কুটনীতিতে
মুক্ত ভাবিয়া আসে
। যাহা দিতে পারে না। মিঃ
সচিব তাহার আর একটি
না সংক্রান্ত নীতি

ফ্রেঞ্চ-ইংরেজ ঠোকাঠুকি

প্রকাশ মিঃ ইডেন আমেরিকার কাছাকাছি
করিয়া অবলম্বনীতি সমর্থন করে নাই। পরন্তু
করিয়াছে ফলে মিঃ
সহিত সমর্থন
ফলে কিছু নীতিগত বিরোধ দেখা
এই নীতির বিরোধে কে জয়ী হইবে। ব্রিটেন
আমেরিকা ?

গুপ্তচর মুক্তি প্রসঙ্গ

মার্কিন নাগরিক ও মিঃ
মালেকম হারেল টাকের কর্মশালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের পথে ঢাকা-এ আসেন।
তো কুপার' নামক এক টাকের সংবাদপত্রে লিখিত এক
প্রবন্ধে তাঁহারা স্বীকার করেন যে, ঢ লে গুপ্তচর হিসাবে
কাজ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল।
—ইহা যদি সত্য হয় তবে পররাষ্ট্র বিভাগ
কি উত্তর দিবেন ?

সোভিয়েট রাশিয়ায় আরও মন্ত্রী পতন

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, সোভি
বরলা সিনের ভারপ্রাপ্ত
ভোরোশেভকে পদচ্যুত করিয়াছেন সরকার
ভারপ্রাপ্ত মিঃ এ. আই. কজলভকেও পদচ্যুত
করিয়াছেন। সাধারণভাবে ও কুঞ্চা' ইহাই
আমরা জানিতাম। পতন ত হইল কিন্তু ইহাদের
কাহারো রাজনৈতিক মৃত্যু হইয়াছে কিনা জানা যায়
পাঠক অপেক্ষা করুন যে সময়ও আমরা পাইব
বেরিয়া নাটকের পুনরাভিনয় হওয়া অসম্ভব নহে

সমাজ ও জাতীয়জীবন

[র. কু. সে.]

আমাদের চরিত্রের সব চাইতে বড় ত্রুটি হ'চ্ছে—আমরা একে অন্যকে সহ্য ক'রতে পারিনে। এর একটা কারণ বোধ করি নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধ। আমাদের রুচির সঙ্গে, চিন্তা ও মননের সঙ্গে এবং চাল-চলনের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক সত্তারই হোক্ বা মানসিক সত্তারই হোক্, কোথায় যেন একটা মস্তবড় তফাৎ থেকে যায়। নিজের সত্তার সঙ্গে নিজের এই অমিল থেকেই আমরা কোথাও কিছুর সঙ্গে এবং কারুর সঙ্গে মিলতে পারিনে! ফলে এ জগতের যা কিছু সবার সঙ্গে অল্পতেই আমাদের একটা বিরোধ ধ্বনিভূত হ'য়ে ওঠে। যেখানে প্রীতির সম্পর্ক, সেখানে এ বিরোধ নেই। প্রীতির দ্বারা মন সম্প্রসারিত হয়। সেখানের দুজনের রুচি, দু'জনের চিন্তা ও মননের মধ্যে পার্থক্য থাকে কম। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর যে সম্পর্ক, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যে সম্পর্ক, সেখানে এই প্রীতির যোগ। ফলে অনেক সময় নীতিগত পার্থক্য ঘটলেও উভয়ের মননের মধ্যে এমন একটা সহনশীল চেতনা সঞ্চারিত থাকে, যার দ্বারা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, উভয়ে উভয়কে সহ্য ক'রে নিয়ে তবে জীবনের বহু-বিস্তৃত পথ পাড়ি দিয়ে চলে।

কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন যেখানে বহুর মধ্য দিয়ে যান্ত্রিক নিয়মে ব'য়ে চ'লেছে, সেখানে এই প্রীতি স্বভাবতঃই অনুপস্থিত। আমরা প্রত্যেকেই অজানা যাত্রী; কি ট্রেণে, কি ট্রামে-বাসে, কি উন্মুক্ত পথে—যেখানেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ, সেখানে প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে অজানিত জীবন নিয়ে ছুটে চলেছি। কখনও কোথাও, হয়ত কারুর সঙ্গে আমাদের ক্ষণেকের আলাপ হলো, তার পরক্ষণেই আর সে আমাদের স্মৃতিতে ধরা দেয় না। জীবন ছুটে চলেছে নানা ভাবে নানা দিকে। এই ধাবমান জীবনে আমরা অপরের সম্পর্কে আদৌ সচেতন নই। ফলে বহুক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ট্রামে-বাসে চলতে গিয়ে এমন বিরোধ আমরা প্রায় প্রতিদিনই লক্ষ্য করি! কেউ উঠ্‌ছেন কিম্বা কেউ নামছেন, তার ফলে কার পা থেতলে গেল বা কার জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল, এ সম্পর্কে আমরা কেউই সচেতন নই। আমার নিজের কাজ হাঁসিল হলেই হলো; তার সঙ্গে আর যে 'ফোবিয়া' বা বাতিক, তা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত রুচি, চিন্তা বা মনন। তার সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মিল ঘটচে না ব'লেই আমি সহপক্তির বাইরে গিয়ে পড়ছি। এর আর একটা দিকও আছে; তা হচ্ছে অসাবধানতা। যেখানে জনতার ভিড় জমেছে, সেখানে নিজের রুচিগত কাজটাই সর্বদা কার্যকরী নয়। অনেকে নিজের খেয়ালেই আমরা বিড়ি-সিগারেট টান্‌তে শুরু করে দিই; সেই সিগারেটের ছাই গিয়ে কার চোখে পড়লো বা আগুনের ফুলকি গিয়ে কার জামাকাপড় পুড়িয়ে দিল, সে সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকিনা। এ অবস্থায় দুর্ঘটনার মুহূর্তে যখন আমরা কারুর দ্বারা আক্রান্ত হই, তখনও লজ্জিত হবার পরিবর্তে আমরা নিজেদের ত্রুটি খালনের যুক্তি খাড়া করে তার বিরুদ্ধে হাতের আস্তিন গুটাতে সুরু করি। সুরু হয় কুরুক্ষেত্র। এমন কুরুক্ষেত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অহরহ ঘটছে।

এরজন্য প্রয়োজন 'Civic sense' বা পৌরজ্ঞান। কিন্তু তা আমাদের মধ্যে নেই। ফলে আমাদের মধ্যে এসে পুলিস খাড়া হয়। আইন ক'রে ট্রামে-বাসে আর সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়। যারা সরকারী এ্যাক্টগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রেছেন, তারাই এ কথার যথার্থ উপলব্ধি ক'রবেন। কিন্তু একটা সুস্থ জাতির পক্ষে

এ কতবড় কলঙ্ক, তা বলবার নয়। জাতি যেখানে অসহায় পরদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, জাতি যেখানে শুধু আমলাতন্ত্র-পরিচালিত বুদ্ধির দাস মাত্র এবং তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন পুলিশি-শাসনের দ্বারা চালিত সে জাতির নিজের চরিত্র সম্পর্কে গর্ব ক'রবার মতো কিছু নেই।

যুদ্ধোত্তর যুগের ভারতে, যদি বলি, আজ আমাদের মানসিক দৈন্য ও বেউলিয়াবৃত্তা এসেছে, তাহ'লে বোধ করি খুব কমই বলা হবে। আমরা বহুতর ক্ষেত্রেই নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে যত্নবান হই। এই ইচ্ছা যতক্ষণ না অপরের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হ'চ্ছে ততক্ষণ বিরোধ থেকে আমরা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাইনা। আমাদের ব্যবহারিক জীবন এই বিরোধেরই সমষ্টি মাত্র। এর প্রধানতঃ দু'টি কারণ: প্রথমতঃ আমাদের পৌরজ্ঞানের অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমাদের মানসিক বৃত্তিগত স্বাতন্ত্র্য। পৌরজ্ঞান সম্পর্কে যতবেশী চেতনার উদ্রেক হয়, মানসিক বৃত্তির এই স্বাতন্ত্র্যও ততই ক্ষয়িত হ'তে হ'তে পৌরসম্পৃক্ত হ'য়ে পড়ে। এই হ'চ্ছে সভ্যতার নিয়ম।

ধরুন, আজকে ক'লকাতার মতো নাগরিক জীবনে যেখানে পুলিশের দ্বারা জনসাধারণের গতি-চলাচল নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে, সেখানে পুলিশি ব্যবস্থায় আমরা অসন্তুষ্ট থাকতে পারি সন্দেহ নেই, কিন্তু পৌরজ্ঞানের অভাবের ফলে এতকাল আমরা যে 'এ্যাক্সিডেন্ট'গুলো ঘটাচ্ছিলাম, তা থেকে এখন যে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া গেছে, তাতে ভুল নেই। আমাদের জনসাধারণের এ ত্রুটি আজ পুলিশকে পুরণ দিতে হ'চ্ছে কেন? সেটা কি আমাদের গণ-জীবনের পক্ষে দারুণ একটা কলঙ্ক নয়?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কলঙ্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যারা নিয়মিত ট্রামে-বাসে যাতায়াত করেন, তাদের অনেকেই অনেক সময় নিজেদের ব'সবার মতো 'সিট' না পেয়ে মেয়েদের নির্দিষ্ট ফাঁকা 'সিটে' ব'সে পড়েন। কোনো ইপেজ থেকে কোনো মেয়ের দলকে উঠতে দেখেও তারা সিট ছেড়ে ওঠেন না। ফলে কণ্ডাক্টারকে এগিয়ে এসে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রতে হয়। নির্লজ্জের মতো তখন উঠে পড়তে হয় তাঁদের। অর্থাৎ—নিজেদের রুচি এবং ইচ্ছার সঙ্গে কোনো প্রতিপক্ষের বিরোধ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁর মানসিক বৈরাগ্য থেকে মুক্ত হ'তে পারছেন না। পারছেন না—যেহেতু তাঁর ঐ Civic sense বা পৌর-জ্ঞানের অভাব।

এই ভাবের বহু দৈন্য এসে আজ আমাদের সমাজ দেহ তথা জাতীয় জীবনে ভর ক'রেছে, ফলে আমাদের সাধারণ মনুষ্যত্ববোধের কাছে আমরা দিন দিনই বেউলিয়া হ'য়ে পড়ছি। জনসাধারণের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উপরোক্ত ত্রুটিগুলির হয়তো কিছু অবসান ঘটতো, কিন্তু অগণিত জনসমষ্টির সঙ্গে এই জাতীয় প্রীতির সৃষ্টি এযুগের কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তা কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তাহলেও সহনশীলতা ও সহানুভূতিশীলতাসূচক গুণ দু'টি আমাদের আয়ত্তাধীন। নিজে আমি যে আচরণ প্রদর্শন করি, অপরের কাছ থেকেও আমাদের সেই আচরণ পেতে হবে। এ কথাটা প্রায়শঃই আমরা ভুলে থাকি। আমাদের সামাজিক বিপদ হ'চ্ছে সেইখানে। আমাদের প্রাত্যহিক চালচলনের মধ্যে সংযম নেই, বরং আছে একাধিক ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খলতা। আমরা কেবলই নিজের ইচ্ছা ও রুচিকে প্রয়োগ করতে যাই, অপরের ইচ্ছা ও রুচির দ্বারা নিজেদের সংশোধিত ক'রতে রাজি নই। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দার্শনিক ক্ষেত্রে মূল্যবান হ'লেও পৌরবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থহীন। অর্থহীন এই কারণে যে, ব্যবহারিক জগতে বহুতর ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই মানিয়ে চলার বিরোধী। যাতে এই বিরোধ না ঘটে, তার জন্য কয়েকটি সাধারণ অনুশাসন অনুসরণ ক'রে চ'লতে হয়। সেই অনুশাসনই হ'চ্ছে 'Social Ethics'। Civic Sense' বা পৌরজ্ঞান হ'চ্ছে 'Ethics-'এরই জ্ঞান। যতক্ষণ না এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সঞ্চারিত হ'চ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতি হিসেবে আমরা সভ্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারিনা। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের ব্যবহারিক আচরণই এই সভ্য পর্যায়ের বাইরে। জাতির পক্ষে এটা কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য জাতিকে সর্বপ্রথম সেই Social Ethics-এর পাঠ গ্রহণ করতে হবে। ব্যবহারিক এই জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে যা কিছু শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান।

পুস্তক পরিচয়

অতলান্ত : শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস-প্রকাশনী। ২বি, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা ৩। দাম ১৲

আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রলাপ এবং অসংলগ্নতার দৃষ্টান্তই সব নয়। কোন কোন তরুণ কবির চোখে আজও দেখছি সেই চিরন্তন কাব্যবধূ। প্রণবকুমারের কবি-দৃষ্টি অতলান্ত স্বপ্ন-রহস্যের মায়ামুগ্ধ। তিনি তরুণবয়স্ক ছাত্র। কিন্তু শব্দবিন্যাস, ছন্দোহিল্লোল, এবং তাদের ভূমিত প্রকাশে তাঁর এ প্রথম কাব্য প্রকৃত রসবোধের পরিচয় বহন করছে। সকল বড় কবি যে অপ্রাপণীয়া সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যান করেছেন এই নবীন কবিও তাঁরই পূজারী—'আমি তাকে পেয়ে হারাই, পেয়ে হারাই।' কী মিঠে হাতে তিনি এঁকেছেন আলো-ছায়াময়ী প্রকৃতির ছবি, আর কী সুন্দর তাঁর তুলনা ব্যঞ্জনা !

"এই ঝরা পাতাদের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
বিস্মৃতি কুয়াশা ঢাকা সুদূর অতীতে
ফিরে যেতে চাও তুমি ?

* * *

"সমস্ত প্রান্তর জুড়ে হাওয়ার সরোদ,
বকুল শালের বনে সোনাঝরা রোদ।
হেমন্তের ধূসর বিকেল।"

শেষ কবিতা 'তারারা' শিশু-মনের কল্পনা মাধুরীকে চমৎকার রূপায়িত রসান্বিত ক'রে তুলেছে :

"তারারা আকাশে সারারাত জ্বলে—
দুষ্টু তারারা !
ঘুম নেই, চোখে ঘুম নেই, আর পড়শুনা ব'লে
কিছু নেই তারা
সারারাত আর সারাটা সন্ধ্যে দুষ্টু মিষ্টির।
জাগা চোখ নিয়ে
জেগে থাকে, নেই ইস্কুল করা।"

উল্লেষ : শ্রীসুবোধচন্দ্র বা। প্রবাসী বঙ্গভারতী ; মিল-এরিয়া, জামশেদপুর ৭। দাম—৸০।

ভাষা ও ছন্দে ত্রুটিহীন এ কাব্যখানিতে বিকাশের প্রতিশ্রুতি আছে। মাঝে মাঝে দু'একটি ঘরোয়া ছবি সুন্দর ফুটেছে।

"কত শিশু ভোরের আশায়
মাটির খেলনা আর খেলাঘর ছাড়ি'
মায়ের আঁচল ধরে' নীরবে ঘুমায়।"

'উপক্রম' নামটি কি অর্থবোধক ও ব্যাকরণসম্মত ?

দেশান্তরের নারী : শ্রীসাধনা বিশ্বাস। এশিয়া পাবলিশিং কোং। ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম ২৲

দেশে দেশে বেড়ানোই বেড়ানোর কথা ভালো করে বলা যায় না ; ঠিকভাবে দেখবার চোখ এবং সরল করে বলবার ক্ষমতা সকলের থাকেনা। শ্রীমতী বিশ্বাস দূর পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের প্রীতির দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেরেছেন এবং মিষ্টিভাষায় তাদের কথা শোনাতে পেরেছেন। সতেরোটি পরিচ্ছেদে তাদের কর্মজীবনের এবং গার্হস্থ্যজীবনের বিচিত্র রূপ তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কোনও জটিলতা বা তত্ত্বকথার মধ্যে নিয়ে তিনি প্রবেশ করেন নি। গল্প করে গেছেন। অথচ, তার মধ্য দিয়েই দিয়ে গেছেন জীবন সম্বন্ধে ভাববার মত অনেক বিষয়ের ইঙ্গিত।

আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৬২ জি, মহারাজা ঠাকুর রোড, ঠাকুরিয়া কলিকাতা ৩১। মূল্য ৩৲।

বিজ্ঞান-সাহিত্য-গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মত সরস করে তুলেছেন গ্রন্থকার। তাঁর আলোচনার ভাষা সহজ সাবলীল। দীর্ঘদিনের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় তিনি কঠিন বিষয়কে সুবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক ক'রে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন। নানা-বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান রচনা ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে আছে এগারোটি নিবন্ধ : বিজ্ঞানে সত্যনিরূপণ প্রণালী, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সত্য, আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ সত্য, আইনস্টাইন ও আপেক্ষিক তত্ত্ব, আলোর বেগমাহাত্ম্য, অচল জগতের সমস্যা, অচল জগতের সন্ধানে, প্রাকৃত সাম্যবাদ, শক্তির কণাবাদ, বিজ্ঞানে ঈশ্বর কল্পনা, বিজ্ঞানের শেষ কথা। চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ নিশ্চয় সমাদৃত হবে।

অন্ধ্র নির্বাচন—

অন্ধ্র প্রদেশে নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে। অন্ধ্র নাকি কম্যুনিষ্টদের একটা বড় ঘাঁটি, এমন গুজব ইতিপূর্বে শোনা গিয়েছে। কম্যুনিষ্ট নেতারা তাঁদের জয় সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু ফলাফল দেখা গেল, কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়েছে। সর্বশুদ্ধ ১৯৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস-পক্ষীয়েরা দখল করেছেন ১৪৬টি আর অন্য সকল দলের প্রার্থীরা মিলে ৪৯টি। তন্মধ্যে কম্যুনিষ্টরা ১৪টি, প্রজাসোশালিষ্টরা ১৩টি এবং স্বতন্ত্র ১২টি।

ফলাফল থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, কম্যুনিষ্ট-প্রভাব সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের, তথা অন্য অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে। দেশবাসীর মনে উত্তেজনা সঞ্চারকে যাঁরা একমাত্র কর্মপন্থা রূপে গ্রহণ করেন তাঁরা ভুলে যান যে, তার দ্বারা জন-চিত্তে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। আর, আকস্মিক উত্তেজনার স্বাভাবিক পরিণাম অবসাদ। গঠনমূলক কর্মপন্থাই আন্তরিক বিশ্বাস অর্জনের এবং প্রকৃত কল্যাণসাধনের উপায়।

কংগ্রেস অথবা বর্তমান গভর্ণমেণ্ট ত্রুটিহীন, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই, সর্বপ্রকারে বর্তমান গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করা অন্যায় এবং অনিষ্টকর। জন-সমর্থন চেয়ে যাঁরা নির্বাচনে দাঁড়ান, জন-মনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা তাঁদের উচিত। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট যখন জনমতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত, তখন তাকে অনবরত হেয় করার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। এ গভর্ণমেণ্ট যে সকল গঠনমূলক কাজ হাতে নিয়েছেন, সেগুলিতে সহায়তা করা এবং সুচিন্তিত উপদেশ দ্বারা তার ত্রুটি সংশোধন করা সেবকের কর্তব্য।

প্রধান মন্ত্রীর উপর আক্রমণ

প্রকাশ, নাগপুরে বাবুরাও নামে এক রিকশওয়ালা ছুরিকাঘাতে পণ্ডিত নেহেরুর গাড়ীর পা-দানে লাফিয়ে উঠেছিল। পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

লোকটি আগে কাপড় কলে কাজ করত, এখন রিকশ টানে। খবরের কাগজ পড়া তার নেশা। সে নাকি বলেছে, কাপড়কলের মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার উদ্দেশ্যেই সে পণ্ডিত নেহেরুর গাড়ির পাদানে উঠেছিল। ছুরিখানা হাতে ছিল মাত্র, তার কোনো কু-উদ্দেশ্য ছিল না।

পণ্ডিতজীর মতে, লোকটি বোধ হয় বিকৃত মস্তিষ্ক এবং ঘটনাটি উপেক্ষার যোগ্য। তবে গ্রেপ্তারের সময় তার কথাবার্তা যতটা অসংলগ্ন মনে হয়েছিল, পুলিসে পরবর্তী জেরায় নাকি ততটা অসংলগ্ন মনে হয়নি। যাহোক, পণ্ডিতজী অক্ষতদেহে উদ্ধার পেয়েছেন, এ সৌভাগ্য।

দোল-উৎসব

ধর্মের দিক ছাড়া উৎসবের একটি সামাজিক দিক আছে। একে উপলক্ষ ক'রে যে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ হয় এবং সর্বসাধারণের মিলন ঘটে, তার মূল্য যথেষ্ট কিন্তু ইদানীং আমরা উৎসবকে অনেকক্ষেত্রে ইতরতার পর্যায়ে এনে ফেলেছি। দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা নাম করে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা নিয়ে জবরদস্তি, তিনদিন ধরে তাসান এবং প্রকাশ্য রাস্তায় তরুণদের হেমটান বা মাতাল কিরিঙ্গি নাচ ভদ্রমনোভাব সম্পন্ন লোকের

অসহ্য হয়ে উঠেছে। অথচ, প্রতিবাদ নেই। তার মানেই পরোক্ষ প্রশ্রয়। কিন্তু এ অবস্থা কি চলতে দেওয়া উচিত? বয়স্কেরা যদি নিজেদের ছেলেপুলেদের ভয় করে চলেন তবে দেশের গতি হবে কি? তাঁরা সমবেত ভাবে চেষ্টা করলে নিশ্চয় এ উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করতে পারেন।

দোল বা হোলি প্রকৃতপক্ষে বসন্ত উৎসব। রং খেলা এবং বিশুদ্ধ নৃত্যগীতে এর অনুষ্ঠান সম্ভবপর। কিন্তু রঙের বদলে জল, কাদা, গোবর এবং ট্রেনের নোংরা জিনিষ পর্যন্ত আজ তরুণদের হোলিখেলার উপকরণ। তাদের সৌন্দর্যবোধ এবং সুরুচির উদয় হবে কবে?

সরকার এইদিনে সাধারণ যানবাহন বন্ধ রেখে তবু উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছুটা সংযত করেছেন, তাও ভালো!

শিক্ষা প্রসঙ্গ

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক এ কথাটা অনেকে অনুভব করছেন কিন্তু সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা নিয়ে কোনও কাজ হচ্ছেনা। একাধিক কমিশন বসল। আলোচনা হল, কিন্তু কোন্ পথে চললে সমস্যার সমাধান মিলবে, তার কিনারা হ'লনা। বুনিয়াদি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—সবগুলির মধ্যে একটা যোগস্থাপন বা সামঞ্জস্য বিধানের কোনও চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রাথমিক শ্রেণীগুলি থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়ার সরকারী নির্দেশ জারী হ'ল, কিন্তু স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত ইংরেজীর পাঠক্রম পূর্ববৎ রইল। এতে ইংরেজী শিক্ষার অসুবিধা হবেনা? সম্প্রতি বহু-উদ্দেশ্য সাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যাচ্ছে। উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু তাকে কার্যকরী করবার ব্যবস্থাই বা কোথায়? লোকই বা কোথায়? 'ইণ্টার মিডিয়েট' বিভাগ তুলে দিয়ে শুধু ডিগ্রী কলেজ রাখা হবে এবং ইণ্টার মিডিয়েট পাঠ্য বিষয়গুলি স্কুলের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। শোনা যাচ্ছে। একদিকে অসংখ্য স্কুলে বিজ্ঞানাদি পড়াবার পূর্ণ আয়োজন, অন্যদিকে শুধু ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র নিয়ে বেসরকারী কলেজ চালাবার ব্যবস্থা উভয়ই প্রচুর ব্যয়সাধ্য। সে পরিমাণ অর্থসামর্থ্য কি বর্তমানে সরকারের আছে! যদি না থাকে তবে এখন এ ব্যাপার মুলতুবি রাখলেই কি ভালো হ'তনা।

ভারত পাক আলোচনা

ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের যে-সব ব্যাপার নিয়ে বিরোধ রয়েছে, সে-সব ব্যাপারে মীমাংসার জন্য আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ উভয় দেশের জনগণের দুর্দশা-মোচনের জন্য নানাবিধ গঠনমূলক কার্যের প্রয়োজন। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি নিয়ে দুই দেশ একসঙ্গে চেষ্টা করলে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভবপর। দীর্ঘকালের প্রীতির ঐতিহ্য মুছে ফেলে আমরা সহসা যে কণ্টকরোপণে শুরু করেছিলাম, যতশীঘ্র তার উচ্ছেদ হয়, ততই ভালো।

রাজা ত্রিভুবন

নেপাল-রাজ ত্রিভুবন কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। সম্প্রতি সুরিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নেপাল নানারকম শাসনতান্ত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। মন্ত্রিসভার উত্থান-পতন কয়েকবার ঘটে গেল। কৈরালা-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ এখনও মেটেনি। ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটির রাষ্ট্রীয় শান্তি যদি ভ্রাতৃবিরোধ বা আত্মবিরোধে দীর্ঘকাল ব্যাহত হয়, তবে শুধু তার নয়, ভারতবর্ষেরও উদ্বেগের কারণ ঘটবে; কেননা সে ভারতেরই অঙ্গস্বরূপ। মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে আধুনিক জীবনে উত্তীর্ণ হবার জন্য নেপালের যে কর্মপন্থা গ্রহণ আবশ্যক, তার আভ্যন্তরীণ শান্তি অপরিহার্য প্রয়োজন।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষার, কল্পনার ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২৲

—নরেন্দ্র রায়—

বাঙলার ভুলে যাওয়া যুগের এক অবিস্মর কাহিনী পাবেন এই উপন্যাসটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠে'র সন্তান সৈন্যদের সত্যকার ইতিহাস।

রূপকথা ২৲

বিদেশীর উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত চোকটী সরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুধীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী"—বসুমতী।

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —স্বরাজ

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২॥০

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসহ। সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির প্রাঞ্জল ইতিহাস। সরল উচ্চপ্রশংসিত বয়স্ক ও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে বিষয়বস্তুতে, ভাষার সরলতায় ও প্রচ্ছদপটের পারিপাট্যে পুস্তকখানি অপূর্ব ও মনোজ্ঞ।

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২॥০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২॥০

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর কার্যাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে

[illegible] ১১

পূজার অভিনয়ে নূতনত্ব চাহিলে

মন্মথ রায়ের নাটক

কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া

সুবিখ্যাত নাটকত্রয় এক খণ্ডে প্রকাশিত : মূল্য ৩৲

জীবনটাই নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত একাধারে পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক : ২॥০

মহাভারতী

১৯০৫ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুক্তি-আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেল একটি চাষী-পরিবারের পঞ্চাঙ্ক জীবন-নাটক একটিমাত্র দৃশ্যপটে রূপায়িত। মূল্য ২॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স : ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি:—৬

কবি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনখানি বই :

কুটীরের গান—১॥০

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'কাব্যপরিচয়ে' এই গ্রন্থেরই কবিতা 'রাতভিখিরী' স্থান পেয়েছিল। ছেঁয়ালি নয়, মতবাদের, উদ্গীরণ নয়,—প্রকৃতি আর জীবনের বিচিত্র মাধুরী রূপ নিয়েছে কবিতাগুলিতে। পূর্ববঙ্গের খাল, বিল, নদী, বন্দরের এমন ছবি আর কোথাও নেই। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন : "কুটীরের গান বাংলা দেশের বর্ণনায় ভরপুর, সে বাংলাদেশ আর আমাদের দেখা চরে না বলে novtalgiaর ভাব আপনি তার সৌন্দর্যকে নিজের লেখনীর ফাঁদ পেতে ধরে রেখেছেন।"

নিশান নাও—১৸০

১২২-'৪৮এর মধ্যে রচিত স্বদেশী কবিতার সমষ্টি। "শেষের যে কবিতাগুলি গান্ধীজীকে নি: সেইগুলি বুকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে।—"শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

[প্রাপ্তিস্থান : ভবানীপুর বুক বুরো। ১বি, রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।]

সাহিত্য প্রবাহ—৩৲

সাহিত্যসমালোচনার অপূর্ব গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া', 'মানসী', 'রক্তকরবী', গোবিন্দচন্দ্র দা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ইকবাল, হালি ; জাপানী কবিতা, অ্যান্টন চেখভ, দিলরুবা—দেশ দেশান্তরের শ্রেষ্ঠসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার উদ্‌ঘাটিত। সর্বত্র প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান : এ, মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লি:। কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

—বাংলার বিপ্লবযুগের অপূর্ব ইতিহাস—

"বিপ্লবের পদচিহ্ন"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

অতএব একখানা কিনে পড়ুন এবং ঘরে ঘরে পড়বার সুযোগ দিন। বইখানা আপনার গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে থাকবে।

—বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

বস্তুতঃ বইখানি পড়তে পড়তে শুধু ভূপেন্দ্রকুমারকে নয়, সমগ্র বিপ্লবীদলকে পাওয়া যায় যারা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং খর্বতা সত্ত্বেও মহৎ। তাদের কর্মসাধনা, তাদের চিন্তাধারা যেন মাটির গভীরে সমগ্র জাতির তপস্যা,—মুক্তির জন্যে, এবং তারও চেয়ে বড়, আলোর জন্যে। এরই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের পরিচয় থাকা শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্য।

(তরুণের স্বপ্ন)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

.....শাসকশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিবরণ. কারাগারের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে স্থিত মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মার পরাজয় স্বীকার না করবার অপূর্ব চিত্র।.....প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই বইয়ে ভূপেনবাবু শুধু নিজের কথাই বলেন নাই ; সহকর্মীদের কথা, পুলিশ কর্মচারী জেল কর্মচারী, সরকারী বড় কর্মচারীদের কথা, বিভিন্ন জেলের ব্যবস্থা, অবস্থা, তা সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা, হাঙ্গামা, জেলে পড়াশোনা, আদর্শ বিচার, দলাদলি, আমোদ-প্রমোদ—সব কথাই অত্যন্ত সরলভাবে বর্ণনা করেছেন।.....

.....বই খানার ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, লিখনভঙ্গী মনোজ্ঞ ও সরস। একবার শুরু করলে শেষ না করে উঠা যায় না। সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটা সবল সতেজ সদয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ করবে। আমরা সকলকেই বইখানা পড়তে অনুরোধ করি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা—

....."Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Ravindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengali youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. Only in the Easter Revolution in Ireland we can search for parallels of such acts of individual heroism. We should know the history of this period of Bengal. Let the world also know about them.

—Amrita Bazar Patrika—

সরস্বতী লাইব্রেরী

৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

সপ্তদশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৬১ | দ্বাদশ সংখ্যা

কবি করুণানিধান

শ্রীগুরুসদয় দে

যে-কবি বলছিলেন—

সোনালী-সবুজ গাঢ় ভরা জল
একুল—ও কূল করে টলমল—
মেঘ-রঙে কা'রা করে আনাগোনা
ঘুমায়ে উড়ায়ে তসর ওড়না
ভাঁজে ভাঁজে ছায়া

সেই কবিই পরে গিয়ে বলছেন—

জানিনে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ
কবে উত্তরিব সন্ধ্যার দেশ,
পূর্ণ পক্ক ফলের মতন
বৃন্ত স্রষ্ট টুটিবে জীবন
সকল বেদনা এড়ায়ে।

ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটেছে 'ওয়ালটেয়ার' কবিতায়। যে প্রকৃতি-প্রেমে কবি বলছিলেন—

নীল লহরীর মাথায় অধির ফেনার ঘূর্ণীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে দেখ্‌রে হেথায় আসি।'
ঘুলিয়ে তুলী গিরির গায়ে
ঘোর বেগুনী রঙ্ ফলায়ে
সাগর-ধোয়া রবির করে করছে তরল হাসি!

সেই প্রকৃতি-প্রেমকে পরিণত করলো এসে একটি আধ্যাত্মিক স্থিতি।—

এই কূলে ওই নীল অচলের গভীরতম প্রাণে,
নিরুপিল নিষ্ঠুর জনক বালক সে প্রজ্ঞাণে,
পড়ল স্নিগ্ধ পুষ্প 'পরি
আপনি এসে দয়াল হরি
নিলেন কোলে, কল্পতরু নামের পরসাদে।

আবার এই আধ্যাত্মিকতাই পরবর্তীকালে পরিমাণ উৎকর্ষতা লাভ করেছে তার প্রমাণ স্বরূপ আমি 'হরিদ্বারে' কবিতার একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি। কবি বলছেন—

জনম-মরণ বাসনার তীরে উত্তরিব নিশ্চয়,—
নিরঞ্জনের চরণে যাচিব মুক্তির চিরানন্দ
এস গো পরম ভাগ্যবন্ত ভক্তির রসে এস তুরন্ত,
এসহেথা এই তীর্থ-রেণুতে মিশে যাও নিস্পন্দ।

এ কবিতায় আর কিছু থাক আর নাই থাক, কাব্যরস যে বিন্দুমাত্রও নেই আশা করি সে কথা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কবির অধ্যাত্ম-বিষয়ক সবগুলি কবিতাই মূলতঃ এই ধরণের। এই আধ্যাত্মিকতা কবি মনের একটি fancy, এর পশ্চাতে কোন 'poetic intuition' নেই, এ-আধ্যাত্মিকতা কবির কাছে রসে পরিণত হতে পারে নি। তীর্থস্থিতির সঙ্গে সাধারণ বাঙালী মনের যে অন্তর্গত আধ্যাত্মিক-আবেগ জড়িত থাকে করুণানিধানের কবি এই জাতীয়

কবিতার রচনায় সেই উৎকেন্দ্রিক মনোধর্মের বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাতে ক'রে তাঁর কল্পনাও বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর মনে তীর্থ দর্শনের আনন্দ ও অধ্যাত্ম-চিন্তার উৎকলিকা পরস্পর সমন্বিত হ'তে পারে নি। কবিতাগুলি না হয়েছে আধ্যাত্ম-কাব্য, না হয়েছে সরল আনন্দ উল্লাসের মুহূর্ত-রূপ। হয়েছে বিবৃতিমূলক, জবরদস্তিমূলক, তথ্য ভাষাক্রান্ত পদ্য মাত্র। 'পরম ভাগ্যবন্ত' 'তীর্থ-রেণুতে' 'নিষ্পাপ' হ'য়ে যাবেন কিনা তাঁরাই জানেন, কিন্তু কাব্যরস যে বাস্তবিকই 'নিষ্পাপ' হ'য়ে গিয়েছে কবি নিজেও সম্ভবতঃ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।

'শতনরী'র কালিদাস রায়-কৃত সংকলনে 'মর্মপথে' পর্যায়ে যে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে তাতে ও কবিদৃষ্টির সুস্থতার পরিচয় নেই। বাংলা সাহিত্যে মনীষি-বন্দনা জাতীয় কবিতা লিখে সার্থক হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার। যাঁদের কল্পনা-শক্তি ও শিল্পদৃষ্টি স্বভাবতঃই নিম্নস্তরের তাঁরা এ-শ্রেণীর কবিতা-রচনায় সফল হ'তে পারেন না। বাংলা সাহিত্যে তারও প্রমাণ আছে কবিশেখর কালিদাস রায় এবং করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাগুলিতে। এ-জাতীয় কবিতায় কবি বন্দনা করবেন সেই মনীষিকেই, যে মনীষির জীবন এবং আদর্শ কবির নিজস্ব জীবন-দর্শনেরই অনুকূল, অথবা এমনই প্রতিকূল যে তাঁকে অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনার প্রয়াস পেলে কবির জীবন-দর্শনই আরও স্ফূর্তি পাবে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের প্রতি কবি-প্রশস্তি রচনা করেছেন, মোহিতলাল বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ শোপেনহাওয়ার-নীটশেবর্ণের উদ্দেশে আত্মভাব নিবেদন করেছেন। কিন্তু করুণানিধান কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ ক'রে তারাপ্রসন্ন শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্মরণীয় ব্যক্তিমাত্রকেই শ্রদ্ধা-তর্পণ করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায়, কবিতাগুলির রচনায় কাব্যানুভূতির সক্রিয়তা নেই, কবিজনোচিত নির্বাচনেরই।—বিশেষ ব্যক্তিমাত্রকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে মাত্র। তাই এ-গুলিতেও বিস্মৃতি আছে। তথ্যভার আছে—'moment'-এর উপযোগী কাব্য—'monument' নেই। শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কবির 'knowledge'-এর বস্তু—realisation-এর নয়। সে-জন্য প্রকাশে এত জড়তা, এত শৈথিল্য। কবিতা-গুলির ভাষা কোথাও কাব্য-রস-পরিক্লিন্ন নয়—গদ্যাত্মক, যুক্তিমূলক, স্থূল, রূঢ়। একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত ক'রে এর প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।—

বুদ্ধকে তরুণ করে যে বঙ্কিম তোমার বাঁশরী,
আলংগিতে শৈল-চূড়া যার মেঘা মেঘের লহরী,
তেমনি উদার মন তোমার রসের নিঝরণ,
'আনন্দ-মঠে'র ঋষি, দেশবাসী করিছে তর্পণ।
সন্তান ধর্মের বীর, সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক,
লহ বিদ্বজ্জনের ভক্তের প্রাণের সংযোদক।
জেনেছিলে উৎস কোথা মানুষের অশ্রু-ঝরণার,
স্বাতী তারা ভোবে যেথা, পেলে সেথা মুকুতার হার।
(বংকিম-তর্পণ)

এ-কবিতার বিচারে Bradley-র উক্তি উদ্ধৃত করা হয়তো না যেতো, 'Matter, subject, content, substance, determines nothing; there is no subject with which poetry may not deal; the form, the treatment, is everything.' কিন্তু 'form'-ই বা কোথায় আর 'treatment'-ই বা কোথায়?

বস্তুতঃ 'জাগন্ত-ঘুম-ঘোরে' 'স্বপ্নছবি' দেখার দৃষ্টি যেখানে নেই সেখানে করুণানিধানের কবিধর্মও প্রকাশ পেতে পারে নি। উৎকৃষ্ট কাব্যের সংগে সৃষ্টি-শক্তির যেমন যোগ রয়েছে, তেমনি যোগ রয়েছে কবি-কল্পনা ও কবি-দৃষ্টির। সৃষ্টির শক্তি আসে স্বকীয় কবি-ধর্মের স্ফূর্তি থেকেই। যে-কোনো উপাদানেই উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা সম্ভব হ'তে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি উপাদানই কতকগুলি বিশিষ্ট কবি-ধর্মের প্রতীক্ষা রাখে। করুণা-নিধানের কবি-ধর্ম এই জাতীয় কবিতার ভাব-অবলম্বনে স্ফূর্তি পেতে পারে না, তাই রচনা হিসেবেও এগুলি সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে নি; করুণানিধানের কবি-প্রতিভা সর্বাতিশায়ী নয়—অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাতে দৃষ্টির বিস্তৃতি নেই—রয়েছে একমুখীনতা। প্রকৃতি সম্পর্কের বাইরে তাঁর কবি-কল্পনার উন্মোচন হয় না;—যে উপাদানের মধ্যে তাঁর প্রকৃতি-প্রেমকে মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, সেই উপাদানের মধ্যে কবি কাব্যসৃষ্টির উপযুক্ত 'emotion' খুঁজে পান নি। গাথা-জাতীয় কবিতাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা। বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এ-দিক থেকে করুণানিধানের প্রেমের কবিতাগুলি রচনা সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। এ-কবিতা গুলির ভিতরে কবির উপলব্ধিগত অকৃত্রিমতা এবং ভাষা ও ছন্দগত মাধুর্য—সবটা মিলিয়ে একটি 'poetic unity' লক্ষ্য করা যায়। এগুলি যেন wordsworth কথিত 'emotion recollected in tranquility' কিন্তু করুণানিধানের প্রেমে যে-মত্ত উৎকণ্ঠা অশেষ

মনোগত ব্যাকুলতাই অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। আমার সেই ব্যাকুলতার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতি প্রেমের শাসন। কবি তাঁর প্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে বিস্মৃত দিনের স্মৃতি মন্থন করছেন। আর প্রকৃতির পটভূমিকায় স্মৃতি-মন্থন-জাত বেদনার রসই প্রেম-কবিতা-গুলিরও রস। কবি এই স্মৃতি মন্থনের জন্য তাঁর প্রিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বড় অথবা স্বাধীন ক'রে দেখেন নি—তাঁর প্রেমানুভূতির মধ্যেও প্রকৃতি-প্রেমের বংশীধ্বনিই মুখ্য হ'য়ে উঠেছে, এবং প্রকৃতি-প্রেমকে পূর্ণায়ত করার জন্যই প্রিয়াকে স্মরণ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রকৃতিই যেন তাঁর কবি-প্রাণের 'রাধা' আর প্রিয়া যেন সেই 'রাধারই পূরয়িত্রী 'যোনী'। প্রকৃতির অনুভূতি আমাদের জীবনে এমন একটা মনোরম মুহূর্ততা এনে দেয় যে সেই মুহূর্ততায় আমরা আমাদের মানস-প্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলে একটা অনির্বচনীয়তার আস্বাদ পাই; অন্তপক্ষে প্রিয়ার অনুপস্থিতিটা সত্য হ'য়ে দেখা দিলে আমরা মুহ্যমান একাকিত্ব অনুভব করি। কারণ, নারী-সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রকৃতি-প্রেম পূর্ণতা পায়। কঙ্কণানিধানের প্রিয়ানুভূতির বেদনা প্রকৃতি প্রেমেরই অপূর্ণতার বেদনা অর্থাৎ প্রেমের বাঁশে এগুলিও প্রকৃতি-রসেরই কবিতা। উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) এইখানে সে যখন এসে স্মৃতির দিঘি
সেচে ফেলে—
অন্তরালের আলুথালুতে অলক্ষ্যে তার
নয়ন মেলে
শেষ-মিনতি শেষ-সুধাতে পাইনি আপাত
আকুল হাতে।—
রূপ হারালো রূপের লীলা বন-পলাশে
আলোক ঢেলে।
(মনের কোণে)

(২) মনের মিঠে ছিলটি তোমার এতায় নি এই
মুগ্ধ চোখ—
দীঘির ঘাটে ওই যে ঝাঁকা নীরু তোমার অলক্ষ্যে।
নারিকেলের কুঞ্জশিরে, পদ্মকোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে' ছড়িয়ে পল পরীর পাখায় স্বর্ণালোক।
তোমায় যবি দেখেছিলাম, সবুজ ছায়া মধুর ঘুম—
অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে ঘন্টাকিনা উঠ্‌ল মুখর।
নৌবাহিনের অন্তরে, তাসল ছায়া কুঞ্জঘরে—
কালো মেঘের রৌদ্র পাকে তরির মতন রৌদ্রছুঁয়।
(দ্বিপ্রহরে)

(৩) নাচিছে হাসিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে,
সঘনে কেতকী ফুটে আষাঢ়-সাঁঝা মাঝে।
তালের কোণে আলোকের লেখা ভাসে,—
ওগো ধারা-ঝর-ঝর এমন আষাঢ় মাসে,
আজি আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।
(আষাঢ়ে)

এবার কঙ্কণানিধানের কাব্যের কয়েকটি রচনা-খণ্ড অংশীর মধ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) চিত্র পরম্পরায় কাব্যরূপের রূপায়ণ—
(ক) দূরী মালকে ঝুল ঝুলাঝুলি,
ঝুরুরায় পাতি যায় পরশপটি,
ঝুলা কালা যাবা পাপড়িতে ঢাকা কাহিনী
ঝরে তলা।
ঘুর নির্জনে তমালের ডাং
প্রাবলা মালতী ঝুলা যায় ডাং
যব তমালের কানে কানে তার কি কথা
হ'ল না বলা।
(বর্ষায়)

(খ) অবাক হ'য়ে চাওয়ার ব'লে দেখ্‌ব ঝুলুর বেলা,
পরিষার ওই আকাশ আলোয় পাখীর
সাঁতার খেলা।
কাঠঠোকরা ঠোঁটের ঘায়ে
পাছের ছেলা ওঁড়ির গায়ে
ঝুরুরপটি ঝরছে পড়ীর—পাখায় ঝরের মেলা।
(বাদলা)

(২) বর্ষাচাতা—
(ক) রৌদ্র চালা সুনীল গায়ে
ঢেউ-এর শিরে চীরক ভাবে
তীরে নীরে শিবের ঝেউল, ঝিনুল ঝোলা শির।
(শরৎ)

(খ) ধরা যখন ছড়িয়ে দেবে মোতির দানা-দুটী :
ঝলম ঝেলব শিউরে উঠে পড়বে ঝরি' ঝরি'।
রাতের ঝোলে যাবে ঝেখা
পুরীধারার 'চিকে' চাকা।
ঝেয়াজালের রাখার 'পরে নারিকেলের নাড়ি।
(বাদলা)

(৩) ঝরুরপত ঝলোরাম—সন্তোষ ঝরের প্রভাব।

দোল দোলনে ঢিলা হ'য়ে সোহাগ-বেণী যাক্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্ নে মুখ, তাকা' তোরা চোখ তুলে।
মনের কোণে রঙ ধরেছে
আকাশ বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যুঁই-বেলাতে দখিন্ হাওয়া যায় দুলে—
তাকা' তোরা চোখ তুলে।
(বসন্ত অভিসার)

আজি ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ ফুটল?
কেন কিংশুক ফুল চীন-বাস গায় চঞ্চল হ'য়ে উঠল?
পিক পঞ্চম গায় বহে দক্ষিণ বায়
নাচে ফুল-হিন্দোল, ছন্দের দোল,—ঘোমটার জের
টুটল?
(বসন্ত বিলাস)

(৬) অলংকরণ দক্ষতা—

(৭) সামনে তরির কিতায় বোনা জলের ফণা ফেনিয়ে
ধায়
তটিনীটির নর্ম-নটন ঊর্মি-নূপুর তটের ছায়।
জমাট মসীর খণ্ডতলে ফলে ভরা পিয়াল বন,
টিলার উপর ছায়া-আলোক—উধাও ছুটন্ত
বালক-মন।
(দেওঘরে)

ফুলের কাছে জমবে সোঁদা,
কাঁপিয়ে নেয়াই পিট্‌স লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন যুঁই—আলোর ছড়াছড়ি!
(বাসনা)

(৪) শব্দপ্রীতি ও শব্দচেতনা ভাষাগত ভংগী!

করুণানিধানের কাব্যে ভাষাগত ভংগীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এখানেও শব্দের অন্তঃস্থিত গূঢ়ার্থ নয়—শব্দের আপেক্ষিক সৌন্দর্যই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। অন্তরের রূপোল্লাস বাহিরে মূর্ত করবার প্রয়োজনেই শব্দকে তিনি নানাখানা ক'রে নানাভাবে খেলিয়েছেন। শব্দের উল্লাসে কবির অন্তরের দুর্দমনীয় উল্লাসই প্রকাশ পেয়েছে—শব্দকে তিনি অনুরাগের রসে চুইয়ে নিয়েছেন। কোন এক অজ্ঞাতপূর্ব রসোজ্জ্বলতাকে ব্যক্ত করবার জন্য শব্দগুলি যেন আনন্দে লীলাচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে সর্বক্ষেত্রে কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। এই অতিরিক্ত শব্দপ্রীতির জন্যই করুণানিধানের কবিমন শব্দের চেতনার দিকটি কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছে। এই চেতনা থাকলেই কবির ভাবানুভূতি যথাবিহিত শব্দযোজনা ও ছন্দ হিল্লোলের মধ্য দিয়ে চিত্ররূপে ফুটে সংহত হয়—করুণানিধানের মধ্যে তার অভাব আছে। শব্দ তাঁর কাব্যে কোথাও কোথাও চিত্রকে প্রকাশ করে না—চিত্রের দূতিয়ালী করে। কবির অন্তরে যে অপ্রকাশ্য দুর্বার আবেগ বর্ষীয়সী ভোগ করছে এবং অতিশয় স্বচ্ছন্দ বাণী বিন্যাস ও উৎকৃষ্ট ছন্দ শিল্পের মধ্য দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তি প্রার্থনা করছে শব্দগুলি যেন তারই রাগিণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত ক'রে স্পষ্ট অস্পষ্টতার কেমন একটি কুহেলিকা সৃষ্টি করেছে। শব্দগুলি শঙ্কিত হচ্ছে, প্রাবিত হচ্ছে—কিন্তু ঠিকমত স্পন্দিত হ'তে পারছে না। যেমন—

(১) মেঘমন্থর জল ঝরঝরে
যত কেয়াকাড় ফুলে গেছে ভ'রে
বেঁধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে মধু লুণ্ঠন লাগি।
শাতার প্রান্তে খর কণ্টকে
পাখা কাটাকাটি অলির কটকে,
কান্ত কঠোর কুসুম ভোটকে পরাগের ভাগাভাগি।
(বর্ষায়)

হেরি নৈঋতে রবিছে মরুৎ
ঊর্ধ্ব শুণ্ড দিগ গজ যূথ
পন্নগ-শিখা স্ফুরৎ প্রতাপ,
গুরু গর্জন জলদ কলাপ
ঝলে কি দীপক আলায়ে।
ওঠে উল্লোল বিদ্রোহ দোল,
নব-নটন মদন-রোল,
কোটি-কোদণ্ড টংকার রব,
বাজে যুগপৎ, রুদ্রোৎসব
নীল মেঘাদ্রি দোলায়ে।
(পদ্মা তটে)

করুণানিধান সম্বন্ধে আলোচনা এইখানেই শেষ হলো। এ আলোচনার ভিতর দিয়ে আমি করুণানিধানের কবি মানস ও কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছি এবং প্রসংগক্রমে তাঁর কবিতাবলীর কাব্যগত উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি সে আলোচনা একেবারে নিষ্ফল হয় নি। প্রবন্ধশেষে বলতে পারি, করুণানিধান আমাদের এই জীবনেরই কবি সে জীবন বস্তুজীবন নয়—বস্তুজীবনেরই অন্তর্গূঢ় রস জীবন। তাঁর styleএর প্রকাশ আছে, ঘোষণা নেই তাঁর ভাষা lucid, flexible, ভাব subjective, প্রকা

musical তথাপি ভাবের বাণীকার হিসেবে তিনি সর্বত্র সার্থক হতে পারেন নি। এমন কবিতাও আমরা পেয়েছি যেখানে কবির ভাব ভাষা ও ছন্দগত কৃত্রিমতাই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। করুণানিধানের সময়ে তাঁর বন্ধুস্থানীয় কোন সমালোচকের দ্বারা এই কৃত্রিমতাই আবার উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু আমরা Byron সম্বন্ধে Matthew Arnold যে কথা বলেছিলেন ঠিক সেই কথাই উদ্ধৃত ক'রে বলবো, "The time has come for him, it comes for all poets, when he must take his real and permanent place, no longer

মণিপুর প্রসঙ্গ (১২)

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

মণিপুরীগণ বর্তমানে বৈষ্ণব মতাবলম্বী হিন্দু হইলেও পূর্বে তাহাদের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ধর্ম ছিল। হিন্দু ধর্ম গ্রহণের ফলে সেই ধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই; সমাজে এখনও প্রাচীন ধর্ম মতের পুরোহিত মাইবা সম্প্রদায়ের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। মাইবাগণ নানা-রকম দেবতার পূজা করিত। ইহাদের মধ্যে চারজন দেবতার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, যথা লাম লাই অর্থাৎ বনরূপ দেবতা, যাহার কৃপায় কৃষিকার্য চলে, ইমোলাই অর্থাৎ বনদেবতা, ইমুংলাই অর্থাৎ গৃহদেবতা, বংশের পিতা। ইহারা ছাড়া প্রকৃতির আরও বিভিন্ন স্বরূপের প্রত্যেকের জন্য এক একজন দেবতা ছিলেন, যেমন জলদেবতা, গিরিদেবতা ইত্যাদি। মণিপুরী উপাখ্যানে পাখৈবী (জন্ম মৃত্যুর দেবতা), সেনামহী (রাজ-দেবতা, একমাত্র রাজাই এই দেবতার পূজার অধিকারী), মুংসাবা (পাথরের স্রষ্টা অর্থাৎ সৃষ্টি দেবতা), ইত্যাদি নানা ব্যক্তিগত, বংশগত এবং সামাজিক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম প্রচলনের পরও ইহাদের মধ্যে অনেকে যেমন পাখৈবী, মুমলাই, সেনামহী, মুংসাবা প্রভৃতি দেবতাগণও হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন! মণিপুরীদের সকল দেবতার উপরে রহিয়াছেন গুরু—যিনি জগতের পিতা—"তাইবাংপানবাগীমাপু (taibangpanbagimapu) তাঁহার দেহ হইতেই অহোম, মুরাং, যাবালাবা, মৈরাং, চেংলেই, কুমল, নিংথাজা প্রভৃতি মণিপুরী গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে সেই জগৎপিতা গুরুর আসন এখনও অটল। মণিপুরী রাজ পরিবার গুরুর পুত্র পাখাংবার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। সমাজে এইরূপ প্রবাদ আছে যে সেই পাখাংবা মাঝে মাঝে সর্পের রূপ ধরিয়া দেখা দেন। যখন তিনি বিশাল কায়রূপ ধরিয়া দেখা দেন তখন তিনি বিরূপ—নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে; যথাবিধি পূজা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই, আর যখন স্বর্ণাকৃতিতে দেখা দেন তখন আর কোন ভয় নাই, মণিপুরীদের উপর তিনি সন্তুষ্টই আছেন।

এই স্বর্ণরূপী পাখাংবা মণিপুরের রাজার বহিরাত্মা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মণিপুরীগণকে পালন করিতেছেন। স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের পতাকায় পাখাংবার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রতীক একটি সর্প আঁকা থাকিত। মণিপুরের প্রাগৈতিহাসিক যুগে নংপক নিংথৌ এবং পাখৈবী, নামক দেব দেবী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর মৈরাং যুগে জনপ্রিয় হন খাম্বা ও থইবী ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর নংপকনিংথৌ এবং পাখৈবী ও খাম্বা থইবী হরপার্বতীর অবতার বলিয়া পরিচিত হন। বিভিন্ন সময়ে এই দুই যুগল অবতার মণিপুরে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। নংপক নিংথৌ এবং পাখৈবীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়াভাব পরিস্ফুট অর্থাৎ শ্রীমতী রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী না হইয়াও তাঁহার প্রতি প্রেমোন্মাদিনী হইয়াছিলেন তেমনি পাখৈবী ও নংপকনিংথৌএর বিবাহিত পত্নী না হইয়াও

তাঁহার নিকট সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাহ্যিক লোকাচারের ক্ষুদ্রগণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার তাঁহাদের অন্তরের সত্যকে সবার উপরে স্থান দিয়া প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তবে প্রথম মণিপুরে হিন্দু ধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে মত দ্বৈধ থাকিলেও—হিন্দুধর্ম প্রবেশের সময় হইতেই প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে ইহার সমন্বয় চলিতে থাকে। গরীব নেওয়াজ যখন রাজনিকে বৈষ্ণববাদকে রাজধর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন তখন হইতে নিঃসন্দেহে হিন্দুধর্মের জনপ্রিয়তা বাড়িয়া চলে। ইহার পর রাজা জয়সিংহের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ গৃহীত হইয়া এখন পর্য্যন্তও সমাজে চালু আছে।

পূজাপার্বণ—বর্তমানে মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মানুমোদিত যতগুলি অনুষ্ঠান আছে—যথা—জন্মাষ্টমী, স্নান যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, হরিশয়ন, হরিউত্থান রাসযাত্রা, চৈতন্যদেবের জন্মদীবস, দোলযাত্রা ইত্যাদি বিশেষ ঘাঁকযমকের সঙ্গে পালিত হয়। তবে ইহাদের মধ্যে দোলযাত্রাই এখানকার সর্বপ্রধান উৎসব। বাংলাদেশে যেমন দুর্গোৎসব মণিপুরে তেমনি দোলযাত্রা। দোলপূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া এই উৎসব প্রায় ১৪দিন ব্যাপী চলে। বৈষ্ণব উৎসব ব্যতীত হিন্দুদের অন্যান্য পূজাপালি—যথা দুর্গাপূজা, দেওয়ালি, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি ইত্যাদিও মণিপুরীরা করিয়া থাকে। বাৎসরিক এই সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও বহিষ্ণু মণিপুরীদের বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের মূর্তি আছে। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সেখানে পূজা এবং সন্ধ্যারতি করিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখে চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি সন্ধ্যায় নামকীর্তন প্রায় লাগিয়াই থাকে। যাহাদের মন্দির নাই তাহাদের কুলবধূগণ গৃহের সম্মুখে সযত্নরোপীত তুলসীর মূলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া দিনের শেষে গোবিন্দকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পল্লী ধূপের গন্ধে, কাঁসর, ঘণ্টা ও শাঁখের নিনাদে পূতগম্ভীর হইয়া স্বতন্ত্র একটা জগতের সৃষ্টি করে।

পূজাপার্বণ মণিপুরীদের শুধু ধর্মভাবের পরিচায়ক নয়, অনেক সময় আভিজাত্যেরও অভিব্যক্তি। পিতৃশ্রাদ্ধ, ষষ্ঠীব্রত, ইত্যাদি নানা উপলক্ষে তাহারা প্রচুর খরচ করে; একে অন্যের সঙ্গে এইভাবে খরচের প্রতিযোগীতা করিয়া অনেক পরিবারকে ফতুর হইয়া যাইতেও দেখা যায়। পূজাপার্বণ ছাড়া তীর্থভ্রমণও মণিপুরীদের পুণ্য সঞ্চয়ের একটি পন্থা। অনেক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাহাদের জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ তীর্থ পর্য্যটনে ব্যয় করিয়া জীবনের অভিলাষ পূর্ণ করে। সমস্ত হিন্দু তীর্থই মণিপুরীদেরও তীর্থ।

তবে তাহাদের সবার সেরা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা ও বৃন্দাবন; চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপও প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত।

এই সমস্ত নিছক হিন্দু অনুষ্ঠান ছাড়াও অনেক প্রাচীন পূজাপালিও মণিপুরী সমাজে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশিয়া আছে। যথা :—

লাইহরাওবা :—মণিপুরী পুরাণে পাওয়া যায়—পৃথিবী সৃষ্টির পর পার্বতী এবং পরমেশ্বর রাসনৃত্য করার সংকল্প লইয়া মণিপুরের গিরিশৃঙ্গে অবতীর্ণ হন। মণিপুর উপত্যকা তখন জলমগ্ন ছিল। পরমেশ্বর মহাদেব তাঁহার ত্রিশূলের দ্বারা জলনিকাশের পথ করিয়া দেওয়ায় মণিপুর উপত্যকা ভাসিয়া উঠে। তখন পার্বতী ও পরমেশ্বর অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তাঁহাদের অভিলাষিত রাসনৃত্য করেন। ইহাই হইতেছে লাই হরাওবা অর্থাৎ দেবতার আনন্দ। বৈশাখ মাসে মণিপুরীগণ সমবেতভাবে অনুরূপ নৃত্য এবং স্থষ্টিতত্ত্বের গান গাহিয়া লাইহরাওবা উৎসব পালন করিয়া থাকে।

চীরাওবা—ইহা চৈত্র মাসে চরক পূজার দিন অনুষ্ঠিত হয়। চরক নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় এবং একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অনেকে ইহাকে চরক পূজা বলিয়া মনে করেন। আসলে চরক পূজার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ঐদিন মণিপুরীগণ ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র পরিষ্কার করিয়া পুরাতন

বৎসরের অতিরিক্ত দুইটা মুছিয়া ফেলে।

কেহ বলেন চহিতারা অর্থাৎ বৎসর গণনা (চারি বৎসর, তারা-গণনা) হইতে চিরাওবা। নামের উৎপত্তি হইয়াছে আগে ঐদিনে একজন নির্দিষ্ট লোক সমস্ত বৎসরের পাপ পুণ্য মঙ্গলামঙ্গলের ভার গ্রহণ করিত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজা কীর্তিচন্দ্রের সময় এই উৎসবের প্রচলন হয়, মণিপুরী সমাজে এইরূপ আরও পূজা পার্বণ আছে; কলেবরের ভয়ে তাহাদের সকলের সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

ভাষা ও সাহিত্য

মণিপুরীদের নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য আছে। কলিকাতা এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাতে বি.এ, এম্‌এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ডাক্তার গ্রীয়ারসন (Dr. Grierson) মণিপুরী ভাষাকে তিব্বৎ-ব্রহ্ম ভাষা শ্রেণীর মধ্যে কুকী-চীন শাখায় ফেলিয়াছেন। বড়ো ভাষা এবং প্রাচীন শাখাগুলির সঙ্গে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে মণিপুরী ভাষার পৃথক বর্ণমালাও ছিল। অবশ্য আজকাল আর তাহা ব্যবহার হয় না। বর্তমানে বাংলা বর্ণমালাতেই পুস্তকাদি লিখিত হয়। তবে ইহার উচ্চারণ পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র,—অনেকটা সংস্কৃত উচ্চারণের মত। প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমালায় লিখিত গ্রন্থাদির পাঠোদ্ধার করার মত লোক বর্তমানে অতি বিরল। 'মণিপুর প্রসঙ্গ' যদি কখনও পুস্তক আকারে বাহির করা সম্ভব হয় তবে তাহাতে সেই সমস্ত বর্ণমালা ও বাংলায় তাহাদের প্রতিবর্ণ কি হইতে পারে তাহা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা আছে।

মণিপুরী সাহিত্যকে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ এই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগের লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে আজ পর্যন্ত ২৪০টি হস্ত লিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুরাণ, বংশের ইতিকথা, জ্যোতিষ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও নীতিকথা প্রভৃতিই ছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মণিপুরী সাহিত্যের প্রধান বিষয় বস্তু। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে—১) তাখেল ঙবা (ত্রিপুরা বিজয়) ২) সুমজোক ঙাবা (সুমজোক বিজয়), ৩) চইথারন কুম্বারা (মণিপুরের রাজাদের ইতিহাস), ৪) নুমিৎ কম্বা (সূর্য্য শিকারী), ৫) পুত্তিল (পুত্তিতত্ত্ব), ৬) পোইরিতন কু খোকপা (পোইরিতনের কাহিনী), ৭ লাইথাক লাইখারোল, ৮) পাম্বৈবী খোঙ্গুন (পাম্বৈবীর পদচীহ্ন), এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর মণিপুরীগণ বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মারফত বাংলা ভাষা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। ধর্মভাব, রাজার আনুকূল্য ও বহিরাগত বৈষ্ণব গুরু ও ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় মণিপুরে বাংলা ভাষা যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে। তখনকার সরকারী চিঠিপত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অনেক মণিপুরী কবি বাংলায় নানা বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'ধরণী সংহিতা' নামক রাজা গম্ভীর সিংএর আমলের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলাতেই লেখা। এখন পর্যন্তও যে কোন পর্ব উপলক্ষে মণিপুরে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী ও পালা কীর্তন গাওয়া হইয়া থাকে. বৃদ্ধগণ কীর্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পরম শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। ১৯২৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত মণিপুরীগন বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পড়াশুনা করিত। বাংলা নাট্যাভিনয়ও তখন পর্যন্ত বিশেষ সমাদৃত ছিল। তথাপি মণিপুরী ভাষা অবহেলিত বা অনাদৃত ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নাই। ১৮৫৮ সনে মহারাজা চন্দ্রকীর্তি সিংএর নির্দেশে একটি মণিপুরী সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মণিপুরী সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প ধর্মগ্রন্থ, ব্যাকরণ শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মণিপুরী প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় কাব্যের মধ্যে হিজাম আঙ্গাহাল সিংএর 'আঙ্গাঘইবী' এবং

কবিরত্ন দেবেন্দ্রজিৎ সিংএর 'কংশবধ কাব্য' বেশ উঁচুদরের। 'খাম্বাথইবী'র মধ্যে লেখক প্রচলিত এবং বহু অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করিয়া শব্দ সম্পদের দারিদ্র্য কিভাবে ঘুচাইতে হয় সেই পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবিরত্ন দেবেন্দ্র সিং 'কংশ বধ কাব্য' ছাড়া আরও বহু কবিতা লিখিয়া মণিপুরী সাহিত্যমালা সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। এই দুইজন খ্যাতনামা কবি ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সুরচাঁদ শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য।

নাটক—

মণিপুরিগণ বিশেষ নাট্যামোদী, এ বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট দক্ষতাও রহিয়াছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৫৬) দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'লোকে নাট্যে' মণিপুরী অভিনেতাগণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সর্ব ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমে এখানকার রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় হইত। ১৯১৩ সনে স্কুলের ছেলেরা বাংলা 'পার্থ পরাজয়' নাটকের অনুবাদ 'অর্জুনলীলাইবীবা' অভিনয় করিয়া মণিপুরীদের চোখ খুলিয়া দেয়। তখন হইতে বাংলা নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়া কিছুদিন অনুবাদের যুগ চলে। ১৯২৪ সনে বর্তমান মেসার্স এম এম. ইবুঙ্গোহাল সিং কর্তৃক লিখিত 'নরসিং' নাটক অভিনীত হয়। এই দেখিয়া এস. ললিত সিং, এম. বামাচরণ সিং, এ. শ্যামসুন্দর সিং, এস. ব্রজমণি সিং, প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নানাবিধ নাটক লিখিয়া রঙ্গমঞ্চের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। নাটক লেখক এবং নাট্যকারদের এইরূপ কৃতীত্বের ফলে এক সময়ে ইম্ফলের মত জায়গায় ৭টী রঙ্গমঞ্চে একই সময়ে অভিনয় হইত। বর্তমানে চলচ্চিত্রের প্রাধান্যের ফলে রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা কমিয়া গেলেও নাট্যাভিনয় একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

উপন্যাস—

মণিপুরী উপন্যাস নাটকের মত ততটা খ্যাতি অর্জন করিতে না পারিলেও এবিষয়েও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থের অভাব নাই। ডাক্তার কমল সিংএর লেখা 'মাধবী' মণিপুরী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বর্তমানে রাজকুমার শীতলজিৎ সিং উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ নাম করিয়াছেন। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (মতুম কৈরেং সিং), কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' (বসুদেব শর্মা), মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য, (ছাওরাই বাম নদীয়াচাঁদ সিং) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস—

ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মতুয়া ঝুলন সিংএর বিজয় পাকালি, অতোম্বাপু শর্মার মণিপুর ইতিহাস দুজাও সিংএর মণিপুর ইতিহাস, রাজকুমার স্বাহাল সিংএর মণিপুর ইতিহাস এবং আরও অনেক পুস্তক আছে।

ধর্মসাহিত্য—

এক্ষেত্রে পণ্ডিতরাজ অতোম্বাপু শর্মা বিদ্যারত্ন একজন দিকপাল। তাঁহার মত সংস্কৃতজ্ঞ, বহুশাস্ত্রবিৎ গবেষক, লেখক, ধার্মিক ও সজ্জন ব্যক্তি ভারতের এই উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অতি বিরল। নগরীর কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া লোকের প্রশংসা ও নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাচীন ঋষিদের মত তিনি তাঁহার গবেষণালব্ধ সত্যকে একের পর এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন; চানক্য নীতি, চৈতন্য চরিতামৃত, সারস্বত ব্যাকরণ, গীতা, পূজাপদ্ধতি, মানব ধর্মসার, অথর্ব বেদ, শ্রীমৎ ভাগবৎ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক রচনার মধ্যে মণিপুর পুরাবৃত্তম, মৈতৈগী মৈচৌরল, ক্রয়োকস, মৈতাই হাত্রিমন্ত্রী, মৈতাই ধর্ম আরীবা, মণিপুরীরাস অনিম্বাবা, মুমিৎ লোইসাং, প্রাচীন মণিপুরী ভাষা, মণিপুর প্রতিভা, মণিপুরী সনাতন ধর্ম ইত্যাদি আরও অনেক আছে। মণিপুরী ভাষায় এত পুস্তক আর কেহ লেখেন নাই।

এই সমস্ত লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও ওসি, প্রজাতন্ত্র, আনৌবা সমাজ প্রভৃতি দৈনিক সংবাদপত্র ও মণিপুরী ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। আধুনিক মণিপুরী সাহিত্য, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার ভাবরসে পুষ্ট।

বর্তমানে এখানে হিন্দী ভাষার ব্যাপক প্রসারতা দেখা যাইতেছে ; কিন্তু মণিপুরী সাহিত্যের উপর এখনও ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হয় নাই। সিন্ধু ও গঙ্গা যেমন অন্যান্য বহু উপনদীর স্রোতধারায় পুষ্ট, তেমনি সাহিত্যও জাতির নিজস্ব সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য সংস্পর্শে আসিয়া পুরিপুষ্ট হয়। এই সত্যটি মণিপুরী ভাষার শ্রীবৃদ্ধির যুগে ধামা চাপা পড়িলে মারাত্মক ভুল হইবে।

মণিপুরী নৃত্য—

নৃত্য সকল কলার আদি ; যখন বাদ্যযন্ত্র ছিল না, সঙ্গীত সৃষ্টি হয় নাই, চিত্রাঙ্কণ কৌশল অজানা ছিল সেই আদিম যুগে মানুষ তাহার অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করিত নিজের দেহে ; দেহ তালে তালে আন্দোলিত করিয়া সাবলীল ছন্দে তাহার সুখ দুঃখ ভয় ঘৃণা প্রকাশ করিত। ইহাই নৃত্য। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অনুভূতি যতই সূক্ষ্ম এবং মার্জিত হইতে লাগিল, নৃত্যও সেই সঙ্গে পা ফেলিয়া সুকুমার কলার পরিণত হইল। যে নৃত্যে সত্য এবং সুন্দরের উপলব্ধি মূর্ত হইয়া উঠে তাহা জীবনী শক্তির চরম বিকাশ। ইহার আবেদন দেশ জাতি, ধর্ম অথবা ভাষার বন্ধন হইতে মুক্ত, মণিপুরী নৃত্য ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তবে অনেক সময় জহরীকে জহর চিনাইয়া দিতে হয়। কারণ সাধারণ লোকের মূল্যবোধ প্রায় ক্ষেত্রেই ততটা উন্নত থাকে না। মণিপুরী নৃত্যের মূল্যও বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলারসিক রবীন্দ্রনাথের চোখে এই নৃত্যকলার অফুরন্ত রস সম্পদ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। ১৩২৬ সনে (বাংলা) শ্রীহট্টে এবং পরে আগরতলায় মণিপুরী রাস নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতেই মণিপুরী নৃত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র মণিপুরী নৃত্য বিশেষ সমাদৃত। কেবল নাচ দেখিবার জন্যই প্রতি বৎসর মণিপুরে বহুলোক আসিয়া থাকে।

নৃত্যের প্রকৃতি, ভাব ও গুণাগুণ বিচার করিয়া মণিপুরী নৃত্য জনপদ এবং উচ্চাঙ্গ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এখানকার অধিকাংশ নৃত্যই লাস্য প্রধান। জনপদ নৃত্যের মধ্যে থাবলচোঙবা, লাইহরাওবা, খাম্বা থইবী, কর্তাল চলোন, মৃদঙ্গ চলোন, নাগানৃত্য ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসনৃত্য উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

থাবল চোঙবা—মণিপুরীদের প্রাচীনতম নৃত্য। শীতের শেষে বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির মনোরম স্পর্শে তরুণ তরুণীদের মন স্বভাবতই পুলকিত হইয়া উঠে—আর তাহা প্রকাশ পায় থাবল চোঙবা নৃত্যে। ফাল্গুন পূর্ণিমার আকাশে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ছেলে মেয়েরা কোন বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পরস্পরের হাত ধরিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত নৃত্য করে। পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ দিন ব্যাপী এই নাচ চলে। থাবল চোঙবার প্রাচীনতা ইহার সারল্য এবং আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে। অন্যান্য মণিপুরী নৃত্যের তুলনায় ইহাতে কলাকৌশল খুব কম। মণিপুরী ছেলে মেয়েরা সকলেই এই নাচ জানে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনের পর কিছু বৈষ্ণবীয় প্রলেপ লাগিলেও ইহার সঙ্গীতগুলি মণিপুরের প্রাকৃতিক বর্ণনা, প্রাচীন দেব দেবী এবং বীরদের বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

লাইহরাওবা—ইহাও মণিপুরের প্রাচীন ধর্ম এবং সভ্যতার দান। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। এই নাচ একক, দ্বৈত অথবা সমষ্টিগত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে মেয়েদের অঙ্গভঙ্গি যত সুললিত এবং লাস্যময় পুরুষের অঙ্গভঙ্গি তেমনই তাণ্ডব এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক। পৃথিবী সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্তই এই নৃত্যের বিষয়বস্তু ; কাপড় বুনা, ধানকাটা, মাছ ধরা ইত্যাদি কোন কিছুই বাদ যায় না।

খাম্বা থইবী নৃত্য—খাম্বা ও থইবীর কাহিনী এই নৃত্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলা হয়। ইহাতে একজন নর্তক খাম্বা ও একজন নর্তকী থইবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নাচিয়া থাকে।

মৃদঙ্গ চলোন, কর্তাল চলোন এবং নাগা নৃত্য তাণ্ডব নৃত্য শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ মৃদঙ্গ

এবং কর্তাল সহযোগে নৃত্য সম্পূর্ণ বৈষ্ণব প্রভাবহীন। নাগানৃত্য মণিপুরীদের নিজস্ব নয়—নাগাদের নিকট হইতে ধার করা।

রাসনৃত্য—

মণিপুরী নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রাসের কাহিনী এই রাস নৃত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র (ভজ সিং) মণিপুরে রাসনৃত্যের প্রথম প্রবর্তন করেন। এই নৃত্যে নর্তক নর্তকীদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ইহার পোষাক পরিচ্ছদ, ললিত ছন্দ ও মুদ্রা, চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু। দর্শকের নয়ন ও মন মুগ্ধ করে। রাসনৃত্যে সাধারণতঃ রাধা এবং তাঁহার ৭জন সখীর ভূমিকায় ৭জন নর্তকী ও কৃষ্ণের ভূমিকায় একজন বালক নৃত্য করিয়া থাকে।

উচ্চাঙ্গ মণিপুরী নৃত্যের মুদ্রাগুলি কথাকলি অথবা ভারত নাট্যমের মত জটিল নয়। অভিবাদন, প্রার্থনা, মালাগাঁথা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশুরী, গাত্রালঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রকাশের জন্য বহুরকমের সরল হস্ত মুদ্রা আছে। মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রের সংগতের দ্বারা নৃত্যের তাল রাখা হয়। রাসনৃত্যের বসন এবং ভূষণ অতি মার্জিত ও মনোরম। ভারতের অন্যান্য নৃত্যে এত সুন্দর পোষাক দেখা যায় না। নৃত্যে মণিপুরীদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। নৃত্যের অ-আ-ক-খ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই জানা ইহার প্রধান কারণ ধর্মের সঙ্গে নৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ধর্মই মণিপুরী নৃত্যের প্রধান অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ধর্মের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্যও উচ্চ পাশাপাশি চলিয়াছে। ধর্মের প্রধান আনুষঙ্গিক এবং অনুষ্ঠান নৃত্য। ধর্ম নিরপেক্ষ নৃত্যের কোন স্থান নাই এইরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভাব আছে বলিয়াই এখানকার নৃত্য স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত, শুধু রঙ্গমঞ্চের আশ্রয়পুষ্ট টবের ফুলের মত বিলাসের সামগ্রী নয়।

সমাপ্ত

লাঞ্জ-নম্বর

শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

জায়গাটা মন্দ নয়। নদী এখানে ঘোড়ার নালের মত ছুদিকে বেঁকে গিয়েছে। অত্যন্ত প্রশস্ত নদীগর্ভ এখানে—পরপর তিন নদীর প্রস্থ হবে প্রায় চার মাইল। ওপার দেখা যায় না—ধূ ধূ করে গাছ পালা। সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াত করে এপথে। নদীর মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একখানা বড় জাহাজ বিদেশী পতাকা তুলে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আছে কোষ্টাল ব্যাটারি—যারা প্রস্তুত হয়ে আছে সমুদ্র পথে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে। কোষ্টাল ব্যাটারির মাউথনে দক্ষিণের বাতাস লেগে শন্ শন্ শব্দ হচ্ছে। মাউথনটি পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই নদীর ধারে পাওয়া যাবে এই ছোট সহরের ডাকঘর। ডাকঘরের মাথায় বড় বড় হরপের কালো অক্ষরে লেখা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

D Roy E.	2 W. GVT. 3	MOYAPUR
36	56 63	494950

এ 'কোড' গুলো পোর্ট কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছে জাহাজকে জলের নাপ বুঝিয়ে দেবার জন্য। ক্রমে সন্ধ্যা হল। বাতি জ্বলে উঠল নদীর মাঝখানে নোঙর করা জাহাজে, আর কোষ্টাল ব্যাটারী এলাকায়। দক্ষিণে নদীর গতি পথের বহু দূরে একটা লাল 'বেকন লাইট' জ্বলতে লাগল জাহাজকে হুসিয়ার করবার জন্য। আর তার চাইতেও বহুদূরে নদীর ওপরে দেখা যেতে লাগল একটা সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষীণ আলো! নদীর স্রোতে সাঁতার কেটে মন এখানে এগিয়ে চলে সাগরের সন্ধানে। আর এখানে আছেন 'জগন্নাথের শীতল শয়ন অনন্ত নাগ'। অনন্ত নাগের বংশধরেরা এখন সাগর ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছেন মোহনায়, ব-দ্বীপে। এখানে আছে চামরকরা, গোখরো, শিকড়চাঁদা এদের দংশনে মৃত্যু অনিবার্য।

এদের ভয়ে নদীর ধারে আর পায়চারী না করে এসে স্ত্রী জয়ন্তীকে বললাম—চলো, আজ ওঠা যাক আর নদীর ধারে অন্ধকারে থাকা ঠিক নয়। জয়ন্তী আপত্তি তুলল—বেশত বসে গল্প করছিলাম আমরা হুজনে এখনই উঠতে হবে?

আমি বললাম—প্রয়োজন হলে তুমি বেহুলা হয়ে লক্ষীন্দরকে বাঁচাতে যাবে কি না তা জানি না, তবে লক্ষীন্দর তোমাকে বাঁচাতে যাবেনা।

—আজকাল বেহুলারাও লক্ষীন্দরকে বাঁচাতে যায় না। তারি আমার লক্ষীন্দর!

দাম্পত্য লঘু পরিহাসের পরিসমাপ্তি টানলেন বিশাখা দেবী, বললেন জয়ন্তীকে—চলো, উঠে পড়া যাক্।

তিনজনে মিলে ফিরে চললাম ঘরে।

জয়ন্তী বললে—খবর জান, বিশাখাদির ঘরে কাল বিকেলে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন।

—কেন?

—ওনার ঘরে যে দুটি ছাত্রী থাকেন, তার ভেতর একটির কাল জন্মদিন পালন করা হবে।

—তা উনি নিজে নেমন্তন্ন না করে তোমায় দিয়ে নেমন্তন্ন করাচ্ছেন কেন? কিন্তু কাল বিকেলে যে আমি মফঃস্বলে বেরিয়ে যাচ্ছি! এবারে জবাব এল স্বয়ং নিমন্ত্রণ কারিণীর কাছ থেকে—কাল বিকেলে না ফিরে পরশু সকালেই যাবেন না হয়।

—বিবেচনা করে দেখব।

এবারে জয়ন্তী বললে—বিবেচনা নয়, উনি বলছেন যখন তুমি কালকের দিনটা থেকেই যাও।

—গভর্ণমেণ্টের হুকুম অমান্য করতে পারি, কিন্তু তোমার হুকুম ত আমি অমান্য করতে পারি না। তুমি বলছ যখন তখন থাকব।

—বিশাখাদির মুখুপ্যে ত আমার সকাল-বিকেল নাকাল করত, আর কত ?

বাড়ী ফিরে এলাম তিনজনে।

আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন, আপনার বয়স যদি তিরিশ পেরিয়ে গিয়ে থাকে, আপনার যদি উজ্জ্বল-বর্ণের প্রতি দুর্বলতা না থেকে থাকে—তবে বিশাখা মুখার্জি আপনার চোখে সুন্দরী বলে মনে হবে। বিশাখার রং কালো, মুখখানা গোল, চিবুকের নীচে একটা তিল, চোখ দু'খানা শান্ত এবং সুন্দর, মাথায় এক-খোপা কালো মিশমিশে চুল অতি সাধারণভাবে বাঁধা। চেহারা বা চলা ফেরায় নেই বিশাখার একটুও আধুনিকতা। প্রসাধন বলতে যা ব্যবহার করে সেটা হল শুধু সাবান, বিশাখা পরে কালো বা সবুজ রংএর চওড়া পাড় দেওয়া মিলের সাদা সাড়ী। বয়েস বিশাখার আটাশ পার হতে চলেছে এবার। মেয়েদের চঞ্চল যৌবন মিলিয়ে গিয়ে এবার দেখা দিয়েছে শান্ত যৌবন। বিশাখা শিক্ষিতা এবং শহুরে মেয়ে, অথচ শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির।

আমাদের দাম্পত্য-জীবনে বিশাখা তৃতীয় ব্যক্তি। জয়ন্তীর সাথে বিশাখার প্রথম আলাপ, তারপরে বন্ধুতা। আর আমার সাথে বিশাখার এ পাঁচ মাসের ভেতরে সরাসরি আলাপ হয়েছে খুব বেশী হলে পাঁচবার। আর তাও খুব সংক্ষিপ্ত। যেমন জয়ন্তী একবার দিদির কাছে বেড়াতে যাওয়াতে জিজ্ঞেস করেছিলেন—জয়ন্তী কবে আসবে ? তাও চোখ দুটো নীচু করে।

আমি বলেছিলাম—তের তারিখে।

বাস্, সেখানেই প্রসঙ্গ শেষ।

আমাদের সাথে বিশাখার পরিচয় হয়েছে আশ্চর্য-ভাবে। নতুন জায়গায় বদলী হয়ে এসে প্রথমেই যে সমস্যাটা আমার দেখা দিল সেটা হল একটা বাড়ীর।

আমার পূর্বেকার সহকর্মী যিনি ছিলেন এখানে, তিনি ছিলেন অবিবাহিত—থাকতেন এক বন্ধুর বাড়ীতে অর্ধের বিনিময়ে আতিথ্য গ্রহণ করে। হয়ত তিনি বুদ্ধিমান, তাই তিনি যৌবনটাকে কাটিয়ে দিলেন অর্ধেক সন্ন্যাসী এবং অর্ধেক গৃহী হয়ে। কিন্তু আমি যে পাকে চক্রে পড়ে শ্রীরাধিকার চরণে দাসখত লিখে দিয়ে বসে আছি (আমার বিয়েটা ভিন-আইনে, তবে আমি জয়ন্তীর প্রেমে পড়িনি—জয়ন্তীই আমার প্রেমে পড়েছিল), আমি করি কি উপায় ? প্রথমে এখানে একা এসেছিলাম, জয়ন্তী হুকুম দিয়েছিল—পনেরো দিনের ভেতরে বাড়ীর ব্যবস্থা করা চাই। বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন স্থানীয় সার্কেল অফিসার দিলীপবাবু, তিনি বললেন—আপনাকে একটা ভাল বাড়ীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাড়ীর মালিকের সাথে আমার পরিচয় আছে, তিনি আমার কথা রাখবেন আশা করি। আমি কৃতার্থ হয়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললাম—পরিত্রাণায় সাধুনাং···আপনি যেন স্বয়ং ভগবান। আপনি আমাকে আমার স্ত্রীর 'পারসিকিউসানের' হাত থেকে রক্ষা করলেন। এই দশ দিনের ভেতরে দুটো 'রিমাইনডার' এসেছে—বাড়ীর কি ব্যবস্থা হ'ল ?

বাড়ী যেটা পেলাম সেটা মন্দ নয়। পছন্দ হ'ল আমার, তবে 'তিনি' পছন্দ করলেই হয়। যাবতীয় ব্যাপারে তিনিই সব, আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র।

বাড়ী দখল করে যে ব্যাপারটা আবিষ্কার করলাম সেটা হ'ল যে আমার প্রতিবেশী হলেন এক ভদ্রমহিলা—বিশ্বয়িত্রি—তিনি দুটো ছাত্রী নিয়ে থাকেন। আমি একটু আড্ডাবাজ লোক, পাশের বাড়ীতে দু'বেলা আড্ডা দেওয়া আমার চিরকেলে অভ্যাস। কিন্তু এ যে নারী-নিকেতন ! কোথায় পাশের বাড়ীতে গিয়ে ব্রিজ-পোকার খেলব, মধ্যপ্রাচ্যের 'কূপ' নিয়ে কাউকে কূপোকাৎ করব, লণ্ডনে কোন ভারতীয় মহারাজা বিদেশী প্রনয়িনীকে নিয়ে যুগপৎ মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে আবৃত্তি করেছেন—

'পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে মানিব তুমি আছ আমি আছি।'

সে বিষয় নিয়ে গবেষণা করব। আর কোথায় পাশের বাড়ীতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে অলিখিত নোটিশ—Trespassers will be Prosecuted.

তবে 'তিনি' খুব খুসী হলেন এসে বাড়ী এবং প্রতিবেশী দেখে—এই যা আমার আনন্দ।

জয়ন্তী পাশের বাড়ীর মহিলার সাথে আলাপ করে এসে বললে, মহিলাটি খুব ভাল। অতি চমৎকার ব্যবহার করলেন। আমি বলে এসেছি যে তুমি এবারে খুব ভয় হয়েছ পাশের বাড়ীতে মেল মেশার না পেয়ে, রোজ রাত এগারটা অব্দি আড্ডা এবারে আর চলবে না।

ক্রমে জয়ন্তীর সাথে পাশের বাড়ীর বিশাখার বেশ অন্তরঙ্গতা জমে উঠল। দু'বেলা উভয়ের সাক্ষাৎ চলল, কখনও এ বাড়ীতে, কখনও ও বাড়ীতে।

আমাদের বাড়ীতে আমি উপস্থিত থাকলে বড় বেশী বিশাখা আসে না। এলেও আমাকে এড়িয়ে চলে।

একদিন বিকেলে জয়ন্তী ঘরোয়াভাবে বিশাখাকে চায়ের নেমন্তন্ন করলে আমাদের সাথে চা খাবার জন্য।

চায়ের টেবিলে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ উপস্থিত নয়। কিন্তু বিশাখা দুটো কথা পর্যন্ত ভাল করে বলতে পারল না, মাথা নিচু করে চায়ের কাপে চামচে ঘোরাতে লাগল। আমি বলে ফেললাম—আপনি বড্ড লাজুক। আমাকে আপনার এত লজ্জা কেন? আগে না হয় অপরিচিত ছিলাম, এখন ত আপনার বন্ধুর স্বামী। না দেখছি, আমি থাকলে আপনার চা খাওয়াই হবে না! আমি বরং ও ঘরে গিয়ে চা খাই।

এবারে বিশাখা বললে—না, আপনি এখানেই বসুন।

কিছুদিন পরে জয়ন্তীর কাছ থেকে জানা গেল বিশাখা বিধবা। বিশাখার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বছর, তার স্বামী মারা গেছে আজ দু' বছর। বিবাহিত জীবন কেমন ছিল, স্বামীর ভালবাসা কতটা পেয়েছিল—এ সমস্ত কোন প্রশ্নেরই জবাব দেয়নি বিশাখা জয়ন্তীর কাছে। সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু বিশাখা বিধবা! এ যেন আমি বিশ্বাস করতে··· করতেই পারছিলাম না। এর ভেতরেই বিশাখার দাম্পত্য জীবন এসেছে আর ফুরিয়ে গেছে! বিশাখার বিগত দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে একটা কৌতূহল ক্রমশই বাড়তে লাগল। জয়ন্তীর সাথে বিশাখার হৃদ্যতা জমেছে বেশ, কিন্তু এ বিষয়ে বিশাখা জয়ন্তীর কাছে নির্বাক।

তারপর এক শ্রাবণের সন্ধ্যাতে অভাবনীয় ভাবে জয়ন্তী বিশাখার দাম্পত্য জীবনের কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারল। সেদিন বিকেল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি চলেছে, সহরের সমস্ত পথঘাট জলে ভেসে গেছে। বিশাখা বাড়ী ফিরে আর কোথাও বের হয় নি। ছাত্রী দুটো কোন বান্ধবীর বাড়ীতে গিয়ে আটকে পড়েছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, বিশাখা একা নিচের ঘরে আলো জেলে বসে আছে। অন্যদিন সন্ধ্যেবেলা বিশাখাকে পাওয়া যায় জয়ন্তীর সাথে। অবিরাম বৃষ্টি চলেছে, এর ভেতরে হঠাৎ ছাতা মাথায় দিয়ে জয়ন্তী এসে উপস্থিত হ'ল বিশাখার বাড়ীতে। বারান্দায় এসে জানালা দিয়ে জয়ন্তী যা দেখতে পেল তা রীতিমত অপ্রত্যাশিত।

বিশাখার সম্মুখে বড় একটা ট্রাঙ্ক খোলা। সে হাতে করে বসে আছে একটি সুদর্শন যুবকের ছবি, সম্মুখে অনেকগুলো নীল কাগজে লেখা চিঠি আর নীল খাম ছড়ান—বিশাখার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে দুই কপোল বেয়ে। জয়ন্তী ভাবলে এ অবস্থায় আর যাওয়াটা সঙ্গত হবে কি না? তারপর জয়ন্তী ঘরে ঢুকে বললে—বিশাখাদি, আর আমার কাছে গোপন কোরোনা তুমি। আজ খুলে বলতে হবে সব।

বিশাখা চোখের জল শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে বললে—ঝড় জলের ভেতরে তুমি?—হ্যাঁ, এলাম তোমার খোঁজ করতে।—তারপর জয়ন্তী ছবিখানা হাতে নিয়ে বলল—এই কি তোমার স্বামীর ছবি?

বিশাখা চোখ দুটো তুলে অদ্ভুত ভাবে তাকাল জয়ন্তীর দিকে, তারপর মাথা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

—আর এগুলো সব ওর চিঠি? এবারেও বিশাখা মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বললে না। তারপর একখানা চিঠি তুলে ধরে বললে—পড়ো।

জয়ন্তী অপ্রস্তুত হয়ে গেল,—স্বামী স্ত্রীর প্রণয়লিপি এত একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। জয়ন্তীর পড়া

কি উচিত হবে? জয়ন্তী বলল—পড়ব আমি?

—পড়ো।

প্রিয়তমাসু—

তোমার ২৪।৪ তারিখের চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। দিন চারেক যাবৎ তোমার ওপরে রাগ করছিলাম তোমার চিঠির বিলম্ব দেখে। ভাবছিলাম তুমিও হয়ত আমায় আর ভালবাস না (জানত আমি খুব সেন্টিমেন্টাল), কিন্তু এ আমার অপরাধ হয়েছে আমি ত জানি তোমার প্রেম সোনার চাইতেও খাঁটি বেশী। তবু কেন এ আমার অন্যায় সংশয়? ভুল বুঝে তোমায় অনেক আঘাত দিয়েছি, হয়ত বা ভবিষ্যতেও দেব। কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝোনা, আমার ভালবাসার দাবীতে সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দিও। এ আমার চিরকালের দাবী। জগতে অনেকে ভুল বুঝেছে তাদের ভুল আমি ভাঙতে পারব না। কিন্তু তুমি ভুল বুঝলে প্রয়োজন হলে অশ্রু জল দিয়ে সে ভুল ভাঙব। তুমি ভুল বুঝেছ এ আমি সইতে পারব না। এ জগতে কারো কাছ থেকে পাইনি স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, ভালবাসা।

জীবন যুদ্ধে শুধু লড়াই করে এসেছি। কিন্তু তুমি এসে আমার অন্তর ভরিয়ে দিয়েছ স্নেহ, মমতা, ভালবাসায়। শৈশব থেকে আমি মাতৃহীন, এ জগতে যাদের শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয় অথবা যৌবনে পত্নী বিয়োগ হয় তাদের মত হতভাগ্য আর কেউ নেই।

সেই এক হতভাগ্যের জীবন তুমি মহীয়ান করে তুললে তোমার প্রেমের মূল্য দিয়ে।

তোমাকে কাছে পাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পাচ্ছি না। আর কতকাল তুমি সামাজিক নীতির যূপকাষ্ঠে নিজের বাসনাকে বলিদান করবে? আর কতকাল নিজের মনকে প্রতারণা করবে? আর তোমার আমার মিলনই যদি বিধাতার অভিপ্রেত নয়, তবে এ বন্ধন কেন? আমি কর্তব্যের দাবীতে সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি, শুধু তোমাকে কাছে পেতে চাই। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি নিজেকে আর বঞ্চনা করতে চেয়োনা। ঘড়িতে রাত বারটা। আজ আর লিখব না। তুমি আমার পরম শুভেচ্ছা এবং প্রণয় সম্ভাষণ জেনো।

ইতি—তোমার প্রণয়মুগ্ধ

অশোক।

চিঠিখানা পড়ে জয়ন্তী বললে—কি হয়ে যায়া গেলেন তিনি? বিশাখা এর ভেতরে নিজেকে বদলে নিয়েছে, বললে—আর কিছু এ বিষয়ে এখন জিজ্ঞেস কোরোনা। তোমার সমস্ত কৌতূহলই আমি মেটাব একদিন, তবে আজ নয়।

এ পর্যন্ত কাহিনী বর্তমানে এসিয়ে এসেছে।

পরের দিন বিকেল বেলা জয়ন্তীকে নিয়ে চায়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেলাম বিশাখার বাড়ীতে। সুন্দর করে ঘর সাজান হয়েছে। টেবিল মুড়ে দেওয়া হয়েছে সুন্দর টেবিল ক্লথে, ফুলদানীতে দেওয়া হয়েছে টাটকা গোলাপ আর রজনীগন্ধা। ঘরের দেয়ালে মহাত্মাজী আর নেতাজীর ফটোতে ঝুলেয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন পুষ্পমাল্য।

আজ যেন শান্ত বিশাখা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, লাজ-লজ্জা আজ মুখর হয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনকে চায়ের টেবিলে বসিয়ে ছোটাছুটি করছে এঘর ওঘর। আমি বললাম—বিশাখা দেবীকে আমাদের সাথে বসতে হবে!

বিশাখা বললে—তা কি হয়? আপনারা আজ আমার অতিথি। আপনাদের আপ্যায়ন করব আজ আমি নিজে।

আয়োজন দেখে বললাম—একি চায়ের নেমন্তন্ন—লুচি, মাংস, মিষ্টি?—আয়োজন করেছেন ত প্রচুর।

বিশাখা বললে—প্রশান্তবাবুকে আর কিছুটা মাংস দি।

বললাম—ধন্যবাদ, আর নয়। খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম, রন্ধন কার্যেও আপনার নিপুণতার পরিচয় পেয়ে গেলাম। তারপর বিশাখা বললে—নীলা কফি নিয়ে এসো।

আমি অবাক—কফি। কফির ব্যবস্থা করলেন কি

—জয়ন্তীর কাছে শুনেছি আপনি কফি খেতে ভালবাসেন। আমি নিজে কফি তৈরী করতে জানি। আমার মেজদাও কফি খেতে ভালবাসেন। বাড়ীতে আমিই ওঁর কফি তৈরী করতাম।

বাড়ী ফিরে এসে ভাবলাম আজ বিশাখা হঠাৎ অত চঞ্চল এবং মুখর হয়ে উঠল কি করে?

চার দিন পরে মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে জয়ন্তীর কাছে শুনতে পেলাম যে, বিশাখা এ সহর ছেড়ে চলে গেছে—আমি যাবার দু'দিন পরেই। অন্য কোথায় নাকি ভাল চাকরি পেয়েছে।

তারপর জয়ন্তীর কাছে যা শুনতে পেলাম তা ততোধিক আশ্চর্যের। যাবার আগে বিশাখা নিজের সমস্ত কাহিনী বলে গেছে জয়ন্তীর কাছে।

বিশাখা জয়ন্তীকে বলেছে—

বোনদের ভেতরে আমি ছিলাম সব চাইতে বড়। তাই আমি ছিলাম বাবার আদুরে। বাবার ইচ্ছে ছিল আমি ভাল করে পড়াশুনা করি—অন্ততঃ বি. এ.টা পাশ করি। কিন্তু আমরা পর পর তিন বোন, মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন আমাদের বিয়ের জন্য। মা বললেন বাবাকে—তুমি মেনীর বিয়ের চেষ্টা কর, আর কলেজে পড়িয়ে কাজ নেই। তিনটি মেয়েরই ত দিয়ে দিতে হবে।

আমি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, বাবা এসে আমায় সব খুলে বললেন, তারপর বললেন—আমার ইচ্ছে ছিল তুমি পড়াশুনা কর। কিন্তু তোমার মায়ের মত নয় তা। তোমার বয়েস হয়েছে, সব তুমি বোঝ—কি করব আমায় বল?

আমি বললাম—বাবা, তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। আমি তার কোনটাতেই আপত্তি করব না।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পাত্র স্থির করার ব্যাপারে বাবা বলেছিলেন—আমি পাত্রের ঘর-বাড়ী বিষয়-সম্পত্তি কিছুই দেখব না, আমি শুধু দেখব পাত্রটিকে। তাকে আমি যাচাই করে নেব, তাকে যদি আমার পছন্দ হয়ে যায়, ব্যস্—সেখানেই ব্যাপার চুকে গেল। তার কারণ বাবা নিজেও ছিলেন কর্মযোগী এবং কর্মযোগে ওঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। বিশ টাকার কেরানীগিরীতে জীবন সুরু করে আজ তিনি হয়েছেন সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক! এবং সত্যিই পাত্র ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল, বিয়ে স্থির করে এসে আমাকে শোনাবার উদ্দেশ্যেই মাকে জোর গলায় বলছিলেন—তোমার বাবাকে এবার হারিয়ে দিলাম। তোমার বাবাও জামাই পছন্দ করেছিলেন, আর আমিও জামাই পছন্দ করলাম। ছেলেত নয় যেন হীরের টুকরো, যেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি চেহারা। আর বরাবর স্কলার। ছেলেটির ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।

মা হেসে বলছিলেন—বিয়েটা হয়ে যাক্, তারপরই বাহাদুরিটা নিও।

শুনে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল—সত্যি এত ভাল একটি ছেলে আমার জীবনের সাথী হবে? বিয়ের আলোচনা চলবার পর থেকেই আমি মনে মনে কল্পনা করেছিলাম একটি যুবককে নিজের পতিরূপে সুন্দর একখানা মুখ, সুন্দর একটি দেহ, জ্ঞানে পণ্ডিত, ব্যবহারে শিশুর মত সরল, আনন্দে চপল এবং কর্মে শান্ত। তাহলে কি সত্যিই আমার কল্পনা বাস্তবে রূপ নেবে?

বিয়ে হয়ে গেল আই, এ, পরীক্ষা দেবার ঠিক দিন কয় পরে। কাছে পেলাম তাকে। তাকে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। তার রূপ এবং পাণ্ডিত্য দুইই আমায় মুগ্ধ করল। বিশেষ করে পাণ্ডিত্যে আমার ছিল কিছুটা লোভ। (বাবাকে দেখেছি বলেই হয়ত)। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য সে পড়েছে অনেক কিছু এবং এখনও রোজ রাতে বসে স্কুলের ছাত্রের মত যেন পড়া তৈরী করে নানা বিষয়ে। সংসারের কথায় এসে আমায় বললে—জানত বিশাখা, সামান্য একটা চাকরি করি। কিন্তু দায়িত্ব আমার অনেক—বুড়ো বাবা, মা, ছোট ভাই, বোন। বৈমাত্রেয় ভাই বোন হলে কি হবে, ওরা আমায় আপন দাদা বলেই জানে ওদের দায়িত্বটা আমার বরং

দেশী। তুমি পারবে আমার সাথে এ বোঝা বইতে? বললাম তোমার বোঝা যদি নিজের বোঝা মনে না করতে পারি তাহলে আপন করা হ'ল কিসে? খুশী হয়ে দু'হাতে আমার মাথাটা কাকুনি দিয়ে বললে—এমন একটি মেয়ে কি আমার জন্যে ছিল?

সামান্য একটা মাথার কাকুনি, কিন্তু তাতে সে কি স্নেহ এবং আন্তরিকতা মাখান ছিল তা ভুলতে পারব না কোনদিন।

(এ কথা বলার কালে বিশাখার চোখে জল এসেছিল)।

এ দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে গিয়েই আমাদের মিলিত জীবনের সুযোগ আর বিশেষ হল না। আমার ভাবনা হ'ল তাকে যেন লোকে মন্দ না বলে। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে যেন কলঙ্কের ছাপ না পড়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দু'জনের মিলিত জীবনের ব্যবস্থা হ'ল। বিয়ে হবার তিন বছর পরে তার হ'ল টি. বি। ছুটি নিয়ে চলে এল কলকাতায় নিজের বাবা মার কাছে চিকিৎসার জন্যে।

চিকিৎসার ব্যবস্থা হল, আমার ওপরে তার পড়ল সেবার।

মাস চারেক কাটাবার পর তাকে দেওয়া হল কাঁচড়াপাড়া টি. বি. স্যানিটেরিয়ামে। ছ'মাস থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এল ঘরে। কিন্তু তিন মাস না যেতেই আবার রোগ ফিরে এল। সংসার এদিকে অচল—শ্বশুরমশায় আর সংসার চালাতে পারেন না। স্যানিটোরিয়ামে থাকা পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যয় বাবাই বহন করেছিলেন, কিন্তু তারপর চলে কি করে। এতদিন যে ছিল সংসারের কর্ণধার সেই হল এখন সংসারের গলগ্রহ। শ্বশুরমশায় চিন্তিত হলেন, শাশুড়ী বিরক্ত হলেন।

তারপর একদিন সে নিজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিল। একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে সে আত্মহত্যা করেছে। আমি শুতাম অন্য ঘরে, সেদিন সকালে এসে দেখি ঘরের দরজা আর খোলা হচ্ছে না। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা ভেঙে দেখা গেল সে দেহ থেকে প্রাণ অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে। টের টের পাওয়া গেল যে সে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। শ্বশুরমশায় চোখের জল ফেলে বললেন—শেষ পর্যন্ত ভানু আত্মহত্যা করল? বড় অভিমানী ছেলে ছিল ভানু। শাশুড়ী কেঁদে বললেন—আত্মহত্যা করলি কেন রে ভানু?

এই পর্যন্ত বিশাখা জয়ন্তীকে বলেছিল যাবার আগের দিন। পরদিন যাবার সময় বিশাখা বলেছে—কালকের ঘটনা আর একটু বলা বাকী। সে আত্মহত্যা করেনি, আমিই তাকে গরম দুধের সাথে আফিম্ মিশিয়ে রাত্রিরে শোবার আগে খেতে দিয়েছিলাম।

আর একটা কথা বোধহয় তুমি জাননা জয়ন্তী যে আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি চার মাস রাঁচী মেনট্যাল হসপিটালে ছিলাম। দু'বার চেষ্টা করেছিলাম নিজে আত্মহত্যা করতে।

জয়ন্তী সমস্ত কাহিনী বলে থেমে গেল। রাত্রি তখন নিষুতি অন্ধকার। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। বারান্দায় দুটো চেয়ারে বসে আছি আমরা দু'জন। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে—তারই অস্পষ্ট আলো এসে পড়েছে জয়ন্তীর মুখে। জয়ন্তীর মুখে একটা করুণ ছায়া পড়েছে। দুজনে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

তারপর আবার জয়ন্তী বললে—ও একটা কথা বলতে বহু আগে বিশাখাদি বারণ করেছিলেন যে ওনার স্বামী ছিল হুবহু তোমার মত দেখতে। আমি ফটোতেও দেখেছি—একেবারে তোমার চেহারা।

একটা বিস্ময় না কাটতেই আরেকটা বিস্ময়!

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ আগেই উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। এসময়ে একমাত্র ঘরের আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন কাজটাই বা কি, যাবারই বা জায়গা কোথায়? অধ্যাপক সিদ্ধান্তর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ মনোবিজ্ঞান আর দর্শন নিয়ে আলোচনা করার বাধা ছিল না, কিন্তু ইচ্ছে হ'লো না এমন অসময়ে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত ক'রতে। দেখ্‌লেই অমনি বিষ্টুচরণকে ফরমাস ক'রবেন তিনি চা ক'রতে। আসলে বিষ্টুচরণের সযত্ন হাতের চা যে গলধঃকরণ করা কঠিন, একথা বলি কি ক'রে? অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কিন্তু তা' ব'লে কোনো সময়ই তত্ত্বতা ক'রতে ছাড়েন না। তাঁর সেই শশব্যস্ত তত্ত্বতা বরং লজ্জারই উদ্রেক করে অনেক সময়। আসলে প্রাণময় মানুষটি। এমন প্রাণঃশীলতা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ভিন্ন এযুগে বড়-একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অথচ সেই তুলনায় ব্যক্তিগত জীবনে একেবারেই নিঃস্ব তিনি। তাঁর কথা মনে হ'লেই তাঁর প্রশস্তিতে এমনি ক'রেই যার বার স্মৃতির নার্ভটা পুনরাবৃত্তি-দোষে দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। তা থেকে মনটাকে কিছুতেই ফেরাতে পারিনা।

পথে বেরিয়ে মুহূর্তের জন্য তাই একবার থামতে হ'লো। এখন আর একটি মাত্রই জায়গা আছে যাবার মতো। সে হ'চ্ছে অণিমা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে তার নির্জন পড়ার টেব্‌লে ব'সে কিছু-একখানি রুচিকর উপন্যাস কিম্বা রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক'-এর পৃষ্ঠার মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপ্ত চোখ দু'টোকে ছেড়ে দিয়েছে। পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে, এখন আর ঘরে ব'সে কাজ বিশেষ নেই। অতএব এবারে সেদিকেই পা দু'খানিকে বাড়িয়ে দিলাম।

গিয়ে উঠ্‌তেই বিস্ময়ে ফেটে প'ড়লো অণিমা। —'মাই গড্। তুমি হঠাৎ এসময়ে আস্‌বে, ভাব্‌তেই পারিনি সুমন্ত।'

ব'ল্‌লাম, 'আমিই কি ভাব্‌তে পেরেছিলাম! কিন্তু ঘটনাচক্রে এসে প'ড়তে বাধ্য হ'লাম।'

—'আমিও অনেকক্ষণ থেকে তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম। একা একা কিছুতেই ভালো লাগ্‌ছিল না।' থেমে অণিমা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এমন কি ঘটনা, ব'ল্‌লে না তো?'

—'ব'ল্‌ছি।' ঘরের এপাশে ওপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ক'রলাম, 'একা কেন, বাড়ীতে নেই কেউ?'

—'থাক্‌লে আর ব'ল্‌ছি কি!' অণিমা ব'ল্‌লো, 'বাবার কোন্ এক বন্ধুর বাড়ীতে এবেলা খাবার নেমন্তন্ন। আজকালকার বাজারে এমন নেমন্তন্নই বা কে কাকে করে! মাকে আর শীলাকে নিয়ে বাবা তাই আধঘণ্টাটাক হ'লো বেরিয়ে প'ড়েছেন। আমাকেও টান্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু যাইনি। মুখ গুঁজে কোথাও গিয়ে আমি ব'সে থাক্‌তে পারি না। বাবা-ওদের ফিরতে-ফিরতেও রাত দশটা-এগারোটার কম হবেনা এ সময়টা নিজেকে নিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ কি!'

'—কিন্তু পারলে না তো?'

হেসে অণিমা ব'ল্‌লো, 'সত্যিই পারলুম না। কেবলই তোমার কথা মনে হ'ছিল, তাই তো এম্‌নি ক'রে তোমাকে পেলাম মুমন্ত।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'বিশ্বাস করো তুমি এই সাইকোলজিতে?'

—'করি।' থেমে অণিমা ব'ল্‌লো, 'এ্যাট্রাক্‌শান অব্‌ সোল টু সোল; একজনের ইম্‌টুইটিভ্‌ ঘট আর একজনকে ভাবিয়ে তোলে, একেই আমরা অন্য নামে বলি—উইল পাওয়ার।'

কথা শুনে না হেসে পারলুম না, ব'ল্‌লাম, 'দেখছি, এতদিনে সাইকোলজির সাইক্লিক্‌ এ্যাক্‌শনে ঠিক তোমার মাথায় এসে গেছে। এবারে অনায়াসে তুমি বিশ্ব-জয়ে বেরোতে পারো!'

—'কেন, আগে সংশয় ছিল নাকি?' চোখ দু'টোকে এবারে বড় বড় ক'রে তাকালো অণিমা।

ব'ল্‌লাম, 'ছিল বৈ কি। পাছে হারিয়ে বসি, পাছে তলিয়ে যাই স্মৃতির অতলে, এমন ভয়টা কি একেবারেই অমূলক ছিল!'

—'আবার তুমি ভূতগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়ছো, দেখ্‌তে পাচ্ছি।' ব'লে বিস্ফারিত চোখ দু'টোকে কিছুক্ষণের জন্য স্থির ক'রে ধ'রলো আমার মুখের দিকে অণিমা।

ব'ল্‌লাম, 'ভূতেরা নির্জন ক্ষেত্রেই আসে, লোকালয়ে আসে না। এমন নির্জন পরিবেশে সেই ভূতকে তাড়াই কি ক'রে?'

—'হ'য়েছে, আর দুষ্টুমি ক'রতে হবে না। এবারে বলো তোমার ঘটনাচক্রটা কি?' আবার যেন খানিকটা ঝিঁ চেপে ব'স্‌লো অণিমার।

ব'ল্‌লাম, 'ব'ল্‌তে পারি এক সর্তে। বলো, মুক্তকণ্ঠে অনেকক্ষণ হা'সে ব'লে আজ আবৃত্তি শোনাবে তুমি?'

এবারে কেন যেন স্বল্পক্ষণের জন্য একবার থাম্‌লো অণিমা,. তারপর ব'ল্‌লো, 'তোমাকে আবৃত্তি শোনাবো ব'লেই কি এতক্ষণ তবে মনে মনে তোমাকে স্মরণ ক'রছিলাম?'

'—আবৃত্তিটা ছিল অবচেতন মনের সঙ্গী। চেতনার স্বচ্ছ আয়নায় যাকে ধ'রতে চেয়েছিলে, সেই আয়নার ঠিক পিছনের দিকটাতেই ছিল এটা; আয়নাখানিকে ঘুরিয়ে দেখ্‌লেই তোমার কাছে তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তো।' একটুকাল থেমে তারপর পুনরায় ব'ল্‌লাম, 'আমাদের আর্টের জগতে গান যেখানে এসে বাসা বাঁধ্‌তে পারলো না, সেখানে আবৃত্তিটাই যে বড় হ'য়ে দেখা দিল। তোমার উন্মাদনা ভিন্ন এও বোধ করি সম্ভব হ'তো না। আজকের দিনটা অন্ততঃ কথা রাখো লক্ষীটি!'

অভিভূতের মতো দৃষ্টিতে এতক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অণিমা, এবারে ব'ল্‌লো, 'আবৃত্তির চাইতেও একটা উন্মাদনাকর ঘটনা তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারি এই মুহূর্তে। বলো, কোন্‌টায় রাজি তুমি?'

—'দু'টোতেই।'

—'বেশ তো যা-হোক্‌! দুধও খাবে তামাকও খাবে? ছেলেরা বড় স্বার্থপর।' ব'লে মুচকি একবার হাসলো অণিমা।

—'আসলে ছেলেরা লাভ এবং লভ্‌ দু'টোকে এক ক'রে চায়, এই হচ্ছে তাদের স্বার্থপরতার কারণ।' একথা বললাম না যে, মেয়েদের স্বার্থপরতাও সেইখানেই। প্রেমের পিছনে যদি লাভ না থাকে, কিম্বা লাভের পিছনে প্রেম, তবে বোধ করি সৃষ্টির আদি থেকে পুরুষ এবং নারী অন্ততঃ হৃদয়ের ব্যাপার থেকে একেবারেই স'রে দাঁড়াতো! থেমে বললাম, 'আগে তোমার ঘটনাটাই বরং বলো।'

এবারে আর একটুকুও দ্বিধা ক'রলো না অণিমা। প্রথমটা তো হেসেই কুটি কুটি, পরে ব'ললো, 'তোমরা যে কি, আর কি নও, তাই আমি বুঝি না। বিকেলে শীলাকে নিয়ে একটু পথে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ মনোতোষের সঙ্গে দেখা। দেখে সত্যিই অবাক হ'লাম।

যে ছেলে এতদিন ক্লাসে অবধি পালিয়ে পালিয়ে ফিরেছে, পরীক্ষার পরে যার নামটা অবধি মন থেকে মুছে গিয়েছিল, হঠাৎ তার আবার সশরীরে পুনঃ আবির্ভাব। দেখা হ'তেই হাত উঁচিয়ে নমস্কার ক'রে কাছে এসে দাঁড়ালো।—'

কৌতূহল দমন ক'রতে না পেরে ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'তারপর?'

তেমনি অবারিত হেসে অণিমা ব'ললো, 'তারের কিছু নেই। প্রথমটা পরীক্ষার ভালো-মন্দ নিয়ে দু' একটা প্রশ্ন তুলে পরে শীলার দিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এ কে, আপনার বোন বুঝি?' ব'ললাম, 'হ্যাঁ'। ইতিমধ্যে হঠাৎ যে শীলার কি হ'লো, বুঝতে পারলুম না; ব'ললো, 'তুমি বরং ধীরে ধীরে এস দিদি, আমি এগোই।' ব'লেই ছুট্। হতচ্ছাড়ীটা আজকাল এত দুষ্টু হ'য়েছে, কি বলি!'

ব'ললাম, 'দুষ্টু নয়, এতে বরং শীলার ইন্টেলিজেন্সেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।'

হাসি থামিয়ে এবারে খানিকটা ক্রোধ প্রকাশ ক'রলো অণিমা: 'আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওর মাথাটিকে আরও খেয়েছ।'

ব'ললাম, 'শীলা যে আমার আদরেরই বস্তু, আদর না দিয়ে কি করি! তা' যাক্, তুমি যা ব'লছিলে তা-ই বলো।'

অর্থাৎ মনোতোষের কথা।

স্বল্পক্ষণের জন্য একবার থামলো এবারে অণিমা, তারপর ব'ললো, 'শীলা চলে গেল, অথচ মনোতোষ কিন্তু সহসা সঙ্গ ত্যাগ ক'রলো না। ব'ললো, 'ভুল ক'রে একদিন মনের দুর্বলতায় অপরাধ ক'রে ফেলেছি আপনার কাছে, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। কবিতাটা আপনি নিশ্চয়ই তক্ষুণি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, জানি না সেই সঙ্গে সেই ঘটনাটাকেও মন থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছেন কিনা! যদি না পেরে থাকেন, তবে আমার অনুরোধ, বিষয়টাকে একটি দিনের জন্যেও আর মনে ক'রে রাখবেন না।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'জবাবে তুমি কিছু ব'ললে না?'

—'ব'ললাম বৈ কি!' থেমে অণিমা ব'ললো, 'ব'ললাম, ভালোবাসা কি কিছু অপরাধ মনোতোষবাবু? শুদ্ধস্বরকে মিশিয়ে একদিন যে কবিতা আপনি আমাকে উপহার দিয়েছেন, তার কি মূল্য কিছু কম? ছিঁড়ে ফেললে হয়ত কাগজের টুকরোটাকেই শুধু ছিঁড়ে ফেলা যেতো, কিন্তু মন? মন যে বস্তুকে ছাড়িয়ে আরও অনেকখানি। কবিতাটা তৎক্ষণে আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে; ইচ্ছে ক'রলেই কি তার কোনো একটি অক্ষর কখনও ভোলা যায়! একথা ভুলে যান কেন যে, আপনি আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ডও! জীবনে যখন যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন, আপনাদের মতো সহপাঠী বন্ধুদের কি কখনও ভুলতে পারি! তবে যে আমার আজকের জীবনটাকে একেবারেই অস্বীকার করা হবে!'

থেমে সকৌতুকে একবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধ'রলো অণিমা। বুঝলাম—কথাটা ব'লে আমাকে কিছুটা পরীক্ষা ক'রতে চাচ্ছে সে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় ভালো নম্বর না তুলতে পারলেও-যে অণিমার প্রশ্নের খাতায় আমার পাওনা নম্বরটা ঠিক পুরোপুরিই রয়ে গেছে, একথাটা বোধ করি অণিমাও ভালো ক'রে বুঝতে পারেনি! তার কথার জবাবে কিছু-একটা ব্যাঙ্গ প্রশ্ন তুলে ধরার বিধা ছিল না, কিন্তু কিছুই না ব'লে নীরবে একইভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নিজের বাক্-সংযমতার তারিফ ক'রলাম।

অণিমা তার সেই সকৌতুক দৃষ্টি নিয়েই পুনরায় কথালো হ'য়ে উঠলো। ব'ললো, 'শুনে বোধ করি মনোতোষের বুকখানি ফুলে পঞ্চাশ ইঞ্চি হ'য়ে গেল; অভিভূত কণ্ঠে ব'ললো, 'ইউ আর রিয়্যালি গ্রেট, মিস মিত্র। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কোনোকালেই ক্ষুণ্ণ হবার নয়।' আচ্ছা বলোতো সুমন্ত, এমন পাগলও কোথাও আছে পৃথিবীতে? তোমাদের মুখে প্রশংসা শুনে শুনে এখন আমার নিজের উপরেই যেন ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছি!'

ব'ললাম, 'ওটা পৃথিবীতে সুন্দরী হ'য়ে জন্মাবার অভিশাপ।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হ'য়ে দাঁড়াতে হ'লো এবারে।

—'সুন্দরী, সত্যিই আমি তবে সুন্দরী, বলো?'

—'সুন্দরী, তবে কিন্নরী নও।' ব'ললাম, 'সুন্দরই যদি না হবে, তবে এই মুগ্ধ ভ্রমরকে বাঁধলে কি ক'রে?'

হেসে অণিমা ব'ললো, 'কিন্তু ভ্রমর হ'লেও তত কালো নও তুমি। আমার গায়ের রং কি তোমার রংকে ছাড়িয়ে কিছু?'

—'কোনোদিন তো মিলিয়ে দেখিনি, এস, এবারে দেখি।'

অণিমার টেব্‌লের মাঝখানে ছোট্ট একখানি হাত-আয়না শোভা পাচ্ছিল, আয়নার অনেকখানিই চ'টে গেছে, তবু দিব্যি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে আমাদের প্রতিবিম্বকে। এবারে অণিমার মুখখানিকে কাছে টেনে নিয়ে আমার কপোল সংযুক্ত ক'রে আয়নার মধ্য দিয়ে আমাদের রং যাচাই ক'রে দেখতে যাচ্ছিলাম, বুঝতে পেরে লজ্জায় নিজেকে সজোরে সরিয়ে নিয়ে অণিমা ব'ললো, 'রংটা কি শুধু মুখেই, হাতে নেই?'

ব'ললাম, 'মুখ আর হাত কি এক হ'লো!'

চাপা হাসিতে মুখখানিকে ঈষৎ রঞ্জিত ক'রে অণিমা ব'ললো, 'তোমার মতো তো আমি কবি হ'তে পারিনি, বুঝবো কেমন ক'রে?'

ব'ললাম, কাব্য কি তোমার মধ্যেও কিছু কম? কম নয় ব'লেই যে তোমার সান্নিধ্যে বার বার ক'রে মনের মধ্যে নানা আবৃত্তি জেগে ওঠে! অনেকদিন শুনি না, শোনাও না একটা আবৃত্তি, লক্ষ্মী!'

প'ড়ে রইল রঙের বিচার, সেই সঙ্গে মনোতোষের প্রসঙ্গটাও চাপা প'ড়ে গেল। গিয়ে ভালোই হ'লো, প্রসঙ্গটার আসলে ঐখানেই শেষ ছিল। ঠিকই ব'লেছিল অণিমা, ভয়ের কিছু নেই। থাকলেও আমি তার উপর বড় বেশী মূল্য আরোপ ক'রতাম না। মনোতোষ যে গভীর জলের মাছ নয়, একেবারেই সাধারণ বুদ্ধির ছেলে—কলেজের ক্লাসে ব'সেই তা বুঝে নিয়েছিলাম।

অণিমা ব'ললো, 'কই, তোমার ঘটনাচক্রটা কি, কিছু ব'ললে না তো?'

কোনো কিছুই ভুল হবার কথা নয় অণিমার।

নিদিয়ার এবারে তদুপরির ব্যাপারগুলিকে প্রকাশ ক'রে ব'ললাম, 'খাবে মাবে না, আপনি মোড়ল। দুদিনের জন্যে কোথাকার কে বেড়াতে এসে এসব কি আরম্ভ ক'রেছে, বলোতো? এরপর তো আমার দেখছি ঘরে থাকাই দায় হয়ে উঠবে।'

—'সে কি, আমি তো দেখছি—বেশ জমিয়ে নিয়েছ তবে!' বলে মুখের উপর দিয়ে শাড়ীর আঁচলখানিকে টেনে নিল অণিমা।

ব'ললাম, 'শেষ পর্যন্ত তুমিও তবে একথা ব'লতে পারলে?'

ধীরে ধীরে মুখের সামনে থেকে আঁচলখানিকে অপসারিত করে অণিমা ব'ললো, 'আমিও তো বুঝতে পারছি না, তুমিই বা বিষয়টাকে এত সিরিয়াস্‌লি নিলে কি ক'রে?'

—'বাড়ীর ভিতরে বিষয় ঘটবে, আর আমি নির্বিসম্বন্ধ হ'য়ে ব'সে থাকবো? কোনো মানুষ কি পারে তেম্‌নি ক'রে ব'সে থাকতে?'

—'মানুষের মধ্যে দেবতাও তো বাস করেন। তাই যদি না পারো, তবে ভালোবাসা ব্যক্ত ক'রে বিয়ে ক'রেই তো ব'সতে পারো।' ব'লে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে কাম্‌ড়ে ধ'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অণিমা আমার মুখের দিকে।

কথাটা শুনে আঘাত পেলাম নিঃসন্দেহে। ব'ললাম, 'এম্‌নি ক'রে আমিও তো ব'লতে পারতাম—মনোতোষকে তুমি বিয়ে করো।'

মাথায় হাত স্পর্শ ক'রলে কেউটে যেমন ফুলে ওঠে, ঠিক তেম্‌নি ক'রেই অণিমা এবারে আগুন হ'য়ে উঠলো। ব'ললো, 'মনোতোষকে নিয়ে আমার মনে কোনো প্রব্লেম নেই। তুমি সেখানে নিজের ব্যাপারে প্রব্লেমকে ছাপিয়ে উঠতে পারছো

ছিবার ইজ নি ডিফারেন্স বিটুইন্ ইউ এ্যাণ্ড্ মি।'

কে ব'লবে—এ মেয়ে দুর্বল, অবলা? কথাটা হয়ত ঠিকই ব'লেছো অনিমা। সাইকোলজিতে এবারে তার ভালো নম্বর থাকবে, নিঃসন্দেহ।

ব'ললাম, 'থাক্ সে ডিফারেন্স, তুমি একবার কাল-পরশু এসো আমার ওখানে।'

—'কেন, মেয়েটির চোখের উপর তোমার ডিফেন্স-পাওয়ারকে বড় ক'রে তুলে ধরবার জন্যে?' বলে এতক্ষণে আর-একবার মুখ টিপে হাসলো অনিমা।

ব'ললাম, 'হলেই বা ক্ষতি কি! সংসারে অন্ততঃ একথাটা প্রকাশ হয়ে যাক—তুমি ভিন্ন আমার উপর কোনো ব্যাপারেই আর-কারুর অধিকার

—'কোনো জিনিষের বাড়াবাড়িটাই কি ভালো, সুমন্ত! মানুষের কাছে তাতে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। আমরা কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত মানুষের হাসির খোরাকে পর্যবসিত হবো?'

বল্লাম, 'হ'লে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বাঙালী হাসতে জানে না, জানে কেবল ক'রতে, জানে সব কিছুকে নিয়ে জট পাকাতে। হাসিকে আমি ভয় করি ভয় করি ঐ জটকে।'

এবারে যেন আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না অনিমার, চোখ-মুখের এমনই একটা ভঙ্গী ক'রে সে ব'ললো, 'ওমা, সে কি, এত ভীতু তুমি! যত বড়াই, সে শুধু তোমার মুখে। দেশের জট ছাড়াতে পারবে না তো দেশের ছেলে হ'য়ে জন্মেছিলে কেন?'

কোন্ জায়গায় যে আঘাত ক'রলো অনিমা, বুঝতে বাকী রইল না; তবু ব'ললাম, 'আমাদের শুধু জন্মই হ'য়েছিল, দেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে আমরা শুধু সংখ্যা বাড়িয়েই গেলাম, পঞ্চপঙ্কে হাঁক দিয়ে মাটির মানুষকে গড়ে যেতে আর পারলুম না।'

কিন্তু কেন পারলুম না, কেন আমাদের এই দীনতা, তা নিয়ে কি একটিবারও ভাবতে বসেছি? ভাবিনি। যদি ভাবতাম, তবে সেই ভাবনার মুখোসের মধ্য দিয়ে দেখতে পেতাম—সমাজের যে হীনমন্যতার মধ্য দিয়ে অর্থকরী বৃত্তির আশ্রয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা একটা নিদারুণ পঙ্কের নালা বেয়ে চ'লেছে, সেখানে সেই ব্যবস্থার মধ্যে প'ড়ে কারুর কোনো ভালো ক'রবার পথই নির্ভয়যোগ্য বা সুগম নয়। আমাদের সংসার-চক্রটাও তারই একটি উল্লেখ-যোগ্য উদাহরণ। অনিমার বাবা অমূল্যধনবাবুর দারিদ্র্য আর মা অরুণাংশু দেবীর মানসিক বিপর্যয়ও সেই একই ব্যবস্থার অনিবার্য ফল। একথা কতদিন কতভাবেই না আলোচনা ক'রেছি অনিমার সঙ্গে! কিন্তু সমস্ত আলোচনাই শেষ পর্যন্ত ঐ আলোচনাতেই পর্যবসিত হয়েছে। ভরাট হয়নি কিছু। রাতারাতি তো আর দেশের সমাজব্যবস্থা কিছু-একটা পাল্টে যাচ্ছে! না যে, ভরাট হবে। অতএব যদি কোনো অক্ষমতা থেকে থাকে, সে অক্ষমতা যে একা আমারই নয়, একথাও অনিমা জানে বৈ কি! একটুকাল থেমে তাই পুনরায় ব'ললাম, 'দেশের কথা, রাষ্ট্রের কথা আপাততঃ না হয় উহ্যই থাক্ এখনকার জন্যে। রাতও অনেক হ'লো, লীলা ওদের ফিরে আসারও বোধ করি বড়-বেশী আর দেরী নেই; একটা আবৃত্তি করো লক্ষীটি, শুনে চিত্ত ভ'রে নিয়ে উঠে যাই।'

আমার মুখের দিকে একটা চোরা চাহনি হেনে মুখ টিপে টিপে অনেকক্ষণ ধ'রে হাসতে লাগলো অনিমা। তারপর বললো, 'আবৃত্তির চাইতে এই যে এতক্ষণ বসে বসে দু'জনে গল্প ক'রছি, এইটেই কি ভালো লাগছে না?'

—'লাগছে, সত্যিই ভালো লাগছে, তোমার পাশে এসে দু'দণ্ড বসতে পেলেই যে আমার ভালো লাগে; তবু একটা আবৃত্তি করো, বাকী রাত্রির প্রহরগুলি তোমার সেই সুরের মূর্চ্ছনাতেই আমার কেটে যাবে।'

কথা রাখলো এবারে অণিমা। ব'ললো, 'বলো তো, কোথা থেকে কোন্ কবিতাটা বলছি?' তারপর তার স্বভাব-কোমল সুরে আবৃত্তি শুরু করলো :

'আমার কাছে কী চাও তুমি ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হ'ল দিনের শুরু
তেম্‌নি হবে সারা।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজভোলা সব খেপার দলে তেম্‌নি আবার জুটে
ক'রবে দিশেহারা।
স্বপনমৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেম্‌নি হবো সারা॥

জানি জানি, তুমি আমার চাওনা পূজার বালা,
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর শুব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশীর রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥'

কোথা থেকে কোন্ কবিতা আবৃত্তি ক'রলো অণিমা, তা অজানা ছিল না, কিন্তু সে সম্বন্ধে একটি কথাও আর খুলে ব'লতে গেলুম না। আবৃত্তি করতে করতে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল অণিমা। তার সেই উচ্ছ্বাস স্পষ্ট অনুভব করছিলাম তার কমনীয় মুখখানির প্রতিটি ভাব ও প্রতিটি রক্তকণিকার মধ্যে। আমারো ইচ্ছে করছিল না অণিমাকে ছেড়ে এমন বিহ্বল রাত্রিটাকে নিঃশেষে নীরবে পোহায়ে যেতে দিতে। কিন্তু দিতে হলো। অকস্মাৎ কোথা থেকে বাসটার বেল কানে এসে বাজতেই সচকিত হয়ে উঠতে হলো। আমার হৃদয়বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সমাজ কোথাও অনুকূল পরিবেশ রচনা ক'রে রাখেনি। এখুনি হয়ত অমূল্যবাবু নীলা আর অরুণাংশু দেবীকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক এই ঘরের দাওয়ায় এসেই হাঁক দিয়ে উঠবেন। আমার এই উপস্থিতির জন্য অলক্ষ্যে হয়ত অণিমার পক্ষে দুটো রূঢ় কথা শোনাও বিচিত্র কিছু হবে না! এমন কত সময়ই তো তাকে শুনতে হয়েছে। তাই আর বিলম্ব না করে উঠে পড়লাম। আসার সময় শুধু নীরবে অণিমার একগাছা কুলিবদ্ধ ডান হাত-খানিকে নিজের হাতের মুঠোয় টেনে এনে ছোট্ট একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে এলাম তাতে। এতটুকুও প্রশ্ন তুললো না অণিমা, শুধু তার বিহ্বল দৃষ্টিটাকে আমার মুখের উপর মেলে ধরে রাখলো। মনে হলো—অণিমার মতো আমিও আবৃত্তি করে বলি—

...'তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর শুব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশীর রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।

কিন্তু সত্যিই কি পারলুম বলতে? মুখের কথা মনের মধ্যেই শুধু গুমরে মরলো।

[ক্রমশঃ

সমালোচক প্রমথ চৌধুরী

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

সাম্প্রতিক কালে শিশু সাহিত্য নামে এক প্রকার সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রমথ চৌধুরী কিন্তু এই জাতীয় শিশু সাহিত্যের অস্তিত্বে আদৌ আস্থা স্থাপন করেন নাই। তাঁহার মতে শিশু সাহিত্য সেই জাতীয় সৃষ্টি কর্ম যাহার রচয়িতাও শিশু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তির অবতারণা করা যায় না।

"শিশু সাহিত্য ব'লে কোন জিনিষ নেই এবং থাকা উচিত নয়! তবে শিশুপাঠ্য সাহিত্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করার সঙ্কল্প অতি সাধু। কেননা শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায়—অর্থাৎ আনন্দ সেই বস্তু যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এই সাহিত্যের সৃষ্টি। ...রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, Don Quixote, Gulliver's Travels, Robinson Cruose এসবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয়নি। ...আসলে ছেলেরা ভালবাসে শুধু রূপকথা—স্বরূপকথাও নয়, অরূপকথাও নয় অর্থাৎ জ্ঞানের কথাও নয়, নীতির কথাও নয়। আমরা যে শিশু সাহিত্য রচনা করতে পারি না তার কারণ আমরা চেষ্টা করলেও রূপকথা তৈরী করতে পারি না। যে যুগে রূপকথার সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগ হচ্ছে মানব সভ্যতার শৈশব। সেকালে লোক মনে শিশু ছিল, সেযুগে সম্ভব অসম্ভবের ভেদজ্ঞান মানুষের মনে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।"

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক আদৌ আছে কিনা বা থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নের কোনও সুচিন্তিত সমাধান হয় নাই। অতীতে এই বিতর্ককে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিতমহলে অনেক বাক্ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান কালে দলগত রাজনীতির উগ্রতার চাপে ঐ বিরোধ ক্রমশঃই ভয়াবহ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর একটি মন্তব্য সুমিত চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। 'সাহিত্য বনাম পলিটিক্স' নামক একটি আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন, "একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, সাহিত্যের ধর্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লেখকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। পলিটিক্স কবির হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ভাবমদমত্ত, দার্শনিকের হাতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, ঔপন্যাসিকের হাতে অদ্ভুত ও ঐতিহাসিকের হাতে ভূতগ্রস্ত।"

অনেকের ধারণা এই যে, 'কথা সাহিত্য' অর্থাৎ গল্প এবং উপন্যাস পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদের দেশের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রমথ চৌধুরীর কথায় বলিব, "বরং সত্য কথা এই যে, পুরাকালে ও সাহিত্য ভারতবর্ষে রচিত হয়ে তারপর দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে! এককালে পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের প্রচলন ইউরোপের লোক সমাজে যে অতি বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে গল্প বলিবার এবং গল্প শুনিবার লোকের যত আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সহিত তুলনীয় নয়। 'কথা সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সেই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন "আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি ব'লে বিশ্বে পরিচিত, সিন্ধু যুগ যুগ

ধরে আমাদের ধর্মের বাহন হয়েছে, মুখ্যতঃ গল্প। রামায়ণ মহাভারত বাদ দিলে হিন্দু ধর্মের পোনেরো আনা বাদ পড়ে যায়, আর জাতক বাদ দিলে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শকের কচ্‌কচি মাত্র হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ছাড়াও এদেশে অসংখ্য গল্প আছে, যা সেকালে সাহিত্য বলেই গণ্য হ'ত। এদেশের যত কাব্য নাটকের মূলে আছে গল্প।

সকলেই জানেন যে, ভারতচন্দ্র প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় কবি ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনে ভারতচন্দ্রের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। যে বাক্‌বৈদগ্ধ বা সরস রচনাগুলী আমরা প্রমথ চৌধুরীর কাব্যের সাহিত্যের প্রতি ছত্রে দেখিতে পাই তাহার মূলেও আছে ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিবাদী মনের পরিহাসরসিকতার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আকর্ষণ। তাঁহার একাধিক আলোচনায় ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ বর্তমান এবং সর্বত্রই ঐ কবির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সমাদর অভিব্যক্ত; ১৩৩৪ সালে শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তেমন অকপট অথচ আবেগহীন বাণী এযাবৎ আর কাহারও মুখ হইতে উচ্চারিত হয় নাই বা লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই। আমরা সংক্ষেপে সেই ভাষণের মূল কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে।...ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এই দুই বিষয়েই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এই খানেই। যে রস তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ রস সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদি রস।...ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদি রস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক; জীবন নয়, মন। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি। আশা করি যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর এ হেন অদ্ভুত ধারণা এদেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না।"

ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা যে অশ্লীলতার অভিযোগ করিয়া থাকেন তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন: প্রথম কারণ ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে অপরের আছে শুধু Nature। তাঁর ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারও চোখকান এড়িয়ে যায় না।

ভারতচন্দ্রের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালও প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় কবি ছিলেন। উভয়ের মধ্যে এমন একটি অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাহাকে কৃষ্ণনাগরিক সম্প্রীতি আখ্যা দিলে ভুল বলা হইবে না। প্রমথ চৌধুরী তাঁহার একটি সনেট কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে বলিয়াছেন:

"যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে মিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিসভায় প্রমথ চৌধুরী যে ভাষণ দেন তাহাতেও এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার গান সম্বন্ধে বলিয়াছেন: দ্বিজেন্দ্রলালের গানে যে বাঙালী জাতির নিকট এতটা আদর লাভ করেছে তার প্রধান কারণ এ কবির আর্ট সঙ্গীতপ্রাণ ও সঙ্গীতকার। দ্বিজেন্দ্রলাল আগে কবিতা রচনা ক'রে পরে তাতে সুর বসাতেন না, আগে তাঁর মনে একটি সুর আসত, তার পরে কথা সেই সুরকে অনুসরণ করত।"

একাধারে কবি ও নাট্যকার হিসাবে খ্যাত হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ কবি হিসাবে অথবা সঙ্গীত রচয়িতা বা সুরস্রষ্টা শিল্পী হিসাবে অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহার হাসির গান বাঙালী জাতির হাস্যরসহীনতার প্রবাদগত অপবাদ দূর করিয়াছে। তাঁহার

পাশে বিদ্রূপ প্রবন্ধ লাভ করিলেও দেশাত্মবোধে বা মহত্ত্বায় অভাব ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরবর্তী কালে কিনিক্স লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রমথ চৌধুরী তাঁহার হাসির গান সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ আলোচনা পাঠ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন: "দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জাতীয় চৈতন্য এত মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের চৈতন্য দূর করতে হয়, তাহলে তার জন্যে আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল হতে হবে। 'আবার তোরা মানুষ হ' দ্বিজেন্দ্রলালের দেশকীর্তির চরম বাণী।"

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য এক সময় কাব্যরসিক সমাজে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য অশ্লীলতাদোষ এমন অভিযোগও প্রুত হইয়াছিল। এই অভিযোগকারীদের পুরোধা ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি সাহিত্য পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হন যে রবীন্দ্রনাথের ঐ কাব্য দুর্নীতিদুষ্ট। পরে অবশ্য অনেক বাদানুবাদ চলিয়া পরস্পরবিরোধী আলোচনার অবসান ঘটে। ওই 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজ সমালোচক হ্যাভলক্ এলিস সাহেব বলেন: The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude"। এই উক্তির প্রতিবাদে এবং তাঁহার আলোচনার দোষ গুণের বিচারে প্রমথ চৌধুরী 'চিত্রাঙ্গদা' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে টমসন সাহেব কৃত রবীন্দ্র কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনামূলক পুস্তকটি প্রকাশিত হইলে উহার লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের (লণ্ডন) 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত এই: "এ গ্রন্থে অনেক facts আছে। গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের বাপ ঠাকুরদার পরিচয় দিয়েছেন, কবির বাল্য জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর কাব্যের মর্ম দিয়েছেন —উপরন্তু তাঁর কাব্যের প্রগল্‌ভ সমালোচনা করেছেন।"

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব ধারণা এই প্রকার: "রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই। আর এর ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সাবলীল। একাব্যের ধ্বনি এক মুহূর্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিংবা ছাড়িয়ে ওঠেনি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতাগুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমার সম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনুপ্রাস ও উপমা উভয়ই ও-কাব্যের অন্তরঙ্গ। একাব্যে এমন একটি অনুপ্রাস কিংবা উপমা নেই যা এ কাব্য-অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়।"

ভারতচন্দ্রের ন্যায় আর একজন কবির সহিত প্রমথ চৌধুরীর ভাবজীবনের সম্পর্ক ছিল। তিনি পারসিক কবি ওমরখৈয়াম। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে প্রমথ চৌধুরী তাঁহার অনূদিত ওমরখৈয়াম কাব্যের একটি ভূমিকা রচনা করেন। ঐ ভূমিকায় ওমরখৈয়ামের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রতিফলিত হইয়াছে। কবিগুরু খৈয়াম একজন মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানী মন এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টি অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ চর্চার অবসরে কতকগুলি চতুষ্পদী রচনা করেন যাহা কাব্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এই কবির প্রতিভা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন: "এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবতঃ এক ভর্তৃহরি ছাড়া আর কখনও কেউ হয় নি। ভর্তৃহরির সঙ্গে ওমরের আরও এক বিষয়ে মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।...ওমরের মতে, যে প্রশ্ন মানুষ চিরদিন করে আসছে বিশ্ব কোনদিনই তার উত্তর দেয় না, কেননা দিতে পারে না। তাঁর চোখে এই সত্য ধরা পড়েছিল যে এ বিশ্বের অন্তরে

হৃদয় নেই, মন নেই, এ জগৎ অন্ধ নিয়তির অধীন সুতরাং তার ভিতর বাহির দুইই সমান অর্থহীন, সমান মিছা।...ওমরের কবিতায় রস ফুলের আসব, সে রস পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেশা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনা চিন্তা আপনা হতে ঝরে পড়ে।"

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রসবিচার শক্তির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইল। পূর্বোক্ত আলোচনাগুলি ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক প্রবন্ধ আছে, বর্তমান আলোচনার স্বল্প পরিসরে যেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ সমালোচক প্রমথ চৌধুরী ভাষা ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়াই গুরুদায়িত্ব ত্যাগ করেন নাই, তিনি একাধিক পত্রালাপে, অভিভাষণে, পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁহার মূল্যবান চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকে সমসাময়িক রসিকদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন। ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত এই তিন ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অধিকার ছিল। ফরাসী সাহিত্যের বিশেষতঃ ফরাসী গদ্যের যে স্বচ্ছতা, ভাবৈশ্বর্য, সার্বজনীনতা বিশ্বের সুধী সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা তিনি আমাদের সাহিত্যে দান করিয়াছেন। তাঁহার 'ফরাসী সাহিত্য' ও 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয়' নামক আলোচনা দুইটি পড়িলে এ সাহিত্যের গুণাবলী সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য লাভ করা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—'অলঙ্কারের সূত্রপাত' এবং 'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত।' বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এমন একজন দ্রষ্টা যিনি আলঙ্কারিক দণ্ডীর ন্যায় বৈদর্ভীরীতির সমর্থক। অর্থাৎ দণ্ডীর ন্যায় অর্থ-ব্যক্তি (Clarity), সমতা (Unity), কান্তি (Restraint) মাধুর্য (Beauty) তাঁহারও সাহিত্য সাধনার আদর্শ ছিল। আজকালকার প্রগতিশীল কবিগণ ছন্দকে বর্জন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় ফলদ্রষ্টা সাহিত্যিকও এমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন নাই। পদ্যের' নামক প্রবন্ধে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন: "ছন্দের বাঁধাবাঁধি নিয়মকে আমি কবিতা রচনার শত্রু নয়—মিত্র হিসেবেই গণ্য করি। পদ্যের বাংলাকাব্যের শুধু বাঁধা সড়ক নয়—একেবারে বড় রাস্তা, সাধু ভাষায় যাকে বলে রাজপথ।

...সভ্যতার আদিযুগে এই শ্রেণীর পদ্যই ছিল মানুষের সকল ভাব প্রকাশের সর্বপ্রধান উপায়। এরি সাহায্যে মানুষকে গল্প বলতে হ'ত, জ্ঞান বিতরণ করতে হ'ত, রাগ বিরাগ প্রকাশ করতে হ'ত।"

সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর এই পরিচয় শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। এত স্বল্প কথায় তিনি প্রমথ চৌধুরীকে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন যে উহা পড়িবামাত্র হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়া পারে না: "আমি অনেক সময় খুঁজি, সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী।...তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সেটা হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধি প্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবাদ্রতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাই অনেকবার ভেবেছি, তিনি যদি বঙ্গ সাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত।"

———

আভার ছেলে

সবীরণ দাশগুপ্ত

একটুকাল ঘরে ছিলেন না অনুপমা, অমনি যা ভাবা!

তিনি বাইরে আছেন এই মস্ত সুযোগে বুঝে ভাড়াটেদের ছেলেমেয়েরা তার ঘরে ঢুকে পড়ে তাক থেকে ঠাকুর দেবতার পট, কাশীতে কেনা পেতলের লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি সব কিছু মাটিতে নামিয়ে এনে পুজো-পুজো খেলতে লেগেছে।

সাত থেকে ন'বছরের একটি ছেলে জলের লালা গলায় পরে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে দু'চোখ শক্ত করে বুজিয়ে বসে পুরুত সেজেছে। তার সামনে কোশা-কুশিতে জল, ফুল তোলা সাজিতে এক সাজি জবা-অপরাজিতা ফুল। দুর্বোর আঁটি এমন কি এক মুঠো আতপ চাল পর্যন্ত সে বিচিত্র খেলার উপচার থেকে বাদ পড়েনি। পূজা অন্তে পুরুত ঠাকুর প্রথানুযায়ী সবাইকে আশীর্বাদী ফুল বিতরণ করছেন, এমন সময় অনুপমা ঘরে ঢুকলেন।

ঠিক বাঘ দেখলে হরিণকুলের যে রকম অবস্থা হয়, অনুপমার আকস্মিক আবির্ভাবে পুরুতঠাকুর সমেত সমবেত পুণ্যাকাংক্ষী দলটির ভিতরে তেমন ধারা একটা ত্রাস তার জেগে উঠল।

একে-দুয়ে যে সটকান দেবে তারও ছাই ভো নেই! অনুপমা রাগতঃ মুখে সমুখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন একেবারে দোর গোড়াটি জুড়ে। এ অবস্থায় অনুপমার রোষ এড়িয়ে ঘর থেকে নিরপরাধ একটা মাছি পর্যন্ত বাইরে যেতে পারে কি না সন্দেহ।

খেলার আনন্দ সোজা ব্রহ্মতালুতে উঠে গিয়েছে। ভয়ে ভয়ে সিকিখানা হয়ে আতুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

অনুপমা ততক্ষণে রাগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলছেন। রোষ মুখ লাল হয়ে উঠেছে চাপা আক্রোশে। না না, তার ক্ষণিক মাত্রের অবর্তমানে প্রতিদিন এই একই অন্যায় অবিচার ঘটবে তার ওপর এ কখনোই আর সহ্য করা যায় না। আচার-বিচার জলাঞ্জলি দিয়ে এসব অত্যাচার তিনি ভাল মানুষের মত অনেকদিন সয়েছেন, আজ এসব ঘটনা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যারপর একে নৃসংশ অমানুষিকতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

সঙ্গে সঙ্গে অনুপমার কেমন মনে হল, এ সমস্তই ভাড়াটেদের সজ্ঞান চক্রান্ত। এ জগতে ভাল মানুষের পিছে সবাই কাঠি দেয়। তাকেও ভালমানুষ পেয়ে সবাই জোট পাকিয়ে নানা কিকিরে লাঞ্ছিত, অপমানিত করে নিচ্ছে।

তা যদি হয় তো আজ তিনিও কাউকে ছেড়ে কথা কইবেন না। চিন্তাধারা অনুপমার সবরকম দুর্বলতা ছেড়ে পলকের মধ্যে কঠোর সংকল্পের পথ ধরল।

খেলুড়ে বাচ্চাদের তিনি ঘরে আটকে রাখলেন। একটা অবাট্য প্রমাণ রইল। তারপর কঠোর মুখ করে দ্রুতপায়ে বাইরে এসে ডাকলেন, 'অ ছোটো বৌমা—অ অখিলের মা, বাছা, একবার শুনে যাও তো এদিকে।'

যাকে উদ্দেশ করে ডাকা, ভাড়াটেদের সেই ছোটো বউ পৌরী রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিল। অনুপমার গলার স্বরে উষ্মার আভাষ পেয়ে বুঝতে বাকী রইল না, নিশ্চই বাচ্চারা কেউ গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে বসেছে একটা। না, এদের দৌরাত্ম্যে দুদণ্ড যদি নিশ্চিন্তে ঘরে তিষ্ঠানোর জো থেকে থাকত!

...এক ছেলে মেয়েরা ছাড়া ভাড়াটেদের আর সকলেই অনুপমাকে একটু দুর্বোধ্যতাজনিত ভয়ের চোখে দেখে থাকে। তার কারণ, অনুপমা দিনরাত্রি

ধুপধুনো আমোদিত, ছুঁচিবাইয়ের কাঁটাতারে ঘেরা এমন এক অসাধারণ রহস্যলোকে থাকেন যার সঙ্গে সাধারণ একটি হাসি-কান্না, হৈ-হুল্লোড়, ধুলো-কাদা আর নানা রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি ভরা সংসারের কোন সম্বন্ধই নেই।

সে অমিলটুকু বড়রা বুঝেছে, বোঝে নি ছোটরা। তাই ছোটরা বড়দের শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও এ সব ওর সম্ভ্রমের ব্যতিক্রম হয়ে আছে।...

গৌরী নতমুখী হয়ে দাঁড়াল এসে পাশে।

অনুপমা চেঁচিয়ে বললেন, "সবাই মিলে তোমরা কি পেয়েছো বলতো? আমি একটা বিধবা মানুষ, সন্ধ্যা-আহ্নিক নিয়ে থাকি—তোমাদের তাতে এত আক্রোশটা কিসের? সব সময় এরকম ছেলে পুলে লেলিয়ে দিয়ে আমায় অপদস্থ করে কি সুখটা পাও তোমরা শুনি?"

গৌরী চমকে উঠে বললে, "আমরা আপনার পিছে ছেলেপুলে লেলিয়ে দি'?"

অনুপমা ভ্রূভংগী করে বললেন, "দাও-ই তো। মুখে বলনা আবারে ইঙ্গিতে বল। এতো আজ একদিনের নয়। কই, কোনদিন ছুটো রাগ-রাগ কথা বলেছো তোমরা কাউকে? লেলিয়ে দাওনি তো কি?"

আর কিছু এরপর বলতে পারলো না গৌরী। সহজ, সরল, নির্বিরোধ মুখটা তার লজ্জায়, অপমানে লাল হ'য়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ছেলে মেয়েদের চড়-চাপড় মেরে, কান টেনে, চুল টেনে উঠিয়ে নিয়ে এল।

সবাই কেঁদে উঠল। কান্না পেলো গৌরীরও। এত সহৃদয় ভাল মানুষ হয়ে এমন নীচ মনের পরিচয় দেবেন অনুপমা একথা গৌরীর মনে স্বপ্নেও কোন দিন ঠাঁই পায় নি। এত অপমানিতও বোধ হয় গৌরী জীবনে আজ প্রথম হ'ল।

ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঘরে যাচ্ছিল গৌরী, অনুপমা পেছন থেকে আবার বললেন, "এ বাড়ীতে আর তোমাদের থাকা চলবে না বৌমা, তোমার দেওর এলে তাকে বোলো একথা।"

গৌরীর দেওর সোমনাথ বিকেলে বাড়ী ফিরলেন আপিস থেকে। শুনলেন সব কথা। ঠিক হ'ল, বাড়ী ছেড়েই দেওয়া হবে। অনুপমা নিজে যখন ভাড়াটে রাখতে আপত্তি জানিয়েছেন তখন আর তার ওপর কোন কথাই থাকতে পারে না।

পর দিন গিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর বাড়ী ঠিক করে এলেন। ভাড়া দু' এক মাসের যা পাওনা ছিল অনুপমার—মিটিয়ে দিয়ে বাড়ী খালি করে পরদিন সবাই নতুন বাসায় চলে গেল গৌরীরা।

অনুপমা বাঁচলেন হাঁপ ছেড়ে। কিন্তু দু'দিন যেতেই আর ভাল লাগে না। এত বড় খালি বাড়ীটাতে একা একটা মানুষ থাকতেই কেমন ভয় ভয় করে। এমন একটা শ্মশান ভূমির মত অস্বস্তিকর পরিবেশে প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় কে যেন দু' হাতের তীক্ষ্ণ নখর তুলে ছুটে আসছে তার দিকে। সমস্তটা বাড়ী এত নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে যে, পায়ের শব্দ পর্যন্ত কড়িকাঠে প্রতিধ্বনি তোলে। জোরে একটু নিঃশ্বাস ফেললে তার শব্দটুকু দ্বিগুণ ভারী হয়ে ফিরে বুকে এসে বাজে।

অনুপমা অন্তর্দাহে মনে-প্রাণে কুরে কুরে মরতে লাগলেন। নিরুপায় হয়ে আবার ভাড়াটে আনলেন অনুপমা বাড়ীতে। স্বামী স্ত্রী আর তিন বছরের একটি ছেলে নিয়ে ভাড়াটেদের নি-জঞ্জালে সংসারটি অনুপমার বড় পছন্দ হ'ল।

নতুন বৌটির নাম আভা। স্বামী আপিসে গেলে মাঝে মাঝে দুপুর বেলা ছেলেকে নিয়ে অনুপমার কাছে এসে বসে। ছেলেকে বসিয়ে রেখে কুশি বোনে, আর একমনে উলের জাম্পারের ঘর ফেরায়।

বৌটি একেবারে কম কথা বলে। এত কম যে, এসে অবধি পনর দিনের মধ্যে তার পাশে বসে দুপুর বেলা করবার কটা কথা বলেছে, অনুপমা ইচ্ছা করলে তা কর গুণে বলে দিতে পারেন।

ব্যাপারটা বড় অসহ্য ঠেকলো অনুপমার কাছে। মানুষজন বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব যদি প্রাণে

অনুভব না করা গেল. গৌরীরা যাবার পর বাড়ী তাহলে আর ভাড়া দিয়েছিলেন কিসের আশায় ? জনপ্রাণী যে এ বাড়ীতে কেউ বাস করে, এ যেন বোঝাই যায়। অথচ গৌরীরা থাকতে কি যে জম-জমাট ছিল বাড়ীটা।

নতুন বৌ'র তিন বছরের ছেলেটাও শান্ত অতিমাত্রায়। মার পাশে হাঁটু চেপে বসে ছোট ছোট নিস্তেজ নির্জীব চোখে সারাক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকবে। হাসবে না খেলবে না কিছুই করবে না। জাত গোত্র ছাড়া ভিন্ন উপাদানে গড়া একটা যেন মাটির পুতুল।

অনুপমা সর্বক্ষণ প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ করে রাখেন, মানুষের একটু কলকণ্ঠ শুনবেন আশায়, কিন্তু মুখ আর কেউ খোলে না।

অনুপমা অধৈর্য হয়ে একদিন আভাকে বললেন, "তুমি তো এমন কিছু বুড়িয়ে যাওনি বৌমা, মাঝে মাঝে একটু গান টান করলেও তো পার। তাতে বাড়ীর গুমোট ভাবটাও কাটে, অমনি জিনিষটাও চর্চায় থাকে।

আভা লাজুক, হেসে বললে, "কি যে বলেন মা'রেমা।'

অনুপমা বললেন, "এতে আর বলবার কি আছে। গান বাজনার বয়েস তোমার তো কাটে নি, কেমন করে যে এখনি ছাবা-বোবা হয়ে ঘরে বসে দিন কাটাও বুঝতে পারি না। ছেলেটাকেও করেছ সে আস্কাজে কুনো। এ বয়সে কোথায় বাড়ীর মানুষকে ছুরন্তপনা করে মারবে —সে জায়গায় সমস্ত দিনেও গলায় একটা সাড়া মেলে না।"

আভা কিছু বলতে পারলো না সাহস করে। মুখখানা লজ্জায় শতগুণ ভারী হয়ে নীচুতে ঝুলে পড়ল।

কারুর কোন হাত ছিল বা নিজের খেয়ালের বশেই কিনা জানা নেই হঠাৎ একদিন দেখা গেল আভার ছেলে অতি মাত্রায় চটপটে হয়ে উঠেছে। তার নিস্তেজ আঁখি-তারায় অহরহ দুষ্টুমির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। অস্থির-পা দু'খানি কেবলই ছুটে ছুটে বেড়ায় সারা বাড়ীময়। ঘরের জিনিষ ভেঙে চুরে তছনছ করে ফেলে। ছেলেকে বাগ মানাতে না পেরে আভা ভয়ানক বিব্রত হয়ে ওঠে। দিনরাত সর্বক্ষণ তাকে ছেলের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়াতে হয়।

"ও খোকা শোন্ শোন্...এই দেখ্ দে...এই রাখলুম মাটিতে, আমি কিন্তু চোখ বুজেছি, চোর এসে কাঁকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু সেবুটা···।"

অনেকক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও চোর আসেনা। সে ততক্ষণে গিয়ে উঠোনের ধুলো মাটিতে লেপ্‌টে বসে পড়ে দু' হাঁটুর সঙ্গে আগডুম বাগডুম খেলা সুরু করে দিয়েছে।

আভার ভয় অনুপমাকে। এ' বাড়ীতে আসার প্রথম দিন থেকেই সে অনুপমা সম্বন্ধে একটা সসম্ভ্রম ভয় পোষণ করে আসছে মনের মধ্যে। যার জন্য সে অনুপমার কাছ থেকে বরাবর একটা সংকোচ পূর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে! কোনদিনই সাধারণ মানুষ ভেবে তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বার্তা বলতে সাহস পায় নি। এমন কি উঁচু কণ্ঠস্বরে অনুপমার পূজা অর্চনার বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে সর্বক্ষণ তার কাছে প্রায় বোবা সেজে থেকেছে।

আভার প্রধান ভয় ছেলেকে নিয়ে। যে দুরন্ত হয়ে উঠেছে, কখন ধুলোমাটি মেখে অনুপমার ঘরে ঢুকে পড়ে সবকিছু ঘরের অপবিত্র করে দেয় সেই দুশ্চিন্তায় আভার চোখে ঘুম নেই।

ছেলে কাছে এলেই সেই এক কথা বার বার ভাবে মনে করিয়ে দেয় আভা।

"ও খোকা মা'রেমার ঘরে নোংরা পোষাক নিয়ে কখনো ঢুকিস নি কিন্তু।"

—"ঢুকলে কি হবে ?"

—"তাহলে খুব পাপ হবে, মা ধরে যাবে। কখনো যাবিনে কেমন তো ?"

—"আচ্ছা।"

দুপুরে একদিন ছেলেকে পাশে ঘুম পাড়িয়ে আভা ঘুমিয়েছে। হঠাৎ স্বপ্নে ভয় পেয়ে আতংকিত প্রাণে ধড়মড় করে জেগে উঠ্‌লো। কিছুতেই

ঘুমুচ্ছিলনা বলে আঁচলের চাবি হাতে দিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়েছিল। জেগে দেখে, পাশে কেবল চাবির গোছাটাই পড়ে রয়েছে, ছেলে নেই।

ঘুমের ঘোরে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেছে ভেবে তাড়াতাড়ি নেবে এলো। না সেখানেও নেই। কিন্তু হঠাৎ কি মনে ভেবে আভা একটু স্বস্তি পেলো। উঃ, কি দুষ্টুই যে হয়েছে বাঁদরটা। দুপুরে পর্যন্ত একটু ঘুমুবেনা। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কেবলি খেলা, কেবলি খেলা। খেলা তোমার ভাঙচি দাঁড়াও। আজ উনি আসুন আপিস থেকে—সব কথা বলচি খুলে—ইস্কুলে না পাঠালে আর তুমি কিছুতেই জব্দ হবেনা বুঝেছি!

আভা পা টিপে টিপে বারান্দায় এলো, যেন সাড়া না পায়, পেলেই একদিকে ছুট দেবে তখন আর ধরা যাবে না। দুষ্টুমিতে কি আর কম হয়েছে এরি মধ্যে।

বারান্দায়ও কেউ নেই দেখে ভয়ে আভার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। আতংকে আড়ষ্ট হয়ে চাপা গলায় একটু জোর দিয়ে ডাকল "খোকা ও খোকা?"

কই সাড়া তো দিল না কেউ! ধারে কাছে থাকলে নিশ্চই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্তো। ছেলের প্রকৃতি তো আভার অজানা নয়।

আভার শ্বাস নিতে কষ্ট হ'ল। মনে হ'ল পৃথিবীর কোথাও একটু বাতাস নেই। সমস্ত বাতাস বুঝি কোন এক যাদুমন্ত্রে পাথর হয়ে গেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে অনুপমার ঘর থেকে কচি শিশু-কণ্ঠের মিষ্টি হাসির শব্দ আভাকে সম্মোহিত করে দিল।

জলের টব, ঝুপুরের খাওয়া ভাতো বাসন পত্র সব কিছু অগ্রাহ্য করে আভা ছুটলো।

অনুপমার ঘরের খোলা দরজায় এসে আরেকবার সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা অসম্ভব অভাবিত দৃশ্য দেখে।

ছেলে তার সমস্ত কিছু তছনছ করে দিচ্ছে ঘরের। অনুপমা নির্বাক বসে দেখছেন সব। অল্প অল্প হাসছেন উৎসাহিত করার ভংগীতে।

আভা বাধা দেবার জন্য আর্তনাদ করে উঠে ভেতরে ঢুকলো ছুটে গিয়ে।

অনুপমা আভার হাত ধরে ফেললেন।

বললেন, "থাক্ না বৌমা, যা করছে করুক।"

আভা অনুপমার হাসি দেখে অবাক না হয়ে পারল না। বললে, 'থাকবে কি মাইমা, পয়সার কেনা জিনিসগুলো ভেঙে চুরে নষ্ট করে ফেলছে আপনি বলছেন থাকবে?" পরে ছেলের দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে বললে, "এই বাঁদর—উঠে আয়।"

অনুপমা তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিলেন, আবার এক ধরণের আশ্চর্য রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে হেসে বললেন, "থাক্ না বৌমা, যা করছে করুক।"

আভা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল অনুপমার মুখের দিকে।

আর খোকার কলোচ্ছ্বাস মুখর দেহখানি বুকে চেপে ধরে তার মৃদু উত্তাপটুকু অনুপমা ব্যাকুল আগ্রহে তার সমস্ত ক্ষুধিত সত্তায় মেখে মেখে নিতে লাগলেন।

বিজ্ঞান জগৎ

গ. চ. ভ.

অগ্নিকুণ্ডে হাটিবার রহস্য

রামায়ণের অগ্নি-পরীক্ষার ব্যাপারটা বিস্ময় উদ্রেক করিলেও বিশ্বাস উদ্রেক করে না। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতীয় হঠযোগী এবং ঐন্দ্রজালিকেরা ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিয়া যাইবার যে বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তো আর অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিছু কাল পূর্বেও ইউরোপীয় দেশসমূহে ভারতীয় হঠযোগী শ্রীযুক্ত প্রাণানিক এই বিষয়ে যে বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। অথচ খালি পায়ে একটা লোকের পক্ষে ৪০।৫০ ফুট লম্বা গনগনে অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাটিয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব তাহা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

প্রায় তের বৎসর আগে জোহান্সবার্গ সহরে অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিয়া যাইবার প্রতিযোগিতামূলক কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতিযোগিতা হইয়াছিল দুই জনের মধ্যে। একজন ছিলেন নাইডু নামে এক হিন্দু পুরোহিত, অপর জন এক দর্জিমজুরের পুত্র নাম—ডিক্টর র‍্যাবি। প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত দিন সকাল বেলায় ২০ ফুট লম্বা, ২০ ফুট চওড়া এবং এক ফুট গভীর একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে ২৭।২৮ মণ কাঠ বিছাইয়া দেওয়া হইল। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে প্রচণ্ড শিখা বিস্তার করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পর অনন্ত অঙ্গারে পরিণত হইলে প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

র‍্যাবি ছিলেন একজন পেশাদার ঐন্দ্রজালিক। তিনি পর পর ছয় বার খালি পায়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাটিয়া যান। তিনি যে সেই গনগনে আগুনের উপর দিয়া খুব সন্তর্পণে হাটিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে, হাটিবার সময় অনন্ত কয়লাগুলি পা দিয়া ইতস্ততঃ ছিটকাইয়া ফেলিতেছিলেন। শেষবারে তিনি একটি স্ত্রীলোককে পিঠে করিয়া অগ্নিকুণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে হাটিয়া যান। ছয়বার হাটিবার পর পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—তাঁহার পায়ে ফোস্কা বা পোড়ার কোন চিহ্নই নাই।

এইবার হিন্দু হঠযোগীর পালা। তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া তিনবার হাটিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কথা সত্য যে, অনেক সময়ে সংবাদপত্রে এই ধরণের ঘটনার অনেক অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হয়, তথাপি মোটামুটি ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আগুনের উপর হাটিবার ব্যাপার সম্বন্ধে বহুকাল ধরিয়া লোকের মনে ভীতিউৎপাদক নানারকমের কুসংস্কার জড়িত রহিয়াছে। ইহা কি একটা ঐন্দ্রজালিক কৌশল? যাহারা আগুনের উপর দিয়া হাটিয়া যায় তাহারা কি জড় মস্তাবস্থায় থাকে? আগুনে তাহাদের পা পোড়ে না কেন? সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় হইল—অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিবার এই সুপ্রাচীন রীতির প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা কোন আলোকপাত করিতে পারিয়াছেন কি?

ঠিক কোন সময়ে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোথায় সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই; তবে ইহা বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, প্রায় ৪০০০ বৎসরেরও আগে ভারতবর্ষেই ইহার প্রচলন শুরু হয়। অনিষ্টকারী অপদেবতার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা, অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন অথবা পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের আচরিত ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ—ইহাদের মধ্যে যে কোন কারণেই হউক, আজও অনেকস্থলে এই অদ্ভুত প্রথার প্রচলন দেখা যায়।

সাধারণতঃ আগুনের উপর হাটিবার দুই রকমের ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। এক রকমের হইল উত্তপ্ত পাথরের উপর এবং আর এক রকম হইল জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিয়া যাওয়া। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হাওয়াই, ফিজি, কুক, সোসাইটি এবং পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে উত্তপ্ত পাথরের উপর হাটিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিবার প্রথা প্রধানতঃ ইহার উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষেই প্রচলিত। অবশ্য ভারত হইতে দূরবর্তী স্থান, যেমন—ত্রিনিদাদ, নেটাল, জাপান প্রভৃতি স্থানেও ইহার প্রচলন দেখা যায়।

দেশভেদে এবং জাতিভেদে উত্তপ্ত পাথর বা অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিবার রীতির যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা সর্বত্রই প্রায় এক রকমের। অর্থাৎ যাহারা এই ব্যাপারে অভ্যস্ত তাহারা প্রত্যেকেই দৃঢ়বিশ্বাসে এবং অকুতোভয়ে খালি পায়ে, খালি গায়ে পুরু এক স্তর উত্তপ্ত পাথর বা জলন্ত কয়লার উপর দিয়া হাটিয়া যায়। হাটিবার পথের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট হইতে ৬০ ফুট পর্যন্ত হইতে পারে। উত্তপ্ত প্রস্তরের পথের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে; কিন্তু জলন্ত অঙ্গারে আস্তৃত পথের দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

অগ্নিকুণ্ডে হাটিবার ব্যাপার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের ধারণা—ইহা একটা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নহে। জোসেফ ডুনিঙ্গার বলিয়াছেন, যদি গর্তের মধ্যে লাইন বরাবর কাঠগুলি প্রথমে পুড়িয়া যায় এবং ধারের কাঠগুলি শেষে পোড়ে তবে গর্তের ধারের দিকের উত্তাপ যখন খুব তীব্র হইয়া উঠিবে তখন মধ্য-লাইনের উত্তাপ খুব কম থাকিবে। সুতরাং মধ্য-লাইন বরাবর তখন হাটিয়া পার হওয়া অসম্ভব নহে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে পায়ের তলায় কোন তাপ-নিরোধক রাসায়নিক পদার্থ মাখাইয়া এই রকমের অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করা সম্ভব। কোন কোন বৈজ্ঞানিক আবার হিপ্নটিজম্ হইতে অনুভূতি নিরোধক ঔষধের বিষয় চিন্তা করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি ভারতবর্ষ, জাপান, ত্রিনিদাদ এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অগ্নিকুণ্ডে হাটিবার ব্যাপারটার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য তাপ-পরিমাপক যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সাহায্যে অনেক কিছু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশের বিবরণী হইতে দেখা যায়—তাঁহারা এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

যে সকল বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে সর্বপ্রথম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন তরল পদার্থের বর্তুলাকৃতি ধারণের নিয়মাবলীর সাহায্যে এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তপ্ত কোন ধাতব পাত্রের উপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িলে তাহা গোলাকৃতি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাই তরল পদার্থের বর্তুলাকৃতি ধারণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই বর্তুলাকার জলের ফোঁটাগুলি অনবরত গতিশীল থাকে এবং তলদেশ হইতে বাষ্প উদ্গমের ফলে সোজাসুজি ধাতব পাত্রের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। জিহ্বায় আঙুল ঠেকাইয়া সেই আঙুল দিয়া গরম ইস্ত্রির উত্তাপ পরীক্ষা করিলে এই কারণেই আঙুলের কোন অনিষ্ট হয় না।

আবার এই কথাও বলা হইয়া থাকে যে, দ্রুটস্থ সীসার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মদ্যশূন্য হাত ডুবাইয়া দিলে হাতের কোনই অনিষ্ট হয় না। ইহার এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, চর্মের জলীয় বাষ্পের জন্য মুহূর্ত সময়ের মধ্যে হাত পুড়িবার অবসর থাকে না। অবশ্য অনেক ঐন্দ্রজালিক এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু গলিত সীসার মধ্যে তাঁহারা সত্য সত্যই হাত ডুবান কি না, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব।

যদি ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইত তবে অগ্নিকুণ্ডে হাটিবার রহস্যের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইত। কিন্তু লণ্ডন ইউনিভার্সিটির সাইকিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এই বিষয়ে ইংলণ্ডে যে পরীক্ষা চালান হয় তাহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা তরল

পদার্থের বহুলীকৃতি ধারণের তথ্যাদির ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া সমর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ পান নাই। এই কাউন্সিল আবদুল হোসেন নামে এক ভারতীয় ফকিরের অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিবার ক্ষমতা পরীক্ষা করেন। ফকিরের অভিপ্রায় অনুযায়ী চার ফুট চওড়া, সাড়ে বার ফুট লম্বা এবং ১৫ ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত কাটা হয়। সেই গর্তের মধ্যে এক টন হাল্কা কাঠ, ৭ টন ওক কাঠে এবং এক গাড়ী কাঠ কয়লা সাজাইয়া অগ্নিসংযোগ করা হয়। সাত ঘণ্টা ধরিয়া আগুন জ্বলিবার পর চতুর্দিকে প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াইয়া কাঠটি জলন্ত কয়লার এক ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়।

৬১ ফুট দূর হইতেও এই অগ্নিকুণ্ডের প্রচণ্ড তাপ অনুভূত হইতেছিল। সেখানে যেসব পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যন্ত্রসহযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অগ্নিকুণ্ডের উপরের উত্তাপ ১০৬৭° ফারেনহাইট আর ভিতরের উত্তাপ ১২৯২° ফারেনহাইট।

হোসেন কোরানের বয়েৎ আওড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে পদার্পণ করেন এবং দ্রুত পদক্ষেপে অগ্নিকুণ্ডের অপর প্রান্তে উপস্থিত হন। একজন বৈজ্ঞানিক ষ্টপ-ওয়াচ ধরিয়াছিলেন। ষ্টপ-ওয়াচে দেখা গেল, সাড়ে বারো ফুট পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার মাত্র ১ মিঃ ৩ সেঃ সময় লাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিবার সময় হোসেনের খালি পা জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে দুই-তিন ইঞ্চি বসিয়া যাওয়া সত্ত্বেও পায়ের তলায় বা উপরে পুড়িয়া যাওয়া বা ফোস্কা হওয়ার চিহ্নমাত্র নাই।

এই ব্যাপারের পর হোসেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, তিনি এই রকম অগ্নিকুণ্ডের যে কোন দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডের উপর চতুর্দিক ঘুরিয়া হাটিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হোসেন সেইভাবে হাটিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমি কেবল সোজা লাইন বরাবরই হাটিতে পারি। তদনুযায়ী আর একদিন ২০ ফুট লম্বা একটা গর্ত করিয়া তাহাতে পূর্বের মত সন্তর্পনে আগুন করা হইল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, তাহার উপরিভাগের উত্তাপ ১০৬৪° ফারেনহাইট। এই সময়ে বেশ জোরে হাওয়া বহিতেছিল, কাজেই উত্তাপ অনেকটা বেশী হইয়াছিল। হোসেন যথারীতি প্রার্থনা উচ্চারণের পর দ্রুত পদক্ষেপে অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া গেলেন। এইবার তাঁহার সময় লাগিয়াছিল ২ মিঃ ৩ সেঃ। কিন্তু এইবার তাঁহার পায়ে পোড়ার চিহ্ন দেখা গেল। তাঁহার ডান পায়ে ৪টা ফোস্কা পড়িয়াছিল এবং বাম পায়েও লাল দাগ দেখা গিয়াছিল। তিনি আর হাটিতে রাজী হইলেন না এবং বলিলেন, বিশ্বাস হারাইয়াছেন বলিয়াই তিনি সাফল্যলাভে কৃতকার্য্য হইলেন না।

একজন বৈজ্ঞানিক তখন জুতা খুলিয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া তিনি জলন্ত অঙ্গারের উপর পদক্ষেপ করিলেন এবং মাত্র ৪টি পদক্ষেপে অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাঁহার পা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল,—সামান্য একটু লাল দাগ পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ফোস্কা পড়ে নাই।

এই ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া আরও দুইজন বৈজ্ঞানিক জুতা খুলিয়া অগ্রসর হইলেন এবং অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাটিয়া গেলেন। তাঁহাদের উভয়ের পা-ই খানিকটা পুড়িয়া গিয়াছিল। পোড়ার জন্য যদিও তেমন কোন যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই তথাপি তাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আগুনের উপর পা ফেলাটা মোটেই আরামদায়ক নহে।

এই ব্যাপার হইতে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিকেরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন?

তাঁহারা এই বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে, অগ্নিকুণ্ডের উপর হাটিবার ব্যাপারটা মোটেই কোন যাদুকরী কৌশল নহে; কারণ কোন রাসায়নিক পদার্থ না মাখাইয়াও খালি পায়ে সাধারণ উপায়ে আগুনের উপর হাটা যায়। কারণ, স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, উত্তপ্ত প্রস্তর বা কাঠ কয়লার তাপ-পরিবহন শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায়, দেহচর্মের সহিত কয়লার আধ সেকেণ্ডের কম সময়ের জন্য সংস্পর্শ ঘটিলে এবং পদক্ষেপ বেশী না হইলে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকিবারই কথা। কাজেই মনে হয়, আগুনের উপর হাটিবার জন্য আত্মিক শক্তি অপেক্ষা দৈহিক কৌশলের উপরই নির্ভর করিতে হয় বেশী। যে যত দ্রুতগতিতে অথচ হাল্কাভাবে উত্তপ্ত কয়লা বা প্রস্তরের উপর পদক্ষেপ করিতে পারিবে, এই ব্যাপারে সেই তত কৃতিত্বের অধিকারী হইবে।

"পদবী", "খেতাব" এর পরিচিতি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

"পদবী" বংশের পরিচায়ক শব্দ। "খেতাব" 'উপাধি'র নামান্তর। শব্দটি—আরবী। অর্থ হইতেছে—'উপাধি।' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" দেখা যায় এরূপ—"মহাবদজ্ঞ দিলা পাতসা খেতাবে।" জাতি, বংশ ও বিদ্যার এবং কর্মের দ্বারায় মর্যাদা যাহা সূচিত হয়, তাহাই 'উপাধি।' বংশ-পরিচয় প্রদান করার রীতি সুপ্রাচীন, শিক্ষাপ্রদ, সমাজের উন্নতিবিধায়ক এবং সুসাহিত্যের অঙ্গীভূত। বেদে বংশ-পরিচয় (যেমন, সামবেদীয় "বংশ-ব্রাহ্মণ", প্রভৃতি আছে—পুরাণে, মহাভারতে ও অভাব নাই। রামায়ণে সীতার বিবাহ-সভায় রাজর্ষি জনক নিজ বংশের ও মহাতপাঃ বশিষ্ঠ সূর্য বংশের পরিচয় সোৎসাহে কীর্তন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি হিন্দু বিবাহে বর ও কন্যা উভয় পক্ষে দুই কূলে তিন পুরুষ এবং পার্বণ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায়ও দুই কূলে তিন পুরুষের যজমানেরও পরিচয় প্রদান করিতে হয়। স্বনাম-ধন্য পিতৃদেব অবিনাশচন্দ্রেরা আইনবিষয়ক বক্তৃতায় ইহার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত আছে—"Ordinarily, at *a parvana sraddha*, offerings are only made to male ancestors (3 on the paternal side and 3 on the maternal), and not to their wives too; পিতৃস্বা ইতি (in the aphorism of Gobhila, cited in the extract of পার্বণশ্রাদ্ধম্) যজমানস্য পিত্রাদিত্রিকমাতামহাদিত্রিকস্য পরম্।" বিবাহ সম্বন্ধের উক্তি এই—"The marriage ceremony acc. to the ritual prescribed by Gobhila, and elaborated and supplemented by Raghunandana in the *Samskaratattva*: তত্রশ্চ সংস্কারে পিত্রাদিত্রয়মাতামহাদি-ত্রয়েভ্যঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা।";

খুব বেশী দিনের কথা নহে, আমাদের দেশে প্রত্যেক হিন্দু গৃহে গৃহস্বামী সায়ংকালে সন্তানদের পূর্বপুরুষের নাম শিক্ষা দেওয়া সায়ংসন্ধ্যার ন্যায় অবশ্য-কর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে করিতেন। বংশ-পরিচয় পাঠে ধৈর্য, জ্ঞান-পিপাসা, নিষ্ঠাসৃষ্টি প্রয়োজন বটে; বলিতে লজ্জা হয় আমাদের উদাসীনতাই আমাদের পক্ষুত্বের কারণ, যদ্দ্বারায় কবি-হৃদয়ে তীব্রভাবে আলোড়িত করিয়া তীব্র-ভাবেই কষাঘাত দেওয়ার হেতু উদ্ভূত হইয়াছে। সত্যই,

---

†"মন্ত্রিরা", পৌষ, ১৩৬০, পৃঃ ৪৪৮, পাদটীকা, পঙ্‌ক্তি ২। "মন্ত্রিরা" পৌষ, ১৩৬১, পৃঃ ৬২৩, ৬২৪, পাদটীকা, পঙ্‌ক্তি ২, পঙ্‌ক্তি ১-২; "Harisal Hitaishi," Vol. LIII, Nos. 10-21 & 25, 1944; Do., Do., Do., Do., No. 50, 1945—kept in the National Library, Belvedere, Calcutta—27; mine literary album, Card Catalogue of European languages: *Author Card* No. 169. F. 6; Card Catalogue of Oriental languages: *Author Cards—Bengali and Sanskrit*: No. 182. Ca. 949. 1; Do., Do., *Reference Cards*: No. 182. Ca. 949. 1; *Card Catalogue entries*: No. 65—kept in Harinath De Collection; my memoirs (a *volume of Indological papers*)—kept in the library of the Asiatic Society, 1, Park Street, Calcutta-16; accessions' list, No. 12 Dec., 1954, ori. (Sans.) Sec., Vanga 278. ka, p. 4; বাংলার ব্রাহ্মণকায়স্থ, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪১, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৫৩-৫৪।

‡ Lecture Notes on Hindu Law, *sub voce*, the Sraddhas; the Eight forms of marriage. পার্বণ-শ্রাদ্ধ is being observed prior to the নবান্ন festival generally in the month of অগ্রহায়ণ or মার্গশীর্ষ month. The নবান্ন is defined thus, "নবোদ্ধকে নবান্নে চ গৃহপ্রজ্ঞাদনে তথা। পিতরঃ পূর্বস্যাহ্নঃ কার্যাস্তু মঘাসু চ॥" Quoted in Raghunandana's অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি, *s. v.*, শ্রাদ্ধকল্প (নবান্নশ্রাদ্ধম্); whereas বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ is being observed in the marriage ceremony, where offerings are made to male ancestors both paternal and maternal sides each being 3, besides পিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী and অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহী of the paternal side. দার্শীমুখ—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-ভোক্তা মাতোপিতৃগণ।

মাইকেল ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসুর কথা প্রণিধান যোগ্য বটে—

"আমরা কারা ?
সভার সমক্ষে বলি
'ছাতারে'র বংশাবলি,
জানিনে পাখার নাম কি গোত্র তারা,
কি ক'রে লাজের কথা—আমরা কারা ?"

সংস্কৃত—সিন্ধু, তাহাই প্রাচীন ফার্সীতে 'হিন্দু' নামে বিকারপ্রাপ্ত হয়। দেশবাচক "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ অতি প্রাচীন কালের। ত্রয়ীর পরিশিষ্টস্বরূপ অথর্ববেদের পরিশিষ্ট, রামায়ণে (রাজর্ষি জনকের দম্ভধ্বংসে "বঙ্গ-রাজের" কথায় মহাভারতে (জরাসন্ধ-বধ পর্বাধ্যায়ে—"বঙ্গ", দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়ে—"বঙ্গরাজ", সভা পর্বের রাজসূয় যজ্ঞসভায়, শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে—কর্ণ "বঙ্গদেশের" অধীশ্বর বলিয়া শিশুপাল কর্তৃক অভিহিত), অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মপুরাণে, গরুড়পুরাণে (১৪৪ অঃ), আগমান্তর্গত শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে (৭ পটলে—"বঙ্গদেশের সীমা"), কূর্মচক্রে (কূর্মাকৃতি দেশ, তন্মধ্যে — বঙ্গ"), ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইদিলপুর পরগণায় রাজা লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেন প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে—"গৌড় বর্দ্ধনভুক্ত্যান্তঃ-পাতি বঙ্গে" See Dr. Rajendra Lal Mitra's, "Indo-Aryans," Vol. II, 1881, p 236). জৈন-ধর্মাবলম্বী হেমচন্দ্রসূরির "অভিধানচিন্তামণি"তে (কোষগ্রন্থের ভূমিকাতে "বঙ্গদেশের সীমা নির্ণয়"), চীন পরিব্রাজক হিউএন্-ৎ সাঙ্ (Hiuen Tsang), ঈ-ৎ সিঙ্ বা-ঈ-চিঙ্ (I-Tsing) এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রকৃতিতে "বঙ্গ" বনগ-অধিকরণ বাচ্যে-অন্ (শব্দের উল্লেখ আছে। আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী"তে আছে—"নাম ই-আসলি বাংলা বঙ্গ।" সমগ্র বঙ্গদেশের নাম "গৌড়বঙ্গ" (অর্থাৎ "গৌড়"—পশ্চিমবঙ্গ ; "বঙ্গ"—পূর্ববঙ্গ) তুর্কী বাদশাহ্‌গণের সময়ে অভিহিত হইত। পরে "গৌড়"কে "বঙ্গদেশ" বুঝাইত। তুর্কী বাদশাহের আমলে "গৌড়" ও "বঙ্গ" সমগ্র দেশকে "বঙ্গালহ্" ("বাঙ্গালাহ্") বলিত। ফার্সী ভাষায় 'বঙ্গা-ল'—বঙ্গালহ বা বঙ্গালা। তাহা হইতে "বাঙ্গালা।" বঙ্গদেশ—"সোনার বাঙ্গাল করে কাঙ্গাল, ইহার বাঙ্গাল যত জনা।"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গলা' বা 'বাঙ্‌লা' লেখাই সমীচীন (ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৪০, পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য)। সেন বংশীয় নৃপতিগণের সময়ে তৎপূর্বে "রাঢ়ীয়", "বারেন্দ্র", ইত্যাদি ও "গৌড়ীয়" নামে অভিহিত হইত।

আনুমানিক ১১৫৯-১২০৪ অথবা মতান্তরে ১১১৯-১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শঙ্করগৌড়েশ্বর বল্লাল সেন এবং পরে ১১০৬ (?) খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেন। বল্লাল সেন "কুলীন" আখ্যায় এক আভিজাত্য সম্প্রদায় গঠন করেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা আবৃত্তি, তপস্যা এবং দান এই সকল গুণের অধিকারীকে তিনি কুলীন" অর্থাৎ প্রশস্তকুলশীল নামে অভিহিত করেন। রাজসম্মানাপেক্ষা কুলগৌরবই প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী গৌরব, তাহাতে সন্দেহ নাই। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে (যখন বৌদ্ধনৃপতি ধর্মপাল কর্তৃক পুররাজধানী "গৌড়বর্দ্ধন" অধিকৃত হয় এবং আদিশূরের পুত্র ভূশূর "রাঢ়ে" পলায়ন করেন, তখন যে সকল ব্রাহ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগ না করিয়া বৌদ্ধপালাধিকারভুক্ত বারেন্দ্রভূমেই (গৌড়দেশেই) থাকেন, তাঁহাদের বংশধরগণ "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ" নামে খ্যাত হন) ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, ঠাকুর, মিশ্র, পাঠক, সিদ্ধান্ত, তলাপাত্র, দেওয়ান, খাঁ, গোস্বামী আচার্য, উপাধ্যায়, ভট্ট, প্রভৃতি, নানারকম সম্মানসূচক উপাধি আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে গৌতম, বশিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, সমাজদার, প্রভৃতি, উপাধি আছে। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দশাশ্বমেধী, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী, ত্রিপাঠী, প্রভৃতি, উপাধি অদ্যাপি বর্তমান। মণ্ডল, খাঁ, সরকারও সম্মানসূচক উপাধি। পাঠক-পাঠিকাবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে কয়েকটি 'পদবী'র অর্থ-বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল :—

ভট্টাচার্য—(ভট্ট (ভূতাততত্ত্বট্)+আচার্য (উদয়নাচার্য))। দর্শনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, পূর্বে সর্বদর্শনের অধ্যাপকের এই 'পদবী' লাভ হইত। বর্তমানে যাজনিকতার পরিচায়ক-রূপে গণ্য। ভূতাততত্ত্বটের মীমাংসা এবং উদয়নাচার্যের "ন্যায়সংগ্রহে" বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রাপ্ত এমন ব্রাহ্মণ।

ভট্ট—(ভট-কর্তৃবাচ্যে-তন), পণ্ডিত, অধ্যাপক দর্শনশাস্ত্রবিৎ ; এখানি বেদ যিনি আয়ত্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এরূপ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিতে চ, সুবিদ্বান্ ব্যক্তি ; possibly Savant—sav'-ong ; Fr. pr.p. of *savoir*, to know, It. *savere*, L. *sapere*, Sp. *saber*, man of great learning, one versed

literature or science. আরবী ভাষার একটি শব্দ আছে তাহা প্রায় তুল্যার্থ, সেটি হইতেছে "হাফিজ্"—অর্থ, যাঁহার সমস্ত কোরাণ (ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ) কণ্ঠস্থ আছে, তিনি ঐ পদবাচ্য হন। স্মৃতি-শাস্ত্রে আছেন যাঁহারা, যেমন, নীলকণ্ঠ ভট্ট, কমলাকর ভট্ট, কুল্লুক ভট্ট, ইত্যাদি; নাট্যকাব্যকার ভবভূতি ভট্ট, প্রভৃতি; শ্রুতিধর সঙ্গীতজ্ঞ যদুনাথ ভট্ট, ইত্যাদি।

চক্রবর্তী—(চক্র—দেশসমূহ যুত্, বর্তমান থাকা + ইন্ (কর্তৃবাচ্যে, শীলার্থে), চক্রে বর্তী—৭মী তৎপুরুষ, কিংবা চক্রে (রাজ্যে স্বামীরূপে) অবস্থান করাই স্বভাব যার, উপপদ সমাস। সম্রাট্, যথা—"ভরতার্জুন-মান্ধাতৃভগীরথযুধিষ্ঠিরাঃ। সগরোনহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্তিনঃ॥" সার্বভৌম। প্রসিদ্ধিবাচক উপাধি। ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। চার বা পাঁচ দর্শনের পণ্ডিতগণের উপাধি।

ঠাকুর—(সংস্কৃত ঠক্কুর), হিন্দী-ঠাকুর। পদবী—যেমন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মণের উপাধি।

মিশ্র—(মিশ্র্—মিশ্রিত করা + অ কর্তৃবাচ্যে). উপাধিবিশেষ, বঙ্গে পূর্বে ষড়্‌দর্শনের মধ্যে যাঁহার দুইটি দর্শনে পূর্ণ অধিকার থাকিত, তিনি এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রাজকতার পরিচারক।

পাঠক—(পঠ্—পড়া + অক কর্তৃবাচ্যে). অধ্যেতা, পাঠকর্তা; ব্রাহ্মণের উপাধিবিঃ।

সিদ্ধান্ত—(সিদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে অন্ত যার বহুব্রীহি সমাস), মীমাংসা। প্রাচীন আর্যশাস্ত্রীয় মীমাংসকগণের উপাধিবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে "সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন", "সিদ্ধান্তবাগীশ", "সিদ্ধান্তরত্ন", "সিদ্ধান্ত-সাগর" উপাধিবিশেষ।

দেওয়ান—(ফার্সী—দীবান্). রাজসভা, মন্ত্রিসভা। রাজ্য-সংক্রান্ত প্রধান কর্মচারী, রাজস্ব-বিভাগীয় মন্ত্রী। দেওয়ান শব্দের সম্মানসূচক উল্লেখ অর্থে—'দেওয়ানজী' কথিত হয়।

খাঁ—(ফার্সী—খান্ শব্দের সংক্ষেপ), মুসলমানদিগের মধ্যে উচ্চ উপাধিবিশেষ, বাঙ্গালায়—নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপাধিবিশেষ। মেদিনীপুর নগরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজারা খাঁ পদবীবিশিষ্ট।

গোস্বামী—প্রভু, ঈশ্বর। মন্ত্রদাতা গুরু। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

আচার্য—(আ-চর-কর্তৃবাচ্যে ণ্যৎ). বেদাধ্যাপক। মনুর মতে—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥" ২।১৪০। যেমন, নিরুক্তকার যাস্কাচার্য, টীকাকার দুর্গাচার্য, বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য—"সত্রাপ্তশ্চ সায়ণাক চতুর্বেদে ভাষ্যকার, পরম বৈয়াকরণ, পরম ধর্মশাস্ত্রবিৎ সর্বদর্শনিকাতে, উত্তরমীমাংসাধুরন্ধর, ব্রহ্মবাদিবরেণ্য মাধবাচার্য! তাঁর নামে এদেশে সার মাধা না হেঁট হয়?"—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ। "নব্যভারত", সপ্তত্রিংশ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৪, পৃঃ ৪৪৪, পঙ্‌ক্তি ২, ১. ৩., "এলা"র নামকরণ।

উপাধ্যায়—(উপ—অধি—ই—অপাদানবাচ্যে ঘঞ্). উপেত্য অধীয়তে অস্মাৎ, বেদাধ্যাপক। মনুর মতে—"একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥" ২।১৪১। বৌদ্ধ মতে—যিনি ধর্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা তিনি আচার্য, যিনি অন্নাদি দিয়া বেদ শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায়। মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি (বেদাধ্যয়ন), তপঃ ও দান, এই নয়টি গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণই 'উপাধ্যায়' এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যিনি যে গ্রামে বাস করিতেন, 'উপাধ্যায়' এই উপাধির প্রথমে সেই গ্রামের নাম কথিত হয়। যথা—(১) (নাম) বরাহ, (গ্রাম) বন্দ্যঘটি, (উপাধি) উপাধ্যায়, (পূর্ণোপাধি) বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) (নাম) সুলোচন, (গ্রাম) চট্টগ্রামী, (উপাধি) উপাধ্যায়, (পূর্ণোপাধি) চট্টোপাধ্যায়। (৩) (নাম) ধাতু, (গ্রাম) মুখুটী, (উপাধি) উপাধ্যায়, (পূর্ণোপাধি) মুখোপাধ্যায়। (৪) (নাম) সৌরী, (গ্রাম) গাঙ্গুলী, (উপাধি) উপাধ্যায়, (পূর্ণোপাধি) গঙ্গোপাধ্যায়—শুভবিবাহ, পৃঃ ৯২ ৯৩।

বাজপেয়ী—(বাজপেয়িন্—বাজপেয় + ইন্, অস্ত্যার্থে, ১মা, ১ব), যজুর্বেদশাখাধ্যেতা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।

অগ্নিহোত্রী—(মূল শব্দ—অগ্নিহোত্রিন্। অগ্নিহোত্রিন্ (হোত্র) + ইন্—(অস্ত্যার্থে-হোতা). নিত্য হোমকর্তা, সাগ্নিক।

মণ্ডল—(মন্ড—কর্তৃবাচ্যে—কল), "দ্বাদশ রাজকং", দেশ, স্থান, বিভাগ; গ্রাম্য ভাষায়—মোড়ল। নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপাধিবিঃ।

সরকার—(ফার্সী)। প্রভু, স্বামী, শাসনকর্তা, গভর্ণমেণ্ট; নগর ও গ্রামের লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত প্রধান হিন্দু বা মুসলমানদিগের উপাধিবিশেষ। যেমন,

সদর দেওয়ানী আদালতের প্রবীণ ব্যবহারাজীবী [illegible] নামক হিন্দু আইন প্রণেতা পণ্ডিত মোতেরণ সরকার। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর আইন অধ্যাপক" (Tagore Law Professor) ছিলেন।

"কাব্য-নির্ণয়" (বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থ), "সম্বন্ধনির্ণয়" (জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ) প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 'বাহাত্তুরে কায়স্থের পদবী' পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'গুহ' একটি। অন্যান্য কায়স্থের 'পদবী'—যথা, বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, দাস, সেন, সিংহ, কর, দেব, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, নন্দী, আঢ্য, ছোড়, আইচ, সূর, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, রুদ্র, গুপ্ত, মল্লিক, বর্দ্ধন, চাকি, ঢোল, প্রভৃতি। কয়েকটি 'পদবী'র উৎপত্তি :—

'গুহ' একটি বিশুদ্ধ আর্য শব্দ। "গুহ"—গুহা-নিহাকৃৎদেবতায়াম্—"গুহাভ্যঃ বিরাতম্"—যজুর্বেদে ১০।১৭ ভাষ্যে—গুহাসু গুহাকুলাস্বাৎ তদাত্মন্ যদাহ শতপথব্রাহ্মণে ১১।২।৬।৫, "তস্মাদিদং গুহা ভবতম্।" "গুহা" প্রবিষ্টৌ সুকৃতস্য লোকে"—শ্রুতিঃ। মায়া—"যান যেন নিহিতং গুহায়াং পরমব্যোমন্"—শ্রুতিঃ। পরমেশ্বরে—"কবলং কারণং কর্ত্তা বিকর্ত্তা গহনো গুহঃ"—বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে ৪৪ শ্লোকঃ। তত্রৈব শাঙ্কর-ভাষ্যম্—গুহতে সংবৃণোতি স্বরূপাদীনি মায়য়েতী গুহঃ "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" ইতি ভগবদ্বচনাৎ। রামায়ণ প্রসিদ্ধে শৃঙ্গবেরপুরাধীশে নিষাদজাতীয়ে রামমিত্রে। কার্ত্তিকেয়ে—"সৈনাপত্যেন দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা"—ভা০ব০৩৮অ০, ২২৮ অঃ; "গুহোঽপি যেষাং প্রথমাগ্রজন্মনাম্"—কুমারসম্ভবে। অগ্নে—"যন্মাত্মা শিবয়োনয়ঃ"—কুমারসম্ভবে। পর্ব্বতাদিগহ্বরে—"গুহানিবদ্ধ প্রতিশব্দদীর্ঘম্", "প্রতি-ধ্বনেনাস্য গুহাগতেন"—রঘুবংশে। শালপর্ণীবৃক্ষে—রাজনির্ঘণ্টুঃ (বৈদ্যকগ্রন্থঃ)। সিংহপুচ্ছীলতায়াম্ (চাকুলিয়া)। কার্ত্তিকেয়ে—"পার্ব্বতীনন্দনঃ স্কন্দঃ সেনানী-রগ্নিভূর্গুহঃ"—অমরকোষে (নামলিঙ্গানুশাসনে) ১।১।৩৯। তত্রৈব ভট্টক্ষীরস্বামিপ্রণীতেনামরকোষোদ্ঘাটনেন—গুহতে সেনাং গুহঃ, কঃ। তত্রৈব ভানুজিদীক্ষিতকৃতয়া ব্যাখ্যানুসারব্যাখ্যয়া ব্যাখ্যায়া—গুহতি রক্ষতি সেনাম্। 'গুহ সংবরণে' (ভা০উ০সে০)। 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' (পাঃ ৩।১।১৩৫) ইতি কঃ। 'গুহঃ ঘাস্মাত্তুরে গুহা। সিংহপুচ্ছ্যাঃ চ গর্ভে চ পর্ব্বতাদেশ্চ কংদরে'। "দেবব্রহ্মণি তত্ত্বেচ্ছা বিপাকেপি গুহ স্মৃতঃ"—শাশ্বত-কোশঃ। "গাং গোপ্তা ব্রহ্মচারী চ গুহো বহ্নিপবাচনঃ"—অভিধানরত্নমালায়াম্ ১।২০। 'মহাসেনো মহাতেজা শক্তিপাণিগুহোঽগ্নিভূঃ"—বৈজয়ন্ত্যাম্ স্বর্গকাণ্ডে আদি দেবাধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকঃ। "গুহঃ স্কন্দে গুহাজারাং পুন্নিপর্ণ্যাং চ গহ্বরে"—নানার্থসংগ্রহে ২২৯ শ্লোকঃ। "দ্বাদশাক্ষো মহাতেজাঃ কুমারঃ সন্মুখো গুহঃ"—অভিধান-চিন্তামণৌ ২।২০৯। "গুহঃ ঘাস্মাত্তুরে গুহে"—মেদিনী। "ষড়াননার্থঃ সেনানীর্গুহঃ শিখ্যর্থবাহনঃ"—কল্পদ্রুকোশঃ। "কায়স্থানাং পদ্ধতিবিশেষশ্চ"—শব্দকল্পদ্রুমে। "গৃহতি দেবসেনাম্, গুহ—ক"—বাচস্পত্যে দ্বিতীয়খণ্ডে। "গুহ"—A name or title proper to persons of the writer caste—H. H. Wilson's, A Dictionary in Sanskrit and English. Third Edition, Calcutta, 1874, p. 242, col. 2.

বসু—(বস্+উ কর্ত্তৃবাচ্যে), গণদেবতাবিশেষঃ, অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভব। ধন, অগ্নি, সূর্য, কিরণ, লবণ, জল; কায়স্থের জাতীয় পদবীবিশেষ।

ঘোষ—(ঘুষ্—শব্দে+অ (অধিকরণ, সংজ্ঞার্থে), (কর্ত্তৃবাচ্যে, সংজ্ঞার্থে), গোপজাতী, গোয়ালা; বাঙ্গালী কায়স্থজাতির উপাধিবিশেষ।

মিত্র—(মিদ্—স্নেহ করা+ত্র কর্ত্তৃবাচ্যে), বন্ধু, সূর্য, অগ্রহায়ণ মাসের সূর্যের নাম মিত্র, সমকর্মী; কায়স্থের বংশপরিচায়ক উপাধিবিশেষ।

দত্ত—(দা—দান করা+ত কর্মবাচ্যে), ত্যক্ত, অর্পিত, ত্যক্ত; ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর জাতীয় উপাধিবিশেষ।

কয়েকটি 'উপাধি'র প্রয়োগ ও অর্থ :—

বাবু—In Persian *mam* is mother, *bab* is father. The affix 'উ' in 'বাবু' is used affectionately. Hence, by the word 'বাবু' it is meant amongst others—'protector', 'wealthy man', 'man of rank and position.' From *mam*, it becomes mother, so also from *bab*, it becomes father. For their *toties quoties* the words are transposed into *ma*, *bap* in the Urdu language. From *baba* (meaning grand-father), a Persian word, *babu* is known in the Urdu language during the Muhammadan epoch. "*Babu*" was a title of honour given at the time of Muhammadan

rule. Haughton says, "A gentleman used as a term of respectful address like 'sir' and nearly equivalent to 'esquire.'"—A Dictionary, Bengali and Sanskrit, Explained in English, and Adapted for Students of Either Language; To which is added An Index, Serving as a Reversed Dictionary, London: MDCCCXXXIII. London, 18th July, 1833. মুন্সী, মুন্সি or মুন্‌শি—The word "Munshi" is of Arabic origin, from নশিউন or নসিউন (*nasiun*)—to grow, and therefrom ইন্‌সা (*insa*)—to cause to grow, now used in the sense of writing. It is meant amongst others—a learned, a good hand in correspondence and a past-master in composition. "'মুন্সীজী' বলিলে যেন পারিভাষিকরূপে স্বরূপ-চন্দ্রকেই বুঝাইত"—"Svarup Chandra became a past-master in the art of elocution in Persian, Arabic and Urdu and for this reason, he was honoured with the surname of "Munshi Svarup Chaudra" in his time. ••••• The proficiency of certain men in Eastern Classics (i. e. in *Arabic*, *Persian*), both written & spoken, is a theme of wonderful thing to many Muslims themselves. East has produced many such eloquent and impressive speakers in Eastern Classics, among them Svarup Chandra's is a household word certainly to conjure with." (Vide, "Barisal Hitaishi," Vol. LVII, Nos. 7-8, 10, 14-15, 17-22 & 25, 1949, *sub voce*, Svarup Ch. Guha—A Biographical Study—kept in the National Library, Belvedere, Calcutta-27; Card Catalogue of European languages: *Author Card: Subject Card*: No. 169. D. 52). Also, "বাকেরগঞ্জনগরাধীনরায়চন্দ্র-পুরগ্রামবাসিকায়স্থগোত্রসম্ভূতকায়স্থকুলমৌক্তিকস্যবিশাল-পূর্ব্বামূর্ধ্বাধিকরণস্যবাবহারাজপ্রখ্যাতস্যস্বামিধামিকপ্রবর-সনন্দস্যদয়োদ্ভতমনঃস্বরূপচন্দ্রস্যচক্রধুরীণস্য"— লেখকের পিতামহ; see পুষ্পিকা of "The Exegesis of the Veda—Ancient & Modern". চৌধুরী—"If a landholder owns a pargana, or an aliquot portion thereof, he is called a Zamindar, and also generally receives by courtesy the title of *Chaudhuri*; but if his estate bears no relation to a pargana or its divisions, he is merely a taluqdar."—H. Beveridge, B.C.S., The District of Bakarganj. London, 1876, p. 56. "Chaudhuri" is an honorific title conferred on persons of position, specially of the landlord class. In some cases, combined titles like 'Roy Chaudhuri' are also found."

চৌধুরী (চৌ + ধুরী from ধুর) । A chief of four (as a title of honour)—Haughton, A Dictionary, Bengali And Sanskrit, Explained in English, London, 1833. p. 1122; চৌধুরী. *s.* a title of honour indicating the chief of four.—A Dictionary of the Bengalee Language, Vol. I. Abridged from Dr. Carey's Quarto Dictionary, Twelfth Edition. Calcutta, 1906. p. 278; চৌধুরী—(চৌ—চারি ধুর—নৌ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতির ভার + ইন্ (স্বা)), lit. the bearer of a discus, i. e. one in authority—the headman of a village or district, community or craft.—Glossary Indore State Gazetteer—1908; চৌধুরী—(চতুর্ধুরিন্, চতুর্ চারি—ধুর্ ভার + ইন্ (বিন্)—ক), উপাধিবিশেষ। রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, ষষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৭৪৭, পং ২ (Vide, "Barisal Hitaishi," Vol. LVII, No. 19, 1949. p. 2, col. 3) । 'বাবু', 'মুন্সী', 'চৌধুরী' উপাধিরূপে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়।

সভ্যতার এবং কৃষ্টির একটি অঙ্গ 'উপাধি।' ভারতের 'উপাধি'র প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসে। ইতিহাসে দেখা যায় "কায়স্থ" এক সম্প্রদায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, শৌর্যবীর্যশালী, লেখনপটু, কর্মনিপুণ, রাজনীতিকুশল এক বিরাট এবং উচ্চ জাতি। স্মরণাতীত কাল হইতে আসেতুহিমাচল সমগ্র ভারতে, এমন কি সুদূর সিংহল পর্যন্ত ইঁহারা যে কীর্তি-কলাপ প্রদর্শন করেন, অদ্যাপি ইতিহাস তাহার স্মৃতি সদর্পে ও সগর্বে রক্ষা করিয়া আসিতেছে! প্রাচীন-কালে "গুহ", "ঘোষ", "সিংহ", "দাস", "দেব" পদবীধারী কায়স্থগণ রাজ্যাধিকারী হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব

পরিচয় দেন। রাজ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে ছিল, মুসলমান এবং ইংরাজ আমলে সর্বত্রই কায়স্থগণ নৃপতিবৃন্দের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। গৌড়বঙ্গ ১২০০ বৎসরের অধিককাল কায়স্থশাসিত ছিল। খ্রীঃ ৫০০ অব্দ হইতে কায়স্থগণই সমস্ত গৌড়বঙ্গের একাধিপত্য শাসক ছিলেন। এত দীর্ঘ কাল গৌড়বঙ্গেই কায়স্থসমাজে প্রচলিত ছিল। "মহারাজাধিরাজ" "পরমভট্টারক", "মহারাউ," ইত্যাদি, উপাধি কায়স্থগণ ধারণ করিতেন। হিন্দু রাজত্ব আমলে "মহাসান্ধিবিগ্রহিক" (Secretary for Foreign Affairs), "মহাক্ষপাটলিক", প্রভৃতি, রাজকীয় উচ্চ পদ কায়স্থদিগের একচেটিয়া ছিল। "মজুমদার" (ফার্সী—মজ্‌মুআদার) অর্থ-রাজস্বের হিসাব-রক্ষক, কুলপদবীবিশেষ (See, Glossary of Vernacular Judicial and Revenue Terms, 1874)। "মল্লিক"—"ভূম্যধিপতিবিশেষঃ", ভূসম্পত্তির অধিকারী, সম্মানসূচক উপাধি, ইত্যাদি, বুকাইত। বিভিন্ন জাতির মধ্যেও ঐ ঐ উপাধি দেখা যায়। পাল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে "জ্যেষ্ঠ কায়স্থ" বা "প্রথম কায়স্থ" নামে এক পদ পরিজ্ঞাত ছিল। তিনি সম্ভবতঃ 'প্রধান কর্মসচিব' (Chief Secretary) এর মত পদধারী থাকিবেন। যিনি রাজাদিগকে শ্রেষ্ঠ লেখক, তিনিই ঐ নামে অভিহিত হইতেন। এ ছাড়া 'বিষয়পতি', 'মহাসামন্ত', 'রাজামাত্য', 'মন্ত্রী', 'রাজস্থানীয়োপরিক', 'বিনিযুক্তক' ও 'মহাদণ্ডনায়ক' কাজেও কায়স্থগণের বিনিয়োগের কথা অবগত হওয়া যায়। উহা বর্তমান সময়ের 'ভুক্তিপতি' (Commissioner of a Division) পদ অপেক্ষাও উচ্চতর পদ ছিল। হিন্দুরাজত্বকালীনে "মহাকায়স্থ," "পুরকায়স্থ", "ভাণ্ডারকায়স্থ" উপাধি অনেক কায়স্থ প্রাপ্ত হইতেন। যাঁহার জিম্মায় রাজকোষ থাকিত, তিনি ছিলেন "ভাণ্ডারকায়স্থ।" রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব কক্ষ সমূহের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী (অনেকটা "কঞ্চুকী") সদৃশ ব্যক্তিই "পুরকায়স্থ" ছিলেন। পাঠান এবং মোগল রাজত্বে কায়স্থগণ অনেকানেক রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহুল পরিমাণে কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পদানুযায়ী উপাধি ছিল।

'দপ্তরদার'—(ফার্সী—দপ্তর্ (দফ্‌তর) + ই + দার, রাজকীয় সীল—যাঁহার নিকটে ঐ মোহর থাকিত এবং যাঁহার দপ্তরখানা হইতে প্রেরিত হইত, তাঁহার উপাধি "Keeper of Royal Seals"—ইহা ইংলণ্ডের "Lord Privy Seal" সদৃশ সম্মানজনক উপাধি ছিল। দেওয়ান রামকৃষ্ণ ঘোষ বঙ্গের নবাবের নিকট স্বনাম দস্তখতের ক্ষমতা পাইয়া এই উপাধি লাভ করেন। ঐ উপাধি বংশগত হয়। "গুহ", "বসু" ও "ঘোষ" এই তিন বংশের কেহ কেহ 'দপ্তিদার' উপাধিও ছিল। বরিশাল নগরের গাভা গ্রামের "ঘোষ" বংশীয়েরা "দপ্তিদার" উপাধিধারী। ঐ গ্রামের "সরোগা বাড়ী" একটি প্রসিদ্ধ বাড়ী—যাহার নাম-পরিচয় বিদেশেও সুবিদিত আছে, সেই বাড়ীর স্বর্গত শ্যামাচরণ ঘোষ একজন তৎকালে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পরিদর্শক কার্যে যথেষ্টই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। লেখকের তিনি মাতামহ ছিলেন)।

শিকদার—(ফার্সী—র্), শান্তিরক্ষক কর্মচারী বিশেষ, মুসলমান রাজাদিগের আমলে রাজকর্মচারীর উপাধি-বিশেষ, বর্তমানে পৌলিক উপাধিবিশেষ।

নিয়োগী—(নিয়োগ + ইন্ (অস্ত্যর্থে) = নিয়োগিন্ ১মা, ১ব। জাতীয় উপাধিবিশেষ; নগর ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তির উপাধিবিশেষ।

বক্সী—(ফার্সী বখ্‌শী), মুসলমান রাজসরকারের দপ্তরের প্রধান কর্মচারী; মুন্সীর উপর ও নাজিরের নিম্নের পদ।

মীরবহর—(আরবী—আমীর-উল্-বহর, ফার্সী—মীর-ই-বহ্‌র), নৌবিভাগের সর্বাধ্যক্ষের উপাধি—ইংলণ্ডের Admiral of the Fleet, মির—Commander, বহর—Sea, Sea—Commander, বরিশাল নগরের নথুল্লাবাদের "বসু" বংশীয়েরা "মীরবহর" উপাধিধারী। এই বংশে বরিশাল-রামচন্দ্রপুরনিবাসী সুপুরুষ, তেজস্বী, সংস্কৃতভাষানুরাগী, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী "কবিতা-কমলের" সুকবি সারদাপ্রসন্ন গুহ মহাশয়ের বিবাহ হয়। তিনি কালীনাথ রায় মীরবহরের কন্যা চিন্তামণিকে (যোগমায়াকে) বিবাহ করেন। ঐ নগরস্থ বরদি-কালিকাপুর পরগণার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম মালিক উজীরপুরনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী জমীদার মহাশয় চিন্তামণির (যোগমায়ার) মাতামহ ছিলেন। সারদাপ্রসন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি পাইয়া এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক বি-এ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন জন্মভূমি রামচন্দ্রপুর গ্রামে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার "কবিতা-কমল" দ্বিতীয় বার্ষিক এফ্-এ শ্রেণীতে পাঠকালীন (১৮৬৯-১৮৭০ খ্রীঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ভিতরে ঐ কাব্য-গ্রন্থের

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সারদাপ্রসন্ন লেখকের পিতৃদেবের জ্যেষ্ঠতাত মোহনচন্দ্রের প্রথম পুত্র ছিলেন। তাঁহার (১২৪৮-১২৭৯) মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর চারি মাস পরে লেখকের পিতৃদেব অবিনাশচন্দ্রের জন্ম হয়।

বিশ্বাস—(বি-শ্বস্ (বিশ্বাস করা)+অ ভাববাচ্যে), প্রত্যয়, শ্রদ্ধা, জাতীয় পদবীবিশেষ, নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপাধিবিঃ। উকিল, খাসনবীস, মহলানবীস, চাকলাদার, সমজুার, সরখেল, সর্বাধিকারী, ঠাকুরতা, মুস্তফী, প্রভৃতি, প্রভৃতি, উপাধিগুলি বর্তমান সময়েও সুপরিচিত আছে। বহু কায়স্থ সন্তান বহু শতাব্দী পূর্বে দক্ষিণ অথবা উত্তর ভারত হইতে যে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা নিঃসন্দেহ! বঙ্গদেশের কায়স্থগণ যে তাঁহাদেরই বংশধর, তাহাও নিঃসন্দেহ! বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের নৃপতিগণ, মহারাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম রায় সকলেই কায়স্থ ছিলেন এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সর্বপ্রধান সেনাপতি ছিলেন কায়স্থ-বংশাবতংস সূর্যকান্ত গুহ। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং রাজা নবকৃষ্ণ দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সময় পর্যন্ত কায়স্থ-পুঙ্গবগণ "লেপ্যাল" (Provincial Governor), "প্রধানমন্ত্রী" (Premier), "শাসন-পরিষদের মন্ত্রী"। Minister of a Province), "অর্থসচিব", "আইনসচিব" (Law Member), "সভাপতি" (Speaker), মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি "মহাধর্মাধ্যক্ষ" (Chief Justice), "ব্যবহারাজীবী" (Advocate), প্রভৃতি, আজ নানারূপ উচ্চ ও সম্মানিত রাজকার্যে সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন! এ ভিন্ন জনসেবায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায়, সংবাদপত্রের পরিচালনায়, এমন কি ধর্ম-ক্ষেত্রেও কায়স্থ-সমাজের মহারথিগণ বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেন এবং এখনও করিতেছেন। "বিদ্যানন্দ খাঁ", "কবিবল্লভ", "কবিচন্দ্র", "কণ্ঠাভরণ", "কবিকঙ্কণ", "মুকুটমণি", "ইন্দ্রমণি", "বৈদ্যশিরোমণি", "বৈদ্যচূড়ামণি", "কর্ণপুর", "কর্ণভূষণ", "হাজরা", "পত্তনবীস" "গুণরত্ন খাঁ", "বসন্ত রায়", "বুদ্ধিমন্ত খাঁ", "সংগ্রামরায়", "ফৌজদার" (আরবী—ফৌজদার্। ম্যাজিষ্ট্রেট্, পুলিশ কর্মচারী বিশেষ, সৈন্যাধ্যক্ষ), "লস্কর" (ফার্সী—লশ্‌কর্)। ফৌজ—"তবু অকাতর ভূপতি লস্কর দুষ্কর সাহসে লড়ে"—কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল। ইংরাজি lascar—a native sailor, জাহাজের দেশীয় নাবিক, সাধারণ সৈন্য ও গ্রামবল সজ্ঞ সূচক উপাধি-বিশেষ), প্রভৃতি, প্রভৃতি, উপাধি কায়স্থগণ নানাবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন। "কায়স্থ"—দ্বিজ। সংস্কার বিহীন হওয়ায় 'শূদ্রত্বে' পরিণত হইয়াছে। শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ নহে—"By origin the Kayasthas were of pure regenerate descent. The research of the modern writers as well has led to the conclusion that the Kayasthas are not *Sudras*, but belong to the three regenerate classes, viz., ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় and বৈশ্য।" পিতৃদেবের লেখনীনিঃসৃত আদ্যন্ত শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায়ও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে—

"কায়স্থো দ্বিজ এব বা ন স স বা
যো বা স বা বাস্তি স-
জ্জাতিঃ সৈব মনাপি চস্য বিদুষো
কুলজ্ঞতের্মম তথা
গোত্রং চ নে কাশ্যপম্।
গোত্রিণাধিকৃতা ন সংভবতি যৎ
কালেন গোত্রোপ্যসৌ
মৌক্তীমুখ্য শতক্রিয়াবিরহণা-
মুখ্যামুখ্য
মৌক্তীবকনমুখ্যসংকৃতিলহা-
ক্ষুদ্রক্ষমেবাপরং॥"
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে এবং আইন গ্রন্থ ও আইন পত্রিকানিচয়েও উল্লেখন বড় বিরল নহে! রাশি রাশি দৃষ্টান্তের কয়েকটি মাত্র লিপিবদ্ধ করা হইল। সাময়িক পত্রেও অভাব নাই, তাহারও উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

Tulsi Ram v. Bihari Lal (1890) 12 All. 328, 334; Ishwari Prashad v. Rai Hari Prashad (1927) 6 Pat. 505; 106 I. C. 620, ('27) A. P. 145; Rajendra v. Gopal (1928) 7 Pat. 245; 108 I. C. 545, ('29) A. P. 51; "Barisal Hitaishi", Barisal-Bengal, Vol. LVI, No. 37, 1948, p. 4, cols. 1-2.*

*কলিকাতাপ্রবীণধর্মাধিকরণস্থব্যবহারাভিজ্ঞস্বরীশ্বরীভবেণএম্-এবি-এল্‌বিরুদস্কৃতবিপুলজ্ঞানগৌরবাদংশেযদ্গুরু-ভত্রাতপরিণামরূপকল্যাণগুণাবলীশুক্তিবিস্তাচিন্তামণিস্বৈ-র্ভ্রাজমানেনস্বর্গতেনঅবিনাশচন্দ্রগুহেনবিরচিতাকায়স্থজাতি-তত্ত্বনিষয়কাঃ শ্লোকাঃ। তৎপুত্রেণশ্রীবিনেন্দ্রনাথগুহেন-আংশোত্তাষায়াং প্রথিতাঃ শ্লোকানাং পদটীকাঃ, *sub voce*, "কায়স্থ", sl. 1.

স্বাধীন ভারতের ব্যবহৃত উপনামের বিবৃতি :

শ্রী—(শ্রি সেবা করা + ক্বিপ্ — কর্মবাচ্য. শ্রি + শ্রী। যাহাকে সকলে সেবা করে). লক্ষ্মী, সম্পত্তি, সৌন্দর্য, দীপ্তি, আলোক, কীর্তি, বুদ্ধি, সৌভাগ্য, শোভা, ঐশ্বর্য, সরস্বতী। জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে ইহার প্রয়োগ হয়। নামের উপাধিবিশেষ। দেবতাদের নামের পূর্বে "শ্রী" শব্দ ব্যবহৃত হয়—"দেবাদিনাম্ঃ পূর্বং শ্রীশব্দ-প্রয়োগঃ কর্তব্যঃ।" যথা, "দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্। সিদ্ধং সিদ্ধান্নিকারাংশ্চ শ্রীপূর্বং সর্বদা বদেৎ।" নামের পূর্বে "শ্রী" শব্দের প্রয়োগ শিষ্টাচার হেতু। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে পরলোকগত বুঝাইতে '৺' এই চিহ্ন হয়। জীবিত লোকের জ্ঞাতসারে স্বহস্তে লিখিত নাম বা স্বকীয় অক্ষর বা অক্ষরের বীথারোক্তির ভাব নিহিত এই "শ্রী"তে। উহা অর্থদ্যোতক, সংক্ষিপ্ত এবং শুদ্ধ বটে, আত্মসম্মান বা গর্ববাঞ্জক নহে। "শ্রী" ইংরাজির 'Mr.' ফরাসীর "Monsieur", জার্মানীর 'Herr' জাতীয় নহে। তাহাদের অপেক্ষা গভীর এবং নিহিতার্থযুক্ত অর্থ। উহারা 'উপাধি' মাত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে Vide, "Hindusthan Standard". Late City Edition, Dated. February 5, 1952. p. 4. col. 4. s 'Sri').

সম্প্রতি রাষ্ট্রের "জনাব্" খেতাব্—

জনাব্—শব্দটি সংস্কৃত। জন-অব্ (রক্ষা করা) + ক্বিপ্ কর্তৃবাচ্য। জনরক্ষক, লোকপাল, লোকপালক (শব্দসার—সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান, ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যা-রত্ন সঙ্কলিত। নবম সংস্করণ, কলিকাতা, ইং ১৯১৮, পৃঃ ২১২, পঙ্‌ক্তি ২); জনাব্—(ফার্সী). সম্মানসূচক সম্বোধন, মহাশয়। In Persian (Arabic ?) the meaning denotes a honorific title "a la" (akin to) 'Sir', 'Janab'—See Rev. Thomas Craven, M. A., B. D., The New Royal Dictionary, Part II. Revised and Enlarged, Lucknow, p. 135, col. 1, 1911 (Vide, Do., Do., Do, Do., cols. 4-5, s. v. 'Janab'). মৌলবী—(ফার্সী), মুসলমান অধ্যাপক, বিদ্বান্ ব্যক্তি—(আরবী—মৌল্‌বী ?)। ইংরাজি – Maulvi শব্দটি অসংযতভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা অসিদ্ধ বটে !

স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে ছেপ্‌ত (ছাপ মোহর) যুক্ত সনন্দ (আরবী—সনদ, Sanad :

রেখো মা হৃদয়ে লিখা
এ হিরণ্ময় হেম-শিখা,
এ অমর সনন্দ তোমার ;
—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

"নব্যভারত", ফাল্গুন, ১৩০৪, পৃঃ ৫৯১, পঙ্‌ক্তি "মঙ্গলোপহার")।

"ভারতরত্ন", "পদ্মবিভূষণ", "পদ্মভূষণ" এবং "পদ্মশ্রী" প্রদান করা হয়। এই সম্মানও 'উপাধি'ক্রম। কলা সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের কার্যে চরমোৎকর্ষ প্রদর্শনে "ভারতরত্ন", যে কোন ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব সরকারী কর্মচারীদের ভিতরেও প্রদর্শনে 'পদ্ম বিভূষণ", যে কোন ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের প্রখ্যাত কার্যের নিমিত্ত সরকারী কর্মচারীদের ভিতরেও প্রদর্শনে "পদ্ম-ভূষণ" এবং যে কোন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কার্যের নিমিত্ত সরকারী কর্মচারীদের ভিতরেও প্রদর্শনে "পদ্মশ্রী" প্রদত্ত হয় (Vide, Gazette of India, Dated, January 15, 1955. New Delhi. Regulations for the awards of the decorations ; Do., January 2, 1954, Regulations issued with notification দ্রষ্টব্য)। হিন্দুদের সময়ে 'উপাধি' (উপ—আ—ধা—ভাবে—কি ; উপনাম), মুসলমানদের আমলে 'খেতাব্' ইংরাজদের যুগে 'title' (O. Fr. *title* (Fr. *titre*)—L. *titulus*) ভূর্জপত্রে (The Birch. Latin—*Betula utilis* or *Betula alba*. Bot. Nat. Or. *Cupuliferae* or *Cupiliferae*, dicot. ; the bark of which is used for writing on, see Kath. ; Kav. ; Var. &c. ; n. a leaf made of birch bark for writing on, Karand. ; an economic product), তালপত্রে (Palmyra-palm Latin—*Borassus flabellifer*. Bot. N. O *Palmeae*, (*Palmaceae*), monocot, used for writing article, an economic product), শালীপত্রে (f. barley-groats or other grain which has the husk removed & is coarsely ground, see Vs 23, 8 (comm. Mahidh.) ; Sat. Br. 13, 2, 6, 8 Ts. 3, 9, 4, 8 ; Ger. *Graupe*, *Grutze*—peeled grain, pearl peeled barley, groats. Bot. N. O *Gramineae*, monocot, used for writing purpose an eco. product), তাম্রপত্রে (Copper plate, see Yajn. i, 318 (used for inscribing land-grants &c. ; see Divyav. xxxv., W. ; Mita. on Yajn.

L. *Cuprum*, an economic product), তাম্রশাসন অথবা কাগজে (আরবী—কাগজ্। হিন্দী—ঐ ; 'কাগদ', 'কাগর'—তুলসীদাস কৃত "রামচরিতমানস।" 'কাঅজ', 'কাএচ'—মুন্সী আব্দুল করিম সংগৃহীত 'চট্টগ্রামের কথা ভাষা।' নেপালী ভাষায়—'কাগদ।' চীন ভাষায়—ঐ) সনদ্ মূলে প্রদত্ত হইত। দার্শনিকে এবং শিক্ষাব্রতীতে, পূর্তবিদ্যাবিশারদে এবং সৌধ-শিল্পীতে, চিকিৎসকে এবং বৈজ্ঞানিকে, সামাজিকানুষ্ঠানে এবং জনসাধারণের কার্যে, চিত্রশিল্পীতে, লেখনীতে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতাতে এবং শাসনকর্তৃত্বে ভারতের গণতন্ত্রের পঞ্চম বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে এবং তৎপর দিবসে বিহার প্রদেশের কায়স্থ-কুলসম্ভূত রাষ্ট্রপতি ডক্টর্ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক "ভারতরত্ন", "পদ্মবিভূষণ", "পদ্মভূষণ" এবং "পদ্মশ্রী" উপাধি দিল্লী রাজধানীস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনের "বল্ রুমে" চিত্তাকর্ষক উৎসবে ভূষিতকরণ হয় (Gazette of India, Extraordinary, January 26, 1955)। গ্রহীতাগণ—"ভারতরত্ন" (সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি) —৫ ; "পদ্মবিভূষণ"—৫ ; "পদ্মভূষণ"—২৬ ; "পদ্মশ্রী" —২৪।

পাশ্চাত্যের আওতায় এখন যাই—তারপর বিদায় গ্রহণ! জার্মান্ নামের বাঙ্গালা অনুলেখন—জার্মান্ "হের্" বা "ফন্" একার্থ শব্দ বিনা। Transliteration কথার 'অনুলিখন' বা 'অনুলেখন' শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল! শব্দটি অর্থদ্যোতক। যেমন প্রতিমধুর, তেমন সংযুক্তাক্ষর বর্জিত। 'লিপ্যন্তর', 'লিপ্যন্তরণ,' 'অক্ষরান্তরীকরণ,' শব্দ অপেক্ষা সুষ্ঠু এবং প্রয়োগ সম্মতও বটে! যে শব্দ শ্রবণমাত্রেই অর্থ পরিস্ফুট হয়, ভাষার ভাণ্ডারে তাহার প্রচলন হওয়া সমীচীন! সুধিগণ তাহা সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রতীতি হয়! বহু বৎসর আগে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় (৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩২৪, পৃঃ ১৪৭, ১৬৪) 'অনুলিখন' বা 'অনুলেখন' শব্দের আলোচনা দেখিয়াছিলাম। তারপর আর তেমন সাড়া শব্দ নাই!

প্রাচীন ভাষার উচ্চারণ ঠিক কি তাহা জানার উপায় অসম্ভব। তবে শিক্ষা-শাস্ত্রের সাহায্যে গুরু পরম্পরায় উচ্চারণ করার আয়ত্তে হয়ত বা কতকটা হইতে পারে, তাহাও অবিকৃত রাখা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। কেননা, মাতৃভাষার উচ্চারণের বিকৃতি স্বেচ্ছাচারীভাবে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, কি হইতেছে উল্লিখিত হয় নাই, এমন বড় দেখা যায় না! প্রাচীন ভাষাগুলির ভিতরে এক সংস্কৃত ভাষাতেই শিক্ষা-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিশ্লেষের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভালবাসিতেন! 'অনুলিখনের' পক্ষে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-বিশ্লেষ বাঙ্গালার প্রশস্ত উপায়। কূট তর্কের প্রয়োজন নাই। নিজের জার্মান্ নামের বাঙ্গালার অনুলেখন কি হইবে, তাহা প্রদর্শন করানই উদ্দেশ্য! ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। স্নান ব্যতিরেকে কিরীটাধানকে অভিষেক বলা যায় বলপূর্বক, প্রকৃত নহে! ইংরাজ রাজার এ কিরীটাধান একটা বেশ প্রহসন মাত্র! আদৌ না হইলেও রাজার অধিকারে কোনই ব্যাঘাত জন্মে না (Brooms, Constitutional Law, First Edition, pp. 15, 16, 30)! কিন্তু প্রাচীন ভারতে অনভিষিক্তের রাজধর্মে কোনও অধিকার নাই। সপ্তম এড্ওয়ার্ডের রাজ্যারোহণকল্পে প্রাচীন ভারতের অভিষেক কিরূপে হইত এবং তাহা যে ইংরাজ রাজার কিরীটাধানাপেক্ষা প্রভেদ—পিতৃদেবের "ঐন্দ্র মহাভিষেক" ("ভারতী," অগ্রহায়ণ, ১৩০২) নামক বৈদিক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের তিন স্থলে অর্থাৎ পৃঃ ৭৪১, পঙ্‌ক্তি ১২-১৩, পৃঃ ৭৪৮, পঙ্‌ক্তি ২ এবং পৃঃ ৭৪৯, পঙ্‌ক্তি ১১তে শার্মস্ত (জার্মেনী) দেশীয় সংস্কৃতবিৎ মার্টিন্ এইচ্ হাউগের বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন। কেহ কেহ "মার্টিন্ হগ্" অথবা "মার্টিন্ হেগ্" লিখেন। পিতৃদেবের সুচিন্তিত মতের দ্বারায় প্রতিপন্ন হয় "মার্টিন্ হাউগ্", "মার্টিন্ হগ্" অথবা "মার্টিন্ হেগ্" কোন প্রকারেই লেখা সঙ্গত হয় না। আরও জার্মান্ সংস্কৃত পণ্ডিতদের নামের পদবীতে বাঙ্গালা অনুলেখনে এরূপ ভাবে লেখা সমীচীন—বেন্‌ফাই (Benfey), গ্রাস্মান্ (Grassmann), ল্যান্ম্যান্ (Lanmann), লিণ্ড্‌নের্ (Lindner), অল্‌দেন্‌বের্গ্ (Oldenberg), মোক্ষমূলর (Max Muller), আউফ্রেহ্ট্ (Aufrecht)। ইঁহারা সকলেই বৈদিক সাহিত্যে পরম পণ্ডিত ছিলেন। যেরূপে লিখিত হয়, তাহা ভ্রমাত্মক! বিশুদ্ধরূপে লিখিতে হইলে ঐরূপ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই!

"শ্রী" এবং "জনাব্" শীর্ষকে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—"In America, England, France,

'দারা'—অবাং [Von—abl.

pp. of j by—Encyklopadis-
englisch deutsches und deutsch-
englisches Worterbuch, Zweiter Teil:
Deutsch Englisch, 1896, p. cols. 2-3)।
"ছের" "অন্" একই অর্থ কি প্রকাশ করে? নিশ্চিতই
শব্দের দ্বারাই "ছের", "অন্" কি একার্থ
ভাস্তধারণা ব্যতীত আর কিছুই
পাশ্চাত্যদেশবাসীদের নামের পূর্বে সম্মান-
সূচকস্বরূপে উল্লিখিত 'আথা' দেওয়া হয়। তদ্দ্বারায়
তাহারা কোন্ জাতিভুক্ত, তাহাও প্রকাশ করে। সম্ভ্রম-
বিহীনের সঙ্গে ঐ উপাধির ('থেতার্' এর) কোনও

'আন্'এর নামের পূর্বে

দেশ ও বিদেশ

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু লোকসভায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করিয়া বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, সম্পত্তি দখলহেতু ক্ষতিপূরণ দানের প্রণালী ও পরিমাণ সম্পর্কে সংসদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। বস্তুতঃপক্ষে এইরূপ গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ আইনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। কেননা, ইহার সহিত আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রশ্নটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। দেশের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন যখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন ইহাকে শুধু মাত্র চোখে দেখিলেই চলিবে না। ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যাকে যদি আমরা নিছক অর্থ দানের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য—কাহার অর্থ কে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিবে? যেদিন ব্রিটিশ সরকার ছিল, সে দিন ভারতের পুঁজির বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যরূপ ইহার চেহারা ছিল 'নওকরে'র, কিন্তু আজ ইহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। আজ সমাজে যত পুঁজি আছে তাহা প্রতিটি সামাজিক জীবের অ-প্রত্যক্ষ অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। ইহারা (অর্থাৎ এই পুঁজি) যাহার হাতে প্রত্যক্ষভাবে থাকুক না কেন, ইহার ব্যবহারের সুযোগ সবাইকেই কিছু-না-কিছু দিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন শ্রেণীকে দিতে গেলেই জাতীয় অর্থ-নৈতিক পুঁজিতে টান পড়িবে। সম্পত্তি হইতে যে অর্থ —অর্জিত হইতেছে তাহা সামাজিক জীবেরই কোন-কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা কেন্দ্রীভূত মাত্র। ইহা বিকেন্দ্রীভূত হইলে সামাজিক সাম্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। কাজেই রাষ্ট্র কাহারো হাতে বিশেষভাবে পুঁজি তুলিয়া দিতে পারে না, কেননা, তাহাতে কোন বিশেষ শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থাটা বৃহত্তর সামাজিক-সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে বিচার করিতে হইবে।

শ্রীনেহেরু বলেন, দেশের সরকার ও শাসনব্যবস্থার কার্যে সহায়তা করাই সংবিধানের উদ্দেশ্য। ইহার লক্ষ্য স্থিতিশীলতা নহে, গতিশীলতাই ইহার লক্ষ্য। ইহা দ্বারা আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়, আবার হঠকারিতারও প্রতিরোধ করা হয়। বস্তুত এই সত্যটি আজ স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে।

অর্থনৈতিক ভারতের প্রগতি

এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক কমিশনের দপ্তর হইতে ১৯৫৪ সালের বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতের ৩৭ কোটি অধিবাসীর শতকরা ৪০ জন কর্মে নিযুক্ত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১·১ হইতে ১·৮ জন। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পাইতেছে। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশবাসীর মাথাপিছু আয় ২৮০৲ টাকার মত হইয়াছে। (১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য মানের হিসাবে)। কমিশন বলেন যে, এই দিক দিয়া এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অঞ্চলসমূহের সর্বনিম্ন আয়ের দেশগুলির অন্যতম। কমিশন মনে করেন ভারতের আয় সুস্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষ যে পরিকল্পনা হাতে লইয়াছে তাহার তিন বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সরকারী উদ্যোগে এ যাবৎ ৮৮৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু পাঁচশালা পরিকল্পনার আসল লক্ষ্য হইল ২২৮৫ কোটি টাকা খরচ করা। হিসাবে দেখা যায় যে, মোট বরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র খরচ হইয়াছে।

ইহাই ভারতের আধিক মানচিত্র। জাতির আশা ভরসার ইঙ্গিত ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের অগ্রগতির পথে যে সব অন্তরায় আজও রহিয়াছে তাহা স্বল্প নহে। এই বাধা যে কেবল মূলধনের তাহাও নহে। জাতির জড়তাও ইহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। তবু কোন ভারতবাসী তাহার অতীতের দিকে নজর রাখিয়া বর্তমানের সফলতায় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিবে।

মুনাফার ভূমিকা ও সমাজতন্ত্র

ভারত চেম্বার্স অব কমার্সের ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রী আর. এন. বাঙ্গুর বলেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বহু আইন-কানুন প্রবর্তিত হওয়ার পর সঞ্চয় এবং মূলধন বিনিয়োগের যে ধারা চলিতেছে তাহা শিল্পপতিগণ কর্তৃক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে। শ্রী বাঙ্গুর বলেন, সমাজে মুনাফার বিশিষ্ট ভূমিকা উপলব্ধি করিতে হইবে। বস্তুত পক্ষে এতাবৎকাল সমাজে মুনাফার ভূমিকা উপলব্ধি করিয়া সবাই মুনাফাকেই প্রায় সর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সামাজিক জীবন এই মুনাফাসর্বস্ব অবস্থার চাপে পড়িয়া নিতান্তই অসহায় বোধ করিতেছে—নচেৎ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে আর নূতন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থার কথা ঘোষণা করিতে হইত না। যাহা সমাজ জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে তাহার অবস্থিতির আজ আর কোন উপযোগিতা নাই। কাজেই দেশের বণিক সমাজকে আজ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সেই মুনাফার প্রশ্নটি বিবেচনা করিতে হইবে। যাহা বহুর সদিচ্ছার দ্বারা গড়িয়া তোলা যায়—তাহাই অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত এবং আমাদের মনে হয় বণিক সমাজের চিন্তাধারা আজ সমাজতন্ত্র না হইলেও, সমাজ কথাটি স্থান পাইবার দিন আসিয়াছে। অন্যথায় অনেক ক্ষেত্রের পরিণতির জন্য তাহাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। তাছাড়া রাষ্ট্র যখন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়িবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে তখন তাহাদের রাষ্ট্রের আদর্শের অভিমুখী মন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারত সীমান্তে বিভ্রাট—

লোকসভায় আলোচনা সূত্রে প্রকাশ যে, "রংপুর-গোয়ালপাড়া সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক সীমান্তের থাম তৈয়ারী করার কাজে নিযুক্ত ছিল। পাকিস্তানের সীমান্ত পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করে এবং নির্মাণক্ষ উপকরণগুলিও লইয়া যায়। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি নির্মাণ-উপকরণ এখনো ফেরৎ দেয় নাই।" খবরের এই অংশ প্রকাশের পর কাহারও প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত যখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজ করিতেছে তখন আর ইহাকে সন্দেহসঙ্কুল না করিয়া তোলাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় উভয় রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া আর একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিবার আছে উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের সদিচ্ছা ছাড়া কোথাও সীমান্ত অঞ্চলের লোকেরা শান্তিতে বাস করিতে পারে না। কেননা আপৎকালীন ব্যবস্থায় ইহারা সব সময়-ই স্বপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে কাজ করিতে পারে এই আশঙ্কায় উভয় রাষ্ট্রই একটা মানসিক সন্দেহে ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সব ভবিষ্যৎ অপ্রীতিকর অবস্থার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্যও একটা আপোষ-নিষ্পত্তির প্রয়োজন আছে। অবশ্য এসম্পর্কে একপক্ষকেই সজাগ হইলে চলিবে না। কিন্তু অন্যপক্ষের সচেতন হইবার তাগিদ কোথায়?

সর্বোদয় ও রাজনৈতিক দল—

পুরী সর্বোদয় সম্মেলনে গুজরাট, সৌরাষ্ট্র ও বোম্বাইর এক প্রতিনিধি সভায় বিনোবাজী বলেন যে, কংগ্রেস সত্যই অহিংস সমাজের প্রতিষ্ঠা চাহেন কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। যে সকল রাজনৈতিক দল সর্বোদয় সমাজ চাহেন, সেই সকল দলকে ভাঙিয়া দিয়া দলসমূহের সদস্যদিগকে ভূদান আন্দোলনে

যোগদান করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ও তিনি যখন আশীর্বাদ করেন তখনই যুদ্ধের অর্ধেক জয় হইয়া যায় এবং তারপর তাঁহার মৃত্যু কোথায় জানিতে চাহেন। বিনোবাজী বলেন, সেই প্রকার আজ আমরাও কংগ্রেসকে উহার মৃত্যু কোথায় রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রশ্নটি সব দিক দিয়াই জটীল। যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলি আত্ম-অবলুপ্তি ঘটাইয়া শুধু মাত্র ভূদান আন্দোলনে যোগদান করিলেই অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা হইলেও ইহার সহিত আর একটি প্রশ্ন নিহিত থাকে, বহুজন দ্বারা গঠিত সমাজ তাহা কি চিরকালই অহিংস থাকিবে? এবং সেকালের রাজনীতি কি হিংসা ও অহিংসার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে? সমাজে সবাই হিংসা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না, তেমন সবাই আবার অহিংস থাকিতে পারে না। এই দুয়ের মধ্যে একটা প্রবৃত্তিগত বিরোধ রহিয়াছে। এই প্রবৃত্তির যে কোন একটার মাত্রাধিক্য ঘটিলেই কতগুলি রাজনৈতিক দল আপনা হইতে গড়িয়া উঠে। কাজেই রাজনৈতিক দল—বিশেষ করিয়া কংগ্রেস—ঐতিহাসিক প্রয়োজনের, সৃষ্টি মাত্র। ইহার প্রভাব মূলত সামাজিক জীবের রাজনৈতিক চেতনার উপরে নির্ভর করিতেছে। এবং সে রাজনৈতিক চেতনা মূলত অহিংস ভাবধারায় বহিতেছে। কংগ্রেস যদি তার প্রভাব আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুরোমাত্রা খাটাইতে না পারে, তবে তাহার মৃত্যু কোথায় আর জানিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহা আপনা হইতে মৃত্যুর গহ্বরে চলিয়া যাইবে।

সর্বোদয় সম্মেলন দেশের মধ্যে যে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার শুভ সম্ভাবনাকে যদি কংগ্রেস মানুষ গড়ার কাজে লাগায় তবে হয়ত সমাজতান্ত্রিক প্রথায় সমাজ গঠন সম্ভব হইবে। কিন্তু সে কাজে অবশ্যই কোন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা মানবের সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক এমনও হইতে পারে যে, মুক্তি সাধনা মূলত রাজনৈতিক সাধনার অংশ বিশেষ। হয়ত অন্য কোন রাজনৈতিক দল বিপথগামী হইয়া সমাজ-জীবনের শান্তির সাধনাকে ব্যাহত করিয়া দিতে পারে। সেজন্যই একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আছে।

রক্ষণশীল নেতৃত্বের পটপরিবর্তন

স্যার উইনস্টন চার্চিল বিদায় লইলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে একদিন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়াছিল বলিয়া আমরা ভারতবাসীরা সব সময় ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক বিচার

স্যার উইনষ্টন চার্চিল

করিতে পারি নাই। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রত্যক্ষ লক্ষ্যস্থল ছিল ভারত। তাই ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দল ভারতীয় জনতার প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি দিতে পারে নাই। যে সাম্রাজ্য ইংরেজ জাতির প্রাণস্বরূপ তাহাকে রক্ষার জন্য একদল রাজনীতিকেরা চেষ্টা করিবেন—ইহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি. মিঃ চার্চিল ছিলেন সেই দলের মুখপত্র ও সেই নীতির ধারক ও বাহক। ইতিহাস একদিন মিঃ চার্চিলের নীতি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এবং ইতিহাসের রায় কি হইবে তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তাঁহার যে বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল ইহা আমাদের জানা আছে। দুইর যুদ্ধের কাল হইতে শুরু করিয়া বর্তমান আণবিক

কাল পর্যন্ত মিঃ চার্চিল তাঁহার রাজনৈতিক
রিচয় দিয়াছেন। গান্ধীজী একদা তাঁহার
ম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের মধ্যে
সবচেয়ে স্পষ্টবাদী লোক। বস্তুত পক্ষে তিনি
জনীতির ছোতা। কোন ঢাকা-ঢাপা ব্যাপারে
এই সব রাজনৈতিক স্পষ্টবাদিতা
ব সম্ভব শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত অমিত বিক্রমে
ইংল্যাণ্ডের সেই শক্তিতে ঘাটতি পড়িয়াছে
বিশ্বাস লইতেছেন।

। মেলিতেছেন

ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইবেন—ইহা
কেন্দ্রিত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে

স্যার এন্টনী ইডেন

লের নীতির কিছু পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা
বহুদিন হইতে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের
বিবালী অংশ চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছেন
াসবাদী নীতির আদি যুগ পার হইয়া মধ্য
ন হইতেছে। এখন আর সাম্রাজ্যের জন্য
গানে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষকে মাতানো যাইবে না।
কেননা যে জাতির শক্তি একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে
পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষার
জন্য চেন-কাজ-নাই করে নাই, সে জাতিই একদিন
সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে শক্তিক্ষয় করিয়াছে। মূলত
রক্ষণশীল দলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার তখন ছিল
মধ্যযুগ। এই মধ্যযুগ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বেশ অটুট ছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের চিন্তার
মাঝে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছে। ভারতের উপর আধিপত্য
নাই, বার্মা নাই, সিংহল শিকল-ছেঁড়া অবস্থায়
পড়িয়া আছে, মিশর হইতেও চলিয়া আসিতে হইল।
এই সব রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রক্ষণশীল দল নূতন
নেতৃত্ব চায়। এই নেতৃত্ব চার্চিল নেতৃত্ব হইতে
নূতনতর হইবে এবং মিঃ ইডেন তাহার যোগ্য বলিয়াই
অনুমিত হয়।

ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচনের জল্পনা-
কল্পনা শুরু হইয়াছে। ইংরেজ জাতি হয়ত সাধারণ
নির্বাচন সমাধা করিয়া একটা মতামত দিতে সমর্থ
হইবে।

মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক ঘূর্ণী

সংবাদে প্রকাশ, পাকীস্তান তুর্কো-ইরাকী সামরিক
চুক্তে যোগদান করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছেন।
পাক প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন এখনও কিছু স্থির হয়
নাই। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র
পাক মন্ত্রিসভারই রহিয়াছে।

সিদ্ধান্ত কি হইবে এসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ
নাই। পাকীস্তান তাহার পররাষ্ট্র নীতিতে বরাবরই
ইসলামী জোটকে বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছে।
ইহা বিভিন্ন কারণে সম্ভব হইয়াছে। একটি কারণ
পাকীস্তানকে যদি ইসলাম রাষ্ট্র হিসাবে প্রভাব বৃদ্ধি
করিতে হয় তবে তাহাকে মধ্যপ্রাচ্যই বাছিয়া লইতে
হইবে। ভারতের প্রতিবেশী থাকিয়া, ভারতকে
ডিঙাইয়া দক্ষিণ, পূর্ব এশিয়ায় আসিবার সামর্থ্য পাকী

স্থানের নাই। যদিও ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের রাষ্ট্র ও প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু এই সব অঞ্চলের ইসলাম রাষ্ট্র এইরূপ ভাবে অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত যে তাকে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। ইহা বাদে ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিক তাহাদের পাকীস্তান হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় পাকীস্তান শুধু মরুভূমির বিচ্ছিন্নতার সমাজ অথবা বর্তমানে টিকিয়া সমাজের উপরই নিজেদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ খুঁজিবে। সেক্ষেত্রে তুরস্ক তাহার সহায় হইবে। কেননা, তুরস্ক বরাবরই আরব জাতিসমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে। তাহার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাইবার পর হইতে সে ডানা-কাটা পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। আজ সঙ্কোচনের পীড়নে সে একপ্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মার্কীণ পররাষ্ট্রনীতি ইহাতে সহসা সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাই সে আবার আরব জগতে ডানা মেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে যতটা পারে এই ডানার তলায় আটকাইয়া রাখিবে। এই প্রচেষ্টায় পাকিস্তান তাহার সহায় হইবে এই ধারণা করিয়া লইতে বাধা নাই। ইহার কারণ, একই সূত্র হইতে সঞ্জীবনী সুধা পাকিস্তানেও আসিতেছে। মিশর ইংরেজকে সুয়েজ হইতে হঠাইয়া দিয়া আপনার অস্তিত্ব লইয়া বিব্রত বোধ করিতেছে। কেননা, আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠীই ছিল তাহার জোটের মহল। সেই মহলে ইংরেজরা একটা খোঁটা পুঁতিয়া বিভ্রাট বাধাইতেছে! এই বিভ্রাটে পড়িয়া আরব সংহতি যায়-যায় অবস্থা। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল কেন্দ্র ইরাণ, ইংরেজকে চটাইবে না। মোসাদেককে হঠাইয়া ইতি-পূর্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করিয়া লইয়াছে। মার্কীনরা বঙ্গোপসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটানা প্রভাবের পসরা মেলিতেছে। কাজেই ছোটখাট বিষয় লইয়া সে নিজেমাথা ঘামাইবেনা—সঙ্কটক্ষেত্রে কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার চেষ্টা করিবে। কেননা, এদিকে পাকিস্তান টোপ গিলিয়াছে, অন্যদিকে তুরস্কও টোপ গিলিয়াছে—যাহে মিশর স্বল্পতেজে কিছু নড়াচড়া করিতেছে। তাহাকেও অগৌণে খেলিয়ে লওয়া যাইবে। কিন্তু এই সব রাজ নৈতিক পারিপার্শ্বিকে ভারতের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজেদের কথা নূতন করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

আফ্রো-এশিয়া মিতালী

আগামী এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন নাকুদ্বে বসিবে। ইহাতে ২৯টি জাতি সম্মতি জানাইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে ইওরোপীয় জাতিবর্গ এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর ভাগ্য লইয়া অনেক সম্মেলনের খেলা খেলিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকাকে বাঁটোয়ারা করিবার নিমিত্ত একদিন ইওরোপীয় জাতিরা বার্লিনে আসর জমাইয়া বসিয়াছিলেন। সুদেক খালের ভবিষ্যৎ লইয়া ইওরোপীয় জাতিগুলি নিজেদের মধ্যে সম্মেলন ডাকিয়া যে পার স্বার্থের বাঁটোয়ারা করিয়াছেন। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ লইয়া সম্মিলিতভাবে ভাবনা চিন্তা করে নাই। মনে হইতেছে ইতিহাসের অঙ্গঘড়ি সহসা মোড় ফিরিয়া অন্য পথে চলিতেছে। সেদিনকার ব্যাপক সম্মেলনের সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য যেন ইহার কাছে ম্রিয়মান বলিয়া অনুমিত হইবে। আজ এই দুই মহাদেশের অধিবাসীরা যে মিলনের ব্যাপক ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসের নূতনতর ইক্ষন জোগাইবে। কেননা, এখানে প্রত্যেকটি জাতি এক অন্ধকার অতীত স্মৃতি লইয়া মিলিত হইবেন। এবং সেই অতীতের রাহুগ্রাস হইতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার এক সহনশীল উপায় উদ্ভাবন করিবেন। ভারত পঞ্চশীল নীতির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই করিয়াছে। এই নীতি বিশ্ব ব্যাপারের সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহারা ক্ষমতার স্বাদে একেবারে মত্তগুল হইয়া আছেন তাহারা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, শক্তি অদহনীয় হইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পাইয়া থাকে। যতবড় শক্তিমানই হোক-না-কেন তাহাকে বিশ্বজনীন নৈতিক মানদণ্ড বিসর্জন দিয়া, মনগাঁথা চেতনা বা বিশ্বাসের ভিত্তি প্রস্তরের উপর দাঁড়াইলে চলিবে না। কেননা, উহা বহুর অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একক সহযোগরূপে দেখা দিয়াছে। এতদিন এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলি ইওরোপীয় জাতিগুলিকে যথেষ্ট সহযোগিতা দান করিয়াছে এইবার এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ক্ষেত্রে ইওরোপীয় জাতিগুলি কতটা সহযোগিতা দান করে তাহাই দেখিবার বিষয়।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কেন্দ্রীয় ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেটে উদ্দীপনার অভাব—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীশ্রী চিন্তামন দেশমুখ লোকসভায় ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট উপস্থাপিত করবার পরে, বিভিন্ন দিক থেকে বাজেটের সমালোচনা করা হয়েছে। দেশে কর্ম সংস্থান সম্প্রসারণের দিক থেকে এই বাজেট বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে বলে মনে করা যায় না। অথচ, মাত্র ডিসেম্বর মাসে অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন যে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করাই আমাদের অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য এবং জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, বাৎসরিক যে অতিরিক্ত ১৮লক্ষ শ্রমিকের সৃষ্টি হবে, সেজন্যে সর্বসমেত প্রতি বৎসর ন্যূনপক্ষে ২০লক্ষ কর্মের সংস্থান করা প্রয়োজন। যদিও ২য় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসঙ্গেই তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন, তবুও বর্তমান বাজেটের প্রস্তাব অনস্বীকার্য।

বর্তমান বাজেটে অত্যন্ত উঁচুহারে কর আদায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে একটি অনুন্নত দেশ এবং সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানে প্রচুর অর্থের বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু উঁচু হারে করারোপ করলে জনসাধারণ কেবলমাত্র নিরুৎসাহিতই হবে না, তাদের সঞ্চয় করবার ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। কর্ম-সংস্থান সম্প্রসারণ করতে হলে, উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং উৎপাদন তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন উৎপন্ন জিনিষ বাজারে কাটতি হয়। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতাদের আয়ও কমিয়ে (কর আদায় করে) দিলে নূতন কর্ম-সংস্থানের সম্ভাবনা কোথায়? অবশ্য একথা ঠিক যে, আমদানী ও রপ্তানীর কড়া-কড়িতে, সেদিক থেকে আয় কিছু কমে গিয়েছে। কিন্তু সেজন্যে নূতন করারোপ করে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম-সংস্থানের পথে বাধা সৃষ্টি করার মধ্যে কতটা যুক্তি আছে সন্দেহজনক। এই বাজেটে সবচেয়ে বেশী পিষ্ট হয়েছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁদের নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়, চিনি, কাগজ, প্রভৃতির দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁদের জীবন-যাত্রার মান নেমে আসতে বাধ্য। তা' ছাড়া এমন অনেক শিল্প-দ্রব্যের উপর শুল্ক চাপানো হয়েছে, যার ফলে তাদের উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য কোন কোন সমালোচনার যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন নি এবং ইতিমধ্যেই সেলাইর কলের উপরে প্রস্তাবিত শুল্ক প্রত্যাহার করেছেন এবং কাপড়ের উপরে প্রস্তাবিত গজ প্রতি এক আনা শুল্ক কমিয়ে দু' পয়সা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক নমুনার নামে দেশের জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার মান যাতে নীচে না নামে সেদিকে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রচুর ঘাটতি পূরণের (Deficit financing) ব্যবস্থা করা হয়েছে সেজন্য নানাপ্রকার সমালোচনাও হয়েছে। তবে এজন্যে খুব আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ দেশের কৃষি ও শিল্পীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে জিনিষপত্র কিনবার ফলে এই নূতন টাকার অনেকটাই চলে যাবে। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত অত টাকাই যে নূতন সৃষ্টি করতে হবে, তাও মনে হয় না।

না হোক এজন্য যে খুব সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, তা বলাই বাহুল্য।

কয়লা শিল্পের সমস্যা—

কয়লা শিল্প যে এক অতি সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে এ নিয়ে বেশ কিছু দিন থেকে শিল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা খুব আন্দোলন চালাচ্ছেন। সম্প্রতি ভারতীয় খনি সমীতির (Indian Mining Association) সাংবাৎসরিক সভায় সভাপতির ভাষণ প্রদানকালে মিঃ জে. এন বাল্ডক কয়লা শিল্পের সমস্যাগুলি আবার সকলের সম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর মতে কয়লা শিল্পের অবস্থা মোটেই উৎসাহজনক নয়: এ অবস্থার জন্য অনেকগুলি কারণ দায়ী; তার মধ্যে উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয় মূল্যের ব্যবধানের স্বল্পতা অন্যতম। ১৯৪৭ সালের উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে যে বিক্রয় মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা এখনও বলবৎ রয়েছে, অথচ বর্তমান উৎপাদন খরচ তখনকার তুলনায় অনেক বেশী। মিঃ বাল্ডক মন্তব্য করেছেন যে, কয়লা শিল্প এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে, যেখানে, শিল্পকে টিকে থাকতে হলে, আর কিছুমাত্র বোঝা এর উপরে চাপানো অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র টিকে থাকাই আজকের প্রশ্ন নয়। জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে, উৎপাদন বাড়াতেই হবে। কয়লা একটি মৌলিক শিল্প। অধিকাংশ শিল্পেই কয়লা উৎপাদন খরচের একটি প্রধান অংশ নিয়ে থাকে। কাজেই কয়লা যদি ন্যায্যমূল্যে পাওয়া না যায়, তা হলে শিল্পীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বেড়ে যাবে। মিঃ বাল্ডক এসব কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে, সে জন্যে কয়লার উৎপাদকগণ লোকসান দিয়ে ব্যবসায় চালাবেন তার কোন অর্থ নেই। কাজেই কয়লা ব্যবসাকে লাভজনক করে তুলবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং সে সব উপায়ের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যতম।

কয়লা শিল্পের উন্নয়নের পথে অনেক বাধা রয়েছে। সরকারের জাতীয়করণের নীতি তন্মধ্যে প্রধান। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে, কয়লা শিল্পকে ১০ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে দশ বৎসর তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। তার উপর সংবিধান রদ-বদলের যে প্রস্তাব চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সরকার যে খনিগুলির মালিকানা অধিকার করে বসবেন না এমন সম্ভাবনা কম। এসব কারণে কয়লা শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য অর্থের অভাব দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে রেশনালাইজেশন্ প্রবর্তনে সরকারী সহযোগিতার অভাবও আছে। কয়লা শিল্পের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উৎপাদন, মূল্য এবং সরবরাহ প্রত্যেকটির উপরই কয়লা শিল্পে নিয়ন্ত্রণ আছে। নূতন খনি খোলা কিংবা কোনও অ-লাভজনক খনি বন্ধ করতে হলে সরকারী অনুমোদন প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা থাকলেও মিঃ বাল্ডক মনে করেন যে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের এবং ছোট খাটো ব্যাপারে কড়া-কড়ির কোন সার্থকতা বর্তমানে নেই।

আর একটি ব্যাপারে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বর্তমান কোল্ বোর্ড সরকারী অফিসারদের নিয়ে গঠিত এবং এতে বে-সরকারী মহলের কোন প্রতিনিধি নেই। মিঃ বাল্ডক কোল্ বোর্ড নূতন করে গড়বার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাটকল শ্রমিকদের অবস্থা

ভারত সরকারের শ্রম বিভাগের অন্তর্গত 'লেবার ব্যুরো' গত ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে পাটকলে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। মোট ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০৯টি এই অনুসন্ধান কার্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১০১টি ভারতীয় পাটকল সমিতির সভ্যতালিকাভুক্ত। পাটশিল্প ভারতের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে পাট বৃহত্তম অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত থেকে যে পাট রপ্তানী হয়েছিল তার মূল্য ছিল ১২৯ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রপ্তানীর

কর্ম সংস্থানের দিক থেকেও পাট শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট। ইহা প্রত্যক্ষভাবে তিন লক্ষ শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান করে থাকে। তা' ছাড়া ২০ লক্ষ কৃষক পরিবারের এবং বহু সংখ্যক দালালদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করে। যে ১০২টি পাটকলের হিসাব দেওয়া হচ্ছে, তাদের উৎপাদনক্ষম সম্পত্তির মূল্য ৭৭'৮ কোটি টাকা। এই পাটকলগুলির ৮৫% ভাগ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, এবং মোট শ্রমিকের ৯২ ৫% ভাগ এই কলগুলি নিয়োগ করে। মোট শ্রমিকের ৮৯'৬% ভাগ পুরুষ, ১০ ৩% স্ত্রীলোক এবং বাকী ০'০২% ভাগ কিশোর। বিহার এবং উত্তর প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। মধ্যপ্রদেশে ২১'৪% ভাগ, অন্ধ্রে ১৪'২% এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০ ৪% ভাগ। ১৯৪৯ সালে পাটশিল্পে ৩,২২,১৪৯ জন শ্রমিক কাজ করেছে। কিন্তু তার পর থেকে শ্রমিকের সংখ্যা কমে গিয়েছে। ১৯৫৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ২,৭২,৩৪২। স্ত্রী ও কিশোর শ্রমিকগণ পাটকল থেকে বস্তুতঃ লুপ্ত হতে গিয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন 'লেবার ব্যুরো'র মারফৎ শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ব্যুরোটি পাটকলের শ্রম-অফিসারদের দ্বারা গঠিত হয়েছে।

১৯৪১ সালের শিল্পীয় ট্রাইব্যুনালের রায় অনুসারে ভারতীয় পাটকল সমিতি "পাটকল শিল্পী শিক্ষানবীশী পরিকল্পনার" প্রবর্তন করেছেন। এই পরিকল্পনা সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও পাটকলের কর্মচারীদের পুত্রদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। পাঁচ বছর শিক্ষানবীশীর পরে একখানা প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। ভারতীয় পাটকলগুলির উৎপাদন ক্ষমতা পৃথিবীর স্বাভাবিক চাহিদা অপেক্ষা বেশী। ভারতীয় পাটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত কলগুলি সময়ের ভিত্তিতে কারখানার কাজের সময় নির্ধারণ করে থাকে। ১৯৪৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী কারখানার কাজের সময় সপ্তাহে ৪২½ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে কাজের সময় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু পাট দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাস থেকে তা আবার কমিয়ে ৪২½ ঘণ্টা করা হয়। ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি কাজের সময় সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা করা হয় এবং অবশেষে গত অক্টোবর মাস থেকে তা'কে ৪৮ ঘণ্টা করা হয়েছে।

১৯৫৩ সালের পরে কারখানার কাজের পরিবেশের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য ক্যান্টিনই ব্যবস্থত হচ্ছে। ছুটি সংক্রান্ত ব্যাপারে 'ফ্যাক্টরী আক্ট' অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে শ্রমিকদের বেতন ও আয় পাটশিল্পের প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৪ সালে বঙ্গদেশে শ্রমিকের নিম্নতম বেতন ছিল সপ্তাহে ২।০ আনা, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ট্রাইব্যুনাল নিম্নতম বেতন মাসে ২৬৲ টাকা বেঁধে দিয়েছে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে শ্রমিকদের নিয়োগ, তাদের চাকুরীর নথিপত্র সংরক্ষণ এবং কল্যাণকর ও আমোদ প্রমোদাদির ব্যবস্থার জন্য শ্রম অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। তা' ছাড়া চিকিৎসার ও শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের সুবিধাও প্রত্যেকটি কেন্দ্রে প্রবর্তিত হয়েছে।

ভারতীয় চা শিল্পের সমৃদ্ধি

ভারতীয় চা শিল্প ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে পুনরায় সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় চায়ের মূল্যই কেবলমাত্র বৃদ্ধি পায় নি, উৎপাদনও বেড়েছে যথেষ্ট। ভারতীয় চা সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভায় বক্তৃতাকালে সমিতির সভাপতি মিঃ ম্যাকে টাল্লাক সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, চায়ের দাম বৃদ্ধি পাবার কারণ, অনেকের মতে চাহিদা বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে উৎপাদন বাড়াবার কিংবা রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার অসমর্থতা। গ্রেটব্রটেনে মাথা পিছু ৩।৪ পাউণ্ড চায়ের কাটতি বেড়েছে। সুতরাং সেখানে মাথাপিছু চায়ের কাটতি ১০ পাউণ্ড দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও চায়ের কাটতি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আফগান এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্য তৈলখনি অঞ্চলেও চায়ের বাজার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। মোটের উপর, সকলে অনুমান করেন, ১৯৫৪ সালে ১৯৫৩ সাল অপেক্ষা ৩'৫ কোটি পাউণ্ড চা অধিক কাটতি হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৪ সালে চায়ের উৎপাদনও ১৯৫৩ সাল থেকে বেশী হয়েছে। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতেই ৫০'৮ কোটি পাউণ্ড চা

উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৫৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৬৮৭ কোটি পাউণ্ড। সিংহল, দক্ষিণ ভারত এবং ইন্দোনেশিয়াতেও চায়ের উৎপাদন গত বৎসর বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং চাহিদার সঙ্গে উৎপাদন সমতা রক্ষা করতে পারে নাই, একথা ঠিক নয়। তবে বাগানে চা উৎপন্ন হওয়া এবং মনোহারী দোকানে তার সরবরাহ আসা এই দুইয়ের মধ্যে বেশ খানিকটা সময়ের ব্যবধান আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ব্যবধানে কিছু যায় আসে না, কিন্তু চাহিদা যখন ঊর্ধ্বমুখী, তখন শঙ্কা উপস্থিত হয়।

চায়ের দাম বৃদ্ধি পাবার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কতকগুলি আবার চা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক হীন—যেমন লণ্ডন ডকে ধর্মঘট। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন চা বাজারে পৌঁছোতে পারে নি। চা বাগানের শ্রমিকদের বেতন চাশিয়ে মজুরীর পূর্ববর্তী স্তরে ফিরিয়ে আনতে পারায় মিঃ ট্যালাক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। চা শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মোটের উপর সন্তোষজনক। এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য পুনরায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

গত অক্টোবর মাসে চায়ের রপ্তানী শুল্ক পাউণ্ড প্রতি ৪ আনা থেকে ৭ আনা করা হয়। এর দু'মাস পরে রপ্তানী শুল্ক ১০ আনায় তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় চায়ের 'কোয়ালিটি' (গুণ) ভাল হয়েছে এবং প্যাকিং সম্বন্ধে বিশেষ অভিযোগ শোনা যাচ্ছে না। গত বছর বিদেশে ১৩১ কোটি টাকা দামের চা রপ্তানী হয়েছে অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল থেকে ২৮ কোটি টাকা বেশী মূল্যের।

দেশের অর্থনীতিতে হস্ত চালিত তাঁত শিল্প

ইদানীং ভারত সরকার হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য যেমন তৎপর হয়ে উঠেছেন, এর পূর্বে আর কখনও এমন দেখা যায় নাই। মিলে প্রস্তুত কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছাড়া বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে হস্তচালিত তাঁত শিল্প আজও শুধু টিঁকেই নেই—আমাদের দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক যন্ত্রে চালিত কলে প্রস্তুত কাপড়ের সঙ্গে পুরাতন প্রথায় হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড় আজও কি করে টিঁকে আছে তা ভাবতে অদ্ভুত লাগে। এর একমাত্র প্রধান কারণ আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার অতি আস্তে এবং অতি সামান্যই হয়েছে। বর্তমানে দেশে ক্রত শিল্পের সম্প্রসারণ হচ্ছে। এখন যদি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া না হয়, তবে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু যে হস্তচালিত তাঁতশিল্প এত যুগ ধরে অবহেলিত হয়েও নিজের সত্তা বজায় রেখে এসেছে, তার অবলুপ্তি কেবলমাত্র অচিন্তানীয়ই নয়—ভয়াবহ। মিলে প্রস্তুত কাপড় দিয়ে হয়ত দেশের চাহিদা মিটানো চলবে, কিন্তু এক কোটিরও উপরে যে জনসাধারণ এই তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছে তাদের কর্ম-সংস্থানের কি উপায় হবে? সম্প্রসারিত বৃহদ্শিল্পে এই বিরাট জনতার কতটুকু অংশ নিজেদের যায়গা করতে পারবে? কাজেই এই হস্ত-চালিত তাঁতশিল্পকে আমাদের যে উপায়েই হোক বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বর্তমান অবস্থায় এই শিল্পে সরকারী সাহায্য অপরিহার্য কিন্তু কতদিন পর্যন্ত এই সাহায্য চালিয়ে যেতে হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ শুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে প্রত্যক্ষে হোক আর পরোক্ষেই হোক সাহায্য এবং সহানুভূতি দিয়ে যেতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার সম্বন্ধে এখনও মন্তব্য করা চলে না, তবে সেগুলি যে উৎসাহব্যঞ্জক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি কয়েক বৎসরে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকে মনে করা স্বাভাবিক যে উপযুক্ত সাহায্য এবং সহানুভূতি দিতে পারলে হস্তচালিত তাঁতশিল্প দেশের অর্থনীতিতে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কতকগুলি কাপড় ইদানীং এক শ্রেণীর লোকের কাছে ক্রমেই প্রিয় হয়ে উঠছে। এটা ভাব-প্রবণতা নয়—হস্তচালিত তাঁতের স্বকীয়তার ফল। হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন এবং কাটতি দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ৬·১৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন, কিন্তু গত বৎসর পর্যন্ত মাত্র ১·৫৯ কোটি টাকা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় করা হয়েছে।

কবিতা গুচ্ছ

মরুভূমি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

তব অট্টহাস্য নিয়ে পৃষ্ঠিত চলে কি তুমি ?
মরোদ্যানী আঁধার চিরাভূমি।
রক্ত লাগে তব চুম্বনে ও নাকি ?
বিষ্ণু দেয় ছায়ে উট আর উটপাখী
মরীচিকা হয়ে বিদ্রূপ করে
তব বায়ু মৌতুকী।

২

তব উৎসবে উষ্ট্র নাচি জন্মিতে নারে ঘাস,
বিকৃতিতা লভি হয় তা ক্যাকটাকাস।
তোমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া রহি,
তাদের মিশির কাহিনী রৌদ্রময়ী,
ভিন্ দৈত্য ও হক পাখীদের
শুনা যায় নিঃশ্বাস।

৩

পড়ি শেষ তব মরীচি পাথারে নাবিক 'সিন্দুবাদ',
আদালীন পায় প্রলীশের সংবাদ।
আলোময়ী তব আলোর নির্জনতা—
বিভীষিকায় কি চলে লেখা উপকথা ?
বেদুইন মন তাহাতেই পায়
অজানার আস্বাদ।

৪

প্রকাণ্ড এক কাগজ যেন প্রায়,—
পড়ে আছ তুমি,—কিছু লেখা নাই তায়।
বিস্ময়ের কি পাণ্ডুলিপি হবে ?
কোন অনাগত জাতির গৌরব
চিহ্নিত হবে তায়।

৫

সচকিতে যেন জড়ীভূত হয়ে ধরায় লভেছ স্থান,
দিগ্বিজয়ীর অপূর্ণ অভিযান।
কি দুর্দম মনের প্রচণ্ডতা !
আতিথ্যের কি অবশেষ পাতা !
রহস্যময় এই বিশালতা
কোন দানবের দান ?

৬

হয়ত আছিলে সাগর-শুকায়ে সাগর হয়েছ আজ,
বিবর্তন তো নিতি বিধাতার কাজ।
হয়তো বা ছিলে শোভনা নগরী আগে,
চাঁদনী রাত্রে সে সুখ স্বপ্ন জাগে,
আবার হয়ত বিধির আদেশে
পরিবে নূতন সাজ।

৭

তোমাতে মনের বিষণ্ণতা কি হইয়াছে রূপায়িত
আর্তনাদেতে কহিছ সকলে ভীত।
বিরণ সুদূর খর্জুর বীথিকায়।
ওষ্ঠাধর স্নেহ কি জমেছে হায় ?
তুমি চামুণ্ডা, দুষ্কর করা
তোমাকে নিরস্ত্রিত।

৮

আরেক তোমার সৃষ্টির দেওয়া, আছে প্রলয়ের দান
মহাবায়া—নাই ছায়ার উপরে টান।
সন্দেহ কর তুমি সভ্যতাকে ?
বালুকায় যেন ঢাকা দিতে চাও তাকে,
চাও বিস্মৃতি—গতির মুক্তি
সুদূরের সন্ধান।

অকাল বসন্ত

শ্রীঅনিলকুমার রায়

ঝরে গেছে সেই মেয়ে, আজ তার কাঠের পুতুল
সাজানো রয়েছে শুধু, ভাঙা ফ্ল্যাটে কাগজের ফুল !!

ধূসর ছায়ার মতো ফেলে-আসা দিন মনে পড়ে
দখিনা হাওয়ার তালে বকুলের ফুল যেন ঝরে।

আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে চেলে দিলে বিদ্যুতের কণা,
মন বলে, 'ওগো আহা আরো কাছে এসোনা এসোনা।'

শহর গড়িয়ে গেল বিকেলের মৌমাছি ফুলে,
এখনও ফিরোবে তুমি ? এসো-না একটু পথ ভুলে
পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটি। কাক ডাকা দুপুরের মতো
চমকে দু'কথা বলি চোখে চোখ মিলিয়ে সতত।

প্রত্যহের দু'টি মন পাখি হল আলাপে আলাপে
একসাথে নীড় বাঁধা জীবনের যৌবনের তাপে।

লতিয়ে লতিয়ে লতা ফুল দিলো, চমকালে তুমি,
পাখি নেই। নীড় ভাঙা !! পাখি সেন হ'ল মৌসুমী।

দু'চোখে জড়িয়ে গেল অক্লমতী নদীর সে-গান
সূর্যের আকাশ থেকে নতুন কলিকে দিলে প্রাণ।
যাত্রাপথ বাঁক নিলো। পাখি সেন জীবিকার নামে
নামলো জটিল জট পাকানো এ-শহরে ও গ্রামে।

ঝরে গেল একে একে বছরের যতো আউলতা
হঠাৎ সে পলাতক পাখি এলো নিয়ে বহু কথা।
ফুরিয়েছে পাখি সেন—মধুক্ষরা দিনের মিতালি,
টানা ভুরু চোখে আজ কাজল নেই তো – শুধু কালি।

তবুও সে মরানদী খুঁজে গেল সাগরের চর
অকাল বসন্ত ভ'রে দিলো গান ভুলের প্রহর।

এগারো বছর পরে পাখি সেন ফাউন্তলা লেনে
নীড় বাঁধে ভাটিয়ালি জীবনের ছড় টেনে টেনে।

বেদনায় পাব বলে

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

বেদনায় পাব বলে চলে যেতে হবে।
আমার আকাশ জুড়ে প্রসন্ন মমতা
কোঁটা কোঁটা করে গিয়ে তার পরে হোক
আদিগন্ত বিদ্যুৎ বিলীন নীরবতা।

আলোর অতলে এক আলোক-মুকুল
পরম দীপ্তিতে ফুটে, রিক্ত মাঠময়
ফুলের আগুন জেলে কোন প্রেরণায়
হৃদয়ে সংহত হয়, ছেয়েছে সময়।

সারাদিন উদাসীন এই প্রাণ ঘিরে
আছে কেউ মেঘছোঁয়া গানের মতন,
কতটুকু পেতে পারি—তাই ভেবে ভাঁ
নিলাম নিলাম শুধু রক্তের দহন।

মরমী হাওয়ায় কার শস্যের সুবাস
জানে না মনের পাখি, যে এমন পায় ;
প্রীতির প্রতিটি কণা মাটি থেকে তুলে
রেখে দেব নীল স্রোতে বুকের শিরায় !

বেদনায় পাব ব'লে চলে যেতে চাই,
সেও এক তীব্রতর বিপুল বেদনা—
আহত বিস্ময়ে ফিরে ডেকে নাও যদি
হয়তো তোমাকে পাবো নিজেকে পাব না।

জীবন-সম্পর্কে

প্রভাকর মাঝি

মুহূর্তে মুহূর্তে দেখি জীবনের বিচিত্র প্রকাশ
কত সুর কত গন্ধ মনের মুকুরে নিত্য ফুটে।
প্রত্যহ প্রভাতে আসি সম্ভাষণ জানাইয়া যায়—
চিরন্তন সৌন্দর্য-স্বপ্নে দেহ মন ভরিয়া উঠে।
সবুজ প্রান্তর মাঠ, অরণ্যের পুলকিত সংলাপ,
তারার স্বাক্ষর লিপি নীল ছুঁয়ে জানালার ফাঁকে।
পাখির কিরীণ সাথে কলকণ্ঠী পাখীদের গান,
সম্মোহন মন্ত্রে ভরা প্রতিদিন জীবনকে ডাকে।
দূর্বাদল, বালিহাঁড়ি, তাপদগ্ধ গৈরিক বসুন্ধরা
সবুজ ঘাসের বুকে সমুজ্জ্বল শিশিরের কণা।
ঝড়ের গর্জন কিংবা আষাঢ়ের অশান্ত বর্ষণ,
অতিক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ নিয়ে আসে নবীন ব্যঞ্জনা।
অন্ধকারে জেগে আছি—চতুর্দিকে কেহ কোথা নাই,
আমারে আশ্বাস দিতে শতভিষা ঊর্ধ্বে জেগে রয়।
ভয়াল ভ্রূকুটী নিয়া অন্ধকার চলে গেল দূরে—
দেহ মনে রোমাঞ্চিয়া উঠে এক অপূর্ব বিস্ময়।

জীবন ছড়িয়ে আছে দেশে-দেশে নগরে-কান্তারে
খনির আঁধার গর্ভে মাণিক্যের চলে আহরণ।
কোথায় কোন সে ক্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর
বিচিত্র জগৎ আর ততোধিক বিচিত্র জীবন।
জীবিকার সংগ্রামেতে জীবনের আরেক ভূমিকা।
আদিম বুভুক্ষা আর দারিদ্র্যের তীব্র দাবদাহ
যতই নির্যাসটুকু তিলে তিলে শুষে নিতে চায়
ততই জীবন দেয় মনেপ্রাণে বিদ্যুৎ-প্রবাহ।
এ কোন্ মাধুর্য আছে, জানি নাকো জীবনের মাঝে,
সহস্র আঘাতে তবু বাঁচিবার উন্মাদনা জাগে।
সূর্যের শপথ নিয়া ভগ্ন-প্রাণ যাত্রা করে সুরু
জীবনকে ধরে থাকি সতত একান্ত অনুরাগে।
দোতে-কোতে, স্নেহে-প্রেমে, দৈনন্দিন সুখে
আর দুখে,
জীবন বিচিত্র রূপে দেখা দিল পৃথিবীর বুকে।

জাগরণ

আনোয়ার হোসেন

( )

দেখিতে দেখিতে আষাঢ় গগন
মেঘে মেঘে গেলো ছেয়ে,
কি খেলা আজিকে খেলিছে দামিনী
দেখ্ দেখ্ তোরা চেয়ে'
বাজে দুন্দুভি, ঝরে ধারাজল,
কদাশীর প্রাণ মিলন উতল,
জাগে ভুঁই চাঁপা গাহিল দাদুরী
বরষা ধারায় নেয়ে।
দিকে দিকে আজ কে যায় সওজি'
স্নেহের তরণী বেয়ে!

(২

তৃষিত মাটির মিটিল পিয়াস
মরণ লভিল প্রাণ।
বনে বনে মধু মল্লার রাগে
ধারাজল গাহে গান।
সেজেছে আজিকে ধরা অনুপম;
জাগে তৃণদল কেতকী কদম,
গাহে নদী জল ছরবে উছল,
মাঠে মাঠে বহে বাণ।
চাতকের বুকে নিদাঘ যাতনা
হ'লো আজি অবসান!

(৩

গানে বেণুবন চঞ্চল বায়ে
বরষা বরণ-বাণী,
দিকে দিকে তাই জাগিল শ্যামলা
রূপসী বরষা-রাণী;
অঙ্গনে জাগে বেলা জুঁই ফুল,
বনে বনে জাগে কামিনী বকুল,
রক্ত কমল জাগিল সাজাতে
বরষার ফুল-দানি,
বলাকারা পাখে জলদের গায়
শুভ্র মালিকা খানি।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

পীতাম্বরের পিছনে পিছনে ডাক্তারবাবু খানিকটা এগিয়ে এলেন।

কেমন যেন মনে হ'চ্ছে এই চাষী যুবকটিকে। বল ছেড়ে ও এখানে দাঁড়িয়ে একলা-একলা কি করছে? কোন মানত আছে নাকি শিবের ঘরে!

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, কিরে!

যোগ দিসনি!

পীতাম্বর উত্তর দিলে না, মাথা চুলকতে লাগল।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভাল লাগে না? পছন্দ হয় না? না, তোকে ওরা কিছু বলেছে?

কিছুই না, পীতাম্বর তেমনি মাথা চুলকোয়। বলবার কথাটা যেন ভুলে গেছে হঠাৎ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, আমাকে কিছু বলবি?

এতক্ষণে পীতাম্বরের যেন খেয়াল হয়, বললো একখানা কাগজ আছে, দেখবেন দয়া করে'?

কাগজ! ডাক্তারবাবু অবাক হ'ন। কি কাগজ পীতাম্বর তাকে দেখাতে চায়!

ডাক্তারবাবু বললেন, কই, কি কাগজ দেখি।

পীতাম্বর বললে, আমার ঘরকে আসুন!

শিবতলা থেকে পীতাম্বরের চালা কতটুকুই বা পথ, ডাক্তারবাবুর মনে হ'লো কত দূর দেশ যেন ভ্রমণ ক'রছেন পরিচিত একটা চাষীর ঘরে পৌঁছতে। একটা মায়াপুরীর সন্ধানে যেন চলেছেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন। এ কোথায় আর কোথায় যেন তিনি এসে পড়েছেন। এই অতিপরিচিত সাধারণের পথটাকে যেন তিনি ঠিক খেয়াল করতে পারছেন না এই মুহূর্তে। মাথার ওপর তারা-ভরা মুক্ত আকাশটাও যেন রহস্যময়!

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর খেয়াল নেই। ডান হাতে কেরোসিনের একটা কুপি নিয়ে ভেতর থেকে পীতাম্বর এগিয়ে এল, মৃদুস্বরে ডাকলে, আসুন!

ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন। পীতাম্বরের আহ্বানটা কেমন-কেমন যেন।

কুপিটা সামনে বাড়িয়ে ধরে পীতাম্বর ডাকলে, আসুন ডাক্তারবাবু!

এর আগে যে কখনো ডাক্তারবাবু মণ্ডল পাড়ায় আসেন নি, কি তাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেননি এমন নয়, কিন্তু সেদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজকের অভিজ্ঞতার প্রভেদ অনেকখানি। উদয়পুরের মণ্ডলরা সে-মণ্ডল নেই—অনেক দীন হ'য়ে পড়েছে। বেশ মনে আছে ডাক্তারবাবুর, এই জায়গাটা জুড়ে অনেকগুলো ভিটে ছিল পর-পর, অনেক মানুষের কলহাস্যে মুখরিত ছিল স্থানটা। উদ্ধব অদ্বৈতর আত্মীয়-কুটুমে ভরে থাকতো। সবচেয়ে প্রাচীন বংশ গ্রামের এই মণ্ডলরা। হঠাৎ কেমন যেন মরে-ঝরে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে! এই পীতাম্বরে ঠেকেছে! এও যেদিন যাবে সেদিন গ্রামের প্রাণ, মানুষটি শেষ হ'বে।

দাবার ওপর 'শপ' পেতে পীতাম্বর অভ্যর্থনা ক'রে আসুন ডাক্তারবাবু, বসুন!

ভিটেটা আর চেনাই যায় না মণ্ডলদের বলে। ভেঙে-চুরে, পড়ে-ঝরে, গলে-গালে অনেক ছোট আর সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেছে।

দাবার নীচে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, না বলবো না, কি দেখবি ঐখান থেকে দেখ—

পীতাম্বর সকাতর অনুরোধ করলে, আজ্ঞে দয়া করে! দেখাচ্ছি—

পীতাম্বরের রকম সকম দেখে ডাক্তারবাবু সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠেন—ছোকরার মতলব কি? একটু বিরক্তির সুরে ডাক্তারবাবু বললেন, না না, দেখাস্‌তো দেখা!

পীতাম্বর মাথা নীচু করে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। এরপর যেন তার আর বলবার কিছু নেই, যার জন্যে এত নিরিবিলি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনা তারও আর প্রয়োজন নেই—ডাক্তারবাবুর মত লোকও যখন গরজ মনে করছেন তখন—

তাছাড়া কি দেখাবে সে? সামান্য এক টুকরো কাগজ—কি মহাভারত লাভ হ'বে! অমন কত কাগজ কোথা দিয়ে উড়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু দাবার ওপর উঠে এলেন, বিছান মাদুরটার ওপর ভাল করে বসলেন। দেখাই যাক ছেলেমানুষের খেয়ালটা! হেসে বললেন, কই এবার দেখা! তোর কি এস্‌টেট্‌ আছে—

পীতাম্বরও হাসলে। চোখ দুটো কেমন চক্‌চক করে উঠলো। খানিক চুপ করে' থেকে যেন সাহস সঞ্চয় করে' ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আরো কিছুক্ষণ পরে একটা পুঁটুলি হাতে করে বেরিয়ে এল।

পুঁটুলিটা ডাক্তারবাবুর সামনে রেখে পীতাম্বর চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। কেরোসিনের কুপির শিখাটা কাঁপতে লাগল।

ডাক্তারবাবু চোখ তুলে বললেন, ওতে কি! টাকা পয়সা কিছু নাকি!

পীতাম্বর তেমনি স্থির, গম্ভীর একটা রহস্য যেন আছে ঐ পুটুলির মধ্যে।

ডাক্তারবাবু বললেন খোল, কি আছে দেখি।

কিছুই নয়, সামান্য কতগুলো কাগজপত্র থরে থরে সযত্নে সাজান। দেখে ডাক্তারবাবু চিনলেন, দাখিলা, হাত-চিঠা তমসুক।

ডাক্তারবাবু কাগজগুলো হাতে দিয়ে নাড়লেন, নেড়ে-চেড়ে দেখলেন আলোর সামনে ধরে। যে নামগুলো দেখলেন তাদের কোনকালে চাক্ষুষ দেখেছেন বলে মনে পড়ল না ডাক্তারবাবুর। হয়তো তারা পীতাম্বরের পূর্বপুরুষ কেউ, কিন্তু একটা নাম যেন বড় পরিচিত বলে মনে হলো— জগৎমোহিনী দাসী। ঐ সঙ্গে আরো একটা নাম, জগদিন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষ।

তমসুকটা অনেকক্ষণ চোখের ওপর ধরে রইলেন ডাক্তারবাবু! চেষ্টা করলেন জগদিন্দ্র নারায়ণের সঠিক পরিচয় মনের মধ্যে বংশানুক্রমে আনা যায়, কিন্তু কে এই জগৎমোহিনী দাসী! বাবুদের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ ছিল এ তমসুকে তার টিপ ছাপের কি প্রয়োজন ছিল!

বেশ উৎসুক ভাবেই পীতাম্বর ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করে। অনেক চেষ্টা করে' যে জিনিষ সে বুঝতে পারেনি এবার ডাক্তারবাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ধরা পড়বে। অভাবনীয় কিছু একটা মিলবে! পীতাম্বর মণ্ডল যে-সে লোক নয়!

ডাক্তারবাবু বললেন, এসব পুরোন দলিলপত্র, তোর ঠাকুর্দা কি তাঁর বাবার আমলের—

পীতাম্বর উৎসুক ভাবে জিজ্ঞেস করলে, ওতে কিছু হবে না বাবু? জমি জায়গা টাকা পয়সা ফিরে পাওয়া যাবে?

অবাক হ'য়ে ডাক্তারবাবু পীতাম্বরের মুখের দিকে চাইলেন, ছোকরা বলে কি! কবেকার কাগজে কি লেখা আছে তার সূত্রে দাবীদার! হয়তো অস্বীকার কিম্বা এতকাল পরে কি তার মূল্য! কার ঋণ কে স্বীকার করবে!

ডাক্তারবাবু বললেন, তোর মথাটা একেবারে গেছে এ সব মতলব কে তোর মাথায় ঢোকাল! ঐ কাগজে কি আছে, তার হিসেব এতকাল পরে! পাগল কোথাকার।

বেশ মনক্ষুণ্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে পীতাম্বর। একটু শেষ আশা যেন তার শেষ হ'লো। সযত্ন রক্ষিত কাগজপত্রের কোন মূল্য নেই! ডাক্তারবাবু যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু নেই ওর মধ্যে!

ডাক্তারবাবু বললেন, বোকা কোথাকার, কাগজ দেখিয়ে কখনো বিষয় ফিরে পাওয়া যায়! তার বাবুদের কাছ থেকে! অমন কত কাগজ ওদের ঘরে আছে—তোরই বাপঠাকুর্দা দিয়ে এসেচে!

পীতাম্বর কি যেন বলতে চাইলে এই কাগজ সম্পর্কে, কিন্তু বলতে পারলে না। বড় আশায় সে আজ নিরাশ হ'য়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, এই জন্যে বুঝি তোকে আজকাল আর দেখা যায় না সমিতিতে! বিষয় চাস ওদের সঙ্গে যোগ দে, আন্দোলন কর,—তা নয় ঘরে বসে চৌতা কাগজ ঘাটচিস্! বোকা কোথাকার।

বুঝি এখনো বিশ্বাস হয় না পীতাম্বরের কাগজগুলো সত্যিকারের চৌতা! সরকারের আইন-আদালতে ওর কোন মূল্য নেই! বেচে দিলে ঠোঙার কাগজ বলে তবু দুচার পয়সা মিলতো!

পীতাম্বর বললে, ওর মধ্যে লেখা নেই কত বিষয় আমাদের বাবুরা নিয়েছেন—খাস্ জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল না আমাদের!

সব আছে, কিন্তু তাতে কি? লিখে পড়ে নিলে কি আর লিখে-পড়ে ফেরৎ দেবে ভেবেচিস্! তোর ঘরে কাগজ ঠিক থাকলে কি হ'বে, ওদিকে কাগজ কত বদল হ'য়ে গেছে! ডাক্তারবাবু ছেলেমানুষকে যেন বোঝাচ্ছেন।

ভাঙা চালার একলা-ঘরে বসে কি যে সোনার স্বপ্ন দেখে পীতাম্বর কে জানে। অনেকের অনেক কথাই সে বোঝে না; কিন্তু দলিলপত্রের এই সাবাস্ত কথাগুলোও কি তা বলে মিথ্যে? উদ্ধব-অদ্বৈত তারও আগে কত পুরুষ এখানে বন কেটে প্রথম বাস করেছিল—এখনো মনে আছে পীতাম্বরের ঐ বেণীকাকার সাহসের পুব দিকে তাদেরও খামার ছিল, ধান উঠতো, রমরমা কাজ করতো—ধানের গোলাও ছিল ভিনটে এই ভিটের মধ্যে! একদিন ঘুম ভেঙে উঠে যেন দেখলে পীতাম্বর সব চলে গেছে—ক্ষেত-খামার, ধানের গোলা, কিছুই নেই।

কেন নেই? অদ্বৈত হরন আধ-পাগলা, ক্ষেপাটে হ'য়ে গেছে—কি বিশ্বাস পেয়ে বিষয় সম্পত্তির! লোকে বলে, 'খালি-মকদ্দমা'···বাবুরা এসে ঢুকিয়েছিল তাদের ঘরে...মোহিনীদিদির কথা পীতাম্বর শুনেছিল···পশ্চিম-খোপের মাঠ জুড়ে ছিল তাঁর জমি। বাবুরা সব 'পাপ' করেছেন ভুলিয়ে-ভালিয়ে!

জগবন্ধুর উপদেশ মনে পড়ে পীতাম্বরের, ফেরৎ চাও—চেপে ধর! তোমাদের থেকে নিয়ে তবে তো ওদের হ'য়েছে!

কিন্তু কাগজেই গোলমাল। বিবর্ণ কাগজে আরো বিবর্ণ হয়ে গেছে তাদের দখলস্বত্ব!

দাবার নীচে এসে ডাক্তারবাবু বললেন, কাগজ দেখিয়ে কিছু হ'বে না...সবার সঙ্গে যোগ দে। আন্দোলন সফল কর!

কথাগুলো কেমন যেন অন্যমনস্কের মত বললেন ডাক্তারবাবু। প্রত্যেকের দৃঢ়তা যেন নেই। সত্যিকারের পীতাম্বরের মত যারা বঞ্চিত তাদের জন্যে যেন করবার কিছু নেই ডাক্তারবাবুর! কোথায় যেন একটা অপরাধ বোধ থেকে যায়। খুব বেশী দিনের কথা নয়, মোওলরা এ-গাঁয়ে বিশেষ সম্পন্ন ছিল...তাদেরই প্ররোচনায় সর্বস্বান্ত হয়েছে, মকদ্দমার নেশায় উচ্ছন্নে গেছে। সুদের কারবার করতো রমাপতির মেজকাকা হরিনারায়ণ—অতি সহজেই লক্ষ্মি মিলতো যাঁদের চাষা-ভুষোর। তিনি অপুত্রক ছিলেন, কালক্রমে তাঁর বন্ধিত সম্পত্তির মালিক হ'য়েছেন ডাক্তারবাবুরাই। কোথাকার জিনিষ কোথায় এসে পড়েছে।

ডাক্তারবাবু ডাকলেন, আয়, লেগে যা সবার সঙ্গে।

দাবার একটা খুঁটি ধরে কেমন যেন নিশ্চেষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকে পীতাম্বর। লাগা-লাগির মধ্যে সে নেই, মনে তার অনেক লেগেছে। বৃথাই রাত্রি জাগরণ করেছে মরা দলিল ঘেঁটে, দিনমজুর সে, তার অত নির্জন কামনা উচিত হয়নি! সুবাসিনী ঠিকই বলতো, যেমন বুদ্ধি, কাগজ ঘেঁটে খাও! বদ, ওদের

রে—

সত্যিই বুঝি ভয় করে পীতাম্বরের! তাই ভয় ভুলতে কাগজ নিয়ে ঘরের কোণে বসেছিল!

কি হয় পীতাম্বরের, তড়াক করে দাবার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে, চলুন ডাক্তারবাবু···ওরা কোথায় যেন গেছে?

ডাক্তারবাবু চমকে ওঠেন, হঠাৎ লোকটা ক্ষেপে গেল নাকি! শান্তস্বরে বললেন, কাগজগুলো তুলে রেখে আয়!

পিছন পিছন আসতে আসতে পীতাম্বর বললে, যাক উড়ে! কাগজে আর দরকার নেই!

ডাক্তারবাবু বুঝি মনে মনে খুসীই হন।

রাত নিশুতি নয় তবু কেমন যেন ভৌতিক স্তব্ধতা আজ উদয়পুরে। শোভাযাত্রার কল-নিনাদ কিছুক্ষণের জন্যে শোনা যায় না।

বাবুদের খামারের ওপর দিয়ে দুজনেই মুখ বুজিয়ে চলতে থাকে—ডাক্তারবাবু আগে আগে পীতাম্বর পিছনে-পিছনে।

খানিকটা পথ এসে পীতাম্বর জিজ্ঞেস ক'রলে, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সন্নিসী সিঁদিন বলছিল, এ আর কোম্পানীর রাজত্ব নয় তোমার ইচ্ছে মত তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবে—'সত্যেমতরং' করলেই হ'লো!

ডাক্তারবাবু বললেন, তাই নাকি? তা শুধু শুধু তুড়ি মারবার দরকার কি?

পীতাম্বর বললে, এই যে আমরা এই সব করচি কিনা!

ডাক্তারবাবু বললেন, একি আর তুড়ি মারা না, অন্যায়? তোদের ন্যায্য দাবীর জন্যে বলচিস্!

জমি-জমা কেউ জন্মের সঙ্গে নিয়ে আসে না—সেই কথা তো আমরা বলচি!

দাবী কথাটা বুঝলেও ন্যায়-অন্যায়ের কথাটা কেমন যেন বুঝতে পারে না পীতাম্বর। গোলমাল ঠেকে, একদা মালিকানার অহমিকায় লাগে।

পীতাম্বর বললে, যদি না আসবে এত বিষয় তা'লে বাবুদের কি করে' হয়? আমার কিছু নেই কেন? সবারই তো থাকে কিছু না কিছু!

প্রশ্নটা বুঝি তেমন সহজ নয়। ডাক্তারবাবু খানিক চুপ করে' থাকেন। তারপর জোর দিয়ে বললেন, সে রকম থাকা উচিত নয়! খাটবে না, খুটবে না আর জমির মালিক হ'য়ে বসে থাকবে, তা চলবে না! যারা মেহনৎ ক'রবে তারাই সত্যিকারের মালিক হ'বে জমির!

পীতাম্বর চুপ করে' থাকে। কথাটা অবিশ্বাসের নয়।

কিন্তু আশ্চর্য, এত চেঁচামেচিতে বাবুরা কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয়নি মনে হয়। ঐ তো বাবুদের বৈঠকখানা, কখন আলো নিভিয়ে দিয়ে যেযার শুয়ে পড়েছেন। ও শালারা যা পারে করুক, যত খুসী চেঁচাক বাবুদের যেমন চলছিল তেমনিই চলছে।

এক সময় বাবুদের খামার পেরিয়ে উহাদের পোড়ো ভিটেটার পাশ দিয়ে দেবদারু গাছটার সামনে এসে দুজনেই চমকে যায়। নিকটেই একটা ছায়া মূর্তি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে আশ্চর্য সাদা!

ডাক্তারবাবু বললেন, কে?

সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বরও চেঁচিয়ে উঠলো, কে। কে! কে গা?

মূর্তিটি নড়ে-চড়ে উঠলো। কাছে এসে ডাক্তারবাবু চিনতে পারলেন, বেণীমাধবের মেয়ে সুবাসিনী।

একটু বুঝি সন্দেহ হ'লো, নিজের পাড়া ছেড়ে এখানে সুবাসিনী কি ক'রতে এসেছে এই সন্ধ্যে রাতে। সন্দেহটা পীতাম্বরেরও কম নয়। সুবাসিনী দিনে দিনে যেন কেমন রহস্যময়ী হ'য়ে উঠছে। আরো গেরামে এই গণ্ডগোলের পর থেকে ওর মনে কি যেন চাঞ্চল্য অস্থিরতা! মেয়েমানুষের অত ভাল নয়! তোর কি, কে কি করলো না করলো তার খোঁজে? অনেক-দিন পীতাম্বরকে সুবাসিনী এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছে। পীতাম্বর ঠিক উত্তর দিতে পারেনি বোধ হয়, সুবাসিনী

কেমন যেন আজকাল গম্ভীর হ'য়ে গেছে। বাড়ির একটা পোষ্যের মত ব্যবহার করে তার সঙ্গে সুবাসি। মাতব্বরের মেয়ে কিনা!

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে সুবাসিনী? এদিকে!

অনেক চেষ্টা করেও জিনিষটাকে লুকতে পারে না সুবাসিনী, আঁচল-চাপা দেওয়া চালের ধামাটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

চাল! চাল কোথা থেকে আনছে সুবাসিনী? চাল সংগ্রহে ওর প্রয়োজন কি!

পীতাম্বর নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করে। সুবাসির ব্যাপার সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে!

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, চাল কোথা থেকে আনচো?

সুবাসিনী কেমন যেন ধরা পড়ে গেছে। বড় লজ্জার বিষয়। চাল ভর্তি ধামাটা কোন রকমে কাঁখে চেপে ধরে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বলবার তার কিছু নেই।

অকারণে পীতাম্বর হঠাৎ কেমন রেগে ওঠে, একটা উত্তরও দিতে নেই বুঝি। জিজ্ঞেস করছেন সেই থেকে—আচ্ছা হ'য়েছে সব!

সুবাসিনী নীচু স্বরে বললে, কাকীমা ফেরৎ দিলেন!

ডাক্তারবাবু বললেন, কে?

পীতাম্বর বললে, স্পষ্ট করে কথা বলা যায় না। যেমন হ'য়েছে সব।

আরো নীচু করে সুবাসিনী বললে, ইন্দু কাকীমা নিলেন না! আমি তো কোন কিছু ভেবে চাইনি তাঁর কাছে—

কেমন যেন ধরা-ধরা মনে হয় সুবাসিনীর গলাটা। সব ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে যায় ডাক্তারের কাছে। হয়তো তিনি জানতেন, হয়তো তিনি জানতেন না—সংসারে বাড়ন্তের কথাটা। ইন্দুমতীর গৃহিণীপনায় মর্যাদা তিনি সব সময় রাখতে পারেন না। ডাক্তারীতে কিছুই অর্থাগম হয় না—ধোটা করে' কারো কাছে একটি পয়সাও তিনি নিতে পারেন না। ইন্দুমতী কত অভিযোগ করেছেন, কত কটু বলেছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি! ডাক্তারবাবু সেই এক কথা বলেছেন স্ত্রীকে, কার কাছ থেকে পয়সা নেব? ওরা দেবে কোত্থেকে? রেগে ইন্দুমতী বলেছেন, যারা দিতে পারে তাদের কাছ থেকে নিও।

ডাক্তারবাবু নির্বিকার কণ্ঠে বলেছেন, যারা দিতে পারে তারা আমাকে ডাকে না!

ধিক্কার দিয়ে ইন্দুমতী বলেছেন, ডাক্তার।

ডাক্তারবাবু হেসেছেন। ডাক্তার তিনি ভাল নন অর্থবানদের কাছে। কিন্তু যাদের তিনি ডাক্তার তাদের কাছে যশ তাঁর বুঝি অফুরন্ত। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর খ্যাতি!

সহজ সুরে ডাক্তারবাবু ডাকলেন, আয় আমার সঙ্গে, দেখি তোর কাকী কেমন না নেয়! ফিরিয়ে দিয়েছে!

সুবাসিনী তেমনি আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেবে পেল না সে এর পরে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে' তার যাওয়া উচিত হ'বে কি না। ইন্দুকাকীমা স্পষ্টই বলেছেন, চাল! ফিরিয়ে নিয়ে যা তুই সুবাসি! বুঝুক বাইরে হুজুক করে' বেড়ালে এতগুলো লোকের পেট ভরে না! তোরা দিতে যাবি কেন?

আরো কি যেন বলেছেন ইন্দুমতী রাগের মাথায়! সে-সব কথা কোনদিন ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে তারা ভাবেওনি। একটা ভুল সুবাসিনী করেছে, ইন্দুমতীর জেরায় কিছুতে বলতে পারেনি চালের ব্যবস্থা ডাক্তার-বাবু নিজে করে' গেছেন। তাকে বয়ে আনবার ভার দিয়েছেন।

ফিরে এসে কথাটা মনে পড়েছে সুবাসিনীর। কিন্তু এখন ফিরে গেলে সেটার আর জোর থাকবে না তেমন। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য আরো বাড়বে!

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন,

কাকীমা খুব বকেছে বুঝি!

কচি মেয়েটির মত মাথা নাড়ল সুবাসিনী।

ডাক্তারবাবু বললেন, একটু বুঝে-সুঝে যেতে হয়। হ্যাঁরে, তোকে কে খবর দিয়েছিল তোর কাকীর ওষুধে ঢাল নেই?

সুবাসিনী চুপ করে' রইল, সত্যি এ খবরদারি তার উচিত হয়নি। সম্মান ছাড়াও আর কিছু যদি তেবে থাকেন ইন্দুমতী বুঝি অন্যায় করেন নি। সুবাসিনীর অত মাথা ব্যথায় দরকার কি! চাষার মেয়ের স্পর্ধা কম নয়।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে হঠাৎ সুবাসিনী ফুঁপিয়ে ওঠে। ডাক্তারবাবু মুস্কিলে পড়েন। হঠাৎ পথের মাঝখানে একি আরম্ভ করলে সুবাসিনী। কান্নাকাটির কি আছে এতে?

"ফিরিয়ে নিয়ে যা! কে তোকে আনতে বলেচে?

সব ভলানীপনা। সমিতি হ'চ্ছে!" ইন্দুমতীর কথাগুলো ছুরির মত কানে বাজছে সুবাসিনীর। কি ভলানীপনা সে করেছে এর মধ্যে?

বিনুত ডাক্তারবাবু বললেন, কি মুসকিল, শুধু শুধু কাঁদিস্ কেন?

সত্যিকারের কারণটা বুঝি সুবাসিনীও জানে না। রোকার মত ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢাল নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু কে তার? চোখ মুছে সাহস করে সুবাসিনী ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল—ঘরে লোকটা বড় অসহায়। ইন্দুকাকীমা বড় অবহেলা, অশ্রদ্ধা করে। সুবাসিনী চায়—

না, না, কিছু চায় না সুবাসিনী। এতবড় স্পর্ধা তার হ'বে না। ঠিক করেছেন ইন্দুমতী তার অর্ঘ্যকে প্রত্যাখ্যান করে। ধরা পড়ে গেছে সুবাসিনী।

ডাক্তারবাবুও চেয়ে রইলেন অবাক হ'য়ে। লক্ষ্য বিশেষ না ক'রলেও, বুঝতে পারেন ক'দিন সুবাসিনীর চাল-চলনটা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির মনে কি আছে কে জানে—শুধু কৃষক আন্দোলনের সফলতা বুঝি ওর কাম্য নয়।

কঠিন স্বরে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, কি চাস তুই?—

কিছু না, কিছু না। স্পষ্ট কথা ব'লতে পারে না সুবাসিনী। চোখ দুটো নামিয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর পাশ কাটিয়ে বাবুদের খামারের পথটা ধরে হাঁটতে সুরু করে সে। ছি ছি, কি ভাবলেন তাকে ডাক্তারবাবু।

চোখে যেন কি সব দেখছিলেন এতক্ষণ ডাক্তারবাবু! অকারণে কি ভেবে অতটা রুক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তিনি? ইন্দুমতীর মিথ্যা মর্যাদাকে সেই তো প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিলেন।—তাঁর সন্দেহকেই প্রকট করলেন। সামান্য সরল চাষার মেয়ের মনে এতটা আঘাত দেওয়া তাঁর ঠিক হয়নি। সহজ ভালবাসার দানকে এমনি করে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয়নি।

খানিক স্তব্ধ হ'য়ে পথের ওপর ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে যেন শুনতে পেলেন শোভাযাত্রাটা ধারে-কাছে কোথায় জয়ধ্বনি দিচ্ছে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'লো, পীতাম্বর অনেক আগেই চলে গেছে তাঁকে একলা ফেলে।

মনে মনে ডাক্তারবাবু হেসে উঠলেন।

[ক্রমশঃ]

সমাজ ও জাতীয়জীবন

[র. কু. সে.]

আমাদের সমাজ-জীবনে আজ একটি জিনিষ নিছক ষ্টাইলে রূপান্তরিত হ'য়েছে। সেটি হ'চ্ছে হাত-ঘড়ি বা রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌। বিশেষ ক'রে যুবক সমাজের এটি প্রিয়বস্তু। যুবক সমাজের আন্তরিক প্রীতি ও পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলে হাত-ঘড়ির প্রচলন সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। 'ঘুর্জোয়া শ্রেণী' থেকে সুরু ক'রে নিম্নতম 'মিনিয়াল ক্লাস' পর্যন্ত আজ হাতঘড়ির যত প্রচলন—তার প্রধান উদ্যোক্তা যুবক সমাজ।

আসলে রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌ বা হাত-ঘড়ির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ভারতের ইংরেজ আমলে এ জিনিষটির প্রসার ঘটে। ইংরেজের দেখাদেখি ভারতবাসী যেমন 'নেক-টাই' পরতে শিখ্‌লো, তেম্‌নি শিখ্‌লো হাতের কব্জিতে রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌ ব্যবহার ক'র্‌তে। 'নেক্‌-টাই' ইংরেজি পোষাকের সমৃদ্ধি বাড়ালেও রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌ কিন্তু ভারতবাসীর জীবনকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারলো না।

অথচ ইংরেজের কিন্তু ঘড়ি না হলে চলে না। ইংরেজ হ'চ্ছে কাজের জাত; কাজ ক'রতে হ'লে সময়ের নিয়মানুবর্তিতা অত্যাবশ্যক। মিছেমিছি কোথাও সময় নষ্ট ক'রতে তারা রাজি নয়। এই স্বভাবই তাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক চরিত্রের সৃষ্টি ক'রেছে। ভারতবাসীর স্বভাব কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো। ঘড়ি তাদের জীবনে অত্যাবশ্যক; ধরমুখো ভারতবাসীর মনের মধ্যে বাজে বাউলের একতারা, তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট কাল নেই। মহাকালের পথিক ভারতবাসী। সময়ের বন্ধনে তাই মানুষের সঙ্গে তার যোগ নয়, তার যোগ আত্মলীলায়; ফলে সময়ের নিয়মানুবর্তিতার চাইতে একটানা অলস বৈঠকে তার আনন্দ। এই আনন্দ নিয়েই এতকাল ভারতবাসী কাটিয়েছে। ঘড়ি ব্যবহার ক'রতে শিখেছে সে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে। আদালতে আর স্কুল-কলেজে ঘড়ির প্রয়োজনীতা বাড়লো। সেই সঙ্গে 'attendance' বা 'হাজিরা' সম্পর্কেও মানুষের চেতনা বৃদ্ধি পেলো।

এই বাড্‌তির মুখে চ'লতে-চ'লতে ক্রমে এমন একটা সময় এলো—যখন সময়-নিরূপণের কাজকে ছাড়িয়েও ঘড়ির প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়লো আর্টের তাগিদে। আংটি যেমন আঙুলের শোভা বাড়ায়, সুশোভিত ব্যাণ্ড্‌যুক্ত উৎকৃষ্ট ঘড়ি তেম্‌নি হাতের কব্জিকে রূপময় ক'রে তোলে, অনেকটা মেয়েদের অলঙ্কারের মতো। কিন্তু লক্ষ্য ক'রবার বিষয় এই যে, বাইরে তাঁরা সাহেবিয়ানাকে পুরোপুরি বজায় রাখতে গিয়ে ভিতরের স্বদেশীয়ানাকে অস্বীকার ক'রতে পারলেন না। ফলে হাতের ঘড়ি তাঁদের সময়ের নিয়মানুবর্তিতাকে অনুসরণ না ক'রে গ্রহণ ক'রলো আর্টের গুলস্ত ধর্মকে। জন্ম নিল ষ্টাইল। আসলে ষ্টাইলের মোহ একটি রোগ। এ রোগের যে কুফল—তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা গেছে। কোনো পিতার হয়ত অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই, ভারগ্রস্ত বিপুল পরিবারের বোঝা মাথায় নিয়ে উদয়াস্ত তাঁকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রতে হ'চ্ছে; তাঁর জীবনে হাত-ঘড়ির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও অর্থাভাবে তা ব্যবহার ক'রে উঠ্‌তে পারছেন অথচ দেখা গেল—পিতার সেই উদয়াস্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থের সুযোগ নিয়ে কলেজে-পড়া ছেলে তাঁর হাত-ঘড়ির আর্ট বজায় রেখে সমাজের একটা বিশেষ স্তরে ষ্টাইল-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'য়ে আত্মশ্লাঘা বোধ ক'রছেন। এমন উদাহরণ পাঠকের কাছে একেবারে

চর।

দিক ছ'চ্ছে—আমরা সঙ্গে
Engagement রক্ষা ক'রতে গিয়েও সময়ের নিয়মানুবর্তিতাকে পুরোপুরি অস্বীকার ক'রেই চলি। এইভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিক অদ্যাবধি একেবারে পিছিয়ে আছে। জাতীয় জীবনের এটা একটা বড় কলঙ্ক। বাংলার শিক্ষিত যুবকসমাজকে এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে এ সম্পর্কে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সময় সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে আমরা যদি যথা সময়ে যথাকর্তব্য কর্মগুলি সংসাধিত করতে পারি, তবে আমাদের একটি মানুষের দ্বারা একই দিনে বহুতর কাজ সাধিত হ'তে পারে। সমাজ ও জাতির উন্নতির দিক দিয়ে প্রধান কাজ। আজকের কর্মমুখী ভারতবাসীর জীবনে এবিষয়ে চিন্তা ও চর্চা করবার সময় এসেছে।

সতীন সেন

অকাল্ত, অপরাজেয় বিপ্লবী ও জননেতা শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনের দেহাবসানের সংবাদ যেমন আকস্মিক তেমনই মর্মন্তুদ। সমগ্র বাংলাদেশ (পূর্ব ও পশ্চিম) এ ঘটনায় অভিভূত হয়েছে। এবং সম্ভবতঃ শুধু বাংলাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের অন্যতম হিসাবে সতীন সেন সমগ্র ভারতেই অল্পাধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু এই উপমহাদেশের সকলেরই পক্ষে একটা শোকাবহ ঘটনা।

বিমানযোগে মনে আজ আমরা স্মরণ করছি তাঁর জীবন কাহিনী। সহকর্মীদের অন্য সকলের মত তাঁরও জীবনের অধিকাংশ কেটেছে বন্দীশালায়, অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাকৃত অনশনের মধ্যে। কিন্তু তাঁর অসহ্য মানসিক শক্তি ও অসাধারণ সাহস কোন আঘাত কোন বিপদ কোন দুঃখেই কোনদিন স্তিমিত হয় নি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অপরাজেয় থেকে গেছেন, অনির্বাণ থেকেছে তাঁর দেশপ্রীতি। এই দেশপ্রীতির বলেই তিনি পূর্ব বাংলায় নিষ্পেষিত, অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শক্তি ও সহিষ্ণুতার উৎস হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপর নির্ভর করে অগণিত মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যেও অন্তও বাস্তু ত্যাগ করে নি। সে নির্ভরতার কোন ব্যবহারিক মূল্য ছিল কিনা সে অন্য কথা, কিন্তু আজ সে নির্ভরতাও তারা হারালো, এটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক।

বিপ্লবীর পক্ষে মৃত্যুর মধ্যে মর্মান্তিকতা কিছু নেই। বরং সারা জীবন বার বার স্পর্দ্ধিত দুঃসাহসে মৃত্যুকে তিনি আহ্বান করেছেন, সংগ্রামরত অবস্থায় মৃত্যুই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিন্তু সাধারণ জনচিত্ত এ কথায় সান্ত্বনা পায় না। শ্রদ্ধেয় নির্ভরযোগ্য জননেতার চরম সান্নিধ্যকে শোকান্তিভূত করবেই। বিশেষ ভাবে যে অবস্থার মধ্যে সতীন সেনের মৃত্যু হয়েছে তা স্মরণ করেই শোকের

স্বর্গত সতীন্দ্র নাথ সেন

আঘাত তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, পাবনা জেলে থাকতেই তাঁর অসুস্থতা তাঁর চিকিৎসকগণকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অবশেষে তাঁকে ঢাকা জেলে আনা হয়, সেখানের কর্তৃপক্ষও তাঁকে দুই তিন দিনের ভিতরেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানেও

তিনি দশ বার দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালেও তাঁর অসুস্থতার সংবাদ বাইরে কাউকে দেওয়া হয় নি, এবং বন্ধু বান্ধব কেউ তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার সুযোগ পান নি। যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মনে হয়, তাঁর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার কোনো সুব্যবস্থা হয় নাই, যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত পথ্যও পান নাই। এতে সমস্ত দেশের জনচিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানী সরকার এ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন তাতে নামুলি দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই। বস্তুতঃ এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে সন্দেহ বরং দৃঢ়তর হয় যে সতীন বাবুর অসুস্থতার ব্যাপারটা আগাগোড়াই অত্যন্ত গুরুহীনতার সঙ্গে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে অবিলম্বে নির্ভরযোগ্য তদন্ত হওয়া উচিত। যদি পাকিস্তানের সরকারী ঔদাসীন্য বা সরকারী কর্মচারীদের শৈথিল্য বা নির্মমতার ফলে এই মৃত্যু সংঘটিত হয়ে থাকে, যেন এই অমর প্রাণের আত্মাহুতিতেই সেই কদর্যতার চির অবসান হয়।

শিল্পপতিদের পরিকল্পনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এক খসড়া পেশ করেছেন। পরিকল্পনার সকল দিক খুব বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও এ খসড়ার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ অনুমান করা যায় যে, আগামী পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক বিন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি মূল বিষয়ে এই খসড়া রচয়িতাদের সঙ্গে ভারত সরকারের মতৈক্য আছে। যথা, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা; দ্বিতীয় পরিকল্পনা, খসড়া রচয়িতাদের মতে হওয়া উচিত শিল্প ও চলাচল পরিকল্পনা। সম্ভবতঃ জাতীয় পরিকল্পনা সংসদেরও এই-ই অভিপ্রায়। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় শিল্পপতিরা জাতীয় সরকারের সঙ্গে একটা আংশিক অসহযোগের ভাব আজো পর্যন্ত বজায় রেখেছেন। সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ করে শিল্প বাণিজ্য চালানো যায় না, সুতরাং কার্যতঃ মোটামুটি রকম সহযোগ তাঁদের করতেই হয়েছে। কিন্তু সরকারের শিল্পনীতির প্রতি তাঁদের নিরন্তর সমালোচনাপূর্ণ বিরূপ মনোভাব কারো দৃষ্টি এড়ায় নি। বরং এ বিরূপতা সংবিধান সংশোধনের সাম্প্রতিক প্রস্তাব উপলক্ষে আরো প্রকটতর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পপতিদের পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রচনা করতে উদ্যোগী হওয়া বিশেষ অর্থপূর্ণ। এ উদ্যোগ তাঁদের বিগত কয় বৎসরের যুক্তিহীন অসহযোগের অবসান সূচিত করেছে কিনা তা অবশ্য এখনও নিঃসংশয়ে বলার সময় আসে নি, কিন্তু এটা নিশ্চয় যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অরাজকতার পরিবর্তে সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। জনসাধারণের পক্ষে এটা আশার কথা।

নির্মাণায়ন ও চলাচল ব্যবস্থা (Transport)

এই পরিকল্পনার মোট কথা হচ্ছে আগামী পাঁচ বছরে ৭২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, তার মধ্যে বৃহৎ শিল্পের জন্য ২০০০ কোটি এবং চলাচল ব্যবস্থার (রেল প্রভৃতির) জন্য ২০৭৫ কোটি টাকা ধার্য হবে। উন্নয়ন ব্যবস্থার ফলে আভ্যন্তরীণ সম্পদ যা বৃদ্ধি পাবে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৬২০০ কোটি টাকা এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আয়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ প্রতিবৎসর মূলধনে পরিণত করা সম্ভব হবে ইত্যাদি। দৃশ্যতঃ এই চিত্র বেশ সন্তোষজনক। কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় আছে যা আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অবশ্য ফেডারেশনের এই পরিকল্পনার বিশদরূপ এখনও আঁকা হয় নি, এবং হলেও পরিকল্পনা সংসদ তাকেই পুরোপুরি গ্রহণ করবেন তাও বলা যায় না। তবে পরিকল্পনা সংসদের ওপরে ফেডারেশনের এই প্রস্তাবের কিছু প্রভাব পড়বেই। সেইজন্য ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে দুই একটি বিষয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে এখনই আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, চলতি পরিকল্পনা অনুসারে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তার ওপর আরো দু' হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের যে প্রস্তাব তার অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রস্তাবকরা বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বহুলতর বিস্তারের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক সব সমস্যার সমাধান দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের বিশ্বাস এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের বৃহৎ এক অংশের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। অবশ্য ফেডারেশান বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মতে বৃহৎ শিল্পের বিস্তার অনিবার্য ভাবেই দেশের সামগ্রিক শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের সহায়ক। তাঁদের হিসাব অনুসারে বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে অন্ততঃ আরো সাতটি লোক সেই শিল্পের পুষ্টিকারক কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকে। সুতরাং ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত এই যে বৃহৎ শিল্পের প্রসার যত হবে বেকার সমস্যাও ততই সমাধানের পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্বজন সমর্থিত নয়। এর বিপরীতটাই বরং যুক্তিসহ। র‍্যাশনালাইজেশান যত বেড়ে চলবে, বেকারের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাবে, বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই। যে দেশে ইতিমধ্যেই প্রায় দেড় কোটি লোক বেকার, সে দেশে বৃহৎ যন্ত্রের আরো বিস্তারের জন্য টাকা খরচ করার আগে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সাম্প্রতিক একটি উক্তি থেকে আশা হয় যে সরকার এ বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন। তিনি বলেছিলেন 'আমাদের এখন power এর (বৈদ্যুতিক শক্তির) চেয়ে man powerএর (জনশক্তির) দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

কুটির শিল্প—

দ্বিতীয়তঃ, এই জনশক্তি ছড়িয়ে আছে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামই বেকারের ভারে পীড়িত। ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য পাঁচ বৎসরে মাত্র ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করলেই যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। আগামী পাঁচ বৎসরে দেশের লোক-বৃদ্ধি সাধারণ ভাবে ধরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। আলোচ্য সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আরো কয়েক লক্ষ বেকারের আগমন অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নয়। কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পে এত লোকের নিয়োগ সম্ভব নয়। তা ছাড়া পল্লীবাসীদের বিশেষতঃ চাষীদের আংশিক বেকারির কথাটাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সে ব্যবস্থা দ্বারা পল্লী-বাসীরা যে যেখানে আছে সেইখানে থেকেই কোন-না-কোন প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত হ'তে পারে—সেটাই হবে সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পন্থা। এরকম ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কুটির শিল্পের বিস্তার। কিন্তু যে পরিমাণ হলে এই দেশজোড়া বেকারি ও দারিদ্র্য ঘুচতে পারে সেটা বৎসরে মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে না। এ দিক থেকেও ফেডারেশনের প্রস্তাবকে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

চলাচল ব্যবস্থা—

তৃতীয়তঃ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কত টাকা ব্যয় করা উচিত, সেটা নির্ভর করছে এ ব্যবস্থার কি পরিমাণ উন্নতি আপাততঃ আমাদের প্রয়োজন তার ওপর এবং এই শেষোক্ত প্রয়োজন নির্ভর করছে শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের মোট পরিমাণের ওপর, একমাত্র শিল্পজাত পণ্যের পরিমাণের ওপর নয়। গত তিনচার বৎসরে কৃষির কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যতটা উন্নতি সরকারি বিবৃতিতে দাবী করা হয়, ততটা হয় নি। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে উন্নতির প্রচেষ্টা যে কোন সময় অল্পাধিক বিপর্যস্ত হতে পারে। মোটের ওপর কৃষিজাত পণ্যের পরিমাণ যদি ক্রমশঃ না বেড়ে চলে তবে নিছক শিল্পজাত পণ্যের দিকে চেয়ে চলাচল ব্যবস্থার (যথা রেল লাইন, ওয়াগন প্রভৃতি) এক তরফা উন্নতি অর্থ-নৈতিক দিক থেকে সমীচীন হবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান চলাচল ব্যবস্থায় কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে একটা মোটামুটি রকম ভারসাম্য আছে। শুধু বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের প্রয়োজনে রেলের ব্যয় বাড়িয়ে দিলেই সেটা সম্ভব হবে না।

বস্তুতঃ যে কোন দেশের চলাচল ব্যবস্থা সেই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এ পর্যন্ত কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের চলাচল নীতি প্রধানতঃ নিরূপিত হয়েছে কৃষিজাত পণ্যের দ্বারা। বৃহৎ-শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রেলবিভাগে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার প্রধানতম হচ্ছে এই: অধিকতরভাবে হয়ে কি ক'রে কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের চলাচলে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। উভয়ের চলাচল অবাধে নিষ্পন্ন করা যায়! দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়,—বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের প্রয়োজনে আগামী তিন বছরের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকার মাল গাড়ী খরিদ করা রেল বিভাগের পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি যদি সমতালে না হয়, তবে অসম্ভব হবে এই সমস্ত মাল গাড়ীকে চলা ও ফেরা দুই সময়েই কাজে নিযুক্ত রাখা। সুতরাং শুধু মালগাড়ী বাড়াবার জন্য এমন বে-পরোয়া টাকা খরচ না ক'রে, টাকা অন্য দিকে খরচ করা উচিত।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পল্লী শিল্পের উন্নয়ন যদি আগামী পরিকল্পনার প্রধান অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে গতানুগতিক চলাচল ব্যবস্থারও একটা বিশেষ পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। পোর্ট থেকে কারখানা এবং কারখানা থেকে পোর্ট—কৃষিপণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানীর প্রয়োজনে আমাদের চলাচল ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে যে ধারা নিয়েছিল —তাকে বদলে বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের মধ্যেই দ্রুততর গতাগতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। সুতরাং চলাচল ব্যবস্থার ঠিক কোন্ বিশেষ খাতে অতঃপর বেশী টাকা খরচ করা দরকার সেটা সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করতে হবে, শুধু বৃহৎ-শিল্পের প্রয়োজনে নয়।

অবশ্য এসব সত্ত্বেও একথা বিনা তর্কে মেনে নেওয়া যায় যে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, এবং বৃহৎ যন্ত্র শিল্পেরও প্রসার বন্ধ হলে চলবে না। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিছক শিল্প ও চলাচল পরিকল্পনাই নামান্তর মাত্র হবে, কি, ভিন্ন বিশ্লেষণের একটা যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষা তার মাধ্যমে করার ব্যবস্থা হবে সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র—

লোকসভার সদস্য ডাঃ লক্ষ্মীসুন্দরমের সভাপতিত্বে আম্বালায় ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবীদারদের এক অধিবেশন হয়ে গেল। এই অধিবেশনে সভাপতি নিজে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন, সীমানা কমিশনের সদস্যদের তৎপরতা সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহের কথা গোপন করেন নি, এবং অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যদি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনে আর অযথা বিলম্ব করা হয়, তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ভাষাভিত্তিক নাটকের এই একটি দৃশ্য।

দৃশ্যান্তরে দেখা যাচ্ছে বিহারে, আসামে এবং অন্যান্যস্থানে ভাষাভিত্তিক দাবীদারদের নানাপ্রকার ভাগ্য-বিপর্যয়। চাকুরিজীবীদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে, দোকানপাটের ওপর অল্পবিস্তর হানাদারি কাণ্ড চলেছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে চলার হুমকি শোনা যাচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে নানা রকম আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা চলছে! বিহারের কোন উচ্চ-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারিকে হাতে হাতকড়ি এবং কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে হাজির করা হয়েছে। আরো কঠোর বিড়ম্বনা আরো অনেকের জন্য অপেক্ষা করছে এটা বলাই বাহুল্য। কার্যতঃ, আম্বালা অধিবেশনের পূর্বেই অপর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

এই চতুরঙ্গ প্রহসনের তৃতীয় অঙ্কে আছেন সীমানা কমিশনের সদস্যগণ। তাঁরা বহুদর্শী, বুদ্ধিমান, নিপুণ রাজনীতিক। তাঁরা বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করছেন, স্থানীয় লোকের মতামত শুনছেন এবং জনতার demonstration দেখছেন। সংবাদে প্রকাশ সীমানা কমিশনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কোন কোন অঞ্চলে পনেরো লক্ষ জনতা সমবেত হয়েছিল। কিন্তু

তা: কুলকর্ণি বা অন্য কোন সদস্য কোথাও এই জন-সমাবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নি। গণতন্ত্রে মতপ্রকাশের অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। কিন্তু শ্রীনেহেরুর মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য তাঁর সম্মুখে পনেরো লক্ষ লোক সমবেত হওয়া, আর অল্পকাল বিশেষ এ রাষ্ট্রে থাকবে কি অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, এ রকম তীব্র বিতর্কমূলক ব্যাপারে মতামত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে লাঠি সোটা নিয়ে পরস্পরের প্রতি গভীর বিদ্বেষাত্মক ধ্বনি করতে-করতে লক্ষাধিক লোকের একস্থানে সমবেত হওয়া—এ দুয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, যা কোন গণতান্ত্রিক নীতির দোহাই দিয়েই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, একথা স্পষ্টতঃই সীমানা কমিশনের বিচক্ষণ রাজনীতিকরা স্বীকার করছেন না। কিন্তু নদীস্রোতের মত ঘটনা-স্রোতেরও একটা গতি আছে, এবং সে গতি কারো স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। লাঠি-সোটা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় যে বিষের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়েছে, তার ক্রিয়াও প্রত্যক্ষ হচ্ছে এবং হবে।

চতুরঙ্গ প্রহসনের চতুর্থ অঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার—এই সর্বনাশা বিষক্রিয়ায় নীরব, নিষ্ক্রিয় দর্শক। বাঙ্গালায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকীর পিছে আছেন রাজনীতিক (politician)। মূল সেক্রেটারীকে আদালতে বয়ে আনার পিছেও আছেন রাজনীতিক। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা উচিত ছিল অন্ততঃ একজনও রাষ্ট্রনায়ক (Statesman), কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও আছেন নিছক রাজনীতিকরা। যদি প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক কেউ একজনও থাকতেন, তবে 'ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র'—অর্থাৎ ভারতের দুরভিলাষী মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের চাকুরিগত হানাহানিকে একটা দেশজোড়া আত্মঘাতী গণ-আন্দোলনের রূপে তাঁরা উঠতে দিতেন না।

অবশ্য এখন আর তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। সীমানা কমিশন তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন। আশা করা যায় সংবিধান রচনার সময় সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা যেমন উপেক্ষা করা হয়েছে, সীমানা কমিশনের হাতে তার পুনরাবৃত্তি হবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা বাস্তব সমস্যা। নিছক অস্বীকৃতির দ্বারা এর সমাধান হয় না। তাছাড়া এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই রয়েছে, তাও নয়; আমেরিকা, ধর্ম বা সংস্কৃতিগত সংখ্যালঘিষ্ঠ সব দেশেই অল্পবিস্তর আছে এবং তাদের সমস্যাও আছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন গণতান্ত্রিক পথে এই সমস্যার যে সমাধান করেছে, অনেকের মতে সেটাই শ্রেষ্ঠতম সমাধান। আশা করা যায় যে সীমানা কমিশনের সদস্যগণ এ পন্থার সঙ্গে পরিচিত, এবং তাঁদের প্রস্তাবিত সমাধান সকলের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

কিন্তু আপাততঃ বিশেষ একটি সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, যার দিকে ভারতসরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণের অংশবিশেষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বেপরোয়া গুণ্ডামী। সীমানা কমিশনের সফরের সময় বিহারের স্থানে স্থানে যা হয়েছিল, সেটাই যথেষ্ট নিন্দনীয়। সম্প্রতি আসামের বিভিন্ন স্থানে যা চলেছে তা বিহারের ঘটনাকেও ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়। আমরা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এই সব গুণ্ডামী দমনের প্রশ্ন বার-বার সংবিধানগত আইনের প্রশ্নের তলায় চাপা পড়ে গেছে। যারা অত্যাচরিত হচ্ছে তারা সর্বাগ্রে ভারতীয় নাগরিক একথা যদি সত্য হয় তবে তারা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবে যে ভারতে এমন কোন কর্তৃপক্ষ আছেন যাঁদের মনোযোগের ফলে এই অরাজকতা দমিত হতে পারে। এ প্রত্যাশা উপেক্ষা করে সংবিধানের দোহাই দিতে থাকলে সংবিধানের প্রতি জনসাধারণের আস্থা রক্ষা করা দুষ্কর হবে।

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বৈতি—

সভাপতি নির্বাচিত হবার পর থেকেই শ্রীদেবর অক্লান্তভাবে চেষ্টা করছেন কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা

বৃদ্ধির জন্য। বিগত আবাদি অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মলিনতা দুর্নীতি প্রভৃতি দূরীভূত করা হবে। তারপর থেকেই শ্রীদেবর অবিশ্রান্ত ঘুরছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের মালদহ অধিবেশনেও তাঁর উদাত্ত আহ্বান আবার ধ্বনিত হয়েছে—'দরিদ্র ভারতবাসীর সেবার চেয়ে মহত্তর সম্মান আর কিছু নেই।' তাঁর এই শ্রান্তিহীন প্রচেষ্টার জন্য কংগ্রেস সভাপতি দেশের জনসাধারণের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করছেন। কিন্তু তাঁর আহ্বানে দেশের তরুণচিত্ত কি ভাবে সাড়া দেয় সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

কংগ্রেসের অতীত গৌরবময় তার বর্তমানও কম গৌরবের নয়। কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন ভার। এবং এ দায়িত্ব সে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে গত কয় বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত জিনিষের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। দেশের তরুণদলের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন অনেকে আছেন যাঁরা দেশের সেবাকেই মহত্তম সম্মান বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই তরুণ দলকে কংগ্রেস আগের মত আজ আর আকর্ষণ করতে পারছে না। কেন? —এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আজ কিছু আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে।

সমষ্টিগত আত্মবিশ্লেষণ ছাড়াও আরো একটি কাজ আছে। আজ কংগ্রেসের হাতে সবচেয়ে বড় কাজ দেশকে গড়ে তোলার কাজ—দেশের জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে সচেতন হতে শেখানো। এটা প্রধানতঃ মানসিক প্রস্তুতির কাজ হলেও এ কর্মপ্রচেষ্টার একটা প্রতিষ্ঠানগত রূপ থাকতে বাধ্য, সুতরাং এ কাজের পরিমাণ নির্দেশ করাও খুব অসম্ভব নয়। সভাপতি হিসাবে শ্রীদেবের অনুসন্ধান করতে পারেন কোন্ রাষ্ট্রে গঠনমূলক কাজ কি পরিমাণ অগ্রসর হচ্ছে, কোন্ রাষ্ট্রের কংগ্রেস কতগুলি কর্মীকে এই গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করেছে। যদি কোন রাষ্ট্রের কংগ্রেস একাজে বেশী অগ্রসর না হয়ে থাকে, তার হেতু কি? দ্বিতীয়তঃ শ্রীদেবের অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন বহুস্থানে এমন অনেক কর্মী আছেন যাঁরা কংগ্রেসের এই গঠনমূলক কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত অথবা এ প্রতিষ্ঠানে তাঁদের প্রবেশ পথ ভিতর থেকে বন্ধ। অপরপক্ষে এই সব রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে এমন বহুলোক আছেন যাঁরা নেতৃস্থানীয় হয়েও বার বার প্রকাশ্যে কংগ্রেস নীতির বিরোধী কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন।

এই সবের কোন প্রতিকার আছে কি না, অথবা থাকলে সে প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কি না—সে কথা কংগ্রেস সভাপতির ঘোষণা করা উচিত। যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের অন্তর্শোধনের সার্থক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হচ্ছে, ততদিন আন্তরিকতাসম্পন্ন সেবাপরায়ণ নূতন কর্মী পাওয়া শ্রীদেবরের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

'মন্দিরা'র নিয়মাবলী

১ মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ'তে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা বার্ষিক সডাক দাম ছয় টাকা। ষাণ্মাসিক তিন টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া যায়, বৈশাখে বা কার্তিকে। অন্য কোন সময়ে গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কার্তিক থেকে বৎসর সুরু হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে জানাবেন। পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেবেন। 'মন্দিরা' প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময় মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের রিপোর্ট সহ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের জানাবেন।

লেখকদের প্রতি

স্বচ্ছলস্তর নতুন বানান ব্যবহার করবেন। নকল রেখে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। নাম ও ঠিকানা না দেওয়া থাকলে কোন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

বিজ্ঞাপনের হার : মাসিক :

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—৫০৲

অর্ধ পৃষ্ঠা—২৮৲

সিকি পৃষ্ঠা—১৬৲

কভার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

আমাদের যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হ'লে আমরা তজ্জন্য দায়ী নই। কাজ শেষ হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ব্লক ফেরৎ নেবেন।

প্রবন্ধাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন

ম্যানেজার—'মন্দিরা'

৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ফোন :—বি. বি. ২৬৬০

বি, কে, সাহা এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

চা ব্যবসায়ী

৫নং পোলক ষ্ট্রীট
২নং লালবাজার ষ্ট্রীট
৭নং পোলক ষ্ট্রীট

কলিকাতা

—বাংলার বিপ্লবযুগের অপূর্ব ইতিহাস—

"বিপ্লবের পদচিহ্ন"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

আজই একখানা কিনে পড়ুন এবং ঘরে ঘরে পড়বার সুযোগ দিন। বইখানা আপনার গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে থাকবে

—বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

বস্তুতঃ বইখানি পড়তে পড়তে শুধু ভূপেন্দ্রকুমারকে নয়, সমগ্র বিপ্লবীদলকে পাওয়া যায় যারা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং খর্বতা সত্ত্বেও মহৎ। তাদের কর্মসাধনা, তাদের চিন্তাধারা যেন মাটির গভীরে সমগ্র জাতির তপস্যা,—মুক্তির জন্যে, এবং তারও চেয়ে বড়, আলোর জন্যে। এরই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের পরিচয় থাকা শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্য।

(তরুণের স্বপ্ন)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

.....শাসকশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিবরণ, কারাগারের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে ক্ষিপ্ত মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মার পরাজয় স্বীকার না করবার অপূর্ব চিত্র।.....প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই বইয়ে ভূপেনবাবু শুধু নিজের কথাই বলেন নাই; সহকর্মীদের কথা, পুলিশ কর্মচারী জেল কর্মচারী, সরকারী বড় কর্মচারীদের কথা, বিভিন্ন জেলের ব্যবস্থা, অবস্থা, তা সংশোধনের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম, জেলে পড়াশোনা, আদর্শ বিচার, দলাদলি, আমোদ-প্রমোদ—সব কথাই অত্যন্ত সরলভাবে বর্ণনা করেছেন।.....

.....বই খানার ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, লিখনভঙ্গী মনোজ্ঞ ও সরস। একবার আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠা যায় না। সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটা সবল সতেজ সহৃদয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। তা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আমরা সকলকেই বইখানা পড়তে অনুরোধ করি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা—

..... "Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Ravindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengali youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. Only in the Easter Revolution in Ireland we can search for parallels of such acts of individual heroism. We should know the history of this period of Bengal. Let the world also know about them.

—Amrita Bazar Patrika—

সরস্বতী লাইব্রেরী

৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২